ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

[প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০

১৩২৫ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ — আশ্বিন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অকর্ম্ম (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	১৬৯
অগ্নিপরীক্ষা	শ্রীসরলা দেবী বি-এ	১১৬
অনাদি মন্ত্র (কবিতা)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৪৮১
আর্ট ও কবিত্ব	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ	১৯৫
আর্টে নব-ধারা (সচিত্র)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৯৩
আধুনিক ভারতের নৈতিক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬৮
উদ্বোধন	শ্রীসরলা দেবী বি-এ	৮৭
কর্ম্ম (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	৪৭
কলঙ্কিনী (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	২৬৯
কাশফুল (কবিতা)	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়	৪৯২
কুঁড়ি (কবিতা)	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়	৪১৯
কৃষি ও কৃষক	শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় বি-এ	১৭৮
খেলাঘর (নাটিকা)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	২৭৪, ৩৬১, ৪৫৬
খেয়ালের খেসারৎ (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	২০১
গান	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪
ঘেন্না (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	৪৩৭
চক্র ও চক্রান্ত (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০১
চিরদিনের দাগা (গল্প-কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৯
ছন্দ-সরস্বতী	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৪
জলের আল্পনা (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২২৫, ৩১৪, ৩৮২, ৪৬৮
জয়ধ্বনি (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩
জাতির জীবনী-শক্তিহীনতা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	২৬৫
দিন গেল (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৩২৩
দৌ র্মে পিতা মাতা পৃথিবী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৪৫১
নাগকেশর (সমালোচনা)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৯৭
"ন্যাসানাল কংগ্রেসে"র কাজ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৫
পঞ্চরাত্র	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল	৪৮২
প্রতিভার খাইখেয়াল (গল্প)	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	১৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
"বর্ব্বর" শব্দের পুরাতত্ত্বের প্রমাণ	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	১২৫
বাদশাজাদী (গাথা)	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	১১২
বিপন্না (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ	৩৪৯
বিলাসী (গল্প)	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৬
ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিকাশের তৃতীয় অবস্থা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৩
ভোলা (গল্প-কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১
মডেল (সচিত্র)	শ্রীঅজিতকুমার হালদার	৩৩৮
মনে-মনে (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৮
মমতার-ক্ষুধা (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ	২৮
মাসকাবারি—	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	
আর্টের অভিব্যক্তি ও আধুনিক আর্টের রূপ		৫১০
কবিতার ছন্দ		১৮২
কেল্টিক রিভাইভ্যাল ও সাহিত্যের নূতন ধারা		৪২৮
পল্লী-সভ্যতা		২৬২
বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা		২৬৪
"বিজয়ী"		৯৪
বিদ্যাপতি		৯৬
মত ও ব্যক্তিত্ব		২৫৬
মাসিকপত্রে কবিতা		৯৩
রচনার নমুনা		১৮৫
সমাজের স্থিতি ও উন্নতি		১৮৫
সমাজ-চ্যুতাদের কথা		২৫৮
সাহিত্যে মতের ভিড়		৩৫০
মায়ের সম্মান (গল্প-কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৮
মুদ্রাযন্ত্র	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৩৮
রমণী-জীবন	শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়	৩০২
রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী (গল্প)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৫০২
রূপ-রেখা (সচিত্র)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮
লুকোনো ছবি	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১
শরৎকুমার (গল্প)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৪১৯
শরতের গান (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	[illegible]
শিল্প ও শিল্পী	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০২
[illegible]	[illegible]	[illegible]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাহারা রাগ (গান) ...	শ্রীসরলা দেবী বি-এ ...	১০১
সাহিত্য	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৯৭, ৩৭৫
সুন্দর-মঙ্গল (কবিতা) ...	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, বি-এল	৩৫৫
সোনার পদক (গল্প) ...	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল	৩৪৬
সৌজাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	১২২
স্বরলিপি ...	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৫
স্বরলিপি ...	শ্রীসরলা দেবী বি-এ ...	১৩৬
ঐ ...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ...	৪৯৮
স্বপ্ন ...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ...	৪১৪
স্বপ্ন-সুন্দরী (গান) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১৭৭
স্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ ...	শ্রীসরলা দেবী বি-এ ...	২৫৩
হাত-ফের (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ...	২৪১
হারিয়ে যাওয়া (গল্প-কবিতা) / কবিতা	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৭১
হাসি (গল্প) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৩২৩
হায়রে অভিমানি ! (কবিতা) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৩৯৫
য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের গতি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি,এস,সি	২১৯,৩৩৩
ক্ষণিক-মিলন (কবিতা) ...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	২১৮

চিত্র সূচী

অরুণিমা (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	২
অজন্তার 'মা ও মেয়ে'	৫৯
অনন্তের পথে	৪৯৩
"আঁখি-পাখী"	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৬১
কর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্ব	৪৯৭
কোণার্কের অরুণাশ্ব	৫৩
কোনো বিখ্যাত মডেল ...	৩৪০
"কৈকেয়ী"	
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত ...	৫৭
ক্রীড়ক	৪৯৪
গ্রেফ্‌তার	৩৪১
ঘরের বাইরে (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত	৪৩৫
জীবনের বোঝা	৪৯৬
ধর্ম্মপাল	৫১
নটরাজ	৫১
নিরালায় (বহুবর্ণ)	১০১
নেপথ্যে (বহুবর্ণ)	৩৫৩
বুদ্ধমূর্ত্তি	৫৫
ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্ণার্ড ...	৪৯৮
মানসগামী রাজহংস	২৭১
মিস নাইটের আসল চেহারা ...	৩৩৮
মিস গ্যারাওয়ের আসল চেহারা ...	৩৪২
মিস গ্যারাওয়ে	৩৪৩
যাদুকর	৪৯৫
যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন	৪৯৯
"সতী"	
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত ...	৫৬
সুন্দর মূর্ত্তি	৬৩
স্রোতের মুখে (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	১২০



অরুণিমা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৫ [১ম সংখ্যা

জয়ধ্বনি

রক্তের আল্‌পনা,— মৃত্যুর জল্পনা,— শেষ ফল কার হাতে ? সংশয়ময় রাতে—
তার মাঝখানটিতে জাগ্‌ছে ও কে !
নির্ম্মল্ মুখখানি, উৎপল্ দুই পাণি, কণ্টক কণ্টকে উদ্ধার কর্‌ছ কে ?
শান্তির কান্তিটি ভায় দু' চোখে !
উজ্জ্বল ভায় সদা কার বা জ্যোতি ?
যুগ যুগ ওই পদে মোর প্রণতি।

নক্ষত্রের বীথী কার প্রাণ্‌ময় গীতি দুষ্টের দুষ্কৃতি কৌটিল্যের নীতি
তন্ময় শুন্‌ছে গো স্বপ্নমুখে !
চক্রের ঘূর্ণনে ওই কে গুঁড়ায় !
ডঙ্কার ডিণ্ডিম,— ঘোর হুঙ্কার ভীম,— ঝঞ্ঝার তাণ্ডব— কার শঙ্খের রব ?—
উৎপাত নিঃসাড় কার সমুখে ?
দস্যুর বৈভব পাড়্‌তে ধূলায় !

কার ইঙ্গিত্-বলে সিন্ধুর ঢেউ চলে নিদ্রায় জাগ্‌ছে যে,—তিন লোক রাখ্‌ছে যে,—
বজ্রের বেগ বাঁধা কার নিয়মে ?
নক্ষায় দাগছে যে দূর ভাবী কাল,—
খুন্-লুণ্ঠন্-রত ক্রুর-নিষ্ঠুর যত উৎসব্ যার হাসি— সব সংশয়-নাশী,—
কার দুই পায় নত হয় চরমে ?
হার কঙ্কাল-রাশি—সর্প ভয়াল !—

কার কাল্-বৈশাখী ঘোম্‌টায় থোয় ঢাকি পদ্মের সদ্মে যে,— বজ্রীর ছদ্মে যে,—
চন্দন্-ধৌত সে স্নিগ্ধ চাঁদে ?
সন্তের মধ্যে যে—মৌন মহান,—
দিন মাস বৎসর কার পন্থার পর তার রূপ ত্যাখ্ দীন ! রুদ্রের দক্ষিণ
হয় আর পায়, হায়, লয় অগাধে ?
মূর্ত্তির কর্ আজ কর জয়-গান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ছন্দ-সরস্বতী

—প্রথম প্রকাশ—

[আদ্যাশ্রী-মূর্ত্তি—মকরাঙ্গী ডিঙ্গা বাহন—
গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি]

বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাস-খানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর করলেন। তার ফলে, বিকেলে, ইস্কুল থেকে এসেই, পিতামহের পরিত্যক্ত, অনেকদিনের পুরোনো, নীলরঙের একখানা বাতিল্ ব্যাঙ্ক-বই আমার নিজস্ব ডেস্ক থেকে বার ক'রে, তার রুল্-টানা পাতায় সযত্নে লিখলুম—

"কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার॥"

এম্‌নিধারা গোটা-আষ্টেক-দশ লাইন লিখ্‌তেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

লেখ্‌বার এবং লেখা লাইনগুলো ফিরে-ফিরে পড়্‌বার ঝোঁকে এম্‌নি মশ্‌গুল ছিলুম, যে, পিছনে যে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তা' টেরই পাই-নি। হঠাৎ—"বাঃ! বেশ হয়েছে।"—শুনে, চম্‌কে ফিরে দেখি মাষ্টারমশাই।

তিনি বল্লেন—"তুমি তো বেশ পদ্য লিখ্‌তে পারো, কোথাও ছন্দ-পতন হয় নি দেখ্‌ছি।"

আমি বল্লুম—"হয়-নি না কি? ছন্দ-পতন কাকে বলে? ছন্দের নিয়মই বা কি? আমায় শিখিয়ে দেবেন?"

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"ছন্দের নিয়ম জান্‌তে চাও? তা' আমি তো ভালো জানিনে; তবে, মোটামুটি দু'চারটে যা' জানা আছে তা' বল্‌ছি। প্রথম কথা—ছন্দ নানারকম, এই ধর, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"পয়ার কি?"

তিনি বল্লেন—"পয়ার জান না? তুমি যে-ছন্দে লিখেছ, একেই বলে পয়ার। এর প্রতিলাইনে চোদ্দটি অক্ষর থাকে, জোড়া-জোড়া লাইনে মিল। প্রতি পংক্তির অক্ষরগুলো সাজাবার আবার একটু কায়দা আছে। পরে পরে এম্‌নি-সব কথা বসাতে হয় যাতে আট অক্ষর আর চোদ্দ অক্ষরের পর একটু দম নেওয়া যায়। সাধারণত বিজোড়-হরফ-ওয়ালা শব্দের পর বিজোড়-হরফ্-ওয়ালা শব্দই বসাতে হয়, —জোড়ের পর জোড়; তা'তে রচনা শ্রুতি-মধুর হয়।"

আমি বল্লুম—"তা হলে তো আমার ভুল হয়েছে; এই দেখুন, "কি দিয়া পূজিব" 'কি' হ'ল বিজোড়, ওর পর বিজোড় বসানো উচিত, কিন্তু তা' না বসিয়ে, জোড় বসানো হয়েছে,—'দিয়া' দু'অক্ষরের শব্দ।"

মাষ্টারমশাই একটু মাথা চুল্‌কে বল্লেন—"এখানে 'কি দিয়া' একসঙ্গে তিন অক্ষর ধরতে হবে, তার পর 'পূজিব' তিন অক্ষর; তা হ'লে বিজোড়ের পর বিজোড়ই হ'ল। এক-অক্ষরের শব্দ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পরেকার শব্দের সঙ্গে

ওকে যোগ ক'রে নিয়ে, জোড় কি বিজোড় ঠিক করতে হয়; তার পর—

"বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ্ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি॥
ঠাঁই বুঝে গুন টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।
যুক্তাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড়॥"

এই গেল পয়ারের নিয়ম। ছন্দকার বলেন—

"আট-ছয় আট-ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয়,
ছয়-ছয়-আট ত্রিপদীর।
লঘু ছন্দ এনে বসে, দীর্ঘ আট-আট-দশে,
রচনা করিবে তুমি ধীর॥"

ছন্দের কথা এইখানে শেষ করে, অঙ্ক-ভূগোল-ব্যাকরণের নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি আমাকে দিয়ে পালন করিয়ে মাষ্টারমশাই যথাসময়ে বিদায় হ'লেন, কিন্তু ছন্দ-সরস্বতী ঘাড় থেকে নাব্‌তে চাইলেন না। যতক্ষণ জেগে রইলুম ছন্দের কথাই মাথার ভিতর ঘুর্‌তে লাগ্‌ল; ঘুমিয়েও নিস্তার নেই; স্বপ্ন দেখলুম, যেন, কাগজের নৌকো তৈরী ক'রে, ভাসাব ব'লে চৌবাচ্চার দিকে গিয়েছি, গিয়ে দেখি চৌবাচ্চা শুক্‌নো খট্‌খটে! নিরাশ হ'য়ে জলের সন্ধানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে পথ হারিয়ে, হঠাৎ দেখি সাম্‌নে একটি ছোট্ট নদী ঝির্‌ঝির ক'রে ব'য়ে চলেছে, নদীর—

"পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল জঞ্জাল।
জলময় শৈবাল,—পায়ার টাঁকশাল॥"

জলে নাব্‌বো বলে ঘাট খুঁজলুম, পেলুম না; শেষে পায়ের দাগ খুঁজছি এমন সময় কে বলে উঠ্‌লো—

"কাম নাবড়ি খাটি মন কৈড় আল।
সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল॥"

মাথা তুলে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। তার পর নদীর দিকে চোখ পড়তে, দেখলুম, যার আওয়াজ পাওয়া গেছে সেই লোকটি নিজের কায়াকে নৌকো ক'রে নদী পার হয়ে চলেছে,—তার নৌকো কাঠেরও নয়, কাগজেরও নয়। ফের যেই নাব্‌তে সুরু করেছি অম্‌নি কে বলে উঠল—

"কে সিরজিল গঙ্গা, কে সিরজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ আঙুল শঙ্খ॥"

উদ্‌গ্রীব হয়ে সাম্‌নেকার বন-ধুতরোর ডালপালা সরিয়ে দেখি কে একজন হাঁটুজলে হেঁটে চলেছে। লোকটির একহাতে একটি শ্বেতপদ্মের কুঁড়ির মতন শাঁখ, আর-এক হাতে নৌকোর রশি; গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখি একখানা নৌকো তার পিছনে; লোকটা তারি গুন টেনে চলেছে, আর মাঝে মাঝে হাতের শাঁখটার উপর চোখ রেখে থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে।

গাঙের ধার-দিয়ে ধার-দিয়ে নৌকো-খানা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। নৌকোর চেহারা অনেকটা মকরের মতন; মকরের পুচ্ছে চাঁদমালা, শুঁড়ে শোলার সিঁথী-মো'র। মাঝিরা দাঁড় বন্ধ রেখে গান ধরেছে—

"দহে পৈসু বড়ায়ি, তিরীর জীবন।
বৈরী হআঁ লাগিল এ রূপ জৌবন॥"

নৌকো আরো এগিয়ে এলে দেখলুম, মাঝি অনেক, কিন্তু আরোহী একজন মাত্র মেয়ে; তার গলায় কুঁদফুলের মালা, হাতে শ্বেতপদ্ম, কানে বকফুলের কর্ণিকা।

দেখেই কেমন মনে হ'ল, ইনিই গঙ্গা-দেবী। যেমন মনে হওয়া অম্‌নি পাঠ-শালের পোড়োদের মতন সুর ক'রে জোর গলায় বল্‌তে সুরু কর্‌লুম—

"বন্দো মাতা সুরধুনী,
পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী!"

আমি গঙ্গাবন্দনার দ্বিতীয় পদটায় না পৌঁছতেই নৌকো আমার সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। দেখ্‌লুম দেবী হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছেন। তাঁর ডাকা সত্ত্বেও আমি জলে নাব্‌তে ইতস্তত করছি, দেখে, একজন মাঝি আরেক-জনকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—"ওহে মুরারি ওঝার নাতি, ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসনা ভাই! ও বোধ হয় জল দেখে ডরাচ্ছে।"

বল্‌বামাত্র মুরারি ওঝার নাতি এসে আমার হাত ধরে বল্লেন—"চলে এস, ভয় কি? হাঁটু-জল।"

নৌকোয় পা দিতেই দেবী বল্লেন,—"তুমি আমার মকরাঙ্গী ডিঙ্গা দেখে, বোধ হয়, আমায় মকরবাহিনী গঙ্গা ঠাউরেছ। আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দ-সরস্বতী। আজ প্রায় হাজার বছর ধ'রে এম্‌নি ক'রে এই ডিঙ্গায় চড়ে গৌড়-বাংলার নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন জানো? মরালের সন্ধানে। অনেক দিন মানস-সরোবরে যাওয়া হয় নি, তাই, এদের বল্লুম আমার বাহন খুঁজে দিতে, তা এরা আমায় এই মন্থরগতি মকরাঙ্গী ডিঙ্গা এনে দিলে।—

'ভালো আর নাহি লাগে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মকরাঙ্গী ডিঙ্গা চড়ি গাঙ্গিনীতরণ॥"

অন্যমনস্কভাবে পায়ে ক'রে একরাশ টগর আর শ্বেত-শিউলী জলে ফেলে দিয়ে দেবী বল্‌লেন—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

আমি বল্লুম—"যাব।"

কি আশ্চর্য্য! বলবা মাত্র দেখি নৌকো চলতে আরম্ভ ক'রেছে! দুইধারে সপ্তপর্ণী আর পঞ্চমুখী জবার জঙ্গল নিরিবিলি সাত-পাতা আর পাঁচ-পাপ্‌ড়ির পয়ার-পাঁচালি রচনায় ব্যস্ত। গাঙের জলে রাশ রাশ বিল্বপত্র ত্রিপদীর অর্ঘ্য বহন ক'রে চলেছে। মেয়েরা গা ধুয়ে কলসীতে জল ভর্‌তে ভর্‌তে গুন্‌-গুনিয়ে গাইছে—

"বাঁশী বাজাইল যবে কাহ্নে,
কোকিল কৈল পালি গানে;
আগুনি জ্বালিল, দেহে তখন, দক্ষিণ পবনে।"

তারা সব—

"উপর কর্ণে চাকি পরে নাম্বা কর্ণে চেঁড়ি।"
তাহার মধ্যে শোভা করে হীরা মঙ্গল কড়ি॥"

তাদের—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।"

এম্‌নি কত স্নানের ঘাট কত আঘাটা পিছনে ফেলে নৌকো চলেছে, একদিকে—

"মুকুলিল আম্ব-সাহারে।
মধুলোভে ভ্রমর গুজরে॥"

অন্যদিকে—

"মাদলের বাজনে রাউত নাচ্যা যায়।
কাহন কুঞ্জরে সাজে রাজরূপ রায়॥"

একদিকে ধনী বেনেদের মস্ত মস্ত বাড়ী, তার—

"পাষাণ দেয়াল ঘরের, লোহার কবাট।
হীরার বাঁধুনি, নাই পীপিড়ার বাট॥"

অন্যদিকে বিজন বন, সেখানে—

"খোঁড়া বাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তমু মোর তিন খানি পা।
গণ্ডার লুকায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্ব্বত সমান হয় গা॥"

একদিকে মুর্চ্চাবন্দী গড়, তার—

"বাহির মহলে বসেছে বীর
ধরণী উপরে ধনুক তীর।"

অন্যদিকে, লতা-বিতানে ঘেরা স্বপ্নপুরীর পইঠায়—

"সুকোমল চরণ কমল দু'টি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।"

একদিকে স্তবের গুঞ্জন,—

"নমস্তে সর্ব্বানী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া!"

অন্যদিকে সুরের ক্রন্দন—

"কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনী, ভরিয়া ডালা।"

একদিকে পল্টন চলেছে—

"কঁত, নিশান ফরফর্‌ নিনাদ ধরধর্‌
কামান গরগর্‌ গাজে।"

অন্যদিকে—

"কপোত দুটি ডাকে, বসি শাখে মধুরে,
দিবস চ'লে যায় গলে যায় গগনে;
কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরু-লতা গহনে॥"

ছবির পর ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি, হঠাৎ, আপ্‌নার মনে ছন্দময়ী বলে উঠ্‌লেন—

"বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা॥"

আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইতেই বল্লেন—"পেয়েছি, আমার মরালের সন্ধান পেয়েছি। সে যুক্ত-ডানা মুক্ত ক'রে আমার দিকে উড়ে আসছে।" হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর যেতেই বল্লেন,—"তোমার হাতে ও কি? কাগজের নৌকো? ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও, এতক্ষণ ভাসাও-নি কেন?.. আচ্ছা তুমি কাগজের হাঁস তৈরী করতে জান?... জাননা?...বাড়ী থেকে কাগজ নিয়ে এস, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।"

কাগজের জন্যে বাড়ী ফেরাটা কিন্তু মোটেই মনঃপূত হ'ল না। প্রথমে পকেটটা হাৎড়ে দেখ্‌লুম, তার পর, কি ভেবে জানিনা—বোধ হয় কাগজের বদলে তাল-পাত চলে, এই কথাটা মনে পড়ে গিয়ে থাক্‌বে—যেমন একটা হেলে-পড়া তালগাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার জন্যে টান দেব অম্‌নি নৌকোখানা স'রে গেল, আমি শূন্যে ঝুলতে লাগলুম। তারপর সমস্ত কেমন গুলিয়ে গেল। খালি মনে পড়ে নৌকোখানা অদৃশ্য হওয়া মাত্র, তার গুন-টানা দড়িগুলো অজগরের মতন হ'য়ে আমার পায়ে যেন জড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, এবং সেই চীৎকারের চেষ্টাতেই ঘুম্‌টাও ভেঙে গেল। চোখ্‌ মেলে দেখি বন্ধ জান্‌লার ছিদ্র দিয়ে তবক্‌-মোড়া মোটা মোটা গুন-টানা দড়ির মতন সূর্য্যের কিরণ বিছানায় এসে পড়েছে।

—দ্বিতীয় প্রকাশ—

[হৃদ্যাশ্রী-মূর্ত্তি,—মঞ্জুমরাল বাহন—
গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতি।]

তিন্‌টে বছর অক্ষর গুণে কেটে গেল। এই সময়ে একদিন ইস্কুলের পথে, আমাদের

পাড়ার এক ভদ্রলোকের হাতে একখানি লাল মলাটের বই দেখ্‌লুম। জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌লুম সেটি কবিতার বই। লাভ সাম্‌লে ইস্কুলেই যাওয়া গেল, কিন্তু মনটা পড়ে রইল সেই বইটার উপর। পণ্ডিতের ঘণ্টায় ছেলেরা যখন হট্টগোল জুড়ে দিয়েছিল আমি তখন টেবিলে মাথা দিয়ে সেই বইটার কথাই ভাব্‌ছিলুম। হঠাৎ দেখি ছন্দময়ী আমার সাম্‌নে উপস্থিত! এবার নতুন মূর্ত্তিতে,—মরাল বাহনে, বীণা-পুস্তকরঞ্জিত-হস্তে। ভোরের আলোয় শুকতারার মতন তাঁর চোখদুটি, আধ্‌-ফোটা বেলফুলের কুঁড়ির মতন তাঁর মুখখানি,—প্রসন্ন প্রফুল্ল অথচ প্রশান্ত। তাঁর হাতের পুস্তকটিকে প্রথমে টালি বলে' ভুল ক'রেছিলুম, কিন্তু ক্রমশ জান্‌লুম, সে টালিও নয়, পাটালিও নয়, সেটি হচ্ছে, আমার ইস্কুলের পথের মায়ামৃগ—সেই লাল মলাটের কাব্যগ্রন্থাবলী।

ছন্দময়ী বল্লেন—"দেখ, দেখ,—

'বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি যেন
রক্ত কমল ফুটে!
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে!"

ছন্দময়ী যখন আবৃত্তি করছিলেন, আমি তখন বইটার পাতা ওল্‌টাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল—

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই?"

আমার অক্ষর-গোণা বিদ্যায় এই নতুন ছন্দের কোনো হদিস্‌ না পেয়ে দেবীকে বল্লুম—"এ কি রকম পদ্য? এ যে পড়াই যায় না, অক্ষর সব কম-বেশী।"

ছন্দময়ী হেসে বল্লেন—"এই আমার মঞ্জু মরাল, এর কণ্ঠে কলধ্বনি, চরণে নৃত্য, গতিতে বৈচিত্র্য অথচ সুষমা। এতদিন বাঙালী ছন্দবিদ্যায় প্রায় উড়ে আর আসামীর সামিল ছিল, এই বারে বিশিষ্টতা অর্জ্জন ক'রেছে।"

আমি বল্লুম—"আমি কিন্তু এর বিশেষত্ব ধর্‌তে পারলুম না।"

ছন্দময়ী বল্‌লেন—"পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর, প্রকৃত পক্ষে যে এক-জোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আর এটাও স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে ঐকার আর ঔকার হচ্ছে স্বর-সঙ্কর অর্থাৎ এক-জোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরী —ইংরিজিতে যাকে বলে dipthong; এই দুটো কথা মনে রেখে, এই নতুন ছন্দ পড়তে, কি লিখ্‌তে চেষ্টা করলে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। এখন আর বাংলা ভাষা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর, যুক্ত-অক্ষরের হর্ত্তুকি-বয়ড়া, আর হসন্তের জুঁইফুল পচিয়ে মহা-সুগন্ধি ত্রিফলার জল তৈরী করছে না; এখন এ 'বহতা পানী নির্ম্মলা!'...আমার গাঙ্গিনী-তরণের মকরাঙ্গী ডিঙ্গা সোনার তরীতে পরিণত হয়েছে। যা এতদিন সিংহল-যাত্রায় বেরিয়ে ক্রমাগত খালের জালেই ঘুরে মরছিল, তা এবার গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতিতে পাড়ি দিয়ে সাগর-সঙ্গম ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় অগ্রসর। সাগরের

তরঙ্গ-ভঙ্গে এখন এর উল্লাস। যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঘেঁষ্‌ড়াতে ঘেঁষ্‌ড়াতে, হসন্ত-তকারের কল্‌মীদাম দাঁড়ের আগায় ছেঁচ্‌তে ছেঁচ্‌তে, অন্যান্য হসন্ত-অক্ষরের শুশুক-পৃষ্ঠে লগি লাগাবার দুশ্চেষ্টা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল। বাংলা কথার উড়ে উচ্চারণ আর সহ্য হয় না। বাঙালী কবির—

'স্ত্রীর নাহি অন্য গতি সৃজিল বিধাতা।
মৈলেহ অধিক নাহি স্বামীর ব্যগ্রতা॥'

আর উড়ে কবির—

'নির্ম্মল' ক্রষ্টিরে নাথ' মোতে ন চাঁহছ।
বেনিভুজে আলিঙ্গন' কিম্পা ন করুছ॥'

ছন্দ উভয়েরই সমান; তফাৎ এই যে, উড়ে পয়ারটির 'নির্ম্মল' 'নাথ' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে অকারান্ত; অপর পক্ষে বাংলা পয়ারটির 'অধিক' 'স্বামীর' প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর হসন্ত, অথচ শুধু ছন্দের খাতিরে অকারান্ত ক'রে পড়্‌তে হয় অর্থাৎ উড়ে-পন্থী হ'তে হয়। মাত্রা-বিচার-শূন্য অক্ষর-গোনা-ছন্দ, এখন, উড়ে কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালী কবির দ্বারা আর ও কাজ চল্‌বেনা। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাৎ হ'য়ে গেছে। উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বল্‌ছে যে পুরোনো ছন্দ পুরোনো কাপড়ের মতন ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জা নিবারণ হবে না, এখন—

'হরী হু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ
সুক্তেন বচসা নবেন।'

এখন দেবতার রথে নূতন ছন্দের তরুণ অশ্ব-যোজনা করতে হবে।

'স প্রত্নবন্ নব্যসে বিশ্ববার
সুক্তায় পথঃ কৃনুহি প্রাচঃ॥'

"তা হ'লে দেবতাও সেই পূজা গ্রহণ ক'রে, ভাবের ভুবনে তোমাদের নূতন নূতন পথ খুলে দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দ-বিদ্যায় বাঙালী আর পাঠশালের পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন হয়েছে। সে আর আসামী কবির—

'দুধ পিউ দুধ পিউ বোলেরে যশোবা।
দুধ না খাঞা গোপাল কান্দে ওবাঁ ওবাঁ॥'

ছন্দে ভুল্‌ছে না; কারণ তার ছন্দ-বুদ্ধি এখন বোধিসত্ত্ব, সে আর স্তনন্ধয় শিশু নয়। মঞ্জু-মরালের পায়ে সোনার মঞ্জীর বেজে উঠেছে। এ আর গাঙ্গিনী-তরণ-পদ্ধতির মকরাঙ্গী ডিঙ্গা নয়; এতে 'ঙ'-এর দু'-রকম বাটখারায় ওজন চল্‌বে না। ছন্দ-ব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের যাট তোলা, স্বরান্তের আশী এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—ছন্দেশ্বরীর টাটে ব'সে—তিনরকম বাটখারায় মিশিয়ে, ইচ্ছামত ওজন দিয়ে—চুক্তি-ভুক্তন্‌ করতে পারবেন না। ঐ দেখ শান্ত জলেও আজ ঢেউ উঠেছে—

'কলস ঘায়ে উর্ম্মি টুটে,
রশ্মি-রাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর চুম্বি যায় কভু।'"

আমি এইবার জিজ্ঞাসা করলুম—"ছন্দ পাটির অনুসারে এই পদটি কি পাটিয়ে দেখ্‌তে পারি?"

দেবী হেসে বল্লেন—"আখো।"

পাটিয়ে এই রকম দাঁড়াল:—

কলস ঘায়ে। উর্‌মি টুটে।
রশ্‌শি রাশি। চুর্‌ণি উঠে।
শান্‌ত বায়ু। প্রান্‌ত নীর। চুম্‌বি যায়। কভু।

ছন্দময়ী দেখে বল্লেন—"ঠিক হয়েছে, প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে পাঁচ। এ আমার পাঁচ-কড়াই পাঁইজোর।"

এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে, আবার আপনার মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বল্‌তে লাগলেন—

"গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-জলে
মেলিয়া যুক্ত ডানা,
মঞ্জুমরাল বিহর হরষে
সঙ্গীত গাও নানা।
ওগো বিচিত্র! বঙ্গবাণীর
নবীন বাহন তুমি,
মধুর তোমার কলগুঞ্জনে
মোহিত বঙ্গভূমি।"

ছন্দময়ী নীরব হ'লে আমি বল্লুম—"এই নতুন ছন্দে লিখ্‌তে চেষ্টা করব কি?"

দেবী বল্লেন—"এখন না।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন?"

তিনি বল্‌লেন—"খবর্দ্দার! ভয়ানক মার খাবে।"

ছন্দ-সরস্বতীর এই আকস্মিক রূঢ়তায় বিস্মিত হ'য়ে, তাঁর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে চোখ-দুটো একটু বেশীমাত্রায় বিস্ফারিত হ'য়ে গেল এবং দেখলুম—সে মুখ ছন্দ-সরস্বতীর নয়—আমাদের ক্লাসের পণ্ডিত-মশাইয়ের। আমাকে তাঁর ঘণ্টায় ঘুমুতে দেখে তর্জ্জনী তুলে প্রচণ্ড রকম তর্জ্জন সুরু ক'রেছেন।

—তৃতীয় প্রকাশ—

[চিত্রশ্রী-মূর্ত্তি—মত্তময়ূর বাহন—
ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতি।]

মঞ্জু-মরালের নৃত্যের তালে কান তৈরী হওয়ার বছর পাঁচেক পরে আবার এক দিন সন্ধ্যার ঝোঁকে খেয়ালী মেয়ে ছন্দময়ী এসে হাজির। বাইরে তখন ঝর্ণার মতন ঝঙ্কার ক'রে বৃষ্টি ঝর্‌ছে, বাদ্‌লা হাওয়ায় জুঁইফুলের গন্ধ, জান্‌লা দিয়ে এসে, আস্তে আস্তে চোখের উপর ঘুমের চামর চোলাচ্ছে। চোখ একেবারে ঝাম্‌রে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই জুঁইফুলের ঘুম্-ঘুম্-গন্ধ খিতিয়ে গিয়ে জুঁইফুলের মতন হাল্‌কা এবং জুঁইফুলেরই মতন ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ের চেহারা আমার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি জড়ানো আওয়াজে বল্লুম—"কেগা?"

মেয়েটি বল্লে—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।"

"আজ এই তিন কন্যের তৃতীয় কন্যাটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ব'লে, এলুম।"

আমি সসম্ভ্রমে উঠে বসে বল্লুম—"দেবী, আজ তোমার এ আবার কি মূর্ত্তি?—

"ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ-শুভ্র-নীল-পদ্ম-বিভূষণা!
হংসারূঢ়া! ময়ূর-আসনা!'

আজ্‌কে মেঘাড়ম্বর দেখে মত্ত ময়ূরকে ধ'রে বুঝি বাহন ক'রেছ? হাতে নীল-পদ্মের কুঁড়ির মতন ওটি কি?"

ছন্দময়ী বেশ একটি কি নাম বল্‌লেন; নামটি সংস্কৃত-গোছের, তার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাড়াতাড়ি সেই অপূর্ব্ব-নাম-বিশিষ্ট নীল পদ্মটিকে হাতে নিতে গিয়ে দেখলুম, সেটি পদ্ম নয়, হাতের পোঁছার মতন ছোট্টো একটুখানি মেঘের টুক্‌রো, তাতে বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে! আমি স্পর্শ করবার

আগেই সে হাত-কসকে অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে বিদ্যুৎ-হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ছন্দময়ী বল্‌লেন—"ওকে অত সহজে আয়ত্ত করতে পার্‌বে না। ও হ'ল বাংলাভাষার প্রাণসাথী। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গবাণীর স্বরূপ-মূর্ত্তি সে প্রত্যক্ষ করবে, বাংলা সঙ্গীতের মর্ম্মের কথা তার কাছে রূপ ধ'রে ফুটে উঠ্‌বে। দেখ্‌তে ছোট বটে, কিন্তু, সহজে তুমি ওকে হাত-করতে পারবে না। আচ্ছা, রোসো, আমিই ওকে ধরে দিচ্ছি।"

এই-ব'লে ছন্দময়ী বীণার তারে আঙুল সঞ্চালন করতে লাগলেন। বীণা ব'লে উঠল—

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।"

ছন্দটি নতুন অথচ চির-পরিচিত মনে হ'ল,—বাড়ীর মেয়েকে পুজো-বাড়ীতে দেখার মতন। তাড়াতাড়ি খড়ি পেতে ছন্দলিপি নিতে গেলুম, কিন্তু, একি!

তোমার আমার। মাঝখানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান সে।
শোনায় নির-। বধি।

—যুক্তাক্ষরের বালাই নেই, অথচ—ছয়, পাঁচ, পাঁচ, দুই; পাঁচ, ছয়, পাঁচ, দুই;—পংক্তিপর্ব্বের কোনোটায় ছ' অক্ষর কোনটায় পাঁচ! এ কি-রকম?

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে, আমার ছন্দলিপির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—"এ ছন্দে হসন্ত বা ভাংটা অক্ষর হাঁটাই ক'রে, খালি স্বরান্ত বা গোটা অক্ষর গুণতে হয়। শব্দের যে-যে-অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে রাখ, বুঝতে পার্‌বে।"

আমি আবার ছন্দপাটি ধরলুম—

তোমার্ আমার্। মাঝ্‌খানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান্ সে।
শোনায় নির-। বধি॥

পংক্তিপর্ব্বগুলো পরীক্ষা ক'রে বল্লুম—"সকল পর্ব্বেই চার পাচ্ছি; খালি দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পর্ব্বে পাচ্ছি পাঁচ। দু-ই-ত-টে-রে, তবেই পাঁচ হ'ল। এইখানে ছন্দ পতন হ'য়েছে।"

দেবী বল্লেন—"দাঁড়াও, অত শীগ্‌গির ছন্দ পতন হ'য়েছে ব'ল' না। দুই-শব্দের ইকার পুরো উচ্চারণ হচ্ছে না, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল; যদি স্বরবর্ণ ব'লে ওকে হসন্ত বল্‌তে ইচ্ছা না হয়, ওকে আধলা বা ভাঙটা বল্‌তে পার, পুরো বা গোটা বল্‌তে পার না। বাংলায় হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ বা হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ নেই; আছে গোটা ই, ভাংটা ই; গোটা উ, ভাংটা উ;—এমন কি গোটা ও, ভাংটা ও; গোটা এ, ভাংটা এ পর্য্যন্ত আছে। 'বাইশ' আর 'বাইজী' শব্দ 'বাউল' আর 'আউলে' শব্দ 'বাঁওড়' আর 'কেওড়া' শব্দ, মনসামঙ্গলের 'গাএন' আর 'পাএরা' শব্দ পরস্পর তুলনা ক'রে দেখলেই আমার বক্তব্য বুঝতে পার্‌বে। এই সমস্ত জোড়া জোড়া উদাহরণের গোড়ার গুলিতে গোটা এবং শেষের গুলিতে ভাংটা স্বর

রয়েছে। বাংলায় সমস্ত স্বরই এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যঞ্জন ত স্বভাবতই আধ্‌লা, স্বরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তবেই পুরো হয়। কাজেই কি স্বর, কি ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণেরই এই দুই মূর্ত্তি,—গোটা আর ভাংটা, পুরো আর আধলা।

আগেকার কবিরাও নিজেদের রচনায় বাংলার এই বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, ওই শোনো মুরারি ওঝার নাতি কি বল্‌ছেন—

"বঙ্গদেশে প্রমাদ হই'ল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আই'লা গঙ্গাতীর॥"

"তোমাদের ভাগবতকার কি বল্‌ছেন শোনো—

'হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর্ কথা শুনি।
তাল্ খাই'বারে শিশুর্ সঙ্গে চলে চক্রপাণি॥'

"রামায়ণে আর ভাগবতে ভাংটা স্বরের নমুনা দেখ্‌লে? এখন মহাভারতকার কাশীদাস কি বলেন শোনো—

'নির্দ্রারিদ্র্য হই'ল ক্ষিতি পাই'য়া মহাদান।'

"সেকালের উচ্চারণে হসন্ত বা ভাংটা স্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই ছিল; নইলে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যে যাঁরা রাজপুত্রা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা পদে পদে এ সমস্ত ব্যাভার ক'রে স্বেচ্ছায় নিজের রচনাকে বিড়ম্বিত করতেন না।"

আমি বল্লুম—"তা যেন হ'ল—স্বরের পুরো ও ঝুরো মূর্ত্তি যেন স্বীকার করা গেল—কিন্তু এ ছন্দে লিখে আর বাহাদুরী কি? এতো আমাদের পুরোনো তের্‌কেলে ছড়ার ছন্দ—নিরক্ষর চাষার ছন্দ, সাপের মন্তরের ছন্দ।"

ছন্দময়ী বল্‌লেন—"হ্যাঁ, এ নিরক্ষরের ছন্দ; সংস্কৃতের উদ্ধিতে এর চেহারা বদলে যায় নি; সেইজন্যে ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। তাই বাইরে থেকেই বোঝা যায়, এর বুকের ভিতর—

'কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
কত পাগল বান।'

"এর অর্দ্ধোচ্চারিত বর্ণ-বিন্যাসে যেন রঙিন ছবির ছায়া-সুষমা; এর চোখের পাতায়, ঠোঁটের কোণে, এর ভাঁজে-ভাঁজে, পরতে পরতে—

'কত আভাস আসা-যাওয়ার
ঝর্‌ঝরাণি হঠাৎ হাওয়ার।'

"ওজন-বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্ত্তি করবার দিকে যাঁদের বেশী ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগ্‌ড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্য-যুগের ফার্সীনবিশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখা-দেখি বাংলার 'যাইবে' 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দ্দিষ্ট বা ভাংটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনে সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি, পয়ারের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা পড়ে, একেবারে বেঁকেচুরে আড়ষ্ট হ'য়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ বল্‌তেও কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না। এ সমস্তই বাইরে থেকে ফার্সী

অলঙ্কারের একটা অবান্তর সূত্রের অনুসরণ করার ফল। 'জরুরৎ-ই-শা'য়্‌র্' বা ছন্দের খাতিরে বয়েতের ভিতর প্রচুর পরিমাণে ই-কারের আমদানী করা ইরানী কবিদের একটা মহৎ ব্যায়রাম; যেমন—

"নিশস্ত্ (ই) সর্। বর্ (ই) আহ্‌ল্ (ই)।
করম্ ব মজ্। লিস্ (ই) খাস্।
দো খাঁ' সে খাঁ'। দো সে খাঁ' খাস্ত্।
(ই) খাঁ' চে খাঁ। কে ন' খাস্ত্।

ফার্সীর নজীরে এম্‌নি ক'রে মধ্যযুগের ছন্দকারেরা হসন্ত-শব্দকে খেয়াল-মাফিক স্বরান্ত বা হসন্ত করেছেন। কালিদাসের প্রাকৃতে—

'কিং বি হিঅএ করিঅ মন্তেধ'

ইত্যাদি পদের 'করিঅ' (কৃত্বা) শব্দের ই-কার যখন ঢুলে ঢুলে ক্রমশ ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়্‌ল, তখনো কেতাবী ভাষায় কাতুকুতু দিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু এত করা সত্ত্বে ভাষার স্বরূপ চাপা পড়েনি।"

ছন্দময়ী নীরব হ'লে আমি বল্লুম—"তা পড়েনি। এখন বেশ বুঝতে পারছি পুরোনো কবিদের ভিতর চৌদ্দর নিয়ম এত শিথিল কেন। আগে ভাব্‌তুম এঁরা বুঝি মিশরী কবিদের মতন ছন্দসৌকুমার্য্য রক্ষার চেয়ে বক্তব্য বিষয়টা স্পষ্ট কর্‌বার দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেন—তা' অক্ষর যতই বেড়ে যাক্‌না কেন। যেমন—

ধেয়ানত হাড়ি গুরু ধেয়ান্ করি চায়।
ধেয়ানর্ মাঝত্ রোল কাওন্ কড়ি ঝোলায় লাগাল্ পায়।

"সেকালে গুন্‌তির হিসেব চলন থাক্‌লে শেষের পংক্তিতে আটের ফারাক দাঁড়ায়; শব্দ-পাপড়ি বা syllableএর হিসেবে তিনের ফারাক হয়। কাজেই, শেষের নিয়মই প্রাচীন কালে বলবান ছিল, বলা সঙ্গত। নইলে বল্‌তে হয় বাঙালীরা ছন্দবিদ্যায় মিশরীদের নিকট জ্ঞাতি বা ভক্ত শিষ্য। কৃত্তিবাসও লিখেছেন—

তারা মোকে নিষেধিল বিবিধ বিধানে।
তোমা হেন ধার্ম্মিক্ চণ্ডালে প্রতীত্ গেলাঙ্ কেনে॥

তার পর শূন্য-পুরাণের—

কুথা হইতে আইলেক্ কুর্ম্ম কুথা তোহ্মার ঘর।

কিম্বা মাণিকচন্দ্রের গানের—

যখন্ আসিবে যম্‌ভাড়ুয়া দৈত্য দানব হঞা।
তৈল পাঠের খাড়া দিঞা ফেলামু কাটিঞা॥

অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের—

তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ্ ছাড়া যায়্ তোমা সভা ছাড়িতে না পারি॥

প্রভৃতি শত শত পদ, যা' আমাদের পণ্ডিতমশাইরা এতদিন প্রাচীন কবিদের ছন্দ-মূর্খতার উদাহরণ ব'লে ঘোষণা ক'রে এসেছেন, তা', এই ছড়ার ছন্দের বা ঝর্ণা-ঝামরপদ্ধতির নিয়মে, syllable বা শব্দ-পাপ্‌ড়ির সংখ্যার হিসাবে প্রায় নিখুঁৎ। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে, যে, ভাষার যা' ধাতুগত,—যা ছেলে-ভোলানো গানে, মেয়েলি ছড়ায়, ব্রতকথায়; যা' সাপের ওঝা, ভূতের ওঝা, ডাইনের ওঝার বোলচালে; যা বাড়ীবন্ধ, শরীরবন্ধ, জলপড়া, তেলপড়া, সর্ষেপড়ার মন্ত্রে; এক কথায় বাংলার অথর্ব্ববেদে যা' আত্মপ্রকাশ করেছে; অন্যদিকে যা' পাঁচালি-তর্জ্জায়, ঝুমুরে-কবিতে, যা' ভেটেলের সুরে, বাউলের গানে, বৈরাগী-ফকিরের সাধন-সঙ্গীতে, যা' রামপ্রসাদের

রচনায়, এক-কথায় বঙ্গের গীতিসাহিত্যে বা বাঙালীর সামবেদে, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, তা' একদিন বাংলার সত্যিকার ঋগ্বেদে অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যেও সুব্যক্ত ছিল। সাক্ষী প্রাচীন কৃত্তিবাস (বটতলার নয়), সাক্ষী গোবিন্দচন্দ্রের গান, সাক্ষী শূন্যপুরাণ। মক্তবের মুন্সীদের দুর্ম্মুশ-দলনে বা টোলের পণ্ডিতদের গোময়-লেপনে তা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য এই, যে, এদিকে এতদিন কারো নজর পড়েনি!"

ছন্দময়ী হেসে বল্লেন—"লম্বকর্ণদের ছন্দের কান নেই, তারা ছন্দের ভিতরকার সুর ধর্‌বে কি ক'রে? বহুদিন পরে বাংলায় একজন সত্যিকার কবিকে দেখ্‌তে পেয়েছি যে জগতের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারে—

'বেদানাম্ মাতরম্ পশ্য
মৎস্থাম্ দেবীম্ সরস্বতীম্।'

তাকে পেয়ে আমার অনেক ক্ষোভ মিটেছে, অনেকদিনের অনেক আরম্ভ সম্পূর্ণতা লাভ ক'রেছে। বাংলায় ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করেছেন,—মিথিলার অনুকরণে, ঢেণ্ঢন্, সরহ, কাহ্নপাদ, নসীর মামুদ, রায় বসন্ত, গোবিন্দদাস বাংলার ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘের কৌলীন্য প্রবর্ত্তনের চেষ্টা পেয়েছেন। ভারত-চন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াতের ভঙ্গীর হুবহু নকল ক'রেছেন কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দ সাম্‌নে পড়্‌লেই, ভঙ্গ না দিন, পাশ কাটিয়েছেন। গুপ্তকবি 'আয় রোদ্দুর হেনে' বা 'ধিন্-তা-ধিনা' প্রভৃতি ছন্দে খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধ'রে ফেলেছেন, বলা যেতে পারে; কিন্তু বেশী দূর এগোননি। এঁর 'স্বেচ্ছা ছন্দ' এখনকার 'মুক্তবন্ধ' বা Vers Libreএরই অগ্রদূত। তারপর মধুসূদনের ব্রাত্যশ্রী-সম্পন্ন অমিত্রাক্ষর, তাতে গ্রীকছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ ধরা না পড়্‌লেও, বাংলার পক্ষে বেশ একটু নতুন জিনিস। রমাই পণ্ডিতের—

'জমরাজা পড়িল ফাঁপরে
আসিয়া জমের মা জমকে দিল গালি
পুত্র আজ করিলি রে সর্ব্বনাস।'

প্রভৃতি হিব্রু-বৃত্তগন্ধী রচনাকে যদি অমিত্রাক্ষরই ধরা যায়, তা হ'লেও মেঘনাদের ছন্দ-বিশিষ্টতা কমে না। তারপর যিনি যাই করেছেন, তাতে আমাকে ক্রমাগতই বল্‌তে হয়েছে—

'তোমরা কেউ পারবে না গো
পারবেনা ফুল ফোটাতে।'

"এইযুগে আমি যখনই বীণার জন্যে হাত বাড়িয়েছি তখন হয় পেয়েছি শিঙে নয় পেয়েছি রামশিঙে। মনের কষ্টে দিন কেটেছে। আমার দুঃখে বোধ হয় বিধাতার টনক নড়েছে, তাই পেয়েছি এই সুরবাহার। ইরানীরা বলে এক বুল্‌বুলে বসন্ত-সম্ভব হয় না, কিন্তু বাংলার শুভাদৃষ্টক্রমে এক বুল্‌বুলেই এখানে ঋতুরাজ মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের মুক্তবেণীর গঙ্গা-তীরে, একজন মাত্র কবির প্রতিভাবলে, আজ ছন্দের তিন ধারা বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে যুক্তবেণীর সৃষ্টি ক'রেছে। আজ—

'আকাশ জুড়ে ঢল নেমেছে, সূয্যি ঢলেছে,
চাঁচর চুলে জলের গুঁড়ি,—মুক্তো ফলেছে।
চাউনিতে কার আওয়াজ দিয়ে বিজুলি চম্‌কায়,
হাওয়ায় উড়ে কদম ফুলের কেশর লাগে গায়।

আল্‌গোছে বা' গায় লাগে তা' গুণ্‌ছে বলকে?
নৃত্য করে মত্ত ময়ূর বিদ্যুতালোকে।
সুপ্ত বীজের গোপন কথা অঙ্কুরে আজ ছায়,
ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতিতে ময়ূর নেচে যায়॥"

ছন্দময়ীর ছন্দ-গুঞ্জন শেষ হ'লে আমি বল্লুম—"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপ্‌ড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?"

ছন্দময়ী হেসে বল্লেন—"আমার নবীন বাহন মত্ত ময়ূর আমাকে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত করছে, কাজেই, আমি নিজে কিছু বল্‌তে পারব না। তামিল-আলঙ্কারিক অমৃত-সাগরন্‌কে স্মরণ করছি, সেই এসে যা' হয় বল্‌বে।"

এই ব'লে ছন্দময়ী অন্তর্হিত হ'লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজলধরকান্তি একজন পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে আমার মধুর সতীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি জান্‌তে চাও?"

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলুম।

তিনি বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"অলবড়ি!...অলবড়ি কাকে বলে জানো? যে-সমস্ত পদ্য-পংক্তিতে চারটি ক'রে পংক্তি-পর্ব্ব থাকে, তাকে বলে অলবড়ি। তোমাদের পয়ারেও তাই, লাচাড়িতেও তাই; ছড়ার ছন্দেও তাই, পুঁথির ছন্দেও তাই; কাজেই মূলে দুইই এক। অলবড়ি শব্দের অপ-ভ্রংশ হ'চ্ছে লাচাড়ি।"

হঠাৎ অমৃত-সাগরনের কথায় বাধা দিয়ে কে-একজন বলে উঠলেন—"কিহে? ভুল শেখাচ্ছ কেন?"

অমৃত-সাগরন্ বল্‌লেন—"কে হে! সৈফী মিঞা যে! তুমি এসে জুটেছ? তুমি কি বল্‌তে চাও?"

কপালে রেশমী রুমাল বুলিয়ে মুসলমান ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"বল্‌তে চাই যে লাচাড়ী শব্দ ফার্সী লাচার-শব্দ থেকে এসেছে। লাচারেরা যে ছন্দে গান গেয়ে বা ছড়া ব'লে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, সেই হচ্ছে লাচারী ছন্দ। যেমন লাচারী তোড়ি মানে লাচার বা ভিখিরীদের মুখে মুখে তোড়ি রাগিণীর যে নতুন চেহারা দাঁড়িয়েছে, সেইটি। আর পয়ার হ'ল আরবী বয়েৎ শব্দের অপভ্রংশ।"

অমৃত-সাগরন্ অদ্ভুতভাবে ঘাড় নাড়লেন। সৈফী মিঞা বিরক্তির স্বরে বল্‌লেন—"কি? 'হাঁ' বল্‌ছ, না 'না' বলছ? তোমার ও মাদ্রাজী ঘাড়-নাড়ার কোনো হদিস্ পাইনে, ব্রাদার।"

"না বল্‌ছি,—নিশ্চয়ই 'না'। বয়েৎ থেকে পয়ার! তুমি হাসালে দেখছি। পয়ার হয়েছে তামিল ছন্দ 'পারণী' থেকে।"

"হুঁঃ! তাহলে আসামীরাও বল্‌তে পারে যে লাচারি হয়েছে তাদের লেচার শব্দ থেকে—যার মানে—চলার ঝোঁকে হাতের ঝাঁকি।"

"কি রকম?"

"রকম আবার কি?"

বাংলায় তামিল আগে? না তুর্কী আগে?"

"বাংলায় ফার্সী কথা বেশী? না দ্রবিড় কথা বেশী?"

"দ্রবিড়!"

"কি রকম?"

"যেখন বহুবচনের 'গুলো'-শব্দ; আমাদের 'মরম্-গল' বাংলায় হয়েচে 'গাছগুলো'।"

"বেশ; কিন্তু অপর দিকটাও দেখছ না কেন? বাংলায় ক্রিয়ার ভিতরেও যে মুসলমানী ঢুকেছে,—আমাদের 'কম্' থেকে যে কমানো হ'য়েছে তা' জানো? তোমাদের বেশী প্রভাব, না আমাদের?"

"আমাদের!"

"আমাদের!"

"নিশ্চয়ই না!"

"নিশ্চয়।"

তুমুল তর্কে তন্দ্রা ভেঙে গেল। তখনও গোলমাল চল্‌ছে; তর্কটা এখন কিন্তু ঘরের বাইরে। তাড়াতাড়ি উঠে জান্‌লার ধারে গিয়ে দেখি, রাস্তায় একজন কেয়াফুল-ওয়ালা কুল্‌ফি বরফ খেয়ে পয়সার বদলে বরফ-ওয়ালাকে ফুল নিতে বলেছে, তারই গোলমাল।

—চতুর্থ প্রকাশ—

[দৃপ্তশ্রী-মূর্ত্তি—গগন-গরুড় বাহন—
বিমান-বিহার-পদ্ধতি।]

কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এবং বাংলা-ছন্দের ত্রয়ী মোটামুটি আয়ত্ত ক'রে একদিন কবিগুরুর মন্দিরে উপস্থিত হলুম। এবং প্রণাম ক'রে আমার যৎসামান্য ছন্দের অর্ঘ্য তাঁর পায়ের কাছে রেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলুম।

কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন কথায় কথায় কবিগুরু বল্‌লেন—

"বাংলায় ছন্দবন্ধের অভাব নেই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ (rhythm) জিনিসটা তেমন ফুটতে পেলে না।"

আমি বল্লুম—"কেন আপনার—

'পৌষ প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিল্লি-মুখর রাতি।'

প্রভৃতি কবিতা তো ছন্দস্পন্দের চমৎকার উদাহরণ।"

কবি বল্লেন—"কিন্তু, আনাড়ির হাতে ঐ ছন্দই এমন ছন্ন-ছাড়া মূর্ত্তিতে দ্যাখা দেয় যে ওকে আর চেন্‌বার জো থাকে না। বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘের তেমন স্পষ্ট প্রভেদ না থাকায়, সংস্কৃতের মতন বিচিত্র ধ্বনির পর্য্যায়-বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারছে না। কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে, জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটারের নকল কর্‌লে ঠিক চলবে না। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আন্‌তে হবে। হরফের মাথায় খুসি-মতন ঘন ঘন কষি টেনে কাজ সারলে চলবে না। তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। আমার বিশ্বাস তুমি ঠিক পারবে।"

কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লুম—"ছন্দে নূতনত্ব বিধানের চেষ্টা আপনি ছাড়া আর-সকলের পক্ষেই অনধিকার-চর্চ্চা।"

কবি বল্লেন—"ওই দ্যাখ, তোমাদের এক কথা। আমি কি চিরকালই এই করব? খালি আমাকেই খাটাবে? তোমরা একটু খাটবে না? সে হ'চ্চেনা। তোমাকেই এ করতে হবে। মন্দাক্রান্তা নিয়ে সুরু কর।... কবে দেখতে পাব, বল। কুড়েমি করলে

চল্‌বে না,...পরশু পারবে?...হ'য়ে উঠবে না?... ...আচ্ছা এক হপ্তা সময় রইল।"

আমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম।

বাড়ী এসে রাত্রে ছন্দময়ীর শরণাপন্ন হওয়া গেল।

ছন্দময়ী প্রসন্নমুখে বল্লেন—"তার আর কি? বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই বা থাক্‌ল? যুক্তাক্ষর তো আছে।—

'সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ-সংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থ বিকল্পেন চ॥'

—যুক্তাক্ষরের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-বৈচিত্র্যের গতি-ক্রম প্রবর্ত্তিত কর।"

আমি বল্লুম—"তাহ'লে ক্রমাগত সংস্কৃত অভিধান থেকে দুর্ব্বোধ দুরুচ্চার্য্য শব্দের আমদানী করতে হবে; নইলে, বাংলায় সংযুক্তবহুল শব্দ তো আর বেশী নেই, কি ক'রে কাজ চল্‌বে?"

ছন্দময়ী বল্লেন—"পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমকে যুক্তাক্ষর নেই, অথচ তাতে কি ক'রে ছন্দস্পন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল?...হ'ল মোটামুটি দু'রকমে:—দীর্ঘ স্বরের সাহায্যে, আর অক্ষর-সংঘাতের বিন্যাসে। অর্দ্ধোচ্চারিত বা আল্‌গোছ অক্ষরের পর, পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বস্‌লেই অক্ষর-সংঘাত হয়; সেই অক্ষর-সংঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে অক্ষর, তাকে পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমক ছন্দশাস্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয়, কেননা, গায়ে গা জুড়ে না দিলেও, বস্তুত ও যুক্তাক্ষরেরই সামিল। কাজেই

'দীহো সংযুত্ত-পরো।'

—এই নিয়ম এখানেও অবাধে খাটে। বাংলায় কি স্বর, কি ব্যঞ্জন, স্থল-বিশেষে দুইই আল্‌গোছ বা গোছালো,—ভাংটা বা গোটা,—ঝুরো বা পূরো হ'য়ে থাকে। কাজেই অক্ষর-সংঘাতের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে—শুধু সংস্কৃত কেন?—সংস্কৃত, তামিল, পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় মধুর-গম্ভীর- ভাষার ছন্দস্পন্দ আহরণ ক'রে বাংলা কবিতাকে অলঙ্কৃত করা যেতে পারে। বাংলায় স্বভাব-গুরু নাই থাক্‌ল? অবস্থানের গুণে গুরু ঢের মিল্‌বে। হিন্দীর—

'রাজত রাজ-সমাজ-মহঁ,
কোসল-রাজ-কিসোর।
সুন্দর সামল গোর তনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥'

কিম্বা, মারাঠির—

ঝালা যযাতি কবিচা জামাতা,
তীচ সৎকথা পরিসা।
যা চরিতামৃত পানেঁ, যা লোকীঁ সর্ব্ব,
রসিক হো হরিসা॥'

অথবা গুজরাটির—

'রূখমনী তে কহে ছে তাতনে
শিশুপাল বর হুঁ নহি বরুঁ।
জাদব-বংশী ছে কৃষ্ণজী,
তেও বাঁহে হুঁ ধরুঁ॥'

প্রভৃতি পদে, দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাঁটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয় তো বাংলায় সম্ভব হবে না। না হোক, যতটা হয় তাই বা ছাড়বে কেন? তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাও,—মেঘের সঙ্ঘাতে যে গর্জ্জন, যে বিদ্যুৎ, অক্ষর-সঙ্ঘাতের সাহায্যে তারি সৃষ্টি কর।"

আমি ছন্দময়ীর ইঙ্গিতে যন্ত্র-চালিতের মতন লিখলুম—

"ভর্‌পুর্ অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।'
বক্ষের পঞ্জর। কাঁপিছে কলেবর।
চক্ষে দুঃখের। নীলাঞ্জন॥"

দেবী চোখ বুলিয়ে বল্লেন—"এই তো! ঠিক হয়েছে, মন্দাক্রান্তা।—

'কশ্চিৎ কান্তা। বিরহগুরুণা।
স্বাধিকার-। প্রমত্তঃ।'
ভরপুর্ অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।'

ঠিক হ'য়েছে। বাংলার ধাত বজায় আছে, অথচ মন্দাক্রান্তা হয়েছে। আচ্ছা আরেকটা চেষ্টা কর, মালিনী—এই তার ছাঁদ :—

অসিত-গিরি-সমংস্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুর-তরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।"

আমি লিখলুম—

"উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল, শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন,
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর, মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।'

দেবী বল্লেন—"আচ্ছা এইবার সাতাশের ঘরানা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। ছাঁদ এই :—

'ইহ হি। ভবতি। দণ্ডকা-। রণ্যদে-।
শে স্থিতিঃ।
পুণ্যভা-। জাং মুনী-। নাং মনো-। হারিণি।'

আমি লিখলুম—

"গগনে গগনে। নীল্ নিবিড়।
ভিড়্ মেঘের। ভিড় গো ভিড়।
শোন্ তাদের। শব্দ ভীম।
ডম্বরুর। দুন্দুভির॥"

দেবী বল্লেন—"'পঞ্চচামর'—শিবতাণ্ডব স্তোত্রের ছন্দ।—

'গতিক্রমপ্রবর্ত্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডবঃ শিবঃ।'"

আমি বল্লুম—

"মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল।
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল॥"

দেবী বল্লেন—"এইবার বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী—'তৎস-। বিতুর্-। বরেণ-। ইঅম্।'"

আমি বল্লুম—

"সূর্য্য মহান্ তাহার অধিক
সত্য মহান্, মহান্ বিবেক।
অদিম্ এ সাম্ প্রধান এ ঋক!
মৃত্যু মহান্ তাহার অধিক
মুখ্য মহান্ প্রাণের নিষেক,
অভয় এ সাম্, অশোক এ ঋক।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"বাল্মিকীর অনুষ্টুপ,—

'মা নিষাদ। প্রতিষ্ঠাংত্ব-।
মগমঃ শা-। শ্বতী সমা।'"

আমি বল্লুম—

"আর্ত্ত সংসার ব্যথায় কাঁদ্‌ছে,
ওরে শোন্ তুই যে ন'স্ বধির;
ধৃষ্ট ধায় ধূমকেতুর দম্ভে,
বাড়ে কল্লোল রুধির নদীর!
নিব্‌ছে উৎসব মানুষ ডুব্‌ছে,
প্রাণে সংশয় দু'পায় শিকল,
অগ্নি-খড়্গের পিশাচ-হাস্যে
সারা সৃষ্টির মরম বিকল।
অন্ধ স্বার্থের রথের চক্রে
ওঠে ঘর্ঘর নিনাদ নিদান,

যুদ্ধ দুনিয়ার চরম যুক্তি!
কাটে সাত চোর বিধির বিধান।
উগ্র আত্মম্ভরীর ডঙ্কা
বাজে ওই শোন্ কপাল-মালায়!
চক্ষে গহ্বর বিকট মৃত্যু
সেজে পল্টন আগুন জ্বালায়!
নষ্ট ঘর পর সুহৃৎ শত্রু
ভেঙে যায় সব লুটায় ধূলায়,
কষ্ট বিশ্বের গভীর মর্ম্মে
কাঁদে ক্রৌঞ্চীর হিয়ার কুলায়।
বিঁধল বাণ কার সাথীর বক্ষ
ধোঁয়া-শেষ নীড় মশাল শিখায়!
রিক্ত রাজ্যের মালিক মস্ত
কিবা সুখ তোর রাজার টীকায়?
শুষ্ক অন্তর হৃদয় শূন্য
কি বাজাও বুক অহং-মায়ায়?
ভস্ম-নেত্রের নিজের দৃষ্টি,
জেন, দগ্ধায় নিজের কায়ায়॥"

দেবী বল্লেন—"তোটক!—ছাঁদ জানো তো?—

'রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।'"

আমি বল্লুম—

"ওকি, ফুটল গো ফুট্‌ল দিগন্ত ভরি!
কারা, জাগ্‌ল ধূসর ধূলি শয্যাপরি!
একি ভাণ্ডারে লুট ক'রে ধন লোটানো!
একি, চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো!"

দেবী বলে উঠলেন—"এই তো! এই তো!—

'এ যে, চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা,
এ যে, মূর্চ্ছনা-ময় গীতি মৌনে সাধা।'

ঠিক হয়েছে, আমি এই ছন্দকে আমার বাহন করে নেব। এ আমার গুরু-লঘু-সমাজে অসঙ্কোচ বিচরণে—কুণ্ঠাহীন বিমান-বিহারে—সহায় হবে, এর নাম রইল 'গগন-গরুড়।'"

আমি বল্লুম—"না, দেবী, তার চেয়ে নাম রাখুন—পুতুল-নাচের জটাইপক্ষী।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"কেন?"

আমি বল্লুম—"এখনো যথেষ্ট জড়তা রয়েছে।"

দেবী বল্লেন—"ও কিছু নয়, ও ঠিক হয়ে যাবে। আর ওকে কি জড়তা বলে?

'অট্টালক পরম রম্য শৃঙ্গাটক বিবদ হর্ম্ম্য
দেব-দ্রুম দিব্য-কুসুম দেউল ফুলবাটি।'

কিম্বা—

'তৃষার্ত্ত সম্প্রাপ্ত সুধাব্ধি যত্নে
সমীক্ষি' সম্পূজ্য পদাব্জ রত্নে।
সুতৃপ্ত মচ্চিত্ত সুশান্ত অদ্য
সুধন্য সম্যক চতুরাস্য সদ্য॥'

প্রভৃতি পদ যখন সর্ব্বাঙ্গে ভূর্জ্জপত্রের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গুটিগুটি বাংলার সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, তখন তোমার আবার ভাবনা? তুমি মিছে ভয় কোরো না, এ পুতুল-নাচের জটাইপক্ষী মোটেই নয়। এ গগন-গরুড়। এতকাল বিমান-বিহারের প্রয়োজন হ'লেই আমাকে মিথিলা থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া ভাড়া করে আনতে হ'ত; নয়ত কৌশাম্বী রাজের চিড়িয়াখানা থেকে তাঁর হস্তীবিম্ব পাখীটি ধার ক'রে আনতুম, তাতেও লঘু-গুরুর গোল ঠিক মিটত না, প্রমাণ—

'নানা তরুবর মৌলিল রে
গঅনত লাগেলী ডালি।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই
কর্ণ-কুণ্ডল বজ্রধারী॥'

কিম্বা—

"চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট।
মন্দির বাহির কঠিন কপাট॥"

"এই দুই পদের 'নাগেলী'র 'গে' এবং 'চলইতে'র 'ত্তে' শুরু হ'লেও লঘুই পড়তে হয়েছে। বিমান-বিহার কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠের নাগাল পায়নি। ভারতচন্দ্র এ পদ্ধতিতে অনেকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অবশ্য খাঁটি বাংলা শব্দ একরকম বর্জ্জন করেই। যেমন—

'জয়, বিষাক্ত-কণ্ঠক কৃতান্ত-বঞ্চক
ত্রিশূল-ধারক হতাধ্বর
জয়, পিণাক-পণ্ডিত পিশাচ-মণ্ডিত
বিভূতি-ভূষিত কলেবর।'

এ শ্লোকে ক্রিয়া বা সর্ব্বনাম একটিও নেই, অর্থাৎ যেখানে বাংলার বাংলাত্ব তার চিহ্ন মাত্রও রাখা হয়-নি। বুঝেছ ?...এখন, তর্ক থাক। চল গগন-গরুড়ে আরোহণ করে ভুবন-পর্য্যটন করে আসা যাক।"

এই বলে সস্নেহে আমার হাত ধরে ছন্দময়ী অন্তরীক্ষে উঠলেন। আমি সানন্দে বলে উঠলুম—"চমৎকার! চমৎকার!"

ছন্দময়ী তখন আপনার মনে বলছেন—

"উধাও! উধাও! গগন-গরুড়!
বিমান-বিহার তারায় তারায়,
সেতার, কানুন্, সারং, লায়র্
বীণাই আওয়াজ হাওয়ায় হারায়।
আকাশ-নদীর লহর লীলায়
যে সুর সে আজ বীণায় আমার,
আমার বীণায় মেঘের গমক
অলখ চমক পুলক-হাওয়ার।
দ্বাদশ রাশির দ্বারের ধূলায়
রবির শশীর যে সুর হারা,—
আচোট আলোর নিশোর যে সুর
আমার যে সাজ সবাই তারা।"

ছন্দময়ী গান থামিয়ে বল্লেন—"ভাখ, ভাখ, পায়ের নীচে তালীবন ছন্দে পাখা-বিস্তার করেছে; নীড়ে সুপ্ত পাখীর, দোলায় ঘুমন্ত শিশুর নিশ্বাসের ছন্দে বুক উঠচে পড়চে। ছন্দে সাগর দুলচে, ছন্দে পল্‌টন চলুচে, ক্লান্ত কুলি ছন্দের ভরনায় বুক দিয়ে পরিশ্রমের কষ্ট ভুলছে। বিশ্ব-জগৎ ছন্দে ওতঃপ্রোত। ও শুধু সৌখীনের বীণার তারেই নেই, বিশ্ববীণার সকল তন্ত্রীতেই ছন্দের স্পন্দন।"

হঠাৎ এই সময়ে গগন-গরুড় ডানা স্থির করে রইল, অন্তরীক্ষে ছন্দময়ীকে দেখে কারা মধুর স্বরে গেয়ে উঠল—

"বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরল কেস সোহন্তী।
একানেক সহস্সকো ধারিণী
জরিরঙ্গা পুরনন্তী॥
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅও
উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবি-মণ্ডল-পরচণ্ডা কহিএ
গঙ্গা কহিএ পানী॥
ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিএ
হর ঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ
কে জান উতপতি তোরী॥"

গরুড় আবার উড়ে চল্‌ল। এইবার পাহাড়ী মেয়েদের গান শোনা যাচ্ছে—

"হিমালৈ মাথি লাসা র গাঁও
লামা ত টাসি ছ।"

টাসি লামার নাম শুনে কি জিজ্ঞাসা

করতে যাচ্ছি এমন সময় দেবী বল্লেন—

"ওই ভাখ চীনের আলগ্ পাগ্‌ড়ি (monosyllable) শূন্যের অপূর্ব্ব ছন্দ, মান্দারিন্ হংস হ'য়ে, এই দিকে পাখা মেলে আসছে, তারা বল্‌ছে—

'শিস্ কে তার গো আজ ?
তার কি তিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ সে তার কি পর ?
চাঁদ সে তার কি তাজ ?
কে ওই গায় রে গান !
যা ভাই তার নে খোঁজ !
কি গান গায় সে রোজ,
কি সাধ ছায় সে প্রাণ !
খোঁজ নে, যায় যে দিন,
ছাই যে ছায় রে ধিক,
নীড় সে দূর হা ধিক !
দিন যে যায় রে দীন !
যে দিন যায় সে যায়,
যে দুখ রয় সে রয়,
যে ভুল হয় সে হয়
দু চোখ জল যে ছায়।
হায় রে নেই ক' সুখ ;
চাঁদ সে তার কি তাজ,
বল্ গো, ফুল কি সাজ,
ফাঁক রে ফাঁক এ বুক।'"

গাইতে গাইতে "কফুর্ অজ্ সফেদ ঙ্গ" হংসমালা আলোয় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নীল আকাশের কোণ থেকে তিনটে নীলকণ্ঠ পাখী বলে উঠল—

"নয় রে ভিন্
জড় ও জীব,
জড় যে এক,—
দেখ রে দেখ,—
শিব সে শিব
স্বয়ম্ভু-সীন।"

ক্রমে এদের আওয়াজও কমে গেল। এইবার পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাঁক বুল্‌বুল্-বোস্তাঁ কাকলি করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

ছন্দময়ী বল্লেন—"ওরা সব ইরান-আরবের ছন্দ-পাখী; ওই যে ছন্দ-'মদীদ' বল্‌ছে—

'শিউলি কোটবার এইতো কাল,
ক্ষান্ত-বর্ষণ এই সকাল !'

"ত'বীল গাইছে—

'কাজল চোখ ! যাহোক তুই লোক !
না-হক্ চাস্, ভুলাস্ দুখ্ শোক !'

"জামির প্রিয় ছন্দ হজজ্ কুজন ক'রে বলছে—

'হাজির ফাল্গুন, ভ্রমর গুন্‌গুন্
নূপুর রুণরুণ, গোলাম নিমুখুন।'

"রজজ্ বলছে—

'কিশমিশ-ডালিম-পেস্তার মুলুক,
বুল্‌বুল ! কোয়েল ! সঙ্গীত চলুক।'

"রমল্ গমক দিয়ে বলছে—

'ডাকতে মন চায়, কিন্তু লজ্জায়
হয় না হায় হায়, এম্‌নি দিন যায়;
ওই হরিণ চোখ, চাউনি-টুক তোর
রইল সকল খাঁজরা পাঁজরায়।'

"খফীফ্ মিহিসুরে বলছে—

'নেই সে ফাল্গুন বুল্‌বুল্ বিলাপ
করছে বিস্তর,
কুঞ্জে নেই ফুল, নিশ্চুপ সেতার,
গ্রীষ্ম দুস্তর।'

"মতদারিক গাইছে—

'দুঃখ দূর ! দুঃখ দূর !
হস্তে মোর স্বর্গপুর !'"

এমনিধারা ইরানী-আরবী ছন্দ-বিহঙ্গদের সঙ্গীত ফুরোতে না ফুরোতে দেবী বলে উঠলেন—"ওই দ্যাখ গ্রীসের মহাকবি হোমরের প্রধান ছন্দ ষট্-পর্ব্বিকা (Hexa meter) স্বর্ণ-চক্ষু ঈগল পাখীর মতন শূন্যে ডানা বিস্তার ক'রে সূর্য্যের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি বলছে, শোনো শোনো—

'হিংসা কি সংসারে চার্‌কালই থাকবে রে
থাকবে কি সংগ্রাম !
জন্তুরে হীন তবে জ্ঞান কর কোন্ দোষে
দাও তারে দুর্নাম ?
শৃঙ্গীরে দন্তীরে নাশ ক'রে দূর ক'রে
বশ ক'রে চেষ্টায়,
অন্তরে ভূত প্রেতই পুষবে কি, ফুঁসবে কি
রক্তেরি তৃষ্ণায় ?
হায় মানবত্ব কি মিথ্যা সে এক্‌বারে ?
সত্য যা স্বার্থ ?
প্রেম স্নেহ ভক্তি কি নইলেও চলবে রে ?
হায় রে লোভার্ত্ত !
দেড়-কড়া ধন নিয়ে আধ-কাঠা ঠাঁই নিয়ে
চল্‌বে কি দ্বন্দ্ব ?
ভুল্‌বি কি সত্যেরে ? সুন্দরে মঙ্গলে
দলবি কি অন্ধ !"

ক্রমে ষট্‌পর্ব্বিকা আকাশে মিলিয়ে গেল ; নীরবে ছন্দময়ী আমায় সঙ্গে ক'রে আরো ঊর্দ্ধে উঠতে লাগলেন। খানিক পরে আমায় সম্বোধন করে বল্‌লেন—

"দ্যাখো, দ্যাখো, হাজার হাজার গ্রহ নক্ষত্র, শূন্যমার্গে বিচিত্র ছন্দ রচনা করে চলেছে, ওদের—

'না হয় ভূষণের ধ্বনি, নাহি নড়ে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজে মঞ্জীর ॥'

কোথাও একটু তালভঙ্গ হচ্ছে না ; যদি হ'ত তবে অতলে তলিয়ে যেত। সূর্য্য চলেছেন সাত ঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে, তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার বিরাট ছন্দ রচনা করতে করতে। ছন্দশাস্ত্রের শতাবধি মাত্রার উৎকৃতি, অভিকৃতি, সঙ্কৃতি প্রভৃতি ছন্দ, এঁর এই বিরাটরূপা সরস্বতীর কাছে চুট্‌কি অঙ্গের ছন্দ মাত্র। চন্দ্র চলেছেন তারার ফুলে সাতাশ-মাত্রার দিব্য-স্রগ্ধরা রচনা করতে করতে, ওঁর মাতানো ছন্দে সপ্তসিন্ধু মাতাল হয়ে উঠল। সিন্ধুর এই চঞ্চলতার ভিতরেও একটি ছন্দ জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম জোয়ার ভাঁটা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে বাঁধা। যাঁরা এই ছন্দের স্পন্দন নিখিলের অণু পরমাণুতে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা বিশ্বস্রষ্টাকে নাম দিয়েছেন—'কবির্মনীষী উদয়াস্তে ছন্দ, আলোয়-অন্ধকারে ছন্দ, জীবনে মৃত্যুতে ছন্দের স্পন্দন।"—বলতে বলতে ছন্দময়ীর মূর্ত্তি বিদ্যুৎ-শিখার মতন হয়ে উঠল।

গগন-গরুড় তাঁর সারথ্যে আরো ঊর্দ্ধে উঠছিল কিন্তু লঘু বাতাসে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে দেখে দেবী গতি ফেরালেন।

নেবে আসবার সময় বেগাতিশয্যে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হচ্ছিল, তাই, জোর করে নিজেকে চাঙ্গা রাখবার চেষ্টায় চট্ করে চট্‌কা ভেঙে গেল, এবং চেয়ে দেখলুম নিজের ঘরে নিজের শয্যাতে পড়ে আছি।

—পাগলা প্রকাশ—

[মঞ্জুশ্রী-মূর্ত্তি—বিদ্যুৎতাঞ্জাম বাহন—
বুল্‌বুল্-গুল্‌জার পদ্ধতি।]

শীতকালের হতশ্রী বাদ্‌লায় সমস্তটা দিন ঘরে বসে-বসে বিরক্ত বোধ হ'চ্ছে, অথচ বের'বার জো নেই। লিখ্‌তে পড়্‌তেও মন বস্‌ছে না, গল্পগুজবের সঙ্গীও কেউ জোটেনি, কাজেই গলির দিকের জান্‌লার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গলির ওপারে অপোগণ্ড ঋষিদের প্রাকৃত বেদগান শুন্‌তে লাগ্‌লুম—

"আয় রোদ্দুর হেনে
ছাগল দেব মেনে।"

কিন্তু ছাগলের লোভেও যখন রোদ্দুর তাদের কথায় কর্ণপাত করলে না এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল তখন তারা একটুও না দ'মে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সুর ধরলে—

"ধিন্‌তা ধিনা, পাকা নোনা
ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা।"

আমি বালাপোষটা পায়ের উপর বেশ ক'রে ঢাকা দিয়ে চোখ বুজ্‌লুম। মাথার ভিতর তখন ঘুরছে ঐ "ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা।" হঠাৎ আপন মনে বলে উঠ্‌লুম—"বাঃ এ যে চারের ঘরানা ছন্দ, কিন্তু চারে থই পাচ্ছেনা। পাকা নোনা হাল্কা হ'য়ে পড়ছে ব'লে ছেলেগুলো আপ্‌না হতেই 'পাকা-া নোনা' ক'রে খুব খানিকটা ঝোঁক দিয়ে টেনে উচ্চারণ করছে।"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠিক এই সময়ে কে বলে উঠ্‌ল—

"জেম ন সহই কণঅ-তুলা
তিল-তুলিঅঁ অদ্ধ-অদ্ধেন।
তেম ন সহই সবন-তুলা
অবছন্দ ছন্দ-ভঙ্গেন ॥"

আমি বল্লুম "অর্থাৎ ?" আগন্তুক বল্লেন—

'"সয়না সোনার নিক্তি যেমন
ওজন-ফারাক্ আধ্-রতির,
তেম্‌নি সূক্ষ্ম কানের নিরিখ
একটু খুঁতেই হয় অথির।'

"তুমি যাকে চারের ঘরানা—চারালী বা লাচারী—বল্‌ছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালীও বল্‌তে পার।"

জিজ্ঞাসা কল্লুম—"সে কি রকম ?"

আগন্তুক বল্লেন—

'"লঘুর্ভবেদ্ একমাত্রো...ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্' —কাজেই 'ডাল্ ভাতে ভাত' পাঁচ দাঁড়াচ্ছে ; 'ধিন্‌তা ধিনা' সাড়ে চার ; 'পাকা নোনা' চার, তাকে ঝোঁক দিয়ে পাঁচের কাছাকাছি টেনে আন্‌তে হ'চ্ছে। কাজেই পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালিও বল্‌তে পার।"

আমি বল্লুম—"এ নিয়ম খাটালে "আয় রোদ্দুর হেনে'র কি দশা হবে ?"

আগন্তুক বল্লেন—"কেন ? 'আয় রোদ্দুর' সাড়ে-চার মাত্রা, কারণ ওতে রয়েছে পুরো তিন আর ঝুরো তিন। পাঁচালি ছন্দে প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে ন্যূন পক্ষে সাড়ে-চার মাত্রা রাখা দরকার, তার কম হ'লেই টেনে বুন্‌তে হয়। অথচ পাঁচটা গোটা অক্ষর দিয়ে পর্ব্ব গড়্‌লে শ্রুতিকটু হবে। কাজেই চারটে গোটা, এবং একটা কি দুটো আধলা দিয়ে গড়াই যুক্তিসঙ্গত।"

আমি বল্লুম—"তার মানে, আপনি

বল্‌তে চান, যে, এর প্রতি পংক্তিপর্ব্বটিই পক্ষীরাজ, তার চারটে পা আর দুটো ডানা।"

আগন্তুক বল্লেন—"উপমাটা বেশী দূর চালালে কিন্তু চল্‌বে না, কারণ—

'আয় রোদ্দুর হেনে'

কিম্বা 'আয় আয় সই জল্ আনিগে
জল আনিগে চল্।'

অথবা 'এক পয়সায় কিনেছে সে
তাল পাতার এক বাঁশী।'

এদের প্রত্যেকটির প্রথম পংক্তি-পর্ব্বে তিন ঠ্যাং এবং তিন ডানা। এদের বেলায় কি বলবে? তা ছাড়া অনেক সূক্ষ্ম হিসেব এর ভিতর রয়েছে, যেমন—নাওয়া, খাওয়া, চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতির 'ওয়া' দুই না ধরে এক ধরতে হয়, কারণ, ওটা অন্ত্যস্থ 'ব'য়ের সামিল; তারপর বাজিয়ে সাজিয়ে প্রভৃতির 'ইয়ে' পংক্তি-পর্ব্বের পূর্ব্বার্দ্ধে থাকলে এক এবং শেষার্দ্ধে থাকলে দুই হবে, যেমন—'বাজিয়ে যাব মল।' কিন্তু ঐটে উল্টে 'যাব বাজিয়ে মল' লিখলে ছন্দ হ'বে না। কারণ 'ইয়ে' এখানে দুমাত্রা। শুধু তাই নয়, পংক্তি-পর্ব্বের কোনো জায়গাতেই একটা পূরোর ব্যবধানে দুটো ঝুরো ব্যবহার করতে পারনা, করলেই শ্রুতিকটু হ'বে। 'নূপুর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজ্‌ল নূপুর সোনার পায়ে' দুইই শ্রুতিমধুর; কিন্তু 'মঞ্জীর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজ্‌ল মঞ্জীর সোনার পায়ে' শ্রুতিকটু। তোমার পক্ষীরাজের ডানা-দুটো সাম্‌নের দুপায়ে জুড়লেও চলবেনা, পিছনের দুপায়ে জুড়লেও মুস্কিল। অনেক ভজকট। তার চেয়ে এক কাজ কর:—এমন ছন্দ তৈরি কর যার প্রত্যেক হসন্ত এবং স্বরান্ত-অক্ষর হিসাবে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘের পর্য্যায়-বিন্যাসে নতুন নতুন ছন্দ তৈরী হয়েছে, বাংলায় তেম্‌নি স্বরান্ত এবং হসন্ত, পা এবং পাখনার পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দপদ্ধতির প্রবর্ত্তন কর। এতে ক'রে আত্মা-পদ্ধতির বৈমাত্র-বিড়ম্বনা ঘুচবে, হৃত্তা-পদ্ধতির যুক্ত-পূর্ব্ব হসন্ত-হরফের স্বরলোলুপতার অবসান হবে। চিত্রা-পদ্ধতির পা ও পাখনার গোল মিট্‌বে; দৃপ্তা-পদ্ধতির হল-স্বরের —দামাল-আলা-ভোলার—হঠাৎ-সমাগমে, সংঘাতের স্থলে সাযুজ্য-বিভ্রাটের অন্ত হ'বে। আমি স্বয়ং পিঙ্গল নাগ তোমাকে মঞ্জু-পদ্ধতির মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, কাজ আরম্ভ কর, বিলম্ব কোরো না।"

হঠাৎ বিদ্যুৎ-শিখার মতন ছন্দকাব্যের ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হ'য়ে ছন্দময়ী বলে উঠলেন—

"ঠিক বলেছে পিঙ্গল, তুমি আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম তৈরী ক'রে দাও; স্থির বিদ্যুতের মণিপট্টে চপলা-বিলাস গেঁথে গেঁথে আমার ফুল্‌দার চৌদোল্ নির্ম্মাণ কর।"

আমি বল্লুম—"ক্ষমা করুন।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"কেন?"

আমি বল্লুম—"গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

দেবী বল্লেন—"আমার হুকুম, কোনো ভয় নেই।"

আমি বল্লুম—"যুক্তাক্ষর আর ঐকার ঔকার প্রভৃতির কি ওজন ধরা যাবে? দুই ধরব কি?"

দেবী বল্লেন—"না, দেড় ধর; যুক্তাক্ষরের

প্রথমাংশ আধ, শেষাংশ এক, দুয়ে মিলিয়ে দেড়। ঐকার ঔকারের প্রথমার্দ্ধ এক, শেষার্দ্ধ আধ, দুয়ে জড়িয়ে ঐ দেড়ই দাঁড়াবে। কাজেই পুঁজি দাঁড়াচ্ছে পুরো আর আধলা, গোটা আর ভাংটা। এই দুয়ের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দস্পন্দের বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্ম্মাণ কর; কলম ধর।"

আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতন কলম হাতে নিলুম; কলম চলতে লাগল—

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্।
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্!
কোন্ ফুল্ তার্ তুল্
তার তুল কোন ফুল?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।"

দেবী বল্লেন—"হিন্দুস্থানী আলঙ্কারিকেরা কে কি বলবেন জান? শূদ্রজাতি ছন্দ। কারণ ব্যঞ্জনবহুল; স্বরবহুল ছন্দ তাঁদের মতে ব্রাহ্মণজাতি। এঁরা ছন্দেরও জাতিভেদ কল্পনা করেছেন। এইবার ব্রাহ্মণ-জাতি ছন্দ রচনা কর দেখি—আগাগোড়া স্বরান্ত।"

আমি আবার চল্‌তে সুরু হ'ল—

ঘুমেরি মহলে বেশরে মোতিটি
নিশাসে নড়ে!
প্রেমী জেগে আছে মুখে চেয়ে, চোখে
পাতা না পড়ে!
মেঘে-গড়া খসা কাঁচেরি ফানুসে
চাঁদেরি আলো;
তাতে কাঁচা সোনা মু'খানি নয়নে
লাগে যে ভালো।
মেঘে মেঘে ঢাকা আকাশেতে রাকা
চাঁদেরি বিভা,
মাঠো মাঠো আলো চুঞে চুঞে মাঠে
পড়ে বুঝি বা!
আলোতে কালোতে মলয়জে যেন
মিলেছে চুয়া,
পহেলি ফাগুনে কে ধরেছে মরি
শাঙনী ধুয়া।
জোছনা আঁধারে মুখোমুখি করে
রয়েছে বসে,
ধারা সে ঝরেনা, আলো ফুটিবারে
নারে সাহসে।
হাওয়া থেমে আছে, থেমে আছে যেন
তটিনীটিও,
অচেনা কি পাখী জেগে উঠে বলে
"কি ও! ও কি ও!"
বেণুবনে ঝোপে ঝাপে যত ঝিঁঝি
ডাকে ঝিমিয়ে,
জোনকীরা একে একে নিবে গেল
টিম্‌টিমিয়ে।
বেপথু হৃদয়ে ঘুমোনো অধরে
চুমুটি নিতে,—
অচেনা পাখীটা ডেকে ওঠে "কিও!
ওকি ও!" গীতে।
ঘুমেরি নিছনি নিতে দেরে পাখী,
উঠনা ডেকে,
স্বপনে সোহাগে মিশে যেতে দেরে
স্মৃতি না রেখে"।

ছন্দময়ী বল্লেন—"তোমার ব্রাহ্মণজাতি ছন্দ একেবারে সারস্বত ব্রাহ্মণ দেখছি।"

আমি বল্লুম—"উঁহু, ভঙ্গ-কুলীন। এক-বার একজায়গায় হসন্ত ব্যাভার হয়েছে।"

দেবীর সহাস্য ইঙ্গিতে আবার কলম চল্ল—

"তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়,
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়
সব তরুণ আজ ধরায়!
তরুণী আশারে সঙ্গী কর
আজ আবার মনরে মন,
চির-নূতনেরি যেই নিঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।"

দেবী বল্লেন—"একে ব্রহ্মমূর্দ্ধা ছন্দ বলতে পার। কারণ এর প্রতি চরণের প্রথমাংশ স্বরবহুল। আচ্ছা অন্য ছন্দের পত্তন কর।"

কলম চল্ল—

"পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দেখ তোমরা।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"এটির নাম রইল 'পিউকাঁহা' ছন্দ। তারপর?"

কলম চল্ল—

"হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে,
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল?
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল! রাত্রি এল!"

দেবী বল্লেন—"পংক্তি-পর্ব্বের মাঝখানে অক্ষরের ওলটপালট দেখছি। এ মধ্যচপলা 'মিশ্র-পর্ব্বিকা।' আচ্ছা, এইবার একটি অন্তচপলা 'মিশ্র-পর্ব্বিকা' রচনা কর।"

কলম চল্ল:—

"জাগ্‌ছে আলো জাগ্‌ছে হৃদয়,
জাগ্‌ছে ভাষা জাগ্‌ছে আশা,
রুদ্ধ ঘরের বুল্‌বুলিতে
বুল্‌বুলি সব বাঁধছে বাসা।"

দেবী বল্লেন—"তারপর?"

কলম চল্ল—

"কুগ্রহ কুদৃষ্টি হালে—
দুঃখ দেহে, দুঃখ মনে,
তাই বলে কি হস্ত জুড়ে
বসবে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে।"

দেবী বল্লেন—"এটির নাম রইল 'পাগলা ভোলা' ছন্দ। তারপর?"

কলম একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে আবার চল্‌তে সুরু করলে—

"নিশাসে কি সৌরভ
কালো চুলে মেঘ সব
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর গো!
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোনোখানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুই স্বর্গ!"

ছন্দময়ী বল্লেন—"আরও চলুক।"

কলম ভঙ্গীভরে চল্ল—

—"অ! বটে এই বুঝি! দেখলুম দেখলুম।"
—"ছি! ওকি রাগ করে' তুই ভাই যাচ্চিস্"
—"তা তুমি বলবে না, থাকবার দরকার?"
—"হুঁ, বলি আয় কাছে 'ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্'
—"এ—কিএ? ছাই কথা,ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্
ধাঁ করে ভেংচিয়ে কম্‌লীর প্রস্থান।
হাঁ ক'রে রয় চেয়ে ফট্‌কের দুই চোখ,
গোঁ হয়ে ভাবছে কি?—গম্ভীর মুখখান!

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে বল্লেন—

"বা কবি, কেন তুমি, বাংলার দীর্ঘের
তা' বুঝি বাংলাদেশ ছুল পেয়ে আজ ফের!'
তারপর?—"

কলম আবার গোঁজরে দাগ পাড়তে লাগল—

"হর-মুকুট! হর-মুকুট!
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট!
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট!
বিজুলি থির হয়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির,
হীরাফেটিক উজলি দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড়।"

একটু ভুরু-কুঁচকে দেবী বল্লেন—"হুঁ; তারপর?"

আবার কলমটা মাথা গুঁজে কাগজ আঁচড়াতে সুরু করলে—

"রুনুরুন্ বাজে কার বাজে মঞ্জীর
কাঁপে তার দেতারের স্নায়ু আর শির;
মৃদু গুঞ্জরে কুঞ্জে কে উন্মন,—
নারী কার ব্যথা-ভার-ভরা যৌবন!
ফোটে ফুল বকুলের, অশোকের থোপ
হরিয়াল্ লালে লাল ফাগুয়ার ছোপ!
মুখে মুখ সারীশুক স্নেহা বিস্তর,
মধু-বায় বুলে, হায়, দোলে পিঞ্জর।
সারঙের তারে রয় যত কম্পন
তারি ঝঙ্কারে, হায়, কাঁপে কায় মন;
বাঁশরীর অশরীর বাহুডোর, হায়,
এ হৃদয়-কমলের কমলায় চায়।
রঙে বুঁদ হয়ে কুঁদ হল রঞ্জন,
রুনুরুন্ বাজে কার করে কঙ্কন!
ফেলে' বাস ভরা শ্বাস চুয়াচন্দন,
কাঁহা পিউ কাঁহা পিউ ওঠে ক্রন্দন।"

দেবী প্রসন্ন মুখে বল্লেন—"এটির নাম রইল 'রুনুরুন্' ছন্দ। ঠিক হয়েছে; আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জামের চাল, চাঁদোয়া, চূড়ো, ঝালর, পাটা, চৌখাম্বা সব তৈরী। এইবার এর একটা পা-দান তৈরী করে দাও।"

ক্লান্ত কলম আবার নক্সার কাজে প্রবৃত্ত হল—

"একটুকু উস্‌খুস্
একটা কি ফিস্‌ফাস্
কার মৃদু নিশ্বাস
কার নিদ্ টুটল!
ভেদ করে আবলুস্
ঘুটঘুটে রাত্রির
শান-দেওয়া সাত তীর
নিঃসাড় ছুটল!
হিম হাওয়া বিলকুল
ঢুলছিল নিউরে
উঠল সে শিউরে
শিউলীর স্পর্শে;
বোল বলে বুল্‌বুল্
আর পাখী তার সিস্
চন্‌মনে চৌদিশ
চঞ্চল হর্ষে।"

ছন্দময়ী সানন্দে বলে উঠ্‌লেন—"হয়েছে, হয়েছে, এইবার অক্ষর-সঙ্গীতের সূক্ষ্মতর শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত ধরা পড়েছে, ছন্দের সঙ্গীত মঞ্জুশ্রী লাভ করেছে। আমার মনের মতন এই বুল্‌বুল্-গুলজার-পদ্ধতি,—মনের মতন এই পুষ্পক রথ।"

আমি সাশ্রুনয়নে বল্লুম—"দেবী, তোমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্ম্মাণ করতে, বিদ্যুদ্দামকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধতে আমার দুই চোখ ঝল্‌সে গেছে। আমি আর তোমায়

ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিনে।"—বলতে বলতে দুই চোখ আবার কূলে কূলে ভরে উঠ্‌ল। বার বার করে চোখ মুছে যখন চোখ মেলতে সক্ষম হলুম, তখন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-লোচনা ছন্দ-দেবতাকে স্বচ্ছন্দে বহন করে বিদ্যুৎ-তাড়াম আমার নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে; আর গৌড়-বাংলার ভবিষ্যৎ-কবি-পরম্পরা এক-ঝাঁক শুভ্র সুন্দর বলাকার মতন সেই তাড়ায় ঘিরে আনন্দে কাকলি করতে করতে পাখার ভরে উড়ে চলেছে।

ফাল্গুন ১৩২৪। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মমতার ক্ষুধা

(গল্প)

দয়াল কুণ্ডুর আড়তের মুহুরী নবীন নন্দী যখন এক হপ্তার মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমস্ত পরিজনকে একে একে মুখ-অগ্নি করিয়া বিদায় দিয়া আসিয়া একলা ঝাড়া-হাতপা হইয়া সংসারে দাঁড়াইল তখন তার অতিবড় শত্রুও তার দশা দেখিয়া আহা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তার যে কতবড় দুর্দ্দিন আর কতখানি দুঃখ তাহা এক ভগবান ছাড়া আর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল দয়াল কুণ্ডুর মা-বাপ-মরা বিধবা ভাইঝি লক্ষ্মী।

নবীন নন্দীর বয়স হইয়াছে বছর চল্লিশ বড় জোর; কিন্তু তার নাম নবীন হইলেও এই বয়সেই তার চেহারাটা বিষম প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিল,—তার মাথার সব চুলই প্রায় বার্দ্ধক্যের জয়ধ্বজা হইয়া উঠিয়াছে, তার পোড়া কপালে দারিদ্র্য আর শোক নিজেদের দখল সাব্যস্ত করিয়া কায়েমি বসবাসের জন্য ভদ্রাসনের ভিত কাটিতেছিল, তারই ছায়া তার চোখের কোলে পড়িয়া তার বয়সকে চেহারায় অনেকখানি বেশী করিয়া তুলিয়াছিল। তবু লোকে তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "তোমার বয়েসই বা কি? শিগ্‌গির আবার একটি বিয়ে করে সংসারী হও।"

নবীন তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের হিতোপদেশ শুনিয়া না হাঁ না ছঁ কিছুই উচ্চবাচ্য করিল না, সে দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া ম্লান মুখে উবু হইয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। লোকে বলিল "একসঙ্গে যমের এতগুলো কোপ খেয়ে লোকটা কেমন জবুথবু হয়ে গেছে।"

তার আপনার বলিবার মতন শেষ লোকটির চিতা নিবাইয়া নবীন যখন শূন্য-বাড়ীর দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছে তখন আইবড় মেয়েদের বাপেরা আসিয়া খুব দরদ দেখাইয়া নজির দেখাইল—মধুপালের এমনি সর্ব্বনাশের পর সে একটি ডাগর মেয়ে ঘরে আনিয়া তবে বাড়ীতে টিকিতে পারিয়াছিল, নইলে শূন্য বাড়ী খাঁ-খাঁ করিয়া তাকে যেন গিলিতে চাহিত; হরিষ-সরকারের বুড়ো নৌকোডুবি হইয়া যমজয় সব খোয়াইয়া পাগল হইয়া যাইবার জো হইয়াছিল, শেষে বুক বাঁধিল আমাদের মধুর মজুমদারের সুন্দর ডাগর মেয়েটির মুখ চাহিয়া।—কিন্তু তার উত্তরে নবীন একটিও কথা কহিল না।

যে লোক স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বড় গলা করিয়া বলে না, যে, আমি আর এ-জীবনে কখনো বিয়ে করিতে পারিব না বা বিয়ের কথা শুনিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, তার কাছে মেয়ের বাপেদের আশাভরসা বড় অল্প। তাই একে একে সকলে সরিয়া পড়িল। টাট্‌কা শোক, দুদিন সয়ে যাক, তখন দেখা যাবে—বলিয়া সকলে ভবিষ্যতের আশায় উৎসুক হইয়া রহিল।

দয়াল কুণ্ডু যখন দেখিল নবীন কোনো দিন বা একবেলা একমুঠো রাঁধে, কোনো দিন বা উপোষেই থাকে, আড়তে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া আপনার কাজটুকু সারিয়া বাসায় চলিয়া যায় আর স্ত্রী-পুত্রের শ্মশান শূন্য-ঘরের দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতে থাকে, তখন দয়াল কুণ্ডু দয়া করিয়া বলিল—ভাখো নবীন, তুমি একলার জন্যে আর বাসা ভাড়া দিয়ে হাত পুড়িয়ে কেন কষ্ট করবে, আমার বাড়ীতে এসেই থাকো।

নবীন মাথা নত করিয়া আস্তে বলিল—যে আজ্ঞে।

এতদিন যে চোখের জল দারুণ দুঃখেও পড়িবার অবকাশ পায় নাই তাহা দয়াল কুণ্ডুর সদয় কথায় বাহির হইবার পথ পাইল। নবীন চোখ মুছিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল।

স্ত্রী আর পুত্রকন্যাদের এমন তাড়াতাড়ি পর পর বিদায় দিতে হইয়াছিল, এক-জনকে বিদায় দিবার সময় বিদায়োন্মুখ অপরদের তাগাদা তখন মনটাকে এমন বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিল, যে, নবীন কাঁদিবারই অবকাশ পায় নাই। একলা হাতে ওলাউঠার রোগীদের সেবা করিয়াছে; ঔষধ পথ্য দিয়াছে, ডাক্তারের দর্শনী দক্ষিণা গণিয়াছে, আবার যে বিদায় লইয়াছে তার মুখ-অগ্নিও করিয়া আসিতে হইয়াছে। বেচারা বড় আশা করিয়াছিল যে সেও ত উহাদের পিছেপিছেই যাত্রা করিবে, একটু-মাত্র পথের আগে-পিছে বই ত নয়, তার জন্য সে কাঁদিতে যাইবেই বা কেন? তাড়াতাড়ি যাইবার আগ্রহে সে আপনাকে বিধিমতে যমের ছোঁয়াচের মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু যম সব-কটিকে সরাইয়া তাকে ছাড়িয়া দিয়া গেল, কিছুতেই ছুঁইল না পর্য্যন্ত। যখন নিরাবিল বাড়ীতে কাঁদিবার প্রচুর অবসর মিলিল, তখনও নবীনের কান্না আসিল না—ধনে আর জনে এই কদিনে তাড়াতাড়ি তার এমন খরচ হইয়া গিয়াছে, যে, শূন্য তহবিল মিলাইয়া দেখিতে তার আর সাহস হইতেছিল না। আজ সেই সর্ব্বস্বের শ্মশান শূন্য বাসাখানি ছাড়িয়া যাইবার সময় নবীনের সমস্ত অস্তিত্ব যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সবাই গেল, শুধু সে আছে! এ যে তার কাছে দুঃখের চেয়ে লজ্জার কথাই

মেশী বলিয়া মনে হইতেছিল। সে চোখের জলে দাওয়ার ধূলা ভিজাইয়া আপনার সংসার ভাঙিয়া চাটিবাটী তুলিয়া বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

নবীন নন্দীর যে আজ কী দুঃখ তাহা লক্ষ্মী নিজের মন দিয়া বুঝিতেছিল। তারও যখন বাপের বাড়ীতে বাপ মা আর শ্বশুর-বাড়ীতে স্বামী আরা গেল, তখন তারও এমনি নিরাশ্রয় অবস্থা, তখন তারও কাছে সংসার এমনি ভীষণ শূন্য লাগিয়াছিল, মনে হইয়াছিল কোথাও বুঝি কিছু অবলম্বনের বা নির্ভরের বস্তু নাই—এ সংসার যেন অতল অথই অন্ধকার গহ্বর, তার মধ্যে সে যুগযুগান্তর ধরিয়া শুধু পড়িতেই থাকিবে, কোথাও থামিবে না। তার শ্বশুর শাশুড়ী ছিল না; দেওর আর ভাসুররা আর তার জায়েরা তার স্বামী থাকিতেই তার সঙ্গে যে-রকম সদয় ব্যবহার করিত তাতে বিধবা হইয়া তার এই দুর্ভাগ্যটাই বড় বলিয়া মনে হইল যে এখন ওদের দয়ার উপর মাত্র তার নির্ভর; সে নির্ভর যে কূপের মুখে মাকড়সার জালের মতন পল্‌কা তা ত তার জানিতে বাকী ছিল না। বিধবা হওয়ার দুদিন পরেই তার বড় ভাসুর বলিল—'বৌমা, তোমাকে ত এখন যাবজ্জীবন আমাদেরই ভরণপোষণ করতে হবে—শিবুর ভাগে পৈতৃক বিষয়ের যে হিস্‌সা পড়ে তাতে তোমার এখন জীবন-উপস্বত্ব। কিন্তু তাতে ত আর তোমার খাওয়াপরার খরচ কুলোবে না—তাই বলছি কি, সেটা এখন বিক্রী করে কিছু থোক টাকা হাতে পেলে আমরা তোমার খরচ চালাতে পারি। নইলে দশজন ভদ্দর লোক ডেকে তোমার অংশ বুঝে পড়ে নিয়ে তুমি পৃথক হতে পারো।' লক্ষ্মী একলা পৃথক হইবার ভয়েও চমকিয়া উঠিল, অথচ ভাসুরদের সংসারে থাকাটাও যে খুব প্রলোভনের তা মনে হইল না। তাই সে শুধু বলিল—আমি কি জানি, যা ভালো হয় আপনাদেরই ত করতে হবে।'

এই উত্তর শোনার দুদিন পরেই লক্ষ্মীর অংশের বিষয় তার ভাসুর লেখাপড়া করিয়া কিনিয়া লইল আর সেই টাকা নিজের কাছেই আমানত রাখিল লক্ষ্মীর খোরপোষের জন্য খরচ হইবে। বড় ভাসুর টাকা রাখিল লক্ষ্মীর খরচের জন্য, কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ হইল একবেলা আহার সকলের খাওয়া-দাওয়ার অবশিষ্ট যা যেদিন হাঁড়ির তলায় পড়িয়া থাকিত আর ভাসুরেরই ছাড়াছোড়া ছেঁড়াখোঁড়া এক-একখানা কাপড়। লক্ষ্মীর দস্তির মতন গতর বলিয়া জায়েদের কাছে লক্ষ্মীর সমাদরের অভাব ছিল না। যে জায়ের যখন ছেলে হয় তার আঁতুড়ের করুণা করিতে হয় লক্ষ্মীকে; কারো অসুখ হইলে লক্ষ্মীকেই ডাক পড়ে, আপনার জন আপনার জনের সময়ে অসময়ে না করিলে করিবে কে? রান্না করা সে ত ঘরের লক্ষ্মীরই কাজ। কোনো ছেলে কাঁদিলে লক্ষ্মীকেই সাম্‌লাইতে হয়; নয়ত তার আক্কেল দেখিয়া জায়েরা অবাক হইয়া ভয়ানক গরম হইয়া উঠে; ছেলেরা কোনো জিনিস অপচয় করিলে বা ভাঙিলে ছিঁড়িলে দোষ

ড় লক্ষ্মীরই উপর;- সে কি শুধু বসিয়া য়া বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করিবে, একটা াদের কাজে লাগিবে না, ইহা ভাবিয়া য় জায়েরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জায়েদের পরের মধ্যে সদ্ভাব বড় একটা দেখা না, কিন্তু লক্ষ্মীকে সৎ উপদেশ দিবার া তাদের একমত ও একজোট হওয়া তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া নীতিপুস্তকে ন পাইতে পারে। ভাসুর-দেওরেরা ারের কোনো কাজেই যাদের দশ কাপড়ে কাছা নাই এমন একাট্য াদের সাব্যস্ত নির্বুদ্ধি জীবদের কোনো মর্শই গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু লক্ষ্মীর কে তাদের মতামত শুনিয়া কাজ তে এদের আপত্তি একবারও দেখা ত না। বিকালের জলখাবার পাইতে ী হইলে যখন "বাড়ীর ভিতরের ওঁরা" ক অবাচ্য সম্পর্কের লোকেরা জানাইত লক্ষ্মীর বাবুয়ানি তার জন্য দায়ী, তখন যদের বিশেষ লক্ষণ রাগটা এমন প্রচণ্ড া উঠিত যে লক্ষ্মীর কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত য়া তারা আবশ্যক মনে করিত না, া খুন্তি বেলন যাহা হাতের মাথায় ত তাই দিয়াই লক্ষ্মীর অঙ্গসেবা করিয়া জদের ক্ষুধার জ্বালাটা লক্ষ্মীর উপর ড়িয়া অনেকটা আরাম বোধ করিত। সুর-দেওরদের এইরকম ন্যায্য আচরণে ীর যদি চোখ দিয়া দু চার ফোঁটা পড়িত তা হইলে দোষ করিয়া আবার য়া দেখিয়া বাড়ীর সকলেরই অঙ্গ জ্বলিয়া ত আর এ বাড়ীতে না পোষায় নিজের া দেখিবার জন্য লক্ষ্মীকে নোটিশ দেওয়া হইত। এমনি সুখে থাকিয়াও লক্ষ্মীর যখন স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, দস্তির মতন খাটিবার শক্তি আর রহিল না, তখন সেই গতরখাকীকে বসিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলেই একবাক্যে তাকে আপনার পথ দেখিতে বলিল—বসিয়া খাওয়াইতে পারে এমন সঙ্গতি তাদের নাই আর তার উপর আবার রোগের করুণা করে কে, তাদের বলে নিজেদেরই কে দেখে তার ঠিক নাই তা আবার পরের সেবা।

লক্ষ্মী বলিল—'আমার ত আপনার বলতে তিন কুলে কেউ নেই, আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

আমনি বড় জা ফোঁস করিয়া উঠিলেন—'আ মর মুখপুড়ী! আবার ঘুরিয়ে গাল দেওয়া! তিন কুলে কেউ নেই কি লা? তোর ভাসুর দেওর সব নির্ব্বংশ হয়ে মোলে তুই বাঁচিস?'

লক্ষ্মীর ভাসুর-দেওরেরা শুনিয়া বলিল—'ঘরের বৌকে হাঁসপাতালে দিতে বলার মানে লোকের কাছে আমাদের অপদস্থ অপমানিত করা, দশের কাছে মুখ হেঁট করে দেবার মতলব!'

লক্ষ্মী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তবে আমি কোথায় যাবো?'

ভাসুরেরা বলিল—'কেন, জেঠার কাছে।'

লক্ষ্মীর জেঠা দয়ালকুণ্ডু তার বাপের জেঠতুতো ভাই। সে ব্যবসা ফাঁদিয়া চুপয়সা ঘরে আনিতে আরম্ভ করিলে লক্ষ্মীর জেঠিমা দেওরকে বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতে

দেখিয়া তির করিয়া দিয়াছিল; লক্ষ্মীর বাবা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে অকালে মারা গিয়াছে, তার মাও স্বামীর পিছে-পিছে গিয়াছে, তবু ত জেঠামশায় জেঠি-মার নজর কোনো দিন তাদের উপর পড়ে নাই; তার পর তার এই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তারা ত শুনিয়াও একবার আহা বলিয়া একদিনও তার খোঁজ লয় নাই; এখন সে কিসের দাবীতে সেই জেঠামশায়-জেঠিমার কাছে যাইবে।

লক্ষ্মী বলিল—'যে জেঠা একদিনের তরে খোঁজ করে না তার কাছে কোন্ মুখে যাবো?'

জায়েরা বলিল—'যার ভাতের থিত নেই তার আবার অভিমান!'

ভাসুর বলিল—'ওর জবানী আমরা চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

লক্ষ্মীর জেঠামশায় লক্ষ্মীর চিঠি পাইল, সে কাঁদাকাটা করিয়া চিঠি লিখিয়াছে একবার জেঠামশায় যদি তাকে লইয়া যান ত দিনকতক সে জেঠিমার কোলে জুড়াইয়া আসে।

দয়াল কুণ্ডু গিন্নির মুখের দিকে চাহিল; গিন্নি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—'আনিয়ে নাও। একজন রাঁধুনি রাখ্‌বো ভাবছিলাম, তা পরকে কেন মাস মাস নগদ টাকা গুনি, আপনার জন ভাতকাপড় পেলেই বর্ত্তে যাবে।'

লক্ষ্মীর জেঠামশায় তাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া তার হাতে লক্ষ্মীকে চিঠি পাঠাইল—লক্ষ্মীর যে এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তা তারা জানিত না, জানিলে কি……ইত্যাদি।

লক্ষ্মী চোখের জলে ভাসুর আ জায়েদের পায়ের ধুলা ধুইয়া দিয়া বিদা লইল।—স্বামী মারা যাওয়া অবধি এমনী তার সুখ ছিল না, তবু এই সুখের স্বর্গ ছাড়িয়া যাইতেও তার বুক ভাঙি যাইতেছিল, আশৈশব সে ত এই বাড়ীকে আপনার বাড়ী বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছিল

জেঠামশায়ের বাড়ীতে গিয়া নামিতে লক্ষ্মীর দশা দেখিয়া জেঠিমা আঁৎকাই উঠিল—'আ মরণ! ঘাটের মড়া একেবারে এ কি হাঁসপাতাল, না গঙ্গাতীর, যে এখা মর্‌তে এলি!' প্রথম পদার্পণেই অভ্যর্থনা নমুনা পাইয়া লক্ষ্মীর বুক কাঁপিয়া উঠি চোখের জল দিয়াও সে তার জেঠিম ক্রোধের আগুন নিবাইতে পারিল ন কিন্তু ঠাঁইনাড়া হইয়া আর মনের জো লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ভালো হইয়া উঠিল, বুঝিয়াছিল যে, যে-গরিব পরের আশ্রি তার শরীর খারাপ হইলে চলিবে ন যতদিন সে খাটিতে পারিবে ততদিন ত আদর না জুটুক ত অনাদর জুটিবে ন লক্ষ্মী এখন তার জেঠামশায়ের সংসা ভাঁড়ারী, রাঁধুনী, গৃহিণীর প্রধান পরিচারিক সে ভোরে উঠিয়া রাত দুপুর পর্য অক্লান্ত খাটে; ম্লান বিষণ্ণ মুখে ত একটি রা নাই। একটু ত্রুটি হইলেই ত জেঠিমা তাকে কোমল স্বরে অনু করে 'এসগে বাছা তুমি তোমার শ্বশুরবা আমার এখানে তোমার পোষাবে ন সেই তৎসনায় লক্ষ্মীর চোখ-দুটি ছল করিয়া উঠিলেও, এতে তার কষ্ট হয় না,—সে শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে এখা

মুখে আছে, আর তুলনায় এ ত হাল। তার মিষ্ট স্বভাব, শান্ত তি আর ম্লান বিষণ্ণ নীরব মুখ দেখিয়া দাসী সবাই তাকে মনে মনে আহা ভালোও বাসে। তাই সে জেঠিমার একটা মোলায়েম তিরস্কার মনে মাখে ছেলেবেলা থেকে দুঃখের আঘাত সহিয়া তার মনটি এমন কোমল রোদনোন্মুখ অথচ নিরভিমান হইয়া য়াছিল যে একটু আঘাত সেখানে বড় হইয়া বাজিলেও তাকে সে আমল না। সেই কারণে পরের দুঃখও তার বড় সহজেই আসিয়া লাগিত; কোনো চাকরকে তাদের মনিবেরা তিরস্কার লে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল করে, তার মশায় কোনো চাকরকে মারিলে বা াইয়া দিলে সেদিন আর লক্ষ্মীর মুখে টুকুও রোচে না। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ন-নন্দী যেদিন দয়াল-কুণ্ডুর আশ্রয়ে লি, সেদিন লক্ষ্মী লুকাইয়া লুকাইয়া খ মুছিতে মুছিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, দিনটা ঠায় উপবাসেই তার কাটিল। নবীন নন্দী অসহ্য শোকের ঘায়ে ন জবুথবু হইয়া গিয়াছিল। সে সমস্ত-শুধু দয়ালবাবুর গোলার দপ্তরখানায় য়া খেরুয়া-বাঁধা বড় বড় রোকড়ের ায় হিসাবই লিখিত, নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার ব বড় একটা রাখিত না। অবসর লে পাছে নিজের জীবনের লাভক্ষতি াইয়া দেখিতে মন হয় এই ভয়ে সে ারা রাতদিন বাবুর লাভক্ষতির খতিয়ান তেই মোতায়েন থাকিত।

নবীন নন্দী দুপুর বেলা খেরুয়া-বাঁধা পাকা খাতার উপর একমনে জমা খাতা হইতে জমাখরচ নকল করিতেছিল। বাবুর বাড়ীর চাকর আসিয়া খবর দিল—নন্দীমশায়, ভাত দেওয়া হয়েছে।

নন্দীমশায় খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া লেখার পরে সোজা সোজা মুখ-বাঁকা কমি টানিতে টানিতে বলিল—আমার খিদে নেই, আমি আজ আর খাবো না।

বেলা তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। চাকর আবার আসিয়া ডাকিল—নন্দীমশায়, খাবেন আসুন, আপনি না খেলে দিদিমণি খেতে পাচ্ছেন না।

নবীন কলমটা কানে গুঁজিয়া হাত নাড়িয়া বকিয়া উঠিল—এ ত তারি আলাতন! আমার খিদে না থাকলেও খেতে হবে! তোমাদের দিদিমণিকে খেতে বলগে। আমি না খেলে তাঁর খাওয়া হবে না, এর কি মানে আছে?

চাকর রাগ করিয়া ফিরিয়া গিয়া লক্ষ্মীকে জানাইল—ও বুড়ো পাকা-হরতুকী খেয়েছে, দিদিমণি। সে আস্‌বে না, আপনি খান গিয়ে।

লক্ষ্মীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আ া! একটা প্রাণী বাড়ীতে অভুক্ত থাকিবে আর সে খাইয়া বসিয়া থাকিবে। তার পেটে ত এখনো এমন আগুন লাগে নাই। সে চাকরকে বলিল—"তুমি বুঝি ভালো করে নন্দীমশাইকে ডাকো নি, সাধু?"

সাধুচরণ ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—আবার কেমন করে ডাকতে হবে, পায়ে ধরে

সাধতে হবে নাকি? আপনি ওর ভাত ঢেকে ফেলে রেখে দিন, পেট জ্বললে আপনিই এসে খেতে বস্‌বে।

সাধুর কথাগুলি গিয়া লক্ষ্মীর মনে বিঁধিল। পরঘরী আর পরভাতী লোকের এমনই হেনস্থা সহিয়া থাকিতে হয়। সেও ত নিজে পরঘরী আর পরভাতী, সে মর্ম্মে মর্ম্মে এই অনাদরের বেদনা অনুভব করিল। থাকিত যদি নবীন-নন্দীর স্ত্রী বা কন্যা, তারা কখনো এমন করিয়া তার ভাত ফেলিয়া রাখিয়া নিজেরা খাইতে বসিতে পারিত না। লক্ষ্মী আবার মিনতি করিয়া সাধুকে বলিল—"আর-একটিবার যাও সাধু।"

—না, দিদিমণি, আমি আর যেতে পারবো না, এখনি বাবু ঘুম থেকে উঠবেন, তামাক দিতে হবে।—বলিয়া সাধু চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর যেখানে নবীনের ভাত ঢাকা ছিল সেখানে গিয়া মাটিতে হাতের ভর রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

যে ঘরে নবীন কাজ করিত সে ঘরখানা বাবুর বাড়ীরই সামিল। বাড়ীর ভিতরদিক্‌কার একটা জান্‌লার খড়্‌খড়ি-কপাটে ইস্ক্রুপ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া সেই ঘরখানাকে পৃথক্ করা হইয়াছিল, খড়্‌খড়ির পাখীগুলা পর্য্যন্ত ইস্ক্রুপ-আঁটা। সেই কপাটের নীচের দিক্‌কার দুইটা পাখী খসিয়া গিয়া সেখানটায় ফাঁক ছিল। লক্ষ্মী নবীন-নন্দীর ভাতের কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া সেই দরজার কাছে দাঁড়াইল, চাবির-খোলো-বাঁধা আঁচলটা তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। ঘরের ভিতরের অন্ত গোমস্তার ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়া লক্ষ্মীর পা দেখিতে পাইল, চাবির খোলোর ঝনাৎ শব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু নবীনের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে খাতাই লিখিতেছে। সকলে লক্ষ্মীর আগমনে সসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া নবীনকে বলিল—নন্দীমশায়, দিদিমণি নিজে ডাকতে এসেছেন, খেতে যান।'

নবীন একবার সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল দুখানি কার পা তার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি "যাই যাই" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া লেখার উপর চোখা কাগজ ছাপিয়া উঠিয়া পড়িল।

তার পরদিনও দুপুর-বেলা সে আসিয়া ডাকিল—নন্দীমশায় খেতে আসুন।

"যাচ্ছি।"—বলিয়া নবীন একমনে খাতাই লিখিতে লাগিল, যে তারিখটা খরচের খতিয়ান সে করিতেছে তা মাঝখানে ছাড়িয়া গেলে ভুল হইয়া যাইতে পারে, ঐ তারিখটা শেষ করিয়া যাইবে।

কতক্ষণ সে বিলম্ব করিল তার ঠিক নাই, হঠাৎ চাবির খোলোর ঝনঝন শব্দে চমকিয়া চাহিয়া সে ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল কালকার মত আজও কার দুখানি কোমল চরণতল দেখা যাইতেছে। নবীন অসমাপ্ত খতিয়ান ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া "যাই যাই" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

পরদিন খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, একটা বাজে, তবু সাধু নবীনকে খাইতে ডাকিতে আসিল না। নবীন আম্‌দানীর খাতায় তিসি গম কলাই পাট জমা করিতেছে আর এক-একবার সাধুর প্রত্যাশায় দরজার দিকে, আর এক-একবার সেই দুখানি পায়ের প্রত্যাশায় ভাঙা খড়্‌খড়ির দিকে আড়ে আড়ে চাহিতেছে।

সাধু গিয়া লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দীমশায়কে ডাকতে যাবো দিদিমণি?"

লক্ষ্মী বলিল—"না, এখন থাক। হাতের কাজ ফেলে তিনি আস্‌তে পারেন না, সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক, তখন ডাকলেই হবে।"

সকলকে খাইতে বসাইয়া লক্ষ্মী গিয়া সেই ভাঙা জান্‌লাটির কাছে দাঁড়াইল, আবার তার চাবি বাজিল। লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল যে সে নিজে ডাকিতে গেলে নবীন আর বিলম্ব করিতে পারিবে না, লোক না পাঠাইয়া তার নিজে ডাকিতে যাওয়াই ভালো।

নবীন আজ প্রস্তুত হইয়াইছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল।

তারপর রোজই একটার ঘরের দিকে ঘড়ীর কাঁটাটা যত ঝোঁকে নবীনের মনটাও ততই চঞ্চল হইয়া সেই দুখানি পায়ের আবির্ভাবকে আহ্বান করিতে থাকে; তার সমস্ত ইন্দ্রিয় চাবির সেই ঝম্‌ম্ শব্দটি ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। তখন তার মন মনকষা সুদকষার মধ্যে আর নিবিষ্ট হয় না, সে ঘনঘন ঘড়ীর দিকে আর ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকের দিকে চায়, আর ভাবে আজ বুঝি সে আর আসিল না। তারপর যেই সে আসে আর অমনি যেন নবীনের সর্ব্বাঙ্গ সাড়া দিয়া উঠে, সে তার উল্লাস আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। সেই সময়ে যদি কোনো দালাল কোনো মালের খবর জানাইতে আসে, নবীন অকারণে চটিয়া উঠিয়া বলে—'কি ভ্যানর ভ্যানর করো হে, দেখ্‌ছ আমি কাজ কর্‌ছি। এখন ফুর্‌সৎ নেই। হয় একটু ঘুরে ঘণ্টা দুই পরে এসো, নয়ত কাল বারোটার আগে বা দুটোর পরে এসো, তখন তোমার কথা শুন্‌ব।' এক-টার কাছাকাছি সময়ে কোনো গোমস্তা তার কাছে কোনো কাজ লইয়া আসিলেও নবীন চটিয়া উঠে—'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কেবল কাজই করি, কি বলো?' সেই সময় যদি বাবু দপ্তরখানায় আসেন তবে নবীনের আর অস্বস্তির অন্ত থাকে না; সে উস্‌খুস্ করিতে থাকে, পাছে বাবু সেই দুর্ল-ভ মুহূর্ত্তটিতে তাকে কিছু আদেশ করিতে আরম্ভ করিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে ছট্‌ফট করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যায়, একবার ঘরে আসে।

নবীনের মন সমস্ত স্নেহের আশ্রয়-গুলিকে হঠাৎ একসঙ্গে হারাইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল; এই একটি কে অচেনা অদেখা মেয়ে এই সর্ব্বরিক্ত হতভাগা অচেনা পরের প্রতি মমতা দেখাইয়া নবীনের স্তম্ভিত মনকে চেতাইয়া তুলিল,—সে জগৎটাকে আবার সুন্দর দেখিতে লাগিল, জীবনটাতে সে আবার স্বাদ পাইল। নিঃস্ব

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

মনের কুড়াইয়া-পাওয়া সোনার কুচির মতন সে যে অকথিত স্নেহের এতটুকু পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছিল, তাহা সে লোকের ভয়ে দেখাইতেও পারিত না পাছে লোকে তাকে চোর ভাবে, আবার মনের আঁচলে গেরো দিয়া রাখিয়াও ত তার ক্ষুধা মিটিত না—যে জিনিসটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ব্যবহারই না করিতে পারিলাম তার আবার মূল্য কি? মানুষ যা ভালোবাসে তার কথা যে বলিতে শুনিতে ভাবিতে সুখ। কিন্তু নিঃস্ব নবীনের জীবনে যদি লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটিল তবু তাহা লোককে জানাইতে সে পারিল না, পাছে লোকে জানিতে পারিলে তাকে এই অনধিকারের ঐশ্বর্য্য হারাইতে হয়। প্রথম-প্রথম লক্ষ্মীর পা-দুখানি দেখিতে পাইলেই নবীন 'যাচ্ছি' 'যাই' বলিয়া সাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইত; সে উঠিয়া দপ্তরখানার তক্তপোষ হইতে যতক্ষণ না নামিত ততক্ষণ লক্ষ্মী রুদ্ধ দরজার ওপারে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু এখন লক্ষ্মীর আগমন দূর হইতেই নবীন টের পায়, এখন সে আর 'যাই' বলিয়া সাড়াও দ্যায় না, তাড়াতাড়িও করে না, গড়িমসি করিতে-করিতে আস্তে আস্তে চোরের মতন উঠিয়া চলিয়া যায়; লক্ষ্মীও আর এখন নবীনের সাড়া পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে না, সে ভাঙা খড়্‌খড়ির সামনে একটু দাঁড়াইয়া চাবির-থোলো-বাঁধা আঁচলটা পিঠে ফেলিয়া ফিরিয়া যায়,—সে জানিয়াছিল যে তার পোষমানা প্রাণীটি তার পিছনে পিছনে ঠিক আসিবে।

রোজই লক্ষ্মী নিজে নবীনকে ডাকিতে আসে, নবীনও তার আগমনের প্রতীক্ষায় একটা বাজিবার কাছাকাছি সময়ে বিশেষ-রকম উন্মনা ও ব্যগ্র হইয়া উঠে, অথচ লক্ষ্মী আসিলেই নবীন কেমন কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া গড়িমসি করিতে-করিতে উঠিয়া যায়;—ইহা সেই দপ্তরখানার লোকেদের দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। তাদের মনের মধ্যে কৌতুক ও সন্দেহ নানারকম সম্ভব অসম্ভব আকারে তাদের পীড়ন করিতেছিল, কিন্তু বাবুর ভাইঝির সম্বন্ধে কোনো কথা কেউ মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছিল না। প্রত্যেকে ভাবিতেছিল সে যা টের পাইয়াছে অপর সকলে তা টের পাইয়াছে কি না; সকলকে নিজের মনের সন্দেহ পরিবেষণ করিয়া দিবার আগ্রহ প্রত্যেকেরই হইতেছিল, কিন্তু কেউই সাহস করিতেছিল না। নবীন উঠিয়া গেলেই সকলে নিবিষ্টমনে খাতা লিখিতে লিখিতে, আড়চোখে আড়চোখে একবার নবীনকে ও একবার সেই ঘরের অপর লোকদের মুখের দিকে চাহিয়া লইত; প্রত্যেকেরই জানিতে ইচ্ছা, যে-ব্যাপারটা আমি বুঝিতেছি তা অপরে বুঝিল কি না।

একদিন নবীন উঠিয়া যাইতেই এক-জন মুহুরী আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া খাতার উপর মাথা ঝুঁকাইয়া লিখিতে-লিখিতে বলিল—"এতক্ষণে নন্দীমশায়ের একটা বাজ্‌ল।"

ঘর নিস্তব্ধ, সবাই একমনে খাতা লিখিতে ব্যস্ত, যেন কেহই মুহুরীর মন্তব্য

নে নাই বা বুঝে নাই। কেবল সেই হুরীর পাশের গোমস্তাটি তেমনিভাবে মাথা ঁজিয়া আস্তে বলিল—"হুঁ!"

ঐ মুহুরীটি একবার যেই আগল ভাঙিয়া ল, অমনি সাহস পাইয়া নবীননন্দীকে ইয়া আলোচনাটা মুহুরী-মহলে একটু-কটু করিয়া দিনকার-দিন বাড়িয়াই চলিতে াগিল যেমন করিয়া জল পাইয়া বীজ ইতে অঙ্কুর অল্পে অল্পে গজাইয়া পাতা লিয়া গাছের আকার ধরিয়া উঠে। কানোদিন লক্ষ্মী একটু আগে আসিলে কউ বলিয়া উঠে—"নন্দীমশায়ের ঘড়ীতে াজ একটু সকাল-সকাল একটা বাজ্‌ল!" কটা বাজিয়া গেলেও লক্ষ্মী যদি না াসে তবে হয়ত কেহ গম্ভীর হইয়া জ্ঞাসা করে—"নন্দীমশায়, একটা কি আজ ায় বাজ্‌বে না?"

নবীন সেইসব ছেলেছোক্‌রার ধৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে চটিলেও কখনো রাগ প্রকাশ করিত না, এবং তারা যে কি ইঙ্গিত করিতেছে তার দিক দিয়াও না গিয়া ঘড়ীর দিকে দেখিয়া সে সহজ স্বরেই বলিত—'কৈ, একটা ত এখনো বাজেনি!' অথবা 'না, একটা ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে; প্রায় দুটো বাজে আর কি!'

একদিন প্রায় দুটো বাজে-বাজে, তখনো লক্ষ্মী নবীনকে নীরব আহ্বান করিতে আসিল না। নবীন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঘনঘন ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকের দিকে আড়ে আড়ে তাকাইতেছে। এমন সময় সাধু খানসামা আসিয়া ডাকিল—"নন্দীমশায় খেতে আসুন।"

নবীন একবার চম্‌কিয়া উঠিয়া অবাক হইয়া সাধুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল—এ আজ আবার কি নূতন কাণ্ড। সাধুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ত বহু-দিন হইল চুকিয়া গিয়াছিল। তার বিরস জীবনের এক মুহূর্ত্তের এতটুকু সুখ-কণিকাকে গ্রাস করিবার জন্য এ কোন্ রাহুর আবার উদয় হইল? তার নাম ত সাধু, কিন্তু এমন অসাধু আচরণ সে তার সঙ্গে করে কেন, ইহা যেন নবীন বুঝিতে পারিতেছিল না। নিত্য নিত্য লক্ষ্মীর ডাক পাইয়া পাইয়া নবীনের মনে তার উপর মমতার সঙ্গে একটা দাবীর ভাবও জড়াইয়া গিয়াছিল; আজ তার বদলে সাধু ডাকিতে আসাতে নবীনের মনে হইতেছিল যেন সাধু তাকে হক পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

নবীনের নড়িবার লক্ষণ না দেখিয়া আর কাছারীর সকল গোমস্তা-মুহুরীর টেপা হাসি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সাধু বলিয়া উঠিল—"হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন! খেতে চলুন।"

নবীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতার উপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিল—"চলো, যাচ্ছি।"

সাধু কড়া সুরে বলিল—"চলো যাচ্ছি নয়, এখনি চলুন। আজ কি আর দিদি-মণি আছে যে আপনার ভাত কোলে করে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত উপোষ করে বসে থাক্‌বে।"

সাধুর কথা নবীনের বুকের মধ্যে ঝনাৎ করিয়া গিয়া আঘাত করিল। 'আজ কি আর দিদিমণি আছে!...' সে নাই? এই 'নাই' কথাটা এক নিমেষে নবীনের

সমস্ত জীবনটাতে আবার একটা ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া প্রকাণ্ড শূন্য দাগিয়া দিল। নবীন একবার সেই ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকের দিকে চাহিল, সে মনে করিতেছিল এত-ক্ষণে হয়ত সাধুর কথা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া সেই ফাঁক ভরিয়া দুখানি চরণের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু না, সেখানটা তার বুকের মধ্যেকার মতনই শূন্য! ও ত ভাঙা খড়্‌-খড়ির ফাঁক নয়, ও যেন নবীনের ভাঙা বুকের পাঁজ্‌রা খসার শূন্যতা! নবীনের ভাব দেখিয়া ঘরের লোকেরা আর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না; টেপা হাসি ঠোঁটের কস গড়াইয়া, চোখের কোণ দিয়া ঠিক্‌রিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। তার সহকর্ম্মীদের এই ক্রুর হাসি আর সাধুর রূঢ় দৃষ্টি দেখিয়া বিমূঢ়ের মতন হইয়া নবীন আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন খাইতে বসিয়া যে-পরিমাণ ভাত থালের এধার ওধার করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সে পরিমাণে গ্রাস মুখে উঠিতেছে না। সে যে-জায়গাটিতে খাইতে বসে তার সম্মুখে দরজার একখানি কপাট আজও অন্যদিনের মতন ভেজানো আছে, কিন্তু তার আড়ালে আজ সে কারো দাঁড়াইয়া-থাকা অনুভব করিতেছে না। নবীনের মন হাহাকার করিয়া কাঁদিতে চাহিতেছিল —কোথায় গেলে তুমি কোথায় গেলে! এই নিঃস্বকে রিক্ত করিয়া তুমি কোথায় গেলে!

হঠাৎ নবীনের কানে গেল প্যারী দাসী গিন্নিকে বলিতেছে—"মা, দিদিমণি কি খাবে? একটু সাবু-টাবু করে দেবো?"

কথাটা শুনিয়াই নবীনের বুকের মধ্যটা ধক্ করিয়া উঠিল। আহারে! অসুখ করিয়াছে! তাই সে উঠিয়া আসিতে পারে নাই। নবীনের ইচ্ছা করিতেছিল, সে যদি একবার তার কাছে গিয়া তাকে একবারটি দেখিয়া শুধাইয়া আসিতে পারিত, সে কেমন আছে? কিন্তু তার অধিকার কি? সে এ বাড়ীর কে?

প্যারী দাসীর প্রশ্নের জবাবে গিন্নি বলিয়া উঠিল—আর আদিখ্যেতা করে সাবু করে দিতে হবে না, শেষ-হাঁড়ির ভাতের টাট্‌কা ফেন একটু এনে দিগে যা, গরম-গরম নুন-নবু দিয়ে খাবে। তিনদিন অন্তর যার অসুখ তার জন্যে অত সাবু-বার্লিক কোথায় পাবো?

গিন্নির কথাগুলি নবীনের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। ভাতের ফেন খাদ্য আর পথ্য হিসাবে ফেল্‌না না হইলেও আমরা তা ফেলিয়া দি বলিয়া উহা তুচ্ছ বা অখাদ্য ভাবি; সেই ফেলিয়া দিবার জিনিস বরাদ্দ করাতে গিন্নির কথায় লক্ষ্মীর উপর যে নির্ম্মমতা আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইল তার ব্যথা নবীনের মনে আসিয়া বাজিল। সে ত মাসে মাসে সাড়ে সতেরো টাকা মাইনে আর চার-টাকা ছ-আনা তহরির পাইতেছে, তার এক পয়সাও ত আর খরচ নাই—সেই সমস্ত টাকা যে সে লক্ষ্মীর পথ্যের জন্য খরচ করিতে পারে। কিন্তু সেই খরচ করিবার তার অধিকার কি?

নবীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।—প্যারীকে ডাকিয়া চুপিচুপি তার সমস্ত পুঁজি উজাড় করিয়া দিলে হয় না? কিন্তু তাতে প্যারী কি ভাবিবে? সে লক্ষ্মীকে মমতা দেখাইবার কে?

গিন্নি চটা সুরে ডাকিল—প্যারী, কোথায় গেলি?

প্যারীর জবাব শোনা গেল—দিদিমণির মাথা কামড়াচ্ছে তাই একটু টিপে দিচ্ছি...

গিন্নি কটু সুরে বলিল—ওরে আমার নবাব-গিন্নি! তবু যদি রতন পাল ভাদ্দর-বৌকে ভাতকাপড় দিত! যার গতর না খাটালে অন্ন জোটে না, তার আবার অত নবাবী!...

প্যারী তাড়াতাড়ি গিন্নির কাছে আসিয়া বলিল—দিদিমণি বলেনি মা, আমিই নিজে-থেকে দিচ্ছিলাম।

—তোরাই ত ওর চাল বিগড়ে দিচ্ছিস। আমার পা দুটো একটু টিপে দিবি আয়।

নবীন খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

উপরের বারান্দা হইতে প্যারী ডাকিয়া বলিল—নন্দীমশায়, মা বল্‌ছেন তাঁর বাড়ীতে অমন ভাত অপচ কর্‌লে চল্‌বে না।

নবীনের দুচোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে মুখ না তুলিয়াই করুণ স্বরে বলিল—আমি খেলেও ত অপচ হত। আমি খেতাম, না হয় পাঁদাড়ের কুকুরগুলো খাবে।

গিন্নি প্যারীকে বলিল—নিন্দে যমের বাড়ী খেয়ে কেমন একতর হয়ে গেছে। কর্ত্তার যেমন আক্কেল যত সব ভদ্দরকুড়ের বাথান করে তুলেছেন বাড়ীখানা—বাইরে নবীন নন্দী, ভেতরে লক্ষ্মী ঠাকরুণ! যত খাবেন তত অপচ করবেন, কিন্তু কোনো কাজে লাগেন যদি একটু। ওদের আপনার আপনার পথ দেখতে বল্‌লেই হয়...

নবীন এঁটো হাতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিয়া গেল। সে বুঝিয়া গেল সে এ বাড়ীতে গলগ্রহ হইয়া আছে। কিন্তু সে ত এ বাড়ীতে যাচিয়া থাকিতে আসে নাই। দুবেলা সে এ বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করিতেছে বটে, কিন্তু তা কত কটি? লক্ষ্মী নিজে ডাকিতে যায়; নইলে ত সে আধেক দিন একবেলা খাইয়া বা উপোষ করিয়াই কাটাইয়া দিতে চায়। যে খাওয়াতে তার রুচি নাই, সেই খাওয়ার উপরে আবার খোঁটা। কথাটা নবীনের মনে বড় অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। আর হইলই না হয় সে দুবেলা গিলিতেছে, কিন্তু দুবেলা দুটি খাইতে দিয়া মনিবের কি কিছু লাভ হয় নাই? আগে সাতটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে পাঁচটা ছ ঘণ্টা তাকে খাটিতে হইত, এখন সে যে ভোর থেকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত খাটে—গোড়া মনকে বিশ্রাম দিবার কি তার জো আছে? তার ত একলার পেট, গঞ্জের গোলায় গোলায় কয়ালির কাজ করিলেও ত চলিয়া যায়—বাঁধা মাইনে তার না হয় নাই থাকিল। চাকরীর মায়া ছিল, তখন যখন অনেকগুলি মুখ তার উপার্জ্জনের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু এখনই কি সে এ চাকরী ছাড়িয়া যাইতে পারে? হায় লক্ষ্মী! সেও যে আরই মতন এদের গলগ্রহ, নিগ্রহভাজন। একথা ত

এতদিন সে জানিত না। সে জানিত লক্ষ্মী বাবুর ভাইঝি। শুধু সে বিধবা বলিয়াই নবীনের মনে যে একটু খেদ আর বেদনা ছিল। আজ সেই বেদনা সেই খেদ যে তীব্র হইয়া উঠিল তাকে নিগৃহীত অনাদৃত জানিয়া। নবীন আঁচাইতেছিল আর তার দুই চোখ হইতে জলের ধারা বহিতেছিল। যদি সে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কহিত তাহা হইলে সে লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিতে পারিত।

জেঠিমার কথা কটা লক্ষ্মীরও অশোনা রহিল না। সেও জ্বরের ঘোরে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতেছিল—সে ত আপনি ইচ্ছা করিয়া যাচিয়া জেঠার গলগ্রহ হইতে আসে নাই। সে শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে এখানে ঢের বেশী সুখে আছে বটে, কিন্তু এ সুখে তার কোনো দাবী নাই জানিয়াই ত সে কখনো চাহেও নাই। সে মেয়েমানুষ, নিরুপায়, তাকে এই স্নেহহীন আত্মীয়তার আশ্রয়েই আমরণ থাকিতে হইবে। কিন্তু নন্দীমশায় ত পুরুষমানুষ, তিনি কেন পরঘরী আর পরভাতী হইয়া এই লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেন? যাই সে আছে তাই ত উহাকে ডাকিয়া-ডুকিয়া খাওয়ায়; সে থাকিতেই চাকর-দাসীরা ভাত ফেলিয়া রাখিতে চায়, না থাকিলে ত সেই মাছি-ভন্‌ভনানো ভাত তাকে খাইতে হয়। আহা! যে লোক স্ত্রীকন্যার যত্নের স্বাদ পাইয়া হারাইয়াছে, তাকে যে এতটুকু অযত্ন কতখানি ক্লেশ দিবে তা ত লক্ষ্মী নিজেকে দিয়া জানে। সে যদি নন্দীমশায়ের সঙ্গে কথা কহিত তাহা হইলে আজই তাঁকে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিত।

সেইদিন হইতে নবীন লক্ষ্মীর সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। কেউ তাকে হয়ত তিরস্কার করিতেছে, তার হয়ত কিছু চাই কিন্তু সে পাইতেছে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়া নবীন অনির্দ্দিষ্ট কল্পিত আশঙ্কায় নিরন্তর পীড়িত হইতে লাগিল। সে বাড়ীময় চকিত হইয়া কান পাতিয়া-পাতিয়া বেড়ায়, কিন্তু না পায় কোথাও লক্ষ্মীকে দেখিতে আর না পায় তার একটি কথাও শুনিতে। এতদিন তারা এক বাড়ীতে আছে, কিন্তু নবীন সাদা থানের পাড়ের নীচে লক্ষ্মীর দুখানি পা ছাড়া তার আর চাক্ষুষ পরিচয় কিছু পায় নাই, লক্ষ্মীর চাবির থোলোর শব্দ ছাড়া সে তার একটি কথাও শোনে নাই। লক্ষ্মী এমনি লক্ষ্মী যে সারাদিন মুখ বুজিয়া কাজ করে, হাজার তিরস্কারেও তার মুখে একটি কথা শোনা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মীর কথা শুনিতে না পাইলেও নবীন যখন-তখন গিন্নির তর্জ্জন শুনিতে পাইতে লাগিল এবং বুঝিতে লাগিল যে এ বাড়ীতে লক্ষ্মী কেমন আদরে কেমন সুখে থাকে। অক্ষম বলিয়াই তার আকুলতা তাকে অধিক পীড়া দিতে লাগিল। এত তিরস্কার-গঞ্জনাতেও লক্ষ্মী যখন শয্যাগত, তখন না জানি তার কেমন কঠিন পীড়া হইয়াছে,—এই দুর্ভাবনাতেই নবীন চঞ্চল হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

নবীনের চঞ্চলতা দেখিয়া তার সহকর্ম্মীরা ভাবিতেছিল লক্ষ্মীকে দেখিতে না পাইয়া বুড়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এতে তারা অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতেছিল। একএকটা দিন যাইতেছিল আর সেদিনও

লক্ষ্মীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কোনো কোথাও না দেখিয়া নবীন বেশী ড়িয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিল। সে বাড়ীর-তর খাইতে গিয়া, তার সহকর্ম্মী যারা বুর বাড়ীতে খাওয়া পাইত তাদের সকলের কে পাত ছাড়িয়া উঠিত আর সকলের ছনে পড়িয়া হয় সাধু নয় প্যারী যাকে দিন কাছে পাইত তাকে ভয়ে-ভয়ে পণে জিজ্ঞাসা করিত—তোমাদের দিদি-কেমন আছেন?

লক্ষ্মীর সম্বন্ধে নবীনের এই জিজ্ঞাসা স্তে সন্তর্পণে হইলেও তার সহকর্ম্মীদের তুখোড় কাজিল ছোক্‌রা গোপেশের ত থাকিত না; নবীনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় ইতস্ততঃ আর গোপনতার প্রয়াস পেশের মনে কৌতুককে কৌতূহলে আর হকে ধারণায় পরিণত করিতেছিল।

প্যারী দাসীর মনের কোণেও একটু তুক বা সন্দেহ জমিতেছিল; সে রোজ লক্ষ্মীকে শোনাইত নন্দীমশায় তার ল জানিবার জন্য কি-রকম ব্যগ্র ব্যাকুল া থাকে। লক্ষ্মী শুনিয়া চুপ করিয়া বত—এই নির্বান্ধব স্নেহমমতাহীন পুরীতে বুড়াটিই তার ব্যথা বুঝিয়াছে, কারণ নিজেও ভুক্তভোগী কিনা।

একদিন গোপেশ খাইয়া কাছারী-ঘরে বলিয়া বসিল—নন্দীমশায়, একটি ডাগর-গর দেখে বিয়ে-থা করে সংসারী বসুন; শেষকালে বুড়োবয়সে একটা লেঙ্কারী ধাষ্টমো করবেন।

নবীন অবাক হইয়া গোপেশের মুখের ক তাকাইয়া পরে বলিল—বুড়ো বয়সে বিয়ে করাটাও ত কম কেলেঙ্কারী ধাষ্টমো হবে না ভাই। এতটুকু দুধের মেয়ে বিধবা হলে তার বিয়ে দেবার জন্যে ত ভাবনা হয় না, যত কেলেঙ্কারী ধাষ্টমোর ভয় কি বুড়ো পুরুষের বেলা?

গোপেশ চকিতে ঘরের সকলের মুখের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া মুচ্‌কি হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বলিল—হুঁ! নন্দীমশায়ের আজকাল বিধবার ওপর বড় দরদ হয়েছে দেখ্‌ছি! বিধবার বিয়ে আপনিই চলন করে দিন না।

নবীন খতিয়ানের খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—বউ-মরা লোকের যদি বিয়ে করতেই হয় তা হলে বিধবাকেই বিয়ে করা উচিত।

তারিণী হাসিয়া বলিল—তা হলে পাত্রী খুঁজ্‌ব নন্দীমশায়?

গোপেশ হাসি চাপিয়া তারিণীকে ধমক দিয়া বলিল—পাত্রী নন্দীমশায় নিজেই ঠিক না করে কি আর কথাটা পেড়েছেন।

সেইদিন হইতে সবাই বিধবা-বিবাহ লইয়া নবীনকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল; গোপেশ শুভকর্ম্মটা তাড়াতাড়ি সারিবার জন্য তাগাদা দিতে লাগিল; তারিণী মিতবর হইবার জন্য উমেদারী জুড়িয়া দিল।

প্যারী দাসী খবর পাইয়া সাত-তাড়াতাড়ি গিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—আর শুনেছ দিদিমণি? নন্দীমশায় বিধবা-বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছে। নাকি কনেও ঠিক করে রেখেছে। এখন দুহাত এক হলেই হয়।...

লক্ষ্মী একবার প্যারীর মুখের দিকে

চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল—প্যারীর মুখের হাসি কটাক্ষ কৌতুকভার লক্ষ্মীর ভালো লাগিল না। লক্ষ্মীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া প্যারীর আনন্দ উল্লাসে পরিণত হইল, সে দম ভরিয়া হাসিবার জন্য সেখান হইতে ছুটিয়া উঠিয়া গেল।

বিধবার বিবাহের কথা কেন যে নবীনের মনে উঠিল তাহা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

লক্ষ্মী চার-পাঁচদিন পরেই বিছানা ছাড়িয়া আবার আপনার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। মধ্যে কদিন নবীনকে না ডাকিতে যাওয়াতে এখন আবার নূতন করিয়া তাকে ডাকিতে যাইতে লক্ষ্মীর সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। রোজ যেমন ডাকিয়া আনে আজও তেমনি সাধু গিয়া নবীনকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া নবীন যখন দ্বারের অন্তরালে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করিল, তখন অভিমানে তার আর খাওয়া হইল না। তার পর-দিন সাধুর ডাকে সে খাইতে যাইতে অস্বীকার করিল; আজ তার শরীরটা ভালো নাই, এবেলা সে খাইবে না। তখন আবার লক্ষ্মীকে তার নিত্যকার দৌত্যে নিযুক্ত হইতে হইল। আবার একটার সময় ভাঙা খড়্‌খড়ির ওপারে পায়ের উদয় হয়, চাবি বাজে, নবীনও বিনা ওজরে খাইতে উঠিয়া যায়।

সেদিন বৃহস্পতিবার; গোলদারদের দপ্তরখানা বন্ধ। দয়াল কুণ্ডু স্ত্রীকে লইয়া ষাঁড়েশ্বরতলায় পুত্র-প্রার্থনায় পূজা দিতে গিয়াছে; সাধু সঙ্গে গিয়াছে। গঞ্জের ঘাটে দু নৌকা পাট আসিয়াছে, তাহা তোলাইয়া মাপাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নবীন গোপেশ আর তারিণী গঞ্জে গিয়াছে। কেহই সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না। বাড়ীতে কেবল লক্ষ্মী আর প্যারী আছে। লক্ষ্মী প্যারীকে বলিল—শুধু তোমার একলার জন্যে আর কি রাঁধবো প্যারী-দিদি, তুমি এবেলা ফলার টলার করে থাকো; ওবেলা সকলের জন্যে ত রাঁধতেই হবে।

প্যারী বলিল—আর তুমি?

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—হ্যাঃ! শুধু আমার জন্যে আবার রাঁধতে গেলাম আজ অবকাশ পেয়েছি, সমস্ত বাড়ীটা ঝেড়ে পুঁছে ফেলি।

লক্ষ্মী কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঝাঁটা ধরিয়া বাড়ী পরিষ্কারে লাগিয়া গেল। বাড়ীর ছাদের কার্ণিশ হইতে পায়খানা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গা ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, ঝুল ঝাড়িয়া জিনিসপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া সে বাড়ীটাকে একেবারে বিয়ের কোনের মতন সুন্দর করিয়া তুলিতে লাগিল। নবীন থাকে সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে একটা ঘরে। ঘরটায় ধূলা ঝুল আবর্জ্জনা জমিয়া আছে, এক পাশে কতকগুলো ময়লা বিছানা ওলটা হইয়া পড়িয়া আছে, দড়ির আল্‌নায় কতক গুলো ময়লা জামা কাপড় এলোমেলো ঝুলিতেছে। লক্ষ্মী সেই ঘরে পা দিয়া বলিয়া উঠিল—আরে রাম! এ ঘরে কে থাকে?

প্যারী হাসিয়া বলিল—তোমার নবীন মশায়।

লক্ষ্মী ঘরটাকে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়া বলিল—আহা! তোমরা একটু দেখতে পারো না প্যারী-দিদি?

প্যারী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আধবুড়ো মিন্সে নিজের ঘরটাকে নিজে পরিষ্কার করতে পারে না?

লক্ষ্মী বলিল—এসব কি পুরুষমানুষে পারে? তাতে আবার উনি বৌমরা বুড়ো মানুষ।

প্যারী বলিল—তোমার মতন আমাদের ত দরদের প্রাণ নয় দিদিমণি।

প্যারীর কথার ভঙ্গীতে একটা কেমন খোঁচা স্পষ্ট হইয়া উঠিল দেখিয়া লক্ষ্মী আর ভালো কথা না বলিয়া নবীনের বিছানা পাড়িয়া বিছাইয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় গোপেশ আর তারিণী ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেই লক্ষ্মী কোমরে-জড়ানো আঁচল লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। গোপেশ আর তারিণী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মীও তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সারিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে বাবু গিন্নি কর্ম্মচারী একে একে সকলেই বাড়ীতে ফিরিয়া বাড়ীর শ্রী দেখিয়া অবাক। বাড়ীর মেয়েকে উৎসবের বেশে দেখিলে যেমন লাগে, এই পুরানো বাড়ীখানাকে তেমনি কেমন নূতন লাগিতেছিল; সে তার ধুলো মাটি কালিঝুল ঘষিয়া মুছিয়া সাফ হইয়াছে, শৃঙ্খলায় পরিপাটি হইয়া সাজানো হইয়াছে। বাবু বৈঠকখানায়, গিন্নি শোবার ঘরে, কর্ম্মচারীরা দপ্তরখানায়, চাকরেরা রান্নাঘরে একজন কার নিপুণ হস্তের স্পর্শ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু গোপেশ আর তারিণী যখন চুপিচুপি চোখ টিপিয়া সকল কর্ম্মচারীকে বলিল—'আর জানেন, নন্দীর ওপর লক্ষ্মীর কৃপা কত! নিজের হাতে নন্দীর বিছানা পেতে দেওয়া হচ্ছিল! আমরা গিয়ে পড়তেই একেবারে থতমত খেয়ে গেল!' তখন আর কারো মনে সেই ব্যাপারটাকে সমস্ত বাড়ী সাফের সাধারণ অঙ্গ বলিয়া ঠেকিল না; গোপেশদের দেখিয়া লক্ষ্মীর থতমত খাওয়াটা পুরুষের সামনে পড়ার সঙ্কোচ বলিয়াও কেহ বুঝিল না। লক্ষ্মী যে সমস্ত বাড়ীটা সাফ করিয়াছে, সে কথা সকলে ভুলিয়া গিয়া নন্দীর বিছানা পাতিয়া দেওয়ার অসামান্য ব্যাপারটা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে না-হইতে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। ধরা পড়িয়া লক্ষ্মী যে থতমত খাইয়া গিয়াছিল তার সাক্ষী ত গোপেশ আর তারিণী। আর হয় নাই হয় প্যারীকে ডাকিয়া ভজাইয়া দিতেও ত তারা প্রস্তুত!

অনেক রাতে নবীন বাড়ীতে ফিরিয়া নিজের ঘরে পা দিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তার সে লক্ষ্মীছাড়া ঘরে কে পদ্মহস্ত বুলাইয়া এমন লক্ষ্মীশ্রী দিয়া গেল! তার অতীত জীবনের চেষ্টা-করিয়া-ভুলিতে-চাওয়া কথা মনে পড়িয়া গেল; তার মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিত তখন সে এমনি করিয়া তার এলোমেলো ঘরকন্নায় শৃঙ্খলা সৌষ্ঠব দান করিত; তার স্ত্রী মেয়ের কাছে বকুনি খাইয়া হাসিয়া বলিত—'আমরা সেকেলে মানুষ মা, আমরা কি

তোদের একেলে চালচলন জানি।' নবীন সেইখানে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, দুই হাত তার মাথায় আর দুই ধারা তার চোখে।

গোপেশ আর তারিণী নবীনের আসার প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল; হাসিতে-হাসিতে আসিয়া বলিল—নন্দীমশায়ের ঘরে আজ লক্ষ্মীর কৃপা হয়েছে দেখ্‌ছি!

নবীন অন্ধকারে চোখের জল লুকাইয়া বলিল—হ্যাঁ ভাই, লক্ষ্মীছাড়ার ঘরেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠেছে।

গোপেশ বলিল—এখন উঠুন, খেতে চলুন।

নবীন বলিল—না ভাই, তোমরা যাও আমি আজ আর খাবো না।

যাইতে যাইতে তারিণী হাসিয়া বলিল—দিবা-অভিসার চল্‌ছিল, এইবার নিশা-অভিসার সুরু হবে।

গোপেশ, ধমক দিয়া বলিল—সুরু যে হয়নি তা তুই কেমন করে জান্‌লি?

তারিণী হাসিয়া বলিল—তাও ত বটে!

গোপেশ আর তারিণী যখন নবীনকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছিল তখন নবীন শুনিতেছিল উপরে প্যারী গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—মা, দিদিমণি রাত্তিরে কি খাবে? সমস্ত দিন কিছু খায়নি, রাত দশটা বেজে গেছে, আর ত ভাত খেতে নেই?

গিন্নি রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আদিখ্যেতা করে আবার দিনের বেলা ভাত খাওয়া হয়নি কেন? একবেলা ভাতই দিতে পারি, রাত্তিরে বিধবার জলখাবার ক্ষীর সর ননী কোথায় পাবো? উনি আবার বামুনের বিধবার মতন চং করে রাত্তিরে আচমনী জিনিষ খান না! কি আর খাবেন তবে? উপোষ করে থাকুন।

এই কথা শোনার পর নবীনের খাইবার প্রবৃত্তি আর ছিল না। যে লোকটি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সমস্ত ঘরসংসারে অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে, তাকে রাত্রেও অনাহারেই থাকিতে হইবে। আর সে দিনে রাতে খাইয়া চলিবে, ইহা নবীনের অত্যন্ত অন্যায় মনে হইল।

খানিকক্ষণ পরে প্যারী আসিয়া বলিল—নন্দীমশায় খেতে আসুন, দিদিমণি নিজে ডাকতে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

নবীন আজ লক্ষ্মীর আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—শুন্‌লাম বিধবার সমস্ত দিন উপোষ করে থেকেও রাত্রে কিছু খেতে নেই। বিধবার নিয়ম আমিও আজ থেকে পালন কর্‌ব প্যারী।

প্যারী বলিল—আপনি আগে বলেননি, চাল নেওয়া হয়েছে, ভাত ফেলা গেলে মা রাগ করবেন। আজ খাবেন চলুন, কাল থেকে যা হয় কর্‌বেন।

নবীন বলিল—আমি খেলেও ত চাল বাঁচ্‌ত না। আমি খাবো না। তোমাদের দিদিমণিকে বোলো কাল থেকে আমাকে তাঁরই হাঁড়ির হবিষ্যি দুটি করে দেবেন; যেদিন তাঁর উপোষ সেদিন আমারও উপোষ।

প্যারী মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া গেল।

প্যারী ফিরিবার আগেই লক্ষ্মী চোখের জল গোপন করিতে সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। নবীন যে তার প্রতি মমতার বশেই এই ক্লেশ স্বীকার করিতেছে ইহা লক্ষ্মীর বুঝিতে বাকী ছিল না; মা বাপ আর স্বামীকে হারাইয়া অবধি লক্ষ্মী এক-নেশের তরে একজনের কাছে একটিও স্নেহের নিদর্শন পায় নাই; কোথাকার এই পরের কাছে এমন মমতার পরিচয় পাইয়া শান্ত লক্ষ্মীর চোখের জল অবাধ্য হইয়া ছুটিয়াছিল; কত দিনের কত কঠোর ব্যবহার সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে এই অস্পষ্ট মমতার আভাসটুকুও সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এতদিন লক্ষ্মী নিজের রান্নাটা ভাতে-ভাত করিয়াই সারিত; কিন্তু নবীন তার শরীদার হওয়াতে তাকে রোজ ডাল আর নিদেন পক্ষে একটা তরকারীও রাঁধিতে আরম্ভ করিতে হইল। তাহা দেখিয়া গিন্নি রুষ্ট হইয়া বলিলেন—নবাবী ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। নন্দী মিন্সে সংসারের সাপ্‌টা রান্না খেয়ে থাকে ভালো, নিজে আপনার পথ দেখুক। এক বাড়ীতে ত হেঁসেল ত আমি চালাতে পার্‌ব না।

গোপেশ তারিণীকে চোখ মট্‌কাইয়া বলিল—ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়্‌ছে। একবাড়ী থেকে একহাঁড়িতে ঠাঁই হয়েছে, তার পর.....

বাড়ীময় যে ঘোঁট জটলা-পাকাইয়া সারা বাড়ীর হাওয়াটাকে গুমোট করিয়া তুলিতেছিল তার ছোঁয়াচ অল্পে অল্পে কর্ত্তা-গিন্নির মনে গিয়াও লাগিতেছিল। কেহ সাহস করিয়া কর্ত্তাগিন্নির সাম্‌নে কুৎসা আলোচনা করিতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু ফিস্‌ফাস কানাঘুষার আভাস একটু আধটু ছিট্‌কাইয়া তাঁদের কানেও লাগিতেছিল।

একদিন একটার সময় লক্ষ্মীর আগমনের প্রতীক্ষায় নবীন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; একবার লিখিতেছে, একবার কানে কলমটা গুঁজিয়া রাখিয়া চোখ-কাগজ দিয়া লেখার কাঁচা কালি ছাপিতেছে। একটু পরেই ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকে লক্ষ্মীর পা উঁকি মারিয়া চাবির শব্দে নবীনকে ডাকিল। নবীন উঠিয়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া চটিজুতার মধ্যে পা দিতেছে, এমন সময় গোপেশ হাসিমুখে ঘরে আসিয়া বলিল—নন্দীমশায়, বাবু আপনাকে বৈঠকখানায় ডাক্‌ছেন!

এমন শুভ মুহূর্ত্তে একি অঘটন! সে ক্ষুণ্ণ মনে চলিতে যাইবে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই ভাঙা জান্‌লার ওপারে চটাস করিয়া একটা চড়ের শব্দ আর গিন্নির চড়া গলার গর্জ্জন—নচ্ছার মেয়ে-মানুষ, এখানে দাঁড়িয়ে তুই কি কর্‌ছিস। সাধে কি বুড়ো মিন্সে বিধবা-বিয়ে কর্‌বে বোলে ক্ষ্যাপে!.....

গিন্নির সেই ভীষণ চড় নবীনের মনের মধ্যে পাঁচ আঙুলের দাগ বসাইয়া গেল। তার জন্যে লক্ষ্মীর এই লাঞ্ছনা আর অপমান! উহা নিবারণ করিতে সে যে প্রাণ দিতেও পারিত! এ বাড়ীতে থাকিয়া সে আর লক্ষ্মীর দুঃখ বাড়াইবে না। বাবুর কাছে বলিয়া সে আজই বিদায় লইবে।

লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে তার কষ্ট হইবে খুবই; কিন্তু কথামালার টাক ও পরচুল গল্পটার কথা স্মরণ করিয়া নবীন মনকে সান্ত্বনা দিল, আপনার জনকেই সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই তা পরকে ধরিয়া রাখিবে কেমন করিয়া? অনেক বিচ্ছেদের দুঃখ সে সহিয়াছে, এ দুঃখও তাকে সহিতে হইবে।

বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইতেই দয়াল কুণ্ডু পরম শান্ত স্বরে বলিল—এই নাও তোমার এ মাসের মাইনে, আর নোটিশের দরুন একমাসের মাইনে আগাম। দরজায় গাড়ীতে তোমার জিনিসপত্তর তোলা হয়ে গেছে এতক্ষণ, তুমি এ গাঁ ছেড়ে এখনি চলে যাও।

নবীন বাবুকে নমস্কার করিয়া যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় গিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়িল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? কোথায় তার কে আত্মীয়, কোথায় বা তার ঘরবাড়ী?

নবীনকে জানাইয়া তাকে অপমান করাতে লক্ষ্মীর মর্ম্মান্তিক বাজিয়াছিল। এ ত শুধু তাকে অপমান নয়, এ যে নবীনকেও। তার জন্য যে নবীন অপমানিত হইল, ইহাতে লক্ষ্মী নিজেকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিল। তার পর যখন জানিল যে নবীনের চাকরী পর্য্যন্ত গেল, এই ঠিক দুপুর বেলা অভুক্ত বৃদ্ধকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইতেছে, তখন লক্ষ্মীর বুক ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইল। সে লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, লোকে আজ যে তার কান্না দেখিতেছে তাতে তার আর লজ্জা নাই।

বাবুর বৈঠকখানা হইতে নবীন বাহির হইয়া যাইতেই গিন্নি দয়ালকে গিয়া বলিল —একটা আপদকে ত দূর করলে; আর একটা?

দয়াল গম্ভীর হইয়া বলিল—ঐসঙ্গেই দূর করে দিতাম, কিন্তু লোকে যাকে আমার ভাইঝি বলে তাকে অমন করে তাড়ালে আমারই মুখ হেঁট হবে। নিজের কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

গিন্নি উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শ্বশুরবাড়ী থেকে তারা এইরকম রীত দেখেই দূর করে দিয়েছে!

লক্ষ্মী জেঠামশায় আর জেঠিমার কথা শুনিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। ওরা তাকে নবীনের মতনই তাড়াইয়া দিত যদি তাতে ওদের মুখ হেঁট না হইত। তাড়াইতেছে না তার প্রতি মমতা বা দয়া করিয়া নয়, নিজেদের নিন্দার ভয়ে। এখানে যতকাল থাকিতে হইবে এই কুৎসার কুণ্ঠা তাকে বহন করিতে হইবে! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর অমন যে শান্ত স্নিগ্ধ কোমল মুখ, তা কঠোর উগ্র হইয়া উঠিল।

নবীন নন্দী চলিয়া যাইতেছে দেখিবার জন্য দপ্তরখানার সব কর্ম্মচারী, বাড়ীর চাকর দাসী, গোলার দফাদার মজুর, পাড়াপ্রতিবেশী অনেক লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে; বাড়ীর উপরের বারান্দা হইতে বাবু আর চিকের আড়াল হইতে

[illegible] দেখিতেছে। গাড়োয়ান গাড়ীতে [illegible] জুতিয়া লাগামের দড়ি ধরিয়া টুই [illegible] করিয়া চালাইবার উপক্রম করিয়াছে, [illegible]ন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে উদ্ধার [illegible]ন ছুটিয়া একেবারে পথে বাহির হইয়া [illegible]ী নবীনকে ডাকিয়া বলিল জেঠামশায় [illegible]টু দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে [illegible]বো।

নবীন গাড়ীর ছইএর ভিতর হইতে [illegible] বাহির করিয়া দেখিল একটি কোমল-[illegible]-মূর্ত্তি তরুণী তাকে জেঠামশায় বলিয়া [illegible]াধন করিতেছে। সে ত কখনো [illegible]ীকে চোখে দেখে নাই, কখনো ত [illegible]র কথা শুনে নাই, কিন্তু সে অন্তরের অনুভবে জানিল এই লক্ষ্মী। সে গলা বাড়াইয়া ব্যাকুল ব্যগ্রতার সহিত বলিল—মা-লক্ষ্মী, তুমি এ লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে কোথায় যাবে মা?

লক্ষ্মী গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল—আমি যাবো জেঠামশায়, আমি না থাকলে আপনাকে দেখবে কে, আপনার কষ্ট হবে যে!

দয়াল কুণ্ডুর যেন মাথা কাটা গেল, সে তাড়াতাড়ি বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে গিয়া লুকাইল।

তারিণী হাসিয়া গোপেশকে বলিল—আজ নন্দীমশায়ের ঘড়ীতে বড় জোরে একটা বেজেছিল হে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্ম

[illegible]ক্তমায়ের ভৃত্য মোরা নিত্য খাটি নিত্য খাই,
[illegible]ক বাহু শক্ত চরণ চিত্তে সাহস সর্ব্বদাই;
[illegible]দ্র হউক তুচ্ছ হউক, সর্ব্বসরম-শঙ্কাহীন—
[illegible]র্ম্ম মোদের ধর্ম্ম বলি' কর্ম্ম করি রাত্রিদিন।

[illegible]দ্ধপুরুষ নিস্ব মোদের বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
[illegible]র্ম্ম মোদের রক্ষা করে অর্ঘ্য সঁপি কর্ম্মে তাই;
[illegible]ধ্য যেমন শক্তি যেমন তেম্‌নি অটল চেষ্টাতে
[illegible]খে সুখে হাস্যমুখে কর্ম্ম করি নিষ্ঠাতে।

[illegible]র্ম্মে ক্ষুধায় অন্ন যোগায় কর্ম্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই,
[illegible]র্ভাবনায় শান্তি আনে নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই;
[illegible]চ্ছ পরচর্চ্চাগ্লানি মন্দ ভালো কোন্‌টা কে—
[illegible]ন্দা হ'তে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বীমাতার পুত্র মোরা মৃত্তিকা তাঁর শয্যা তাই,
শস্পেতৃণে বাসটি ছাওয়া দীপ্তি হাওয়া ভগ্নী ভাই;
তৃপ্ত তাঁরি শস্যেজলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ,
মুক্ত মাঠে যুক্ত করে বন্দি তাঁরেই প্রত্যহ।

পক্ষীপ্রাণী নিত্য জানি,শ্রম বিনা কার খাদ্য হয়,
সুদ্ধ মানুষ ভিন্ন—সে কি বিশ্ববিধির বাধ্য নয়!
চেষ্টা ছাড়া অন্ন যে খায় অন্তে তারে বল্‌বে কি,
ভিক্ষুকেরও ঘৃণ্য তারে গণ্য করা চল্‌বে কি?

ক্ষুদ্র নহি তুচ্ছ নহি ব্যর্থ মোরা নই কভু—
অর্থ মোদের দাস্য করে অর্থ মোদের নয় প্রভু;
স্বর্ণ বল' রৌপ্য বল' বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান।

কীর্ত্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ রয় মুদ্রিত,
শূন্য পরে নিত্য হের স্তোত্র মোদের উদ্গীত ;
সিন্ধুবারি পণ্য বহি' ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্র প্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

বিশ্ব যুড়ি' সৃষ্টি মোদের হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্ব্বঘটে কোন্‌খানে তা দৃশ্য নয়?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্ম,সে যে ধর্ম্ম মোদের—কর্ম্ম চাহি কর্ম্ম চাই।

ঠাট্টা করুক ব্যঙ্গ করুক লক্ষ্মীপেঁচার বাচ্ছারা—
পার্ব্বেনাক করতে মোদের কর্ম্মদেবীর কাছছাড়া
শান্তিভরা দৃষ্টি যে তাঁর জ্বল্‌ছে মোদের অন্তরে,
শঙ্কাসরম ডঙ্কা মেরে তুচ্ছ করি মন্তরে।

মাতৃভূমি! পিতৃপুরুষ! কর্ম্মে যেন দীক্ষা হয়!
রুদ্ররবে গর্জ্জি' বল' ভিক্ষা নহে—ভিক্ষা নয়!
হস্ত যখন অঙ্গে আছে সঙ্গে আছেন শক্তিময়,
কর্ম্ম ছাড়া অন্য কারে করব মোরা ভক্তিভয়?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

রূপ-রেখা

যেদিকে যেতে হবে, রেলের লাইন ঠিক সেই-মুখে না হয়ে, যদি উল্টো-মুখে পাতা হয়, তবে গন্তব্য স্থানটি রইলো একদিকে, আমরা রইলেম একদিকে। তেমনি সব জিনিষকে বোঝবার একটা একটা পথ; সেই পথ না ধরে, অন্য পথ ধরে যদি আমরা সেটাকে বুঝতে চলি, তবে কেবল পথ-চলাটা ছাড়া আর-কিছু আমাদের লাভ হয় না।

আর্টের জিনিষগুলোকে বুঝতে হলে, artistic training এবং artistic feeling —এই দুই সোজা লাইন ছাড়া আমাদের মনোরথ অনন্যগতি।

আর্ট যদি জ্যামিতির সমস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা, কিম্বা দেহতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রভৃতির মতন একটা-কিছু হতো, তবে আর্ট বুঝতে যেতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর-করা ছাড়-পত্রখানি, রেলওয়ে পাসের মতন, আর্টের প্ল্যাটফর্ম্মটিকেও আমাদের পক্ষে সুগম করে দিতো। কিন্তু সেটি তো হবার যো নেই! বাণীর বীণাটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, বিশ্বের সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করতে গেলে দ্বারী আমাদের পথ আটকাবে! বিশ্বকর্ম্মার দিক থেকেও ঠিক ওই কথা;—শিল্পজ্ঞান এবং রসবোধ এ-দুটোর একটা তোমার থাকা চাই।

কলেজের বেঞ্চি এবং বাসার তক্তা-পোষ এ দুটোর মাঝে যে-জগৎটা রূপের ছন্দে বিচিত্র, সুরের আঘাতে মুখর, সেই-খানটিতে আমাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির পথ খুলে রাখা চাই। আমাদের মধ্যেকার সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ, সুর-বোধটি নিয়ে, সৌন্দর্য্যের নব-নব-চ্ছবি, সুরের নতুন-নতুন লহরী, যেখানে নিয়ত আমাদের চোখে পড়ে, সেই স্কুল-ঘরের বাইরেটাতেই মাঝে মাঝে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমরা সবই করি, কেবল

সেইটই করি না,—যেগুলোর দ্বারায় আমাদের শিল্পবোধটিতে শান্ পড়ে।

লেখাপড়ার কাজ, আমাদের বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে একই জায়গায়—স্কুল মাষ্টারের চেয়ার, নয়তো অফিস চেয়ারেতেই —বসিয়ে রেখে দেয়। যদি ডিবেটিং ক্লাব, এবং রাজনৈতিক সভা প্রভৃতি গুলোই হয় মনের কথা বলবার এবং হাঁফ-ছাড়বার স্থান, তবে যেখানে দিন, রাত্রি এবং ষড়ঋতুর রসের ছন্দে ছাঁদ মিলিয়ে শিল্পী গড়ছে এবং লিখছে সেদিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে?

রসবোধ করবার শক্তিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে। আঙুলের সামান্য স্পর্শে কেঁপে উঠে বাজবার শক্তি বীণার তারের মধ্যেই রয়েছে। একমাত্র শিথিলতাই হয় বাজার অন্তরায়। বিশ্বের যে বীণা-ঝঙ্কার আলো হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে, ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, রং হয়ে ঋতু থেকে ঋতুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, দিনরাত্রি কোথাও যার বিরাম নেই, তারি সঙ্গে নিজেই সুর হয়ে মেলবার ক্ষমতা ও চেষ্টা, বিধাতা শুধু আর্টিষ্টদেরই দিয়ে পাঠাননি। অণুপরমাণুর মধ্যে বাইরের থেকে তরঙ্গের অভিঘাত পেয়ে জেগে ওঠবার যে শক্তি, কানের এবং চোখের—শব্দের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে, এক-সুরে মেলবার যে শক্তি, সেই শক্তি আর-একভাবে আমাদের সকলের মনকে সৃষ্টির সুরে সুর মেলাবার জন্যে রয়েছে। আর্টিষ্টের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি মাত্র; এ ছাড়া আর্টিষ্ট আর সাধারণ-মানুষে তফাৎ কোন্ খানে?

এটা আমরা দেখেছি—নিজের নিজের পরিবারে যে-বিষয়ে অধিক চর্চ্চা চলে, সেই-খানে দেখতে-দেখতে অনেকগুলি ছেলে সেই সেই বিষয়ে একটা স্বাভাবিক দক্ষতা পায়। অবশ্য যেখানে গানের চর্চ্চা, সেখানে সবাই কালোয়াৎ হয়ে ওঠে না, কিন্তু সুরবোধ, তাল-মান-জ্ঞান, এবং গানের ভালোমন্দ-বিচারের একটা সহজ-শক্তি তারা লাভ করেই। তবেই দেখা যাচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে শিল্পবোধরূপ-শক্তি চর্চ্চার অভাবে অনেক সময়ে ফুটতে পায় না; সে-শক্তিটা যে আমাদের মধ্যে নেই, তা নয়।

আমাদের দেশে, ছাত্র-অবস্থা থেকে শিক্ষাটা যে-পথে চলে আসে, সেটা আমাদের শিল্পবুদ্ধি উদ্রেক করবার অনুকূল কিনা, সেটা তর্কের বিষয় হলেও, এখানে আমি সে প্রশ্ন করবো না। শিল্পীর কোন্ পথ, সেইটে নির্দ্দেশ করতে পারলেই, শিল্পকে বোঝাবার পথও আমরা পাবো।

যেমন আমাদের কাছে বহির্জগৎ রয়েছে, তেমনি অন্তর্জগৎও রয়েছে। বহির্জগতের দেখা কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের দেখা। সেখানে সাধারণ-মানুষও যা দেখছে, শিল্পীও তাই দেখছে;—কতকগুলো আকার, কতক-গুলো বর্ণ, কতকগুলো ভঙ্গী। আর অন্তর্জগৎ—সেখানে এক মানুষের দেখার সঙ্গে আর-এক মানুষের দেখার পার্থক্য রয়েছে; সেখানে শিল্পীর দেখার সঙ্গে সাধারণের দেখার মিল হচ্ছে না।

শিল্পী যেখানে দেখছেন মেঘাচ্ছন্ন সকালের

আকাশ,—যেন জলভারে অবনত চোখের পাতাটির মতো! সাধারণ দেখছে সেখানে একটা বাদলার দিন—অফিস লেটের উপক্রম; কিম্বা কলেজের ছেলে দেখছে স্কুল বন্ধের সুযোগ!

এইখানে শিল্পীর কাজ বুঝতে হলে সাধারণ-ধারণাটি নিয়ে গেলে তো চলবেনা। বড় শিল্পী যে হয়, সে কাজের কৌশলে তোমার মনটিকে ঠিক সেইখানটিতে নিয়ে উপস্থিত করে, যেখানটিতে যাওয়া তোমার-আমার সাধ্য হয়নি;—যেন আর-একটা লোকে উপনীত হয়ে মন আমাদের দ্বিজত্ব লাভ করে। সাধারণ-ধারণাটুকু ছাড়া যার পক্ষে আর-কিছু সম্ভব নয় তার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্।

শিল্পী মনোরাজ্যের চাবি-কাঠিটি নিয়ে এসেছেন এটা মেনে, সেইদিক দিয়ে শিল্পকে যদি আমরা বুঝতে চলি, তবে মন-বস্তুটা ঝাপ্‌সা ঠেকলেও, শিল্পীর মানসমূর্ত্তিগুলো আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

শিল্পী যখন বস্তুটির সাধারণ-রূপটাই দিচ্ছেন, যেমন কোনো প্রাণীবিশেষের চেহারা কিম্বা স্থানবিশেষের দৃশ্য, তখন আমাদের সাধারণ-বুদ্ধি সহজেই তার দোষ-গুণ ধরতে অপারগ হয় না। কিন্তু যেখানে ভাব এসে শিল্পীর কাজে যোগ দিয়েছে, সেইখানে সাধারণভাবে তার বিচার অসম্ভব।

আমাদের দেশের,—বল্‌তে গেলে সমস্ত প্রাচ্য জগতের—শিল্প হচ্ছে ভাবাত্মক। ভাবের খাতিরে সেখানে স্বভাবের অভাব, বহুল পরিমাণে শিল্পীরা নিজেদের কাজের মধ্যে ঘটিয়েছেন এবং সেটুকু স্বীকার করে নিয়েই প্রাচ্য শিল্পকে দেখতে হবে।

ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, সমভঙ্গ—এমনি সব যে ভঙ্গী—সাধারণ-মানুষ তেমন ভঙ্গীতে শরীরটাকে বাঁকাতে-চোরাতে গেলে হাড়-গোড়-ভাঙ্গা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু শিল্পীর হাতে এইসব ভঙ্গী নিয়ে তাঁর মানস-মূর্ত্তিগুলি সুন্দর হয়ে উঠেছে, এটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

মাদ্রাজের নটরাজ মূর্ত্তি। এটার মধ্যে সাধারণ হাত-পায়ের গড়ন অনেকটা বজায় রাখা হয়েছে। এর কারণ এখানে শিল্পীকে ভাবের একটি মৃদু-ছন্দের অবতারণা করতে হয়েছে। ভাব-তরঙ্গকে এখানে সজোরে দেহকে উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ করতে দিলে, ভাবের ব্যাঘাত ছাড়া পরিস্ফুরণ হয় না। আমি যখন প্রথম এ মূর্ত্তিটি দেখি, তখন এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেনি, বরং এই মূর্ত্তির মধ্যে যে দেহগঠনসম্বন্ধে বাস্তবিকতা ও সাধারণ-পরিমাণ, সেটা দেখে এটার সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা মোটেই হয়নি, কিন্তু আমি এটাকে বোঝবার চেষ্টাও পরিত্যাগ কল্লেম না। দিনের পর দিন,—শেষে একদিন এ মূর্ত্তিটির মধ্যে শিল্পীর যে অভিপ্রায়টি রয়েছে সেটা আমার কাছে ব্যক্ত হ'ল।

প্রথম, এ যে সামান্য নট নয়, কিন্তু নটরাজ—সেই কথা শিল্পী স্পষ্ট করে বলে দিলেন সহজ মানুষের চেয়ে দুখানি হাত বেশি দিয়েও বটে, নাচের ভঙ্গীটির একটি অপূর্ব্ব সুষমা, প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে

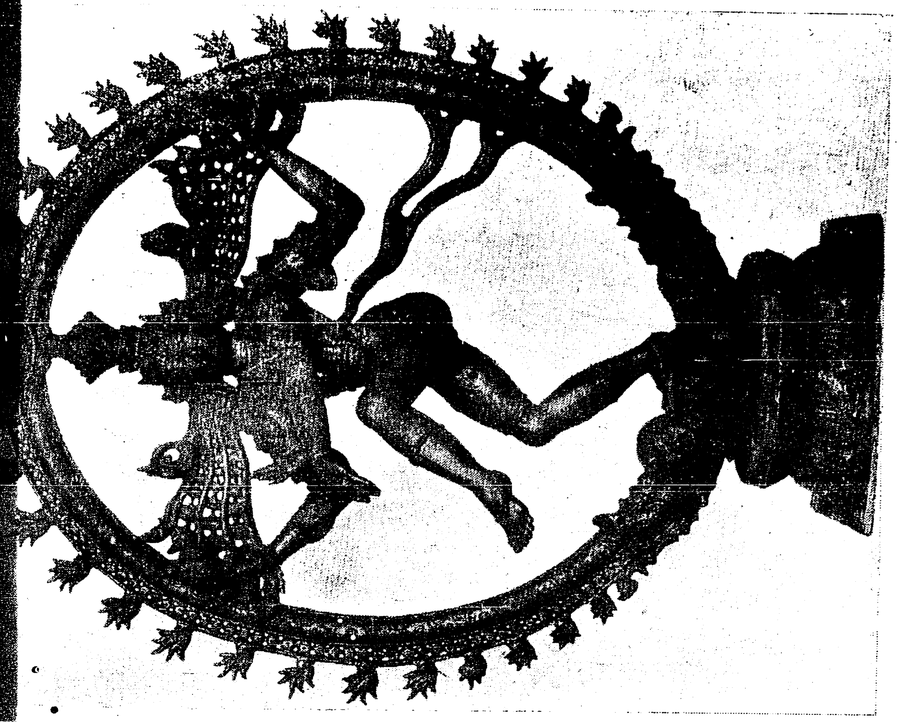

নটরাজ

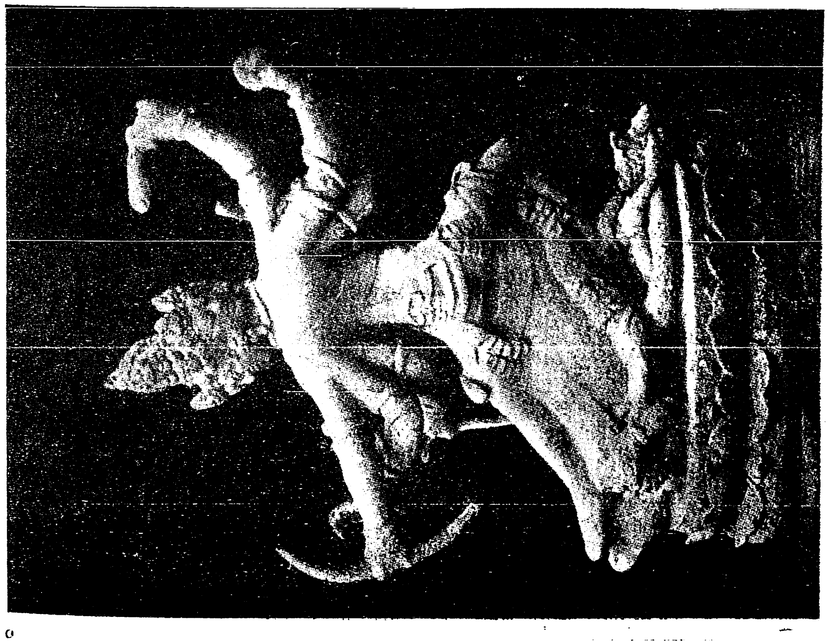

ধর্ম্মপাল

প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়েও বটে। পুরাণের অন্ধকাসুর-বধের উপাখ্যানটি যে মূর্ত্তি বা কল্পনার গোড়া, সেটা বুঝতে তাণ্ডব-মূর্ত্তির পায়ের তলার অসুর, এক-হাতের ডমরু, জটার চন্দ্রকলা, গলার সাপই যথেষ্ট ছিল। এ সত্ত্বেও শিল্পীর যা অভিপ্রায় —যেটার জন্যে এ মূর্ত্তিটা শিল্পজগতে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি—সেটা আমার কাছে অনেক-দিন ধরা দেয়নি। সাধারণ-চোখে দেখলে, মূর্ত্তিটা শিবের তাণ্ডব-নৃত্য—এইটুকু মাত্র প্রকাশ পাবে। কিন্তু একটু মনঃসংযোগ করে দেখলে আমরা দেখবো যে, মূর্ত্তিটা একেবারেই নাচ্চেনা;—গতির গতাগতি ওতে নেই বল্লেও চলে। যেন নাচের আনন্দ-উচ্ছ্বাস হঠাৎ এক-নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়েছে; দুই-হাতের তাল পড়বার জন্য উদ্যত—পড়বে এমন আভাষটি মাত্র; ডান-পাখানি পড়ে রয়েছে অসুরের উপরে সম্পূর্ণ লিপ্ত এবং স্থির;—ধ্বংসের পর একমুহূর্ত্তের জন্য সৃষ্টি-কার্য্য বন্ধ হয়েছে। হয় তো এখনি আরম্ভ হবে, কিম্বা হয় তো এই নটরাজের দক্ষিণহস্তের দ্বিতীয় তালটি পড়ার অপেক্ষায় যুগযুগান্তর কেটেও যেতে পারে!—শিল্পীর এই অভিপ্রায়টিই ঐ মূর্ত্তিতে ধরা রয়েছে। ভাব যেখানে স্তম্ভিত হয়েছে, সেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ও মান-পরিমাণের আতিশয্য যে মোটেই শোভনীয় হতে পারেনা, এই মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সেইটেই পরিষ্কার করে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল।

এরি পাশে আর এক সংহার-মূর্ত্তি।—এখানে শিল্পী মূর্ত্তিটিকে একটা অপ্রতিহত গতি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ঝড়ের বেগে মূর্ত্তিটা—যেন ক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিপুল তরঙ্গের মতো—একদিকে গড়িয়ে চলেছে! এখানে আর স্বাভাবিক দেহের গঠন-ভঙ্গী রাখা চলেনা। ভাব এ'কে টেনে নিয়ে চলেছে—যতটা পারে একদিকে। ঝোড়ো-বাতাস-ভরা পালকে যে ভঙ্গীটি দেয়, সজোরে-টানা ধনুক ঠিক যে বাঁকটি পায়—সেই বাঁকটি! সাধারণ-মানুষের দেহ কোনো দিন এমন বাঁকতে পারেনা। কিন্তু এটি বাদ দিলে তো চলে না; শিল্পীর অভিপ্রায় যে অস্ফুট থাকে! আট-হাতের এবং দুই-প্রসারিত-পায়ের রেখাগুলি মিলে একটা গতিশীল উত্তাল তরঙ্গের সৃজন করেছে। এই তরঙ্গ বহন করে আন্‌ছে পাপীর জন্য অষ্টবজ্র! দেবতার ক্রোধ এম্‌নি করেই আসে,—সর্ব্ব নাশের আঘাতে দিক্-বিদিক্ ধ্বসিয়ে দিয়ে। ঠিক এরি উপরে শান্তার করুণা-দৃষ্টি শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে, কতকগুলি মুখের ভঙ্গীতে, ফুটিয়ে তুলেছেন।

ধর্ম্মপালের এই মূর্ত্তির জন্য শিল্পীকে যে ফরমাস দিয়েছিল, তার মনে ছিল হয়তো ঠিক শাস্ত্র-মতো অষ্টভুজ ধর্ম্মপাল! শিল্পী ইচ্ছা করলে সেইটুকু মাত্র দিয়েই ক্রেতাকে বিদায় করতে পারতেন; কিন্তু না, এখানে আশার অতিরিক্ত দান করে তবে শিল্পী ক্ষান্ত হলেন। এ দান কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে দেওয়া নয়, এটা জগৎকে দেওয়া; এবং এরি জন্য বাস্তব জগতের সঠিক বর্ণনা না হলেও, এই সব ভাবাত্মক-শিল্পের মূল্য নেই বল্লেও চলে।

শিল্প যেখানে ভাবাত্মক নয় সেখানে

সে life-like; তার প্রমাণ পাচ্ছি কোনার্ক-মন্দিরে শিল্পী যে রাজ-হস্তীটি রচনা করেছেন সেটি দেখে। সেখানে হস্তীটির বিপুল অবয়ব, তার চেয়ে সুবিপুল গাম্ভীর্য্যটি;—শিল্পী যেন সজীব রাজ-হস্তীটি এনে সেখানে দাঁড় করিয়েছেন! এইখানে ভাবাত্মক-শিল্পের সঙ্গে, দেহের গঠন, মান-পরিমাণ নিয়ে, অনুকৃতি-শিল্পের মস্ত প্রভেদ।

এরি পাশে কোনার্ক-শিল্পের শ্রেষ্ঠরত্ন অরুণের অশ্বটি এনে দেখি। প্রথমেই চোখে পড়বে—ঘোড়ার দেহের অসাধারণ মান-পরিমাণ। এখানে ঘোড়ার অস্থিসংস্থান, মাংসপেশী প্রভৃতির দিকে শিল্পীর কোনো নজর নেই;—কেবল এটা যে ঘোড়া, হাতি নয় এইটুকুমাত্র! অ্যানাটমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এটাকে কাঠের ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই মনে হবেনা। কিন্তু ভাবের দিক থেকে শিল্পীর অভিপ্রায়টিকে ধরবার চেষ্টা কল্লেই দেখবো যে, এ সেই-ঘোড়া, যে সূর্য্যের আলোক-রথকে বহন করে আনে। এর মধ্যে, অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসবার যে তেজ এবং গতিবেগ, সেটি—ঘোড়ার পশ্চাতের পাদুখানি থেকে তার বাঁকা ঘাড় এবং সম্মুখের পাদুখানির তলা পর্য্যন্ত—রেখার একটিমাত্র তরঙ্গে শিল্পী দেখিয়ে দিয়েছেন। ঘোড়ার মধ্যে যে গতি, ঠিক সেই গতিই রয়েছে অরুণ-সারথিটিতেও। তার এক পদক্ষেপ থেকে আর-এক পদক্ষেপের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। দ্রুতগতিতে অন্ধ-কারকে অতিক্রম করে অরুণ, সূর্য্যের বিজয়-অশ্বটি বহন করে আনছে। অন্ধকারের উপরে আলোর জয়,—শিল্পীর এই অভিপ্রায়, আর-এক নটরাজের মতো মহান্ ভাবে, এই বাস্তবিক ঘোড়ার সঙ্গে অনেক তফাৎ অরুণাশ্বটির মধ্যে দিয়ে, আমরা পাচ্ছি।

ইংরাজীতে দুটি কথা আছে—presen-tation আর representation। ভাবাত্মক-শিল্পের মধ্যে জিনিষটাকে শিল্পী present কচ্ছেন—ভাবকে মূর্ত্তি দিয়ে শিল্পী আমাদের জন্য উপস্থিত কচ্ছেন। আর শিল্প যেখানে represent করা মাত্র, সেখানে শিল্পী তাঁর নিজস্ব কিছু দিচ্ছেন-না; যা দিচ্চেন সেটা ইতিহাসের ঘটনামাত্র, কিম্বা এমন কিছু ঘটনা যা আমাদের

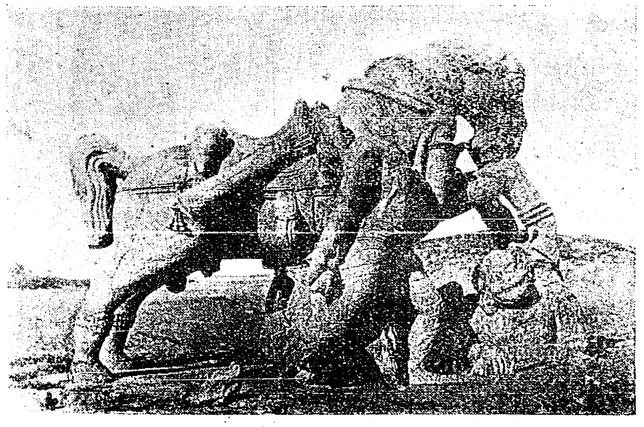

কোনার্কের অরুণাশ্ব

নিজের চোখের উপরেই রয়েছে দেখছি, তারি ছবিটি।

আদালতের মকদ্দমায়, ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে বোঝাবার বেলায় খুব বড় ব্যারিষ্টারের দরকার হয় না। কিন্তু কেস্‌টা কেমন করে present করা হবে যখন একথা ওঠে, তখন একজন এমন লোকের প্রয়োজন হয় যার ভাব্‌বার শক্তি, সাধারণ ঘটনাকে অতিক্রম করে একটা নতুন দিক দিয়ে কেস্‌টা দেখতে পারে।

এই যে ঘটনাকে অতিক্রম করে' একটা নতুন বড় দিক দেখবার শক্তি, সেইটেই হল শিল্পীর। এছাড়া রূপের অনুরূপ করা, বর্ণের মতো ঠিক বর্ণটি লেখা, এমন কি ঘটনাটার ঠিক-ঠিক ছাপ তুলে নেওয়াকে কৌশল, কারিগরি, চাতুরী প্রভৃতি শব্দকল্পদ্রুমে শিল্পের যে অর্থ দেওয়া আছে তাছাড়া আর কিছু বলা চলেনা।

এখন প্রশ্ন—বাস্তব রূপ ও তার ঠিক-ঠাক মান-পরিমাণের ব্যতিক্রম না করে শিল্পীর মনোভাব চিত্র করা যায় কি না? আমার মনে হয় যায়না। কেন, তা বলি। বস্তুরূপটি হল স্থির-পদার্থ—স্থিতিশীল; আর ভাব তরল—গতিশীল। ভাবের বদল হচ্ছে, উচ্ছ্বাস রয়েছে—নিবৃত্তি রয়েছে। না-চলাকে না-ভেঙে যেমন চলা ব্যক্ত করা অসম্ভব, তেমনি রূপকে না ভাংলে বা ভঙ্গী দিলে ভাবকে তার মধ্যে পোরা অসম্ভব। ভাবের গতি-অনুসারে কতটা ভাঙা, না-ভাঙা, সেটা শিল্পীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর কচ্ছে। সেখানে তাকে এতটা ভাঙো, অতটা নয়, —এ উপদেশ দিতে যাওয়াই ভুল। নটরাজ-মূর্ত্তিতে দেহের সাধারণ-গড়ন শিল্পী কমই ভেঙেছেন, কিন্তু ধর্ম্মপাল-মূর্ত্তিতে দেহ-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানকে ভেঙে তিনি চুরমার করেছেন। ভাব যে কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে শিল্পীর হাত থেকে, তারও ঠিকানা নেই;—সে মানুষ হয়েও দেখা দিতে পারে, ঘোড়া হয়েও আসতে তার বাধা নেই।

ভাবাত্মক-শিল্প—ভাবের গতি দেখানোই যার উদ্দেশ্য—তাতে শিল্পীকে রূপ-প্রকাশের জন্যে এমন-কিছু বেছে নিতে হয় যেটা গতি ও তরঙ্গ দুই ব্যক্ত করে।

পাহাড়ের নানা পাথর তার বস্তুরূপ। সব পাহাড়ই পাথরের স্তূপ, কিন্তু এক পাহাড়ের রূপের আসল বিভিন্নতাটি ধরা দেয়—পাহাড়ের শিখরে শিখরে যে নানাভাবের রেখাগুলি তরঙ্গিত রয়েছে তারি মধ্যে। এই রেখা-রূপ বা রূপ-রেখা-গুলি গতিশীল। এরি সাহায্যে আমরা দেখি কোনো পাহাড় বেগে আকাশ ছাড়িয়ে উঠতে চাচ্ছে, কোনোটা গড়িয়ে পড়ছে,—এমনি নানা ভাব! বস্তুরূপ স্তূপাকার হয়ে পাহাড় হয়েছে সত্য; কিন্তু ঐ অচল তাদের নিজের-নিজের ভাব প্রকাশ করছে এই সচল রেখাগুলি আকাশ-পথে টেনে দিয়ে।

পাহাড়ের কাঠামোটা পিরামিড্; মানুষের কাঠামো তেমনি কঙ্কাল। কঙ্কালের রেখা ও রূপ দুইই স্থির; তার ভাবও স্থির। সচল মানুষের মধ্যে সে আপনার স্থির ছাঁদ তার চেয়েও স্থির অট্টহাস নিয়ে বিরাজ করছে। এরি উপরে বিধাতা কেবল

কের রেখাটির একটু, চোখের টান্‌টির একটু, আঙুলের রেখার একটু কম-বেশ, —এমনি রেখাকে কোথাও একটু উঠিয়ে, কোথাও একটু গড়িয়ে, এখানে একটু টেনে, ওখানে একটু বাড়িয়ে, সেখানে একটু কমিয়ে রূপকে কি বিচিত্র-ভাবেই জগতে উপস্থিত করেছেন। রেখা! সচল সজীব রেখা ছাড়া, ভাবকে রূপ দেবার এমন জিনিষ শিল্পীর আর কোথা! রেখা চাই রূপকে বাঁধবার জন্য, রেখা

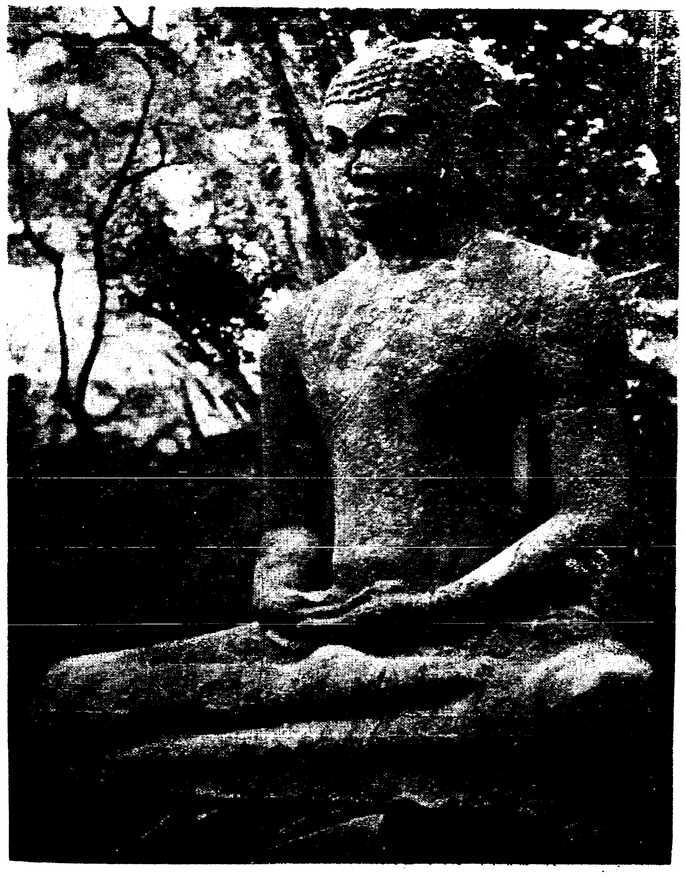

বুদ্ধমূর্ত্তি



সতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত

চাই ভাবকে গতি দেবার জন্য, রেখা চাই বর্ণের সঙ্গে রূপ, রূপের সঙ্গে ভাবকে জুড়ে দেবার জন্য।

রঙের ছন্দে ভাব দীপ্তি পায় মাত্র; কিন্তু রেখার ছন্দে সে রূপ পেয়ে—গতি পেয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। ভাবাত্মক-শিল্পমাত্রই রেখার শিল্প।

ইউরোপীয় শিল্প, বস্তুরূপ দিয়ে যীশুখৃষ্টে

মূর্ত্তি কোটাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পেরেছে কি? এ সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয়ান্‌ই কি বলছেন—

"Think of the curious fact that, after more than eighteen centuries of Christianity, our art has not yet created a single adequate image of its founder; whilst the Buddhist world soon incarnated its ideal Gautam in a form which left us no room for change."

ভাব-রূপকে গোচর করবার শক্তি কেবল-বস্তুর মধ্যে নেই, কিন্তু কেবল-রেখাতে আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিতে বাস্তবিকতা নেই বল্লেও চলে। বুদ্ধের এটি প্রতিকৃতি নয়। বুদ্ধত্বের ভাব-রূপ—চোখ-দুটির নত-রেখায়,



কৈকেয়ী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত

ঠোঁটদুটির আনন্দের একটু তরঙ্গিত টানে—এখানে সজীব হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশের খুব-এখনকার এই 'সতী'র চিত্র। রেখাগুলি ভাবে সজীব হয়ে এখানে দেখা দিচ্চে। এখানে রং দিচ্চে কেবল আগুনের দীপ্তি ও জ্বালা; কিন্তু তারি মধ্যে ভাবযুক্ত-রেখা, করপুটে নির্ভয়ে গভীর আনন্দের সঙ্গে আপনাকে দান করতে উদ্যত রয়েছে দেখছি।

আবার এই শিল্পীর লেখা 'কৈকেয়ী'। পায়ের কাছে সাড়ির পাড় থেকে, বাঁকা ভুরু-দুখানি পর্য্যন্ত,—রেখা এখানে সাপিনীর মতো তর্জ্জন করে উঠেছে, কুটিল বক্রগতিতে রেখাগুলো যেন আপনাকে-আপনি ক্রমাগত দংশন করে চলেছে! কৈকেয়ীর চেহারাটা চিত্রকর দেননি;—কৈকেয়ীর কুটিলতাকেই এখানে রেখা দিয়ে শিল্পী রূপ দিয়েছেন।

ভাবাত্মক-চিত্রে রং বল, আকৃতিই বা বল, ভাবের তারা সাজ। শিল্পী ইচ্ছা করলে যে সাজ পরিয়ে হোক্, ভাবকে উপস্থিত করতে পারেন; কিন্তু রেখা ভাবকে মূর্ত্তি দেয়, বহন করে;—তাকে সার্থক ক'রে তোলাতেই শিল্পীর ক্ষমতার পরিচয়।

অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী। বুদ্ধের জীবনের ঘটনা এখানে দেখানো হয়েছে। শুধু representation-হিসেবে এই চিত্রগুলি থেকে, সে সময়ের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রার খুঁটিনাটি-সরঞ্জামগুলিই যে আমাদের চোখে পড়ে তা নয়, প্রত্যেক মানুষটি সেখানে ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অজন্তা-শিল্পীদের রঙের ভাণ্ডার খুব কম,—লাল, নীল, হলুদ, কালো, সাদা। খু কম-দামের বিলিতি রঙের বাক্সয় যতগুলে রং থাকে, তার সিকিভাগও তাদে ছিল না। তাই নিয়েই তারা ভাবে ফুটিয়েছে। গুহাগুলির এমন স্থান নে যেখানে শিল্পীর ভাবনা, ফুলের মতে সৌন্দর্য্যে, সুষমায় ফুটে ওঠেনি। রে সেখানে অজন্তা-শিল্পীর একমাত্র নির্ভ হয়ে, কোথাও মৃণালদণ্ড, কোথাও শতদ পদ্ম, কোথাও কিন্নরী, কোথাও অপ্সরী কোথাও দেবতার আশীর্ব্বাদ, কোথাও- মানুষের দুইহাতে প্রেম ভক্তি, চোখে লা আলস্য,—এমনি বিচিত্র-ভাবে ক্রীড়া করছে

অজন্তার গুটিকতক হাতের ছবি মানুষের হাতের anatomical drawing এগুলো মোটেই নয়। শুধু রেখা—নানা ভাবে তরঙ্গিত রেখা; এতেই এগুলি সজী হয়েছে দেখি।

তার পর, অজন্তার সেই কুমার সিদ্ধার্থে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। একটিমাত্র ত্রিভঙ্গ-রেখা মূর্ত্তিটির পা থেকে কিরীট পর্য্যন্ত একটি বিষণ্ণতা যে ফুটে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে ঐ রেখার ছন্দ।

অজন্তার রেখা-শিল্পের আর-একটি অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি—'মা ও মেয়ের' চিত্র খানি। যে শিল্পী ছবিখানি লিখেছেন তাঁ নাম নেই ছবিটিতে। শিল্পে নামপ্রচা তখন আমাদের মতো এতটা অগ্রস হয়নি। এই ছবিখানি দেখে মনে হয় ন যে ছবি;—একটা যেন কথা, শিল্পীর প্রাণে মধ্যে থেকে এসে এই ছবিখানির রেখা গুলির তারে-তারে বেজে উঠেছে! ম



অজন্তার 'মা ও মেয়ে'

তার ছোট মেয়েটির হাত দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে এসেছে—ঘটনাটি এই; কিন্তু শিল্পীর হাতের টান শুধু ঘটনা হয়ে এখানে দেখা দিলে না;—এর বিস্মিত দুই-চোখের টানে, এর সমস্ত দেহটির উন্মুখ-রেখায়—ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যাবার ভঙ্গীতে—এর

হাত-দুখানির স্নেহকোমল রেখার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ছবিটা যেন এই কথা হয়ে দেখা দিয়েছে—

"ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী!
আরো যদি চাও,মোরে কিছু দাও,ফিরে আমি দিব তাই।"

সাধারণত ছবিকে হয় বাস্তব ঘটনার, নয় তো শিল্পীর মানস-কল্পনার ছবি (ছাপ) বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু এ ছাড়াও দেখছি শিল্পের উচ্চতম দিক রয়েছে। সেখানে ছবি, সে ছবি নয়,—সে কবির কথা!

এইখানে একটু গোল বাধবার সম্ভাবনা। ছবি যদি কথাই হল, তবে কথাটা স্পষ্ট করে, বড়-বড় অক্ষরে, সাইন্‌বোর্ডে লিখে দিলেই তো চলতো! এত রেখার টানটোন্, রং এবং সময়ের অপব্যয় করে একখানা ছবির অবতারণা করবার কি দরকার ছিল? কবির কাছ থেকে কথা তো পাচ্ছি, ছবিটা না হয় ছবি হোক্!

এটা আমরা কেমন করে বলি যে, ছবি যে লেখে, সে কেবল ছবি দেবারই চেষ্টা নিয়ে জগতে এসেছে;—কথা-বল্‌বার জন্যে কিম্বা কথা-শোনাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই তার থাকা সম্ভব নয়? কবিকে যেমন বলা যায় না—তুমি কেবল কথা দাও, কবিতায় ছবি দেওয়া তোমার কাজ নয়; তেমনি শিল্পীর উপরেও সে হুকুম চলে না। কবি ছন্দের মধ্যে কখনো কথাকে গাঁথেন, কখনো-বা ছবিকেও ফোটান। শিল্পীর দিক থেকেও সেই একই চেষ্টা,—কখনো কথা, কখনো ছবি, শুধু ছবি কখনই নয়—

"তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েচ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?"

কবি কথা দিয়ে কথা বলেন; আমাদের সঙ্গে শিল্পী কথা বলেন ছবি দিয়ে। কবি কথাতে লেখেন ছবি, শিল্পী ছবি দিয়ে লেখেন কথা। কেবল উপায়ের প্রভেদ।

তাই বলে' যে-সব রূপ-রেখা শিল্পীর অন্তরের কথা ব্যক্ত করে, তাদের চীনে ভাষার মূর্ত্তিমন্ত অক্ষর, কিম্বা তান্ত্রিকদের মন্ত্রচিহ্নগোছের একটা-কিছু বলা চলেনা।

জোয়ারের জল সরে গেলে বালির উপরে জলের রেখাগুলির ছবি পড়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে জলের পদক্ষেপের ইতিহাস ছাড়া, প্লাবনের রূপও নেই, জলের কথার কলধ্বনিও নেই! মানুষের পদক্ষেপের ছাপ দেখলে, মানুষটি কিম্বা তার কথা যেমন শোনা হল না, শিল্প যেখানে symbol মাত্র, সেখানে সে অঙ্কশাস্ত্র, অঙ্কনবিদ্যা নয়।

এই তর্কটার মীমাংসা আমাকে ছবি লিখে একবার করতে হয়েছে। "দেখিবারে আঁখী-পাখী ধায়।"—এই কথাটা শিল্পী যে-উপায়ে কথা বলে সেই-উপায়ে আমাকে বলতে হবে!

আঁখি-পাখীর সন্ধান করে বেড়ালেম; এজগতে তেমন পাখী মিল্লোনা। শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে চীনের অক্ষরের মতো খঞ্জন-নয়নটির দেখা পেলেম। যেমন দেখা অমনি তাকে ধরে' কাগজের দাঁড়ে বসানো! কিন্তু দেখলেম ওড়া তো দূরের কথা, সে নড়েও



আঁখি-পাখী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

না। যেখানে খঞ্জন-চোখ, তার সাম্‌নে পাখী উড়লোনা; এবং সে যে আঁখি-পাখী মেঠো রাস্তার মতো আঁকা-বাঁকা রাস্তা দেগে নয়,—মানুষ ও পাখীর আদিপুরুষের কেউ, দিলেম, এবং যার আঁখি তার সাম্‌নের এইটেই বার-বার প্রমাণ করতে লাগলো। চুল, এবং নাসাটিকেও অনেকটা পাখীর হতাশ হয়ে কাগজ থেকে পাখীটাকে রবার ঠোঁটের আকার দিয়ে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু ঘষে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায়,

চোখের তারা প্রায় মুছে গিয়ে, শিবনেত্রটি, আঁখি-পাখীকে মনের মধ্যেই যে ধরা সম্ভব সেটা, আমায় বলে দিলে। তখন আমি মনোজগৎ থেকে যে আঁখি-পাখী ধরে এনে বসালেম ছবিতে, সেইটেই যথার্থ কথা বল্‌তে, উড়্‌তে, চল্‌তে, কিছুমাত্র বিলম্ব কল্লেনা। ছবিটা এই—

একটি মেয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে উঁকি দিচ্ছে। উঁকি দিচ্ছে, শুধু এই এই কথাটি মাত্র বলতে হলে, জান্‌লার কাছে মুখটি নিয়ে গেলেই আমার ঝঞ্ঝট চুক্‌তো; কিন্তু উঁকি-দেওয়া যে ঘটনাটি তার ছবিতো আমি চাইনি, আমি চেয়েছি "দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়"—এই কথাটি ছবিকে বলাতে। ছবির ধ্বনি নেই যে সেটা সে উচ্চারণ করবে; কিন্তু রেখাক্ষর বর্ণমালার তো তার অভাব নেই! সে রঙের ভাষায় রেখার ছন্দে কথাটি পরিষ্কার উচ্চারণ কল্লে। শুধু তাই নয়, কবির কথায় ছবিটি আমাদের মনে কতকটা অস্ফুট ছিল, ছবিতে সুস্পষ্ট হল।

প্রথমেই দেয়াল উঠলো—খাঁচার ছোট দরজাটির মতো জালিবদ্ধ একটি ছোট জান্‌লা নিয়ে। এরি মধ্যে খাঁচার পাখীটির মতো, দুই পায়ে নূপুরের বেড়ি-পরা মেয়েটি। খাঁচার পাখী সারাদিন বসে যেমন তার পালকগুলি ধোয়-মোছে, এখানেও মেয়েটি ছোট ঘটে একটুখানি জল, একটি রঙিন কাপড় নিয়ে, সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছিল —আপনারি অঙ্গরাগে। উদ্গমেই ছবির এতখানি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার পরে বাইরের সুর আলো হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে কি, মেয়েটির পা থেকে মাথা—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখা—সচকিত, সজীব, মুখর হয়ে, পাথর ভেঙে, জান্‌লার জাল ঠেলে, বেরিয়ে যাবার জন্য ঝটাপটি করছে; ঐ সুরে তার সমস্ত অঙ্গ, অলঙ্কারের সব বন্ধন কেঁপে-কেঁপে সোনার ডানা মেলে দিয়েছে —আলোয় ঝিক্‌মিক্। এই যে রেখা ও রঙের উচ্ছ্বাস-কম্পন, এরি মধ্যে দিয়ে ছবির কথা, কবির কথার মতো, আমাদের কাছে এসে উচ্চারিত হচ্ছে। কবির কথাটি আসছে তাঁর হাতের লেখার আকারে, কিম্বা কণ্ঠস্বরের মূর্ত্তিতে; আর শিল্পীর কাছ থেকে আসছে তাঁর কথা, তাঁরই হাতের লেখা ছবির আকারে, রঙের সুরে ও রেখার ছন্দে জীবন্ত হয়ে। এই মাত্র প্রভেদ—কবিতায় ও ছবিতে।

এই রূপরেখা, শিল্পীর হাতে, ভাবকে ধরার ফাঁদ। এই রেখার ছাঁদ, ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবি হয়ে দেখা দেয়,—কথা হয়েও উপস্থিত হয়। চোখে যেমন রূপ দেখা যায়, প্রাণেও তার কথার সুর তেমনি স্পষ্ট হয়েই বাজে। শুধু রেখা বলতে আমরা যা বুঝি এ তা নয়। শুধু যে লাইন, সে outline মাত্র; সে প্রাচীরের মতো সীমানা নির্দ্দেশ করে। চীনের দেয়ালের মতো, কিম্বা খাতার দুই ছত্রের মধ্যে দপ্তরীর টানা রুল্‌টির মতো, সে সরু-মোটা সব-অবস্থাতেই কঠিন এবং জড়। কিন্তু রূপ-রেখা—সে পাকা ফলের গায়ে, ফোটা ফুলের পাপ্‌ড়িতে, নদীর তরঙ্গে, মেঘের কিনারায় লেগে থাকে। এই রূপ-রেখার সাধনাই হয়েছে প্রাচ্য শিল্পীদের সাধনা। রূপ-রেখার মধ্যে রূপও আছে, রংও আছে;

রংও আছে,—এই কথাটা প্রাচ্যশিল্প, রেখায়-রেখায় জীবন্ত প্রতিমাগুলির মধ্যে দিয়ে, জগৎকে জানিয়েছেন।

এই রূপ-রেখা আমাদের কাছে যে কতটা তা সাধারণকে বোঝানো অসাধ্য। বাড়ির চাকার গায়ে যে সরু সুতোটা কালো রং দিয়ে টানা থাকে, তাতে দেখবার বাহাদুরী থাকা ছাড়া আর কি আছে? সেটা না-থাকলে হয় তো চাকাখানা দেখায় না ভালো, কিন্তু তার জন্যে চাকার চলার কোনো ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু চাকার চারিদিকের রেখা? কিম্বা কাকে ধরে রাখে যে দণ্ডটি? এই একটি



সুন্দর মূর্ত্তি

গতিশীল, আর-একটি রুলের মত সরল,—এই দুই রেখা যদি যে শিল্পী নয় সে টানে তবে চাকার গোলাকার, এবং দণ্ডের লম্বটি দেখতে ঠিক থাকলেও গাড়ি হয় চলবেনা, নয় তো খুঁড়িয়ে চলবে। চাকার দু-চারখানা কাটি কমও দেওয়া যায়, বেশিও করা চলে—যেমন মূর্ত্তিতে দুখানা হাত বেশি-কমে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু চাকার রেখাকে, এবং শিল্পের রূপ-রেখাকে প্রাধান্য দিতেই হবে—যদি শিল্পী কথা চালাতে চান।

এই যে "সুন্দর-মূর্ত্তি"; এতে রং নেই, সবই রূপরেখা। রূপরেখা—সে মূর্ত্তির ডান পাখানিতে শক্ত হয়ে, মাটিতে শিকড় গেড়েছে—গতির লেশমাত্র সেখানে নেই। বাঁ-পাখানি এগিয়েছে, রেখা সেখানে দুলেছে, একটু তরঙ্গ তুলেছে। তারপর ডান-হাত, সেখানে রেখায় পিছন থেকে টান পড়েছে; হাতে মুঠোর রেখাগুলি যেন শক্ত করে কিছু আঁকড়ে রয়েছে;—কেবল দুটি আঙুলের মাঝে একটু ফাঁক, রেখা সেখানে দৃঢ়তাকে শিথিল করেছে—দুই আঙুলের ডগার কোমলতায়। বাঁ-হাতের রেখা সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে —যেন কাকে স্পর্শ করবার জন্যে! সব-উপরে চোখের রেখা-দুটি। তারা নেই, কিন্তু তবু দেখছি চোখ দেখছে—নির্নিমেষ হয়ে! "সুন্দর-মূর্ত্তি"র বাস্তব-দেহটা কেমন ছিল কেউ দেখেনি; এবং এটা তাও নয়, কেননা এই মূর্ত্তি অন্যরকমও দেখেছি। এটি হচ্ছে

একটি ভাবের রূপ। "সুন্দর-মূর্ত্তি"র সমস্ত জীবন-কাহিনীর সার মর্ম্ম এটি—

ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান, সুন্দর-মূর্ত্তি, শাপভ্রষ্ট শিবানুচর, বিবাহের রাত্রে তরুণ বর! এইটুকু ঘটনা—মাথার চন্দ্রকলা, গলার রত্নমালা—এমনি গোটাকতক চিহ্ন (symbol) দিয়ে সহজে প্রকাশ হল। এর পর ভাবের খেলা। বিবাহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে ভুলে রয়েছেন সুন্দর; হৃদয়ের স্বামীকে পূজার অঞ্জলি দেবার জন্যেই যে করপুট, সেই চলেছে সংসারের সুখ-সৌভাগ্য দুই হাতে গ্রহণ করতে—বহন করতে। ঠিক সেই সময় সুন্দরের দেবতা তাঁকে দেখা দিয়েছেন;—দেবতা তাঁর পলাতক দাসকে সংসারের মধ্যে থেকে ফিরে নিতে এসেছেন! এখানে আর সুন্দরমূর্ত্তিকে বাস্তবের মধ্যে কিম্বা symbolএর মধ্যে রাখা গেলনা। নানাদিক থেকে নানাভাবের রেখায় টান পড়লো। ডান-হাতের কাছে সংসারের প্রাণপণ টান; পায়ের রেখা চলেও-চলেনা; হাতেরও মুঠোর রেখাগুলি—সঙ্গী-সঙ্গিনীর হাত, সংসারের দখল—ছেড়েও-ছাড়তে চায়না। সামনে নতুন করে ফিরে-পাওয়া চিরদিনের তৃষাতুর দেহমন সসম্ভ্রমে এগিয়ে চলেছে; নির্নিমেষ দৃষ্টিটি দেবতার দিকে স্থির। রেখা রূপে-রূপে সুন্দরকে সৌন্দর্য্যে স্নান করিয়ে দিয়েছে! শিল্পীর ধ্বনি-হীন রেখার ভাষা এখানে বীণার সুরের চেয়ে কম ঝঙ্কার তুলছেনা; কিন্তু কোনোদিন কানে তা পৌঁছয় না, প্রাণেও তা বাজেনা,—প্রাণ এবং কান দুটোই শিল্পচর্চ্চা থেকে দূরে রাখলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা,
ঘরে আধা বাইরে আধা
এবার ভাসাই সন্ধ্যা-হাওয়ায় আপনারে।

কাট্‌ল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামারে মন,
নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

II সা—া—ঋা। গঙ্মা—গমা— পঙ্মা। পা —া —া। —া —া পঙ্মা II
অ ০ ০ শ্রু ০ ন দীর ০ ০ ০ ০ সু

পা —া —না। ধপা —া —ঙ্মা। গা —া —া। —া —া —া II ঋগা —া —ঙ্মা।
দূ ০ র্ পা ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ঘাট ০ ০

গঙ্মা —পা পঙ্মা। গা —া —ঋা। —সা —া সা II সা —ঋা —া। ঋা —া —া।
দে ০ খা যায় ০ ০ ০ ০ তো মার ০ ০ দ্বা ০ ০

সা —া —া। —া —া —া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

I ঋপা —া —া। ঋপা —া গা। পা —া —া। —া —া —া I ঋপা —া —া।
নি ০ ০ জের ০ হা তে ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ০

ঋপা —ঙ্মা পা। ধা —া —া। —া —া —া I পধা —া —া। ধা —পা ধা।
জে ০ বাঁ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ঘ ০ ০ রে ০ আ

I না —া —া। —া —া —া I নর্সা —া র্গা। র্গর্রা —া না। র্সা —া —া।
ধা ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ ই রে ০ আ ধা ০ ০

I —া —া —া I র্সা —া —র্গা। র্গর্রা —া না। র্নর্সা —া —া। —া —া —া I
০ ০ ০ এ ০ ০ বার ০ ভা সাই ০ ০ ০ ০ ০

I র্সনা —া —র্রা। র্নর্সা —া না। ধনা —া —ধা। —পা —া —া I
স ০ ০ ন্ধ্যা ০ হাও য়ায় ০ ০ ০ ০ ০

I ঋপা —া —া। পা —ঙ্মা পা। পদা —া —া। —ঙ্মা —া —া II
আ ০ ০ প ০ না রে ০ ০ ০ ০ ০

II রগা —া —া। রগা —া রা। সা —া —া। —া —া —গা I রগা —া —া।
কাট্ ০ ০ ল ০ বে লা ০ ০ ০ ০ ০ হা ০ ০

I রগা —া রা। সা —া —া। —া —া —া I গা —া —পা। পা —ঙ্মা পা।
টের ০ দি নে ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ কের ০ ক

একটি ভাবের রূপ। "সুন্দর-মূর্ত্তি"র সমস্ত জীবন-কাহিনীর সার মর্ম্ম এটি—

ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান, সুন্দর-মূর্ত্তি, শাপভ্রষ্ট শিবানুচর, বিবাহের রাত্রে তরুণ বর! এইটুকু ঘটনা—মাথার চন্দ্রকলা, গলার রত্নমালা—এমনি গোটাকতক চিহ্ন (symbol) দিয়ে সহজে প্রকাশ হল। এর পর ভাবের খেলা। বিবাহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে ভুলে রয়েছেন সুন্দর; হৃদয়ের স্বামীকে পূজার অঞ্জলি দেবার জন্যেই যে করপুট, সেই চলেছে সংসারের সুখ-সৌভাগ্য দুই হাতে গ্রহণ করতে--বহন করতে। ঠিক সেই সময় সুন্দরের দেবতা তাঁকে দেখা দিয়েছেন;—দেবতা তাঁর পলাতক দাসকে সংসারের মধ্যে থেকে ফিরে নিতে এসেছেন! এখানে আর সুন্দরমূর্ত্তিকে বাস্তবের মধ্যে কিম্বা symbolএর মধ্যে রাখা গেলনা। নানাদিক থেকে নানাভাবের রেখায় টান পড়লো। ডান-হাতের কাছে সংসারের প্রাণপণ টান; পায়ের রেখা চলেও-চলেনা; হাতেরও মুঠোর রেখাগুলি—সঙ্গী-সঙ্গিনীর হাত, সংসারের দখল—ছেড়েও-ছাড়তে চায়না। সামনে নতুন করে ফিরে-পাওয়া চিরদিনের তৃষাতুর দেহমন সসম্ভ্রমে এগিয়ে চলেছে; নির্নিমেষ দৃষ্টিটি দেবতার দিকে স্থির। রেখা রূপে-রূপে সুন্দরকে সৌন্দর্য্যে স্নান করিয়ে দিয়েছে! শিল্পীর ধ্বনি-হীন রেখার ভাষা এখানে বীণার সুরের চেয়ে কম ঝঙ্কার তুলছেনা; কিন্তু কোনোদিন কানে তা পৌঁছয় না, প্রাণেও তা বাজেনা,—প্রাণ এবং কান দুটোই শিল্পচর্চ্চা থেকে দূরে রাখলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা,
ঘরে আধা বাইরে আধা
এবার ভাসাই সন্ধ্যা-হাওয়ায় আপনারে।

কাট্‌ল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামারে মন,
নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

II সা—া—ঋা। গঋা–গমা– পঋা। পা –া –া। –া –া পঋা II
অ ০ ০ শ্রু ০ ন দীর ০ ০ ০ ০ সু

পা –া –না। ধপা –া –ঋা। গা –া –া। –া –া –া II ঋগা –া –ঋা।
দূ ০ র্ পা ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ঘাট ০ ০

গঋা –পা পঋা। গা –া –ঋা। –সা –া সা II সা –ঋা –া। ঋা –া –া।
দে ০ খা যায় ০ ০ ০ ০ তো মার ০ ০ দ্বা ০ ০

সা –া –া। –া –া –া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

I ঋপা –া –া। ঋপা –া গা। পা –া –া। –া –া –া I ঋপা –া –া।
নি ০ ০ জের ০ হা তে ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ০

ঋপা –ঋা পা। ধা –া –া। –া –া –া I পধা –া –া। ধা –পা ধা।
জে ০ বাঁ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ঘ ০ ০ রে ০ আ

I না –া –া। –া –া –া I নর্সা –া র্গা। র্গর্রা –া না। র্সা –া –া।
ধা ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ ই রে ০ আ ধা ০ ০

I –া –া –া I র্সা –া –র্গা। র্গর্রা –া না। র্রর্সা –া –া। –া –া –া I
০ ০ ০ এ ০ ০ বার ০ ভা সাই ০ ০ ০ ০ ০

I র্সনা –া –র্রা। র্রর্সা –া না। ধনা –া –ধা। –পা –া –া I
স ০ ০ ন্ধ্যা ০ হাও য়ায় ০ ০ ০ ০ ০

I ঋপা –া –া। পা –ঋা পা। পদা –া –া। –ঋা –া –া II
আ ০ ০ প ০ না রে ০ ০ ০ ০ ০

II রগা –া –া। রগা –া রা। সা –া –া। –া –া –গা I রগা –া –া।
কাট্ ০ ০ ল ০ বে লা ০ ০ ০ ০ ০ হা ০ ০

I রগা –া রা। সা –া –া। –া –া –া I গা –া –পা। পা –ঋা পা।
টের ০ দি নে ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ কের ০ ক

খপা –া –ক্ষা। –গা –া –া I গা –া –ক্ষা। গক্ষা –পা –ক্ষা। গা –া –া। –া –া –া I
থাব ০ ০ ০ ০ ০ বো ০ ০ ঝা ০ কি নে ০ ০ ০ ০ ০

I গপা –া –া। ক্ষপা –া গা। পা –া –া। –া –া –া II ক্ষপা –া –া
ক ০ ০ থার ০ সে ভার ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০

পা –ক্ষা পা। ধা –া –া। –া –া –া I পধা –া –া। ধা –পা ধা।
মা ০ রে মন ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ ০ রব ০ হ

না –া –া। –া –া –া I নর্সা –া –র্গা। র্গর্রা –া –না। র্রর্সা –া –া। –া –া –া I
য়ে ০ ০ ০ ০ ০ শোন্ ০ ০ দে ০ খি শোন্ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা –া –র্গা। র্গর্রা –া না। র্রর্সা –া –া। –া –া –া I র্সনা –া –র্রা।
পা ০ ০ রের ০ হাও যায় ০ ০ ০ ০ ০ গান ০ ০

র্রর্সা –না নধা। ধনা –া –ধা। –পা –া –া I ক্ষপা –া –া। পা –ক্ষা পা।
বা ০ জে কোন্ ০ ০ ০ ০ ০ বী ০ ০ ণার ০ তা

পদা –া –া। –া –া –ক্ষা II II
রে ০ ০ ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাসী *

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-ছেলেদের সকালে আট্‌টার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়,—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলা সাগর সাঁতার দিয়া ইস্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগ্য বালকদের মা সরস্বতী খুদি

* জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরি হইতে নকল। তাঁর আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই, —নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন, ন্যাড়া।

হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান,—তাঁদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্র লোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয়না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই তুলিলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্র লোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই,—দু ক্রোশের মধ্যে এমন আরও দু তিন খানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে সুরু করিয়াছে, কার বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছের কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর পাড়ের খেজুর মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা —কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলেনা।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ। —এবং, আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মৎলব করি মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চির দিন দেখিয়া আসিয়াছি।—তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান আর তার মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ী;

আর ছিল এক জাতি খুড়া। খুড়ার একটা কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এম্‌নি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত; এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে সেই দিনই দেখিয়াছি মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারো সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল মাল-পাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো বাড়ীতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্ ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে—বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক্ খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া জিয়াইয়া-রাখা বাসি ফুলের মত! হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়া-চাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে!

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে ভাড়া?

বলিলাম—হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বোসো।

মেয়েটি ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই যে প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে। এবং যদিচ, এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলে মানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে, এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা কত শুশ্রূষা কত ধৈর্য্য কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ!

কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এই-বার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমাকে রেখে আস্‌ব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং, মনে যাই থাক্ প্রত্যুত্তরে শুধু একটা "না" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল,—বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য, এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

২০।২৫ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময়ই পাইলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল

একটী মৃত-কল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাত্রটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি,—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলেনা! পাড়ায় খবর দেওয়া চাই,—অনেক জিনিস জোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই যা হবার সেতো হইয়াছে, আর বাহিরে গিয়া কি হইবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক্ কাজ,—তুমি বোসো।

বলিলাম, বসিলে চলিবে না, একবার খবর দিতেই হইবে, বলিয়া পা বাড়াইবা মাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃত-দেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও স্ত্রীর সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানোও আমার উদ্দেশ্য নহে কিম্বা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিম্বা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া এক সঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধানই পায়না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয়

যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তা হোক্, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিম্বা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানিনা তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে, তাহার সরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে গেল-গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নাল্‌তের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকাল-কুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক্, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়া সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে! নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁর কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম তাহা মনে করিলে আমি আজিও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নাল্‌তের মিত্তির বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশবারো জন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়ীতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে

রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে-মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ সুরু করিলেন। বলা বাহুল্য জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধকরি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এম্‌নি, যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো!

খুড়া বলিলেন তবেরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাতদুটা—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত-তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না! আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা' সে নয়-নাই যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল, এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া-লইয়া চলিলাম।

'চলিলাম' বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু, কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে, এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু, আমার কথা যাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না।

...ঞ্চ, বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ...দার্য্য প্রকাশ করি, যে, শুনিলে আপনারা ...বাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ...াত খাইয়া, অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত, ...া' হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না! ...ার কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের ...নকা,—এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার ...কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত ...াইয়া! হোক্ না সে আড়াই মাসের রুগী, ...হাক্‌না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ...াত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার ...াংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! ...সেতো আর সত্যসত্যই মাপ করা যায় ...া! তা' নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ-চিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে-সব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির ঘরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার, এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক্, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারওয়ারী পূজা-বাবত দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণদের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে আসিতে অনেকেই, দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত, কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন!

কিন্তু যাক্। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারে পূরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবে মাত্র সন্ন্যাসী-গিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মাল-পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটীরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁথির মালা,—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা

বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরা-দস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেতরাণী বিবাহ করিয়া মেতর হইয়া গেছে, এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি-কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে,—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে,কোন কালে সে কসাই-ভিন্ন আর-কিছু ছিল! কিন্তু, সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাইত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এম্‌নিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না! যে পল্লীগ্রামের পুরুষ-দের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্! ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারিনা দেশের নব্বই জন নর-নারী ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ, এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাইই। যাক্। বলিতেছিলাম যে দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়! কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরে ফেল্‌ত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

যাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে, এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলে-বেলা হইতেই দুটা জিনিষের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নাম-জাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ; এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়-বান্দা হইয়া উঠিলাম যে মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাপ্‌রেধ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল, এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে,

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট পালট্ পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি তাহা আমি জানিনা। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু, যতদিন না হইল, ততদিন, সাপ ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ ওস্তাদ বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় গোমাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া হুঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার বাপ যে সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু, বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা আমি এমনি অবহেলার সহিত করিতে সুরু করিয়াছিলাম যে সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুইচারি-দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভাণ করে, ভয় দেখায় কিন্তু কামড়ায় না। মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা,—যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখানো হোক আর একটা কাঠিই দেখানো হোক সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখো, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুকগে সবাই।

আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত। আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এম্‌নি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সাম্‌লাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ী সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে, —সে হেঁট হইয়া কয়েক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল,এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখ্‌চ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুইই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই, আমি বল্‌চি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্ম্মান্তিক ভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখ্‌রো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ—করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া তখন রক্ত ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ, সাপ ধরিতে গেলে কে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া, আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্দ্ধে আর উঠিবে না। এবং, আমার সেই, "বিষহরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল, এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে

লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সম্বাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু, মিনিট পোনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটীর উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষ-হরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা এক সঙ্গে, কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন চার জন রোজা মিলিয়া, বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে, সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধস্তা-ধস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব, যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া-থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রহিল, এ সব তুমি আর কখনো কোরোনা।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু, যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন, ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে ত হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হোতো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মোলো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক কোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু!

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্‌রে! এর কি আর প্রাশ্চিত্তি আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও

অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লী-গ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে, পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব্ব-প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতী-লোক তাঁরা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু, সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইঁহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, যে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নয়।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁরা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অন্ত শতাব্দীর অতগুলা রিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিঁকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়; এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব, বড় লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে-চোখে এবং কোলে-কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু, একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু'এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিরদিনের দাগা

ও-পার হতে এ-পার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আন্‌চে ছেলে মেয়ে।
সবাই সমান তা'রা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা-ফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিন মুহূর্ত্ত গোনা!

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে
জননী তার লজ্জা পেল; ভাব্‌ল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আন্‌ল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইচে যখন চাষী
নাম্‌ল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হ'ল সুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হ'ল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপ্‌নি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ার মুখী," শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আন্‌লি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ!

যতই তারা দিত ও'রে গালি
নির্ম্মলারে দেখ্‌ত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালী।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বস্‌ত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বল্‌ত হাসি হাসি—
"আমার নাম যে দুষ্টু, সর্ব্বনাশী!"
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
"আমি কে তোর বল্ দেখি ভাই মোরে?"
বল্‌ত "দাদা, তুই যে আমার বর!"—
এম্‌নি করে হাসাহাসি হ'ত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয়না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্ম্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি;
শুভকর্ম্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বল্‌তে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে?"
অম্‌নি যে তার দু'চোখ গেল ভেসে
ঝর্‌ঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, "ছি, ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি
করিস্ অমঙ্গল?"
বল্‌তে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

আজ্‌ল বিয়ের বাঁশি
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুষ্টু সর্ব্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—যেয়ো যেয়ো!" "যাব, যাব, যাব বৈ কি, বোন!"
আর কিছু না বলে'
আশীর্ব্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে!
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে!
কেন এল কেনই গেল কেইবা তাহা জানে!
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।
"যাব, যাব, যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে কথা কি ভুল্‌তে পারি ভাই?"
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাইনে আমি আর।
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেন কালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বল্লে, "খুড়ো, একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।

শৈল যখন ছোট ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার পরে এ কি
হিজিবিজি কালীর আঁচড়! মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ!
বোঝা গেল শৈলরি এই কাজ!
মারা ধরা গালি মন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে!
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিনী বিষম ক্রোধে! অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিণী গর্ব্ব ভেঙে বল্লে এসে, "আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি!"
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই ক'খানা পাতা
আজ্‌কে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মত।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত;—
সে শাস্তি নেই, সে দুষ্টু নেই;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় ক'টি আমার বুকে লাগা!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিকাশের তৃতীয় অবস্থা

(ফরাসী হইতে)

ইংলণ্ডে উদারনৈতিকদিগের মধ্যে, অধীন রাজ্যগুলি রক্ষার বিরুদ্ধে যে মনোভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রযুক্ত ভারতে যে সকল আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইংলণ্ডের "সাম্রাজ্যবুদ্ধি" পরিপুষ্ট হইয়া সেই সকল আশাকে শূন্যে বিলীন করিয়া দিল। এখন আর কোন ভারতবাসী আশা করে না যে, ইংলণ্ড তাহার অধিকৃত প্রাচ্য দেশগুলিকে ছাড়িয়া দিবে। পক্ষান্তরে সার্ব্বজনিক কাজের অভ্যাস, হাকিমী কাজে ভারতবাসীদিগের পদোন্নতি, পার্লেমেণ্টে সদস্য হইবার চেষ্টাদি—এই সমস্ত হইতে, আন্দোলনকারীদিগের একটু বিজ্ঞতা জন্মিল।

অবশ্য, শেষের কংগ্রেস-সভাগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেসের সমস্ত সঙ্কল্প বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু উহাতে অর্থনৈতিক ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত প্রশ্নাদিই বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষার সংযম, গভর্ণমেণ্টের সহিত অধিক বনিবনাও করিয়া চলা—ইহার দ্বারাই জাতীয় কংগ্রেসের নবযুগের প্রারম্ভ পরিচিহ্নিত।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রবর্কার ১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহাকে উভয়পক্ষের মন রাখিয়া মনোরঞ্জনী ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেন:—

"ভারত-সরকারের কর্ণধাররূপে আমরা এমন একটি নীতিকুশল শাসনকর্ত্তা পাইয়াছি যাঁহার সম্বন্ধে ন্যায্যত বলা যাইতে পারে,—ভারতের রাজপ্রতিনিধির যাহা হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইবেন—এইরূপ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আশা হইতেছে। একথা বলা বাহুল্য, তিনি লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, এবং লোকেরাও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ভ্রমণের সময় তিনি যেরূপ আগ্রহপূর্ণ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায় তিনি ক্রমেই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। লর্ড কর্জন আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন,—তাহার কারণ, তিনি যে অবধি এখানে আসিয়াছেন তিনি কেবল বস্তু-বিচ্ছিন্ন একটা সূক্ষ্মতত্ত্বের ন্যায় আমাদের মধ্যে নাই, পরন্তু রক্তমাংসবিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রসম্বন্ধে কোন সঙ্কল্পই প্রকাশ করুন কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতাই করুন,—তিনি লোকদিগকে সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করেন, লোকদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তিনি তাঁহার অধিষ্ঠান, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার উদ্যমশীলতা সমস্ত ভারতের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন" (India, 24 Jan 1901)।

যখন চন্দ্রবর্কার গবর্ণমেণ্টের দোষগুণ

বিচার করেন, তখন তিনি বিদ্রোহোদ্দীপক জন-নেতার ভাষা ব্যবহার করেন না; তাঁহার মতামত, তাঁহার বলিবার ধরণ সমস্তই প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিকের ন্যায়।

"যাহা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির উপযুক্ত, যাহা মহারাণীর এই বৃহৎ ভারতসাম্রাজ্যের উপযুক্ত—এইরূপ প্রশস্ত উদারভাবে ও দক্ষতা সহকারে এখনো ব্যস্ত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হন নাই। যাহাকে লর্ড রোজবেরী বলেন 'জোড়া-তাড়ার' নীতি, এই সমস্যা-সমাধানকল্পে গভর্ণমেণ্ট সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা যতই দুঃখিত হইনা কেন—ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। বস্তুতঃ ব্রিটিশ চরিত্রে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা প্রশংসনীয় ও যাহা আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে। 'কেজো' ব্যবহারিক বুদ্ধিই এই চরিত্রের মূলভাব। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দুঃখকষ্টে সহানুভূতি, যে দয়া কাজে প্রকাশ পায়,—যাহার পরিচয় বিগত দুর্ভিক্ষের কার্য্যক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে —এই সকল গুণ এই চরিত্রের স্থায়ী লক্ষণ। অবস্থার উপর প্রভুত্বও আর একটি লক্ষণ। ব্রিটিশচরিত্রের বলও ইহাই; কিন্তু অনেক সময় যাহা ঘটে—এই বলই কখন কখন দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যে জাতির বুদ্ধি কেজো ধরণের, যাহারা কোন অসহ্য অহিতকর ব্যাপার চোখের সাম্‌নে দেখিলে তবেই উত্তেজিত হয় সেই জাতির লোক কোন দুঃখকষ্ট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে, উপেক্ষার ভাবে যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে দেয়। হয়ত একটু দূরদৃষ্টি সহকারে একটু সুব্যবস্থা করিলে সেই সকল দুঃখ কষ্ট নিবারিত হইতে পারে। ইংলণ্ড ভারতে অনেক সময় ইহাই ঘটিয়াছে। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে লর্ড রোজবেরী ইংলণ্ডের শাসনকার্য্যসম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা এখন ভারতের পক্ষে খাটে। তিনি বলিয়াছিলেন:

"আমার মনে হয়, এদেশে—(অর্থাৎ ইংলণ্ডে) "আমরা দিন আনি, দিন খাই —আমরা কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করি···আমরা বড় অপব্যয় করি। কেবল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করি না বলিয়াই এই অপব্যয় হয়।" (India, 11 Jan. 1901, P. 21)

এক্ষণে, ১৯০১ ও কংগ্রেসের সভাপতি কলিকাতার কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিব।

মিঃ ডিন্‌শা এদল্‌জী বাচা কেবল অর্থনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে যথাযথ তথ্যের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ এই সকল প্রশ্ন তেমন বিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করে না। এবং চন্দ্রবর্কারের বক্তৃতার বিপরীতে, বাচার বক্তৃতায় নিন্দাবাদের আধিক্য দেখা যায়।—

"ভারতে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে—এই যে মত, এই মতটি কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? যে দেশ ঋণ-গ্রস্ত ও বৈদেশিকের শাসনাধীন, যাহার ঋণ বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং যাহার রপ্তানীর পরিমাণ আমদানী অপেক্ষা

অধিক, সেই ভারতবর্ষ বাণিজ্যে কি করিয়া লাভ করিতে পারে? যে দেশে সঞ্চিত অর্থ নাই, সঞ্চয় নাই, ধনসম্পত্তি নাই, যে দেশের কোটি কোটি লোক সামান্য মজুরীতে অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—ইহা দুঃসাহসের কথা। আমরা জানি, দরিদ্র লোকের অবস্থার ক্রমোন্নতি-সাধন—সমৃদ্ধি, জ্ঞানের বিকাশ এবং দাসত্ব মোচন। যতদিন "দূরাবস্থান"-প্রথা (absenteeism) প্রচলিত থাকিবে—যাহা ব্রিটিশ-শাসনের মুখ্য লক্ষণ—ততদিন কোন উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ৩০।৪০ কোটি টাকার দেশীয় দ্রব্যজাত দেশ হইতে অপসারিত হইতেছে—ইহা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই—ইহাই জাতীয় সমৃদ্ধির পথে একটা বৃহৎ অন্তরায়। এই বিষয়ে দেশীয় লোকের সম্মতি কখনই গৃহীত হয় নাই, এবং যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও অত্যন্ত বেশী। ভারতের পূর্ব্ব-শাসনকর্ত্তারা এই দেশেই বাস করিতেন এবং দেশের লোককে দিয়াই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৬০ হইতে ভারত হইতে চলিয়া যায় ৬২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা—ইহা বাদে বেসরকারী সওদাগরদিগের, ও বণিকদিগের লভ্যাংশের কত টাকা ইংলণ্ডে চালান হয়। ইহাই ভারতের দৈন্যদশার প্রকৃত কারণ।"

এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক,—ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে টাকার জন্য ঋণী তাহার অধিকাংশই ধার-লওয়া টাকার সুদ। ইংলণ্ডের নিকট টাকা ধার করিয়া ভারতের বন্দর, রেলপথ, রাস্তা, খাল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নির্ম্মিত হয় এবং বড় বড় দুর্ভিক্ষে সাহায্য করা হয়। যদি ভারতবাসীরা মূল ধনীদের "দূরাবস্থিতি"র জন্য (absenteeism) অভিযোগ করে, তাহা হইলে রুসেরাও ফরাসী মূল-ধনীদের "দূরাবস্থিতি"র জন্য অভিযোগ করিতে পারে। ভারত খুব কম সুদে টাকা ধার করিয়াছে; এবং ভারত ঐ টাকা খাটাইয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবানও হইয়াছে। অবশ্য বিদেশীর নিকট প্রভূত অর্থ ঋণগ্রহণ করিলে দেশের অবস্থা একটু খারাপ হয়, এবং এই জন্যই জাপানীদের আয়ের টাকা জাপানীরা নিজের দেশের মধ্যেই চালাচালি করে। কিন্তু পক্ষান্তরে যে সকল ধার বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়, তাহা কি বিদেশীর নিকট হইতে লওয়া হয় না? যেদেশ এতটা সমৃদ্ধ যে তাহার রাজকোষে প্রয়োজনীয় সমস্ত মূলধন সর্ব্বদাই সঞ্চিত থাকে সে দেশে, যে টাকা ধার করা হয় তাহার দ্বারা কেবল যুদ্ধের ও পূর্ত্তকর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এবং আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে যে টাকা ঘাটতি পড়ে, তাহা পূরণ করা হইয়া থাকে। পূর্ত্তকর্ম্ম আবার অনেক সময় বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি খারাপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য বর্ণভেদ প্রথা, ভারতীয় বণিকদিগের কার্য্যপদ্ধতি, এবং ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুদের চারিত্র্যই দায়ী। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুরা বাণিজ্য-ব্যাপারে ও শিল্পকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা কেবল

বিদ্যাসাপেক্ষ (liberal) ব্যবসায়ের জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্যই চেষ্টা করে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যাইবে, খুব বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অর্থনৈতিক প্রশ্নাদি সম্বন্ধে কতটা ভুল বুঝিয়া থাকে।

রৌপ্য টাকাই ভারতের প্রচলিত আদর্শ মুদ্রা। অতএব রূপার মূল্য হ্রাস হইলে, ভারতের আয়ব্যয়সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা খারাপ হইবারই কথা; কারণ, যে-ইংলণ্ড হইতে ভারত প্রভূত অর্থ ঋণ স্বরূপ লইয়া থাকে, সেই ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত আদর্শ-মুদ্রা। অতএব ভারত-সরকার যদি রূপার মূল্য বাড়াইবার চেষ্টায় রৌপ্য মুদ্রার স্বাধীন মুদ্রণকার্য্য রহিত করিয়া থাকেন, টাকার মূল্য স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন, স্বর্ণমুদ্রাকে আদর্শ মুদ্রা রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এইসকল চেষ্টা তো প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) মুদ্রা-বিনিময়ের ঘাটতিতে ঋণভার বৃদ্ধিত হইবার কথা; এই ঘাটতির টাকা ভারতীয় করদাতারা পরিশোধ করিয়া থাকে; এই সংস্কার সাধনে তাহাদের লাভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিনিময়-হারের বৃদ্ধিতে কেবল রপ্তানিওয়ালাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; তাহারা টাকার মূল্যে জিনিস খরিদ করে এবং স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে তাহা বিক্রয় করে। কিন্তু স্বয়ং রপ্তানিওয়ালা বিনিময়ের ঘাটতিতে বেশীদিন লাভ করিতে পারে না; বিনিময়ের চাঞ্চল্যে খরিদ্দারেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। বিনিময়-হারের বৃদ্ধিতে প্রায়ই বাণিজ্যসঙ্কট উপস্থিত হয় (pour le Japan P 449), কিন্তু এই সংস্কারসাধনের দ্বারা পরিশেষে সকল পক্ষেরই লাভ হইয়া থাকে।

ন্যাশানাল কংগ্রেস সম্বন্ধে ইংরেজী সংবাদপত্রের মতামত—

Manchester Guardian (liberal, 28 Dec. 1901)।—এই সপ্তাহে ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই কংগ্রেস সম্বন্ধে, প্রায় অর্দ্ধেক ইংরেজী সংবাদপত্রে এত অনিষ্টজনক প্রবন্ধ বাহির হয় যে, এই সময়ে কংগ্রেস কি এবং কংগ্রেস কি কার্য্য করিয়াছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মন্দ নয়। এই দুই প্রশ্নের যিনি উত্তর দিয়াছেন তিনি একজন আইনব্যবসায়ী, প্রিভিকৌন্সেলের সদস্য এবং বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি। সেই Sir Richard Garth এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন: "ভারত-সরকার ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের নিন্দাবাদ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন তাহার সাহিত্য তৎকৃত অন্য অন্যায়ের তুলনা হয় না। ভারতসরকার-পক্ষীয় লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিষয়ে ইংরেজী সংবাদপত্রদিগের সম্মুখে যেরূপ অপ্রকৃত বা বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন এমন আর কোন বিষয়ে

উদ্বোধন

(কলেজ স্কোয়ারে)

যখন পাঞ্জাবে বসে কলেজে পড়তুম
ালীর ডবল কোম্পানী গঠিত হচ্ছে,
ন মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যের স্বাক্ষরিত
লগ্রাম আমার কাছে আসত—"আজ
গুলি বাঙ্গালী ছেলে সৈন্য হয়ে চল্‌ল
দের লাহোর ষ্টেশনে একটু আদর-অভ্যর্থনা
বেন"—আর যখন দশ পনের দিন বাদে
বাদে ৩০টি, ৪০টি, ৫০টি বাঙ্গালী সৈন্য-বেশে
ট্রেনে করে লাহোর ষ্টেসনে এসে নাম্‌ত,
ষ্টেসনে ট্রেণ থাম্‌তে না থাম্‌তে জানালা
থেকে আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে তাদের
"বন্দেমাতরং" গর্জ্জনে পাঞ্জাব-মেদিনী কম্পিত
হয়ে উঠ্‌ত, তখন কি আনন্দে কি গর্ব্বে
আমাদের গুটিকত প্রবাসী বঙ্গ নরনারী ও
তাঁদের আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী পাঞ্জাবী
মিত্রদের হৃদয় স্ফীত হয়ে উঠ্‌ত!

—, কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীরা বিনা প্রমাণে বলেন যে এই কংগ্রেস, ভারতের কোন জাতির, কোন
ীর বা কোন ধর্ম্মেরই মুখপাত্র নহে। Sir Richard Garth কষ্ট করিয়া এলাহাবাদ কংগ্রেসের
তিনিধি তালিকাটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এবং এই বিশ্লেষণ হইতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, এই
তিনিধিরা বাস্তবিকই লোকের মুখপাত্র "এবং এইসকল প্রতিনিধির বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে—
ইহারা অকপট দেশহিতৈষী"; তাহার পর তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তবে এইসকল লোক এতটা
ক্ষুব্ধ ও অবমাননার পাত্র কিসে হইল? তাহার উত্তরে তিনি বলেন:—"তাহারা যাহা করিয়াছে,
তোমাদিগকে বলিতেছি। তাহারা আপনারা চিন্তা করিতে সাহসী হইয়াছে; আরও অধিক,
ারতের কোটি কোটি দরিদ্র ও নিরক্ষর প্রজাদের জন্যও চিন্তা করিতে সাহসী হইয়াছে। এই
ত হতভাগ্য লোকের সাহায্যার্থ তাহারা নিজের স্বার্থ বলিদান করিয়াছে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকেও
করে নাই। বহুবৎসরাবধি যে সকল অন্যায় অত্যাচারে আমাদের শাসনকার্য্য কলঙ্কিত এবং
ভারত ও ইংলণ্ডের লোকমত দুষ্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু যাহা ভারতসরকার দৃঢ়ভাবে
কড়িয়া ধরিয়া আছে—উহারা সেই সকল অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে
সী হইয়াছে।" Standard (tory, 28 Dec. 1901)—গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় ন্যাশানাল
গ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিনিধিগণের বাক্‌সংযম দেখিয়া আমরা অতীব
ন্দিত হইয়াছি। যে সকল লোক নিজেরাই প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল, যাহারা রীতিমত নির্ব্বাচিত
তিনিধি নহে তাহারাই, ভারতীয় লোকের নাম-লইয়া, উগ্রভাবে বক্তৃতাদি করিয়াছিল, মুসলমানদিগের
প্রতিবাদের ফলে, উহাদের দুরাগ্রহ অনেকটা প্রশমিত হয়। যখন ভারত-সাম্রাজ্যের একটা বড় দল
সহকারে আন্দোলনকারীদের পক্ষ ত্যাগ করিল, এমন-কি খুব জোর করিয়া উহাদের মূলসূত্র
হর প্রতিবাদ করিতে লাগিল, তখন কংগ্রেসের অভ্যুৎসাহী সভ্যেরাও বুঝিতে আরম্ভ করিল যে
ধিক পরিবর্ত্তনের দাবী করা নিতান্তই অসঙ্গত ... যদি কংগ্রেস এই প্রকার উদ্ধত বক্তৃতা পরিত্যাগ
এবং লর্ড কর্জনকে সাহায্য করিয়াই সন্তুষ্ট হয় (কর্জনের সদভিপ্রায় সম্বন্ধে কংগ্রেস নিজেই স্বীকার
) তাহা হইলে কংগ্রেস পূর্ব্বেকার নির্ব্বুদ্ধিতা ও ভুলভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত
র সাধন করিতে পারে।—১৮৮২ অব্দের কংগ্রেস (আহমেদাবাদ) সভাপতি, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

প্রথম যেবার বাঙ্গালী সৈন্যের সাক্ষাৎ দর্শন করলুম, কালের ঘড়ি আমার মনে ১৫ বৎসর পিছিয়ে গেল। যেদিন দুর্গা পূজার মহাষ্টমীতে পিতৃগৃহে বীরাষ্টমী ব্রতের প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলুম, বাঙ্গালী ছেলের হাতে ছড়ি ছাড়িয়ে লাঠি ধরিয়ে ছিলুম,—সমগ্র অবিশ্বাসী বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধিদের আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গনে আমন্ত্রণ করে বাঙ্গালীর হাতের ছোরা ও তলোয়ার খেলার নৈপুণ্য দেখিয়ে ছিলুম, শক্তিপূজক বাঙ্গালীকে শুধু ঘটে পটে নয়—অসিতে শক্তির আবাহন করতে লইয়ে ছিলুম—সেই-দিন মনে পড়ল। যে মহাশক্তির প্রয়োচনায় আমি এই ব্রতে ব্রতী হয়ে ছিলুম তাঁরই কৃপায় সে ব্রত আজ উদ্‌যাপিত হল অনুভব করলুম। তাই আমার হৃদয় গেয়ে উঠ্‌ল

"দেখেছি সুন্দর শিখ
মরাঠা গোর্খা বীর,
এমন মোহন মূরতি যে নাই সে কোনটির।"

এই বাঙ্গালী সৈন্যেরা আমারই অন্তরের কল্পনা ও সাধনা যেন বাইরে মূর্ত্তিমান হয়ে লাহোরের প্লাটফর্ম্মে উপনীত হয়েছে। টুপ ট্রেণে গাদা গাদা ইংরেজ সৈন্যও লাহোর ষ্টেসনে আনাগোনা করত। দলে দলে গোর্খা এসেও গাঁটরী ঠেসান দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে বসে থাকত। কিন্তু পাঞ্জাবী শিখ সৈন্যদের—সৎশ্রী অকাল—এই গুঞ্জন ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের কোন গুঞ্জন—"বন্দেমাতরং" এর মত লাহোর ষ্টেসনকে শব্দায়িত স্তম্ভিত ও আলোড়িত করে তোলেনি।

আমাদের লোকেরা চলৎ ট্রেণে লাফিয়ে উঠে সৈন্যদের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে পড়তেন, তারপর ভিন্ন ভিন্ন কম্পার্টমেণ্ট থেকে তাঁদের নামিয়ে সারবন্দী করে মালা পরান হত, পাঞ্জাবের শীতকালের প্রত্যুষের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় তাঁদের চা পান করিয়ে গরম করে তোলা যেত এবং শেষে তাঁদেরই কম্পার্টমেণ্টে আট দশটি গাইয়ে বাঙ্গালী ছেলে মেয়ে যুবকের দল বসিয়ে সঙ্গে-বয়ে-নিয়ে-যাওয়া হার্ম্মোনিয়ম বা বেহালার সঙ্গে তাঁদের বন্দনা-গীতি গেয়ে তাঁদের অন্তরাত্মাটিরও তৃপ্তি ও উৎসাহ সাধন করা যেত।

ডবল কোম্পানী খণ্ডে খণ্ডে নৌশেরা গেল এবং নৌশেরা থেকে সম্পূর্ণ কম্পানী লাহোর হয়ে—লাহোরে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে করাচী গেল। তারপরে শোনা গেল্ল বাঙ্গালীর ব্যাটেলিয়ন তৈরি হচ্ছে—শুধু ২২৮ জন সৈন্যতেই শেষ নয়, এই ডবল কোম্পানীটি বঙ্গভূমির একটা hothouse প্রসূন নয়, বাঙ্গালীর জল-মাটিতে সৈন্য-প্রসবিনী স্বাভাবিক শক্তি আছে এবার তা প্রতিপন্ন হবে। শুধু ব্যাটেলিয়ন নয়, রেজিমেণ্ট তৈরি হচ্ছে—এবার বঙ্গজীবনে নতুন গণিত শিক্ষা হবে, কটা মানুষে একটা কম্পানি, কটা কম্পানিতে একটা ব্যাটেলিয়ন এবং কটা ব্যাটেলিয়নে একটা রেজিমেণ্ট হয় হাতে-কলমে সে নতুন নামতা অভ্যেস হবে।

এবার বড় আশা নিয়ে মাতৃভূমি বঙ্গ-ভূমিতে এলাম। বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট দেখব। বাঙ্গালী সৈন্যের ধারাবাহিকতা চল্‌তে থাকবে, ফুলষ্টপ কোথাও পড়বে না। নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে। যেমন কেরাণী-গিরি, যেমন স্কুল-মাষ্টারি, যেমন মুদ্দোফী-

যেমন ওকালতি, যেমন জজিয়তি, যেমন দালালি দোকানদারি, তেমনি এও একটা পেশা বাঙ্গালীর পক্ষে খুলে গেল। যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার সিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার ব্যাপারী সবই আছে—অথচ সৈন্যও আছে; মড়খানা আছে, মাথাটা আছে, আবার সেই মাথাটা বাঁচাবার প্রয়োজনকল্পে নিজের হাতখানাও তৈরি আছে, পরের হাতের প্রত্যাশা রাখতে হয় না—তেমনি বিধির অনুগ্রহে বাঙ্গালীরও এতদিনে সেই শুভদিন আবার ফিরে এল।

কিন্তু এসে দেখি রেজিমেণ্টাল অঙ্কের কোটা এখনও অপূর্ণ। রেজিমেণ্ট পুরো করতে দুশো লোক এখনও চাই—আঠার-শ হয়েছে, শেষ দুশো ভরাতে নাকি প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হচ্ছে। কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং।

মনুষ্যত্ব-জিনিষটি কি? বুদ্ধি বৃত্তির স্ফুরণ একটা মস্ত মনুষ্যত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজ-আমলের বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অনেক জাতিকে পিছনে রেখেছেন বলে আমরা গর্ব্ব করি। কিন্তু বুদ্ধি-চর্চ্চা যদি শুধু পুঁথিগত হয়, বই পড়ায় ও বই লেখায় হয়, কার্য্যে ও সাধনায় না হয় তবে তাকে বাম্‌নে-বুদ্ধি, পণ্ডিতি-বুদ্ধি, বা পণ্ডিত-মূর্খতা বলা যায়। পণ্ডিত-মূর্খের নানারকম গল্প তোমরা শুনেছ কিন্তু আয়নায় মুখ মিলিয়ে দেখনি সে গল্পগুলি নিজেদের মুখেরই প্রতিবিম্ব কি না। বাঙ্গলা দেশকে ইংরেজ-যুগে পণ্ডিতমূর্খ করে রাখা হয়েছে। পরশুরাম ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করে ছিলেন—ব্রিটিশরাজ বঙ্গদেশকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। বাঙ্গালীর প্রতি এই মহা অধর্ম্ম আচরণ হয়েছে। বাঙ্গালীকে এমন একটা পর্ত্তার গাঁজা ধরান হয়েছে যাতে করে সে বাকী সব কর্ম্মিষ্ঠ উদ্যমী জাতকে 'ছাতু-খোর' 'মেড়ো' প্রতি খেতাব দিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করছে। পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাটী, নেপালী এরা সব হল sword hands of India—আর তোমরা বাঙ্গালীরা কি! না, পণ্ডিত, অর্থাৎ আত্মরক্ষায় একেবারে অসমর্থ। শুনি নাকি তোমাদের অক্ষমতা এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে যে অন্ধকারে ঘরে চোর ঢুকেছে সন্দেহ হলে ভয়ে ভয়ে স্ত্রীকে টেনে বল "পিদিমটা জ্বালা।"

যদি তোমাদের মেয়ে-বৌকে রাস্তায় ঘাটে কেউ অপমান করে চুপ মেরে বসে বা লুকিয়ে অপমানটি হজম কর, বড় জোর দশ জনের পরামর্শে তার পরদিন কাছারীতে অপমানকারীর নামে মকদ্দমা কর। নিজের হাতে নিজের স্ত্রী-কন্যার অপমানের শোধ নেবার পৌরুষ তোমাদের নেই—তাই বল, "পথে নারী বিবর্জিতা।" জীবনের রাজপথে বেরোবার পাথেয় যার নেই, যার অন্তরের গুপ্তির ভিতর আবশ্যকের সময় বের করার জন্যে তেজোরূপী অস্ত্র লুকান নেই, তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দোর বন্ধ করে অষ্টপ্রহর ঘরে বসে থাকাই শ্রেয়! মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ, জীবন-মেলার শতধারে প্রবাহিত শতপথের আনন্দ—যাত্রীদের সঙ্গ তাদের জন্যে নয়। তারা ঘরের কোণে বসে বসে বই পড়ে পড়ে ডিস্‌পেপ্সিয়া, ডায়াবেটিস্ আর যক্ষা দিয়েই মানবলীলা সম্পন্ন করুক। জীবনের

যত কিছু রস তা ভারতের বাকী জাতিরা উপভোগ করুক—আর বাঙ্গালীরা শুধু দিস্তে দিস্তে কাগজ চিবিয়ে জিহ্বা লেলায়িত করুক, জীবনের সাধ কাগজে মেটাক।

কিন্তু এখনও ত একেবারে রসাতলে যাওনি? এখনও ত কিছু মনুষ্যত্ব বাকী আছে। তোমাদের lucid momentsএ বুঝতে ত পার মনুষ্যত্ব জিনিষটা শুধু পড়ায় নয়, শুধু ভোগে নয়, শুধু সহজ-সাধ্যতায় নয়। এই যে তোমরা দলে দলে আজকাল দুদিন Convocationএ Cap ও gown পরে ডিগ্রি আর মেডেল নিয়ে এলে, এই ক হাজার ছেলের মধ্যে ক-শো ছেলেরও মনে military medal বা Victoria cross নেবার সখ চড়ে না?

জ্ঞানবুদ্ধির চর্চ্চা মুনি-ঋষিরাও করতেন। তাঁদের বুদ্ধিচর্চ্চার ফলেই আর্য্যসমাজে বর্ণাশ্রম বিভাগ হয়েছিল। কোনও মনুষ্য-সমাজে কেবলমাত্র এক বর্ণের স্থান নেই; তাতে সমাজ অচল হয়, পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারজাতই চাই। আপনার আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে স্থির করে নাও। অন্য-জাতের কি কথা, জাত-বামুনের ছেলেও একালে সবরকম অব্রাহ্মণ্য পেসায় নিযুক্ত হচ্ছ। তবে এই ত্রিশকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ক্ষাত্রস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রের ছেলেরা এই নিঃক্ষত্রিয় বঙ্গভূমিতে নতুন ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত কেন হবেনা? পরশুরাম ব্রাহ্মণশূন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নূতন ব্রাহ্মণ জাতি সৃজন করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে। তিলক গোখলে প্রভৃতি চিৎপাবন শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের কৃত ব্রাহ্মণ বলে শুনা যায়। আজ য়ুরোপীয় মহাসমরের যুগে ব্রিটিশ-রাজের অনুগ্রহে বাঙ্গলায় নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি কেন হবে না?

বাঙ্গালীর ধড়ে বীরত্ব নেই, বাঙ্গালীর শরীরে সাহস নেই, বাঙ্গালীর প্রাণে কষ্ট-সহিষ্ণুতা নেই, বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা নেই, আত্মসম্মান-বোধ নেই এ কলঙ্ক ক্ষালন কর। ত্রিশকোটির মধ্যে দুশো-আটাশ জনের সৈনিকবৃত্তিতে দেশের ক্ষাত্র তেজ পরিস্ফুট হয় না—দু হাজারেও হয় না। এই দু হাজারের ধারাবাহিকতায় হয়। লড়ায়ে যাচ্ছে আস্‌ছে, মর্‌ছে, ফির্‌ছে, আবার যাচ্ছে, আরও যাচ্ছে—এই রকমেতে হয়।

কে যাবে তোমরা? দু হাজার সংখ্যা এখনও পুরো হয়-নি—এখনও দুশো বাকী। কি লজ্জার কথা! এই তোমাদের বুদ্ধি-চর্চ্চার ফল? বুদ্ধি দিয়ে যেটা উচিত জান কাজে সেটা করে উঠতে পার না! এমন নিষ্কর্ম্মা সাধনাহীন বুদ্ধি? শুধু এগ্‌জামিন পাশ করা passive বুদ্ধি, নিজেকে মানুষ করার active বুদ্ধি নয়! আর এই বুদ্ধির গর্ব্বে বাকী বীর জাতিদের এক-একটা মানুষের মত মানুষকে ছাতুখোর বলে উড়িয়ে দাও? জেনো তারা তোমাদের চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান। তারা ইংরেজ-সেনানী-ভুক্ত হয়ে জগতে ভারত-শক্তি উদ্দীপিত রেখে দিয়েছে। তোমরা বঙ্গের বঙ্গশক্তিকে ঘনিয়ে তোল,—ভারত-সৈন্যের পাশাপাশি বঙ্গসৈন্য হয়ে গিয়ে দাঁড়াও। দুর্ব্বল হাতে অস্ত্রধারণের বল ও কৌশল আয়ত্ত কর।

যে গুরুরা এতদিন তোমাদের য়ুনির্ভাসিটির পাঠ্য, পরীক্ষা ও পাশের অগুরু-চন্দন-চূয়ায় ভুলিয়ে রেখেছিলেন তাঁরাই আজ মহা-শক্তির প্রেরণায় তোমাদের মানুষ হতে সাধাসাধি করছেন। তাঁদের উপর অভিমান করে নিজের ক্ষতি কোরোনা। এখনও সময় আছে, এখনও মানুষ হও।

শোনা যায় নাকি বাঙ্গালী বাপেরাই বাঙ্গালী ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়ার অন্তরায়? তাই যে সব ছেলেরা যাচ্ছে তারা লুকিয়ে চুরিয়ে সেনাদলে ভর্ত্তি হচ্ছে, সভাস্থলে প্রকাশ্যে কেউ উঠে এসে নাম দাখিল কর্ত্তে পারে না!

শোন ভাই বাঙ্গালী পিতারা! গুরু গোবিন্দ সিং বলে একজন পাঞ্জাবী মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে লড়ছিলেন। তাঁর তিন তিন ছেলে তাঁর সঙ্গে ছিল। ১১ বৎসরের কনিষ্ঠ ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে বল্লে—"পিতাজি, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমি একটু জল খেয়ে যাই, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে!"

গোবিন্দ সিং পুত্রের মুখ চুম্বন করে বল্লেন—"বৎস, পার্থিব জলের সময় নেই, সমর-প্রাঙ্গণে তোমার জন্যে দেবতারা অমৃতবারি নিয়ে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের কাছে শীঘ্র যাও।"

যে রক্তমাংসের শরীরে গোবিন্দ সিং গঠিত ছিলেন, সেই রক্ত-মাংসের শরীরে বঙ্গপিতারা গঠিত। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের ভিতরে যে আত্মার শক্তি কার্য্য করছিল সে আত্মা বঙ্গপিতাদের দেহে কোথায় লুক্কায়িত? সে আত্মাকে জাগ্রত কর, আত্মশক্তির উদ্বোধন কর। আত্মানং বিদ্ধি।

৬ই মার্চ্চ ১৯১৮ শ্রীসরলা দেবী।

লুকোনো ছবি

সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজ্‌ছি কাঁচা বয়েস থেকে,
উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা হিংসে গো যার রূপটি দেখে—
ভালবাসার বুল্‌বুলিটি দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
সে এক রঙীন্ শাঙণ বিহান—হাস্‌ছ তুমি রঙ্গ দেখে?

মন যে আবার সবুজ হয়ে উঠ্‌ল গো তার খবর পেয়ে,
সরম-গুটির রেশ্‌মী শাড়ী মিশিয়ে আছে তার সে দেহে;
সূক্ষ্ম হিসাব কর্‌লে দেখি আস্‌ছ তুমি চালিয়ে মেকি—
শপথ ক'রেই বল্‌তে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আজও প্রিয়ে বুকের ভিতর রসের উজান কম্ চলে,
তারই খোঁপায় পাপ্‌ড়ি চাঁপার ঝর্‌ছে প্রাণের রঙ্‌মহলে,
কণ্ঠ তাহার কি যে মিঠে, ছিটার আনার-দানার ছিটে,
নটকানো রঙ্‌ আঁচল ফুটে রূপ-দরিয়া পড়্‌ছে ঢলে।

নিন্দে কেবল কর্‌বে তুমি, বল্‌বে নিলাজ প্রগল্‌ভা সে,
হায় মানে তার রূপের দেমাক্ সাঁচ্চা তোমার প্রেমের পাশে,
ও সব কথা নিক্তি ধরে' দেখ্‌তে কে যায় ওজন করে'
তুমি যে মোর ভরা ভাদর, ফাগুন মাসের দক্ষিণা সে।

ও কি সখি রাগ করিলে? কিন্তু সে মোর রাগ করে না,
সে যে আমার আঙুর মধু, অনুরাগের হাস্‌নুহেনা।
তোমার মত নয় সে মোটে, যাচ্চ তুমি বেজায় চটে',
বল্‌লাম "আমি তার নিকটেই চুকিয়ে তোমার পাওনাদেনা।

"চঙ্‌ দেখে আর বাঁচিনে গো, সঙ্‌ সেজেছেন বুড়ো হয়ে,"
চোখ ঘুরায়ে কহেন প্রিয়া—"একেবারে গেছ ব'য়ে,
চল্লিশেতে চাল্‌শে ধরা, ঝাপ্‌সা চোখে চশ্‌মা পরা,
যৌবনেরই লক্ষণ এসব, পড়্‌তে পার প্রেমের মোহে।

বারেক শুধু দেখাও তোমার পোড়ার-মুখী কল্পনাকে,
বলিহারি পছন্দ তাঁর করতে পেয়ার চান তোমাকে?
মর্‌তে কি তার জায়গা নেই আর, প্রেম করা বা'র করব গো তার,
বুড়ো খুকী দেয়ালা করেন, মন মজেছে গোঁফের পাকে।"

জবাব দিলাম-"ফটো যে তার রয়েছে মোর ডেক্‌সটিতেই,
সে যে তোমার সতীন প্রিয়ে, সে মুখ তোমার দেখ্‌তে তো নেই।"
যেম্‌নি ফটোর খবর পাওয়া, উল্কা সমান করেন ধাওয়া,
ডেক্‌স দেরাজ ফেলেন খুলে—রিং-টি ছিল অঞ্চলেতেই।

তর্ সহেনা, ছড়িয়ে ছিঁড়ে চিঠির তাড়া, কাগজ, ছবি
ঘরের মেঝেয় উলট-পালট, একসা করে' ফেলেন সবই।
আল্‌গা খোঁপা গেছে ক্ষেপে, মুক্তাদাঁতে অধর চেপে,
খোঁজেন ফটো—কইনু ওগো—"সইতে নারি বেয়াদবি।"

"দিচ্ছি আমি বাহির করে' ওই জাপানী বাক্স থেকে
মুখু ঘুরে যাবে এখন, তার সে চোখের ভঙ্গি দেখে,
ডালার তলেই আছে আঁটা, সেই তোমারি সতীন-কাঁটা,
মন যে আমার করলে দখল কনক-চাঁপার রঙটি মেখে।

দেখেন ডালার উল্টাপিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠ্‌ল ফুটে আর্শীটিতে রূপের আলোর গুমরটুক্।
জল-জমা সেই চোখের পাতায় অভিমানের মুক্তালতায়
অপরূপ এক ধর্‌ল শোভা অশ্রুমাখা হাসির সুখ।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

মাসিকপত্রে কবিতা

বাংলা মাসিক পত্রগুলিতে যে সকল কবিতা বাহির হয়, তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য থাকে না, কারণ বলিবার মত বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রায়ই যে সব কবিতার নমুনা পাই তাহাদিগকে কবিতা না বলিয়া কবিতার 'এক্‌সেসাইজ্' বলিলেই ভাল হয়।

শুনিয়াছি জীবতত্ত্ববিদের পরীক্ষাগারে বহুকাল ধরিয়া জীবকোষ তৈরির চেষ্টা চলিতেছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা জীবকোষ যে যে উপাদানের দ্বারা গঠিত, তার যথাযথ পরিমাণ সমস্তই পাওয়া গেছে। সেই সেই পরিমাণ রক্ষা করিয়া উপাদান-গুলিকে ঘুঁটিয়া দেখা যায় যে এক রকমের কৃত্রিম জীবকোষ করা যায় বটে, কিন্তু তাতে প্রাণের স্পন্দনটা কোনমতেই জাগানো যায় না। তা যদি যাইত, তবে ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রাণ-তৈরির ফরমাস চলিত।

অ-কবির কবিতা এবং কবির কবিতার মধ্যে এই তফাৎ। অ-কবির কবিতাতে মাল-মসলা ঠিক আছে, কিন্তু প্রাণের সাড়া নাই। কবির কবিতাতে প্রাণ স্পন্দিত বলিয়া মাল-মসলার খোঁজ নেওয়ার বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

প্রাণ জিনিসটা ফরমাসের জিনিস নয়। প্রাণ হইতেই প্রাণের উদ্ভব। যে কবির মধ্যে প্রাণের আবেগ স্বত-উচ্ছ্বসিত, তাঁর রচনার মধ্যেই নব নব সঙ্গীতের বেগ স্বত-স্ফূর্ত্ত। ঐ আবেগ জিনিসটাকে আমরা রস বলি—অথচ রস শুধু আবেগের মধ্যে নাই—আবেগ যখন ভাষায় ও ছন্দে সমূর্ত্ত ও সবেগ হইয়া দেখা দেয়, তখনই আমরা

রস অনুভব করি। কেননা রস মানে আস্বাদন। ভাব রূপ পরিগ্রহ না করিলে আস্বাদন জন্মিবে কি উপায়ে?

আমাদের শরীরের পক্ষে নাইট্রোজেনের দরকার। হাওয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সে নাইট্রোজেন আমাদের রসনার গ্রাহ্য নয়। যে বস্তুর রস বা আস্বাদ আছে তাকেই রসনা গ্রহণ করে। রসগোল্লার মধ্যেও নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেটা রস রূপেই আছে। তার স্বাদ আছে।

কোন ভাব বা আইডিয়া কিম্বা কোন হৃদয়াবেগ বা ইমোসন্ ঐ আকাশের নাইট্রোজেনের মত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা রসমূর্ত্তি গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার স্বাদই নাই।

রসনার দ্বারা উপভোগ্য খাদ্যরসের সঙ্গে মনের দ্বারা উপভোগ্য কাব্যরসের তুলনা চলে। খাদ্যরসের মধ্যে যেমন শরীরের স্বধর্ম্ম থাকা চাই, কেননা খাদ্যকে শরীর হইতে হইবে—কাব্যরসের মধ্যে তেমনি মনের স্বধর্ম্ম থাকা চাই, কেননা কাব্যকে মননপূর্ণ তথৈব জীবনপূর্ণ হইতে হইবে। এই মনন-ধর্ম্মটার অভাববশতই অনেক কাব্যই আমাদের ভোগে লাগে না। তারা ল্যাবরেটরিতে তৈরি জীবকোষের মত—তাদের মধ্যে আছে সবই, কেবল জীবনটুকুই নাই।

"বিজয়ী"

চৈত্রের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের "বিজয়ী" কবিতা বাহির হইয়াছে। এটি 'বিষম' ছন্দে লেখা—ইংরাজীতে যাকে বলে free verse—সুতরাং অনভ্যস্ত পাঠকদের পক্ষে এ কবিতা ঠিকমত পড়া বিষম মুস্কিলেরই ব্যাপার।

জীবনের ছন্দটা সম-ছন্দ নয়, সেটা সম-অসম-ছন্দের দ্বন্দ্বে দোলানো বিষম-ছন্দই বটে। সঙ্গীতশাস্ত্রে শুধু সুরের খেলায় হয় 'মেলডি'; কিন্তু সুর-বেসুরের সঙ্গতিতে তৈরি হয় 'হার্ম্মণি'। সেই হার্ম্মণিই পূর্ণতর সঙ্গীত। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রই বলি আর কাব্যশাস্ত্রই বলি, জীবন-মহাশাস্ত্রেরই তারা ভাষ্য বইত নয়। সুতরাং জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বের সুর যদি কাব্যে ফোটান দরকার হয়, তবে তাতে কোনমতেই একটানা সুর হইতে পারে না—তার মধ্যেও কতক সুর কতক বেসুর দেখা দিবেই। সেই জন্য তার ছন্দটাও সম-ছন্দ না হইয়া ক্রমশঃ বিষম-ছন্দ হইবেই।

Blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই বিষম ছন্দেরই নমুনা। সেই জন্য বড় বড় এপিক-কাব্যে তার স্থান হইয়াছে। তার বিচিত্র দোল; তার বিরাম-যতির সংস্থানও বিচিত্র। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দটাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেই ইহা টের পাওয়া যাইবে।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান যখন বলিলেন যে, তিনি

"Life immense in passion,
pulse and power"এর গান গাহিবেন, তখন তাঁকেও জীবনের ছন্দের সন্ধান করিতে গিয়া মিলকে বাদ দিয়া অমিলেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তিনি গদ্যে কাব্য লিখিলেন বটে কিন্তু সে গদ্য ছন্দোময় গদ্য (rhythmic prose)।

তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই আর এক সংস্করণ।

Tears ! । Tears ! । Tears ! ।
In the night, । in solitude, । tears, ।
On the white shore । dripping, । dripping, । suck'd in । by the sand, ।
ইত্যাদি।

এ এক রকম বৈদিক ছন্দের মত উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ছন্দের বিচিত্র উত্থান-পতন-মালায় গ্রথিত।

হুইটম্যানের ছন্দের কান খুব সূক্ষ্ম ছিল বলা যায় না; তাঁর রচনায় পৃথিবীর আদি-যুগের নানা যৌগিক ধাতুর স্তরের মত স্তর-ভেদ আছে—তাহা কোথাও কঠিন, কোথাও তরল। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যে যেমন পদ্যাংশকে গদ্যাংশ হইতে তফাৎ করা যায়, তেমনি হুইট্‌ম্যানের কাব্যেরও বিপুল গদ্যাংশকে খণ্ড পদ্যাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি এই ছন্দোময় গদ্যের উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে ছন্দোময় গদ্য আর বলা চলে না—ইহাও এক ধরণের পদ্যই বটে। কেন না রীতিমত গদ্যের মধ্যেও এক রকমের বড়-গোছের ছন্দ থাকে—সে ছন্দ পদ্যের ছন্দ নয়। অর্থাৎ তার পদক্ষেপ গণনা করা শক্ত। সেণ্টস্‌বারি গদ্যের সেই ছন্দের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু মিল রাখিয়া বিষম ছন্দে লেখার রীতি এই ধরণের গদ্য-পদ্য লেখার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে Browneএর কবিতায় এই সমিল বিষম ছন্দ দেখিয়াছি। বিস্তর কবি এই free verseএ রচনা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'তে এই ছন্দেরই উদ্ভাবন ঘটিয়াছে। এ ছন্দ পড়া শক্ত; এ ছন্দ লেখা আরও শক্ত। আনাড়ির হাতে এ বিষম ছন্দের একসেসাইজ্ বিষম দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কেননা এ ছন্দের নিয়ম কি তাহা না জানিলে এ ছন্দের ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে। এ ছন্দের আপাত অনিয়মের মধ্যেও নিয়ম আছে।

"তখন তারা। দৃপ্তবেগের। বিজয়-রথে।
ছুটছিল বীর। মত্ত অধীর,। রক্তধূলির।
পথ-বিপথে।
তখন তাদের। চতুর্দ্দিকেই। রাত্রি-বেলার।
প্রহর মত।
স্বপ্নে চলার। পথিক মত।
মন্দ-গমন। ছন্দে লুটায়। মন্থর কোন্।
ক্লান্ত বায়ে;।
বিহঙ্গ-গান। শান্ত তখন।
গহন রাতের। বসন ছায়ে।"

স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই ছন্দের পদক্ষেপ সমান নয়। এ পদক্ষেপ ভাবানুসারী। সমান ছন্দে ভাবের বিচিত্র উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দকে দোলায়িত করিবার সুযোগ নাই। সেখানে সমস্তেরই ওজন সমান করিয়া দিতে হয়।

এ ছন্দের মুস্কিল এই যে, চার অক্ষরের কথা ইহাতে ব্যবহার করা চলে না। অবশ্য যুক্ত অক্ষর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বরাবরই দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। 'বিজয়ী' কবিতায় চার অক্ষরের শুধু একটি কথা—'মরীচিকা'—এক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাম্‌ল পথিক,। এই যে তাদের।

মশাল-শিখা।

নয়সে কেবল। দণ্ডপলের। মরী (ই) চিকা।

মরীচিকা কথাটিতে ঈর উচ্চারণ করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু ছন্দের কথা বলিয়া কবিতাটিকে বিদায় দেওয়া যায় না।

কবিতাটির ভাব এই যে, যে সব বীর রাত্রিবেলা মশালের আলো জ্বালাইয়া ভাবিয়াছিল যে তাদের সেই মশালের শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে অমর হইয়া জ্বলিবে এবং অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া 'নিত্য কালের বিত্তরাশি' তাদের কবলিত করিবে—সেটা তাদের যে স্বপ্নাবেশ মাত্র তাহা তারা বুঝিল যখন প্রভাতের সূর্য্য প্রকাশ পাইল। ঐ মশালের আলোটা যে চিরন্তন নয়, ওটা যে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র তাহা তখনই বোঝা গেল।

"Word over all, beautiful as the sky,
Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time be utterly lost."

ইউরোপেও আজ 'রক্তধূলির পথবিপথে' যারা মশাল জ্বালাইয়া ছুটিয়াছে, নিত্য-কালের আকাশকে আলোককে যারা ম্লান করিয়া দিল, একদিন যখন এ দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাইবে—তখন সেই আকাশ সেই আলোকেরই জয় হইবে। এবং তখন দেখিব যে,—

"মশালভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।"

শুধু এই যুদ্ধের কথাই বলি কেন, আমাদের হৃদয়রাগ (passion) যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেও নিত্যতাকে উ[illegible] হসিত করিয়া কত দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকা[illegible] সৃষ্টি করিয়া তোলে। কিন্তু শেষ পর্য্য[illegible] কি তারই জয় হয়?

উপমা কালিদাসস্য—এই ত প্রসিদ্ধি[illegible] কিন্তু উপমা রবীন্দ্রনাথস্য বলিলে মহাকবি[illegible] প্রতি কোন অমর্য্যাদা প্রকাশ পায় না[illegible] অন্ধকারের ঊর্দ্ধে মশালের আগুন [illegible] জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন কবি তাহা[illegible] উপমা দিতেছেন—

"বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল যেন দম্ভভরে"

এবং দূরের তারাগুলি তখন—

"দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।"

চমৎকার উপমা!

সমস্ত কবিতাটিই যেন ছবি-পরম্পরা[illegible] ছবিগুলির গ্রন্থনে একটা অপূর্ব্ব কাহিনী[illegible] আভাষ দিতেছে। রাত্রির অন্ধকার—র[illegible] ঘর্ঘর—পথের ধূলি রক্তময়—মশাল প্রদী[illegible] —দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ—ঘণ্টার শব্দ—সূর্য্যো[illegible] —মশাল নির্ব্বাপিত। এম্নিতর ছবির [illegible] ছবি। অথচ এ ছবিগুলি একটা [illegible] আইডিয়ার symbol মাত্র। সমস্ত কবিতা[illegible] অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সেই আইডিয়ার প্রা[illegible] স্পন্দমান। এইতো কবিতা।

বিদ্যাপতি

ফাল্গুনের 'সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত সুরেশ[illegible] চক্রবর্ত্তী বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ উপস্থি[illegible] করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন যে অনে[illegible] সমালোচকের মতে বৈষ্ণব পদাব[illegible] অশ্লীলতাপূর্ণ বলিয়া সে সব কবিতার কো[illegible] মূল্য নাই। এঁদের এই অভিযোগে[illegible]

উত্তরে তিনি বলেন, "কবি কি লিখ্‌বেন তার উপরে সমাজপতি নীতিবিদের হাত ত নেইই খোদ কবিরও বড় বিশেষ নেই।... কবির যেখানে এই কবিতার জন্ম হচ্ছে সেখানটা কুনীতি, সুনীতি, শ্লীল অশ্লীল জুড়ে বসে নেই—সেখানটা জুড়ে ব'সে আছে সত্য ও আনন্দ।"

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁর পদাবলীতে আগাথেকে গোড়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের কথার চাইতে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী। তার হৃদয়জ জিনিষটা প্রেমলোকের গানের বিষয় নয়—সেটা হচ্ছে কামলোকের ধ্যানের বস্তু।"

সমাজনীতি বা গার্হস্থ্যনীতির তরফ হইতে সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের বিচার চলেনা —সাহিত্যের বর্ণমালা-জ্ঞান যাঁর আছে একথা তাঁকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেননা সমাজনীতিকে রেয়াৎ করিয়া বাঁধা-দস্তুরের পথে যদি সাহিত্যকে চলিতে হইত, তবে সে সাহিত্য রবিবাবুর 'ব্যাঙ্গকৌতুকে'র 'সারবান্ সাহিত্যের' বিচিত্র নমুনামাত্র হইত। তাহা তখন মনু-পরাশরের বিধান অনুসারে প্রেমের কবিতা লিখিত, উপন্যাসে নায়ক নায়িকার প্রেমের বর্ণনাও ঐ বিধান অনুসারেই করিত। কিন্তু সাহিত্য বা আর্ট—ধর্ম্ম হোক্, সমাজ হোক্, এমন কি সভ্যতা হোক্—কারো conventionকেই খাতির করিয়া চলেনা বলিয়াই তার নব নব উন্মেষ এমন আশ্চর্য্যরূপে এমন বিচিত্ররূপে লক্ষ্য করা যায়। সেই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিই সাহিত্য-প্রতিভা।

সাহিত্যে তাই সমাজপতি বা পুরোহিত বা রাজার শাসন চলে না—কোন কালেই কি চলিয়াছে? কারণ, সাহিত্যে মানুষ যেমনটি ভাবে যেমনটি কল্পনা করে তেমনটিই প্রকাশ করে—সে প্রকাশের ফলাফল শুভ কি অশুভ তাহা তার চিন্তার বিষয় হয় না। প্রত্যেক সমাজেই ত ধর্ম্মনীতির কড়া শাসন বিদ্যমান, নইলে সমাজ চলে না। অথচ সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত 'অশ্লীল' সাহিত্যের ওজন বোধ করি শ্লীল সাহিত্যের চেয়ে ঢের বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কয়টা গ্রন্থ আছে (বৈরাগ্যশতক বা মোহ-মুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ বাদে অবশ্য) যাহা খুব নরম নীতিবিদেরও হিসাবে শ্লীল? শকুন্তলা কি সমাজনীতিজ্ঞের হিসাবে চলে? মৃচ্ছকটিক? ইংরাজী সাহিত্যেও ঠিক তাই। শেকস্‌পীয়র হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত প্রায় কোন কবিই নীতিবিদের পাস-মার্কা পান্‌না। ফরাসী সাহিত্যে রাবেলে, ইতালীয় সাহিত্যে বোকাক্‌সিয়ো, পেত্রার্কা প্রভৃতি, নীতি-বিদের কাছে বিভীষিকার বস্তু। একালের সাহিত্যের ত কথাই নাই—ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ ইব্‌সেন প্রভৃতি ত অচল।

তবে কি বলিতে হইবে যে, সাহিত্য নীতির কোন ধার ধারে না? যে-কোন দুর্নীতি সাহিত্যে প্রশ্রয় পাইবে? না। এমন আশঙ্কার কারণ নাই। কারণ সাহিত্য সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করে—জীবনকে যে সাহিত্যস্রষ্টা যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে ও দেখাইতে পারেন সাহিত্য-হিসাবে তাঁর আসন তত উঁচু। মানুষের জীবনে

কাম জিনিষটা কম প্রবল নয়, কামের প্রভাব প্রচণ্ড। সেই কামের লীলাকে যে কবি বা ঔপন্যাসিক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখান, তাঁর শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ সেই সঙ্গে বলিতেও হইবে যে, ইনি এর উর্দ্ধে এর বাহিরে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রেমের উচ্চ সপ্তকের সুর ইঁহাতে বাজিল না। বায়রণ বা বোকাকৃসিয়ো, ভারতচন্দ্র বা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে। সুতরাং সাহিত্যের মূল্য যাচাই এই হিসাবেই চলে যে, কোন্ সাহিত্যের মধ্যে জীবনের কতখানি প্রসার ও গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা স্থির করিতে হইবে। এ standardছাড়া অন্য যে কোন standard দিয়াই সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে, উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করা সম্ভব হইবে না।

অবশ্য এর চেয়েও বড় একটা ষ্টাণ্ডার্ড আছে। সে রসের ষ্টাণ্ডার্ড। সাহিত্যে প্রকাশ জিনিষটা সরস ও সজীব হইল কিনা, তাহা চিরকালের মানুষের আনন্দভোগে লাগিবে কিনা—সাহিত্যে এই বিচারটাই যথার্থ রসবিচার ও বড় বিচার। কবি ও অকবি এই বিচারের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু তারপরেও দেখা দরকার যে, জীবন জিনিষটা কোন্ কবি বা কোন্ সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে কতখানি প্রস্ফুর্ত্ত। কেননা তাহা না হইলে সকল কবির বা সকল স্রষ্টার আসনই সমান হইয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে সাহিত্যে জীবনের রস বিচিত্র—তা অলঙ্কার শাস্ত্রের নয় রস নয়। সেই বিচিত্র রস যাঁর লেখায় বিচিত্র ভাবেই ফোটে, তিনিই বড় স্রষ্টা। যাঁর লেখায় কম ফোটে, তাঁর স্থান নীচে।

বিদ্যাপতিকে যে সব সমালোচক অশ্লীল বলিয়া খাটো করিয়াছেন তাঁরা সম্ভবতঃ সমাজনীতির তরফ হইতে তাঁকে অশ্লীল বলেন নাই। তাঁদেরও বক্তব্য বোধ হয় এই যে, বিদ্যাপতির কবিতায় 'হৃদয়ের কথার চেয়ে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী'। বিদ্যাপতি কামলোকের সোপান বাহিয়া উচ্চতর প্রেমলোকের নিত্য-সুন্দর ধামে পৌঁছিতে পারেন নাই। দুএকটি কবিতায় তার আভাস মাত্র দিয়াছেন। তাই আমরা বলিব যে, বিদ্যাপতি রসস্রষ্টা হিসাবে বড় বটেন, কেননা কামের রস তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রসার সংকীর্ণ বলিয়া কবি হিসাবে তাঁর আসন শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিদের চেয়ে অনেক নীচে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ।

নিরালায়।

ভারতী

৪২শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ [২য় সংখ্যা

সাহারা রাগ

গাইব আমি আমার সুরে
তোদের সুরটি নাইক জানা,
মরুদেশের সাহারা শোন্
আমার রাগে নেই সাহানা!

ধূধূ বালুর মূর্চ্ছনা তায়
ঝঞ্ঝা উঠে মেলিয়ে ডানা,
কর্ম্মনাশা মীড়ে মীড়ে
মর্ম্মনাশা গমক হীনা!
আমার গানটি নাই শুনিলি
সাহারা সে, নয় সাহানা।

অচল ঠাটের বাহিরে ধায়
তীব্র কড়ি কোমল নানা,
বাঁধা সুরের জ্ঞানে বাধে
শুনিস্‌নেরে, মানিস্ মানা!

মরীচিকার মিথ্যা ঝলক
ঝল্‌সে আঁখি কর্‌বে কানা,
ধূসর বরণ প্রাণের আমার
শুন্‌বি যদি আলাপখানা!
মরুদেশের সাহারা গাই
আমার রাগে নেই সাহানা!

শ্রীসরলা দেবী।

শিল্প ও শিল্পী

দুইদলে ঝগড়াটা চলেছে এইভাবে :—

একদল শিল্পী-মানস-রূপকেই প্রাধান্য দিয়ে বলছেন, মনোজগতে যে রূপটি সেইটিকেই প্রকট করে তোলো; চোখে যে-রূপ দেখি তার সঙ্গে মেলে তো ভালো, না মেলে তো ক্ষতি কি! মনের মধ্যে মনের মানুষ, হৃদ্‌পিঞ্জরে মন-পাখী, মানস-সরোবর প্রভৃতি সমস্তই রয়েছে—বিচিত্র রূপ, রং, ভাব-ভঙ্গী নিয়ে। চোখের দেখা রূপের সঙ্গে তারা কতক মেলে, অনেকটা মেলেও না। শিল্পীর কাজ সেই মনের ছবি দেওয়া।

অন্যদল বলছেন, তা কেন? যে-রূপ চোখে পড়ছে সেইটেই যতটা নির্ভুল করে দেখাতে পারো দেখাও। মনোবিজ্ঞানের কথা ছাড়। দৃষ্টিবিজ্ঞান, অস্থিসংস্থান এগুলোকে বাদ দেওয়া কিছুতেই চলবে না। যা খুসি তাই আঁকবার কিম্বা গড়বার স্বাধীনতা এঁরা মোটেই স্বীকার করেন না। ইউরোপ এই তর্কটা কি-ভাবে চালাচ্ছে সেটা আমাদের দেখবার বিষয় নয়; তারা স্বাধীন জাতি, আর্টিষ্ট-বিশেষের ইচ্ছা-অনুসারে গড়া না গড়ায় খুব একটা সঙ্কীর্ণ মত সেখানে কারুর না থাকাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশ, যেখানে তর্ক ক্রমে মত এবং মত ক্রমে বেদবাক্য হয়ে উঠে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন-চেষ্টাকে সঙ্কীর্ণতার বেড়ি পরিয়ে দিতে অধিক বিলম্ব করেনা, সেখানে এই ঝগড়াটাকে বেশিদিন চলতে দিলে আমাদের ভালো হবেনা। যেমন খুসি দৃশ্যমান জগতের রূপগুলিকে ভেঙে-চুরে, নিজের কল্পনাকে ব্যক্ত-করার আর্টিষ্টের স্বাধীনতা আছে কি, নেই—একমাত্র সেইটেই দেখছি ভাববার বিষয়। কবি—তিনি নিজের কল্পনার মধ্যে যে ছবিটি দেখেছেন সেটি ব্যক্ত করবার বেলায় প্রকৃত বস্তুগুলোর সম্বন্ধে বেশ একটু স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন দেখি। চোখ কখনো পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় না, উড়েও চলে না; সাধারণে এইতো চোখে দেখেছে! কিন্তু কবির মনোরাজ্যে চোখ, দুই পল্লবের বেড়িতে ঘেরা চোখ নয়, সে ঘুরে বেড়ায়, উড়ে চলে!—

"নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে।"

এটা খুবই একজন আধুনিক কবি বলেছেন। এটা সুরে ছন্দে জীবন্ত হয়ে যখন উপস্থিত হল তখন সাধারণের কান মনে প্রবেশের পথটি কোনো প্রশ্ন না করেই ছেড়ে দিলে। ধরে নেওয়া যাক্ এ পদটার মধ্যে অসামান্য কিছু নেই—যদিও এটা পদ! কিন্তু "দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়!" কিম্বা যেমন—

"শুধুই শ্যামল অঙ্গ পরিমল চন্দন চুয়াকো ভাতি
মোর নাশা জনু ভ্রমরী উমতি ততহিঁ পড়ল মাতি।"

এই 'জনু' বা 'যেন'র জন্যে কবি যে বাস্তব-জগতে একটা অভাবনীয় কাণ্ড করলেন তার উপর কেন বলা তো চলে না! তা যদি বলি তো কবিকে লিখতে হয় চোখটা একটুখানি নড়ছে, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে রয়েছে। নাক বেচারা মাথা না নড়লে নড়তেই পারে না, উড়ে পড়া তো দূরের কথা! নাকের সম্বন্ধে কোন কথাই কবির বলা চলেনা।

বস্তুর মান সাধারণের কথায় বজায় রেখে চলা কবির পক্ষে সম্ভব কি না, কাব্য থেকে অসম্ভবকে বাদ দিতে গেলে কবিতা সম্ভব কিনা এটা আমার তর্ক নয়, কেননা আমি কবি নই। আমার ভাবনা শিল্পী আর শিল্প নিয়ে। শিল্পী কবিরই মতো মনো-জগতের বাসিন্দা হলেও অত নির্ভয় নয়। কবির মতো ভাব-রূপটির খাতিরে বস্তুরূপকে নিয়ে যা-খুসি সে করতে পারে না। বস্তুর বাঁধন শিল্পীকে নিগড়ের মতো বেঁধেছে। এই বাঁধন কতটা শিথিল করতে পারে—এই ইচ্ছাটা বা এই চেষ্টাটা শিল্পীর দিক থেকে কিম্বা শিল্পের দিক থেকে মার্জ্জনীয় কিনা সেইটেই দেখি। মনোরাজ্যে যে অবাধ কল্পনার আসনখানিতে বসে পুষ্পক-রথ থেকে আরম্ভ করে পুষ্পবৃষ্টি পর্য্যন্ত কবি সৃষ্টি করেন, ঠিক সে আসনটি শিল্পীকে দেওয়া চলে না। কথা দিয়ে, না হয় রেখা দিয়ে,—যদিও কবিতায় আর ছবিতে এইমাত্র প্রভেদ, তবু কথায় এতটা ইঙ্গিৎ-আভাস দিয়ে ভাবকে বুঝিয়ে দেওয়া চলে যে রেখা কি রং দিয়ে সেটা অসম্ভব, যদিও রেখা ও রং দুয়েরই আভাসে জানাবার ক্ষমতাও কম নেই।

"দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়"—এই ভাবটা কবিতায় দু-চারটে বাছা-বাছা কথাকে ছুঁয়ে সহজে শ্রোতার মনে গিয়ে একটা রূপ নিচ্ছে, কিন্তু ছবিতে? ইউরোপ যেমন মানুষের পিঠে ডানা দিয়ে গড়েছে পরী, তেমনি চোখকে দুখানা ডানা দিয়ে 'আঁখি-পাখী' গড়া তো শিল্পীর দ্বারা হতে পারেনা! চোখ যেমন ঠিক তেমনিই আঁকতে হবে, অথচ এই ভাবটা পূর্ণরূপে দর্শকের মনে ফুটে উঠবে। এই অসাধ্য-সাধন শিল্পীকে করতে হয়। নিজের নিজের পেশাটার বড়াই সবাই করে থাকে, তাই সভার মধ্যিখানে আমাকেও বলতে হচ্ছে শিল্পীকে এইরকমের সব অসাধ্য-সাধন করতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ছবির যে 'ছ' পর্য্যন্ত এগিয়েছে এমন সব অসাধ্য-সাধনের অতি-সহজ নানা উপায় সে আবিষ্কার করে নিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ভাবটিকে ছবিতে দিয়েছেন,—কোথাও চোখ দিয়ে, কোথাও চোখকে একেবারে বাদ দিয়ে, কোথাও বা চোখের সঙ্গে আর পাঁচটা সামগ্রী জুড়ে দিয়ে; কিন্তু পাখী দিয়ে, কি পাখীর একটি পালক দিয়েও নয়।

কবি এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য এবং ভাব ব্যক্ত করবার উপায়ের পার্থক্য থাকলেও, দুজনের মধ্যে আসলে মিল রয়েছে;—মানস-কল্পনাকে দুজনেই মূর্ত্তি দিচ্ছে,—যা দৃষ্টিতে পড়ছে এবং যা সৃষ্টির বাহিরেও রয়েছে দুই থেকেই উভয়ের মন রস সংগ্রহ করে চলেছে। কেবল মনের কল্পনাটা ব্যক্ত করবার উপকরণ ও উপায়ের প্রভেদ না হলে মনোজগতের দিকে কবির আর শিল্পীর সমান অধিকার দেখছি। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে সাধারণের বিচার কবিকে দিচ্ছে অভয়,—বস্তু অবস্তু দুইকে নিয়েই যথেচ্ছা সৃষ্টি করতে! বাস্তবকে যদি ভাংতে-চুরতে বাঁকাতে-চোরাতে হয় তাতেও কবি যেমন স্বাধীন, অবাস্তবের অবতারণা করতেও তিনি তেমনি নির্ভয়। কিন্তু শিল্পী ভাবের খাতিরে অবয়বের

যে মাপ অ্যানাটমি বিদ্যায় লিখ্‌ছে, কিম্বা সাধারণে চোখে সেটাকে যেমন দেখ্‌ছে, সে সম্বন্ধে একটু স্বাধীনতা নিয়েছে কি আর রক্ষে নেই!

Anatomy ও perspective যে দুটো রয়েছে, সে দুটোকে অস্বীকার করা কিছুতেই চলেনা; কিন্তু শিল্পে তারা যে সর্ব্বেসর্ব্বা নয় এটা বলতে আমরা কেন ইতস্তত করবো? যেখানে আমরা চোখের দেখা বস্তুটি মাত্র চিত্র করছি সেখানে সাধারণ anatomy ও perspective ইত্যাদির মাপ-কাঠি দিয়ে সেটাকে যাচিয়ে নেওয়া চলে এবং সে সহজ কাজটা সাধারণ-দর্শকেও পারে, কিন্তু যেখানে শিল্পীর সম্পূর্ণ মানস-কল্পনাটি রয়েছে, কিম্বা যেখানে বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি এসে মিলেছে, সে-স্থলে ও মানদণ্ডটি চালালে তো চলবে না! বহির্জগৎ রয়েছে এটা যেমন সত্য, আর্টিষ্ট মাত্রেরই, এমন কি সাধারণ মানুষ তাদেরও, একটি করে মনোজগৎ রয়েছে এটাও তেমনি সত্য।

ফটোগ্রাফের মন নেই, সুতরাং তার মনোরাজ্যও নেই; তার আছে মাত্র এই জগৎ। এ জগতের বস্তুগুলোকে সে খুব ঠিক দেখে, আর খুব ঠিক করে তাদের ছাপ নেয়। কিন্তু কলের এই দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের দেখার তফাৎ রয়েছে যে! মনের মধ্যেও যে সে দেখতে পাচ্ছে। বাহিরের এই রূপ মনে গিয়ে কি বিচিত্রতাই না পাচ্ছে!

এই মনের দেখা আছে বলেই একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফটো-যন্ত্রের, এবং সাধারণের দেখার সঙ্গে কবি ও শিল্পীর দেখার তফাৎ রয়েছে। রকম রকম মন নিয়ে এক এক লোক এই জগৎকে দেখ্‌ছে বলেই না জগৎ বিচিত্র ছবিতে, বিচিত্র কবিতায় ভরে উঠ্‌ছে চিরকাল। শুনেছি পাছে আর কেউ তাজ প্রস্তুত করে, সেই ভয়ে সাজাহান তাজের শিল্পীর প্রাণ হরণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর্টিষ্টের মনের চোখ কড়া হুকুমে বন্ধ করে দেওয়া, প্রাণদণ্ডের চেয়েও এই ভয়ানক শাস্তি, কেন যে এ দেশের শিল্পীর উপরে প্রয়োগ করা হচ্চে—তার কারণ খুঁজে পাইনে। হুকুম তো হচ্ছে, কিন্তু হুকুম প্রতিপালন করে কে? যে ইউরোপীয় শিল্পের কাছ থেকে এই হুকুমটা আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস, সেই ইউরোপই আপনাদের আর্টের মধ্যে কি কাণ্ড করছে দেখিনা।

ইউরোপীয়ান্ আর্ট পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল এখন তা নেই। যে দেশের র‍্যাফেল সেই দেশেই এখন futuristদের প্রকাণ্ড দল। এর উপর cubist, pre-Raphaelite, realist, idealist; এমন কি বেশির ভাগ লোক এখন Classic ও Greek artকে পূজা দিতেও নারাজ। আর আমাদের দেশে, সেই পঞ্চাশ বৎসর আগেকার হুকুম—সে ঘুরতে ঘুরতে যতই পুরোণো হচ্ছে, ততই অভ্রান্ত বেদবাক্যে পরিণত হচ্ছে। ফটো-যন্ত্র আজকাল রূপের সঙ্গে রংও দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ইউরোপ কোনো দিন তাকে যে মনশ্চক্ষু দিয়ে এদেশে পাঠাতে পারে এমন ভরসা আমরা করতে পারিনে, কাজেই এখনো অন্তত কতক পুরুষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মনের দেখা শিল্পে প্রচলিত থাকবে।

সঙ্গীতের জায়গা গ্রামোফোন, চিত্রের জায়গা ফটো-যন্ত্র—এটা চলবে না এখানেও!

নেপোলিয়ানের একখানা সচিত্র জীবন-বৃত্তান্ত দেখছিলেম। বইখানাতে নেপোলিয়ান আর তাঁর যুদ্ধের ঘোড়ায় কতকগুলি ফটো-গ্রাফ, এবং শিল্পীদের হাতের লেখা কতক-গুলি চিত্র, পাশাপাশি-ভাবে সাজানো আছে। ফটোয় আসল ফরাসী বীর আর তাঁর ঘোড়া একেবারে সাধারণ জীব। চলিত কথায় যাকে বলা যায় পাঁচ-পাঁচি-গোছের! দেখে মনেই হয় না এদের দ্বারা কোনো লড়াই সম্ভব! অথচ ঐ দুটোই—মানুষটি ও জন্তুটার নির্ভুল বাস্তবিক রূপ! এরি পাশে শিল্পীর লেখা নেপোলিয়ানের মানস মূর্ত্তিগুলি,—কোথাও সে তুষারপর্ব্বত অতিক্রম করে চলেছে মহাকায় অশ্বারোহী পুরুষ, কোথাও সে রত্ন-মুকুট-মাথায় সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বর! ফ্রান্সের দীনতম অধিবাসী মনে নেপোলিয়ানের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে ছিল, শিল্পীর দেখার মধ্যে সেই-গুলোই ধরা গেল, আর ক্যামেরা খুব নির্ভুল করে দেখলে অথচ সমস্ত ফ্রান্স এবং সমস্ত জগৎ যেটা দেখলে, সেইটেই দেখা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

পুরীতে বিমলাদেবীর মন্দিরের উঠানে একটা পাথরের প্রকাণ্ড শার্দ্দূল বসানো আছে। এই শার্দ্দূল-মূর্ত্তিটি না বনের, না চিড়িয়াখানার সিংহের সঙ্গে মেলে। এই মূর্ত্তির রূপ-কল্পনার সঙ্গে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সেটা থেকে আর্টের একটা দিকের কথা পাওয়া যায়। রাজার হুকুম হল—দেবীর মন্দিরের সাম্‌নে দেবীর বাহন শার্দ্দূলকে চাই। পুরীর মধ্যে সে নামজাদা আর্টিষ্ট, শ্বেত-পাথরে এক সিংহ গড়ে এনে হাজির। সিংহটি হল—ঠিক রাজার চিড়িয়াখানার সিংহ, একেবারে হাঁ করে, থাবা তুলে, ল্যাজ আপ্‌সে যেন গিলতে আসছে! সহরের লোক যখন সিংহের তারিফ করতে ব্যস্ত সেই সময় রাজা উপস্থিত। সিংহ দেখেই রাজা মহা খাপ্পা হয়ে শিল্পীকে বল্লেন "একি! এ তো আমার সিংহ, এ তো আমি চাইনি। দেবীর শার্দ্দূল—সে কি ওই চিড়িয়া-খানার সিংহ! যাও, এ সিংহ চলবে না, দোসরা গড়ে আন।"

দুই তিন চার, এমনি বারে বারে সিংহ আসে, প্রতিবার রাজা করেন না-পছন্দ। তখন শিল্পী পণ্ডিতের শরণাপন্ন হল—চাকরি বুঝি-বা যায়! পণ্ডিত শিল্পশাস্ত্র খুলে শার্দ্দূলের ধ্যানটি তাল-মান-সমেত তাল পাতায় আঁচড়ে দিলেন—বেরালের মতো চাকা মুখ, ভাঁটার মতো দুই চোখ, মুলোর মতো দাঁত, কুকুরের মতো জিহ্বা, ঘোড়ার মতো কেশর, সুন্দরী স্ত্রীর মতো কটি, গরুর মত ল্যাজ, বাঘের মতো থাবা। শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে মূর্ত্তি এবার প্রস্তুত হল; পণ্ডিত সেটাকে ঠিক বলে সার্টিফিকেট দিয়ে, শিল্পীর নমস্কার ও দক্ষিণা নিয়ে বিদেয় হলেন। কিন্তু রাজা দেখলেন সেটা শার্দ্দূল তো হয়ই নি, উপরন্তু সেটা মুলোর ক্ষেত, বা কুকুর, কি ঘোড়া, কি স্ত্রী, কিম্বা বাঘিনী কোনো-কিছু-একটাও হয়ে ওঠেনি। পণ্ডিতের বৃত্তি এবং আর্টিষ্টের ভাতা বন্ধ হল।

হতমান শিল্পী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে দেখছে—দেয়ালের গায়ে পিটুলীর

আলপনায় দাগা, ঘণ্টা-চামর-মুকুট-মণিহার দিয়ে সাজানো, এক শার্দ্দূলের চিত্র তার ছোট মেয়েটা দেগে রেখেছে। বাপের প্রশ্নে মেয়ে বল্লে—নদীতে স্নানের সময়, জলের মধ্যে এই মূর্ত্তি ছায়ার মত সে দেখেছে,—বোধ করি দেবী আকাশ-পথে তখন মেঘের মধ্যে দিয়ে বিচরণ করছিলেন!

উড়িষ্যার মহাপাত্রটির উচিত ছিল চিড়িয়াখানা এবং পণ্ডিতের টোলে দুজায়গাতেই না যাওয়া। শার্দ্দূল-মূর্ত্তিকে সেই ছোট মেয়েটির মতো নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ টেনে বার করবার চেষ্টাই ছিল কথা। শাস্ত্রের বচনকে এবং চিড়িয়াখানার সিংহকে যথাযথ ধরতে যাওয়াই হয়েছিল শিল্পীর ভুল। যেখানে শিল্পী মন থেকে সৃষ্টি করার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পাচ্ছে সেখানে সে যায় কেন সৃষ্ট বস্তুর নকল এবং শাস্ত্র ও শাস্ত্রীর হুকুমের দাস হতে?

পুরীর এই সিংহটির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী যাই থাকুক, সেটির গঠনের বাহাদুরী দেখলে পাকা কারিগরের হাত যে তাতে পড়েছিল তা বেশ বোধ হয়। শিল্পের মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে, পাকা হাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তার সঙ্গে যোগ দেয় তখনি মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।

এই মূর্ত্তির পাশে, জাপানের এক শিল্পীর লেখা একটি বাঘের চিত্র রেখে দেখলে আমরা দেখবো পুরীর শিল্পীর মতো জাপানী চিত্রকরও মন থেকে বাঘ কল্পনা করেছেন। খাঁচার বাঘের সঙ্গে এই বাঘটিকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় ঠিক বাঘের দেহখানি নকল করা হয় নি, কিন্তু বাঘের ভীষণতা সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে।

এখন কথা হচ্ছে—ছেলেদের 'কাপি বুক'এর যে বাঘ, সে বাঘের অবয়ব, ঠিকঠাক ভঙ্গী, সব বজায় রেখে আর্টের জিনিষ হয়ে ওঠে কি না—যদি তার মধ্যে বাঘের ভীষণতাটি না দেওয়া যায়। হয়ে উঠবে, নিশ্চয় হয়ে উঠবে, কিন্তু বস্তুর ছাঁদটি ঠিকঠাক মান-পরিমাণমতো বজায় রেখে, একচুল এদিক ওদিক না করে, আর্টিষ্ট তাঁর বাঘের চিত্রে সেই হিংস্রতা কুটিলতা ফুটিয়ে তুলতে কিছুতেই পারবেন না! এটা শুধু কথার কথা নয়।

বাস্তবিক বাঘটার বাহিরের চেহারার মধ্যে এমন-কিছু নেই যে সেটাকে দেখলেই ভয়ানক রসের উদ্রেক হবে। তা যদি থাকতো তবে ছেলেরা আলিপুরের দিকেই যেতে চাইতো না। ছোট ছেলে যে বাঘের চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—বাঘের অবয়বটা তো তাকে ভয় দেখায় না! বাঘকে সে একটা বড় জাতের বেরালই মনে করে। একটা গল্প আছে—এক কাপ্তেন সাহেব একবার সুন্দরবনে জাহাজ লাগিয়েছিল; তখন খালাসীরা নতুন বিলাত থেকে এদেশে এসেছে; একটা বাঘকে তীরের উপরে বসে থাকতে দেখে খালাসীরা কাপ্তেনকে শুধোলে—ওটা কি? কি জানি কি মনে করে সাহেব বলে দিলেন—Indian Cat. খালাসীদের বেরাল পোষবার সখ হলো, জন পাঁচ-সাত মিলে অনেক ধস্তাধস্তি আঁচড়-কামড়ের পরে বাঘটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে জাহাজে এনে উপস্থিত। সবাই মিলে

কাপ্তেনকে যখন সেই বেরালটি বকসিস্ দিতে যায়, তখন কাপ্তেন বল্লেন ওটা কি জানো,—Indian Tiger!

যতক্ষণ জানা যায়নি বাঘ বলে, ততক্ষণ বাঘের জাজ্বল্যমান রূপ তাদের কাছে কোনো ভীষণতা ব্যক্ত করেনি, বাঘ সে বড় জাতীয় বেরালের চেয়ে একতিলও বড় ছিলনা; কাপ্তেনের এককথায় সে আর বেরাল রইল না, সত্যি বাঘই দেখা দিলে!

শিল্পেও তেমনি। কাপ্তেনের ওই একটি কথার মতো ঠিক অবয়বটির একটুখানি টেপা-টোপা টানা-টোনা অদল-বদল না করলে, বহিরঙ্গীন রূপের পর্দ্দা সরিয়ে, আভ্যন্তরীণ যেটা, সেটাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে কতটা অদল-বদল, কতটাই বা ভাঙাচোরা সইবে সেটা স্থির করবার ভার শিল্পী ছাড়া, সাধারণ কমিটির হাতে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি আমরা; কিন্তু তাতে শিল্পী বেচারাকে নানা মুনির নানা মতের ফের থেকে আমরা কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না। জন-সাধারণের দেখার সঙ্গে শিল্পীর দেখার যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে। বাহিরের রূপ পর্দ্দার মতো ভিতরের পদার্থ টিকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে, সেই পর্দ্দা সরিয়ে যাওয়া এবং সরিয়ে দেখানোই শিল্পীর কাজ।

মনোজগৎ এবং ভাবজগৎ ছেড়ে একবার চোখের-দেখা জগতে নামা যাক্। মানুষের অবয়বটা সৃষ্টি হয়েছে যে প্ল্যান-অনুসারে, বানরের অবয়বেও ঠিক সেই একই প্ল্যান। ঘোড়ারও কঙ্কালে মানুষের মতো ঠিক ততগুলো অস্থি ঠিক তেমনিভাবে সাজানো আছে। অথচ সেই একই প্ল্যানের মধ্যে বিচিত্র তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা জীব দেখছি। এই যে মানুষে-মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে ইতর জীবগুলির আকার-গত প্রভেদ, এটা সৃষ্টিকর্ত্তা ঘটান্ কোন্ উপায়ে? ওই কঙ্কালটা যেটা মানুষে এবং অন্য জীবে প্রায় এক, সেইটেকে ঢেকে কোথাও লম্বা ছাঁদ কোথাও সুশ্রী কোথাও সোজা কোথাও বাঁকা দিয়ে নয় কি?

বিধাতা দেখছি বিচিত্রতার সৃষ্টি করছেন ছাঁদ দিয়ে,—ছাঁদকে খাড়া রাখছে কঙ্কালটা এইটুকু মাত্র। শিল্পীও বিচিত্র রূপ গড়ে তোলে ঠিক এই নিয়মে; কেবল সে কঙ্কালটা অতটা কৌশলে গড়েনা; খড়-জড়ানো কাঠামো, ব্রহ্মসূত্র কিম্বা জলের পাইপ—এমনি একটা মোটামুটি জিনিষের উপরে সে ছাঁদকে বসায়; তারপর নানা রেখা, নানা ভঙ্গী শিল্পী নিজের থেকেই দেয়। এই ছাঁদ শিল্পীর মনের ছাঁদই হোক, আর দেখা কোনো বস্তুর নকল করা ছাঁদই হোক, দেশ-ভেদে, শিল্পী-ভেদে সেটা রকম-রকম হবেই এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কঙ্কাল বদলায় না; কিন্তু ছাঁদ বদলায়। ছাঁদ গতি দেয়, বিচিত্রতা দেয়, ছাঁদের একটু-আধটু এদিক-ওদিকে জিনিষটা পুতুলও হতে পারে, সজীবও হয়ে ওঠে; সুন্দরও হয়, কুৎসিতও হয়। আর্টিষ্টের পক্ষে কঙ্কালের অস্থি-সংস্থান তন্ন তন্ন করে জানার চেয়ে, ছাঁদের রহস্য-জ্ঞানই হচ্ছে আসল দরকার।

ভাবকে ধরার একটি ফাঁদ হচ্ছে ছাঁদ। ভাবকে ঠিক ধরতে যদি আঙুলকে লম্বা ছাঁদ, চোখকে আকর্ণ-বিশ্রান্ত ছাঁদ, কটিকে

যদি একেবারে অসম্ভব-রকম ক্ষীণ, এমন কি মানুষকে অসম্ভব-রকম অমানুষ ছাঁদ দিতে হয়, তবে তাও করতে হবে। সাধারণে কি বলবে, কিম্বা আমাদের শিল্প-জগতের বাস্তব-পন্থীরা সেটাকে দুষবেন, এ কথা ভেবে হাত-গুটিয়ে বসলে তো চলবে না। ছাঁদ বিষয়ে আর্টিষ্টের সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া চাই। শুধু যে ভাবাত্মক শিল্পের বেলাতেই আর্টিষ্টের এই স্বাধীনতা তা নয়, যখন সে চোখে দেখে কারো প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তখনও তাই।

মানুষ দণ্ডে দশবার দশ রকম মুখোস খুলছে, পরছে। বাইরে এল সে এক মুখোস, ঘরে সে আর-এক! যখন সে আফিসে কেরাণী তখন মুখোসটা দীন-হীন গোছের, আবার যখন সে ইস্কুলের মাষ্টার-মশায় তখন ভীষণ গম্ভীর, যখন সে সাধারণ সভায় আচার্য্য উপাচার্য্য কি বক্তা কি শ্রোতা তখন যে মুখোস, ফেরি জাহাজের আমাদের "গুপ্তক সভায়" যাবার বেলায় সে মুখোসটা সে সম্পূর্ণ বদলে আসে। এ ছাড়া Regimental uniformএর মতো মানুষের বংশগত, পিতৃপরম্পরাগত উর্দ্দির ধরণের মুখোস; আটপৌরে মুখোস, Title-holderএর মুখোস! politician, journalist, artist, poet, philosopher প্রভৃতির হাজার-একশো-একের চেয়েও বেশি মুখোস আমাদের আছে। আর্টিষ্টের স্বাধীনতা থাকা চাই এই হাজার হাজার মুখোসের মধ্যে যে-কোনো-একটা মুখোস আমায় পরাতে কিম্বা এ সমস্ত মুখোস টেনে ফেলে মুখোসের পর মুখোসের কৌটোর মধ্যে যে আয়ার-আমিটি লুকিয়ে রেখেছি সেইটে টেনে বার করতে।

হয় তো এমন হল যে, নিজের কাছে এ আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার এক মুখোস প্রিয় এবং সুপরিচিত, কিন্তু আর্টি মূর্ত্তি গড়বার সময় সে মুখোসটা না নে নিয়ে, আমার নিজেরই, অথচ সম্পূর্ণ অ ধারণ একটি মুখোস পরিয়ে আমায় ছে দিলে! তখনই আমরা আদালতে চল আর্টিষ্টের সঙ্গে মামলা করতে। তাতে এ হতে পারে যে আর্টিষ্ট হারালে পারিশ্রমিক আবার এমনো হতে পারে যে আর্টি হারালেম শিল্পীর হাতের একটি অপূ রচনা! নাটক-রচয়িতা কবির সমস্ত মৎল ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অভিনয়ের সময়, যা নাটকের পাত্র ও পাত্রী সাজবে, তা নিজের নিজের সাধারণ মুখোস পরেই মঞ্চে অবতীর্ণ হতে চায়। সেই সময়ে সাজ-ঘ আর্টিষ্টের প্রয়োজন। সে কুরূপাকে সুরূপ কিম্বা এর বিপরীতটাও করবার জন্য অভিনেতাগণের মামুলি চেহারাটার উপ স্বাধীনভাবে হাত চালালে কবির কাছেও বাহবা পায়, দর্শকের কাছেও সাধুবাদ পেয়ে থাকে। কবি মৎলব ঠিক করে দিয়ে বসে আছেন, শিল্পী সেই মৎলবকে রূপ দিচ্ছেন, জন-সাধারণ দর্শকের জায়গায় বসে গোলমাল না করে সমস্তটা উপভোগ করেছে।—এইটেই হওয়া দরকার। না হলে সাধারণের জায়গা থেকে সাজঘরে এমন সাজাও, তেমন মৎলব কর—এমনটি হলে, কিম্বা সাজঘরের মধ্যেও সেপাই বিদ্রোহ উপস্থিত করলে, আর্টিষ্ট ও কবি দুজনেই মুস্কিলে

পড়ে এবং অভিনয়টাও ভেঙে যায়। জগতের নাট্যশালায় কবি আর শিল্পী দুজনের একই কথা—

"কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি—
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন ঘাসের খেলাঘরে
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।"

সাধারণের দৌড় কেবল পাতাকে পাতা তৃণকে তৃণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত। বনের পাখী, বনের পাখী তাকে কোনো খবর—কারু খবর পৌঁছে দেয় না। সে তাস খেলে, টেনিস খেলে, খেলাঘরের খেলার সাথীকে নিয়ে খেলবার অবসর সে যেমন চায়না, তেমনি পায়না। অন্য দেশে শিল্পের কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, কোন্ ছবিটা ঠিক, কোন্ ছবিটা নয় তার বিচার করবার প্রণালীটা যাই হোক, ভারতবর্ষে সাধারণ-ধারণার ছোট বাটখারায় ওজন করে যে শিল্পীর বেলায় তুলাদান ব্রতটা সাঙ্গ করা হয়ে থাকে এটা সত্য।

আদালতে 'কমন্' জুরির বিচার চলে কিন্তু তত্ত্ব-পরীক্ষার বেলায় আমাদের জহুরীর কাছে যেতে হয়; নয় তো নিজে জহুরী হয়ে ওঠা চাই।

ইউরোপে শিশুকাল থেকে আর্টের চর্চ্চা সাধারণ লোকে করছে আর আমরা —আগেকার আমরা নয় এখনকার আমরা— সব করছি কেবল ওইটে নয় শিল্পের যথার্থ ভাও নির্দ্ধারণ করতে সেই জন্যে আমাদের গোলযোগ হচ্ছে। শিল্পীর দেখাকে আমাদের সাধারণ দেখা দিয়ে আমরা মিলিয়ে নিতে চলি, তাতে করে শিল্পটা হয়ে আসে খাটো আর আমাদের সাধারণ দেখাটাই হয়ে ওঠে বড়।

এটা আমার ঘটেছিল। ছেলেবেলায় বুড়ো দেওয়ানজীর মুখে আমাদের ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে সোনার ইট ছিল, শুনতেম। ছেলে বুদ্ধিটি নিয়ে আমার ইঁটের মাপটাই যে সোনার ইটের মাপ, এটা আমি ঠিক করে রেখেছিলেম। বড় হয়ে পর্য্যন্ত আমার সেই ধারণা। Bar-Gold Brick-Gold যখন শুনি, তখনি লোহার মোটা গরাদে এবং এগার ইঞ্চির তুল্য মূল্য দিয়ে সেটাকে দেখি। একদিন খানিক সোনার প্রয়োজন, সরকারকে সোনা আনতে বলায় সে বল্লে— সোনার টালি বাজারে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। আমি টালিই আনতে হুকুম দিলেম। সমস্ত দিন আমার মাথায় টালি ঘুরতে লাগলো। কিন্তু সোনার টালিটা এল ঘরের ছাদের টালির চেয়ে অনেক ছোট, অনেক পাতলা! টালির ধারণা নিয়ে সোনার তক্তি দেখতে গেলে যে গোল, বাস্তব-জগতের বস্তুগুলো সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ-দৃষ্টি নিয়ে, শিল্পীর সৃষ্টির দিকে দেখলেও সেই গোলযোগের সম্ভাবনা নিশ্চয়। চাক্ষুষ বস্তু সম্বন্ধে তো এই। জিনিষটার ভাব বোঝাও শক্ত হয় যদি সেটায় চোখ বুলিয়ে যাই মাত্র। সকালে আমেরিকায় একটা তার পাঠালেম— "Thirty one pictures, full number already sent, invoice goes next mail, make payments to me."

সন্ধ্যাবেলায় censor আফিস থেকে, আমার explanation তলব করে এক প্রকাণ্ড

গালা-মোহর করা চিঠি! তারটার কোথায় যে গোল ঠিক করতে না পেরে ব্যারিষ্টার সঙ্গে আমি একেবারে আফিসে হাজির —যুদ্ধের গোরার সাজ-পরা বড়-সাহেবের কাছে! সেখানে শুনলেম আমার লেখায় punctuation নেই; এবং censor সমস্ত রাত ধরে তার কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে পারেনি! এত বড় সাধারণ মানুষকে গভমেণ্ট আমাদের গোপনীয় চিঠি খুলে পড়বার ভার দিয়েছেন জেনে আমি অনেকটা আরাম পেলেম। লেখাটা punctuation দিয়ে পড়ে full number মানে যে total number এখানে বোঝাচ্ছে সেই বলে দিয়ে censorএর কাছ থেকেও ধন্যবাদ নিয়ে এসেছি।

শিল্পীর কাজের মধ্যে, তিনি রূপকে যে-রকমে punctuate করে ভাবটা বোঝাচ্ছেন, সেটা সাধারণ punctuation হলো তো সাধারণ সেটাকে আর censor কল্লে না; কিন্তু শিল্পী যখন নিজের punctuation দিচ্ছেন, তখন সাধারণ বুদ্ধির কাছে সেটা হেঁয়ালি, কাজেই সে যখন সত্য বলে তখন বলে, 'বুঝলেম না মশায়!' কিন্তু যখন সে বলে—'আরে ছ্যাঃ ছাই হয়েছে'—তখন নিজের দিক থেকে সত্যবাদী, কিন্তু আর্টের দিক থেকে সে যে একটা মিছে তর্কের বোঝা বয়ে চলেছে এইটেই প্রমাণ হয়।

শিল্প যখন সাধারণে দেখাবার জিনিষ তখন সাধারণকে তার মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে বাধা দেওয়া চলে না; কিন্তু সাধারণ যে তাই বলে. শিল্পীকে হুকুম করবে, নিজের standard of judgment শিল্পীরও standard of judgment হোক এ কথা বলবে, এটা কেমন করে হতে পারে?

আমরা যেমন দেখছি শিল্পী কি কবি জিনিষটাকে তেমন করে দেখছেন না। যে দর্জ্জি নয় তাকে কোট প্রস্তুত করতে দিলে সে তার অজ্ঞতার পরিমাণকেই সে কোটের মাপে খাটাবে, কিন্তু যে পাকা দর্জ্জি সে জানে এক মাপ সবার নয়, এমন কি তার নিজের মাপও অন্যের উপরে খাটানো চলে না;—যদিও সে একজন সুপুরুষ।

গ্রীক শিল্পের উন্নততর মাধুর্য্য ও ভাবের দিকটা ছেড়ে দিয়ে তার কারিগরির দিকটাই দেখি। গ্রীক শিল্প Phediasর আমলে দৈহিক গঠন সম্বন্ধে, সাধারণ মানুষের ছাঁদকে অনেকটা স্বীকার করেছে। যাঁরা শিল্পে বাস্তব-পন্থী এটা তাঁদের কাছে মস্ত একটা প্রমাণ। কিন্তু গ্রীক শিল্প মস্ত শিল্প; সেখানকার শিল্পীরাও সাধারণ মানুষ ছিল না; তারা জান্‌তো মানুষটাকে যদি সব-দিক-দিয়ে মানুষ করে তোলা যায় তবে সেটা সাধারণ ছাড়া আর কিছু হবে না। তারা এই চোখ মুখ হাতকে এমন size দিয়ে গড়েছে যে সে sizeএর মানুষ গ্রীসের সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। গ্রীক শিল্পের life-sizeটি হচ্চে সব-দিক-দিয়ে সাধারণ মানুষের মাপের চেয়ে একতাল বড়। মানুষের চোখে সাধারণত মণি থাকে, গ্রীক মূর্ত্তিতে, অন্তত ভালো ভালো মূর্ত্তিতে, তা নেই! size সম্বন্ধে আতিশয্য, এবং চোখের মণি প্রভৃতির সম্বন্ধে অসাধারণতা ও অবাস্তবতা-প্রয়োগের স্বাধীনতা, এমনি আরো কত কি, গ্রীক শিল্পকে

বাঁচিয়েছে—common-place হওয়া থেকে। আমার মনে হয়, আমাদের কলেজ স্কোয়ারের মূর্ত্তিগুলোর size যদি ত্রিরাট রকমের করে তোলা যায় তবে তাদের পুত্তলিকা ভাবটা নিশ্চয়ই চলে যায়। সব দেশের সব শিল্পী রূপ দিয়ে,—রূপের পরিমাণ, ভাবভঙ্গী, রং চং সব দিয়ে,—সাধারণ দৃষ্টি, সাধারণ জ্ঞানকে ছাড়িয়ে উঠছে। চোখের দেখার কারাগার থেকে মুক্তি দেবার না-দেবার কর্ত্তা সাধারণ মানুষটি নয়, কর্ত্তা হচ্ছেন আর্টিষ্ট ও কবি নিজেরাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম কেন হবে?—এখানে বলা চলে না। শিল্পীর করা, আর কবির বলা দুইই যখন শেষ হয়েছে, তখনি কেবল সাধারণ আসতে পারেন মতামত প্রকাশ করতে।

আমাদের শিল্প-শাস্ত্রের একটি অনুশাসন হচ্ছে "দেব-মূর্ত্তি গড়বে, মানব-মূর্ত্তি নয়!" এই শাস্ত্র-বাক্যটা দুই রকমে শিল্পীর উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। খুব সঙ্কীর্ণ অর্থটা বেড়ির মতো শিল্পীকে পরিয়ে বলা—কেবলি হরি হরি হর হর, কেবলি চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন ষড়ানন গজানন! এ মানুষও নেই, এ পৃথিবীও না, আছে কেবল তেত্রিশ কোটী অদ্ভুত লোক! ইউরোপীয় পরিব্রাজকরা এই শাস্ত্র-বাক্যের সঙ্কীর্ণ অর্থটাই যেন আমাদের শিল্পের উপরে কাজ করেছে দেখে। এখানে মাটি খুঁড়লে দেবতা, জল সেঁচলে দেবতার মূর্ত্তি, মন্দিরগুলো—গোপুর থেকে দেউল—আগাগোড়া দেবতায় মোড়া। পর্য্যটকের এটা ভাবা আশ্চর্য্য নয় যে এদেশের শিল্পীর স্বাধীনতা মোটেই ছিল না, ব্রাহ্মণেরা এদের দিয়ে যা খুসি তাই গড়িয়েছে!

এ কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু যখন একটু ভালো করে চারিদিকটা দেখি, যখন অন্ধকারের মধ্যে এক-একটা মূর্ত্তি একটা-একটা চিত্র একটা-একটা জ্যোতিষ্কের মতো চোখে পড়ে তখন মনে হয়—না যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়! অনুশাসনটা solitary cellএর দেয়ালের মতো শিল্পীকে কয়েদ করেনি, ফাঁক ছিল। form সম্বন্ধে শিল্প শাস্ত্রে যে-বাঁধাবাঁধি, feeling সম্বন্ধে সেটা একেবারেই নেই,—শিল্পীর ধ্যানের উপরে সেখানে সম্পূর্ণ নির্ভর! এতে হয়েছে, কেবল যারা কারিগর তারা academic শিল্পের মতো বড় একটা আশ্রয় পেয়ে mediocre হবার সুবিধে পায়নি, আর যারা উঁচু দরের শিল্পী ছিল, ভাবরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। পূজার মূর্ত্তি গড়েও শিল্পীর তখন যথেষ্ট অবসর ছিল, এবং সেই অবসরে তারা ইচ্ছা-মতো গড়তো এবং লিখতো; অজন্তা চিত্রাবলী বুদ্ধের মূর্ত্তি—এইগুলো তার সাক্ষী।

শিল্পশাস্ত্রের মূর্ত্তি-লক্ষণে স্পষ্ট করে বলা রয়েছে:—'কেবল যে সকল মূর্ত্তি পূজার জন্য, তারি এই লক্ষণ। অন্য মূর্ত্তি শিল্পী যথেচ্ছা গড়তে পারেন।'

সময়ে সময়ে শাস্ত্রের বাঁধন যে কড়া হয়ে উঠেছে, এবং লোকে সেটাকে আমোল দিচ্ছেনা তারও প্রমাণ শিল্পশাস্ত্রে এবং আমাদের শিল্পের মধ্যেও পাচ্ছি।

প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায়ের শেষ ছত্রে শুক্রাচার্য্য বলছেন—

"এই যে লক্ষণাক্রান্ত শিল্পের কথা বলা গেল এটা হল 'পণ্ডিতানাম্ মতম্'। এছাড়া

প্রাণ যেটায় খুঁসি হচ্ছে সেইটেই শিল্প। —"তত্র রম্যং যত্র লগ্নংহি যস্ত হৃৎ।"[৯]

কোণার্ক মন্দিরে যাচ্ছি। পাদ্রি বন্ধু বল্লেন—যেওনা! শিল্প সেখানে কোথা? পাগলের খেয়াল দেখবে! এ সত্ত্বেও ঝড় মাথায় করে কোণার্কে উপস্থিত। সমুদ্রের খোলা বাতাসের মধ্যে সেখানে শিল্পী ও তার শিল্প সম্পূর্ণ স্বাধীন; দেখলেম—

অরুণ-সারথি সূর্য্যের রথের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন! শাস্ত্রে সে মূর্ত্তির লক্ষণ নেই, আর্টিষ্ট সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে গড়েছে—রূপের মধ্যে রূপের দেবতা! সকালের আলোর মতো সেই ঘোড়া অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসছে। নতুন দিন সমুদ্রের পরিষ্কার বাতাসে উত্তরীয়টি উড়িয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে এল, এই ভাবটি মাত্র! ঘোড়া সেখানে শিল্পী গড়েছে সাধারণ ঘোড়ার মতনই নয়, সারথি সে যেন তেজের প্রতিমূর্ত্তি! এরি ঠিক সামনে শিল্পী গড়ে রেখেছে কালো-পাথরে একটি একেবারে হুবহু রাজহস্তী! সেখানে শিল্পী ঐরাবতের দিক দিয়েও যায়নি; হাতীর সহজ মূর্ত্তির মধ্যে যে বিপুলতা আর গাম্ভীর্য্য সেইটুকু ঠিক গড়েই সে ছেড়ে দিয়েছে।

শিল্পের দুটো দিকই শিল্পীর কাছে খুলে যায় যখনি সে শাস্ত্র এবং সাধারণ দুয়েরই উপরে একটি স্বাধীন আসন অধিকার করবার সুবিধা পায়। মাষ্টারের শেখানোতে কিম্বা প্রভুর হুকুমেতে শিল্পও হয় না, শিল্পীও হয় না। শিল্পী এসেছে একটা হতভাগা স্কুল-পালানো ছেলের মতো একেবারে দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা নিয়ে। পূজারী তাকে ধরে বলছে—গড়্ দেবতা; মাষ্টার তাকে ধরে বলছে—পড়্ anatomy, শেখ্ perspective; প্রভু তাকে বলছে—লেখ্ আমার রূপ-বর্ণনা; আবার সভার মধ্যিখানে পাঁচজনে তাকে বলছে ব্যাখ্যা কর্ শিল্প-শাস্ত্র! শিল্পীর জীবনের ইতিহাস এই!—চারিদিকে জুলুম-জবরদস্তি, তারি ফাঁকে-ফাঁকে সে মনোরাজ্যের খেলা-ঘরে এক একবার সাথীর সঙ্গে খেলে নিচ্ছে—সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেলা!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাদ্‌শাজাদী

কম্‌লাফুলি ঘোম্‌টা খুলি' এলিয়ে দিয়ে চুল,
একলা ঘরে বাদ্‌শাজাদী ছিঁড়্‌তেছিল গুল।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্‌কা পানে চায়,
সুর্‌কি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌ল যুবা তায়।
কি সুন্দরী সেই তরুণী ইরাণ নারী-কবি!
অরুণ-রথে আবীর-খেলা করলে সুরু রবি।

"ভুলিয়েছে মন রঙীন্ স্বপন"—গাইল রূপোন্মাদ,
"কে পেতেছে সূর্ম্মা-পিছল চোখের চোরা ফাঁদ?
তোরের রাঙা রঙের রসে ঠোঁট-দুখানি লাল,—
দুল্‌ছে আলোর ঝুম্‌কো-লতা, উড়্‌ছে অলক-জাল।
মেহ্‌দি-রাঙা পা দু'খানির আধেক দেখা যায়,
লুকিয়ে আছে আঙুলগুলি জরির পাদুকায়।

এস আমার ফুলের ঝড়ে কাজ্‌নেরি রাণি,
রূপের নতুন লোরোজাতে বাড়িয়ে দেবে পাণি।"
সে গান গিয়ে ঢেউ তুলিল বাদ্‌শাজাদীর বুকে,
রঙ্গঢালা হাসির আলা ফুট্‌ল চোখে মুখে।
ভাব্‌লে বালা খেল্‌বে খেলা মনের ছিনি-মিনি,
ছড়ায় পথে গুল্‌পশরা বাদ্‌শাহ-নন্দিনী।
প্রাণের গোপন কার্ব্বা থেকে ঝর্‌ল সুবাস-ধার,
পিছন থেকে খেলার পরী চোখ টিপিল তার।
গাইল বালা,—"চায় কে মালা? স্পর্দ্ধা এত কার?"
খাম্‌ল বনে বনের পাখী গাইল না সে আর।

বছর পরে আবার দেখা, সে এক সন্ধ্যাবেলা,
রাবির জলে বাদ্‌শাজাদী কর্‌তেছিল খেলা।
নবীন এলা-বল্লী জিনি' নন্দিত-যৌবনা,
মন্মথ-মন-উন্মাদিনী, নেত্রে অনল-কণা।
আবার হোলো চোখোচোখী,—নিখুঁৎ পদ্মফুল
পাপ্‌ড়ি মেলে রাবির জলে সৌরভে আকুল।
সাক্ষী রহে আশ্‌মানেতে ইদের চাঁদের ফাল্লি,
সন্ধ্যাতারার চোখের পাতে দেয় রূপালি চালি'।

মুগ্ধ যুবা দেখ্‌ছে তখন—দুল্‌ছে স্বপন-দোলা,
নাচ-মহলের কাচ-দরজা সাম্‌নে গো তার খোলা।
মেঝের পরে শাদা-কালো মারবেলেতে গাঁথা
অপরূপ এক পাশাখেলার 'ছক' রয়েছে পাতা।
বাদ্‌শা খেলেন রূপের পাশা, বেগম-গুটি চেলে',
চম্‌কে ওঠেন ঠুংরী ঠেকার তালটি কেটে গেলে,
হুকুম ছিল উড়িয়ে ওড়্‌ন্ চরণ ফেলে ফেলে,
মিলিয়ে গলা বেয়ালা-সুরে খোস্‌বো যারে ঢেলে।
নূপুর-ভরা নৃত্যলীলা, অপাঙ্গে ফুল-বাণ,
সুন্দরীরা 'আড়ি'র দানে মাৎ করে গো প্রাণ,
জোড়ায় জোড়ায় ঘাঘ্‌রা ঘোরায় পাঁচশো কিশোরীতে—
গিট্‌কিরীতে টিট্‌কারীতে ছুট্‌ল বাঁশরীতে।
তর্ করেছে আগ্‌রা-পুরী রসের তরঙ্গী,
ফুর্ত্তি-জোয়ার উজিয়ে চলে হাজার ভ্রূভঙ্গী।
স্মরতি-রসে ঘুর লেগেছে, পড়্‌ছে টলে' শির,
গল্‌ছে তরল গুল্-ফোয়ারা পাঁচশো রূপসীর।

ভাব্‌ছে ওকিল, সাজিয়ে আসর খেল্‌তে হবে পাশা,
বাদ্‌শাজাদী বস্‌বে পাশে, পুর্‌বে নাকি আশা?
দুল্‌বে আলো বেল্‌ওয়াড়েতে, গল্‌বে হাজার বাতি,
কাট্‌বে জীবন বিলাস-লীলায় রাতির পরে রাতি।

সে সব কথা বিঁধ্‌ল গিয়ে আরংজীবের কাণে,
উঠ্‌ল ফুলে' ললাট-শিরা দারুণ অপমানে,
শৌর্য্য-তেজে ভারত জুড়ে' পাল্লা আঁকা যাঁর,
লড়্‌কীরে তাঁর কর্‌বে দাবি স্পর্দ্ধা এত কার?
কর্‌বে 'সাদি', পর্‌বে গলায় বাদ্‌শাজাদীর হার,
খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল খাপে তুর্কী তরবার।

"ধিক্ ধবল হক শবল" ছুট্‌ল বাজীর দল,
বাদ্‌শা চলেন দেখ্‌তে বেটী, দিল্লী টলমল্।
শ্বেত-পাথরে তৈরি মহল 'রাবি'র কিনারায়,
সোনায় মোড়া হাওদা তাঁহার লাহোর-পথে যায়।

বাদ্‌শা সেথায় পৌঁছে গেলেন, ফটক-মহবতে
ফেনিয়ে ঝরে সুর-ঝরণা মুলতানেরি গতে।
ঈষৎ 'দুনে' শানাই শুনে' টল্‌ল 'রাবি'র জল,—
বাদ্‌শাজাদীর চোখ দুটি গো অশ্রুতে ছল্‌ছল্!

মোগল আদব কায়দা মাফিক্ কুর্ণিশে কুর্ণিশে
জেব্-উন্নিসা বাপ্‌কে তাহার এগিয়ে নিল এসে।
বাদ্‌শা পশেন শীস্‌মহলে, কুঞ্চিত তাঁর ভুরু,
বাঁদীর দলে চামর দুলায় হৃদয় দুরু দুরু।
পায় না সাহস জেব্-উন্নিসা আস্‌তে বাপের কাছে,
মেজাজ শরীফ নেইক আজি, কর্‌বেন গোসা পাছে।

আল্‌বোলাতে পুড়্‌ছে ছিলিম বাদ্‌শাহী কক্ষেতে,
স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ-ধূমে কক্ষ ওঠে মেতে।
তপ্ত তাওয়ায় তাম্রকূট হায় পুড়্‌ছে মনের দুখে,
বাদ্‌শা আজি সুখ-টানে চুম্ দেন না নলের মুখে।
সাম্‌নে জলের যন্ত্র খোলা, তুষার-গলা ধার
ঝর্‌ঝরিছে, ছাপিয়ে গেছে ফটিক জলাধার।
খর্‌রা ভাসে গন্ধ তেলে, একটি ফোঁটাও তার
কর্‌তে পরশ নেইক বেয়াল আজ কে শাহানশার।

চিহ্ন তারি জিজ্ঞাসারি চিহ্নেতে তোর্‌পুর,
রুদ্র তালে দীপক-রাগে লুপ্ত কোমল সুর।

ভাঙ্‌ল চমক—দিচ্ছে আজান মসজিদ্‌-আঙিনায়,
বাদ্‌শা চলেন্‌ পড়্‌তে নেমাজ ওক্‌ত বয়ে' যায়।
মজ্‌ল ওরে গজল-সুরে আরংজীবের দিল,
পড়্‌ল চোখে জোড়ের মুখে কোন্‌খানে গর্‌মিল।
পাগ্‌ড়ীতে তাঁর মুক্তাহীরার জেল্লা হ'ল ছাই,—
সুখ কিছুতেই নাই রে ওরে সুখ কিছুতেই নাই।
পড়্‌ল এসে শুক্ল কেশে দিন-ফুরানোর আলো,
বাদ্‌শাগিরির দিক্‌দারি আর লাগ্‌ছে নারে ভালো।
ছিটিয়ে ফেলেন থুথুর মত রংমহলের সুখ,
খেদিয়ে দিলেন তরফাওলীর সরাব-রাঙা মুখ,
খেতাব-খাতির ভেক্কিখেলা, দুনিয়া ফক্কীকার—
পাগ্‌লা আলানস্তরেরি ধাক্কাতে চুর্‌মার!—
সাঁচ্চা যখন মিল্‌বে তখন চল্‌বে কি আর মেকি?
দেশ-বিদেশের ধর্ম্মফলের রস-মধুটি একই।
নেমাজ শেষে বাদ্‌শা বসেন ফুলের গালিচায়,
বসিয়ে কাছে আর্দ্রস্বরে কহেন দুহিতায়—
"জেব উন্নিসা, আন্না তোমায় করুন্‌ মেহের্‌বানি,
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শাহ সেই 'মৌলা' তোমার পাশি
মুক্ত করুন সেই হাতে, যার মুক্ত তরবার
কাফের-শোণিত সিক্ত মুলুক করবে অধিকার।"

বাঁদীর মুখে বাপের কথার জবাব দিল বালা,—
"চায় সে হতে স্বয়ংবরা; তারেই দেবে মালা
তস্‌বীরে যার মূর্ত্তি দেখে' ধর্‌বে নেশা চোখে;"—
মন্‌টি যে তার টল্‌ছে তখন প্রেম-সিরাজির ঝোঁকে।

বাদ্‌শার হুকুম বাদ্‌শাজাদীর হয় নি মনোমত,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটায় কল্‌জে-ঢাকা ক্ষত,
দরদ-ব্যথায় জেব্‌-উন্নিসার টুট্‌ল চোখের নিদ্‌,
হার মানিলেন পিতাই শেষে, রইল মেয়ের জিদ্‌।
হাজার যুবা দূতের হাতে পাঠিয়ে দিল ছবি;
প্রেম-দুরিতে বাঁধ্‌বে কারে এই তরুণী কবি।

দ্বিতীয় বার পছন্দ তার হোলো ওকিল খাঁর,
কিন্তু মিলন? আশ্‌মানে ফুল ফুটবে যখন হায়!
সাধ্য গো কার এড়িয়ে যাবে অদৃষ্ট সেই হাত?
ইঙ্গিতে যার নিব্‌ল বাতি, উৎসবেরি রাত
কর্‌লে আঁধার, বেল্‌সাজারের তোজ না হ'তেই শেষ
থাম্‌ল হঠাৎ ঝঙ্কৃত বীণ, সঙ্গীতেরি রেশ।
অঙ্গুলি তার রুদ্র লেখা লিখ্‌ল দেওয়াল-গায়,
পেন্সিলে নীল কৃষ্ণ ছটায় উল্কা ছুটে যায়।
সে হাত এসে হইল বাদী বাদ্‌শাজাদীর সাথে,
রহস্যময় নিষেধ-বিধি লিখ্‌ল নতুন ছন্দে।

বাদ্‌শা গিয়ে ওকিল খাঁরেই পত্র দিলেন লিখে—
"চাই সঁপিতে তোমার হাতে স্নেহের দুলালীকে।
দিল্‌-পছন্দ হইল গো তার তোমারি তস্‌বীর,
দিল্লী এস, রোজার শেষে দিন করেছি স্থির।"

ওকিল খাঁ এক বন্ধুকে তাঁর দেখান চিঠিখানি,—
(হায় তিনিও ধ্যান করেছেন বাঞ্ছিত সেই পাণি)
ঈর্ষা চেপে কহেন, "সখা, কর্‌ছি আমি মানা,
নয় সে উচিত তোমার আমার বাদ্‌শাজাদী আনা।
ঝাঁপ দিওনা আগুন খেলায় বল্‌ছি তোমায় সোজা,
এই লেফাফা ফন্দীভরা যায় না ভাল বোঝা;
দিল্লী যেতে সাধেন কেন বাদ্‌শা আরংজীব?
পাগ্‌লী মেয়ের খাম্‌খেয়ালি কর্‌লে কি উদ্‌গ্রীব?
বুঝ্‌তে নারি এই হেঁয়ালি মুণ্ড ঘুরে যায়,
ভাব্‌না আমার, একটা বিষম কাণ্ড ঘটে হায়,
শেষটা কি গো শিব্‌জী সম বন্দী রবে তাঁরি?
শোধ নেবেন এই অপমানের, কাজ কি এ ঝক্‌মারি!
শঙ্কা ভয়ে শিউরে ওঠে ওকিল খাঁয়ের মন,
লুকিয়ে বুকে বুকের দাগা করেন পলায়ন।
যাবার বেলা জেব্‌উন্নিসায় পত্র পাঠান হায়—
"ধর্‌ণা দিয়ে পড়্‌ব প্রিয়ে, পীরের সে দর্‌গায়।
চোখের জলে ঝুর্‌ছে, হের, দর্‌বেশেরি বেশ,—
এই মুসাফির প্রেমের ফকীর ছাড়্‌ল গো আজ দেশ,
লাগ্‌ত যে দেশ বেহেস্‌ত্‌ সমান তাকিয়ে তোমার পানে
কি খুব্‌-খুরৎ তুহার খুরৎ—হুরীরা হার মানে!

ল্‌ মস্‌গুল্‌ কর্‌লে তোমার 'গুলেস্ত ত'রি গুল,
ড়্‌ল বঁধু তোমায় পেয়ার, দিওয়ানা বুল্‌বুল।"

ত্র পড়ে' জেব্‌-উন্নিসা দুনিয়া দেখেন খালি,
লছে হরফ বুক-চেরা তার রক্ত-জমাট কালি।
ত্যি নতুন টন্‌টনানি প্রাণ-বঁধুয়ার ধ্যানে,
দনা চেপে ওঠেন ক্ষেপে—লুটান রাজোদ্যানে।
রুগোশেরা পায় না সোহাগ, যায় না গো তার কাছে,
তমন উতল রং ঢেলে আর ফুল ধুরে না গাছে,
াল্‌বালে আর জল পিয়ে না ময়না টিয়ে সারী,
ডুক্‌রে ওঠে শুব্ধ রাতে কাঁদন শুনে তারি।

ফল্‌ল না রে রাঙা স্বপন ভাগ্যে ওকিল খাঁর!
কম্‌নে যাবেন ইরাণ মরুর মরীচিকার পার?
উট চলে ওই ঘণ্টা বাজে, আব্‌ছা কাঁপে দূরে,
মাথায় 'পরে দীপ্ত তারা, একলা যুবা ঘুরে।
দুই-কুঁজওলা উট চড়ে' যায় হাব্‌সী যুবতীরা,
কাঁচল 'পরে নূর-দরিয়ায় ঝক্‌মকিছে হীরা।
তৃপ্তি হাসে রূপ ধরে ওই মায়াপুরীর পথে,
চুম্‌ছে সুধা মরুর শিশু মার পয়োধর হ'তে।
চার্‌দিকে প্রেম—ফকীর ওকিল পায় না নাগাল শুধু!
পথ-হারা তার দিল্‌-সাহারায় জ্বল্‌ছে আগুন ধূধূ।
তৃষ্ণা-মেটার ঝর্ণাটি তার দিল্লীতে ঝর্‌ঝর্‌,
আস্‌ছে খবর বিনা তারেই, যন্ত্র থাকে ধর্‌।
পড়্‌ল মনে 'রাবি'র জলে ভাসিয়ে আদুল গা,
ইদের সাঁঝে বাদ্‌শাজাদী ছুঁড়্‌তেছিল পা;
বিদায় বেলা দুষ্ট রাবি চুমার ঢেউএ ভরে'
ছাড়্‌ল বালার আপেল-গালের রংটি ফিকে করে'।
দিল্লী ফিরে চল্‌ল ওকিল্‌ চোখের দেখার লাগি'—
আজ যে তারে ডাক দিয়েছে হিয়ার দরদ্‌ভাগী!

ফাল্গুনেরি ফুল-দানীতে রং জমেছে দলে,
মিল্‌ল মৌহে পারুল-বাগে জলপায়েরি তলে।
চাঁদনী রাতে হাতে হাতে পরশ-রসে ভোর,
লুকিয়ে মনের কোণে কোণে খেল্‌ছে মনোচোর।

রূপ সে খেলায় 'কাণামাছি', প্রেম হোলো রে 'বুড়ি',
প্রাণ-বঁধুয়া স্পর্শি তারে বস্‌ল রে বুক জুড়ি'।
চুম্‌রুড়ি দেয় ফুল-কুঁড়িরা, মান্‌বে কে আজ মানা?
নিঙ্‌ড়ে দে তোর আনার-মধু, যা খুসি তাই গা' না!

পিক পাপিয়া দিক্‌ ছাপিয়া দেয় রে উলুধ্বনি,
তবু পেয়ালা রূপ্‌সী সাকী দুলিয়ে বেণীর ফণী।
বৌ কথা কও সাম্‌নে এসে কর্‌ছে পরিহাস—
"হায় তরুণি, এই বেলা তোর মিটিয়ে নে রে আশ।
যার লাগি তোর বাদ্‌শা পিতা 'হলিয়া' দিয়েছে,
দুলিয়ে দে হার কণ্ঠে লো তার সেই আজ এয়েছে।"

আচম্বিতে ফুল-বীথিতে সারং বেসুর বলে,
আরংজীবের কালো ছায়া কাঁপ্‌ল বেদীর তলে।
তবু সহেনা লুকায় কোথা? আজ্‌কে ধরা প'লে
বাদ্‌শার হুকুম কর্‌বে তামিল ডালকুত্তার দলে।
কয় সে বঁধুর কাণে কাণে—"সময় যে আর নাই,
লুকিয়ে থাক, বাদ্‌শা আসেন—পায়ের আওয়াজ পাই।
লুকিয়ে থাক ডেক্‌চিতে ওই, রোয়ো নীরব হয়ে'—
মান রেখো গো বাদ্‌শাজাদীর, যায় গো সময় বয়ে'।
হয় তো মোদের শেষ চুমু এই, মিট্‌ল না রে তৃষা,"
ফিরিয়ে নিল ব্যগ্র অধর ত্রস্ত জেব উন্নিসা।

"কি আছে ওই ডেক্‌চি মাঝে?"—আরংজীবের স্বর
বজ্রভরা মন্দ্র মেঘে কাঁপ্‌ছে থরথর।
কইল বালা—"আছে ঢালা টাট্‌কা গোলাপ-জল।"
শির-দাঁড়া তার গুঁড়িয়ে গেল, ফাট্‌ল পাঁজরতল।
বাদ্‌শা কহে—"চুইয়ে নেব, আতর হবে বেশ।"
বহ্নিতাপে ফুট্‌ল বারি বাদ্‌শাহী আদেশ।

সেই আগুনেই ঝল্‌সে গেছে ফুল্ল পারুল-বাগ,
মর্ম্মরেরি শুভ্র পরীর দগ্ধ বুকের দাগ
দীর্ণ করে ফুঁপিয়ে ওঠে গুম্‌রে-কাঁদন কার।
অশ্রু ঢেলে কর্‌লে লোনা রাবির বারিধার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্নিপরীক্ষা

এমন পরীক্ষায় কোন জাতি কখন পড়েনি। একেবারেই অগ্নি-পরীক্ষা! দুশো বৎসর ধরে যাদের পৌরুষকে জাগিয়ে না রেখে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, কোনোরকম সাহসিক কাজেই যাদের ব্রতী করা হয় নি, সৈনিক-বৃত্তির দ্বার যাদের জন্যে পুরুষানুক্রমে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, আজ তাদের হঠাৎ বলা হচ্ছে—একদম জার্ম্মানের আগুনের সাম্‌নে আগুয়ান হও! সীতার সতীত্ব যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছিল, বঙ্গীয় পুরুষের পৌরুষও তেমনি আজ অগ্নি-পরীক্ষায় যাচিয়ে নেওয়া যাবে। কাশীপুরের রেক্রুটিং মিটিংয়ে কমিশনর বাহাদুর র‍্যাঙ্কিন সাহেব প্রকারান্তরে সেই কথা বল্লেন, কলেজ স্কোয়ারের মিটিংয়ে বঙ্গীয় লাটের সদস্য কামিংসাহেব ভাষান্তরে সেই কথাই বল্লেন, বেঙ্গল রেজিমেণ্ট কমিটির রেক্রুটিং অফিসার কর্নেল বুড়িয়ার সাহেব প্রতি মিটিংয়ে বাঙ্গালীদের সেই কথাই শুনিয়ে এলেন, এবং খাস দরবারে বাঙ্গালী শ্রোতার প্রতি স্বয়ং লাটসাহেবের সেই একই উক্তি অমর ক'রে বাঙ্গলা রেজিমেণ্ট কমিটির মোহর-ওয়ালা কাগজে ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। যে কোন বাঙ্গালীর রেজিমেণ্ট কমিটির সঙ্গে পত্রব্যবহারের সৌভাগ্যলাভ হবে তাকেই প্রথমে লাটসাহেবের উক্ত উক্তির সম্মুখীন হতে হবে:—

"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire, they have been given the privilege of fighting under the banner of their king and I would say to them then that you do not fail."

লাটসাহেব বলছেন fail হয়োনা বাঙ্গালী পুরুষেরা! য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা আর এ পরীক্ষায় অনেক তফাৎ! দেখনা কেন য়ুনিভার্সিটিতে বি-এ ফেল, এফ-এ ফেল, এণ্ট্রেন্স ফেল হয়েও বিয়ের বাজারে আর চাকরীর বাজারে বিকিয়ে যাচ্ছ—কিন্তু এ অগ্নিপরীক্ষায় যদি ফেল হও ত জগৎহাটে মানের বাজারে এক কাণা কড়িও তোমাদের মূল্য হবে না।

লাটসাহেব বলছেন—"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire."

বাঙ্গালীর কোন্ প্রাণের অভিলাষটি গবর্ণমেণ্ট পূরণ করেছেন? একেবারে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভিলাষ? এ অভিলাষও ত সাধারণ নয়! এমন আত্ম প্রত্যয়, এমন আভিজাত্য-জ্ঞান আর কোন্ জাত দেখিয়েছে? সোনার বাঙ্গলার মানুষও যে সোনার তা তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, নয়ত অগ্নিপরীক্ষায় আর কার কামনা বা সাহস হতে পারে! মেকলে থেকে আরম্ভ করে সব ইংরেজই বাঙ্গালীকে বুলি পড়িয়ে আসছেন—"বাঙ্গালী

বুটো, বাঙ্গালী নগণ্য, বাঙ্গালী মূল্যহীন"—এত বছরের বুলি পড়েও বাঙ্গালী বল্লে—"না, বাঙ্গালী সাচ্চা, বাঙ্গালী সোনা, আগুনে পুড়িয়ে দেখ"। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী, তোমাদেরও মধ্যে সেই কথা বল্‌বে কে, কে আগুণে পুড়তে সাহস করবে?

একবার ভূতপূর্ব্ব বড়লাটসাহেবের পত্নী লেডি হার্ডিংয়ের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল। তার পূর্ব্ব-ইতিহাস একটুখানি জানানর দরকার।

দিল্লী দরবারের পূর্ব্বে ভারত-সম্রাটের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে ভারববীয়দের কি বিশেষ দান দেওয়া হবে এই বিষয়ে যখন নানারকম আলোচনা চলছিল তখন "Coronation Boon to the Bengalis" এই শীর্ষে একটি ইংরেজী প্রবন্ধে আমি আমার মতে কি দান দেওয়া উচিত তা ব্যক্ত করি। তখনকার দিনে আমার প্রস্তাবিত দানের কল্পনাটুকুও এত দুঃসাহসিক বোধ হয়েছিল যে যে বাঙ্গালী টাইপিষ্টের দ্বারা আমি প্রবন্ধটি টাইপ করাই সে টাইপিষ্ট ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল পাছে এমন পরম দুঃসাহসিক প্রস্তাব টাইপের সংযোগে প্রচারের দোষে সে ধরা পড়ে। একজন বঙ্গবন্ধু ইংরেজ সম্পাদককে আমি সে প্রবন্ধ পাঠিয়ে তাঁর কাগজে তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের আলোচনা করতে অনুরোধ করি। তিনি লিখে পাঠালেন—"এখনও এ প্রস্তাবের সময় আসেনি। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবকে অসমসাহসিক মনে করবেন,—প্রায় বোমার গোলা ফেলার মত,—এবং আজকাল কোন সম্বাদপত্রই এ প্রস্তাবকে পত্রে স্থান দিতে সাহস করবেনা।"

সে প্রবন্ধের কতকগুলি ছিন্নপত্র আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে পড়ে আছে। তার ভিতরকার প্রস্তাবটি কি ছিল শুনবে?—যা ছয় বৎসর পূর্ব্বে একটি ভারত-সুহৃদ্ ইংরেজ সম্পাদকের মনেও বিভীষিকা উৎপাদন করেছিল? সে আর কিছু নয়, শুধু এই যে—বাঙ্গালীদের সৈন্য কর।

সে প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম:—

"In the days of old when Gods and men were not such utter strangers to each other as they are in these degenerate days, and boons followed austerities invariably, Druva chose the sovereignty of a new world to be called after his name and repented ever afterwards for losing the chance of asking for something greater. Nachiketa was wiser and would have nothing short of the knowledge of things eternal by possessing which he knew he would possess all things on earth. The God of Death tried hard to dissuade him, tempted him with everything that a mortal's heart could desire, but he would not be waived from his purpose and got at last what he stood fast for.

What should we Bengalis ask for on the happy occasion of the Emperor's coronation? Now that the news is going round that His Gracious Majesty King George V of England and Emperor of India would

beseat himself on his hereditary throne in India and dispense boons with his two hands like the beloved kings of yore and would verily prove himself a representative of God on earth with the lustre of Indra, the strength of Vayu and the riches of Kuvera—what should we Bengalis ask for?

Sore as the Bengalis are on the question of the Partition of Bengal, we must hesitate nevertheless when the choice of a boon is offered to fix upon the reconsideration of the Partition as *the* boon to be desired at this particular moment. For the Partition is a temporary political blunder which shall be redressed as a matter of course, it being a question of time only. For it is a blunder which injures the rulers just as much as the ruled. We should rather seize the present opportunity to gain something greater,—i. e, that which has been withheld from us as a race ever since the British people took over the reins of our government. The restriction that denies the Bengali youth fullest opportunity for rendering loyal service, their ineligibility to be admitted in the army is the one act of iniquity and injustice under the British rule that cries for removal; and I believe when legitimate routes of bravery and heroism are opened up to them, the dark subterranean passages of political dacoities would be deserted for ever by the youth of Bengal. Give them equal opportunities of military service with other races of India, foster their manhood and self-esteem on the right lines, open up the door of willing service to their king and I dare assert the Bengali youth would not be a source of anxiety to Government but a tower of strength. Would you allow your enemies to enlist them and yourself fail to recognise their merits?

Stung to the quick, hurt to the deepest depths by the cowardly taunts of barrack-room poets like Rudyard Kipling and the campaigns of falsehood of other writers and for ever denied the chance of belying those calumnies in the open battlefield, some of the Bhadralok Bengalis have been driven to moral suicide in the way of dacoities. Yet are these dacoities not indications of the stifled yearning for the mere physical conditions for the noblest of human achievements, the performance of heroic deeds?

The master-mind of a true statesman would see to the truth of my words in a flash of inspiration and my voice will not be the voice of one in the wilderness but that of a prophetess!"

দিল্লীর দরবার হয়ে গেল। যা দান বর্ষণ করার তা করে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গেলেন। যে গোপন কথাটি আমার প্রাণের ভিতর ছিল তা রয়েই গেল, ব্যক্ত হবার সুযোগ পেলেনা। কিছুদিন পরে হঠাৎ একবার সাংঘাতিক রকম পীড়িত হয়ে পড়লুম। তখন এই অনুতাপ মনে জাগতে লাগল যে আমার কর্ত্তব্য সমাধা হল না, বাঙ্গালীকে অস্ত্র খেলিয়েছিলুম, কিন্তু তাদের অস্ত্র ধরাতে পারলুম না, বাঙ্গালীকে সৈন্যরূপে দেখার প্রথম ইটখানিও গাঁথতে পারলুম না। এবার সুস্থ হতে না হতে সিমলা পাহাড়ে ভাইস্‌রিনের মারফৎ ভাইসরয় সাহেবকে আমার অভীষ্ট-প্রস্তাব ও উল্লিখিত যুক্তিগুলি জ্ঞাপন করার সুযোগ গ্রহণ করলুম। আমার কথাগুলির উত্তরে সহৃদয়া লেডি হার্ডিং একটি কথা যা বল্লেন তা আমার এখনও মনে পড়ে। যখন আমি বল্লুম—"প্রকাশ্য আলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখাবার সুযোগ এদের রুদ্ধ বলেই এদের উদ্দাম পৌরুষ ডাকাতির পথে আত্মপ্রকাশ করছে। ভেবে দেখুন আপনাদের দেশে কত শত-সহস্র যুবক আপনা আপনি সৈনিকবৃত্তি পছন্দ করে নেয়। আমাদের দেশেরও কোটি কোটি যুবকের মধ্যে ক্ষাত্র স্বভাবের যুবক শতসহস্র কি নেই? তাদের স্বভাবানুকূল বৃত্তি অবলম্বনের পথ যদি চিররুদ্ধ থাকে তারা বিপথগামী হতে পারে না কি?"

লেডি হার্ডিং বল্লেন—"সৈন্যদলভুক্ত হলেই কি সব শান্ত হবে? সৈন্য হলেই যে active serviceএ যাবে তার ত কোন কথা নেই? তুমি বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্য হওয়া চাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি যুদ্ধপর্ব্বের আয়োজন চাই, তা না হলে ত তোমার হিসেবে তোমার দেশের ভদ্রলোক ছেলেদের সৈন্য হওয়ার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না। আমাদের দেশের যে-সব ছেলেরা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে তারা সকলেই active serviceএ থাকেনা, তাই বলে শান্তির সময় ত ডাকাতি করে না।"

এর উত্তরে আমি বল্লুম—"ব্যারাকের ড্রিল কসরৎ প্রভৃতিতে শান্তির দিনে ইংরেজ যুবকের উদ্দামতা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, আমাদের ছেলেদের সে পথও রুদ্ধ, শারীরিক ব্যায়ামের ক্লাব মাত্রই আজ সিডিষণের আখড়া বলে গণ্য।"

কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে স্পষ্ট করে মনের অভিলাষটা ব্যক্ত করা সেদিনের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল—মূষিক জাতির বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরানর মত। যে কথাটা সেদিনকার ইংরেজ সম্পাদকের মতে কাগজে আন্দোলনের সময় আসেনি, সে কথাটা সেই ঢাকঢাক গুড়গুড়ের দিনে মুখফুটে বলার সুযোগ মাত্রে আমি ধন্য বোধ করলুম। আমার একজনের বলায় সদ্য সদ্য ফল হয় নি,—তার অনেক পরে অনেকের বলায় হয়েছে। তাই বঙ্গলাট বলছেন—"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire."

কিন্তু আজ লেডি হার্ডিংয়ের সেই একটি কথা আমার কাণে বাজছে—"বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি

যুদ্ধপর্ব্বের আয়োজন চাই * * * তা নইলে তাদের সৈন্য হওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।"

প্রাতঃস্মরণীয়া লেডি হার্ডিং সেদিন যে কথাটা পরিহাস করে বলেছিলেন আজ কালচক্রে মহাকালের ইচ্ছায় সত্যসত্যই তা ঘটেছে। যুদ্ধপর্ব্ব সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীকে সৈন্য হতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে, তার পূর্ব্বে নয়। মুষ্টিমেয় দস্যুমার্গাবলম্বী ছেলেদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী সমগ্র জাতির পক্ষে এ বড় কঠিন পরীক্ষার দিন। কসরৎ করতে ভালবাসা, ঘরে বসে সকালে বিকেলে কুস্তির আখড়ায় গিয়ে মাটি মেখে আসা, প্যারালালবার, ডাম্বল ও নানারকম জিম্‌ন্যাষ্টিকের দ্বারা শরীরের স্ফূর্ত্তিসাধন করা, এমন কি তলোয়ার ও ছোরা খেলায় খেলা হিসেবে নৈপুণ্য আয়ত্ত করা এক জিনিষ, আর প্রকৃত পক্ষে তলোয়ার হাতে নিয়ে সমরক্ষেত্রে মারতে বা মরতে বেরিয়ে পড়া আর এক জিনিষ। আর এ যুদ্ধে তলোয়ারও চলে না, শুধুই অগ্নিবর্ষণে ঝাঁপ দেওয়া। এক্ষেত্রে যোদ্ধা হওয়ার জন্যে শারীরিক বলের তত প্রয়োজন নেই—আছে প্রয়োজন মনের বলের। এখানে মনের পিছনে শরীর ছোটে, শরীরের সঙ্গে মন এগোয় না। এখানে পালোয়ান চাইনে, সাহসী চাই।

সাহস জিনিষটা যে পরিমাণে শারীরিক বল ও অস্ত্রকুশলতাসাপেক্ষ ততটুকু ব্যায়াম-পটু ও কষ্টসহিষ্ণু শরীর চাই এবং ততটুকু অস্ত্রদক্ষতা চাই। তাই এই যুদ্ধের জন্যে একটা পল্টনকে তৈরি করতে বেশী দেরী লাগেনা, প্রায় তিনমাসের শিক্ষায় ও অভ্যাসে তারা যুদ্ধক্ষম হয়ে ওঠে। এবারকার জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ প্রচার করে বাহুবলের চেয়ে মনোবলই আসল বল সেই মনোবল চট্টগ্রামের যুবকেরা কত দেখিয়েছে এবং আরও কতদূর দেখাবে এই সেই দেশ যেখান থেকে বণিকেরা অতুল সাহসে সমুদ্রপথে নৌবাহন করত, নৌযুদ্ধে পর্টুগীজদের সমুচিত হত। মৃত্যুভয় তোমাদের কোনদিন ছিল না, আজও তোমাদের গরীবদের মধ্যে নেই। কেননা চট্টগ্রামের লস্করেই যুরোপের যুদ্ধজাহাজবর্গও আজ গতিশীল। তোমরা জ যুদ্ধানলে ঝাঁপ দিতে পিছপাও কেন হবে!

শুনতে পাই পূর্ব্ববঙ্গে ইণ্টার্ণমেণ্ট বাহিনী একটা রব উঠেছে—"মরতে ভয় পাই না লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু মরব কার জন্যে, লড়ব কার জন্যে? যে গবর্ণমেণ্ট ইণ্টার্ণমেণ্ট-রূপী দানবকে আমাদের উপ ছেড়ে দিয়েছে তার জন্যে কেন প্রাণ দেব!"

ভাই, প্রাণ দেওয়া কোন গভর্ণমেণ্টের জন্যে নয়, প্রাণ পণ করা আত্মাভিমানের জন্যে। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অভিমান কর আত্মাভিমানে কুঠারাঘাত করো না যারা ঘরে রইল তারা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝাপাড়া করবে, ইণ্টারমেণ্ট দৈত্যকে দেশ ছাড়া করবে। যাদের বাইরে ডাক পড়েছে তারা বেরিয়ে এস—ঐ যেখানে রণরঙ্গিণী আমাদের ডাকছেন, এতদিন পরে বাঙালী সন্তানের উপর প্রসন্ন হয়েছেন—সেইখানে তাঁর পাশে গিয়ে উন্মত্ত উল্লাসে জাতীয় সম্মান রক্ষা ও বৃদ্ধি কর। কে আছে বীর চট্টগ্রামের সন্তান, নির্ভীক ও স্বাধীন নাবিকদের উত্তর পুরুষ, যার ধমনীতে এখ

রাগে আজ আহ্লাদ নেচে উঠছে না! রা হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গি হও, যুদ্ধ-সমুদ্রে প্রাণ-নৌকা একবার ন করে এস, এপার ওপার পাড়ি র দেখ, কেমন তালে তালে নৃত্য তে করতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে পড়ে বনের উপকূলে আবার এসে লাগবে! দ্রে সবাই ডোবেনা, যুদ্ধে সবাই মরেনা। রাশি রাশি নৌকা পাল তুলে চলেছে—পাঞ্জাবী, মারাঠী, গোর্খা, রাজপুৎ, ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, মার্কিন! বাঙ্গালী, তুমিও নোঙর খুলে বেরিয়ে পড়, পালে হাওয়া লাগাও, উৎসাহে ফুলে ওঠ, সাহসে বাধা কাটিয়ে চল। কে যাবে চট্টগ্রামবাসী এই মহাযাত্রায় যাত্রী হয়ে?

২৩শে মার্চ্চ শ্রীসরলা দেবী।
১৯১৮

সৌজাত্যবিদ্যা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা

(২)

আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি, (১) তামাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, এবং ভয়পক্ষের ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদেরও দৈহিক মানসিক রোগহীনতা প্রভৃতিই সুসন্তান ৎপাদন বিষয়ে প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। বতত্ত্ব ও বংশানুক্রমের আবিষ্কৃত সত্যগুলিই -সকল স্থলে সৌজাত্য বিদ্যা সমাজক্ষেত্রে য়োগ করিতে চায়। জীব-তত্ত্বের আরও নেক সত্য সৌজাত্যবিদ্যার লক্ষ্য করিবার ষয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে ই-একটী কথা বলিব।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় যৌন-র্ব্বাচন বা বিবাহ-ব্যাপারেও—সুপ্রসিদ্ধ Golden mean" বা "মধ্যপন্থা"ই বোধ য় শ্রেয়স্কর। যে দুই জাতির মধ্যে প্রকৃতি-গত প্রার্থক্য অত্যন্ত বেশী তাহাদের যৌন-সম্মিলন শুভকর নহে।—আবার অন্তপক্ষে যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশী তাহাদের যৌন-সম্মিলনও মঙ্গলকর নহে। বর্ত্তমান যুগের জীবতত্ত্বের প্রধান আচার্য্য ডারুইন স্বয়ং এইরূপ কথা বলিয়াছেন (২)।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতির মধ্যে নরনারীর সম্মিলন যে ভাল নহে তাহা বোধ হয়—সহজ-সংস্কারবশতঃ—পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরাও বুঝিতে পারিত। সেইজন্য দেখা যায় যে প্রাচীন জাতিরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রায়ই নারাজ হইত। প্রাচীন গ্রীক, রোমক, হিব্রু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর এই ভাব ছিল। পরে অবশ্য যুদ্ধে বন্দিনী

(১) সৌজাত্যবিদ্যা—ভারতী, চৈত্র, ১৩২৪
(২) Darwin—The origin of species.

অন্য জাতির স্ত্রীগ্রহণের প্রথার মধ্য দিয়া অনেক জাতি-সংমিশ্রণ হইয়াছিল, কিন্তু কোনকালেই পরজাতির স্ত্রীগ্রহণের প্রতি মনের বিরূপ ভাবটা যায় নাই।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এই ভাবটী অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেইজন্য আর্য্য-অনার্য্যদের মধ্যে বহুকাল যুদ্ধের পর একটা মিটমাট হইয়া গেলেও—বিবাহের আদান-প্রদান হইতে বহু যুগ কাটিয়া গিয়াছিল। যদিও পরবর্ত্তী কালে আর্য্য-অনার্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণ হইয়াছিল—কিন্তু ব্যাপারটা চির-কালই আর্য্যসমাজে নিন্দনীয় ছিল। আর এখন পর্য্যন্ত যে সেই সহজ বিদ্বেষের ভাবটা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তাহার প্রমাণ, দেশশুদ্ধ সকল জাতির আদমসুমারীর খাতায় আর্য্যনাম লিখিবার বিপুল আগ্রহ। যদিও অনেক বর্ণের মধ্যে সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াও 'আর্য্য-রক্তের' আভাস পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ,—তবুও সকলেই আমরা বুড়া মনুপরাশরের দোহাই দিয়া নিজ নিজ বংশের সীমা-রেখাটাকে স্বরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে ব্যস্ত।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির * নরনারীর যৌনমিলন যে কোন জাতির পক্ষেই শুভকর নহে—তাহার প্রমাণ মানব-ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমেরিকা, আফ্রিকা ও ও পলিনেশিয়ার অনেক আদিম জাতি যে অধিক-উন্নত ও অধিক-সভ্য ইউরোপীয় জাতির সহিত সংমিশ্রণে একেবারে লোপ পাইয়াছে—তাহাও সকলের জানা কথা। ডারুইন এরূপ কয়েকটী জাতিধ্বংসের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (৩)। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে আদিমজাতির স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয়দের সমাগমে প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত। আর স্ত্রীগণের এই উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস বা লোপ জাতি-ধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণরূপে সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে। দুইটী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে—দুর্ব্বল জাতির জীবনপ্রবাহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাহাদের মধ্যে নানারূপ রোগ ও দুর্ব্বলতাও দেখা দিয়াছে। এইরূপ মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর-জাতি প্রায়ই দেহ-মনে অনুন্নত হইয়া পড়ে। প্রমাণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষেই সেইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে, এবং আমেরিকা ও আফ্রিকাতে দৃষ্টিপাত করিলেও বুঝা যাইবে।

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত এই সত্যটী উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন জীবতত্ত্ব-হিসাবে এই কথার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এরূপ একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। বরং আধুনিক যুগের একজন প্রধান পণ্ডিত এ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জাপানের প্রধান মন্ত্রী এইরূপ জাতিসংমিশ্রণ বিষয়ে (জাপানীদের সহিত ইউরোপীয়দের) হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মত চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে স্পেন্সার যে পত্র লিখেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The physiological basis of this experience appears to be that any one variety of creatures in course of many generations acquires a certain constitutional adaptation to its particular form of life and every other variety similarly acquires its own special adaptation. The consequence of that if you mix the constitution of two widely divergent varieties which have severally become adapted to widely divergent modes of life, you get a constitution—which is adapted to the mode of life of niether, a constitution which will not work properly because it is not fitted for any set of conditions whatever."

অর্থাৎ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতির প্রকৃতি ও গঠন প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন যে সন্তান, সে কোন জাতির প্রকৃতি ও গঠনই ভাল করিয়া লাভ করিতে পারে না—সুতরাং জীবনযুদ্ধে মিশ্র জীবটীর কার্য্যকারিতা-হীন হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বাতন্ত্র্য একটা দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে তাহার সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করা দরকার। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির সহিত যৌন-সম্মিলনে এই জাতীয় প্রকৃতি বা স্বাতন্ত্র্য-নাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। সুতরাং যে জাতি আপনার অস্তিত্ব ও বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে চায় তাহাকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। বিশ্ব-মানব বা মহামানবের মিলন মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঘটিবে একথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু যৌন-সম্মিলন বা জাতিমিশ্রণের দিক দিয়া সেটা মঙ্গলকর কিনা এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাঁহারা ইউরোপীয় ও ভারতবাসীর মধ্যে বিবাহ-সংঘটনকে স্বর্গের পাকাসিঁড়ি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন, "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।"

এই জাতি-সংমিশ্রণের ব্যাপারে ভারত-বাসীরা এখনও যে খুব সাবধান তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং ব্যাপারটা আর এক বিপরীত দিকে গিয়া আমাদের অনিষ্ট ঘটাইতেছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ অনিষ্টকর। কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যৌন-সম্মিলন জীবতত্ত্ব-হিসাবে খুবই কল্যাণকর (৪)। ইহাতে নূতন রক্ত-সংমিশ্রণে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হয়, জাতির উৎকর্ষ সাধিত হয়, জাতির মধ্যে নবতেজের সঞ্চার হয়। একই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যৌন-সম্মিলন ঘটিলে, জাতি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, বুদ্ধিমান ও সুস্থ-সবল লোকের জন্ম দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। হিন্দুসমাজে এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী এতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ ভয়াবহ। সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে বাঙ্গালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভেদের গণ্ডী ত আছেই। এক এক প্রদেশে আবার ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি শত শত উপজাতি (Caste) আছে। এক এক উপজাতির

* এই প্রবন্ধে "জাতি"—'Race' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি—'caste' নহে। caste=উপজাতি

(৩) Darwin—The Descent of man

(৪) Darwin—The origin of species. বর্ণ=variety.

মধ্যে আবার শত শত বিভাগ। এক এক বিভাগের আবার শত শত শাখা, এক এক শাখার আবার শত শত উপশাখা। এই-রূপভাবে সীমা টানিতে টানিতে ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। অনেকস্থলে এই সকল কৃত্রিম গণ্ডী-বন্ধনের ফলে বিবাহক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে বিবাহই হয় না। কুলীনদের মধ্যে শত শত অনূঢ়ার অস্তিত্ব এখনও বিরল নহে। আধুনিক কালের কন্যাদায়ের সমস্যা, যে অনেকটা ইহারই ফল নহে, তাহাও বলা যায় না। বরঞ্চ অর্থনীতি-শাস্ত্রের 'Law of demand on supply'-এর সূত্র প্রয়োগ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়। হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে সগোত্র ও সপিণ্ড-মিলন—তাহার সীমানা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে। এই-সব সঙ্কীর্ণ উপজাতি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতির মিলনে যে নিবীর্য্য সন্তানের জন্ম হইতেছে, জাতি অনুন্নত হইয়া পড়িতেছে এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কেহ কেহ আবার আধুনিক 'বংশানুক্রম তত্ত্বে'র দোহাই দিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত "কৌলীন্য"-প্রথার সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ হাস্যকর তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহাদের আধুনিক 'বংশানুক্রম-তত্ত্বে'র কিছুমাত্র 'মত্ব-ণত্ব' জ্ঞান আছে তাঁহারা কখনই এরূপ বলিবেন না। বংশানুক্রম-তত্ত্ব জীবতত্ত্বের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আধুনিক 'কৌলীন্য', কৃত্রিম প্রথা ও আভিজাত্য-গর্ব্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকস্থলে এই-গুলির মূল আকার ধনগর্ব্ব বা কাঞ্চন-কৌলীন্য। বংশানুক্রম বৈজ্ঞানিক সত্য-হিসাবে নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের সন্ধান করিয়া থাকে, এবং "কৌলীন্য" আভিজাত্যের মিথ্যাগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া কেবল কতকগুলি গতানুগতিক প্রথা মানিয়া চলিতে প্রাণপণ করে। বংশানুক্রম ও 'সৌজাত্যবিদ্যা'র উদ্দেশ্য জাতির উৎকর্ষ-বিধান, 'কৌলীন্যে'র উদ্দেশ্য স্বার্থের পরি-পুষ্টি। প্রথম যখন কৌলীন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন 'নবধা কুললক্ষণং'এর হিসাব হইয়া-ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু এখন ত সে হিসাবের কল্পনাও কাহারও মনে আসে না। 'কাঞ্চন-কৌলীন্য' ও 'বনিয়াদির' খেয়ালেই সব কাজ চলিয়া থাকে। নর-নারী ও তাহাদের বংশের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ, অনুরূপ যোগ্যতা, উৎকৃষ্ট সন্তানের উদ্ভব, জাতির কল্যাণ, এ-সব কৌলীন্য-বাদীরা স্বপ্নেও ভাবে না। কোন্ কোন্ পর্য্যায়ের গরমিল হইলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইবে—আর কোন্ পর্য্যায়ের হিসাব ঘটক-মহাশয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেই ভবিষ্যতে নন্দনকাননের মৌরশীপাট্টা লওয়া যাইবে, তাহা সেখানকার আলোচনার বিষয়।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

প্রাচীন উপদেশমত এই নিয়মগুলি বিবাহব্যাপারে মানিয়া চলিলেও সৌজাত্য-বিদ্যার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যাঁহারা সময়ে-অসময়ে সকল ব্যাপারেই 'আর্য্যামি'র বড়াই করেন, তাঁহারা 'কৌলীন্যে'র এই প্রাচীন নিয়ম মানিয়া চলেন কি? আমরাও হিন্দু-সমাজ ও সভ্যতার গৌরব করিয়া থাকি। কিন্তু যত পাকা ইমারতই হোক্ না কেন—কালবশে তাহার যে জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে—নদীপ্রবাহের ন্যায় জাতির জীবন-প্রবাহও যে নূতন নূতন ঘাত-প্রতিঘাতে বহিয়া আপনাকে শক্তিশালী করিয়া নেয়, এই সনাতন সত্য অস্বীকার করিবার মত দুঃসাহস আমাদের নাই।

আমরা আজ বিশ্বমানবের মিলন ঘটাইতে ব্যস্ত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের জাতিরই বিভিন্নবর্ণের মধ্যে রক্তসংমিশ্রণের চেষ্টা করিলে বোধহয় ভাল হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিরাট হিন্দু-জাতির মধ্যে স্থানগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এক নিবিড় জাতীয় ঐক্যের বন্ধন সুস্পষ্ট। এই বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের মধ্যে যোগ্য নর-নারীর বিবাহ-বন্ধন ঘটিলে জাতির মধ্যে নবরক্ত সংমিশ্রণের ফলে যে নূতন তেজ ও বীর্য্যের উদ্ভব হইবে, জাতীয় উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। যাঁহারা 'মহাভারতে'র কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের এটা প্রণিধান করিবার বিষয়। আবার, এক এক প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণ আরও প্রয়োজনীয়। সহস্র সহস্র শাখা-উপশাখায়-বিভক্ত হিন্দু-সমাজের কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নব নব রক্ত-সংমিশ্রণের ব্যবস্থা হোক্। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের নবযুগের সমাজের ভিত্তি গঠিত হোক্। ইহা অশাস্ত্রীয়ও নহে। প্রাচীন সমাজপতি ও শাস্ত্রকারেরা দূরদৃষ্টির বলে ইহার পথ-নির্দ্দেশও করিয়া গিয়াছেন। শুধু আমরাই সকল ধর্ম্ম ও সত্যের উপরে দেশাচারকে স্থান দিয়া, তাহারই নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আজ হাঁকপাঁক্ করিয়া মরিতেছি। যে জাতি উঠিতে চায় তাহাকে এই নাগপাশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যে সত্য দিবালোকের মত মুক্ত ও স্বচ্ছ, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া জাতীয় উৎকর্ষ ও সামাজিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। "সৌজাত্যবিদ্যা" এই শিক্ষা দেয়; সুতরাং "সৌজাত্যবিদ্যা" আধুনিক যুগে আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

"বর্ব্বর" শব্দের পুরাতত্ত্বের প্রমাণ

"বর্ব্বর" শব্দটীর প্রয়োগ-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, কৌতুকাবহ ঐতিহাসিক সত্যেরই সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বর্ব্বর শব্দটী যে সংস্কৃত ভাষারই শব্দ, শব্দশাস্ত্রের নিয়োদ্ধৃত সুপ্রচলিত বাক্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"ফাল্গুনে গগনে ফেনে গত্বামিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

এখানে "বর্ব্বর" যে ভাষাজ্ঞানে অজ্ঞ

ব্যক্তিরই বোধক তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

'বর্ব্বর' শব্দের অপর একটী প্রয়োগ অপর একটী সুপ্রচলিত বাক্যে পাওয়া যায়, যথা—"ভূতে পশুন্তি বর্ব্বরাঃ॥" অর্থাৎ 'বর্ব্বরেরা গত না হইলে কোন বিষয় দেখিতে পায় না।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ব্বর-দিগের দূরদর্শন নাই। এস্থলে 'বর্ব্বর' মূর্খ অর্থেরই বোধক হইতেছে।

সংস্কৃত অপর একটী বাক্যেও 'বর্ব্বর' শব্দের একটী বিশেষ অর্থের আভাস রহিয়াছে, যথা—

"যেনতেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ।"

এস্থলে 'বর্ব্বর' নির্ব্বোধ, বোকা লোককেই বুঝাইতেছে।

এই নির্ব্বোধ ভাব হইতেই বর্ব্বর শব্দের সহিত একটী অমার্জ্জিত অশিক্ষিত ভাব সংযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষার "বর্ব্বরোচিত" শব্দে এই অমার্জ্জিত বা অসভ্যতার ভাবটী স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত।

'বর্ব্বর' শব্দের মধ্যে এইরূপে ভাষাজ্ঞান ও সভ্যতার একটী নিকৃষ্ট আদর্শের আভাসই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

আর্য্যগণ আপনাদের উৎকৃষ্ট ভাষা, জ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শ লইয়া যখন ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিবেশী ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা শুনিয়া তাঁহারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইহার অস্পষ্ট উচ্চারণের অনুকরণে ইহাকে 'বর্ব্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই 'বর্ব্বর' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের ভাষায় কেহ কথা বলিলেও, যদি তাহা আমরা স্পষ্টরূপে শুনিতে না পাই তবে "সে বর্‌বর্ করিয়া কি বলিতেছে?" এই রূপ আমরা এখনও বলিয়া থাকি। "তাহার মুখে কি বল্‌বল্ করিতেছে?" ইহাও আমরা উক্তরূপ অর্থেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। বলাবাহুল্য এই 'বল্‌বল্' প্রাগুক্ত 'বর্‌বর্' শব্দেরই অপভ্রংশ।

আর্য্যগণ বৈদিককালে অন্যপক্ষে "কৃষ্ণবর্ণ" বা "অনাসিক" বলিয়া বিশেষিত করিতেন। বর্ণ ও আকৃতির বিশেষত্বের পর ভাষার বিশেষত্ব 'বর্ব্বর' শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইত। 'বর্ব্বর' প্রথমে ভাষা-বাচক হইয়া পরে জাতি ও দেশের বাচক হইয়াছে। পুরাণে 'বর্ব্বর' জনপদের স্থান-নির্দ্দেশ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"কম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা হর্ষবর্দ্ধনাঃ।"

বিশ্বকোষধৃত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৫৭অ

'দরদ' যে বর্ত্তমান দার্দ্দিস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কম্বোজ ও দার্দ্দিস্থান ভারতের উত্তরবর্ত্তী দেশ। ইহাদের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়ায় 'বর্ব্বর'ও ইহাদের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থান বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানও পুরাণের নির্দ্দেশকেই সমর্থন করে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে:—

"পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিন্ধুনদের মধ্যমোহনার সমীপবর্ত্তী স্থানকে * * * প্রাচীন বর্ব্বর জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥"

'বর্ব্বর' নামক জনপদে 'বর্ব্বর' সংজ্ঞক অসাধুভাষার প্রচলন সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের

গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন:—

"হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ব্বর জনপদে একটী স্বতন্ত্র অপভ্রংশ ভাষাও প্রচলিত ছিল, যথা—"বর্ব্বরাণাস্তু পাঞ্চালাঃ টাক্ক মালব কৈকয়াঃ॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)।

ভাষার প্রমাণও যে পুরাণোক্ত সংস্থানেরই সমর্থক তাহাই এস্থলে অনুমিত হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণই প্রথমতঃ আপনাদের অসভ্য, অনুন্নত, অশিক্ষিত প্রতিবেশীদিগের প্রতি "বর্ব্বর" এই শব্দ প্রয়োগ করেন। কালে এই "বর্ব্বর" শব্দটীই অসভ্য, অমার্জ্জিত ভাবের সাধারণ পরিভাষারূপে পরিণত হয়। এই পরিভাষারূপে 'বর্ব্বর' শব্দ কেবল ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকে নাই —অপর দেশীয় সভ্যজাতিও তাঁহাদিগের অসভ্য প্রতিবেশীদিগের প্রতি হেয়তা জ্ঞাপনার্থ এই বর্ব্বর শব্দটীকেই বিশেষরূপে মনোনীত করেন। সর্ব্বপ্রথম গ্রীক্‌গণই এই শব্দটী তাঁহাদের ভাষায় গ্রহণ করেন। গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে রোমকেরা ইহা প্রাপ্ত হন। রোমকদিগের নিকট হইতে সম্ভবতঃ আরবীয়েরা ইহা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

গ্রীকেরা বর্ব্বর শব্দটী যে ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহাদের ভাষার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন তাহার ভাষাগত অতি আশ্চর্য্য নিদর্শনই বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'বর্ব্বর'-বাচক 'barbarian' শব্দটীর মূল, ইংরেজী অভিধানে এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে:—

[L, barbarus, Gr. barbaros, bar, bar, an imitation of unintelligible sounds applied by the Greeks (and afterwards the Romans) to those speaking a different tongue from themselves.] Chambers's Etymological Dictionary.]

'বর্‌বর্' হইতে 'বর্ব্বর' অনুকার-শব্দরূপে উৎপন্ন বলিয়া আমরা পূর্ব্বে যে প্রদর্শন করিয়াছি—এস্থলে তাহার অনুরূপ অনুমানই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

পাশ্চাত্য ভাষায় 'barbarian' শব্দ আমাদের বর্ব্বর শব্দেরই ন্যায় যেমন অসভ্যতা ও অমার্জ্জিত ভাবের সূচক—তেমনই ভিন্ন-জাতীয়তারও সূচক। পাশ্চাত্যভাষার 'barbarian' শব্দ অপভাষার জ্ঞাপক এবং barbarity শব্দ অসভ্যতা ও অকমনীয়তার জ্ঞাপক। এইরূপে 'বর্ব্বর' শব্দ রূপতঃ ও অর্থতঃ উভয়তঃই যে পাশ্চাত্যভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে তাহারই প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

বর্ব্বর শব্দদ্বারা শেষে আরবীয়েরা আফ্রিকার 'বার্ব্বরি' দেশের নামকরণ করিয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদিগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যরক্ষার্থ অসভ্যদিগের জন্য যে 'বর্ব্বর' রূপ পরিভাষার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অপর প্রাচীন সভ্যজাতিও অবিকল সেই পরিভাষাই আপনাদের জন্য গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার অধিক মৌলিকত্ব ও উৎকর্ষেরই সাক্ষ্যদান করিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মায়ের সম্মান

অপূর্ব্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা সাতটা গাড়ি,
ছিল কুকুর ; ছিল বেড়াল ; নানান্ রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ' সাত জোড়া ;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস, বেহারা, চাপ্‌রাসী।
—আর ছিল এক মাসি।

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি'
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে'
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কি করে' আপ্‌নারে
মুছ্‌বে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে'
কেউবা বলে' ওঠে, "আপদ জুট্‌ল কোথা থেকে"
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাৎ ছোট্ট ছেলে ;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।

শিশু-চিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে' দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, "চুপ্, চুপ্—"
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায়নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুসি হলে রাখ্‌বে চাপি'
কোনোমতেই কর্‌বেনাকো লাফালাফি।
অপূর্ব্ব আর পূর্ণ ছিল এদের এক-বয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেল্‌তে গেলে এরা হ'ত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়,
এরা যদি উল্টে দিত চড়,
থাক্‌ত নাকো গণ্ডগোলের সীমা,—
উভয় পক্ষেরি মা
কানাই বলাই দোঁহার পরে পড়ত ঝড়ের মত,—
বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু'ধার থেকে মারের পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাক্‌ত উপবাসী,—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে দু'টি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলা-ফেরা ওঠা-বসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখীহারা পক্ষিনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি' ;
ঘুচে গেল ন্যায় বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।

সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে কর্‌ল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্ব্বাক।
চক্ষে আঁধার দেখ্‌ত ক্ষুধার কোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয় তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাক্‌ত, বল্‌ত "ক্ষুধা নাই।"
অসুখ কর্‌লে দিত চাপা ; দেব্‌তা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ্‌ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি।
প্রমাদ গণি', দীর্ঘনিশাস ছাড়ি'
মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে,—
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দেরে
তোদের প্রাইজ্‌ দুটি।
তার পরে যা ছুটি'
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস্‌ ফিরে, প্রাইজ্‌ পেলি কেউ যেন না শোনে।"
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন করে' দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হাল্কা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান,—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলচে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে।

সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
বাচ্চে নিয়ে একটি লক্ষ্য পানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই
কালেজেতে পড়চে দুটি ভাই
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙ্‌ল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার,—
থিয়েটারের সখ চেপেচে তার।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে ;
যখন ধরা পড়ে পড়ে
অপূর্ব্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাই দাদার শোবার ঘরে বালিস দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বল্লে এসে—
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা!
ছেলে মানুষ, দোষ কি ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"
কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহ্নি প্রায়
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বল্লেন, "আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।"
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস, বেহারা চাপ্‌রাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড় আদালতে।
মনের মত বউ এসেচে, একটি দুটি আস্‌চে নাৎনি নাতি,—
জুট্‌ল মেলা সুখের দিনের সাথী।
মা বল্লেন, "মিট্‌বে এবার চিরদিনের আশ,—
মরার আগে করব কাশীবাস।"
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পূজোর ছুটির দিনে
মনের মত বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাৎ কখন্ মা ফির্‌লেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক্ সবাই,—মা বল্লেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল', অপূর্ব্বকে পুরতে দিবি জেলে?"
কানাই বল্লে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"
মা বল্লেন, "ভুলবি কেন? মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তাহলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো পরে
বাইরে কিম্বা ঘরে?
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে

তখন আমার মনে হল আমি যদি স্বপ্নমাত্র হই
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছুই নই
তাহলে হয় ভালো!
মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাইত বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায়না যেন কোনো জনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কি ঘটে ছিল অল্পলোকেই জানে,
বলে রাখি সে কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিন্‌টে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে' সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
ত'বিল-ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেচে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বল্লে, "মনে কি নেই?" অপূর্ব্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকে বুকে।"
"চুকে গেছে?" কানাই উঠ্‌ল বিষম রাগে জ্বলে',
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্চে চুকে যাবে বলে'।"
নীচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুক্‌ল তারি ঘরে।
বল্লে, "আমায় রক্ষা কর!"
বলাই কেঁপে উঠ্‌ল থরথর।

অধিক কথা কয়না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাক্‌ল দরোয়ানে।
অপূর্ব্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্ব্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে
এদের ঘরে নিজে
আস্‌তে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বল্লে, "রক্ষা কর মাসি!"

এরি পরে কাশী থেকে মা আস্‌লেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বল্লে ধীরে ধীরে—
"জান ত, মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বল্লে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"
মা বল্লেন, "তোরা বলিস্ কি এ!
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম্ম!
এই কি তোদের ধর্ম্ম!"
এত বলি' বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "যাচ্চ কোথায়?" মা বল্লেন, "অপূর্ব্বদের বাড়ি।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে!"
"রোস, রোস, থাম, থাম, করচ এ কি!
আচ্ছা, ভেবে দেখি!

তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বল্‌চ তাই হবে!"
আর কি থামেন তিনি!
গেলেন একাকিনী
অপূর্ব্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিলনা আর দোবে চোবে, ছিলনা চাপ্‌রাসি।
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ন্যাসানাল কংগ্রেসে"র কাজ

(ফরাসী হইতে)

এক্ষণে ন্যাসান্যাল কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা বিচার নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিব।

তাহারা যে একই দেশের লোক—এই ধারণাটি ন্যাসান্যাল কংগ্রেসই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীদিগের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য, ভারত কিংবা কংগ্রেস সম্বন্ধে নিরক্ষর কৃষকদিগের কোনও ঔৎসুক্যই নাই; কিন্তু যে-কেহ সংবাদপত্রাদি পাঠ করে সেই আজকাল জানে, সমস্ত ভারতবাসীর একটি মাতৃদেশ আছে; আচার ব্যবহার ও ভাষার বহুল পার্থক্যসত্ত্বেও, ভারতের সমস্ত জাতিরই সমান স্বার্থ।

তবে-কিনা, ইংরেজরাই এই ভারতীয় মাতৃভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছে; নৈতিক শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য ভারত ইংরেজের নিকটেই ঋণী। ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা; মারাঠী, বাঙ্গালী, শিখ, তামিল, হিন্দুস্থানী—যাহারা কংগ্রেস-সভায় সম্মিলিত হয়—তাহারা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না; এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য উহারা দাবী করে সেগুলি ইংরেজী প্রতিষ্ঠান। ন্যাসান্যাল কংগ্রেসেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অভিব্যক্তি মাতৃদেশত্ববোধে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তা ছাড়া আরও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, ভারত কতটা ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং ইহাও বুঝিতে পারি, পরিশেষে ভারত-ইংরেজী সভ্যতা কিরূপ আকার ধারণ করিবে। তাছাড়া, জাপানী-দের ন্যায় ভারতবাসীদিগের উপর কেন এই-রূপ দোষারোপ করা হয় যে তাহারা বিদেশীর অনুকরণের জন্য, স্বকীয় জাতীয় ঐতিহ্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে? যদি জাপানীদের ও ভারতবাসীদের প্রতিনিধিমূলক কোন

প্রতিষ্ঠান না থাকিত, ইংরেজরা যাহাকে "Self government" (স্বায়ত্তশাসন) বলে, সে সম্বন্ধে যদি তাহাদের কোন ধারণাই না থাকিত, তাহা হইলে, য়ুরোপীয়-দিগের পার্লেমেণ্টীয় পদ্ধতি গ্রহণ করিবার কথা তাহাদের আদৌ মনেই হইত না। কিন্তু জাপানীদিগের গোত্র-পঞ্চায়ৎ ছিল, রাজবৃন্দের সভা, আমীরওমরাওদিগের সভা, মধ্যবিত্ত লোকের সভা, কৃষকদিগের সভা ছিল; সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় মহাসভা ও মন্ত্রিপরিষৎস্থাপন তাহাদের নিকট সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ভারতবাসীদের সম্বন্ধেও তাহাই। সুদূর অতীত কালে আমরা দেখিতে পাই, রাজা ও ব্রাহ্মণেরা "জাতের" ব্যবহার ও প্রথা মানিয়া চলিতেছে। সকল রাজারই আমলে জাতের পঞ্চায়ৎ, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার নিষ্পত্তি করিতেছে। কোন কোন জাতের মধ্যে, পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তি, কিংবা সমগ্র পঞ্চায়ৎ মৃত্যুদণ্ডপর্য্যন্ত বিধান করিতে পারিত। সকল শাসনাধীনেই গ্রামের 'মোড়ল' কিংবা পঞ্চায়ৎ স্বকীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছে। লৌকিক প্রথার দ্বারা গঠিত, ভারতবাসীরা ইংরেজের "ম্যুনিসিপাল" ও "জুরী"-পদ্ধতি আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই দুই পদ্ধতি উহাদিগকে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতির জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে।

জাপানী ও ভারতবাসীরা স্বকীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির পরিপুষ্টিসাধনের চেষ্টা না করিয়া য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যে দাবী করিয়াছে তাহার দুই কারণ আমরা দেখাইতে পারি। একদিকে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহাদের সভ্যতার অভিব্যক্তি স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্য দেশের লোকের নিকট শিক্ষা করা প্রত্যেক জাতির পক্ষেই বৈধ ও আবশ্যক। তাছাড়া, এ বিষয়ে জাপানী ও ভারতবাসীরা—জর্ম্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, হঙ্গারীয়, রুস ইহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। উহারা সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে উদারনৈতিক ইংলণ্ড ও বৈপ্লবিক ফ্রান্সের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা

।।৪।। র² নো¹ নো¹। ধ² প¹ মগ¹। ম² নো¹ নো¹। ধ¹ ধপ¹
গা ই ব আ মি – আ মা র সু –

প¹ ধপ¹।। ম¹ প¹ ধ¹ স¹। নো¹ ধ¹ প¹ ধপ¹। ম¹ মগো¹ র¹ ম¹।
রে – তো – দে র সু র টি – না – ই ক

গোর¹ স¹ র²।। র¹ র² স¹। নো¹ নোধ¹ প¹ ধ¹। র¹ র³। সনো¹
জা – না ম রু দে শে – – – র সা হা রা

ধ¹ প¹ ধপ¹।। ম¹ প¹ ধ¹ স¹। নো¹ ধ¹ প¹ ধপ¹। ম¹ মগো¹
– শো ন্ আ – মা র রা – গে – নে –

র¹ ম¹। গোর¹ স¹ র²।।
ই সা হা – না

শেষ।

নোপ² প²। নো² নো¹ স¹। র²– গো¹ স¹। র³।। ম² ম¹ গ¹।
ধূ ধূ বা লু র মূ র্চ্ছ না তায় ঝ ঞ্ঝা –

ম² গম¹ প¹। ম¹ ম¹ রগো¹ ম¹। গোর¹ স¹ র²।। নো² র¹ স¹।
উ ঠে – মে লি য়ে – ডা – না ক র্ম্ম –

র² গো¹ র¹। স¹ সনো¹ ধ¹ স¹। সনো² ধ¹ ম¹।। ম¹ প¹ ধ¹ স¹।
না শা – মী ড়ে – – মী ড়ে – ম – র্ম্ম –

নো¹ ধ¹ প¹ ধপ¹। ম¹ মগো¹ র¹ ম¹। গোর¹ স¹ র²।। র¹ র² স¹।
না – শা – গ ম – ক হা – না আ মা র

নো¹ ধ¹ প¹ ধ¹। র³ স¹। নো¹ ধ¹ প¹ ধপ¹। ম¹ প¹ ধ¹ স¹।
গা – ন টি নাই শু নি – লি – সা – হা –

নো¹ ধ¹ প¹ ধপ¹। ম¹ মগো¹ র¹ ম¹। গোর¹ স¹ র²।।
রা – সে – ন – য় সা হা – না

নো¹ নো² প¹। নো² নো¹ স¹। র² গো¹ স¹। র³।। স¹ গ² গ¹।
অ চ ল ঠা টে র বা হি রে ধায় তী – ব্র

ম² গম¹ প¹। ম¹ গো¹ গো¹ গো¹। রগোর¹ স¹ র²।। র² নো²।
ক ড়ি – কো – ম ল না – না বাঁ ধা

ধ² নো¹ ধ¹। প² ধ¹ প¹। ম² পম¹ গ¹। গ¹ গ³। ম² গম¹ প¹।
সু রে র জ্ঞা নে – বা ধে – শু নিস্ নে রে –

ম² মগো² গোর¹ স¹ র²।।
মা নিস্ মা – না

নোপ১ প২ প১। নো২ নো১ স১। র২ গো১ স১। র০।। ম২ ম১
ম রী চি কা র – মি থ্যা ঝ লক ঝল্ সে

গ১। ম২ গম১ প১। ম২ রম১ গো১। র স১ র৩।। নো২ র১ স১।
– আঁ খি – কর বে কা না – ধূ স র

র২ গো১ র১। স১ সনো১ ধ১ ধস১। সনো২ ধ২। ম১ প১ ধ১ স১।
ব র ণ প্রা – ণে র আ মার শু ন্ বি –

নো১ ধ১ প১ ধপ১। ম১ মগো১ র১ ম১। গোর১ স১ র২।। র১ র২ স১।
য – দি – আ লা – প খা – না ম রু দে

নো১ ধ১ প১ ধ১। র১ র৩। সনো১ ধ১ প১ ধপ১। ম১ প১ ধ১ স১।
শে – – র সা হা রা – গা ই আ – মা র

নো১ ধ১ প১ ধপ১। ম১ মগো১ র১ ম১। গোর১ স১ র২।।
রা – গে – নে – ই সা হা – না

(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

মনে-মনে

(গল্প)

বন্ধু-সভায় তর্ক চল্‌ছিল যে বাঙালি-জীবনে লভে পড়বার কোনো সুযোগ আছে কি না? অনেক তর্কের পর অধিকাংশের মত এই দাঁড়াল যে, না—কোনো সুযোগই নেই।

একজন বল্লেন—"তবে যে বাংলার কাব্যে ও গল্পে এত লভের ছড়াছড়ি—সেটা কি?"

উত্তর হ'ল—"সে কবি-কল্পনা ও গাল-গল্প ছাড়া আর-কিছুই নয়।"

নবীন কিন্তু এ উক্তিটাকে গ্রাহ্য করতে রাজি হ'ল না। সে বল্লে—"আমাদের জীবনে যদি ঐ লভের সংস্পর্শ না ঘটত তাহ'লে কবি কখনোই সেটাকে নিজের রচনায় আমোল দিতে পারতেন না। আমাদের সাহিত্যে যে লভ্-সং এবং লভ্ ষ্টোরি তৈরি হচ্ছে এইটেই একটা মস্ত প্রমাণ যে আমাদের জীবনে লভ্ আছে।"

সতীশ বল্লে—"দেখ, তর্কের গোড়াতেই আমরা একটা মস্ত ভুল করে বসেছি। লভ্ বলতে তোমরা কি ধরে নিচ্চ সেটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার।"

আমাদের দলের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতা লিখতেন। সতীশ তাঁর কবিতা শুনে ভারি

টিট্‌কারি দিত। সেইজন্য লক্ষ্মীকান্তর ধারণা সতীশ-লোকটা একেবারে কাঠখোট্টা বেরসিক। তিনি সুযোগ পেলে সতীশের টিট্‌কারির শোধ তুলতে বিলম্ব করতেন না। তিনি বলে উঠলেন—"দেখ সতীশ, লভ্ বলতে কি বোঝায়, সে তুমি বুঝতে পারবেনা;—ও তোমার প্রভিন্স্ নয়।"

সতীশ বল্লে—"সরল স্বচ্ছ ভাষায় ছন্দ ঠিক রেখে বল্লেই আমি সব বুঝতে পারি। ভাব এবং ভাষার তোত্‌লামি দেখলে আমার হাড় জ্বলে যায়!"

অখিল চীৎকার করে বলে উঠল—"কম্ টু দি পয়েণ্ট! কি বলছিলে হে সতীশ? লভ্ বলতে কি বোঝায়!"

সতীশ বল্লে—"হ্যাঁ। কারণ আমরা অনেকেই বিয়ে-থা করে পত্নীপ্রেমে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছি—এ যখন দেখতে পাই তখন তর্ক কোথায়? তবে তুমি যদি বল—ফ্রি-লভ্—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"অবশ্য, ফ্রি-লভ্ নিয়েই তর্ক।"

সতীশ বল্লে—"আচ্ছা তবে তর্ক চলুক।"

নবীন বল্লে—"আমি ত তাই বলছিলুম যে ঐ ফ্রি-লভ নিয়ে যখন কবিতা গল্প লেখা হচ্ছে তখন নিশ্চয় আমাদের মধ্যে ফ্রি-লভ্ আছে।"

বিপিন বলে উঠল—"এ তোমার কী রকম লজিক্?"

নবীন উত্তর দিতে যাচ্ছিল; যতীন বাধা দিয়ে বল্লে—"আমার কি মনে হয় জান? আমাদের বাস্তব-জীবনে ফ্রি-লভ্ না থাকলেও আমাদের মনোজগতে ফ্রি-লভের একটা স্বর্গ তৈরি হয়ে উঠেছে। সেটা অবশ্য তৈরি হয়েছে বিদেশী-সাহিত্যের অনেক মাল-মসলা আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে বিদেশী-সাহিত্যের আব্‌হাওয়াটা আমাদের মনের মধ্যে এমন জমাট বেঁধে উঠেছে যে বাইরে কোনো সুযোগ না থাকলেও মনে-মনে লভে পড়তে আমাদের কিছুমাত্র আটকায় না। সামাজিক ক্ষেত্রে যেটা খোঁড়া হয়ে আছে, মানসক্ষেত্রে সেটা মেলট্রেনের মতো চলে।"

নবীন বল্লে—"আমি ঠিক ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে হে!"

সকলকার মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাটা ঠিক লেগেছে। কেবল লক্ষ্মীকান্ত একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন যাকে বলে অতিরিক্ত-মাত্রায় 'স্বদেশী'। বিদেশকে কোথাও একটু প্রাধান্য দিলে তাঁর বরদাস্ত হ'ত না। তিনি বলেন, জর্ম্মানযুদ্ধে যত-কিছু আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি দেখা গেল, তা সমস্তই আমাদের এই ভারতবর্ষে ছিল। প্রমাণ চাইলে তিনি সংস্কৃত পুরাণ, উপপুরাণগুলোকে মন্থন করতে বলেন। নবীনের মুখে বিদেশী-সাহিত্যের নাম শুনে তিনি আগুন হয়ে বলে উঠলেন—"ফ্রি-লভের জন্যে আমরা অন্যদেশের ঋণ স্বীকার করতে যাব কেন? আমাদের দেশে কি ফ্রি-লভ ছিল না? শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের উপাখ্যানটা কি?"

যতীন বল্লে—"অবশ্য, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ফ্রি-লভের যথেষ্ট নজির আছে।

নইলে জিনিষটা যদি একেবারে 'ফরেন্' হ'ত তাহ'লে আমাদের মন সেটাকে গ্রহণ করতেই চাইত না। জমী আমাদের তৈরি ছিল, বিলিতি এন্‌জিনিয়াররা তাঁর উপর কোঠা বানিয়ে দিয়েছে মাত্র।"

অখিল বল্লে—"দেখ, তোমরা বলছ বটে, কিন্তু দুষ্মন্তের প্রেমকে ঠিক ফ্রি-লভ্ বলা যায় কি-না আমার সন্দেহ আছে। কারণ শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা ভেবে তিনি প্রথমটা ভেব্‌ড়ে গিয়েছিলেন, তারপর যখন শুনলেন তিনি অপ্সরার মেয়ে তখনই তাঁর স্ফূর্ত্তি হ'ল।"

যতীন বল্লে—"আচ্ছা তর্কের খাতিরে না হয় দুষ্মন্তের কথা ছেড়েই দিলুম। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেম—গোপিনীদের প্রেম, সে-সব কি?"

সতীশ বল্লে—"ওহে ও-সব কথা ছেড়ে দাও। সেদিন ত লক্ষ্মীকান্তবাবুর বক্তৃতায় শুনলে—ও হ'ল 'ডিভাইন' জিনিষ। দুশ্চর তপস্যা না করলে ঐ স্বর্গীয় তত্ত্বরস লাভ করা যায় না।"

যতীন বল্লে—"ও নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছে থাকলেও আজ আমি নিরস্ত হলুম। যাই বল, মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ফ্রি-লভ্‌টা আমাদের ভিতর এখন চলন না থাকলেও জিনিষটা একেবারে বিদেশী নয়।"

লক্ষ্মীকান্ত উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন—"আমিও তো তাই বলি। 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভূভারতে'—এই প্রবাদ বাক্যটা ভুয়ো ভিত্তির উপর তৈরি হয়-নি। আমাদের কি না ছিল? বিদেশের যে-সব চাকচিক্য দেখে তোমরা মুগ্ধ হচ্ছ ও সমস্ত আমাদের ছিল—এ পর্য্যন্ত কোনো শর্শা একটি কণাও নূতন করে যোগ করতে পারেন-নি—"

অখিল বাধা দিয়ে বলে—"সে-সব গেল কোথায়?"

লক্ষ্মীকান্ত মুখটাকে গম্ভীর করে নিয়ে বল্লেন—"আমাদের এই পূতপবিত্র ভারত—এই মহাভারত—ঐ সকল নশ্বর বস্তু-ভারের জড়তা অতিক্রম করে একদিন পুণ্যাত্মা স্বর্গের পথে তীর্থযাত্রা করেছিল—সেই ছিল এই ভারতের সাধনা।"

অখিল বল্লে—"তাই বুঝি এই ভারতের স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটল!"

লক্ষ্মীকান্ত জোর করে বল্লেন—"হ্যাঁ! এ ঠাট্টা নয়। সত্যই ভারত স্বর্গের পথে যাত্রা করে শেষে স্বর্গে গিয়ে পৌঁচেছিল। সেই জন্য আমাদের প্রাচীন পুরুষরা দেবতাদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের কাহিনী এখন দেব-কাহিনী হয়ে গেছে—সেগুলোকে তোমরা এই ধূলো-মাটির মানুষ এখন আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দাও। কীটাণুকীট তোমরা যে অমৃত রসের মর্ম্ম কি বুঝবে?"

সতীশ বল্লে—"ও-ও-ও তাই বুঝি তুমি সেই "নরহরি" শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিলে! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম কেন ঐ নরহরি কথাটা নিয়ে একশ লাইন মক্স করা হয়েছিল!"

লক্ষ্মীকান্ত জোর দিয়ে বলেন—"সত্যিই ত! 'নরহরি'র মতো একটা কথা তুমি অন্য ভাষা থেকে খুঁজে বার কর দেখি! নর—এই নশ্বর নর, আর হরি—ঐ অমরলোকের

বৈকুণ্ঠবিহারী হরি—এই দুইকে যাঁরা এক-করতে পেরেছেন তাঁরা কি আর এই পৃথিবীর মানুষ ছিলেন!"

সতীশ বল্লে—"তাই নাকি? এ তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আবিষ্কার করেছ? তাহ'লে তুমি শুধু কবি নও—একাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক।"

লক্ষ্মীকান্তবাবুর চেহারা দেখে মনে হ'ল সতীশের মুখ থেকে এতগুলো বিশেষণ লাভ করে তিনি মনে-মনে খুসি হয়েছেন। তিনি বল্লেন,—"দেখ সতীশ, খাঁটি কবিতা তৈরি করতে হ'লে ও তোমার দর্শনও চাই, ভাষাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বও চাই—এমন কি বিজ্ঞানকেও বাদ দেওয়া চলে না;—জীবতত্ত্ব বীজতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র তত্ত্বকে কেন্দ্রীভূত করে যে বিরাট, অনন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কাব্যসৃষ্টি তারই ছায়ামাত্র।"

সতীশ বল্লে—"দেখুন লক্ষ্মীকান্তবাবু, ঐ সব শক্ত শক্ত কথা কস্মিনকালে আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না—সে হয় ত আমার স্বভাবের দোষ। কিন্তু এই সহজ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে নতুন করে আবার কাব্য তৈরি করবার দরকার কি? বিশেষত আপনার। কারণ আপনি বলে থাকেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা-কিছু দরকার তা সব চূড়ান্ত করে চুকেছেন। তবে কি কেবল কাব্যটির বেলাই আপনার জন্য কিছু বাকি রেখে গেছেন? তাঁরা ওটারও চূড়ান্ত করে গেছেন বলে আপনার ঐ কটমট গান-গুলো লেখা যদি অনুগ্রহ করে বন্ধ করেন তো আমাদের কানগুলো রেহাই পায়।"

অখিল তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"শুধু গান কেন বলছ ভাই, ওঁর ঐ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলোও ঐ সঙ্গে বন্ধ করতে বলনা। তাহ'লে আমাদের এই মজলিসটা অনেকটা সরস হয়ে আসে।"

যতীন আর কাউকে অবসর না দিয়ে বল্লে—"দেখ, ফাঁক পাচ্ছিনা বুলে একটা কথা তুলতে পারছিনা—লক্ষ্মীকান্তবাবুর ঐ নরহরি—"

সতীশ বল্লে—"আবার ঐ নরহরি!"

যতীন বল্লে—"ও-কথা তো তুমিই তুল্লে হে—"

সতীশ বল্লে—"তাই না কি! তবে কানমলা খাচ্ছি। দাও, আমার কানটা আচ্ছা-করে মলে দাও।"

যতীন বল্লে—"না, না, শোনোনা আমার কথাটা! 'নরহরি' শব্দের যে-রকম ব্যাখ্যা লক্ষ্মীকান্তবাবু করলেন, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে তার অর্থ অন্যরূপও হ'তে পারে। যেমন ধর, নরের কিনা মানুষের জিনিষ যে হরণ করে অর্থাৎ চোর কি ডাকাত। অথবা নরকে যে হরণ করে অর্থাৎ যম কিম্বা আড়কাঠির দালাল।"

লক্ষ্মীকান্ত চটে উঠে বল্লেন—"তোমাদের এই ছ্যাব্‌লামির আড্ডায় আমি থাকতে চাইনি।"

সতীশ তাঁর হাতদুটো ধরে বল্লে—"সেটি হচ্ছেনা দাদা! তোমার মতন চিজ্‌কে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারিনা। তাহ'লে এ সভার অর্দ্ধেক রসই শুকিয়ে যাবে।"

যতীন বল্লে—"চট কেন দাদা? কবি হয়ে রসিকতা বোঝনা।"

লক্ষ্মীকান্ত বল্লেন—"তোমাদের রসিকতা ক্রমেই ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করছে।"

সতীশ বল্লে—"আচ্ছা, তুমি যাতে ঠাণ্ডা হও তার জন্যে না হয় প্রাচীন ভারতের ভদ্রতা-সম্বন্ধে তোমার কবিতা কিম্বা প্রবন্ধ আমরা বুক-ঠুকে শুনতে রাজি আছি। আস্‌ছে-বারের প্রোগ্রাম না-হয় তাই রইল! এইবার তুমি খুসি ত!"

লক্ষ্মীকান্ত বল্লেন—"ঠাট্টার কথা নয়—সত্যিই ভদ্রতা কাকে বলে তোমাদের জানা দরকার। এবং সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের শিক্ষা দিতে চাই।"

সতীশ বল্লে—"আচ্ছা গুরুদেব, আচ্ছা! এখন ধীরোভব!"

যতীন বল্লে—"দেখুন, আমার মনে হয় লক্ষ্মীকান্তবাবু ঠিকই বলেছেন। আমাদের দেশে ভদ্রতার বড়ই অভাব। একটা দৃষ্টান্ত—"

সতীশ বাধা দিয়ে বল্লে—"ওটা আসছে বারের জন্যে স্থগিত থাক্‌না ভাই।"

যতীন বল্লে—"আমি লক্ষ্মীকান্তবাবুকে সমর্থন করতে চাই।"

নবীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার অধীর হয়ে বলে উঠল—"ওহে তর্ক যে ক্রমেই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।"

অখিল বল্লে—"ঠিক! ঠিক! কম্‌ টু দি পয়েণ্ট!"

সতীশ কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে বল্লে—"তাইত! আমরা কি নিয়ে আরম্ভ করছিলুম বল ত?"

অখিল বল্লে—"ফ্রি-লভ্‌!"

সতীশ বল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু কোন্ অবধি আমরা এসে পৌচেছি মনে পড়ছে না ত!"

যতীন বল্লে—"তাইত হে, ঐ ফ্রি-লভ্‌ সম্বন্ধে আমার কি একটা যেন বলবার ছিল আর তার থেই খুঁজে পাচ্ছিনা।"

বিপিন বল্লে—"তর্কটাকে বেশ একটু জাট করে আনা গিয়েছিল, তারপর কোথা এলিয়ে গেল—না?"

নবীন বল্লে—"আমি বলছিলুম এই কথা যে আমাদের সমাজে ফ্রি-লভ্‌ না থাকলেও আমাদের মনে ফ্রি-লভের জায়গা আছে।"

সতীশ চোখ-মট্‌কে বল্লে—"এ সম্বন্ধে লক্ষ্মীকান্তবাবু কি বলেন?"

লক্ষ্মীকান্ত ফোঁস্‌ করে বলে উঠলেন—"আমি এমন জায়গায় কোনো কথাই বলতে চাইনে!"

বিপিন বল্লে—"যতীন, তুমি কিছু বলবে না হে?"

যতীন বল্লে—"যা বলব ভেবেছিলুম তা তো ভুলে গেছি; এখন কি বলব তাই ভাবছি!"

অখিল বল্লে—"আমার অবস্থাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে বলবার যেন কোনো উৎসাহই পাচ্ছিনা।"

সতীশ বল্লে—"উৎসাহ আমার খুব আছে; কিন্তু আমি ভাবছি নবীনের কথায় প্রতিবাদ করব কি সায় দেব। লক্ষ্মীকান্তবাবু কি বলেন?"

লক্ষ্মীকান্তবাবু এবার সতীশের দিকে কেবল কট্‌মট্‌ করে চেয়ে উঠলেন—কোনো জবাব দিলেন না।

নবীন বল্লে—"তোমরা যখন কেউ

কিছু বলতে চাও না, তাহলে আমিই বলি।"

সবাই বলে উঠল—"বেশ! বেশ!"

নবীন বল্লে—"ফ্রি-লভ্‌ নিয়ে আর শুক্‌নো তর্ক না করে ওরই সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটা সত্যঘটনামূলক কাহিনী শোনাতে চাই।"

অখিল বিস্ফারিত চোখে বল্লে—"অ্যাঁ সত্য ঘটনা?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ, সত্য ঘটনা।"

সতীশ বল্লে—"দাঁড়াও হে, আমি একটা সিগারেট পাকিয়ে নিই।"

নবীন তার টেবিলের টানা থেকে একখানা খাতা বার করে বল্লে—"এই সেই কাহিনী। এ কার লেখা, কেমন-করে আমার কাছে এল, সে সব কথা চাপা থাক্‌; এখন ঘটনাটা শোনো।"

সতীশ সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বল্লে—"আচ্ছা বল।"

নবীন খাতা খুলে পড়তে লাগল—

একপিঠের কথা

তার সঙ্গে আমার প্রথম-দেখা—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, সামনে তীব্রগতি স্বচ্ছ নদীর কুলুকুলু তান, পূর্ণিমার রজতকিরণে উচ্ছ্বসিত রজনী, গাছে-গাছে কোকিল-কোয়েলার কলসঙ্গীত, বসন্তের মলয় সমীরণ—এ সমস্ত কিছুই ছিল না। ঘোর অমাবস্যা নিশীথে বিজন বনে একাকিনী দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা হয়ে সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী আর্ত্তনাদ করছিল, আমি অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়ে তাকে উদ্ধার করলুম—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সে বহু-যত্নে শুশ্রূষা করে আমায় সুস্থ করলে; তারপর আমার উপকারের বিনিময়ে তার হৃদয়টি আমার হাতে তুলে দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল—আমি অবাক হয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে, সেই অমূল্য উপহারটি গ্রহণ করে, একবার মাথায়, একবার বুকে ঠেকিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলুম—এমন কবিত্বময় ব্যাপারও ঘটেনি।

কোনো নিরালায় নির্জ্জনে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি;—তাকে দেখেছিলুম আমি এক ভীষণ জনকোলাহলের স্রোতের মধ্যে; —ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেসি, তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, লুটোপুটি তারই মাঝখানে! স্থানটি কোনো মেলাক্ষেত্র না হলেও, মেলার চেয়েও সেখানে ঢের বেশী ভিড়; বিরাট বক্তৃতা-সভা না হলেও ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল সেখানে। জায়গাটি একেবারে আত্রহীন খোলা মাঠের মতন নয়, অথচ মনে হয় যেন হাট কি বাজার। অর্থাৎ সেটি হাওড়া ষ্টেশন।

আমি যাচ্ছিলুম হাওয়া বদলাতে দেওঘরে। সঙ্গে ছিল কেবল চাকর ও বামুন। পাঞ্জাব মেলের এক দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরায় একটা জান্‌লা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে চুপ করে বসে-ছিলুম। অসুস্থ দেহের দুর্ব্বলতা বিদেশযাত্রা কাতর মনটাকে ক্রমেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শেষে এমন মনে হতে লাগল যেন আমার দেহ-মন সমস্ত আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখের সামনে লোকজন ছুটোছুটি করছে, মালপত্র বহে নিয়ে

বাচ্ছে, গাড়ির দরজা টানাটানি করে খুলে পিল্ পিল্ করে লোক সেঁধচ্ছে, মুটের সঙ্গে ঝগড়া, সঙ্গী নিয়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি চলেছে—এ সমস্ত শুধু চোখেই দেখছিলুম, কানেই শুনছিলুম,—মনের যেন কোনো সাড় ছিল না।

হঠাৎ আমার সেই তন্দ্রার উপর একটা ধাক্কা দিয়ে একটি ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে জায়গা হবে কি ?"

আমি বল্লুম— একটা জায়গা আছে বোধ হয়।"

ভিড়ের সময় রেল-কামরার যে দরজা খোলা হয় সেই দিকে সবাই ছোটে। ভদ্রলোকটি দরজা খুলতেই তাঁর আশপাশে অনেকগুলি লোক এসে দাঁড়াল। তারপর, আর জায়গা নেই দেখে আবার ছুট দিলে।

ভিড় সরে গেলে দেখি আমার সাম্নে এক বৃদ্ধ একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে কি ভাবছেন। হঠাৎ আমার মনের উপর এই ছবিটি একটা ঝট্‌কার মতো এসে লাগল—তাইতে আমার সেই তন্দ্রা একেবারে ছুটে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার গায়ের রং, তার সেই মুখ, চোখ, ঠোঁট, ভুরু,—এমন-কি তার সেই ফিরোজা রঙের সাড়িখানির ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত আমার মনের উপর কেঁপে-কেঁপে দাগ কাটতে লাগল। তার সেই কালো চোখের পাতার কাঁপুনি, তার হাতের চুড়ির ঠুন্‌ঠন্, তার পায়ের আলতার পাভাটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না;—এই সমস্ত রং ও শব্দের রেখা নিয়ে আমার মনে যেন একখানি জীবন্ত প্রতিমা জেগে উঠল।

আমি তার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়েছিলুম, হঠাৎ সে আমার পানে টানাটানা চোখ তুলে একবার চাইলে। যেমন দেখা সেই দৃষ্টি একেবারে সোজা আমার অন্তরের মধ্যে গিয়ে পৌছল। অমনি আমার সমস্ত হৃদয়-মন সেই দৃষ্টিকে বরণ করে তুলে নিলে।

এত ব্যাপার ঘটে গেল একমুহূর্ত্তের মধ্যে। বৃদ্ধটি খুব অল্পক্ষণই সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত টেনে ডাকলেন। মেয়েটি চলে গেল। তার পায়ের পাঁয়জোরের ঘুঙুর বাজতে লাগল—ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্! আমার মনে হল সেই সুর যেন আমায় ডেকে গেল। আমি উঠতে পারলুম না, কিন্তু আমার চোখ, ঐ সুরের সঙ্গী হয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে শেষে হতাশ হয়ে একা ফিরে এল।

আমি বসে বসে ভাবছিলুম। সেই ভাবনার মধ্যে চারিদিকের গোলমাল, চারিদিকের আলো যেন নিভে গিয়ে, সব ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন কেবল সেই মেয়েটির ছবি স্বপ্নের মতো চোখের উপর ভাসতে লাগল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমি চোখ-বুজে শুয়ে পড়লুম। আমার অসুস্থ শরীর-মন ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল। সেই ঝিম্‌ঝিমানির ভিতরে ভিতরে তার চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্, পাঁয়জোরের ঝুন্‌ঝুন্‌শব্দ কোন্ সুদূর থেকে এসে বেজে বেজে মিলিয়ে যেতে লাগল।

গাড়ি যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ মনে এইরকম একটা তৃপ্তির আবছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে মেয়েটি কাছে না থাকলেও সঙ্গে আছে। কিন্তু যেই বর্দ্ধমানে এসে গাড়ি থামল, লোকজনের নামা-ওঠা সুরু

যখন দেখলুম কারা দুজন দূরে গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চলে গেল, অমনি আমার বুকটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। হতে লাগল আমার জীবনের শুকতারাটি চিরদিনের মতো ঐ অস্ত যায়! একবার হ'ল বোধ-হয় সে নয়; কিন্তু হটাকে দৃঢ় করবার কোনো সুযোগই লুম না। বুকের ভিতরটা হায়-হায় রে উঠল,—কেবলই মনে হতে লাগল সে ঐ চলে গেল,—কোন্ অজানা কারের মধ্যে ডুবে গেল!—আর র দেখা পাব না! কত মানুষই চলে ল দেখলুম, কিন্তু তার যাওয়াটিই হৃদয়-ঝে বিদায়ের একটি নিবিড় ব্যথা জাগিয়ে য়ে গেল।

গাড়ি আবার ছেড়ে দিলে। এতক্ষণ আমি ছায় যাচ্ছিলুম, এইবার আমাকে জোর রে টেনে নিয়ে চল্ল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দিক দিয়ে সে চলে গেল সেই-দিকটিতে খ-মেলে চুপ করে পড়ে থাকি, কিন্তু তা ল না; নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে ন আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল!

আমি হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লুম। াড়ি দোল খাইয়ে-খাইয়ে আমাকে ঘুম-াড়াতে লাগল। সেই দোলার উপর ামার সমস্ত শরীর-মনকে ছেড়ে দিয়ে মি অসাড় হয়ে পড়ে রইলুম—আমার লক্ষ্যে ঘুম এসে আমাকে আত্মসাৎ রলে।

কবিরা যে বলেন প্রেম অন্ধ—একথা ব ঠিক! প্রেম যে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায় এর প্রমাণ আমি যেমন পেয়েছি, আর-কেউ পেয়েছেন কি-না—জানি না। সে মেয়েটি সমস্ত পথটা আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল, সকালবেলা আমার সাম্‌নে গাড়ি থেকে নেমেছে, আবার গাড়িতে উঠেছে, আবার নেমেছে—অথচ একবারও আমার চোখে পড়েনি। আমি নিশ্চয় কাণা হয়ে ছিলুম, নইলে বারবার এমন করে কখনো সে আমার চোখ এড়িয়ে যায়?

পরদিন সকালে তাকে দেওঘরে দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। গত রাত্রের সেই ঘন হতাশার কুয়াসা ঠেলে আমার বুকের মাঝে যেন সূর্য্য উঠলেন। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল, কেমন করে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হ'ল। এ যেন স্বপ্ন! একি সেই অদৃষ্টদেবীর খামখেয়ালি খেলা, যিনি আড়ালে থেকে মানুষকে নিয়ে মজা করেন? ঐ দেবীটির মনে কি গূঢ় মতলব আছে জানি না, কিন্তু আমার মন আনন্দে মেতে উঠল!

তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে-যাবার পথে। তখন সূর্য্যাস্তের রাঙা রং মেঘের গায়ে লেগে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছে—পাখীরা চারিদিকে কলরব করে উঠেছে। এই রং আর সুরের শতদলটির উপর হঠাৎ তার আবির্ভাব হ'ল। আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি;—মনে হ'ল স্বপ্ন। কিন্তু না, স্বপ্নের দুয়ার ঠেলে সত্যই সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল! সত্যই তাকে চোখের সাম্‌নে দেখলুম।

পরদিন সকালে আরো আশ্চর্য্য হয়ে দেখি

যে তারা আমার ঠিক সাম্‌নের বাড়িতেই এসে উঠেছে। এত কাছে যে গলার আওয়াজটি পর্য্যন্ত কানে এসে লাগে।

আমার বসবার বারন্দা থেকে তাদের বাড়ির একটুখানি ভিতর দেখা যেত। সেই দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার অলস দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলুম। প্রথম-প্রথম সে স্থানটা শূন্যই থাকত, আমার মনের আশা দিয়ে তাকে ভরিয়ে রেখেছিলুম। কখন্ একটিবার সে আসে এই প্রতীক্ষায় তার না-আসার সময়টা উদ্বেগের আনন্দে কাটত।

ক্রমে ক্রমে একটু-একটু করে আসা সুরু হল। তখন আমার মনে হতে লাগল—"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।" যাওয়া-আসার তাল তারপর একটু ঘন হয়ে এল। আমি চুপ-করে চোখ-মেলে পড়ে থাকতুম;—স্বপ্ন দেখার মতন দেখতুম সে আমার সাম্‌নে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। কখনো আসতে-আসতে হঠাৎ থম্‌কে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে যেত; কখনো এসে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকত—সে কতক্ষণ ধরে।

এই নির্জ্জন নিরালার গোপনতার মধ্যে বসে ছবির মতো তাকে দেখাটি আমার ভারি ভালো লাগত। এইরকম সুযোগ না পেলে আমার মনটিকে অম্‌নি করে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে আমার দেখবার অবসর হত না। সে একটু দূরে ছিল বলে আমার চোখটি খুলত ভালো—সঙ্কোচে তার ডানা মুদে আসত না। এই কারণে ঐ ব্যবধানটুকুর জন্যে আমার মনে কোনো দিন কোনো খেদ হয় নি।

আমার এই অশ্রান্ত দেখার কোনো ব্যাঘাত ছিল না। কেবল হঠাৎ এক-এক তার দৃষ্টি এসে আমাকে চম্‌কে দিত। আমার দেখার একটানা ছন্দের মধ্যে পড়ে আমার দেখার সুরকে বিচিত্র করে এবং ঐ চম্‌কানির আন্দোলনে আমার নি বুক নাড়া পেয়ে সজীব হয়ে উঠত।

আমি ঐ জায়গাটি ছেড়ে নড়তে পার না। কোথাও যাবার তাড়া পড়লে আ হ'ত—যদি এসে ফিরে যায়—দেখাতো না! আমি কৃপণের মতো তার পাওয়াটিকে আঁকড়ে ছিলুম; একতিল লোকসান আমার কিছুতেই বর হ'ত না।

কেউ যদি এখন জিজ্ঞাসা করে এ মধ্যে কি ছিল, যার জন্যে তোমার এত তা হ'লে আমি তাকে কোনো জবাবই পারি না। ভাবতে গেলে দেখার সত্যই কিছু ছিল না; তবু এই দেখা কোনো দিন আমার ফাঁকা মনে হয় নি।

এক-একবার মনকে প্রশ্ন করি কি দেখবারই লোভ ছিল, দেখাবার সাধ মনে-মনে ছিল না? মনে হয়, ছিল বো হয়। নইলে তার চোখের একটি চাহনি জন্যে মনটা অমন কাঁপতে থাকত কে যাতে সে এদিকে চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্যে ফাঁক না দেখে তার জন্যে ভিতরে-ভিত অত উৎকণ্ঠাই বা জাগত কেন?

যখনই তাকে সাম্‌নে পেতুম চোখ-ভ দেখে নিতুম, তার একটা মুহূর্ত্তও আ কখনো বিফল হ'তে দিইনি! একই ছ উল্টেপাল্টে দেখতুম—প্রতিবার নূতন দেখা সঙ্গে নব-নব বৈচিত্র্য ফুটে উঠত। একবা

া আর একবার অ-দেখার লুকোচুরির ধ্যে পড়ে আমার ব্যাকুলতা পুরোনো তে পারত না। সেই জন্যে দিনের র দিন ধরে আমি দেখেই চলেছিলুম।

শুধু দেখা নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের রিচয় হ'তে পারে আমার জীবনে আমি া প্রত্যক্ষ করেছি। তার সঙ্গে পরিচয়ের ানো বন্ধনই ঘটেনি, তবু আমার মন ানে সে আমার কতখানি পরিচিত। ার কিছু জানতে আমার বাকি নেই; ার আমার বিশ্বাস সেও আমার সব জেনেছে —ঐ দেখার ফাঁকে-ফাঁকে।

সে আমার এতটা জানা হয়ে গিয়েছিল য কোনো শব্দ না পেলেও আমি বুঝতুম সে এইবার আসচে; কোনো ইসারা না পেলেও আমি টের পেতুম সে এইবার চলে াবের কথা কইতে না পেলেও কথা যে আটকায় না, তা যারা শুধু চোখের কারবার করেছে তারাই জানে।

আমার প্রতিদিনের সকালটি আসত তারই দেখা-পাবার আশা নিয়ে, সন্ধ্যা আসত তারই বিরহব্যথা বুকে জাগিয়ে। আমি আমার সকালটিকেও যেমন অভিনন্দন করতুম, সন্ধ্যাটিকে তেমনি অভিনন্দন করতুম—কারণ সে আমার দেখার সাধটিকে রাত্রের অন্ধকারে ঘনিয়ে তুলত,—যার জন্যে সকালের আশাটি আমার অত উজ্জ্বল হয়ে উঠত পারত।

আমার ঐ দেখাটির মধ্যে দিয়ে আমার মনের সমস্ত সাধ আমি মেটাবার চেষ্টা করতুম। কখনো তাকে মনের আনন্দ নিবেদন করতুম, কখনো দুঃখটিকে তার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরতুম। কখনো অভিমান জানাতুম, কখনো সেধে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তুম। কখনো গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিতুম, কখনো খেলনা নিয়ে খেলা করতে বসতুম। কখনো তার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতুম, কখনো বা লীলাভরে তাকে অবহেলা করতুম। কখনো তিরস্কার করতুম, কখনো আদর করতুম—এমনিতর কত কি!

সে এসব বুঝত কি-না, গ্রহণ করত কি-না, এ সন্দেহ অনেকবার হয়েছে; কিন্তু তাতে মন কখনো নিবৃত্ত হয়নি। সে রোজ রোজ নতুন-নতুন খেলা নিয়ে এত মেতে থাকত যে এদিকে তার গ্রাহ্যই ছিল না—বিফলতার অবসাদ গ্রহণ করবার তার অবসরই ছিল না।

এই একজায়গায় বসে-বসে আমি কত ছবিই না দেখলুম, কত বিচিত্র পথেই না ঘুরলুম, কত দোলাতেই না দুল্লুম, কত স্বপ্নই না সৃষ্টি করলুম! তবু আমার চোখের শেষ-ক্লান্তিটি কখনো এলনা।

চুপ-করে বসে দেখতে-দেখতে আমার এক-একসময় মনে হ'ত এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে এই যে সরু পথের ব্যবধান এটাকে আমার চোখ যেন একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে,—আমরা দুজনে এত কাছা-কাছি এসে পড়েছি যে পরস্পরকে মুখোমুখি দেখে লজ্জায় একেবারে জড়সড়, তখন কে কোথা দিয়ে পালাব পথ খুঁজে পেতুম না।

ওগো কে, তুমি কে, যে আমাদের এমনি করে খেলাচ্ছ—একবার কাছে নিয়ে গিয়ে, একবার দূরে রেখে, একবার চোখের

সামনে এনে, একবার চোখের আড় করে? এ কী নূতনতর খেলা—এর দুঃখই যে আনন্দ, এর আনন্দই যে দুঃখ!

তার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে এক-একবার ভারি ইচ্ছে হ'ত একটি কথা তাকে বলি। কেমন-করে বলব তা জানতুম না, তবু মনে হ'ত বলি। মনের ভিতর উল্টেপাল্টে কথাটি ঠিক করে নিতে আমার এক-একটি দিন শেষ হয়ে যেত। তারপর সন্ধ্যার সময় মনে আক্ষেপ হ'ত এমনি করে দিন ত বৃথায় গেল তবু মনের কথা তৈরি হ'য়ে উঠল কৈ? বেশী ত বলা যাবেনা, বেশী ত সময় পাবনা—একটি কথায় মনের সব-কথা শেষ করতে হ'বে—কিন্তু কৈ তেমন কথা? কোথায় পাব সে কথা?

আমার অলস-জীবনে তখন এই কথা-খোঁজার কাজ আমি পেলুম। অমনি আমার সমস্ত অবসরটি যেন ভরে উঠল। ঐ একটি কথা খুঁজতে গিয়ে কত কথাই জড়ো করলুম—যেন একটা কথার সমুদ্র সৃষ্টি হয়ে গেল। তবু তো সেই মনের কথাটি বাছতে পারলুম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াত আমার চোখ ঐ কথার সমুদ্র থেকে স্নান করে উঠে তার অভিষেক করত—নব-নব কথা দিয়ে তার অভিনন্দন জানাত। সে বোধ হয় উত্তর দিত—চোখ দিয়ে উত্তর দিত। কারণ তা নইলে আমার চোখের মন ঠাণ্ডা হ'ত কি করে? আমি সে-সব কথা ঠিক বুঝতে পারতুম না, বোধ হয় আমার চোখ বুঝত। নইলে তার আনন্দের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত কেমন করে?

উল্টোপিঠের কথা

চিঠিপত্র

(১)

ভাই সরি,

তুই আমাকে বলেছিলি, রোজ একখা করে চিঠি লিখতে হ'বে নইলে আ সঙ্গে আড়ি। তাই এইখানে পৌঁ তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। এই তোর সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, ঘণ্টাকত গেছে মাত্র, এর মধ্যে এমন-কি ঘটে যার কথা তোকে লিখি, খুঁজে পাচ্ছি না হাঁ, একটা কথা মনে হয়েছে বটে। হাওড়া ষ্টেশনে এমন ভিড় দেখলুম যে তেম কখনো দেখিনি। বাপরে বাপ, এত লোক বিদেশে আসে! কত-রকমের মানুষ যে দেখলুম তার ঠিক নেই। মানুষের মু চোখ যে এত রকমের হ'তে পারে আমা জানা ছিল না; তারা যে এত রকমে কাপড় পরতে পারে তাও আমি কখনে ভাবিনি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে হরেক-রকম জানোয়ার দেখে যেমন আশ্চর্য্য হতে হয়, আমি ঠিক তেমনি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। সহরের কাছে এমন-একটা খোলা চিড়িয়াখানা যে আছে তা বোধ হয় তুই জানিস্ না। পারিস্ ত একদিন গিয়ে দেখে আসিস্। খুব মজা পাবি।

গাড়িতে এমন ভিড় হয়েছিল যে বাবা জায়গা খুঁজে পাননি। জানিস বোধ আমাদের তাড়াতাড়ি চলে আসতে হ'ল তাই আগে-থাকতে গাড়ির বন্দোবস্ত হ নি। মেয়ে-কামরায় তিলমাত্র জায়গা

নই দেখে, বাবা বল্লেন, পুরুষদের সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। শুনে আমার ভারি লজ্জা হ'তে লাগল বটে কিন্তু মনে মনে একটা কৌতূহলও জাগছিল—দেখিনা পুরুষদের ধরণধারণ কেমন?

পুরুষদের একটা কামরায় একটুখানি জায়গা বোধ হয় ছিল। বাবা আমাকে নিয়ে সেইদিকে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই কে-একটা লোক এসে সেটা দখল করে নিলেন।

সেই গাড়িতে দেখলুম জান্‌লা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে একটি লোক বসে আছেন। তিনি চোখ চেয়েছিলেন বটে, তবু মনে হচ্ছিল যেন ঘুমচ্চেন। আমার মনে হল যেন কোন্ মায়াবী তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আমার ভারি ইচ্ছে হ'তে লাগল' হয় খুব নাড়া দিয়ে তাঁর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিই, নয়ত ঐ মায়াবীটার মন্ত্র ভেঙে দিয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে জব্দ করে দিই। মানুষকে এমন অসহায় দেখলে আমার ভারি মায়া করে!

লোকটাকে দেখে আমার দয়া হচ্ছিল, কিন্তু তার ব্যবহারে আমি ভারি চটে গেলুম। যতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল ততক্ষণ তাকে দোষ দিই না, কিন্তু সে যখন দানো-পেয়ে উঠল তখন তার উচিত ছিলনা কি আমাদের জন্যে একটু জায়গা করে দেওয়া? সে একটা বেঞ্চি পুরো দখল করে কাৎ হয়ে পড়েছিল। ইচ্ছে করলেই সে একটু সরে আমাদের জায়গা দিতে পারত। আমি রেগে উঠে বল্লুম—"বাবা, এখান থেকে চল!"

তারপর অবিশ্যি আমরা জায়গা পেয়েছিলুম; কিন্তু সমস্ত রাত বসে আসতে হয়েছে। সে আমার বেশ লাগল। ঘুমিয়ে এলে কিছুই দেখতে পেতুম না। এ বেশ সমস্ত রাতটি বসে-বসে, অন্ধকারে চেনা-জিনিষের চেহারা কেমন অদ্ভুত দেখায় তাই দেখতে-দেখতে এলুম।

আজ এই পর্য্যন্ত। তোদের সব খবর দিস্।

(২)

ভাই সরি,

তোর চিঠি আসবার এখনো সময় হয়নি; আসবার আগেই আমাকে লিখতে হচ্ছে; কারণ এখন না লিখলে আজকের ডাক পাবনা। তোর চিঠিখানা পেলে তবু কিছু লেখবার কথা পেতুম, শুধু-শুধু কি লিখি তাই ভাবছি।

এখানে আমাদের বাড়িটি বেশ নির্জ্জন জায়গায়। খান-চারেক বাড়ি আছে। চারদিক বেশ খোলা। পৃথিবীতে বাতাস যে এত প্রচুর এবং আকাশটা যে এত বড় তা এই খোলা মাঠে এসে প্রথম দেখলুম। আমরা কি ঘুপ্‌টির মধ্যেই থাকি। বাবাকে বল্‌ছি এইখানে একখানা বাড়ি কিনে বসবাস করতে। তিনি বলেন যে তোর জন্যেই তো ভাবনা, তোকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারিনা, তা নইলে কি আমি এমন জায়গা ছেড়ে সহরে পড়ে থাকতুম! তুই যদি এখানকার একটা সাঁওতাল ছেলে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতিস তাহ'লে—। সরি, কি বলিস্ তুই—একটা সাঁওতাল বিয়ে করব না কি?

এখানে সময় আমার বেশ কাটছে; কেবল তোর জন্যে বড় মন-কেমন করে। তুই যদি আস্‌তিস্ তাহ'লে আমার আর কোনো দুঃখ থাকত না। যাই হোক, এখানে একটা সঙ্গী জোটাতে হচ্ছে—নইলে দিন কাটবে না। কিন্তু তোর মতন সই পাব কোথা? কাজেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। সইয়ের সন্ধানে এইবার অভিযান করতে হবে। শুনচি আমাদের পাশের বাড়িতে কলকাতার কে চাটুয্যে আছে; তাদের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে হ'চ্ছে। তারপর কোন্ বাঙালদেশের জমীদার আছেন; তাঁদের ওখানে যাব কি না ভাবছি। এঁরাই হলেন আমাদের প্রতিবেশী। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। সেই যে হাওড়া ষ্টেশনের লোকটির কথা বলছিলুম, তিনি এই দেওঘরেই এসেছেন—আমাদের ঠিক সাম্‌নের বাড়িতে আছেন। লোকটার উপর থেকে আমার রাগ এখন একেবারে পড়ে গেছে—আহা, বেচারার মুখখানি দেখে। বেচারা বোধ হয় অনেকদিন কোনো কঠিন রোগে ভুগেছে। এখনো মুখখানি এমন শুক্‌নো যে দেখলে মায়া করে। তার সেই ঘুমন্ত ভাব এখনো ভালো-করে কাটেনি;—চলে-ফেরে যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে। চেয়ে থাকে—সেও যেন কেমন রকম.চাওয়া। চোখ দেখলে মনে হয় যেন খুব-একটু-খানি তেল নিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলছে।

বেচারা একলা এখানে এসেছে। আহা, ওর মা-বোন বোধ হয় কেউ নেই;—নইলে এমন রোগা ছেলেকে কেউ কখনো একলা ছেড়ে দেয়? সত্যি বলতে কি ওর জন্যে আমার ভাবনা হয়।

আমরা ভালো আছি। তোর চিঠির আশায় রইলুম।

(৩)

সরি,

তোর চিঠি পেলুম। কিন্তু এমন রাগ হ'ল কি বলব? ঐটুকখানি চিঠি এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেল! একটু বড়-করে লিখতে পারিস না? তাহ'লে কিছুসময় তবু কাটে! তোর চিঠি পেয়ে মনে হ'ল তুই নিজে যেন এসেছিস, আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিস। কিন্তু যেমন আরম্ভ অমনি শেষ! একটু দেখা দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলি তার ঠিক নেই। বল্ দিকিন্ এতে রাগ ধরে কি না!

কিন্তু তোকে দোষ দেওয়া বৃথা। চিঠি বড়-করে লেখা সত্যিই শক্ত। কি মাথামুণ্ড লিখব খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতায় বসে আমি যখন কাউকে চিঠি লিখেছি দু-দশ লাইনের বেশি কখনো লিখতে পারিনি। কিন্তু এখানকার জলহাওয়ার দেখছি আশ্চর্য্য গুণ! চিঠি লিখতে সুরু করলে শেষ হতে চায় না। এত কথা লেখবার ইচ্ছে হয় যে লিখতে-লিখতে হাত ব্যথা করে। এবং যা-তা লিখতে কিছুমাত্র বাধেনা। যেমন ধর্‌না কেন, আমি আমার ঘরে বসে চিঠি লিখছি, আর সেই হাওড়া ষ্টেশনের লোকটি জান্‌লার পাশে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে এ-কথাটা লেখবার কোনো দরকার নেই, তবু মনে হচ্ছে লিখে দিই।

আহা, বেচারার মুখখানি এখনো তেমনি

শীর্ণ আছে। এখানকার এমন ভালো জল-হাওয়া, তবু ওর উপকার হচ্ছেনা কেন? বোধ হয় যত্ন-আত্তির অভাব। পুরুষমানুষ নিজে সব দেখে-শুনে করতে পারেনা—চাকর-বামুনের পরেই ভরসা। তারা পর; তাদের কি বয়ে গেছে? বড় জোর তারা বাঁধা-ধরা কাজগুলো চুকিয়ে দেয়; তার পর পড়ে-পড়ে ঘুমোয়।—এর বেশী ত কিছু করেনা। তাতে কি আর রুগ্ন মানুষের চলে? রোগীর জন্য চাই যত্ন; কিন্তু সেই যত্ন ওকে কে দেবে? সত্যি, বেচারাকে দেখে বড় মায়া করে।

তাছাড়া আমার মনে হয় বুড়োধাড়ি হলেও ও যেন নেহাৎ ছেলেমানুষ! নিশ্চয় শরীরের অনিয়ম করে—নইলে সার্‌তে পারছে না কেন? শুধু সেবা নয়, ওকে একটু শাসন করাও দরকার। সে-ভারটা যদি আমার উপর পড়ে তাহ'লে আমি ওকে দুদিনে শুধরে দিতে পারি।

মরুকগে, পরের জন্যে এত ভাবনা কেন? যা হয় হবে।

তুই এবারকার পুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছিস কেমন? এখানে পুজো নেই বটে কিন্তু পুজোর আমোদটা নিতান্ত কম বলে মনে হচ্ছেনা। গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় বাতাস লেগে যে বাঁশির সুর এবং পাখীর ডাকে-ডাকে যে গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার কাছে ঐ পুজোর সানাই লাগেনা।

(৪)

সরি,

ভেবেছিলুম, ঐ লোকটির কথা আর লিখব না; কিন্তু তুই কথাটাকে আবার খুঁচিয়ে তুল্লি। তোর চিঠি এবার বেশ-একটু বড় হয়েছে দেখছি। তার স্পষ্ট কারণ ঐ লোকটি। ঐ লোকটির নাম শুনে তুইও যে অনেক লেখবার কথা খুঁজে পেয়েছিস লো! তোর চিঠির আগাগোড়া প্রায় ওরই কথা।

কি আশ্চর্য্য দেখ্! ও-লোকটি আমাদের কেউ নয়, তবু যেন আত্মীয়ের মতো হয়ে পড়ল। ওর খবরাখবর না দিলে যেন আমাদের চিঠি সম্পূর্ণই হয় না। আমি যেম্‌নি ওর কথা লিখেছি, তুইও লিখতে আরম্ভ করেছিস। আমি তবু ওকে চোখে দেখেছি, তুই তাও দেখিস্‌নি। আমরা কেউই ওকে জানিনা, চিনিনা, তবু ও-ই আমাদের কথার অনেকখানিটা জুড়ে আছে। আমি ভাবি, কেমন-করে পর এমন আপনার হয়?

যতই দিন যাচ্ছে, যতই ওকে দেখছি, ততই ওর উপর থেকে আমার মনের সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছে। প্রথম-প্রথম ওর চোখে পড়লে আমার ভারি লজ্জা করত। কিন্তু এখন আমি ওর সাম্‌নে বেশ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। ওর চাহনিটি এমন সরল, সহজ, যে, ওর চোখের সাম্‌নে দাঁড়াতে কিছুমাত্র বাধে না। মনে হয় ওকে ভয় বা লজ্জা করবার কিছুই নেই—যেন খুব নিকট-আত্মীয়।

পরপুরুষ বলতে আমাদের মনে একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা আছে বটে কিন্তু এখন দেখছি সব পরপুরুষ সমান নয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে, যারা পর হলেও বন্ধু হবার যোগ্য।

মানুষটি সত্যিই বড় ভালো। মেচারা জীবনে স্নেহ, ভালোবাসা রোধ হয় কখনো পায়নি। এমন-করে চায় যে মনে হয় চোখদুটি যেন ভিক্ষা করছে। ও যদি আমাদের বাড়ির কেউ হ'ত তা'লে ওর ঐ স্নেহের অভাব পুরণ করে দিয়ে আমি খুসি হ'তে পারতুম।

সরি, তুই যদি ওকে দেখতিস্ তোরও মায়া করত। তুই তাহলে আমার মনের ক্ষোভটা বুঝতে পারতিস। আমার হাতে এত সময় যে ফেলে-ছড়িয়েও শেষ হয় না, কাজ এত কম যে তার আঁচ গায়েই লাগেনা, তবু ওর জন্যে কিছুই করতে পারছি না। এতে ক্ষোভ হয় না? সত্যি ওর সেবার দরকার। অথচ এখানে ওর সেবা-করবার কেউ নেই।

(৫)

সরি,

তোর মেজ-দার অসুখ শুনে ভারি চিন্তিত হলুম। কেমন থাকে লিখিস। আমাদের বাড়ীর সামনে ঐ রুগ্নমানুষটিকে দেখে অবধি রোগের উপর আমার কেমন-একটা ভাবনা ধরেছে। রোগ হলে মানুষ বড় অসহায় হয়ে পড়ে; তখন তার অনেকখানি দরকার হয়,—শুধু দেহের নয়, মনেরই বেশী করে। সেই দরকারটুকু পূরণ না হ'লে তাদের কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ তা আমি ঐ লোকটির মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ঐ অভাবটুকু সামান্য; কিন্তু সংসার যে দুর্ভিক্ষে ছেয়ে গেছে। তাই বা কেন বলি? থাকলেও কি সবায়ের দান-করা ঘটে ওঠে?

একটা নতুন খবর আছে। চাটুয্যে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কিন্তু এ আলাপ যে বেশিদিন টেঁকে এ বোধ হয় না। কারণ গোড়া থেকেই তা আমাকে একটু অদ্ভুত-রকম-করে দেখা আরম্ভ করেছে। এত বয়স পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি এটা তাদের আশ্চর্য্য করেছে। আমাকে তারা জিজ্ঞা কোরে-কোরে অস্থির করে তুলেছে যে আ বিয়ে হয়নি কেন? দেখ দিকিন্, আমি উত্তর কি দেব? আমার বিয়ে হয়নি কে তা আমি কি জানি?

এদের বাড়ি অনেকগুলি ছোট ছোট মে আছে—বেশ সুন্দর-সুন্দর দেখতে। আমি যখন ওখানে যাই তারা সবাই এসে আমাকে ঘিরে বসে। আমার মনে হয় যেন একরা চীনেমাটির পুতুল সাজানো আমি তাদে নিয়ে পুতুল খেলছি।

আমার চেয়ে বয়সে তারা ছোট বই বড় হবেনা, তবু মনে হয় তারা যেন একএকটি ক্ষুদে গিন্নী! মাগো মা, এর মধ্যে এত গিন্নি পানাও শিখেছে। আমাকে তারা বলে, তোমার এত বয়েস হ'ল তবু তুমি এত ছেলেমানুষ কেন? এত বয়েস বলতে তারা আন্দাজ করে যে আমি যে-বয়েস বলেছি তার চেয়ে অন্তত দশ বছর বয়স আমার বেশী—বিয়ে হয়নি বলে কমিয়ে বলছি। মানুষকে এমন খাম্‌কা অবিশ্বাস করা কেন বল দেখি?

যাক্, বয়েস নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে; কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার পোষাবে না। মনের মতন মানুষ না পেলে আলাপ করে সুখ নেই। সরি, এই সব দেখেশুনে

তোর জন্যে আমার ভারি মন-কেমন করছে। তোর মতন সই পাব কোথা?

(৬)

সরি,

আজ তোর চিঠি পেলুম না কেন? ভেবেছিলুম তোর চিঠি না পেলে কখ্খনো তোকে লিখব না, কিন্তু একটা কথা তোকে বলবার জন্যে মন ভারি ছট্‌ফট্ করছে, তাই না লিখে পারলুম না।

তোকে আগেই লিখেছি যে আমাদের বাড়ির সাম্‌নের সেই লোকটি সমস্তদিন এক-জায়গায় চুপ-করে বসে থাকে; সেখান থেকে আমাদের বাড়ির বারান্দাটুকু দেখা যায়। সেখান দিয়ে ঘুরতে-ফিরতে যেটুকু সে আমার নজরে পড়ত, সেইটুকুই আমি তাকে দেখতুম; আজ তার চেয়ে একটু বেশী করে দেখেছি।

এতদিন হয়ে গেল, ঐ এক-জায়গা থেকে ও নড়েনা কেন ভেবে আজ আমার ভারি কৌতূহল হ'ল। ও দিন-রাত এদিকে চেয়ে-চেয়ে কি দেখে? কাকে দেখে? ওর ঐ দেখার কি ক্লান্তি নেই? অবসাদ নেই? এই ভেবে আমি এগিয়ে গিয়ে বেশ-একটু প্রকাশ্যে তার সাম্‌নে দাঁড়ালুম। আমাকে দেখেই তার সেই স্বপ্নমাখা চোখদুটি ভারি খুসি হয়ে উঠল—কিন্তু সে তখনই চোখ নামিয়ে নিলে। আমি চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন তার সেই চুরি-করে-করে দেখার ফুর্ত্তি দেখে কে! আমার ভারি মজা লাগছিল। আমি যেন কিছুই টের পাইনি এম্‌নি-করে রইলুম। তাতে সে ভরসা পেয়ে আবার চোখ-তুলে দেখতে লাগল। একবার ভাবলুম চলে যাই। কিন্তু পিপাসিতের মুখের জল কেড়ে নিতে যেমন মায়া করে, আমার ঠিক তেমনি মায়া করতে লাগল।

আমাকে চোখ-ভরে দেখে তার সে কী আনন্দ! তার সমস্ত দেহখানি যেন আহ্লাদে ভরে উঠছিল। কিন্তু কেন বল্ দেখি? আমি ত তার কেউ নই, তবে কেন তার এ আহ্লাদ?

আমি চুপ-করে দাঁড়িয়েছিলুম; হঠাৎ কি একটা কাজে বাবা পিছন থেকে ডাকলেন; আমি চলে গেলুম। কিন্তু কেন তার এত আহ্লাদ?—এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে প্রতি কাজেই আমার ভুল হ'তে লাগল। তারপর থেকে আজ সমস্তদিন যখনই পেরেছি ঐখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি—ইচ্ছে করে নয়, কে যেন টেনে এনেছে। আমি যে সমস্তক্ষণ তার দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিলুম তা নয়। আমার দৃষ্টি ছিল নীল আকাশের একটা নির্জ্জন কোণে—যেখানে দুটো অচেনা পাখী খুব ঘেঁসাঘেসি করে স্বর্গপুরীর উদ্দেশে যাত্রা জমিয়েছে। আমি আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছিল আমার সাম্‌নে থেকে দুটি চোখের স্নিগ্ধকোমল স্পর্শ এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে যাচ্ছে। থেকে-থেকে ভারি একটি আবেশ আসছিল। মানুষের ঐ ছোট্ট চোখের মধ্যে যে এত সুধা আছে আগে তা জানতুম না।

আমাকে দেখতে তার ভালো লাগে এ-কথাটা বুঝতে আমার বাকি নেই।

আমি এতদিন জানতুম আমি একটি সাদা-সিধে মেয়ে মাত্র;—আমার মধ্যে এমন-কিছু আছে যা মানুষের ভালো লাগতে পারে এ খোঁজ কখনো পাইনি। আজ হঠাৎ এই খবর পেয়ে আমার বোধ হচ্ছে আমার সমস্ত মনের রং যেন বদলে গেল। আমি আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিজেকে দেখলুম; কিন্তু আমার মধ্যে কোথায় লোকের-ভালো-লাগার সেই মায়া-অঞ্জন লুকিয়ে আছে তার খোঁজ পেলুম না। আমার ত মনে হল আমি নিতান্ত সাদাসিধে।

সত্যি বলতে কি, সরি, আজ আমার এই গর্ব্ব হচ্ছে যে আমারও একটা মূল্য আছে। এতদিন আমার কাছে আমার কোনো দামই ছিল না। আজ আমার উপর এই যে দামের রেখা লাগল এর জন্যে আমার মন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছে—কার কাছে জানিস?—তার কাছে!

আজকের আমার জীবনের এই প্রথম-উৎসবটিকে আমি বরণ-করে হৃদয়-মন্দিরে তুলে রাখলুম। এর শঙ্খধ্বনি এখনো কানে বাজছে—এই চিঠি লেখার ভিতরে-ভিতরে তার ফুৎকার জড়িয়ে যাচ্ছে!

(৭)

সরি,

কাল্‌কের সেই দেখার পর থেকে অনেক নতুন জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো কি তা বলা ভারি শক্ত। এতদিনে জানলুম মানুষ যে শুধু মুখে কথা কয় তা নয়। তার চোখের পাতা, তার ঠোঁটের রেখা, তার আঙুলের ডগা, তার পায়ের নখটি পর্য্যন্ত কথা কইতে জানে। সে ভারি আশ্চর্য্য ভাষা। সে ভাষা স্পষ্ট শোনা যায় না, বোঝা যায় না, মনের উপর ছায়ার মতো এসে পড়ে। ছায়ার শীতলতা যেমন—গ্রহণ তেমনি কেবল অনুভব করা যায়। এম্‌নি করে আজ সমস্ত দিন ঐ লোকটির কতকথা শুনলুম। সে কি, মুখে, তা বলতে পারব না কিন্তু মনে তার ছাপগুলি লেগে আছে।

ওর সঙ্গে কোনো আলাপই হয়-নি তবু মনে হচ্চে খুব আলাপ হয়ে গেল। এ কি মজা বল্ দেখি?

তোরা কে কেমন আছিস?

(৮)

সরি পোড়ারমুখী,

তুই চিঠি লিখছিস্‌নি কেন? এখানে তোর চিঠিই আমার একমাত্র সঙ্গী তা জানিস? চাটুয্যে-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি। চিল্‌মারির জমিদারদের বাড়িতে যাওয়া আমার পোষাল না। তাদের মেয়েরা এমন পর্দ্দা-বন্দী যে সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়াতেও বেরোয় না। পবন-দেব জোরজার করে যে হাওয়াটুকু গিলিয়ে দেন সেই পথ্যটুকুই তাদের বোধ হয় যথেষ্ট। খুব উঁচু পাচিল দিয়ে সমস্ত বাড়িটা আগাগোড়া ঘেরা—প্রবেশের জন্য যে ফাঁকটুকু আছে, তার মুখে প্রকাণ্ড পাগড়ি-বাঁধা রক্তচক্ষু প্রহরী! বাইরে থেকে একটু-কিছু যেতে হলে হিসেব দিয়ে যেতে হয়। কেউ ঢোকে সাধ্যি কি! আমি তো কোন্ ছার, সে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও ভয় পান। কাজেই বুঝতে পারছিস, আমি একেবারে

একলাটি! এমন অবস্থায় তোর চিঠি না পেলে কি-রকম রাগ ধরে বল্-দিকিন!

হ্যাঁ, তোর কাছে মিছে কথা বলব না। আজ ভোরে উঠেই ভারি-চমৎকার একটি বন্ধু পেয়েছি। এমন ফুটফুটে সুন্দর, এমন তুলোর মতন নরম, কি বলব! দেখে অবধি সে আর আমাকে ছাড়তে চায় না। একদিনেই আমার সঙ্গে এত ভাব করে ফেলেছে যে তাকে একদণ্ড ছাড়তে আমারও কষ্ট হয়। শুনে তোর হিংসে হচ্ছে বোধ হয়। তুই যে কি-রকম হিংসুটে তা ত আমার জানতে বাকি নেই! সেই সরমার সঙ্গে আমার যখন ভাব হল তখন কেঁদে-কেটে কি কাণ্ডটাই না করলি! তার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'লি!

কিন্তু সত্যি কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব, সরমার চেয়ে এর সঙ্গে আমার ঢের বেশী ভাব হয়েছে। এমন কি, তুই যদি নেহাৎ চিঠি না লিখিস তাহলে একে নিয়ে আমার দিন বেশ কেটে যাবে। এ যাতে না পালায় তার বন্দোবস্ত করতে হচ্চে।

(৯)

সরি,

আজও তোর চিঠি পেলুম না। ভাগ্যিস্ ঐ লোকটি ছিল, তাই একরকম করে দিন কাটচে, নইলে কি করতুম তাই ভাবি। তোর চিঠি না পেয়ে আজ মন এত খারাপ হয়ে গেল, কি বলব? বোধ হয় তার ছায়া আমার মুখের উপর এসে পড়েছিল। নইলে আজ দুপুরে আমাকে দেখবামাত্রই ও-বাড়ির ঐ লোকটির মুখচোখ অমন কাতর হয়ে উঠল কেন? মনে হ'ল তার চোখদুটি যেন উদ্বিগ্ন প্রশ্নে ভরা। কেবলই যেন জিজ্ঞেস্ করচে—তোমার কি হয়েছে? কি হয়েছে? ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, ওগো অত ভেবোনা, এমন কিছু হয়-নি! কিন্তু অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কই কেমন করে? বেচারা সমস্ত দিন এমন কাতর হয়ে আছে যে দেখে মায়া করে।

কিন্তু সরি, আমার জন্যে ওর অত ভাবনা কেন? আমি মরি-বাঁচি তাতে ওর যায়-আসে কি? না হয় মরলেও বুঝতুম—আহা একটা মানুষ মরে গেল গা—তার জন্যে লোকের দুঃখ হ'তে পারে। কিন্তু আমার একটু মন-খারাপ হয়েছে তাতে ওর অত মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারি না।

তুই হয় ত বল্‌বি আমাকে, যে, তোর অত লক্ষ্য করবার দরকার কি? ও জন্যে তোর অত ভাবনাই বা কেন? কিন্তু কি জানিস্ সরি, তুই যদি দেখিস্ কেউ তোর জন্যে ভাবছে, তোর একটুখানি দুঃখে তার চোখে জল আসছে, তাহ'লে তুই তার কথাটা একবার মনে না করে থাকতে পারবি না।

(১০)

সরি,

তোর চিঠি পেলুম। তুই লিখেছিস্ এই লোকটিকে দেখবার তোর ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে, যদি পারতুম তোকে দেখাতুম। কিন্তু আবার ভয়ও হয়। তুই দেখলে হয়ত ওর বিস্তর খুঁৎ বার

করবি। তোর যে খুঁৎ বার করা স্বভাব! খুঁৎ যে নেই তা আমি বলছি না। মানুষ আবার নিখুঁৎ হয়েছে কবে? কিন্তু মানুষটির স্বভাবের ভিতর ভারি একটি চমৎকার শ্রী আছে। আর যদি নাই থাকে, তাতে তোরই বা কি, আমারই বা কি!

লোকটিকে দেখে-দেখে আমার কি ইচ্ছে হয় জানিস্? ওর সঙ্গে একটু ভাব করি। এতদিন আমাদের কাছাকাছি রইল অথচ আমরা ওর কোনো খবরই নিলুম না—এটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম নিশ্চয় ওর সঙ্গে আলাপ করতুম। কিম্বা ও যদি মেয়ে হ'ত তাহ'লে ত কথাই ছিল না।

কিন্তু তাও ঠিক নয়। আমি যা আছি তাই এবং ও যা আছে তাই থেকেও যদি আমাদের আলাপ হ'ত ত সেইটেই সবচেয়ে ভালো হ'ত। যাক গে, যা হবার নয় তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কি?

তবু, ও ছিল-বলে' আমার এই একলা দিনগুলো একরকম কেটে যাচ্ছে। ও অত দূরে থাকলেও মনে হয় যেন খুব কাছে একজন সঙ্গী আছে।

ওর গলা কখনো শুনিনি—এক-একবার ভারি ইচ্ছে হয় ওর গলা শুনতে। কিন্তু ও দিন-রাত মুখটি বুজেই আছে। তাহ'লেও ও যে একেবারে নীরব, তা নয়। ওর ভাবের এক-একটা ইসারা চুপিচুপি আমার মনে এসে লাগে আর আমি চম্‌কে উঠি! হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয় ও যেন আমায় ডাকচে। এক-একসময় এমন করে চায় যে ঠিক মনে হয় যেন ওর ঐ চোখদি আমার আরতি করছে! মাগো, আমার কেঁপে ওঠে! আমি মানুষ, আমাকে আর করা কেন?

কিন্তু ঐ জন্যেই ওকে আমার আ বেশি-করে ভালো লাগে। ওতো আমা ঠিক মানুষের মতন-করে দেখেনা! দেখা,—সে এক-রকমের দেখা! সেইজ সে-দেখাতে কোনো সঙ্কোচ আসেনা, লজ্জা লাগে না।

কিন্তু তবু ওর গলাটি শোনবার জন্যে আমার মন দিন-দিন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। আমি কান্ খাড়া করে থাকি—যদি কোনো ফাঁকে একটু শুনতে পাই। ও কথা বল না কেন, সরি, বলতে পারিস্?

(১১)

সরি,

আজ ভারি মজা হয়েছে। ও লোকটার ভিতরে-ভিতরে দুষ্টুমি আছে। আজ সকাল থেকে ইচ্ছে-করে ঐ জান্‌লাটার কাছে যাইনি। দুপুরবেলা যখন গেলুম তখন দেখি ওর মুখ ভার। আমি অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার দিকে একবার চাইলেও না। আমি মনে-মনে ভাবলুম, রোসো মজা দেখাচ্চি; বলে, সেখান থেকে চলে গেলুম এবং খুব-একটা শব্দ করে জান্‌লাটা বন্ধ করে দিলুম। বারোটার সময় তার খেতে যাবার সময়, আমি জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখচি তার বামুন এল, চাকর এল, তবু সে খেতে উঠল না। বামুনটা খাবারের থালা সাম্‌নের টেবিলের উপর ধরে দিয়ে চলে গেল। সে

আর দিকে চাইলেও না, ছুঁলেও না। দেখে প্রথমটা আমার মায়া করতে লাগল, পরে ভাবনা হ'তে লাগল—বেচারা না খেয়ে শেষে অসুখে পড়বে! আমি ধপাস্ করে জান্‌লাটা খুল্লুম। সে-শব্দে সে চোখ তুল্লেনা, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। আমার তখন মহা ভাবনা হ'ল—তাইত, কি করি?

তুই ত জানিস, আমাদের খাওয়া হয় অনেক দেরিতে—বিশেষতঃ বিদেশে আরো দেরি হয়ে যায়। বাবার খাবার কোনো তাড়া নেই, সেইজন্যে তিনি আমাকে আগে খেয়ে নিতে বলেন। তা যদি না হ'ত আজ ভারি মুস্কিলে পড়তুম। বাবার সঙ্গে খেতে হ'লে আমাকে খেতে বসতেই হ'ত—না বলতে ত পারতুম না। কিন্তু আজ যখন দাসী এসে খবর দিলে খাবার এসেছে, আমি বারান্দা থেকে চীৎকার করে বল্লুম—"যা, আজ আমি খাব না।"

যেমন আমার এই কথা শোনা, দেখি, ঐ লোকটি সুড়্‌সুড়্ করে খাবারের থালার কাছে এগিয়ে গেছে। আমার হাসিও পাচ্ছিল, দুঃখও হচ্ছিল।—আহা, বেচারাকে আজ ঠাণ্ডা খাবার খেতে হ'ল। দাসী জিজ্ঞাসা করলে—"কেন খাবেনা দিদিমণি?" আমি বল্লুম—"যা, যাচ্ছি।"

তারপর বিকেলে দেখি তার মুখ আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, সকালবেলা ঐখানটিতে যাওয়া কোনো দিন আর বন্ধ করব না। শেষে কি একটা লোক না-খেয়ে মরবে!

(১২)

ওলো সরি,

তোর অত মান-অভিমান, রাগ-বিরাগ কেন লো! সে তোর সতীন নয়, সে একটা বেড়াল-বাচ্ছা! বেচারা আমাদের বাড়িতে এসে পড়েছিল, তাই তাকে একটু যত্ন করি। এক বাবা-ছাড়া আর আমার যত্ন-করবার কে আছে বল? তাই যাকে পাই, তাকেই যত্ন করতে ইচ্ছে করে। এই মিনিটাকে নিয়ে এখন আমার অনেকটা সময় কাটে—ওর জন্যে তবু খানিকটা কাজ পেয়েছি। ওকে বুকে তুলে যখন আদর করি, ও ল্যাজ-নেড়ে মিউ-মিউ করতে থাকে; পুটুপুটে চোখ তুলে আমার দিকে এমন-করে চায় যে মনে হয়, বেড়াল হ'লে কি হয়, সব বোঝে। ও বোধ হয় মায়া জানে, নইলে বেড়াল হয়ে আমাকে মুগ্ধ করলে কেমন-করে? আমাকে এমন-করে তুলেছে যে দিনরাত ওটাকে থেকে-থেকে বুকের মধ্যে চেপে না ধরলে বুকটা কেমন ফাঁকা বোধ হয়।"

(১৩)

সরি,

ও লোকটি সেদিনে আমাকে যেমন মুস্কিলে ফেলেছিল, আজ নিজে তেমনি জব্দ হয়েছে।

ব্যাপারটা

মিনি গিয়েছিলেন আজ ওদের বাড়ি বেড়াতে। নিশ্চয় কিছু দুষ্টুমি করেছিল। হঠাৎ বারান্দায় গিয়ে দেখি ঐ লোকটি সজোরে জুতো ছুঁড়ে মিনিকে মারলে।

মিনি কুঁইকুঁই করতে-করতে একেবারে আমার কাছে পালিয়ে এল। আমি তাকে বুকে তুলে নিতেই লোকটির যা লজ্জা তা আর তোকে কি বলব! বোধ হয় জানত না ওটি আমার পোষ্য। আমি মিনির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। যতই হাত বুলোতে লাগলুম ততই ঐ লোকটির অনুতাপ বুক-ফেটে উঠতে লাগল। আমার কাছে একটা মালিসের কৌটো ছিল, সেইটে ঘর থেকে বার করে এনে আমি মিনির পিঠে ঘস্‌তে লাগলুম; দাসীকে গরম জল আনতে বলে সেঁক দিতে লাগলুম। মিনির এসব কিছুই দরকার ছিল না, তার এমন বিশেষ-কিছু লাগেনি। আমি কেবল দুষ্টুমি করে এত কাণ্ড করছিলুম। এই সামান্য ব্যাপারটাকে আমি ক্রমে এত ঘনিয়ে তুল্লুম যে লোকটি শেষে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল যেন তার চোখদুটি আমার পায়ে লুটিয়ে-পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। আমার এমন হাসি আসছিল কি বলব! লোকটা যদি একটু চোখ দিয়ে দেখত, তাহলে তখনই আমার দুষ্টুমি ধরা পড়ত। কারণ, মিনির যে কিছুই হয়-নি, সে তার স্ফূর্তির লাফালাফি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

বেচারার অনুতাপ এখনো কাটেনি। ওর ঐ মনের ছট্‌ফটানি দূর করতে হ'বে। কি করে করব তাই ভাবছি।

(১৪)

সরি,

সাধে বলি কি তুই বেজায় হিংসুটে! তোরও অম্‌নি একটা বেড়াল-বাচ্ছা চাই? পাব কি না জানিনা, তবে খোঁজ করব। যদি না পাই একটা পাখী নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, মিনির কথায় একটা কথা মনে পড়ল। এর-মধ্যে বেহারা মিনি আবার একদিন ও-বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওমা দেখিনা, টেবিলের উপর উঠে ঐ লোকটির পাশে চোখ-বুজে বসে আছেন; আর তিনি তার পিঠে হাত-বুলিয়ে আদর করছেন। তার ল্যাজ দেখে বুঝলুম কোথায় একটা কালির দোয়াত উল্‌টেছেন। তাতে আজ ঐ লোকটির একটুও রাগ দেখা গেল না। তিনি বোধ হয়, সেদিনকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। হঠাৎ মিনি চোখ তুলে সেখান থেকে আমায় দেখতে পেয়ে মিউ-মিউ করে উঠল। তিনি ঘাড় তুলে আমাকে দেখলেন। আমার এমন লজ্জা করতে লাগল কি বলব! মনে-মনে বল্লুম, মিনিটা বাড়ি আসুক না একবার, মজা টের পাওয়াব। তিনি খুব করে তাকে আদর করতে লাগলেন। আমি সেই আদর দেখচি দেখে তার মনের সেই ছট্‌ফটানি কমেচে বলে বোধ হ'ল।

সরি, এ কি মুস্কিলে পড়লুম বল্ দেখি! যেমন-করে হোক তার কথা কি এসে পড়বেই! ঐ মানুষটিকে চোখ থেকেও যেমন সরাতে পারছিনা, মন থেকেও তেমনি! ও কোথা-থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল বল্ দিকিন্!

এখানে আমার চোখের সাম্‌নে আর-কেউ নেই বলে ও অত বড়-হয়ে উঠেছে;—যেন সমস্ত দৃষ্টিকে রোধ-করে একমাত্র ঐ

মানুষটি বিরাজ করছে। নির্জ্জনতায় এই বড় মুস্কিল যে তার মধ্যে যেটিকে দেখা যায় সেটি বড় গুরুতর হয়ে ওঠে। ঐ মানুষটিকে আমার জীবনে হয়ত মনে রাখবার কোনো দরকার নেই, তবু ও মনে থাকবেই। ওর সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সংশ্রব নেই তবু ও এমন-করে জড়িয়ে গেল যে এ জট হয় ত কখনো খুলতে পারব না। অথচ এর মজা এই যে এ জট আমরা কেউ ইচ্ছে করে পাকাইনি।

কিন্তু তাই বলে' এঁর প্রতি আমি যেন কোনো অবিচার না করি! তাঁর পরে আমার কোনো নালিশ নেই। তিনি আমার মনের ভাণ্ডারে যেটুকু দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা তুলে রেখেছি। এই কৃতজ্ঞতা যেন আমি ইহজীবনে না ভুলি!

(১৫)

সরি,

ছি ছি, ছি! তুই এমন কদর্থ করবি জান্‌লে আমি তোকে আমার এই সব মনের কথা লিখতুম না। তুই ঠাট্টা করেছিস্ কিন্তু ঐ ঠাট্টাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। তুই ঠাট্টার ছলে আমার নারীত্বকে এমন অপমান করেছিস যে তোর সঙ্গে আমার কথা কয়বার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমারই ভুল হয়েছে। এ-সব মনের কথা আমার মনে-মনে গোপন রাখাই উচিত ছিল। মনের জিনিষ বাইরের আব-হাওয়ায় এম্‌নি করেই বিকৃত হয়ে ওঠে! আমার মনের কথা তোকে আমি আর-কখ্‌খনো লিখব না। এই শেষ!

প্রথম পিঠের কথা

ডায়ারির ছেড়া-পাতা

কবি বলেছেন—

"গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।"

কিন্তু আমি আমার দেবীর চরণে কুসুম দিতে পারলুম কৈ? আমার মনের বাগানে যে ফুল ফুটেছে তার সৌরভ দেবীর কাছে পৌঁচেছে কি না জানিনা; সে গোপন-বিজনের ফুল না হয় গোপনেই থাক্! কিন্তু আমার এই কুটীরের আশে-পাশে স্তরে-স্তরে রাঙা-সাদা নানা রঙের ফুল যে ফুটেছে, এ তো আর কারু কাছে গোপন নেই, তবু এরই একটি ডালি তাঁকে ত উপহার দেওয়া হ'লনা! দেবী আমার ফুল ভালোবাসেন, সে তাঁর ফুলের উপর চাহনি দেখেই আমি বুঝেছি।

আমার এক-একসময় মনে হয় ঐ যে নানা রঙের ফুলগুলি ফুটেছে, ওরা যেন আমার মনের গোপন-কথা—আমার হৃদয়ের স্বপ্ন যেন ওরা! তাই ত আমার রোজই ইচ্ছে করে, যে, ঐ ফুলের একটি-একটি-করে তুলে দেবীকে উপহার পাঠাই। তাহ'লে দিনে দিনে এক-একটি ফুলের কথায় আমার হৃদয়ের কাব্যটি দেবীর সাম্‌নে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে। কিন্তু হায়, কৈ দেওয়া হ'ল আমার ফুল? আমার চোখের সাম্‌নে কতবার তারা ফুটল, কতবার ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়ে গেল, আমার দিকে চেয়ে তারা কত মিনতিই জানালে, তবুতো আমি কিছু করতে পারলুম না।

(২)

রোজ দেখি দুপুরবেলা উনি বসে-বসে চিঠি লেখেন। এ সম্বন্ধে এতদিন কোনো কৌতূহল হয়-নি, আজ হঠাৎ মনটা কেমন করছে। উনি এত-যত্ন করে ঐ চিঠিগুলি লেখেন কাকে? মনে হয় সমস্ত মনটি যেন চিঠির উপর ঢেলে দিয়েছেন। ঐ মন-ঢালা চিঠিগুলির প্রত্যাশায় কে পথ চেয়ে বসে আছে? ঐ চিঠি যখন তার কাছে পৌঁছবে, না-জানি সে কত খুসি হয়ে উঠবে!

সে কে? কে জানে কেমন সে দেখতে? কি জানি ওঁদের দুজনের কেমন ভাব। কিছুই জানিনা, তবু সেই মানুষটির একটি ছায়া আমার মনে এসে লাগছে। ভারি ইচ্ছে করছে ওঁদের দুজনের চিঠির কথাগুলি চুপি-চুপি উঁকিমেরে দেখে নি।

উনি এখনো ঐ বসে-বসে লিখছেন। কি-কথা লিখছেন, কার কথা লিখছেন, কে জানে?

(৩)

ও-বাড়ির বুড়োটি আজ আমার সঙ্গে দেখা-করতে এসেছিলেন। লোকটি ভারি মিষ্টি। এত বয়স হয়েছে তবু আমার মনে হ'ল যেন আমারই সমবয়সী। তিনি এসেই বল্লেন—"দেখুন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি আমার নিকটতম প্রতিবেশী তবু এদ্দিনের মধ্যে একদিনও আপনার কাছে আসিনি!"

আমি বল্লুম—"যদি এটাকে দোষ বলেন তাহ'লে তা উভয়েরই হয়েছে।"

উনি বল্লেন—"না। কিজানেন, আমি যখন বয়েসে বড়,তখন আমারই উচিত সবপ্রথম—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"আমি যখন বয়েসে ছোট, তখন আমারই উচিত ছিল সবপ্রথম আপনাকে একটি নমস্কার জানিয়ে আসা।"

উনি প্রসন্নমুখে বল্লেন—"তাহ'লে আমি খুবই খুসি হতুম বটে। কিন্তু ত্রুটিটা আমার হয়ে গেছে স্বীকার করতে হ'বে।"

তারপর উনি বল্লেন,—"দেখুন,আমি জানতুম না যে আপনি এই বিদেশে একলাটি আছেন। তাহ'লে কখনোই এই অবহেলা ঘটতে দিতুম না। আজ আমি এই প্রথম শুনলুম।"

ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি, কার মুখে শুনলেন? কিন্তু মুখ-ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল বৃদ্ধের এই কুশল প্রশ্নের ভিতর দিয়ে আমার দেবী তাঁর মনের দূতটিকে আমার কাছে পাঠিয়েচেন। বৃদ্ধের সমস্ত কথার মাঝ থেকে আমি তাঁরই গলার সুর শুনছিলুম।

(৪)

একটি ঘটনায় আমার মনকে আজ ভারি চঞ্চল করেছে। আজ আমি খাইনি, উনি কি টের পেয়েছেন? নইলে সমস্ত দিন অমন মুখ-শুকিয়ে আছেন কেন? আমার শরীর ভালো নেই, একথা ত ওঁর জানা সম্ভব নয়, তবু কেন মনে হচ্চে উনি আমার জন্যে ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছেন? যেন কেবলই প্রশ্ন করছেন—আমি কেমন আছি? আমার কি হয়েছে?

আমি বারবার মনে-মনে হেসে-উঠে বলবার চেষ্টা করছি—আমার কিছুই হয়নি,—ও কিছু নয়! কিন্তু তবু ত ওঁর মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

ওঁর ঐ শুকনো মুখ দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু যেমন ভাবছি আমার জন্যেই ওঁর ঐ মুখটি শুকিয়ে উঠেছে অমনি ভিতরে-ভিতরে ভারি একটি আনন্দ লাভ করছি।

(৫)

আমার হৃদয়টি যে তাঁর পায়ে নিবেদন করেছি, এ খবর কেউ না-জানলেও আমার মনের কাছে তা তো গোপন নেই। দেবী আমার নিবেদন গ্রহণ করেছেন কি-না মনের এ সন্দেহ এ দিন পরে বোধ হয় মিটল। কারণ তার পরিচয় একটু-একটু করে আমার মনের ভাণ্ডারে এসে জমা হতে আরম্ভ করেছে। আমার প্রতি তাঁর চাহনির রং যেন বদ্‌লে গেছে। তার মাঝে প্রেমের উজ্জ্বল শিখাটি জ্বলে উঠছে কি-না বলতে পারি না, কিন্তু একটি আকর্ষণের টানে ভাবের রেখা যে বিচিত্র হয়ে উঠছে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কে-জানে এ দেখা আমার ভুল কি-না। হয়ত আমারই মনের রঙে আমার চোখের দেখা রঙিন হয়ে উঠছে। এ ভুলই হোক, আর সত্যই হোক এর আনন্দ ত মিথ্যে নয়। সেইটিই আমার পরম লাভ।

(৬)

আজ বৃদ্ধটি এসে আমায় নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তিনি বল্লন যে আমি একলা থাকি, নিশ্চয় আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট। এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমার ভারি লজ্জা করছিল, কিন্তু এড়াতেও মন-সরছিল না। মনে হচ্ছিল এ নিমন্ত্রণের মধ্যে দেবীর একটি সাদর আহ্বান প্রচ্ছন্ন আছে। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

দেবী-মন্দিরে আমার নিমন্ত্রণ! আজ সমস্ত দিন আমার বুকটা দুরুদুরু করছে।

(৭)

কাল নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলুম। দেবী আমার সাম্‌নে আসেন্‌নি, কিন্তু গৃহে প্রবেশ-মাত্রই তাঁর হাতের পরিচর্য্যা চারিদিক থেকে আমাকে অভিনন্দন করে উঠল। এমন কি, তাঁর সাম্‌নে-আসার অভাবটি পর্য্যন্ত আমায় অনুভব করতে দিলেন না—এমন নিবিড়ভাবে তাঁর নিজের আভাসটিকে চারিদিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

দেবীর প্রসাদ ত আমি গ্রহণই করলুম। কিন্তু তাঁকে কিছু দিতে পারলুম কৈ? দেবীর হয়ত কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তা বলে মন ত মানে না—তার যে একটা দেবার কান্না আছে।

(৮)

আজ ওঁর ব্যবহার দেখে মনে হচ্চে, আমি এতদিন ভারি ভুল বুঝে এসেছি। যা দেখেছি সে শুধু স্বপ্ন! দেবী যে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়-মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছেন, সে আমার মনের কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। আমার এত-দিনের আশার জগৎ আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য; কিন্তু তার আঘাত বড় ভয়ানক! দেবী ঐখানে দাঁড়িয়েছিলেন; আমি আজ একটু সাহসী হয়ে একটুখানি এগিয়ে গিয়েছিলুম মাত্র; কিন্তু তিনি আমাকে দেখেই চলে গেলেন। আমার সেই ব্যাকুলতার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

মূঢ় আমি। ভেবেছিলুম ওঁর মনটি

আমি জয় করেছি! যা জয় করবার জন্যে জগতে বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, আমি ঘরের কোণে বসে তাই জয় করেছি? বাতুল ছাড়া এমন কথা কে ভাবতে পারে?

(৯)

বৃদ্ধটি আবার আজ দেখা করতে এসেছিলেন। হাতে কিছু খাবার এনেছিলেন। ওঁদের মৌখিক আলাপ ক্রমেই আত্মীয়তায় এসে জমছে। কিন্তু কেন এ আত্মীয়তা? যার মূলে কিছুই নেই, হৃদয়ের বাঁধুনি যেখানে আল্‌গা, সেখানে আত্মীয়তা নিয়ে কি হবে? এঁদের এই আত্মীয়তা আজ সমস্ত দিন আমার বুকে বিঁধেছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে আমাকে স্নেহ দেখাচ্ছিলেন, তখন আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়-মন অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তাঁর কথা আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। ইচ্ছে করছিল তাঁকে কোনোরকমে বিদেয় করে দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকি।

(১০)

না, না, না! কাল্‌কের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভুয়ো। আজ সকালে উঠে ওঁর মুখখানি দেখেই আমার মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেছে। অমন প্রসন্ন দৃষ্টি—যা আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে দিলে তা কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না।

আমি কি ভুলই বুঝেছিলুম!—ঐ বৃদ্ধটির প্রতি তখন কি অবিচারই করেছিলুম! এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে। আজ সমস্ত দিন কেবল ওঁদের কথাই ভেবেছি। তাতে আমার বারবার মনে হয়েছে ওঁরা আমাকে এত স্নেহের উপহার দিচ্ছেন, আমি কি কিছুই দিতে পারি না? কিন্তু কি দেব? দেবার মতন জিনিস কী আছে?

হঠাৎ মনের গোপন কোণ থেকে এ কথাটা খোঁচা মেরে উঠল—তোমার বাগানে এত ফুল—কিছু ফুল পাঠাও না। হায়, আমার ফুল!

(১১)

উনি হারমনিয়মের সঙ্গে আজ একটি গান গাইছিলেন। তার সব-কথা আমার মনে নেই, কিন্তু একটি কথা এত বার বার করে বলছিলেন যে এ জীবনে ভোলা অসম্ভব।

"সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে!"

ঐ গান শুনে অবধি তাঁর মাথার ঐ একটি-কুসুম পাবার লোভ মন কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না!

(১২)

শুনেছি এবং পড়েছি প্রেম মানুষকে অসমসাহসী করে' তোলে! কিন্তু আমার মধ্যে সাহসের একটু কণাও জ্বলে উঠল কৈ? আজ পর্য্যন্ত সাহস করে তাঁর মুখে একটি কথাও কইতে পারলুম না! ছি, ছি, ছি! নিজের প্রতি আমার ঘৃণা হচ্ছে। মনের একটি ক্ষুদ্র সঙ্কোচ দিয়ে বিধাতার এতবড় একটি শ্রেষ্ঠ দান আমি ব্যর্থ করে ফেল্লুম! হায়, হতভাগ্য আমি!

(১৩)

উনি মধ্যে-মধ্যে গান করেন; আমি শুনি। আমি খুব ভালো-রকমই জানি, গানের লক্ষ্য আমি নই—এবং হয় ত এ

নিশ্চয় কেউই নেই—তবু এক-একটা লাইন শুনে আচ্‌মকা মনে হয় আমার উদ্দেশেই যেন ঐ গান ভেসে আসছে। সুরের সঙ্গে কথাগুলো এমন-করে জড়িয়ে আসে যে তার ধাক্কায় আমার স্বীকার করতেই হয় আমি ছাড়া ও কথা আর-কারো জন্যে নয়। এক-একসময় জোর করে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি—না, তা নয়। অমনি মনে হয় গানের যেন কোনো অর্থই পাওয়া যাচ্ছে না, সুর যেন তার সঙ্গে মিশতেই চাইছে না।

এক-একসময় দেখি আমারই মনের কথাটি উনি গেয়ে উঠলেন।—যেন আমারই হয়ে গাইছেন। যে কথা আমি বলিনি অথচ বলবার অপেক্ষায় ছিলুম—এ হুবহু সেই কথা! গান শেষ হ'লে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হয়—যাক্, আমার কথাটাও তবু বলা হ'ল।

(১৪)

আজ সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। কেন হ'বে না?—কেন হবে না? তার সঙ্গে একটি কথা-কওয়া কেন হবে না? ভিতর থেকে কে যেন বলেছে, যা হয় না, তা কি করে হ'বে? আমি বলুম, যা হয় না, তা হওয়াতে হ'বে। সে বল্লে, আচ্ছা, তোমার চোখ-রাঙানি মানলুম কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে এস দেখি! অম্‌নি মনে হ'ল তাইত, কি করে তার সঙ্গে কথা কই? কোন্ সুযোগে তার চোখের সাম্‌নে-টিতে গিয়ে দাঁড়াই? ঝগড়ার এইখানে আমার মনটি একেবারে কুঁচ্‌কে গেল। কথা-কওয়ার সাধটি হতাশার অন্ধকারে, বুকের মাঝে হায়-হায় করে ফিরতে লাগল। তাকে শান্ত করতে পারলুম না!—পারলুম না! কত আশার স্বপ্ন দিয়ে ঐ সাধটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলুম—একে-একে তার দলগুলি ঝরে যেতে লাগল।

মনে-মনে তো তার সঙ্গে অনেক কথা কয়েছি, মুখ-ফুটে কথা বলবার এবং তার মুখের কথা শোন্‌বার পিপাসা ত তবু মিটচে না! গলার সুরে যে সুধাটি আছে সেটি পান করবার জন্যে সমস্ত হৃদয় যে তৃষিত হয়ে উঠল।

আমি এই সব কথা লিখচি আর তাঁর উজ্জ্বল দুটি-চোখের দৃষ্টি জান্‌লার ফাঁক্ দিয়ে আমার এই লেখার উপর এসে পড়চে—আর আমার লেখাগুলি সুধাসিক্ত হয়ে উঠছে। আমার হাতের অক্ষর দেখে আমি নিজেই খুসি হয়ে উঠছি।

ওগো দেবী, এ আমি কি লিখচি, কার কথা লিখচি তা কি তুমি টের পেয়েছ? দেখবার জন্যে তোমার আঁখিদুটি কি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে? কৌতূহলে কি তোমার সমস্ত হৃদয়টি ঝুঁকে পড়েছে? এই লেখাটি পড়তে পেলে কি তুমি খুসি হবে?

(১৫)

আজ দেবীকে আমি খুব স্পষ্ট করে দেখলুম। আমার মনে হ'ল দেবী সত্যই পাষাণী! কৈ, ঐ চোখে ত কিছুরই আভাস দেখিনা—ও তো একেবারে শূন্য। তবে এতদিন কি আমি ঐ শূন্যতারই পূজা করে এসেছি?

এই কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ ওঁরা দুজনেই আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। আমি একেবারে চম্‌কে গেলুম; আমার বাক্‌রোধ্ হয়ে গেল!

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—"এ দীনের কুটীরে দেবীর যে পায়ের ধূলো পড়ল, —এ সৌভাগ্য আমার কে এনে দিলে?"

বৃদ্ধটি বল্লেন—"আপনাকে আমরা একটু বিরক্ত করতে এলুম!"

আমি মনে-মনে বল্লুম—"এতবড় আনন্দের সওগাদ জীবনে আর-কখনো পাব কি?"

বৃদ্ধ বল্লেন—"শুনলুম, এই বাড়িটা বিক্রি। আমার এখানে একটা বাড়ি কেনবার ইচ্ছে আছে, তাই বাড়িখানা একবার দেখতে এলুম। কিছু মনে করবেন না।"

আমি মনে-মনে বল্লুম—"ধন্য আমি!"

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন; দেবী তাঁর পাশে মুখনীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে একবার চেয়েই মাথা নীচু করে নিলুম। আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলুম। বৃদ্ধ আমার পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন—"চলুন, বাড়িটা দেখেনি।"

আমি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত বাড়িখানা দেখাতে লাগলুম। আমার মনের মধ্যে এমন-একটা ঝড় বইতে লাগল যে দেবীদর্শনের আনন্দটি মনের উপর থিতিয়ে বসতে পেলেনা। কোনো-কিছুরই ছাপ পড়ল না; সবই যেন তাড়াতাড়ি নড়ে-নড়ে সরে চলে গেল। নিমেষের মধ্যে মনের ভিতর যে কত তুফান বয়ে গেল তার ঠিক নেই!

দেবী আমার ফুলের বাগানটি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। হায়, আমার ফুলের বাগান! এর একটি ফুলও যদি ঐ হাতে তুলে দিতে পারতুম! ইচ্ছে হ'ল বলি দেবী, একটি ফুল তুলে নিয়ে আমার জীবনকে সার্থক কর। কিন্তু মুখ-ফুটে বলতে পারলুম না। এতবড় সুযোগটা বহে গেল!

বৃদ্ধ আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় দেবীর চোখের দিকে একবার দেখলুম; কিন্তু চোখ তাঁর উঠল না কেমন।

(১৬)

দেবী দয়া করে আমার ঘরে এসেছিলেন, আমি তাঁর অভ্যর্থনা করতে পারলুম কৈ? আজ এই কথাটা কেবলই মনে হয়ে সমস্ত হৃদয় হায় হায় করছে। আজ সারা দিন আগাগোড়া বাড়িখানা আমি খুঁজেছি—কোথায়-কোথায় তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়েছে। বাতাসের গায়ে হাত দিয়ে-দিয়ে দেখেছি—কোথায় তাঁর স্পর্শটুকু লেগে আছে। তাঁর মাথা থেকে ফুলের একটি পাপ্‌ড়ি ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, আমি তখন তুলে নিতে পারিনি—যতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে ঘুরেছি লুব্ধ মন ঐ পাপ্‌ড়িটির উপর পড়েছিল। তাঁরা চলে যেতেই সেটিকে বুকে তুলে নিয়ে বাক্সবন্দী করেছি। এই তাঁর সেই গানের—'আমার মাথার একটি কুসুম!'

(১৭)

বাড়ি থেকে রোজ প্রশ্ন আসছে, আমি কবে ফিরে যাব? এখানে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই, তবু যেতে মন চাইছে না। যাবার কথা উঠলেই মনে হয় কি বুঝি তাড়াতাড়িতে ফেলে যাচ্ছি। আজ লিখে দিলুম আমি এখন যেতে পারব না।

(১৮)

আজ বেড়াতে যাবার সময় আমার ফুলের বাগানের বেড়ার পাশটিতে দেবী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। কী মমতা-ভরা চোখ-দুটি দিয়ে তিনি ফুলগুলিকে দেখছিলেন! ফুলের গাছেরা মাথা নুইয়ে দেবীকে অভ্যর্থনা করলে; ফুলেরা হেসে-হেসে তাঁকে ডাকতে লাগল। দেবীর পা-দুখানি একবার একটু এগিয়েই সঙ্কোচে পিছিয়ে এল; হাতখানি বাড়াতেই লজ্জা সেটিকে টেনে নিলে। দেবী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে বলি, এস দেবী, এস, এই ফুল-বাগানে এস, যত খুসি ফুল তোল; ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দাও। কিন্তু কিছুই বলতে পারলুম না। দেবী চলে গেলেন। আমি ছুটে এসে মালিকে বল্লুম, "ওরে, শিগ্‌গির একটা ডালি সাজা।" মালি রং-বেরঙের ফুল দিয়ে ডালি সাজালে কিন্তু তার সাজানো আমার পছন্দ হ'ল না। আমি সমস্ত দিন ধরে নিজের হাতে ডালি সাজালুম। তারপর সেই ডালি হাতে নিয়ে কতক্ষণ বসে-বসে ভাবলুম; মনে-মনে কতবার সেটি দেবীর পায়ে নিবেদন করলুম, কিন্তু হাতে তুলে দেওয়া আর হ'ল না। আমার ডালি-ভরা ফুল শুকিয়ে গেল।

(১৯)

আজও ডালি-ভরে ফুল সাজালুম, আজও পাঠাতে পারলুম না। আজকের ফুলও শুকিয়ে গেল।

(২০)

প্রতিদিনকার ডালির ফুল যেমন করে শুকিয়ে যাচ্চে, আমার মনে হচ্চে অমনি করে আমার হৃদয়-দলের উপর ব্যর্থতার তপ্ত নিশ্বাস পড়ে-পড়ে লেগুলিও শুকিয়ে উঠ্‌ছে। চারিদিক্ থেকে কেবলই অবসাদ এসে জমছে। এতদিন যেগুলো সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে সে স্বপ্নমাত্র! দেবীর ঐ যাওয়া-আসা ঐ চোখতুলে চাওয়া,—ঐ গান, ঐ হাসি, সবই যেন স্বপ্ন! এই স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের সমস্ত উৎকণ্ঠা রয়েছে কিন্তু কিছু করবার শক্তিসামর্থ্য নেই!

এখন দেবী কি-চোখ দিয়ে আমায় দেখছেন কে জানে! তাঁর দৃষ্টি আমার হৃদয়ের অলিগলির ভিতর কেবলই ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে আমি অনুভব করছি, কিন্তু সেখান থেকে যে সাড়াটুকু উঠছে, সেটুকুতেই কি তাঁর মনের তৃপ্তি হচ্ছে? আরো কিছু পাবার—দুটি কথা, একটু হাসির জন্যে তাঁর মনে কি আকাঙ্ক্ষা জাগচে না? জানবার ভারি ইচ্ছে হয়। দূর হ'ক গে! কি হবে আমার জেনে? জেনে আমি কি করব?

এই অবসাদের মধ্যে এখন মনে হচ্ছে, আমার দিবারাত্রের এই স্বপ্নটি যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে,—কেবল তার স্মৃতিটুকু রেখে দিয়ে!

ঐ যে দেখ্‌ছি দেবী আবার জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার আমার স্বপ্ন ঘোরালো হয়ে উঠল। এতক্ষণ যা মিথ্যা মনে হচ্ছিল আবার তা সত্য হয়ে উঠল। যাই, দেবীর জন্যে ফুল সাজাইগে!

(২১)

রোজ সন্ধ্যাবেলা আকাশের ঐ তারাটিকে আমি দেখি। ওর নাম জানিনা, ওর পরিচয় জানিনা, তবু ওটিকে আমি বড় ভালোবাসি। কেন ভালোবাসি তাও জানিনা।

দিন-দিন দেখচি ও উদয়ের পথ ছেড়ে অস্তের পথে এগিয়ে চলেছে। ঐ আকাশের তারা, ও কখনো কাছে আসবে না, ওকে কাছে কখনো পাবনা, তবু মন ওরই সঙ্গে ছুটেছে—থামতে চায় না। ওর জন্যে আসন্ন-বিরহব্যথা এরই মধ্যে আমার বুকে জেগে উঠেছে।

আমার হৃদয়-আকাশে যে-তারাটি উঠেছে সেও ঠিক ওরই মতন। তারও নাম জানিনা, পরিচয় পাইনি, তবু তাকে আমি ভালোবাসি। সে কখনো কাছে আসবে না, তবু মন তারই দিকে ছুটেছে। এক-একবার মনে হয় বুঝিবা ঐ-তারাটির মতো আমার এই-তারাটিও হৃদয়-আকাশ থেকে অস্তাচলের পথে এগিয়ে চলেছে;—কবে বুঝি আমার সমস্ত হৃদয় অন্ধকার করে দিয়ে অদৃশ্য হবে!

(২২)

কাল রাত্রে খুব ঝড় হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে যখন সেই ঝড়ের গর্জ্জন শুনছিলুম তখন টের পাইনি যে তার ধাক্কা আমার জীবনে এসে লাগচে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছিলুম। জেগে-জেগে ফুলের স্বপ্ন দেখ-ছিলুম। সকালে উঠে, আবার কি-রকম করে ডালি সাজাব তারই কল্পনায় মনকে রঙিন করে তুলছিলুম। বাইরের ঝড় আমার অন্তরের এই রঙিন বাতির উপর অলক্ষ্যে ফুৎকার দিচ্চে তার আভাসটি পর্য্যন্ত পাইনি।

সকালে উঠে বাগানে গিয়ে দেখি ঝড়ের ঝাপটায় আমার ফুলের বাগান উজাড় হয়ে গেছে। বাগানের সেই অবস্থা দেখে আমার মনে হ'ল যেন একটা মূর্ত্তিমান তিরস্কার চোখ-রাঙিয়ে আমার দিকে চে আছে।

হায়, হায়, আমার এত সাধের আ উপর এ কি বজ্রাঘাত হ'ল! কাল ম সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে প্রতিজ্ঞা ক ছেড়েছিলুম যে আজ ফুলের উপহার পাঠা কিন্তু কি নিয়ে এখন সে উপহারের ডা সাজাই?

আবার ফুল ফুটবে—সে কতদিনে জানে? ততকাল কি অপেক্ষা করা চলবে

এখন ঐ বারান্দাটিতে গিয়ে বসতে আ লজ্জা করছে। ছি, ছি, কি করে তাঁ আমি মুখ দেখাব? আজ কি নিয়ে তাঁ সাম্‌নে দাঁড়াব?

কিন্তু পারলুম না, বারান্দায় গি বস্‌তে হ'ল। অনেকক্ষণ ওবাড়ির দিকে মু তুলে চাইতে পারিনি। হঠাৎ চোখ-তু দেখলুম বাড়ি শূন্য!—মন্দির আঁধার ক যেন দেবী অন্তর্হিত হয়েছেন!

আমি চৌকি ছেড়ে উঠে, ছুটে গি বারান্দার একেবারে শেষ-কিনারায় দাঁড়ালুম। সত্যই বাড়ী শূন্য! আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হ'ল কাল্‌কের ঝড়ে সমস্ত পৃথিবীখানা বুঝি ওলটপালট হয়ে গেছে! এতবড় বিরাট শূন্যতা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমার মনে হ'তে লাগল আমার খালি বুক-খানার ভিতর দিয়ে কাল্‌কের ঝড়ো হাওয়া হুহু শব্দে বহে চলেছে—কোথাও একটু বাধছে না, এমনি সেটা শূন্য!

আমি টেবিলের উপর মাথা দিয়ে পড়ে রইলুম। বুকের ঝড় থেমে বর্ষা আরম্ভ হ'ল।

ও-বাড়ির চিঠি

ল্যাণীয়েষু,

হঠাৎ আমায় চলে যেতে হচ্ছে। যাবার াগে দেখা করে যেতে পারলুম না। এত াত্রে আর তোমায় বিরক্ত করব না। আমার য়ের বিয়ের একটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে; াই এত তাড়াতাড়ি।

এইখানে গল্প থামল।

যতীন বল্লে—"তার পর?"

নবীন বল্লে—"তার পর আর কি? দেওঘর থেকে সেই রাত্রে সে ও বাড়ি ফিরে এল।

যতীন বল্লে—"তার পর?"

সতীশ বল্লে—"তার পর সে মনের দুঃখে কাল কাটাতে লাগল।"

যতীন বল্লে—"তার পর?"

সতীশ ধমক দিয়ে বল্লে—"তার পর আর নেই।"

অখিল বল্লে—"নবীন, এটা কি তোমার ঠিক ফ্রি-লভের কাহিনী হ'ল হে?"

সতীশ বল্লে—"হ'ল বৈ কি? আমাদের দেশে ওর বেশী আর কি হ'বে।"

যতীন বল্লে—"হ্যাঁহে এটা কি সত্যিই সত্যি?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ!"

অখিল বল্লে—"তার প্রমাণ?"

নবীন বল্লে—"তার প্রমাণ আমি স্বয়ং।"

যতীন বল্লে—"তাহলে এ গল্পের নায়ক তুমি?"

সতীশ বল্লে—"তাই নাকি? ওরে নবীনে, তুই যে বেজায় লায়েক হ'য়ে উঠেছিস্ দেখছি। থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লায়েক।"

লক্ষ্মীকান্তবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"ঐ নায়িকাটি কে হে?"

সতীশ বল্লে—"ওটা জিজ্ঞাসা করাই অভদ্রতা হয়েছে, উত্তর দিলে আরও অভদ্রতা হবে।"

যতীন বল্লে—"কিন্তু নবীন, একটা বড় ধাঁদা লাগছে। তুমি ঐ নায়িকার চিঠিপত্র-গুলো পেলে কেমন করে? তার সঙ্গে তো তোমার আলাপ হয় নি!"

নবীন বল্লে—"আচ্ছা, অনুমান কর না।"

সবাই ভাবতে সুরু করলে। বিপিন ফস্-করে বলে উঠল—"আমি বলতে পারি।"

চারিদিক থেকে অমনি শব্দ উঠল—"কি? কি?"

বিপিন বল্লে—"ঐ যে নায়িকার সই—সরি না, কি? তিনি নিশ্চয় নবীনবাবুর ভগিনী হবেন—হয় মামাতো, কি পিস্‌তুতো কি মাস্‌তুতো! তিনি সমস্ত ঘটনা কোনো-রকমে টের পেয়ে চিঠিগুলো নবীনবাবুকে পাঠিয়ে খুব-এক-চোট মজা করে নিয়েছেন। এরকম মজার ব্যাপার আমি গল্পে পড়েছি।"

সবাই বল্লে—"কি বল হে নবীন?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ, কতকটা ঠিক—"

বিপিন উৎসাহে বুক ফুলিয়ে বল্লে—"দেখলেন, আমি বলেছি!"

অখিল বল্লে—"সত্যি তিনি তোমার ভগিনী?"

নবীন বল্লে—"তাকে ঠিক ভগিনী বলা যায় কি-না বলতে পারি না—সহচরী বলতে পার।"

সতীশ বল্লে—"এ আবার সহচরীটি কে এল হে? এতক্ষণ ত এর কথা ফাঁস করনি।"

যতীন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সে কে হে?"

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্লেন—"কোনো ভদ্র-মহিলার প্রসঙ্গ প্রকাশ্য-সভার মধ্যে উত্থাপন করা আমি বিশেষ আপত্তিজনক মনে করি।"

সতীশ বল্লে—"ওহে নবীন, এখন থাক্। এর পর আমাদের সকলকার কানে-কানে—অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত ছাড়া—চুপি চুপি বলে দিও।"

অখিল বল্লে—"দেখ নবীন, তোমার ঐ প্রেম-কাহিনীটি আমাদের সমাজের ভারি উপযোগী হয়েছে। এতে কারুর কিছু বলবার যো নেই।"

যতীন বল্লে—"ও যে সত্য ঘটনা কাজেই—"

লক্ষ্মীকান্ত বাধা দিয়ে বল্লেন—"শুধু উপযোগী বল্লে কম বলা হয়; ওটি আমাদের আইডিয়াল্ প্রেমের গল্প হয়েছে।"

যতীন বল্লে—"তাহ'লে আমাদের দেশের ফ্রি-লভের চেহারা কি অমনিধারাই হবে?—যা-কিছু সব মনে-মনে?"

সতীশ বল্লে—"কাজেই! প্রেমের সদর দরজা যখন বন্ধ তখন মনের অন্তঃপুরে বসে প্রেমের স্বপ্ন দেখেই আমাদের কাল কাটাতে হ'বে!"

অখিল বল্লে—"তবে উপায়?"

সতীশ বল্লে—"উপায়—এই বলে ... ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠা যে"—বলে সে তুড়ি দি... সুর-করে গেয়ে উঠল—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা ক...

"এবং এইটেই বার বার করে বলা"—বলে অখিল ধরলে—

"তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোনো স্থলগনে হ'ব না কি কাছাকাছি!"

হঠাৎ সতীশ ঘড়ির দিকে চেয়ে ... উঠল—"ওহে রাত যে বারোটা!"

—"অ্যাঁ বারোটা!"—বলেই সব দুদ্দা... দাড়্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লক্ষ্মীকান্ত গম্ভীরভাবে বল্লেন—"নবীন, তুমি যে এমন চমৎকার নির্দ্দোষ প্রেমকাহিনী লিখতে পেরেছ তার জন্যে আমি তোমাকে অভিনন্দন করচি!"

সতীশ একটু দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মীকান্ত চলে গেলে পর নবীনের হাত ধরে বল্লে—"ভাই নবীন, আমার হৃদয়ের সমবেদনা জানাচ্চি।"

নবীন একলাটি খানিকক্ষণ চুপ-করে দাড়িয়ে রইল। তারপর খাতাখানি দেরাজে বন্ধ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বেহারা এসে আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘর চাবিবন্ধ করে দিলে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অকর্ম্ম

দণ্ড দুয়ের কাণ্ড মধু—সংসারে এই সং সাজা,
পণ্ডিতে কয় মিথ্যা সবি; সন্ন্যাসী বা হোক্ রাজা—
চিত্ত সবার প্রার্থী সুখের—মুগ্ধ তারি আশ্বাসে
ঘূর্ণাবেগে ঘুরছে সবাই ভ্রান্ত মনের বিশ্বাসে!

ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল'—ভণ্ডামি সব জুচ্চুরি,
চক্ষু মুদে' আসবে যখন, খোঁজ থাকেনা কিছুরি;
স্পষ্ট চোখে দেখছে লোকে সঙ্গে কিছুই যাচ্ছেনা,
জন্ম ভরে' কর্ম্ম করে' ফল কোন তার পাচ্ছেনা।

দেখ্‌তে বড় শুন্‌তে বড় স্বার্থত্যাগের কল্পনা,
মন-ভুলান' ভেল্কী সুধু লোক-ঠকান' জল্পনা;
মৃত্যু এসে এক নিমেষে সমজে দেবে সত্য যা,
ধর্ম্ম তারে ধর্‌ত,যদি—মর্‌ত কি সে? মর্‌ত না!

বল্‌ছ মুখে কর্ম্ম গীতা—কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্মভোগের সুখ কি শুনি—জন্ম ত যায় যন্ত্রণায়;
কর্ম্ম লাগি' জন্ম যদি, চট্ করে' তা টুটত না,
কর্ম্মফলে জন্ম হলে' ফুলটি তারো ফুটত না!

মিথ্যা সবি ফক্কিকারী, স্ফূর্ত্তি সুধু মিথ্যা নয়,
অর্থ তাহার বুঝতে পারি, ভোগটা যে-তার মর্ত্ত্যে হয়!
হাস্ত করি নৃত্য করি দিব্যি খাসা প্রাণ ভরে'—
খাদ্যে পানে পেটটি ভরে' জন্ম কাটাই গান করে'।

পুষ্প করে গন্ধে বিভোর—চক্ষু ভুলায় বর্ণ তার,
কর্ণ জুড়ায় বাদ্যগীতে, স্ফূর্ত্তি যে তার কর্ণধার;
মদ্য মিঠায় সদ্য তৃষা, মাংস স্বাদে মন হরে,
মুগ্ধ প্রিয়ার দ্রাক্ষা-অধর স্বর্গ ভুলায় মন্তরে।

ফুলটি ফুটে মৌন মধুর—বল্‌ত কি তার কর্ম্ম ভাই,
ঝরণা ছুটে মত্ত মুখর, ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম নাই!
চাঁদটি উঠে জ্যোৎস্না ফুটে,অর্থ কি তার—হাস্ত সার!
গন্ধ লুটে মন্দ মলয়—আর কিছু না, লাস্য তার!

বিশ্ব যুড়ি' স্ফূর্ত্তি মেলা—কর্ম্ম সে ত যন্ত্রণা,
ক্ষিপ্ত যারা নিত্য শুনায় কর্ম্মপথের মন্ত্রণা!
দুঃখে দায়ে রাত্রে দিনে অশ্রুগলদ্ঘর্ম্মসাজ,
বৃষ্টি ঝড়ে রৌদ্রে শীতে মুর্খে করুক কর্ম্ম কাজ।

ভবিষ্যতের দাস্য করে—দৃষ্টি তারি অদৃষ্টে,
অনিশ্চিতের পোষ্য যারা চিন্তা তারি অনিষ্টে!
চিত্ত সুখের নিত্য সেবক স্ফূর্ত্তি মোদের সব কাজে,
বর্ত্তমানের শিষ্য মোরা—আজকা মোদের আজকা যে!

ভাবনা বটে অর্থ চাহি—পাওনা কিছু শক্ত যা'র,
দূর কর ছাই—কর্ব্বে যোগাড় যেমনে পারুক ভক্ত তা'র;
চক্ষু বুঁজে বুদ্ধি করে' আন্‌লে পরেই শুদ্ধ তা'—
শুদ্ধ আমোদ দেয় যে তাতে—সেও ত কিছু বুদ্ধ না!

স্ফূর্ত্তি কর স্ফূর্ত্তি কর প্রত্যহ ও প্রত্যেকে,
আজকে আছি আজ ত বাঁচি—অন্য কথা ভাবছে কে?
মূর্খে থাকুক কর্ম্ম নিয়ে ধর্ম্মে দিয়ে মন বাঁধা,
সত্যে ছেড়ে মিথ্যা তেড়ে ধরতে যাবে কোন্ গাধা?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

প্রতিভার খামখেয়াল

যে সকল প্রতিভার অবতার সভ্যতার ইতিহাসের গোড়া থেকে পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তাঁদের জীবনী আলোচনা করে দেখলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। কারণ, তাঁদের প্রায় সকলেই একটু-না-একটু বাতিকগ্রস্ত, মানসিক অবসাদগ্রস্ত অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন!

আধুনিক যুগের লেলা-মোরিও, লম্ব্রজো প্রমুখ কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত বলেন, প্রতিভার সঙ্গে উন্মাদ-রোগের খুব নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মোরিও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন যে প্রতিভা জিনিষটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটা রূপান্তর মাত্র; তারই কিছুদিন পরে লম্ব্রজো এই মতের সমর্থন করেন। লম্ব্রজো বলেন, বেশীর ভাগ প্রতিভাশালী লোকের বংশের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সেখানে উন্মাদ-রোগ বর্ত্তমান। হেগেল ও র‍্যাডেষ্টক প্রমুখ কয়েকজন জার্ম্মান পণ্ডিতও মোরিওর মতের সমর্থন করেন; অপর পক্ষে লক্, হেলভেসিয়াস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ঐ মতের পোষকতা করেন না।

চার্লস ল্যাম্ব এই সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখছেন, মানুষের ধারণাশক্তি শেকস্‌পীয়ারের মতন লোককে পাগল বলে কল্পনা করতে অক্ষম।

মোরিও যখন প্রতিভাকে উন্মাদ-রোগের অতি নিকট-আত্মীয় বলে প্রচার করলেন, তখন চারিদিকে মহা হুলুস্থুল বেধে গেল। বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ ফ্লাউরেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মতের বিরুদ্ধে এক পুস্তক প্রকাশিত করেন; তিনি বলেন, প্রতিভা এবং বাতুলতাকে এক কোঠায় পোরাও যা, পাপ আর পুণ্যকে এক পৈঠেতে স্থান দেওয়াও তা। পৃথিবীতে যদি আজ পাপ খুব উন্নতিলাভ করে তু পুণ্যের তাতে কিছুই লোকসান হবে না। আজ পর্য্যন্ত যেমন পাপ, পুণ্যের কিছুই করে উঠতে পারে-নি, তেমনিধারা বিজ্ঞানও প্রতিভার কিছুই করতে পারবে না; মোট কথা প্রতিভা চিরকালই পৃথিবীতে নিজের সম্মান বজায় রেখে আসছে ও রাখবে। ফ্লাউরেনের এই গা-জুরি যুক্তি তেমন সারবান বলে পণ্ডিতেরা গ্রহণ করতে পারেননি; ফ্লাউরেন ছাড়া ইংলণ্ডের গ্যালটন, মড্‌স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মোরিওর মত খণ্ডন করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। এঁরা বলেন, অনেক প্রতিভাবানের নানারকম খেয়াল ছিল বটে;—সক্রেটিস, প্যাস্‌ক্যাল প্রভৃতির খেয়ালের কথা কে না জানে? কিন্তু এই খেয়ালগুলোকে বাদ দিলে কি তাঁদের নাম জগতের ইতিহাস থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? কখনই না।

কিন্তু সাধারণ লোকে,—যারা প্রতিভার মর্ম্ম বোঝে না, তাঁরা যদি এঁদের সঙ্গে গারদের পাগ্‌লাগুলোর তুলনা করে দেখে, তাহলে বোধ হয় বিশেষ-কিছু প্রভেদ দেখতে পাবে না।

কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সাধারণ পাগল এবং এই শ্রেণীর পাগলদের খেয়ালগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

এরিষ্টটল্ বলেছেন যে, তিনি এমন অনেক লোককে দেখেছেন যাদের মস্তিষ্কের রোগ হওয়ার পর প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে। এমন কি সক্রেটিস্, এমপিডক্‌লস্, প্লেটো প্রভৃতি লোকের মধ্যে এবং বিশেষ করে কবিদের ভিতরই এই রোগ দেখা যায়। ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ প্রতিভাবান ব্যক্তিই জীবনের অন্তত কয়েকটা বছরও এই রোগে ভুগেছেন।

আধুনিক যুগের ফ্যারিনি, ব্রাউহ্যাম্, সাদে, গোভেন, মাংগে, ফারসি, কাউপার, রোচিয়া,রিক্কি, ব্যাটজুয়েকভ্, মুলার, উইলিয়ম কলিন্স, ফন ডার ওয়েষ্ট, হ্যামিলটন্, পো ও উহল্‌রিচ—এঁরা কেউই ঐ রোগ থেকে অব্যাহতি পান-নি।

মারটিনি বলেন, ফরাসীদেশের অনেক ভাল ভাল কবি যৌবনবয়সেই এই রোগে মারা গিয়েছেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে গুনডারওড এবং ষ্টিগ লিট্‌জ্ এঁরা দুজনেই আত্মঘাতী হয়েছিলেন, ব্র্যাকমান এবং এস, ই, ল্যান্‌ডন্ এঁরা দুজনেও উন্মাদ-রোগে মারা যান।

মনটেনাসের ধারণা হয়েছিল, তাঁর দেহটা একটা ছোলায় পরিণত হয়েছে এবং পাছে পাখীরা ছোলা মনে করে তাঁকে খেয়ে ফেলে অথবা কোন্‌দিন বা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ঘরের বাইরে বার হতেন না। হ্যারিংটনের যখন মাথা খারাপ হয়ে গেল তখন তাঁর মনে হোত, রাজ্যের যত ব্যারাম মশা আর মাছির রূপ ধরে তাঁকে কামড়াতে আসছে! এই সব কাল্পনিক মশা আর মাছির ভয়ে তিনি সবসময়ে দরজা বন্ধ করে হাতে ঝাঁটা নিয়ে বসে থাকতেন। বিখ্যাত রসায়নবিদ্ আমপেয়ার রসায়নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেন; তাঁকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বল্লেন, সেটা তাঁর নিজের লেখা নয়, তাঁর ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছিল সেই সেটা লিখেছে।

চিত্রকর কালো ডল্‌সির হঠাৎ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এত বেড়ে উঠল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ম্যাডোনার চিত্র ছাড়া আর অন্য ছবি আঁকবেন না, যদিও সে সব ম্যাডোনা-মূর্ত্তি বল্‌ডুইনির মূর্ত্তির নকল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রিত সকলেই এসে পৌছল, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না! শেষটা অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল একটা গির্জ্জার বেদীর উপর তিনি নিশ্চিন্তমনে শুয়ে পড়ে রয়েছেন। ন্যাথ্যানিয়েল লি একবার খুব শক্ত ব্যারামে পড়ে অনেক-দিন ধরে ভুগেছিলেন, রোগের যন্ত্রণা উপশম করবার তাঁর একমাত্র ঔষধ ছিল, গল্প লেখা। যতক্ষণ যন্ত্রণা থাকত ততক্ষণ তিনি লিখতেন। এই রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে তিনি তেরটি বিয়োগান্ত উপন্যাস শেষ করেছিলেন।

টমাস লয়েড কবিতা লিখে সেগুলোকে ভাঙা কাঁচ চাপা দিয়ে রেখে দিতেন। তিনি বলতেন, যে তাঁর লেখার ভিতর কোথাও খারাপ কিম্বা ভুল থাকলে ঐ কাঁচে সেগুলো ঠিকমত পালিশ হয়ে থাকবে। তিনি

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাঁয়ারের সঙ্গে কয়লা, কাগজ, তামাক ইত্যাদি যা পেতেন তাই খেয়ে ফেলতেন আর বলতেন, এতে শরীর খুব ভাল থাকে।

চার্লস ল্যাম্ব ছেলেবেলায় একবার পাগল হয়ে গিয়েছিলেন; এই রোগ তাঁর বংশের অনেকেরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কোলরিজকে সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন; —"অবিমিশ্র আনন্দ জীবনের মধ্যে শুধু সেই সময়টা উপভোগ করেছি, সেই দিনগুলো ফিরে পাবার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট করে, তুমি বুঝতে পারবে না যে সে কি আনন্দ!"

রবার্ট স্যুমান যৌবনে যখন আইন পড়তেন তখন তিনি একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েন। এই মেয়েটি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন, রবার্ট প্রায়ই এঁর বাজনা শুনতেন। কিছুদিন পরেই তাঁর মাথার রোগ দেখা দিল; তাঁর মনে হোত মেণ্ডেলেসন্, বিথোভেন প্রভৃতি ভাল ভাল গাইয়ে-বাজিয়েরা কবর থেকে উঠে এসে তাঁকে গান-বাজনা শোনাচ্ছে। একসময় পাগলামির ঝোঁকে তিনি রাইন নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলেন; তারই কিছুদিন বাদে একটা পাগ্‌লা-গারদেই তিনি মারা যান।

জেরার্ড ডি নার্ভালের পাগলামিতে বেশ মজা দেখা যেত; বছরের মধ্যে ছ-মাস তাঁর এত স্ফূর্ত্তি চাপত যে, তিনি যেখানে যেতেন সে জায়গাটা তাঁর হাসির গর্‌রায় ভরে উঠত, আর ছ-মাস তাঁর মনে এত অবসাদ আসত যে, তাঁকে দেখলে লোকের দুঃখ হোত। একবার গারদে তাঁর এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জেরার্ড তাঁকে বলেছিলেন—"এখানকার সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মনে করে যে সে একটা পাগ্‌লা-গারদের তত্ত্বাবধান করছে; কি করি, সেইজন্যে আমরা সবাই পাগ্‌লা সেজে বেচারাকে একটু খুসি রাখতে চেষ্টা করি।" একদিন ছাদের উপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল কে বুঝি আকাশ থেকে তাঁকে ডাকচে। সেই ডাক শুনে তিনি উপরে ওড়বার জন্য ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রায় মারা যাবার যোগাড় হয়েছিলেন। এরই কিছুদিন পরে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

বদ্‌লেয়ারের জীবনী পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনিও এই রোগ থেকে অব্যাহতি পান-নি। এঁদের সকলের রোগ একরকম না-হলেও মস্তিষ্কের রোগ যে ছিল এ-কথা জোর করে বলা যেতে পারে। বদ্‌লেয়ারের পরিবারে অনেকেই এই রোগে ভুগেছেন। তাঁর যখন এই রোগ প্রথম দেখা দিল তখন তিনি নিজের বাড়ীর সাম্‌নের দোকান-গুলোর বড় বড় কাঁচের দরজা-জান্‌লার উপর ইঁট ছুড়তেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "কাঁচ ভাঙবার শব্দ শুনতে ভারি ভাল লাগে।" বদ্‌লেয়ার মাসে অন্ততঃ একবার করে বাসা বদলাতেন। বাড়ীর লোকেরা তাঁর এইরকম মতিগতি দেখে তাঁকে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকবার জন্য ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একজন নিগ্রো রমণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। একটা নতুন-কিছু করবার

ঝোঁকে তিনি এমন-সব কাণ্ড করতেন যে, কলে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। তিনি শীতকালে গরমের, আর গরমের সময় শীতের পোষাক পরতেন। মাথার চুলে সবুজ কলপ লাগাতেন। তাঁর আরও এমন-সব কুৎসিত খেয়াল ছিল যে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। তিনি সমস্ত দিন ধরে, কখন্ কি করতে হবে, কখন্ কোন্ কোন্ বিষয় লিখতে হবে তারই তালিকা তৈরি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন,—আসল কাজের দিকে ঘেঁসতেনও না।

অনেকে বলেন, অঙ্কশাস্ত্রে যাঁরা প্রতিভা দেখিয়েছেন কিংবা এদিকে যাঁদের বিশেষ প্রতিভা আছে তাঁদের এ রোগের বালাই থাকে না। কিন্তু এ-কথা একেবারে ঠিক নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ নিউটন এন্‌ফ্যান্‌টন, আরকিমেডিস্, প্যাস্‌ক্যাল্, কোড্যাজ্জি এঁদের সকলেরই একটু-না-একটু ছিট্ ছিল। বোলারির (জ্যামিতিবিদ্) শেষ-জীবনে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তিনি প্রায় ছ'মাস অন্তর বন্ধুদের কাছে নিজের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতেন! কারডানের জীবনীতে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি সারাজীবন ধরে ঐ রোগের যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। এই কারডান বনিয়াদী পাগল ছিলেন। তাঁর বাপ থেকে তিন পুরুষ ধরে তাঁরা পাগলামীর চাষ করে গিয়েছেন। তিনি কখনও কোন জায়গায় স্থির হয়ে কাটাতে পারতেন না, সর্ব্বদা একদেশ থেকে অন্যদেশে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতেন; তাঁর মনে হোত তিনি যেখানে যান সেখান-কারই গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ধরবার ফিকিরে ষড়যন্ত্র করে। প্যাভিয়া-বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য যখন নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হল, তখন সেখানে গিয়ে তাঁর কেমন খেয়াল হল যে, সেখানকার অধ্যাপকরা তাঁকে বিষ খাওয়াবার মতলোবেই এই নিমন্ত্রণের ছুতো করেছেন। যেম্‌নি এই কথা মনে হওয়া অমনি সেখান থেকে তাঁর পলায়ন! এই রোগে ভুগে-ভুগে শেষটা তাঁর চেতনা-শক্তি এত বিগড়ে গিয়েছিল যে কোনো রকম একটা শারীরিক যন্ত্রণার উত্তেজনা না-পেলে তিনি সুস্থ বোধ করতে পারতেন না; তাই সব-সময়েই তিনি শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে মানসিক কষ্টের উপশম করতেন। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ পাগলরা হাত-পা কাম্‌ড়ে কিম্বা দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজেদের যন্ত্রণা দেয়; এথেকে বুঝতে পারা যায়, আর-একটা কোনো কষ্ট ভুলে থাকবার জন্যই তারা এই কাণ্ড করে। বাইরন বলতেন, পালাজ্বর তাঁর বেশ ভাল লাগে, কারণ জ্বর ছাড়বার সময় যে আবেশময় অনুভূতি সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হোতে থাকে, সেটা বড় আনন্দদায়ক।

রুশো, হ্যালরের মতন কারডানও তাঁর কষ্টময় জীবনের শেষদিনগুলো আত্মচরিত লিখে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

রুশো, শোপেনহয়র্, ভল্‌টেয়ার, সুইফট্, ট্যাসো, ফোডেরো প্রভৃতি প্রতিভাবানদের জীবন যে কি-রকম রোগ-যন্ত্রণায় কেটেছে —তা তাঁদের জীবনচরিত পড়লে বোঝা যায়।

অনেকের জীবনে, পুরোদস্তর পাগ্‌লামী দেখা না-গেলেও সেটা যে আংশিক ভাবে

বর্ত্তমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হয়েছে সকল প্রতিভাবানই যে একরকম রোগে ভুগেছেন তা নয়, চিকিৎসকেরা তাঁদের রোগগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে এক-এক শ্রেণীতে এক-একজনকে ফেলে তাঁদের জীবনী বিশ্লেষণ করেছেন।

যে সকল প্রতিভাশালী লোক পাগ্‌লামীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের অনেককেই আবার অন্যরকম স্নায়বিক রোগে ভুগতে হয়েছে। লেনো এবং মনটেকি যখন লিখতেন, তখন তাঁদের পা ভয়ানক কাঁপতে থাকত। বাফোণ, জন্‌সন্, স্তাল্টিনেল, ক্রেবিলন, লোম্বার-ডিনি প্রভৃতির মুখ এতটা বেঁকে গিয়েছিল যে, তাঁদের দেখলে মনে হোত যেন তাঁরা কাউকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছেন। জন্‌সন্ সম্বন্ধে আর-একটা মজার কথা শুনতে পাওয়া যায়। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তিনি নাকি প্রত্যেক ল্যাম্প-পোষ্ট ছুঁয়ে যেতেন। যদি এক-আধটা মাঝে বাদ পড়ে যেত তখনি আবার ফিরে এসে সেগুলোতে হাত ঠেকিয়ে তবেই ফের চলা সুরু করতেন। টমাস ক্যাম্বেলের ঠোঁট সর্ব্বদা কাঁপত। চ্যাটার-ব্র্যাণ্ড অনেকদিন ধরে হাত-কাঁপুনি-রোগে ভুগেছিলেন। জুলিয়স সিজার, ডষ্টয়এভস্কি, প্রেতার্ক, মলেয়ার, ফ্লবেয়ার, পঞ্চম-চার্লস, সেণ্ট-পল ও হাণ্ডেল এঁদের সকলকেই মৃগী-রোগে ভুগতে হয়েছে। গেটে ও ফ্লবেয়ার প্রভৃতি কয়েকজনকে মানসিক-অবসাদ রোগে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়েছে। গেটে এক জায়গায় লিখেছেন—"আমার মনের ভিতর আনন্দ ও দুঃখের ধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে। আমি অত্যন্ত আন[illegible] থেকে হঠাৎ নিরতিশয় দুঃখের সাগ[illegible] নিমজ্জিত হই।" ফ্লবেয়ার একস্থলে উ[illegible] করেছেন, "আমার জীবন আনন্দ-উপভো[illegible] জন্য সৃষ্ট হয়-নি।" এই মানসিক-অবসা[illegible] রোগে ভুগে-ভুগে কত প্রতিভাশালী লো[illegible] যে আত্মহত্যা করেছেন তার একটা ছো[illegible] খাট রকমের তালিকা দেওয়া গেল। জে[illegible] এরিষ্টটল্ (?), সিপ্পাস, হেগে, সিঙ্গাগ, ক্লিনথে[illegible] ষ্টিলপো, ডাওনিসাস (of Heraclea.) লুক্রোটিস্, ল্যুমান, চ্যাটারটন, ক্লাইভ ক্রিচ, ব্রাউনট, হেডান, ডোমেনিচিনো স্প্যাগ্‌নোলেটো এবং ন্যুরিট। এ-ছাড়া আ[illegible] কতজন যে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছে[illegible] তার আর সংখ্যা নেই।

প্রতিভাদের মধ্যে আর-একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁদের ভিতর অনেকেই অত্যা[illegible] নেশাপ্রিয় ছিলেন (বিশেষ করে মদ্য পান) এবং অনেকেরই নীতিজ্ঞান এত কম ছি[illegible] যে, শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

আলেকজান্দার টেবিলে বসে একপাত্র দুপাত্র করে হারকিউলিসের নাম নিয়ে ম[illegible] খেতে খেতে—দশপাত্র পান করেই পঞ্চ[illegible] পেয়েছিলেন। সিজারকে প্রায়ই তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা মাতাল-অবস্থায় বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেত। সক্রেটিস, সেনেকা, এলসিবিয়াডস্, কেটো, পিটার দি গ্রেট (তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন এবং মেয়ে এলিজাবেথ), এঁরা সকলেই মদ্য[illegible] ছিলেন। কনষ্টেবল ডি বুরবোঁ এবং এভিসেনা এঁরা দুজন জীবনের শেষার্দ্ধভাগ মদ খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, 'প্রথম-জীবনে লেখাপড়া করে যে [illegible]

[illegible]াপ করা গেছে শেষ-জীবনে মদ খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করা যাচ্ছে।'

মারগার, জেরার্ড ডি নারভাল, এলফ্রেড ডি মুসে, ক্লিষ্ট, পো, হফ্‌ম্যান, এডিসন, ষ্টিল, ক্যারু, সেরিডান, বায়রন্‌স্, চার্লস ল্যাম্ব, জেমস টমাস, মেলাথ, হারটলি কোলরিজ—এঁদের সকলেরই মদের প্রতি বিশেষ টান দেখা যেত। ট্যাসোর একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"অস্বীকার করছি না যে আমি পাগল,—কিন্তু অত্যধিক নেশা ও প্রেমই আমায় পাগল করেছে।"

কোলরিজ এই মদ ও আফিংএর নেশার জন্য জীবনে অনেক কাজ করতে পারেন নি। আবার তাঁর ছেলে হারটলি কোলরিজ ছেলেবেলা থেকেই এত-বেশী মদ খাওয়া সুরু করেছিলেন যে, সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। লোকে তাঁর সম্বন্ধে বলত, "He wrote like an angel and drank like a fish." স্যাভেজ শেষ-জীবনটা একরকম মদ খেয়েই বেঁচেছিলেন, বলতে হয়। শেষকালে তিনি ব্রিষ্টলের জেলের ভিতরে মারা যান। ম্যাডাম ডি ষ্টিল এবং ডি কুইনসির আফিং খাওয়ার কথা ত সর্ব্বজন-বিদিত। সঙ্গীতে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে ডুসেক্, হ্যাণ্ডেল, গ্লুক প্রভৃতি অত্যন্ত মদ্য-প্রিয় ছিলেন ;—অর্থ, মদ এবং যশ এই তিনটি ছিল তাঁদের বিশেষ উপাস্য। তাঁরা বলতেন, প্রথমটি হাতে এলেই দ্বিতীয় পদার্থটি কেনবার সুবিধে হবে এবং সুরার অনুপ্রেরণায় তাঁরা যে সৃষ্টি করবেন তা থেকে যশোলাভ করা যেতে পারবে। এঁদের মধ্যে গ্লুক মদ খেতে-খেতেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

জর্জ্জ স্যাণ্ড শেষ-জীবনে লিখেছিলেন, "যেখানে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব সেখানে সততা বোকামির নামান্তর মাত্র। যেখানে শক্তি নেই সেখানে সততা একটা ভাণ। যেখানে বুদ্ধিও আছে শক্তিও আছে সেখানে সততা প্রায়ই টিঁকতে পারেনা। কারণ সেখানে অভিজ্ঞতা এবং বহুদর্শিতা থেকে সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জন্মলাভ করে। যাঁরা খুব মহৎ অভিপ্রায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা প্রায়ই ভারি কঠোর এবং উগ্র।"

আর-এক স্থানে তিনি বলছেন—"বড়লোকের নামে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। যতদিন বেঁচে থাকে তারা ভারি বদমায়েস অত্যাচারী খামখেয়ালী ইত্যাদি।"

থেমিসটোক্‌ল্‌সের জীবনী লিখতে লিখতে ভেলেরিয়া ম্যাক্সিমাস বলেছেন, "তাঁর যৌবনের ইতিহাস আলোচনা করে যখন দেখতে পাই, একদিকে তাঁর পিতা তাঁর নীচ ব্যবহারের জন্য তাঁকে ত্যজ্যপুত্র করলেন, অপর দিকে তাঁর মা এরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন বলে আত্মহত্যা করলেন, তখন আর বেশী দূর অগ্রসর হোতে ইচ্ছা হয় না।"

সেলাষ্ট ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখতেন বটে কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনটা লাম্পট্যের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। পুস্‌কিন একদিন প্রকাশ্য থিয়েটারের ভিতর গবর্ণর-জেনারেলের স্ত্রী কাউণ্টেসের ঘাড় সুন্দর দেখে লোভ সামলাতে না-পেরে কামড়ে দিয়েছিলেন! স্পিয়াসিপ্পাস (প্লেটোর শিষ্য) ব্যভিচারে যখন উন্মত্ত সেই সময়েই হত হয়েছিলেন! ডেমোক্রিটাস নিজের চোখ নষ্ট করে

ফেলেছিলেন; তিনি বলতেন স্ত্রীলোক দেখলেই আমার মন ভারি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

থিয়োগনিস জন-সাধারণকে অনেক নীতি উপদেশ দিয়ে শেষে মরবার সময় তাঁর পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এক বেশ্যাকে দান করে গিয়েছিলেন।

নারীপ্রতিভার মধ্যে স্যাফো, ফিলেনা, এলিফ্যানটিনা, লিওনসন্ (দার্শনিক ও সন্ন্যাসিনী), ডিমোফিলা প্রভৃতির নাম চরিত্র-হীনতার জন্য দেশ-বিদেশে রটে গিয়েছিল। সেলাষ্ট, সেনেকা ও বেকনকে, তহবিল-ভাঙার অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছিল। ক্রেমানি জাল করতেন, ডেমি বিষ খাইয়ে লোককে পরলোকে পাঠাতেন, এভিসেনা শেষ-বয়সে এত-বেশী ইন্দ্রিয়সেবী হয়েছিলেন আর আফিংএর মাত্রা এত বেশী চড়িয়েছিলেন যে লোকে বলত, "তাঁর চরিত্র শোধরাতে শাস্ত্র যেমন হার মেনেছে তাঁর শরীরকে সুস্থ রাখতে ওষুধও তেমনি নিষ্ফল হয়েছে।" এই রকমে বনফ্যাডি, রুসো, এরিটিনো, কারসা, ক্রনেটো ল্যাটিনি, ফ্র্যাঙ্কো, ফস্‌কোলো, বাইরণ প্রভৃতি মনস্বীরা নিজেদের প্রতিভাবলে যেমন অক্ষয় যশ ও কীর্ত্তি রেখে গেছেন, অন্যদিকে হীন-চরিত্রের জন্য আপনাদের জীবনে কলঙ্কের দাগ চির-কালের জন্য দেগে দিয়ে গেছেন। সৎ আর অসতের এ-রকম অপূর্ব্ব সমাবেশ সাধারণ-চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।

অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির খুব কম-বয়সেই প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে; আবার অনেকে ছেলেবেলায় অত্যন্ত বোকা ছিলেন, বয়স হবার পরে হঠাৎ একসময় তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়ে থেয়ারস, পেষ্টালোজি, ওয়েলিংটন, ডুগেসক্লি গোল্ডস্মিথ, বার্‌ন্‌স্, ব্যালজ্যাক, ক্রেসপে ডুমা (বড়), হুমবোল্ট, সেরিডান্, বোকাসি পিয়ার টমাস্, লিনাস, ভলটা, এলফেরি,—এ ছেলেবেলায় বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন নিউটনও অঙ্ক ছাড়া স্কুলের অন্য পড়া ক পারতেন না। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ ক্ল্যাপর্থ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করতেন তাঁকে শিক্ষকেরা অভ্যন্ত বোকা বলেই জানতেন। পরীক্ষার সময় যে প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারতেন না একদিন তাঁর শিক্ষক ঠাট্টা করে বলেছিলে —"তুমি কোন বিষয়েরই কিছু জান দেখছি।" শিক্ষকের কথা শুনে ক্ল্যাপর্থ বলেছিলেন—"মাপ করবেন মশায়, আ চীনে ভাষা জানি এবং বার্লিনে বোধ এমন কোন অধ্যাপক নেই যিনি আমা চেয়ে চীনে ভাষা ভাল জানেন।"

প্রতিভাবানদের মধ্যে আর-এক জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিকে তাঁদে শারীরিক অনুভব-শক্তি যেমন কমে যায় অ দিকে তেমনি মানসিক অনুভব-শক্তি এক বেড়ে যায় এবং সামান্য সামান্য ঘটনাকে তাঁ এত বড় ও বেশী করে দেখেন যে, তা থেকেই মানসিক-অবসাদ প্রভৃতি রোগে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফস্কোলোর এক বন্ধু তাঁকে একবার কি-একটা ঠাট্টা করেছিলেন; বন্ধু বিদ্রূপ শুনে তিনি বল্লেন, "তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?"—এই বলে দেয়ালে এত জোরে তিনি মাথা ঠুকতে আরম্ভ করলেন যে কেউ ধরে না-ফেললে তাতে তাঁর মৃত্যু হতে পারত। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রাসিয়া, র‍্যাফেলের আঁকা একখানা ছবি দেখে আনন্দের আতিশয্যে মারা গিয়েছিলেন। সোপেনহয়রের নাম কেউ যদি ছুটো P দিয়ে বানান লিখত তাহলে সে তাঁকে অপমান করেছে বলে তিনি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতেন। বার্থেজের কোন এক পুস্তকে একটা বানান ভুল হয়েছিল বলে তারপর থেকে তিনি রাত্রিতে আর ঘুমোতে পারতেন না। ম্যালহারবের মৃত্যুর সময় যখন পাদ্রী এসে তাঁকে ধর্ম্ম উপদেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, ওর বলবার ভঙ্গী বড় খারাপ'!

প্রতিভাশালী লোকদের জীবন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৎ অসৎ ও নানারকম ভাবের সংমিশ্রণে এত বৈচিত্র্যময় যে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়; এতগুলি বিচিত্র লক্ষণ ছাড়াও প্রতিভাবানদের জীবন আরো অনেক চমকপ্রদ ইতিহাসে পরিপূর্ণ; ভবিষ্যতে সেগুলি আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্বপ্ন-সুন্দরী

(গান)

ঘুম দিয়ে—
নিঝুম্ দিয়ে!—

ওকি আওয়াজ-হারা হাওয়ায় এল গো
চাঁদ-চারণের ভূম দিয়ে!
ঢুলুঢুলে ওই চোখের চাহনি
ভুলিয়ে নিল ঝিল্লিরই ধ্বনি!
ওকি জোনাক্-জ্বালা তারার আলো গো
(সব্) শীতলে দিল চুম্ দিয়ে!
ওকি জ্যোৎস্নাটুকু ফুরিয়ে এল অস্ত-লগনে
ফুলের বাসে ঝামর আঁচল ঢুলিয়ে গগনে
মূর্চ্ছা ও কি রূপ ধরেছে রে!
হরেছে মোর মন হরেছে যে!
ভরেছে যে হর্ষে আকাশ গো
তারারি কুঙ্কুম দিয়ে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কৃষি ও কৃষক

(ক্রপটকিন হইতে)

অর্থশাস্ত্রের প্রতি অনেকের অবিশ্বাসের একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, তার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রায়ই ভ্রান্ত মত-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ-তাত্ত্বিকেরা বলেন, মানুষের কার্য্য-শক্তি ও ফসল-বৃদ্ধির একমাত্র প্ররোচনা নিজ-নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের মধ্যেই নিহিত।

এই অপবাদ ও অবিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। কিন্তু যে-যুগে দেশের কৃষি-শিল্প-সম্পদে মানুষ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে সে সময়ে সর্ব্বসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সকলের লক্ষ্য ছিল, আত্ম স্বার্থ-সাধনের ক্ষুদ্রতা তাদের মনকে মলিন করতে পারেনি। এ-কথা খুব জোর করেই বলা চলে যে বিশ্বের বিখ্যাত উদ্ভাবক ও আবিষ্কর্ত্তারা মানব-সাধারণের উন্নতি ও মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করেছেন এবং আত্ম-কৃত কার্য্যের উন্নতির অনুপাতে নিজের নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করেছেন। আমরাও বিশ্বাস করি যে, কল-কারখানার উদ্ভাবক মনীষিরা যদি বুঝতেন, তাঁদের উদ্ভাবনার ফলে মানব-সাধারণের জীবন-সংশয় হবে তবে কোন্-কালে সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট করে' ফেলতেন। কেবল মান ও অর্থের খাতিরে নয়, বিশ্বের উন্নতির দিকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ধনবিজ্ঞানের আর একটি তত্ত্ব এই রকম ভ্রান্ত। অর্থশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই নিতান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন যে, যদি কোনো দেশে বছরের পর বছর ফসলের প্রাচুর্য্য ঘটে এবং তাতে যদি দেশে লোকের সকল অভাব মেটে, তবে দেশে লোক পারিশ্রমিকের লোভেও আর দেহ বিক্রি করবে না এবং তার ফলে কল-কারখানা খনির কাজ, কর্ম্মীজনের অভাবে অচল হয়ে উঠবে। ধন-বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত এই মত-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; এগুলি অর্থ-তাত্ত্বিকের পণ্ড-পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা এই ভ্রান্ত-তত্ত্বের নিরসন পূর্ব্বেই করেছি।

মানুষের অভাব ও সেই অভাব মেটাবার উপায় আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কি শিল্পে আর কি কৃষিকার্য্যে সাধারণের অভাব-মোচনের নানা সম্ভাবনাই আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কৃষি-শিল্প-সম্বন্ধে সমস্ত ফসলে প্রকৃত অভাব দূরীকরণের বন্দোবস্ত হয়। নিজের অভাব মিটলে, ক্ষুদ্র স্বার্থ-সাধনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলে মানুষ বাঁচার আনন্দে সকল কাজেই যেচে হাত লাগাবে; তখন তাকে আর পারিশ্রমিকের লোভও দেখাতে হবে না, কোনো-রকম শাসন-তন্ত্রের শক্তি-সাহায্যে বাধ্য করবার প্রয়োজনও হবে না।

যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ করাই চলে না,—কলে কারখানায় খনিতে আজ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তাহাতে পরিশ্রমের হ্রাস ও উৎপাদনী-শক্তির বৃদ্ধি এই দুয়েরই

যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং এই সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টার উপর মানব-সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে।

কৃষি-সম্বন্ধেও একথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। কারখানার কর্ম্মীর মত কৃষকও তার জমির উৎপাদনী-শক্তি অনেক পরিমাণে বাড়াতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিশ্রমও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে। আমাদের কাম্য সামাজিক পরিবর্ত্তন সার্থক হলে বর্ত্তমানের মহাজনী বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই লোপ পাবে। তখন কৃষক তার নবলব্ধ শক্তি সম্পূর্ণভাবে দেশের ও দশের কাজে লাগাবার সুবিধা পাবে এবং দেশের প্রকৃত অভাব মোচনের সুচারু বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি হবে না।

কৃষির কথা মনে হলেই কৃষকের একটা ছবি আমাদের মানস-নেত্রে ফুটে ওঠে।—লাঙলের উপর ঝুঁকে পোড়ে, কর্ম্মক্লান্ত শীর্ণদেহ কৃষক জমিতে এলোমেলো ভাবে বীজ ছড়াচ্ছে; ফসলের ভালো মন্দের জন্য সময়ের উপর বরাত দিয়ে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় কাতর হচ্ছে; কিংবা একটা পরিবারের সকল-লোক সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে কঠিন শয্যা, যৎসামান্য খাদ্য, জঘন্য পানীয় ও ছিন্নবসনে তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে কর্ম্মীজনের এই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ছবিটা নানা আকারে অঙ্কিত হয়েছে। এবং এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব-সন্তানের দুঃখলাঘবের জন্যে সমাজ বড়-জোর তার দেয় কর বা খাজনা কমাবার বন্দোবস্ত করে। সমাজের স্তম্ভ যাঁরা, তাঁরা কোনোদিন ভাবতেও সাহস করেন না যে কৃষক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তারও অবকাশ ও আনন্দ মিলতে পারে এবং কৃষির হাজার রকমের উন্নতি সম্ভব! এ বিষয়ে চিন্তায় ও কাজে যে উন্নতি হয়েছে তা কৃষি-কার্য্যের বিস্তৃতি মাত্র। আমেরিকায় বিস্তৃত-কৃষির উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখা ছাড়া সোসিয়ালিষ্ট দল আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন-নি।

কিন্তু কৃষিবিদের ধারণাশক্তি ক্রমশ যথেষ্ট প্রসার ও গভীরতা লাভ করেছে। আবহাওয়া, ঋতু-পরিবর্ত্তন এবং জল ও বায়ুর সকল রকমের বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে মাটিকে নিজের কাজের উপযোগী করে গড়ে নেবার জন্যে তিনি প্রাণপণ করেছেন; আনন্দে ও স্বেচ্ছায় যে সময়টুকু কাজ করা চলে সেই সময় এবং অল্প জায়গার মধ্যে সকলের উপযোগী ফসল জন্মানো তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য। আধুনিক কৃষির গতি এই দিকেই। কৃষিতত্ত্বের থিওরী নিয়ে বিজ্ঞানবিদেরা যখন যন্ত্রাগারের বদ্ধতার মধ্যে ভুলের পর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, তখন কর্ম্মী-জন নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টায় এর অন্তর্নিহিত রহস্যোদ্ঘাটনের পথ বার করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন, যা ভাবতেও মানুষ দ্বিধা বোধ করে। এঁরা যে সবাই উচ্চশিক্ষিত তা নয়; বরং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শবজী-বাগানের মালী, আর আবাদী চাষা! ছোট জায়গার মধ্যে কেমন করে শুধু একটা পরিবারের নয়—তার চেয়েও ঢের বেশী লোকের অশন-বসন, এমন-কি বিলাসিতার উপকরণ পর্য্যন্তও যোগানো যায় তার রহস্যটা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এখানে সমস্ত খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু কয়েকটা সাধারণ মন্তব্য প্রচার করতে চাই, যাতে সবাই বেশ বুঝতে পারেন যে, এটা কবি বা অলস লোকের স্বপ্ন নয়,—কর্ম্মীজনের যত্নে ও চেষ্টায় বস্তুত এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। অধিকন্তু, এই কথাগুলি বিশেষরূপ উপলব্ধি করতে পারলে সামাজিক পরিবর্ত্তনের পক্ষে অনেকটা জোর পাওয়া যাবে।

নানা দেশে রাজকর বা জমিদারী খাজনার নানারকম তারতম্য থাকলেও এটা নিঃসন্দেহ সত্য যে, শাসনতন্ত্র ও জমিদারশ্রেণী কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন। মহাজন দাদন দিয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব পূরণ করে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার একলার নয়—উত্তরাধিকারীদের জন্যেও যে ঋণের ফাঁস রচনা করে, তা-থেকে আমরণ কারও মুক্তি নেই। মাঝারি দল বা আমলা-দালালের অত্যাচার ত তার জীবনে নিত্য ঘটনা! তারপর, নানারকমে খরচের ভার এড়িয়ে বাকি যা-কিছু থাকে তাতে কোনো রকমে যমের ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করা চলে। কৃষক যদি কোনোরকমে তার ফসল-বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে এবং যত্ন ও পরিশ্রমে সফলকাম হয় তবে আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে খাজনা-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কোনোদিক থেকেই তার নিস্তার নেই। তাই দেখা যায়, এত বছরের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কৃষি-ব্যাপারকে সামান্যই উন্নতি দান করতে পেরেছে। কিন্তু তবু মানুষের শক্তি ও দৃঢ় চেষ্টা সমস্ত বিপরীত ব্যবস্থাকে জয় করবার পণ ছাড়ে না; তাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে!

আমেরিকায় আজকাল যে-নিয়মে আবা করা চলছে অন্য দেশে তা একরক অসম্ভব; কারণ সেখানে নূতন ক্ষে অভাব হয়নি এবং অদূর-ভবিষ্যতে না-হবা সম্ভাবনাই বেশী। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্ত য়ে চাষ চলেছে তার মধ্যে বর্ত্তমানের সুযো ও সুবিধা যথেষ্ট। নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রশক্তি সাহায্যে এবং এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা চাষী যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সে দে একটা বিরাট সামরিক ব্যাপার, সৈন্যদলে কুচ কাওয়াজের মত বা প্রথানির্দ্দিষ্ট বিধা অনুসারে তার সমস্তটাই যন্ত্রের মত চলে;— কোনোদিকে অযথা-অপব্যয় নেই—সময়েরও নয়, শক্তিরও নয়। কিন্তু এর বন্দোবস্ত য সুন্দর হোক এবং ক্ষেত্রের ও কৃষির বিস্তৃতি য বেশী হোক, প্রকৃতির কাছ থেকে যা পাওয়া যায়,তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়—মাটির উৎকর্ষ বিধানের কোনো চেষ্টা এর মধ্যে নেই। যেদিন ক্ষেত্রের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হ যাবে, সেদিন তাকে পরিত্যাগ করে নতুন জমির সন্ধানে ফিরতে হবে। কিন্তু মানু এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে-নি;—শুধু তাই না, আবশ্যকের ও অভাবের দায়ে তাকে উন্নতি চেষ্টা করতে হয়েছে, কারণ নতুন জমি সব দেশে সব সময়ে পাওয়া যাবে না; শুধু বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যতের দায়ও কম নয়!

কৃষির এই উন্নতিকে কৃষি-বিজ্ঞানের নূতন অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে চাষ করে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল লাভ করা। জমিতে সার দিয়ে, নানারকমে তার প্রোট করে

এবং শক্তি কেন্দ্রীভূত করে' জমির উর্ব্বরতাকে বাড়িয়ে তোলাই উন্নত কৃষির প্রধান বিশেষত্ব। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব; এবং সভ্য দেশে এই নিয়মেই কাজ চলছে। তার ফলে কোথাও-বা চার, কোথাও-বা পাঁচ গুণ ফসল লাভ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যন্ত্রের সফল-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও যথেষ্ট লাঘব হচ্ছে। চাষের আগে মাটির পাট করতে হলে যা-কিছু করা দরকার, যন্ত্রে তা অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন হচ্ছে। মাটির পাট করলে চাষের কত সুবিধা, তা বোধ হয় কারুকে বোঝাতে হবে না। অবশ্য পাট করা ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত নয়,—কারণ কেবলমাত্র আগাছা মুক্ত করার ফলে কোনো-কোনো জমিতে দ্বিগুণ ফসল হোতেও দেখা গিয়েছে।

আমরা কৃষির রোমান্স রচনা করতে চাই না;—আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, মানুষের চেষ্টায় ও যত্নে সাধারণ ক্ষেত্রেও অপর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে, অথচ পরিশ্রম ও সময়ের মোটেই অপব্যবহার হয় না।

বর্ত্তমানের নানা রকমের অসুবিধার মধ্যেও যদি এতটা উন্নতি সম্ভবপর হয় তবে ভবিষ্যতে স্বাধীন সমাজে এর চেয়ে বেশী উন্নতি আমরা আশা করতে পারি! সভ্য দেশের বড় বড় সহরে অকেজো অলস লোক ছাড়া শত শত শ্রমোপজীবী কর্ম্মহীন ও বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে; বর্ত্তমান ব্যবস্থার এই দোষ দূর করলে কর্ম্মীর সংখ্যা বেশী হবে এবং যন্ত্র-বলের সঙ্গে লোক-বলের সংযোগ-ফলে অন্ন-সংস্থানেরও অভাবনীয় সুবিধা হবে।

কিন্তু বিদ্রোহ বা সামাজিক পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে বর্ত্তমানে বা অদূর-ভবিষ্যতে এটা সম্ভব হতে পারে না। শাসনতন্ত্র, জমিদার ও মহাজন এই উন্নতির গতিরোধ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছে; কারণ এতে তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। অথচ এই পরিবর্ত্তনের ফলে যারা সত্যই উপকৃত হবে-সেই কর্ম্মীজনের এ সমস্ত বোঝবার মত না-আছে বিদ্যা না-আছে শক্তি,—না আছে অর্থ। অধিকন্তু, নিজের ও দেশের জন্যে সারাজীবন পরিশ্রম করে' এ-সব চর্চ্চা করবার মত তার অবকাশই বা কোথায়? মূর্খ দরিদ্র কর্ম্মীদের কাছে এ-সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়!

য়ুরোপীয় মধ্যযুগে এই ভূমিই একদিন রাজশক্তির ও ভূস্বামীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে চাষীকে মুক্তি দিয়েছিল এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি, আধুনিক উন্নত-কৃষিও, মাঝারি-দলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চাষীকে যথেষ্ট শক্তি প্রদান করবে।

কাগজে-কলমে কৃষক-সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্গতির আলোচনা আমরা যথেষ্ট করে' থাকি এবং তাদের জন্যে বেদনা-প্রকাশও বড় কম করছি না; কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই—তাই আমাদের সহানুভূতিতে আন্তরিকতার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। আমরা কোনোদিন খবর রাখি না যে, এই সব চাষীর দল ভারবাহী পশুর জীবন যাপন কোরে, মানুষের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেও মানুষের জন্যে তারা যা করেছে এবং করছে তা মানুষের পক্ষে গৌরবের বিষয়। মাটিকে মানুষের কাজে লাগাতে

হবে, তার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে সফল সার্থক করে' তুলতে হ'লে, যা-কিছু করা দরকার সে শিক্ষা আমরা তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। প্রকৃতির সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে' স্থান-কালের সমস্ত বিপরীত ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে নানা উপায়ে বেশী পরিমাণ ফসল আদায়ের চেষ্টায় যারা জয়ী হয়েছে, সেই সমস্ত মালী আর চাষীকে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে!

আমাদের জীবনের চারিদিকে নানা সম্ভাবনার নানা বীজ ছড়ানো আছে;—সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা অকাজের দায়ে আমরা নিজেদের অকেজো করে' তুলছি—নিজের শক্তি উপলব্ধি করবার অবকাশটুকুও আমাদের নেই। মানুষ যদি জানত সে কি করতে পারে, এবং যদি সে আপনার শক্তিকে নিপুণভাবে কাজে লাগাত, তবে এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত মিথ্যা সংস্কার ও পণ্ড-পাণ্ডিত্যের জীর্ণ প্রাসাদ আজ তাদের অভাব-অনটনের সঙ্গে-সঙ্গেই ধূলায় লুটিয়ে পড়ত। মানুষের কর্ম্মশক্তির অভাব নয়,—মনের ভীরুতাই স্বাধীনতা-কামীর পক্ষে সব-চেয়ে বড় শত্রু। পুরানো ব্যবস্থার ত্রুটীকে দূর করতে হলে শক্তির দরকার হয় বটে, কিন্তু নিজের শক্তির উপরে শ্রদ্ধা না-থাকলে এগিয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

কবিতার ছন্দ

ইংরাজী "আর্য্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ পর্য্যায়ক্রমে কবিতার রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় তিনি কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—"metre বলিতে আমরা সুনির্দ্দিষ্ট এবং সমান ওজনবিশিষ্ট ধ্বনির বিভাগ বুঝি এবং তাকেই আমরা 'মাত্রা' বলিয়া থাকি। সেই 'মাত্রা' বস্তুটা কবিতার বিচিত্র গতিলীলার প্রথাগত ভিত্তিমাত্র নয়; তাহা যথার্থই তার আসল ভিত্তি।

"কিন্তু আধুনিক কালে এই প্রথাকে অস্বীকার করিবার একটা ঝোঁক দেখিতে পাই। হুইটম্যান-কার্পেণ্টারের কাব্য এবং ফরাসী ও ইতালী দেশে যাঁরা vers libre বা অসমমাত্রিক ছন্দে * কাব্য লিখিতেছেন তাঁদের রচনাই তার প্রমাণ। এই সব রচনা বাঁধা মাত্রার বাঁধনকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়। যথার্থ সত্য, স্বাধীন এবং স্বাভাবিক কবিত্বের ছন্দকে বাঁধা মাত্রার বাঁধে ফেলিলে নিতান্ত হাল্কা, পল্কা ও ছেঁদো করিয়া তোলা হয়, বাঁধা মাত্রার বিরুদ্ধে হয়ত এও এদের একটা অভিযোগ। কিন্তু এ মত

* গতবারের মাসকাবারিতে রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" সম্বন্ধে নবপ্রকাশিত প্রবন্ধের 'সম' 'অসম' ও 'বিষম' শব্দগুলি কিছু স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল—vers libreকে বিষম ছন্দ বলা হইয়াছিল—আমার অর্থে অনর্থের 'বিষম' সম্ভাবনা দেখিয়া পলায়ন শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।—লেখক।

শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারেনা বলিয়া আমার বিশ্বাস; কেননা ইহা টিঁকিবার যোগ্য নয়। শেষ পর্য্যন্ত না এই হালের অসমমাত্রিক ছন্দ এমন সকল সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করিয়া তোলে যাদের পাশে প্রাচীন বড় বড় ওস্তাদ্ গায়ন্ কবিদের সৃষ্টি পরিষ্কার নীচের দরে পড়িয়া যায়, সে পর্য্যন্ত হেরি জিৎ স্বীকার করা যায় না।...

"কানটাকে চট্ করিয়া দখল করিয়া বসে এমনতর ছন্দে-গাঁথা মনোহারী ভাষায় যে বাক্য লেখা হয়, তাকেই সাধারণতঃ আমরা কবিতা নাম দেই। কিন্তু ছন্দের চলার সঙ্গে ভাষার খানিকটা জোর-বলাকে জুড়িয়া দিলেই সেটা উচ্চ দরের কাব্যকলা হয় না। সেটা কাব্যের বাহ্য রূপ বা ছায়া হইতে পারে, তার স্বরূপ বা কায়া হয় না।

"বিশেষ শক্তিমান কবিরা—সময়ে সময়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কবিরা—একটা বাঁধা হার্ম্মণি বা রাগসঙ্গতি কিম্বা একটা বাঁধা মেলডি বা একটানা রাগরাগিণীতে গান বাঁধিয়া খুসি থাকেন। বাইরের কাণে সে সুর মধুর; আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধকেও সে একরকম সরল বৈশিষ্ট্যহীন সুখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। এই সহজ রাগ-সঙ্গতি বা রাগিণীর ছাঁচে কবিরা তাঁদের পূর্য্যমান, ধাবমান কল্পনাকে অবাধে ঢালিয়া দেন—আর-কোন নিবিড়তর উৎকর্ষের প্রয়োজন তাঁরা অনুভবই করেন না। এরকম কবিতাকে আমরা সুন্দর কবিতা বলি; আমাদের রসবোধ, কল্পনা, কান সমস্তকেই ইহা পরিতৃপ্ত করে—কিন্তু ঐ খানেই ইহার মোহিনীশক্তির অবসান। একবার ইহার ছন্দ শুনিলে আর নূতন কিছু প্রত্যাশা করিবার থাকেনা; ভিতরকার কানের দ্বারে নব নব বিস্ময় দেখা দেয় না; আত্মার পক্ষে অজানা গভীরতার ভিতরে সহসা প্রবাহিত হইয়া যাইবার কোন বিপদ্ দেখা যায় না।"

কবিতা সম্বন্ধে এই সুন্দর আলোচনায় vers libre বা অসম-মাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে অরবিন্দ বাবু সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সমমাত্রিক ছন্দে রচিত প্রাচীন উৎকৃষ্ট সকল কাব্যের পাশে অসমমাত্রিক ছন্দে রচিত হালের কাব্যগুলিকে তুলনায় খাটো হইতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু তার কারণ ইহা নয় যে এ ছন্দের ভাবী উৎকর্ষের সম্ভাবনাই নাই; বরং তার কারণ এই যে, সে সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার মত কবি-প্রতিভা ইউরোপে এখনো দেখা দেয় নাই। যেমন ধরুন, বিখ্যাত আধুনিক লেখক Emile Varhaaren তাঁর নাট্যে ও কাব্যে এই অসমমাত্রিক ছন্দ বা vers libre ব্যবহার করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবে তাঁর প্রতিভা উচ্চদরের নয়; সেই জন্য বড় বড় গুণী ওস্তাদের সৃষ্টির পাশে তাঁকে দাঁড় করাইতে গেলে তাঁর ছন্দের সুর অত্যন্ত চিমে আওয়াজ দিতে থাকিবে। অরবিন্দ বাবু কাব্যে যে "intensest rhythm" বা নিবিড়তম ছন্দের আন্দোল-লীলা দেখিতে চান্, সে ধরণের কাব্য পৃথিবীতে যে বিরল তাহা তিনি নিজেই কবুল করিয়াছেন। vers libre ছন্দে সেই একান্ত নিবিড়তাকে, সেই নব নব বিস্ময়কে, এখনি এই দণ্ডেই

প্রত্যাশা করা চলে না। কেননা,এ ছন্দবাহনের যোগ্য দেবতা এখনো দেখা দেন্ নাই।

তবে যদি কোন দেশে এমন কোন বড় কবি থাকেন যিনি সমমাত্রিক ছন্দে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া তার পরে অসমমাত্রিক ছন্দকেও আয়ত্ত করিয়া তার ভিতরকার রহস্যগুলিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাব্যামোদীর পক্ষে এই দুই ছন্দের প্রকৃতির পার্থক্যটা কোথায় তাহা দেখিবার একটা চমৎকার সুযোগ হয়। বাংলা দেশে কবি রবীন্দ্রনাথ "গীতালি" পর্য্যন্ত সমমাত্রিক ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া "বলাকা" হইতে তাঁর আধুনিকতম কবিতাগুলিতে অসমমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁর কাব্যে এই দুই ছন্দেরই সমান উৎকর্ষ দেখা যায়। তবে দুয়ের স্বাদ একেবারে ভিন্ন।

অরবিন্দবাবু যে লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ কবিই বাঁধা ছন্দে কাব্য লিখিয়া তৃপ্ত থাকেন এবং সে ছন্দ তার ধ্বনিমাধুর্য্যে কানকে সুখ দেয়, রসবোধকে তৃপ্তি দেয় এবং কল্পনাকে মুগ্ধ করে—তার প্রমাণ তো স্বয়ং রবিবাবুর চিত্রা, সোনারতরী প্রভৃতি কাব্য-গুলিই বটে। কিন্তু তিনি যাকে "highest intensest rhythm" বলিয়াছেন,—যে নিবিড় ছন্দে প্রত্যেক ধ্বনিটিরই একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে, বাঁধা ঢালা ছন্দে সে ঐ-কান্তিকতা সে ধ্বনিবৈশিষ্ট্য থাকে কৈ? কোথাও বা ধ্বনির সংরুদ্ধ বিরতি, কোথাও বা তার উচ্ছ্বসিত স্ফীত বিস্তৃতি,—কোথাও তাহা মুখর কোথাও মন্থর; কোথাও কৌতুকে হাস্যে দ্রুত কোথাও বা বিষাদে বিলম্বিত বা স্তম্ভিত—বাঁধা ছন্দে এত বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে কি? বরং দেখি যে রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক ছন্দেই এই বৈচিত্র্যগুলি অধিকতর দীপ্যমান—সমমাত্রিক ছন্দে এত বৈচিত্র্য, পদে-পদেই এত বিস্ময় ত ছিলনা। বাঁধা রাজপথ এবং গ্রামের পায়ে পায়ে চিহ্নিত আঁকা-বাঁকা মেঠোপথের মধ্যে যে প্রভেদ, বাঁধা ছন্দ এবং অসমমাত্রিক এই বাঁধাবাঁধনহীন ছন্দের মধ্যে সেই প্রভেদ। মেঠো পথের প্রত্যেকটি বাঁক মনকে আর ফাঁক দেয়না, বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। বাঁধা পথের সরল ঔদার্য্য পদে-পদেই ঔৎসুক্য জাগায় না—একেবারেই মনকে ঘরের কোন্ হইতে টানিয়া বাহির করে।

বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার রচনাই চল্‌তি হইতে শীঘ্র চায়না; সুতরাং এই সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া ছন্দ বাঙালীর কানে অত্যন্ত হইয়া তার মনে রসোদ্রেক করিবে, তার যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, ভারতবর্ষের একমাত্র সাধনা ছিল মুক্তি-সাধনা। সেইজন্য কি সমাজে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সঙ্গীতে, মুক্তির নাম শুনিলেই ধৈর্য্যরক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। মুক্তি সম্বন্ধে ইংরাজীতে যাকে বলে sensitive —আমরা তাই। ওটা আমাদের সহ্য হয়না। ওটা যক্ষের ধনের মত;—ওকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছি—খাটাইয়া খাইতে সাহস হয়না।

আধুনিক ফেরঙ্গ যুগের দুইজন কবি ছন্দকেও মুক্তি দিবার জন্য [illegible] সরস্বতীর

য়ের বাঁধামাত্রার বেড়ি খুলিয়া দিয়াছেন ং তার গতিকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। জন মাইকেল, আর একজন রবীন্দ্রনাথ। জনের মধ্যে আর-কোনজায়গায় মিল না ক্—দুজনেই বিধর্ম্মী ও ফেরঙ্গ-ভাববিশিষ্ট বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর দুজনেই রাজদ্রোহী, সুতরাং দণ্ডের যোগ্য। অথচ খের বিষয় এই যে, দুজনেরই ঠিক সমকক্ষ তিদ্বন্দ্বী পাওয়া যায়না। পাওয়া গেলে কতকটা সান্ত্বনার কারণ ছিল।

অতএব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সমস্ত নকল যেমন নাকাল হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের এই অসমমাত্রিক বন্ধনমুক্ত ছন্দের নকলও যথেষ্ট সফল হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এস্‌রাজের পর্দ্দা বাঁধা; সেখান হইতে সুর আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সারঙ্গী বা সেতার হইতে সুর আদায় করা কঠিন, সেখানে যে বাঁধা পথ নাই।

বিরামযতির সংস্থান-বৈচিত্র্যের জন্যই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল্য। হেমচন্দ্র সেই বৈচিত্র্যকে ধুইয়া মুছিয়া পয়ারের মত ৮।৬ ভাগে অত্যন্ত ধ্যাব্‌ড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ বৃত্রসংহারে চালাইলেন। তাতে বৃত্র অসুর সংহার হৌক্ আর না হৌক্, কাব্য-সুরের সংহার হইয়া গেল।

আশঙ্কা হয় যে লম্বালম্বা পংক্তিতে এবং যা-তা মিল দিয়া এ vers libre ছন্দেরও চলন অচিরাৎ দাঁড়াইবে। কিন্তু যারা এই সব নূতন সুর কাব্য লিখিবে, নিশ্চয়ই তারা বাহবা পাইবে।

রচনার নমুনা

"আমায় কেহ বলিতে পার, কেন বাঙ্গালাদেশ হইতে বাঙ্গালী চলিয়া গেল? কোন্ পাপে? কিসে বাঙ্গালী সব হারাইল? এত যদি সংস্কার, এত যদি বিরাট্ এবং ইত্যাদি, তবে এবং তবু অর্থাৎ তথাপি, আজ সে বাঙ্গালীর এ দশা কেন?

* * * *

"নারায়ণ রথে উঠিয়াছেন। তাঁহার রথ চলিবে। পক্কাসুতা, এমন কি মিনিসুতার টানেও এ রথ চলিবে। থামিবে না। *-* *

* * * *

"বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্য একে একে ধাপে ধাপে কি করিয়া সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে... আমি গাধার চীৎকারে বাঙ্গালীকে তাহাই শুনাইতে দাঁড়াইয়াছি।"

—নারায়ণ, চৈত্র সংখ্যা ১৩২৪।

এই শেষ পংক্তিটা পড়িয়া বুঝা গেল বাংলাদেশ ছাড়িয়া বাঙালী কেন চলিয়া গেছে।

সমাজের স্থিতি ও উন্নতি

বৈশাখ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'সমাজের স্থিতি ও উন্নতি' শীর্ষক এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সমাজের ধ্বংস-নিবৃত্তি কি কি উপায়ে হইতে পারে প্রধানত সেই বিষয়েই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:—

"বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতাই সামাজিক অবনতির এবং পরিণামে ধ্বংসের প্রধান কারণ। অর্থাৎ ঐরূপ প্রতিযোগিতায় পড়িয়া যে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে সমাজ ক্রমে অবনত এবং শেষে ধ্বংস হইয়া

যায়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে প্রতিযোগী সম্প্রদায় অথবা জাতির উপর জয়ী হইতেই হইবে! নচেৎ ধ্বংস নিবারণের কোন উপায় নাই। স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা করা আপনা-আপনি বলক্ষয় করা মাত্র। সুতরাং সমাজপতিগণের কর্ত্তব্য যে, স্বসমাজ ও স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা যথাসম্ভব হ্রাস করা। এইরূপে স্ব-সমাজ বলী হইতে পারে এবং অপর সমাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে জয়যুক্ত হইতে পারে।" * * * *

"সমাজ-ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ, চিরাগত আচার ব্যবহারের ও প্রণালীর সম্যক্ পরিবর্ত্তন। মহাত্মা ডারুইন অসভ্য ও সভ্য সমাজ—উভয়ের সম্বন্ধেই এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।" * * * *

"ডারুইন সভ্যজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,... ... "সভ্যজাতিগণ গৃহপালিত জন্তুর ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যেও চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে কখন কখন জননশক্তিহীনতা উৎপন্ন হইয়া থাকে;" এই মহাবাক্য সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। কোনও প্রসিদ্ধ ও সুপণ্ডিত বিলাত-ফেরতের সহিত একদিন এই সাহেবিয়ানা সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়। তিনি উপরের উক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহার পিতার যেরূপ দীর্ঘায়ু ও বহু-সন্তান-জনন-ক্ষমতা ছিল, তাঁহার সেরূপ ছিল না। তাঁহার অপত্যগণ প্রায় সকলেই অল্প বয়সে মারা যান।" * * * * *

"সমাজস্থিতির মূল ও শেষ কথা ধর্ম্ম। যে জাতির অস্থিমজ্জা মধ্যে ধর্ম্মভাব, সে জাতি কালজয়ী। হিন্দুজাতি তাহাই।" * * * *

লেখকের এ আলোচনাকে কোনমতেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলিতে পারিনা।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার দরুণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অনেক সমাজ যে লোপ পায়, তার উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর মেলে। পরজাতির আক্রমণে অভিভূত হইয়া প্রাচীনকালে বিস্তর জাতি ধ্বংস পাইয়াছে। হঠাৎ যদি কোন সমাজে আবহমান সমস্ত রীতিনীতি ও ব্যবস্থা উলোট পালোট হইয়া যায়, তবেও ধ্বংস লক্ষ্য করা যায়। নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের উদাহরণ ডারুইন দিয়াছেন, লেখকও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান্‌দের ধ্বংসেরও ঐ একই কারণ। নূতন অবস্থার সঙ্গে তাদের ভাল করিয়া বনিবনাও হইতেছেনা বলিয়াই তাদের মধ্যে জননশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া সমস্ত জাতিটাই মৃত্যুমুখে পড়িয়া গেছে।

সমাজ-তত্ত্বের এই সকল মূল সত্যগুলি লইয়া লেখকের সঙ্গে কারো বিবাদ হইতে পারে না। কিন্তু দেশকালপাত্র-ভেদে এই সত্যগুলির রূপ-বৈচিত্র্য না দেখিয়া যখন তখন তাহাদিগকে আমাদের দেশীয় সমাজের উপর নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হয় বলিয়াই বিবাদ ঘটে। কেননা, তখন যে বৈজ্ঞানিক সতর্কতা আবশ্যক, তথা সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক তার অভাব পদে-পদেই লক্ষ্য করা যায়। যথেষ্ট সমীক্ষা ও পরীক্ষা (observation and experiment) ভিন্ন কোন অন্বীক্ষার (inference) বৈজ্ঞানিক মূল্য কতটুকু? বিজ্ঞানে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা হাইপথিসিস্ খাড়া করিতে গেলেও বিস্তর তথ্য জড় করিয়া ও পরীক্ষা করিয়া তবে সেটা খাড়া করা সম্ভাবনীয় হয়।

যেমন, লেখকের জনৈক বিলাত-ফেরত বন্ধুর পিতা দীর্ঘায়ু ও বহু সন্তানের জনক ছিলেন, কিন্তু ঐ বন্ধুটির নিজ পিতার মত

য়ু ও বহু সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা
া যায় নাই এবং তাঁর ছেলেরাও
বয়সে মারা গিয়াছে। অতএব এইরূপ
একটি দৃষ্টান্তের উপর র করিয়া যদি
ান্ত করা যায় যে 'চিরাগত আচার
বহারের পরিবর্ত্তনে' জননশক্তি ক্রমশঃ
ণ হয়'—এই তো তার হাতে হাতেই
াণ—তবে সেটাকে কি বৈজ্ঞানিক
ান্ত বলিতে পারি? প্রাকৃত-জনের
জ্ঞতাসুলভ অন্বীক্ষার সঙ্গে ইহার তফাৎটা
থায়? বিলাত-ফেরত বন্ধুটির যথেষ্ট সন্তান
হওয়ার কত রকমের কারণ থাকিতে পারে
-তারপর, কারণটা তাঁর দিক্ দিয়া না হইয়া
ার স্ত্রীর দিক্ দিয়াও হইতে পারে। তাঁর
ননশক্তির হীনতাই যে বহু সন্তান
া হওয়ার একমাত্র কারণ একথা
লেখকের কেন মনে হইল? আমরা
মন বিস্তর বাঙালী সাহেবকে জানি
াদের পিতা পিতামহ হইতে তাঁদের
রমায়ুও কম নয় এবং সন্তান-জননক্ষমতাও
বিন্দুমাত্র কম নয়। সুতরাং বিলাতী আচার
ব্যবহার হিন্দু সমাজে কতক কতক প্রবেশ
করিয়াছে বলিয়াই যে হিন্দুজাতির মধ্যে
জন্মের হার কমিয়া যাইতেছে, এ সিদ্ধান্ত
একটা শূন্য কল্পনামাত্র—একে বৈজ্ঞানিক
সিদ্ধান্ত বলিয়া খাড়া করা চলে না।

বরং আমাদের সাবেক গ্রাম্য জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা যে একালের সহুরে ব্যয়সাধ্য শিক্ষাদীক্ষা আইন আদালত কর্ম্ম-ব্যবসায় প্রভৃতির হঠাৎ আমদানিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ার দরুণ আমাদের পরিবার ও সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নূতন অবস্থার সঙ্গে তাদের ভাল করিয়া বনিবনাও হইতেছে না—এবং এই কারণেই আমাদের প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, ডারুইনের সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-হিসাবে এ কথা বলা চলিত। কেননা, স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের অভাব বাড়িয়াছে, অথচ পূরণের উপায় নাই—আমাদের আদর্শের বদল হইয়াছে, কিন্তু তার উপযুক্ত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গেছে, অথচ রাষ্ট্রীয় সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই। জমি ছাড়িলাম, ভিটা ছাড়িলাম; অথচ শাসন-শিল্প-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হইল না। এইজন্য আমাদের খাদ্যের অভাবের চেয়েও শক্তির অভাব, স্ফূর্ত্তির অভাব অনেক বেশি। সমস্ত দেশ নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ। এইটেই যথার্থ "আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন।" তার পর কেউ টিকি রাখেন কি কেউ রাখেন না, কেউ ধুতি পরেন কি কেউ পরেন না, কেউ হাতে খান কি কেউ কাঁটা চাম্‌চেয় খান—এসব তুচ্ছ আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে জননশক্তি বাড়েওনা কমেও না। এগুলি অবান্তর।

কোন সভ্য প্রাচীন সমাজই সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকাল ধরিয়া পরানুকরণ করিতে পারে না; সে পরজাতির সংঘর্ষে পরজাতির সম্পদকে আয়ত্ত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে চেষ্টা করে। যে পরিমাণে সে আত্মসাৎ করিতে পারে, সেই পরিমাণে সে বল লাভ করে। জাপানে বিজাতীয় পরিচ্ছদ, ক্রীড়া কৌতুক, এমন কি বিজাতীয় ধর্ম্মমতও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—তাই বলিয়া

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কি জাপানের নিজস্ব প্রকৃতি কিছু নাই? সেকি ইউরোপীয় জাতির অনুকরণ মাত্র? উপর উপর দেখিলে তাহাই মনে হইতে পারে; কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সে একদিকে প্রাচীন অন্যদিকে নবীন —সে তার পুরাণো রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে এ কালের সভ্যতার নূতন নূতন ভাব ও সংস্কারকে মিশ্‌ খাওয়াইবার মস্ত সাধনায় রত আছে। জাপানের অন্তর্নিহিত মর্ম্মস্থানে 'জাপানী সভ্যতা' বলিয়া যদি কোন বিশিষ্ট পদার্থ না থাকে, তবে জাপান যে অনুকরণ করিতেছে সে বুদ্বুদের মত একদিন আপনাকেই আপনি ফাটাইয়া ফেলিবে। আর যদি তার নিজস্ব কোন প্রকৃতি থাকে, তবে সে এই কালের তাপে নূতন করিয়া মঞ্জরিত হইবে—নব বিকাশ লাভ করিবে। আজ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই জাতি-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীনে নবীনে বোঝাপড়া চলিতেছে। অমন প্রাচীন চীনেরও টিকি কাটা পড়িল; নবযুগের জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এই প্রবল সংঘাতে প্রাচীন মরিবেনা, নবজীবন লাভ করিবে—অবশ্য যদি তার মধ্যে জীবনের বীজ কোথাও লুকানো থাকে।

ডারুইন বলিয়াছেন ভবিষ্য সমাজে "virtue will be triumphant"—অতএব লেখকের মতন যদি সিদ্ধান্ত করি যে, হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রাণ, তাহা কোন কালে মরিবে না—তবে সে কথা ডারুইনের মতে পোষক হয় কি? কেননা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম একালে প্রাণধর্ম্ম কি জড়ধর্ম্ম তাহাই গোড়ায় বিচার্য্য। ডারুইন একথা কোথাও বলেন নাই যে যারা জড়ধর্ম্মী তারাই সমাজের স্থিতির সহায় হইবে। মানিলাম যে, হিন্দু এক সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ছিল —তখন সে অধ্যাত্ম সাধনার চরমতম শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু তার সাধনার ধারাবাহিকতা কোথায়, এ কালের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র কোথায়? হিন্দুর ধর্ম্ম যখন পুঁথির বা প্রথার জিনিস ছিল না, তখনই হিন্দুর দ্বারে সমস্ত এশিয়া শিক্ষার্থী বেশে আসিয়াছিল। এই ধর্ম্ম সভ্যতার প্রাণবীজ তখন দেশ বিদেশে নীত হইয়া নব-নব সভ্যতার মহীরুহ সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দুর সেই ধর্ম্ম যদি এখনও প্রাণের জিনিস থাকিত, তবে তার সমাজ এমন বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন হইত না। কালের বিপুল পদক্ষেপের সঙ্গে হিন্দু আজ আর তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। পর জাতির দ্বারা অভিভব নহে, পর জাতিকে আত্মসাৎ করিবার মন্ত্রই আজ হিন্দুর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে ধ্বংস হইতে এ জাতিকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.



স্রোতের মুখে
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪২শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৫ [৩য় সংখ্যা

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;—
থাম্‌ল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থাম্‌ল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝর্‌ঝরানি ;
সূর্য্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল একনিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণ-পারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেচে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগর মাঝে আর কি তুফান তোলে ?
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হ'ত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস্ কি তুই" বলে' ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠ্‌ত যেন টলে'।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক্ ডাক্
ঢাক-ভরা মৌমাছির মত উড়ে গেছে শূন্য করে' চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন ?"

সবাই তারে দুষ্টু বল্‌ত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত, শাসন বিনা বড় হলে ঘটাবে আপশোষ।
সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে'
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জ্জে' ছুটে'
বারে বারে ফিরে ফিরে ফুলে' ফুলে কূলে কূলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তা'র দুষ্টু মিটি তেম্‌নি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে',
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে'।
বয়সের এই পর্দ্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে ;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথী ছিলেম সকল প্রাণে মনে।
আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে
উঠ্‌ত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।

পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে' গাছের ডালে
দুপুর বেলায় খেয়েছি আমি করে' কাড়াকাড়ি,—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বল্‌ত তারে
"দেখিস্‌নে তোর বাবা আছেন কাজে ?"
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত, আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায় ;
মনে হ'ত "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায় !"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথী
মনে হল এতদিনে বুড়ো-বয়সখানা
পূরল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চল্‌ব এবার প্রবীণতার 'পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়বে মন লেখার খাতার শুক্‌নো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চল্‌বে আলোচনা
কেবলি সৎপরামর্শ কেবলি সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েচে মোর চৌকি টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টি কতে নাহি পারি ;
বৈরাগ্যে মন-ভারী
উঠোনেতে করছিনু পায়চারী।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মত বুকের পরে পড়ল আমার ঝেঁপে।
চমক লাগল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
আমি শুধাই, "কে রে, কি রে?"
"আমি ভোলা" সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়,
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি।
সে বল্লে "ঐ বাইরে তেঁতুল গাছে
ঘুড়ি আমার আট্‌কে আছে
ছাড়িয়ে দাওনা এসে।"
এই বলে সে
হাত ধরে মোর চল্ল নিয়ে টেনে।
ওরে ওরে এই মত যার হাজার হুকুম মেনে
কেটে ছিল ন'টা বছর তারি হুকুম আজো মর্ত্যতলে
ঘুরে বেড়ায় তেম্‌নি নানান ছলে!
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয়নি মোর কাজ!
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো!
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে!
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে',
আবার হঠাৎ উল্টে পড়ে'
দোয়াৎ হল খালি,
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি!
আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি,
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।
আমার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উল্টপাল্ট গণ্ডগোলের মাঝে
ফেলা-ছড়া ভাঙাচোরার পর
আমার প্রাণের চির-বালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্ট ও কবিত্ব

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বঙ্গসাহিত্যের সুর যে একপর্দা চড়ে গিয়েছে, এ-সত্য সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট না হলেও, আমার বিশ্বাস, অসাধারণের কাছে আর অস্পষ্ট নেই; পৌরাণিক যুগের বেড়া টপ্‌কে গণ্যাগ্রতো সাহিত্যিকরা যে অতঃপর ঔপনিষদিক যুগের ফাঁকা ময়দানে এসে হাঁফ ছাড়বার উপক্রম করেছেন, এ কথা "সঙ্গীতের মুক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধেই বিঘোষিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের অর্থ হচ্ছে সেই যুগ, যা' কিছু-মুক্ত কিছু-বা-জড়িত—আর ঔপনিষদিক যুগ হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্তির যুগ।

এতদিন যে কবিত্ব-জ্যোৎস্নার বন্যার উপর দিয়ে আমরা আধজাগা ঘুমঘোরে ভেসে আসছিলুম, আজ যদি তা বিশুদ্ধ আর্টের দিবালোকে কেন্দ্রস্থ হবার উপক্রমই করে' থাকে তা'হলে আমাদের দুঃখ পাবার কথা নয়,—কিন্তু দুঃখ যে পাচ্ছি, সে শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির আশ্বাস-বাণীতে পুরো বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি নে বলে।

যে-যুগ সম্মুখে এসে সবেমাত্র দাঁড়াচ্ছে, সেই art for arts sakeএর যুগ-সম্বন্ধে যদি এমন কথা আজ শোনা যায় যে, তা' বাতিলই হ'য়ে গিয়েছে—তা' হ'লে এই ভেবে মানুষের চোখ স্বভাবতঃই বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, যে এরই মধ্যে সে এলই বা কবে আর গেলই বা কোথায়?

রূপের জন্যে বা রূপোর জন্যে প্রেম বুঝতে পারা যায়,—কিন্তু 'প্রেমের জন্যেই প্রেম' যে নিতান্তই বাজে কথা তাতে সন্দেহ করবার লোক খুবই কম সত্য; তবু যাকে আরম্ভ করবার জন্যেই এত চেষ্টার পর চেষ্টা, আজ যদি তা' আকার লাভ করে' থাকে, তা' হলে রাগ করে' তাকে অস্বীকার করতে চেয়ে আমরা অস্বীকৃত রাখ্‌তে পারব কি? এই art for arts sakeএর যুগ-

সম্বন্ধে কি বোঝা চল্‌তে পারে, তা' দেখবার আগে কি বুঝ্‌তে চাওয়া গিয়েছে, তাই দেখি :—

আমরা স্বীকার করেছি যে একালের অধিকাংশ কলাসৃষ্টিতে 'সমস্তার বিচিত্রতা' থাক্‌লেও 'রসের অখণ্ডতা' নেই, এবং তার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যা' নির্ণয় কর্‌তে চেয়েছি তা' এই :—

"একালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলিকে যখন কতকটা নির্লিপ্তভাবে দূরে স্থাপন করিয়া সমগ্র-দৃষ্টিতে আর্টিষ্ট দেখিতে পারিবেন, তখনই আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে নিত্যরসের আভাস জাগিবে। সেই পরিপ্রেক্ষণটী না থাকার জন্য একালের অধিকাংশ কলাসৃষ্টিতেই সমস্তার বিচিত্রতা আছে বটে কিন্তু রসের অখণ্ডতা নাই। কিন্তু তার কারণ এই যে আর্টের পরিধিটা হঠাৎ বিস্তৃত হইয়াছে; এ-যুগে আর্টসৃষ্টি বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্টের চর্চ্চা এখন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।"

পরিপ্রেক্ষণটির অভাবই যে রসের অখণ্ডতাটিকে বেষ্টন করে' ধর্‌তে না পারবার কারণ, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু ঐ অভাবটাই যে বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টি করবার জন্যে অত্যাবশ্যক, এ-কথা বল্‌লে একটু অনাসৃষ্টি কথাই বলা হয়! কেন, তা' বলি :—

আমাদের ধারণা ছিল যে কেন্দ্রচ্যুত মানব-সভ্যতা এতাবৎকাল তার সভ্যতা-বুদ্ধিকে কেন্দ্রস্থ করবারই পথ খুঁজে আসছে; —তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত তা' দূরেই সরে চলেছে (কেননা কেন্দ্র থেকে যত [illegible] যাওয়া যায় ততই পরিধি বৃহত্তর হয়ে থাকে) তা' হলেও কথা দাঁড়ায় এই যে, 'পরি[illegible] যদি তা' হয় তবে 'অখণ্ড' না হয় কেন্দ্র end থেকে বা কেন্দ্র থেকে যদি দৃষ্টিনিক্ষে[illegible] করা যায়, তবে সে দৃষ্টির পরিধি যতদূরে যাক্ না কেন, রসের অখণ্ডতাটি থাকবেই তার মধ্যে!

দ্বিতীয়তঃ, 'নির্লিপ্ততা' বা 'সমগ্রদৃষ্টি[illegible] দেখা' ব্যাপারটির যে অর্থ নির্দ্দেশ [illegible] হয়েছে, তাতেও অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা। দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে হিমালয়-শীর্ষ সর্ব্ব কালের বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ পাশ কাটি[illegible] স্থানুর মতন বসে (সম্ভবতঃ) হাই তুলছে; ওকে যদি আমরা আর্টিষ্ট ভাবি, তা হলে আর্টের ধর্ম্মকে হীন করতে পার[illegible] না; কিন্তু আপনআপন বিচার-শক্তিরই জড়ত্ব প্রকাশ করবো! আর্টিষ্টের জাগ্রৎ-দৃষ্টি সমগ্রকে নির্লিপ্ততার মধ্যে দেখা, আর জড়ত্বের নির্লিপ্ত-দৃষ্টিহীনতায় 'কোনো কিছুকেই দেখ্‌তে না চাওয়া' ঘুলিয়ে ফেলে লাভ নেই।

তা ছাড়া, গুটি-আষ্টেক লাইনের মধ্যেই, আর্টের আসন একবার সুদূর ভবিষ্যতে নির্দ্দেশ করে' ('কালের বিক্ষোভে' মাথা ঠিক রাখতে না পারার দরুণ) যদি ঐ দূর-ভবিষ্যৎকে "এখন আর" বাক্য-যোগে আবার অতীতের দিকে একদম ঘুরিয়ে দিই—ত' হলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে এ-সাহিত্য দুদিনেই প্রলাপে পরিণত হবে।

রহস্য যাক্—আমার বিশ্বাস, ঐ-সাহিত্যের

[illegible]রিষ্যৎ যুগ আর্টেরই যুগ হবে, এবং তা' [illegible] কারণে যে, কবিত্ব তার চরম পরিণতি [illegible]ত করেছে। এখন ওদিকে কেউই কিছু [illegible]সর করতে পারবেন না; যা' পারবেন [illegible]' শুধু দাগা বুলতে, আর না হয় এমন [illegible]ছু গড়্‌তে যা' কাব্য-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য [illegible]ড়াবে না, জায়গা জুড়বে মাত্র। এখন [illegible]খা যাক্—কবিত্ব ও আর্টে তফাৎটা [illegible]:—

(ক)

[illegible] বিশ্ব-বস্তুর সীমাগুলিকে আকুল মনের [illegible]পর তুলে নিয়ে তার মধ্যে অসীমের সুর [illegible]াজিয়ে তোলার নাম কবিত্ব। ভোগও [illegible]র্দ্বস্ব মনে হচ্ছে না, অথচ যোগও পরিপূর্ণ [illegible]য়ে উঠছে না—এই অবস্থায় যা সম্ভব, তাই [illegible]বিত্ব। আর আর্ট কথাটির যদি কোনো [illegible]র্থ থাকে তবে সে অর্থ হচ্ছে—যাবতীয় [illegible]বন্ধনের লিপ্ততাকে মুক্তির নির্লিপ্ততায় [illegible]উদ্ভাসিত করে' তোলবার শক্তি। এর চেয়ে সোজা, সঠিক ও পরিষ্কার বাংলায় ও-শব্দদুটির মানে বোঝানো যায় কি না তা' আমাদের অজ্ঞাত।

কালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারকে পাশ কাটানো নয়—কিন্তু শিবের মতন ঐ বিক্ষোভের বিষ গলাধঃকরণ করে' নির্বিকার নির্লিপ্ততায় তাকে অমৃত-পরিণাম দান করাই আর্টিষ্টের কাজ; অপর কথায় সমস্ত অনিত্যতাকে নির্লিপ্ততার নিত্য রসে যুক্ত করে' মুক্তি দেবার শক্তিই আর্ট।

সত্যকথা যে, যে-যুগের বেড়া আমরা [illegible]টকে এলুম সে-যুগের সৃষ্টি বিচিত্র হলেও [illegible]টুকরো টুকরো ছিল—আর, আমরা অধিকাংশ লেখকই আজ পর্য্যন্ত ঐ টুক্‌রো সৃষ্টিরই জের টেনে চলেছি। এর কারণ, যেখান থেকে জাল ফেল্‌লে সমস্তটাই গুটিয়ে তোলা যায় সে-জায়গাটার সচিত্র চেহারা ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নি—আর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলেও, গ্রাহ্য করে' নিতে আমাদের এমন একটা জায়গায় টান পড়ছে যা' সব-চেয়ে-বেশী মোহের জায়গা।

এতদিন আমাদের 'পথটী চিনে চিনে'ই কেন্দ্রের দিকে এগুতে হচ্ছিল—এ-কাজে একটা মস্ত-বড় সুবিধা ছিল এই যে মনোজগতের সমস্ত স্তরই আমাদের আকুল-হয়ে-চলার ছোঁয়াচ লেগে স্থিতিশীলতা পরিহার করতে বাধ্য হচ্ছিল। সম্প্রতি আমাদের কবিত্বের আহ্বানে কেন্দ্রের দিক থেকেও একটা শক্তিকে নেমে আস্‌তে দেখা যাচ্ছে—এ-শক্তিটির মধ্যে মনোরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম details নেই, কিন্তু ঐ মনখানাকে সবসুদ্ধ ই গিলে ফেল্‌বার একটা অপূর্ব্ব-পরিচিত শক্তি আছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে বল্‌তে পারা যায় যে জ্ঞানে ও প্রেমে আর্টে ও কবিত্বে, শক্তিবাদে ও ভক্তিবাদে শুভসম্মিলন ঘটবার মাহেন্দ্রক্ষণ আগত-প্রায়। কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট কর্‌ছি।

কবির কাজ—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা; আর্টিষ্টের কাজ—চাতুর্য্য বৃষ্টি করা। যাঁদের মতে 'সৌন্দর্য্য' অর্থে আকাশকুসুম-বৎ অলীক ও অনাবশ্যক একটা কিছু, আর 'চাতুর্য্য' অর্থে Sly Foxএরই অনুরূপ কোনো একটা গুণ, তাঁদের কথা বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ঐ দুটি বিরুদ্ধ ব্যাপারই অল্পাধিক-পরিমাণে চর্চ্চার ফলে নিজের

অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া-সম্বন্ধে আমরা কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছি, তারই উপর নির্ভর করে' রহস্যটা জানাচ্ছি।

সৌন্দর্য্যের ধারণ-ক্ষেত্র মানুষের মন; কবি তাঁর অন্তরের মধ্যে যে প্রণালীতে বহির্জগৎকে ভোগ করেন তা' বিমোহন করে' তুলে পাঠকদের মন মুগ্ধ করেন। চাতুর্য্যের প্রেরণ-ক্ষেত্র মানুষের প্রজ্ঞা; আর্টিষ্ট তাঁর আত্মার সঙ্গে যে প্রাণালীতে ঐ বহির্জগৎটা যোগ করেন পাঠকের প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তা' প্রেরণ করে' তাদের মুক্ত করতে থাকেন।

Intellectএর শিখাটির সাম্নে বিশ্ব-বৈষম্যে-ভরা মনখানাকে বিছিয়ে দিয়ে যখন আমরা সেটিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করে' তুলি, তখন পাঠকের মনেও অনুরূপ বর্ণ-প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। এতে তাঁর মনের বৈষম্য দিন দিন বৈচিত্র্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বোধের মিষ্ট সান্ত্বনা আসে। কিন্তু কবির সঙ্গে পাঠকের যে উপভোগ-পার্থক্যটি এখানে ঘটে, তা' বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার জিনিস—কেননা, আর্ট সম্বন্ধে পরে যা' বলবো, এই পার্থক্যটির স্পষ্ট ধারণা তা' গ্রাহ্য করবার পক্ষে দরকার হবে।

কবি যখন প্রজ্ঞার যাদুদণ্ড-সাহায্যে তাঁর স্মৃতিচিত্রগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে থাকেন তখন তাঁর মনের অন্দর-পিটে বহির কাজ চলে বটে, কিন্তু সদরপিট ঐ বহ্নিটি চেপে দীপ্তিটাকে মাত্র ছাড়পত্র দেয়। এতে ফল হয় এই যে, কবিকে যে-সৃষ্টি মুক্তির দিকে টানে, পাঠককে সেই একই সৃষ্টি মোহের দিকে ঠেলে। কবি যে ইচ্ছা করে' তাঁর পাঠককে Hypnotise ক তা' সত্য নয়, তবে পাকেচক্রে ব্যাপা দাঁড়িয়ে যায় তাই—কেননা, ও-কাজের দস্তুর। যতক্ষণ মন জিনিসটা চাঁদের সূর্য্যালোককে আড়াল করে' থাকে বহির্জগৎ তাকে ভোগ্য যোগায়, তত কবিত্ব। জগতের দিক থেকে শেষ-ব্রহ্ম গ্রন্থিটিও যখন মনের মধ্যে কাটা প যায়, তখন লঘুভার মন Intellectএর মিলে-মিশে গিয়ে তার direct raysকে এগিয়ে দেয়। প্রাণের যে আন সূর্য্যের ভিতর দিয়ে চাঁদে পড়ে' জগ সংসারকে জ্যোৎস্নায় মুড়ে দেখাচ্ছিল, অ পর তা পূর্ণরূপে সৌরমণ্ডলটি দেখাব সুযোগ পায়। ঐ মনের আনন্দ হ কবিত্ব—আর এই জ্ঞানের আনন্দের না আর্ট। এখানে মন চাঁদের কাজ করে কিন্তু আতস-কাঁচের কাজ করে—অর্থা কেন্দ্রীয় শিখাটিকেই মুক্তি দেয়। ব বাহুল্য, মন দিয়ে মনের মধ্যে যা দেওয়া যায় তা সাময়িক—কিন্তু brain-centreএ পৌছে দেওয়া যায় তা' চিরদিনের।

আমাদের বিশ্বাস, সত্ত্বগুণের শেষ জ্যোতি নিখিলেশের মস্তকে লণ্ডভাঘাত করে' ক বলতে চেয়েছেন যে তাঁর মানব-প্রকৃতি পরিদর্শন-কার্য্যটি শেষ হয়েছে। মানবজাতির জন্য idealise করবার মতন আর কিছু বাকি নেই। এখন ব্যক্তিগতভাবে যা তাঁর idealটি realised হয়, যাতে মা গুণ-যুক্ত স্বভাবকে অতিক্রম করে' তা সত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তা সহায়তা দরকার। কিন্তু কোথায়

স্বভাব, যেখানে মানুষ তার গুণযুক্ত স্বভাবকে অতিক্রম করে' আছে?

উত্তর—"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"। অতএব ঐ মূর্দ্ধা থেকেই অতঃপর আর্টের জাল নেমে আসুক। এখন যিনি সাহিত্য-সাম্রাজ্যে কবির উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর সৃষ্টির ক্রিয়া মানুষের মনকে আশ্রয় করে' আরম্ভ হবে বটে, কিন্তু সে-সৃষ্টিকার্য্যের শেষ যেখানে গিয়ে তার রেশ মিলিয়ে দেবে, সেটি যেন, হৃদয় না হয়ে মস্তিষ্ক হয়। এ-কার্য্যের ফল হবে এই যে, কবিসৃষ্ট আদর্শ-জগৎটি—যার বহির্দ্দেশকে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলগাড়ীর মতন বেষ্টন করে' করে' আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম,—অতঃপর আমাদিগকে চূড়ায় দাঁড় করিয়ে তার অন্তর্দ্দেশটিও দেখিয়ে দেবে। এক কথায়—এ চেষ্টার ফলে কবির idea ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে real হয়ে উঠ্‌বে।

(খ)

প্রবন্ধান্তরে বলেছি যে জগতে যাঁরা ভক্তিযোগী তাঁদেরই বলে কবি। এখন বলা যাক্—জগতে যাঁরা শক্তিসাধক তাঁরাই হচ্ছেন আর্টিষ্ট।

এই ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ বিবাদ কিম্বা প্রতিবাদ নয় সত্য, কিন্তু পরস্পরের অনুবাদও নয়। এর একটি অপরটিকে অনুপ্রাণিত করে না, করতে পারে না—কিন্তু দুটিকেই গুণধর্ম্ম অনুপ্রাণিত করে' থাকে। প্রথমটি দ্বৈতবুদ্ধিকে আশ্রয় করে' নীচু থেকে উপর-দিকে ওঠে, দ্বিতীয়টি অদ্বৈতবুদ্ধিকে অবলম্বন করে' উপর থেকে নীচুদিকে নামে।

ভক্তিবাদে—'মর্ত্ত্য স্বর্গে ওঠে প্রেমে'।

শক্তিবাদে—'মুক্তি স্বর্গে আসে নেমে'।

এ-কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে কবি 'মুক্তি চাহিনা হরি' বলে তাঁর ঐ ভক্তিপিপাসাতেই থেমে পড়তে বাধ্য, অথবা সর্ব্বসাধারণকে মুক্তিদান-কার্য্যটি সুদূর ভবিষ্যতে আর্টিষ্ট-কর্ত্তৃকই সম্ভাব্য। শক্তিবাদ যে মুক্তির আভাস ভক্তিবাদের 'জন্য বহন করে' আনে, তাকে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত করে' দেবার ভার কবিরই—কেননা বিশ্বের চিত্ত-বৈষম্যের সূত্রগুলি তাঁরই চিত্ত-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিধৃত। বস্তুতঃ, সাধারণ যদি কখনও মুক্তি পায়, তবে সে তার কবির হাত থেকেই তা' গ্রহণ করবে। কবি যাতে বাঁধা পড়ে' সকলকে বেঁধেছেন—কবিই যেদিন তাকে তুচ্ছ করে' বেরুবেন সেদিন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মুক্তির অগ্নিশিখা স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করবে। আর্টের যে আগুন আজ সাহিত্যে শিখা-বিস্তার করছে, কবির পরিণামেই তার বৈদ্যুতিক শক্তিকে আমরা জীবন্ত দেখে যেতে পারবো। ত্যাগী নিখিলেশকে যিনি বেদনার মধ্যে এঁকেছেন,—দেহাত্মিকা মতিকে নষ্ট করার অর্থ যে তাকে স্ত্রী-দেহাত্মিক মতিত্বে স্পষ্ট করা, এ-কথা যিনি প্রবলকণ্ঠে অস্বীকার করেছেন—নিখিল-রহস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা তাঁরই চরম আনন্দ থেকে দিগ্বিদিকে ঠিক্‌রে পড়বে।

কেউ কেউ মনে করেন যে চাতুর্য্য-চর্চ্চার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে অবহেলা করা হয়। প্রত্যুত্তরে যদি মনে করা যায় যে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার প্রতি বেশী ঝোঁক দিলে চাতুর্য্যকে বিবাগী করা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

হয়, তা' হলে ঐ মনে-করাকরি কালক্রমে মন-করাকবিতে পরিণত হয়ে মানব-জগতে শক্তিবাদ ও ভক্তিবাদের পুনর্বিরোধ সৃষ্টি করবে। বলা বাহুল্য, প্রাচীন মানব-সভ্যতার এই বিরাট ধ্বংস-লীলার সাম্‌নে দাঁড়িয়েও ও-কার্য্য আমাদের কাম্য হওয়া ঠিক হবে না,—অতএব ও-দুটিকেই সমান-ভাবে গ্রাহ্য করে' নিয়ে জীবনকে শক্ত ও সুন্দররূপে দাঁড় করানোই মঙ্গলের হবে।

অবশ্য অন্তরে ক্ষতুর হয়ে চতুর হতে চাওয়া দোষের—অপর-পক্ষে, হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চাওয়াও নির্দ্দোষের নয়। হুল লুকিয়ে মধু ছড়ানোর নাম কবিত্ব হলে মধু লুকিয়ে হুল ফোটানোর নামও আর্ট হবে। হুল হচ্ছে সেই লিপ্ততা যা' পাঠককে অচেতন করে, আর মধু হচ্ছে সেই নির্লিপ্ততা যা তাদের সচেতন করে' দেয়।

কবির আত্মপ্রকাশ সবিনয়—আর্টিষ্টের আত্মপ্রকাশ সাহঙ্কার। এর একটা যদি খাদ হয় তবে অপরটাও নি-খাদ নয়। একদিকে বিনয়ের hollow আছে—অপরদিকে অহঙ্কারের billow আছে; পরস্পরকে তিরস্কৃত করে'ই ও-দুটি মোক্ষলাভ করবে। আসল কথা এই যে, কবি ভক্তিবাদী হলেও অশক্ত নন, আর আর্টিষ্ট শক্তিবাদী হলেও অভক্ত নন,—তফাৎটা শুধু এই, কবিত্বে শক্তির মুখ ভিতর দিকে আর আর্টে ঐ মুখটিই বাইরের দিকে।

(গ)

এইমাত্র আর্টের যে-দিকটির কথা বললুম, তা' স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক, আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে—বৈষম্য নষ্ট করা। এই বিনাশ-শক্তি কবি-প্রকৃতির ভিতর থেকেও প্রকাশ পা —কিন্তু কবির গড়বার হাত ও ভাঙ্‌ হাত আলাদা আলাদা, আর আর্টিষ্ট একহাতে ঐ দুটি কাজ করেন। কবির impulsi nature তাঁকে একবগ্‌গা ছুটিয়ে নিয়ে যা ফলে, বিরুদ্ধমতের পাঠক বিরক্ত হ তা' প্রকাশ করবার পথ পায়। আর্টি সকল দিকের কথাই বলে দিয়ে যান সুতরাং পাঠকের বিরক্তি আত্মপ্রকাশ করবা পথ না পেয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশে তার বুকের রক্তেই রূপান্তরিত হয়ে যা তা' ছাড়া, সরল রেখায় বা সহজপথ মন্তব্যটি না চালিয়ে একটু ঘুরপথে চালা স্থলবিশেষে দরকারও হয়,—তা' এইজ যে, 'পেরেক' জিনিসটির চেয়ে জিনিসটির জোর কম নয়; আর সব কাঠে পেরেক ঠোকাটা নিরাপদও ন যে-হেতু তাতে কাঠ চিরেও যেতে পারে

* * *

এইবার "বৃহত্তর-মানব-সভ্যতার" বিশুদ্ধ আর্টের যোগাযোগের কথা ব প্রবন্ধ শেষ করি।

আমার প্রথম কথা এই যে, 'সভ্যতা' পদার্থটিকে বিশুদ্ধতার উল্টো-কিছু ব মনে করা অসভ্যতা। সভ্যতা বল্‌তে বোঝায়, তা' "সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি" ছাড়া কিছুই নয়—অন্ততঃ 'মহত্তম সভ্যতা' ঐটিই হচ্ছে অর্থ। এখন, এই বিশু সভ্যতাকে অশুদ্ধ থেকে অশুদ্ধতর করতে করতে চারিয়ে দেওয়াই যদি 'বৃহত্তর সভ্যতা' গড়বার উপায় হয়, তা' হলে ব্যাপারটা একটু আশঙ্কাজনকই হয়ে ওঠে।

চেতনা আপনাকে বিস্তার করতে করতে যে-ভাবে জড়-বিশ্বে বিরাম লাভ করেছে—'সভ্যতা' সম্বন্ধে আমাদের চেতনাও যদি তাই করে, তবে মানুষ প্রথমে পশু, তৎপরে উদ্ভিদ এবং সর্ব্বশেষে জড়পিণ্ড হয়ে পূরোসভ্য হবে। আশা করি, সভ্যতাকে এ-ভাবে degrade করে' বৃহত্তর করে' তুলতে আমরা রাজি হব না; কেননা, তাতে শিব গড়তে অন্য-কিছুই গড়া হবে।

অবশ্য যদি এ-কথা বলা যায় যে বিশুদ্ধ আর্ট গ্রহণ করবার যোগ্যতা এখনও আমাদের হয়নি—অতএব endএর মর্য্যাদা বুঝে নেবার আগে এখনও কিছুকাল means to attain that endএর চর্চ্চা চালাবো; তবে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথা যেন আমরা না বলি যে, 'নির্লিপ্ততা'র উদ্ভাবনা দোষের হয়েছে বা কাজের হয় নি। সত্যের মর্য্যাদা না রাখতে শিখ্‌লে সত্যযুগের আবির্ভাবকে আমরা পেছিয়েই রাখ্‌বো;—যে-সত্যের মর্য্যাদা রাখ্‌বার জন্যে 'নিখিলেশ' মানুষের সব-চেয়ে বড়-মোহ থেকেও প্রাণপণে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছে, সেই নিখিলেশ-স্রষ্টার দীক্ষাকে অপমান করবার অধিকার তাঁর কোনো ভক্তেরই নেই, এ-কথা যেন আমরা না ভুলি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

খেয়ালের খেসারৎ

(গল্প)

ও-বাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা যে কি-রকম তা বলা শক্ত। ওদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সংস্রব নেই,—থাকতেও পারেনা; তবু তিন-পুরুষ ধরে' ওদের সঙ্গে আমাদের দাদা, দিদি, কাকা, খুড়ি, পিসি প্রভৃতি সম্পর্ক চলে আসছে। কোন্ সময় কেমন-করে এই আত্মীয়তা আরম্ভ হয়, সে-ইতিহাস বলবার লোক এখন আমাদের পরিবারেও নেই, ওদের পরিবারেও নেই—অর্থাৎ বুড়োর দল দু-পরিবার থেকেই সরে পড়েছেন। এখন আমরা যারা আছি ঐ আত্মীয়তার সম্পর্ক উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছি। আমাদের বাড়ির এখনকার ছেলেরা কেউই এ প্রশ্ন করেনা যে ওরা কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ, ওদের আমরা দাদা দিদি বলি কেন? কিম্বা ওদের বাড়ির কেউই, আমরা ব্রাহ্মণ বলে' যে আমাদের বিশেষ-একটা মর্য্যাদা দেয় তাও নয়। তারা যেটুকু শ্রদ্ধাভক্তি করে তা আত্মীয়-গুরুজনের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং আমাদের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা তাতে প্রাণের টানেরই পরিচয় বেশী।

কোনো গোল ছিলনা; গোল বাধালেন আমার দাদা। কেমন-করে ব্যাপারটা ঘটল

তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমি ঠিক জানিনা; হঠাৎ দেখি দাদা এম-এ পাশ করে ছুটির সময় ভারি হিঁদু হয়ে উঠেছেন। তাঁর ছোট-বড়-কুরে ছাঁটা চুল চৌরস হয়ে গিয়ে পিছনে এক সরু টিকি গজিয়ে উঠেছে; পৈতে-গাছটা শুচিতার ঘর্ষণে সাবানের ফেনার মতন সাদা এবং তিরিক্ষি-মেজাজ লোকের মতন কড়া হয়ে রয়েছে। একদিন তিনি আমায় গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"ভাখ্ নবীন, আর এ-সব চলবেনা। আমাদের অনাচারে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ দিন-দিন অধঃপাতে যাচ্ছে; আমরা ব্রাহ্মণরা অনেক দিন ধরে কর্ত্তব্যে অবহেলা করে এসেছি, এবার কর্ত্তব্যভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।"

আমি বল্লুম—"বেশ ত!"

দাদা বল্লেন—"শুধু বেশ ত বল্লে চলবে-না; তোকেও কাজে লাগ্‌তে হ'বে। তুই আমার ভাই, আমার পাশে এসে তোকে দাঁড়াতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"কি করতে হ'বে?"

দাদা বল্লেন—"পয়লা নম্বর—তোকে টিকি রাখতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"তা আমি পারবনা।"

দাদা একটা ভ্রূকুটি হেনে বল্লেন—"পার-বিনে কেন?"

আমি বল্লুম—"কালেজের ছেলেরা তাহ'লে ভারি উৎপাত লাগাবে।"

দাদা বল্লেন—"তুই coward! যা ভালো বুঝবি তা করবার সাহস যদি তোর না থাকে তাহ'লে তোর মতন কাপুরুষ দুনিয়ায় নেই!"

আমি বল্লুম—"দাদা, তুমি ভারি ভুল করছ। আমার কাপুরুষতা তখনই প্রমাণ হবে যখন আমি স্বীকার করব টিকি-রাখা ভালো।"

দাদা চম্‌কে উঠে বল্লেন—"তুই টিকি-রাখার পক্ষপাতী ন'স?"

আমি বল্লুম—"মোটেই না!"

দাদা বল্লেন—"কেন?"

আমি বল্লুম—"তর্কশাস্ত্র-অনুসারে কেন টিকি রাখব এর জবাব দিতে তুমি বাধ্য। তোমার ঐ 'কেন'র দায় আমার নয়।"

দাদা রেগে গিয়ে বল্লেন—"থাম্। তুই ভারি ফাজিল হয়েছিস!"

দাদার আজ্ঞায় আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু সেটা তাঁর আদৌ মনঃপূত হ'লনা। কারণ তাঁর তর্ সইছিল না; তিনি মনে-মনে চাচ্ছিলেন যে এই তর্কটা কোনোরকমে মিটে গিয়ে আমি এখনই তাঁর দলভুক্ত হয়ে পড়ি। তিনি অধীর হয়ে বলে উঠলেন—"টিকি রাখব এই জন্যে যে ওটা আমাদের জাতীয়তার একটা গৌরবের নিশানা।"

আমি হেসে বলে উঠলুম—"গৌরবকে মাথায় রাখতে হয় স্বীকার করি, কিন্তু যে তোমার অম্‌নি-করে কথার-কথার তর্জ্জমা করে নাকি! তাহ'লে তুমি যে এম-এ সেটাও কপালে টিকিট-মেরে জাহির করে বেড়াও না!"

দাদা চটে-উঠে বল্লেন—"জানিস্ এ-সব ঠাট্টার বিষয় নয়!"

আমি বল্লুম—"ঠাট্টা কি আমি করছি? তোমার ঐ জাতীয় গৌরবটাকে তুমিই ত একটা বিরাট ঠাট্টা করে তুলছ!"

দাদা বাধা পেয়ে মনে-মনে খানিকক্ষণ

ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন—"ভাখ্, ঐ টিকিটি হ'ল—

আমি হেসে বল্লুম—"কি? তবপারের টিকিট?" দাদা ফট্‌মট্ করে উঠলেন।)

—ঐ টিকিটা হ'ল আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে একটা পরিচয়ের বন্ধন;—ঐ বন্ধন খুলে দিলে আমাদের পরিচয়ের কোনো মর্য্যাদাই থাকেনা।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু দাদা, পূর্ব্বপরিচয় ভালো-করে বজায় রাখতে হ'লে অনেক পুরোনো জিনিসই ফিরিয়ে আনা দরকার। তাহ'লে এই ক্ষুদ্র দেহটিকে একটি প্রকাণ্ড নাদুঘর করে তুলতে হয়। মাথায় যদি টিকি রাখ তাহ'লে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের ন্যাজটাই বা দোষ করলে কি!"

দাদা এবার ভয়ঙ্কর রেগে উঠলেন। আমার সাম্‌নে আর মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়ালেন না; রাগে গস্-গস্ করতে-করতে চলে গেলেন!

দাদার সঙ্গে সেদিন যে এই তর্ক করেছিলুম সে আমি ভেবে-চিন্তে করিনি;—কথার পিঠে যা মুখে এসেছিল বলে গিয়েছিলুম মাত্র। দাদাও যে তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলেন তা মনে হয় না। কারণ সেটা তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর স্বভাব ঝোঁকের মাথায় কাজ-করা। উৎসাহের তোড়ে তিনি যখন মেতে ওঠেন তখন তিনি মনে করেন জগৎ-সুদ্ধ-সবাই বুঝি তাঁর সঙ্গে সমান মেতে উঠেছে;—কোথাও যে বিরুদ্ধতা থাকতে পারে এ কথাটা তিনি মনে করতেই পারেন না। তারপর, সত্যি বলতে কি, আমার দাদা—তাঁকে তো আমি জানি—তিনি যে এমন হঠাৎ-হিন্দু হয়ে উঠে এই সব কথা অন্তরের সঙ্গে বলছেন এটা আমার তখন সত্যিই বিশ্বাস হয়নি। তাঁর ঐ টিকি-রাখার কথাটা আমার কানে অনেকটা ঠাট্টার মতোই শোনাচ্ছিল। তা-ছাড়া আমার তখন সব-চেয়ে ভাবনার বিষয় ছিল কোনো-রকমে এম্-এটা পাশ করা। হিন্দুধর্ম্ম গেছে কি আছে তখন এ-প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। কাজেই দাদার কথাগুলোর জবাব উচিত-মতো করে দিতে পেরেছিলুম বলে আমার মনে হয় না; এবং তার জন্য যে মনে কোনো ক্ষোভ হয়েছিল তাও নয়। দাদা কিন্তু আমার কথাগুলোকে মর্ম্মান্তিক-করে নিয়েছিলেন। তিনি এমন রেগে গেলেন যে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। আমাকে বাদ দিয়েই তাঁর কাজ সুরু হল।

আমার এম-এ-পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দেখি আমাদের বৈঠকখানার বাঁ-দিকের ঘরটায় দাদা বেশ-একটি আড্‌ডা জমিয়ে বসেছেন। পাড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় ছেলে এসে জুটেছে। টেবিল চেয়ার উঠিয়ে দিয়ে ঘরময় কুশাসন বিছানো হয়েছে। যে-সব তাকে চীনেমাটির পরী, ফুলদান প্রভৃতি সাজানো ছিল সেখানে এখন বিরাজ করছে কাঁশর ঘণ্টা শাঁক কোশাকুশি পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি। কেরোসিনের আলোটা সরিয়ে একটি ছোট্ট ঘিয়ের প্রদীপ বসেছে। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। আমি সেই ঘরে উঁকি মার-তেই দাদা মুখ-ফিরিয়ে নিলেন। আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেমন ঘরে ঢুকতে যাব অমনি চারিদিকে একটা হাঁ-হাঁ শব্দ উঠল। আমি থম্‌কে একটু পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করলুম—"ব্যাপার কি?" সকলে ঘাড়-নেড়ে বলে উঠল—"উঁহু, জুতো-পায়ে আসবেন না এখানে!" আমি জুতো খুলতে যাচ্ছি এমন সময় দাদা গম্ভীরভাবে বল্লেন—"জুতো খুল্লেও ওঁর এ-ঘরে ঢোকবার অধিকার নেই।" সত্যি বল্‌তে কি, সকলকার সাম্‌নে দাদার এই রূঢ় কথাটা আমার প্রাণে বড় বাজল। আমি গুম-হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলুম।

এর পর থেকে দাদার আড্‌ডায় আর ঢোকবার ইচ্ছে করিনি। পাশের ঘরে বসে প্রায় শুনতুম সেখানে কখনো খুব উচ্চস্বরে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, কখনো বা শাঁকঘণ্টা বাজছে। আমি নির্ব্বাসিতের মতো একলাটি নিজের ঘরটিতে পড়ে থাকতুম। একে-একে দাদা আমার বন্ধুদেরও আকর্ষণ করে নিতে লাগলেন। লোক বশ করবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁর হৃদয়টি এমন স্নেহপ্রবণ যে চারদিকের সবাইকে তিনি যেন আঁকড়ে ধরেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া শক্ত। আমাকে ছেড়ে বন্ধুরা যে তাঁর কাছে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ওদের ঐ আড্‌ডা ভাঙবার জন্যে আমার মন এমন নিশ্‌পিশ্‌ করতে থাকত কি বলব! আর-কিছু ভেবে না পেয়ে আমি থেকে-থেকে খুব চীৎকার করে ইংরেজি কবিতা পড়তুম; কখনো বা একটা হাতুড়ি নিয়ে দুম্‌দাম্‌-শব্দে দেয়ালে পেরেক ঠুক্‌তুম।

দাদার মাথার চুল যে অত বাড়ন্ত এর পূর্ব্বে আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। দেখতে-দেখতে তাঁর টিকিটি বেশ লম্বা হয়ে উঠেছিল। আমি সেইটেকে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে-করে দেখতুম বলে দাদা বোধ হয় ভা[illegible] আমি মনে-মনে ঠাট্টা করচি। তাই [illegible] মুখে কিছু না বল্লেও ভিতরে-ভিতরে [illegible] চটে উঠতেন তা আমি বুঝতুম। [illegible] একরকম স্থির করেই নিয়েছিলেন [illegible] ঐ টিকি নিয়েই যখন তাঁর সঙ্গে আ[illegible] ঝগড়া তখন ঐ টিকি যত দীর্ঘ হ[illegible] বিবাদও তত বাড়ছে বই কমছে না[illegible] সেই জন্যে তিনি আমাকে দলে টানবা[illegible] আর চেষ্টাই করলেন না। এবং আমি [illegible] হলেও যে তাঁর চলে এটাও বোধ হয় তি[illegible] দেখানো দরকার মনে করতেন। [illegible] জন্যে আমি দুঃখিত ছিলুম না; কা[illegible] আমি জানতুম দাদার সঙ্গে আমার [illegible] মান-অভিমানের পালা এক-দিন-না-একদি[illegible] শেষ হয়ে যাবেই। কিন্তু এখনকার এ[illegible] ছুটির দিনগুলো একলা-একলা কাটে কে[illegible] করে? দাদার আড্‌ডায় প্রবেশের উপা[illegible] না পেয়ে শেষে আমি ও-বাড়ির অন্দরে প্রবেশ কর্‌লুম। একেবারে অন্দরে যাবা[illegible] কারণ এই যে ও-বাড়ির বৈঠকখানা তখ[illegible] একরকম বন্ধই থাকত। ওখানকার সতী[illegible] এবং যতীশ আমাদের সমবয়সী দুই ভা[illegible] দাদার আড্‌ডায় যোগ দিয়ে অষ্টপ্রহর আমাদে[illegible] বাড়িতেই পড়ে থাকত।

ও-বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে আমি ভালো-বাসতুম পিসিমাকে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর হাতের যত প্রহার এবং আহার খেয়েছি সে-সব এখনো আমার মনে গাঁথা আছে। পিসিমার প্রধান গুণ এই ছিল যে প্রহারের সঙ্গে আহারের মিল না দিলে যে রসভঙ্গ হয় এটা তিনি ভালো-

[illegible]ই জানতেন। সেই জন্যে আমাদের কাছে প্রহারটা কখনো বেতালা হয়ে ওঠেনি। [illegible]মরা ঐ মিলের লোভে অনেক সময় [illegible]মি করে মার খেয়েছি। এটা যে [illegible]নি বুঝতেন না তা নয়; তবুও যে [illegible]নি আমাদের প্রশ্রয় দিতেন তার কারণ [illegible]মাদের ঐ দুষ্টুমিটা তিনি যে সমস্ত মন-প্রাণ [illegible]য়ে উপভোগ করতেন।

তিনি অল্প বয়সে বিধবা হ'ন। তাঁর [illegible]লেপুলে ছিল না। আমাদের দুটি [illegible]াইকে অতৃপ্ত বুকের সমস্ত স্নেহটুকু [illegible]লিয়ে দিয়েও তিনি যেন তৃপ্তি পেতেন [illegible]া। আমার মায়ের ছেলেমেয়ে অনেকগুলি; [illegible]বাইকে তিনি সাম্‌লে-উঠতে পার্‌তেন না; [illegible]ার জন্যে আমাদের দু-ভায়ের যে অভাব-[illegible]কু হ'ত পিসিমা তার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে [illegible]তেন—এমন-কি তার অতিরিক্তও দিতেন। [illegible]াঁকে আমরা কখনো পর-বলে' ভাবতে [illegible]ারিনি। মায়ের চেয়ে তাঁর দিকেই আমাদের [illegible]টান ছিল বেশী। পিসিমা কাকে বেশী ভালোবাসেন -এই নিয়ে আমাদের দু-ভায়ের মধ্যে এখনো ঝগড়া চলে। বাইরের এই ঝগড়া না মিটলেও আমাদের মনের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। কারণ, দাদার বিশ্বাস পিসিমা তাঁকেই বেশী ভালোবাসেন এবং আমি মনে-মনে জানি আমার চেয়ে পিসিমা কাউকে ভালোবাসেন না। অনেক ছেলে-মানুষী আমাদের কেটে গেছে বটে কিন্তু পিসিমার ভালোবাসা নিয়ে আমাদের দু-ভায়ের হিংসা এখনো কাটেনি। তার কারণ পিসিমার কী আশ্চর্য্য গুণ আছে যাতে তাঁর কাছে গেলেই আমরা যে বড় হয়েছি এ-কথাটা একেবারে ভুলে যাই।

পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম বলে' অনেক-দিন পিসিমার কাছে আসা হয়নি। আমাকে দেখে তাঁর আহ্লাদ যেন সর্ব্বাঙ্গ-দিয়ে উপ্‌চে পড়তে লাগল। আমি যখন গেলুম তখন তিনি রান্না-ঘরে ছিলেন। আমার গলা-পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এলেন। আমার হাত-ধরে টেনে একেবারে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে-গিয়ে হাজির করলেন। পিছনে-পিছনে এক দাসী ছুটে এসে বল্লে—"ও পিসিমা, তোমার ঘিয়ের কড়া জ্বলে গেল যে!" পিসিমা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন,—"ঐ যাঃ, কড়াটা নামিয়ে রেখে আসতে ভুলে গেছি! বস বাবা নবীন, আমি এলুম বলে'।" বলেই তিনি ছুটে গেলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে বল্লেন,—"হ্যাঁরে, তোর দাদা এলনা যে!"

আমি বল্লুম—"তিনি এখন ভারি ব্যস্ত।"

—"ব্যস্ত? কিসের জন্যে এত ব্যস্ত রে!"

আমি বল্লুম—"জাননা বুঝি? তিনি এখন হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধার করছেন।"

পিসিমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"সে কী রে?"

আমি বল্লুম—"সে যে কি মাথামুণ্ডু তা তিনিই জানেন।"

পিসিমা বল্লেন—"বল্‌না; আমি যে বুঝতে পারছিনা।"

আমি বল্লুম—"পিসিমা, আমিও ও-সব তেমন বুঝিনা।"

পিসিমা বল্লেন—"সে সমস্ত-দিন কি করে বল্‌ত?"

আমি বল্লুম—"দেবদেবীর স্তোত্রপাঠ করে, শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে—আর কি করবে ?"

পিসিমা বল্লেন—"আহা, তা করুক ! ধর্ম্মেকর্ম্মে মতি কি সবায়ের হয় রে ! তাকে বলিস একদিন যেন আমার গোপালের আরতিটি সে করে দিয়ে যায়—তার হাতের আরতি দেখবার আমার বড় সাধ হয়েছে।"

আমি মুখ-ভার করে বল্লুম—"পিসিমা, আর আমার উপর বুঝি কোনো সাধ নেই ?"

পিসিমা তাড়াতাড়ি বল্লেন—"ওরে তোর মুখে রামায়ণ-শোনবার সাধ আজ কতদিন যে মনে পুষে রেখেছি কি বলব ! তুই সেই ছেলেবেলায় মিষ্টি-মিষ্টি-করে রামায়ণ পড়তিস—সে আমার কানে এখনো লেগে আছে।"

আমি বল্লুম—"এখন একটু পড়ে শোনাবো ?"

পিসিমা বল্লেন—"রোস, আগে তোকে কিছু খেতে দিই।"

ক্ষিধে না থাকলেও পিসিমার হাতের খাবার কখনো ফেরাতে পারা যায় না। খাবারের থালাটি হাতে-ধরে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে তিনি যখন সাম্‌নে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর হাতের অন্ন প্রত্যাখ্যান করতে মনে হয় বুঝি সর্ব্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়ে গেলুম।

একখানি ছোট্ট রেকাবিতে কিছু খাবার নিয়ে এসে পিসিমা বল্লেন—"আজ বেশি-কিছু নেই—তুই যে আস্‌বি তাতো জানতুম না—গোপালের ভোগ থেকে কিছু নিয়ে এলুম।"

রেকাবিখানি হাতে-করে ধরেছি মাত্র এমন সময় দাসীটা এসে বল্লে—"[illegible] কল্লেন কি ! ঠাকুরের যে এখনো [illegible] হয়নি—খাবার এঁটো করতে দিলেন !"

পিসিমার মুখখানি একবার শুকিয়ে [illegible] আমি ব্যস্ত হয়ে রেকাবিখানা নামিয়ে [illegible] বল্লুম—"পিসিমা, এখন থাক্‌না ; [illegible] হয়ে গেলে সন্ধ্যার পর খাব এখন !"

পিসিমা আমার মুখের দিকে [illegible] কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লেন—"ওরে না, না, [illegible] এতদিন পরে এলি, তোর মুখের [illegible] আমি কেড়ে নেব ? গোপাল আমার [illegible] অপরাধ নেবেননা—তুই খা। তুইও যে [illegible] আমার গোপাল !" বল্‌তে-বল্‌তে [illegible] গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

পিসিমার সঙ্গে আমার দিনগুলি [illegible] কাটছিল। রোজ দুপুরবেলা তাঁর [illegible] বসে গল্প করে, তাঁকে রামায়ণ শুনিয়ে [illegible] তাঁর হাতের নানান্ খাবার খেয়ে আমা[illegible] পেটও যেমন ভরত, হৃদয়ও তেমনি [illegible] উঠত। তিনিও ভারি খুসিতে থাকতেন। মনে হ'ত আমার প্রত্যেক স্পর্শ, আমার শব্দ, আমার নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত তাঁর অন্তরের থলিটিকে অতি মমতার সঙ্গে ভরে ভরে নিচ্চেন। দাদার কথা তিনি অনবরত তুলতেন। তাঁর অভাবে পিসিমার আনন্দটি যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছেনা এ আমি খুব বুঝতে পারতুম। তিনি প্রায়ই বলতেন—"তোরা যেন কানাই-বলাই দুই ভাই—তোদের একসঙ্গে না দেখলে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়।"

আমি একদিন অভিমান দেখিয়ে বল্লুম—"পিসিমা, তুমি দেখচি দাদার জন্যে হেদিয়ে

[illegible]ছ। তুমি তাঁকে নিয়েই তাহ'লে থাক ; আমি আর আসবনা।"—বলেই উঠে [illegible]ড়ালুম।

পিসিমা আমার এই কথা-শুনে যেন [illegible]মনতর হয়ে গেলেন। তিনি কিছু [illegible]তে পারলেন না, শুধু আমার হাত-ধরে [illegible]নে তাঁর কোলের কাছে বসিয়ে নিলেন।

এর পর থেকে দাদার কথা আমার [illegible]মনে তিনি আর পাড়তেন না। আমি [illegible]খতুম তাঁর মন ছট্‌ফট্ করছে, তবু তিনি [illegible]প-করে আছেন—যেন উপায় নেই ! তিনি [illegible]শ্চয় মনে-মনে কামনা করতেন দাদার [illegible]কথাটা আমিই পাড়ি। আমি প্রথম-প্রথম [illegible]প-করে থাকতুম ; শেষে পিসিমার মুখ [illegible]দেখে এমন মায়া করত যে দাদার কথা না [illegible]তুলে পারতুম না। তিনি গম্ভীরভাবে শুধু জিজ্ঞাসা করতেন—"সে কেমন আছে ?" দেখতুম উত্তরের অপেক্ষায় তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে কিন্তু তিনি দেখাতে চাইতেন যেন তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। যদি কোনো দিন বলতুম, দাদা বোধ হয় তোমায় ভুলে গেছে পিসিমা, অমনি তাঁর চোখমুখ ছলছল্ করে উঠত। যদি বলতুম, কাজে ব্যস্ত তাই বোধ হয় তোমার কাছে আসবার সময় পায়না, অমনি তাঁর সমস্ত দেহ মন আশ্বস্ত হয়ে উঠত। পিসিমার হৃদয়টি ছিল এত কোমল যে সামান্য-একটু আঘাতও সইত না।

বাড়ি ফিরে রোজই দেখতুম পিসিমা এক-থালা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি কিছু বলে দিতেন না, কিন্তু আমি বুঝতুম এগুলি দাদার জন্যে। আমি খেয়ে এসেছি, দাদা খেতে পারেনি—মনের এ আপশোস্ তাঁর পক্ষে সহ্য করা শক্ত। দাদা স্বপাকে আহার ধরেছেন কাজেই তিনি সে-সব ছুঁতেন না। কিন্তু এ-কথাটা আমাকে পিসিমার কাছে চেপে যেতে হ'ত ; কারণ দাদা তাঁর খাবার খান্‌নি শুনলে তিনি হয় ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেই বসে থাকবেন।

দাদার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারটা যে তাঁর বৈঠকখানার ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ রইল তা নয়। তিনি বাড়ির ভিতরেও নানা হেঙ্গাম সুরু করে দিলেন। আমাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে যে এতগুলো খুঁত আছে, এতদিন তা কারুর নজরেই পড়েনি। দাদা সেগুলো খুঁটে-খুঁটে বার করে স্তূপাকার করে তুল্লেন। তখন দেখা গেল এই আবর্জ্জনার মধ্যে আমাদের বাপ-পিতা-মহের ধর্ম্ম কোথায় ভলিয়ে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এবং ক'পুরুষ ধরে আমরা এমন-সব শাস্ত্রছাড়া অনাচার করে বসে আছি যার প্রায়শ্চিত্তের বিধান মনুর শাস্ত্রের মধ্যে মাথা-খুঁড়ে মরলেও মেলেনা। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে শাস্ত্র মান্‌তে গেলে আমরা যে হিন্দু আছি একথা মানা চলেনা। আমি হতাশ হয়ে বল্লুম—"তবে উপায় ?" দাদা বল্লেন—"এইটেই ত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব—কিছুতেই এর মরণ নেই ; বহু কালের তপস্যায় এ অমর হবার বর লাভ করেছে।"

পাড়ার এক মিশ্‌নারি-স্কুলে আমাদের বোন তিনটি পড়ত। দাদা বল্লেন—"এ সব আর চলবেনা। ওদের আবার নূতন-করে শিক্ষার পত্তন করতে হবে। ভোরবেলা

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

শিব-পূজা করা চাই, দুপুরবেলা নানা দেব-দেবীর স্তোত্র এবং মন্ত্র মুখস্থ এবং সন্ধ্যা-বেলা উপদেশ;—আমি সেই সময় পুরাণ থেকে সতীসাবিত্রীর উপাখ্যান পড়ে-পড়ে শোনাবো।"

ঠাকুমা দাদার কথায় সায় দিলেন; কিন্তু মা রাজি হলেননা। তিনি দাদাকে বল্লেন—"তোর দু-দিনের সখ দু-দিনেই মিটে যাবে—মধ্যে থেকে মেয়ে-তিনটের পড়াশুনো মাটি হবে।" তাই শুনে দাদা চটে-উঠে মায়ের মুখের উপর এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লেন। তার মধ্যে অনেক-গুলো সংস্কৃত শ্লোক ছিল এইটুকু শুধু আমার মনে আছে।

দাদা ফুস্‌লে-ফাস্‌লে দেখি কাজ হাসিল করেছেন। এর মধ্যে ঠাকুমা নিশ্চয় ছিলেন, নইলে হ'তনা। মা যে ঠাকুমার মুখের উপর কথা বলতেন না এইটেতে দাদার সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি, নেড়ি আর ফুলির স্কুল-যাওয়া দিন-পাঁচ-সাত বন্ধ রইল দেখলুম। তারপর একদিন সকালে দেখি তারা আবার স্কুলের বই খুলে বসেছে। দাদা কোত্থেকে ছুটে এসে বল্লেন—"কৈ তোরা আজ শিবপুজো করতে গেলিনে?"

বুড়ি বল্লে—"বাবা! ভোরবেলা এই শীতে ওঠা যায়!"

নেড়ি বল্লে—"রোজ সন্ধ্যেবেলা অং-মং-করে তুমি কি বকে যাও ভাল্‌লাগেনা বাপু!"

ফুলি বল্লে—"অ্যাঁ-া! ওঁর জন্যে আমাদের সেই রূপকথার শেষটা শোনা হ'ল না!"

বলেই তিন-বোনে ছুটে পালালো।

দাদা তাদের ধরে-এনে খুব ধমক দিতে লাগলেন। ঠাকুমা বল্লেন—"ওরে, ওরা ছেলেমানুষ—এই শীতে কি ভোরবেলা উঠতে পারে? যখন নাত-বৌ আসবে তাকে তোর ঐ মন্ত্রতন্ত্র শেখাস! আহা, ওরা দু-দিন-বাদে পরের বাড়ি চলে যাবে—ওদের অত ধম্‌কাস্‌নে।"

ঠাকুমার এই কথায় দাদার নিশ্চয় অভিমান হয়েছিল, নইলে সে-দিন বাড়ির ভিতরে খেতে এলেন না কেন? ঠাকুমা অনেক-করে ডাকাডাকি করলেন তবু এলেন না। তাঁর সেই পুজোর ঘরে স্পিরিট্ ষ্টোভে মাল্‌সা চাপিয়ে ভাতে-ভাত-করে খেলেন। এতে ঠাকুমার ভারি ভাবনা হ'ল। মা তাঁকে বল্লেন—"কিছু ভেবোনা মা তুমি! ওর পাগ্‌লামির ঘোর দু-দিনেই কেটে যাবে; ওকে যত বল্‌বে, তত বাড়াবে।"

ঠাকুমা বল্লেন—"ও ঠিক ওর দাদা-মশায়ের মতো হয়েছে। কখন্ যে কী খেয়াল চাপে কিচ্ছু ঠিক নেই।"—বলে দাদামশায়ের কবে বুঝি কি-একটা যজ্ঞ করবার সখ হয়েছিল তার আমুল বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন:—"কাশী থেকে এল ফর্দ্দ—ভূর্জ্জিপত্রে লেখা, যেন একখানা পুঁথি। কোত্থেকে সব বিকটাকার লোক এসে হাজির—দেখলে তাদের ভয় করে! উঠোনটাকে খুঁড়ে-চষে একাকার করে ফেল্লে! কতক-গুলো মাটির চিপি তৈরি হ'ল। জলে-কাদায় বাড়ি প্যাচ্-প্যাচ্ করতে লাগল। তিন দিন ধরে যজ্ঞ চল্‌ল; তার পর সেই যজ্ঞের ধোঁয়ায় কর্ত্তার চোখ এমন ফুলে উঠল যে

ছ'টি মাস তিনি চোখে হল্‌দে কাপড় বেঁধে বিছানায় পড়ে রইলেন। তার পর থেকে ঐ হোমের ধোঁয়ার উপর তিনি এমন গেলেন চটে যে, বৌমা মনে পড়ে বোধ হয়, তোমার বিয়ের সময় হোমই দিলেন বন্ধ করে! পুরুতরা মহা চেঁচামেচি করতে লাগল। কর্ত্তা ধম্‌কে উঠে বল্লেন, যাও, যাও, ওর জন্যে কিছু মূল্য ধরে দিলেই হবে! আমি ত ভয়ে কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লুম না।"

দাদা তাঁর দলে আমাকেও পেলেন না, ছোট বোন্-তিনটিকেও পেলেন না। ঠাকুমার প্রতি বোধ হয় তাঁর তত লোভ ছিল না। বাকি রইলেন মা। তাঁকে বেশী-কিছু উপদেশ দিতে গেলেই তিনি ধমক-দিয়ে উঠতেন—"থাম্, থাম্, তোর আর ফাজ্‌লামি করতে হবে না।" দাদা এই সব দেখে-শুনে একদিন অভিমান করে বল্লেন—"এখানে আমার আর থাকা চলেনা দেখচি;—চারিদিকে যে অনাচার!" আমি ভাবলুম বলি—"শুধু এখানে কেন, তাহলে তোমার থাকাই চলে না।" কিন্তু দাদা যে অভিমানী, না-বলাই ভালো। ঠাকুমা দাদার কথা শুনে মহা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। মাকে বল্লেন—"বৌমা, তোমার ছেলে বলে কি গো! তুমি বাপু ওর একটা বিয়ে-থা দিয়ে দাও;—শেষে কি ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?" মা বল্লেন—"তা যাক্‌না;—সন্ন্যাসী-হওয়ার কত মজা একবার দেখুক না!"

মায়ের এই কথায় দাদার বুকের কোমল পর্দ্দাটিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তা না হলে তিনি মায়ের মুখের উপর দুটো কথা শুনিয়ে ন' দিয়ে ছাড়তেন না। তিনি একেবারে চুপ-হয়ে রইলেন। দাদা ছিলেন আদরের কাঙাল। তাঁর মনের-মতন কাজ হচ্ছিল না বলে তিনি ভাবতেন তাঁর আদর বুঝি বাড়ির চারিদিক থেকে ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। তাই তিনি অনেক সময় মুখটি শুকিয়ে থাকতেন। তার পর মা-হয়ে যখন এমন ভাব দেখালেন যে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেও তাঁর কোনো ভাবনা নেই তখন দাদার মনে যে কতখানি লাগল তা আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। আমি শপথ-করে বলতে পারি তিনি যে বাড়ি-ছাড়বার কথাটা বলেছিলেন সে তিনি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে যাবেন বলে' বলেন নি; তিনি বলেছিলেন এই আশায় যে তাঁর বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় বাড়ি-সুদ্ধ সকলের মন কাতর হয়ে তাঁকে চারদিক থেকে স্নেহের বন্ধন দিয়ে ঘিরে ধরবে। এইটের প্রতি তাঁর মনের লোভ ছিল। তিনি চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলেন; তাঁর চোখ দেখে আমার মনে হ'তে লাগল তিনি সাম্‌নে যা দেখছেন তা যেন একটা শুষ্ক মরুভূমি! দাদার সেই রকম মুখ দেখে আমার ভারি মন-কেমন করতে লাগল। আমি বলে উঠলুম—"দাদা, পিসিমা তোমায় ডেকেছেন!" পিসিমার নাম শুনেই দাদার দৃষ্টির সেই শুষ্কতা কেটে গিয়ে চোখদুটি ভরে উঠল। আমি তখনই তাঁর হাত-ধরে টেনে একেবারে পিসিমার কাছে হাজির করলুম।

দাদাকে দেখে পিসিমার বোধ হয় আহ্লাদের চেয়ে বিস্ময়টা বেশি হ'ল।

তিনি তাঁর দিকে চেয়ে-চেয়ে বলতে লাগলেন—"ওমা, এ কি চেহারা করেছিস? আমি ভাবলুম, কে বুঝি গোঁসাইঠাকুর এল।"

দাদা চুপ-করে রইলেন।

পিসিমা বল্লেন—"ওরে নারে, না! সত্যি তোকে কী সুন্দর দেখাচ্চে কি বলব! ইচ্ছে হচ্চে তোকে একটা গড় করি!"

দাদা বল্লেন—"পিসিমা, কেমন আছ?"

পিসিমা বল্লেন—"বাবা, আমার আবার থাকা-থাকি! তোরা ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকি।"—বলে' তিনি দাদার গায়ে হাত-বুলোতে লাগলেন। বুলোতে-বুলোতে বল্লেন—"হ্যাঁরে যোগীন, তুই না কি ধম্ম-কম্মে মন দিয়েছিস? আহা, বেশ বাবা, বেশ!"

দাদা উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"দেখ পিসিমা, আমাদের কারো ধর্ম্মকর্ম্মে মন নেই বলেই ত আমরা অধঃপাতে যেতে বসেছি।"

পিসিমা নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লেন—"তোর এই বুড়ো পিসিমাকে ভুলিস্‌নে বাবা;—একেও তোর ধম্মকথা কিছু-কিছু শোনাস্।"

দাদা বল্লেন—"নিশ্চয়! তোমাকে পিসিমা অনেক-কথা আমার বলবার আছে।"

পিসিমা বল্লেন—"তা কি আমি জানিনে বাবা! পিসিমাকে সকল-কথা না বল্লে ছেলেবেলায় তোর ঘুমই হ'ত না—"

দাদা বাধা দিয়ে বল্লেন—"না না, এ সে-সব ছেলেমানুষী কথা নয়! এ সব কথা তোমায় মন দিয়ে শুনতে হ'বে—পালন করতে হবে।"

পিসিমা বল্লেন—"শুনব বৈ-কি বাবা! তোর ঐ মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনবার জন্যে তো হাঁ-করে বসে থাকি।"

দাদা বল্লেন—"আমি যা-যা বলব সব ঠিক-ঠিক কর্‌তে হ'বে কিন্তু।"

পিসিমা বল্লেন—"সে কি আর বলতে হবে রে তোকে!"

দাদা মহা খুসি হয়ে উঠলেন। তাঁর এই কাজে পিসিমার মতন এমন বুক-ভরা সহানুভূতি যে কোথাও পান্‌নি সে-দুঃখ যেন একনিমেষে ডুবে গেল। দাদা বলে উঠলেন—"দেখ পিসিমা, আমার মনে হয় তুমিই আমার সত্যিকারের মা!"

আনন্দের আবেগে পিসিমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

দাদা তখনি হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"চল্লুম পিসিমা, আমার সময় হয়ে এল।"—বলেই তিনি ছুট দিলেন।

পিসিমা চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"ওরে শোন্, শোন্!" সে-কথা দাদার কানেই গেলনা।

পরদিন দুপুরান্তে দাদা দেখি হন্‌-হন্ করে বেরিয়ে চলেছেন। আমি বল্লুম—"কোথা যাও দাদা?"

দাদা বল্লেন—"পিসিমার কাছে।"

আমি বল্লুম—"চল, আমিও যাবো।"

দাদা মনে-মনে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বল্লেন না। পিসিমার ঘরে হাজির হয়েই চাদরের ভিতর থেকে একখানা বই বার-করে তিনি বল্লেন—"পিসিমা, এই মনুসংহিতা এনেচি—এর থেকে আমি ঠিক-করে বেঁধে দেব তোমার কি-কি করা উচিত।"

পিসিমা বল্লেন—"আচ্ছা বেশ; এখন একটু জিরিয়ে নে দেখি!"

দাদা বসে' বইয়ের মধ্যে নীল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া অংশগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে লাগলেন। পিসিমা বল্লেন—"তোরা ভায়ে ততক্ষণ গল্প কর্, ময়দা মাখা আছে, আমি চট্-করে লুচি ভেজে নিয়ে আসি!"

দাদা বইখানা মুড়ে রেখে চুপ-করে বসে কি ভাবতে লাগলেন। আমি সেখানা তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে-দেখতে দাদাকে বল্লুম—"দেখ দাদা, আমি তোমার কথা ভেবে দেখেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে কাজে লাগতে হ'লে আমার আগে একটু তৈরি হয়ে নেওয়া দরকার। এই ছুটিতে কিছু-কিছু শাস্ত্রীয় বই পড়ে নেব ভাবছি। কি, কি পড়ি বল দেখি?" দাদা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে-দিয়ে দেখতে লাগলেন; বোধ হয় সন্দেহ হচ্ছিল আমি ঠাট্টা করছি। দাদা কি বলতে যাবেন এমন সময় পিসিমা লুচির থালা-হাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঝি এসে দুখানা আসন পেতে দিয়ে গেল। আমি বসতে যাচ্ছি এমন-সময় দাদা বল্লেন—"আমি তো খাবো না।"

পিসিমা চিন্তিত হয়ে বল্লেন—"খাবিনে কেন? অসুখ করেছে না কি?"

দাদা বল্লেন—"না, অসুখ করেনি।" বলে তিনি মনুসংহিতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

পিসিমা বল্লেন—"অসুখ করেনি ত খাবিনে কেন?"

দাদা বই থেকে মুখ তুলে দৃঢ়-কণ্ঠে বল্লেন—"আমি যে ব্রাহ্মণ!"

পিসিমা কথাটা বুঝতে পারলেন না; হাসতে-হাসতে বল্লেন—"তোকে তো আমরা কেষ্টাকলুর জামাই বলি;—তুই ব্রাহ্মণ হ'লি কবে থেকে?"

দাদা ভুরু-কুঁচকে বলে উঠলেন—"না পিসিমা, আমি খেতে পারব না!"

পিসিমা বিস্মিত-হয়ে বল্লেন—"কেন বল্ ত?"

দাদা বল্লেন—"তোমার হাতে খাওয়া চলবে না!"

পিসিমা বল্লেন—"শোনো একবার কথাটা! তুই যে চিরকাল আমার হাতে খেয়ে এলিরে! ছেলেবেলায় আমি হাতে-করে ভাত খাইয়ে না-দিলে তুই যে খেতিস না।"

দাদা বল্লেন—"তার জন্যে আমায় প্রায়শ্চিত্ত-করে শুদ্ধ হ'তে হবে!"

পিসিমা কথাটা শুনেই থম্‌কে গেলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ল যে তাঁর হাতে খাওয়াটা আমাদের পক্ষে এতই সহজ যে এর মধ্যে কোনো বাচ-বিচার আছে একথা কোনো দিন তাঁর মনেও আসেনি। এমন-কি, দাদা যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ফুক্‌রে উঠলেন সে-সময়ও তাঁর মনে ও-কথাটা জেগে ওঠেনি। কিন্তু হঠাৎ এই প্রায়শ্চিত্তের নাম শুনে তিনি এমন থম্‌কে গেলেন যে তাঁর মুখ পাথরের মতো অসাড় হয়ে গেল। তিনি যে রাগ করলেন—তা মনে হ'ল না; বেদনা পেলেন—তাও মনে হ'ল না। পাথরের মূর্ত্তিটির মতো তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দাদা সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মুখ নীচু করলেন। আমি একবার

ডাকলুম—"পিসিমা!" তাঁর ঠোঁটটি একটু কাঁপল মাত্র—কোনো শব্দ হ'লনা। আমি ছুটে-গিয়ে খাবার আসনে বসে পড়লুম। দাদা আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি যতক্ষণ খেলুম—পিসিমা চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটি কথাও কইলেন না। আমি কত আব্দার করলুম, কত অভিমান করলুম, তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। আমি দাদাকে ধরে-আনবার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলুম। বাড়ি এসে শুনলুম তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছেন। আমি একলা আমার ঘরে বসে পিসিমার কথা ভাবতে লাগলুম।

এর পরে যখনই পিসিমার কথা মনে করতুম, তাঁর সেই অসাড় মূর্ত্তিটি আমার চোখের উপর ভাসতে থাকত, আমি আর তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। নির্লজ্জ দাদা কিন্তু যাতায়াত বন্ধ করেন নি। তিনি আমার কাছে এসে প্রায়ই শুনিয়ে যেতেন—"পিসিমা যে এমন আশ্চর্য্য ভক্তিমতী রমণী তা আগে জানতুম না।" শুনলুম ইতিমধ্যে তিনি তাঁকে দিয়ে গোটাকতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন। দাদা যে তাঁর কাছে খুবই উৎসাহ পাচ্ছিলেন সে তাঁর হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আমি ভাবতুম না-জানি কী মর্ম্মান্তিক মূল্য দিয়েই দাদার এই খেয়ালগুলোকে পিসিমার পুষতে হচ্ছে! দাদা একদিন নতুন উৎসাহের ঝোঁকে এসে বল্লেন—"নবীন, তুমি যে সেদিন বলছিলে আমার সঙ্গে যোগ দেবে—"

আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম—"তোমার সঙ্গে যোগ?—তোমার মত নিষ্ঠুরের সঙ্গে!"

দাদা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, আমি ডে বল্লুম—"শোনো, তুমি যে সেদিন পিসিমার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে তার জন্যে তোমার অনুতাপ হচ্ছেনা?"

দাদা বল্লেন—"দেখ নবীন, তোমার সঙ্গে যখন আমার মতের মিল নেই তখন এসব কথা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে।"

আমি বল্লুম—"এ তো মতের কথা নয়—এ হৃদয়ের কথা!"

দাদা বল্লেন—"শুধু হৃদয় নিয়ে ত মানুষ নয়—তার উপরে আত্মা আছে—তার সদ্গতি করা চাই!"

আমি বল্লুম—"পিসিমাকে অমন-করে আঘাত দেবার তোমার কোনো অধিকার নেই।"

দাদা বল্লেন—"পিসিমা যে তাঁর নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে চলছিলেন, তাই ত তাঁকে এই সংঘর্ষের আঘাত খেতে হ'ল। তাঁর অধিকার কতটুকু তা আমি তাঁকে এখন স্পষ্ট করে নির্দ্দেশ করে দিচ্ছি।"

আমি বল্লুম—"তার মানে তুমি তাঁকে পলে-পলে বধ করছ।"—আমি আরো বলতে যাচ্ছিলুম দাদা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে গেলেন।

আমি সেদিন দুপুরবেলা যখন পিসিমার কাছে গেলুম তখন তিনি দালানে বসে রামায়ণ শুনছিলেন। আমাকে দেখে পড়া থামিয়ে গল্প করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি বল্লুম—"পিসিমা আমার ক্ষিদে পেয়েছে।" পিসিমা বল্লেন—"তোর জিখে

না! এই খেয়ে এলি, এরই মধ্যে ক্ষিধে?"

আমি বল্লুম—"না পিসিমা, আজ আমার ভালো-করে খাওয়া হয়নি।" পিসিমা আমার মুখের দিকে সস্নেহে চাইতে লাগলেন; তাঁর মুখ-শুকিয়ে উঠল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন—"আজ তো ঘরে কিছু নেই বাবা!" আমি বল্লুম—"দুখানা লুচি ভেজে দাওনা—নুন দিয়ে খাবো।" পিসিমা বল্লেন—"আহা নুন দিয়ে খাবি কেন?"—বলতে-বলতে তাঁর চোখ ছলছল্ করে উঠল। আমি বলে উঠলুম—"পিসিমা, আড্ড ক্ষিধে পেয়েছে!" পিসিমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন—"রোস্ দেখি!" বলে আস্তে-আস্তে তিনি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু পিসিমা ফিরে এলেন না। অন্য সময় দেখেছি তিনি আমাদের সাম্নে বসেই ময়দা মাখতে-মাখতে গল্প করতেন—আজ কিন্তু তা করলেন না। আমি দেরী দেখে তাঁর খাবার ঘরের দিকে গেলুম। গিয়ে দেখি ঘর খিলবন্ধ। আমি কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করলুম—কোনো সাড়া পেলুম না। মনে হ'ল যেন ভিতর থেকে একটা কান্নার নিশ্বাস আসছে।

বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরে সতীশ-যতীশ দুই ভাই বসে আছে। আমি বল্লুম—"কি সৌভাগ্য! আজ যে আমার ঘরে? দাদার ঘরে যাওনি?"

সতীশ বল্লে—"অনেক দিন তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হয়নি তাই একবার এলুম।"

যতীশ বল্লে—"নবীন, তোমার ঘরটি বেশ লাগছে ভাই। ভারি একটি স্নিগ্ধ ভাব আছে;—শরীরটা বেশ-একটু আরাম পায়।"

সতীশ বল্লে—"তোমার দাদার ঘর থেকে এসে মনে হচ্চে যেন বুকটা হাঁফ-ছেড়ে বাঁচল! ওখানে যে ধুনোর ধোঁয়া!"

যতীশ বল্লে—"আমার তো ভাই ঐ ধোঁয়ায় শিরঃপীড়া হবার যো হয়েছে।"

সতীশ বল্লে—"তোমার দাদাকে কতবার বলেছি, ঐ ধোঁয়াটা একটু কম কর, তোমার দাদা সে কথা কানেই তোলেনা। তার বোধ হয় বিশ্বাস যে ঐ পবিত্র ধোঁয়া যত বেশী পাকিয়ে উঠবে বাহির এবং অন্তরের ময়লা ততই সাফ্ হয়ে গিয়ে আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠব।"

হঠাৎ দেখি মহিমচন্দ্র দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে এল। তার মতন ছেলেও যে দাদার আড্ডায় যোগ দিয়েছে তা আমি জানতুম না। শুনলুম এই তার প্রথম দিন। সে আমার ঘরের চারদিকটায় চোখ ফিরিয়ে বল্লে—"বাঃ তোমরা যে তোফা বসে আছ হে! আমার ভাই, এতক্ষণ সিগারেট না খেয়ে পেট ফুলছিল। এ তোমাদের কি-রকম ক্লাব হে, যে সিগারেট খাবার যো নেই?" বলেই রূপোর কেস্ বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সজোরে এক টান মেরে প্রায় এক-এঞ্জিন ধোঁয়া ছেড়ে দিলে।

আমি বল্লুম—"সন্ধ্যে হ'ল, চায়ের আয়োজন করা যাক্—কি বল?"

মহিম মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে বল্লে—"বহুৎ আচ্ছা!" যতীশ এবং সতীশ একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখাতে লাগল। আমি একটা

ষ্টোভে চায়ের জল এবং আর-একটায় ডিম-সিদ্ধ চড়িয়ে দিলুম। যতীশ বল্লে—"ওহে নবীন, ডিমটা আজ থাক্।" মহিম ভ্রূকুটি করে বল্লে—"মাইরি!" তারপর যখন ডিম ও চা তৈরি হল তখন মহিমের গলার এবং গায়ের জোরের কাছে যতীশ-সতীশের মনের বল বেশীক্ষণ টিঁকল না। আমার ঘরে খুব হল্লা চলতে লাগল। একা মহিমই একশ! তার গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে দাদার সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ আমাদের কানে এসে বাজতে লাগল।

আমার ঘরে আড্ডা ভেঙে গেছে, দাদার ঘরের গুঞ্জনও আর শোনা যাচ্চে না, এমন সময় হরিপদ চোরের মতো আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। ছেলেটি বড় ঠাণ্ডা। আমার তাকে ভারি ভালো লাগত। সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, আমাদের নীচে পড়ে, আমাদের সঙ্গে সম্ভ্রম রেখে কথা কয়। আমি বল্লুম—"এস, হরিপদ বোস। এত রাত্রে কোথা থেকে?"

—"আজ্ঞে এতক্ষণ ঐ দাদার ঘরে ছিলুম।" এই কথাটুকু বলেই সে চুপ করে রইল। আমি তার মুখ-দেখে বুঝলুম সে কিছু আমায় বলতে এসেছে, কিন্তু সঙ্কোচ হচ্চে।

আমি বল্লুম—"হরিপদ, কি মনে করে এসেছ বলনা।"

হরিপদ যেন অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ চমক-ভেঙে বল্লে—"আজ্ঞে না, কিছু না। রাত হ'ল আপনাকে আর বিরক্ত করবনা।" বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

আমি বল্লুম—"সত্যি বলতে কি হরিপদ, তোমার ঐ মনের কথাটি না শুনলে আমার ঘুম হবেনা।"

হরিপদ চোখ নীচু করে ধীরে বলতে লাগল—"দেখুন, নবীন আপনার দাদা আমার উপর ভারি গেছেন।"

আমি বল্লুম—"কেন বল ত?"

হরিপদ বল্লে—"দেখুন আমি ওঁকে করি, উনি আমার অনেক উপকার করেছেন, কিন্তু—"

আমি বল্লুম—"কিন্তুটা কি?"

সে বল্লে—"কিন্তু তিনি বলেন আমি শূদ্র একথাটা ভুল্লে চলবেনা, আমাকে শূদ্র মতোই থাকতে হবে।"

আমি বল্লুম—"তার মানে?"

—"তার মানে ওঁদের ঐ ঘরে আসনে বসবার অধিকার নেই—আমাকে মাটিতে বসতে হ'বে।"

—"তুমি তাতে রাজি হয়েছ?"

—"আজ্ঞে অত লোকের সামনে দাদার মুখের উপর আমি কিছু বলতে পারিনে মাটিতেই বসে থাকি। কিন্তু আমার মনে যে কি হয় তা আপনি বুঝতে পারছেন।"

আমি রেগে বল্লুম—"তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেনা কেন?"

হরিপদ বল্লে—"আপনি ত জানেন আপনার দাদা আমার কত উপকার করেছেন!"

আমি বল্লুম—"তা বলে দাদা যা-খুসি করবেন? এ দাদার ভারি অন্যায়!"

হরিপদ বল্লে—"দেখুন আপনার দাদাকে আমি ভালোবাসি; উনি আমাকে যে-রকম

হ করেন তাতে আমার মনে হয় উনি মার সত্যিকার দাদা। ওঁর জন্যে না হয় টুকু অপমান সহ্য করলুম! কিন্তু উনি খন বলেন শুধু অমন চুপ-করে বসে থাকলে লবেনা, আমাকে কাজে লাগতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"কাজটা কি?"

—"উনি বলেন আমাদের বিধিদত্ত কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে তাই আমাকে গ্রহণ রতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"সেটা কি?"

হরিপদ বল্লে—"সেবা!" বলেই সে কটু চুপ-করে আবার বলতে লাগল—"উনি লেন প্রথমে আমায় সামান্য সেবা নিয়ে ারম্ভ করতে হ'বে—যেমন রোজ খানিকক্ষণ করে ব্রাহ্মণের পদসেবা। দাদার পদসেবা া হয় একটু করলুম, সে আমি খুসি হয়ে রতে পারি, কিন্তু উনি চান ওঁর দলে যত াহ্মণ আছে সকলের পায়ে হাত বুলোতে হ'বে। এ কী করে পারি বলুন দেখি!"

আমি বল্লুম—"দাদা ক্ষেপে গেল নাকি!"

হরিপদ বল্লে—"উনি ঐ নিয়ে ভারি জিদ ধরেছেন। ওঁর দলেরই অনেক ব্রাহ্মণ এতে মহা আপত্তি করছেন; তাঁরা বলছেন, খাম্‌কা একজন এসে পা টিপতে থাকবে এ কেমনতর হবে! এই নিয়ে দলের মধ্যে মহা ঝগড়া বেধে গেছে।"

আমি রেগে বল্লুম—"দেখ হরিপদ, তুমি যদি দাদার এই জবরদস্তি মেনে নাও তাহ'লে আমি তোমার মুখদর্শন করব না।"

হরিপদ বল্লে—"যার-তার পায়ে হাত দেওয়া আমার দ্বারা হবেনা—কেটে ফেল্লেও না।"

আমি হরিপদর পিঠ-থাবড়ে বল্লুম—"এই ত ঠিক কথা!"

এর দিন-দুই পরে দুপুরবেলা দাদা চটে এসে বল্লেন—"দেখলে, হরিপদর আক্কেলটা দেখলে! তার জন্যে আমার কাজ আটকে রয়েছে; তাকে দুদিন ধরে ডাকাডাকি করছি তবু রাস্কেলের দেখা নেই। অকৃতজ্ঞ কোথাকার!"

আমি মুখে কিছু বল্লুম না। মনে মনে ভাবলুম—দাদার হরিপদও এবার গেলেন!

ক্রমে ব্যাপার মন্দ হ'ল না। মহিমচন্দ্রের দৌলতে দাদার আড্‌ডা দিনে-দিনে কৃশ হয়ে আমার আড্‌ডা স্থূল হ'য়ে উঠতে লাগল। দাদার ঘরের ছেলেদের দিকে কটাক্ষ করে সে বলত—ডিম, চা, চুরুট যেখানে বুদ্ধিমানের বাসা সেইখানে। তার কথায় বোকারা চট্‌পট্ বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে লাগল। তাতে করে আমার ডিমের খরচটা একটু বেশী হতে লাগল বটে কিন্তু তা আমি গ্রাহ্য করলুম না। দাদার শিষ্যেরা প্রথম-প্রথম ভদ্রতার খাতিরে ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই তাড়াতাড়ি উঠতে পারলেন না। কাজেই তাঁদের আসন কায়েমী হয়ে যেতে লাগল। তার পর, মহিম-চন্দ্র সমস্ত আটঘাট গানে গল্পে এমন ভরপুর করে রাখত যে গোলে-পালাবার ফাঁক কোথায়? তার উপর সে একখানা প্রহসনের রিহার্সাল জুড়ে দিয়ে আসর সরগরম করে তুলেছিল। দাদা এক-একদিন নিজের ঘরে লোক না পেয়ে আমার ঘরের পাশ দিয়ে কট্‌মট্ করে চেয়ে চলে যেতেন। আমি মজা দেখে মনে-মনে হাসতুম।

এর পর ব্যাপার গিয়ে কোথায় দাঁড়াল সহজেই অনুমান করা যায়। শেষে এমন অবস্থা হল যে দাদার পূজোর মন্দিরে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বালবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তাঁকে নিজের হাতে ঘর-পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে পূজা, আরতি সব একাই করতে হ'ত। তাতে তাঁর অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছিল; এবং বাড়ির ভিতর শোনা গেল প্রতিদিন হবিষ্যি করে তাঁর শরীরও কাহিল হয়ে এসেছে। তার পর, তাঁকে দেখলেই এখন পাড়ার ছেলেরা পাশ-কাটিয়ে পালায়। অতএব —অতএব যে কি হল তা না বলাই ভালো। দাদা প্রথমটা খুব চটে উঠে শেষে নিশ্চয় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ একদিন আমাকে একলা-পেয়ে তিনি বল্লেন—"ন্যাখ্, আমাদের জাতটা একেবারে গেছে—কি বলিস!"

আমি বল্লুম—"নিশ্চয়।"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে বৃথা চেষ্টা।"

আমি বল্লুম—"তার আর সন্দেহ!"

আমার এই কথাটাতে দাদা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর মন অনেকটা আশ্বস্ত হল দেখলুম। এর পর থেকে তিনি আমার জমাট আড্ডার আশপাশ দিয়ে মধ্যে মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চলে যেতে লাগলেন। নিজে সেধে আসতে তাঁর লজ্জা হবারই কথা, তাই আমি তাঁকে একদিন সন্ধ্যেবেলায় চায়ের নিমন্ত্রণ করলুম। তিনি বল্লেন—"চা তো আমি খাব না। তবে একবার ঘুরে যেতে পারি। কিন্তু আমার একটা কাজ আছে, তাই ভাবছি।"

দাদার কাজ যে কোথায় গেল জানিনা, সন্ধ্যাবেলা দেখি তিনি ঠিক হাজির হয়েছেন; তবে চা খেলেন না।

দাদা লোক না পেলে থাকতে পারে না; কাজেই একটু-একটু-করে আমার আসতে-আসতে শেষে জমে যেতে লাগলেন। তার পর, মহিম তাঁকে বুঝিয়েছিল হিন্দুধর্ম্ম-উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পথ হচ্চে হিন্দুমূলক প্রহসন বা নাটকের অভিনয় করে দেশশুদ্ধ লোককে দেখানো। নাটকের যতটা কাজ হয় এমন আর কিছুতে নয়; নাটকই যে একটা জাতকে তোলবার প্রধান উপায় একথা বড় বড় ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করে গেছেন। সেইজন্য দাদা মহা উৎসাহে সঙ্গে মহিমকে নিয়ে হিন্দুনাটক অভিনয়ের প্ল্যান করতে লেগে গেলেন। কাজেই তাঁকে রোজই আমার আড্ডায় আসতে হ'ত। সকলকার সঙ্গেই তিনি মিশতেন কেবল চায়ের পেয়ালাটি ছুঁতেন না; শেষে সেটাও টিঁকলনা; কারণ মহিমদা একদিন বল্লে কোন্ বাংলা মাসিকপত্রে নাকি বেরিয়েছে যে চা-জিনিষটা পুরাকালে হিন্দুদের মধ্যে চলত। তবে ডিম নিয়ে তর্ক সহজে মিটল না। দাদার অনেক বাহুল্য বর্জ্জন গেল বটে কিন্তু তিনি টিকিটি চট্ করে ত্যাগ করতে পারলেন না। কারণ তিনি বোধ হয় মনে করতেন আমার এবং আমার জাতীয় লোকের পরিহাসের বজ্র ধরবার জন্যে ওটারে খাড়া রাখা দরকার। যাই হোক, বেচারা শিখাও যে দিন-দিন শুকিয়ে আসছিল এ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার হত না।.....

ল-কালেজ খুলতে পড়াশুনার চাপে দাদা

াড়ের ভূতটা যে কোথায় পালাল তারও কি দেখা গেল না। তখন একদিন দাদাকে লুম—"দাদা, পিসিমার হাতে খেতে তোমার এখন আর কোনো আপত্তি নেই বোধ হয়।"

দাদা বল্লেন—"বড় কথা মনে করিয়ে য়েছিস্—অনেক দিন তাঁর কাছে যাওয়া য় নি, না?"

আমি বল্লুম—"তুমি তাঁকে কি মন্ত্র দিয়েছ, তেষ্টায় মরে যাচ্ছি বল্লেও আমার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে চান না।"

দাদা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"তাই না কি?"

আমি বল্লুম—"বেশী পীড়াপীড়ি করলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে' ওঠেন—ওরে অমন করে বলিসনি—তোর পায়ে কি আমি মাথা-মোড় খুঁড়ে মরব!"

দাদা বল্লেন—"নিশ্চয় তুই পিসিমাকে চটিয়েছিস্! তোর ঐ সব ছেলেমানুষী উৎপাতগুলো সহ্য করবার শক্তি কি তাঁর এ বয়সে আছে?"

আমি বল্লুম—"দাদা—"

দাদা বাধা দিয়ে বল্লেন—"জানি জানি, তোকে আমি খুব চিনি—তোর আর ইয়ে করতে হ'বে না। তোর এতটা বয়েস হ'ল পিসিমার মুখ চেয়ে একটু বুঝে চলতে পারিস্না। তোর মতন বুড়োধাড়ির ধকল কি সামান্য?"

আমি বল্লুম—"দাদা তুমি ভুল করছ—"

দাদা জোর দিয়ে বল্লেন—"আমি ঠিক বলছি। চ-দিকিন তাঁর কাছে, কেমন তিনি আমায় ফেরান দেখি!"

আমি বল্লুম—"তুমি গিয়ে হাত পাতলে হয়তো তিনি ফেরাতে পারবেন না।"

দাদা বল্লেন—"তাই বল; অপরাধ করবি তুই নিজে, আর দোষ হবে পিসিমার।"

ব্যাপারটা যে তা নয়—এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আর তর্ক করলুম না। আমার মনে আশা হচ্ছিল হয় ত দাদা গিয়ে হাত পাতলে পিসিমার রুদ্ধ-স্নেহ বাঁধ-ভেঙে উপচে পড়বে। সত্যি বলতে কি, তাঁর হাতে খাওয়া না পেয়ে আমার অন্তর-আত্মা ক্ষুধায় ক্রন্দন করছিল। তাঁর কাছে খাওয়া না পেলে যে কিছুই পাওয়া হয় না। তাঁর সমস্ত অন্তরের স্নেহটিকে তিনি যে অন্নপূর্ণারূপেই আমাদের বিতরণ করে এসেছেন। তাঁর হাতে থালা না দেখলে যে তাঁকেই দেখতে পাই না। এ দুঃখ তখন আমার সব-চেয়ে বড় দুঃখ হয়ে উঠেছিল। আমি দাদার হাত ধরে বল্লুম—"দাদা, চল পিসিমার কাছে।"

দাদা যেতেই পিসিমা বল্লেন—"যোগীন, আমাকে কি ভুলে গেলি বাবা? তোর এই পাপী পিসিমাকে মাঝে-মাঝে দুটো ধম্মকথা শুনিয়ে যাস্।"

দাদা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর গম্ভীর-ভাবে বল্লেন—"ও-সব ছেড়ে দিয়েছি পিসিমা।"

পিসিমা বল্লেন—"বেশ করেছিস্ বাবা! —এই কি তোর ধম্মকম্মের সময়? ছেলে-মানুষ তোরা;—এখন হেসে খেলে বেড়াবি।" বলে দাদার ও আমার গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে তিনি গল্প করতে লাগলেন।

কথার মধ্যে দাদা হঠাৎ বলে উঠলেন —"পিসিমা, আজ তোমার এখানে খাবো বলে' বাড়িতে খেয়ে আসিনি।"

পিসিমা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন।

দাদা বল্লেন—"দেখচ কি পিসিমা? আমার ক্ষিধে পেয়েছে এখনো টের পাওনি?"

পিসিমা বল্লেন—"আহা তাই বুঝি তোর মুখখানি অমন শুকিয়ে গেছেরে?" বলেই পিসিমা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটুখানি গিয়েই থম্‌কে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসে চুপটি করে আমাদের পাশে বসলেন।

দাদা বল্লেন—"কি হ'ল পিসিমা?"

পিসিমা নিরুত্তর।

দাদা বল্লেন—"যাও পিসিমা, বসলে কেন? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে!"

পিসিমার কাতর মুখখানি কান্নার বিহ্বলতায় ভরে উঠল; চোখদুটি ছল্ ছল্ করতে লাগল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দাদা প্রথমটা কেমন থম্‌কে গেলেন। তার পর একটু চুপ করে তিনি পিসিমার হাত ধরে বল্লেন—"কি হ'ল পিসিমা তোমার?"

পিসিমা চোখের জল সাম্‌লে বল্লেন—"তুই ত সব জানিস বাবা, কেন তবে—" বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ এল।

দাদা কি বলতে যাচ্ছিলেন তাঁরও আটকে গেল। পিসিমা ছল্-ছল্ চোখে চাইতে লাগলেন তাঁর মনের নিরুপায়তার অস্ফুট ছট্‌ফটানি দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বল্লুম—"পিসিমা তুমি যদি না খেতে দাও তবে—"

পিসিমা আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে ছিট্‌কে দূরে চলে গেলেন। তাঁর মুখখানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দেখলুম তাঁর দু-চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে বিভীষিকায় নিদারুণ ভীত হয়ে উঠেছে। তিনি আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলেন—"ওরে আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর!—আমার পরকাল নষ্ট করিস নি।"

আমরা তাঁর সেই ভয়াচ্ছন্ন সুদূর-প্রসারিত চোখের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পিসিমা হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বল্লেন—"বোস্ বাবা, তোরা বস।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষণিক-মিলন

মধুবসন্ত আসেনি তখনো হায়,
দ্বিধাভরে পিক উঠে নাই ফুকারিয়া;
মৃদুল মধুর বহেনি দখিন-বায়,
প্রথম তোমারে দেখেছিনু যবে প্রিয়া!

সন্ধ্যা তখন নামিছে আলোর শেষে,
থেমে গেছে যত দিবসের উচ্ছ্বাস।
একাকিনী তুমি সন্ধ্যা-রাণীর বেশে
দাঁড়াইয়াছিলে পরি ঘন-নীলবাস!

সরল আঁখির নিবিড় দৃষ্টি দানে
এনে দিলে প্রাণে দুঃসহ রসাবেশ!
আধ-তন্দ্রায় আমি শুধু তব পানে
তৃষিত, কাতর, চেয়েছিনু অনিমেষ।

দখিণ-বাতাস লাগিল নিমেষে বুকে,
দুরু দুরু করি দুলিয়া উঠিল হিয়া;
শিরায় শিরায় না-জানি কি কৌতুকে
আকুল সেতার উঠিল ঝঙ্কারিয়া!

পরাণ মথিয়া প্রণয়-অমৃত আনি
ভরিয়া দিলাম দুখানি ললিত মুঠি;
স্ফুরিত ওষ্ঠে ফুটিলনা তব বাণী,—
মুখ 'পরে শুধু রাখিলে নয়ন দুটি!

হাতে হাতে দোঁহে রহিনু নীরবে চেয়ে,
আঁখিতে আঁখিতে মুগ্ধ, নিমেষ-হত!
মদির আবেশ ফেলিল দোঁহারে ছেয়ে,
মিলনের সুখ বাজিল দুখের মত!

ঘনায়ে আসিল ক্রমে বিদায়ের ক্ষণ,
মোহাবেশ টুটে গেল নিমেষের মাঝে;
তপ্ত ললাটে দিনু এঁকে চুম্বন!
আজিও সে চুমা শুক-তারা হয়ে রাজে!

তার পরে হায় শুধুই অশ্রুজল,
শুধুই হুতাশ আকুল পাগল পারা,—
সুখী তবু আমি,—আছে মোর সম্বল,
আছে স্মৃতিটুকু,—আছে ওই শুকতারা!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের গতি

য়ুরোপে চপলা লক্ষ্মীর পদ্মাসন আজ রক্ত-সরোবরে টলমল। এই কুরুক্ষেত্রের কারণ যে যাহাই বলুক, ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথাটা যে ইহার মূলে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

লড়াই সুরু হইতেই আমাদের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানি, বেচাকেনা, সোণা-রূপার দেনা-পাওনা সমস্ত ব্যাপারেই খুব একটা নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। আমরা য়ুরোপীয় মালপত্তরের দাস—প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমাদের ইহা একান্ত আবশ্যক; অতএব এই সকল জিনিষের রপ্তানি কমিতে সুরু হইলে আমাদের ঘরে-বাইরে নানা উপসর্গ দেখা দিল। যে দেশে তুলা, পাট জন্মে সে দেশে পরিধানের বস্ত্র নাই, যে-দেশে কাগজ-তৈরীর মাল মসলা আছে, সেখানে লিখিবার কাগজ নাই, যে-দেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চামড়া সরাবরাহ করা হয়, সে-দেশে জুতার মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে আর যে-দেশ লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত সেখানে লবণ না পাইয়া বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে।

দেশের এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কি আসে নাই? মনে ত হয় এই

দিকে রাজপুরুষগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, নতুবা এমন দুর্দ্দিনেও কি কমিশনের বৈঠক বসে? ভারতবর্ষের বৈষয়িক অবস্থা কমিশনরগণ চোখ মেলিয়া দেখেন ত অনেক তথ্য ইঁহারা অবগত হইবেন যাহা লড়াইয়ের এই মহা অশান্তির মধ্যেই অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল য়ুরোপকে কাঁচামাল জোগাইবে আর য়ুরোপ কল-কারখানার সাহায্যে তাহা রূপান্তরিত করিয়া এ-দেশে বিক্রয় করিবে ইহাই ত ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতির মূল কথা। এই জন্য আমাদের মনেও সন্দেহ হইতেছে যে এ-দেশের কাঁচামালের খবর লওয়াই কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। লড়ায়ের পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন করিয়া চালানো হইবে ইহা লইয়া রাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আমাদের চিরপরিচিত লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন:—"ভারতবর্ষে যত-কিছু পণ্যদ্রব্য প্রয়োজন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য তাহা সম্পূর্ণ জোগাইতে না পারিবার কোনো হেতু নাই; আর, তদ্‌পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যের হাটে ভারতবর্ষের কাঁচামাল বিক্রয় করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলে এই অদলবদল উভয়পক্ষেরই মঙ্গলজনক হইবে।" এই সব শুনিয়া আশঙ্কা হয় চিরকালই ভারতবর্ষ অন্যদেশকে কাঠখড় জোগাইয়া দিবে আর তাহার নিজের আবশ্যকীয় তৈজসপত্তরের জন্য তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু আমাদের মতন অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে আর কাহারো নাই। কোনো অর্থনীতি-শাস্ত্র এই বাণিজ্য-সম্বন্ধকে স্ব বিক বলিয়া ইহার পক্ষসমর্থন করিবে কেবলমাত্র কৃষির উপর আমাদের নি করিতে হইলে আমাদের দুর্ভিক্ষ বা বই কমিবে না। ইংলণ্ডের কলকারখা সুবিধার দিকে তাকাইয়া আমাদের দে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে।

দেশের লুপ্তশিল্প আমাদের প্রয়োজ জোগাইতে পারে না বলিয়াই আজ জার্ম্মানি পরিবর্ত্তে জাপান আসিয়া হাটবাজার দ করিয়া বসিয়াছে। এই সুযোগের প্রতীক্ষা জাপান দীর্ঘকাল বসিয়াছিল। চীন ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যাকে মালপত্ত জোগাইয়া জাপান অর্থ সঞ্চয় করিবে ইহাই তাহার অনেক দিনের আশা। তারপর জাপানের সমরশক্তির সঙ্গে অর্থবল যো হইলে হয়ত সমস্ত এসিয়ার উপর কর্ত্ত করিবার অধিকার পাইবে জাপান।

কিছুদিন হইতে শিল্প ও বাণিজ্যে কথাটা আমরাও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখানে সেখানে কিছু-কিছু কাজও হইতেছে। অতএব এই সময়েই য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কেন না এতকাল ধরিয়া য়ুরোপ যাহা গড়িয়াছে তাহার ফলাফল না জানিয়া আমরা কাজে হাত দিতে গেলে ভুল করিবার আশঙ্কা আছে। য়ুরোপে শিল্প-ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য দিয়াছে এবং যে পথ দিয়া ইহা বিস্তার লাভ করিল তাহা জানা থাকিলে ভুলচুকগুলার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইব। ইহা ত সুস্পষ্ট দেখিতেছি এই বাণিজ্য

য়ুরোপীয় সমাজে, রাষ্ট্রে, এমন কি লসম্প্রদায়ের মধ্যেও মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। জীবী ও ধনীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি য়া সমাজের নানা অঙ্গে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ খা দিয়াছে—তারপর এই বিরাট বাণিজ্য-জ্বর আগুন লইয়াই আজ সমস্ত য়ুরোপ লিয়া উঠিল।

য়ুরোপীয় শিল্পইতিহাসকে যাঁহারা বাহির ইতে বিচার করেন তাঁহারাই ইহার প্রতি াকৃষ্ট হন। তাঁহারা ভাবেন বাংলাদেশে রামপুরকে ম্যান্‌চেষ্টারের মতন গড়িয়া লিবেন আর বোম্বে হইবে ভারতবর্ষের ্যাঙ্কাসায়ার। অর্থাৎ দেশের প্রকৃতি ও বিশেষ অবস্থা বিচার না করিয়া ইঁহারা য়ুরোপকেই বাণিজ্যগুরু বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। যে পথ দিয়া য়ুরোপ তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের বহু ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে ভারতবর্ষকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাই ইঁহাদের অভিমত।

আমি কয়েকটি প্রবন্ধে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, দেশের প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষ অবস্থার হিসাব না করিয়া অন্ধ-অনুকরণের দ্বারা আমরা কোনো লক্ষ্যই ভেদ করিতে পারিব না। তারপর, যাহাকে য়ুরোপীয় শিল্পনীতি (Industrial Policy) বলিয়া জানি, এই শতাব্দীতে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প-বাণিজ্যের দিন আজ অস্তগত।

সভ্যতার ভিত্তি গঠনে জাপান য়ুরোপের মালমসলা ব্যবহার করিয়াছে সত্য কিন্তু যে-পরিমাণ মালমসলা জাপানের প্রকৃতিগত সভ্যতার সঙ্গে মিশ খায় নাই, সেই পরিমাণে ইহা নানা বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানেও মহাজন ও শ্রমজীবীর সংঘর্ষ ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, প্রতিযোগিতার ফলে নিষ্কর্ম্মার দল বৃদ্ধি পাইতেছে, কারখানার সঙ্গে কৃষিজীবীর নিকট-সম্বন্ধ আর নাই;—এমন-করিয়া য়ুরোপের সবগুলি উপসর্গ প্রাচ্যসভ্যতার অঙ্গে দেখা দিয়াছে এবং একদিন এই সকল সমস্যাই জাপানের অঙ্গহানি করিবে সন্দেহ নাই।

এইবার য়ুরোপীয় অর্থ-শাস্ত্রের গোড়ার দুই-একটি কথা পাড়িয়া বাণিজ্য ও শিল্প ইতিহাস আলোচনা করিব।

যাঁহারা য়ুরোপীয় অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা য়্যাডাম স্মিথের সুবিখ্যাত গ্রন্থে—Wealth of Nations—যে সকল মৌলিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অবগত আছেন। এক যুগ পূর্ব্বে য়্যাডাম্-স্মিথ যাহা লিখিয়াছেন এতকাল ধরিয়া য়ুরোপীয় অর্থনীতি কেবল উহারই ভাষ্য করিয়াছে মাত্র।

শ্রমবিভাগ (Division of labour) দ্বারা জাতীয় ধন-বৃদ্ধি হয় এই কথাটা য়ুরোপ অর্থনীতি শাস্ত্রজ্ঞের মুখে শুনিয়া আসিতেছে, অতএব তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে শ্রমবিভাগের চূড়ান্ত দেখা যায়। বিপুল কারখানায় বিভাগের পর বিভাগ সৃষ্টি হইয়া মানুষকে কলের মতন করিয়া তোলা হইয়াছে।

নিউইয়র্কে এক জুতার কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম; সেখানে একজন বৃদ্ধ কারিগরের সঙ্গে কথা বলিয়া জানিলাম,

যখন সে আট বছরের বালক তখন এই কারখানায় সে প্রথম কাজ গ্রহণ করে; আজ তাহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। এতকাল পর্য্যন্ত এই কারখানায় হুক্ বসানো মেসিনের মধ্যে কেবল জুতাগুলোকে আগাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার কাজ। সাতান্ন বৎসর একটা লোকের জীবন কাটিল কেবল জুতায় হুক্-বসানো মেসিনের দাসত্ব করিয়া! যে অর্থনীতি অনুসরণের ফলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা কিছুতেই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না।

আজ য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল কথাগুলি লইয়া সে-দেশের পণ্ডিতেরা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন এবং এতকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহার সুরে কিছু পরিবর্ত্তনও দেখা যাইতেছে। শ্রমবিভাগ দ্বারা আশু ফল পাওয়া গেলেও সমাজের পক্ষে ইহা কল্যাণকর নহে এ কথা য়ুরোপের কোনো কোনো অর্থনীতিজ্ঞ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শক্তির বিকাশের পথে ইহা অন্তরায়। অতএব ইঁহারা আশা করেন শ্রমজীবীগণের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা (integration of labour) শিল্পোন্নতি করিবেন এবং তাহা হইলে সমাজের স্তরে স্তরে আবর্জ্জনারাশি আর জমিয়া উঠিতে পারিবেনা। তারপর যেদিন ষ্টীম্ আবিষ্কৃত হইল সেই দিন হইতেই কল-কারখানার সৃষ্টি,—আর সেই কারখানাতেই সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। শিল্পী তাহার হাত-গড়া নানা কৌশল ত্যাগ করিয়া কলকব্জার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিল আর কারখানার কাজ করিবার জন্য পাড়া-গাঁ ছাড়িয়া কুলী-মজুরেরা আসিয়া জুটিল। যে শিল্পী আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত, কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার মানিল। ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা বলিল আমরা সমস্ত পৃথিবীকে তৈরী-মাল জোগা আর সমস্ত পৃথিবী আমাদের কাঁচা দিবে। নিজেদের দেশে ফসল উৎ করিবার ভাবনায় আমাদের প্রয়ো কি? রুসিয়া, হাঙ্গেরি,—যাঁহারা আমা মত কলকারখানার মালিক নয়—তাহা মাঠে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন কর বেলজিয়ম্ মেষ চরাইয়া আমাদের প দিবে, ভারতবর্ষ তুলা, পাট, তৈলশস্য দি ক্যানাডা ফলমূল পাঠাইবে, নিউজিল্যা মাংস পাঠাইবে আর আমরা ইহাদের ক কারখানার তৈরী নানবিধ পণ্যদ্রব্য পাঠাইব

যাহা হোক্, ইংলণ্ড কিছুকাল এই ভা উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করিয়া কলকা খানার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত সুরু করিল আর পৃথিবীর চারিদিকে তা রপ্তানি করিয়া প্রভূত ধনের অধিকা হইতে লাগিল। য়ুরোপের অন্যান্য দে তখনও ষ্টীমের কলকারখানা প্রবর্ত্তিত নাই, অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-ক্ষে ইংলণ্ডের ছিল তখন একছত্র রাজত্ব। তারপ যতই অর্থাগম হইতে লাগিল ইংলণ্ডে অর্থনীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ ভাবিলেন, শ্রমবিভা দ্বারা দেশের অর্থ বৃদ্ধি পায় এ-সম্বন্ধে আ সন্দেহ নাই, কেননা এই উপায়েই ইংলণ্ডে মহাজনেরা লাভবান হইতেছে আর ক্রমশ জাতীয় ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু চিরদিন এইরূপ ব্যবস্থা কি

র চলে? কেন্দ্রীভূত হইয়া শিল্প িজ্য আর কতদিন কেবল ইংলণ্ডকে প্রভূত র অধিকারী করিবে? তারপর যখন খা গেল য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও লকারখানা স্থাপিত হইয়া তাহাদের নিত্য-য়োজনীয় পণ্যদ্রব্য তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত রিতে পারিতেছে তখন হইতেই ইংলণ্ডকে াহার মালপত্র চালাইবার কথা লইয়া মাথা মাইতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্তার কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হই। ১০ হইতে ১৮৭৮ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড মন আশ্চর্য্য দ্রুতবেগে বাণিজ্য-বিস্তার রিতে সক্ষম হইয়াছিল তেমন আর কোনো দেশে সম্ভব হয় নাই।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির আমদানি ৩০ টন্ হইতে ৩৮০,০০০,০০০ টন্, কারখানার তৈরী দ্রব্যাদির রপ্তানি ৪৬ হইতে ২০০, ০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ত্তর বৎসর মধ্যে! ইংলণ্ডে এই সময়ের মধ্যেই রেল প্রস্তুত হইয়াছিল পনর হাজার মাইলেরও র্দ্ধে। কয়লার খনি হইতে এই সময়ের মধ্যে ০ টন্ হইতে ১৩৩,০০০,০০০ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। এই সময়েই মহাজনেরা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ডের ধনকুবেরদের ঘরে যে বিপুল অর্থ সঞ্চিত, তাহার অধিকাংশই এই সময়ের উপার্জ্জিত এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত।

ইংলণ্ডের Statistical Societyর এক পত্রিকায় একজন সভ্য এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের মহাজনেরা বিদেশে নানা-ব্যবসায়ে কি পরিমাণ অর্থ খাটান, তাঁহাদের বাৎসরিক আয় হইতেই সেটা বুঝা যাইবে।

বিদেশীয় বাজারে খাটানো মূলধন হইতে ইংলণ্ডের বাৎসরিক আয় ৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪,৫০০,০০০,০০০ টাকা। এই অঙ্ক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লওয়া হইয়াছিল—এখন নিশ্চয়ই ইহা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তবে কি মূল্য দিয়া ইংলণ্ড এই বিপুল বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছিল তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দেশের শ্রমজীবীগণের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য এক কমিশন বসাইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে যে সকল লোমহর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে দেহ-মন শিহরিয়া উঠে। ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসের সেই অধ্যায় পাঠ করিয়াও যদি কেহ সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করাকে কোনো দেশের এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি ইতিহাসের ভিতর দিয়া বিধাতার আদেশ শুনিতে পাইলেন না।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একছত্র রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী না হইলেও অল্পকালের মধ্যেই সে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং এখনও পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ইংলণ্ড বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড যে সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছিল আর কোনো জাতি তাহা পায় নাই। একদিকে বিজ্ঞানের

অভ্যুদয় এবং অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কর্ম্মক্ষেত্র এমন সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল যে, ইংলণ্ড বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিসাধন ভিন্ন আর কোনো সাধনার দিকেই বেশী ঝোঁক দেয় নাই।

নগরে নগরে কারখানা স্থাপন, পৃথিবীর চারিদিক হইতে কাঁচামালের আমদানী আর কল-কারখানার সাহায্যে তাহা রূপান্তরিত করিয়া রপ্তানি করা—এই সমস্ত কার্য্য ইংরেজ-জাতটাকে যেন পাইয়া বসিল। কারখানার মালিকদিগকে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইনকানুন করিলেন। য়ুরোপের অনেক দেশে ও এসিয়ায় তখনও কলকারখানা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই সকল দেশেই হাটে বাজারে যত সস্তামাল স্বদেশী পণ্যকে আপন ভিটা হইতে উৎখাত করিয়াছে। তারপর, এই বাণিজ্য রক্ষার ও বিস্তারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে রণতরী।

এদিকে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলিও সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাহারো একচেটিয়া নহে, অতএব কোনো শিল্পই এক বিশেষ দেশমধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিল না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ইহার বিস্তারের লক্ষণ দেখা গেল।

তারপরই সুরু হইল যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্ম্য! ফরাসীদেশে সবেমাত্র তরুণ শিল্প ও বাণিজ্য মাথা তুলিয়া উঠিতেছে এমন সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই বাধিল। ইংলণ্ড দেখিল জার্ম্মানি ও ইতালীর বাণিজ্য ও শিল্প তখনও শৈশবে, অতএব ফ্রান্সের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পকে যদি কোনোরকমে পঙ্গু যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড আরো কিছু শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিষ্কণ্টক রাজত্ব করিতে পারে।

বাণিজ্যরক্ষার জন্য ফ্রান্সও রণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল কিন্তু ইংলণ্ডের নৌ-শ কাছে টিঁকিবার সামর্থ্য তাহার ছিল ফ্রান্স অনেকদিনের চেষ্টায় যাহা গ যুদ্ধের বিপ্লবে তাহা ধূলিসাৎ হই ঊনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে আ ফ্রান্সের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য মাথা তু পারিল। এখন আর ইংলণ্ডের র দ্রব্যের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে না। যাহা তাহার আবশ্যক সে নি তাহার অধিকাংশ প্রস্তুত করিয়া লয় যে পরিমাণ মাল সে রপ্তানি ক পারে তাহার মূল্য ইংলণ্ডের র মালের প্রায় অর্দ্ধেক। ফ্রান্সের র তালিকার মধ্যে বস্ত্রাদিই অধিক।

কিন্তু ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্যনীতির সা ইংলণ্ডের কিছু প্রভেদ আছে। র জিনিষের কাট্‌তি বাড়াইবার ও অ দেশের শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য বৃহদ আয়োজন ফ্রান্স করে নাই। ফরাসী প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছে নিজেদের প্রয়োজ মিটাইতে—তারপর যে-পরিমাণ দ্রব্য তাহাদে নিজেদের আমদানী করিতে হয়, বাণিজ্যে তুলাদণ্ড ঠিক রাখিবার জন্য সেই পরিমা রপ্তানিও করা প্রয়োজন। কিন্তু এই রপ্তানি জন্য ফ্রান্স কোনো উপনিবেশের প্রতি উৎপাত করে নাই, কেবল ইহাই চে করিয়াছে যাহাতে ফ্রান্সকে অপর কোনো

শের উপর কোনো দ্রব্যের জন্য নির্ভর তে না হয়।

এইবার ফ্রান্সের আমদানি ও রপ্তানির ম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ফ্রান্সের যে পরিমাণ শস্য আবশ্যক তাহার দশভাগের ভাগ আমদানি করিতে হয়। কিন্তু ন দ্রুতবেগে এদেশে কৃষি উন্নতির ণ দেখা যাইতেছে তাহাতে ফ্রান্সে এলজিরিয়া বাদ দিয়া) ফসলের পরিমাণ ই এত বৃদ্ধি পাইবে যে, শস্যের আমদানি ত হইবেই বরং অতিরিক্ত ফসল পাওয়া ইবে।

কফি ও রাইতিলতিসি-জাতীয় তৈল ক্ষিত বীজ ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে আমদানি রে। এই জাতীয় শস্য ফরাসিদেশে ৎপন্ন করা সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে কৃষিবিভাগ নুসন্ধান করিতেছেন।

ফ্রান্সে কয়লার খনিগুলি ইংলণ্ডের মতন পরিচালিত নহে। সে জন্য ফ্রান্সকে বেলজিয়ম্, জার্ম্মানি ও ইংলণ্ড হইতে কিছু কিছু কয়লা আমদানি করিতে হয়, কিন্তু স্বদেশের কয়লা-খনিগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইলেই এই আমদানিও বন্ধ হইবে।

কিছু তুলা, কিছু পশম ও কিছু রেশম ফ্রান্সে আমদানি করা হয়। তৈরী বস্ত্রাদির আমদানি অতি সামান্য, কিন্তু ১৯০৯-১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৩৪, ৪৪০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রকার দ্রব্যের আমদানি হইয়াছিল প্রায় ৬৮,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কিন্তু রপ্তানি হইয়াছিল ১৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তৈজস-পত্র;—কাঁচামাল নয়। অল্পকাল মধ্যে ফ্রান্স নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রচুর দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন ফ্রান্সে কি কখনো ইহা সম্ভব হইত?

(ক্রমশ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জলের-আল্পনা

এক

গাছের মাথায়-মাথায় সকালের কচি রোদটি আসিয়া পড়িয়াছে—ঘন সবুজের উপরে যেন ফিকে সোণার-জলের ঝিক্‌মিকে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে!

সেনেদের বাড়ীর মস্ত বাঁধানো উঠানের উপরে দাঁড়াইয়া এক বৈষ্ণব-ভিখারী আনন্দ-লহরী বাজাইয়া গান ধরিল—

"রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে,
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না-জানি কারসনে!
কেন গাঁথ চিকণ মালা,
ছেড়ে যাবে চিকণ কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা—জপমালা হবে মনে।"

বাড়ীর গিন্নী অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বৈরাগী-ঠাকুর, ও দুঃখের গান আজ্‌কের দিনটায় আর গেয়ো না—ছেলেটা আজ কল্‌কাতায় যাবে!"

ভিখারী মাথা নাড়িয়া নূতন গান ধরিল—

"এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা,—
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরব রসের নব গোরা!—"

ভিখ্‌ পাইয়া ভিখারী চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া একটা ঘরের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দরজা ঠেলিতে-ঠেলিতে ডাকিলেন, "গৌরী, অ গৌরী! বলি, একগঙ্গা রোদ হোল্‌, এখনো তোমার ঘুম ভাঙ্‌ল না বাছা!"

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল, "যাই মা, যাই!"

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল একটি পনেরো কি ষোল বছরের মেয়ে, তাহার রংটি ফর্‌সা নয় বটে, কিন্তু পুরন্ত মুখখানি এবং নিটোল গড়নটি লাবণ্যে যেন ঢলঢল করিতেছে। আসন্ন যৌবনের দখিন হাওয়ার সাড়া পাইয়া তাহার রূপের কুঁড়ি আজ ফুলের মত পাপড়ি মেলিয়া ফুটি-ফুটি করিতেছে!

অন্নপূর্ণা তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও আমার পোড়াকপাল! তাইত বলি, সবাই উঠ্‌ল, আর আমার গৌরীর রাত এখনো পোয়াল না কেন? হ্যাঁরে হাবা মেয়ে, কাল সারারাত জেগে-জেগে বুঝি কান্না হয়েছিল? জয় আজ কল্‌কাতায় যাবে বলে তোর মন-কেমন করেছিল বুঝি?"

গৌরী টোল্‌-খাওয়া গাল-ছটি [illegible] করিয়া মুখ নামাইয়া লইল; না-বলি[illegible] ঘো নাই,—তাহার মুখের উপরে এ[illegible] শুষ্ক অশ্রুর দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার চিবুকে হাত [illegible] স্নেহভরে বলিলেন, "ছিঃ মা, কান্না কিসে[illegible] জয় ছুটি হলেই ত ফের এখানে আস[illegible] হরি করুন, সুভালাভালি তার [illegible] পড়াটা সাঙ্গ হয়ে যাক্‌, আমিও তো[illegible] তার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তি হই!"

গৌরীর গায়ের উপরে কাহার [illegible] আসিয়া পড়িল; চোখ তুলিয়া তাহা[illegible] দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি সেখান হ[illegible] পলাইয়া গেল!

অন্নপূর্ণার পিছনেই একটি যুবক আসি[illegible] কখন্‌ যে দাঁড়াইয়াছে, কেহই তাহা জানি[illegible] পারে নাই।

যুবার রং অত্যন্ত গৌর, বাঙালী[illegible] মধ্যে তেঁমন রং সহজে চোখে ঠেকে না[illegible] মাথায় বড় বড় কোঁকড়ান চুল;—চোখদুটি যেমন শান্ত তেম্‌নি স্বপ্নালস; নাকটি প্রতিমার নাসিকার মত টিকলো; ঠোঁটদুখানি পাত্‌লা, মৃদুমৃদু হাসিমাখা; তাহার ফাঁক্‌ দিয়া সারি-বাঁধা শ্বেতপাথরের টুক্‌রোর মত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে; ঠোঁটের উপরে ছোট্ট একটি ভোম্‌রা-কালো গোঁফের রেখা—যেন তুলির একটিমাত্র নিপুণ টান! দেহটি একহারা হইলেও বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ।

গৌরী আচম্বিতে লজ্জা পাইয়া পলাইয়া গেল কেন, বুঝিতে না-পারিয়া অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যুবককে দেখিয়া

[illegible]য়া বলিলেন, "ও, বুঝেচি। তুই বুঝি [illegible]ড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুন্‌ছিলি?"

—"তোমার কথা কাণে এসে ঢুক্‌ল, কি [illegible]রি বল মা? তা, গৌরীর অত লজ্জা [illegible]ন?"

—"তুই কল্‌কাতায় যাবি বলে গৌরী [illegible]দে চোখ রাঙা করেচে! আমি ধরে ফেলেচি [illegible]মা, তাই অত লজ্জা!"

যুবক দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ [illegible]রবে কি ভাবিল, তারপর আস্তে-আস্তে [illegible]চে নামিয়া গেল।

যুবকের নাম জয়ন্ত, অন্নপূর্ণা তাহাকে [illegible]য় বলিয়া ডাকেন।

সেদিন দুপুরে জয়ন্ত যখন খাইতে বসিল, [illegible]ন্নপূর্ণা তাহাকে পরিবেষণ করিতে-করিতে [illegible]লিলেন, "জয়, আবার কবে ফির্‌বি বাবা?"

দুটি ভাত ভাঙিয়া জয়ন্ত বলিল, "সেই [illegible]পুজোর ছুটিতে মা!"

অন্নপূর্ণা তাহার সাম্‌নে রান্নাঘরের চৌকাঠের উপরে বসিয়া বলিলেন, "তা [illegible]খ্যাখ্‌ বাবা, গৌরীকে আর ত রাখা [illegible]চলে না।"

জয়ন্তের মুখ হঠাৎ কালো হইয়া গেল। ঘাড় গুঁজিয়া অস্বাভাবিক মনোযোগের সহিত সে ভাতের উপরে ডাল ঢালিতে লাগিল—হাঁ, না, কোন জবাব দিল না।

অন্নপূর্ণা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, চুপ করে' রইলি যে?"

—"আমি ত বলেছি মা, পাশ না করে' বিয়ে কর্‌ব না!"

—"তোকে ত পেটের দায়ে পাশ দিতে হচ্চে না! বিয়েটা হয়ে গেলে আমি যে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচতে পারি!"

—"মা, পেটের দায়ে পাশ না দি, লেখা-পড়ার জন্যে ত দিচ্চি বটে!"

—"বিয়ে কর্‌লে কি লেখাপড়া হয় না?"

—"আপাতত আমাকে মাপ কর্‌তে হবে মা! আগে এম-এ-টা দি, তারপর এ-সব ভাব্‌বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!"

—"তোর যা মনে হয়, কর্‌! কিন্তু আমি যে সত্যি করেচি তা যেন মিথ্যে না হয়!"

জয়ন্ত চুপ মারিয়া মুখে ভাতের গরস্‌ তুলিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে আর-একবার সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া, অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ন্ত আপনার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পাণের ডিবা হাতে করিয়া গৌরী দাঁড়াইয়া আছে।

গৌরীকে দেখিয়া জয়ন্ত আজ যেন কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

গৌরী পাণের ডিবাটি তাহার হাতে আগাইয়া দিল।

জয়ন্ত কোন কথা না-কহিয়া ডিবাটি টেবিলের উপরে রাখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল।

জয়ন্তের আজ্‌কের ভাবগতিক্‌ দেখিয়া গৌরী ভারি অবাক হইয়া গেল। অন্য-অন্য বারে ছুটির শেষে কলিকাতায় যাইবার দিনে, যে-জয়ন্ত কাতর মুখে ছলছল চোখে তাহার সঙ্গে আবোল-তাবোল কত কথাই কহিত, সেই মানুষই আজ এত চুপ্‌চাপ্‌, এত আন্‌-মনা, এত চিন্তিত কেন?

গৌরী খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ করেচে?"

জয়ন্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, অসুখ করবে কেন?... ...আচ্ছা গৌরী, এবার কল্‌কাতায় গিয়ে তোমাকে কি কি বই পাঠাতে হবে বল দেখি?"

—"ঘরে-বাইরে, বলাকা, চতুরঙ্গ।"

—"আচ্ছা।"

—"রোজ চিঠি লিখো।"

—"হুঁ।"

জয়ন্ত জান্‌লার দিকে মুখ ফিরাইল। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে রোদ-ভরা খোলা মাঠের কতক-কতক দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে উদাসীন চোখে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ চুট্‌কীর আওয়াজে জয়ন্তের চটক ভাঙিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, মুখখানি ম্রিয়মান করিয়া গৌরী ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিতে গেল, —কিন্তু কি ভাবিয়া আবার থামিয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জয়ন্ত এক-খানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

... ...

জগদীশপুরের সেনেরা পুরাতন বনিয়াদি বংশের বিখ্যাত পরিবার। জয়ন্ত এখন এই বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ।

জয়ন্তের পিতা অনঙ্গমোহনের দুই বিবাহ। সূতিকাগৃহে জয়ন্তকে প্রসব করিয়াই অনঙ্গমোহনের প্রথম স্ত্রী পরলোকে চলিয়া যান। জয়ন্তের বয়স যখন একবৎসর, তখন তিনি অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহের ছয়বৎসর পরেই অনঙ্গ-মোহনের অকাল-মৃত্যু হয়।

মা-হারা জয়ন্ত কিন্তু কোনদিনই মা অভাব বুঝিতে পারে নাই। জয়ন্তকে কো পাইয়া বন্ধ্যা অন্নপূর্ণাও মাতৃত্বের আ পাইয়াছিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত জ জানিত অন্নপূর্ণাই তাহার আপন মা।

সন্তান হয় নাই বলিয়া কেহ যি কখনো দুঃখপ্রকাশ করিত, অন্নপূর্ণা অ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিতেন, "ষাঠ্, ষা জয় আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক-শ বছর বেঁচে থাক্—ওযে আমার সাত-রাজার ধন এক মাণিক! আমার আবার ছেলে অভাব, অমন কথা কেউ মুখে এননা!"

অন্নপূর্ণার এক বাল্যসখী ছিলেন মেনকা। একই গ্রামে তাঁহাদের দুজনের জন্ম হয়—একই গ্রামে তাঁহাদের দুজনের বিবাহ হয়। তবে অন্নপূর্ণার মত মেনকা ধনীর হাতে পড়েন নাই।

গঙ্গাসাগরে গিয়া মেনকার সঙ্গে অন্নপূর্ণা যেদিন 'সাগর' পাতান, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোর যদি মেয়ে হয় ভাই, আমার জয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব!"

মেনকা বলিলেন, "এখন তুই এ-কথা বল্‌ছিস্ বটে, কিন্তু গরিবের মেয়েকে শেষটা তোর মনে ধর্‌বে কেন ভাই?"

রাগ করিয়া মেনকার গালে তিন ঠোনা মারিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমাকে তুই এমন কথা বল্‌লি সাগর! আমি কি তোকে সেই চোখে দেখি? তোর মেয়ে হোলে তার সঙ্গে আমার জয়ের বিয়ে দেব, দেব, দেব, -এই গঙ্গাজল ছুঁয়ে তিনসত্যি কর্‌লুম! জানিস্ ত, ছেলেবেলা থেকে সজ্ঞানে আমি কখনো মিছে কথা বলি-নি!"

ভগবান যেন এই দুই সখীর মনের ধ মিটাইয়া দিলেন—মেনকার একটি য়েই হইল। অন্নপূর্ণা সাগরের মেয়ের াম রাখিলেন, গৌরী।

তারপর অল্পবয়সেই মেনকা মৃত্যুশয্যায় য়ন করিলেন। আসন্নমরণা মেনকা, গৌরীকে অন্নপূর্ণার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে গৌরী এই সংসারে অন্নপূর্ণার আপন কন্যার মতই আছে। এবং অন্নপূর্ণাও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলেন নাই।... ... ...

বাল্যকাল হইতেই জয়ন্ত জানে গৌরী তাহার বউ, গৌরী জানে জয়ন্ত তাহার বর। মুখের কথায় তাহাদের গোপন প্রেম কখনো বাহিরে প্রকাশ পায় নাই বটে, কিন্তু দুজনের মন জানিত—তাহাদের মনের কথা কি!

জয়ন্ত যতদিন দেশে থাকিয়া পড়াশুনা করিত, গৌরীকে সে লিখিতে-পড়িতে শিখাইত। কলিকাতায় গিয়াও জয়ন্ত গৌরীর লেখাপড়ার কথা ভুলে নাই; যখন-তখন তাহার কাছ হইতে গৌরী ভালো-ভালো বই উপহার পাইত।

এতদিন গৌরীর সঙ্গে জয়ন্তের বিবাহ কোন্‌কালে হইয়া যাইত। কিন্তু বাল্য-বিবাহে জয়ন্তের অত্যন্ত আপত্তি ছিল বলিয়াই এই শুভকর্ম্মটি ঘটিয়া উঠে নাই।

দুই

বিবাহ করিয়া জগৎবাবু বন্ধুমহল হইতে 'স্ত্রৈণ' নামক বিখ্যাত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎবাবু ঘাড় নাড়িয়া অভিযোগকারী বন্ধুবর্গকে বলিতেন, "কিন্তু আমার স্ত্রীর মতে আমার মত অমনোযোগী স্বামী দুনিয়ায় আর দুটি নেই!"

বন্ধুরা চটিয়া বলিতেন, "তোমার স্ত্রীর মত্ যাই হোক্, আমাদের মতে তুমি একটি একের নম্বরের স্ত্রৈণ।"

জগৎবাবু খুব খুসি হইয়া জবাব দিতেন, "হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।"

তাঁহার এই অপরিসীম নির্লজ্জতায় বন্ধুদের মুখ বোবা হইয়া যাইত!

এ অনেকদিনের কথা। তারপর জগৎ-বাবুর প্রিয়তমা পত্নী সংসারের মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন,—স্বামীর কোলে দুটি মেয়েকে স্মৃতিচিহ্নের মত রাখিয়া।

'পুত্রার্থে' দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য জগৎবাবুকে অনেকে অনেক সাধা-সাধি করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের পাকা দাড়ির দিকে চাহিয়া এমন কাঁচা কাজ করিতে তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। তাঁহার মতে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যা যতটা লোভনীয়, ততটা শোভনীয় নয়।

জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত জগৎবাবু লক্ষ্মী বা সরস্বতীর পায়ে হেঁটমুখে গড় করেন নাই; অথচ যে-দুটি জিনিষের লোভে লোকে প্রাণপণে ঐ দুই দেবীর মোসাহেবী করিয়া থাকে, জগৎবাবুকে কোনদিন তাহার অভাব ভুগিতে হয় নাই!

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশে একশ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন—হিন্দুর তেত্রিশকোটি বা অহিন্দুর ঈশা-মুসা প্রভৃতি কাহাকেও কোন-কিছু করদান করিতে

তাঁহারা নেহাৎ নারাজ। রামপক্ষীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেও এঁরা কিরিঙ্গি নন; আবার হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলেও টিকি বা পৈতার কোনই মর্য্যাদা রাখেন না। সাহেবরা বলে, দেশে যত অশান্তি সব এঁদের জন্যই এবং বাঙালীদের মতে, এঁরা কালাপাহাড়—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুখে চুণ-কালি মাখাইতেই এঁরা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগৎবাবু বয়সে নবীন না হইলেও এই অপ্রবীণ দলেরই একজন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে জগৎবাবু বড়ই অসহায় হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরের শূন্যতা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উদাস করিয়া দিত, তাই সদর মহলেই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যাইত।

বন্ধুদের কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে বলিতেন, "ওহে, আমার আর একলা থাকতে ভালো লাগে না। তোমরা এসে যদি দুটো গল্পগুজব কর, তাহলে তবু একটু শান্তি পাওয়া যায়।"—থামিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে আবার বলিতেন, "ভূমিহীন মহারাজা এদেশে অনেক আছে বটে, কিন্তু স্ত্রী-হীন স্ত্রৈণ বোধহয় একটিও নেই —কি বল?"

বন্ধু হয়ত কোন জবাব দিতেন না। জগৎবাবু তামাক টানিতে-টানিতে জড়িত স্বরে বলিতেন, "কিন্তু স্ত্রৈণ হওয়ায় ঢের সুবিধে আছে হে, এমন উপাধি থেকে আমি বঞ্চিত হলুম!"—স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া যাইতেন।

জগৎবাবুর আহ্বানে বন্ধুরা রোজ নিয়মিত ভাবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া আ জমাইয়া তুলিলেন।

এই আসরে যেমন চা-চুরুট-সিগা এবং সেইসঙ্গে প্রায়-পেট-ভরা জলখাবা বন্দোবস্ত ছিল, অন্য-কোথাও তেমন একটা দেখা যাইত না। অতএব, বৈকালী সভাটির সভ্যসংখ্যা যজ্ঞিবাড়ি লোকের মত ক্রমেই হু-হু করিয়া বাড়ি যাইতেছিল এবং সে বন্ধু-সভা শীঘ্রই সর্ব্বসাধারণের সভা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না!

... ...

সেদিন বৈকালে জগৎবাবুর বৈঠকখা তখনো তেমন জমিয়া উঠে নাই।

একখানি সোফার উপরে পা-ছড়াই বসিয়া, জগৎবাবু মাঝে-মাঝে কথা কহিতে ছিলেন এবং মাঝে-মাঝে আল্‌বোলার নল ফুড়ুক্-ফুড়ুক্ করিয়া এক-একটি টা মারিতেছিলেন। জগৎবাবুর স্ত্রী স্বামীর এ তামাক খাওয়াটা দু-চক্ষে দেখিতে পারিতে না। স্ত্রীর মুখ চাহিয়া জগৎবাবু সংসা ছাড়িয়া বনবাসে যাইতে রাজি ছিলেন,— কেবল এই তামাক ছাড়িবার হুকুম পাইলেই তিনি কিন্তু ভয়ানক বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। তাই তাঁহার স্ত্রী এই আল্‌বোলাটিকে সতীনের মতই ঘৃণা করিতেন। আর জগৎবাবুও, পাছে এই আল্‌বোলাটি প্রিয়তমার পায় পড়িয়া গবাক্ষপথে কোনদিন-বা রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই তটস্থ হইয়া থাকিতেন এবং আপনার উত্তমার্দ্ধার সম্মুখে আল্‌বোলার নলে কখনো চুম্বন করিতে ভরসা পাইতেন না! স্ত্রী

যন পরলোক, সুতরাং জগৎবাবু আজকাল ঘণ্টাই বিপুল উৎসাহে নির্ব্বিঘ্নে ন-উদ্গীরণ করিতে থাকেন। সময়ে ময়ে আল্‌বোলার উপরে কলিকা থাকে না—কিন্তু জগৎবাবুর মুখ হইতে তখনো লটি খসিয়া পড়ে না!

জগৎবাবুর ঠিক সাম্‌নেই যে লোকটি সিয়াছিল, তাহার নাম অবনী—দুর্নীতির সে নাকি পরম শত্রু! দেখিতে সে শ্যামবর্ণ— তাহার মুখ-শ্রীও মন্দ নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড ঁাকড়া-ঝাঁকড়া উস্কখুস্ক চুলে এবং ততো-ধিক প্রকাণ্ড একরাশ অন্ধকারের মত কালো দাড়ী-গোঁফে তাহার মুখমণ্ডল এম্‌নি জঙ্গলাকীর্ণ যে, সেই দুর্ভেদ্য আবরণের মধ্য হইতে মুখের কোন শ্রী-ছাঁদ আবিষ্কার করা একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুধু মুখের দাড়ী-গোঁফ বলিয়া নয়, অবনীর দেহটিও যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের মত রোমশ, পাত্‌লা পাঞ্জাবীর ভিতর হইতে একটা ঘনকৃষ্ণ আভা ফুটিয়া উঠিয়া সেটাও জাহির করিয়া দিতেছে। প্রবাদে আছে 'এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়' কিন্তু এই মানুষই যে বনে না-গিয়াও অনায়াসে বনমানুষ বনিতে পারে, সেটা প্রবাদে বা আর-কোথাও শোনা বা দেখা যায় না; এবং এই অবনীকে স্বচক্ষে না-দেখিলে এ-কথাটা বিশ্বাস করাও ভয়ানক শক্ত!

অবনীর পাশে বসিয়াছিল, তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দু। লোকটি কিছুকাল হইতে ওকালতি সুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মক্কেলরা ছিল মাছের মত পিচ্ছল; তাই আজ-পর্য্যন্ত

তাহার কবল হইতে তাহারা অতিশয় সন্তর্পণে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বর্ণেন্দু তবু হাল ছাড়ে নাই,—যেমন যথাসময়ে সে এই বৈঠকে আসিয়া হাজির হয়, তেম্‌নি যথাসময়ে প্রত্যহ তাহার আদালতে যাওয়া চাই-ই-চাই! স্বর্ণেন্দুর গায়ের রং বেজায় কটা; দেহখানি জিরাফের মতন লম্বা এবং বকের ঠ্যাংএর মত সরু-লিক্‌লিকে; তার উপরে আবার সাহেবী পোষাক,—বাঁথারিতে যেন কোট-পেণ্টলুন শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। সেই ঢ্যাঙা এবং রোগা দেহের সঙ্গে মানান রাখিয়া সমঝদার বিধাতা তাহার মুখখানিও এম্‌নি সরুঙ্গে ও লম্বাটে করিয়া গড়িয়াছেন যে, সে মুখের তুলনা খুঁজিতে গেলে নর-রাজ্য ছাড়িয়া ঘোটক-রাজ্যে যাত্রা করিতে হয়।

ঘরের ভিতরে আর-একটি লোক, যিনি কোঁচার খুঁট্ পাকাইয়া নাকে পুরিয়া ক্রমাগত হাঁচিতেছেন আর হাঁচিতেছেন, তাঁহার নাম কৈলাসবাবু। দিন-কে-দিন ভুঁড়ির বহর বাড়িয়া যাইতেছে এবং জামা পুরাতন না-হইতেই আবার নূতন জামার ফরমাজ দিতে হইতেছে বলিয়া আজকাল তিনি জলপান ছাড়িয়া স্যাণ্ডোর শিষ্য হইয়াছেন।... ... ...

অবনী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতেছিল, "এ একটা ফ্যাসান্ জগৎবাবু, এ একটা ফ্যাসান্! নইলে যাঁর কবিতার মানে খুঁজতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয় সেই রবিবাবুকে নিয়ে লোকে এত ধেই-ধেই করে' নাচে কেন?"

জগৎবাবু হুস্ করিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "জয়ন্ত যদি এখানে থাকৃত, তাহলে সে নিশ্চয়ই আপনার কথায় প্রতিবাদ করৃত।"

অবনী অবজ্ঞাভরে ঠোঁটদুখানা নীচের দিকে বাঁকাইয়া বলিল, "জয়ন্তবাবুর আপত্তি-টাপত্তি আমি গ্রাহ্যই করি না।"

স্বর্ণেন্দু মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া বলিল, "বাস্তবিক জগৎবাবু, অবনী হক্ কথাই বল্‌ছে! রবিবাবুর পদ্য সুধুই যে বোঝা যায় না, তা নয়—আমার মেজমামা সেদিন বল্‌ছিলেন যে, রবিবাবু নাকি অক্ষর গুণে পদ্য লিখতে পারেন না।"

জগৎবাবু স্বর্ণেন্দুর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আপনার মেজমামা দেখছি কাব্য-চর্চ্চাও করে' থাকেন! সাধু, সাধু!"

স্বর্ণেন্দুর এক দূর-সম্পর্কের মেজমামা আছেন, তিনি খেতাবী রাজা; এক দূর-সম্পর্কের মেশো আছেন, তিনি সি-আই-ই; এক নিজ-সম্পর্কের ভাই আছেন, তিনি সওদাগরী অফিসের কেরাণী। স্বর্ণেন্দু যখন কথাবার্ত্তা কহিত তখন মেজমামার নাম করিত বারংবার, মেশোর নাম করিত মাঝে-মাঝে, ভাইয়ের নাম একবারও-না। ভাই যে কেরাণী—তার নাম কি করা যায়—আরে ছোঃ! এইজন্য স্বর্ণেন্দুর আড়ালে সকলে তাহাকে 'মেজমামা' বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

অবনী পা নাচাইতে-নাচাইতে বলিল, "আজকাল দেশে একদল ছোক্‌রা দেখি, 'রবি-ঠাকুর রবি-ঠাকুর' করেই' তারা অজ্ঞান। ঐ চ্যালাদের অতি-ভক্তির ঠ্যালায় অ
ত অস্থির হয়ে উঠলুম মশাই! আ
জয়ন্তবাবুর যদি একটুও রসবোধ থা
তাহলে তিনি রবিবাবুর এমন অন্ধ নি
গোঁড়ামী কর্‌তে পার্‌তেন না। আমি কি
হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়া অ
থতমত খাইয়া একসঙ্গেই পা-নাচানো
রবিবাবুর সমালোচনা বন্ধ করিয়া ফেলি
তারপর তাড়াতাড়ি স্বর বদলাইয়া ব
উঠিল, "এই যে, জয়ন্তবাবু! আসুন
আসুন, এইমাত্র আপনার কথাই হ
যে!"

জয়ন্ত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আ
আস্‌তে-আস্‌তেই সব শুন্‌তে পেয়েছি!"

জগৎবাবু আল্‌বোলার নল ফেলি
বলিলেন, "দেশ থেকে কবে ফির্‌লে হে?"

জয়ন্ত বলিল, "আজ সকালে।...
তারপর অবনীবাবু, আপনি গোঁড়ামী আ
রসবোধের কথা কি বল্‌ছিলেন না?"

অবনী দুটো ঢোঁক গিলিয়া আত্মস
আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, না, এমন-কি
নয়—এমন-কিছু নয়।"

কৈলাসবাবু নাকে কোঁচার খুঁট ঢুকাইয়া
হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করিয়া দুবার হাঁচিয়া,
দুষ্টামি-মাখানো হাসি হাসিয়া বলিলেন,
"জয়ন্তবাবু, অবনীবাবু বল্‌ছিলেন যে রবিবাবু
কবি নন, আর আপনার রসবোধ নেই
আর—"

অবনী রাগে গস্‌গস্ করিতে-করিতে
হুম্‌কি দিয়া উঠিল, "বল্‌ছিলুম ত বল্‌ছিলুম;
—তাতে হয়েছে কি?"

জয়ন্ত রাগ সাম্‌লাইয়া বলিল, "না,

মন-কিছু হয়-নি! তবে কি জানেন,
পনার দুটি মত ই ভ্রান্ত!"

—"ভ্রান্ত কিসে?"

—"অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, আর,
আমার রসবোধ আছে!"

—"মহাকবি! যিনি মহাকাব্য লেখেন-
, তিনি মহাকবি!"

জয়ন্ত কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল,
এমনসময় চাকর আসিয়া টেবিলের উপরে
খাবারের থালা আনিয়া রাখিল।

অম্‌নি কৈলাসবাবু হাঁচি থামাইয়া টপ্-
করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং শূন্যে
দুহাত তুলিয়া বলিলেন, "শান্ত হোন, শান্ত
হোন, আপনারা শান্ত হোন! খাবার ভরা
থালা যখন সাম্‌নে এসে অপেক্ষা করে,
তখন হাত-গুটিয়ে মুখবন্ধ করে' তর্ক শোন্‌বার
ধৈর্য্য আমাদের নেই! অতএব—"

অতএব কৈলাসবাবু অতুল উৎসাহে
বিপুল ভুঁড়িটি দুলাইয়া এবং সাগ্রহে দুই খাবা
পাতিয়া খাবারের থালাকে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ
করিলেন।

তিন

জগৎবাবুর বাড়ীর পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে।

সেইখানে একখানি লোহার বেঞ্চির উপরে বসিয়া জগৎবাবুর বড় মেয়ে ইন্দুলেখা আপনমনে গুণ্‌গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছিল। এমনসময় পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া সে গান বন্ধ করিল। পিছন না-ফিরিয়াই বলিল, "কে?"

—"আমি।"

—"কে জয়ন্তবাবু?"—বলিয়াই ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

—"হ্যাঁ, আমি। তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম।"

—"দেশ থেকে কবে এলেন?"

—"আজ সকালে।"

—"ভালো আছেন ত?"

—"হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ ইন্দু?"

—"ভালোই আছি। বসুন।"

জয়ন্ত বেঞ্চির একপাশে গিয়া বসিল।

ইন্দুলেখার গড়নটি ছিপ্‌ছিপে—সাধারণ বাঙালী স্ত্রীলোকের তুলনায় সে একটু দীর্ঘাকার—কিন্তু সে দীর্ঘতা তাহার দেহ-খানিকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ছোট্ট কপালখানির উপরে একরাশি কোঁকড়া চুল নাচিয়া-নাচিয়া উঠিতেছে। ভুরু-দুখানি যোড়া—যেন এতটুকু একখানি ছবির ধনুকের মতন। ঘনপল্লবের মাঝে উজ্জ্বল ও আয়ত দুটি চোখ—তার দৃষ্টি এমন চঞ্চল, যে দেখিলেই মনে হয়, এ যেন কালো মেঘের মধ্যে রহিয়া-রহিয়া যুগল বিদ্যুতের চমক! ঠোঁটদুখানি পাত্‌লা, যেন রক্তকমলের হাল্‌কা পাপ্‌ড়ি! চিবুকের উপরে একটি তিল—যেন তার চোখের তারা আঁকিবার সময়ে বিধাতার তুলির মুখ হইতে একতিল কালি এখানে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে! বাহুদুখানি নধর-নিটোল, সে পেলবতার তলায় কঠিন হাড় আছে বলিয়া বোঝাই যায় না। ইন্দুর গায়ের রংটিও অপূর্ব্ব,—যেন ভোরের আকাশ হইতে খানিকটা গোলাপী আভা ছানিয়া আনিয়া কে তার সর্ব্বাঙ্গ ছোবাইয়া দিয়াছে।... ...

জয়ন্তের পাশে বেঞ্চির উপরে বসিয়া ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি ত দেশে গিয়ে বেশ দিনকতক কাটিয়ে এলেন, আমার কিন্তু এখানে আর মন টিঁকছে না। বাবাকে এত করে' বলছি দিনকতক আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে, তা যাচ্চি-যাব করে' এস্তানাগাৎ তাঁর যাওয়া আর হোলই না! কল্‌কাতা ছাড়্‌তে তাঁর গায়ে যেন জ্বর আসে—বাবা বাবা, এমন মানুষ আর ত দেখি-নি!"

—"হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে দেশবিদেশে বেড়িয়ে এলে মনের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরেরও উন্নতি হয়।"

ইন্দু তাহার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র পা-দুখানি ঘনসবুজ ঘাসের উপরে দুলাইতে-দুলাইতে বলিল,—"আপনি বেশ আছেন জয়ন্তবাবু, কল্‌কাতা যদি একঘেয়ে লাগে অম্‌নি দেশে পালিয়ে যেতে পারেন। আমাদেরও দেশ আছে, শুনেছি সেখানে নাকি মস্ত তিন-মহল বাড়ীও আছে, কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত সব রূপকথার মত শুনেই আস্‌ছি—কিছু চোখে দেখা আর হয়ে উঠল না।"

—"কেন, ইচ্ছে করলেই ত সেখানে তোমরা যেতে পার!"

—"ওরে বাস্ রে, কার এমন সাধ্যি আছে বাবাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে! দেশের নাম না-কর্‌তেই বাবা ভয়ে একে-বারে আঁৎকে উঠ্‌বেন—চোখ কপালে তুলে বলবেন, সেখানে ঘরে আছে ম্যালেরিয়ার জাগ্রত মশা, বাইরে আছে গোখ্‌রো সাপ আর পুকুরের জলে আছে কলেরার বীজ!"

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাবার অম্‌নি-কতকগুলো ছিট্ আছে বটে! আর সুধু তিনি কেন, তাঁর সঙ্গে থেকে-থেকে তোমাদেরও ঐ-সব বাতিকে ধরেছে!"

—"কিন্তু জয়ন্তবাবু, পাড়া-গাঁ আমার এত ভালো লাগে যে, কি আর বলব!"

—"কখনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক-নি, তাই এ কথা বলছ—সেখানে গিয়ে থাক্‌লে হোলে হয়ত দুদিনেই অরুচি ধরে যেত!"

ঘাড় নাড়িয়া খোঁপা দুলাইয়া চোখ নাচাইয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা বৈকি, কখ্‌খনো অরুচি ধর্‌ত না! অনেক দিন আগে রেলগাড়ী করে' আমরা একবার গিরিডি গিয়েছিলুম। পথে যেতে-যেতে দু-ধারে কত যে পাড়া-গাঁ দেখলুম! কোথাও-বা মাঠের ধারে গ্রাম, কোথাও-বা নদীর ধারে, কোথাও-বা সবুজ গাছপালার ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতরে! কত-সব কুঁড়েঘর—পাতা আর খড়ে গড়া, ছোট্ট-ছোট্ট, তাদের আশেপাশে কলাগাছের নিশান উড়ছে, কত-সব তাল-নারকেল-খেজুর গাছ, বাঁশ-বনের ঝুপ্‌সী ছায়ার তলায় পুকুর-ঘাটে কেমন জল থৈ-থৈ করছে, গাঁয়ের মেয়েরা সেখানে কলসী-কাঁখে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, কত-সব ছোট-ছোট আঁকাবাঁকা পথ—তার কোনটি গাঁয়ের ভিতরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, কোনটি-বা মস্ত মাঠের মধ্যে কে-জানে কোথায় কোন্‌দেশে চলে গেছে! সত্যি জয়ন্তবাবু, আমার ভারি ইচ্ছে করে, সেই পথ ধরে ধু-ধু-করা মাঠের মধ্যিখানে রাখালের বাঁশীর গান শুনতে-শুনতে খালি ছুটি আর ছুটি আর ছুটি!"

জয়ন্ত হাস্যমুখে ইন্দুর এই উচ্ছ্বাসভরা প্রাণের কথা চুপচাপ শুনিয়া যাইতেছিল। সে থামিলে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যখন গাছপালা এতই ভালোবাস, তখন তোমার এই বাগানটি যাতে নানানরকম গাছে ভরে ওঠে, এবার থেকে আমি সেই চেষ্টা করব।"

এমনসময় জগৎবাবু সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন। তাহাদের দুজনকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝি এইখানে অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছ? আর আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

ইন্দু বলিল, "এমন চাঁদের আলোতে তুমি অন্ধকার দেখচ বাবা!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চাঁদের আলো দ্যাখবার বয়স আর কি আমার আছে মা! নে, উঠে পড়্—এস জয়ন্ত, ঘরের ভিতরে এস!"

জয়ন্ত উঠিয়া বলিল, "বাইরের ঘর থেকে ওঁরা সব চলে গেছেন নাকি?"

—"হ্যাঁ, আজ একটু সকাল-সকাল আসর ভেঙে গেছে।"

সকলে বাড়ীর ভিতরে একটি ঘরে গিয়া বসিলেন।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জগৎবাবু বলিলেন, "এর-মধ্যে নটা বেজে গেছে! ইন্দু, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল, জয়ন্ত আজ এইখানেই খেয়ে যাবেন।"

জয়ন্ত বলিল, "না, আজ থাক্—বাসায় খাবার তৈরি হয়েছে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না-হয় সেগুলো আজ ফেলাই যাবে!"

একটু পরে জগৎবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খাইতে বসিল। ইন্দুলেখা পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইন্দু তখন কতকগুলি আম ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল।

জগৎবাবুর পাতে আম ও মিষ্টান্ন দিয়া ইন্দু যেম্‌নি জয়ন্তের পাতে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, জগৎবাবু অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ইন্দু, দিস্-নে—দিস্-নে।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি হাত গুটাইয়া লইল। জগৎবাবু রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হাঁকিলেন, "ঠাকুর! শীগ্‌গির এদিকে এস!"

রাঁধুনে বামুন যখন আসিল, তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আম আজ সিদ্ধ কর-নি কেন?"

মুখ চুণ করিয়া বামুন বলিল, "আজ্ঞে, ভুলে গেছি!"

—"ভুলে গেছ! লোককে প্রাণে মার-বার ফিকির, না?"

কথাটা এই। জগৎবাবু আম প্রভৃতি ফল আগে একবার গরমজলে না-ডুবাইয়া খাইতেন না। পাছে কোনরকম রোগের 'জার্ম্' বা বীজ বিনা-নোটিসে শরীরে ঢুকিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই তটস্থ হইয়া থাকিতেন! যে-সব ফল সিদ্ধ করা চলিত না, সে-সব তিনি নিজেও খাইতেন না এবং বাড়ীর আর কারুকেও খাইতে দিতেন না। বাজারের কোন মিষ্টান্নও এ বাড়ীতে কেউ খাইতে পাইত না—

পাছে কোন সংক্রামক ব্যাধি সেই ফাঁকে দেহের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া বসে!

যাহা হৌক,—বাবুর হাতে-পায়ে ধরিয়া বামুনের চাকরিটি সে যাত্রা টিকিয়া গেল বটে, জয়ন্তের ভাগ্যে সেদিন কিন্তু আম খাওয়া আর হইল না!

জগৎবাবুও পাতের আম পাতেই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন; চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে, এখনি হয়েছিল আর কি, ও আম খেলে আর দেখতে-শুনতে হোত না—ও কি আম, ও যমালয়ে যাবার পরোয়ানা! বড্ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে জয়ন্ত!"

বহুকষ্টে হাসির বেগ সাম্‌লাইয়া জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তবে আসি!"

ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, কাল একটু সকাল-সকাল আস্‌বেন।"

ইন্দুর হাত হইতে পাণ লইয়া জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা!"

... ...

আজ বছরখানেক হইল, জয়ন্তের সঙ্গে জগৎবাবুদের আলাপ হইয়াছে।

বাসা বদ্‌লাইয়া জয়ন্ত যে নূতন বাড়ীখানি ভাড়া করে, সেখানি ঠিক জগৎবাবুর বাড়ীর সাম্‌নেই, এ ফুটপাথের উপর।

জয়ন্ত গান-বাজ্‌না বড় ভালোবাসিত। সে যখন হার্‌মোনিয়ামের সঙ্গে গান ধরিত, কিংবা আপন মনে বাঁশী বাজাইত, তখন রাস্তার উপরে লোকের পর লোক জমিয়া যাইত। এমন মিষ্ট গান বা এমন চমৎকার বাজ্‌না সহজে যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। সে সুরের মন্ত্রে মরামানুষও যেন জাগিয়া উঠে।

সাম্‌নের বাড়ীর জগৎবাবুর কাণেও সে সুর গিয়া পৌছিল। বাঙ্‌লাদেশে পাড়ায় পাড়ায় হামেসা যে-রকম গান-বাজ্‌না হয়, কাণের পোকা বাহির করা ছাড়া তার আর কিছু সার্থকতা থাকে না;—এমন-কি সময়ে-সময়ে পুলিস ডাকিয়া পল্লীবাসী তাহাদের সেনদের স্তব্ধ করিতে না-পারিলে প্রাণ বাঁচানো শক্ত হইয়া উঠে! কিন্তু জয়ন্তের গানে এ বিভীষিকা ছিল না!

অতএব, কৌতূহলী জগৎবাবু এর-তার মুখ হইতে খোঁজ লইতে লাগিলেন, এই গীতসিদ্ধ যুবকটি কে!... ...শুনিলেন, সে মফস্বলের এক জমিদারের ছেলে, কলিকাতার কোন কলেজে এম-এ পড়ে এবং তাঁহাদেরই স্বজাতি!

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায়, জয়ন্তের বাঁশী পূরবীর উদাস সুরে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে, হঠাৎ জগৎবাবু আসিয়া তাহার বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।

বাজ্‌না থামাইয়া জয়ন্ত বলিল, "আসুন, বসুন।"

জগৎবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আমি সাম্‌নের বাড়ীতেই থাকি —আপনার বাজ্‌না আজ আমাকে বাড়ী থেকে এখানে টেনে এনেছে।"

একটু হাসিয়া জয়ন্ত তার বাঁশীতে আবার ফুঁ দিল। জগৎবাবু চোখ বুঁজিয়া তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বাঁশীর

রাগিনী আবার বাজিতে লাগিল—কখনো উর্দ্ধে, কখনো নিম্নে, কখনো কড়িতে, কখনো কোমলে। বিভোর হইয়া অনেকক্ষণ বাজাইয়া জয়ন্ত যখন থামিল—জগৎবাবুর মাথা-নাড়াও তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এবং মুখখানি বুকের উপরে একপেশে হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত দু-একবার ডাকিয়া সাড়া না-পাইয়া বুঝিল, তাহার এই অপূর্ব্ব শ্রোতাটি এখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন!

পরদিনই জগৎবাবু আসিয়া জয়ন্তকে নিজের বাড়ীর আসরে জোরজার করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার গানে আর বাজ্‌নায় সেদিনকার আসরটি একেবারে জম্‌জমাট্ হইয়া উঠিল।

কিছুদিনের আলাপ-পরিচয়েই জগৎবাবু বুঝিলেন যে, এই যুবকটি সুধু রূপ, অর্থ ও বিদ্যা সম্পদেই ধনী নয়, চরিত্র-সম্পদে এবং হৃদয়-ধনেও তাহার সমকক্ষ সহজে মেলা দুর্ঘট।... ...তিনি জয়ন্তকে অনুরোধ করিলেন, ইন্দুলেখাকে গান শিখাইবার জন্য। জয়ন্তেরও তাতে অমত হইবার কোন হেতু ছিল না।

এম্‌নি-করিয়া জয়ন্তের সঙ্গে এই পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতায় একজনের চোখ বিষম টাটাইয়া উঠিল; সে অবনী।

অবনী, জগৎবাবুরই এক প্রতিবেশী। তাহার বাপ দালালী করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা অত্যন্ত অসামান্য না-হইলেও নিতান্ত সামান্য নয়। তার উপরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপ পাওয়াতে বিয়ের বাজারে অবনীর পসার বাড়িয়া গিয়াছিল যৎপরোনাস্তি। আজকাল বড়-বড় ঘর হইতে তাহার যে সমস্ত সম্বন্ধ আসিতেছে —তাহাতে সম্মতি দিলে সে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকন্যা না-পাইলেও একটি রূপসী মেয়ে এবং অন্তত হাজার-দশেক টাকা অনায়াসে হাতাইতে পারে! কিন্তু রাঙা বউ এবং চক্‌চকে টাকার প্রতি যথোচিত টান্ থাকিলেও এ-সব সম্বন্ধে সে একেবারেই গা করিতেছে না।

জগৎবাবুর একটি মস্ত গুণ ছিল,—ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই তিনি সমান ভাবে মিশিতে পারিতেন। তাই বয়সে অনেক ছোট হইলেও অবনীর সঙ্গে তাঁহার মেলা-মেশায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। অন্য সকলে যেমন যায়, অবনীও তেম্‌নি নিয়মিতরূপে জগৎবাবুর বন্ধুসভায় গিয়া হাজির হইত।

পর্দ্দা খাটাইয়া এবং পাঁচিল গাঁথিয়া অন্তঃপুরের নারীদের অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া তুলিতে জগৎবাবুর যথেষ্ট আপত্তি ছিল সত্য; কিন্তু তা-বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে সকল বন্ধুকেই ঢুকিতে দিতেন না। তাঁহার যে দু-চারজন বাছা-বাছা বন্ধুর এ সৌভাগ্য ছিল, অবনীও তাহাদের একজন।

অবনীর মুখের এবং বুকের আধখানা বুড়িয়া যে অত্যন্ত-গম্ভীর দাড়ীর অরণ্য, তাহার মধ্যে যে কোনরকম কোমল বৃত্তি বাসা বাঁধিতে পারে, এটা চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠা ভারি শক্ত ছিল। কাজে-কাজেই জগৎবাবু একদিনও এমন সন্দেহ

মনে আনেন নাই, তাঁহার কন্যা ইন্দুলেখাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক!

অবনী এখনো মুখ ফুটিয়া জগৎবাবুর কাছে তাঁহার কন্যার পাণিপীড়নের প্রস্তাব দাখিল না-করিলেও প্রায়ই জগৎবাবুকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিত, "অমুক জমিদার মেয়ে নিয়ে তাকে ভারি সাধাসাধি করছে। অমুক ডেপুটি তাকে এত টাকা আর নিজের একমাত্র মেয়েকে দিতে প্রস্তুত। সে কিন্তু রাজি নয়।"—ইত্যাদি।

জগৎবাবুও মনে-মনে ভাবিতেন, 'এ লোকটির পক্ষে বিবাহ করার চেয়ে না-করাই হচ্ছে পরম স্বাভাবিক; কেন না এ-হেন দাড়ির আবির্ভাবে বাসর-ঘরে বিদ্রোহ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা।' কিন্তু এমন ভালো-ভালো সম্বন্ধে অবনীর এতটা অরুচির আসল কারণ যদি জগৎবাবু বুঝি পারিতেন, তাহাহইলে তিনি জী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিস্ময়ে অভিভূত যাইতেন!

যাহা হৌক্—এম্‌নি ভাবে দিন যাই ছিল; কিন্তু এর-মধ্যে আচম্বিতে জয় আগমনে সমস্তই ওলট্‌পালট্ হইয়া গে কারণ, প্রথমত—কথাবার্ত্তায়, গানে-বাজ জয়ন্ত একেবারে আসর জম্‌কাইয়া তুলি দ্বিতীয়ত—জয়ন্তের প্রতি জগৎবাবুর প পাতিতা ক্রমেই চরমে উঠিতেছে; তৃতী এবং প্রধানত—ইন্দুলেখাও যেন জয় অত্যন্ত পছন্দ করে বলিয়া সন্দেহ হয়!

—অতএব, জয়ন্তের উপরে অবনী হা হাড়ে চটিয়া গেল। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মুদ্রাযন্ত্র

(ফরাসী হইতে)

ধর্ম্মঘটিত সংস্কার, সামাজিক সংস্কার রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার—এই সমস্ত সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে মুদ্রাযন্ত্রও সাহিত্যের এই সকল সংস্কারের মুখ্য উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতির মধ্যে ভারতীয় সমাজের ক্রমাভিব্যক্তি আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। পূর্ব্বে, লিখিবার অধিকার, চিন্তা করিবার অধিকার একটি বিশেষ জাতের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল; আজিকার দিনে, সকলেই নিজ মতা সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশ করিতে পা সংবাদ-পত্রাদির মতামত সকলেই প্রকা ভাবে বিচার-আলোচনা করিতে পা তাছাড়া, মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ প ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্য উত্তরোত্তর কেমন বেশ মিশিয়া যাইতে মুদ্রাযন্ত্ররূপ এই সম্পূর্ণ ইংরেজী প্রতিষ্ঠা লক্ষ লক্ষ হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের এ মুখ্য উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্য সকল বিষয়েরই ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে

...মের বেগটা জেতৃজাতি হইতেই আসিয়া ...। গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংরেজী ...াদপত্র বাহির হয়; দেশীয় ভাষার প্রথম ...াদপত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশনরীরা মুদ্রিত ...রেন।

তাহার কিছুকাল পরেই—বিশেষত ১৮৩৫ ...র অপেক্ষাকৃত উদার আইন প্রবর্ত্তিত ...ার পর—দেশীয় লোকেরা সাহসপূর্ব্বক ...ই কাজে প্রবৃত্ত হইল। বঙ্গদেশে মানসিক ...া-উদ্যমের নেতা ছিল দুইটি সংবাদপত্র; "সংবাদ প্রভাকর" ১৮৩০ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র ...ত কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। এই সংবাদপত্র ...াতন পন্থীদিগের মুখপত্র ছিল; দেবেন্দ্রনাথ ...কুরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার পর ...ক্ষয়কুমার দত্তকর্ত্তৃক সম্পাদিত "তত্ত্ব-...াধিনী পত্রিকা" নব-হিন্দুদিগের দাবীদাওয়ার ...র্থন করিত।

১৮৬৭ অব্দের আইনে, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য-...সার খুব বাড়িয়া গেল; কিছুকাল পরে, ...র্ড-লিটন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব ...রিলেন, কিন্তু লর্ড-রিপন্ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ-...ুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত সমস্ত বারণ-বাধা ...াইয়া দিলেন। (১)।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের কতটা উন্নতি ও ...দ্ধি হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য কতক-...লি সংখ্যাঙ্ক নিম্নে দিতেছি।

১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৬৯৫, ...াম্বাই প্রদেশে ৪৬৩ (তন্মধ্যে গুজরাটিতে ...২৮, মারাঠীতে ১০১ ও ইংরাজীতে ৭৭) ...াময়িক পত্র বাহির হয়; মাদ্রাজে ১৩০ সংবাদপত্র; ১৮৯৯—১৯০০ অব্দের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮৬ সংবাদপত্র; পঞ্জাবে ১১৭ সাময়িক পত্র, তন্মধ্যে ইংরেজীতে ২৪, ইরেজী ও দেশীয় ভাষায় ২, গুরুমুখীতে ২, হিন্দিতে ২।

* * *

ভারতের সরকারী সংবাদপত্র—Gazette of India। প্রাদেশিক বিভাগগুলিতেও ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় তাহাদের স্বকীয় গেজেট আছে।

ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র। একদিকে ভারতের ইংরেজদিগের জন্য ইংরেজদিগের সংবাদ-পত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—Allahabad Pioneer—গবর্ণমেণ্টের সরকারী পত্র; Calcutta Englishman, Bombay Gazette, Indian Daily News এবং Timnes of India.

পক্ষান্তরে, ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় লোকের এবং য়ুরোপীয়ধরণে শিক্ষিত হিন্দুদের সংবাদপত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—M. Malabari's Indian Spectator; তাহার পর Voice of India—ইহাও মালাবারীর কাগজ; তার পর Hindu Patriot, Indian Mirror (বঙ্গদেশে)।

প্রধান প্রধান দেশীয় সংবাদপত্র:—"বঙ্গবাসী" (গ্রাহক-সংখ্যা ২০,০০০), "দৈনিক চন্দ্রিকা"; "সাহিত্য-সংহিতা"—ইহা একটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক পত্র। হিন্দী:—বেনারসের "ভারত-জীবন" (গ্রাহক-

(১) Sir Charles Metcalfeএর আইন,—১৮৩৫; ১৮৬৭ অব্দের X.X.V. আইনের দ্বারা ...ারতীয় মুদ্রাযন্ত্র ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় সমান স্বাধীনতা লাভ করে,—এবং একই বারণ-বাধা স্থাপিত হয়।

সংখ্যা ১৫০০), উর্দ্দু :—লাহোরের Paisa Akhbar (গ্রাহক-সংখ্যা ১৩,০০০)।

* * *

ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে অনেকগুলিই বেশ যোগ্যতা ও ধীরগাম্ভীর্য্য সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে; তদ্বিপরীতে আর কতকগুলি, মান্য ব্যক্তিদের প্রতি অবমাননার শেষ সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে।

ইংরেজী সংবাদপত্র—Bengal Times হইতে পূর্ব্বে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয়, সেটি এই ধরণের।

দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, উহাও এই প্রকার! উহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ১৮৮৮ অব্দে "দৈনিক চন্দ্রিকায়" প্রকাশিত হয়; ইহা লর্ড-ডফরীনের বিদায়-সম্ভাষণ উপলক্ষে লিখিত। লর্ড-ডফরীন পাঁচ বৎসর রাজ-প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান :—

"ডফরীন, তুমি নিজ গৃহে ইংরেজদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাও। তোমার প্রস্থানে আমরা একটুও দুঃখিত নহি, বিনা অশ্রু-পাতে আমরা তোমাকে বিদায় দিতেছি। কারণ, "আভার কৌণ্ট" বলিয়াই আমরা তোমাকে জানি। ভারতবাসীর প্রতি তোমার একটুও মমতা নাই। তোমার একটু হৃদয় আছে শুনিয়াছিলাম; যাহারা এইকথা বলে, তোমার প্রতি তাহাদের হৃদয়ের অনুরাগ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজের নিতান্তই মস্তিষ্কের অভাব সন্দেহ নাই। অ্যাঙ্গলো আইরিস্ জমিদার! তোমার মতে, ভারত শুধু ভারতীয় ইং[illegible] সুখ-সুবিধা ও ধনসঞ্চয়ের জন্যই অব[illegible] রুসিয়ার সহিত যুদ্ধের অছিলায়, [illegible] ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে প্রভূত[illegible] গ্রহণ করিয়াছ।"

২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ অব্দে চন্দ্রন[illegible] প্রকাশিত "প্রজাবন্ধু" নামক বাঙ্গলা স[illegible] পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছি[illegible] তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ইংরেজরা মূর্ত্তিমতী শঠতা; উ[illegible] কাহারও ভালো দেখিতে পারে না, কাহা[illegible] উন্নতি সহিতে পারে না। ইংরেজের স[illegible] নত হও, ইংরেজ তোমার কিছু উপ[illegible] করিবে; মাথা উঁচু কর—তোমা[illegible] চুচক্ষে দেখিতে পারিবে না ..... ইং[illegible] মুসলমানদিগকে আশ্রয় দেয়, এবং হি[illegible] দিগকে উৎপীড়ন করে। কিন্তু ইংরেজ[illegible] একদিন ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে[illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসহিষ্ণু হইয়া, হিন্দু [illegible] মুসলমান কোন অপকর্ম্ম করিতেই পরাঙ্মু[illegible] হইবে না। এইরূপ প্রজাদিগের ম[illegible] বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করাতেই সিরাজুদ্দৌলা[illegible] রাজত্ব ইংরেজের হস্তগত হয়। সম্প্রতি[illegible] শিখরে উঠিয়া সিরাজুদ্দৌলার মাথা ঘুরি[illegible] গিয়াছিল। ইংরেজেরও কি মাথা ঘুরি[illegible] গিয়াছে?"

ইহা অপেক্ষাও উগ্রধরণের প্রব[illegible] বাহির হইয়াছে; সেই প্রবন্ধে, পূর্ব্ব ব[illegible] বীর্য্য হিন্দুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য [illegible] ম্লেচ্ছনিধনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য দুর্গা[illegible] নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, হত্যা ও[illegible] বিদ্রোহ করিতে লোকদিগকে আহ্বান কর[illegible]

[illegible]ছে; এই নৈতিক মারী হইতে যে [illegible] হাঙ্গাম উপস্থিত হয় তাহার দরুণ [illegible]কগুলি সংবাদপত্র খুব কঠোর দণ্ড-[illegible]গ করিয়াছিল। (২)

* *
*

[illegible] মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করায় [illegible]নকে লর্ড রিপণের প্রতি দোষারোপ [illegible]র। কিন্তু, কে শত্রু, কে মিত্র তাহা [illegible]া এবং স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসনের দরুণ যে [illegible]ল বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা পূর্ব্ব [illegible]তে অবগত হওয়া,—ইহা গবর্ণমেণ্টের [illegible]ক, বিশেষত স্বেচ্ছাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের [illegible]ক কি বাঞ্ছনীয় নহে? এবং ইহাও কি স্বাভাবিক নহে, যে-দেশের লোক বহুকাল হইতে উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছে, শেষে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে প্রথম-প্রথম তাহারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে?

আমার মতে, যাহা মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হয়, তাহাই আধুনিক ভারতের হুবহু প্রতিরূপ, আধুনিক ভারতের অনিশ্চিততা, উগ্রতা, ভীরুতা, পাপ, পুণ্য, এবং য়ুরোপের সভ্যতা যাহাকে যুগপৎ আকর্ষণও করে পরাঙ্মুখও করে সেই যে এসিয়াবাসীর অন্তরাত্মা সেই অন্তরাত্মার আশ্চর্য্য ইতস্ততঃ ভাব ও সঙ্কোচ দ্বৈধভাব—এই সমস্তই উহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) মুদ্রাযন্ত্রের অপরাধ-ঘটিত কোন ভারতীয় আইন নাই; কিন্তু ইংরেজি আইনের ন্যায়—যাহারা অপরাধ করিতে মন্ত্রণা দেয় তাহারা অপরাধী ব্যক্তির সহচর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উক্ত দুই প্রবন্ধ, M. Samuelson-এর India Past and Present গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হাত-ফের

(গল্প)

নিবারণ বাড়ীর বড়-ছেলে হলেও সংসারের [illegible]ব-চেয়ে বড় বোঝাটা মাথায় তুলে নেবার [illegible]ত শক্তি তার কাঁধে তখনো হয়নি। [illegible]ার বাবা তিন-চারিটি ছোট-ছোট ছেলে-[illegible]য়ে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে কোনোরকমে [illegible]াল খেতে-খেতে একটা অজানা আঘাটায় [illegible]াদের নামিয়ে রেখে যখন সরে পড়েছিলেন, [illegible]খন সে নিতান্ত শিশু।

তার মা গ্রামের লোকেদের বাড়ি কাজ-কর্ম্ম করে কোনোরকমে তাদের ছোট সংসারটি চালিয়ে নিত; কিন্তু সে-রকম করে বেশীদিন আর চলল না; কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই দেশে দুর্ভিক্ষ এল; কিছু দিন বাদে, যারা তাদের সাহায্য করত তাদেরই দিন-চলা ভার হয়ে উঠল।

নিবারণ তখন গ্রামের এন্‌ট্রেন্‌স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার মা তাকে অনেক কষ্টে লেখা-পড়া শেখাচ্ছিল, কিন্তু

শেষে এমন হল যে দিন আর চলে না। ছোট ভাই-বোনদের ক্ষিধের কান্না আর মায়ের বুকফাটা চোখের জল দেখে-দেখে নিবারণের দিন-কাটানো অসহ্য হয়ে উঠল।

সে শুনেছিল সহরে গিয়ে চেষ্টা করলে নাকি অর্থ উপায়ের সুবিধা হতে পারে। লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বড়-লোক হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবার একটা দুরাশা অনেকদিন তাকে প্রলুব্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু শেষটা তাকে বাধ্য হয়ে তার মায়া কাটাতে হল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল। রইল তার পড়া-শুনো, রইল তার ভবিষ্যতের সেই রঙিন ছবিগুলো—কল্পনার তুলি দিয়ে যে-গুলোর উপরে এতদিন ধরে সে হাত-বুলিয়ে এসেছিল।

বর্ষার একটা সন্ধ্যায় সে সহরে এসে নাম্‌ল। এখানে কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে এখন যায় কোথায়? একটা রেলের কুলি তাকে যাত্রীদের বিশ্রামের ঘরখানা দেখিয়ে দিলে; সেইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার জন্যে হাজার-হাজার যাত্রীর মধ্যিখানে একটু জায়গা করে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

রাত্রিটা একরকম জেগেই কেটে গেল। এত আলো সে জন্মে-কখনো দেখে-নি; আর এত গোলমালও এর আগে কখনো শোনে-নি। এই হট্টগোলের ভিতরেও মানুষ এমন স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে দেখে সেদিন সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা ষ্টেশন ছেড়ে সে সহরের ভিতর ঢুকল। ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাম মটরগাড়ীর মাঝখানে পড়ে নিজেকে যে চলতে যেচারী পদে-পদে আপনাকে করে তুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সহরের চারিদি ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় একটা দো থেকে দু-পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে ধারে গিয়ে সে বসল।

গঙ্গার ধারটা সহরের অন্য জা চেয়ে অনেকটা নিস্তব্ধ। ঘাটের ধাপের উপর চুপ করে বসে-বসে সে ভা লাগল—মা, ভাই, বোন। সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে তাদের কান্না যেন বা ভেসে এসে তার কানে পৌঁছতে লাগল।

তার চোখে জল আসছিল। কি ক সে একা এই সহরে? অসহায় অপরিচিত কি করে অর্থ-উপায় করে বাড়ীতে পাঠা তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগ একবার ভাবলে যাই বাড়ী ফিরে, যেমন হোক দিন সেখানে কেটে যাবে; না সকলে একসঙ্গে গলাগলি হয়ে মরে থাক ট্যাঁকে তার যে ক'টা পয়সা ছিল একবার বার করে গুণে দেখে আবার সেগু ট্যাঁকেই গুঁজে রাখলে। তারপর আবা মনে হ'ল বাড়ীর সবাই অনাহারে দি কাটাচ্ছে, আমার আশাতেই পথ চে বসে আছে। এই সব ভাবতে ভাবতে আ কান্নার বেগ ক্রমেই বেড়ে গেল,—মু কাপড় দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—"কিরে ছোঁড়া, এখানে বসে কি কচ্ছিস?"

নিবারণ চম্‌কে উঠল। সহরে এসে অবধি কারো সঙ্গে তার কথা হয়-নি। হঠাৎ এই সম্ভাষণে সে একেবারে ভড়্‌কে গেল।

সে পাশ ফিরে দেখলে, একটা লোক—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বল্‌ছিল। সেই চেহারা দেখে নিবারণের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তার কান্না থেমে গিয়েছিল কিন্তু তখনো তার গলা দিয়ে থেকে-থেকে কান্নার একটা হেঁচ্‌কি উঠছিল। সে কি উত্তর দেবে কিছু ভেবে ঠিক করবার আগেই লোকটা বলে উঠল—"ইস্, আবার কান্না হচ্ছে? আদুরে গোপাল আমার রে! কাঁদছিস্ কেন? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?"

অজ্ঞাতসারে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —"হ্যাঁ।"

ক্ষিদে তার পেয়েছিল সত্যি। সমস্ত দিন অনাহারের পর দু-পয়সার মুড়ি খেয়ে পাড়াগেঁয়ে ছেলের পেট ভরেনা, কিন্তু সে-লোকটাকে ক্ষিদের কথা জানাবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

লোকটা নিবারণের হাতখানা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"ক্ষিদে পেয়েছে ত এখানে বসে কি কচ্ছিস্? চল্।"

মন্ত্রচালিতের মত নিবারণ তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাকে বল্‌লে—"ক্ষিদেই যদি পেয়ে থাকে তবে গঙ্গার ধারে মরতে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাবি খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধুতে, বুঝলি ছোঁড়া!"

নিবারণ ভয়ে-ভয়ে একটা ছোট্ট "হ্যাঁ" বলে তার সঙ্গে সঙ্গে সুড়্‌সুড়্ করে চলতে লাগল।

তারপর এ-গলি সে-গলি—এম্‌নি করে প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে তারা একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

হোটেল-ওয়ালাকে খাবার দিতে বলে লোকটা পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার করে গেলাসে ঢেলে মাঝে মাঝে তাতে চুমুক মারতে লাগল।

খাবার যা এল তার আকার আস্বাদন সবই নিবারণের কাছে একেবারে নতুন। ক্ষিদের ঝোঁকে দু-এক কামড় খাবার পর তার আর খেতে প্রবৃত্তি হল না। মদ আর মাংসের একটা বিকট মিশ্র-গন্ধে তার পেটের ভিতর থেকে বমি ঠেলে উঠতে লাগল। সে-লোকটা মদের গ্লাসটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ান-জড়ান সুরে বল্লে—"একটু খাবি?"

নিবারণ ঘাড় নেড়ে জানালে—"না।"

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তোর নাম কিরে?"

সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—"নিবারণ।"

এক গাল হেসে লোকটা বলে উঠল—"বা-রে, বেড়ে নাম ত—নি-বা-র-ণ!"

একটু চুপ করে থেকে খানিকটা আধসিদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে সে আবার বল্লে—"আমার নাম কেষ্ট, বুঝলি?" আবার খানিক চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কি করিস্?"

নিবারণ উত্তর দিল—"টাকা রোজগারের চেষ্টায় এসেছি!"

হো-হো করে একটা বিকট হাসি হেসে কেষ্ট বলে উঠল—"বা-রে আমার মাণিক! টাকা রোজগারের চেষ্টায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিলি?—টাকা রোজগার করতে চাস তো আমার সঙ্গে চল্। তুই নৌকো বাইতে পারিস্?"

নৌকো বাইবার কথা শুনে নিবারণের মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিলে; ছেলেবেলা থেকে খেলার মধ্যে এইটেই তার প্রধান খেলা ছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"নৌকো চালানো? ওঃ, সে আমি খুব পারব।"

কেষ্ট তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বল্‌লে—"তুই ত খলিফা ছেলে দেখছি,—নে, নে, একটু টেনে নে।"

এই টেনে নেওয়ার কথাটার মানে যে কি, নিবারণ ভাল করে বুঝতে পারলে না। সে একটু থতমত খেয়ে নিজের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি টান্‌ব?"

গেলাসটা একটু এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট বল্লে—"নে, এইটুকু চোঁ-করে মেরে দে।"

নিবারণ মাথা নেড়ে বল্লে—"না, ও-সব আমি খাই না।"

"খাস্‌না?"—বলেই সে গেলাসটা এক-চুমুকে নিঃশেষ করে হাত ধুয়ে তাকে বল্লে—"চল্। পারবি ত? দেখিস্!"

নিবারণ জোরে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—"হুঁ, খুব পারব।"

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা আবার গলি-ঘুঁজি দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। জেটির ধারে একখানা ছোট নৌকো বাঁধা ছিল; তার ত তারা চড়ে বসল।

নিবারণের হাতে একটা দাঁড় দিয়ে কেষ্ট নিজে গিয়ে হালে বসল। পর একটু-একটু করে নৌকোখানাকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বল্লে—"নে, দাঁড় কিন্তু দেখিস্, বেশী তাড়াতাড়ি করিস্‌নি অনেক দূর যেতে হবে, হাঁপিয়ে যাবি।"

—"আচ্ছা" বলে সে আস্তে আস্তে ফেলতে লাগল।

রাত্রির প্রথম-প্রহর তখন প্রায় গেছে। বর্ষার এক-আধখানা পাতলা চাঁদের পাশ দিয়ে দৌড়-দৌড়ি করে ক্রমে মেঘগুলো সব একজোট হয়ে খানাকে একেবারে ঢেকে ফেল্লে। চারিদি অন্ধকার, কেবল দূরে প্রাসাদের বড়-বড় জাহাজগুলোর ছোট ছোট দিয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা আলোর টুক নদীর জলের উপর লম্বা হয়ে পড়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। একখানা জাহা থেকে একটা তীব্র বাঁশীর আওয়াজ দুকূল ঝন্‌ঝনিয়ে আবার হাওয়ার গা মিলিয়ে গেল। জাহাজের বাঁশীকে লজ্জা দেবার জন্যেই আকাশ থেকে একখ মেঘ একটা ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে তখনি আবার চুপ করলে। মনে হল যেন উপরকার ঐ বিরাট কালো দেহটা নিজের গলাটাকে একটু শানিয়ে নিলে। অন্ধকারে উঁচু-উঁচু জাহাজের মাস্তুলগুলো দেখে নিবার ভয়ে-ভয়ে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে—"ওগুলো কি?"

কেষ্ট ত্রস্তভাবে একবার চারদিকে তাকিয়ে

য়ে বললে—"কোথায় কি? নে, নিজের কর্।"

—"ঐ যে উঁচু-উঁচু।"

—"ক্যাব্‌লা ছেলে! ওগুলো জাহাজের ল। নে, নে, তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্।"

জাহাজের ভিড়ের মধ্যে সরু সরু ির ভিতর দিয়ে তারা সাবধানে বেয়ে তে লাগল।

কেষ্ট আস্তে আস্তে নিবারণকে বল্লে, "ত্থাখ্, বেশী সপ্‌সপ্ আওয়াজ করিস্‌নি, াহাজের লোকেরা টের পেলে বড় ফ্যাসাদ ধাবে।" তারপর আপনা-আপনি বলতে গল,—"ব্যটারা আজকাল ভারি ধর-পাকড় ক করেছে।"

কথাগুলো নিবারণের কানে যেতেই র বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ভয়ে র হাত-দুখানা গুটিয়ে আসতে লাগল। স্তে আস্তে, আওয়াজ না-করে দাঁড় লতে ফেল্‌তে কখন্ যে তার দাঁড়-টানা াপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল সে নিজেই ঝতে পারলে না। কেষ্ট দাঁত-খিঁচিয়ে বল্লে —"কিরে, থামলি বড় যে?"

হঠাৎ তাড়া খেয়ে সে আবার ঝপ্‌ প্ করে দাঁড় বেয়ে চলতে লাগল।

এবার কেষ্ট তার জায়গা ছেড়ে উঠে সে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাত-দুটো নড়ে-নেড়ে বলতে লাগল—"ফের্ শব্দ রে! শেষটা নিজেও মর্‌বি, আমাকেও র্‌বি! যা বল্‌চি তা যদি না শুনিস্ তবে কটি চড়ে কাবার করে দিয়ে এই গঙ্গার লে তোকে ভাসিয়ে দেব।"

কেষ্টর সেই বিকট হাবভাব দেখে নিবারণের অন্তরাত্মা ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার কেবলই মনে ভয় হ'তে লাগল এ কোন্ অজানার দিকে সে নৌকো বেয়ে চলেছে, যার অলক্ষ্যে চুম্বকের মত একটা বিপদ তাকে আকর্ষণ করছে। আজ্‌কের এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটা তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কে জানে সেই-বা কে! নানান ভয় ও ভাবনায় বেচারী একেবারে মুস্‌ড়ে পড়ল। আরো-একটু নৌকো বাইবার পর সে কাঁচু-মাচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতদূর যেতে হবে?"

সাম্‌নের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কেষ্ট উত্তর দিলে—"আর একটু।"

আরও কিছুক্ষণ দাঁড় ঠেল্‌বার পর কেষ্ট উঠে তাকে বল্লে—"ত্থাখ্, ঐ যে আলোটা ত্থাখা যাচ্ছে, ওটা একটা ঘাঁটি, ঐটে, পেরোলেই আর কি—"

আস্তে আস্তে দম বন্ধ করে নিবারণ জায়গাটা পার হয়ে চলে গেল। তারপর একটা সরু জেটির কাছে এসে কেষ্ট নৌকো ভিড়িয়ে নৌকোর খোলের ভিতর থেকে কতকগুলো কি জিনিষ বার করে নিয়ে নেমে গেল। যাবার সময় বলে গেল। —"যতক্ষণ-না আমি আসি এইখানে বসে থাক্!"

নিস্তব্ধ সেই জায়গাটায় বসে থাকতে-থাকতে নিবারণের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। তার বুকের ভিতর এতক্ষণ ভাবনা আর ভয় এই দুটো জিনিষেরই লড়াই চলছিল, এবার ভাবনাটা গিয়ে ভয়টাই তার মনের উপর সওয়ার হয়ে বস্‌ল। সে নিজের

শরীরটা যতদূর সম্ভব ছোট্ট করে এককোণে সরে গিয়ে বসল। একবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ল, তারপর ছোট-ছোট অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনদের! ভয়ে দুঃখে যখন সে প্রায় আধমরা হয়ে নৌকোর খোলের উপর নিজের দেহটা বিছিয়ে দিয়েছে তখন হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে কেষ্ট ফিরে এল।

কেষ্ট নৌকোতে পা দিয়েই নিবারণকে একটা লাথি মেরে তুলে দিয়ে বল্‌লে—"চল্, চল্, আর এক-মিনিটও দেরি নয়, পাহারা বদ্‌লাবার আগেই আমাদের ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হবে।"

নিবারণ তাড়াতাড়ি উঠে আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল।

নৌকোখানা একটু চলবার পরই কেষ্ট তাকে বল্লে—"তুই বেশ ছোকরা, তোকে আজ্‌কের কাজের জন্যে দশ টাকা দেবো।"

নিবারণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর করলে—"আমার এক পয়সাও চাই না, আমায় ছেড়ে দাও।" সে মনে মনে এতক্ষণ প্রতিজ্ঞা করছিল, একবার এই লোকটার পাল্লা থেকে উদ্ধার পেলে, সটান বাড়ী চলে যাবে, সহরে একদণ্ডও আর থাকবে না।

কেষ্ট একটুখানি কি ভেবে বল্লে—"কেন দশটাকা কি কম হল? আচ্ছা, যা তোকে আরো পাঁচ টাকা দেবো; কিন্তু দেখিস্—আজ্‌কের কথা কাউকে বলিস্‌নি যেন।"

অতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার কথা শুনে নিবারণের একটু লোভ হতে লাগল। পাওয়া দূরে থাক্, অত টাকা পাবার আশাও সে করতে পারে-নি। সে মনে-মনে একটা হিসেব করে দেখলে তাতে তাদের দু-[illegible] বেশ সুখে চলে যেতে পারবে। কিন্তু [illegible] তখনও পুরো-মাত্রায় তার মনের উপর রা[illegible] করছিল, কাজেই সে একটা ছোট-রকমে 'আচ্ছা' বলে আবার দাঁড়-বেয়ে চল্‌[illegible] লাগল।

একটু এগোবার পরই কেষ্ট হঠাৎ চম্‌[illegible] উঠে তাকে দাঁড় থামাতে বল্লে।

"এই রে, বুঝি দেখতে পেয়েছে! [illegible] ছাখ্, দূরে একটা আলো নাড়চে[illegible] দেখেচিস্?"

নিবারণ দেখলে নদীর ধারে এক[illegible] লাল লণ্ঠন যেন হাওয়ায় দুল্‌চে। তা[illegible] মনে হতে লাগল বুকের ভিতরের হা[illegible] গুলো যেন খাঁচার পাখীর মতন ছট্‌ফ[illegible] করে পাঁজরা-ভেঙে বেরিয়ে পড়বার চে[illegible] করছে,—ভয়েতে তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দি[illegible] একটা কাঁপুনী ধরল, অজ্ঞাতসারে তা[illegible] হাত থেকে দাঁড়টা খসে পড়ে গেল[illegible] কেষ্ট তখনি দাঁড়টা জল থেকে তুলে নিলে[illegible] নিবারণের সেই রকম অবস্থা দেখে তা[illegible] ভয়ানক রাগ হল, তার পেটের ভিত[illegible] থেকে একটা গালাগালির ঢেঁকুর উ[illegible] অস্বাভাবিক আওয়াজ করে হাওয়ায় মিলি[illegible] গেল।

নদীর ধারের আলোটা খানিকক্ষণ নড়ে[illegible] চড়ে আবার স্থির হয়ে গেল, নিবারণ[illegible] একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার নৌকো বাই[illegible] আরম্ভ করলে; অন্ধকারে মিশিয়ে তারা ঘাঁ[illegible] পার হয়ে গেল।

ভয়ের সীমানা পেরিয়ে আসবার প[illegible] নিবারণ যেন একটু ভরসা পেলে। টা[illegible]

[illegible]র লোভটা তখন তার মনের কোণে [illegible]টু-একটু করে আবার উঁকি মারতে সুরু [illegible]রছে। সে ভাবছিল টাকাগুলো কতক্ষণে [illegible]ওয়া যাবে! কিন্তু একেবারে কেষ্টকে [illegible]টা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোচ্ছিল [illegible]; বুদ্ধি খাটিয়ে সে তাই জিজ্ঞাসা [illegible]লে—"ও পুটলিতে কি আছে?"

কেষ্ট উত্তর দিলে—"ওতে কোকেন [illegible]ছে। ওর দাম কত জানিস্? হাজার [illegible]কার ওপর! আচ্ছা যা—তোকে আরো [illegible]চটাকা দেবো—কেমন, খুসি ত?"

পাওনার মাত্রা আরো বেড়ে গেল দেখে [illegible]র ফূর্ত্তির জোয়ারে নতুন স্রোত এসে [illegible]গল; মনের আনন্দে সে বেয়ে চলতে লাগল। কেষ্ট জিজ্ঞাসা করলে—"তোর বাড়ী [illegible]থায় রে?"

নিবারণ বল্লে—"বিষ্ণুপুর।"

—"বিষ্ণুপুর! সে ত অনেকদূর রে!"

[illegible]লই সে একটা তান ধরে দিলে—"বিষ্ণু-[illegible]রের তামাক এনেছি, খাও-সে রাজা [illegible]মোদ করে।"

রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারও তখন খুব [illegible]ন হয়ে এসেছে, আকাশে একটা তারাও [illegible]খা যাচ্ছিল না; রাস্তার আলোগুলো এমন [illegible]বে জলের উপর এসে পড়েছে যেন আকাশের [illegible] সব তারাগুলো নেমে এসে নদীর দুদিকে [illegible]র-বেঁধে বসে গিয়েছে। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে [illegible]দের ছোট্ট নৌকোখানা ধীরে ধীরে এগোতে [illegible]গল। দুজনের কারো মুখে কথা নেই; [illegible]কে-থেকে কেষ্ট এক-একটা গানের এক-[illegible]ধটা পদ গেয়ে উঠছে,—কোনোটা হাসির, [illegible]কোনোটা দুঃখের, কোনটা প্রেমের। তার প্রাণের ভিতর ফূর্ত্তির যে তুফান বইছিল তারই একটু-আধটু আভাস তার গানের সুর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। গান গাইতে-গাইতে সে চেয়ে-চেয়ে নিবারণকে দেখতে লাগল। হঠাৎ কি মনে ক'রে নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই টাকা নিয়ে তুই কি করবি?"

নিবারণ বল্লে—"বাড়ী পাঠাব।"

নিবারণ এমন আকুল-মমতার সঙ্গে বাড়ীর নামটা উচ্চারণ করলে যে কেষ্টর মনের ভিতর কেমনতর একটা ধাক্কা লাগল। কেষ্ট যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাড়ীতে তোর কে আছে রে?"

"মা, ভাই, বোন।"—বলেই নিবারণ তাদের সেই দুঃখের সংসারের কথাগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলতে সুরু করলে। এতক্ষণ পরে দুঃখ জানাবার একজন লোক পেয়ে তার মন খুলে গেল। একই কথা একশ-বার করে বলেও যেন তার ভাল করে বলা হচ্ছিল না। নিবারণের সেই ব্যাকুল কথার ভিতর থেকে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের গায়ের উপর একটি করুণ ছবি ফুটে উঠে কেষ্টর মনকে কেমন উতলা করে তুলতে লাগল। কেষ্ট সেই ছবিটাকে মন-থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই সেটা গেল না। গঙ্গার জলস্রোতের সঙ্গে নিবারণের কণ্ঠস্বর মিশে কেমন-একটা কান্নার মত সুর তুলতে লাগল যাতে কেষ্টর বুকের ভিতরটা ঝির্-ঝির্ করে কাঁপতে লাগল।

বাড়ী! বাড়ী ছেড়ে আজ কতদিন সে এসেছে। এই নিবারণেরই মত সেও অর্থের চেষ্টায় বাড়ী ছেড়ে এসেছিল।

তারপর? তারপরের কথা মনে করতে গিয়ে কেষ্টর বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। সে চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল;—নৌকো ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

বাড়ীর কথা ত তার মনে ছিল না; আজ কতদিন হ'ল তার স্মৃতি থেকে বাড়ীর ছবি একেবারে মুছে গেছে। তার পর থেকে তা মনে করবার তার অবসরই হয়নি—কেউ মনে করিয়েও দেয়নি। তার এই জীবনের মধ্যে যারা সঙ্গী ছিল তাদের কারোর মুখে সে কখনো বাড়ীর কথা শোনেনি। আজ হঠাৎ এই নিবারণ কোথা থেকে এসে তাকে বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দিলে! তার ঐ গলার সুরে, তার ঐ মুখের ভাবে কি ছিল যাতে কেষ্টর সমস্ত হৃদয়টা তোলপাড় করে উঠল। সে চুপ্‌টি করে পড়ে সেই কথা ভাবতে লাগল। অনেক দিনের অনেক পুরোণো ছবি অস্পষ্টতার কুয়াসা ঠেলে তার চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

নিবারণ দাঁড় টান্‌তে-টান্‌তে ভাবছিল টাকার কথা। সহরে এসে কি করে টাকা উপায় করবে এই তার ভাবনা ছিল। সে কী জানে যে কিছু করবে? সামান্য এই নৌকো চালানো—যা ছেলেবেলায় সে খেলাচ্ছলে শিখেছিল—তাই তার সৌভাগ্যের পথ খুলে দিলে ভেবে সে যেমন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তেমনি তার আহ্লাদও হচ্ছিল। টাকাগুলো হাতে নিয়ে নাড়চাড়া করবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেল্‌লে—"টাকাটা কখন্ দেবে?"

কেষ্টর প্রাণে তখন জাগছিল জল-ভ
ডব্‌ডবে দুটি চোখ,—কি বেদনা, কি ম
ব্যথা সেই দুটি চোখ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছি
টাকার কথা কিছু না বলে একটা দীর্ঘ
ফেলে সে নিবারণকে বল্‌লে—"নিবারণ, তু
বড় ভাল ছেলে রে, আমার আজ
উপকার করলি—"

আর নিবারণ ভাবছিল, বেশ ব্যবসা
খাটুনি নেই, কিছু নেই, এক রাতেই এ
টাকা! এক মাসের ভিতরেই বড় লোক

আরো অনেকক্ষণ বেয়ে আসার পর তা
একটা জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে ফেল্‌লে
কেষ্ট নিবারণকে বললে—"সারারাত্রি ঘুমো
নি, এখন একটু ঘুমিয়ে নে, আমার আসা
একটু দেরি হবে, কোথাও যাস্‌নে যেন।"

নিবারণের ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে আসছি
সে গুঁড়িশুড়ি মেরে নৌকোটার ভিতর
পড়ল। কেষ্ট একলাফে নৌকো আর ডাঙা
ব্যবধানটুকু পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গে

কেষ্ট যখন আবার নৌকোয় ফিরে এ
তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। সে নিবারণে
গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে তাকে তুলে দি
পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে তা
হাতে দিয়ে বল্লে—"নিবারণ, তোকে এ
একশো টাকা দিলুম। এখুনি বাড়ীতে পাঠি
দে! তুই আমার বড় উপকার করেছিস্ রে

নিবারণ নোটগুলো হাতে করে তু
নিলে। তার হাত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপ
লাগল।... ...

এই তার সহরের প্রথম অভিজ্ঞতা, এই
তার প্রথম রোজগার। এমন সহজে যে এ
রোজগার হ'তে পারে এ-কথা নিবার

নোদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। এর
ধ্যে একটু ভয় আছে বটে, কিন্তু সে
য়কেও তো এড়ানো যায়—কেষ্ট তা প্রমাণ
রে দিয়েছে। আর ঐ ভয়টুকুর যে পুরস্কার
া তো সামান্য নয়! কাজেই রোজগারের
ই পথ নিবারণকে প্রলুব্ধ করে তুল্লে।
রদিন কেষ্টর খোঁজে সে সন্ধ্যাবেলা থেকেই
ার ধারে এসে বসে রইল। কেষ্ট আর
লনা বটে সে কিন্তু তাই বলে কেষ্টর সেই
নৌকোখানার মালিকের অভাব হলনা। রাত-
পুরে কেষ্টরই মত একটা লোক এসে
খন সেটাতে চড়ে বসল তখন নিবারণ
বচ্ছায় তার কর্ণধার হ'ল। এমনি করে
ার ব্যবসার সূত্রপাত হ'ল। এবং কেষ্টর
ঙ্গে সে যে-যাত্রা সুরু করেছিল তারই আবৃত্তি
াতের পর রাত ধরে চলতে লাগল। ক্রমে
ল চাকর থেকে মনিবের দলে গিয়ে উঠল।
াশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন হতে লাগল।
া-ভাই-বোনের দুঃখ দূর হ'ল। তখন মাসে-
াসে যথাসময়ে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে
ারলেই সে নিশ্চিন্ত হ'ত। তার পর
সেই নিশ্চিন্ত-মনটাকে নিয়ে সে যা-খুসি-তাই
রতে লাগল। ক্রমে এই নিশ্চিন্ততার ফাঁক
য়ে মা-ভাই-বোনের মুখ যে কবে সরে
ড়ল, সে তা টেরও পেলেনা। যারা তার
ঙ্গী ছিল তাদের কারো কোনো দায়
ছলনা। একটা দায় ঘাড়ে করে থাকাকে
ারা পরিহাস করত। ক্রমে নিবারণেরও
সেইটে সহজ অবস্থা হয়ে এল। তখন জীবনের
ধ্যে যা রইল তা কেবল ঐ অন্ধকার
াত্রের কাজ, আর হল্লা-করে স্ফূর্ত্তি করা!

* * * *

আদালতে সেদিন কয়েকটা পাকা বদমায়েসের বিচার হচ্ছিল। আসামীদের মধ্যে নিবারণকেও ধরে আনা হয়েছে। এখানে এই তার প্রথম আসা। এতদিন সে স্ফূর্ত্তি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল;—ভয় একটা ছিল বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভয়ের চেহারাটার সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে কী-সব ভয়ঙ্কর বিপদ জড়িয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে, তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগল। তার মনে হতে লাগল এই সব বিপদের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে সে কি-করে এতদিন কাটিয়ে এসেছে! উঃ!

নিবারণের চোখের সাম্‌নে তার সঙ্গীদের জেল হয়ে গেল। প্রমাণ-অভাবে সে-ই কেবল ছাড়া পেলে। সে তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। দরজার সাম্‌নে জেলখানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কতবার এই গাড়ীখানার কথা সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনেছে। কৌতূহলের ঝোঁকে অন্যলোকদের মত সেও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। খানিক পরে হাতকড়া-লাগানো তার বন্ধুদের পিঠে রুলের গুঁতো মারতে-মারতে গোরা পুলিশ সেই গাড়ীখানার অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে তাদের ধাক্কা মেরে তুলে দিতে লাগল। তাই দেখে নিবারণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। উঃ, ওই গাড়ীটার ভিতর কি ঘুট্‌-ঘুটে অন্ধকার!—একটু আলো নেই, বাতাস ঢোকার পথও বন্ধ! উঃ, জেল!—

তার পা-দুটো থর-থর করে কাঁপতে লাগল। একদণ্ডও আর সেখানে দাঁড়াতে না

পেরে সেখান সে থেকে সরে পড়ল। তারপর আস্তে-আস্তে হাবড়ার পুলের কাছে এসে দাঁড়াল।

পুলের দুদিক দিয়ে লোক চলছে। নীচেকার জলস্রোতের মতন উপরকার জন-স্রোতেরও বিরাম নেই। নিবারণ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে—"কিরে নিবারণ, চিনতে পারিস্? ওঃ, কত বড় হয়ে গিছিস্ রে!—আমি কেষ্টরে—কেষ্ট!"

নিবারণ প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি। সে নিজের নাম বলতেই তাকে চিনে ফেল্লে।

—"কেষ্ট! ওঃ তোমাকে সেই দেখে-ছিলুম; কতদিন দেখা হয়নি।"

নিবারণ কেষ্টকে বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর মত হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর; কেমন আছিস?"

কেষ্টকে পেয়ে নিবারণের মন যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে তার হাত ধরে টান্‌তে-টান্‌তে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলওয়ালাকে খাবার দিতে বলে নিবারণ কেষ্টকে নিয়ে একটা পর্দ্দা-ঘেরা ঘরের ভিতর গিয়ে বসল। তারপর একটা চাকরকে ডেকে বলে দিলে—"ওরে একটা পাঁট্ নিয়ে আয় ত।"

দুটো গেলাসে মদ ঢেলে নিবারণ একটা কেষ্টর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও দাদা, টেনে নাও।"

কেষ্ট একটু অপ্রস্তুত-ভাবে বলে উঠল —"না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।"

নিবারণের বুকের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন কি একটা তীক্ষ্ণ জিনিষ যেন বেরিয়ে গেল। কেষ্ট মদ ছেড়ে দিয়ে যদিও কেষ্টর সঙ্গে তার মোটে একরা পরিচয় কিন্তু সেই একরাত্রেই সে যতটা চিনেছিল ততটা বোধ হয় আর-কা চিনতে পারেনি। তার কথাটা নিবার কাছে একটা রহস্যের মত ঠেক্‌ল; একটু অভিমানের সুরে বল্লে—"খাবে

কেষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দে বল্লে—"না; তুই খা-না।"

—"আচ্ছা বেশ, তবে আমিই খা বলে উপরি-উপরি দুটো গেলাসের মদ চৌ করে দু-চুমুকে সাবাড় করে ফেল্লে।

কেষ্ট হাসতে-হাসতে বল্লে—"খুব হয়েছিস্ যে রে!"

নিবারণের মুখের উপর থেকে মদের আস্বাদনের বিশ্রী ছবিটা তখনো একেবা মিলিয়ে যায় নি; একটা হাঁসের ডি আধখানা কামড়ে নিয়ে সে বল্লে—"ও ত তুমিই করেছ দাদা।"

নিবারণের এই কথাগুলো কেষ্টর বু হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে। সে নিবারণ ভাব-ভঙ্গী কথাবার্ত্তা যতই দেখতে লা ততই অবাক হয়ে যেতে লাগল। তার ম হতে লাগল—সেদিনকার সেই ছোঁড়াটা মদের নাম শুনে যার মুখ সিঁটকে উঠ —আজ তার এ কী!

হঠাৎ নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা কর —"আজকাল কি হচ্ছে?"

কেষ্ট বল্লে—"চাষবাস সুরু করেছি!"

নিবারণ অবাক হয়ে বল্লে—"অ্যাঁ, চা বাস!"

কেষ্ট বল্লে—"হ্যাঁ। তাতে আমার দিনু শ কাটচে।"

নিবারণ তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে শ-একটা তৃপ্তি এবং নিশ্চিন্ততায় সে খখানি ভরে আছে। সমস্ত শরীরের পর একটি আরামের আবেশ বিছিয়ে য়েছে। নিবারণ বারবার তাকে দেখতে াগল। তার মনে জেগে উঠল আজকের াদালতের তার সঙ্গীদের সেই অবস্থা, ার নিজের সেই ভয়ের উৎকণ্ঠা! এতদিন সে ও-সব কিছু ভাবেনি, কিন্তু আজ আদালত থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত তার বুকটা থেকে থেকে দুর্-দুর্ করচে।

কেষ্ট বল্লে—"বড় বেঁচে গিয়েছি নিবারণ! সব ছেড়েছুড়ে বাড়ী না গেলে জাহান্নামে গিয়েছিলুম আর কি!"

জাহান্নামে! নিবারণের বুকটা কেমন ধড়্‌ফড়্ করে উঠল। সে আর এক গেলাস মদ এক-চুমুকে টেনে নিয়ে বল্লে —"হঠাৎ কাজ-ওটিয়ে পালালে যে?"

কেষ্ট বল্লে—"এখানে আর মন টিঁকল না। মনে আছে তোর সেই-রাত্রের কথা —যেদিন তোকে নিয়ে নৌকোয় বেরিয়ে ছিলুম?—তুই তোর বাড়ীর কথা বল্‌তে লাগলি, আর আমারও বাড়ীর জন্যে প্রাণটা কেঁদে উঠল। কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগল না।"

নিবারণ আর-এক গ্লাস মদ নিঃশেষ করে একটা গম্ভীর শব্দে "হুঁ" বলে, ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলের উপর আছ্‌ড়ে রাখলে। সে যতই কেষ্টর সেই নিশ্চিন্ত মূর্ত্তি দেখতে লাগল ততই কেমন-একটা হিংসেয় তার শরীরের মধ্যে জ্বালা ধরতে লাগল। সে সেই জ্বালার উপর প্রাণ ভরে মদের ধারা ঢালতে লাগল।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হয়ে রইল। তারপর কেষ্ট স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে —"বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস্ ত নিবারণ?"

কেষ্টর মুখে এই বাড়ীর কথায় নিবারণের দেহের রক্ত যেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে তার মাথার ভিতরে গিয়ে জমা হতে লাগল। তার মনে জাগতে লাগল সেদিনকার কথা—যেদিন এই লোকটার সঙ্গে ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে নৌকো বেয়ে সে চলেছিল, সেদিন-কার জীবন-যাত্রায় এই লোকটাই ছিল কর্ণধার! আজ তাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! আর সে নিজে কোথায় এসে পড়েছে! কেষ্ট যাকে বল্লে জাহান্নাম—তারই ত পথে! কে তাকে এখানে এনে ফেল্লে? এখন কোথায় পড়ে আছে তার সেই মা, তার সেই ভাই-বোন—যাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিল!

কেষ্টর দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে হতে লাগল, কেষ্ট যেন দূরে দাঁড়িয়ে তার অবস্থাটা দেখে মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাসছে। তার সেই হাসিতে নিবারণের মনে হল যেন সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরে উঠল। দেখতে-দেখতে তাদের সেই গ্রাম, তাদের সেই বাড়ী, তার ভাই-বোন-মা সবাই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! চোখের সামনে জাগতে লাগল কেবল শূন্যতার অন্ধকার!

প্রাণপণ-শক্তিতে সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে চোখ-দুটোকে ঠেলে বার করে নিবারণ কেষ্টকে দেখতে লাগল।

তার সেই-রকম চাহনি দেখে কেষ্ট ভয়ে-ভয়ে ভাঙা চেয়ারটা একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে মারবি নাকি ?"

কি করলে যে নিবারণের মনের ঐ জ্বালাটা দূর হয় সে এতক্ষণ ঠিক করতে পারছিল না ; হঠাৎ কেষ্টর মুখে মারের কথা শুনে সে যেন একটা উপায় দেখতে পেলে। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে সে বল্লে—"মারলেও তোর যথেষ্ট সাজা হয় না, আমার কি করেছিস জানিস্ ?"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে "বেশী চালাকি করিস্ নি, এখুনি পুলিস ডেকে দেবো ; নেশা ছুটে যাবে।"

—"পুলিশ দরকার হবেনা"—বলেই সে বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে কেষ্টর টুঁটিটা চেপে ধরলে।

তারপর ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ, গেলাস ভাঙবার ঝন্-ঝন্-শব্দ, গোলমাল, লোক-জনের হাঁকাহাঁকির ভিতর কখন্ যে কি হয়ে গেল তা তাদের দুজনের কেউ ঠিক করে বলতে পারেনা।

তারপর নিবারণকে যখন জমাদার এসে ধরলে তখন তার কথা এড়িয়ে এসেছে, ভাল করে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। পাহারাওয়ালার গুঁতোর চোটে মাঝে-মাঝে তার চেতনা ফিরে আসছিল, আবার তখুনি তাদের গায়ে নেতিয়ে ঢলে পড়ছিল। খানিকটা হিচড়ে আর খানিকটা কোল-পাঁজা করে তারা তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

কেষ্ট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দে ছিল। নিবারণের পিঠে ক্লোর গুঁতোয় যেন দ্বিগুণ জোরে এসে তার বুকে বাজ লাগল ; তার মুখের অস্ফুট এড়ানো কথাগু সহস্র অর্থ নিয়ে তার কানে এসে ঢুক লাগল। পথ-চল্‌তি অনেক লোক সেখা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, কেউ বুঝুক আ না-বুঝুক সে কিন্তু কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝ পারছিল। ভিড় ঠেলে সে একটু ফাঁকে এ দাঁড়াল। নিবারণের সঙ্গে তার সেই প্রথ দেখার দিনের কথা মনে পড়্‌ল, তার সে ফুঁপিয়ে কান্না, সেই সরল হাব-ভাব, সেই ভ সভয় মুখ—সমস্ত ছবিগুলো তার চোখে সাম্‌নে এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল।

দিনকয়েক পরে এই মারপিটে মোকদ্দমা উঠল। নিবারণের সাম্‌নে যখন জেলের ছবি জাজ্বল্য হয়ে উঠছে, এমনসময় কেষ্ট সাক্ষী দিতে এল। সবাই ভাবলে এইবার নিবারণের দফা শেষ! কিন্তু তা সাক্ষীতেই মোকদ্দমা একেবারে ফেঁসে গেল। নিবারণ বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেরুতেই কেষ্ট ছুটে এসে নিবারণের হাত-দুটো চেপে বল্লে—"চল ভাই, আমার সঙ্গে চল।"

নিবারণ তার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে জনস্রোতের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট নিরুপায় হয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ

আজ প্রাতঃকালে আমি বঙ্গের একটি তীর্থস্থানে সমাগত হয়ে ধন্য বোধ করছি। সে কিসের তীর্থ? স্বাধীনতার তীর্থ। বহুকাল ধরে পড়ে আসছি এই হেয় নিন্দিত বঙ্গদেশেরই বক্ষে সেই দুটি হিন্দু-রাজ্য বিরাজ করছে যারা কখনো পরাধীনতা মানেনি;—সে দুটি কোচবিহার ও ত্রিপুরা-রাজ্য। বিজয়ী মোগলেরা ভারতবর্ষের আর সকল স্থানেই প্রায় নিজেদের ধ্বজা প্রোথিত করেছিলেন শুধু কোচবিহার ও ত্রিপুরা ছাড়া। জাপানীরা ও জাপানের ইতিহাস-পর্য্যালোচক ইংরাজেরাও জাপানের মাহাত্ম্যের অন্যতম একটি কারণ এই দেখিয়ে থাকেন যে দুই হাজার বৎসরাবধি একাদিক্রমে একই রাজবংশের হাতে জাপানের রাজ্য-শাসন চলে আসছে। ত্রিপুরার ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে মানব-স্মৃতি যতদূর পৌঁছায় ততদূর হতে একই রাজকুল ত্রিপুরা-রাজ্যের রাজদণ্ড বহন করে আস্‌ছেন। সুতরাং হে ত্রিপুরারাজ-সন্তানগণ, হে ঠাকুরগণ! তোমাদের আভিজাত্যের নিকট আধুনিক ভারতবর্ষের আর-সকল রাজকুমারগণ পরাস্ত। কিন্তু তোমাদের কমনীয় কান্তি দেখতে-দেখতে মনে এই প্রশ্ন উদয় হয় ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ঠাকুরেরা বীরত্ববিষয়ে তোমাদের কত পিছনে ফেলে গেছেন তার কোনো হিসাব খতিয়ে দেখেছ কি? এক মহারক্তের অক্ষুণ্ণ ধারবাহিকতার যে গৌরব তা তোমরা দাবী কর; কিন্তু সেই রক্তের উপযোগী সে কর্ম্মপ্রবাহ, সে তেজ, সে পৌরুষ, সে পুরুষম্মন্যতাও তোমাদের মধ্যে আছে কি? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শুধু যে শত্রুহস্ত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করেছিলেন তা নয়; সে-কালের বীরত্বের আদর্শে, পরদেশজিগীষায়, বলের দ্বারা পরের স্বাধীনতা অপহরণ করেছিলেন; চট্টগ্রাম আরাকান প্রভৃতি পর-রাজ্যকে নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এই ন্যায়ের যুগে, ধর্ম্মের যুগে, ব্রিটিশ-রাজ্যের চক্রবর্ত্তিত্বে পররাজ্য-হরণবৃত্তি তোমাদের রুদ্ধ করতে হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসুলভ সব রকম ক্ষাত্রস্পৃহাই কি তোমাদের নিভে গেছে?

তোমরাও 'ঠাকুর' এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রাজসন্তানেরাও ঠাকুর। কিন্তু অন্যদের তুল্য ক্ষত্রিয়ভাব তোমাদের কোথায়? ক্ষত্রিয়-বেশ কোথায়? তোমরা দেখি সমতলস্থ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থেরই মত ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে বেড়াও! বীরের বসন আর তোমাদের নিত্য-পরিধান নয়, তোমাদের পাজামা চাপকান উষ্ণীষে বীরভাবে দেহ মণ্ডিত নয়, তোমাদের কোষে আর অসি বা খড়্গ ঝুলান থাকেনা; চোদ্দ দেবতার নাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হওয়ার মত চেহারা আর তোমাদের নয়! ভারতবর্ষের অন্য ঠাকুরেরা তোমাদের এ বিষয়ে লজ্জা দিচ্ছে।

একদিন ছিল যখন এই ত্রিপুরারাজ্যে এক-লক্ষ পদাতিক ও সহস্র গজারোহী সৈন্য ছিল। এখন নাকি এখানকার সৈন্যসংখ্যা কেবল

একশত মাত্র? একলক্ষ মানুষ কি আর এদেশে নেই? তোমরা, আভিজাত্যগর্ব্বস্ফীত ঠাকুরেরা থাকতে ত্রিপুরায় আজ এক সহস্র সৈন্যও নেই? তোমাদের মহারাজ যদি তোমাদের বীরত্বের পথে পুনর্যাত্রা করতে অনুনয় বা অনুজ্ঞা করেন তোমরা নাকি ঘোঁট কর, কমিটি কর, চক্রান্ত কর, চুকলি কর; সর্ব্বতোভাবে তাঁর সাধু ইচ্ছা ব্যর্থ করে, নিজেদের আভিজাত্য প্রমাণ কর!

তোমাদের ভাইবন্ধু—তোমাদের কুটুম্ব নেপালীরা শুধু স্বদেশে নয়, ব্রিটিশ রাজ্যে দলে দলে চিরকালই সেনানীভুক্ত। আজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তোমাদেরও ডাকছেন। আজ এমন সুযোগের দিনেও তোমাদের লুপ্ত ক্ষাত্র-গৌরবের উদ্ধার করবে না? তবে কিসের তোমাদের আভিজাত্যের অভিমান? কিসের অভিমান রাজ-রক্তের? মহারাজ বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া-রাজকে একবার হাতী উপঢৌকন পাঠালে, জয়ন্তিয়া-রাজ যখন সে উপঢৌকনে রাজার প্রতি রাজার সৌজন্য না চিনে, মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বিজয়মাণিক্য তাঁর প্রতাপে ভয়-ভীত হয়ে এই উপহার পাঠিয়েছেন, তখন বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া-রাজের ভুল-ভাঙ্গানর জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করে তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করেছিলেন;—"ভয়-ভীত" বলে আখ্যাত হওয়ার কলঙ্ক সহ্য করেন নি। সেই বিজয়মাণিক্যের রক্ত তোমাদের ভিতর আছে। জগৎ যখন বলবে ত্রিপুরার কুমারেরা আজকের দিন সৈনিক হচ্ছেনা, কারণ বোধ হয় তারা ভয়ভীত, তখন তোমরা এ নিন্দা উদরস্থ করবে? বিজয়মাণিক্যের বংশধরেরা যে ভয়ভীত হতে পারেনা, তাদের রক্তে ভয়-জিনিষটাই যে নেই তা দলে-দলে সেনাদলভুক্ত হয়ে এমন কি নিজেদেরই একটা কম্পানী গঠন করে তা প্রমাণ করবে না কি?

হে দেববর্ম্মণেরা, হে ক্ষত্রিয়-ভাই-সব, আজ আর কথার দিন নেই, কাজের দিন এসেছে। আজ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়-অভিমানী সূর্য্যবংশের চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়ন্ম —সূর্য্যবংশত্ব বা চন্দ্রবংশত্ব যুদ্ধের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে নেওয়া হবে। এ পরীক্ষায় ভারতের বাকী ক্ষত্রিয়ম্মন্য জাতিরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—তোমারাই শুধু বাকী রয়েছ।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর তাঁর কৈশোরে রাজকুমারগণের সভায় পাঠের জন্য ত্রিপুরার ইতিহাস হতে একটি মহাবীরকীর্ত্তি উদ্ধার করে কুমারগণের উৎসাহ প্রজ্বলিত করেছিলেন। সে কীর্ত্তিকাহিনী আবার স্মরণ কর।

"মহারাজ ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধর দেববর্ম্ম ১৭৩৬ ত্রিপুরাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার শাসনসময়ে হীরাবন্ত খাঁ নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ ছিল। হীরাবন্তের জন্মভূমি পশ্চিম প্রদেশে হইলেও এরাকানাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় বাণিজ্যই তাহার সম্পত্তির মূল কারণ। এইরূপ বাণিজ্যে নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইবার অভিপ্রায়ে সে গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকনাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করিবার সংকল্প করিল। ত্রিপুররাজ্যের পশ্চিম সীমাবর্ত্তী পদ্মা অথবা অন্যান্য নদী দিয়া বিনানুমতিতে নৌকা-যোগে যাতায়াত করার সম্বন্ধে ত্রিপুররাজার দৃঢ় নিষেধ ছিল। হীরাবন্ত খাঁ গর্ব্ববশতঃ সেই নিষেধ আজ্ঞা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস না করিয়া গৌড়েশ্বরের উদ্দেশে উপঢৌকনস্বরূপ কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন সমভিব্যাহারে পদ্মা নদী দিয়া যাইতেছিল। ত্রিপুর

রাজ এই সংবাদ-প্রবণে দূতদ্বারা বীর নিষেধ প্রচার করাইলেন, বণিক্ তখন অনুমতি প্রার্থনা করিল। গৌড়েশ্বর ত্রিপুর-মহারাজের চিরশত্রু; তিনি এরূপ শত্রুর সম্মাননার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, শুনিয়া ত্রিপুর-নরপাল সসৈন্যে তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। বণিক্, গৌড়েশ্বরের নিকট ত্রিপুর-মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। গৌড়েশ্বর উপঢৌকনে বঞ্চিত হইয়া তিন লক্ষ সেনা, ত্রিপুরায় যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ভয়ে ভয়ের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজমহিষী প্রলিখিতরূপে সৈন্যদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া সমরে প্রবেশ করিলেন। গৌড়সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

১

বীরপুত্রগণ মম হও আগুয়ান,
আমি বাছা তোমাদের মায়ের সমান;
মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি,
এস সবে ত্বরা করি,
বীর দম্ভে করে ধরি অসি খরসান;
এস, দেব-আশীর্ব্বাদে হইবে কল্যাণ।

২

"চৌদ্দদেবতার জয়—জয় ত্রিপুরেশ;"
বলি সবে রণ-ক্ষেত্রে করহ প্রবেশ,
চল চল ত্বরা চল,
আমি বাছা পক্ষ-বল,
শত্রু শেষ-সৈন্য আজি করিয়া নিঃশেষ,
রণবেশ ছাড়ি—লব রমণীর বেশ।

৩

"কি ভয় কি ভয় রণে, কি ভয় কি ভয়,"
বলিব না, হেন কথা বলিবার নয়।
ত্রিপুরের বীরচয়
নয় এত ভীরু নয়
রণ-মুখে নারী-কণ্ঠে শুনিয়া অভয়,
বাঁধিবে কবচ—হবে নির্ভয় হৃদয়।

৪

এই বাছা তোমাদের কলঙ্ক অশেষ,
এই বাছা তোমাদের মৃত্যু-নির্ব্বিশেষ;
শুনি শত্রু ভেরী রব
না সাজিতে বীর সব
ধরেছিল নারী এক সমরের বেশ;
ধোও এ কলঙ্ক, করি সমরে প্রবেশ।

৫

ঐ শুন রণ-বাদ্য বাজিছে আবার
ঐ শুন শত্রুদের প্রলয়-হুঙ্কার;
ঐ শুন প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনি অমনি,
প্রতিরব ছলে সবে করিছে ধিক্কার—,
সহে কি এ অপমান তিল-আধ আর?

৬

ঐ শুন রণ-বাদ্য বাজিল আবার,
সচল পাষাণ-ময় অচল এবার।
তোমাদের রক্তময়
শরীরে কি নাহি হয়
শিরায় শিরায় বল বিদ্যুৎ-সঞ্চার?
ধর অসি—কর সবে শত্রুর সংহার।

৭

জন্ম-ভূমি তুলা মাত্র মাতার সহিত
সেই মাতৃভূমি এই রবেতে কম্পিত;
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি,
মাতৃভূমি মনে করি,
সমরে মরণ-ভয় কর বিদূরিত;
সমরে মরণ—এ ত—বীরের বাঞ্ছিত।

৮

কোথা ত্রিপুরেশ আজি এমন সময়,
সে কথা স্মরণ করি কিবা ফলোদয়?
লোহার শিকল হেলে,
যে করি ভাঙ্গিয়া ফেলে,
বল মায়াময় বিধি সমর্থ কি নয়;
বাঁধিতে তূণেতে সেই হস্তি-পদ-চয়?

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

৯

কীর্ত্তিতে যাঁহার নাম জানে সর্ব্বজন,
তাঁহার অকীর্ত্তি আজি বিধির লিখন ;
বিধাতা পুরুষবরে,
অবলার সম করে,
অবলায় বল আজি করিল অর্পণ,—
কি কাজ সে কথা আর করিয়া স্মরণ।

১০

মনে কর নরবরে রোগের শয্যায়,
ভাব হে সদয় রাজা পাঠালে আমায়,
প্রাণ-প্রিয়া বলি যার,
রাজাদর অনিবার,
তার প্রাণ তুচ্ছ বোধ করি, নররায়,
দেশ হেতু পাঠালেন, সমরে আমায়।

১১

ভোল ও সকল কথা, করহ স্মরণ,
যদ্যপি তোমরা আজি নাহি কর রণ
জানিবে জানিবে তবে,
মাতৃহত্যা পাপে সবে.
স্পর্শিবে—আমার পণ সমরে মরণ ;
এস সবে—বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।

১২

মনে কর পলাইয়া রাখিলে জীবন,
মনে কর জয়লাভ করিল যবন !
স্মরণে হৃদয় হায়,
যেন বিদরিয়া যায়,
ডুবিবে পাপেতে যত ত্রিপুর ভবন,
স্পর্শে যদি একবার যবন-পবন !

দেখিয়া রাণীর বেশ, শুনি উপদেশ,
রণবেশ করি সবে, রাখিবারে দেশ ;
অসি করে পশিলেক, সমর সাগরে,
বীরমদে বীরদল, আপনা পাশরে।
প্রবল-প্রবাহ-মুখে তৃণের মতন,
অস্থির ত্রিপুর-বলে, যতেক যবন।
"জয় চৌদ্দদেব জয়—ত্রিপুরেশ জয়,—
জয় মাতা ঈশ্বরীর," বলি সৈন্যচয়,
যবন দমন করি বিজয় উল্লাসে,
উঠাইয়া চন্দ্রবাণ সুনীল আকাশে,
ত্রিপুর ভবনে সবে করিল প্রবেশ ;
ছাড়িলেন মহারাণী সমরের বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি মুরতি মোহন,
আকুল তরঙ্গ হতে কমলা যেমন।"

ত্রিপুরার ঠাকুরেরা আবার "জয় চৌদ্দদে
জয়, ত্রিপুরেশ জয়, জয় মাতা ঈশ্বরীর" র
তোমাদের অন্তরস্থ কাপুরুষতা-যবনকে দ
করে বিজয়-উল্লাসে মহাসমরে সংলীন হবে।

শ্রীসরলা দেবী।

মাসকাবারি

মত ও ব্যক্তিত্ব

পুরাণে আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন। সেই গঙ্গার পাবনী মৃত্তিকাতেই "বাংলার মাটি বাংলার জল" পুণ্য হইয়াছে। কিন্তু "জলরেখাবলয়িত" মাটীটুকুই যদি আমাদের সব সম্বল হইত, তবে আমরা মাটীই হইতাম! আমাদের এই জাতির মধ্যে বৃহৎ জীবনের ধারাকে নিঃসারিত করিয়া নূতন করিয়া জাতীয় মনটাকে "সুজল সুফল" করার প্রয়োজন ছিল। এযুগে সেই ভাব-গঙ্গাকে আনিবে

যুগের ভগীরথ, রাজা রামমোহন
।

যে বাংলাভাষার আজ এত সম্পদ্,
দিন ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ
ান্ত-রত্নে সেই ভাষাকে রামমোহন
াইয়াছিলেন। গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচিয়া
বং বাংলা গদ্যের অঙ্গ হইতে সমাস-সন্ধির
কল খুলিয়া ফেলিয়া রামমোহন সংস্কৃত-
রাধার বাংলাভাষার নিজ প্রতিভাকে প্রথম
ভিনন্দন জানাইলেন। নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের
কল বিরোধকে সমন্বয় করিয়া হিন্দু সভ্য-
ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অপর অপর
ভ্যতার সহযাত্রী করিয়া মহামানবের
তিহাসের বিরাট্ রঙ্গভূমিতে তাহাকে
তীর্ণ করিয়া দিলেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে
ারাজ্যের জন্য আজ আমরা আন্দোলন
রিতেছি, সেই স্বারাজ্যের মহনীয় বরণীয়
াদর্শ তিনি তাঁর মানস-চক্ষে প্রথম
র্শন করিয়াছিলেন। সাহিত্যে, সমাজে,
াষ্ট্রে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে,
বজীবনের ধারাকে তিনি বহাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আজ তার কলধ্বনি গ্রাম হইতে গ্রামে নগর হইতে নগরে মুখরিত, উচ্ছ্বসিত, পরিব্যাপ্ত!

রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সভ্যতার রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, আইন, আচারব্যবহার প্রভৃতির বিচিত্র মহালের নানা গোপন দরজা খুলিয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রহরী-পাহারার তর্জ্জনী না মানিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহালের পরস্পরের মধ্যে সহজ ও অবাধ প্রবেশের নানা সঙ্কেত, নানা পথঘাট উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর সেই বিরাট বিশ্ব-প্রাসাদের মহালে মহালে তাঁর সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করা শক্ত। কিন্তু যিনি তাঁর পরে এ দেশকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উদ্বোধিত করিলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু হিন্দুসভ্যতার মহালার মধ্যেই দেশকে টানিয়া লইয়া চলিলেন এবং সেখানকার বন্ধ দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া দেশকে তার আপন পরিত্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎসব জমাইলেন। তাঁর কাজ রামমোহনের চেয়ে সংকীর্ণতর। কিন্তু সংকীর্ণ খাতে নদীর বেগ যেমন বাড়ে, তেম্‌নি সংকীর্ণক্ষেত্রে—দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে—দেশের ধারাকে আকর্ষণ করিয়া তিনি তাকে গভীর, নিবিড় ও প্রখরবেগশালা করিয়া তুলিলেন। আমাদের দেশাত্মবোধের তিনিই জনক, এ কথা মনে রাখা উচিত।

রামমোহন বাংলাভাষার প্রতিভাকে অভিনন্দন করিলেন; দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাষাকে কলাসৌষ্ঠববতী করিয়া সকল জন-হৃদয়ের পক্ষে রমণীয় করিলেন। শুধু সাহিত্যকে যে তিনি সৃজন ও পরিপোষণ করিয়া এদেশের মানস আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিলেন তাহা নয়; সেই সঙ্গে সাহিত্যের সহচরী শিল্পকলা, সঙ্গীতকলাকেও দেবেন্দ্রনাথ আবাহন করিয়া আনিলেন। শাস্ত্রকে মানিয়াও তার শৃঙ্খল হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া তার চিন্তার স্বাধীনতাকে তিনি অবারিত করিলেন—'আত্মপ্রত্যয়' যে সকল প্রত্যয়ের মূল এবং মূল্য তাহা নিজ জীবনের ভিতর হইতে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করিয়া, সেই বাণীর

দ্বারা দেশের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ক্রমে, সকল জিজ্ঞাসাকে তিনি নূতন করিয়া জাগাইয়া দিলেন।

অস্থিতত্ত্বের হিসাবে যেমন মানুষের দেহ-পরিচয় মেলেনা, তেম্‌নি মতামতের বা তত্ত্বের হিসাবে কোন মনীষীর ব্যক্তিত্বের (Personality) পরিচয়ও পাওয়া যায় না। রামমোহনকে শাস্ত্র-মীমাংসক কিম্বা দেবেন্দ্রনাথকে ব্যক্তি-তান্ত্রিক বলিলে সেটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয় না। কেননা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব কোন অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মাত্র নয়, তাহা সকল তত্ত্বের ও মতের চেয়ে বড়, এমন কি তাঁদেরই সকল রচনা-আলোচনা সকল ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যানের চেয়ে বড়। কিসের জোরে একজন ব্যক্তি যুগ-চালক হইয়া বসেন এবং আর এক জন হন না—এ প্রশ্নের উত্তর সে ব্যক্তির কোন মতবাদের মধ্যে নাই—তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ইহার উত্তর রহিয়াছে। হীরার নানা মুখ হইতে যেমন রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, বৃহৎ ব্যক্তিত্বের নানা মুখ হইতে তেম্‌নি নানাভাবের ও রসের আলোক পাওয়া যায়। সেই তাঁর সমস্ত জীবনের আলোকে, ব্যক্তিত্বের আলোকে, তাঁর রচনা যিনি পড়েন তাঁর কাছেই তাঁর রচনাও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কিন্তু যিনি কেবলমাত্র মত-বিচারক, তিনি কেবল পুথির মত-বাদ লইয়া বিবাদ করেন। ব্যক্তিত্বের আলোয় মতকে দেখেন না বলিয়া কোন মতের মূল্য নিরূপণ করা তাঁর সাধ্য নয়। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতা বাদ দিলে তাঁর মতের সঙ্গে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সদ্য পাশ-করা ছোক্‌রা কিম্বা কোন নব্য তার্কিক উকীলের বুলি-কপ্‌চানো মতের সঙ্গে পার্থক্যটা কোথায়?

"মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটে কুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখ হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে কীট তুই একি করিলিরে!
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে—
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কি, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কিবা, শুধু কালো দাগ।
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটে কুটে করি ছারখার!"

—(কণিকা

সমাজ-চ্যুতাদের কথা

খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায় কুলনারীদিগকে ফাঁকি দিয়া হরণ করি দুষ্টলোক তাহাদিগকে সমাজের অঙ্গ হইতে বিচ্যুত করিবার ব্যবসা চালাইতেছে সুবাসিনীর ঘটনা সকলেই খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। সে নির্দ্দোষ; তার শরীরে কলুষ স্পর্শ করিলেও তার মনের নিষ্কল্ম শুভ্রতায় কোন কালিমার দাগ পড়ে নাই। যে সমাজ এ-হেন নির্দ্দোষকে আশ্রয় না দিয়া পাপের পথে ঠেলিয়া দেয়, সে সমাজে ভাঙন ধরিবেই এবং একদিন তার ভিত্ গুঁ ধসিয়া যাইবে—একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

শুধু ধর্ষিতা স্ত্রীলোককে পুনর্গ্রহণ করাই যে সমাজের কর্ত্তব্য তাহা নয়—যারা সমাজ-চ্যুতা তাদের সম্বন্ধেও সমাজের

র্ত্তব্য আছে। অথচ কেবলমাত্র এই শের সমাজই সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। হিন্দুসমাজে দয়া-দাক্ষিণ্য, স্বজন-বাৎসল্য, তিথি-সেবা প্রভৃতি অনেক মহত্ত্বের নিদর্শন াছে—কিন্তু নাই একটি বড় জিনিস। ক্তিগত কিম্বা সমষ্টিগত ভাবে মানুষের রে একটা সহজ অনুকম্পা একটা অকৃত্রিম রদ—সে পড়িয়া গেলে তার হাতখানি রিয়া তাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা— এই ত্তার অসদ্ভাব এ দেশের সমাজে পদে-দেই লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপের সমাজে পাপ নানা আকারে খা দেয়—সেখানে সমাজ-চ্যুতার সংখ্যা থেষ্ট, জারজ সন্তানের সংখ্যা প্রবল, ৎসিত রোগাক্রান্তের সংখ্যাও অসংখ্য। ন্তু ইউরোপের কোন দেশই এ সম্বন্ধে ামাদের দেশের মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া াই। তারা এই সব ব্যাপারের তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া সংগ্রহ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক দিক্ দিয়া ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতেছে, এবং এইসব অমঙ্গল-নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইউ-রোপের নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) সমাজতত্ত্ববিদ্ (Sociologist) সৌজাত্য-তত্ত্ববিদ্ (Eugenist) চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ প্রভৃতি, এ সকল বিষয়ে কত যে গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন, তার হিসাব লইলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইউরোপের তুলনায় পণ্যাস্ত্রীর সংখ্যা এদেশে কম হইলেও ইউরোপে তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বিস্তর আছে, অথচ এদেশে একটিও নাই। এ সম্বন্ধে M. Ryan, Tait, Wardlaw, Lombroso প্রভৃতির কেতাব ইংরাজীতে পাওয়া যায়—Sex বা মিথুন সম্বন্ধীয় যে কোন কেতাবেই এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। Lombroso-লিখিত "Woman as criminal and prostitute" একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মিথুন-তত্ত্ব (Sexual science) সম্বন্ধে গ্রন্থের ত অভাবই নাই। অথচ এই সব সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগা দূরে থাকুক, তথ্য সংগ্রহ করিতেও কারো উৎসাহ হয় না। স্বীকার করি যে, ইউরোপের সমাজের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজের নানা বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য আছে বলিয়া ইউরোপের তুলনায় সামাজিক দুর্নীতি এ দেশে যথেষ্ট কম। তবু যাহা আছে, তার তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয় করা দরকার নয় কি? কত ডাক্তার আছেন—চিকিৎসার্থ তাঁহাদিগকে পণ্যা-নারী-দের সংসর্গে আসিতে হয়। তাঁরা অনায়াসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও এ বিষয়ে উদাসীন।

ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, আমরা অনেকেই বিদেশের মিথুন-তত্ত্ব আলোচনা করিতে সুরু করিয়াছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশের মিথুন-জীবনের (sex-life) কোন জ্ঞান আমাদের নাই। অথচ যে সকল অবস্থায় সমাজের মধ্যে মিথুন-বোধ (sex consciousness) অত্যুগ্র হইয়া মানুষের মনকে বিষাইয়া তোলে, আমাদের সমাজে সে সমস্ত অবস্থাই ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় সহরে Public House, Dancing saloon না আসুক, শৌণ্ডিকাপণ, কদর্য্য থিয়েটার, বায়স্কোপ, অপেরা-হাউস্, ঝি-

পরিচারিত মেস, এবং cafe'র বদলে পান-ওয়ালাদের দোকান এ সমস্ত উপকরণই উপস্থিত। এ গুলিকে রাতারাতি বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই।

নাগরিক জীবনটাতে আমরা ক্রমেই অভ্যস্ত হইতে চলিয়াছি। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সমৃদ্ধ নগরের মত বাংলাদেশের ছোট বড় নগরগুলিতেও শ্রমী-ব্যবসায়ী-ব্যাপারীর দলবৃদ্ধি হওয়ায় স্ত্রীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি। কেননা, অনেক পুরুষই নগরে একক বাস করে। তার ফলে পণ্যনারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। তারপর সহরের আবহাওয়া নিরানন্দ, সমস্ত দিন ক্লান্তিকর পরিশ্রম—অতএব, সন্ধ্যার পর একটা কিছু উত্তেজনা দরকার হইয়া পড়ে। সুতরাং নানাপ্রকার লঘু আমোদে মানুষ আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বাঁচে। কিন্তু এসকল বিষয়েই যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা গোড়ায় দরকার।

এরি সঙ্গে আমাদের দেশের বিবাহ, পরিবারের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট কথা নূতন করিয়া ভাবিবার আছে। কেননা, আগে যে সমস্যার কথা বলিলাম, তার সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট। গতানুগতিক সংস্কার জিনিসটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভালো যতক্ষণ মানুষ সেটা যে সংস্কার এই কথাটা না বোঝে। মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ যখন হয়, তখন চোখ-ফোটা পক্ষিশাবকের মত অন্ধ সংস্কারের কুলায়ে তাহাকে আর কুলায় না—তার দৃষ্টির ক্ষেত্রটা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঞ্চরণ-ক্ষেত্র ও বিহার-ক্ষেত্রও বাড়িয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহরা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই সব বি মনস্তত্ত্ব, বিবাহ, প্রভৃতি বিষয়ে আধু বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন সং জানিতেন না। কাজেই তাঁদের চে নূতন নূতন দরজা খুলিয়া যায় কিন্তু আমরা একালের মিথুন-মনস্তত্ত্ব আ করিয়া এবং নিজেদের মিথুন-জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিতেছি যে, আমা জীবনে আজ যে মিথুন-রাগের লীলা বি ভাবে লীলায়িত, তার সঙ্গে মানুষের আ কাম-প্রবৃত্তির কোন সাযুজ্য বা সারূপ্য না অথচ সেক্স্-ঘটিত কোন প্রসঙ্গ তুলি এদেশের অধিকাংশ লোকের মনের ম ইন্দ্রিয়ভোগের লালসাপূর্ণ স্থূল দিক্‌টাই হইয়া উঠে। যে মিথুন-রাগের কথা বলিতে তাহা মানুষের জীবনের সৌন্দর্য্যানুভূ প্রেমানুভূতি, এমন কি, অধ্যাত্ম অনু পর্য্যন্ত, সকল অনুভূতি ও প্রেরণা অনির্ব্বচনীয় রংয়ে রঞ্জিত করিয়া মানু সমস্ত চেতনাকে আবেগ-চঞ্চল করি তোলে। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানু হৃদয়-মনের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মানু আদিম স্থূল কামপ্রবৃত্তি এই সূক্ষ্ম সর্ব্বরঞ্জ মিথুন-রাগে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এইজন্য একজন মিথুন-তত্ত্ব-রচয়িতা এ অভিনব মিথুন-রাগকে "Rhythmo tropism" বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলে এই অভিনব মিথুন-রাগের প্রেরণা ইন্দ্রিয়জও বটে হৃদয়জও বটে—ইন্দ্রিয়ে সঙ্গে হৃদয়-মনের ছন্দের অপূর্ব্ব মি সুতরাং এখনকার কালে, ছবিতে গা কাব্যে, স্ত্রীপুরুষের অঙ্গ-সজ্জায় গৃহ-সজ্জা

পুরুষের সামাজিক মিলনে, হাস্যে পরিহাসে লাপনে, কত শতসহস্র মধুর ছলার ভিতর য়া মানুষের মনের তারে ও ইন্দ্রিয়ের তারে ই মিথুন-রাগের অনির্ব্বচনীয় ঝঙ্কার ল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। এ হিল্লোলের ল যে খারাপ, এমন কথা কে বলিবে? এই ল্লোল-চাঞ্চল্যই ত সাহিত্য-শিল্পে, সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে লীলায়িত। রোমান্টিক াহিত্যের মূলে মনসিজের এই বিচিত্র ভাবই তো প্রত্যক্ষ। রুশোর New Heloise হইতে সুরু করিয়া গ্যয়টে, গেল, হাইনে, মোপাসাঁ, গোতিয়ে, দলেয়ার, ব্রাউনিং এবং একালের ইব্‌সেন্-নড্‌বার্গ পর্য্যন্ত, শুধু মিথুন-রাগের াহিত্য কি কম এবং তার প্রভাব কি ামাদের মনের পরে সামান্য? বাংলা াহিত্যের কোন কবি বা ঔপন্যাসিকের াম না করিলেও সকলেই জানেন যে, খনকার গল্প-উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় —এই অভিনব মিথুন-রাগের বিচিত্র লীলা।

সেই জন্য, এখন এই সেক্স্-জীবনের রিবর্ত্তনটাকে যদি একালের স্ত্রী-পুরুষের ম্বন্ধে জোর করিয়া অস্বীকার করি, যদি লি যে জবরদস্তির দ্বারা এ পরিবর্ত্তনস্রোতকে রোধ করিব তবে ফল হইবে এই যে, বজাগ্রত এই সুস্থ বিকাশে সমাজে থুন-বোধের (Sex-consciousness) যে াহিত্য-শিল্প-সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিত, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে সহজ করিত, বিবাহকে াধীন নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত রিত—তার সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া াইবে। মানব-প্রকৃতি যদি আপনার স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পায়, তবে সে বিকৃত হইয়া উঠে। বহুযুগ-রূপান্তরিত হৃদয়জ মিথুনরাগ সমস্ত জীবনকে ও হৃদয়কে মধুর রংয়ে রঞ্জিত করিতে না পারিলে, তাহা অস্বাভাবিক কাম-বিকারে পর্য্যবসিত হইবেই। তখন সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র-সঞ্চারিত সেই বিষকে ঠেকাইবে কে?

যে সকল কদর্য্য সামাজিক অবস্থায় এই সব বিষ উৎপন্ন হইতেছে ও ছড়াইয়া পড়িতেছে, তার গোটাকতককে উন্মূলিত করিলেই যে সমস্যা চুকিয়া যাইবে তাহা নয়। থিয়েটার বন্ধ করিলেই যে সহরের যুবক ও অন্যান্য লোক দুর্নীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে তাহা নয়। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জায়গায় স্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কলুষিত আমোদের জায়গায় ভদ্র আমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। থিয়েটারও চাই, গান-বাজনাও চাই—এমন কি নাচও হয়ত চাই। কিন্তু কি ভাবে চাই, কি আকারে চাই—তারি উপর এর সুফল-কুফলের নির্ভর। শ্রমীর শ্রম লাঘব করা ও শ্রমের মধ্যে মর্য্যাদাকে জাগানো এবং তার আনন্দের ও অবসরের ব্যবস্থা করা—শ্রমীকে পতন হইতে রক্ষা করিবার একটা উপায়। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থাই এত গুরুতর পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ যে, সমাজ সে সব পরিবর্ত্তনের ছায়াপাতেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

তাই বলিতেছিলাম যে, কোন সমস্যারই আনুমানিক সমাধান স্থির না করিয়া গোড়ায় দরকার তথ্যসংগ্রহ। সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংগৃহীত হইলে, তারপর নানা থিওরি স্বভাবতই দাঁড়াইবে। তারপর নানা

পরীক্ষা উপস্থিত হইবে এবং ক্রমশ খিওরির পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে। এমনি করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ প্রস্তুত হইবে। এবিষয়ে যাঁরা ভাবুক ও চিন্তাশীল, তাঁরা অনুসন্ধানে ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা আশা করিয়া রহিলাম।

পল্লী সভ্যতা

ইস্কুলে যখন পড়িতাম, তখন মাষ্টার মহাশয় পল্লী ও সহরের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করিয়া রচনা লিখিতে দিতেন, মনে পড়ে।

তখন পল্লীর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-সরলতার কথা লিখিয়া পল্লীর তুলনায় সহরকে খাটো করিবার চেষ্টা করিলে মাষ্টার বলিয়াছিলেন যে, সহরই সভ্যতার জন্মভূমি—সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-ব্যবসায়, ধনৈশ্বর্য্য, রাজ্য-সাম্রাজ্য, সমস্তই তৈরি হয় সহরে। পল্লী আছে শুধু সহরের পুষ্টিসাধনের জন্য।

বেশি বয়সে দুচারটে অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেতাব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি যে, পল্লী সম্বন্ধে আমাদের ইস্কুল-মাষ্টার যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তারি সমর্থন পাওয়া যায়। মাল-জোগানের দিক্ দিয়া পল্লীর সঙ্গে সহরের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের কোন আঁচ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাব এই যে, পল্লীতে যেন মানুষ নাই এবং সে মানুষদের সম্বন্ধে ভাবিবারও কোন দরকার নাই—সেখানে শুধু ফলে ফসল এবং সেই ফসল ও কাঁচামাল সহরের হিসাবেই প্রয়োজন।

রুশো পড়িয়া, ওয়ার্ডস্বার্থ পড়িয়া প্রথম বুঝি যে, যারা প্রকৃতির সহবাসে বাস ক তাদের মধ্যে এমন কতকগুলা দেখা দেয়, যাহা সভ্যতার কৃত্রিম আবহাও মানুষ যারা, তাদের মধ্যে বিরল। তা কার্লাইল, রাস্কিন্ পড়িয়া প্রকৃতির সহবা মূল্যটা আরও বেশি করিয়া মনে দাগা দি যে সভ্যতা প্রকৃতির বুকের মধ্যে লা হয়- না, সে শতপাক আবরণে জড়ানো—সে আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে নগ্ন হই হইবে, এইতো কার্লাইলের বাণী। যে শি যে ব্যবসায়, প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তঃপুর সৌন্দর্য্য ও মহিমার দ্বারা পরিবেষ্টিত সে শিল্প মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হয়, সে ব্যবসা ঘোরতর যান্ত্রিক হইয়া উঠে—এইতো রাস্কি ও উইলিয়ম ম্যরিসের কথা। সুতরাং পল্লী যে শুধু ফসল ফলাইবার জায়গা, সেখা আর কিছু ফলিবার সম্ভাবনা নাই— ধারণাটা ক্রমশ আঘাত পাইতে লাগিল।

বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, পল্লী সভ্যতাকেও সৃষ্টি করিয়া তোলা যায়। অতএব, বাংলা পল্লীগুলির মধ্যে বিদে হাওয়া বহাইয়া দিতে হইবে। পল্লীকে এম করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে সেখানকা মানুষ শ্রমকে ও ব্যবসায়কে 'ব্যূহবদ্ধ' করি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং অবকাশ পায় এব সেই অবকাশকে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য প্রভৃতি দ্বারা রমণীয় করিয়া তুলিতে পারে। ভদ্রলোক-ছোটলোক—এই ব্যবধানটা ঘুচা ইয়া সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়া কাজে নামিলে গ্রাম আর গণ্ডগ্রাম থাকিবে না, সেখানে জীবনের বেগ স্বতই দেখা দিবে।

রবীন্দ্রনাথের এই "স্বদেশী সমাজের"

ড়িয়াটা প্রথমে বুঝি নাই। মনে হইয়াছিল কবি-মানুষ প্রকৃতির সহবাসে আনন্দ পান, গ্রামে বসতি করিয়া ম্যালেরিয়া ও প্লীহা য় করিলে তখন যে আনন্দটা কি রকম ায় তাহা ভাবিয়া দেখেন না। তারপর ানে মানুষ কোথায়? কোথায় নানা ত্তর ঘাতপ্রতিঘাত? জ্ঞানের চর্চ্চার ানে সুযোগ কোথায়? বেশিদিন গাঁয়ে কলে গাছপালার সামিল হইতে হয়— বনের মধ্যে সরলতা জাগিতে পারে, কিন্তু ড়লতা ও নিঃসাড়তা জাগিবে তার গে।

দুটো কথা তখন ভাবি নাই।

১। সকল দেশেই—বিশেষতঃ এদেশে— া-কথিত ছোট লোকের সংখ্যাই ভদ্র াকের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। রোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে ধীনতা ও গণতন্ত্র, সেখানেও শ্রমীরা াদের অধীন এবং তাদের অবস্থা সেকালের ীতদাসদের চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। াৎ এই যে, ক্রীতদাসকে চাবুক মারিয়া াজ করানো হইত, আর শ্রমী-মজুরদের তে না মারিয়া 'ভাতে মারিয়া' খাটানো য়। গণতন্ত্রে এই গণদের স্থান কোথায়? মকে যখন মূল্য দিয়া কেনা যায়, খন এই আধুনিক দাসদেরই বা ক্রীতদাস া বলি কেন? সুতরাং যে সভ্যতায় া গণতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্রীতদাস, াকে উঁচুদরের সভ্যতা বলা চলে না।

২। আধুনিক সভ্যতা নাগরিক ভ্যতা হওয়ায় পল্লী হইতে মানুষের মনের াত সরিয়া যাওয়ায় সেখানে প্রাণ মরিয়া যাইতেছে। সেখানে অস্বাস্থ্য, সেখানে নিরানন্দ, সেখানে নিঃসাড়তা। যে দেশে কৃষি ও কৃষক মরে, সে দেশটাও ক্রমশ ধ্বংসের মুখে পড়ে। প্রাচীন ইতালী এই কারণে মরিয়াছিল। ইংলণ্ডে এই ব্যাধি ঢুকিয়াছে; আয়র্লণ্ডে মানুষ বিদেশে পলায়ন করিতেছে, কেননা দেশে আনন্দ নাই। ভারতবর্ষেও, বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে, পল্লী সব জীর্ণ হইয়া ঝুরিয়া গেল প্রায়। এই যে ক্ষয়, ইহা নিবারণ করিতে না পারিলে সভ্যতা দাঁড়াইবে কিসের উপর? পল্লীতে বিচ্ছিন্ন মানুষ আছে; বৃাহবদ্ধ সমাজ নাই—সুতরাং সভ্যতা নাই। পল্লীতে যদি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আনন্দ-ধর্ম্ম প্রভৃতি আমদানি করা যায় এবং সমাজ গড়া যায় তবেই সভ্যতা বাঁচে।

উপরে যে দুটো কথার অবতারণা করা গেল, তাহা পাইলাম একজন আইরিশ কবি, A.E.'র 'The National Being' নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে। এই দিক্ দিয়া এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। পল্লী যে সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে, একথা আমাদের মনে হয় নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজকের সভ্যতায় যারা এর বিলাস-বিভবের অংশীদার নয়, তারা আমাদের মন হইতে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তারাই যে সংখ্যায় বেশি সে কথাটা বেমালুম ভুলিয়া যাইতে হয়। পশ্চিমে এই অবজ্ঞাত শ্রমী সমবায়-ধর্ম্মের প্রভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তবু এখনও পর্য্যন্ত যে সব Trade-unionism বা Socialism এর

চেহারা দেখি, তাহা বেশীরভাগ সহরের শ্রমীদের মধ্যেই দেখি। সহরে তারা নগণ্য; তাদের স্থান সঙ্কীর্ণ। তারা সহরে পড়িয়া নেশায় জীর্ণ, বিলাসের আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান, পাপের কলুষে আকণ্ঠ নিমগ্ন। সামাজিক দুর্নীতি সম্বন্ধে যে কোন বই পড়িলে দেখা যায় যে, পল্লী হইতে যে সব দরিদ্র স্ত্রীলোক সহরে দাসীবৃত্তি করিতে আসে, ক্রমে তারাই পণ্য-স্ত্রীতে পরিণত হয়। আর সহরের অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ আবাসে, নিরানন্দ পরিবেষ্টনে, পুরুষেরা নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল আমোদের মধ্যে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচে। এ পাপ হইতে রক্ষার জন্যও শ্রমকে ও ব্যবসায়কে সহরে কেন্দ্রীভূত না করিয়া পল্লীতে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া দরকার। পল্লী যদি ব্যূহবদ্ধ হয়, তবে পল্লীতে ও জিলায়, জিলায় ও দেশে, একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যাইবে। তখন সমস্ত দেশ এক সজীব-কলেবর-বদ্ধ হইবে। এইতো রবিবাবুর স্বদেশী সমাজের আদর্শ।

কবি, এ,ই, লিখিয়াছেন যে, এই "স্বদেশী সমাজ" গড়িতে না পারিলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বন্ধনে মানুষের ঐক্য হয় না। সামাজিক ঐক্যের ভিত্তির উপর তবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য পাকা রকম দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়াছেন যে, ষ্টেটের দিকে না তাকাইয়াই এই স্বদেশী সমাজ গড়া দরকার। এ,ই, বলেন তার কারণ :—

—"Big Empires and republics do not create real citizenship because of the loose organisation of society. Men failing to understand the intricacies of the vast and comple life of their country, fall back private life and private ambitio and leave the making of la etc to professional politicians."

বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা

গত সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগ্য সভা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভ তাঁরই উপযুক্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষা উচ্চশিক্ষার বাহন করা সম্বন্ধে অনেকের মতামত উদ্ধার করিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা দেওয়া গেল :—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি, এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য পঠন-পাঠনের ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গ ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণে ব্যবস্থা করিতে হইবে

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডি পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করি বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে।

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-জ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয়ের (ক) প্রস্তাব সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রবেশিকা হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকা সম্বন্ধে এখনি ভাবা দরকার। এ সম্বন্ধে আমরা বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রথী-মহারথীদিগের কিরূপ মত তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁরা ইচ্ছুক হবেন, তাঁরা যদি পাঠ্য-তালিকা তৈরি করিয়া আমাদিগকে পাঠান্, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের কি পরিমাণে এবং কতদূর পর্য্যন্ত স্থান হইতে পারে, তার একটা ধারণায় সকলেই উপনীত হইতে পারেন। বলাবাহুল্য, প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, গল্পপ্রবন্ধ, হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের রচনা, প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগ হইতেই পাঠ্যপুস্তক বাছাই করিতে হইবে। ভরসা করি, বাংলাসাহিত্য বলিতে হীরেন্দ্রবাবু পণ্ডিত-মহাশয়দিগের সংস্কৃত-রীত্যনুসারে লিখিত ও সংস্কৃত ব্যাকরণ-সঙ্গত, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য ও বিভীষিকাপ্রদ গুটিকতক কেতাব স্মরণ করেন ন'ই। বাংলা যে সংস্কৃত নয়—এ জ্ঞান অনেক পণ্ডিত-মহাশয়ের না থাকিলেও "বেদান্ত-রত্ন" হীরেন্দ্রবাবুর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাতির জীবনীশক্তিহীনতা

জাতির মধ্যে অতিরিক্ত রোগ-প্রবণতা শিশু-মৃত্যু জাতির জীবনীশক্তি-হীনতার সূচায়ক একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জাতির জীবনীশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সে আর পূর্ব্বের মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে 'খাপ্' খাইয়া চলিতে পারে না। ফলে তাহার মধ্যে নানা ব্যাধি ও বিকৃতির সূচনা দেখা যাইতে থাকে।

কোনো জাতি যখন আদিম অবস্থা ছাড়িয়া "সভ্য" হইতে থাকে, তখন সে নানারূপ আরাম ও সুবিধা ভোগ করিবার সুযোগ পায় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অসুবিধাও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন যে তাহার সাধারণ-জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, রোগ-প্রবণতার আধিক্য দেখা দেয়, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। স্পেন্সার বলেন যে

সভ্যজাতি রোগ-নিবারণের যে-সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করে তাহাতেই তাহাদের রোগ-প্রবণতা আরও বাড়িয়া যায়। নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে বহিঃপ্রকৃতির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া দেহের সহিষ্ণুতা-শক্তি কম হইয়া পড়ে ও তাহাতে ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া রোগের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়।

"The very precautions against death are themselves in some measure new causes of death. Every further appliance for meeting an evil, every additional expenditure of effort, every extra tax to meet the cost of supervision, becomes a fresh obstacle to living". (Study of Sociology—p.341.)

ফলতঃ, সভ্যতা অনেক স্থলে মানব-জাতির পক্ষে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ তাহা ঠিক করা কঠিন। সভ্যতা অর্থে যদি নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশ বুঝায়, তবে এ-কথা দুঃখের সহিত বলিতেই হইবে যে, এই সকলের দ্বারা প্রায় কোনো সভ্যজাতিই শেষ-পর্য্যন্ত জীবন-যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আদিম ও বর্ব্বর যুগের যুদ্ধ-প্রবণতা ও কঠোর জীবন-প্রণালী ছাড়িয়া যখনই কোনো জাতি শান্তশিষ্টভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে বসিয়াছে, তখনই তাহারা "নির্বীর্য্য" হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের দৈহিক বল ও সহিষ্ণুতার হ্রাস হইয়াছে। ফলে প্রান্তবাসী দুর্দ্দান্ত অর্দ্ধ-সভ্য বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণে তাহাদিকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে ও অধিকাংশ স্থলেই দাসত্ব-শৃ
পরিতে হইয়াছে। আর্য্যজাতি যখনই নি
মনে গঙ্গাতীরে বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা ক
বসিয়াছিলেন, তখনই শক, হূণ, গ
ও তাতার জাতির অত্যাচারে তাঁ
বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক
যে অতিরিক্ত কাব্য-দর্শন আলোচনার ম
দুর্দ্দান্ত রোমের কবলে বন্দী হইয়াছিল এ
বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গ
গথেরা রোমক সভ্যতার সুরম্য
আপনাদের বিপুল বর্শার আঘাতে চূ
করিয়া দিয়াছিল। "সভ্যতার" ফলে নানা
বিলাসিতা ও দুর্নীতি আসিয়া সমা
ভিত্তিমূল যে ক্ষয় করিয়া দেয়, তাহাতে ম
নাই; তাহা ছাড়া ইহাতে জাতি শারি
ও নিরীহ হইয়া পড়ে; যুদ্ধবিদ্যা ভু
কেবল তানপুরা ভাঁজিয়া ও পুঁথি প
তাহাদের শরীর-মন অনেকটা মে
ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং ফলে নানা
দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার প্রা
হয়।

"সভ্য" জাতি বর্ব্বর জাতির দু
নানা বিষয়ে শান্তিপ্রিয় হইয়া পড়ে স
নাই; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আবার
জাতির জীবন নানারূপ কৃত্রিম চঞ্চল
ভরিয়া উঠে। একদিকে লোকসংখ্যা বৃ
ফলে খাদ্যাভাব ঘটে ও জীবন-ধা
জন্য নানারূপ কষ্টকর ও কদর্য্য উ
আহার সংগ্রহ করিতে হয়; অন্য
স্থানাভাবে সহর ও গ্রামগুলি মধুচক্রের
জনবহুল হইয়া সাধারণ মানুষের বা
সঙ্কীর্ণ এবং আবর্জ্জনাময় হইয়া উঠে।

কারখানা ও রেল, ষ্টীমার, মোটর-কার প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও পবিত্রতায় অনেকখানি ব্যাঘাত আসিয়া পড়ে। নানারূপ কৃত্রিম আমোদ-প্রমোদ লোকের মনকে লঘু ও তরল করিয়া তোলে এবং জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করিবার অবসর দেয় না। এই সকলের ফলে সভ্যজাতির মধ্যে অনেক নূতন নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কতকগুলি ব্যাধি কেবল সভ্যজাতির নিজস্ব; বর্ব্বর জাতির মধ্যে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। যেমন যক্ষ্মা, বহুমূত্র প্রভৃতি।

এইরূপে সভ্যতার ফলে জীবনীশক্তি-হীনতা জাতি-সমূহের মধ্যে অনেকটা সাধারণ; কিন্তু আর একটা বিশেষ কারণে কোনো কোনো জাতির জীবন-শক্তি-হীনতার উপর ঘা পড়ে। দুইটি সম্পূর্ণ-বিভিন্ন-জাতীয় ও অসম-সভ্যতাবিশিষ্ট জাতির যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন এইরূপ ঘটে। এই অবস্থায় প্রবল সভ্যতাবিশিষ্ট জাতির সংস্পর্শে আসিয়া দুর্ব্বল জাতির জীবন-প্রণালীতে ঘোরতর উলটপালট ও গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। দুর্ব্বল জাতি যে অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিল, প্রবল জাতির সংঘর্ষে আসিয়া তাহার অধিকাংশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ফলে নূতন অভ্যাস ও নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অধিকাংশ স্থলেই সে অশক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মধ্যে নানারূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। তাহার জীবনশক্তি হ্রাস হইয়া যায়, রোগ-প্রবণতা বাড়িয়া উঠে, জীবন-যুদ্ধে পদে-পদে তাহাকে প্রতিহত হইতে হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা যে অনেকটা এইরূপ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রবল ইউরোপীয় জাতি-সমূহের সংঘর্ষে আসিয়া, তাহার প্রাচীন শান্ত জীবন-যাপন-প্রণালীতে আঘাত লাগিয়াছে; তাহাকে চির-পুরাতন অনেক অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, নূতন নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে 'খাপ্' খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। জীবন-সংগ্রামের ব্যস্ততা, উদ্বেগ ও কৃত্রিম চঞ্চলতা তাহার মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে। যদি তাহার জীবনীশক্তি প্রবল থাকিত, তবে হয়ত এ আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত; কিন্তু বহু-শত-বৎসরের নানা উপদ্রব ও বিড়ম্বনায় তাহার জীবনীশক্তি স্বভাবতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এ নূতন আঘাত সহিবার ক্ষমতা তাহার কমিয়া যাইবারই কথা। ফলে নানারূপ নূতন নূতন ব্যাধি তাহার মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইতেছে।

ভারতে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার মান্দ্রাজবাসী C. Muthu M. D. M. R. C. S. একটা খুব বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতে এই ব্যাধির আসল কারণ "tremendous impact between the ideals of the East and the West." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আর সেই দুই সম্পূর্ণ-ভিন্নজাতীয় আদর্শের সংঘর্ষেই এই নূতন সভ্যতা-ব্যাধি ভারতে দেখা দিয়াছে। বাস্তবিক আধুনিক ডাক্তারেরা রোগের নিদান নির্ণয় করিতে

গিয়া জীবাণু-তত্ত্বের উপরে খুবই বেশী ঝোঁক দেন;—কোন্ জীবাণু কোন্ রোগের নিদান তাহার গবেষণা করিতেই অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু এই সকল রোগ উৎপত্তির ভিতরে যে জীবন-বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানের (Biology & Psychology) একটা দিক আছে তাহা মোটেই দেখেন না। আচার্য্য ডারুইনের দৃষ্টিতে কিন্তু এদিকটা এড়ায় নাই। প্রবল জাতির সংস্পর্শে দুর্ব্বল জাতির মধ্যে রোগ-সৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন--

"It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease." (The Descent of Man—P. 283.)

কিন্তু ডারুইনের পরে এই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটি লইয়া বিশেষরূপে আর কেহ আলোচনা করেন নাই—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

জাতির মধ্যে জীবনীশক্তিহীনতার একটা লক্ষণ—জাতীয়জীবনের আয়ুঃপরিমাণের হ্রাস। যে-জাতির জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িয়াছে, সে জাতির মধ্যে লোক প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না;—তাহার অন্তর্গত ব্যক্তি-সমূহের আয়ুঃপরিমাণ তুলনায় সুস্থ ও সবল জাতির লোকদের আয়ুঃপরিমাণ হইতে অনেক কম। আমাদের এই ভারতবর্ষেই তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। ব্যাপার কিরূপ গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, নিম্নের তালিকা হইতে বেশ তাহা বুঝা যাইবে :—

বিভিন্ন দেশের লোকের আয়ুর গড় পরিমাণ :—

দেশ	অব্দ	পুরুষ	স্ত্রী
সুইডেন	১৮৯১—১৯০০	৫০.৯	৫৩.৬
ডেন্‌মার্ক	১৮৯৫—১৯০০	৫০.২	৫৩.৬
ফ্রান্স	১৮৯৮—১৯০৩	৪৫.৭	০০.০
ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্	১৮৯১—১৯০০	৪৪.১	৪৭.১
মার্কিনদেশ	১৮৯৩—১৮৯৭	৪৪.১	৪৬.৬
ইতালী	১৮৯৯—১৯০২	৪২.৮	৪৩.১
জার্ম্মাণী	১৮৯১—১৯০০	৪১.০	৪৪.৫
ভারতবর্ষ	১৯০১	২৩.০	২৪.০

উপরি-লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কোনো পাশ্চাত্য জাতির আয়ুঃপরিমাণ চল্লিশ বৎসরের নীচে নাই। ভারতবাসীর আয়ুঃপরিমাণের গড় উহাদের তুলনায় অর্দ্ধেক। হয়ত জল-বায়ুর জন্য কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিতে পারে; কিন্তু এতটা বেশী পার্থক্য যে ভারতবাসীর জীবনশক্তিহীনতারই লক্ষণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের কথা ত এই। কিন্তু শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবিলে, বোধ হয় অবস্থা আরও শোচনীয় দেখা যাইবে। বাঙালীর আয়ুঃপরিমাণ যারপরনাই কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ করেন। বাংলা দেশের ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও আয়ু লইয়া আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক আলোচনা ও আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ছাত্রমহলে নহে, আমাদের আশঙ্কা যে বাঙালী-জাতি-সাধারণের মধ্যেই এই আয়ুঃহীনতা দেখা দিয়াছে। পল্লীতে ম্যালেরিয়া এবং সহরে যক্ষ্মা ও বহুমূত্র—যেখানে এই তিন দস্যু সর্ব্বদা হানা দিতেছে, সেখানে যে অকালমৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বিশেষ-করিয়া বাংলার প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে এই অকাল-মৃত্যুর আধিক্য দেখা যাইতেছে। ব্যক্তির পক্ষে যেমন মস্তিষ্ক, জাতির পক্ষে তেমনই প্রতিভাশালী লোকেরা। তাঁহারাই জাতীয় আদর্শের স্থাপয়িতা, জাতীয় উন্নতির পথ-নির্দ্দেশক। যে-জাতির মধ্যে প্রতিভাশালীর বাহুল্য, তাহার ভবিষ্যৎ আশাসূচক। প্রতিভাশালীদের অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে ঘোরতর ক্ষতিকর; তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলে জাতিকে যে-সকল জ্ঞান ও ভাবসম্পদ দান করিতেন, অকালমৃত্যুর ফলে জাতিকে সে-সকল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কেন যে বাংলাদেশে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী লোকেরা বেশীদিন বাঁচিতে পারেন না তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত সকলেই অকালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ভগবৎ-দত্ত প্রতিভা তাঁহারা যে-পরিমাণে লাভ করেন—সে পরিমাণে তাঁহাদের দেহ বাহ্যজগতের ধাক্কা সহিবার উপযোগী হয় না। জাতির সাধারণ জীবনী-শক্তি-হীনতার ফলে তাঁহাদের ক্ষীণ দেহ নিজেদের কর্ম্মবহুল জীবনের গুরুতর চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম বোধ হয় বেশীদিন সহ্য করিতে পারে না। কারণ যাহাই হউক—ইহা যে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে আশাপ্রদ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি আমাদিগকে বাঁচিতে হয়, তবে আমাদের এই জীবনীশক্তিহীনতার মূল কারণ নির্ণয় করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

কলঙ্কিনী

বৈশাখের অপরাহ্ণ ; তপ্ত রবি অগ্নি-আঁখি হানে,
পদপ্রান্তে পড়ে' আছে অনিমেষে চেয়ে তারি পানে
মুহ্যমান মৌন ধরা ; শূন্যদৃষ্টি সরোবরতীরে
নারিকেলতরুকুঞ্জ মর্ম্মরিয়া কাঁপিতেছে ধীরে
দুলায়ে চামর-পত্র ; তীরাস্তৃত বেতসের বন
বিম্বিত ছায়াটি তারি বিস্মিত করিছে নিরীক্ষণ।

তীরের কুটীর ছাড়ি' গ্রীষ্মতাপে সেথা জম্বুমূলে
বসিয়াছিলাম একা আঁখি রাখি' সরোবরকূলে।

সহসা হেরিনু দূরে অপ্রশস্ত বনপথ দিয়া
ত্বরিত চরণ ফেলি' দীঘিজলে নামিল আসিয়া
অবীরা চতুরালকন্যা—পল্লীকলঙ্কিনী সেই তারা!
টুটিল অলস স্বপ্ন ; মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহের পারা
ভাঙিল সহজ শান্তি ; সুনির্ম্মল সরোবর-বারি
শিহরি' উঠিল যেন অসংযত অঙ্গস্পর্শে তারি!

তবু রহিলাম চাহি'—অদৃশ্য তাহার নেত্রপথে,
সঙ্কোচের আবরণ সাধ্যসে সরায়ে কোন মতে!

চঞ্চলা ও রঙ্গময়ী তরঙ্গেরই নর্ম্মসঙ্গিনী সে—
রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে' ;
আয়ত উরস 'পরে উর্ম্মিগুলি হেসে করে খেলা ;
কুঞ্চিত চিকুরভার তরঙ্গিত শৈবালের মেলা

ভাসে মুখপদ্ম বেড়ি' ; আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্যভঙ্গী ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের !
লীলায়িত তনুখানি সঞ্চারিয়া উদ্দাম কৌতুকে,
সৃজি নব ইন্দ্রধনু মুখজলে, মুক্তামালা বুকে—
দাঁড়াইল স্নানশেষে তীরপ্রান্তে বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।
সহসা-ফিরায়ে মুখ আর্ত্তকণ্ঠে 'ওমা ! ওকি', বলি'
চকিতে নামিয়া নীরে দ্রুত সন্তরণে গেল চলি'
ওপারের তীর লক্ষ্যি ; সবিস্ময়ে চাহি' সেই পানে
হেরিনু গোবৎস এক ঊর্দ্ধমুখে সন্ত্রস্ত নয়ানে
মুক্তি-আশে পঙ্কমাঝে করিতেছে প্রাণান্ত প্রয়াস ;
শৈবালে আচ্ছন্ন দেহ, চরণে জড়ায়ে গেছে ফাঁস !
উদ্‌ভ্রান্তের মত বালা ক্ষিপ্রপদে পহুঁছি' সেথায়,
ত্বরিতে বিপুল বলে বাহুপাশে তুলিয়া তাহায়
বহুযত্নে, শিশুসম অংসোপরি রাখি' মুখখানি
সাবধানে জল হ'তে তীরে তারে কোনরূপে টানি'
আনিলা অনেক কষ্টে ; রাখি' ধীরে তীরলগ্ন ঘাসে
বাহুপাশে বাঁধি তার গ্রীবাখানি বসি' তার পাশে,
করটি বুলায়ে ধীরে চোখে মুখে—স্নেহ-সুকোমল,
একান্ত আগ্রহভরে, বারেক তাহার গণ্ডস্থল
চুম্বিলা নিবিড় স্নেহে—মাতা যেন কাতর সন্তানে!
পরিপূর্ণ মমতায় শেষে তারে রাখি' সেইখানে
সরোবর অতিক্রমি' পুনরায় সন্তরণ দিয়া
এপারে যখন ধীরে উপজিল, দেখিনু চাহিয়া—
পরিপাণ্ডু মুখচ্ছবি, বক্ষ কাঁপে, নয়ন অলস,
শ্রান্ত দেহ অবনত, বাহুমূল শিথিল অবশ !
ফিরিলা গৃহের পথে মন্থর চরণ দুটি ফেলি',
স্নেহস্নিগ্ধ সুধারসে সুস্মিত নয়ন দুটি মেলি'।

সহসা বিটপীশাখে ঊর্দ্ধে মোর পল্লবেতে ঢাকা—
অজানা বিহঙ্গ এক অন্ধকারে ঝাপটিল পাখা !

একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে মনে পড়িয়াছি গালি,
সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর সৃষ্টিরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে।
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমালোচনা

মণিমঞ্জীর। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট গল্পের বই ; সর্ব্বসমেত দশটি ছোট গল্প ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক ও বাকী অনুবাদ। অনূদিত গল্পগুলি সরস, এবং সেগুলির ভাষা পরিষ্কার, স্বচ্ছ ; কোথাও একটু আড়ষ্ট ভাব নাই ; রচনার গুণে সেগুলিকে অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। মণিমঞ্জীর গল্পটি আকারে বড় এবং সেইটির নাম লইয়াই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। এ গল্পটি ভারতের অতীত যুগের প্রণয়-লীলার একটি মধু ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। "মহামুস্কিল" নিতান্তই রচনা—রচনা বহুকালের—তবে এ রচনাটির লেখকের একেবারেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ছিল। "গর্দ্দ গান" গল্পটিও বিশেষত্বহীন ; এ গল্পটির হাস্যরস করুণতা কিছুই তেমন সহজ-সুন্দর হয় নাই। মুদ্রাকরের প্রমাদের মাত্রা একটু বেশীই লক্ষ্য করিলা ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



মানসগামী রাজহংস।
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ।

ভারতী

৪২শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৫ [৪র্থ সংখ্যা

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চল্‌ছিল সাবধানী।
আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে'
দেখ্‌তে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেচে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কি হয়েছে বামি?"
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চল্‌চে ধীরে ধীরে।
নিব্‌ত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি'
আকাশ ভরে' উঠ্‌ত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেলাঘর*

নাটিকা

পাত্র-পাত্রী

হেমন্ত
নীরদা
রণেন্দ্র
কামাখ্যাচরণ
হেমন্তের তিনটি পুত্র-কন্যা
আয়ি
বলাই
দাসী

প্রথম অঙ্ক

হেমন্তের সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত কক্ষ;
কাল—প্রভাত।

নীরদা ও আয়ি

নীরদা। এই জিনিষগুলি আর এই ফুলের টুকরিটি আয়ি, সাবধানে লুকিয়ে রেখে দাও ত। ছেলেরা যেন টের না পায়! সমস্তদিন আজ আমি একটুও ফুরসৎ পাব না দেখ্‌চি। খাওয়া-দাওয়ার উগ্যুগ তুমিই কর গে। আমি ততক্ষণ এ-দিক্‌কার কাজ যতটা পারি এগিয়ে রাখি। এই খেলনা আর পুতুলগুলো বাইরেই বয়ে নিয়ে যাও। ছেলেরা বেড়িয়ে ফিরে এলে তাদের হাতে দিও। এ-সব পেলে তারা সমস্ত দিন মেতে থাকবে, এদিকে বড় আর ঘেঁসবেও না; তা হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারব। দেখ, সামনের ঐ টেবিলটার উপর লতা পাতা আর ফুল দিয়ে একটা গাছ তৈরি করতে হবে, আর ঐ জায়গাটা তাড়া

* হেনরিক্ ইবসেন রচিত "Doll's House" নাটক-অবলম্বনে

করে সাজাতে হবে। লুকিয়ে এ-সব করতে হবে, কিন্তু। উনি কি আর-কেউ যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়েন, তাহলে তাড়াতাড়ি ওই পরদাটা টেনে দিতে হবে। কাউকে এখন দেখানো হবে না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হলে ব্যাপার দেখে সকলের তাক্ লেগে যাবে। হাঃ হাঃ, কি মজাই হবে তখন!

হেমন্ত। (পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে) আজ ভোর থেকেই যে ভারী ব্যস্ত দেখ্‌চি। ব্যাপারখানা কি?

নীরদা। কেমন চমৎকার চমৎকার সব জিনিষ আনিয়েচি, দেখবে এস না!

হেমন্ত। তোমার চমৎকার জিনিষ দেখবার এখন আমার সময় হচ্ছে না যে!

নীরদা। বেশ! যাও, দেখতে হবে না!

হেমন্ত। আহা, না, না, দেখাও, আমি আসচি।

(ক্ষণেক পরে পাশের দরজা খুলিয়া নীরদার নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন)

কি এ-সব! কিনে আনিয়েছ বুঝি? এ-সব ত দেখ্‌চি ছেলেদের জামা-কাপড়। একরাশ খেলনাও দেখচি যে। হঠাৎ আজ এ রকম খেয়াল মাথায় ঢুকলো যে! নাঃ, তুমি দেখ্‌চি নেহাৎ ছেলেমানুষ। এত বাজে খরচও করতে পার!

নীরদা। ছেলেমানুষ নই গো, আর বাজে খরচও কিছু করছি না যে বকবে! আজ তোমার জন্মদিন কি না, সেই জন্যেই এ সব আনিয়েছি। আজ সন্ধ্যাবেলা দু'চার জনকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে হবে।

হেমন্ত। ওঃ বুঝলুম এতক্ষণে। তা এত বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। একটু বুঝে-সুঝে খরচ করা উচিত নয় কি? অত পেরে উঠবো কেন?

নীরদা। তোমার কেবলই ঐ ভাবনা! যখনই একটু খরচ করতে যাই, তখনই তুমি —না, আজ আমি কোন কথা শুনছি না। দেখ ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন, ব্যাঙ্কের সেই বড় চাকরিটি ত তুমি দু'এক দিনেই পাবে, তবে তোমার আর ভয় কিসের? এখন থেকে আমরা বেশ সচ্ছল-ভাবেই খরচ করতে পারব।

হেমন্ত। চাকরিই না হয় পেয়েচি। কিন্তু একমাস কাজ না-করলে ত আর বেশী টাকা হাতে আসচে না! তদ্দিন কি করে চলে?

নীরদা। এই কটা দিন বইত নয়! ধার-ধোর করে চালিয়ে নেব।

হেমন্ত। এইটিই ত তোমার ছেলেমানুসি। ধার যে করবে বলচ, কি ভরসায় ধার করবে? ধর, আজ তুমি দু'শ টাকা ধার করে সব তোমার স্বামীর জন্মোৎসবে খরচ করে বসলে, আর কাল যদি তোমার স্বামীর মাথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, তখন—?

নীরদা। আহা, কি যে অলক্ষুণে কথা বল তার ঠিক নেই! থাক্, থাক্, বাবু তোমাকে আর অত বক্‌তে হবে না, তুমি নিজের কাজ করগে।

হেমন্ত। আচ্ছা, ধর যদি তাই-ই হয়, তা হলে তুমি কি কর?

নীরদা। যাও, যাও, তোমার সঙ্গে আমি বাজে বকতে পারি না।

হেমন্ত। যদিই ভেঙ্গে পড়ে, বল না, তখন কি হবে?

নীরদা। তখন টাকা ধার থাকুক বা না থাকুক, আমার ভারী বয়ে যাবে কি না!

হেমন্ত। তোমার না হয় বয়ে যাবে না, কিন্তু যারা ধার দেবে তারা ত ছাড়িবে না!

নীরদা। করুক্‌গে তাদের যা ইচ্ছে, আমার কি! যাও তুমি! (চোখে কাপড় ঢাকিল)

হেমন্ত। ছেলেমানুসি আর কাকে বলে? আমি ঠাট্টা করলুম, আর তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। যাক্ এ-সব কথা। দেখ নীরো, তবে শোনো, আমার মনের কথা ত তুমি জান! আমি চাই—একটি পয়সাও ধার করব না—ঋণগ্রস্ত কখনো হব না। যে সংসারে একবার ঋণের অশান্তি ঢুকেছে, সেখানে কি কখনো সুখ থাকতে পারে? এদ্দিন যখন আমরা কষ্টেসৃষ্টে সোজা পথ ধরে চলে এসেচি, তখন বাকী কটা দিনের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে কেন আর অস্বস্তির বোঝা ঘাড়ে চাপাই? সত্যি তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ো না—কথাটা বুঝে দেখ।

নীরদা। না, এতে ক্ষুণ্ণ হবার কি আছে? তবে তুমি বড় চাকরি পেয়েচ, তার উপর আজ তোমার জন্মদিন, তাই আমি একটু আমোদ করতে চাচ্ছি! আমার আজকের ইচ্ছাগুলি তুমি অপূর্ণ রেখো না, লক্ষ্মীটি! আজ আমায় সাধ মিটিয়ে উৎসব করতে দাও।

হেমন্ত। আচ্ছা বেশ, তাই হোক্ তবে। আমি এখন কাজ করিগে। ও আবার কি! মুখ ভার করে রইলে তবু চোখের পাতা ভিজে রইলো যে! নাঃ তুমি দেখচি নেহাৎ ছেলে মানুষ। আচ্ছা কত টাকা হলে তোমার এই আজকে খরচ চলে, বল, দশ—পনেরো—বিশ—পঞ্চাশ তুমি কি ভাব আমি একটা আন্দাজ করতে পারি না? আচ্ছা, এই নাও পঞ্চাশ টাকা কেমন, এতে হবে ত?

নীরদা। (টাকাগুলি নাড়াচাড়া করিয়া —সস্মিত মুখে) ঢের হবে। এথেকে বরং দিন কতক সংসার-খরচও চলবে।

হেমন্ত। নিশ্চয়?

নীরদা। জিনিষপত্তর কেনাতে যে বেশী খরচ করি আমি, তা তুমি বলতে পারো না। কেমন সস্তায় এ-সব কাপড়-জামা ছেলেদের জন্য আনিয়েচি! খেলনাগুলি দেখ! বড় খোকার জন্য এই বন্দুকটা, ছোট খোকার জন্য এই ঘোড়া আর ড্রাম্। খুকীর জন্য এই পুতুল আর ঝুম্‌ঝুমি। আর বেশী দিয়ে কি হবে? হাতে পড়ামাত্রই ত ভেঙ্গে ফেলবে। বুড়ী আয়ির জন্য এই কাপড়খানা আনিয়েচি। বেচারীকে এর চেয়ে একটু ভাল জিনিষ দিলে হত ভাল, কিন্তু পাব কোথায় সে খরচ!

হেমন্ত। আর ঢাকা রয়েছে ওগুলো কি?

নীরদা। না, না, ও-সবে হাত দিয়ো না। সন্ধ্যের আগে ও-সব খোলা হচ্ছে না।

হেমন্ত। বেশ কথা। এ-সব বেশ হল। এখন বল দেখি, নিজের জন্য তুমি কি চাও?

নীরদা। কি চাই আবার! কিছু না—আমার ত কিছুরই দরকার নেই।

হেমন্ত। তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমি কিন্তু কিছু দিতে চাই যে। বল, কি নেবে?

নীরদা। (কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে) যদি দিতে চাও, ত একটি জিনিষ দাও। তুমি আমায় শুধু—শুধু তুমি—

হেমন্ত। আহা, বলেই ফেল না—

নীরদা। আমায় শুধু কিছু টাকা দাও। যা পার। তার পর এরই ভিতর একদিন আমি নিজের পছন্দমত কিছু কিনিয়ে আনাব।

হেমন্ত। ওহো, বুঝেচি। এখনও বুঝি কিছু কিনতে বাকী আছে, তাই টাকার দরকার? না, না, নগদ টাকা দেব না তোমায়। টাকা হাতে পেলে এখনই ছাই-ভস্ম কতকগুলো কি কিনিয়ে আনাবে, কিম্বা সংসারে লাগিয়ে দেবে। তার পর আবার আমায় দো-কর দিতে হবে।

নীরদা। না গো না, ও-টাকা আমি তোমার সামনেই বাক্সে তুলে রেখে দেব না হয়। কি এত বাজে খরচ আমি করি? তুমি জাননা, তাই অমন বল। যতদূর পারি আমি বাঁচাতেই চেষ্টা করি।

হেমন্ত। (হাসিয়া) বাঁচাতে চেষ্টা কর, তা জানি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী সিকি-পয়সাও বাঁচাতে পেরেছ কি?

নীরদা। দেখ, তুমি কিছু বোঝ না, তাই অমন কথা বল। গেরস্থালীর ধারণাই যার তোমার নেই—

হেমন্ত। গেরস্থালীর ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার খরচ-পত্রের ধারণা অনেকটাই আমার আছে। তোমারই, বা দোষ কি, বল? ছেলেবেলায় যেমন শিখে এসেচ, তেমনি ত করবে। শ্বশুরমশায় ছিলেন একজন মস্ত খরচে লোক; তাঁরই মেয়ে তুমি! রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়!

নীরদা। আহা, বাবা আমার স্বর্গে গেছেন। তাঁর ধনদৌলত না হোক্, তাঁর গুণগুলিও যদি পেতুম!

হেমন্ত। তাঁর কোন-কিছুই তোমার পেয়ে কাজ নেই। যেমন আছ, তেমনিটিই থাক তুমি। আমার ঘরের লক্ষ্মী—নয়নের আলো—হৃদয়ের সুখ! তুমি আমার এমনিই থাক, তাহলেই আমার সব থাকবে। আচ্ছা, আজ তোমায় এত বিমর্ষ দেখচি কেন?

নীরদা। রোজই ত তুমি তাই দেখ!

হেমন্ত। সত্যি! ভারী তোমায় শুক্‌নো দেখ্‌চি আজ। আচ্ছা, তাকাও দেখি আমার দিকে।

নীরদা। ওই করি আর কি! নাও, সকালে উঠেই এলেন আমার সঙ্গে রঙ্গ করতে। যাও, যাও! আমার আর কাজ নেই না কি? ও আয়ি, ও বুড়ি—কোথায় গেলি আবার? আয় না এদিকে। চট্‌পট্ সব গুছিয়ে ফেলি। বেলা হয়ে পড়লো যে!

হেমন্ত। আচ্ছা, আমি তবে বাইরে চল্লুম। বলাইয়ের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নীরদা। ঠাকুরপোকে ওবেলা এখানে খাবার কথা বলে দিও। আর যাকে-যাকে বলবার বলে এসো।

হেমন্ত। হ্যাঁ, রণেনকে আবার আলাদা

করে কি বলবে? সে ত রোজই আসে, বলা যাবে তখন। আজ সন্ধ্যেটা বেশ আমোদেই কাটাব তা হলে, এঁ্যা? আজ হল তোমার স্বামীর জন্মোৎসব! কি বল?

নীরদা। তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু আজ আমার যে কি আনন্দ, তা আর তোমায় কি বলব!

হেমন্ত। ঠাট্টা করব কেন? তোমার আনন্দে আমিও আনন্দ বোধ করচি। তোমার চোখে মুখে যে কি নির্ব্বাক আনন্দ উথলে উঠেছে তা কি আমি বুঝতে পাচ্চি না?

(ভৃত্য বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হেমন্ত। আমি চল্লুম।

বলাই। ডাক্তারবাবু এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ তিনি এসেছেন।

(প্রস্থান)

হেমন্ত। রণেন এসেছে? তা বলতে হয় এতক্ষণ!

(বাহির হইয়া গেলেন)

(সঙ্কুচিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

লীলাবতী। কেমন আছ নীরদা?

নীরদা। (সন্দিগ্ধ ভাবে) আপনি ভাল আছেন?

লীলাবতী। তুমি এখনো আমায় ভাল চিনতে পারনি বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ, না—কৈ ভাল মনে পড়চে না ত!—বোধ হয়—বোধ হয়—ওহো, হয়েচে, হয়েচে। তুমি আমাদের সেই লীলাবতী—লীলা দিদি?

লীলাবতী। হাঁ, আমি সেই লীলাবতী। (নীরদা সানন্দে লীলাবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন; তারপর উভয়ে সোফায় উপবেশন করিলেন)

নীরদা। আমি ত ভাই চিনতেই পারিনি তোমায়! কি রকম যে বদলে গেচ তুমি!

লীলাবতী। হাঁ বোন, ন-দশ বছর কম কথা নয়! অনেক ঝড় মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারই চিহ্ন এখন শরীরে পড়ে আছে।

নীরদা। ওঃ, আজ কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল দিদি! তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাই, আমি বেশ সুখেই ঘরকন্না কচ্চি। তুমি কিন্তু, দিদি, বড্ড কাহিল হয়ে গেছ।

লীলাবতী। আর বুড়োও হয়েছি।

নীরদা। নাঃ, বুড়ো তেমন কি! অবশ্য শোকে-তাপে—(হঠাৎ থামিয়া বিষণ্ণভাবে) মাপ কর দিদি। আমি স্বার্থপরের মত নিজের সুখের কথাই বলে যাচ্চি। তোমার কথা—

লীলাবতী। কেন, কি হয়েচে তাতে?

নীরদা। তোমার পোড়া অদৃষ্টের কথা আমি শুনেছি।

লীলাবতী। হাঁ বোন্, তিন বছর হল, আমি বিধবা।

নীরদা। সবই অদৃষ্ট! যখন এ-কথা শুনলুম, কতবার তখন মনে হল, তোমায় চিঠি লিখি। কিন্তু দিদি, সংসারের নানান্ ঝঞ্ঝাটে চিঠি লিখেও তোমার খোঁজ নিতে পারিনি। তুমি কি মনে করেচ, না জানি!

লীলাবতী। না বোন্, আমি তোমার ভাল রকমই চিনি।

নীরদা। আহা, কি কষ্ট তোমার দিদি! স্বামী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই। ভগবানও কিছু রেখে যাননি বোধ হয়?

লীলাবতী। কিছু না, বোন!

নীরদা। ছেলে-পিলেও কিছু হয়নি?

লীলাবতী। না।

নীরদা। তা হলে ত কোন চিহ্নই নেই!

লীলাবতী। না, এতটুকুও চিহ্ন নেই। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা সেও এক মস্ত সুখ। তাও আমার অদৃষ্টে নেই। যাক সে কথা। তোমায় আজ দেখতে পেয়ে বড় সুখী হলুম। তোমার ছেলে মেয়ে কটি? কোথায় তারা?

নীরদা। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারা সব বেড়াতে গেছে, এল বলে। তুমি নিজের কথা চাপা দিচ্চ কেন দিদি? তুমি এখন কি করচ, কোথায় এসে রয়েচ? সব আমায় বল, শুনি!

লীলাবতী। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়েচি, তার গলগ্রহ হয়ে। আমার কথা আর কি শুনবে? তোমার ঘরকন্নার কথা কও যে শুনে সুখী হই। তোমার স্বামী কি করেন?

নীরদা। এই ক' বছর ধরে ত কোর্টে বেরুলেন, কিন্তু সুবিধে কিছুই হল না। তা ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েচেন, ব্যাঙ্কে আটশ' টাকার একটা চাকরি তিনি পেয়েচেন। এই ক'টা দিন গেলে বাঁচি। তা হলে পয়সার মুখ দেখতে পাব। পয়সার কষ্ট আর সইতে পারি না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—তিনটি ছেলে, তাদেরও মনের মত কোন জিনিষ দিতে-থুতে পারি না!

লীলাবতী। (ঈষৎ হাসিয়া) নীরদা, দেখচি তুমি ইস্কুলের সেই নীরদাই আছ। তেমনি ছেলেমানুষ, তেমনি সাদাসিধে, তেমনি সব। পয়সার অভাব মোটেই সহ্য করতে পার না!

নীরদা। (হাসিতে হাসিতে) ইনিও আমায় ঠিক ঐ কথাই বলেন বটে। কিন্তু যাই বল তোমরা, নীরদা এখন আর বোকা নয়। এখন কি আর বাজে খরচ করবার আমাদের অবস্থা? দুজনেই আমরা হাড়হদ্দ খেটে অস্থির।

লীলাবতী। তোমাকেও খুব খাটতে হয়, বুঝি?

নীরদা। টানাটানির সংসারে না খাটলে চলবে কেন, ভাই? (নিম্নস্বরে) ওঃ, কি বিপদই যে আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে!

লীলাবতী। বিপদ?

নীরদা। হাঁ, ওকালতিতে প্রথম প্রথম যখন ওঁর একেবারেই কিছু হত না, তখন উনি রাত্রি জেগে খবরের কাগজের জন্য লিখতেন কি না! একে হাড়হদ্দ খাটুনি, তার উপর রাত্রি জাগা, অর্ত সইবে কেন? ভয়ানক ব্যারামে পড়লেন। ডাক্তার বল্লে, হাওয়া বদলাতে।

লীলাবতী। সে আমি শুনেচি। ওয়াল্‌টেয়ারে না কোথায় তোমরা এক বচ্ছর ছিলে না?

নীরদা। ওয়ালটেয়ারে। সে কি দিদি সহজ ব্যাপার? তখন সবে আমার বড় খোকাটি হয়েচে আর কি। সুন্দর জায়গা কিন্তু ওয়াল্‌টেয়ার। আর ধন্যি সেখানকার

জল-হাওয়া। অত যে অসুখ, সেখানে পা দেওয়া মাত্রই কমে গেল। কিন্তু দিদি, বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে।

লীলাবতী। তা ত হবেই।

নীরদা। একশ' আধশ' হলে ত কথা ছিল না। একেবারে হাজার টাকা! ব্যাপারখানা বুঝে দেখ!

লীলাবতী। ভাগ্যে সেই বিপদের সময় অত টাকা জুটেছিল, তাই রক্ষে!

নীরদা। তা আর বলতে দিদি! বাবাই সব টাকা দিয়েছিলেন।

লীলাবতী। সত্যি! তাহলে ত ভালই হয়েছিল। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা যান না?

নীরদা। হ্যাঁ। বল দেখি, কি রকম মুস্কিলে তখন পড়েছিলুম। মেজ খোকা পেটে—আমার নিজেরই ওঠবার সামর্থ্য নেই; তার উপর উনি ব্যারামে পড়লেন—ওদিকে বাবা মৃত্যুশয্যায়—তেমন বিপদে আমি আর কখনো পড়িনি।

লীলাবতী। স্বামীগতপ্রাণ তোমার, তা ত জানি বোন।

নীরদা। টাকাটা হাতে এসে পড়ল, আর ওদিকে ডাক্তারও খোঁচাতে লাগলেন, কাজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম! কিন্তু বাবার সঙ্গে শেষ-দেখা আর হল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামী নীরোগ হয়ে ফিরে এসেচেন ত?

নীরদা। হাঁ।

লীলাবতী। তবে আবার তোমার বাড়ীতে ডাক্তার কি জন্য?

নীরদা। কোন্ ডাক্তার?

লীলাবতী। এই না তোমাদের চাক[illegible] বলছিল যে ডাক্তার বাবু এসে ব[illegible] রয়েছেন।

নীরদা। ওঃ, উনি হলেন আমাদে[illegible] আপনার লোক। সম্পর্কে ওঁর ভাই হন, রো[illegible] এমনি বেড়াতে আসেন। তোমাদের আশীর্ব্বাদে[illegible] দিদি, এখন আর আমাদের কারো অসুখ[illegible] বিসুখ নেই। কিন্তু আমি ত নিজে[illegible] কথাই বলে যাচ্চি। কি স্বার্থপর আমি[illegible] আচ্ছা, কিছু না মনে করত একটি কথা[illegible] জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে তেমন[illegible] সদ্ভাব ছিল না শুনেচি। কেন?

লীলাবতী। মা তখন বেঁচে। তুমি জানতে না, বোধ হয় যে, বাবা মারা যাবার পর আমরা জেনানা মিশনে আশ্র[illegible] নিয়েছিলুম, সেখানে আমায় হাড়ভাঙ্গা মেহন্নৎ করতে হত। মা আগে থেকে[illegible] কঠিন রোগে ভুগছিলেন, ক্রমে ব্যামো[illegible] আরো বেড়ে গেল—আর এদিকে ভাই[illegible] দুটিরও দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এ[illegible] রকম কষ্টে পড়ে পাঁচজনের কথা অ[illegible] না ভেবে-চিন্তে মা আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্লেন, মনে কল্লেন, আমার একটা হিল্লে হবে আর ভাই দুটিরও সাহায্য হবে।

নীরদা। সে ত ভালই হয়েছিল। শুনেছি তোমার স্বামী বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন।

লীলাবতী। তিনি কারবার করতেন। যখন বেঁচে ছিলেন, সংসার তখন ভালই চলত। কিন্তু মারা গেলে দেখা গেল, বিস্ত[illegible] দেনা। যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও সে দেনা শো[illegible] হল না। আমায় পথে বসতে হল।

নীরদা। তারপর?

লীলাবতী। তারপর আর কি! আবার [illegible]মি জেনানা মিশনে চাকরি নিলুম। [illegible]ন্তু সেখানে বেশী দিন পোষাল না। [illegible]নের চাকরি ছাড়ব-ছাড়ব কচ্চি এমন [illegible]য় একটি ভদ্রলোক আমাকে তাঁর [illegible] মেয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কল্লেন। [illegible] রকম পাঁচ জায়গায় ঘুরে ভাইদুটিকে [illegible]ান রকমে মানুষ করেচি। বড়টি ত্রিশ [illegible]কার এক চাকরি পেয়েচে। ছোটটি পড়চে। [illegible]ই দুটিই এখন আমার ভরসা। মা কিন্তু [illegible]র বেঁচে নেই।

নীরদা। তুমি তাহলে এখন [illegible]শ্চিন্ত?

লীলাবতী। হাঁ, অনেকটা বৈ কি! [illegible]ন্তু বড়ই যেন হাল্‌কা ঠেক্‌চে। সংসারে [illegible]ান বন্ধন নেই—কোনরকম দায়িত্বই [illegible]ই, তাই বোধ হয় একজায়গায় বেশী [illegible]ন থাকতে পারি না। এদিকে এসে [illegible]লুম, সুবিধা-মত একটা কাজ-কর্ম্মের [illegible]ষ্টায়—যদি তাতে মন বসে।

নীরদা। দেখ দিদি, তোমার শরীরটা [illegible]ন্তু একেবারে ভেঙ্গে গেছে। দিনকতক [illegible]াথাও গিয়ে নয় হাওয়া বদলে এস।

লীলাবতী। আমার কি বাপ আছে [illegible]রদা, যে তিনি তার খরচ জোগাবেন?

নীরদা। রাগ কল্লে দিদি?

লীলাবতী। রাগ নয়, বোন্, দুঃখ কচ্চি। [illegible] রকম দুরবস্থায় আমি পড়েচি তা [illegible]মিই জানি। কাউকে এখন আর [illegible]াওয়াতে পরাতে হয় না বটে, কিন্তু [illegible]নজের পোড়া পেটটা ত আছে! যৎসামান্য [illegible]লেই চলে, কিন্তু তাই-বা জোটে কই? অভাব আমায় এম্‌নি স্বার্থপর করে তুলেচে, যে বল্লে হয়ত বিশ্বাস করবে না, যখন তুমি বল্লে যে তোমার স্বামীর বড় চাকরি হয়েচে, তখন সেই কথা শুনে তোমাদের উন্নতির জন্য যত না আনন্দ হয়েছে, আমার নিজের লাভের আশায় তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হচ্ছে।

নীরদা। ভাল বুঝলুম না ভাই তোমার কথা। তোমার কি ধারণা ইনি তোমার কোন উপকার করতে পারেন?

লীলাবতী। হাঁ, কি জানি কেন, আমার সেই ধারণাই হয়েচে।

নীরদা। ওঁর যদি সামর্থ্য থাকে, অবশ্য করবেন বই কি। নিশ্চয় করবেন। তোমার কথা ওঁকে আমি বলব। যেমন করে পারি, তোমায় সাহায্য করব।

লীলাবতী। (গদ্‌গদভাবে) ছেলেবেলার সেই ভাব এখনো যে তোমার বজায় আছে, তুমি এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কর্ত্রী হয়েও যে আমার মত অনাথার সঙ্গে আলাপ করচ—আমার দুঃখে দুঃখিত হচ্চ, এ-যে আমার কি সৌভাগ্য—কি আনন্দের, তা আর বলতে পারিনে। নীরদা, তুমি সংসার ঠিক চিনেচ কি? এত সরল তুমি যে, সংসারের কিছুই বোধ হয় এখনও জান না?

নীরদা। আমি? কিছুই আমি জানি না,—বল কি দিদি?

লীলাবতী। (ঈষৎ হাস্যে) হাঁ, নীরদা। তোমার ত এই ছোটখাট সংসার! তার আবার ঝঞ্ঝাট কি? তুমি ত এখনো ছেলে-মানুষ বোন্।

নীরদা। (সহাস্যে) তুমিই বা আর গিন্নী কিসে, দিদি?

লীলাবতী হাসিলেন।

নীরদা। আর পাঁচজনে যা বলে, তুমিও তাই বলচ। সবাই বলে, শক্ত কাজ একটুও আমার দ্বারা হয় না।

লীলাবতী। তবেই বোঝ।

নীরদা। আর সংসারের কোন কষ্ট আমাকে কখনো ভোগ করতে হয় নি।

লীলাবতী। না। দুঃখ-কষ্ট সকলকে একটু না একটু পেতেই হয়। এই মাত্র ত তুমি তোমার কষ্টের কথা আমায় বলেচ!

নীরদা। হায় দিদি! ও সব কষ্ট ত কষ্টই নয়। (নিম্নস্বরে) আসল কথাই তোমায় বলি নি।

লীলাবতী। আসল কথা! সে আবার কি?

নীরদা। তুমি আমায় কেবল ছেলে-মানুষ বলেই ঠাউরে রেখেচ। কিন্তু সে তোমার ভুল, দিদি।

লীলাবতী। তবে নিজের কথা বলি ভাই, মা যে আমার শেষ বয়সে কষ্ট পান নি, ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে তাঁকে রেহাই দেবার উপায় ভগবান যে আমার হাতে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তা মনে হলে আমার খুবই আনন্দ হয়।

নীরদা। তোমার ভাইটিকে যে তুমি মানুষ করতে পেরেচ, সে জন্যে তোমার গর্ব্বও হয় ত?

লীলাবতী। তা একটু হয় বই কি।

নীরদা। আমার ত হয়। তবে শোন দিদি, তোমায় সব কথা বলি। আমি এমন কাজ করেচি, যার জন্যে আমার আনন্দ হয়—আর গর্ব্বও হয়!

লীলাবতী। তুমি কি বলচ, আমি বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। চুপ। আস্তে কথা বল উনি যেন শুনতে না পান। উনি—শুধু কেন, জগতের কেউ যেন না টের পায়।

লীলাবতী। কি এমন কথা?

নীরদা। সরে এস দিদি, আস্তে কও। চল, ওই কোণটাতে যাই। আমার স্বামীর প্রাণ আমিই রক্ষা করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে? কি রকমে?

নীরদা। আগেই ত বলেচি, ওয়ালটেয়ার ওঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেছলুম। সেখানে না গেলে কি উনি বাঁচতেন?

লীলাবতী। তা ত বুঝলুম। কিন্তু তোমার বাবাই না সব খরচ দিয়েছিলেন?

নীরদা। ইনি তাই বুঝেছিলেন, বলে অপরেও তাই জানে।

লীলাবতী। আসল কথা তবে কি?

নীরদা। বাবা একটি পয়সাও দেন নি, আমি নিজেই টাকার জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে? কত টাকার?

নীরদা। হাঁ দিদি, এক হাজারের ওপর টাকাই আমি জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। অবাক্ করলে বোন! অত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

নীরদা। হুঁ-হুঁ (গুন্‌গুন্ স্বরে—গর্ব্বিত মুখে) আঁচ কর না?

লীলাবতী। ধার অধিক্ষি করতেই না।

নীরদা। (চমকিয়া) কেন? ধার ...তে পারি না কেন?

লীলাবতী। স্বামীর অমতে কি করে ...করবে? তাও কি হতে পারে?

নীরদা। (মাথা দোলাইয়া) পারে গো, যদি স্ত্রীর কাজের বুদ্ধি থাকে, স্ত্রী যদি ...টু চালাক চতুর হয়, তাহলে—

লীলাবতী। কি বলচ তুমি, নীরদা? ...মি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। বুঝে আর তোমার কাজ ...ই। আমি ত এখনও বলিনি যে আমি ...করেচি। অন্য উপায়ে পেয়ে থাকতে ...রি। (অবসন্নভাবে মেঝেতে শুইয়া ...লেন) রূপের ফাঁদ পেতে জোগাড় ...য়েছি।

লীলাবতী। তুমি পাগল।

নীরদা। কেমন, ইচ্ছে হচ্ছে না জানবার?

লীলাবতী। শোন নীরদা, যদি তাই করে ...ক, তাহলে কাজটি ভালো হয় নি।

নীরদা। (উঠিয়া বসিলেন) কেন? ...লো নয় কিসে? স্বামীর প্রাণ রক্ষা ...া?

লীলাবতী। তাঁর অমতে—তাঁকে না ...নিয়ে—?

নীরদা। কিন্তু তাঁকে না জানতে ...ওয়াই যে দরকার ছিল, দিদি। কি রকম ...ঘাতিক ব্যামোয় তিনি পড়েছিলেন, সেইটে ...র জানতে না পারাই দরকার হয়েছিল ...! ডাক্তার আমায় আড়ালে ডেকে বল্লেন, ...ওয়া-বদলানোই হল এ রোগের একমাত্র ওষুধ। কিছুদিন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে না থাকলে কিছুতেই রোগ সারবে না। আমি তাঁকে রাজী করিয়েছিলুম কি করে, জান? তাঁকে বুঝিয়ে ছিলুম যে আমার নিজেরই বেড়াবার ইচ্ছে। বল্লুম যে ওয়াল্‌টেয়ার ভারি চমৎকার জায়গা,—আমার বড্ড ভাল লাগে সেখানে থাকতে। চোখের জল ফেলতেও বাকী রাখিনি। তবু কি তিনি শোনেন? কিন্তু আমিও নাছোড়-বান্দা। বললুম, আমার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে এ সময় অন্তত আমার আবদার তাঁর রাখা উচিত। না হয় কিছু ধারই হবে। ধারের নাম করতেই তিনি চটে উঠলেন, বল্লেন, স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি ভাল রকম বোঝেন—আমার খেয়ালের প্রশ্রয় তিনি কিছুতেই দেবেন না। তাছাড়া আমি বোকা, আহাম্মক, আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই রকম কত কথাই আমায় শুনিয়ে দিলেন। আমিও সঙ্কল্প করেছিলুম—তুমি যত বাধাই দাও না, তোমাকে রক্ষা আমি করবই। তোমার প্রাণ বড়, না, পয়সা বড়? তার পর দিদি, বুঝলে—বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি ঐ উপায়ই ঠিক করেছিলুম।

লীলাবতী। তোমার বাবা যে টাকা দেন নি, সে কথা কি তিনি তারপর কখনো ওঁকে বলেন নি?

নীরদা। না। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা গেলেন কি না! আমার মতলব ছিল বাবাকে এ কথা জানিয়ে রাখ-বার—যাতে তিনি কথাটা গোপন রাখেন। কিন্তু তাঁর তখন বড্ড অসুখ—সেই অসুখই

শেষ কাল হল। আর তাঁকে ও কথা জানানোই হল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে তাহলে এ কথা মোটেই বল নি?

নীরদা। সর্ব্বনাশ! তাহলে কি আর রক্ষে থাকত দিদি? ওঁরই অসুখের দরুণ এত টাকা খরচ করেছি শুনলে উনি কি আর আমার মুখ দর্শন কর্ত্তেন? তাহলে আজ আমাদের এই যে সুখের সংসার দেখচ, এ কোন্‌দিন ভেঙ্গে যেত।

লীলাবতী। তাহলে তোমার মতলব, কস্মিনকালেও তাঁকে এ কথা জানাবে না?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) তা—হয়ত—কোন দিন না কোন দিন—ধর, অনেক বছর পরে—এই যখন বুড়-সুড় হব, বুঝলে কি না?—তুমি হাস্‌চ যে! এই, মনে কর না, যখন আমার এত বেশী বয়স হবে যে উনি আর আমায় নিয়ে মজে থাকবেন না। যাও দিদি, তুমি ভারী দুষ্টু। কি যে মাথামুণ্ডু বকাচ্চ, তার ঠিক নেই। সে দিন কিন্তু আসবে না। কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না। আচ্ছা দিদি, তোমার এখন কি মনে হয়? তবু কি আমায় বোকা বলবে? এই ধার নিয়ে যে আমি কি নাকাল হচ্চি, তা আমিই জানি। এই টানাটানির সংসারে এত টাকা শোধ দেওয়া কি মুখের কথা? তিনমাস অন্তর টাকা দিতে হচ্চে—ভাবো দিকিন্ ব্যাপারটা একবার।

লীলাবতী। তাইত! ভারী মুস্কিলেই ত পড়েচ তুমি!

নীরদা। সে কথা আর বল্‌তে! হাজার-হুহাজার রোজগার নেই যে তা থেকে রকমে বার করে নেব। বেশ বুঝেসু চলতে হয়। তার ওপর ওঁর আ পাই-পয়সার হিসেব থাকে। তবু ভিতর থেকে নানা অছিলায় কিছু আদায় করে নি। একবার উনি একমা জন্য মফঃস্বলে গেছলেন। সেই দিন-রাত খেটে অনেক ভাল ভাল কাজ তৈরী করি। সেগুলো বিক্রী দু'তিন দফার টাকা শোধ করে দি রকম কত ফিকির যে খাটাতে হয় দেনা শোধ করবার জন্য!

লীলাবতী। কত শোধ করেচ?

নীরদা। তা ঠিক জানি না। এই জানি যে একটি পয়সাও যখনি পেরেচি, তখনি সেটি দেনার দি সময়-সময় দিদি, আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়। ভেবে যখন কিনারা পাই না, তখন চুপ করে আকাশ-কুসুম ভাবি. যেন আমি টেয়ারে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্চি, বে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের বসে পড়লুম, সন্ধ্যা হয়-হয়,—এমন পাথরটা হঠাৎ নড়ে উঠল। আমি লাফিয়ে পড়লুম। লাফিয়েই দেখি এ মস্ত গর্ত্ত, আর গর্ত্তের ভিতর এক মোহর।

লীলাবতী। হা আমার কপাল!

নীরদা। কিন্তু আমার আকাশ সত্যি সত্যি ফলে গেল। মোহরের না হোক্ টাকার ঘড়া ত দেখব। চাকরি বজায় থাকলে, এক বছরের

সব টাকা হেসে খেলে শোধ দিতে পারব। (বাহিরের দিকে চাহিলেন) ও কে ওখানে উঁকি মারচে? (ভৃত্যকে ডাকিলেন) দেখ্‌ত বলাই, ওখানে কে?

লীলাবতী। আমি এখন আসি তবে।

নীরদা। না, না, তুমি বস। এখানে কেউ আসবে না।

(ভৃত্য প্রবেশ করিল)

ও কে, বলাই?

বলাই। খাতাঞ্জি বাবু।

নীরদা। খাতাঞ্জি বাবু আবার কে?

বলাই। সেই যে—ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

(দরজার পার্শ্ব হইতে আওয়াজ আসিল) আমি কামাখ্যাচরণ। (কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লীলাবতী ত্রস্তভাবে এককোণে সরিয়া গেলেন)

নীরদা। (অগ্রসর হইয়া কম্পিতস্বরে) কি, তুমি হঠাৎ যে? এমন অসময়ে কি মনে করে?

কামাখ্যা। খাবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি, সুতরাং অসময়ে নয়, সময়েই এসেচি। তবে কোন কষ্ট দেব না। এখন একবার বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

নীরদা। তা হলে তাঁর কাছে না গিয়ে এখানে হাজির হবার প্রয়োজন?

কামাখ্যা। রাগ করবেন না। যে কাজে এসেচি, তাতে আপনারও হাত আছে। তাই প্রথমেই আপনাকে একবার দেখা দিয়ে গেলুম। আমি চল্লুম তবে তাঁর কাছে। ফেরবার সময় সব বলে যাব।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

লীলাবতী। ও কে ভাই?

নীরদা। সম্পর্কে ভগ্নীপতি হয়। আমার মামাত বোন কিরণের সঙ্গে ওর বে হয়েছিল। বাবাই উদ্‌যুগ করে বে দিয়েছিলেন—তারা বড্ড গরিব ছিল কি না!

লীলাবতী। ও তা হলে সেই লোক!

নীরদা। তুমি ওকে চেন?

লীলাবতী। খুব চিনি। ও আমাদের ওখানে মোক্তারি করত।

নীরদা। হাঁ, মোক্তারিই বরাবর করত। তারপর কি সব কাণ্ড করে এখন ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েচে। সেই ব্যাঙ্কেই উনি কাজ পেয়েছেন।

লীলাবতী। লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বদলে গেছে।

নীরদা। ছাই বদলেছে! ভগ্নীপতি বলে পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায় আমার।

লীলাবতী। স্ত্রীটি মারা গেচে না?

নীরদা। হ্যাঁ, মরেচে না বেঁচেছে! বেচারী অনেকগুলি ছেলেপিলে রেখে গেছে কিন্তু।

লীলাবতী। শুনেচি লোকটা অনেক রকমের কাজ কারবার করে।

নীরদা। কি কারবার যে ও না করে!

* * * *

[রণেন্দ্র হেমন্তর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে]

রণেন্দ্র। (হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া) না দাদা, তোমার কাছে বসে মিথ্যে বেলা বাড়াব না।—এখন একবার বৌদির সঙ্গে দেখা করে বাড়ী যাব।

(নীরদার কক্ষে যেমন প্রবেশ করিতে

যাইবেন, অমনি লীলাবতীকে দেখিয়া হঠিয়া আসিলেন)

রণেন্দ্র। মাপ্ করবেন, আপনারা আছেন তা আমি জানতুম না।

নীরদা। না, না। এস তুমি। ইনি আমার লীলাদিদি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে আমরা পড়েছিলুম।

রণেন্দ্র। (লীলাবতীর প্রতি) নমস্কার। আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেচি। আমি যখন এখানে আসি, ফটকের কাছে আপনিই দাঁড়িয়ে ছিলেন না ?

লীলাবতী। হ্যাঁ, আমিও আপনাকে আগে দেখেছি।

রণেন্দ্র। আপনাকে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল দেখ্‌ছি। চিকিৎসা করাতে এখানে এসেচেন বুঝি ?

লীলাবতী। না, তা নয়। আমাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় কি না, তাই শরীরটা এমন হয়েচে।

রণেন্দ্র। ও—,আপনি তা হলে বেড়াতে এসেচেন—দিন কতক বিশ্রাম করতে ?

লীলাবতী। না, আমি এসেচি, কাজের সন্ধানে।

রণেন্দ্র। কেন ? সেটা বুঝি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ওষুধ ?

লীলাবতী। বেঁচে থাকতে হবে ত, ডাক্তার বাবু।

রণেন্দ্র। হাঁ, বেঁচে থাকাটা নিশ্চয় দরকার। কারণ, দুনিয়ায় সকলেই তা চায়।

নীরদা। নিজেই তা' হলে স্বীকার কচ্চ ত ঠাকুরপো ?

রণেন্দ্র। তা কচ্চি বই কি। যত দুর্গতিই হোক না, প্রাণটা দেহ ছেড়ে চলে যাক্, এ আর কে চায় বল ? আমি অন্তত হাজারটা রোগী এ পর্য্যন্ত দেখেছি, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও এমন কাউকে দেখিনি, যে মরতে চেয়েচে। যারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত— একেবারে যারা পাপের চরম সীমায় পৌঁছে সয়তানের দাস হয়ে পড়েচে, তারাও ত কই একটিবারও মরতে চায় না ! ভয়ঙ্কর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত একটা লোককে এখনই আমি দেখে এলুম, লোকটা ওই ঘরে বসে কথা কইছে—

নীরদা। কার কথা বলচ, ঠাকুরপো ?

রণেন্দ্র। ঐ কামিখ্যের কথা। চেন ত তাকে ? কি ঘৃণিত জীবন লোকটার ! কিন্তু তা সত্ত্বেও উঁচু গলায় ও বলতে ছাড়চে না যে ওর বাঁচা চাইই।

নীরদা। কি বল্‌চে ?

রণেন্দ্র। ভাল শুনিনি। লোকটাকে দেখেই আমি বেরিয়ে এলুম। কি ব্যাঙ্কের কথা কইচে।

নীরদা। কামিখ্যের সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কের কি কথা ?

রণেন্দ্র। একটা চাকরি চায় আর কি।

নীরদা। (হাসিয়া উঠিলেন)

রণেন্দ্র। হাসলে যে বড় !

নীরদা। আচ্ছা, বলত ঠাকুরপো, ব্যাঙ্কে যে সব লোক চাকরি করে, সকলেই কি এঁর নীচে ?

রণেন্দ্র। এই কথা ?

নীরদা। হাঁ, এত লোক আমার স্বামীর অধীনে কাজ করে—অতখানি ওঁর কর্ত্তৃত্ব ! ঐ যে উনি আসচেন।

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

রণেন্দ্র। পাজিটায় হাত থেকে ছাড়ান পেয়েচেন ?

হেমন্ত। হাঁ, এইমাত্র উঠে গেল।

নীরদা। (হেমন্তের প্রতি) ইনি আমার বন্ধু লীলাবতী—

হেমন্ত। ভারী খুসী হলুম।

নীরদা। ছেলেবেলায় যখন একসঙ্গে পড়তুম, আমরা দুটিতে একপ্রাণ ছিলুম।

হেমন্ত। ও—(উৎসুক নেত্রে চাহিলেন)

নীরদা। কেবল তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ইনি এতদূর কষ্ট করে এসেচেন।

হেমন্ত। আমার সঙ্গে ?

লীলাবতী। না, না, তা নয়—তবে—

নীরদা। এঁর দুটি ছোট ভাই আছে, বড়টি বেশ লেখা-পড়া জানে।

হেমন্ত। বেশ !

নীরদা। তা জানলে কি হবে ? মুরুব্বি ত কেউ নেই। সে এখন ত্রিশটি টাকা মাত্র মাহিনা পায়। তুমি কেন তাকে ব্যাঙ্কে একটি ভাল চাকরি দাও না ?

হেমন্ত। আচ্ছা দেখবো, হতেও পারে হয়ত। ঠিক ! আপনি বেশ সময়ে এসেচেন।

লীলাবতী। এর জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম।

হেমন্ত। না, না, ওসব কথা বলবেন না। (নীরদার প্রতি) আমি এখন একবার বেরুব।

রণেন্দ্র। আমিও চলি।

নীরদা। বেশী দেরী করো না যেন।

হেমন্ত। না, দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।

লীলাবতী। আমিও তবে এখন আসি।

নীরদা। তুমি কোথায় যাবে দিদি ? আজ এখানেই থাক না !

লীলাবতী। আমার কি অসাধ ? তবে তাঁদের বলে আসা হয় নি কি না ! কাল আবার আসব'খন।

নীরদা। কাল নয়। ওবেলা তা হলে এস। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পৌঁছুনো চাই। আজ এঁর জন্মদিন —একটু আমোদ-আহ্লাদ করব ভাবছি।

(বাহিরে ছেলেদের চীৎকার শুনা গেল)

ওই যে ছেলেরা এসেচে। ওদের দেখে যাও দিদি। (দরজার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া) আয় না রে তোরা, এদিকে।

(ছেলেরা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল এবং নীরদাকে জড়াইয়া ধরিল। নীরদা তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন)।

হেমন্ত। চল হে ডাক্তার, আর এখানে থাকা নয়। ছেলের মা ছাড়া এখানে আর কারো এখন টেঁকে থাকা শক্ত হবে।

হেমন্ত ও রণেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন।

(লীলাবতী ছেলেগুলিকে সস্নেহে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন)

নীরদা। (গদ্‌গদ ভাবে) বাছারা যেন আমার সোনার পুতুল ! নয় দিদি ?

লীলাবতী। আহা বেঁচে থাকুক্। তবে এখন আসি ভাই।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

(ছেলেদিগকে লইয়া নীরদা ফরাসের উপর বসিলেন। ছেলেরা কেহ তাঁহার মাথায় কেহ পিঠে চড়িয়া মহা উৎপাত লাগাইয়া দিল এবং সকলে একসঙ্গে মিলিয়া নিজের নিজের কথা বলিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের কথার জবাব দিতে লাগিলেন)

নীরদা। তুমি গাড়ী টানছিলে ?—অ্যাঁ, মেজ খোকা আর টুনি দুজনে বসেছিল—আর একা তুমি তাদের টেনে নিয়ে গেছলে ? —বাঃ, খুব বাহাদুর ত! আয়ি, দাও একবার টুনিকে আমার কোলে—আমার ক্ষুদুরাণীকে একবার আদর করি। (ছোট ছেলেটিকে লইয়া নাচাইতে লাগিলেন, আর দেখাদেখি অন্য ছেলেদুটিও নাচিতে লাগিল) তোমরা খুব ছুটোছুটি কচ্চিলে ?—হাঃ হাঃ-ভারী মজাই হয়েছিল তাহলে।—আমিও একদিন তোমাদের সঙ্গে যাব—আর সকলে মিলে মাঠে ছুটোছুটি করব। আয়ি, তুমি নিজের কাজে যাও—আমি এদের কাপড়-জামা তুলে রাখব'খন।

(ছেলেদের গা হইতে কাপড় জামা খুলিয়া লইয়া মেঝেতেই ফেলিয়া রাখিলেন এবং পা ছড়াইয়া বসিয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন)

অ্যাঁ সত্যি ? একটা কুকুর তোমাদের পেছনে পেছনে দৌড়েছিল—কামড়ায় নি ত ? নাঃ, টুকটুকে ছেলেদের কি কুকুরে কামড়ায় ?—না, না, ওদিকে যেওনা—খবরদার !—কি ওগুলো ?—ভারী খুসী হবে কিন্তু দেখলে—না, না, ও ভারী বিশ্রী জিনিষ। যেওনা ওদিকে। এস আমরা খানিকক্ষণ খেলা করি—আচ্ছা, কি খেলা যায়, বল দেখি ?—লুকোচুরি ? - তাই ভাল। মেজখোকা আগে লুকুবে কিন্তু—আমি আগে লুকুব ?—আচ্ছা, তাই ভাল—আমিই আগে লুকুই।

(ইহাদের হাস্যধ্বনিতে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। নীরদা চুপিচুপি বড় টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইলেন। ছেলেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে নীরদার চাপা হাসির আওয়াজে টেবিলের কাপড় তুলিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিল—এবং সকলে হাসিয়া উঠিল। নীরদা হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইলেন এবং ভারী গলায় কৃত্রিম আওয়াজে ছেলেদের ভয় দেখাইলেন, অমনি আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। এমন সময় দরজায় কে ঘা দিল, কিন্তু কেহ তাহা টের পাইল না। দরজা একটু ফাঁক হইল এবং কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুনরায় খেলা চলিতে লাগিল)

কামাখ্যা। (গলার সাড়া দিলেন)

নীরদা। (ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিলেন) কে ? (তিনি যেমন হাঁটুতে ভর দিয়া ছিলেন, তেমনই ভাবে কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) কি চাও তুমি ?

কামাখ্যা। মাপ করবেন। দরজাটা খোলাই ছিল। বিশেষ জরুরি কথা বলেই—

নীরদা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু ওঁরা এখন বাহিরে গেছেন—

কামাখ্যা। তা আমি জানি।

নীরদা। তবে এখানে তোমার কি দরকার এখন ?

কামাখ্যা। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

নীরদা। আমার সঙ্গে কথা ! (ছেলেদের প্রতি) আয়ির কাছে তোমরা যাও ত বাবা।

টু পরে আবার আমরা খেলা রব।

(ছেলেরা চলিয়া গেল)

আমার সঙ্গে কথা ?

কামাখ্যা। হাঁ, আপনার সঙ্গেই !

নীরদা। আজই কথা ?—আজ ত পরলা রিখ নয়।

কামাখ্যা। না, এখনো তার এক হপ্তা রী আছে। আর এক হপ্তা পরেই পনাদের অবস্থা ফিরবে, কিন্তু তখনকার দিনগুলি সুখে কি দুঃখে কাটানো, আপনারই হাতে।

নীরদা। কি চাও তুমি ?—আজ কেবারেই পারব না—তোমাকে কিন্তু—

কামাখ্যা। না, সে কথা আমি বলচি —এ একেবারে পৃথক ব্যাপার—ফুরসৎ ত আপনার—মন দিয়ে শুনবেন ?

নীরদা। (ব্যস্ত হইয়া) হাঁ, হাঁ, শীগগির —যদিও আজ আমার—

কামাখ্যা। বেশ। এখান থেকে রিয়েই আমি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। খলুম হেমন্ত বাবু আর ডাক্তার চলে লেন। সে স্ত্রীলোকটিকেও যেতে খলুম।

নীরদা। কোন্ স্ত্রীলোকটি ?

কামাখ্যা। এই একটু আগেই এখানে নি বসেছিলেন।

নীরদা। ও—

কামাখ্যা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে রি, সেই স্ত্রীলোকটির নাম কি লীলাবতী ?

নীরদা। হাঁ—লীলাবতীই। এইমাত্র নি এখান থেকে গেলেন।

কামাখ্যা। সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ? কেমন, না ?

নীরদা। হাঁ, বিশেষ অন্তরঙ্গ—কিন্তু এ সব কথা—

কামাখ্যা। এক সময় আমার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল।

নীরদা। আমি তা শুনেছি।

কামাখ্যা। ওঃ, জানেন তবে সব ? তা হলে অন্ধকারে ঢিল না মেরে এখন আসল কথাটাই পেড়ে ফেলি। লীলাবতীর ভাই কি ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পেয়েছে ?

নীরদা। তোমার তাতে প্রয়োজন ? তুমি আমার আত্মীয়, স্বীকার করি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন, যে তুমি আমার স্বামীর একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। বেশ, জিজ্ঞাসাই যখন কল্লে, তখন বলি। হাঁ, লীলাবতীর ভাই ব্যাঙ্কে চাকরি পাবে—সে একরকম পাকা।

কামাখ্যা। আমি তবে যা ভেবেচি, তাই ঠিক।

নীরদা। (টেবিলের উপরস্থ ফুলদানিটি অনাবশ্যকভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে) সব দিন সমান যায় না। কোন না কোন রকমের ক্ষমতা মানুষের হাতে কোন দিন না কোন দিন আসেই। স্ত্রীলোক বলে বুঝি তার—? দেখ, উপরওয়ালার অধীনে যাকে কাজ করতে হয়, তার সে রকম লোককে চটানো সুবুদ্ধির কাজ নয়, যার—

কামাখ্যা। যার হাতে ক্ষমতা আছে ?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। (সুর বদলাইয়া) সে ত ভালই। আমারও তা হলে আশা আছে

আপনি আপনার ক্ষমতা আমার কাজে একটু লাগাবেন।

নীরদা। তার মানে?

কামাখ্যা। যাতে আমার চাকরিটা বজায় থাকে আপনি সে চেষ্টা করবেন, এই আর কি!

নীরদা। তোমার কথা বুঝলুম না। কে তোমার চাকরি কেড়ে নিচ্ছে?

কামাখ্যা। ছলনা করে আর লাভ কি? আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি আমার অন্ন কেড়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করচেন। এ বুঝতে আমার বাকী নেই।

নীরদা। কিন্তু এসব কথার কিছুই আমি জানি না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারেন। এখন তবে কাজের কথা বলি, শুনুন। আপনার উচিত এ সময় আমাকে সাহায্য করা—যতদূর আপনার ক্ষমতা, এতে বাধা দিন, যাতে আমার চাকরিটি না যায়।

নীরদা। কিন্তু আমার এতটুকুও ক্ষমতা নেই তাতে বাধা দেবার।

কামাখ্যা। সে কি? এইমাত্র না আপনি বলছিলেন—

নীরদা। সে কথার যে ও-রকম মানে করবে, তা ভাবিনি। আচ্ছা, কি দেখে তোমার ধারণা হল যে আমার স্বামীর উপর ও-ধরণের ক্ষমতা আমার আছে?

কামাখ্যা। আপনার স্বামীকে আমি খুব ভালরকমই জানি। সচরাচর স্বামী-মশায়রা যে রকম হয়ে থাকেন তিনি যে তা থেকে পৃথক, আমার ত তা মনে হয় না।

নীরদা। দেখ, আমার স্বামীর সম্ব যদি ও-রকম তাচ্ছিল্যভাবে কথা ব তাহলে বাড়ী থেকে তোমায় বার ক দেব।

কামাখ্যা। আপনার সাহস আছে বলতে হবে।

নীরদা। তোমাকে আর আমি ভ করি না। আর মাস কতকের মধ্যে আমি সব দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কামাখ্যা। (নিজেকে সংযত করিয়া শুনুন তবে আসল কথা। চাকরিটি আমি সহজে ছাড়চি নে। দরকার হলে শে পর্য্যন্ত পণ করব, এটি বজায় রাখতে।

নীরদা। তাই দেখচি।

কামাখ্যা। শুধু টাকার জন্য না টাকার পরোয়া আমি করি না—অন্য চাকরি ঢের মিলবে। আসল কারণ আপনি হয়ত জানেন না। অনেক বৎসর পূর্বে আমি একটা বে-আইনি কাজ ক ফেলেছিলুম।

নীরদা। আমি তার কিছু কিছু শুনেছি।

কামাখ্যা। ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়নি বটে, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আমার উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই আমি যে ব্যবসায়ে হাত দিয়েছি তা আপনারও কিছু কিছু জানা আছে। এতে অনেক রকমের ফন্দি-ফিকির খাটাতে হয়। যথার্থ বলতে গেলে অধর্ম্ম যে করি না, তা নয়। কিন্তু যা করবার করেছি আর না। ছেলেপিলেগুলিও বড় হয়ে উঠ্‌লো, অন্ততঃ তাদের মুখ চেয়েও এখন এমন কাজ নিয়ে আমায় থাকতে হবে

তে মান-ইজ্জত বজায় থাকে। ব্যাঙ্কের ই চাকরিটি আমি আমার উন্নতির প্রথম াপানের মত পেয়েচি, কিন্তু আপনার ামী আজ আমায় সেখান থেকে ধাক্কা য়ে আবার নীচে ফেলে দিতে চান!

নীরদা। আমি কি করব, বল? এতে ামার কোন হাত নেই। তুমি আমার া বিশ্বাস কর—তোমাকে এ বিষয়ে াহায্য করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

কামাখ্যা। ক্ষমতা নেই, না, ইচ্ছে নেই? ন্তু জানেন আপনি, জোর করে আপনাকে য়ে কাজ করাবার উপায় আমার হাতে াছে!

নীরদা। (উদ্বিগ্নভাবে) তুমি নিশ্চয়ই কে সে কথা বলবে না যে আমি তোমার াছে টাকা ধার নিয়েছিলুম?

কামাখ্যা। ধরুন, যদি তাই বলি?

নীরদা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) ভয়ানক অন্যায় ব তাহলে! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ামার সেই গোপন কথা যদি উনি ানতে পারেন—যেটি আমার আনন্দের নিষ, গর্ব্বের জিনিষ,—তাও আবার এই রকমে—এই রকম লোকের কাছ কে—! ওঃ—কি ভয়ঙ্কর অশান্তি হবে াহলে।

কামাখ্যা। শুধুই অশান্তি?

নীরদা। (গর্জ্জিয়া উঠিলেন) তাই ল তাহলে। এতে তোমারই যতদূর ন হবার, তা হবে। উনি ত জানতেই ারবেন তোমার ভিতরটা কত নোংরা, াড়া চাকরিও তুমি কোনমতে রাখতে ারবে না।

কামাখ্যা। আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম যে, আপনি ভয় পেয়েচেন কি শুধু এই ভেবে যে আপনার গৃহটি অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে?

নীরদা। আমার স্বামী যদি ধারের কথা জানতে পারেন, তাহলে তখনি তোমার বাকী টাকা সব ফেলে দেবেন। তার পর তোমার সঙ্গে আর আমার কিসের সম্পর্ক?

কামাখ্যা। (সম্মুখে একপা অগ্রসর হইয়া) শুনুন তবে আপনি আমার কথা, হয় আপনার স্মরণ-শক্তি খুব অল্প, আর না হয় আপনি দেনা-পাওনার বিষয় কিছুই বোঝেন না। আরও গুটিকতক কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই তবে!

নীরদা। কি কথা?

কামাখ্যা। আপনার স্বামী যখন পীড়িত, তখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন হাজার টাকা ধার নিতে—কেমন?

নীরদা। আর কাউকে জানতুম না, তাই।

কামাখ্যা। আমি টাকার জোগাড় করে দিতে রাজী হই—কেমন?

নীরদা। হ্যাঁ দিয়েও ছিলে।

কামাখ্যা। একটি সর্ত্তে আমি দিতে রাজী হয়েছিলুম। কিন্তু স্বামীর ব্যারামের দরুণ আপনি তখন এতই উতলা যে সর্ত্তের কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা আপনার মোটেই ছিল না। তাই এখন একবার সে কথা মনে পাড়িয়ে দিচ্চি। আমি একখানা কাগজ লিখে এনেছিলুম, স্মরণ হয়?

নীরদা। হাঁ, তাতে আমি দস্তখত করি।

কামাখ্যা। বেশ—কিন্তু আপনার দস্তখতের নীচে আরও দু'এক ছত্র কি লেখা ছিল, মনে আছে?—যাতে আপনার বাবা সেই টাকার জন্য জামিন হচ্ছিলেন—যেখানটায় আপনার বাবারই দস্তখত করা উচিত ছিল—কেমন?

নীরদা। (চমকিত হইয়া) উচিত ছিল? কেন, দস্তখত ত তিনি করেছিলেন!

কামাখ্যা। তারিখের জায়গাটা আমি খালি রেখেছিলুম, অর্থাৎ আপনার বাবাই তারিখটা বসাতেন দস্তখতের পর—কেমন, মনে পড়চে কি?

নীরদা। পড়চে।

কামাখ্যা। তারপর সেই কাগজখানা আমি আপনাকে দিলুম, আপনার বাবার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য—কেমন, তাই কি না?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আপনি অবশ্য তখনি তাই করেছিলেন—কেননা, পাঁচ দিন কিংবা ছ' দিন পরে কাগজখানা নিয়ে আমার কাছে গেলেন,—তাতে আপনার বাবার দস্তখত। আর তার পর আমি আপনাকে টাকা দিলুম। এই ত?

নীরদা। তোমায় কি আমি নিয়ম-মত টাকা শোধ দিয়ে আসচি না?

কামাখ্যা। তা দিয়ে আসচেন—নিশ্চয়ই। সে সময়টা আপনার পক্ষে ভারী কষ্টের সময় ছিল,—কি বলেন?

নীরদা। তা আর বলতে!

কামাখ্যা। আপনার বাবার ভয়ঙ্কর ব্যামো—না?

নীরদা। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

কামাখ্যা। তারপর শীগ্‌গিরই তিনি গেলেন—কি বলেন?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আচ্ছা, বলুন দেখি আপনার কি মনে পড়ে কোন্ দিন মারা যান?—অর্থাৎ মাসের কোন্ তারি

নীরদা। পঁচিশে ভাদ্র।

কামাখ্যা। বেশ কথা। আমিও ঠিক ঐ তারিখে, আর এই জন্যই একটা ভুল দেখতে পাচ্চি—(জা পকেট হইতে একখানা কাগজ বা করিলেন) সেটার কোন কূল-কিনারা ঠাওরাতে পাচ্চি নে।

নীরদা। ভুল আবার কিসের? জানি না—

কামাখ্যা। ভুলটা এই যে আপ বাবা মারা যাবার তিন দিন পরে কাগজখানা তিনি দস্তখত করেছিলেন।

নীরদা। এঁ্যা?

কামাখ্যা। ২৫শে ভাদ্র আপনার বা মারা যান ত, কিন্তু এখানে দেখুন, তি তারিখ বসিয়ে দস্তখত করেচেন—আটা ভাদ্র। ভুলটা এইখানেই—কেমন, এ ভুল ত? (নীরদা নীরব) কি করে এ হল, বুঝিয়ে দিতে পারেন?—(নী তথাপি নীরব) আরও বেশী আশ্চর্য্য এই '২৮ ভাদ্র' এই কথাগুলি আপনার বাবা হাতের অক্ষরে লেখা নয়। যাঁর হস্তা লেখা, তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু যা

এ ব্যাপারটার সহজেই মীমাংসা হতে পারে। হয়ত আপনার বাবা তারিখ বসাতে ভুলে গেছলেন, তারপর আর-কেউ তাড়াতাড়িতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাবার আগেই তারিখটা বসিয়ে দিয়েছিল। যাক্, তাতে কিছু এসে যায় না। আসল জিনিষ হল এই নাম, তার উপরই সব নির্ভর কচ্চে। আপনার বাবাই নিজের হাতে নাম দস্তখত করেছিলেন, কেমন না?

নীরদা (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তারপর মাথা উঁচু করিয়া অবজ্ঞাভরে কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) না—তা নয়, আমিই বাবার নাম লিখে দিয়েছিলুম।

কামাখ্যা। এটা আপনি স্বীকার করেন, তা হলে! কিন্তু এ কাজটা কত বিশ্রী, কত খানি বিপদ হতে পারে এতে, তা আপনি জানেন কি?

নীরদা। বিপদ আবার কি? তোমার টাকা ত তুমি শীগ্‌গিরই পাবে।

কামাখ্যা। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কাগজখানা আপনার বাবার কাছে আপনি পাঠান্ নি কেন?

নীরদা। অসম্ভব বলেই পাঠাইনি। তাঁর তখন ভয়ানক ব্যামো, তিনি শয্যাশায়ী। তাঁর দস্তখত চাইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, অত টাকা আমি কি করব। নিজেই যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখন কি করেই বা তাঁকে বলতুম, আমার স্বামী পীড়িত, তুমি জামিন হয়ে আমায় টাকা পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাই? না, টাকার কথা তখন আমি কিছুতেই বলতে পারতুম না।

কামাখ্যা। সে যাত্রা ওয়াল্‌টেয়ারে না গেলেই ভাল করতেন।

নীরদা। তাও অসম্ভব ছিল! না গেলে এঁকে হারাতে হত! অথচ টাকাও হাতে ছিল না!

কামাখ্যা। কিন্তু, একবারও কি আপনার মনে হল না, যে আপনি কত বড় প্রতারণা করছেন? একটা জাল—?

নীরদা। অত কথা আমার মনেও হয় নি তখন। একটার পর একটা ফ্যাসাদ্ বার করে তখন এমনি জ্বালাতন করছিলে তুমি, যে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অথচ টাকা না নিলেও উপায় ছিল না।

কামাখ্যা। কি ভয়ঙ্কর কাজ করে বসেচেন আপনি, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছেন না! তবে এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলতে পারি, আমার সেই একটি মাত্র ভুল, যার জন্য আমি আমার মান-মর্য্যাদা সব খুইয়েচি, সেটি আপনার এই কাজের চেয়ে এতটুকুও বেশী গুরুতর ছিল না।

নীরদা। কি বল্‌চ তুমি? তুমিও এমনি বিপদে পড়েছিলে?

কামাখ্যা। আইন কেবল দোষেরই বিচার করে—সে ত আর উদ্দেশ্য দেখে না!

নীরদা। তা হলে সে আইন অতি বদ!

কামাখ্যা। বদ হোক্ আর ভালই হোক্, এখন যদি এই কাগজখানি আমি আদালতে দাখিল করি, তা হলে সেই আইনেই আপনার বিচার হবে।

নীরদা। কখনো না। এ আমি বিশ্বাস করি না। মেয়ে তা হলে বাপের মুখ চাইবে

না, স্ত্রী তা হলে তার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবে না! এ আইন আবার আইন? যাই হোক্, আইন-কানুনের আমি অত ধার ধারি না। আমার বিশ্বাস, তেমন আইন আছেই, যাতে ও-রকম কাজ কখনই দোষের হয় না। তুমি না মোক্তারি করতে! দেখ্‌চি, তুমি আইন-কানুনের কিছুই জান না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারি; কিন্তু দেনা-পাওনার কথা, যা নিয়ে আপনাতে-আমাতে লেখা-পড়া হয়েছিল—সে সবও কি বুঝি না, মনে করেন? আচ্ছা, যা বোঝেন, করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, চাকরিটি যদি আমার যায়, এবার যদি আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, তা হলে আপনারও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হবে। মনে রাখবেন এই কথা।

[বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

নীরদা। (নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িলেন) ভারী বিশ্রী! কেবল আমায় ভয় দেখানোর মতলব! আমি এত বোকা নই! কিন্তু—(ছেলেদের জামা-কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন) কিন্তু, তা হলেও—না, না, তা কি কখনো হতে পারে? প্রাণের টানেই ত এ কাজ করেছিলুম আমি—

ছেলেরা। (দরজার নিকট আসিয়া) মা—

নীরদা। এসো বাবা।

ছেলে। ও কে মা?

নীরদা। চুপ, ওর কথা কাউকে বলোনা যেন, বাবা, বুঝলে? বাবুকে পর্য্যন্ত না।

ছেলেরা। না মা, কাউকে বলব এখন এস না মা, আমরা খেলা করি

নীরদা। না, বাবা, এখন আর না

ছেলেরা। বা রে! তুমি যে তখন উনি চলে গেলেই আবার খেলা করবে

নীরদা। বলেছিলুম। কিন্তু এ আর পারচি নে। তোমরা উঠানে ছুটি ছুট করগে—আমার হাতে এখন অনে কাজ। যাও, আমার মাণিকধনরা! আ ততক্ষণ কাজ সেরে নি। (ছেলেরা চলি গেলে নীরদা অবসন্নভাবে ফরাসের উপ বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে উঠিয়া এবা সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন) নাঃ, এ থাক্। (কাজ ফেলিয়া আবার উঠি দাঁড়াইলেন এবং দাসীকে ডাকিলেন) ঝি, একবার এস ত এদিকে।—না, না অসম্ভব, তাও কি হয়!

(দাসী প্রবেশ করিল)

দাসী। আমায় ডাকচ?

নীরদা। হাঁ,—দেখ ঝি, না, না, তু এখন যাও, আমি এবার ফুল নিয়ে বসি।

(দাসী চলিয়া গেল)

নীরদা। (টুকরি খুলিয়া ফুল বাহি করিলেন) এই যে ফুল আর পাতা, এ দি একটা আস্ত গাছ তৈরী করতে হবে—না গাছ তৈরী করে আর কাজ নেই—শুধু গোটা কতক বড় বড় তোড়া বেঁধে ফেলি—এ টেবিলটার উপর রেখে চারিদিকে বাতি জ্বেলে দিলে কি চমৎকার হবে! ও—কামিখ্যেটা কি পাজী, কি বদমায়েস!—হাঁ ভারী ত কথা! অন্যায়ই বা কি করেচি আমি? কিছু না। মিছে কি সব ছাইপাঁ

...ি, দূর হোক্ গে!—শুধু তোড়াতে কিন্তু ...লো হবে না, একটা গাছও তৈরী করে ...ি। উনি যাতে আজ প্রফুল্ল থাকেন, ...ই করতে হবে। যদি গান গাইতে বলেন, ...ন আর আপত্তি না করে ভাল ভাল ...ন শুনিয়ে দেব—ভারী খুসি হবেন!

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হস্তে এক ...ণ্ডিল কাগজ)

নীরদা। এই যে তুমি এরই মধ্যে এসেছ!

হেমন্ত। হাঁ, কেউ এসেছিল?

নীরদা। এখানে? কই, না!

হেমন্ত। আশ্চর্য্য! কামিখ্যেকে যেন ...ড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখ্‌লুম না?

নীরদা। দেখ্‌লে? ও হ্যাঁ! আমি ভুলে ...ছলুম—কামিখ্যে এক বার এসেছিল বটে!

হেমন্ত। আমি বুঝতে পেরেচি, নীরো, ...াকটা তোমায় সুপারিস্ ধরতে এসেছিল।

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। আর তুমিও তার জন্যে ...পারিস্ করতে অঙ্গীকার করেচ, বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। কিন্তু—এ রকম ব্যাপারে ...তামার থাকা উচিত নয়। কামিখ্যের মত ...াকের সঙ্গে কথা কওয়া—তার সাহায্য ...রতে অঙ্গীকার করা ঠিক নয় নীরদা! ...কথা আবার লুকোচ্ছিলে তুমি, মিথ্যা ...লে? ছিঃ!

নীরদা। মিথ্যা বলে?

হেমন্ত। হাঁ। তুমি না বল্লে যে কেউ ...খানে আসে নি? (গলার সুর বদলাইয়া ...ারদার নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমার নীরো, ...আমার আদরের বুল্‌বুল্, কেবল সত্যি কথাই বলবে—মিথ্যে কথা কখনো মুখ দিয়ে যেন না বেরোয়!

(নীরদাকে আলিঙ্গন করিলেন)

কেমন! ঠিক ত? বল। (আলিঙ্গন-মুক্ত করিলেন) আচ্ছা, থাক্। এ-সব কথা আর নয়।

(সোফার উপর বসিলেন)

বাঃ, ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা ত! ভারী আরাম! (কাগজ দেখিতে লাগিলেন)

নীরদা। (এক পাশে বসিয়া তোড়া বাঁধিতে লাগিলেন) দেখ—

হেমন্ত। কি, বল।

নীরদা। কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে, আমি শুধু তাই ভাবছি।

হেমন্ত। তখন তুমি কি মজাটা দেখাও, আমিও তার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

নীরদা। নাঃ, মজা-টজা কিছুই হবে না বোধ হয়, কেবল কোন রকমে নিয়ম রক্ষে আর কি!

হেমন্ত। বাঃ, এত অনুষ্ঠানের পর শেষ বুঝি তাই? না, তা হচ্ছে না!

নীরদা। (তোড়াবাঁধা রাখিয়া হেমন্তের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন) তুমি এখন ভারী ব্যস্ত, না?

হেমন্ত। হাঁ, কেন বল দেখি।

নীরদা। এগুলো কি কাগজ?

হেমন্ত। ব্যাঙ্কের।

নীরদা। এরই মধ্যে—?

হেমন্ত। হাঁ, পুরোনো ম্যানেজার থাকতে থাকতেই খারাপ লোকদের সব তাড়িয়ে ভাল লোক বাছাই করে নিতে হবে কি না, তাছাড়া—

নীরদা। ও, তাই কামিখ্যে এমন হুমকি-ধুমকি করে ছুটে এসেছিল?

হেমন্ত। হুঁ—

নীরদা। (ফুলের তোড়া একটা হাতে তুলিয়া লইয়া) এটা ভারী চমৎকার দেখাচ্চে, না? এ-রকম আরও পাঁচটা তৈরী করতে হবে—আচ্ছা দেখ, কামিখ্যে কি সত্যি সত্যি এমন কোন দোষ করেচে যার জন্য তার চাকরি থাকবে না?

হেমন্ত। হাঁ, সে একজনের নাম জাল করেচে।

(নীরদা শিহরিয়া উঠিলেন)

তার মানে কি, তুমি জান না বোধ হয়?

নীরদা। এমনও হতে পারে ত যে সে বেচারা ভয়ানক দায়ে পড়েই হয়ত এ কাজ করেছে!

হেমন্ত। যাই হোক্, প্রথমবার অপরাধের জন্য আমি তাকে কঠিন সাজা দিতে চাই না!

নীরদা। আমি জানি, তুমি তা কখনই পার না।

হেমন্ত। দোষ যখন করে ফেলেচে, তখন আর উপায় কি? প্রকাশ্যভাবে দোষটা স্বীকার করে নিলেই সব মিটে যেত—একটা নাম মাত্র সাজা হত তাতে।

নীরদা। সাজা হত?

হেমন্ত। কামিখ্যে কিন্তু সে সব স্বীকার করেনি, উল্টে চালাকি খেলে নিজেকে নির্দ্দোষ দেখাতে গেছলো।

নীরদা। তা হলে—

হেমন্ত। ভেবে দেখ একবার ব্যাপার-খানা। অমন কাজ যে করে, তাকে কি রকম ভিতরে এক বাইরে আর করে সকলের সঙ্গে মিশতে হয়! কি রকম ওস্তাদির মুখোস পরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যাতায়াত করতে হয়! এমন কি, নিজের ছেলেপিলে, স্ত্রী যারা সবচেয়ে আপন, তাদের সঙ্গেও কি কপটভাবে বাস করতে হয়! কি ভয়ানক ব্যাপার, একবার ভাব দেখি! এতে ছেলে-পিলেদের অবস্থা একেবারে মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাদের ভবিষ্যৎ—

নীরদা। (ত্রস্তভাবে) কি রকম?

হেমন্ত। কারণ মিথ্যার এই ঘৃণিত আবরণ ঘরের বাতাসকে পর্য্যন্ত বিষিয়ে তোলে, আর সেই বিষাক্ত বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ছেলেদের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়ে তাদেরও বিষাক্ত কলুষিত করে,—

নীরদা। (অতি নিকটে গিয়া অধিকতর ত্রস্তভাবে) সত্যি?

হেমন্ত। সত্যি না ত কি! আমার পাঁচ বছরের ওকালতির অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা বলচি। অল্পবয়সে যারা-যারা অসৎ কাজ করেচে, প্রায় দেখা গেছে তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই মা বদ ছিল।

নীরদা। কেবল মায়ের কথাই বলছ কেন?

হেমন্ত। কারণ মায়ের ক্ষমতাই ছেলেদের উপর বেশী কাজ করে কি না! বাপের দোষেও ছেলে খারাপ হয় বই কি! আইনের ব্যবসা যারা করে, তারাই এ কথা জানে। এই কামিখ্যে এখন থেকে তার ছেলেগুলোকে মিথ্যা আর কপটতার বিষে জর্জ্জরিত করচে। লোকটার নৈতিক বল একেবারে লোপ পেয়ে গেচে। তাই বলি, আমার নীরদা যেন ও লোকটার

কোন কথায় না থাকে—ও না খেতে দিয়ে মারা যেতে বসলেও যেন ওর কোন সাহায্য না করে। কেমন, এখন বুঝলে ত?—আর দেখ, ওকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ও রকম লোকের কাছে বসতে আমার গা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।

নীরদা। (হেমন্তর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন) ওঃ, এখানটা ভারী গরম বোধ হচ্ছে—অসহ্য! এখনও কত কাজ বাকী—

হেমন্ত। (কাগজপত্র রাখিয়া উঠিলেন) খাওয়া-দাওয়ার পর কতকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। তার পরই তুমি তাড়া লাগাবে ত? তোমার কাজও করে দেব বই কি! বাঃ, ভারী চমৎকার তোড়া বানিয়েচ ত! এত সব ডালপালা আবার কি হবে?—আচ্ছা, যা ইচ্ছে তোমার, কর। আমি চট্ করে নেয়ে নি তা হলে।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

নীরদা। (গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন) না, না—এ সব মিছে কথা। অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব!

আয়ী। (আস্তে দরজা খুলিয়া) ছেলেরা যে তোমার কাছে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে!

নীরদা। না, না,—আমার কাছে ওদের আস্তে দিও না—খবরদার—তুমিই ওদের নিয়ে থাক, আমি—

আয়ী। বেশ, বাছা! (দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল)

নীরদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বাছা-দের আমার ডুবিয়ে দিলুম—সংসারটাকেও বিষাক্ত করলুম! (স্তব্ধ হইয়া রহিলেন) না, না, মিছে কথা! তাও কি হয়? এও কি সম্ভব? কখনো না!

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সাহিত্য

(ফরাসী হইতে)

১

ইংরেজী গ্রন্থরচনা

মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষা সাহিত্যে সমাজের ক্রমবিকাশ অধিক পরিব্যক্ত হয়।

* * *

প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্য। প্রথমকার কালে, জেতৃজাতির সভ্যতা গ্রহণের জন্য বিজিতদিগের একটু মুগ্ধধরণের অবোধ-সরল উৎসাহাতিশয্য, স্বকীয় প্রচলিত সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা, ইংলণ্ডের 'রোমান্টিক' কবিদিগের প্রতি, বিশেষত বায়রণের প্রতি অগাধ ভক্তি পরিলক্ষিত হয়।

১৮৪০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা ইংরেজী পদ্য রচনা করিতে ভাল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাসিত। মধুসূদন দত্ত, যিনি আরো কিছু-কাল পরে বাঙ্গলা রচনার জন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার "Captive Lady" এই সময়ে (১৮৪৯) প্রকাশিত হয়। তাঁহার বাগ্‌দত্তা ইংরেজ-প্রেয়সীকে তিনি এইরূপ বলিতেছেন :—

"Yes—like that star which
on the wilderness
Of vasty ocean wooes
the anxious eye
Of lonely mariner—and
wooes to bless—
For there be hope writ on her
brow on high :
He recks not darkling waves—nor
fears the lightless sky.

Oh ! beautiful as inspiration,
when
She fills the poet's breast—her
fairy shrine ;
Wooed by melodious worship !
welcome then ;
Though ours the home of want,
I ne'er repine,
Art not thou there, even thou,
a priceless gem and mine ?
(Literature of Bengal
গ্রন্থে উদ্ধৃত, p. 199)

কিন্তু শীঘ্রই এই উৎসাহাতিশয্য প্রশমিত হইল। হিন্দুরা বুঝিল, বিদেশী-ভাষার উপর তেমন দখল কখনই হইবে না, বি ভাষায় ওস্তাদী চলিবে না। বায়রণ টেনি সহিত টক্করাটক্করী করা অপেক্ষা, ভাল ইংরেজী গ্রন্থ—বিশেষত এখন যা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে সেই সেক্‌স দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে বেশী হইবে (১)।

কিন্তু তবুও, একটি অল্পবয়স্কা বাঙ্গি কুমারী দত্ত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই মনো কর কবিতাগুলি লিখিয়াছিল ;—ই ভারতের অন্তরাত্মা ইংরেজের অন্তরা সহিত কি সুন্দর মিশিয়া গিয়াছে।

ইহা সাবিত্রীর ইতিহাস। সত্যবা সহিত সাবিত্রীর এইমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে।

"এ কি ?—এ কি প্রেম ? কবিরা মিথ্যা বলেন নাই, প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসা হতে পারে! দেবতা সাক্ষী অনেক সময়ে হৃদয়-নাথ হৃদয়ে বিদ্যুৎ-ম্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করেন। খেলা করিতেছি আমোদ-আহ্লাদ করিতেছি, কোন ভাবনা চিন্তা নাই—তারপর ঐ শো কার পদশব্দ—আর অমনি আনন্দময় জী কিংবা নীরব নৈরাশ্যের আবির্ভাব···এইম চারিচক্ষের মিলন হইল। সাবিত্রী মু কুটীরে প্রবেশ করিল। হৃদয়-পদ্ম একব প্রস্ফুটিত হইলে আর মুদিত হয় না।"

মুনি আসিয়া যখন প্রকাশ করিলেন,

(১) ১৯০০—১ খৃষ্টাব্দের নৈতিক উন্নতির বিবরণী'তে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গনাট্যসাহিত্য সেক্‌সপিয়ারের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকগুলি নাটকে Duncanএর হত্যার পূর্ব্বে Lady Macbethএর কথার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরে ম্যাকবেথের একটি ভাল পদ্যময় অনুবাদ বাহির হইয়াছে। তা ছাড়া Banim কৃত Damon ও Pythias ও Sheridan কৃত Pizarroর অনুবাদ এবং Miltonএর অনুকরণে, "সুর-সঙ্গীত" পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বৎসরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে, তখন মিত্রীর পিতামাতা এই বিবাহের বিরোধী লেন। কিন্তু সাবিত্রী :—

"আমি আমার হৃদয় দান করিয়াছি। -মনে দান করিলেও তাহা আর াইয়া লইতে পারিব না। দানের বস্তু রাইয়া লওয়া মহাপাপ, ভগবান তাহা তে আমাকে রক্ষা করুন। ফিরাইয়া বই বা কেন ?—হৃদয় এমন কিছুইত রে নাই যাহার জন্ত আমি হৃদয়কে রস্কার করিতে পারি।"

সাবিত্রীর পিতা :—"কন্যা বিবাহে আত্ম-প্রদান করিতে পারে না, পিতা কিংবা মাতার সম্মতি ব্যতীত বিবাহের চুক্তি অসিদ্ধ হয়।"

সাবিত্রী :—"সকলেই একবার মাত্র ভক্তি তব্যতার বশীভূত হয়। ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। রমণীও নিজের হৃদয় ও পাণি একবার মাত্র দান করে...আমি আমার হৃদয় দিয়া ফেলিয়াছি—সেই সঙ্গে বাগ্‌দানও হইয়া গিয়াছে। আর আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। ওরূপ যে করে, সে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। মুখে উচ্চারিত না হইলেও, আমার শপথ কম গুরুগম্ভীর নহে। মুখের বাক্য লঙ্ঘন করা অপেক্ষা, হৃদয়ের বাক্য লঙ্ঘন করা কি কম পাপ ? (২)

(২) What was the meaning—was it love ?
Love at first sight as poets sing,
Is then no fiction ! Heaven above
Is witness, that the heart its king
Finds often like a lightning flash ;
We play—we jest—we have no care—
When harka step—there comes no crash,—
But life or silent slow despair,
Muni's eyes just met,—their past
Into the friendly Savitri hut,
Her heart-rose opened had at last—
Opened no flower can ever shut···

This was enough. That monarch knew
The future was no sealed book
To Brahma's son. A clammy dew
Spread, on his brow,—he gently took
Savitris' palm in his, and said :
'No child can give away her hand,
A pledge is nought unsanctioned ;
And here, If right I understand,
There was no pledge at all,—a thought,
A shadow—barely crossed the mind—
Unblamed, it may be keenly forgot,
Before the gods it can not bind·····

পত্ত যাহা হারাইয়াছে, গত্ত তাহা লাভ করিয়াছে। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত নব-হিন্দুরা, ইংরেজ-প্রভুদের নিকট আপনাদিগের দাবীদাওয়া জানাইবার জন্ত এবং তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে, সামাজিক ও অর্থশাস্ত্রসংক্রান্ত স সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্ত ই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। বৈজ্ঞা প্রশ্নাদির ব্যাখ্যা করিতে পারে,—তা কোন ভাষাই এখনো সেরূপ গড়িয়া

In the meek grace of virginhood
Unblanched her cheek, and undimmed her eye.
Savitri, like a statue stood,
Somewhat austere was her reply.
"Once, and once only, all submit
To Destiny,—'tis God's command ;
Once and once only, so' tis writ,
Shall woman pledge her faith and hand ;
Once, and once only can a sire
Unto his well-loved daughter say,
In presence of the witness fire
I give thee to this man away.

Once and once only have I given
My heart and faith—'tis past recall ;
With conscience none have ever striven,
And none may strive, without a fall.
Not the less solemn was my vow
Because unheard, and Oh ! the sin
Will not be less, If I should now
Deny the feeling felt within.
Unwedded to my dying day
I must, my father dear, remain ;
"Tis well, if so thou'lwill'st, but say
Can man balk Fate, or break its chain ?

কোন উচ্চবর্ণ বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে তরুদত্ত ৪ মার্চ্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্র করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপযাত্রা করেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে Bengal Magazine প Leconte de Lisleএর উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, "রেনেসান্‌স" ও অষ্টাদশ শতাব্দী ফরাসী কবিদের রচনা হইতে চয়ন করিয়া এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া "Sheaves Glean in French fields" নামক কবিতার গ্রন্থ প্রকাশ করেন; Du Bartas হইতে Andri chenie পর্য্যন্ত আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কোন পুরাতন গ্রন্থকারকেই তিনি প্রকৃত কবি বলিয়া মনে করি না। ২০ বৎসর বয়সে, ৩০ অগষ্ট ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Mlle. Clarisso Bade ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তরুদত্ত-রচিত এক ফরাসী উপন্যাস প্রকাশ করেন; "Le Journal d Mademoiselle d' Arvers"—Ancient ballads and legends of Hindustan, Edmon Gossএর ভূমিকার সহিত (১৮৮১)।

; তাহাড়া ইংরেজী ভাষাই একমাত্র
যাহা সকল শিক্ষিত ভারতবাসীই
। প্রতিবৎসর সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থই বাহির
তে দেখা যায়(৩)।
সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থ যথা :—
Dutt প্রণীত "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা"
ং M. Bose প্রণীত—"ইংরেজের আমলে
রতের সভ্যতা"।
অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ ; যথা—M. Dutt
ণীত "ভারতের দুর্ভিক্ষ", এবং M.
aoraji প্রণীত "দারিদ্র্য ও ব্রিটিস-
তিবিরুদ্ধ শাসনতন্ত্র"। দার্শনিক আলোচনা
যথা, M. Banerjiর "হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে
খোপকথন" এবং M. Ghoseএর "চৈতন্যের
নীতি"।
সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা
ন্ধীয় গ্রন্থ :—যথা, M. Duttএর "বাঙ্গালা
াহিত্য।"

বিদ্রূপাত্মক লেখা। যথা :—M. Malabariর "গুজরাট ও গুজরাটী"।

এই বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থের মধ্যে, পার্সি-পুরোহিত দস্তুরের বর্ণনা আছে; Malabari নিজে বোম্বায়ের একজন পার্সি।

দস্তুর।—"দস্তুরের উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও অবনতি; তাহার রসাতলে দারুণ পতন; তাহার ব্যবহার; তাহার অনুরাগ, বিরাগ, ও কষ্ট; তাহাকে লইয়া এখন কি করা যায়।

দস্তুরই ধর্ম্মের অন্ধযুগের আলেয়ার আলো। স্বাধীন চিন্তার ঐতিহাসিকেরা তাহাকে একটা পৌরাণিক অলীক কথা বলিয়া মনে করে; পক্ষান্তরে ভক্তেরা তাহাকে পুরাতন Magiদিগের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া দাবী করে; কিন্তু গ্রীক শব্দ Magiর অর্থ যদি maggot হয়, তবে এইরূপ ব্যাখ্যায় একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়; কেন না, দস্তুরের ধর্ম্মমতটা আর যাই

(৩) মালাবারি (মেঃতা ৮ বেহরামজী মেরওয়ানজীর দত্তকপুত্র) এই কবি ও বিশ্বহিতৈষী পার্সি। ৪৩ খৃষ্টাব্দে বরোদায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Age of Consent আইন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্ত মন্তব্য দেন এবং "ধাস্পত্য-অধিকার প্রত্যর্পণ" কবিবার বিরুদ্ধে কাগজে খুব লেখালেখি করেন। ইহার প্রধান গ্রন্থাবলী :—The Indian eye on English life (1893) The India Problem (1894). India in 1897 (1898) Anubhabik (Experiences of life) (1894). Man and his world (1898). Dutt (রমেশচন্দ্র দত্ত) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন; কলেক্টর মেজিষ্ট্রেট ৮৮৮); বর্দ্ধমানের কমিশনার (১৮৯৪—০৫) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৯৫); কংগ্রেসের ভাপতি (১৮৯৯), লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যাপক। গ্রন্থাবলী :—Literature f Bengal (১৮৭৭). History of Civilization in Ancient India (১৮৮৮—৮৯)। A rief history of Ancient and Modern India. (1891) Lays of ancient India ইত্যাদি ত্যাদি।
ঘোষ (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) ভারতীয় পজিটিভিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা। এই নামে আরও অনেক গ্রন্থকার আছে। অনেক ভারতবাসীই তাহাদের নাম ইংরাজীধরণে পরিবর্ত্তন করিয়াছে; যেমন—দত্তের স্থানে ডট্। ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ভারতবর্ষে ১১৬৪ ইংরেজী গ্রন্থ এবং ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১২২৯ ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অন্ত য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি গ্রন্থ ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

হোক্—বড়ই পোকা-ধরা (maggoty)। ডারুইন্ আভাস-ইঙ্গিতে যে বলেন—সাজারু প্রভৃতি প্রাণীরাও দস্তুর জাতির অন্তর্ভুক্ত—এ কথায় তিলমাত্র সত্য নাই। দস্তুর সাহেব বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ, যে কেহ তাঁহাকে কিছু দক্ষিণা দিবে, তার জন্য তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

শ্মশানযাত্রায় তিনিই মুখ্য শোকপ্রকাশক এবং সেই জন্য তিনি বেশ দু-পয়সা পাইয়া থাকেন। বিবাহ এবং অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনিই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, এবং এইসকল উপলক্ষে তাঁহার প্রাপ্য আরও বেশী। বিবাহের ঘটকালী ও বিবাহভঙ্গের কাজে তাঁর বেশ দক্ষতা আছে; এবং এই ক তাঁর পাওনা সবচেয়ে বেশী। এই তাঁর আয়ের পথ—যাহা তিনি নম্রতা দুঃখের সহিত বলেন "আয়ের জানলা।"

কোন দুঃখী বিধবা—অর্থাৎ যাহার নি সম্পত্তি আছে কিন্তু উত্তরাধিকারী নাই তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া দস্তুরের অন্তরা অনিবার্য্য আগ্রহের সহিত তাহার ধাবিত হয়। সম্পত্তিশালী যুবতী বিধবা অত্যন্ত বুনো ধরণের জীব; কিন্তু দ ডাক্তার ও উকীলের হাতে পড়িয়া উহা শীঘ্রই ভেড়া বনিয়া যায়।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রমণী-জীবন

অনেকদিন থেকে মহাবীর নেপোলিয়নের মহাবাণী পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি স্মরণ করে' আসচে। সে বাণী হচ্চে এই যে, কোনো জাতিকে পৃথিবীর বক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, দেশে অগণন উপযুক্ত জননীর সৃষ্টি করা। অনেক মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করে আমরা দেখতে পাই যে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই চরিত্র-গঠনের পক্ষে জননীর সহায়তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল। মহাপুরুষগণও মুক্তকণ্ঠে জননীর ঋণ স্বীকার করে' গেছেন।

জাতিমাত্রই নর ও নারীর সমষ্টি। অতএব নির্ব্বিকারে একথা আমরা বলতে পারি যে, শুধু পুরুষের উন্নতিতেই কোনো দেশ উন্নত হয় না। নরনারীর জীবন-সম্বন্ধ এমন সুদৃঢ় সংবদ্ধ যে, ইহাদে উন্নতি-অবনতি চিরকাল পরস্পরসাপেক্ষ কোন উন্নত জাতিকে লক্ষ্য করে' কে যদি বলে, ওদের পুরুষগুলোই ভাল, মেয়ে গুলো অপদার্থ, তবে সে কথা আমরা সত্য বলে স্বীকার করতে পারিনে। কারণ, জাতির রমণী উন্নত নয়, সে-জাতি কখনো পুরোপুরি উন্নত হতে পারে না; জাতি অবনত অংশ নিজের অবনতির অনুপাতে তাকে অবনত করে' রাখবেই। আমরা জানি, ভীরু, উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য রমণী স্বামী পুত্রের মহৎ আকাঙ্ক্ষা সফল করার পক্ষে যেমন বাধাস্বরূপ, তেমনি তেজস্বিনী উন্নতমনা নারী উন্নতির পক্ষে সাহায্যকারিনী। এই যে কতিপয় বাঙ্গালী যুবক পল্টনশ্রেণীভুক্ত

...ছে, এদের মধ্যে কয়জন যুবক যারের ...াহ পেয়ে সৈনিক-জীবনে প্রবেশ ...রেচে? বাঙ্গালী-ছেলেদের সৈনিক বিভাগে ...বেশের প্রবলতম অন্তরায় এই যে, তারা ...রিবারিক অসন্তোষ ও অশ্রুজলের বাধা ...তীর্ণ হতে পারছেনা।

...হিন্দুর দেশে একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, ...ণী শক্তি-রূপিনী। কিন্তু সেই শক্তিকে ...মরা স্বীকার করছি কই? আজকের দিনেও ...দি সেই শক্তিকে অবহেলা করি, তাহলে ...নবযুগের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় আমরা ...ল হয়ে উঠেছি, তার কোনোই সার্থকতা ...াকবে না। জাতীয়তার ক্ষেত্রে আমরা ...াত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য আগ্রহান্বিত ...রেও উহার মূলে যে সত্যটি বিদ্যমান ...য়েছে, তাকেই যেন আমরা সকলের ...ন্তরালে অদৃশ্য করে' রাখতে চাচ্ছি। ...আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ব, অথচ ...আমাদের রমণীকুল যে তিমিরে সেই তিমিরেই ...ড়ে থাকবে, এমনতর ধারণা অনেকেই ...পোষণ করে থাকেন। আমি চাচ্ছি পাহাড়ে ...চড়বো, অথচ যাকে ছেড়ে এক পা এগিয়ে ...যাওয়া চলেনা, সে থাকবে নীচে পড়ে! ...তার ফল হবে কি? না, আমাদেরও পাহাড়ে ...ওঠা হবে না; নারীর অঞ্চললীন হয়ে, আমরাও ...পাহাড়ের তলদেশেই পড়ে থাকব।

রমণীদের উন্নতিসাধন বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনার উল্লেখ করতে গেলেই একদল লোক খপ্ করে' জিজ্ঞাসা করবেন, যে দেশে পুরুষদেরই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করবার সুবন্দোবস্ত নেই, মেয়েদের উন্নতির জন্যে সে দেশের এত মাথাব্যথা কেন? আগে পুরুষগুলি মানুষের মতন হোক, তার পরে মেয়েদের কথা ভেবো। আমাদের মনে হয়, যাঁরা এমনতর ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা নিজেরা যে উন্নত হতে চান, এ কথাই সত্য নয়। পূর্ব্বেই বলেছি, নরনারীর উন্নতি-অবনতি পরস্পরসাপেক্ষ। পৃথিবীতে কোনোকালে এমন জাতি ছিল না, বা নাই, কিম্বা হবেনা, যাদের পুরুষ ও রমণীর উন্নতি-অবনতি একই ক্রমে সংঘটিত হয়নি। পুরুষ ও রমণীর একজনকে পশ্চাতে রেখে অপরের উন্নতি আকাশ-কুসুম মাত্র।

তাই, যদি দেশে শিক্ষাবিস্তার করতে হয়, সে শিক্ষার আলো নরনারী উভয়ের মধ্যেই প্রয়োজনানুপাতে বণ্টন করে' দিতে হবে; যদি ধর্ম্মবলে, কর্ম্মবলে এ জাতিকে শক্তিমান করে' তুলতে হয়, তাহলে নরনারী সমান ভাবে সে শক্তির অংশীদার হবে।

সংসারে পুত্রও জন্মে কন্যাও জন্মে—এ বিধানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। কিন্তু পুত্রের জন্ম হ'লে প্রত্যেক পরিবারে, অন্তত বাঙ্গালীর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, আনন্দের কোলাহল জেগে ওঠে; আর কন্যাসন্তান জন্মালে একটা বিষাদের ছায়াপাত হয়! অবশ্য একথা আমরা জোর করে' বলতে পারিনে যে, পিতামাতা স্বভাবত কন্যার চেয়ে পুত্রকে বেশি স্নেহ করেন। কিন্তু এটা দেখা যায় যে, পুত্র যতটা আদর-যত্ন লাভ করে' থাকে, কন্যা তার সিকিও পায় না। পুত্র বংশধর, ভবিষ্যতের আশাভরসা; আর কন্যা পরের জিনিষ, যতদিন রক্ষণীয়া তত দিন সংসারের বোঝা—এই ভাবে দুজনের বিচার চলে। পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্মের

জন্যেই পিতামাতা দায়ী, উভয়কে সমভাবে কেন যে তাঁরা মানুষ করে' তুলবেন না, সে কথা বোঝা দায়। যে আদর-যত্ন, যে খাদ্য, যে শিক্ষা ছেলের জন্যে তাঁরা ব্যবস্থা করেন, মেয়ের জন্যে তা তাঁরা করবেন না কেন? দু'জনেই সংসারের খেলা খেলতে এসেচে, দু'জনকেই শরীর দিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করতে হবে; এক জনের প্রতি এত অনুগ্রহ কেন, আর আর একজনকে সুধু অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করে' ছেড়ে দেওয়াই-বা কেন? অনেকে বল্‌বেন, ছেলের জন্যে যা দরকার, মেয়ের জন্যে সে সকল দরকার নেই। আমরা তা মেন্‌ নিচ্ছি। কিন্তু একথা কি তাঁরা স্বীকার কর্‌বেন না যে, উন্নত স্বাস্থ্য, উদার প্রশস্ত মন, স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণ উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজন? ভগবান নর ও নারীকে আলাদা করে' তৈরি করে'ও বিভিন্নতার ভিতর দিয়েও ঐক্যের বন্ধন সৃজন করে' রেখেচেন, তা' তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন কি? যেখানে নর ও নারীর ঈপ্সিত বস্তু অভিন্ন, সেখানে যদি সমাজ পথ রুদ্ধ করে' দাঁড়ায়, তবে সেখানে সমাজ ন্যায়কে অমান্য করে' আত্মহত্যা করে বই কি!

উন্নত স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ মন, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা,—উন্নত জাতির নরনারীর বিশিষ্ট চরিত্র। এই স্বাস্থ্য, মন এবং প্রাণের স্বাস্থ্যনীতি ও ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করা দরকার। ধরুন, যথাযোগ্য ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য না হ'লে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তেমনি মনের উন্নতির জন্যে ক্রীড়া, কৌতুক, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষার প্রয়োজন। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বালক ও বালিকার শরীর ও মনের উন্নতিসাধনের জন্যে আমরা কি নিয়মের বন্দোবস্ত করেচি? যদি না করে' থাকি, তবে তা'র জন্যে আমাদের জবাব দেবার কি আছে? আমাদের পুত্রগণ যতটুকু সুবিধা পেয়ে থাকে, মেয়েরা তার শতাংশের একাংশও পায়না কেন? কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন, মেয়েরা যে ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাতেই স্বাস্থ্য-বিধানের পক্ষে তাইই যথেষ্ট। কিন্তু একথা একেবারেই মিথ্যা। যাঁরা রীতিমত ব্যায়াম করে' থাকেন, তাঁরা জানেন যে নিয়মানুবর্ত্তিতা, মনোযোগিতা এবং প্রফুল্লতা ব্যায়াম-সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই গুণত্রয় সংযোগে যে ব্যায়াম অবলম্বিত হয় তাতেই মানুষের স্বাস্থ্য ভবিষ্য জীবনে সহায়কর হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রমণীবৃন্দের জন্যে এমন ধরণের ধারাবাহিক কোনো ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করে' আমরা রেখেচি কি? অবশ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না, যে পুরুষের মতন রমণীরা ফুটবল খেলবে বা ক্রিকেট ও হকি খেলতে ময়দানে ছুটবে। কিন্তু শরীররক্ষার যে যে ব্যায়ামের দরকার, তাও যদি তাদের নিয়মিত কর্‌তে না-দেওয়া হয়, তবে তাদের শরীরের উন্নতির আশা আমরা কোনমতেই করতে পারিনে। এই যে ঘরকন্নার কথা, এটা কি একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যাপার নয়? আমরা তো দেখতে পাই অনেক জায়গাতেই অমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভেঙে হচ্ছে, আবার কোনো-কোনো স্থলে অলসতায় নিমজ্জিত থেকে অনেকের স্বাস্থ্য একেবারে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

আহারে অনিয়ম, কার্য্যে অনিয়ম, মানসিক শান্তি বাঙালী-রমণীর চরিত্রগত। বাল্যকাল থেকে তাদের শরীর ও মনকে এই কঠোর সংসারের ধাক্কা সাম্‌লে চলবার উপযুক্ত করে' দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি বলেই রমণী-জীবনের এই দুর্দ্দশা। মরুভূমির ভিতর দিয়ে যে পান্থদের অগ্রসর হতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জল সঙ্গে না নিলে, তাদের যেমন তেষ্টায় ছাতি ফেটে মর্‌তে হয়, আমাদের রমণীদেরও তেমনি ভাবে বাল্যকাল থেকে নিরাবলম্ব হয়ে সংসারে প্রবেশ করে' ভগ্নস্বাস্থ্যে দিনপাত কর্‌তে হয়। অথচ আমাদের ধারণা যে, মেয়েদের ব্যায়াম-সাধনার কোনো প্রয়োজন নেই! এর চেয়ে অন্ধ জড়ত্ব আর কি থাক্‌তে পারে?

তারপর বিয়ের পর থেকেই আমাদের বালিকাবৃন্দ পিঞ্জরলীন পক্ষীর মত অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস ও বিশ্বের জীবন-স্রোত থেকে বঞ্চিত হয়। তখন তাদের সাথের সাথী ও আলাপ করার পাত্র ও পাত্রী তাদের বয়সী অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ বালক-বালিকাবৃন্দ। যে সময়টা সংসার-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার প্রকৃষ্ট সময়, সেই দুর্লভ কালটা তাদের কচি-কচি ছেলেদের অনভিজ্ঞতার সঙ্গে খেলা করে' কাটে! স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে হয়ত সেই নিস্তব্ধ রাত্রে, নিদ্রাজড়িত নেত্রে। তাতে স্বামীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু অর্জ্জন করা বালিকা-বধূর পক্ষে সম্ভবপর নহে। অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের দ্বারা সাধারণত যে শিক্ষালাভ হয়ে থাকে, আমরা তার উপরই বেশি নির্ভর করি। কিন্তু এ শিক্ষা কি? প্রথমত এঁরা শিক্ষাদান কর্‌তে জানেন না, তার পরে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে মনের ভাব আদান-প্রদানেরও কোনো বন্দোবস্ত নেই। "কি? এবং কেন?" প্রশ্ন করবার যেখানে সুবিধা এবং সাহস নেই সেখানে যে ভাল-কিছু শিক্ষা করা যায়, এমন হ'তেই পারেনা। সর্ব্বশেষে অতি কুণ্ঠিতভাবে এ-কথাও বল্‌তে আমরা বাধ্য যে, এখানে গুরুর উদ্দেশ্যই নয় শিষ্যকে শিক্ষিত করা, গুরুর উদ্দেশ্য সুধু শিষ্যাকে খাটিয়ে মারা। খাটুনীর বন্দোবস্ত আছে, বিশ্রামের নেই; বকুনী আছে, আদর নেই; ঘানি আছে, জাবনা নেই।

একটি বুদ্ধিমতী মহিলাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের রমণীদের স্বাস্থ্য যে এত খারাপ, তার প্রধান কারণ কি? তিনি বলেছিলেন, "হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, অথচ পেটে অন্ন নেই বলেই এমন হচ্ছে। মেয়েরা স্বভাবত লজ্জাশীলা, বিয়ের পর কোনো মেয়ে আপনা হ'তে খাবার নিয়ে খায় না, এবং কারুর কাছে খাবার চেয়েও নেয়না। যাঁরা গিন্নীবান্নী লোক তাঁরা প্রথম দু'চার দিন খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যত্ন করে' থাকেন, কিন্তু বেশিদিন আর তাঁদের সে যত্ন থাকেনা!" এইটে যে সংকীর্ণ মন ও স্নেহহীনতার পরিচায়ক তাতে আর সন্দেহ নেই। নিজেদের মেয়েদের বেলায় এ অমনোযোগিতা তাদের দেখা যায় না, বউয়ের বেলায় সেটা সকলেই লক্ষ্য কর্‌তে পারে। এ ছাড়া আরও এমন অত্যাচার, অবহেলা, লাঞ্ছনা এদের উপর দিয়ে দুর্দ্দিনের ঝড়ের মত চলে যায়, যার জন্যে "কলিতে

অমর কনের পাণ্ডড়ী"—এমন গানের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এমনি করে' পাহাড়-প্রমাণ বাধাবিপত্তি, অভাব-অসুবিধার মধ্যে থেকে আমাদের রমণীকুলের জীবন ক্রমেই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে।

আমাদের সাম্‌নে কতকগুলি কাজ আছে যা আমরা ভাল কাজ বলে থাকি; কিন্তু এমন আরো-কতকগুলি কাজ আছে যেগুলিকে ভক্তিভরে আমরা শ্রেষ্ঠ কাজ বলে আখ্যা দিই। মেয়েদের পক্ষে রীতিমত ঘর-কন্না করা, গুরুজনকে ভক্তি করা, লঘুজনকে আদর-যত্ন করা কর্ত্তব্য কার্য্য বা ভালকার্য্য। কিন্তু নাইডুর মতন বিদুষী হওয়া, নিবেদিতার ন্যায় জীবপ্রেমে আত্মনিবেদন করা, বা ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের ন্যায় আহতের সেবা করা মহৎ কার্য্য। অনেকের মুখে শুনে থাকি, আমাদের রমণীকুল সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনে যেমন তৎপর, তেমন আর কোনো দেশের রমণী নয়। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলি আমাদের রমণীবৃন্দ তার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করে কি? যে দেশের যত অধিকসংখ্যক রমণী শ্রেষ্ঠ কাজ বরণ করে' নেয় সে দেশের রমণী তত বেশী উন্নত। আর যেখানে ভালর সংখ্যা বেশি সেইখানেই শ্রেষ্ঠের উৎপত্তির সম্ভাবনা অধিক। আমাদের সমাজে যখন শ্রেষ্ঠ রমণীর আবির্ভাব হয় না, তখন আমাদের রমণীকুল যে খুব ভাল তার প্রমাণ হয় কিসে? ভাল কাজ বা শ্রেষ্ঠকাজের জন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান চাই—শরীর ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত্তি মানুষকে ক্ষুদ্রত্ব হ'তে মহত্বে নিয়ে যায়। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম না হলে অ[illegible] সুপ্তশক্তি জেগে উঠ্‌তে পারেনা। [illegible] আমাদের রমণীবৃন্দের এই সুযোগ কোথা[illegible] মানুষ হয়ে যারা জন্মেছে, ভগবানের সর্ব[illegible] আশীর্ব্বাদ থেকে কে তাদের বঞ্চিত [illegible] রেখেচে?

মনের সংকীর্ণতা, স্বাস্থ্যহীনতার যে [illegible] কুফল তা আপনারা সকলেই প্রতিদি[illegible] দেখ্‌তে পাচ্ছেন। ঘরে ঘরে অবি[illegible] কোন্দল, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াঝাটি, [illegible] স্বার্থপরতা,——বাঙ্গালী-পরিবারের [illegible] পরিচয়। রুগ্না, ক্ষীণদেহা জননীর সুস্থ[illegible] সন্তান সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে তারই [illegible] যে হাসপাতালের সৃষ্টি হয়ে আছে, [illegible] গৌণ কারণ খুঁজতেও আমাদের বা[illegible] যেতে হবে না। আমাদের মেয়েরা স[illegible] পালন কর্‌তে জানে না, নিজেদের [illegible] স্বাস্থ্য নিয়ে সকল সময় সকল কাজ রীতি[illegible] করে'ও উঠতে পারে না। তাদের [illegible] এমন পর্য্যাপ্ত বা পুষ্টিকর নয়, যাতে সন্তা[illegible] দেহ সুগঠিত হতে পারে। এতও[illegible] বাধা-বিপদের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠা আমা[illegible] ভবিষ্য বংশধরদের পক্ষে কত যে [illegible] ব্যাপার, তা' সকলেই বুঝ্‌তে পাচ্ছে[illegible] নেপোলিয়ন বলে গেছেন, দেশে উপ[illegible] জননী তৈরি কর্‌তে; আমরা কেমন জন[illegible] তৈরি কচ্ছি একবার সকলে মিলে তলি[illegible] ভেবে দেখুন দেখি।

তারপরে অনেক মনীষী বলে থাকে[illegible] শিশুরা প্রথম শিক্ষাটা জননীর কাছ থে[illegible] পেলেই তাদের শিক্ষার ভিত্‌টা সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। কথাটির ভিতরে [illegible]

[illegible] নিহিত আছে। কচি বয়সে শিশুরা [illegible]কেই একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। [illegible] খেলার ছলে, আদরে-সোহাগে জননী [illegible]ভাব বা যে-কথা সন্তানের অন্তরে [illegible]খে দেন জীবনান্ত পর্য্যন্ত মানুষ আর তা [illegible]তে পারে না। কিন্তু বেতনভোগী মাষ্টার [illegible] গুরুগম্ভীর চালে শিশুদের সুকুমার [illegible]তিষ্কের উপর শিক্ষার ভার চাপিয়ে দিতে [illegible] হন্, তাতে শিশুগণ জীবনারম্ভ থেকেই [illegible]ক্ষাটাকে একটা ভয়াবহ জিনিষ বলে [illegible]নে করে। সহজ শিক্ষা ও কষ্ট-লভ্য শিক্ষার [illegible]তম্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। [illegible] কাজে আনন্দ আছে সে কাজ দশদিক [illegible]লিয়ে তোলে, আর যে কাজে আনন্দ নেই, [illegible] সুধু সকলকে দগ্ধে মারে। আমরা যে [illegible]ক্ষায় শিক্ষিত হই, তা এই মাষ্টারমশায়ের [illegible]রা গিলিয়ে-দেওয়া শেষোক্ত শিক্ষা; [illegible] জননীর সহজ শিক্ষার আনন্দে ঝল্‌মল্ [illegible]রে' ওঠেনা। দেশের রমণীবৃন্দ অশিক্ষিত, [illegible] সুশিক্ষা দান কর্‌বে?

সমাজ যদি পুত্র ও কন্যার শিক্ষাবিধানে এমন পক্ষপাতিত্ব না কর্‌তো, সমাজ যদি [illegible]রীর মনপ্রাণকে বিকসিত করতে এতটা [illegible]র্পণ্য প্রকাশ না কর্‌তো, এত অল্পবয়সে [illegible]দি তাদের পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর ন্যায় অন্দরে [illegible]রে না রাখ্‌তো, তাহলে আমাদের জাতীয়ত্ব [illegible]কল দিক দিয়ে কিছুতেই এতটা খর্ব্ব হয়ে [illegible]ড়্‌তো না।

তারপর মেয়েদের বিয়ের কথা। বিয়ের [illegible]থা বল্‌তে যাওয়াও বৃথা, কেননা এ সমাজে [illegible]বিবাহ-ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের কোনো [illegible]ত নেই। বাপ-মা যার সঙ্গে যাকে গেঁথে দেবেন, সেই তার জীবন-মরণের সঙ্গী। এই কথা নিয়ে আমরা "স্বেচ্ছা বিবাহ" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলুম। তাতে আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই ছিল যে, সুসন্তান জন্মাতে হলে নরনারীর—ধরে-ভদ্রে ঘটানো নয়—প্রেম-সঞ্জাত মিলনের প্রয়োজন। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করে'ও, নর ও নারীর মিলনে যে একবিন্দু স্বাধীনতা নেই, এ-কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। প্রেমের পথে এই যে বিষম বাধা, আমাদের জাতীয় জীবনের এমন ঘোরতর জড়ত্বের তাই যে প্রধানতম কারণ নয়, তা' কে বল্‌তে পারে?

অনেকে আবার বলেন, য়ুরোপীয় যে স্বাধীন বিবাহ, তা' Spiritual marriage অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা সাত্বিক বিবাহ নয়, ও-একটা চুক্তিবদ্ধ বিবাহ মাত্র; আর আমাদের যে মিলন তা' হচ্ছে আধ্যাত্মিক; আত্মায় আত্মায় মিলন—যা' জীবনের পর-প্রান্তেও অটুট থাকে। কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে মিলন তা কি সমাজ ধরে-ভদ্রে ঘটিয়ে দিতে পারে? সে মিলন যদি চিরন্তন, তবে পুরুষ বহুবিবাহ করে কেন? আমাদের অনেক সময় মনে হয়, এই যে আমরা আধ্যাত্মিকতার বুলি কপ্‌চাই, ওটা একপক্ষে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা, অপর পক্ষে ভণ্ডামি। তারপর ঐ রকম আধ্যাত্মিকতা সমাজ-সমস্যার মধ্যে রাখ্‌তে গেলে বাঁচা চলে না; কারণ এখানে কর্ম্মকলহ আছে, জাতি-সংঘর্ষ আছে; এখানে জন্ম-মরণ, অর্থ আর স্বাস্থ্য—এরই লড়ালড়ি।

কোনো বিদেশী মহিলা আমাদের লক্ষ্য করে' একদিন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, এ-জাতি যে এতটা অধঃপতিত, তার প্রধান কারণ, এরা নারীর সম্মান করতে জানে না। কথাটি শুনে তখন রাগও হয়েছিল ব্যথাও পেয়েছিলুম। কিন্তু যত অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগ্‌ল বুঝতে পারলুম, মেম-সাহেব খাঁটি কথাই বলেছিলেন। বাস্তবিকই রমণী আমাদের চক্ষে যতটা রমণীয় বা লোভনীয়, ততটা পূজনীয় নয়। তাই যদি না হ'তো, এত অবহেলার মধ্যে, এত অবিশ্বাসের আড়ালে আমরা তাদের ডুবিয়ে রাখতুম না—আর বঙ্কিমবাবুও রমণীর বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সঙ্গে তুলনা করতেন না। তবু, রিস্তাবুদ্ধি যাদের আধখানা, মনপ্রাণ যাদের সিকিখানা তারাই আধ্যাত্মিক জগতে রমণী-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে' রয়েছে। এমন অহঙ্কার ঘরে বসেই করা সাজে। এদেশের শাস্ত্রেই আছে—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। কিন্তু কেন এদেশ "নরকস্য দ্বারো নারী" এমন কুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচে? "নরকস্য দ্বারো নারী" যে দেশে রমণীর কল্পনা, সে দেশ যে সমগ্র ভাবে নরকগামী, এ ধারণা কেউ পোষণ করলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? আবার, রমণী আমাদের কাছে আখ্যা পেয়েছে 'অবলা'। কিন্তু এ আখ্যা জাতীয় জীবনের পক্ষে গৌরবময় কি?

সকলেই জানেন সংকীর্ণ ডোবা পুকুরের মধ্যে যে সকল মাছ থাকে, তারা ক্ষীণদেহী ও স্বল্প-শক্তিবিশিষ্ট হয়ে থাকে, আর যারা বৃহৎ জলাশয়ে বাস করে, তাদেরই দীর্ঘকায় ও শক্তিমন্ত হওয়ার সম্ভাবনা বে[শি]। আমাদের সংসারেও যে যতখানি বিশাল[তার] মধ্যে বিচরণ করে, তার দেহ-মন [তত] বিশালতা প্রাপ্ত হয়। এরি জন্যে বোধ[হয়] যোগী-ঋষিগণ সকল ক্ষুদ্রত্বকে দূর [করে] দিয়ে একেবারে সমস্ত পৃথিবীটাকে আপ[নার] ঘর বলে বরণ করে' নেন এবং আপন[াকে] বিস্মৃত হয়ে সকল জীবকে আপন উদার[তার] স্থান দান করেন। বাস্তবিক, যে যত[খানি] মুক্তির আনন্দ লাভ করে তার তত[খানি] জীবনের স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু কোন্ স্বার্থলাভের আশায় আ[মরা] নারীর মুখে ঘোমটা পরিয়ে দিয়েছি? নারী[র] চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বাকে ক্ষুদ্র সীমা[র] মধ্যে আটক করে' রেখেচি? আমাদের [এই] আঁটাআঁটি বন্দোবস্তে বাঙ্গলার নারী-[হৃদয়] প্রস্ফুটিত হয়েছে, না ধ্বংসের পথে এ[গিয়ে] চলেছে? নারী অবশ্য সর্ব্বত্র লোভনী[য়], রমণীয়, কিন্তু তাই বলে তারা ত [কা]মোহর নয়, যে সিন্দুকবন্ধ থাকবে! তা[দের] প্রতি আমাদের এই যে বিচার এতে [কি] আমাদেরই কাপুরুষত্ব প্রমাণ হচ্চে না?

ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ক[রে] দিয়ে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র খুলে রা[খা] বাইরের যত রোগের বীজাণু ঐ ছিদ্র-প[থে] প্রবেশ করে' ঐ ঘরেই আটকা পড়ে যা[য়], তেমনি আমাদের সঙ্কীর্ণ দাম্পত্য-জীবনে [যে] বিষই প্রবেশ করুক না, সে এমনভাবে ব[সে] বসে যে, সর্ব্বনাশ না করে' যায় না। যে[মন] হাওয়ার মত জীবনের ভিতরে এবং [বা]ইরে মুক্তির প্রবাহ রাখলে জীবন স্বাস্থ্যপূর্ণ [হয়] ওঠে,—তাতে-করে' ছোট-বড় সব রক[মের]

[সা]মের সঙ্গে যোঝবার ক্ষমতা জন্মায়, নইলে [ছু]টতেই কাবু হয়ে পড়তে হয়। বদ্ধ [জ]লের মুস্কিল এই যে তার ফাঁক দিয়ে [বে]রুবার জন্যে মন অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্ [ক]রতে থাকে। এবং ভাল-মন্দ বিচার না [ক]রে' বন্দী প্রাণী কোনোরকম একটু ফাঁক [পে]লেই সেই-পথের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু [যে] খোলা জায়গায় আছে, সে কোন্ পথে যাবে [কো]থায় যাবে তার বিচার করবার অবসর আছে। [বা]ধার প্রলোভন এই যে, সে-বাধাকে [দ]লে ফেলবার একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ হয়। [নি]ষিদ্ধ ফলভক্ষণ করার জন্যেই আদিম [নর-দম্পতির ঝোঁক অস্বাভাবিকরূপে প্রবল [হয়ে] উঠেছিল।

আমাদের তাই মনে হয়, আমাদের অন্দর-[প্রথাকে] আমরা যতই মাধুর্য্যে রঞ্জিত করে' [বর্ণনা] করি না কেন, এবং অভ্যাসের মোহে [রমণীগণ] এই অন্দর-জীবনকে যতই ভাল-[বাসুক] না কেন, এ প্রথা জীবধর্ম্মের পক্ষে [অস্বাভাবিক]। এতে তারাও যেমন শক্তিহীন [হয়েচে], সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষগণও সমান অনুপাতে [অধঃপতিত] হয়েচে।

অনেকে বলে থাকেন, নারীবৃন্দ অন্দরে [আবদ্ধ] থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা ত সেখানকার [রাণী]! এ কথাটা শয়তানের সেই কথার [মত]—It is better to reign in hell than to serve in heaven অর্থাৎ স্বর্গে অধীনতার চেয়ে নরকে আধিপত্য করা ভাল।—কিন্তু অন্তঃপুরে যে তাঁরা রাজত্ব করেন এ-কথাও সত্য বলে মনে হয় না। কারণ ছোটোখাটো ব্যাপার থেকে বড় ব্যাপার পর্য্যন্ত কোথাও যে তাঁরা স্বাধীন হুকুম চালাতে পারেন কিম্বা তাঁদের হুকুম চলে এমন তো দেখ্‌তে পাইনে।

তাছাড়া অন্তঃপুর সংসারের কতটুকু অংশ? যেমন সাপ গর্ত্তে বাস করে, কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাছ জলে বাস করে তেম্‌নি-ধারা রমণী অন্তঃপুরের চৌকাঠের মধ্যে বদ্ধ থাকবে,—ঘোমটা খুলে বিশ্বসংসারের দিকে চাইবে না, ভগবান এমন কোনো বিধান তাদের জন্যে মঞ্জুর করে' দিয়েছেন কি? গ্রামের লোককে পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে যে সবাই ঠাট্টা করে' থাকে, রমণী-জীবনও কি তেমনি উপহাসের যোগ্য নয়? আমাদের রমণীবৃন্দও পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতন সংসারের কোনো বিশাল চিন্তার অংশ নিতে পারেনা, কোনো দুরূহ কার্য্যের সহায়তা করতে পারেনা, কোনো মহৎ ব্যাপারে তাদের শক্তি নিযুক্ত হতে পারে না। স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর বালকের সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আমরা পরামর্শ করে' থাকি, একটি বয়স্কা রমণীকে আমরা তারও যোগ্য জ্ঞান করিনে। "আজ কি রান্না হোল?" "বাজার থেকে কি আন্‌তে হবে?" "খোকা স্কুলে গেছে কি না?" "গয়নাটা মনের মতন হয়েচে কি না?"—এর বেশি কোনো বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আমাদের রমণীর সঙ্গে সম্ভবপর নহে। অবশ্য এ-সকল কাজ প্রয়োজনীয় স্বীকার করি, কিন্তু এর চেয়ে কি বড় কাজ আর বড় প্রয়োজন আমাদের সংসারে নেই?

নারীর স্নেহ-মমতাই নাকি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। আমাদের রমণীদের যে স্নেহমমতা অত্যন্ত বেশি, তা' কারুর অস্বীকার করবার

থো নেই। কিন্তু এই স্নেহমমতার ভিতরে একটা ঘোরতর দুর্ব্বলতাও যে বিদ্যমান রয়েচে, তা সকলেই লক্ষ্য কর্‌তে পারেন। তাদের বুক-ভরা প্রেম আছে সত্য, কিন্তু সে প্রেমের স্বাধীনতা নেই; তার সঙ্গে মনের পরিপূর্ণ যোগ নেই, কাজেই তা প্রায়ই ব্যর্থতায় নষ্ট হয়ে যায়। পিতামাতা যার-তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। মেয়ের তাকে ভালবাসতেই হবে; কেননা সে স্বামী। কাউকে ভালবেসে মেয়েরা তাকে স্বামীত্বে বরণ করে না, আগে স্বামীত্বে বরণ করে, তবে ভালবাসে। এ-যেন একটা উল্টো ব্যাপার। কে না স্বীকার কর্‌বেন যে ভালবাসার রাজ্য নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়? কিন্তু এই দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে আমরা এক বাঁধা রাজপথ তৈরি করে' দিয়েচি—এ যেন ভগবানের উপরেও কিস্তির চাল। এইখানেই নারীর স্বাধীন প্রেমের উপর সমাজের শাসনদণ্ড সংযম-শিক্ষার ছলে সরল প্রাণের সহজ গতিকে খর্ব্ব করে' রেখেছে।

বাঙ্গলাদেশের মেয়েদের একটা প্রশংসা এই যে তারা ভারি লজ্জাশীলা। লজ্জা রমণীর ভূষণস্বরূপ। এই লজ্জার রেখা রমণীর সৌন্দর্য্যকে যে বাড়িয়ে তোলে তার ভুল নেই; কিন্তু অতিরিক্ত লজ্জায় জড়সড় হলে সৌন্দর্য্যই একটা বিসদৃশ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যার জন্যে অনেকে আমাদের দেশের মেয়েদের পুটুলির সঙ্গে উপমা দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এই লজ্জার আতিশয্যে প্রাণের কর্ম্মশীলতার দিকটা একেবারে চাপা পড়ে গেছে। চোখ তুলে চাইতে ভয়, এক পা চল্‌তে প্রাণ দুরুদুরু করে, মুখ ফুটে কথা বল্‌তে কে যেন গলায় পা দিয়ে আসে! [illegible] ভীম ভামাকান্ত তাঁর বেগম-নামে বাদ[illegible] যখন বনে ছেড়ে দিতে যান তখন পিঞ্জর ছেড়ে যেতে সেও যেন লজ্জায় বিনম্র পড়েছিল—পিঞ্জরের গুণ এমনি বটে! লজ্জার আবরণ নারীকুলকে যে কতটা দুর্ব্বল করে' রেখেচে তা তাদের প্রতি ক্ষেপে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিপদে তারা পরমুখাপেক্ষী; বহিঃসংসার তাদের [illegible] ভয়াবহ স্থান; তারা এত অসহায় যে এক মাত্র বাইরে পা দিতেই একরত্তি শিশুর চেয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে এবং সামান্য একটু বিপদে কাবু হ'য়ে যায়। মান-ইজ্জত থাকে না।

এই লজ্জাশীলতার দরুণ রমণীবৃন্দকে অত্যাচার অসুবিধা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়; শিক্ষার অভাবে আমাদের শ্রমজীবীগণ যেমন অত্যাচার-অবিচার ঘাড় গুঁজে সহ্য করতে হচ্ছে। মুখ-ফুটে মনের কথা যেমন বলবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই, সেখানে আর কি গত্যন্তর আছে? যে অত্যাচার যে অবস্থায় তারা সহ্য করে, পরে গিন্নী হয়ে গ্রাম্যপাঠশালায় গুরুমশায়দের মতন তারাও আবার নববধূদের উপর দিয়ে সুদে-আসলে তা আদায় করে' নেয়। ধারাবাহিকরূপে এই হিংসার বীভৎস লীলা বংশ-পরম্পরায় চলে আসচে, এবং এর যা কুফল তাও আমরা বরাবর থেকে ভোগ করে' আস্‌চি।

অনেকের ধারণা, য়ুরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকার দরুণই সেখানকার রমণী-বৃন্দ সতীত্বহীন। কিন্তু এ-কথা সত্য হতে পারে না। তাদের যদি অসতী বলে মানতে হয়, তবে তার অন্য কারণ আছে। [illegible]

স্বাধীনতার অপব্যবহার। কিন্তু জিনিষের অপব্যবহার আছে বলে আসল জিনিষকে [illegible] করতে হবে এমন পরামর্শ কেউ দেবেন [illegible]। উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা দরকার; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে কাউকে রক্ষা করবার [illegible] তার চিরদিনের স্বাধীনতা অপহরণ করা [illegible] যুক্ত নয়। যে দোষী তার জন্যে শাস্তি [illegible] উচিত, কিন্তু দোষ করবার সম্ভাবনা আছে বলে মানুষ ত আগে-থাকতে চিরদিন শাস্তি ভোগ করতে পারে না! তবে দোষ [illegible] না হয় তার জন্যে সাবধান হওয়া উচিত বটে। সেই সাবধানতা হচ্ছে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার করা, জীবনের আদর্শকে উন্নত করে' তোলা;—হাত-পা বেঁধে কারাগারে ফেলে রাখা নয়। য়ুরোপের রমণীবৃন্দের চিত্র অঙ্কন করলে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীন প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছে; স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ কচ্ছে; তাদের মানসিক স্ফূর্ত্তিকে সমাজ কোনো দিক দিয়ে বাধা দিচ্ছেনা। তারা পেট ভরে খেতে পায়, প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করতেও তাদের কোনো বাধা নেই। এইটেই স্বাভাবিক।

চিরবৈধব্য নিয়ে আমরা বেশী আলোচনা করবো না, সুধু দু-একটা কথা বলব। শোনা যায় হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক মিলন। মিলন যেখানে আধ্যাত্মিক সেখানে কাউকে পুনর্ব্বিবাহ করতে আমরা বলিনে, সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর যেই হোক। কিন্তু সুধু মুখে বল্‌লেই তো হবে না, বাস্তবিক-পক্ষে এটা আধ্যাত্মিক কিনা তাই আগে বিচার করে' দেখা কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিকের আদর্শটা খুব শ্রেষ্ঠ জিনিষ সন্দেহ নেই; কিন্তু এই আদর্শের আড়ালে মেকি জিনিষ চালাবার যে বন্দোবস্ত, তা অতি ভয়ানক। যারা সুশিক্ষালাভ করেচে, যারা প্রাণের গভীরতম কক্ষে তদ্গত চিত্তে স্বামীর জন্যে আসন পাত্‌তে পেরেছে, যাদের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়ে গিয়ে সন্তান-স্নেহে প্রাণ ভরপুর হয়ে রয়েচে, তারা কখনোই পুনর্ব্বিবাহ করতে চাইবে না; কিন্তু যাদের এইগুলি অর্জ্জন করা হয়নি, বরং উল্টো অবস্থা, তাদের ভিতরে পুনর্ব্বিবাহের প্রচলন হওয়ায় কি বাধা থাকতে পারে? বরং এই বাধার দ্বারা সমাজে অনেকরকম পাপ গুপ্তভাবে প্রশ্রয় পাচ্চে। আর আধ্যাত্মিক মিলনটা কি সুধু স্ত্রীলোকেরই বেলায়? পুরুষ অবিশ্বাসী হলে তথাকথিত আধ্যাত্মিক মিলন যখন অটুট থাকে তখন অপূর্ণমনা মেয়ের বেলায়ও তা থাকবে না কেন? এমনতর বিচার যে নিরপেক্ষ বিচার, তা আমরা স্বীকার করতে পারিনে। এ ছাড়া আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের সমাজে চিরবৈধব্যপ্রথা বিদ্যমান থাকার দরুণ শিক্ষিত পরিবারের যতটা ক্ষতি হোক আর নাই হোক, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর ভিতরে ব্যভিচারের সংক্রামক ব্যাধি ভয়ানক রকম ছড়িয়ে পড়েছে।

বিবাহের উদ্দেশ্য, শরীর ও মনের মিলন সাধন। নর ও নারীর শরীর-মন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মানব-সমাজ এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে শৃঙ্খলা দান করবার জন্যে বিবাহের সৃষ্টি করেচে। যাঁরা কেবলমাত্র মনের মিলনকে গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় একান্ত ভাবে উঁচিয়ে তুল্‌তে চান, তাঁরা রক্তমাংসের শরীরটাকে ভুলে গিয়ে ভয়ানক গোলমালের

সৃষ্টি করেছেন। শরীরটাকেই বাড়িয়ে তুল্‌লে নরনারীর মিলনটাকে যেমন কদর্য্য মনে হয়, তেমনি একমাত্র মনটাকে উঁচিয়ে তুল্‌লেও সেটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে ওঠে।

তারপর আধ্যাত্মিক বিবাহের মাহাত্ম্য জাহির করবার জন্যে যে-সব বিধবাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে তাদের দ্বারা সেই আধ্যাত্মিকতার সম্মান কতদূর রক্ষিত হচ্চে? এ-কথা ত অস্বীকার করলে চলবে না যে বালবিধবারা ও নিম্নশ্রেণীর বিধবারা প্রায়ই শুচিতা রক্ষা করতে পারেনা। পতিতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করলে টের পাওয়া যাবে বোধ হয় শতকরা নিরনব্বই জন আমাদের বিধবাদের ভিতর থেকেই সে-পথে গেছে। এই কলিকাতা সহরেই নাম-লেখানো পতিতার সংখ্যা চল্লিশ সহস্র। আমাদের বোধ হয় গুপ্তভাবে যারা সমাজের মুখে চূণ-কালি মাখিয়ে দিচ্ছে, তাদের সংখ্যা আরো বেশি।

বৃদ্ধাদের জীবন-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা নিষ্প্রোজন। সকল দেশেই এরা নিষ্কর্ম্মা —তবে আমাদের দেশে বার্দ্ধক্য অপেক্ষাকৃত অকালেই দেখা দেয়—এই যা তফাৎ। বেশির মধ্যে আমাদের সমাজে এইটুকু লক্ষ্য করা যায়, যে অনেক সংসারে এদের ঝি-বাঁদীর মতন খেটে মর্‌তে হয় এবং কোথাও কোথাও এরাই কনে-বৌদের উপর দিয়ে বিগত অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলে নেয়। তাদের বরাবরকার মজ্জাগত সংকীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা, ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে এবং তারাই পুরুষদের উন্নতির পথে পাষাণ চাপা দেয়।

আর একটি বিষয়ের প্রস্তাবনা করে'ই আমরা বিদায় হ'ব,—সে হচ্ছে আমাদের রমণীবৃন্দের ধর্ম্ম-জীবনের কথা। ঢের বলে থাকেন, যদি এদেশে ধর্ম্মের একটুও কোথাও থাকে, তবে সে রমণীর ভিতরে। দেশের পুরুষগুলি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে, রমণীকুলই এখনো হিন্দুয়ানীর বজায় রেখেছে। আমাদের যতটুকু সুবিধা হয়েচে, তাতে করে' বলতে যারা হিন্দুয়ানীর বড় বেশি ধুয়া ধরে তাদেরই কথা। ধর্ম্ম যে কাকে বলে, নিয়েই আমরা লড়াই কচ্ছি। তবু আমরা ধর্ম্মকেই যদি ধর্ম্মের মাপ-কাঠি রূপে ব্যবহার করি, তাতেই আমরা দেখতে পাই, রমণী ও শূদ্র হিন্দুর শাস্ত্রে বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত। ব্রাহ্মণ ধরণী পর্য্যন্ত গৃহদেবতাকে স্পর্শ করতে পারে না, ওঁ কারের স্থলে নমো না তাদের পাপ-লিপ্ত হতে হয়। তাদের যে ব্যবস্থা আছে সে ছেলেখেলার ব্রত-কথা, শিব-পূজা ইত্যাদি।

এই পুতুলখেলার মত ধর্ম্মকর্ম্ম মেয়েরা তুষ্ট কিনা, তা তারাই জানে। সত্যই যদি তারা এইটুকুতেই তুষ্ট থাকে তাহলে বলতে হবে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত। কে না দেখ্‌তে পায় যে, মেয়েদের ধর্ম্মজ্ঞান চির শিশুত্বেই বিলীন হয়ে রয়েছে। তারা লেখাপড়া জানে না, অথচ সংস্কৃত মন্ত্র অশুদ্ধ উচ্চারণ করে' দিনের পর দিন সেই একই পদ্ধতিতে পূজা সেরে যাচ্ছে। ওদের বিস্ময় ও রহস্য পরিপূর্ণ সৃষ্টিবিধানের কোনো ধ্যান-ধারণা করতে চেষ্টা করে না; সুধু নাক টিপে ধরে' হাত দেখে আচমন করে' কলের পুতুলের মতন

...ধর্ম্ম কচ্ছে। এমন করে' আপনাকে ...ক দিয়ে কেথানে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা, ...নে ধর্ম্মলাভ করা যে সম্ভবপর, ...দের ত তা' বিশ্বাস হয় না।

এতক্ষণ আমরা আমাদের নারী-জীবনের ...লতার দিকটাই দেখ্‌তে চেষ্টা করেছি। ...কে বলবেন, তবে কি আমাদের নারী-...জে কোনো সৌন্দর্য্য, কোনো মহত্ত্ব নেই? এমন অন্যায় কথা আমরা বল্‌তে চাইনে। ...দের যদি কোনো শ্রেষ্ঠ সম্বল না থাকতো, ...লে পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্বই এত ...ন বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তবে আমরা যে ...ী-চরিত্রের ব্যাধির দিকটাই ফুটিয়ে তুল্‌চি, ...র কারণ বর্ত্তমান যুগে নারী-জীবনকে ব্যাধি-...ক করবার জন্যে উদার আহ্বান এসেচে। ...বীর সমুন্নত জাতিবর্গের পাশাপাশি ...রাও মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে চঞ্চল ...উঠেছি। আমরাও রোগ, শোক, ...লতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মমহিমায় ...পূর্ণ শক্তিতে জেগে উঠ্‌তে চাচ্ছি।

অনেকে বল্‌বেন, এই যে এত কথা ...লুম, এর আড়ালে খৃষ্টান-সমাজের ছবি ...গে রয়েচে। কিন্তু ভালর জাতি-বিচার ...ই। খৃষ্টান-সমাজেও ঢের মন্দ আছে; কিন্তু ...সত্য, তাকে আদর করে' বরণ করতে ...ব, তা সে যেখানেই থাক্। শক্তি যদি অত্যাচারে পীড়িত হয়, তবে সে অত্যাচারের ধ্বংসসাধন করাই হচ্ছে যথার্থ সত্যের সাধনা। পুরুষ যদি স্বাধীনতায় মণ্ডিত হতে চায়, তবে রমণীকেও তার অনুরূপ স্বাধীনতা দিতে হবে, এই হচ্ছে সুবিচার। অনাবশ্যক কতক-গুলি আড়ম্বরে যদি রমণী-শক্তি পঙ্গু হয়ে গিয়ে থাকে এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন না-করে' সে যদি চির-শিশুত্বে ডুবে থাকে, তবে সেই আড়ম্বরের আবর্জ্জনা ঝাটিয়ে সরিয়ে ফেলাই হচ্ছে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। কেন আমাদের রমণীবৃন্দ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত? কেন তারা ভগ্ন-স্বাস্থ্যে চিরটা জীবন যাপন করে? কেন তাদের প্রতি এত অত্যাচার, এত অবিশ্বাস, এত অবিচার?

আজ জাতীয় জীবনে নব বসন্তের হিল্লোল এসে লেগেচে—আমাদের জীবন-তটিনী সবদিক দিয়ে কানায় কানায় যেন ভরে উঠ্‌তে চাচ্চে! কে আজ অন্ধ জড়ত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকবে?—সে যে আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ! যারা ডেমক্রেসিকে সমর্থন করেছে, তাদের পক্ষে কোনো দেশকে পদদলিত করে' রাখা যেমন হাস্যকর, যারা স্বায়ত্বশাসন চাচ্ছে, সমাজের অন্দরমহলে স্বাধীনতার হাওয়া বইতে না-দেওয়াও তাদের পক্ষে তেমনি উপহাসের ব্যাপার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

জলের আল্পনা

চার

পরদিন হইতেই জয়ন্ত ইন্দুলেখার উদ্যান-রচনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। এবং মালদুয়েকের ভিতরেই সে নূতন-নূতন ছোট-বড় দেশীবিলাতী নানারকমের ফুলের গাছ আনাইয়া সেই পোড়ো জমিটাকে চমৎকার একটি বাগানে পরিণত করিয়া ফেলিল।

সেদিন জয়ন্ত বাগানের এককোণে কতকগুলি কলাগাছ পুঁতিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমনসময় ইন্দুলেখা আসিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, বাগান ত হোল,—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মত এখানে যে পাখী-টাখি ডাকে না তার কি হবে?"

জয়ন্ত বলিল, "সে আর এমন বেশী কথা কি!"

তারপরদিনেই জয়ন্ত টেরিটিবাজারের চিড়িয়াখানা প্রায় খালি করিয়া আনিল। মণিয়া, শ্যামা, কেনেরি, টিয়া, কাকাতুয়া, নীলমন, ময়না, ময়ূর—সে যে কত জাতের কত পাখী তা আর গুন্‌তিতে আসে না।

তাদের কিচির্‌মিচির্ শুনিয়া জগৎবাবু মহা বিস্ময়ে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ইন্দুলেখা তখন খুসি হইয়া বালিকার মত হাততালি দিয়া নাচিতেছে!

জগৎবাবু সহাস্যবদনে আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ইন্দুলেখার হাসি-খুসি দেখিলেন। তারপর আগাইয়া গিয়া বলিলেন,—"ইন্দু, তোমার নাচ থামাও—তুমি এখন কচি-খুকিটি নও!"

ইন্দু ছুটিয়া গিয়া পিতার গলা জড়া[illegible] ধরিয়া বলিল, "বাবা—বাবা, কত [illegible] দ্যাখ!"

—"তাইত, এত পাখী এল কোত্থেকে[illegible]

—"কেন; জয়ন্তবাবু আমাকে উপ[illegible] দিয়েছেন যে! তা বুঝি জাননা?"

জয়ন্তের দিকে ফিরিয়া জগৎবাবু বলি[illegible] "থাম্‌কা তুমি এতগুলো টাকা নষ্ট ক[illegible] গেলে কেন বল দেখি?"

—"ইন্দু যে পাখীর গান শুন্‌তে চা[illegible]

—"ও পাগ্‌লী যদি আকাশের চাঁদ [illegible] বসে তুমি তাও এনে দেবে নাকি? [illegible] না, সে হবে না—তোমার কত খরচ হ[illegible] বল, আমি এখনি দিয়ে দেব!"

জয়ন্ত কিন্তু তাঁহার কথা কাণেই তু[illegible] না।

কৃত্রিম পাহাড়ের ঝরণার সাম্‌নে পা[illegible] দের মস্ত-একটা খাঁচা তৈরি করা হই[illegible] তাহার ভিতরে কতক পাখী রহিল[illegible] বাদবাকি রহিল গাছে-গাছে টাঙা[illegible] খাঁচায়।

পাখীদের জন্য বন্দোবস্ত শেষ হই[illegible] কিন্তু ইন্দুলেখার মন তবু উঠিল না। [illegible] ভার করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, এখন [illegible] পড়েছে—এ-সময়ে ব্যাং না ডাক্‌লে এ-যায়গা[illegible] ঠিক পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ বলে মনে [illegible] না ত!"

জয়ন্ত মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ব্যাং [illegible] বাজারে কিন্‌তে মেলে না ইন্দু!"

[illegible] ইন্দুলেখা বলিল, "তাহলে কি হবে! [illegible]মার কিন্তু ব্যাং চাই-ই চাই!"

জয়ন্ত খানিক ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে! [illegible]লদিঘিতে খুব ব্যাং ডাকে! সেখানে [illegible]য় ঝুলি বোঝাই করে' ব্যাং ধরে আন্‌লেই [illegible],—কি বল?"

তারপরদিন বাগানে যখন ঝুলি খুলিয়া [illegible]াং ছাড়া হইতেছে, অবনী আসিয়া হাজির। [illegible]শিরাশি কোলা ব্যাং দেখিয়া দুই চক্ষু [illegible]স্ফারিত করিয়া সে বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ, [illegible]কি কাণ্ড!"

[illegible] পাছে দু-একটা ব্যাং গায়ে লাফাইয়া [illegible]ড়, সেই ভয়ে ইন্দুলেখা তখন একটা [illegible] জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইখান [illegible]তেই সে বলিল, "অবনীবাবু, পাড়াগাঁয়ের [illegible] এখানেও যাতে ব্যাং ডাকে, তারি [illegible]ন্দোবস্ত হচ্ছে।"

—"কিন্তু এত ব্যাং এল কোত্থেকে?"

—"কোত্থেকে আবার! গোলদিঘি [illegible]কে!"

—"বুঝেছি, এ জয়ন্তবাবুর কাণ্ড!"

—"না, আমি বলেছি বলেই উনি ব্যাং [illegible]ানিয়েছেন; তা নইলে পাড়াগাঁয়ের ঠিক [illegible]াবটি ফুট্‌বে কেন?"

অবনী টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "বাঃ [illegible]য়ন্তবাবু, বাঃ! কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সুধু ত [illegible]াং থাকে না—সাপ, বিছে, বাদুড়, শেয়াল [illegible]গুলিও যে পাড়াগাঁয়ের পুরণো বাসিন্দা। [illegible]াদেরও এখানে নেমন্তন্ন করে' আনুন—[illegible]নলে মানাবে কেন?"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "মনুষ্য-[illegible]মাজে ও-জীবগুলি যে কল্‌কে পায় না অবনীবাবু! ওদের সঙ্গে আমাদের কারবার নেই—কাজেই ইন্দুলেখার বাড়ীতেও তাদের নেমন্তন্ন বন্ধ!"

—"আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি।"

—"ভয় পাবেন না অবনীবাবু, ভয় পাবেন না—অকারণে ভয় পাওয়াটাই হচ্ছে বেঠিক মাথার লক্ষণ!"

—"আপনার সব-তাতেই মৌলিকতা! বাগান কর্‌তে চান বাগান করুন—তার মধ্যে এত ফ্যাচাং কেন মশাই! বাগান ত আমারো আছে—কিন্তু তা ব্যাঙে ভরাও নয়, এমন উঁচু-নিচুও নয়।"

—"উঁচু-নিচুর কথা বল্‌ছেন? বাগানের জমি উঁচু-নিচু করাই ত উচিত, নৈলে বাহার হবে কেন? যে-কোন ভালো বাগান বা বাগান-সম্বন্ধে লেখা বই দেখ্‌লেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন।"

অবনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বেশ মশাই, বেশ! আপনার মত আমি ত সকলবিষয়ে পণ্ডিত নই, অত-শত জানি না!"

ইন্দুলেখা এতক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকিয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, একটা গলা-ফোলা মস্তবড় কোলা ব্যাং লুকাইবার ঠাঁই না-পাইয়া অবনীর লম্বা কোঁচার ভিতরে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে!

সে মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, "অবনী-বাবু, আপনার কোঁচার ভেতরে একটা ব্যাং গা-ঢাকা দিয়েছে!"

অবনী তড়াক্ করিয়া একটা লাফ মারিয়া, পিছনে হটিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "ছি ছি, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে!" সে আর

দাঁড়াইল না—বারংবার কোঁচা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে সরিয়া পড়িল।

যাইতে-যাইতে শুনিতে পাইল, জয়ন্ত ও ইন্দু পিছন হইতে হো-হো করিয়া হাসিতেছে!

* * * *

জগৎবাবুর বাহিরের ঘর হইতে একে একে সবাই যখন উঠিয়া গেল, অবনী তখনো নড়িল না।

জগৎবাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, রাত ৯টা বেজে গেছে—আজ্‌কের মত আসর ভঙ্গ করা যাক্—কি বলেন?"

অবনী একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দরজার দিকে খানিক আগাইয়া গেল। আল্‌বোলার নল ফেলিয়া জগৎবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন—হঠাৎ অবনী ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

জগৎবাবু অবাক হইয়া অবনীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জগৎবাবু!"

—"বলুন।"

—"দেখুন, আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি এও চাই যে, সে শিক্ষাটা যেন কুশিক্ষা না-হয়ে ওঠে!"

—"আপনি হঠাৎ এ-কথাটা তুল্‌লেন কেন বলুন দেখি!"

—"কারণ আছে। আমি যা বল্‌লুম, সেটা সঙ্গত কিনা?"

—"হ্যাঁ, খুবই সঙ্গত। কিন্তু অবনীবাবু, অসময়ে অকারণে কোন প্রসঙ্গ তুললে, তা সঙ্গত হলেও শুন্‌তে অসঙ্গত হয়।"

—"তাহলে কারণটা শুনুন। কাল বৈকালে আমি যখন আপনার বা[illegible] এসেছিলুম, শুনলুম জয়ন্তবাবু আ[illegible] মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন।"

—"বেশত, তাতে হয়েছে কি! আ[illegible] কি মেয়েদের গান-শেখানো অন্যায় [illegible] মনে করেন?"

—"নিশ্চয় করি না!"

—"তবে?"

—"কিন্তু মেয়েদের অশ্লীল গান শেখ[illegible] আমি সেটা অন্যায় মনে করি!"

—"অশ্লীল গান? তার মানে?"

—"জয়ন্তবাবু আপনার মেয়েকে এ[illegible] একটা কুরুচিপূর্ণ গান শেখাচ্ছিলেন, [illegible] কোন ভদ্রমহিলারই গাওয়া উচিত না[illegible]

জগৎবাবু বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়া[illegible] বলিলেন, "বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"এ যদি সত্য হয় তাহলে জয়[illegible] অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বল্‌তে হবে।"

—"আমি স্বকর্ণে শুনেছি জগৎবাবু[illegible] এ মিথ্যা হতে পারে না। গা[illegible] রবীন্দ্রনাথের।"

—"রবীন্দ্রনাথের গান অশ্লীল!"

—"গানটা শুন্‌লেই আপনি বুঝ[illegible] পার্‌বেন। তার কথাগুলো এই—

"তুমি যেওনা এখনি,
এখনো আছে রজনী।
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক তরু গহন
আঁধার ধরণী—'

—প্রভৃতি। এর মানে কি? [illegible] একটা কুচরিত্রের স্ত্রীলোক তার প্রণয়ী[illegible]

[illegible]ধন করে' বল্‌ছে যে—" বলিতে-বলিতে [illegible]নী থামিয়া পড়িল, কারণ ততক্ষণে [illegible]ৎবাবু দুহাতে পেট চাপিয়া অট্টহাস্যের [illegible]ম তোড়ে সোফার উপরে কাৎ হইয়া [illegible]ড়িয়াছেন!

অবনী একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা [illegible]রিল, "আপনি হাস্‌ছেন কেন?"

কিন্তু জগৎবাবুর সে হাসি কি সহজে [illegible]মিতে চায়? অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া [illegible]নি বলিলেন, "রক্ষে পাই! এই বুঝি [illegible]াপনার অশ্লীল গান?"

—"অশ্লীল বলে না-মান্‌লেও এটা [illegible]কলকেই মান্‌তে হবে যে, এ অতি [illegible]রুচিপূর্ণ গান।"

—"আপনাদের কুরুচি-টুরুচি আমি অত [illegible]ঝি-টুঝি না মশাই! স্থানে-অস্থানে অম্‌নি [illegible]রুচির দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ত বলে হিন্দুরা আগে [illegible]ন্ধদের যৎপরোনাস্তি ঠাট্টা কর্‌ত! এখন [illegible]খছি কথাবার্ত্তায় কাগজে-বইএ হিন্দুরা [illegible]কারণে কুরুচি কুরুচি বলে এত-বেশী [illegible]্যাচাচ্ছে যে ব্রাহ্মরাও কখনো তত জোরে [illegible]্যাচাতে পারে-নি। আপনাকেও এই দলের [illegible]ভতরে দেখে আমি দুঃখিত হলুম অবনীবাবু!"

অবনী হতাশ ভাবে চেয়ারের উপরে [illegible]হেলিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আপনার [illegible]ত অতটা উদার হোতে পারলুম না জগৎ-[illegible]বাবু! জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আপনারাও দেখছি [illegible]বি-ঠাকুরের গোঁড়া চ্যালা হয়ে পড়েছেন—[illegible]নইলে এমন বিশ্রী গানটাও—"

জগৎবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "অনর্থক [illegible]তর্কে কোন লাভ নেই। আপনার বোঝা [illegible]উচিত, কবিতা বল্‌তে আহ্নিকের স্তব বোঝায় না। কবিরা হাল্‌কা রসকে 'বয়কট্', করলে যৌবনের মুখ যে একেবারে বোবা হয়ে যাবে!"

অবনী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "জগৎবাবু, আমি যা বল্‌লুম তা সরল মনে সরল বিশ্বাসেই বলেছি। আপনার মেয়েকে এ-সব গান গাইতে শুন্‌লে সত্যই আমি দুঃখিত হই! ... ... কারণ,"—অবনী থামিয়া জগৎবাবু মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলিল, "কারণ,—আপনার মেয়েকে ... ... আমি ... ... ভালোবাসি!"

জগৎবাবু কিছু সন্দেহ না-করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মা ইন্দুকে সকলেই অম্‌নি ভালোবাসে!"

জগৎবাবু তাহার কথার আসল মানেটা বুঝিলেন না দেখিয়া অবনী নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে—আপনার মনের কথা খুলিয়া না-বলিয়া আজ সে এখান হইতে কিছুতেই নড়িবে না! অতএব ঘরের মেঝের দিকে তাকাইয়া আবার বলিল, "জগৎবাবু, আপনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না।"

—"কেন? আপনি ইন্দুকে ভালোবাসেন, এই বল্‌ছিলেন ত? এ আর এমন দুর্ব্বোধ কথা কি?

মরিয়া হইয়া অবনী একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইন্দুলেখাকে আমি তাই বিবাহ কর্‌তে চাই।"

—"কি, কি বল্‌লেন?"

—"ইন্দুলেখাকে আমি বিবাহ কর্‌তে চাই।"

কিন্তু জগৎবাবু তখনো যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একান্ত সন্দেহের সহিত তিনি অবনীর প্রায়নাভি-চুম্বনোদ্যত দাড়ির দিকে অবাকভাবে চাহিয়া রহিলেন—ঐ কঠোর দাড়ির মধ্য হইতে বিবাহের মত কোমল কথাটা যে বাহির হইতে পারে, এ-যেন তাঁহার ধারণাতীত!

জগৎবাবুর চাহনির ভাব দেখিয়া অবনী আরো কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘাড় হেঁট্ করিয়া সে বলিল, "দেখুন, আপনার মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে চাই বলে আমি অনেক বড় সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি মুখ্যু বা গরীব নই—আমার হাতে পড়্‌লে আপনার মেয়ে বোধকরি, অপাত্রে পড়্‌বে না!"

এতক্ষণে জগৎবাবুর বিশ্বাস হইল, অবনী ঠাট্টা করিতেছে না—সত্য-সত্যই সে ইন্দুলেখাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক! কিন্তু অবনী এমন আচম্বিতে কথাটা তুলিয়াছে যে তিনি প্রথমত তাহার কিছু জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না। মেয়ের বিয়ে ত আর মুখের কথা নয়, যে আল্‌টপ্‌কা ফস্-করিয়া হাঁ বলিয়া ফেলিলেই হইল! অতএব, মাথার চুলের ভিতরে আঙুল চালাইতে-চালাইতে কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকার পর জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু, এত-শীঘ্র আমি আপনার কথার জবাব দিতে পারলুম না—আমাকে দু-চারদিন ভাব্‌বার সময় দিন।"

—"বেশ—তাহলে আজ আমি আসি" বলিয়া অবনী উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে জগৎবাবু হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আ[illegible] আপনিই বলিলেন, "অবনীকে দেখলে [illegible] তার কথা শুন্‌লে কারুর বোঝবার [illegible] নেই যে, তার মনটা মরুভূমির মত [illegible] আজ দেখ্‌ছি সেখানেও সবুজের আঁচ [illegible] আর সেখানেও বিয়ের ফুল ফুট্‌তে [illegible] তাইত, অবাক কর্‌লে দেখছি!"

পাঁচ

ফোয়ারার পাশে এক্‌লাটি দাঁড়া[illegible] ইন্দুলেখা লালমাছের খেলা দেখিতেছি[illegible] পিছন হইতে জয়ন্ত আসিয়া বলিল, "[illegible] ইন্দু, তুমি কি চব্বিশঘণ্টাই বাগানে ব[illegible] বসে কাটাবে? চল, আজ তোমাকে [illegible] নতুন গানটা শিখিয়ে দিই-গে!"

ইন্দু বলিল, "কোন্ গানটা?"

—"রবিবাবুর সেই "দখিন হাওয়া[illegible] গান!"

ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া ভুরু কপা[illegible] তুলিয়া বলিল, "ওরে বাস্‌রে, রবিবা[illegible] গান? উঁহু, অসম্ভব!"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করি[illegible] "আজ আবার একি দুষ্টুমি!"

ইন্দু বলিল, "দুষ্টুমি নয় জয়ন্তবাবু[illegible] দুষ্টুমি নয়! হুকুম হয়েছে রবিবাবুর গান[illegible] টান আমি আর গাইতে কি শিখ্‌তে পার[illegible] না! আপনার রবিবাবু এবার গেলেন!"

—"হুকুম! এমন হুকুম দিলেন কে[illegible] তোমার বাবা?"

—"উঁহু!"

—"তবে?"

—"অবনীবাবু।"

—"অবনীবাবু? কেন শুনি?"

—"রবিবাবুর গান নাকি অশ্লীল।"

—"এ হুকুম মান্‌বে কে?"

—"আমি। নইলে তিনি নাকি আমায় [illegible] কর্‌বেন না"—বলিয়াই দুষ্টু ইন্দু মুখে [illegible]ড় চাপা দিয়া হাসিতে-হাসিতে সাম্‌নের [illegible]কে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া [illegible]ল। তারপর বলিল, "তোমার হাসি [illegible]মিয়ে ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি?"

ইন্দু হাসির তোড় থামাইয়া কহিল, [illegible]লুম ত, অবনীবাবু আমাকে বিয়ে কর্‌তে [illegible]! বাবার কাছে তিনি নিজেই নিজের [illegible] ঘট্‌কালি করে গেছেন।"—সে আবার [illegible]সির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

জয়ন্তের মুখ মলিন হইয়া গেল। আস্তে-[illegible]স্তে বলিল, "তার জন্যে অত হাস্‌ছ [illegible]ন?"

—"অবনীবাবুর কথা মনে হচ্ছে আর [illegible]মার হাসি আস্‌চে! কি করি বলুন দেখি [illegible]য়ন্তবাবু, লোকে আমায় ভারি বেহায়া [illegible]াববে,—না?"—তারপরেই ফের হাসি!

জয়ন্ত কোন জবাব দিল না, বসিয়া-[illegible]সিয়া আনমনে ভাবিতে লাগিল।

আকাশের, মেঘপুরীর তোরণে তখন [illegible]াদের মশাল ধীরে-ধীরে উস্কাইয়া উঠিতেছে; [illegible]তন ফাগুনের ঝির্‌ঝিরে বাতাস বাগানের [illegible]থরে ফুলে-ফুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া [illegible]াইতেছে; এবং আমগাছের কোন্ ডালে [illegible]কটা বন্দী-কোকিল সে বাতাসে সুদূর [illegible]নের বার্ত্তা পাইয়া উদাসপ্রাণে বারংবার [illegible]াকিতেছে কুহু, কুহু, কুহু!

জয়ন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুর হাসি তখন থামিয়াছে—চাঁদের দিকে মুখ তুলিয়া সে চুপ-করিয়া বসিয়া আছে।

জয়ন্ত গাঢ়স্বরে ডাকিল, "ইন্দু!"

—"উঁ!"

—"তুমি যা বল্‌লে তা সত্যি?"

—"অবনীবাবুর দাড়ির দোহাই! আমার একটি কথাও বানানো নয়!"

—"তোমার বাবার মত্ কি?"

—"কে জানে!"

—"তুমি কি বল?"

—"কিছু নাঃ!"

—"অবনীবাবুকে তুমি কি—"

—"উঁহুঃ! বিয়ে করে' কি হবে?"

—"না, ঠাট্টা নয় ইন্দু! আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।"

জয়ন্তের স্বর শুনিয়া ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। বলিল, "কি কথা জয়ন্তবাবু?"

একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জয়ন্ত বলিল, "এই—তোমার—তোমার বিয়ের কথা!"

—"ও ছাই কথা থাক্, আমার আদোপেই ভালো লাগ্‌চে না!"

জয়ন্ত ইন্দুর একখানা হাত আপনার মুঠোর ভিতরে চাপিয়া বলিল, "অনেকসময় অনেক কথা ভালো না-লাগ্‌লেও শুন্‌তে হয়।"

জয়ন্তের হাতে হাত রাখিয়া ইন্দুর মনে হইল, জয়ন্তের হাতের আঙুলগুলি যেন কথা কহিতেছে! সে কি কথা—কি কথা? ইন্দুর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ইন্দুর আধ্‌ফোটা কোরকের মত নত-নয়নের দিকে তরল চোখে চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল তাহার মুখে আর সেই চপল হাসি নাই, সে অত্যন্ত গম্ভীর।

জয়ন্ত মৃদু স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি যদি আশা দাও আমি তাহলে তোমার বাবার কাছে যেতে পারি।"

ইন্দুর ঠোঁটদুখানি কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। এক-গা ঘামিয়া আড়ষ্ট হইয়া সে বসিয়া রহিল; এবং কি-এক ব্যথাভরা সুখে তাহার ছোট প্রাণ-খানি একেবারে ভরিয়া উঠিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "ইন্দু, তোমার মন জানি না, কিন্তু আমার মন সুধু তোমাকে চায়—সুধু তোমাকেই! আমার চোখের সাম্‌নে আর কেউ যদি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায়, তোমাকে হারিয়ে আমি তাহলে কি-করে বেঁচে থাক্‌ব?"

জয়ন্ত আশা-নিরাশায় দুলিতে-দুলিতে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল—সে দৃষ্টির সুমুখে লজ্জায় ভাঙিয়া পড়িয়া ইন্দু ঘাড় ফিরাইয়া আপনার বাহুমূলে মুখ লুকাইল। একটা দম্‌কা বাতাসে ইন্দুর ফুলগন্ধী চুলের রাশি উড়িয়া জয়ন্তের মুখে-চোখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইন্দুর হাত আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া জয়ন্ত কহিল, "বল, তোমার বাবার কাছে আমি এ-কথা তুল্‌ব কিনা? যদি তোমার মত্‌ না-পাই তাহলে আজ্‌কের এই দেখা তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা!"

দুইহাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া খুব অস্পষ্ট স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু!"

—"বল, তুমি আমাকে বিবাহ করবে"

জবাব দিতে ইন্দুর নিশ্বাস যেন হইয়া আসিল। তবু সে প্রাণপণে ফেলিল, "হ্যাঁ!"

হ্যাঁ!—এই সামান্য একটি কথায় জয় সমস্ত মন যেন বিশ্বের নিখিল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! আনন্দের আ অধীর হইয়া সে ইন্দুর শীতল ও করপুটের উপরে আপনার তপ্ত ও রাখিয়া একটি চুম্বন দান করিল!

গগনের জ্যোৎস্না-সায়রে কালো মে ভাঙন-ধরা কূলে চাঁদ তখন ঠেকিয়া —সে-যেন স্বর্গ-রূপসীর নিজের-হাতে ভা দেওয়া আশার প্রদীপ! চারিদিকের স্তব ঘুম ভাঙাইয়া, ইন্দুর বাগানে তখন কো ও পাপিয়া এ-উহাকে হারাইবার অবিশ্রান্ত গানের ঝঙ্কার তুলিয়াছে!

ছয়

সেদিন জগৎবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার আ কিছুতেই জমিতে চাহিতেছিল না—কা সকলে বাধ্য হইয়া স্বর্ণেন্দুর মুখে তা 'মেজমামা'র চিরন্তন কাহিনী একান্ত অ মনস্ক ভাবে শুনিতেছিলেন।

স্বর্ণেন্দু মাঝে-মাঝে সিগারেটে এক-এক জোর-টান মারিতেছে এবং সেইসঙ্গে ম উৎসাহের সহিত বলিতেছে, "বুঝলেন কি কৈলেশবাবু, মেজমামার চা-খাওয়া, সে এ অবাক কারখানা! পাকা গোয়ালঘরে তি তিন্‌টে হাতীর মতন নাদুস্‌-নুদুস্‌ ভাগ পুরী গাই বাঁধা আছে। আমি বল 'হ্যাঁ মেজমামা, এ গরুগুলো আলাদা বাঁধা কেন?' মেজমামা একটুখানি মুচ

বল্‌লেন, 'জানিস্‌ না বুঝি? এযে গরু!'—সে গরু তিনটে যত দুধ সব ক্ষীর করে' চায়ে ঢালা হয়। আহা, মেজমামার বাড়ীর চা—সে ত চা নয় বুঝলেন কিনা—সে হচ্ছে সুধা, সুধা!" —বলিয়া পাইপ হইতে দগ্ধীভূত সিগারেটের অবশিষ্টটা ফেলিয়া দিয়া সে আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

জয়ন্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি সিগারেটে ফাঁশীর টান দিচ্ছেন যে! বিনামূল্যে সিগারেট পেয়েছেন বলে এতটা desperate হয়ে উঠ্‌বেন না!"

লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণেন্দু সিগারেট নামাইয়া জয়ন্তের দিকে ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া চাহিল।

এমনসময় ঘরের ভিতরে আর-একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল; সকলেরই কাছে তাহার মুখ চেনা-চেনা বোধ হইল, অথচ কেহই ঠিক চিনিতে পারিলেন না!

জগৎবাবু দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে খুঁজচেন?"

—"একি, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না!"

তাহার গলার স্বরে চম্‌কাইয়া, সকলেই একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অবনী-বাবু!"

কৈলাসবাবু হাঁচিবার জন্য স্তিমিত চক্ষে মস্ত-একটা হাঁ করিয়াছিলেন—কিন্তু দাড়ি-কামানো অবনীকে দেখিয়া তাঁহার হাঁচি আট্‌কাইয়া গেল—তিনি বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! আপনার বিখ্যাত দাড়ি-গোঁফ কার জিম্মায় রেখে এলেন?"

চিবুকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে অবনী অতিশয় করুণ স্বরে বলিল, "কামিয়ে ফেলেছি!"

—"বলেন কি! আপনার দাড়ি দেখলে সন্দেহ হোত, দাড়ি আগে না আপনি আগে জন্মেছেন—তেমন বর্দ্ধিষ্ণু দাড়িটিকে আপনি কোন্‌ প্রাণে নির্ব্বাসিত কর্‌লেন?"

অবনী ফোঁশ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা যেতে দিন!"

শত-শত হাসি-ঠাট্টার চোখা চোখা বাণ যে দুর্ভেদ্য দাড়ির একগাছি চুলও খসাইতে পারে নাই, কত দুঃখে এবং গূঢ় কারণে অবনী যে তাহার সেই সনাতন শ্মশ্রুগুম্ফের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, এ-ঘরের এতগুলি লোকের মধ্যে কেবল জগৎবাবু ও জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ তাহা টের পাইলেন না!

* * * *

সেদিনকার মত আসর যখন ভাঙিয়া গেল, জগৎবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, বোসো, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসুভাবে জগৎবাবুর দিকে চাহিল।

জগৎবাবু একবার দরজার দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন সকলে চলিয়া গিয়াছে কিনা! তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু হঠাৎ কেন দাড়ি কামালেন জান?"

জয়ন্ত মৃদুমৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিল, "জানি।"

জগৎবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "জান? আচ্ছা, কেন, বল দেখি?"

—"অবনীবাবু বিয়ে করতে চান।"

—"কি করে' জানলে তুমি?"

—"ইন্দুলেখার মুখে শুনলুম।"

—"আমার হাবা মেয়ে বুঝি তোমার কাছে কোন কথাই লুকোয় না!... ... যাক্, ইন্দুর বিবাহ নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

—"কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।"

—"বল।"

জয়ন্ত মাথা নামাইয়া বলিল, "জগৎ-বাবু, জানবেন আপনার মতামতের ওপরে আমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

জগৎবাবু খরচোখে জয়ন্তের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,—"তাইত হে, তোমার মুখখানা হঠাৎ যে-রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে তাতে বোধ হচ্ছে তোমার নিবেদনটা কিছু গুরুতর। কিন্তু জয়ন্ত, তুমি ত জানই, গম্ভীর মুখ আমি চু-চক্ষে দেখতে পারি না—আমার কাছে সহজভাবেই নিবেদন জানালে আমি খুসি হব।"

—"আজ্ঞে, আমি ইন্দুলেখার বিবাহের কথাই বলতে চাই।"

—"ইন্দুলেখার বিবাহের কথা বলতে চাও ত মুখের ওপরে অতবড় গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়েছ কেন?"

জয়ন্ত লজ্জিত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, একটু কারণ আছে।"

—"আবার, কারণ! যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে, অকারণে আপনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—পদে পদে কারণ খোঁজে, বার্দ্ধক্য! কিন্তু তোমরা—এক্ষালের যুবকরা, এ বুড়ো হয়ে পড়েছ যে, অকারণে কি করতে জান না! তোমরা কাব্য লিখ —বিবাহের প্রীতি-উপহারের জন্যে; উপ লিখবে—সমাজ বা ধর্ম্মতত্ত্ব বা কৃষিবি শেখাবার জন্যে; লেখাপড়া শিখবে চাকরি করবার জন্যে! কেন রে বাপু, কারণ জানবার দরকার কি?"

জয়ন্ত মাথা তুলিয়া বলিল, "থাক্ জগৎ বাবু, আজ্‌কে আমার নিবেদনটা চাপা থাক্, আর-একদিন শুনবেন তখন!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এইত বা যৌবনের ধর্ম্ম আপনি ফুটে উঠল! কা দেখিয়ে নিবেদন জানাতে এসেছিলে, এ অকারণে রাগ করলে চলবে না ত!"

—"আজ্ঞে, আমি রাগ করি-নি ত

—"রাগ কর-নি কি-রকম? খুব বে রকমই রাগ করেছ! নইলে, যে কথার ওপ তোমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর ক —সে কথাটা না-বলেই মুখবন্ধ করতে চাও

জয়ন্ত অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে চুল্‌কাইতে সুরু করিল।

জগৎবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন তারপর কোমল স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা জয় ইন্দুকে আমাদের অবনীবাবু বিবাহ করতে চান—তাই ভেবেছিলুম, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ করব। কিন্তু এখন দেখছি তোমার সঙ্গে পরামর্শ নিষ্ফল।"

—"বলুন না, নিষ্ফল কেন হবে জগৎ বাবু?"

—"নিষ্ফল হবে না? যে বিচারক, আসামী হোলে মকদ্দমা চলবে কেন

—"আপনি কি বলছেন!"

জগৎবাবু জয়ন্তের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর জয়ন্তের একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাপু হে, বুড়োদের তোমরা যতটা 'ঘুঘু' ভাব আসলে আমরা ঠিক ততটা বোকা নই! তুমি কি ভাবছ তোমার মুখ দেখে আর তোমার 'নিবেদনে'র ভূমিকা শুনে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারি-নি?"

জয়ন্ত হেঁটমুখে একেবারে চুপ!

জগৎবাবু তেম্‌নি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "পাত্র-হিসেবে অবনী যে খারাপ, তা নয়! কিন্তু তোমাকে আমি বেশী পছন্দ করি—আর মা-ইন্দুও বোধ করি তোমাকে আমার চেয়েও বেশী পছন্দ করে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

জয়ন্তের মনের আনন্দ তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু বোধ হয় চটে যাবেন! কিন্তু কি করব, ইন্দু আমার বড়-আদরের মেয়ে, তার সুখ-অসুখে দৃক্‌পাত না-করে আমি ত আর অবনীবাবুকে খুসি রাখতে পারব না!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দিন গেল

দিন গেল, এ দিনের কোন কিনারায়
পড়িল না তোমার কিরণ,
জাগিল না তাই প্রাণ মন,
ফুটিলনা কোন ফুল, গাহিল না পাখী
দুলালী হরিণী-বধূ মেলিল না আঁখি,
অশ্ব নাহি সাড়া দিল রুদ্ধ মন্দুরায়।

দিন গেল, এ ভবনে তোমার চরণ
দিয়ে নাহি গেল পদধূলি,
তাই সব আয়োজন ভুলি,
আনমনে তাই কভু ঘরে গিয়ে পশি;
উদাসী নয়ন লয়ে আঙিনায় বসি,
দিশাহারা পরবাসী যেন সমীরণ!

দিন গেল, মোর কাণে তব কণ্ঠস্বর
ঢালিয়া ত দিলনাক সুধা,
উপাসীর মিটিল না ক্ষুধা,
হায়, মালা-জপা মোর হ'লনাক আজ,
আরতি-বিহীন বৃথা গেল ভোর সাঁঝ,
অজিনে বসিয়া, ধ্যানে নাই অবসর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

হাসি

(গল্প)

তাহাকে যেই দেখে সেই বলে—"আহা বেশ মেয়েটি ত।"

আমার কিন্তু মনে হয় যে, সে 'বেশের' চেয়েও একটু বেশী ভাল। তাহার সুদীর্ঘ পল্লবযুক্ত বড়-বড় চোখদুটি এমন স্বপ্নময় ভাবে ঢলঢল, ছোট ছোট সুগঠিত অধরোষ্ঠ-দুখানি এমন হাসি হাসি, আর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণখানি এমন স্বাস্থ্য-লাবণ্যপূর্ণ যে অনেক সুরূপা গৌরীকে ফেলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

তাহার দিদিমার চোখে ত সে অদ্বিতীয় সুন্দরী,—তিনি ডাকেন তাহাকে রূপসী বলিয়া। কিন্তু আসল নাম তার সুগুণা। কি গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার দাদা-মহাশয় অন্নপ্রাশনকালে সেই অবাক্‌দন্ত দশমাসের শিশুটির নাম দিয়াছিলেন সুগুণা, তাহা জানিনা; তবে কালে তাহার এ নাম সার্থক হইয়াছে। ঘর-বাহির তাহার গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ। পিতার আর কেরাণী রাখিতে হয় না,—যত তাঁহার চিঠিপত্র সে টাইপ করিয়া দেয়; মায়ের জমাখরচ সেই রাখে; দিদিমাকে সে বাঙ্গলা পুস্তক পড়িয়া শুনাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে, অবসর-সময়ে ইংরাজি উপন্যাসের তর্জ্জমা করিয়াও শুনায়। রন্ধনেও তাহার হাত ভাল। এমন কি, বালিকার হাতে তৈরি মিষ্টান্নের একবার যিনি আস্বাদ পাইয়াছেন, তাহার লোভে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াও যাচিয়া দ্বিতীয়বার তিনি মুখুয্যেবাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

গানবাজ্যেও বালিকা পটু, সে সঙ্গীত-সঙ্ঘে একজন ছাত্রী। এখন সে-কাল গিয়াছে, নব্যশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই —মেয়ে জন্মিবামাত্র পিতামাতাকে তাহার লেখাপড়া ও গানবাজনা শিক্ষার খরচ আগে হইতে ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। কিন্তু ঘোর হিন্দুসমাজেও আজকাল মেয়ের গানবাজনা-শেখাটা দোষণীয় নহে, বরং প্রশংসনীয়—কারণ ইহা সুপাত্র লাভের একটা উপায়। দরকারের নিকট আইনকানুন আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়ে।

কিন্তু বালিকার সকল গুণের সেরা গুণ —তাহার কোমল প্রকৃতি, তাহার আত্ম-গর্ব্বহীন সরলতা। সদাবিকাশিত নির্ম্মল হাসিতে, অমায়িক সহজ কথাবার্ত্তায় তাহার মনের এই রূপটুকু আত্ম-অজানিত নিজ সুমধুর ভাবেই বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে।

দিদিমা কিছু-কিছু সংস্কৃত জানেন; তিনি তাহাকে শুনাইয়া যখন-তখন আওড়ান—

"পয়সা কমলম্ কমলেন পয়ঃ,
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি,—
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।" ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই, জলে যেমন পদ্ম, পদ্মে যেমন জল এবং উভয়ের সন্নিবেশে সরোবর যেমন শোভা পায় সেইরূপ তাহার নাতনীটির রূপ তাহার গুণকে, এবং গুণ রূপকে ফুটাইয়া উভয়ে মিলিয়া তাহার আধারকে সুশোভিত করিতেছে। দিদিমার

সত্যই হাসি না হাসিয়া কথা কহিতে পারে না—বা না হাসিয়া গম্ভীরভাবে কাহারও কথা সে শুনিতে পারে না। এইরূপে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের মধ্যে রসিকতার কোনো প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লুক্কায়িত না থাকিলেও সে অকারণে হাসে; আর কারণ থাকিলে ত কথাই নাই, প্রফুল্ল কমলের মত হাসিতে সে ঢলিয়া পড়ে। অতএব এত হাসি সকলের সহ্য হইবে এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু শ্বশুর-গৃহ তাহার এই হাসি সহ্য করিবে কি না আপাততঃ এই চর্চ্চাতে দু-একজন প্রৌঢ়া হিতাকাঙ্ক্ষিনীর অতি-দুঃখেতেও বেশ সুখে সময় অতিবাহিত হইতেছে। নিজের মেয়ের কালোরূপ এবং বধূর ঘুমটধারী গুমট-মুখের প্রতি হতাশ নয়নে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গোপনে যাঁহার যতই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া ওঠে মুখে ততই সজোরে তিনি বলেন—"মেয়েছেলের রূপ লইয়া আর কে ধুইয়া খায়?" প্রিয়সখী অমনি পাল্‌টা উত্তরে যখন ধুয়া ধরেন—"তা তো বটেই, মেয়েছেলের "স্বভাবটাই" আসল, তোমার-আমার বৌয়ের মুখে কি কেউ কখনো হাসি দেখতে পায়?" তখন হাস্যে ভাষ্যে প্রসঙ্গটা উত্তরোত্তর অতিরিক্ত-মাত্রায় জমিয়া ওঠে।

কিন্তু ঘরের মধ্যেই এই আন্দোলন আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। হাসির পিতা-মাতাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করাটা তাঁহারা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন।

দিদিমা কিন্তু এরকম অযাচিত উপদেশে জ্বলিয়া যান। রাগিয়া বলেন—"বিধাতা আগে বর গড়িয়া তবে কনে সৃষ্টি করেন। হাসির বরকে মুগ্ধ করিবার জন্যই হাসিকে তিনি এমন

প্রশংসায় নাতনীটি হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে—কিন্তু গর্ব্ববোধ করেনা।

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম। আর-কিছুতে না হউক, এই আদর্শে বালকবালিকার নামের পশ্চাৎ একাধিক নেজুড় টানিয়া—আমরা যে কতজাতি ইহার প্রমাণ দিতে পারি না কি? বাঙ্গালী-ঘরে বোধ হয় এমন ছেলেমেয়ে নাই যাহার একাধিক নাম না আছে। আমাদের নায়িকাটিও যে এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত-বিধির মধ্যে গণ্য নহেন—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত দুই নাম ছাড়া তাহার আরও একটি নাম আছে। বালিকা সদাহাস্যময়ী বলিয়া পিতা তাহার নাম দিয়াছেন হাসি।

ভাবে অনুভাবে বালিকার পক্ষে এ নামটি এত সঙ্গত যে ক্রমশ ইহাই তাহার ডাকনাম হইয়া পড়িয়াছে।

হাসির হাসিটি তাহার বাপমার নিকট কি সুমধুর! দিদিমার নিকট কি বিশ্ব-বিমোহিনী! তাহার প্রিয় আত্মীয়স্বজন সখা-সখীদিগের নিকটও অতি সুন্দর। তথাপি ইহার শোভা বাদানুবাদবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। মেয়েছেলের মুখে সারাদিন এমন হাসি কাহারও-কাহারও মনে বড় বাড়াবাড়ি অশোভন বলিয়াই ঠেকে।

আশ্চর্য্য নাই! যে পঞ্চভূতের সমষ্টি এই মানব তাহার সর্ব্বপ্রধান ভূত কি? আমি ত বলি তাহার ভেদ-বুদ্ধি! স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব লইয়াই যখন নানামুনির নানামত; আমি আছি বা নাই ইহাতেও যখন মতভেদ তখন হাসির হাসিটুকুতেও যে কেহ-কেহ চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

হাসি দিয়া গঠিত করিয়াছেন।" হাসির পিতা, তাঁহার মাতারই একেলে সংস্করণ,—তাঁহার মনের গঠন মাতারই অনেকটা অনুরূপ; তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃত মাত্র। তিনি এরূপ উপদেশে রাগেন না, হাসিয়াই বলেন—"দরকার না থাকিলে হাসির হাসি আপনিই সংযত হইয়া আসিবে, সেজন্য আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।" মা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না মনে-মনে ইহার সারবত্তা মানিয়া লইয়া মেয়েকে সাবধান হইতে শিক্ষা দেন। মেয়ে যখন উত্তরে সানুনয়ে বলে—"আচ্ছা মা আমি আর হাসব না।"—এবং কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়াও থাকে তখন মা কিন্তু দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেন।

তবে নক্ষত্রের অন্তরে মহাবিপ্লব না ঘটিলে তাহার জ্যোতিহীনতা যেমন ক্ষণ-স্থায়ী সেইরূপ হাসির হাসিও মাতার সাদর উপদেশ ভুলিয়া কিছু পরে মেঘমুক্ত জ্যোতির ন্যায়ই পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাতার ক্ষোভের কারণ দূর করিয়া দেয়।

এইরকম-করিয়া হাসি-খুসীর মধ্যেই হাসি আঠার বছরের মেয়েটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। বড় কি নূতন কথা! নব্য-সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া,—ঘোর হিন্দু সমাজেই বা কয়জন পিতা আজকাল অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা-দানে গৌরীদানের পুণ্য লাভে কৃতকৃতার্থ!

অতএব আমি কৈফিয়েৎ-আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া উপন্যাসলেখকের জয়পতাকা উড়াইলাম! পতাকা পত-পত-শব্দে কি বলিতেছে শোন:—

"জয় ঔপন্যাসিকের জয়! এখন বাঙ্গালী-ঘরে বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা প্রেম-পরিণয় লেখকের কল্পনামাত্র নহে, ঘরের কথা, দৈনন্দিন ঘটনা।" পতাকার সহিত সমস্বরে নিজের জয় গাইয়া পুনরায় সগর্ব্বে বলিতেছি অ বর্ষীয়া হাসি এখনো অবিবাহিতা।

সুরূপা, সুগুণা, ধনী পিতামা স্নেহের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হাসির কিছুরই অভাব নাই, অভাব কেবল সুপাত্রের। সংসারে সাধারণ মিল মিলে, অসাধারণের মিল পাওয়াই এই কারণেই বোধ হয় তাহার বিবাহ হয় নাই। অথচ তাহার বরের নিতান্ত অভাব তাহাও নহে; হাসির গুণের সমজদার বিস্তর। প্রচুরতা বশ সম্ভবতঃ তাহার মধ্য হইতে কোনো-একটি নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া পিতামাতার এতটা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহা চোখে যাহার রূপ লাগে তাহার গু অভাব হয়, যাহার রূপগুণ দুইই দে পান, ধনমর্য্যাদায় অথবা বংশমর্য্যাদায় সে হইয়া পড়ে; আর যে ছেলেটি সর্ব্বাঙ্গসু অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে হাসির যোগ্যবর বি বিবেচিত হয় তাহাকে জামাতা ক তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হই দাঁড়ায়, কেননা হয়ত বা সে ভিন্নবর্ণ অথ ভিন্ন গোত্র।

এইরূপে ছাঁটছোট্ বাদ্‌সাদ্ দিয়া দুইটি পাত্র তাঁহাদের হাতে আছে। দু জনের মধ্যে বিধাতা কার ভাগ্যে হাসি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন।

এরজন ধনীপুত্র, কিন্তু পাশের যাচাইয়ে হার বাজার-দর কম। ইউনিভারসিটি ীক্ষায় পাশ অপেক্ষা ফেল-নম্বরই তাহার ধিক। অথচ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও অভাব ই, অভাব কেবল সেই উত্তমটুকুর—সেই রোচনার—যাহার বলে সাধারণতঃ আমাদের শের অনেক স্বল্পবুদ্ধি ছেলেও বুদ্ধিমান লিয়া যায়। চাকরি-করার সেই তাগাদাটুকু জনকুমারের ছিলনা বলিয়াই বুঝি তাহার দ্ধিতে উত্তমের যোগাযোগ ঘটিতেছিল না।

আর একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান; ৪ বৎসরের মধ্যেই ডাক্তারির শেষ-পরীক্ষা য়াছে—পাশ যে হইবে তাহা একরূপ স্থিরনিশ্চয় তবুও তাহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—কেননা নিজের ভাগ্য তাহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইবে; ইহাতে বাধাবিঘ্ন বিস্তর।

হাসির মাতার তাই ইচ্ছা ধনীপুত্র বিজনকুমারকেই জামাতা করেন। পুত্র সুরেনের সে হৃদয়বন্ধু; সেই তাহাকে প্রথমে এখানে আনে। বিজনকুমার দেখিতে ভাল, কথাবার্ত্তাতেও বিনয়ী, আর হাসির পিতার দিকের একটা কি দূর-সম্পর্কের দাবীতে কাকিমা-সম্বোধনে যখন-তখন কাছে আসিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

শরৎকুমারও তাঁহাদের অনুগত, ছেলে-বেলা হইতেই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু পড়াশুনার চাপে অনেকদিন হইতেই সে বড় বিব্রত; সুতরাং তাহার অবসর কম। তথাপি সে এখানে একেবারে যে আসে না এমন নহে, কিন্তু যাহার টানে আসে তাহাকে সে প্রায়ই কর্ত্তার ঘরে দেখিতে পায়, সেই জন্যই বিশেষতঃ অন্তঃপুরে তাহাকে আর বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে অধিক ইচ্ছা সেইখানেই প্রায় সফলতায় বিলম্ব দেখা যায়। তাই রক্ষা—নহিলে উপন্যাসলেখকের বড় দায় হইয়া উঠিত। বিজনকুমারের সহিত হাসির বিবাহেও একটি বিষম বাধা ঘটিয়াছে। বরপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কোনই প্রস্তাব আসিতেছে না। তাহার বাপের ইচ্ছা বি-এটা পাশ করিলেই তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন আর যতদিন না পাশ করে ততদিন তাহার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু বিজনকুমার কাকিমার কাছে ঘরের অনেক কথা বলিলেও একথাটা চাপিয়া গিয়াছে। হাসির মাতা ভাবেন বিজনকুমারের ত এদিকে টান দেখিতেছি, লজ্জায় সম্ভবতঃ সে এবিষয়ে আপনা হইতে বাপকে কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু ছেলে যখন ভাল, সর্ব্বতোভাবে মনোমত, তখন গর্ব্ব করিয়া তাহাদের প্রস্তাবের জন্য বসিয়া থাকাটা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। বড়মানুষের ছেলে, কাল গুনিব তাহার বিবাহ হইয়া গেছে। তিনি সেইজন্য কর্ত্তাকে ক্রমাগত তাড়া দেন যে, "চেনাশুনা ঘর, বরের বাপের সঙ্গে তোমার একটু সম্পর্কও আছে; তুমিই আপনা হইতে কথাটা ওঠাও।"

কর্ত্তা ফিলজফার লোক, অতএব অলস-প্রকৃতি, কোনো কাজে তাঁহাকে ভিড়ান বড় সহজ নহে। যতক্ষণ তিনি অন্যকাজ করিবেন ততক্ষণ তাঁহার দর্শনতত্ত্ব লেখায় ব্যাঘাত ঘটিবে। তাঁহার মতে মানুষের যাহা দরকার তাহা সহজেই মেলে, তাহার জন্য

অতিরিক্ত প্রয়াস অনাবশ্যক। যদি সহজে বিজনকুমারকে পাওয়া যায় ত ভাল, আর না পাওয়া যায় তাহাও মন্দ নহে, শরৎকুমার ত আয়ত্তের মধ্যেই রহিয়াছে।

এ রকম মনের গঠন বেশ সুখের সন্দেহ নাই, তবে অনেক সময় দুঃখেরও কারণ হইয়া ওঠে। এজন্য সময়-সময় গৃহিণীর নিকট তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই উপভোগের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা বশতঃ গৃহিণীর সকল অনুরোধ, সকল ভারই তিনি যেরূপ বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করেন, সেইরূপই দ্বিধাহীন চিত্তে অন্যের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গৃহিণীর অনুরোধ-পালনের ভারটি চুপে-চুপে বন্ধুবর হেমচন্দ্রের মাথায় চালাইয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ-রহস্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন। গৃহিণী কিন্তু একথা জানেন না, জানিলে সম্ভবতঃ অন্য চেষ্টা দেখিতেন।

কর্ত্তাবাবু একটি অনতিবিস্তৃত গৃহে ছিন্ন কাগজ-বেষ্টনীর মধ্যে, একটি ছোট টেবিলের নিকটে বসিয়া কাগজের পর কাগজে নানা ফিগার আঁকিয়া—জিওমেট্রির সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদ প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বৃত্ত বা লাইন—যাহা জগতের সার-নিদর্শক তাহা বিন্দুর সমষ্টি বই আর কিছু নহে,—ইহাই বিশ্বকোষ, অথচ এই বিন্দুগুলি স্বস্ব-প্রধান; বৃত্তের মধ্যে ইহার প্রভাব অসীম কিন্তু তফাৎ করিয়া লও ইহা বিন্দু-মাত্র; অতএব পরমাত্মাতেই জীবাত্মা এবং জীবাত্মাতেই পরমাত্মার বিকাশ। বহুদিন ধরিয়া এই তত্ত্ব নির্ণয় জন্য তিনি 'ফিগার' আঁকিতেছেন; কিন্তু এই বহুদর্শী জ্ঞানময় আত্মার প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিরূপে বিশ্ব যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করিবেন তাহার কোন মীমাংসা হইতেছে না। আজ তাঁহার মাথায় সেই তত্ত্বের উদয় হইয়াছে। শব্দ-শাস্ত্রের সাহায্যে ওঁ শব্দ দ্বারা বহুকাল ধরিয়া এই সত্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে বটে, এই জ্ঞানে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। জিওমেট্রির ফিগার লেখা কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একখানা নূতন কাগজে মোটা নাগরী অক্ষরে ওঁ শব্দটি বেশ বড় ছাঁদে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ সে বিষয়ের কি হোল?"

বাধা পাইয়া কর্ত্তা বড়ই আহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাগ-প্রকাশের যো নাই, কাগজের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়াই বলিলেন "কোন্ বিষয়ে?"

"ভুলে গেছ নাকি?"

কর্ত্তার অক্ষরের একটা দিক এক ধ্যাবড়া হইয়া পড়িল; তিনি একটু অসন্তোষ স্বরেই বলিলেন—"আঃ ভুলব কেন? তুমি বল না?"

"গিয়েছিলে কি, বিজনের বাপের কাছে?"

এইবার কর্ত্তা অক্ষর হইতে মুখ তুলিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? হেমকে ভার দিয়েছি!"

"হেমকে ভার দিয়েছ?" গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন—"ঠিক কুড়িদারটিই বটে!"

"না—আমাকে সে কথা দিয়েছে—কাজটা হাসিল করে তবে অন্নজল গ্রহণ করবে। তুমি একটুও ভেবোনা—"

"দেখ, মেয়ে বড় হয়ে উঠলো—তোমার—"

কর্ত্তা অধীর হইয়া পড়িলেন, সানুনয়ে বলিলেন—"দেখ গিন্নি—একটা মস্ত প্রমাণ আমার মাথায় এসেছে, লক্ষ্মীটি তুমি এখন—"

"তুমি কি ক্ষেপলে? মেয়ে বড় হয়েছে তার জন্য ভাবনা নেই—কেবল—"

"তোমার দুটি পায়ে পড়ি—"

"দেখ আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব—"

"আঃ জ্বালালে তুমি! আচ্ছা বল কি করতে হবে? বলে ফেলো।"

"তোমার ঐ কাগজগুলো কিন্তু আমি ছিঁড়ে ফেলব।"

কি জানি কথাটা গৃহিণী কার্য্যেই যদি পরিণত করিয়া বসেন। কর্ত্তা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে হাস্যমুখে বলিলেন—"কি করতে হবে বলই না, কোন্ কথাটা কাল দেখি তোমার না শুনি?"

"হ্যাঁ শোন বটে, কিন্তু এক কান থেকে অন্য কানে আর পৌঁছয় না। আর-কিছু তোমার করতে হবেনা, তুমি নিজে গিয়ে বিজনের বাপকে একবার নেমতন্ন করে এস!"

"শুধু-শুধু নিমন্ত্রণ! ক্ষেপলে নাকি?"

"তা শুধু-শুধু কি নিমন্ত্রণ করতে নেই! বাকা পাশ হয়েছে—তাই যেন আহ্লাদ করে খেতে বলছ, আপনার জন ত সে তোমার, এতে আর দোষ কি?"

"তা বেশ তাই হবে। আগে কিন্তু এই লেখাটা শেষ করতে দাও। নইলে যতক্ষণ এটা না শেষ হচ্ছে—ততক্ষণ বেশীক্ষণ ধরে কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়াটা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কর্ত্তা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ফলটা ভাল হইল না; গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "আমি চল্লুম তবে। তুমি যে-রকম জ্বালাচ্ছ কিরোসিনের তেলে জ্ব'লে দেখছি আমাকে ঠাণ্ডা হতে হবে।"

গৃহিণীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কাগজ-পত্র ফেলিয়াও কর্ত্তার উঠিতে হইল। তাড়াতাড়ি তাহাকে ফিরাইয়া তিনি সাদরে বলিলেন—"রাগ করোনা আমার যাদুটি, তোমার চোখে আগুন দেখলেই যে আমার প্রাণে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—"

গৃহিণী যখন বাঁকা-নয়নে চাহিয়া একটু হাসিলেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া কর্ত্তা আবার বলিলেন—"আচ্ছা আমি একটা কথা বলি শুনবে?"

"চিরদিনই ত শুনে আসছি।"

"একেই ত বলে লক্ষ্মীটি! আচ্ছা বিজনকে যদি নাই পাওয়া যায় তাতে এমনি কি ক্ষতি! শরৎ ত আমাদের হাতেই রয়েছে—এমন গুণবান ছেলে আর কোথায় পাবে বল। এমন অল্পবয়সেই ডাক্তারির শেষ-পরীক্ষা দিয়েছে—আর পাশও—"

গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না—"বুঝেছি বুঝেছি—এইজন্যেই তুমি বিজনের বাপের সঙ্গে দেখা করতে চাও না,—এই অভিপ্রায়েই তুমি এতদিন আমাকে ঠকিয়ে আসছ। তোমার ভাল ছেলে তোমার থাক্

—আমি কিন্তু অমন গরীব ছেলেকে মেয়ে দেব না—আমার প্রাণ থাকতে ত নয়ই,—এ ঠিক জেনো।"

গৃহিণী রাগিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা যে ইতিপূর্ব্বেই শরৎকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া একরূপ কথা দিয়াছেন সে কথাটা তাঁহাকে বলিতে কর্ত্তার আর সাহসে কুলাইল না!

(২)

হাসির পিতামাতা নিজেদের ইচ্ছার ভারেই ভারাক্রান্ত করিয়া কন্যার ভাগ্য তৌল করিতে ব্যস্ত। হাসির ইচ্ছারও যে এ তৌলদণ্ডে অন্ততঃ একটুখানিও স্থান হওয়া উচিত একথাটা তাঁহাদের মনেই পড়ে না। উপন্যাসলেখক ছাড়া সাধারণ সকল বাঙ্গালীরই পক্ষে বোধ হয় ইহা বিস্মৃতির বিষয়। আমি কিন্তু অনেকবার হাসির মনের কথাটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। বাস্‌রে মেয়ে কি চাপা! যতই কেন একথা পাড় না, তাহার হাসি দিয়াই সেটাকে সে চাপিয়া ধরে। আজকাল কার মেয়েদের সরলতার অর্থে যদি কেহ ভাবেন যে সে মনের কথাটি সকলের কাছে খুলিয়া ধরিবে তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। হয়ত বা আমিও তাহাকে ভুল বুঝিয়াছি—হয়ত বা তাহার ভিতরে প্রেমের আঁচড় এখনো পড়ে নাই, নয়ত বা নিজের মনের গোপন ভাব নিজেই সে বোঝে না—বুঝিবার অবসর ঘটে নাই। তাহা নহিলে কি এমন সরল ছেলেমানষি হাসিটুকু সর্ব্বদাই তাহার মুখে ফুটিয়া থাকিত! কে জানে?

সে যে কাঁদিতে জানে, সেইদিন কিন্তু জানিতে পারিয়াছি। তখন সে পিতার যাইতেছিল, মাতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনিয়া দেখে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। —"অমন গরীব ছেলেকে কখ্খনো দেবো না!" শরৎকুমার মাতার অবজ্ঞাভাজন! ছি ছি! সজোরে মাথায় যেন লৌহদণ্ডের আঘাত বা বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপিতে লাগিল, কেহ দেখিবার পূ সে নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় লুটা পড়িল। * * *

সেদিন তাহার সঙ্গে যাইবার দিন সেতারের পুরাতন গৎগুলা সে অভ্যাস ক বসিল। মা একবার এঘরে আসিয়া তা বাজাইতে দেখিয়া আর ডাকিলেন না, নি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দাসী আ বিজুলি-বাতির কলটা টিপিয়া দিয়া স বাতি জ্বালিয়া গেল। হাসি অন্য সেতারে ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল,—বি বাজনাটাকে সে আজ কিছুতেই সুরে ঠি করিতে পারিল না। গৎগুলা সুরে তা কেবলি বেসুরা-বেতালা বাজিতে লাগি সেতারটার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবা হইয়া হাসি একটুখানি বিরক্তির হাসি হাসি তাহার পর উঠিয়া পাশের গাড়ীবারান্দ গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের আস্তাবলের দি হইতে একটা আনন্দসঙ্গীতের হিল্লোল কা মধ্য দিয়া তাহার প্রাণে গিয়া পৌঁছিল।

পূর্ণিমার ভরা চাঁদখানা আকাশের এক প্রান্তে উঠিয়া সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ভরিয়া দিয়াছিল। বাগানের বকুল গাছ ঝাউগাছ ও আমগাছের ছিদ্রের মধ্যে

...আলোক-অন্ধকারে ভেদ ছিল না। ...টা কোকিল আমগাছের ডালে বসিয়া ...র আগমন-গীতিতে সন্ধ্যাকে আহ্বান ...তেছিল। আর হাস্‌নুহানার সুগন্ধ—...য়ানীর হৃদয়মথিত আনন্দসঙ্গীতের সহিত ...য়া পূর্ণিমার আলোকময়ী রজনীকে সার্থক ...য়া তুলিয়াছিল।

...জোয়ানী হাসিদের সহিসের বোন; ...স ২০ বৎসর; দুই চারিদিনের মধ্যেই ...হার বিবাহ হইবে। এতদিন সে ভাইয়ের ...কটেই আছে,—এইবার নিজের ঘর করিতে ...বে। সে চুলার উপরে হাঁড়ি চাপাইয়া ...ঠে কাঠ দিতে-দিতে গান ধরিয়াছিল—...ইয়া পরদেশে, পরসিনো,—ধৈরয কৈসে ...ক মৈ।"

...বিরহের গানটা মিলন-সঙ্গীতের ন্যায়ই ...হার কণ্ঠ হইতে আনন্দ ধ্বনিত করিতে-...ল। হাসি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া—আর সকল ...ী ভুলিয়া গিয়া লুব্ধকর্ণ পাতিয়া গানটি ...নিতে লাগিল; সেই সঙ্গীতের আনন্দস্পর্শ ...ন্ত-সমীরের ন্যায় তাহাকে পুলকিত করিয়া ...লিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল ...হাসি?"

হাসি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া ...লিল—"শর-দা—তুমি?"

"একটা সুখবর দিতে এসেছি!"

"সুখবর! বল বল?"

"কি দেবে আগে বল?"

"কি চাও তুমি?"

"না কিছু না।—আমি পাশ হয়েছি।"

হাসি আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"পাশ হয়েছ! কি মজা! বাবাকে বলেছ?"

"না এখনো বলিনি—তবে তিনি জানেন। গেজেটে বার হবার আগেই কাল এ খবর পেয়েই তাঁকে জানিয়েছি।"

"আমা'কে বল্লে না কেন—কাল?"

শরৎ স্ত্রীলোকের মতই অপ্রতিভ-ভাবে একটু মৃদুমধুর হাসিয়া উত্তর করিল—"কাল ত তোমাকে সে ঘরে দেখলুম না—আর তোমার বাবার সঙ্গে অন্য কথাও একটু ছিল।"

"আচ্ছা বেশ বেশ! কিন্তু মাকে বলেছ?"

"না এখনো বলা হয়নি।"

"তবে আমি যাই—এখনি খবরটা দিয়ে আসি।"

"না একটু দাঁড়াও—আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"আমি বিলাত যাচ্ছি!"

"কবে?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যেই, জাহাজ ঠিক হয়ে গেছে।"

"এত শীঘ্র?"

"দেরী করে লাভ কি? যত শীঘ্র গরীব নামটা ঘোচে সেই ত মঙ্গল।"

বিকালের ঘটনাটা সে এতক্ষণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল শরতের কথায় তাহা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ কি তবে কোন-রকমে মায়ের মনের ভাবটা টের পাইয়াছে নাকি! লজ্জায় তাহার হাসি মুখখানি মলিন বিবর্ণ হইয়া পড়িল। আপনা হইতে চোখ দুটি আনত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখিল—দেয়ালের কোণে যে একটি ঘাসের ফুল অন্যের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া ফুটিয়া ছিল, শরৎ সেটিকে আবিষ্কারপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া টবের ফার্ণের পাতার সহিত বাঁধিতেছে; বন্ধন-রজ্জু তাহার গলার ছিন্ন উপবীত-সূত্র।

তোড়া বাঁধা হইলে শরৎ হাসির দিকে সাগ্রহে চাহিল। ইচ্ছা, তোড়াটি তাহাকে উপহার দেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে, বলি বলি করিয়া আর মুখ ফোটে না; ইতিমধ্যে হাসি ফুলটি অধিকার করিয়া লইয়া বলিল—"এস শর-দা—তোমাকে পরিয়ে দি।"

শরতের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। হাসি নিজের কাপড়ের একটা পিন খুলিয়া লইয়া তাহার কোটে ফুলটি আটকাইতে আটকাইতে বলিল—"কবে ফিরবে শর-দা?"

"জানিনা। সম্ভবতঃ বছর তিনেক পরে!"

"চিঠি লিখবে?"

"যদি বল।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"তবে লিখব।"

"লিখবে?"

"লিখব।"

"তিনসত্যি?"

"হ্যাঁগো হ্যাঁ।"

ফুল পরাইয়া হাসি হাত সরাইয়া লইয়া বলিল "শর-দা গান শুনছ? কেমন লাগছে!" জোয়ানীর আকাশস্পর্শী বিরহসঙ্গীত মৃদু কোমলতর সুরে তখন নামিয়া পড়িয়াছিল।

শরৎ সে কথার উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এখনি যেতে হবে-হাসি।"

"এখনি কেন যাবে? আর ত 'পাদ পড়া পড়তে হবে না তোমার। দেখ শর-দা কেমন চাঁদ উঠেছে?"

"একটি কথা বলব?"

"বল না শর-দা!—"

"তুমি চাঁদের চেয়েও সুন্দর।"

"কি যে বল তুমি!"

"বলবার অধিকার পেয়েছি হাসি তোমার বাবা বলেছেন, তাঁর আপত্তি নেই"

"কিসে?"

"বুঝতে পারছ না হাসি?"

হাসির এবার লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু মায়ের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

শরৎ বলিল—"কিন্তু তুমি বল হাসি!"

"কি বলব?"

"তোমার ইচ্ছা আছে কি না?"

"কেন বাবা ত বলেচেন!"

"বাবা ত তোমার মনের কথা বলেন নি; তুমি বল হাসি!"

হাসি চুপ করিয়া রহিল। শরৎ আগ্রহভরে তাহার হাত-দুখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহাতে তাহার সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া বলিল—"বল হাসি, তুমি বল, আকাশের ঐ আলোভরা চাঁদের দিকে চেয়ে বল তুমি—তোমার ইচ্ছা আছে, বল বল; এস আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তে দুজনের কাছে দুজনে শপথ করে—বলি—"

হাসি শরতের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত-দুখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া বলিল—"না, শর-দা।"

শরতের উচ্ছ্বাস-আবেগময় সুখস্বপ্ন কোথা

...র ধ্বনিতে সহসা যেন ভাঙ্গিয়া গেল! ...চাহিতে নিষ্ঠুর দেবতার নিকট একি ...ঘাতী গরল লাভ করিল সে! শরৎ ...র ন্যায় কাতরকণ্ঠে কহিল—"বলবে ...?"

"না।"

"কেন হাসি?"

"জানিনা।"

শরৎ বুঝিল, ইহা হাসির সবিনয় ...কার-বাক্য।

তাহার যেন সমস্ত শক্তি অবসিত হইল; ...তিকষ্টে সে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল—...শ হাসি! বিদায় তবে,—আর দেখা ...কি না জানিনা।"

শরৎ চলিয়া গেল। জোয়ানীর গান ...ন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; পূর্ণিমার স্বচ্ছ আলোক একখণ্ড কালো মেঘের মধ্যে সহসা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আর হাসির প্রফুল্ল হাসিখানি তাহার মনের দারুণ অন্ধকারের মধ্যে অতি অস্বাভাবিকভাবে মিলাইয়া পড়িয়াছে। যখন পরমুহূর্ত্তে সে পুনরায় হাসিবে—তখন কি পূর্ব্বের সরল স্বাভাবিক আনন্দদীপ্তিতেই সে হাসি ফুটিয়া উঠিবে? কে জানে!

শরৎ চলিয়া গেল। হাসি গাড়ী-বারাণ্ডার থামে ভর দিয়া মূর্ত্তিমতী বেদনার ন্যায় শূন্য কাতর দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় একজন কে অপরিচিত পথিক মার্জ্জিত সুকণ্ঠে তান ছাড়িয়া গাইয়া গেল—

"মনে রইল ও সই মনের বেদনা!
প্রবাসে যখন যায় গো সে—
তারে বলি বলি আর বলা হোল না!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের গতি

...শিল্প-বাণিজ্যে খুব দ্রুত উন্নতি জর্ম্মানিতে ...মন হইয়াছে আর কোনো দেশের ইতিহাসে ...হার তুলনা মেলেনা। ফরাসির সহিত ...ড়াইর পর হইতেই ইহাদের দৃষ্টি এই ...কে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতি-...শারদগণ তখন দেখিতে পাইলেন যে, ...শের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ...তিসাধন করা প্রয়োজন, নতুবা দেশের ...বয়িক সমস্যা ক্রমশই গুরুতর হইয়া ...ঠিবে। জর্ম্মানির হাটে প্রতিবেশীদের ...দ্রব্য বিক্রয় হইত;—ইংলণ্ড জোগাইত কাপড়, ফ্রান্স জোগাইত রেশম ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

কিন্তু কোনো দেশের পক্ষেই এতাদৃশ অবস্থা ভাল নহে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য আর কাহারো হাতে দিয়া কেবল কৃষি-কর্ম্মে মন দিলে না-হয় সে দেশের কৃষির উন্নতি, না-হয় অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা। জর্ম্মানি যদি তাহার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্য নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে না পারিত, যদি কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের খনিজ পদার্থ ও নানা-

বিধ ক্ষেত্রজাত ফসল হইতে তাহারা নিজেরাই আবশ্যকীয় পণ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ না পাইত তাহা হইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যাকে আজ কি পালন করা সম্ভব হইত? বিগত চল্লিশ বৎসরে জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা জর্ম্মানির আদমসুমারিতে দেখা যায়;—১৮৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল চারি কোটি, আর, ১৯১৪ সালে হইয়াছে সাড়ে ছয় কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যার ভরণপোষণ স্বদেশী শিল্পোদ্ধার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইত না। স্বদেশে জীবিকার্জ্জনের পথ খোলা না থাকিলে দেশবাসীকে অন্যদেশে গিয়া কুলী-মজুরের কাজ করিতে হয়। জর্ম্মানি হইতে ১৮৮৫ সালে ১৭১,০০০ জন জর্ম্মান বিদেশে গিয়াছিল, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র কলকারখানা স্থাপিত হইতে সুরু হইলে এই সংখ্যারও হ্রাস হইল; ১৮৯৮ সালে ২২,৯২১ জন জর্ম্মান বিদেশে গিয়াছিল। ঘরে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান থাকিলে কে স্বদেশ পরিত্যাগ করে? আজ জর্ম্মানি তাহার শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের দ্বারা দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়াছে এবং দেশের বৈষয়িক অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। কেমন করিয়া এত অল্প সময় মধ্যে ইহা সম্ভব হইল ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আরো আশ্চর্য্য এই যে, জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতিবিশারদগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, কৃষি অবহেলা করিয়া শিল্পোন্নতির দিকে ঝোঁক দেওয়া কোনো দেশের পক্ষেই কল্যাণকর নহে। ইঁহারা দেখিলেন ইংলণ্ড একদিকে ঝোঁক দিতে গিয়া, সে দেশের সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্য মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি জাতীয় জীবনের এক বিভাগের অপর বিভাগের একটি যোগ রক্ষা না অনর্থের কারণ ঘটে। জর্ম্মানি সহরে কলকারখানা বসাইয়াছে, রাইন্ নদীর কূলে দেখিতে দেখিতে শিল্প ও বাণি নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান ও বহু আয়ো স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু কৃষককে গ্রাম হই টানিয়া আনে নাই। সেইজন্যই কৃষি শি কাঁচামাল জোগাইয়াছে আর শিল্প কৃ লাভের অঙ্ক দেখাইয়া উৎসাহিত করিয়াছে এই দু'য়ের যোগেই জর্ম্মানির আর্থিক উন্ন এত দ্রুত এবং সম্পূর্ণ আকার ধারণ করি পারিয়াছে।

অবশ্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন ইহা কখন সম্ভব হইত না। য়ুরোপের আর কোনে রাষ্ট্র কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিবা জন্য এত যত্ন লয় নাই। তরুণ শিল্পে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ১৮৭৯ সা জর্ম্মানি অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করি তারপর পাছে কোনো এক বিশেষ দি দৃষ্টি দিতে গিয়া অপর কোনো অঙ্গে পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে সেই দিকে জর্ম্মা অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রি ফন্ বিউলোর বই (Imperial Germany —Prince von Bulow) হইতে এক উদ্ধৃত করিতেছি।

We had to proceed like a clever doctor, who takes care to maintain all the parts and functions of

e body in a strong and healthy ndition and who takes measures good time if he sees that e excessive development of one gle organ weakens the others— র্থাৎ শরীরের ভিতর-বাহির সকল যন্ত্রের ্য ভাল রাখা এবং কোনো বিশেষ অঙ্গের াভাবিক পরিণতি দ্বারা অপর অঙ্গ দুর্ব্বল লে সময়-মত তাহার প্রতিকার করা যেমন চক্ষণ চিকিৎসকের কাজ, আমাদেরও মনি দেখিয়া-শুনিয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া লিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে র্ম্মানির হাটে-বাজারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের া-দ্রব্য বিক্রয় হইত। অপর দেশে াঠানো দূরে থাকুক জার্ম্মানি তাহার জের প্রয়োজনই মিটাইতে পারিত না। কিন্তু আজ পৃথিবীর হাটে-বাজারে জার্ম্মান ণ্য আর সকলকে হার মানাইয়াছে; লণ্ডের নিকট হইতে সে যেমন খরিদ রে আবার তাহার কাছে জর্ম্মানির প্রস্তুত নিষ-পত্তর বিক্রয় করিয়া থাকে। হির্বাণিজ্যের হিসাবে জার্ম্মানি আজ থিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ংলণ্ডের বর্হিবাণিজ্যের পরিমাণ পঁচিশ হাজার লিয়ন্ মার্ক (২০ মার্ক = ১৫৲) আর র্ম্মানির উনিশ হাজার।

ইংলণ্ড একদিন মনে করিয়াছিল ল্যাঙ্কেশায়ারের বস্ত্র না হইলে পৃথিবীর লজ্জা দূর হইবে না। কিন্তু সে স্বপ্ন সত্য হইল না। র্ম্মানির তুলা নাই, তবু সে তুলা আমদানী করিয়া কাপড়ের মিল বসাইল। ১৮৬৪খৃষ্টাব্দে র্ম্মানি ২২০,০০০ মণ তুলা খরিদ করিয়া কাপড় বোনে এবং ১৯০৪ সালে আমদানী তুলার পরিমাণ হইল ১০,২০০,০০০ মণ। ১৮৮৩ সালে মিলের সূতা ও কাপড় রপ্তানি করিল;—তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল ৩, ৬০০, ০০০ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯০৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ডে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অবশ্য এখনও জর্ম্মানির মিল ল্যাঙ্কেশায়ারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ১৯১৩ সালে জর্ম্মানি ইংলণ্ড হইতে ১২,৮১৬,৮৬৭ পাউণ্ড মূল্যের সূতার ও পশমের কাপড় খরিদ করিয়াছে;—কিন্তু, স্যাক্সনির উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি জর্ম্মানি ইংলণ্ডের কাছে বিক্রয় করিয়াছে ১০, ১৩৩, ৭৯২ পাউণ্ড মূল্যের।

অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। ইহা স্মরণ রাখিলেই হইল যে জর্ম্মানি এখন নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্য-দ্রব্যের নিমিত্ত অপর কোনো দেশের দিকে তাকাইয়া থাকেনা। কারখানায় যে কাঁচা মালের আবশ্যক তাহা যতদূর সম্ভব দেশের খণি হইতে, বন হইতে ও উন্নত কৃষি-প্রণালীর সাহায্যে স্বদেশের মাটি হইতে জর্ম্মানি সংগ্রহ করিয়া লয়। তারপর, পৃথিবীর চারিদিক হইতেও কম কাঁচামাল জর্ম্মানি খরিদ করেনা। ১৯১১ সালে কারখানার প্রয়োজনার্থ ৫, ৩৯৬ মিলিয়ন্ মার্ক মূল্যের (কুড়ি মার্ক পনর টাকা) কাঁচামাল জর্ম্মানি খরিদ করিয়া ৫, ৪৬০ মিলিয়ন্ মার্ক মূল্যের পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে জর্ম্মানির সফলতার কারণ কি? প্রথমতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে

কলকারখানা প্রস্তুত করিতে এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রের বহু সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে যে সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল জর্ম্মানিকে তাহা করিতে হয় নাই; এই কারণে জর্ম্মানির কিছু সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আসল কথা, জর্ম্মানিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে, আর কোনো দেশে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, জর্ম্মান কারখানার মজুর ইংলণ্ডের মজুর অপেক্ষা শিক্ষিত। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতে পারে এইরূপ শিক্ষা পায় বলিয়া ইহাদের কাছ হইতে পুরোপুরি কাজও পাওয়া যায়। রসায়ণ-শাস্ত্রের ব্যবহার বল, কলকব্জা নির্ম্মাণ বল, উন্নত কৃষি-প্রণালী বল, সমস্ত বিষয়ে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার জন্য জর্ম্মান রাষ্ট্র সচেষ্ট। জার্ম্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক বিভাগের সহিত দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; শিল্প-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য জর্ম্মান পণ্ডিতগণ ছাত্রদের লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন্ এবং শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জর্ম্মানির জাতীয় শিল্পোন্নতির গাঁথুনি এমন পাকা।

তারপর রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ত আর অন্ত নেই। ১৮৭৯ সালে অবাধ বাণিজ্য-নীতি পরিহার করা হইল; ইহার ফলে তরুণ শিল্প চারিদিকের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাড়িবার সুযোগ পাইল, সন্দেহ নাই। এইরূপে, যে জার্ম্মানি কেবল চাষবাসের উপর নির্ভর করিত, যে দেশের হাটে-বাজারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তৈজসপত্র পুরোপুরি দখল করিয়া বসিয়াছিল, জার্ম্মানি নিজের দেশে নিজের লোক খাটি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লা আর স্বদেশের হাট-বাজার হইতে নানা বিদেশী পণ্য বিদায় দিয়াই ক্ষান্ত রহিল অধিকন্তু বিদেশীয় বাজারে জার্ম্মানি মালপত্তর পাঠাইয়া বিপুল বাণিজ্যের সূত্র করিল।

তখন য়ুরোপের মধ্যে রুসিয়ার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্ম্মানি মনে করিল ইহার বিপুল জনসং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারাই জোগাই কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের যে জার্ম্মানিতে কাজ করিয়াছে, তাহার রুসিয়ায়ও আসিয়া পৌছিল।

রুসিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষে ন্যায় বিদেশী পণ্য হজম করিবার ক্ষম তাহারও আছে; সেইজন্যই এই দুই দেশে হাট-বাজার দখল করিবার জন্য শিল্পপ্রধা জাতিসমূহের মধ্যে এত চেষ্টা।

রুসিয়ার ধন-সম্পদের সীমা নাই, বিস্তৃত জমি, অসংখ্যক খনি, বিপুল জন সংখ্যা সমস্তই আছে, নাই জর্ম্মানির মত রাষ্ট্রব্যবস্থা, নাই ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশো ন্নতির জন্য আগ্রহ।

কিন্তু তবুও য়ুরোপীয় শিল্প সভ্যতার ডাকে ইহাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। জার্ম্মানির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রুসিয়াও কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইল, দু-পাঁচটা করিয়া খনি খনন করা সুরু হইল, আর, শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য রুস ছাত্র জার্ম্মানির ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করিল।

তারপর, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শিল্প-জগতের নায়কেরা মনে করিত, রুসিয়া তাহাকে চিরকাল তাহার বন হইতে কাঠ জোগাইবে, খনি হইতে কয়লা, লোহা তুলিতে দিবে আর তাহাদের প্রয়োজন হইলে মাঠ হইতে কিছু ফসলও আমদানি করিবে। ইহার পরিবর্ত্তে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে কাপড়, ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহারা জোগাইবে। বস্তুত ইহাই প্রকৃত অবস্থা ছিল, কিন্তু জার্ম্মানি যেমন ম্যান্‌চেষ্টারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কাপড়ের কল বসাইল, রুসিয়াও বস্ত্রাদির জন্য ম্যান্‌চেষ্টার ও স্বাক্‌সনির উপর নির্ভর না করিয়া স্বদেশে কারখানা স্থাপনের উদ্যোগী হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমস্ত রুসিয়ায় ৪,৩৩০ কারখানা ছিল এবং যে পরিমাণ মাল প্রস্তুত হইত তাহার মূল্য ৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু, বিশ বৎসর পরে মোট কারখানা হইল ৩৫,১৬০ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৩১,০০০,০০০পাউণ্ড।

রুসিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ লক্ষণ এই দেখা গিয়াছে যে, গত শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের ও জার্ম্মানির ধনে রুসিয়ার অনেক কারখানা স্থাপিত ও পরিচালিত। রুসিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাই হউক না, বিদেশী মূলধনের গতিবিধিকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে। সেইজন্যই ফিন্‌ল্যাণ্ডে পশম-বোনার শিল্প জার্ম্মানির ও বেল-জিয়মের কলওয়ালারা স্থাপন করিয়াছে; উৎকৃষ্ট সূতা-কাটার শিল্প ইংরেজ কলওয়ালাদের হাতে; খনি হইতে তেল, কয়লা, তুলিবার মূলধন তাহাও আসিয়াছে বিদেশ হইতে; ইহা ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় ছিল না। বিদেশী মাল-পত্তরের উপর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য রুসিয়ার গভর্ণমেণ্ট কম চেষ্টা করে নাই। কিন্তু, এমন একটি বাধার সৃষ্টি করিলেই ত হয় না; বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য চাই—যেমন সাহায্য জার্ম্মানি দেয়।

আজ রুসিয়ায় বাহিরের জিনিষ অপেক্ষাকৃত কম আমদানী হয়। একসময় ইংলণ্ড হইতে প্রচুর পণ্যদ্রব্য রুসিয়া খরিদ করিত, আজ সে-দেশ হইতে কলকব্জা ও কয়লা ব্যতীত আর বিশেষ-কিছু আমদানী করে না। কলকব্জাও কিছু-কিছু স্বদেশেই নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। চাষ করিবার উৎকৃষ্ট লোহার লাঙ্গল উরল অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানিও হইতেছে। খনি হইতে লোহা উঠিতে থাকিলে কলকব্জার জন্যও রুসিয়াকে অন্য দেশের দিকে তাকাইতে হইবে না। অবশ্য এখনও রুসিয়ার আমদানী রপ্তানির তুলনায় চৌদ্দগুণ হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে তাহারা নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বদেশেই প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগী। আজ তাহাকে একথা বলা চলে না, তুমি চাষ-বাস কর, ফসল উৎপন্ন কর, আর কাঁচামাল আমাদের দাও। আমরা তোমার জামা-কাপড় ঔষধ-পত্র, কলকব্জা ইত্যাদি যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করিব। কেন্দ্রীভূত শিল্প ও বাণিজ্যের দিন চলিয়া গিয়াছে;—এমন কোনো বৈষয়িক নীতি নাই যাহা অনুসরণ করিলে সে দিন ফিরিয়া আসিবে। আর, এই

decentralisation of Industries এর দিনে চিরকাল কেবল কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পজাত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য পৃথিবীর হাটে-বাটে বিক্রয় করিবে, কোনো জাতি এমন আশা করিতে পারে না। যাহারা শিল্প-বাণিজ্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিল আজ তাহাদের দৃষ্টান্তে সকল জাতিই সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপে প্রত্যেক জাতি তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াই ত ইংলণ্ড ও জর্ম্মানি এসিয়ার হাট দখল করিবার জন্য জাহাজ বোঝাই করিতে সুরু করিল এবং এই জাহাজ রক্ষার জন্যই প্রস্তুত হইল রণতরী।

কিন্তু এসিয়াও ত একেবারে নিষ্ক্রিয় নাই। এখানেও স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে এবং য়ুরোপীয় পণ্যদ্রব্যের দাসত্ব-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য এসিয়ার প্রত্যেক সভ্য জাতিই যতদূর সম্ভব আয়োজন করিতেছে।

বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মডেল

বাংলায় মডেলের প্রতিশব্দ যে কি হওয়া উচিত আমরা তা খুঁজে পাইনা। অনেকে 'মডেল' শব্দের বাংলা করেছেন "আদর্শ;"



মিসেস নাইটের আসল চেহারা

কিন্তু শিল্পীর মডেল বল্লে যা বোঝায় তা ঐ আদর্শ কথাটির মধ্যে পুরোপুরি পাওয়া শক্ত। ঐ জিনিষটার চলন আমাদের মধ্যে ছিল না বলেই বোধ হয় ওর উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় না। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতিতে দেখতে পাই যে, বিরহীরা পরিকল্পনার সাহায্যে সুদূর প্রবাসে বসে পরস্পর পরস্পরের আলেখ্য চিত্র করে' তাঁদের বিরহ বেদনা দূর করবার চেষ্টা করচেন বটে, কিন্তু সাম্‌নে মডেলকে বসিয়ে ছবি-আঁকার কথা কোথাও বড় একটা পাওয়া যায়না। ইউরোপীয় শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁদের শিল্পের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা মডেলের সন্ধান পেয়েছি। ইউরোপীয়দের মতে চিত্রকরের ভাগ্যে যদি মডেলের মত মডেল অর্থাৎ ঠিক যে-ভাবের চিত্র আঁকা দরকার সেই



"দো-মনা" ছবিতে মিসেস নাইট

ভাবের মানুষটি মেলে তাহলে তাঁর আর ভাল ছবির পরিকল্পনা করতে বড়-বেশী ভাবতে হয় না,—মডেলের গুণেই ছবি দিব্যি উৎরে যায়। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা তাই মডেলের মর্ম্ম ভালরূপই বোঝেন। তাঁরা বলেন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য থাকলেই যে ভাল মডেল হয় এমন নয়, অন্তরের রূপ-গুণ থাকাও দরকার—বিশেষ-করে শিল্প-রসের সহজ অনুভূতিটি। একশোর মধ্যে কুড়িটি এমন যোগ্য মডেল মেলে কিনা সন্দেহ। সত্যই এমন মডেল খুব অল্প আছে, যারা প্রকৃত পক্ষে শিল্পীর হাতের শুভ্র লেখ্য-পটখানিকে সার্থক করে তুলতে পারে।

বিলাতে এক লণ্ডন সহরেই নানান শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন হাজার হাজার লোক আছে, যাদের মডেল হওয়াই জীবিকা-উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়। এদের মধ্যে

কেউ-কেউ খুব ভাল বংশের; আবার কেউ-কেউ সাধারণ লোকের ছেলে বা মডেলেরই ছেলে,—যারা শৈশবে মাতৃমূর্ত্তির মডেলের কোলে থোকার মডেল রূপে চিত্রকরের চিত্রশালায় প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে ক্রমে বেড়ে উঠে, শিল্পীদের সংসর্গে থেকে শেষে ওস্তাদ-মডেলরূপে পরিণত হয়।

এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো চিত্রকরের কোন-একটি বিশেষ ব্যক্তিকে মডেল-

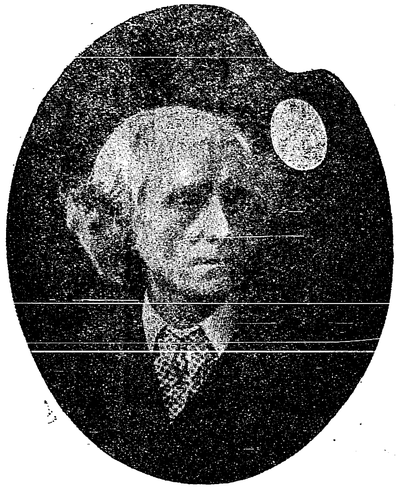

কোনো বিখ্যাত মডেল
যিনি "গ্রেফতার" চিত্রে স্থান পাইয়াছেন

রূপে না পেলে তাঁর মাথা একেবারে খোলেনা—এমন-কি, সেই বিশেষ মডেলের চেয়ে অনেকগুণে দেখতে-শুনতে ভালো বা তাঁর সেই বিশেষ বিষয়টির উপযোগী চেহারার লোক পেলেও তিনি নিজের সেই পুরাতন মডেল না-হলে কাজ করতে পারেন-না।

যাঁরা কিছুকাল ধরে শিল্পীর মডেলরূপে কাজ করেন, তাঁদের দ্বারা জগতে অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিলাতে যদি কোনো অকর্ম্মণ্য বালিকার দেহের মধ্যে কোথাও বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য থাকে তাহলে শিল্পীর চিত্রশালায় অনায়াসেই সে স্থান পায়। যদি কোন বৃদ্ধের বা যুবকের চেহারার মধ্যে দৃঢ়তা, কুটিলতা, সরলতা, ক্রোধ বা এম্নি একটা-কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব থাকে, তাহলে তার আর অন্নচিন্তার বিশেষ ভাবনা থাকেনা।

নট ও নটীদের সঙ্গে মডেলের তফাৎ এই যে, একটি বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পীর আঁকা শেষ না হয় ততক্ষণ মডেলকে একই ভাব ধারণ করে' থাকতে হয়, আর অভিনেতাকে ক্রমাগত একটার-পর একটা ভাব বা ভঙ্গী দেখিয়ে চলতে হয়। মডেল হতে হলে আত্মবিস্মৃত হয়ে চিত্রকরের পরিকল্পনার মধ্যে এম্নি তলিয়ে যাওয়া দরকার যে বোধ হবে, যেন সে চিত্রকরের জন্যে কোন ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই—যেন সে সত্যসত্যই সেই চিত্রবর্ণিত আসল নায়ক বা নায়িকা। উপকথায় আছে কোনো ছেলে ব্যাঙ্ ভাবতে ভাবতে শেষটা সত্যি-সত্যিই ব্যাঙ্ হয়ে পড়েছিল, মডেল হওয়া অনেকটা তাই। এই তন্ময়গত ভাবটি যে মডেলই স্থায়ীভাবে অধিকক্ষণ ঠিক ধরে রাখতে পারে। কোনো মডেল বিলাতের এক ব্যক্তির কাছে গল্প করেছিলেন যে, একবার তাঁকে কোনো চিত্রকরের কাছে মডেল হতে হয়েছিল। সেই ছবির বিষয়



গ্রেফ্‌তার

ল কোনো ভদ্রমহিলা তাঁর সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য এক প্রণয়াভিলাষীর দিকে অবহেলা ঘৃণাভরে দেখচে! এই ভাবটি যাতে ডেলের মুখে বরাবর সজাগ থাকে তার ন্যে শিল্পী ক্রমাগতই বল্‌তে লাগলেন— ও লোকটার দিকে ঘৃণার সঙ্গে চাওয়া ন? ও তোমার ঘৃণারও যোগ্য নয়!" ই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সত্যই মডেলের ক সিঁটকে উঠতে লাগল এবং চোখের তা নেমে পড়ল এবং তিনি যে মডেল ত্র, আসল সেই মহিলা নন, একেবারে ভুলে গেলেন।

মডেলদের সম্বন্ধে নানান মজার গল্প প্রচলিত আছে। একটা গল্প শোনা যায়, একজন শিল্পী যুদ্ধ-বিগ্রহের ছবি আঁক্‌তে ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁর সমঝদারেরা বলতেন যে, তাঁর হাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভীষণ ও কঠোর ভাব ভালো ফোটেনা। তিনি কিন্তু নিজে কথাটা মানতেন না, তাই যুদ্ধের এই ভীষণ ও কঠোর ভাব নিজের কোনো চিত্রে ফোটাবেন বলে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসলেন। তিনি স্থির করলেন, একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছবি আঁকবেন। কিন্তু তার জন্যে উপযুক্ত মডেল তো পাওয়া চাই? অনেক সন্ধানের পর

তিনি এমন দুজন লোকের খবর পেলেন যারা কোনো কারণে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে পূর্ব্বেই একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে বলে স্থির করেছিল। শিল্পী সুযোগ বুঝে তাদেরই মডেল করবেন মনে-মনে স্থির করলেন এবং তাঁর ছবি আঁকবার ঘরে সব সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকে, উভয়কে একই কালে চুপি-চুপি নিমন্ত্রণ করলেন। যথা-



মিস্ গ্যারাওয়ের আসল চেহারা

সময়ে তারা সশস্ত্র সজ্জায় দুজনে দুই বিপরীত দরজা দিয়ে তাঁর চিত্রশালায় প্রবেশ করেই সহসা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে রাগে জ্বলে উঠল—তারপর একেবারে দ্বিরুক্তি না করেই বাঘের মত দুজনেই দুজনকে ভীষণ আক্রমণ করলে। একদিকে এদের ভীষণ তরবারী-যুদ্ধ চলতে লাগল, আর-একদিকে শিল্পীও তাই দেখে দেখে নিজের ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। আধঘণ্টার পর দুজনেই দুজনের অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে মাটিতে যখন পড়ে গেল, তখন শিল্পীর ছবিও শেষ হয়ে গেল এবং তিনি কি গর্হিত কাজ করেছেন তাও বুঝতে পারলেন।

মোগল-আমলে আমাদের দেশে কোনো লোকের প্রতিকৃতি আঁকতে হ'লে শিল্পীরা সাধারণতঃ মন থেকে ভেবে ভেবে আঁকতেন। রাজা-বাদশাহের ছবি আঁকতে হলে রাজ-দরবারে বসে বসে আগে তাঁর ভালো করে রাজা-বাদশাহের চেহারা মনে নিতেন; তারপর চিত্রশালায় গিয়ে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ছবি আঁকতেন। কিন্তু বেগম বা রাণী-সাহেবাদের চেহারা আঁকতে হলেই শিল্পীকে বিষম মুস্কিলে পড়তে হ'তো। মোগলের অসূর্য্যম্পশ্যা বেগম দ্বিতলের ঝরোখা খুলে অল্পক্ষণের জন্যে এসে দাঁড়াতেন; নীচে থালায় জল বা আয়না রাখা হ'তো, শিল্পী মাথা হেঁট করে নীচে থেকে বেগমের প্রতিবিম্বটি দেখবার সুযোগ পেতেন। সেই প্রতিবিম্ব মানস-দর্পনে এঁকে নিয়ে তাকে আবার চিত্রপটে ফলাতে হ'তো। সেইজন্যে মোগল-আমলের সব চিত্রেই রাণীদের ছবিগুলি একই ধরণের দেখতে হয়ে থাকে। অজন্তার ভিত্তি-চিত্রে যদিও এক-একটি বিশেষ ধরণের মানুষের আকৃতি দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি কোনো ব্যক্তিকে মডেল রূপে বসিয়ে যে হুবহু আঁকা হয়েছিল তা জোর করে বলা যায়না।

ইউরোপে অনেক সময় শিল্পীর আত্মীয়ের ভিতর কেউ-কেউ মডেল হয়ে দাঁড়ান। ইউরোপীয় চিত্র ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া

ক সময় এই মডেলের উপরই নির্ভর র। লর্ড লেটন্ তাঁর চিত্রে বিলাতের নকার অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে মডেল প বসিয়েছিলেন। তিনি মডেলদের স্পষ্টই তেন যে, 'তোমাদের উপরই আমার যা-ছু আশা-ভরসা, ছবি যদি ওৎরায় তা হলে নবো সে তোমাদেরই গুণে।' লেডি ট্লার তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র-লিতে আসল সৈনিক পুরুষদের এনে মডেল রতেন। কিন্তু ক্যাটন্ উড্‌ভিল্ কতকটা াচ্য শিল্পীদের মতই মডেল না নিয়েও ড় বড় যুদ্ধের ছবি এঁকে গেছেন। অথচ ার ছবিতে যুদ্ধের খুঁটিনাটি যা-কিছু খবার, তার কিছুই বাদ পড়তনা। উড্‌ভিলের মত খালি পরিকল্পনার সাহায্যে ার-কোন বিলাতী শিল্পীকে ছবি আঁকতে খা যায় না। মডেল দেখে এঁকে এঁকে নেক সময় শিল্পীদের এমন অভ্যাস হয়ে য় যে, কখনো কখনো মডেল সাম্‌নে না-রেখেও মডেলকে মনে-মনে ভেবেই তাঁরা বির বিষয়টি আঁকতে পারেন। কিন্তু বড়ই শ্চর্য্য যে, তাঁরা মডেলকে না ভেবে াধীন ভাবে চিত্রটির মোট রূপটি কেবারেই ভাবতে পারেন না।

আমরা শুনেচি বিলাতের কোনো বিখ্যাত চিত্রকর (নাম বলবো না) ভারতবর্ষের ানান তীর্থস্থান ভ্রমণ করে যখন দেশে রেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে বসে তাঁর াঁকা কতকগুলি আদ্‌রা (Sketch) বলম্বন করে কাশীর এক সাধু-সন্ন্যাসীর বি আঁকবেন ঠিক করেন এবং তজ্জন্য লাত-প্রবাসী কোন ভারতবর্ষীয় ছাত্রকে মডেলরূপে আহ্বান করেন। মডেলের সাহায্যে অবশ্য ছবিটি সম্পন্ন হ'ল। তখন কবিবর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ছিলেন। শিল্পী তাঁর কবি-বন্ধুকে নিজের চিত্রশালায় নিয়ে গিয়ে সেই ভারতবর্ষীয় সাধুর ছবিটি দেখালেন। কবি দেখলেন, সবই ঠিক, সেই ভারতবর্ষীয় ছেলেটির চেহারা সাধু-সাজে ছবিটিতে বেশ মানিয়ে গেছে,



"জোয়ান অফ্ আর্ক" চিত্রে
মিস্ গ্যারাওয়ে

কিন্তু মাথার হালফ্যাসানের টেরী-কাটা চুলের কাছটায় ছবির ছন্দপতন হয়েছে। তিনি শিল্পীকে সেই ভ্রমটি দেখিয়া দিলেন। শিল্পী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষীয় মডেলের টেরীটি হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে এলোমেলো করে' দিয়ে, পুনরায় ছবি-সংশোধনের চেষ্টা

করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে আর ঠিক করতে পারলেন না। প্রাচ্য শিল্পী হলে এ বিপদ ঘটত না, কারণ সম্পূর্ণ ছবি তাঁর মনেই থাকত, বাইরের বাধা তাঁকে পেয়ে বসত না। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের আসল তফাৎ।

ছোট ছেলেদের বা যুবকদের মডেল হওয়া একটা বিষম সাজা। একবার একটি ছেলেকে তার মা তাঁর ছবির জন্যে বসতে বলেছিলেন, কিন্তু ছেলেটি খেলাধূলার বয়সে 'হতাশ প্রেমিকে'র ভঙ্গীধারণ করে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে কিছুতেই সম্মত হয়নি।

বিলাতের বিখ্যাত মডেলের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক গ্রেগরি একজন। ৮৬ সাল থেকে গ্রেগরী মডেল হয়ে আসছেন এবং লর্ড লেটন, ফ্রেড বানার্ড, চার্লস গ্রীণ, জে, বি, বার্জ্জেস প্রভৃতি বিস্তর বিখ্যাত শিল্পীর সহায় হয়েছিলেন। স্যার লরেন্স অ্যাল্মা-ট্যাডেমার মডেল ছিলেন—মিস্ ওলিভ্ গ্যারাওয়ে রূপে-গুণে তিনি খুবই বিখ্যাত। তিনি অনেক বড় বড় শিল্পীর কাছে মডেল হয়ে বসতেন এবং সেইজন্যে বেশ দু-পয়সা রোজগারও করেছিলেন। ঠাকুর-মা আঁকতে হলে শিল্পীরা এখনও মিসেস নাইটের তলব করে থাকেন। তিনি আজ ৮৪ বৎসর শিল্পীমহলে মডেলরূপে বসে বসে এ-কাজে এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, একভাবে মডেল হয়ে বসে থাকার যন্ত্রণা তাঁর কাছে কিছুই নয়; এই বৃদ্ধ-বয়সেও অসাধারণ ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি মডে কাজ করতে পারেন।

কখনো কখনো মডেলের চোখ, হাত, ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর একটা কোন-ভালো হলেই শিল্পীরা একরকম করে' চালিয়ে নিয়ে থাকেন। ইউরোপে চিত্রক গুণে অনেক মডেল শিল্পজগতে অমর লাভ করে। ইউরোপে মডেলের দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে চিত্রকরেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকেন, প্রাচ্য শিল্পে তা মোটেই চলে না। প্রাচ্যশিল্পীরা ভাবকে মডেলের সাহায্যে দেখতে চান আপনাদের মানস-পটেই তাঁরা তার স পান এবং এইজন্যেই প্রাচ্যশিল্পীর মনে আঁকবার পূর্ব্বে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

জাপানে শোনা যায়, কাল্পনিক বাঘের চিত্র আঁকার জন্যে কোনো বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন বা ছবি আঁকতেন, তখন নিজের ভাবে নি বিভোর হয়ে যেতেন। একবার তিনি আঁকতে আঁকতে এম্‌নি তন্ময় হয়ে গে ছিলেন যে, কিছুকাল তাঁর মাথা খারাপ গিয়েছিল এবং সর্ব্বদাই নিজেকে বাঘ ম করে লোককে আক্রমণ করতে ছুটতেন। "কল্পনা শিল্পীর মনে সত্যের রূপটি এ ভাবে এনে ধরবে, যে তিনি বাইরের ম কথা ভুলে যাবেন"—এইটেই হ'ল শিল্পী বিষয়ে মহাজনের উক্তি।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

বজ্র-বোধন

অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশাস সুপ্তিহারা;
ফির্‌তেছিল হাওয়ায় ছায়া-মূর্ত্তি-পারা;
নিদাঘ-দিবস হান্‌তেছিল আগুণ-চাবুক
লুপ্ত সারা জগৎ হতে সোয়াস্তি-সুখ।
শুক্‌নো পাতার সকল-এড়া শিথিল সুরে
তেপান্তরের তপ্ত তামার চাতাল ঘুরে—
উঠ্‌তেছিল গুমট্ ঠেলে মৌন মুখে
বিদ্যুতেরি বিত্ত নিয়ে গোপন বুকে—
সাগর-তড়াগ হ্রদের নদের তৃপ্তিহারা—
উষ্ণ নিশাস,—নীরব ছায়া-মূর্ত্তি-পারা।

* * * *

হঠাৎ কখন্ কোন্ গগনের পান্থ হাওয়ার কোন্ ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই অতনু সে কোন্ তারায়?
লক্ষ ব্যথার তপ্ত নিশাস পড়্‌ল হঠাৎ ঐক্যে বাঁধা
জীবন-মরণ-মন্ত্র যেন মন্দ্রমধুর শব্দে গাঁথা!
আকাশ হ'ল ভাঙড় ভোলার নেশায় ঘোলা চোখের মত
ঘোর গুমটের গুম্‌ঘরে আজ ঘুল্‌ঘুলি সে খুল্‌ল শত;
অস্তাচলের সোনার বরণ অঙ্গ হঠাৎ উঠ্‌ল ঘেমে
শিউরে সাগর ঢেউ ঢিমিয়ে থম্‌থমিয়ে রইল থেমে।
তালের সারি পাণ্ডু ছবি কাজল মেঘের মূর্ত্তি দেখে
চম্‌কে উঠে ময়ূর চেঁচায় "কে গো! এ কে? কে গো! এ কে?"
ধায় আকাশের উল্কামুখী হঠাৎ যেন প্রমাদ গণি'
আগুণ-ডোরে শূন্যে দোলে ইন্দ্রাণীরই স্নানের দ্রোণী।
বজ্র-বোধন বাদ্য বাজে হিয়ায় হিয়ায় তড়িৎ চুয়ায়,
গুমট্-ভরা আষাঢ়-সাঁঝের জলদ্-গহন গগন-গুহায়।

* * * *

হ্রদের নদের কুড়িয়ে নিশাস নিশান ওড়ে! নিশান ওড়ে!
লক্ষ হিয়ার মন্যু জাগে প্রলয়-মেঘের মূর্ত্তি ধরে!
আস্‌ছ কে গো বাষ্প-ঘন! বারুদ-মাখা অঙ্গে একা
ঈশান-কোণে দিগ্বারণের হাওদা তোমার যাচ্ছে দ্যাখা;

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

তোমার সাড়ায় বৃংহনেরি বৃহৎ ধ্বনি স্তব্ধ বনে,
সিংহ বারেক গর্জ্জে উঠে গুহায় পশে ত্রস্ত মনে,
ঝঞ্ঝা তোমার চারণ-কবি জগৎ লোটায় পায়ের নীচে,
পায়ের ধূলার তলায় যারা তারাই শুধু অঙ্কুরিছে!
ব্যথার তাপে জন্ম তোমার আস্‌ছ ব্যথায় আসান দিতে
নবীন মেঘের গর্ভাধানে মন্ত্র পড় রুদ্র গীতে।
জীর্ণ যা' তা' পড়ছে ভেঙে জরার ভারে পড়ছে ভেরে
তোমার সাড়া চমক দিয়ে জাগায় অস্ফুট অঙ্কুরেরে।
গর্ব্ব যাদের পর্ব্বে পর্ব্বে সে পর্ব্বতের উড়াও চূড়ায়
বজ্র! কুশাঙ্কুরচ্ছবি! তোমার পরশ পাহাড় গুঁড়ায়।
গ্রীষ্মে জরা দগ্ধ ধরা ভাব্‌ছে যারে চিরস্থায়ী
তোমার সাড়ায় মূর্চ্ছা সে পায়, বজ্র! হে নীলপদ্মশায়ী!

* * * *

তোমার সাড়ায় তৃষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়্‌ল ডানা
কোন্ সে শাখীর ভাঙ্‌ল শাখা তার কথা নেই তুল্‌তে মানা,
তোমার সাড়ায় তরুণ প্রাণের যে বন্যা আজ জলে-স্থলে
ক্ষতির কথা ভুলিয়ে দিতে হাস্‌ছে তারা নানান ছলে।
তোমার সাড়ায় উল্টে গেল শূন্য-শয়ান জলের দ্রোণী
সোহাগ-দ্রোণীর ঝর্ণা-ধারায় আর্দ্র ভুবন দিন রজনী।
লক্ষ ব্যথার প্রসব তুমি সূর্য্যে নিবায় তোমার গাথা
বজ্র! তুমি দর্পহারী, খড়্গ তুমি অভয়-দাতা!
তোমার বোধন গাইছে কবি গাইবে কবি সকল কালে,
জীবন-লোকে বরণ তোমার দীপক রাগে রুদ্র তালে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সোনার পদক

রাত্রি প্রায় নয়টা। সমস্ত দিন অত্যন্ত খাটুনি গিয়াছে। সন্ধ্যার পরও একজন রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া সবেমাত্র আহার সারিয়া ইজি চেয়ারে পড়িয়া ধূমপান করিতেছি, এ সময় বাহিরে কে ডাকাডাকি করি লাগিল। বিরক্তভাবে চাকরকে বলিলা "কে, দেখে আয়। যদি নূতন রোগী

ন ডাক্তারের কাছে যেতে বলে দে। আজ আর বেরুতে পার্‌ব না।"
বেহারা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই য়া আসিয়া বলিল, "হেমেন বাবু।"
শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিলাম, "আনে লো।"
বেহারা যাইবার পূর্ব্বেই হেমেন্দ্র ঘরের য় আসিয়া ঢুকিল; আসিয়া একখানা ারের উপর সে বসিয়া পড়িল।
হেমেন্দ্র একসময় আমার বিশেষ বন্ধু ল। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে তাহার ঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। কাজ-কর্ম্ম ছুই করে না! দিনরাত কোথায় থাকে, করিয়া কাটায়, কেহ জানে না। মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যখন তার টাকার কার। অন্য কোন কারণে সে আর দেখা রিতে আসে না। যখন আসে তখন ায়ই মদ খাইয়া আসে। তাহাকে টাকা ওয়ার অর্থ তাহার সর্ব্বনাশ করা, তাহা বি। তবু না দিয়াও থাকিতে পারি না।
আজও উৎকট গন্ধে বুঝিলাম, সে সুরা-ান করিয়া আসিয়াছে। মনে ভাবিলাম, কা ফুরাইয়াছে! রাত সবে ন'টা। এখন কা চাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, কা চাই বুঝি?"
হেমেন্দ্র কথার উত্তর দিল না। বলিল, আচ্ছা ডাক্তার (হেমেন্দ্র আমায় ডাক্তার লিয়া ডাকিত), বেশী মদ খেলে কি াগৎ অবস্থাতেই লোকে স্বপ্ন দেখে?"
আমি বলিলাম, "কেন, বল দেখি?"
হেমেন্দ্র বলিল, "তামাসা নয়, সত্যি বল। আমার মাথাটা দেখ ত। দব্‌দব্‌ কচ্ছে। ভিতরে যেন আগুন জল্‌ছে। আমি কি পাগল হয়েছি—যা দেখেছি, যা দেখ্‌ছি, তা কি সত্যি?"
"বেশ করে মাথায় খানিক জল ঢেলে এস দেখি। নেশাটা কাটুক তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, স্বপ্ন দেখছ কি জেগে আছ?"
"তুমি কি ভাব্‌ছ এখনও আমার নেশা আছে? তুমি কিসের ডাক্তার? নেশা আমার অনেকক্ষণ ছুটে গেছে। কখন ছুটে গেছে, জান? যখন স্বপ্ন দেখেছি—যখন দেখেছি—ডাক্তার, ডাক্তার, স্বপ্ন না সত্যি? দেখ ত, দেখ ত, আমি এখন কেমন আছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?"
হেমেন্দ্রর এরূপ ভাব পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে বলিয়া যাইতে লাগিল—"মিথ্যে কথা বল্‌ব না, আজ পাঁচ বোতল খেয়েছি। কোথায় ছিলুম, জান?" হেমেন্দ্র একবার দরজার দিকে চাহিল। "মেয়েরা শুন্‌তে পাবে না ত? আশ্চর্য্য হচ্ছ? আগে এ ভয় করতুম না, কিন্তু এখন থেকে করি। আর নাম করেই বা কি হবে? বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। শুনলুম নতুন একজন এসেছে। তার বাড়ী কোনদিন যাইনি। শুনে গেলুম। আর কেউ ছিল না। খুব খাতির করে সে বসালে। কত কথা—মনে নেই, তখন ত আর জ্ঞান ছিল না—নেশার ঘোরে কি বলেছি, কি করেছি, তা জানি না। তারপর—তারপর হঠাৎ মনে হল আমার বুকের উপর একটা কেউটে সাপ যেন ছোবল মারলে। সমস্ত শিরা-উপশিরা-গুলো যেন রিষে চন্‌-চন্‌ করে উঠল! সে

কাছে আসতেই আমার চোখে পড়েছিল তার গলায় সরু সোনার হারে গাঁথা একটা পদক,—তার চারদিকে পানের মত চুণি বসানো। এমনি একগাছা হার যে আমার চির-পরিচিত। এমনি পদক যে সে—আমার স্ত্রী পর্যন্ত! আমিই তাকে দিয়ে ছিলুম—প্রেমের সে এক মস্ত ইতিহাস! ঝুঁকে পড়ে পদকটা হাতে তুলে নিলুম। বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'কুসুম'। আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। ডাক্তার, এই লক্ষ্ণৌ সহরে পতিতাদের মধ্যে বাঙ্গালী ত আগে দেখিনি। এ কি বাঙ্গালী না কি? আমার সঙ্গে ত বাঙ্গলায় কথা কচ্ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, 'সত্যি বল, ভগবানের দোহাই—তুমি কি বাঙ্গালী?' সে হেসে উঠ্‌ল। বোধ হয় ভাব্‌লে বাঙ্গালী বল্‌লে তার আদর আরও বাড়্‌বে, সে বল্লে—'হ্যাঁ, আমি কুসুম।" আমায় যেন কে চাবুক মার্‌লে, এ্যাঁ—এইরকম পদক, এইরকম হার যে সে পর্যন্ত!

তাকে চিতায় তুলে দিয়ে অবধি ত রমণী কাকে বলে ভুলে গিয়েছিলুম। আমোদের সঙ্গিনী নিয়ে মেতেছিলুম। বাঙ্গালী দেখিনি—বাঙ্গলায় কথা কইনি। তাই বুঝি ধাঁধা লেগেছিল—তাই বুঝি চমক ভাঙ্গেনি। ঠুংরির তালে তালে পেশোয়াজের ঝল্‌মলে রূপ দেখেছি, ঘুঙুরের রুণুঝুণুর সঙ্গে হিন্দী গান শুনেছি। মুসলমানী আদব-কায়দায় কথাবার্ত্তা কয়েছি, সে আর-এক জগৎ! আর এ, এ—কি বীভৎস—এ যে আমাদেরই ঘরের রমণী! এরাই তাহ'লে রূপান্তর ধরে বেরিয়েছে। আমার নেশা ছুটে গেল। ডাক্তার, ডাক্তার, অবিশ্বাস করো না, তোমার গা [illegible] বল্‌ছি—যেমন তোমায় এখন [illegible] তেমনি স্পষ্ট চোখে দেখলুম—আমার [illegible] এসে কুসুমের পাশে দাঁড়িয়েছে। [illegible] দিন যেমন দেখেছিলুম, কপালে চন্দনের [illegible] —লাল চেলী পরা, ঠিক তেমনি! [illegible] ইসারা করে কুসুমকে দেখিয়ে সে [illegible] 'আমার অপমান করো না। নারী [illegible] অপমান করো না।' তারও বুকে [illegible] পদক—সেই হার! সে হার পরে [illegible] গড়িয়ে দিয়েছিলুম, তবু দেখতে পেলুম, [illegible] সাজেই সে তা গলায় পরেছে। এমন [illegible] কোন দিন দেখিনি! যখন মদ ধরি[illegible] সে মরে যাবার পর দিন-রাত [illegible] তার ধ্যানেই থাকতুম, তখনও ত সে [illegible] দেয়নি! আজ এতদিন পরে, যখন [illegible] সব গিয়েছে, তখন কেন দেখা দিলে! [illegible] মর্য্যাদা ত অনেকদিন আগেই ধূলায় [illegible] দিয়েছি! আমার কি অধঃপতনের [illegible] হয়েছে? আমার কি দিন ফুরিয়ে এসে [illegible] তার ত আর দেখা পাবার আশা রা[illegible] তার সঙ্গে থাক্‌তে পাব, তার কাছে [illegible] পাব, সে ভরসা আর নেই। এখন [illegible] তফাতে পড়ে গেছি। কুসুম আমার [illegible] চেয়েছিল, বল্‌লে—'এসো—অমন করে [illegible] দেখ্‌ছ?' আমি বললুম, 'না। আর [illegible] আজ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি কি করে[illegible] আমি শুধু নিজে অধঃপাতে যাইনি—[illegible] দিনতার অমর্য্যাদা করেছি। তুমি [illegible] মাপ করো। আমরাই তোমাদের [illegible] নামিয়েছি, আমরা পতিত, তাই আমা[illegible] স্পর্শে তোমরাও পতিত হয়েছ।' [illegible]

[illegible] সে বল্লে, 'নাও, ন্যাকামি কর্‌তে হবে [illegible]। এসো। এ কি থিয়েটার পেয়েছ যে [illegible] ক্টিং আরম্ভ কর্‌লে?' এই বলে আমার [illegible] ধরে টান্‌লে। আমার স্ত্রী হেসে উঠ্‌ল। [illegible] ল্‌লে কেন ডাক্তার? আমি বুঝ্‌তে [illegible] লুম না। তুমি বলতে পারো, কেন [illegible] রাগ করলে না, তিরস্কার কর্‌লে না, [illegible] ধু একটু হাস্‌লে? কিন্তু সেই হাসিতে [illegible] আমার সব ধাঁধা কেটে গেল ডাক্তার। [illegible] আমি জোর করে হাত ছিনিয়ে নিয়ে [illegible] আমার স্ত্রীর দিকে ছুটে গেলুম। সে [illegible] াঙুল তুলে ঠোঁটের উপর রাখ্‌লে। [illegible] রথে ধীরে ধীরে সরে গেল। আমি [illegible] াগলের মত ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লুম। কুসুম [illegible] চিয়ে বল্লে, "আমরণ, মুখপোড়া পাগল [illegible] াকি?' আমি সে কথায় কাণ দিলুম না। [illegible] াস্তাশুদ্ধ লোক আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে [illegible] াগ্‌ল। তখন আমার নেশা ছিল না, [illegible] ত্বও কেউ বল্লে 'মাতাল', কেউ বল্লে [illegible] পাগল'। বলুক, ডাক্তার। তুমি শুধু বল, [illegible] কিসে আমি আবার তাকে দেখ্‌তে পাই। মাতাল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব। পাগল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব - বল, বল—একটা উপায় কর।"

হেমেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বেহারাকে ডাকিলাম। সে মাথায় জল দিতে লাগিল, আমি একটা ঔষধ আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলাম।

আহারান্তে স্ত্রী পানের সহিত কাশীর জর্দ্দা লাগাইতেছিলেন, বলিলেন, "আবার এত রাত্রে মাতালটা এসেছে? ভদ্রলোকের বাড়ীতে রোজ রোজ এ সব কি ঢলাঢলি বাপু!"

আমি বলিলাম, "ও আজ যে নেশায় মাতাল হয়েছে, ভগবান করুন যেন অমন নেশা আমার চিরদিন থাকে!"

স্ত্রী বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ। তা খেলেই ত হয়। বারণ করেছে কে?"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিপন্না

[illegible] কৌরবের সভাতলে বামহস্তে বসন সম্বরি'
[illegible] স্তে বাহু ঊর্দ্ধে তুলি' শ্রীহরিরে ডাকি' বারম্বার,
[illegible] বিহ্বলা দ্রৌপদী যবে দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভরি'
[illegible] ণায় লজ্জায় ক্ষোভে মেগেছিল মৃত্যু আপনার,
[illegible] শ্রীকৃষ্ণ তখনো সেই অপূর্ণ নির্ভর হেরি' তার
[illegible] আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিতরি';
[illegible] কিন্তু যবে নিরুপায়, দুইবাহু মেলিয়া উদার
[illegible] চাহিল শরণ শেষে, নিমেষে আসিলা নামি' হরি।

মাতাল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব। পাগল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব - বল, বল—একটা উপায় কর।"

হেমেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বেহারাকে ডাকিলাম। সে মাথায় জল দিতে লাগিল, আমি একটা ঔষধ আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলাম।

আহারান্তে স্ত্রী পানের সহিত কাশীর জর্দ্দা লাগাইতেছিলেন, বলিলেন, "আবার এত রাত্রে মাতালটা এসেছে? ভদ্রলোকের বাড়ীতে রোজ রোজ এ সব কি ঢলাঢলি বাপু!"

আমি বলিলাম, "ও আজ যে নেশায় মাতাল হয়েছে, ভগবান করুন যেন অমন নেশা আমার চিরদিন থাকে!"

স্ত্রী বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ। তা খেলেই ত হয়। বারণ করেছে কে?"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিপন্না

বিমূঢ় পাণ্ডবদল পরস্পরে চাহি' রহে মুখে,
ধর্ষিতার হর্ষ হেরি' দুঃশাসন গুমরায় দুখে!

বিপন্না দ্রৌপদী আজি ঘরে-ঘরে মেলি' দুই বাহু
কাঁদে যে তোমায় ডাকি'; কোথা তুমি লজ্জানিবারণ?
তুচ্ছ করি' ভর্ত্তৃদলে, ব্যর্থ করি' দুঃশাসন রাহু
এস তুমি আর্ত্তসখা—এ দুর্দ্দিনে, এস নারায়ণ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মাসকাবারি

সাহিত্যে মতের ভিড়

১

আর্ট কাকে বলে, কবিতার উদ্দেশ্য কি কিম্বা তার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা—এই সব প্রশ্ন লইয়া বাংলা সাহিত্যে বিস্তর মতামত জমিয়া উঠিতেছে।

অস্‌কার ওয়াইল্ড, সিমন্‌স্‌ প্রভৃতির মতো একদল বলেন, "all art is quite useless"; আর্ট একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীন, প্রয়োজনবিহীন, আর্টকে আর্টের তরফ হইতেই দেখা উচিত। অন্যদল বলেন যে, ঐ মতটি লইয়া বিদেশে বিস্তর তর্কবিতর্ক হইয়া চুকিয়াছে—আর্টকে আর্টের তরফ হইতে দেখা মানে যদি তাকে জীবনের বিচিত্র আনন্দ ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয়, তবে সে আর্ট সৌখীন্ খেলনার মতো ক্ষণিক চাকচিক্যে মন ভুলায় বটে, কিন্তু মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করেনা।

এই উদ্দেশ্য-অনুদ্দেশ্য লইয়াই আর্টে নীতির স্থান আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে পুনরপি তর্ক উঠে। অস্‌কার ওয়াইল্ড এ সম্বন্ধে এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all." সাহিত্যে নীতিপূর্ণ বা দুর্নীতিপূর্ণ কোন গ্রন্থ নাই। কোন গ্রন্থ বা সুলিখিত, কোন গ্রন্থ বা কুলিখিত—ব্যস্‌ এই পর্য্যন্ত। আবার রাস্কিন্‌, আরনল্ডের মতে উচ্চ আর্ট মাত্রেই মানুষের উচ্চ নৈতিক বোধকে জাগ্রত করে। আসলে সাহিত্যে নীতির তর্কটা রুচির তর্কে। কিন্তু এ তর্কের শেষ মীমাংসা যে পাওয়া যায়না তাহা কালিদাসই বহুযুগ পূর্ব্বে বলিয়া গেছেন :—ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

তারপরে mass-consciousness, collectivism, individualism-এর তর্ক। কারো মতে গণ বা সমূহের মধ্যে আবদ্ধ সাহিত্যের আদর্শগুলা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যক্তির ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গণ-প্রকৃতির আপন জিনিস হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাব্যকলার কোন উদ্ভট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যোদ্ভূত কল্পনাকে রূপদান করা সার্থক হইতেই পারেনা। সেই প্রয়াস আপনি স্বয়ম্ভু হইয়া বিরাজ করিতে থাকে—দেশের রুচির রীতিধারার সঙ্গে কাব্যকলার রীতিধারার সঙ্গে, তাহা দিয়া খাপ খাইয়া সেই রীতিধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখেনা। এদিক্‌ দিয়াও সাহিত্য-আর্টের বিচার চলিতেছে। "আর্য্য" পত্রিকায় অরবিন্দ বাবু জুন সংখ্যায় ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় লিখিয়াছেন—"Its history has been more that of individual poetic achievements than of a constant national tradition." অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাব্য-কৃতিত্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সাহিত্যে একটা অবিচ্ছিন্ন জাতীয় রীতিধারা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, ইহা দেখা যায় না।

অন্য পক্ষ বলেন যে, সাহিত্যে ও সব ডিশন বজায় রাখা, গণ-বোধকে ধীরে রে উন্মীলিত করিয়া সৃষ্টিকে ক্রমশঃ ঘাটিত করা, প্রভৃতির কথাই উঠিতে রেনা। কেননা, প্রথমতঃ সাহিত্য বা র্ট জিনিসটা স্বতোচ্ছ্বসিত ও অনিবার্য্য। ইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্টের সৃষ্টি চেতন-লোকেই সম্ভাবিত হয়। ম্যাথু ারনল্ড ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতাকে যে nevitable" বলিয়াছেন, সেই অনিবার্য্য তোচ্ছ্বাসই আর্টের প্রাণ। দ্বিতীয়তঃ, র্ট রীতিধারাকে বজায় রাখা দূরে থাকুক, চলিত রীতিকে বরাবর আঘাতই ত করিয়া াকে। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই কি বচেয়ে প্রত্যক্ষ নয় ?

তারপর, আর্টে ন্যাশন্যাল বা স্বাজাতিক বং য়ুনিভার্সাল বা সার্ব্বজাতিক দিকের ধ্যে কোন্‌টা প্রধান, কোন্‌টা অপ্রধান—ই তর্ক হইতে এখন আবার Ethnic া নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তর্কও দেখা দিয়াছে। তি সভ্যজাতির মধ্যেই জাতিমিশ্রণ টিয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি এই জাতিমিশ্রণে বিচিত্র হইয়া র্টকেও বিচিত্র করিতেছে বলিয়া ইংরাজী কোনো সাহিত্যগ্রন্থে কতটুকু কেল্টিক প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া কতটুকুই বা স্যাক্সন্‌ প্রকৃতির অনুরঞ্জন পড়িয়াছে, তাহা বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা দেখা যায়।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নৃতত্ত্ব জিনিসটাই এখনো গোকুলে বাড়িতেছে। যে শাস্ত্র এখনো হামাগুড়ি দেয়, তাকে এ প্রকার সাহিত্যিক মল্লযুদ্ধে পাঠানোটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

২

সাহিত্যে এই সব মতের ভিড় দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

পঞ্চভূতে "কাব্যের তাৎপর্য্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি।"

অস্‌কার ওয়াইল্ডও বলেন "Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex and vital"—কোন কলারচনা সম্বন্ধে মতবৈচিত্র্য হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সে রচনাটা নূতন, জটিল এবং প্রাণবান্‌।

উপরোক্ত দুই মত হইতেই এই কথা মনে হয় যে, পাঠকদের প্রকৃতির ভিন্নতা-বশতই আর্টের তাৎপর্য্য যেন বিচিত্র হইয়া উঠে। কিন্তু কলাস্রষ্টার মধ্যেই যে বিচিত্র প্রকৃতির সমাবেশ থাকিতে পারে, সুতরাং তাঁর কলাসৃষ্টিতেও সেই সকল বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হইতে পারে, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। কাব্য হইতে জোর করিয়া "ইতিহাস আকর্ষণ বা দর্শন উৎপাটন" করিলে সেটা রসজ্ঞতার পরিচায়ক হয় না। কিন্তু যেখানে কাব্য স্বতই দর্শনের অভিব্যঞ্জনায় পূর্ণ, যেখানে তার রস তত্ত্বরূপে এবং তত্ত্ব রসরূপে বিভ্রাজমান, সেখানে সেই জটিল অথচ রসবিদগ্ধ সৃষ্টিটিকে

বিচিত্র দিক্ হইতে না দেখিয়া উপায় নাই। কেননা, সেই বৈচিত্র্যই যে তার অঙ্গীভূত।

সাহিত্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও নানা মতের ও আদর্শের ভিড় দেখা দিয়াছে। সেইজন্য সমালোচনার যতগুলি কানুনের (canon) উল্লেখ করিয়াছি, তার কোনটাকেই বাদ্ দিলে চলে না। "আর্ট ফর্ আর্টের" যুগ যে "সম্মুখে সবে মাত্র এসে দাঁড়াচ্ছে" একথা এ যুগ সম্বন্ধে বলা যায় না; কেননা আমরা দেখিলাম যে কত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ canon বা কানুন সাহিত্য-সমালোচনার উপলক্ষ্যে দেখা দিয়াছে। অতএব, "বিশুদ্ধ আর্ট" অর্থাৎ জীবনের অন্য সকল interest-নিরপেক্ষ আর্ট, অর্থাৎ কেবল মাত্র কারুকৌশলসর্ব্বস্ব আর্ট, এ যুগে যে চলিবেনা বলিয়াছিলাম, তার কারণ এই যে, আর্টের মধ্যে জীবনের নানা জটিলতা যেমন সামঞ্জস্য খুঁজিতেছে, তেম্‌নি আর্টের রস গ্রহণ-ব্যাপারেও, সমালোচনার ক্ষেত্রেও, রস-বিচারের বিচিত্র মানদণ্ডগুলাও একটা বড় সামঞ্জস্যে পরিণত হইবার অপেক্ষায় আছে। সেই Synthetic criticism সেই সম্যগ্‌দর্শী সমালোচনা, আজও পর্য্যন্ত পুরোপুরি দেখা দেয় নাই। তার আয়োজন চলিতেছে মাত্র।

এ যুগে আর্ট-সাহিত্যের মধ্যেও এত তত্ত্ব, এত সমস্যার বিচিত্রতা, কেন দেখা দিতেছে—তার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তার কারণ পরিষ্কার এই দেখিতে পাই যে, এ যুগে মানুষ তার সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সমস্তই বড় করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে চায়। এ যুগে তারি বড় নক্সা আঁকা হইতেছে, বড় বড় "প্ল্যান" তৈরি হইতেছে। সেই ভাবনা-কল্পনাগুলি মানুষের কল্পলোকে নীড় বাঁধিতেছে বলিয়া কাব্যকুঞ্জও তাদের গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার নব সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব কল্পনাগুলির সঙ্গে যার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, একালের সাহিত্যের সম্পূর্ণ রস ভোজে তারি আসন। ইব্‌সেন বল, মেটারলিঙ্ক বল, রোম্যারোলাঁ বল, এ, জি ওয়েল্‌স্ বল, এ, ই বল,—যেমন আধুনিক লেখকের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে গেলে এ যুগের বিচিত্র সমস্যা ও তার বিচিত্র সমাধান-কল্পনার পরিচয়টা গোড়ায় আবশ্যক হইয়া পড়ে।

তবু বলি যে আর্টের পক্ষে একটা detachment বা নির্লিপ্ততার আবশ্যক আছে। পরিপ্রেক্ষণ ভিন্ন যেমন চিত্র ফোটেনা, নির্লিপ্ততা ভিন্ন তেমনি আর্টও সম্ভব হয় না। কেননা, আর্ট অনিত্যকে নিত্যের মধ্যে, অংশকে সমগ্রের মধ্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে—সেই ত আর্টের কাজ। আর্টের সেই নিত্যদৃষ্টি, সেই সমগ্রের vision যদি কোন অনিত্য পরিবর্ত্তমান আংশিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহা আপন ধর্ম্ম হইতেই ভ্রষ্ট হয়। এ যুগে অনেক কলা-স্রষ্টার মধ্যে আর্টের সেই নিত্যতার দৃষ্টিটিকে দেখিতে পাই না বলিয়াই মহাকালের শিল্প-মোহর তাঁদের রচনার উপর অঙ্কিত হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



নেপথ্যে

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩২৫　　[৫ম সংখ্যা

সুন্দর-মঙ্গল

ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
শত শত পিশাচ-সেবিতা,
রে কুৎসিত ! দানব-দুহিতা,
তোর ও চুলের মুঠি ধরি,
শতবার ঝাঁটা-পিঠা করি,
তোরে আমি দেছি তাড়াইয়া—
তবু তুই আবার আসিয়া,
রে ডাকিনি, হইলি হাজির !
কাটা নাকে ঝরিছে রুধির,
সারা দেহে শীতলার দাগ,
বর্ণ তোর সম দাঁড়কাক—
ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
কুহকিনি, রে বহুরূপিণি,
অপরূপা, অদ্ভুতা ডাকিনি,
গুহার আঁধারে, অন্তরালে,
কোন্ তান্ত্রিকের পাঠশালে,
চুপে চুপে শিখি' ছলা-কলা,
হয়েছিস্ নিপুণা কুশলা,
মায়াময় নাট্য-লীলা-তন্ত্রে,
জ্ঞান-হরা কাপট্যের মন্ত্রে ?
তাই তোর কোটী ছদ্মবেশ,
বৈচিত্র্যের নাহি বুঝি শেষ।
নানাবর্ণ পুষ্পের পরাগ,
কোটী বস্ত্র, কোটী অঙ্গরাগ,
অযুত মুখস্, পরচুলা,
বিশ্ব যাহে বিমূঢ়া ব্যাকুলা !
কভু তুই মূর্ত্তিমান কাম,
শত পুরুষের মনস্কাম
হাব-ভাব কটাক্ষে পূরাস্,
বিস্তারিয়া বাহু-নাগ-পাশ !
লজ্জাহীনা, উলঙ্গ হইয়া,
টপ্পা গাস্ নাচিয়া নাচিয়া
কভু তুই ক্রোধ মূর্ত্তিমান,
ঘুরাইয়া খড়্গ খরশান,

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কাটিস আপন পতি-শির,
চীৎকারিয়া, চুষিস্ রুধির !
কভু তুই লোভ, ডোম-কন্যা,
আপনারে মানিস্ সুধন্যা,
অশুচি অস্থানে ছিল পড়ি,
পাকা জাম, দুই হস্তে ধরি,
আনন্দে পুরিয়া নিজ গালে,
যখন ভখিস্ অন্তরালে !
কু-সঙ্গে, কু-অঙ্গে, কু-বচনে,
বিশ্বের বিপুল অশোভনে,
রে কুৎসিত ! নিকেতন তোর !
অশোভার নাহি তোর ওর ।
কভু তুই দ্বেষ মূর্ত্তিমান,
পর-সুখে সদা মুহ্যমান ।
প্রতিবেশী-সৌম্য গৃহ-পানে,
চাহি চাহি আকুল নয়ানে,
ফেলিয়া ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস,
করিয়া করিয়া হা-হুতাশ,
গৃহে চুপে অগ্নি দিস্ জ্বালি—
সাবাসি লো তোর নাগরালি !
কভু অহঙ্কার শরীরিণী,
দোজ-পক্ষে ধনীর গৃহিণী ।
কর্ণে কণ্ঠে বদনে অলকে,
হীরা মুক্তা কাঞ্চন ঝলকে ।
দুগ্ধ-শুভ্র পালঙ্কে শয়ান,
উর্দ্ধে দোলে ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ ।
ডাগর নয়ানে হুতাশন,
দিবারাত্রি তর্জ্জন গর্জ্জন ।
মদে মত্তা, অঙ্গ নাহি নড়ে,
ধরা-পৃষ্ঠে চরণ না পড়ে ।
কভু তুই মূর্ত্তিমান স্বার্থ,
রোগে শোকে বিশ্ব যবে আর্ত্ত,
রাত্রি নাই, নাহিক সূর্য্যাস্ত,
আপনারি স্বার্থ লয়ে ব্যস্ত !
বধূ-বেশে, ভাঙ্গি লজ্জা-হাঁড়ি,
শ্বাশুড়ির অন্ন নিস্ কাড়ি ।
ভিখারীর গালে মারি চড়,
হেসে হেসে দেখিস্ রগড় !
ছদ্মবেশ ধরি আপনার,
এসেছিস্ শত শতবার,
তবু তোরে চিনেছি চিনেছি,—
তোর ও চুলের মুঠি ধরি,
শতবার ঝাঁটা পিঠা করি,
তোরে আমি খেদায়ে দিয়েছি ।
বেহদ্দ বেহায়া আর পাজি,
রে কুৎসিত ! কেন তুই আজি,
আবার হাজির ?
ও নয় রে খেঁদা নাকে আরক্ত আঁখি,
কাটা নাকে ঝরিছে রুধির !
গালে তোর চুণ আর কালি মাখাইয়া,
গাধার পিঠেতে বসাইয়া,
এই নে এই নে, তোরে করিনু বাহির ।
ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
আর যেন, আর যেন, হোস্‌নে হাজির ।
মহাজ্যোতি-পারাবার-পারে,
নরকের নিবিড় আঁধারে,
যারে তুই যা ।
ভন্ ভন্ করে যথা পুঞ্জে পুঞ্জে রক্ত-পায়ী মশা,
দশ-ঠেঙো বিশ-ঠেঙো মাকোসা,
মেলি লম্বা পা,
ডিমে দেয় তা,—
উকুন ও ছারপোকা
পিপীলিকা, তেলাপোকা,

শুঁয়োপোকা, সাপ বেঙ করে যথা,
কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্,
ভূত-প্রেত পিশাচেরা হাসে যথা,
খিল্‌খিল্, খিল্‌খিল্,
কার হা হা হা হা,
রে কুৎসিত ! সে নরকে যা ।

* * * *

কমলায় পশেছে অনল,
আজি হিয়া ধবল উজ্জ্বল ।
সরসীর শৈবাল সরেছে,
চাঁদে হেরি চাঁদ হাসিতেছে ।
এই বেলা মুদিয়া নয়ান,
হে সুন্দর ! করি তব ধ্যান ।
হয়েছে হয়েছে নিশি ভোর,
নাহি আর যামিনীর ঘোর ।
সরসীতে ফুটেছে কমল,
কুসুমে শেফালি-তরুতল,
একেবারে ছাইয়া গিয়াছে ।
রাঙ্গা উষা হের আসিয়াছে—
মেঘ-হীন চিত্তের আকাশ,
অহো একি অরুণ-প্রকাশ !
আসিয়াছ ! এস হে সুন্দর,
মদন-মোহন, মনোহর !
চিরদিন নয়ন-অঞ্জন,
চিরদিন ভুবন-মোহন !
মুখ-চন্দ্র, নয়ন-মুকুর,
চিরদিন মধুর মধুর !
চিরদিন বদন-মণ্ডল,
রূপ ও লাবণ্যে ঢলঢল !
চিরদিন সুমধুর ভাষ,
চিরদিন সুললিত হাস !
চিরদিন নন্দন-সৌরভ,
চিরদিন বসন্ত-গৌরব !
চিরদিন নয়ন-আনন্দ,
চিরদিন প্রাণ-মকরন্দ !

হে চির-সুন্দর রূপরাশি,
একি শুভ্র আনন্দের হাসি
ও অধরে লাগিয়া রয়েছে !
নাহি জানি কত শুভ্র যুঁই,
জাতি ও মল্লিকা মধুময়ী,
কামিনী বকুল ও সেঁউতি,
ধবল কমল ও মালতী
তব শুভ্র হৃদয়ে ফুটেছে !
ফুলে ফুলময় ফুলবন,
তোমার ও হৃদয়, মোহন !
কোন্ শুভ্র গন্ধরাজ ফুল
ও নিকুঞ্জে ফুটিয়া রয়েছে,
সারা বিশ্ব হইয়ে আকুল,
গন্ধে যার পাগল হয়েছে ?

সৌন্দর্য্য-সাগরে করি স্নান,
ঘুচিল ঘুচিল অকল্যাণ !
ধ্যান-অন্তে, একি হেরি চাহি ?
অসুন্দর নাহি আর, নাহি !
চারিধারে সুন্দর, সুন্দর,
চারিধারে সৌন্দর্য্য-নিঝর,
উথলিছে করি কল্‌কল্,
উথলিছে করি ছল্‌ছল্ !
নীলাকাশে বিথারিয়া তনু,
হাসে সৌন্দর্য্যের রামধনু !
সবুজে সবুজে একি ঘটা,
লাল নীল পীতের কি ছটা !

লালে লাল গোলাপের কুঞ্জ,
লালে লাল কমলের পুঞ্জ,
হাসিতেছে বিকাশি গরিমা—
সৌন্দর্য্যের নাহি আর সীমা !
হলুদ সফেদ বর্ণ-ভাতি,
নানাজাতি প্রজাপতি-পাঁতি ;
কি আনন্দে বসিয়া নিঝুমে,
মধু পিয়ে কুসুমে কুসুমে !
রঙে রঙে একি ঘেঁষাঘেঁষি,
রূপে রূপে একি মেশামেশি !
সৌন্দর্য্যের কুঞ্জে কি উৎসব,
চারিধারে পক্ষী-কলরব।
নিখিলের চন্দনা ও টিয়া
নিখিলের কোকিল পাপিয়া,
একেবারে পাগল হয়েছে !
বউ কথা কও, সহ বধূ,
পরাণের সুমধুর মধু,
একেবারে ঢালিয়া দিতেছে !
ঝুরুঝুরু বহিছে অনিল,
রাশি রাশি মার্শেল্‌নিল্‌
নিজ গন্ধে ক্ষেপিয়া উঠেছে !
অগণন সৌন্দর্য্যের ধারা,
অতুলন রূপের ফোয়ারা !

* * *

আজি একি আনন্দ উদয়,
হে সুন্দর, জয় তব জয় !
নিখিলের শোভার মাঝারে,
হে সুন্দর, নিরখি তোমারে।
রূপমৌর বরাঙ্গ মোহনে—
অফুরন্ত ফুল-উপবনে !
তার সেই গোলাপি বদনে,
তার সেই চম্পক-বরণে,
তার সেই নয়ন-কমলে,
আন্দোলিত ভ্রমর শ্যামলে,
তার সেই নাসা তিলফুলে,
কর্ণ-মূলে, ঝুমুকার দুলে,
তার সেই বাঁধুলি-অধরে,
কুন্দফুলে, দন্ত মনোহরে,
তার সেই শ্রীকণ্ঠ মাঝার,
হাসে যথা মালতীর হার,
তার সেই কুন্তলের মাঝে,
বেলফুল যথায় বিরাজে,
তার সেই মৃদু মৃদু হাসে,
জয়যুক্ত শেফালি-নিশ্বাসে,
তার সে কদম্ব পয়োধরে,
যাহে লীলা লাবণ্য বিহরে,—
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই হেরিবারে পাই !
সু-সঙ্গে, সু-অঙ্গে, সু-বচনে,
বিশ্বের বিপুল সুশোভনে,
অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে !
গ্র্যামোফোনে, পিয়ানো, এস্রাজে,
হারমোনিয়াম্‌, বেহালার মাঝে ;
শঙ্খরোলে, ঘণ্টারোলে, তূর্য্যে,
সেতার ও বীণার মাধুর্য্যে ;
ছায়ানটে, ললিতে ও বেহাগে,
ইমনে ও ভৈরবের রাগে,
সাহানায় আর সোহিনীতে,
বিশ্বের বিপুল কলগীতে,
শষ্পে, শষ্পে, শ্যামল পল্লবে,
বসন্তের আনন্দ-উৎসবে,
প্রতিধ্বনি-কৌতুকে ও রঙ্গে,
দিশি দিশি শব্দের তরঙ্গে,

নারী-নৃত্যে, হাবভাবে, তালে,
ভকতের খোল্‌ করতালে,
নতমুখী কুলবধূ-লাজে !
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে !
ধূলিহীন গৃহ-আঙ্গিনায়,
টগর-ধবল সু-শয্যায়।
বিশ্বের বিপুল বিমলতা,
বিশ্বের বিপুল উজ্জ্বলতা,—
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই দেখিবারে পাই !
মধুর পনসে ইক্ষুরসে,
সুস্বাদু ব্যঞ্জনে ও পায়সে,
তর্‌মুজে ও আঙ্গুরে রসালে,
পাট্‌নার আনারের লালে,
কমলালেবুতে, নারিঙ্গিতে,
বিশ্বের বিপুল মাধুরীতে,
মখ্‌মলে, বিচিত্র সাটীনে,
ঝলমল্‌ চেলির রঙ্গিনে,
রসময় পদ্মমধু-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে !
রঙ্গণে ও দোপাটি, গ্যাঁদায়,
মৃগচক্ষে তব রূপ ভায় !
আবিরে সিন্দূরে ও চন্দনে,
তরল অলক্ত-বিলেপনে,
অতসী ও অশোকে অশোকে,
নাগে নাগে চম্পকে চম্পকে,
পদ্মরাগে, চুণির চমকে,
হীরকে ও মুক্তার ঝলকে,
কর্পূরে ও কস্তুরি-ভিতরে,
চামেলী গোলাপী আতরে,
ম্যাহোগ্‌নি টেবিলে, দর্পণে,
ঝাড়, বাতি, ঝালরে, লণ্ঠনে,
মৃগশৃঙ্গে, হস্তীর দশনে,
বিপুল সুন্দরে ও চিকণে,
লীলাময় নির্ঝর-তরঙ্গে,
লীলাময়ী নদীর উৎসঙ্গে,
দূর্ব্বাদলে, শিশিরে শিশিরে,
রজনীর নয়নের নীরে,
কমলের ধবল মৃণালে,
সুধবল মরালে মরালে,
কষিত কাঞ্চন কণ্ঠহারে,
রজতের মঞ্জীর-ঝঙ্কারে,
লাল নীল উপলে উপলে,
ঝিলে বিলে উৎপলে উৎপলে,
ঊর্দ্ধে উছল উৎসে উৎসে,
ফোয়ারার লাল নীল মৎস্যে,
বীরবৌটি, কাঁচপোকা-মাঝে,
তোমার মধুর মূর্ত্তি রাজে !
বিয়োগিনী, উপজাতি-ছন্দে,
বিশ্বের বিপুল ছন্দোবন্ধে,
প্রাণচোরা গল্পে, কাহিনীতে,
স্তুতিতে ও ভজন-সঙ্গীতে,
বাগ্মীর জলন্ত দু-নয়নে,
রসনার উষ্ণ প্রস্রবণে,
অদভুত জোয়ার ভাটায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ-লীলায়,
জলধির হিল্লোলে হিল্লোলে,
জলধির কল্লোলে কল্লোলে,
সারা বিশ্ব-বিভূতির মাঝে,
তোমার সুন্দর মূর্ত্তি রাজে !
ফুল-শয্যা, ফুলের তোড়ায়,
চিত্ত-চোরা ফুলের মালায়,
ফুলদানি, ফুলের সাজিতে,
বাসরের হাসির রাশিতে,

কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর বোলে,
উলুউলু আনন্দের রোলে,
মধুর মধুর বংশীরবে,
বিরহান্তে মিলন-উৎসবে,
জগতের বিপুল খেলায়,
জগতের বিপুল মেলায়,
দুর্গোৎসবে, দোল-পূর্ণিমায়
বৃন্দাবনী আবির-খেলায়,
দম্পতীর মধুর চুম্বনে,
দম্পতীর বাহুর বন্ধনে,
বিশ্বের বিমলানন্দ-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
পতিব্রতা সতীর নিশ্বাসে,
বালকের হাসির উচ্ছ্বাসে,
দম্পতীর নব অনুরাগে,
ঋষি-সন্ন্যাসীর মহাত্যাগে,
ভকতের ভকতি-ঐশ্বর্য্যে,
ব্রাহ্মণের বালব্রহ্মচর্য্যে,
সাধকের নিশি-জাগরণে,
প্রাণপণে প্রাণান্ত সাধনে,
প্রেমিকের স্বদেশ-কল্যাণে,
দৃপ্ত তেজে আত্ম-বলিদানে,
মহাজ্ঞানে, মৈত্রী করুণায়,
মুদিতায় আর উপেক্ষায়,
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই দেখিবারে পাই!
জননীর সস্নেহ-চুম্বনে,
শাশুড়ির অপূর্ব্ব যতনে,
গৃহবধূ-কার্য্য-পটুতায়—
শ্বশুর ও শাশুড়ি-সেবায়,
সন্তানের সহাস্য-বদনে,
পিতৃমাতৃ-চরণ-বন্দনে,
জামাইষষ্ঠীর উপচারে,
মিষ্টান্নে ও স্নেহ-উপহারে,
শ্যালিকার রঙ্গ ও লীলায়,
সৃষ্টিছাড়া ঠাট্টা তামাসায়,
ভগিনীর ভাই-ফোঁটা-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
মধুর গতিতে ও ভঙ্গিতে,
বিশ্বের বিপুল সুললিতে,
সুকবির ছন্দ-মহিমায়,
চিত্রকর-চিত্র-গরিমায়,
গায়কের রাগ-রাগিণীতে,
বাদ্যকর-তালের ভঙ্গিতে,
রাজহর্ম্ম্যে, মর্ম্মরের তাজে,
ভাস্করের শত চারু কাজে,
বিশ্বের বিপুল শোভা মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!

সেবাশ্রমে, সেবার ভিতরে,
রোগী, আর্ত্ত, দুঃখীর শিয়রে,
ক্লান্ত পান্থ ধর্ম্মশালা-মাঝে,
হে সুন্দর; তব মূর্ত্তি রাজে!

অন্ন-সত্রে আর জল-সত্রে,
কলসীতে কদলীর পত্রে,
বিপুল বাসনাহীন কাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিতে,
সুবিচিত্র বেদের ধ্বনিতে,
উপনিষদের মহাজ্ঞানে,
পুরাণের ভকতি-আখ্যানে,
যীশুর অপূর্ব্ব উপদেশে,
কোরাণের প্রখর আদেশে,

অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে।

রবিহাস্যে, শশী-জোছনায়,
অনন্ত আকাশ-নীলিমায়,
ছায়াপথে তারকা-কুসুমে,
যামিনীর প্রশান্ত নিঝুমে,
রাঙ্গা উষা-হাসির ছটায়,
গোধূলির ম্লান সুষমায়,
শিখিপুচ্ছে, কপোত-গ্রীবায়,
সুন্দরীর বিচিত্র ব্রীড়ায়,
বসন্তের সুরভি নিশ্বাসে,
শরতের শশাঙ্ক-উল্লাসে,
বরষার অযুত প্রপাতে,
হেমন্তের হিমের সম্পাতে,
শৈলরাজ-তুষার-মুকুটে,
জলধির কোটী করপুটে,
অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে।

প্রতিমায়, বিগ্রহে ও পটে,
মন্দিরে, মসজিদে আর মঠে,
উপাসনা আর আরাধনে,
কীর্ত্তনে ও আত্ম-নিবেদনে,
ভকতের আকুল আহ্বানে,
সাধকের মুদ্রিত নয়ানে,
সিদ্ধ যোগী-যোগানন্দ-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
* * * *
আসিয়াছ? এস হে সুন্দর,
ভুবনমোহন, মনোহর!
চিরদিন নয়ন-অঞ্জন,
চিরদিন অপূর্ব্ব শোভন!
মুখচন্দ্র, নয়ন-মুকুর,
চিরদিন মধুর মধুর!
চিরদিন বদন-মণ্ডল,
রূপ ও লাবণ্যে ঢলঢল!
চিরদিন সুমধুর হাস,
চিরদিন সুললিত ভাষ!
চিরদিন নন্দন সৌরভ,
চিরদিন বসন্ত-গৌরব!
চিরদিন নয়ন-আনন্দ,
চিরদিন প্রাণ-মকরন্দ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

খেলাঘর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—হেমন্তর সুসজ্জিত কক্ষ। সন্ধ্যা হয়-হয়। নীরদা তাঁহার পূর্ব্ব-কল্পিত পুষ্প-শিল্প শেষ করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। পর্দ্দা দিয়া এখন সেটি ঢাকা। তিনি একাকিনী কক্ষমধ্যে অস্বচ্ছন্দভাবে পায়চারি করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পর্দ্দা খুলিয়া নিজের কাজ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন।

নীরদা। কে আস্‌চে না? (দরজার নিকটে গিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন) না, কেউ নয়! (আবার ফিরিয়া আসিয়া পায়-

চারি করিতে লাগিলেন) ভারী বিশ্রী কিন্তু ! উনি যা বল্লেন, সব বাজে কথা ! এ রকম কখন হতে পারে ? অসম্ভব !—আমার যে তিনটি ছেলেমেয়ে !—না—(আয়ি প্রবেশ করিল) কি ?

আয়ি। ঘরের ভেতর একলাটি কেন গা ? বাইরে এস না। সন্ধ্যে হল যে !

নীরদা। লীলা দিদি ত কই এল না, আয়ি। কেন এল না ?

আয়ী। কি জানি বাছা !

নীরদা। ছেলেরা কোথায় ?

আয়ি। যে সব খেলনা তাদের দিয়েচ, তাই নিয়ে তারা এখন মেতে আছে।

নীরদা। আমার কাছে আসতে চাইছে না—আমাকে খুঁজচে না ?

আয়ি। খুকী মাঝে মাঝে 'মা-মা' বলে চেঁচাচ্চে।

নীরদা। (তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া) চট্ করে বাকী কাজটুকু সেরে ফেলে—না, আয়ি, ওদের নিয়ে এখন আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না।

আয়ী। ছেলেমানুষ কি না !—হাতে একটা কিছু পেলেই ভুলে থাকে।

নীরদা। সত্যি ! আচ্ছা, আয়ি, তোমার কি মনে হয় ? ওদের মা যদি জন্মের মত চলে যায়, তা হলে ওরা তাকে ভুলে থাকবে ?

আয়ী। কি যে বল বাছা তার ঠিক নেই !

নীরদা। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, আয়ি, তুমি তোমার ছোট মেয়েটিকে পরের কাছে রেখে কোন্ প্রাণে আমাদের বাড়ী চাকরি করতে এসেছিলে ?—তোমার মনটা তখন কি রকম হয়েছিল ?

আয়ি। উপায় ছিল না যে, বাছা। তা না হলে কি নীরোকে মানুষ করতে তুম ? তারও যে মা ছিল না।

নীরদা। সে যেন বুঝলুম। তোর মনটা তখন কি রকম হয়েছিল, বল না !

আয়ি। কি করব বল ! না এলে যে না পেয়ে আমিও মরতুম—মেয়েটাও মরত তার চেয়ে তাকে পরের হাতে রেখে ভালই হয়েছিল। মিন্সে কিছুই যায়নি ত !

নীরদা। তুমি না এলে আয়ি, কিন্তু মরে যেতুম।

আয়ী। (গদ্‌গদ্ কণ্ঠে) নীরো বেলায় আমাকেই মা বলে জানত।

নীরদা। আমার ছেলেদুটি আর মে এখন যদি তাদের মাকে হারায়, বিশ্বাস আয়ি, তুমিই তাদের মা হয়ে—মাথা-মুণ্ডু কি যে বকে যাচ্চি, তার ঠিক যাও তুমি এখন, আয়ি—ছেলেদের দে আমি চট্‌পট্ কাজ সেরে নি।

আয়ি। বেশ মা ! (চলিয়া গে (নীরদা দরজা বন্ধ করিলেন)

নীরদা। নাঃ, এখনও কারও দেখা নে এ কথা যে কাউকে বলবার নয় ! নি আগুনে নিজেকেই পুড়তে হবে। ওই কে আসচে !

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

কে, লীলাদিদি ? এস এস। আ তোমার জন্যই হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।

লীলাবতী। আয়ি তাই বলছিল বটে।

নীরদা। তুমি যে দেরী করে এলে

ই প্রায় তৈরী। এস এখন দুজনে বসে করা যাক্।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন)

লীলাবতী। তুমি ত নিজেই সব সাজিয়ে করে রেখেচ দেখ্‌চি ! তোমার পছন্দ রী চমৎকার !

নীরদা। আমার যা-কিছু দেখ্‌চ, দিদি, ই ওঁর কাছে শিক্ষা—এ আর বৃহৎ ব্যাপার ? কিছুই নয়। কেবল দু'পাঁচ জনকে য়ে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ করা আর কি !

লীলাবতী। তোমার এ উৎসবে যে াগ দিতে পারলুম, এতে আমার তখানি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব ? চ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আজ কালে তোমাদের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলাপ া। তাঁকে যেন কেমনতর দেখলুম না ? ীবরই কি উনি ঐ রকম ?

নীরদা। ওঁর খুব শক্ত ব্যামো কি , তাই কখন-কখন অমনতর দেখায়। চারী ক্ষয়রোগে ভুগচে। বাপের দোষেই লের এই দুর্দ্দশা। বাপেরও শেষটা ঐ াগ হয়েছিল—দিন-রাত তিনি নেশায় ডুবে কতেন।

লীলাবতী। উনি রোজ এখানে যাতা-ত করেন, বোধ হয় ?

নীরদা। প্রত্যহ দুবেলা। নেহাৎ আপ-য় লোক—আর বে-থাও হয় নি। ওর থা কেন এত জিজ্ঞাসা করচ বল দেখি ?

লীলাবতী। আমার মনে একটা খট্‌কা ধেচে, তাই।

নীরদা। খট্‌কা !

লীলাবতী। হ্যাঁ, সকালে যখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল তিনি বল্লেন যে আমার নাম তিনি এ বাড়ীতে অনেক বার শুনেছিলেন, কিন্তু তোমার স্বামীর কথায় ত বোধ হল না, যে তিনি আমার নাম একবারও শুনেচেন। তোমার স্বামী জানলেন না, অথচ তিনি জানলেন কি করে, তাই বুঝতে পারচি না।

নীরদা। ও, এই কথা ! কি জান, উনি চিরকাল নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দিনান্তে যেটুকু ফুর্‌সৎ পান, আমাদের ঘর-কন্নার কথাতেই তা কাটিয়ে দেন। তা'ছাড়া ওঁতে আর একটি চমৎকার জিনিষ আমি লক্ষ্য করেচি। ওঁর যা-কিছু কথাবার্ত্তা, যা-কিছু আলোচনা, সব আমাকে নিয়ে। আমার মুখে অন্য কারও প্রশংসা-আলোচনা শুনতে উনি ভালো বাসেন না। সেই জন্যে তোমার নাম ওঁর কাছে কখনও করিনি—কাজেই উনি শোনেন নি। ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার দুনিয়ার সব গল্পই হয়ে থাকে। তোমার গল্প ওর কাছে অনেকবার করেচি—তাই জানে।

লীলাবতী। নীরদা, তুমি যাই বল, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে ছেলে মানুষের মত। আমি সংসারে অনেক রকম দেখেছি, আর আমার বয়সও তোমার চেয়ে বেশী, একটা পরামর্শ আমার শোন ত বলি। তোমার এই ডাক্তার ঠাকুরপোটির সঙ্গে যত শীগ্‌গির পার নিষ্পত্তি করে ফেল।

নীরদা। কিসের নিষ্পত্তি করে ফেলব ?

লীলাবতী। সকালে তুমি একটি লোকের খুব তারিফ্ কচ্ছিলে না ? কে তোমার বিপদের সময় টাকা ধার দিয়েছিল ?

নীরদা। তারিফ্ করবার কেউ নেই দিদি, আর।

লীলাবতী। আচ্ছা, তোমাদের এই ডাক্তার বাবুটি বেশ সঙ্গতিপন্ন, না?

নীরদা। হ্যাঁ, তা বটে।

লীলাবতী। বে-থা করেন নি, অন্য লোকও কেউ নেই যাকে ভরণ-পোষণ করতে হয়?

নীরদা। তা নেই, কিন্তু—

লীলাবতী। আর প্রত্যহ দুবেলা এখানে যাতায়াত করে থাকেন?

নীরদা। হ্যাঁ, সে ত আগেই বলেচি।

লীলাবতী। আর তিনি তোমাদের আত্মীয়।

নীরদা। হ্যাঁ।

লীলাবতী। আচ্ছা, তা হলে তোমাদের এই সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়টির কোনরকম অবিবেচনার কাজ করা কি সম্ভব?

নীরদা। তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌লুম না ভাই।

লীলালতী। আমার সঙ্গে ভাঁড়ামি করো না। তুমি কি মনে কর, আমি এতটুকুও আন্দাজ করতে পারিনি যে হাজার টাকা ঐ লোকটিই তোমাকে দিয়েছিল?

নীরদা। তুমি দিদি পাগল হলে নাকি! এ কথাটা তোমার মনে এল কি করে বল ত? যে আমাদের আত্মীয়, আর যে রোজ বাড়ীতে যাতায়াত করে, তার কাছে টাকা ধার নেওয়া—সেটা কি রকম বিশ্রী দেখায় বল দেখি?

লীলাবতী। তাহলে সত্যি সত্যি ওঁর কাছে নয়?

নীরদা। নিশ্চয়ই নয়! ওর কথা বারও আমার মাথায় আসে নি। তা সে সময় ত ওর অবস্থা ভাল ছিল টাকাকড়ি এই হালেই ওর এসেচে।

লীলাবতী। ভালই হয়েচে, তা

নীরদা। না—ঠাকুরপোর কথা তখন মনেই আসে নি। কিন্তু ওর কাছে চেয়ে বসতুম, ও নিশ্চয় তা হলে—

লীলাবতী। চাওনি যে, সেইটিই করেচ।

নীরদা। না, কখনই না। কিন্তু বার যদি মুখ ফুটে ওকে বলতুম,—

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে জানিয়ে?

নীরদা। হ্যাঁ তা বই কি! লোকটির সঙ্গেও আমি শীঘ্রই নিষ্পত্তি ফেলবো—কিন্তু, তাও অবশ্য আমার অজ্ঞাতেই। যত শীগ্‌গির পারি সে পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে।

লীলাবতী। হ্যাঁ,—আমি ঐ সকালে তোমাকে বলতে যাচ্ছিলুম। দেখ নীরো—

নীরদা। দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট মানুষেরই সাজে।

লীলাবতী। সে কথা আর বলতে!

নীরদা। আচ্ছা বলত দিদি, এ কথা জিজ্ঞাসা করি। দেনা চুকিয়ে দি কাগজ-পত্র সব তার কাছ থেকে পাব ত?

লীলাবতী। নিশ্চয়।

নীরদা। আর তখনি কুচি কুচি

ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবো। লক্ষ্মীছাড়া পাজ!

লীলাবতী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীরদার মুখ চাহিয়া) নীরদা, তুমি আমার কাছে কোন কথা যেন গোপন কচ্চ।

নীরদা। অ্যাঁ,—আমার চেহারা দেখে কিছু মনে হচ্ছে না কি?

লীলাবতী। নিশ্চয়! অবিশ্যি কিছু হয়েচে। কি হয়েচে নীরদা?

নীরদা। (আরও কাছে সরিয়া বসিলেন) তবে শোন দিদি সব কথা—ওই উনি এদিকে আস্‌চেন যে। সর্ব্বনাশ! কি দিদি তা হলে একটিবার ছেলেদের নিয়ে যাবে? উনি চলে গেলেই তোমায় ডেকে পাঠাব।

লীলাবতী। বেশ, বেশ, আমি ওদিকে ক্ষণ বসিগে। জেনো বোন্, তোমার সব কথা ভাল করে শুনে তবে আমি এ বাড়ী থেকে নড়ব। [নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

নীরদা। এতক্ষণ কি বাইরে থাকতে হয়? তোমার জন্যে আমি হাঁ করে বসে আছি।

হেমন্ত। উনি কে বেরিয়ে গেলেন?

নীরদা। লীলাদিদি। আমরা বসে গল্প করছিলুম। তুমি এখন আপিসের কাজ নিয়ে থাকবে নাকি?

হেমন্ত। (হস্তস্থিত কাগজের তাড়া দেখাইয়া) হ্যাঁ, আমি ব্যাঙ্ক থেকেই আসচি। কি, এখনও যে পরদা ঢেকে রেখেচ! আচ্ছা, আমি তবে ও ঘরে বসে কাজ করিগে।

(চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

নীরদা। (হাত ধরিয়া) দাঁড়াও না একটু।

হেমন্ত। কেন বল দেখি?

নীরদা। একটি কথা বলব?

হেমন্ত। কি কথা?

নীরদা। রাখবে, বল?

হেমন্ত। কোন উপরোধ-টুপরোধ নয় ত?

নীরদা। যদি রাখ, তা হলে আজ চমৎকার চমৎকার গান শোনাব।

হেমন্ত। সে লোকটার জন্যে অবিশ্যি কিছু বলবে না?

নীরদা। হ্যাঁ গো তারি কথা—তোমায় মিনতি করি—

হেমন্ত। তার কথা তুলতে আবার তোমার সাহস হচ্চে?

নীরদা। আমার কথা তোমায় রাখতেই হবে, কামিখ্যেকে কিছুতেই তাড়াতে পাবে না।

হেমন্ত। তা আর হয় না। হুকুম পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেচে—কামিখ্যেকে তাড়ান হবে, আর সেই বন্দোবস্তে তোমার লীলা-দিদির ভাইয়ের একটা চাকরি হবে।

নীরদা। সে তোমার অনুগ্রহ। কিন্তু কামিখ্যেকে তাড়িও না। তার বদলে না হয় অন্য কাউকে তাড়াও।

হেমন্ত। তা আর হয় না। হুকুম পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেচে কামিখ্যেকে তাড়াবার।

নীরদা। ওগো, না, না! ও যে কত বড় পাজী, তা ত তুমি জান। চাকরি ওর গেলে, ও যে কতরকমে তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, তা কি ভেবে দেখেচ?

শেষে হয়ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে! ও ত আমাকে সেই ভয়ই দেখিয়ে গেল!

হেমন্ত। আমি তত ভীরু নই, যে সামান্য একটা কেরাণীর কথায় ভয় পাব। আপিস-শুদ্ধ লোক জেনেচে যে কামিখ্যে বরখাস্ত হবে। এখন যদি আবার তা বদ্‌লে যায়, তাহলে সবাই মনে করবে, আমি স্ত্রীর কথামতই কাজ করি।

নীরদা। যদিই মনে করে, তাতে কি?

হেমন্ত। তা বটে! তোমার মত এক-গুঁয়ে যারা, তারা ওতে কোন দোষ দেখবে না ত! কিন্তু আপিসের লোকদের নজরে আমি কোনরকমে খাট হতে রাজী নই। এ রকম খামখেয়ালি কাজের ভবিষ্যৎ ফল ভাল হয় না, জেনো। এ সব ছাড়া এমন একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার থাকতে কামিখ্যের সেখানে থাকা চলতে পারে না।

নীরদা। কি সে ব্যাপার?

হেমন্ত। তার জাল-জুয়াচুরী, বদ্‌-মায়েসী এ সব হয়ত আমি অগ্রাহ্য করলেও করতে পার্তুম। কিন্তু, যে জিনিষটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না, সেটা হল তার অভদ্র, অবাধ্য ব্যবহার। ছেলেবেলায় দুজনে সহপাঠী ছিলুম—তার পর ইদানীং একটা সম্পর্কও হয়েছিল—কিন্তু সেই সব পুরানো ব্যাপার নিয়ে সে এখনও আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিতে ছাড়ে না।

নীরদা। দেখ, এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার—এতে নিশ্চয় তোমার মনে কিছু হওয়া উচিত নয়।

হেমন্ত। উচিত নয়?—কেন নয়?

নীরদা। কেননা, মনটাকে অত ছোট করে কোন জিনিষ দেখা উচিত নয়।

হেমন্ত। কি বল্‌চ তুমি?—ছোট মন! আমার ছোট মন!

নীরদা। না, তা বলছি না—

হেমন্ত। তুমি কথার ভাবে বল্‌ছ আমার মন ছোট অর্থাৎ আমি ছোট নজরে সব জিনিষ দেখি। আচ্ছা, তাই ভাল, আমি তবে ছোট নজরেই এবার কাজ করব। এখনই এর একটা হেস্তনেস্ত করব। (দরজার নিকটে গিয়া) বলাই—

নীরদা। কি করবে?

হেমন্ত। এই দেখনা, কি করি! (বলাই প্রবেশ করিল) দেখ বলাই, ব্যাঙ্কের চাবির রাশি বাইরে বসে আছে। এই চিঠি নিয়ে এই টাকা নিয়ে তাকে দাও, আর বলে যে এই সব নিয়ে এখনি যেন কামিখ্যে বাবুর হাতে সে দিয়ে আসে, জল্‌দি।

[বলাই চলিয়া গেল

হেমন্ত। এবার কি হয়?

নীরদা। কিসের চিঠি ও?

হেমন্ত। কামিখ্যের বরখাস্তের চিঠি।

নীরদা। ওগো, ফিরিয়ে আন। এখনও সময় আছে। তোমার পায়ে পড়ছি, এখনও ফিরিয়ে আন। যদি আমার ভাল চাও, তোমার ভাল চাও, ছেলেদের ভাল চাও ত ফিরিয়ে আন। আমার কথা রাখ, ফিরিয়ে আন। তুমি কি জান, ও চিঠিখানা আমাদের কি সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে?

হেমন্ত। আর হয় না—লোক গেছে।

...নীরদা। সত্যই আর হয় না।

...বসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন)

...হেমন্ত। (নীরদার হস্ত ধারণ করিয়া) ...ভয় পেয়েচ তুমি? কিসের ভয়? কেবল ...নাকি ভয় পেয়েচ, তাই আমি ব্যাপারটা ...মাথ্‌লুম না; তা নইলে এটা কি কম ...মানের কথা! একটা কেরাণীর ধাপ্পা-...তে ভয় পাওয়া অপমানের কথা নয়? ...কোন ভয় করো না। বিপদ আসে, ...ক, আমার সামর্থ্য এবং সাহস, দুই-ই ...ছ তাকে রোধ করবার। তুমি নিশ্চিন্ত ...। এর যত কিছু দায়িত্ব—যা কিছু বিপদ ...মি একাই বহন করব।

...নীরদা। (ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে) কি বল্‌চ ...?

...হেমন্ত। যা কিছু দায়িত্ব, আমি একাই ...

...নীরদা। তোমায় কখ্‌খন তা করতে ...ব না।

...হেমন্ত। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি ...র নেব না-হয়? কেমন, এখন ত খুসী ...? (নীরদাকে আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া) ...ছ কেবল তোমার ভয়! যত সব বাজে ...াল তোমার! কামিখ্যের কথা? সব ...া—সব ভুয়ো! এখন যাও, শীগ্‌গির ...ী হয়ে নাও। নিমন্ত্রিতেরা সব এলেন ...! আমি ততক্ষণ খানিকটে কাজ সেরে ...। তারপর পেট ভরে তোমার গান ...বো। রণেন এলেই তাকে আমার কাছে ...ঠিয়ে দিও কিন্তু!

[কাগজের বাণ্ডিল হাতে করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন]

নীরদা। (দরজা বন্ধ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) সে তা পারে—সে করবেই তা। আমি কিন্তু করতে দেব না—কখখনো না। আর যাই হোক্, সেটি কিন্তু হতে দিচ্চি না।—ও কে আবার আসচে? ঠাকুরপো না? হ্যাঁ, সেই ত! ওকেও কিন্তু জানতে দেব না—আর যাই হোক সে কথা কিন্তু জানতে দেওয়া হবে না—

(দরজা খুলিয়া দিলেন)

এস ঠাকুরপো। আমি দূর থেকেই তোমায় দেখেছিলুম। ওঁর কাছে এখন যেয়োনা—উনি ব্যস্ত আছেন।

রণেন্দ্র। আর তুমি, বৌদি?

নীরদা। কাজ-কর্ম্ম সেরে তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি আর কি। বসোনা, ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক্।

রণেন্দ্র। আমিও ত তাই চাই, বোঠান্। যে কটা দিন আছি, তোমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেই কাটিয়ে দি।

নীরদা। আহা, কথার শ্রী দেখ না!

রণেন্দ্র। শুনেই যে ভয় পেয়ে গেলে, বৌদি।

নীরদা। আজ তুমি কেমন আছ ঠাকুরপো?

রণেন্দ্র। যেমন থাকি। এগিয়ে চলেচি আর কি! তবে এত শীগ্‌গির যে অন্তিম-যাত্রা করতে হবে, তা ভাবি নি।

নীরদা। একটুতেই তোমার বাড়াবাড়ি। অসুখ করেচে, সেরে যাবে। অত অস্থির হলে কি চলে?

রণেন্দ্র। একেবারে সারবে, বোঠান্!

নিজে ত আমি ডাক্তার, আমি বেশ ভাল রকম হিসেব করে দেখেচি, পরমায়ুর পুঁজি আর আমার বড় নেই। এক মাসের মধ্যেই দেউলে হব আর কি! বেশী দিন না, এক মাস। তার পরেই ভব-পারে যাত্রা করব।

নীরদা। কি যে বল তুমি!

রণেন্দ্র। ব্যাপারটাই যে বিশ্রী, বোঠান। কিন্তু এখনও হয়েচে কি! যা দেখ্‌চ, এর চেয়েও বিশ্রী হয়ে দাঁড়াব, এই ক'দিনের ভেতর। এখন তবু উঠে হেঁটে বেড়াই, তখন আর তাও পারব না। তখন এক এক বার খবর নিও বোঠান। দাদাকে কিন্তু যেতে দিও না। উনি সৌখীন লোক। এ সব বিশ্রী জিনিষ ওঁর ধাতে সইবে না। আমার ওখানে ওঁর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

নীরদা। আজ তুমি যা-নয়-তাই বকে যাচ্চ। একটু সুস্থির হও, মনটাকে প্রফুল্ল কর দিকি।

রণেন্দ্র। মৃত্যু যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার আবার সুস্থিরতা, তার আবার প্রফুল্লতা! দোষ করে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অপরে। দুনিয়ার নিয়ম কি চমৎকার!

নীরদা। আঃ, কি ছাই বক্‌চ। চুপ কর—অন্য কথা কও না!

রণেন্দ্র। ঠিক বলেচ বোঠান, কি ছাই বক্‌চি! আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্চি নে, কি অপরাধ আমি করেচি, যার জন্যে আমার এই শাস্তি।

নীরদা। তুমি অধীর হচ্চ কেন, ঠাকুরপো? তোমায় আমরা অকালে হারাব না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

রণেন্দ্র। সয়ে যাবে। দুদিনেই আবার সয়ে যাবে। যারা চিরদিনের মত যায়, তা কথা শীগ্‌গিরই লোকে ভুলে যায়।

নীরদা। তোমার কথা ভুলে যাব, ঠা রপো?

রণেন্দ্র। মানুষ নিত্য-নূতন বন্ধনে পড়ে, আর পুরাতনের কথা দুদিনে ভুলে

নীরদা। আমরা নূতন বন্ধনে পড়ব —?

রণেন্দ্র। দাদা আর তুমি দুজনে তোমার নিজের ত দেখ্‌চি, এরই মধ্যে সূত্রপাত হয়েচে। আচ্ছা বোঠান, তো বন্ধুটি যাঁর নাম লীলাদিদি, তোমার কাছে জন্যে তিনি এসেছিলেন, আর সমস্ত স তোমরা কিসের পরামর্শ আঁট্‌ছিলে?

নীরদা। কেন ঠাকুরপো, তাকে দে কি তোমার হিংসে হচ্চে নাকি?

রণেন্দ্র। হ্যাঁ হচ্চে। সেই আমার স্থা দখল করবে। আমি যখন চলে যাবো, তখ এই স্ত্রীলোকটিই—

নীরদা। আহা, চুপ, চুপ,—চেঁচিও না লীলাদিদি এই পাশের ঘরেই আছেন।

রণেন্দ্র। এ বেলাও আবার এসেচেন তবেই বুঝতে পারচ, আমার কথা—

নীরদা। ওঁর জন্মোৎসবে নেমন্তন্ন করেচি তাই এসেচেন। তুমি নেহাৎ অবুঝের ম কথা বলচ, ঠাকুরপো। আচ্ছা, একটা ক বলি? একটা জিনিষ চাইব, দেবে?—না কাজ নেই।

রণেন্দ্র। কি জিনিষ, বোঠান?

নীরদা। তুমি যে আমার হিতৈষী, বন্ধু তারই একটা শক্ত পরিচয় আমি নিতে চাই। তুমি তা দিতে পারবে কি?

রণেন্দ্র। হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।

নীরদা। আমার তা হলে অসীম উপকার হবে।

রণেন্দ্র। মরতে ত বসেচি। এ সময় মার একটা উপকার করব, সে লোভ কি তে পারি?

নীরদা। কিন্তু তুমি জান না, ব্যাপারটি রকম গুরুতর।

রণেন্দ্র। তা সে যত গুরুতরই হোক্।

নীরদা। সে ব্যাপার আবার সকল জ্ঞান- র বাইরে। আমি ভাল করে তা বুঝি- ও তোমায় বলতে পারি না। এতে মার পরামর্শ, তোমার সাহায্য চাই, আর ই তোমার অনুগ্রহ।

রণেন্দ্র। বুঝতে পাচ্চি না তোমার কথা। লেই বল না, কি? কেন, বিশ্বাস হচ্চে না?

নীরদা। একমাত্র তোমাকেই আমার শ্বাস হয়, সেইজন্যে আমার গোপন কথাটি তোমাকেই বলতে চাই। জানি, এ বিপদে মি আমার বন্ধু,— একমাত্র সহায়। তুমি—

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। বাবু ডাক্‌চেন ডাক্তার বাবুকে। রও সেখানে অনেকে এসেচেন। (প্রস্থান)

নীরদা। এখন তবে বলা হল না— অনেক কথা। তুমি তবে এখন যাও। ন্য সময় সব বলব।

রণেন্দ্র। (উঠিয়া) কাজে কাজেই। াদার আর তর সইল না।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

(ঝি প্রবেশ করিল)

ঝি। (চুপি চুপি) মা, সে লোকটা নেকক্ষণ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!

নীরদা। কে, কামিখ্যে বুঝি! তাকে বিদায় করে দিলি নে কেন?

ঝি। বলতে কসুর করিনি মা, কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। তোমার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবে।

নীরদা। হতচ্ছাড়া, পাজি! আচ্ছা, এক কাজ কর্, তাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়। দেখিস্, যেন এর বাষ্পও না কেউ টের পায়।

(ঝি চলিয়া গেল)

কি ভয়ানক! কপালে কি আছে, জানি না। (নীরদা পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিলেন। কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল— তাহার আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা) আস্তে কথা কয়ো, উনি বাড়ীতেই আছেন।

কামাখ্যা। আমার তাতে বয়েই গেল।

নীরদা। কি চাও তুমি আমার কাছে?

কামাখ্যা। একটা কৈফিয়ৎ।

নীরদা। আচ্ছা, চট্‌পট্ সেরে নাও— কিসের কৈফিয়ৎ?

কামাখ্যা। চাকরিটি আমার গেছে। কেমন, আপনি জানেন ত?

নীরদা। কি করব, রাখতে পারলুম না। তোমার জন্যে বলতে কসুর করিনি, কিন্তু কোনই ফল হল না।

কামাখ্যা। আপনার স্বামী তাহলে আপনাকে এতটুকুও খাতির করেন না দেখ্‌ছি। তিনি জানেন, এতে আপনার কি রকম অনিষ্ট হবে—জেনেও তাঁর এ সাহস হল?

নীরদা। আমার স্বামীর সম্বন্ধে একটু সম্ভ্রম করে কথা কয়ো। তিনি যে এ সব

জানেন, সে ধারণা তোমার কিসে হল? তুমি কি চাও এখন তাই বল। বেশী কথা কইবার আমার সময় নেই।

কামাখ্যা। একবার দেখা করতে এলুম। আজ আমি সমস্ত দিন কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। আমি একজন কেরাণী, অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, কিন্তু আমারও হৃদয় আছে—মায়া-মমতা আছে।

নীরদা। তা হলে আমার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুরতা কচ্চ কেন? আমার ছেলেদের কথা, সংসারের কথা একবার ভেবে দেখ—

কামাখ্যা। আমায় ভাবতে বলচেন, কিন্তু আপনি বা আপনার স্বামী আমার কথা একবারও ভেবেচেন কি? যাক্ সে কথা। আমি কেবল আপনাকে জানাতে এসেছিলুম, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন, আমার দ্বারা প্রথমেই এ বিষয়ের কোন রকম আন্দোলন হবে না।

নীরদা। না, তুমি তা করবে না, আমি জানি।

কামাখ্যা। সমস্ত গোলমাল আপোশে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে। অন্য কেউ এর বাষ্পও টের পাবে না—কেবল আমরা তিন জনেই যা জানব।

নীরদা। আমার স্বামীকেও এর কিছু জানতে দেওয়া হবে না।

কামাখ্যা। তা কি করে হতে পারে? বাকী টাকা কি আপনি নিজেই দিতে পারবেন মনে করেন?

নীরদা। না, এখনই সব টাকা আমি দিতে পারব না।

কামাখ্যা। শীগ্‌গির শোধ দেবার [illegible] উপায় ঠিক করেছেন কি?

নীরদা। না, কোন উপায়ই আমার [illegible]

কামাখ্যা। উপায় থাকলেও এখন [illegible] সেটা কোন কাজেই আপনার লাগচে [illegible] সব টাকা হাতে নিয়ে যদি আপনি দাঁড়ি[illegible] এখন থাকতেন, তা হলেও সে কাগজ[illegible] আমি ফিরিয়ে দিতুম না।

নীরদা। কেন? সে কাগজ [illegible] আপনি কি করতে চান?

কামাখ্যা। কেবল রেখে দেব—[illegible] কিছু না। আমার কাছেই থাকবে [illegible] কেউ কিছু টের পাবে না! কোন [illegible] নেই আপনার।

নীরদা। (নতমুখে নীরব রহিলেন)

কামাখ্যা। মন থেকে সব দুর্ভা[illegible] মুছে ফেলুন।

নীরদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, একেবারেই সব মুছে ফেলব।

কামাখ্যা। অ্যাঁ, আপনি মনে [illegible] কোন গুরুতর সঙ্কল্প আঁট্‌ছেন না কি?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।

কামাখ্যা। না, না, ও সব ভাবনা [illegible] দিন।

নীরদা। আমি কি ভাবচি না ভাবচি [illegible] তুমি তার কি জানবে?

কামাখ্যা। ভাবনার ধরণটা অনেকে[illegible] এক রকম কি না! আমিও একটি[illegible] ভেবেছিলুম, কিন্তু সাহস হয় নি।

নীরদা। (নিরুত্তর রহিলেন)

কামাখ্যা। আপনারও সে সাহস হয়[illegible] না, নিশ্চয় বলতে পারি।

[illegible]নীরদা। (নতমুখে) না, আমার সে [illegible]হস নেই।

কামাখ্যা। যাক্, এক দায় থেকে বাঁচ-[illegible]ম। দেখুন, আমার স্বামীর জন্যে একখানা [illegible]ঠি আমি সঙ্গে এনেচি।

(পকেট হইতে চিঠি বাহির করিল)

[illegible]নীরদা। সব কথা ওতে লেখা আছে [illegible]ঝি?

কামাখ্যা। হাঁ, যতদূর সম্ভব নম্রভাবে [illegible]ছিয়ে সব কথা বলেছি।

[illegible]নীরদা। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) না, [illegible]! কিছুতেই তাঁকে দিতে পাবে না। ও [illegible]ঠি ছিঁড়ে ফেল বলছি—এখনি ছিঁড়ে [illegible]ল। যেমন করে পারি, আমি টাকা [illegible]ব তোমায়।

[illegible]কামাখ্যা। মাপ করবেন, সেটি করতে [illegible]রবো না।

[illegible]নীরদা। তোমার বাকী টাকার কথা [illegible]মি বল্‌চিনে। যে টাকা তুমি আমার [illegible]মীর কাছে চাও, সেই টাকা আমিই [illegible]তামাকে দেব।

[illegible]কামাখ্যা। একটি পয়সাও ত আমি [illegible]র কাছে চাই নি!

[illegible]নীরদা। কি চাও তবে?

[illegible]কামাখ্যা। শুনুন। আমি নিজেকে [illegible]নঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাতে আপনার [illegible]মীর সাহায্য দরকার। এ-ক'বচ্ছর অত্যন্ত [illegible]দুঃখে কষ্টে আমি দিন কাটিয়েচি, তা ছাড়া [illegible]কোন মন্দ কাজ করিনি। নিজের সামান্য [illegible]উপার্জ্জনেই আমি সন্তুষ্ট ছিলুম। এখন তাও [illegible]গেল। তাই আমি চাই, একটি ভাল রকম [illegible]চাকরি, এই ব্যাঙ্কেই যে কোন উপায়ে হোক্ আমায় সে চাকরি পেতেই হবে। এতে আপনার স্বামীর সম্পূর্ণ হাত—তাঁকে দিয়ে এ কাজ করাতেই হবে।

নীরদা। তিনি কিছুতেই তা করবেন না।

কামাখ্যা। করতেই হবে তাঁকে। আমায় সাহায্য করতে তিনি বাধ্য। তারপর কাজে ঢোকা মাত্রই দেখে নেবেন, কি ব্যাপার হয়! এক বছরের মধ্যে আমি ম্যানেজারের ডান হাত হয়ে দাঁড়াব। তখন আমিই হব আসলে ব্যাঙ্কের হর্ত্তা-কর্ত্তা।

নীরদা। (হাসিয়া) কখনই তা হবেনা।

কামাখ্যা। কেন? হবে না কেন? এ হতেই হবে।

নীরদা। (নতমুখে) আমার এখন সাহস হয়েচে।

কামাখ্যা। (নীরদার কথা কাণে না তুলিয়া আপন মনে) একবার ঢুকতে পারলে হয়। দুদিনে তাকে নিজের বাধ্য করে ফেলবো।

নীরদা। অসম্ভব!

কামাখ্যা। (উত্তেজিতভাবে) আপনি ভুলে যাচ্চেন কেন যে আপনার মান-সম্ভ্রম এখন আমারই হাতে। (নীরদা কঠিন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন) শুনুন, আমার কথা। এখনো আপনি সাবধান হয়ে যান। বোকার মত কোন কাজ করবেন না। হেমন্তবাবু এই চিঠি পেয়ে একটা কিছু করবেনই—আপনারও তা জানতে বাকী থাকবে না। এই যে অপ্রীতিকর কাজে আমায় হাত দিতে হল, এর জন্য আপনার স্বামীই দায়ী! আমার ত এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি তাঁকে এইবার দেখে নেব। তবে, চল্লুম এখন—বিদায়।

(দ্রুত প্রস্থান করিল)

নীরদা। (পূর্ব্বোক্ত কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দরজা অল্প ফাঁক করিয়া সম্মুখস্থ বারান্দার দিকে দেখিতে লাগিলেন) চলে গেল। যাক্, চিঠিখানা বাক্সে তা হলে ফেলবে না। নাঃ, তা কি পারে? শুধু ভয় দেখাচ্ছিল বোধ হয়! বেচারীর কিন্তু বড় কষ্ট। ও কি! এখনও দাড়িয়ে আছে যে! সর্ব্বনাশ, চিঠির বাক্সের দিকে যাচ্ছে যে! ওই ত, ওই ত চিঠিখানা ফেলে দিয়ে চলে গেল! ওই যে দেখা যাচ্চে চিঠিখানা। সর্ব্বনাশ, এবার সত্যি সত্যি সর্ব্বনাশ হল।

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

কেও, লীলাদিদি! এস ত এদিকে।

লীলাবতী। কি হয়েছে? এত অস্থির দেখ্‌ছি কেন?

নীরদা। এস না এদিকে। দেখ ত বাক্সের ভেতর চিঠি একখানা দেখতে পাচ্ছ কি! ঐ যে সামনে—চিঠির বাক্সের ভিতর?

লীলাবতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই ত রয়েছে।

নীরদা। কামিখ্যে ওখানা ফেলে গেল।

লীলাবতী। ও—কামিখ্যের কাছেই টাকা ধার নিয়েছিলে?

নীরদা। হ্যাঁ দিদি, উনি এবার সবই জানবেন।

লীলাবতী। আমার ত মনে হয় বোন্, সেটা তোমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল।

নীরদা। তুমি ত সব কথা জান না দিদি। আমি যে একটা নাম জাল করেছিলুম।

লীলাবতী। সর্ব্বনাশ! সে কি ব্যা

নীরদা। একটি কথা কেবল তুমি আমায় রাখ, দিদি। তুমি আমার সাক্ষী থাক।

লীলাবতী। কিসের সাক্ষী!

নীরদা। যদি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়—সে রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়—যদি—

লীলাবতী। নীরদা,—

নীরদা। কিম্বা যদি এমন হয় যে, কোন কারণে আমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়—

লীলাবতী। নীরদা, সত্যই দেখ্‌ছি তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে।

নীরদা। আর এমন যদি হয় যে, কোন লোক নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিতে চায়—বুঝতে পাচ্চ?—তা হলে—

লীলাবতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পাচ্চি কিন্তু তুমি কি অনুমান কর যে—

নীরদা। তা হলে দিদি, তুমি আমার হয়ে সাক্ষী দিয়ে বলো যে সব মিথ্যে। এবং আমার মাথা এতটুকুও খারাপ হয়নি—আমি সজ্ঞানে বল্‌চি, এই ব্যাপারের জন্যে অন্য কেউ এতটুকুও দায়ী নয়। একা আমি নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ করেচি। মনে রেখো দিদি, আমার এ কথা।

লীলাবতী। নিশ্চয় রাখব। কিন্তু আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

নীরদা। কি করে পারবে বল। দেখ দিদি, একটা মজা হয়ত এখনি দেখতে পাবে।

লীলাবতী। কি মজা?

নীরদা। ভারী মজা। কিন্তু কি

ক্ষয়! না—কিছুতেই হতে দেবনা তা—প্রাণ গেলেও না।

লীলাবতী। আমি এখনই গিয়ে কামিখ্যের সঙ্গে দেখা করব।

নীরদা। যেওনা দিদি, যেওনা। সে হলে তোমারও সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে।

লীলাবতী। আমার কোন অনিষ্ট করবার সাহস তার হবে না। সে আমায় ভাল রকম চেনে।

নীরদা। তোমায় সে ভাল রকম চেনে?

লীলাবতী। হ্যাঁ। আমি একদিন তার বিশেষ উপকার করেছিলুম—বিষম সঙ্কট থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলুম। আমি মিশনের কাজ ছেড়ে যে ভদ্রলোকটির বাড়ীতে শুশ্রূষিত্রীর কাজ কর্ত্তুম, কামিখ্যেও সেখানে রোজ যাতায়াত করত—তার মোক্তারির কাজ-কর্ম্ম নিয়ে। যাক্, সে অনেক কথা—আর একদিন বলব তখন। এখন বল দেখি, কামিখ্যে এখানে কোথায় ও থাকে?

নীরদা। ঝিকে জিজ্ঞাসা কর।

(হেমন্ত আসিয়া দরজায় ঘা দিলেন)

এই যে তুমি! কি চাও?

হেমন্ত। (বাহির হইতে) বলি, আমি ঘরের ভিতর একবার যেতে পাব কি?

নীরদা। একটু থাম, লক্ষ্মীটি। এই জামার কাপড় পরা হল আর কি!

(লীলাবতীর প্রতি—নিম্নস্বরে)

গিয়ে আর কি হবে দিদি? এখনি ত উনি চিঠির বাক্স খুলবেন।

লীলাবতী। চাবি কোথায়?

নীরদা। ওঁরই কাছে।

লীলাবতী। কামিখ্যেকে গিয়ে ধরব। কোন না কোন অছিলায় সে এখনি তার নিজের চিঠি ফিরে চাইবে।

নীরদা। কিন্তু অত করবার সময় কোথায় দিদি? এখনি ত উনি বাক্স খুলবেন—রোজ এই সময় খুলে থাকেন।

লীলাবতী। তুমি এক কাজ কর—যেমন করে পার ওঁর মন অন্যদিকে লাগিয়ে রাখ। আমি এই চল্লুম—এখনি ফিরে আসবো।

(দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

[নীরদা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী অতি-দ্রুত যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া পরদাটি সরাইয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পাধারের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত বাতিগুলি জ্বালাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ খানি ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল—পুষ্পের সুমধুর গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইল। এইবার তিনি একখানি সুন্দর বসন পরিধান করিলেন। তারপর, নিঃশব্দে কক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বাজনার নিকট গিয়া বসিলেন এবং গান ধরিলেন]

"ওহে সুন্দর,মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি!
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি!
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি এনেছি যুঁথি জাতি।
তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী!"

[গানের শব্দ পাইয়াই হেমন্ত ঘরে ঢুকিয়া একখানি আসন দখল করিয়া বসিয়া

ছিলেন। নীরদার সঙ্গীতে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব পুষ্পসজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও মোহিত হইতেছিলেন]

হেমন্ত। এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আচ্ছা, তোমার মতলবখানা কি? আজ কি ফুল-শয্যার পুনরভিনয় হবে নাকি? তা বেশ! কিন্তু একা একা শুনলে ত চলবে না। রণেন বেচারা কি দোষ করলে? ছেলেরা সব গেল কোথা? আমি চিঠির বাক্সটা খুলে, চিঠিপত্র গুলো দেখে শুনে ওদের সবাইকে নিয়ে আস্‌চি। (উঠিতে উদ্যত হইলেন)

নীরদা। (বাজনার সুর দিতে দিতে) ছেলেরা ঘুমুচ্চে। আর কাউকে এখন ডাকতে হবে না। খাবার তৈরী হতে এখনও দেরী আছে। ততক্ষণ আমরা একটু গান করি, বসো। ওগো, তুমি একাই শোনো, আমি গাই—

(নীরদা গান ধরিলেন)

"আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথা-ভরা ফুলের ভারে গো,
আমি যে আর সইতে পারিনে।
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে॥"

(হেমন্ত গানে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল নীরদা তাঁহার দিকে কটাক্ষমাত্র করি আবার গান ধরিলেন)

"মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়!
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়-রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥"

নীরদা। আঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

হেমন্ত। সুন্দর! ভারি চমৎকার —আচ্ছা, তুমি একটু জিরোও, আমি ততক্ষণ চিঠিগুলো বার করে নিয়ে আসি, এখানে বসে বসে দেখবো—অনেক জরুরী খবর আসবার কথা।

(হেমন্ত উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র নীরদা আবার গান ধরিয়া দিলেন)

"ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথ-রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।"

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমন্ত কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন)

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সাহিত্য

(ফরাসী হইতে)

২

স্বদেশী ভাষায় গ্রন্থরচনা

অবশ্য, য়ুরোপের প্রভাবাধীনে ভারতবাসীদিগের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এক্ষণে উহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থশাস্ত্র, দর্শনের অনুশীলন করিয়া থাকে। উহারা প্রাচ্য দেশের লোক, উহাদের কি তবে কবিতা গল্প ও ব্যঙ্গরচনা আর ভাল লাগে না? সাহিত্যের এই সকল বিভাগের অনুশীলন উহাদের দেশীয় ভাষায় হইয়া থাকে। ইংরেজীর অনুকরণে সমস্তই রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমাশ্চর্য্য আখ্যানের পরিবর্ত্তে ঐতিহাসিক উপন্যাস, তারপর সামাজিক উপন্যাস; যাত্রা ও পৌরাণিক নাটকের পরিবর্ত্তে, সামাজিক নাটক। য়ুরোপীয়দিগের অন্তর্মুখী কবিতা, প্রাচ্যদিগের বহির্মুখী কবিতার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে ও খুব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া লিখিবার যে রীতি আছে—দেশীয় ভাষাকে দুম্‌ড়াইয়া মোচড়াইয়া সেই লিখন-রীতির উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়।

* * *

এক্ষণে, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের অনুসরণ করা যাক্।

উর্দ্দু। ১৯ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, ১৮ শতাব্দীর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী গতানুগতিক ধরণের কবিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রকার কবি ছিলেন মুমিন্ (১৮৫২ অব্দে মৃত্যু হয়); নাশির (১৮৪২ বা ৪৩ অব্দে মৃত্যু হয়); আতাস্ (১৮৪৭ অব্দে মৃত্যু হয়)।

মামনূনের একটি কবিতার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

"রাত্রে, বুল্‌বুলের ন্যায় আমার আর্ত্তনাদ উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের তীর আমার পাষাণ হৃদয়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে...

বন্ধুবিনা আমি আর কার কাছে বিশ্বাস করিয়া আমার হৃদয়-বেদনা নিবেদন করিব, আমার হৃদয় আমার বক্ষকেই বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে...

যখন আমার কলম আমার হৃদয়-জ্বালা কাগজে লিপিবদ্ধ করে তখন সেই কাগজ হইতে অনল-শিখা নিঃসৃত হয়"...(১)

কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, আইন ও ধর্ম্মের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে আরব ও পারসীকদিগের পুরাতন শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহের পুনরাবৃত্তি আছে।

৩০ বৎসর হইতে, প্রচুর পরিমাণে (১৯০০ অব্দে ১০৭৪ গ্রন্থ মুদ্রিত) সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় গ্রন্থাদির অনুশীলনে নূতন ভাব মিশ্রিত হইয়া এই সকল গ্রন্থকে একটু রূপান্তরিত করিয়াছে। মুসলমান কবিতা-গ্রন্থ ও ধর্ম্ম-গ্রন্থে গতানুগতিক আদর্শটি বজায় আছে; কিন্তু উপন্যাস ইংরেজী গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিস্তর অনুবাদ:—সেক্স-পিয়ার, লিটন্ ("পম্পেয়াইর শেষদিন" পর্য্যন্ত); আবার অনেক দুর্নীতিমূলক উপন্যাস, চুরী ও গুপ্তহত্যার গল্প।

এই তিন বৎসরের মধ্যে, কতকগুলি চিত্তাকর্ষক রচনা বাহির হইয়াছে—"তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধ", "সাদীর কবিতার সমালোচনা", "আমীর আবদুল-রহমানের জীবনী", "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (কমান ব্রিটানিয়া)।

* * *

বস্তুতঃ লিখিত-হিন্দী একটি সাহিত্যিক ভাষা। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল অসংখ্য উপভাষা কথিত হয়, হিন্দী তাহা হইতে ভিন্ন। এই আধুনিক কালে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষাগুলি যেরূপ শক্তি-শালী সাহিত্য উৎপাদন করিয়াছে, হিন্দী সেরূপ পারে নাই।

১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কবি লাল্লুলাল "প্রেম-সাগর" নাম দিয়া ভাগবদগীতার অনুবাদ করেন; এই প্রেমসাগর ও তুলসী দাসের রামায়ণ—এই দুই গ্রন্থই হিন্দুস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য লোকেরা কথককে ঘিরিয়া বসে; কথক প্রেমসাগরের ছন্দোবদ্ধ গদ্যরচনা সুর করিয়া গান করে, প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের প্রেম-লীলা ও মৃত্যুর বর্ণনা করে।

প্রেমসাগর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—রাজকুমারী রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইয়াছে। রুক্মিণীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহাদের এই বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। রুক্মিণী মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ:—"এই ললনার মৃত্যু আসন্ন", এই কথা বলিয়াই, স্বকীয় দিব্যরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া, দুই বাহুতে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া, নিজের জানুর উপর বসাইলেন; তৃতীয় হস্তের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, চতুর্থ হস্তের দ্বারা আলুলায়িত অলকদাম ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিলেন—কখন-বা হরি স্বকীয় রেশমী বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার চন্দ্রবদন মুছাইতে লাগিলেন, কখন-বা তাঁহার কোমল করপদ্ম তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন।

হরি বলিলেন:—"সুন্দরি, প্রিয়তমে, তোমার হৃদয়ে সাহস নাই, তাই, আমি যাহা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম তুমি তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছ; তুমি সত্যই মনে করিয়াছ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আশ্বস্ত হও প্রিয়ে, তোমার মনকে শান্ত কর, চক্ষু উন্মীলন কর; যতক্ষণ না তুমি আমার সহিত কথা কহিবে, ততক্ষণ আমার মনের কষ্ট দূর হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া রুক্মিণীর আবার চৈতন্য হইল, রাজকুমারী স্বকীয় পদ্মনেত্র উন্মীলন করিলেন। "কিন্তু একি! আমি কৃষ্ণের কোলে?"—নিজের এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং হরির চরণতলে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন (২)।

প্রেমসাগর ও তৎসদৃশ গ্রন্থাদির প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে সংরক্ষিত হইয়াছে; জন-সাধারণ, রমণীবৃন্দ, এবং অনেক শিক্ষিত হিন্দু এখনো অতীত ছাড়া আর কিছুই মানিতে চাহে না। কিন্তু ভালই হোক্, মন্দই হোক্, বলপ্রদই হউক বা অস্বাস্থ্য-

(১) Garcin de Tassy, Litterature Hindouie et Hindostanie.

করই হউক, উপন্যাসে কিংবা আরও গম্ভীর ধরণের রচনায়, বর্ত্তমানের প্রভাব এখনই অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি, বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও (১৮৯৯ অব্দে ৭৯৯ গ্রন্থ, ১৯০০ অব্দে ৭০০ গ্রন্থ) হিন্দী সাহিত্যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।

* * *

পক্ষান্তরে, গত শতাব্দীতে যে ভাষা উল্লেখযোগ্য ছিল না, সেই গুজরাটী ভাষা,—বোম্বাই প্রদেশের উন্নতি ও পার্শীদিগের বর্দ্ধনশীল প্রভাবের কল্যাণে—ভারতের একটি প্রধান ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গুজরাটী লেখকের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ—মালাবারী। বোম্বায়ের দুই ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও ইংরেজী আখ্যান ও পদ্যের গ্রন্থকার মালাবারী, গুজরাটী কবিতার জন্যই বেশী প্রসিদ্ধ। "নীতিবিনোদ", "তরোদ্-ই-ইত্তেফক্" এবং খুব হালে "জীবনের অভিজ্ঞতা" (অনুভাবিক) (১৮৯৪) এবং "মনুষ্য ও জগৎ" (১৮৯৮) এই গ্রন্থগুলি তাঁহার রচিত। জীবন-চাঞ্চল্যে অনুরঞ্জিত ও মৈত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত মালাবারীর যে কবিতা সেই কবিতার লিখন-ধারা ও মর্ম্মভাব সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয়। (৩)

(২) প্রেমসাগর (Chap. LXI) Trad. Pincott, P. 215.

(৩) জননীর মৃত্যুতে মালাবারী নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন; ইহা আমি M. Tissot-র অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

"যখন আমার পরম পূজনীয়া মাতার মৃত্যু হইল, আমি মর্ম্মাহত হইয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, আমার দুঃখ-শান্তির জন্য কোথায় মাথা রাখিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না! হতভাগ্য মা আমার, তাঁর অদৃষ্টে কত দুঃখই ছিল। বসন্তের আরম্ভেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-কুসুম শুকাইয়া গেল; তাঁহার জীবন-শিখা অস্থির ভাবে জ্বলিতে লাগিল—মনে হইল যেন এক ফুৎকারেই নিবিয়া যাইবে।

মালাবারীর রচনা হইতে গুজরাটী সাহিত্যের মূল্য বুঝা যায় এবং নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কগুলি হইতে, গুজরাটী সাহিত্য যে একটা "টেলিমেকসের" অনুবাদ একটি। ১৯৯ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তাহাও উপলব্ধি করা যায়:—১৮৯৯ অব্দে ৪৪৪ গ্রন্থ মুদ্রিত ৪৫৩ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তাহার অন্তর্

, "তথাপি, যখন বৎসরের পর বৎসর দারুণ দুঃখ আসিয়া তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণকে এবং ব্যাধি আসিয়া তাঁহার দুর্ব্বল দেহকে অধিকার করিল, তখন এই রোগে তাপে আকুল হইয়াও, মধুরতম সুধারসে আমার মেয়ে পুষ্টিসাধনের জন্য যত্ন করিতে তিনি ভুলেন নাই!

বসন্ত-সমীরণে গোলাপ-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ তাঁহার স্নেহের চুম্বনে আমার কপোলদেশ পুনরায় বিকসিত হইয়া উঠিত।

"মাতৃ-হারা শিশুর কি দুর্ভাগ্য।...ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্য এই অনাথ শিশু স্বকীয় ভগবদ্দত্ত শক্তি হইতে সুফল লাভ করিবে এবং অনেক গুপ্ত সুখের আস্বাদন করিবে; কিন্তু আর কখনই সেরূপ পূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে না। মাকে হারাইলে পুত্র কি করিয়া সুখী হইবে?" *

নিদ্রাহীন জীবন

"হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর! তোমার সেবক না জানি কি দোষ করিয়াছে? আমার অতীত জীবন যখন আলোচনা করি—দেখিতে পাই, তখনকার দিনগুলি ভাল ভাবে কাটে নাই; আমার অন্তরের অন্তর প্রদেশ যতই কেন তলাইয়া দেখি না—বিশুদ্ধ জীবনের কোন্ নিয়ম আমি লঙ্ঘন করিয়াছি তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ধনী দরিদ্রের মধ্যে আমার হৃদয় একটুও পার্থক্য কখনো স্থাপন করে নাই।

"তবে কেন, হে সর্ব্বশক্তিমান, আমার হৃদয়ে শান্তি পাই না! তবে কেন আমার মনে শান্তি নাই, আমার এই হতভাগ্য দেহ স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত? আমার অপরিচিত বন্ধু এই কবিতার পাঠকবৃন্দ, তোমরা আমার এই জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর—যে জীবন চিরদিন নিদ্রা হইতে বঞ্চিত।

"আমার ১০ বৎসর বয়স হইতে আমি নিদ্রার আরাধনা করিয়া আসিতেছি, আজ চল্লিশে পড়িয়াছি, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমি একটি রাত্রিও চোখ বুজিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না; নিদ্রামগ্ন হইয়া দিবসের ভাবনা-চিন্তা কখনই ভুলিতে পারি নাই।

"দিবালোকে আমি যে সকল চিন্তায় মগ্ন থাকিতাম, যে সকল প্রাণী আমার পাশ ঘেঁসিয়া যাইত, যে সকল দৃশ্য আমার নেত্র-পথে পতিত হইত—সে-সমস্ত নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমার স্মৃতিপটে নূতন ভাবে আবির্ভূত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কত অদ্ভুত বিকট আকার ধারণ করিত। দারুণ ভয়ে আমার হাতের তেলো পর্য্যন্ত ঘামিয়া উঠিত।

"দিবালোকে যখন আমি ভাবিতাম আমার মতো কত হতভাগ্য লোক এইরূপ কষ্ট পাইতেছে, তখন আমার মন কারুণ্যরসে আপ্লুত হইত; কিন্তু যখন আবার ধরণীমণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হইত এই করুণাই আমার কল্পিত দৃশ্যগুলিকে আরও তীব্র ও উজ্জ্বল আকারে অঙ্কিত করিয়া আমার অন্তঃকরণকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিত।

"আমার স্বভাব এইরূপ যে, যদি কোন রোরুদ্যমান বিধবা আমার নেত্রপথে পতিত হয়, তখন আমার মন হয়, আমি যেন আর একটা জীবন ধারণ করিয়াছি এবং পুরুষ হইয়াও আমি যেন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যদি কোন রোগী, কিংবা অন্ধ, কিংবা কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, তখনও আমার

কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ (৪)।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন আর দুই ভাষা উল্লেখযোগ্য। মরাঠী (২৪২ গ্রন্থ ১৯০০ অব্দে প্রকাশিত) ও পাঞ্জাবী (৩৯৭ গ্রন্থ)।

মরাঠী সাহিত্যে—কবিতা, উপন্যাস ও অনুবাদ।

পাঞ্জাবীতে অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য—কতকটা মুসলমানী ও কতকটা হিন্দু ধরণের (৫)

দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলিরও উন্নতি হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটির প্রচুর সাহিত্য আছে:—তামিল (১৯০০ অব্দে ২৮৬ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়),তেলুগু (২৫৮ গ্রন্থ) ও মলয়লম্ (৩৯ গ্রন্থ)। কিন্তু এই সকল মুদ্রিত গ্রন্থের অধিকাংশই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান ও উপন্যাস; —উপন্যাসগুলি তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। শিক্ষিত মাদ্রাজীরা ইংরেজী লিখিতেই বেশী ভাল বাসে: ১৯০০—১৯০১ অব্দ মধ্যে ১২২৯ ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই ৩৬৮ গ্রন্থ রেজেষ্টারি হয়।

*
* *

সমস্ত ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে, ভারতবাসীদিগের য়ুরোপকে জানিবার চেষ্টা, য়ুরোপকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়; কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশে একটা "লজিক্যাল" ধরণের ও একটা সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানানুশীলন-ক্ষেত্রে একটা গৌণ স্থান অধিকার করিত; তথাপি, হিন্দু চিন্তা-প্রবাহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বঙ্গের সাহিত্যিক ইতিহাসে বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মধ্যযুগে সংস্কৃত গ্রন্থের সরল অনুবাদ:—কাশীরাম

দের ঐরূপ অবস্থা হয়। আতঙ্ক, মৃত্যুভয়, অন্ধতার যন্ত্রণা, দারিদ্র্য-কষ্ট অনুভব না করিয়া আমার জীবনের একদণ্ডও কাটে নাই।

"এই হতভাগ্যদের আর্ত্তনাদ দিবারাত্রি আমাকে অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের যাচ্ঞা ক্রমাগত আমার মনকে আলোড়িত করিতেছে। একমুহূর্ত্তও তাহাদের কথা আমার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় না। যতক্ষণ না আমি এই হতভাগ্যদিগের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হই ততক্ষণ হাসিতেও সাহস করি না।

"যেন একটা প্রকাণ্ড ভারী পাথরের চাপে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। মানবের অপরিমেয় অনন্ত দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবিয়া আমার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে! আমার অ-জানা বন্ধু সকল! যখন আমি শয্যায় শয়ন করি, তখন এই সকল দুঃখ-কষ্টের চিন্তা আমাকে অনুসরণ করে, এবং অনিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া আমি অবিরাম এপাশ ওপাশ করিতে থাকি।

(৪) তিন জন পার্শী মহিলা (১৯০০-১৯০১) গুজরাটীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করেন—"প্রসিদ্ধ নারীদিগের জীবনী" যথা—"ভিক্টোরিয়া", "জেন্ গ্রে", "মেরিয়া থেরিসা", "মারী-আঁতোয়ানেৎ", "প্রথম নেপোলিয়নের জননী", ইত্যাদি।

(৫) ১৯০০-১৯০১ অব্দে, "শীতের গল্প" ও "মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিসের" পাঞ্জাবী অনুবাদ।

সংখ্যাঙ্ক গুলি Administrative Statistlcs Vol. XXV. হইতে গৃহীত।

দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে যোগধর্ম্মী (মিস্‌টিক) চৈতন্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন : এই যুগের সমস্ত ভাব-গতিই কৌতূহলাবহ ও জটিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম—যাঁহাতে "ক্লাসিক" কবির সুর আছে, কিন্তু যাঁহার কবিতার বিষয় সাধারণ গৃহস্থ সমাজ-ঘটিত। তিনি শান্তিময় সুব্যবস্থিত যুগের মুখপাত্র ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। ইঁহার কবিতা, পদলালিত্য, শব্দচাতুর্য্য ও আদিরসের জন্য প্রসিদ্ধ। আর একজন কবি—রামপ্রসাদ। ইনি সরল গ্রাম্য ধরণের কবি।

তাহার পর,—যে সময়ে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ফ্রান্স ও য়ুরোপকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই একই সময়ে তদপেক্ষাও পূর্ণধরণের একটা বিপ্লব বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় : ইংলণ্ড বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া তাহার উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা চাপাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদের সরল গান ও ভারতচন্দ্রের কামগন্ধী আদিরসাশ্রিত লঘুধরণের কবিতার পর রামমোহন রায়ের পৌরুষিক ও "মিস্‌টিক" রচনার আবির্ভাব। ফ্রান্সে যেরূপ Ducis ও Parreyর পরে Chateaubriandর আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সেইরূপ। তথাপি চিরাগত সাহিত্যিক ধারাটি অব্যাহত ছিল; সাহিত্য স্বাভাবিক কার্য্য-কারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু পরে কতকগুলি গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রতিক্রিয়া-শক্তি জাগিয়া উঠিল।

রামমোহন রায়ের পর সমস্ত সাহিত্য নবীভূত হইল। একদিকে যেমন ঈশ্বর গুপ্ত (১৮০৯-৫৮) Aristophanএর মত রক্ষণশীল ও পরিহাস-রসিক, বিদ্রূপ-কর দ্বারা য়ুরোপের পক্ষপাতী, উদারমতাব বৈপ্লবিকদিগকে চাব্‌কাইতেছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশব সেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ, একেশ্বরবাদের ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষ সমর্থন ও প্রচার করিতেছিলেন। সকলের অগ্রগণ্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১); উনবিংশ শতাব্দীর একজন মহানুভব ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য পূর্ণ শক্তিশালী লেখক, এবং সর্ব্বোপরি মহৎ সংস্কারক :—১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। Seeley প্রণীত Ecce homo গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে দেবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাঁহাকে একজন ধর্ম্মশীল বীরপুরুষ, শান্তিদাতা ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তিনি বলেন,—গোপীগণ ও রুক্মিনী—এ সমস্ত কবিকল্পনা।

উপন্যাস-রচনায় সেই একই গতি, সেই একই নমনীয়তা, সেই একই শক্তির জোর। গ্রন্থরচনার সংখ্যা অগণিত, তিন জন বিশেষরূপে এই যুগের সাহিত্যের স্বরূপপরিচায়ক।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—৭৩) বঙ্গীয় সাহিত্যের মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই নীল দর্পণ (১৮৬০) নাটক লিখিয়া নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, উহাতে রায়ৎদিগের

ইংরেজ নীলকরদিগের অত্যাচার বর্ণিত আছে। এই নাটক পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সমস্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অত্যাচারদিগের অত্যাচার নিবারণের উপায় বিধান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" এবং সামাজিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" লিখিয়া হিন্দু উপন্যাসের সৃষ্টি করেন।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) "মেঘনাদবধ" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার বিষয় রামায়ণ হইতে গৃহীত :—রাবণ-নন্দন মেঘনাদের মৃত্যু। মধুসূদন বাল্মীকির কবিতাকে হোমর-সদৃশের মহাকাব্যে পরিণত করিলেন। উহাতে আর সেরূপ বানর নাই, বহু-বাহু-বিশিষ্ট রাক্ষস দেবতা বা দৈত্যও নাই। উহাতে কোন বিকটাকার রাক্ষস নহে,—একজন মানুষ মাত্র; রাবণ সীতাকে যে হরণ করে, সে গর্ব্বের বশে, কামের বশে নহে। তা ছাড়া, কারাবদ্ধ সীতারাণীর দুঃখ-কষ্ট সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইলেও, সীতা মেঘনাদবধের নায়িকা নহেন। মেঘনাদ ও তাহার পত্নী প্রমীলা—যাহাদের বিদায়-সম্ভাষণ হেক্টর ও এণ্ড্রোমেকসের বিদায়-সম্ভাষণকে স্মরণ করাইয়া দেয়—গ্রন্থের সমস্ত রসবিকাশের কেন্দ্র ও আগ্রহ ঐ দুইজনের উপরেই কেন্দ্রিত হইয়াছে। মেঘনাদ, রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন; রাবণ আবার লক্ষ্মণকে বধ করিলেন। কিন্তু রাম নরকে প্রবেশ করিয়া নরক-দেবতাদিগের নিকট হইতে লক্ষ্মণের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লক্ষ্মণকে ফিরিয়া পাইলেন। মেঘনাদের শেষ-সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা আছে; প্রমীলা সহমৃতা হইলেন।

বাঙ্গালীরা মধুসূদনের লিখনরীতি ও সুন্দর পদ্য রচনার খুবই প্রসংশা করে। বাঙ্গলা ভাষায় মধুসূদনই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা এবং যাহাতে প্রকৃত মানব-হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সব দৃশ্যের বর্ণনা সম্বন্ধেও বাঙ্গালী লেখকেরা প্রশংসা করিয়া থাকে। যেটা খুব য়ুরোপীয় বলিয়া চোখে ঠেকে—সেটা হচ্ছে কবিতার মর্ম্মভাবটি। হোমরের ও বাল্মীকির অনুকরণ, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন,—হিন্দু ও য়ুরোপীয় ভাবের সম্মিলন,—এই সমস্ত হইতে ভারত-বাসীদিগের স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতিসাধন এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের চরিত্র-সংগঠনের একটা প্রয়াস দেখা যায় (৬)।

*
* *

এক্ষণে সমস্ত ভারতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করা যাক্।

দুইটা জিনিস আমাদের চোখে ঠেকে।

প্রথম।—

ভারতীয় সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাববশে

(৬) ১৯০০ অব্দে, ২৫৯০ গ্রন্থাদি বঙ্গদেশে রেজিষ্টরি হয় : যথা—৬৯৫ মাসিকপত্র ও ১৮৯৫ গ্রন্থ; মধ্যে মৌলিক :—৮৩২ বাঙ্গলা ও ২৫৭ ইংরেজী, ৯৯ সংস্কৃত, ১৪০ উড়িয়া; বাকী—অনুবাদ ও পুনঃসংস্করণ; শুদ্ধ, বাঙ্গলা—১৩৩৬।

নবীকৃত হইয়াছে; এতটা নবীকৃত হইয়াছে যে, দর্শনসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সাক্ষাৎভাবে Comte ও Spencer দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে; উপন্যাসগুলি হয় রোম্যান্টিক নয় স্বাভাবিক ধরণের; মহাকাব্যে হোমরের এমন-একটু ছায়া আছে যে আমাদেরও তাহা বোধগম্য হয়। ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া ঘটিল?—ইহা ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশেরই ফল। ভারতীয় সাহিত্য, শেষ চারি শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় সেই একই অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছে:—(রিনেসান্স) পুনরুত্থান, (Classicism) প্রাচীন-আদর্শনিষ্ঠা, দার্শনিক যুগ, স্বেচ্ছাচারের যুগ, বৈপ্লবিক যুগ, হিতবাদের যুগ।

য়ুরোপের সাহিত্যিক রূপ ও [illegible] আত্মসাৎ করিয়া ভারত স্বকীয় ক্রমবিকা[illegible] পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা। সাহিত্য হইতে (মুদ্রা[illegible] অপেক্ষাও সম্পূর্ণরূপে) চিরপ্রথানুগত ভারত[illegible] বৈপ্লবিক ভারতের, কুলপতিতন্ত্র ভারত[illegible] ব্যক্তিত্ব-প্রধান ভারতের ছবি আমরা প্র[illegible] হই। এই ছবির অন্তর্ভুক্ত—লক্ষ [illegible] নিরক্ষর লোক, কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতি[illegible] কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর লেখক; আম[illegible] এমন একটি ভারত দেখিতে পাই যেখা[illegible] লোক-ভাষাগুলির পরিপুষ্টি অতি দ্র[illegible] সংসাধিত হয়। পক্ষান্তরে, একটি ভাষা সম[illegible] ভাষার উপর আধিপত্য করে, এবং সে[illegible] ইংরেজী ভাষা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জলের আল্পনা

সাত

শিল্পীর বাটালির ছোঁয়া পাইবার আগে মূর্ত্তি-গড়িবার পাথর যেমন আকারহীন ও কুদর্শন হইয়া থাকে, প্রেমের পরশ না-পাইলে মানুষের জীবনও তেম্‌নি একটা সুডৌল-সুশ্রী আকার লাভ করিতে পারে না। তাই জয়ন্তের সেদিন মনে হইল, এতদিন পরে যথার্থ প্রেমের সাক্ষাৎ পাইয়া আজ তাহার শূন্যজীবন পূর্ণ, সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে!

আপনমনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গায়িতে-গায়িতে জয়ন্ত যখন বাসায় ফিরিয়া সিঁ[illegible] দিয়া উপরে উঠিতেছিল, ভজহরি লণ্ঠ[illegible] আলোয় তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "ই[illegible] খোকন যে আজ বড্ড খুসি!"

ভজহরি তাহাদের পুরণো চাক[illegible] জয়ন্তের স্বর্গীয় মাতার বিবাহের স[illegible] তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে সেই যে [illegible] সঙ্গে আসিয়াছিল, আর আজ-পর্য্যন্ত একবা[illegible] ছুটির নাম মুখে আনে নাই! তাহার কো[illegible] পিঠই ছিল জয়ন্তের শিশুকালের খেলা[illegible] এবং আজ এই পূর্ণযৌবনেও ভজহরি

[illegible]ভরা বুক, স্নেহভরা কোল এবং সেবা-[illegible]রা বাহুর বাঁধন পাইয়া জয়ন্ত নিশ্চিন্ত ও [illegible]রিতৃপ্ত হইয়া আছে।

পুরাতন বটবৃক্ষের মত এই পুরাতন [illegible]াকরটিরও বয়স যে কত, কেউ তা জানে [illegible]া। কিন্তু এত বয়সেও ভজহরি বেশ [illegible]ক্তসমর্থ আছে—এমন-কি, জয়ন্ত এখনো [illegible]যদিন গান গায়িতে বসিয়া বাড়া ভাত ঠাণ্ডা [illegible]করিয়া ফেলে, ভজহরি ক্রোধভরে আসিয়া [illegible]তাহাকে শিশুর মত অনায়াসে কোলে [illegible]তুলিয়া খাবারের সাম্‌নে লইয়া গিয়া [illegible]বসাইয়া দেয়। জয়ন্ত যদি হাসিয়া বলে—"হ্যারে ভজা, তোর ঐ বুড়ো হাড়ের জোর [illegible]কি কোনদিনই কম্‌বে না রে?"

ভজহরি ফোলা-ফোলা দড়ির মত শিরা-[illegible]ভরা হাতদুখানা নাড়িয়া উত্তর দেয়, "এ [illegible]বুড়ো হাড় নয় রে খোকন, এ বুড়ো হাড় [illegible]নয়—এ হচ্চে পাকা হাড়! বাঁশের লাটির [illegible]মত আমার হাড় যত পুরণো হচ্চে, তত [illegible]পেকে উঠ্‌চে—এর জোর কি কখনো কমে [illegible]রে বোকা?"

—"তুই কি বল্‌তে চাস্ তোর জোর [illegible]কখনো কম্‌বে না?"

—"কম্‌বার যো কি? আমার জোর [illegible]কম্‌লে তোকে দেক্‌বে কে রে খোকন? [illegible]আর এটাও ঠিক জানিস্ যে, আমার [illegible]খোকনকে বুকে কর্‌বার জোর যেদিন যাবে, [illegible]তোর ভজা সেদিন পটল তুল্‌বেই তুল্‌বে!"

পুরণো চাকর একটু গায়ে-পড়া হয়; [illegible]মনিবকে সে ভালোবাসে কিন্তু মনিবের [illegible]ধম্‌কানি গ্রাহ্য করে না। ভজহরিও সেই [illegible]স্বভাবের লোক; জয়ন্তের সঙ্গে সে সমান ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিত, দরকার হইলে উপদেশ-পরামর্শ বা ধমক-ধামকটাও দিতে ছাড়িত না।

জয়ন্ত সেদিন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যখন গায়ের জামাটা খুলিতেছে, ভজহরি তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "দেশ থেকে তোমার চিটি এসেচে—নাও।"

জয়ন্ত চিঠিখানা খুলিল। ভজহরি মাটির উপরে উবু হইয়া বসিয়া কৌতূহলের সহিত ঘাড় তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চিঠি লিখিয়াছেন অন্নপূর্ণা। জয়ন্ত পড়িতে লাগিল:—

"বাবা জয়,

আজ একসপ্তাহ তোমার কোন্ খবর না-পেয়ে ভাবিত আছি, শীঘ্র তোমার কুশল-সংবাদ দেবে।

এদিকে গৌরীকে আর রাখা যায় না; তুমি এখন বিয়ে কর্‌বে না বলে খালাস হ'লে ত চল্‌বে না। পুরুষমানুষ বেশী বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাক্‌লেও চলে—পুরুষের সব শোভা পায়; কিন্তু স্ত্রীলোক তা কর্‌লে নানাজনে নানাকথা কয়—বিশেষ পল্লীগ্রামে। কাজেই আমি ঠিক করেছি, আস্‌ছে বৈশাখ মাসেই একটা ভালো দিন দেখে তোমার বিবাহ দেব। এতে তোমার অমত হ'লে চল্‌বে না। আমরা সবাই ভালো আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা

চিঠি পড়িয়া জয়ন্তের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

ভজহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "ও কি খোকন, তোর মুখ অমন হোলো ক্যানো? বাড়ীর খপর কি ভালো নয়? মা-ঠাক্‌রোণ ক্যামন আচেন? গৌরী—"

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বলিল, "তারা সবাই ভালো আছে। তুই এখন যা ভজা, কাণের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে' আমাকে আর জ্বালাতন করিস্-নে!"

কিন্তু ভজহরি সেখান হইতে এক আঙুলও নড়িল না—ভাবিল নিশ্চয় কোন খারাপ খবর আসিয়াছে, খোকন তাহার কাছে লুকাইতেছে। চিঠিখানা জয়ন্তের হাত হইতে ফস্-করিয়া টানিয়া লইয়া আলোর কাছে ধরিয়া সন্দিগ্ধ চোখে সে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বারংবার দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই আঁকাবাঁকা কালির দাগের ভিতর হইতে ভালো-মন্দ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না। শেষটা হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিরক্ষর ভজহরি সকাতরে বলিল, "তোর পায়ে পড়ি খোকন, আমার কাচে কিচু লুকোস-নে!"

জয়ন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "বল্‌ছি ত খবর সব ভালো।"

—"তবে তোর মুখ অমন শুকিয়ে গ্যাল ক্যানো?"

—"শুকিয়ে গেল, সে আমার ইচ্ছে! তোর সব কথায় দরকার কি?"

—"বল্ না খোকন, নক্ষীটি! বুড়োকে ক্যানো খাম্‌কা কষ্ট দিচ্চিস্!"

—"মা লিখেছেন বশেখ মাসে গৌরীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

ভজহরি বেজায় খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "সত্যি? এর জন্যে আ ভাব্‌না ক্যান্‌রে হাঁদা!"

জয়ন্ত নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি আপনমনে বড়্-বড়্ করি বকিয়া যাইতে লাগিল, "বশেখ মাসে ন এটা হোলো গিয়ে মাঘমাসের সাত তারিখ্—না খোকন? হুঁ, হাতে ফাগুন চোত্—কুল্যে এই দুটো মা তাহলে একুনি থেকে সব উয়্যুক-আয়োজ করতে হয় যে! আমার খোকনের বিয়ে একি একটা যা-হোক্-তা-হোক্ ব্যাপার সাতদিন ধরে সাত গাঁয়ে পাত্ পড়বে ঢাকের বাদ্যি শুনে-শুনে একমাস লোকে কাণে তালা লেগে থাক্‌বে, আর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলি "থাম্ ভজা, থাম্! বিয়ে কর্‌ছে কে?"

ভজহরি বলিতে-বলিতে থামিয়া পড়ি বিস্ময়ে দুইচক্ষু ড্যাব্‌রা করিয়া জয়ন্তে দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বলিল, "ভজা, মা যতই বলুন এ বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌ব না!"

—"খোকন, এ কী বলিস্ রে?"

—"হ্যাঁ।"

—"ক্যানো?"

—"আমাদের সাম্‌নের বাড়ীর ঐ জগৎ বাবুকে জানিস্ ত? আমি তাঁরই মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব।"

—"অ্যাঁঃ! কে এ সমন্দ কর্‌লে?"

—"আমি!"

—"মা-ঠাক্‌রোণ জানেন ত?"

—"না। কিন্তু আজই তাঁকে চিঠি লিখে সব জানাব।"

ভজহরির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। খা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "খোকন, মাকে মি জান ত! কেউ তাঁর অমতে কাজ রলে তাঁর মন নোয়ার মত শক্ত হয়ে ওটে। ামন কাজ করিস্ নে—করিস নে!"

—"উপায় নেই।"

ভজহরি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু খোকন, গৌরীদিদির আঁতে তুই বড় ঘা মার্‌বি তা কি একবার ভেবে কেচিস্? সে যে তোকে একন থেকেই ামীর মত ভক্তি করে, ভালোবাসে!"

ঠিক এইখানেই জয়ন্তের মনেও কেমন কটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। গৌরীকে সে বলিয়া বুঝাইবে? তাহার কোমল াণের ভিতরে, শৈশব হইতে এই উন্মুখ ীবন পর্য্যন্ত যে ভাবের ধারা অবাধে হিয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ সে ধারাকে বন্ধ করিয়া দিবে কিরূপে? এ কি নির্দ্দয়তা নয়?

জয়ন্ত বিবর্ণ মুখে উঠিয়া ঘরের মধ্যে স্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দক্ষিণের জান্‌লা খোলা ছিল; সেই থে নববসন্তের মধুর বাতাস একটা রাগিণীর সুর বহিয়া আনিয়া জয়ন্তের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিল—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর-মত বাসিও—"

এ ইন্দুলেখার গান!

জয়ন্ত সমস্ত ভাবনা ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল—তাহার মনে হইল, এ গান যেন তাহাকেই শুনাইয়া-শুনাইয়া গাওয়া হইতেছে!··· ···

সে গানের সুরের ভিতরে পড়িয়া অভাগী গৌরীর কাতর মুখ, জোয়ারের স্রোতে ছেঁড়া ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

আট

বৈকালে ঠাকুরঘরে বসিয়া অন্নপূর্ণা আরতির উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছেন। দরজার কাছে গৌরী, কোলের উপরে একখানা কুলা লইয়া ধান বাছিতেছিল।

এমনসময় দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা কোশার ভিতরে গঙ্গাজল ঢালিতে-ঢালিতে বলিলেন, "কার চিঠি রে?"

দাসী বলিল, "সরকার-বাবু বল্‌লেন কল্‌কাতার চিটি।"

গৌরী বুঝিল, কার চিঠি! একবার লজ্জিত চোখে পত্রের দিকে চাহিয়াই, আবার মুখ নামাইয়া সে ধান বাছিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা ঐখানে রাখ্, দেব্‌তার কাজ না-সেরে ও ত আর ছুঁতে পার্‌ব না!"

ঠাকুরঘরের কাজকর্ম্ম চুকাইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা এইবার দে ত গৌরী!"

গৌরী চিঠিখানা অন্নপূর্ণার হাতে দিয়া আবার ধান বাছিতে লাগিল—কিন্তু তাহার কাণ রহিল সজাগ।

অন্নপূর্ণা খাম ছিঁড়িয়া জয়ন্তের চিঠি পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু পড়িতে-পড়িতে তাঁহার মুখের ভাব ধীরে-ধীরে বদ্‌লাইয়া

গেল। পড়া যখন সাঙ্গ হইল—তখন তাঁহার মুখ একেবারে সাদা !... ... স্তম্ভিতের মত অন্নপূর্ণা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, পত্রখানা তাঁহার অসাড় হাত হইতে খসিয়া মাটির উপরে পড়িয়া গেল।

দেখিতে-দেখিতে অন্নপূর্ণার মুখ রাগে একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল, বিকৃত রুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "জয় কি এতবড় পাষণ্ড হয়েছে !"

সে স্বরে চমকিয়া গৌরী মাথা তুলিল। অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল !

জান্‌লা দিয়া আচম্‌কা একটা বাতাস আসিয়া গৃহতল হইতে জয়ন্তের পত্রখানা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, গৌরী তাড়াতাড়ি সাম্‌নে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া দু-হাতে সেখানা চাপিয়া ধরিল।

হঠাৎ চিঠির একজায়গায় তাহার চোখ পড়িয়া গেল। সেখানে লেখা রহিয়াছে, "মা, গৌরী বোনের মত আমার কাছে থাক্—তাকে আমি চিরকাল স্নেহের চোখে দেখ্‌ব, কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ এই যে,—" গৌরী আর পড়িতে পারিল না, জয়ন্তের হাতের সেই নিষ্ঠুর অক্ষরগুলো যেন আগুনে-পোড়ানো সূচের মত তাহার চোখে বিঁধিয়া তাহাকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিল।

অন্নপূর্ণা কঠিন স্বরে বলিলেন, "গৌরী, তুই এখন এখান থেকে যা !"

গৌরী আস্তে-আস্তে উঠিয়া আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার দুইচক্ষু তখন বিস্ফারিত, নাসা থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, ওষ্ঠ পরস্পরের উপরে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে।

অনেকদিন আগেকার একটা বিদ্যুতের আখরে তাঁহার চোখের সাম্‌ জ্বলিয়া উঠিল,—গৌরীর মা, মেনকার ধরিয়া গঙ্গাজল ছুঁইয়া তাঁহার সেই শপথ ... ...তারপর, সেইদিন ! যেদিন মেনকা মৃত্যুশয্যায় তিনি শিশু গৌরীকে আশী ভাবী পুত্রবধূ বলিয়া কোলে টানিয়া লই ছিলেন এবং তাই দেখিয়া মরণকাতর মেনকার মুখে নিশ্চিন্ত হাসির রেখা ফু উঠিয়াছিল।

জয়ন্তের জন্য আজ কি তাঁহার ভঙ্গ হইবে ?... ...অন্নপূর্ণার বুকটা ধুক্‌ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, পরলো মেনকার অশরীরি আত্মা এতক্ষণে অদৃ হইয়া উঠিয়াছে !

জয়ন্ত যে তাঁহাকে এতবড় দাগা দি চাহিবে, এ তিনি কখনো ভাবেন নাই চিঠিতে সে আর-একজনের কথা লিখিয়া কে সে ? কার মেয়ে—হিন্দু না ক্রীশ্চান কি কুহকে সে তাঁহার একান্ত-অনুগ জয়ন্তকে এমন বশ করিয়াছে যে, সে ন্যায়-অন্যায় বিচার পর্য্যন্ত করিতেছে না ?

আর গৌরী ? অন্নপূর্ণা জানিতেন জয়ন্তকে এখন থেকেই সে স্বামী বলি জানে ! জয়ন্তকে সে ভালোবাসে ! এ জয়ন্ত যদি তাকে ত্যাগ করে, তবে তাহা দশা কি হইবে, সে কোথায় দাঁড়াইবে ?

অন্নপূর্ণা আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলে "না, এমন পাপ আমি হোতে দেব না

কিন্তু কি ভেবেছে নারী বলে আমি শুধু আদর কর্‌তেই জানি,—শাসন কর্‌তে জানি না !"

দরজার কাছ হইতে শোনা গেল, পা-ধোবার জল দাও গো,—একি, ঠাকুর-ঘরে এখনো সন্ধ্যে দেওয়া হয়-নি !"

এ পুরুতঠাকুরের গলা ! অন্নপূর্ণার তখন স্‌ হইল,—চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার পাত্‌লা অন্ধকারে চারিদিক ছায়া হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "গৌরী, অ গৌরী—শুন্‌ছিস্, সাড়া দিচ্ছিস না যে, কাণের মাথা খেয়েছিস্ নাকি ?"

পাশের ঘর হইতে গৌরীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—"যাই মা, যাই !"

অন্নপূর্ণা পুরুতঠাকুরের পা ধুইয়া দিতে-লেন, গৌরী আসিয়া বলিল, "কি বল্‌ছ মা ?"

—"কি বল্‌ছি ? আ হাবা মেয়ে, সন্ধ্যে উৎরে গেছে, আজ কি আর শাঁক-টাক্‌ বাজাতে হবে না ?"—বলিতে-বলিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা অবাক্ হইয়া গেলেন !

গৌরীর চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা—সে যেন এইমাত্র কাঁদিতে-কাঁদিতে কান্না থামাইয়া উঠিয়া আসিয়াছে !

নয়

ইন্দুলেখার ময়নাটা এম্‌নি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আজকাল যাকে-তাকে সে "দূর পোড়ারমুখো" বলিয়া গালাগালি দিতে সুরু করিয়াছে !

অতএব ইন্দু সেদিন চীনের বাদাম খাইতে-খাইতে তাকে বুঝাইতেছিল, "ছি ময়না, অমন করে' কি গালাগাল দিতে আছে ?"

ময়না তার চোখ পাকাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "দূর্ পোড়ারমুখো !"

ইন্দু চটিয়া বলিল, "আ গ্যালো যা, আমার খেয়ে আমাকেই গালাগাল ? রও, আজ তোমাকে ছাতু খেতে দিচ্ছি না—দু-বেলা পেটভরে খেয়ে-খেয়ে তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না ?"

জয়ন্ত পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, "খেতে পেয়েও ময়না যখন তোমাকে গালাগাল দিচ্ছে, তখন খেতে না পেলে ও তোমাকে আরো বেশী গালাগাল দেবে, ইন্দু !"

জয়ন্তের কথায় যেন সায় দিয়াই ময়না আবার চ্যাঁচাইয়া উঠিল, "দূর পোড়ারমুখো !"

ইন্দু চোখ রাঙাইয়া শাসাইয়া বলিল, "ময়না, ফের্ !"

কিন্তু ময়না তাতে একটুও দমিয়া গেল না ; ডান পা দিয়া ঠোঁট্‌টা চট্‌পট্ সাফ্ করিয়া লইয়া ইন্দুকে উল্টা ধমক দিতে লাগিল, "কোঁ-কট্‌কট্, কোঁ-কট্‌কট্, কোঁ-কট্‌কট্ !"

—"ও কি বল্‌তে চায় জয়ন্তবাবু ?"

—"এবারে ও তোমাকে নিজের ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে—কেরাণীরা সায়েবের সুমুখেই সায়েবকে গালাগাল দিতে হ'লে এই চরম উপায়ই অবলম্বন করে ! ওটা হচ্ছে দাসত্বের লক্ষণ !"

ইন্দুলেখা বাদামের খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে বাগানের একদিকে চাহিয়া বলিল,

"জয়ন্তবাবু, আপনার চাকর বোধহয় আপনাকে ডাক্‌তে আস্‌ছে,—ঐ দেখুন!"

জয়ন্ত ফিরিয়া দেখিল, ভজহরি চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে তাহাদেরি দিকে আসিতেছে! সে ডাকিয়া বলিল, "কিরে ভজা, তুই যে বড় হঠাৎ এখানে?"

ভজহরি পাণের ছোপ্‌ধরা দুপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার বৌ দেক্‌তে এলুম খোকন!"

ইন্দুলেখা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

জয়ন্ত বলিল, "এ আমাদের পুরণো লোক, এর হাতেই আমি মানুষ হয়েছি ইন্দু!"

একটা চীনের বাদাম টপ্‌করিয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া ইন্দু বলিল, "ও!"

ইন্দুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভজহরি বলিল, "হ্যাঁ খোকন, এই মেয়েটির সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে বুঝি?"

জয়ন্ত বিরক্তভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

এত-বড় মেয়ে, এখনো আইবুড়ো! বৌয়ের বয়স বেশী দেখিয়া ভজহরি মনেমনে বড় খুসি হইল না। কিন্তু মুখে মনের কথা না-ভাঙিয়াই বলিল, "বাঃ, খাসা মেয়ে ত!"

ইন্দু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভজহরি মনেমনে তুলনা করিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের গৌরীর চেয়ে এ মেয়েটির রং ঢের ফর্‌সা বটে, কিন্তু এ-যেন কিছু বেহায়া! গৌরী ত বরের সাম্‌নে এমন করে' কথনো চীনের বাদাম খায় না! গৌরীকে বৌ বলে যেমন মানায়, খোকনের পাশে একে ঠিক তেমনটি ত কৈ মানাচ্ছে না!

হঠাৎ ইন্দুলেখার পায়ের মখ্‌মলের জুতোর দিকে ভজহরির নজর পড়িল। বৌয়ের পায়ে জুতো—অ্যাঁঃ! তাহার ধারণা ছিল, যে-সব মেয়ে জুতো পায়ে তারা সবাই ক্রীশ্চান!

ফস্‌-করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "হ্যাঁগা বাছা, তোমরা হিঁদু ত?"

ভজহরির বিস্মিত মুখ দেখিয়া এবং উদ্ভট প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দুলেখা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, আমাকে দেখে কি মোছলমান বলে মনে হয়?"

ভজহরি থতমত খাইয়া বলিল, "না—না বল্‌চি কি—ইয়ে—ইয়ে—"

ইন্দুলেখা বেচারাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমরা হিন্দু!"

—"তবে তুমি জুতো পরেচ ক্যানো বাছা?"

—"কেন, জুতো পর্‌লে কি আর হিঁদু হোতে নেই?"

ভজহরি মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিল, "আমি পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ সহরের ধরন-ধারন ত জানিনা, তা ক্ষমা-ঘেন্না করে' কিচু মনে কোরো না!" এই বলিয়া সে আস্তে-আস্তে আবার বাড়ীমুখো হইল।

খোকনের বৌ রূপসী হইলেও, জুতো পরে এবং বরের সাম্‌নে বেহায়ার মত চীনের বাদাম খায় বলিয়া, বৃদ্ধ ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। এর-চেয়ে গৌরী ভালো, বয়সে ছোট, মুখটিতেও লজ্জা মাখানো—যেমনটি হয়, তেম্‌নি! গৌরীর নিরাশ মুখ ভাবিয়া ভজহরির ভারি দুঃখ হইল।

কিন্তু খোকনকে সে এত ভালোবাসে, গৌরীকে বিবাহ করিতে না-চাওয়ার জন্য জয়ন্তের যে কিছু অন্যায় হইয়াছে, তাও সে মনে করিতে পারিল না। 'আমরা ছোড়া-হাবড়া মানুষ, আমাদের পছন্দে-অপছন্দে কী এসে যায়? বৌ যখন খোকনের মনে ধরেচে তখন তার ওপর আর কথা নেই, ও যা ভালো বোঝে তাই করুক্!'

—এই ভাবিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনের সমস্ত ইতস্তত বাহির করিয়া দিয়া ভজহরি নিশ্চিন্ত স্বরে গান ধরিল—

"হরি হে, কেমনে ভুলিব তোমায়!
ওহে বন্ধুরায়, ভুলে রৈলে মথুরায়—
—কেমনে ভুলিব তোমায়!"

* * * * *

এদিকে, বৈকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া জগৎবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। জুতোর শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, অবনী। খবরের কাগজখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আসুন।"

অবনী তাঁহার সাম্‌নেই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাগজ পড়ছিলেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ। পড়্‌তে-পড়্‌তে ভাবছিলুম যে, এত-বড় পৃথিবীতে নতুন-কিছু ঘট্‌ছে না—সব খবরই পুরণো আর একঘেয়ে! বসুন্ধরী দেখ্‌ছি একেবারে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে—তার মধ্যে রস-কস্‌ বৈচিত্র যা-কিছু ছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নিংড়ে সমস্ত বার করে' নিয়েছেন।"

অবনী ডিবা হইতে একটা পান লইয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "হ্যাঁ, ও কাগজ-টাগজ পড়া না-পড়া দুই-ই এখন এককথা।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আমাকে পড়্‌তে হয়, নৈলে সময় কাটে না যে! কাগজের মধ্যে ভালো লাগে তবু পুলিস-কোর্টের কলমটা। বিংশ শতাব্দীর রোম্যান্‌স উপন্যাসের সীমানা আর মানুষের জীবন থেকে পলায়ন করে' আশ্রয় নিয়েছে ঐ পুলিস-কোর্টের ভিতরে গিয়ে!"—থামিয়া, গলা চড়াইয়া হাঁকিলেন, "ওরে, তামাক দিয়ে যা!"

চাকর তামাক দিয়া গেল। নলটা হাতে করিয়া, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "বাজে কথা যাক্‌। এখনো কেউ আসে-নি, এইবেলা চুপি-চুপি আপনার সঙ্গে দুটো কাজের কথা কয়ে-নি।"

অবনী বুঝিল, কি কথা! কাণ খাড়া করিয়া সে চুপচাপ্‌ বসিয়া রহিল।

জগৎবাবু আগে আল্‌বোলার নলে দু-তিনটি টান মারিলেন; তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, "অবনীবাবু, আপনি আমার মত্‌ জানেন ত, মেয়েদের আমি দাস-ব্যবসার পণ্য বলে ভাব্‌তে পারি না; সুতরাং যাকে খুসি তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেবার ক্ষমতা আমার নেই,—যদিও আমি পিতা।"

অবনী সায় দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই ত উচিত। একপক্ষ থেকে গ্রহণ কর্‌লেই ত চল্‌বে না, যার সঙ্গে আজীবন এক হয়ে থাক্‌তে হবে, সেই ভবিষ্য স্বামীকে কন্যাও স্বেচ্ছায় গ্রহণ কর্‌তে চায় কিনা, সেটা দেখাও যে খুব দরকার।"

জগৎবাবু বলিলেন, "কিন্তু অনেকে এ সহজ কথাটাও বোঝেন না, বা বুঝ্‌তে

চান না। মন্ত্রশক্তিতে বোধহয় তাঁদের অসীম বিশ্বাস; তাঁরা তাই ভাবেন, পুরুত এসে টিকি নেড়ে বড়্‌বড়্‌ করে' দুটো মন্ত্র পড়ে দিলেই, সম্পূর্ণ অচেনা দুটি মানুষ তাদের চরিত্রের সমস্ত পার্থক্য ভুলে চিরকাল মিলে-মিশে এক হয়ে থাক্‌বে। তা যদি সম্ভব হোতো, খবরের কাগজে পুলিস-কোর্টের রিপোর্টে তাহলে প্রায়-প্রত্যহই দাম্পত্য প্রণয়-ভঙ্গের এত মোকদ্দমার কথা দেখ্‌তুম না। শাস্ত্র যতই কোলাহল করুক,—আমি কিন্তু জানি, মন্ত্র পড়্‌লেই বিবাহ হয় না; সেই বিবাহই আসল বিবাহ—সে বিবাহে পাত্র আর পাত্রী দুজনেই সচেতন ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করে।"

অবনী বলিল, "এ কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু, সেকালে যখন গৌরীদান-প্রথার চলন ছিল, তখন মেয়ের মত্‌ জানবার কোন দরকার হোতো না। কারণ, শৈশবে বিবাহ হোতো বলে কন্যার মনে তখন বিচার-শক্তি নামে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাকৃত না। কাঁচা বাঁশের মত মেয়ের শিশু মন তখন কোমল থাকৃত, কাজেই স্বামী তাকে অনায়াসেই নিজের চরিত্রের উপযোগী করে' গড়ে নিতে পারৃত। এখন কিন্তু সমাজের সে অবস্থা আর নেই। একালে নানা কারণে মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে বেশী বয়সে। সুতরাং বিবাহের আগেই তাদের চরিত্র পরিণত হয়ে গড়ে ওঠে; সে-ক্ষেত্রে পিতার ইচ্ছায় কলের পুতুলের মত তারা যদি এমন পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়—যাদের চরিত্রের সঙ্গে তাদের চরিত্রের সবদিকেই গরমিল, তাহলে সে বিবাহের পরিণাম অমঙ্গলে।"

জগৎবাবু তামাকের ধোঁয়া ছাড়ি ছাড়িতে বলিলেন, "সুতরাং বিবাহের আ মেয়েদের মত নেওয়া অত্যন্ত দরকার।"

অবনী বলিল, "অত্যন্ত।"

অবনী যাহা বলিল, সেটা সত্য-মি তাহার প্রাণের কথা; কিন্তু আজ সে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করি না, জগৎবাবুর আসল বক্তব্য যদি তাহা জানা থাকিত। সে মনে-মনে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাহাকে জামাতা বা বা বলিয়া গ্রহণ করিতে জগৎবাবু বা ইন্দুরে কাহারোই অমত হইবে না; কেননা, তাহা টাকাও আছে বিদ্যাও আছে!

জগৎবাবু একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলে "এখন আসল কথাটা পাড়া যাক্‌। আপনি আমার মেয়েকে বিবাহ করতে চান, সে আমি ইন্দুর কাছে তুলেছিলুম। কিন্তু—"

এই খট্‌খটে 'কিন্তু'টা অবনীর কা ভারি বেসুরো ঠেকিল; চকিত চোখে জগৎবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

জগৎবাবু জলন্ত কলিকার উপরে নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ইন্দুর এ মত্‌ নেই।"

অবনীর মুখ একেবারে এতটুকু! আস্তে-আস্তে মাথা নোয়াইয়া বোবার সে চুপ করিয়া রহিল।

জগৎবাবু তাহার মলিন মুখের দি চাহিয়া দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "কি করব বলুন, ইন্দুর মনে কষ্ট দিয়ে কোন কা করতে পারি না ত!"

...উত্তরে অবনী একটু হাসিবার চেষ্টা ...কিন্তু তাহার তখনকার বিকৃত মুখে ...হাসিকে একেবারেই হাসি বলিয়া মনে ...না। ইন্দুলেখা যখন তাহাকে বিবাহ ...বে না, তখন সেও জগৎবাবুকে দেখাইতে ...যে, ইন্দুর প্রত্যাখ্যানে সে কিছুমাত্র ...লিত হয় নাই! অতএব, অবনী খবরের ...জখানা সুমুখ হইতে তুলিয়া লইয়া ...র মনোযোগের সহিত তাহার উপর ...পাত করিল।

...জগৎবাবু বলিলেন, "ইন্দুর অমতের ...টি কারণও আছে।"—বলিয়া তামাকের ...টান মারিতে লাগিলেন।

...কারণটা যে কি, জানিবার জন্য অবনীর ...টা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু ...দিকে সে আর কোন আগ্রহই দেখাইল ...কাগজের দিকে যেমন চাহিয়াছিল ...নিই কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

...জগৎবাবু বলিলেন, "আপনার মত জয়ন্তও ...মার জামাই হোতে চান—"

—অবনীর বুকের ভিতর দিয়া যেন ...টা আগুনের স্রোত বহিয়া গেল—

—"আর ইন্দুও জয়ন্তকে বিবাহ করতে ...! সুতরাং এক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা ...ছেন ত?"

ক্রোধের একটা দুরন্ত ঝট্‌কায় অবনী ...কেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। টেবিলের ...টা কোণ্‌ দু-হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, ...বনী প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল। ...খানিকপরে, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ...বনী বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

—"সেকি, এরি মধ্যে!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার একটু দরকার আছে।"

—"অবনীবাবু, কিছু মনে করবেন না", মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া জগৎবাবু হাতদুটি যোড় করিলেন।

—"কিছু মনে কর্‌বার অধিকার আমার ত নেই জগৎবাবু!"—চাপা অভিমানের স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া অবনী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।... ..

রাস্তায় খানিকদূর গিয়াই অবনীর সঙ্গে স্বর্ণেন্দুর দেখা।

স্বর্ণেন্দু তাহার সেই ঘোড়ার মত মুখে ইঁদুরের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে! জগৎবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছ বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"কেন, এরি মধ্যে চলে এলে বড় যে? ... ...ওকি, ভোট না পেলে মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের মুখের ভাব যে-রকম শোচনীয় হয়, তোমার মুখখানাও ঠিক তেম্‌নিধারা কেন হে?"

—বলিতে-বলিতে স্বর্ণেন্দু তাহার এক-খানা হাত চাপিয়া ধরিল; অবনী কিন্তু এক-হ্যাঁচ্‌কায় নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "যাও, যাও, মিছে বকিও না!"

স্বর্ণেন্দু একটু ভাবিয়া বলিল, "ও, বুঝেছি!"

অবনী চোখ-মুখ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, "বুঝেছ? ছাই বুঝেছ!"

স্বর্ণেন্দু হাসিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমি যদি না-বুঝি বন্ধু, তাহলে মিছেই

তোমার সঙ্গে এতদিন মিশ্‌লুম! কি হয়েছে বল্‌ব? তুমি সেদিন ইন্দুলেখার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলে, আজ তার চরম জবাব পেয়েছ আর কি!"

—"পেয়েছি ত পেয়েছি, তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

—"কেন? কারণ, সুপথে-কুপথে আমি তোমার একমাত্র বন্ধু কিনা!"

অবনী ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "জান স্বর্ণ, ইন্দু আমাকে বিবাহ কর্‌বে না সেও আমি সইতে পারি—কিন্তু সে কিনা—সে কিনা—" রাগের আবেগে অবনী তাহার কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

—"কিহে, থাম্‌লে কেন?"

—"ইন্দু জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌বে।"

—"অ্যাঁঃ, জয়ন্তকে!"—স্বর্ণেন্দু যেন আকাশ থেকে খসিয়া পড়িল।

জয়ন্তকে এরা দুই বন্ধুই দেখিত বিষ-দৃষ্টিতে। স্বর্ণেন্দুর মনে পড়িল, জগৎবাবুর বৈঠকখানায় এই জয়ন্তের স্পষ্টস্পষ্ট কথার দরুণ কতদিন কতবার তাহাকে সকলের সাম্‌নে অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। সুধুই কি তাই? কোনরকম তর্ক-আলোচনার সময়ে জয়ন্ত তাহাকে একেবারেই আমোল দেয় না, তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, স্বর্ণেন্দুকে সে যেন একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। সেই নিদারুণ উপেক্ষায় জয়ন্তের উপরে স্বর্ণেন্দুর সমস্ত মন বিরূপ হইয়া আছে।

তাহার কটারঙের গোঁফে মোচড়্ দিতে দিতে স্বর্ণেন্দু খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল; তারপর বলিল, "দেখ অবনী, আমাদের চোখের উপরেই কলা দেখিয়ে জয়ন্ত যে ইন্দুকে ফস্ করে' [illegible] করে' ফেল্‌বে, আর আমরা ফ্যাল্‌[illegible] করে' তাকিয়ে বোকার মত তাই দে[illegible] এ হোতে পারে না।"

—"তাই-বা দেখ্‌ব কেন? [illegible] থেকে আমি জগৎবাবুর বাড়ী [illegible] কর্‌লুম।"

—"কেন, থাম্‌কা অমন করে' [illegible] মান্‌বার দরকার কি? বন্ধু, চোরের উ[illegible] রাগ করে' ভূঁয়ে ভাত খেয়ে লাভ নে[illegible] সংসার-অরণ্যে ঢুকে যদি সিংহের মত শী[illegible] কর্‌তে চাও, তাহলে সর্ব্বদা শিয়া[illegible] চাম্‌ড়ায় তোমাকে আগাপাশতলা চে[illegible] রাখ্‌তে হবে! জয়ন্তকে ভালো ক[illegible] সম্‌ঝে দাও যে, আমরা তার উপেক্ষা[illegible] পাত্র নই।"

—"স্বর্ণ, তুমি কি যে ছাই মাথা[illegible] বল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

—"শোনো। এ বিবাহ যাতে না[illegible] সেই চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

—"কি করে'?"

—"সেইটেই ত আগে দেখা দরকার।"—বলিয়া, স্বর্ণেন্দু অন্যমনে একদিকে চাহি[illegible] কিছুক্ষণ শিষ দিতে লাগিল; তারপর হঠা[illegible] শিষ বন্ধ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমাকে দুদিন ভাবতে দাও, সব ঠিক করে' ফেল্‌[illegible] দেখো—মাথা খাটালে কি না হয়! এতদি[illegible] আমরা কিছু বলি-নি বটে, কিন্তু এবা[illegible] আমরা একেবারে প্রথমশ্রেণীর দুরাত্মা[illegible] পরিণত হব! জানইত, 'দুরাত্মার কখনো ছলের অভাব হয় না'!" বলিয়া, স্বর্ণে[illegible] হেঁড়ে-গলায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

[illegible]'পিন্‌স্‌নেষ্' চশমাখানা নাকের উপরে [illegible]লো করিয়া লাগাইয়া স্বর্ণেন্দু আবার বলিল, [illegible] সাবধান, জয়ন্তকে কি আর-কারুকে [illegible]মাদের মনের ভাব কোনরকমে জান্‌তে [illegible]ও না,—জগৎবাবুর সঙ্গে আরো ভালো [illegible]র' মিশ্‌বে। এম্‌নি ভিজে-বেড়ালটির মত [illegible]ক্‌বে—যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে [illegible]ননা! তাহলেই দেখ্‌বে, শেষটা আমরাই [illegible]ল্লা ফতে কর্‌ব!" এই বলিয়া অবনীর [illegible]ঙ্গে 'স্যেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া সে চলিয়া গেল।

অবনী তখনো রাস্তার উপরে থ হইয়া [illegible]ড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, স্বর্ণেন্দুর আসল [illegible]ত্‌লোবটা কি!

দশ

অন্নপূর্ণার চিঠি হাতে করিয়া জয়ন্ত [illegible]ছানার উপরে ভাবনা-বিভোর হইয়া [illegible]সিয়াছিল।

ভোর হইয়াছে অনেকক্ষণ,—জয়ন্তের [illegible]ায়ের ও বিছানার উপরে ফাগুণের শিশির-ভেজা সকাল-বেলাকার রোদের একটি [illegible]প্ত রেখা আসিয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু সেদিকে তাহার মোটেই খেয়াল নাই। ঘুম ভাঙিয়াই এই চিঠিখানা পাইয়া আজ তাহার মাথার ভিতরে বিষম গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা আবার চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল। অন্নপূর্ণা লিখিয়াছেন;—

"বাবা জয়,

তোমার পত্র পেলুম। যে লেখাপড়া শিখেছে, বংশগৌরবের দিকে যার দৃষ্টি আছে, সে এমন পত্র লিখ্‌তে পারে না।

তুমি কি জাননা, গঙ্গাজল ছুঁয়ে গৌরীর মায়ের হাত ধরে আমি কি শপথ করেছিলুম! গৌরীর মা যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখনো আমি তাকে কি আশ্বাস দিয়েছিলুম, তাও তুমি অনেকবার শুনেছ। তারপর, গৌরীকে আমি তোমার সঙ্গেই মানুষ করেছি। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে জানে, তোমার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। স্বামী বল্‌তে সে তোমাকেই বোঝে। তোমার সঙ্গে তার সামাজিক লোকবুঝানো বিবাহ হয়-নি বটে, কিন্তু ধর্ম্মত এখনই তুমি তার স্বামী।

আর, আজ তুমি এ কি বল্‌ছ! গৌরীকে তুমি বিবাহ কর্‌বে না!

এ বিবাহে তুমি যদি অমত কর, তাহলে কি হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছ? তাহলে আমার সত্যভঙ্গ হবে—গঙ্গাজল ছুঁয়ে যে সত্য আমি করেছি। তাহলে পরলোক থেকে গৌরীর মায়ের আত্মা অশান্ত হয়ে উঠ্‌বে,—হয়ত তার অভিশাপে তুমিও ইহলোক-পরলোক দুই হারাবে। তাহলে এ সংসারে থেকেও অভাগী গৌরী জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌বে।

তুমি কি তাই চাও? তুমি ত এমন ছিলে না, তবে কার চক্রান্তে পড়ে তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল? কোন্ কুহকিনীকে দেখে তুমি আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসেছ? সে কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কি নাম তার?... ... জেন, পৃথিবীতে রূপই বড় নয়, সংসারে আত্মসুখের চেয়েও বড় জিনিষ আছে।

আমি স্ত্রীলোক বলেই তুমি আমার অবাধ্য হোতে সাহস করেছ। উনি থাক্‌লে আজ তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে এতবড় অপমানটা কর্‌তে পার্‌তে না। স্ত্রীলোক কি এতই হেয়?

বাবা জয়, লক্ষ্মী মাণিক আমার,—এমন কাজ তুই করিস্‌নে! ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়, আমার কোলে ফিরে আয়—তোকে আর কল্‌কাতায় থাক্‌তে হবে না, তোর আর লেখাপড়ায় দরকার নেই। আমি তোকে গর্ভে ধরি-নি বটে, কিন্তু আমি তোকে যে স্নেহ যে ভালোবাসা দিয়েছি—কোন মা কি সন্তানকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারে?

তুই কি আমাকে বিমাতা বলে পর ভাবিস্? তাই হবে! তোর আচরণ দেখে আমারও কি মনে হচ্ছে জানিস্? মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভে জন্ম নিলে হয়ত তোর এমন কুমতি হোত না—আমার দেহের রক্ত তোর দেহে থাক্‌লে আজ হয়ত আমার বুকেই তুই এমন শেল হান্‌তে পারতিস্ না!

কিন্তু জয়, আমাকে তুই জানিস্ ত? আমি স্নেহ দিতেও জানি, শাসন কর্‌তেও জানি। তিনি যে উইল করে' গেছেন, তাতে সমস্ত বিষয়ের উপরে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার। এই পত্রেও তোর মন যদি না-ফেরে, তাহলে তুই ত্যজ্যপুত্র হবি; সমস্ত বিষয় আমি গৌরীর নামে লিখে দিয়ে যাব। ইতি

তোর দুঃখিনী মা।

পুঃ। তোর চিঠির কথা শুনে গৌরী কি কর্‌ছে জানিস্? কাঁদ্‌ছে, খালি কাঁদ্‌ছে।"

দুই করতলের ভিতরে মাথা গুঁজিয়া জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল।... ...তার মন তখন দোলনার মত দুলিতেছে—একবার এদিকে, একবার ওদিকে!

গৌরীর কান্নার অশ্রু তার মনকে[illegible] হয় সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কি সত্যই গৌরীকে ভালোবাসে?... ... ... প্রাণপণে আপনার মনের ভিতরটা [illegible] তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিল।... ...

না! সেখানে ইন্দুলেখার রূপের পূর্ণজ্যোতিতে ঝল্‌মল্ করিতেছে! [illegible] প্রত্যেক চাহনি, প্রত্যেক ভাবভঙ্গি, প্রত্যেক কথাটি পর্য্যন্ত তাহার বুকের ভিতরে [illegible] মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া আছে, তাহার [illegible] দেহের রক্তে রক্তে যেন ইন্দু'র শত-শত প্রতি[illegible] নাচিয়া বেড়াইতেছে,—আর তাহার [illegible] দেহ যেন শত-শত নেত্র লইয়া সেই[illegible] নির্নিমেষে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপুল পুল[illegible] রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে!... ... ... নাই—নাই, গৌরী সেখানে নাই!

হ্যাঁ, গৌরীকেও সে ভালোবাসে বটে কিন্তু সে যে বোনের প্রতি ভাইয়ের ভালোবাসা! সে ভালোবাসায় এ ভালোবাসায় যে অনেক—অনেক তফাৎ!

জয়ন্ত অনেক ভাবিল, কিন্তু তার হৃদয়ের ভাষা যে কথা বলিতেছে, তাহার সত্যতা কি-কারিয়া সে অস্বীকার করিবে!

মরুভূমে বর্ষাধারার মত, গৌরীর কান্নার অশ্রু জয়ন্তের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া আবার শুকাইয়া গেল!

হঠাৎ অন্নপূর্ণার পত্রের একটা জায়গা বিশেষ-করিয়া তাহার চোখে পড়িল। তিনি ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন।

ইন্দুকে ভালোবাসিয়া মনের ভিতর হইতে সে জোর পাইতেছিল বটে—কিন্তু এতক্ষণ

[illegible]য়ে কোন অবলম্বন পাইতেছিল না; [illegible]ল, পত্রের উপরে আর-একবার দৃষ্টিপাত [illegible]য়া তাহার প্রাণ একেবারে রুখিয়া [illegible]াইল। অন্নপূর্ণা বিমাতা, তাই তিনি [illegible]হার রক্তের দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ভ-[illegible]ণীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! আর [illegible]াতা বলিয়াই তিনি তাহাকে ত্যজ্যপুত্র [illegible]রিবার কথাটা মুখে আনিতে পারিয়াছেন! [illegible]নি কি ভাবিয়াছেন, বিষয়ে বঞ্চিত হইবার [illegible]য় সে প্রাণের প্রার্থনা ভুলিয়া কুকুরের [illegible] ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদলেহন করিবে? [illegible]—কখনই না!... ... ...

[illegible]দরজায় মুখ বাড়াইয়া ভজহরি ডাকিল, [illegible]োকন, তোর আজ হ'ল কি! চাদ্দিকে [illegible]াদ খাঁ-খাঁ কর্‌চে,একনো মুখ-হাত ধুলি-নে!"

জয়ন্ত ডাকিয়া বলিল, "ভজা, ঘরের [illegible]ভিতরে আয়, কথা আছে!"

ভজহরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হাঁটুর কাপড় [illegible]নিয়া মেঝের উপরে উবু হইয়া বসিল।

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, চিঠিতে মা কি [illegible]লেখেছেন জানিস্?"

—"কি লিকেচে খোকন?"

—"যদি গৌরীকে বিয়ে না-করি, আমি [illegible]ত্যজ্যপুত্র হব।"

ভজহরি একেবারে লাফাইয়া উঠিল। [illegible]অত্যন্ত উদ্বেগের স্বরে বলিল, "অ্যাঁঃ, সে [illegible]কি রে!"

—"হ্যাঁ।"

—"তুই কি কর্‌বি তবে?"

—"গৌরীকে বিয়ে কর্‌ব না।"

—"সাধ করে' পথে বস্‌বি?

—"হ্যাঁ, তোর ভয় হচ্ছে নাকি?"

—"ভয়! তুই হাসালি খোকন! তিনকাল গিয়ে আমার এককালে ঠেকেচে, আমার আবার ভয়? দুগ্‌গা—দুগ্‌গা! ওরে বোকা, আমি ভাব্‌চি তোর জন্যে।"

"আচ্ছা ভজা, আমার এই মা যদি বিমাতা না-হতেন, তাহলে আমাকে ত্যজ্যপুত্র কর্‌বার কথা কি তিনি মুখে আন্‌তে পার্‌তেন?"

ভজহরি খানিক ভাবিয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা নয় রে খোকন, তা নয়! মাঠাক্‌রোণ যে গঙ্গাজল ছুঁয়ে পণ করেচেন গৌরী-দিদির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন! পাচে অধম্ম হয় সেই ভয়েই তোর ওপরে তিনি রাগ করেচেন! তিনি ত তোকে সৎমার মতন ছাকেন না ভাই! তোর অ্যাতটুকু বয়েস থেকে তিনি যে জয় জয় বলে অজ্ঞান, তোর সামান্যি অসুক হ'লে ভাব্‌নায় তাঁর চোকে যে জল আস্‌ত! আমার চোকে ধূলো দিয়ে তুই অ্যাক্‌বার পিদিমের কাচে গিয়েছিলি বলে মা-ঠাক্‌রোণ আমার সঙ্গে কদ্দিন কথা কন-নি—নেহাৎ পুরণো চাকর আর তুই আমার বড্ডই ন্যাওটা বলে সেবারে মানে-মানে আমার চাক্‌রিটা টেকে গ্যাল। সৎমার কতা মনে আনিস্-নে রে খোকন, মনে আনিস্-নে,- এ মাকে বিমাতা বল্‌লে তোর মঙ্গল হবে না!"

জয়ন্তের মন আবার এলাইয়া পড়িল, বিছানার চাদরটা মুঠোর ভিতর পাকাইতে-পাকাইতে স্তব্ধ হইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সত্য! অন্নপূর্ণার ব্যবহারে আজ-পর্য্যন্ত কখনো বিমাতার বিমুখতা প্রকাশ পায় নাই। এমন-কি, কেউ না বলিয়া দিলে

জয়ন্ত আজ জানিতেই পারিত না, তিনি তার নিজের মা নন।

ভজহরি বলিল, "আর তোরই-বা এ কি ধনুকভাঙা পণ যে, তুই গৌরীকে বিয়ে কর্‌বি-নে! ব্যাচারী তোর কাচে কি দোষে দুষী, আমাকে বুঝিয়ে দে দিকি অ্যাক্‌বার!"

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভজা, গৌরীর ত কোন দোষ নেই—কিন্তু তাকে বোন ছাড়া আর কিছু আমি বল্‌তে পার্‌ব না। বেশ, মা যদি বলেন, আমার বিষয়-সম্পত্তি আমি গৌরীকে দিচ্ছি, অতবড় বিষয় পেলে রাজার ঘরে গৌরীর বিয়ে হবে, তাই নিয়ে সে সুখী হোক্—মাও আমাকে ক্ষমা করুন।"

—"আর তোর কি হবে?"

—"আমি ইন্দুকে বিয়ে কর্‌ব।"

—"বৌকে কি খাওয়াবি, পরাবি?"

—"নিজে রোজ্‌গার কর্‌ব, আমি পুরুষ-মানুষ, মূর্খও নই।"

ভজহরি সকাতরে জয়ন্তের কাছে আগাইয়া আসিল। তারপর তার [illegible] স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে বলি "থোকন, নক্সী ভাই আমার! [illegible] মায়ের কথায় কান দে, তাঁর আঁতে [illegible] অ্যাত-বড় ঘা মারিস-নে!"

জয়ন্ত দু-হাতে নিজের মাথার দু[illegible] চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তা আর হয় ভজা! ইন্দুকে না-পেলে আমি—"

ভজহরি অবাক হইয়া দেখিল, জয়ন্তের চোখ অশ্রুজলে টস্‌টস্ করিতেছে থোকনের চোখে জল! সে আর থামিতে পারিল না, জয়ন্তকে কচিছেলের মত দুইহাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওরে খোকন, আমার চোখে সাম্‌নে তুই কেঁদে ফেল্‌লি! না ভাই তোর যা প্রাণ চায় তাই কর্—আ আর কোন কতা কইব না!"—এই বলি সে ব্যাকুল ভাবে জয়ন্তের চোখের জ দুইহাতে মুছাইয়া দিতে লাগিল। [ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হায়রে অভিমানী!

ও আমার সূর্য্যমুখী
ওগো কুসুমরাণী,
শুধাই তোরে চুপে চুপে
গোপন একটি বাণী!

এমন তোমার রূপের ঘটা!
এমন বর্ণ এমন ছটা!
লুকাও তুমি কিসের তরে
মধুর গন্ধখানি?

কমলিনী আকুল হেসে
গোলাপ দোদুল গন্ধে ভেসে;
প্রেমিক অলি শুনায় এসে
সুখের গুন্‌গুনানি!

কার অযতন কাহার ভুলে
তুমি আনন শূন্যে তুলে
সাঁঝ না হতে পড় ঢুলে
হায়রে অভিমানী!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নাগকেশর *

বিশ-পঁচিশ বছর আগে, বাঙ্‌লা কাব্যের আসরে [illegible] সুরের আলাপ শোনা যেত, কবিদের বীণায় [illegible] সুর এখন আর বাজতে শোনা যায় না।

সত্য বটে, বাঙ্‌লার বর্ত্তমান গীতিকাব্যে যেমন [illegible]মান্ রাগিণীর বৈচিত্র্য, যেমন নিত্যনূতন ছন্দের [illegible]ঠা, যেমন সার্ব্বজনীন ভাবের বিত্ত দেখা যায়, [illegible]শ-পঁচিশ বৎসর আগে তেমন-ধারা বিচিত্রতা [illegible]ভোগের অবসর বড় ছিল না;—কাব্যের যে-দিকটি [illegible]খন ছিল তরল, এখন সেটি হয়েছে গভীর; এবং [illegible]খনকার সংকীর্ণতা এখনকার সর্ব্বগ্রাহিতার মধ্যে [illegible]শেষে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু একালের এতটা [illegible]তি সত্ত্বেও, যতই দিন যাচ্ছে ততই আমরা একটি [illegible]র থেকে ক্রমেই যেন বেশী বঞ্চিত হয়ে পড়্‌ছি। [illegible]রীন্দ্রনাথের "মানসী" ও "সোনার তরী" প্রভৃতি [illegible]ব্য-পুথিতে যে খাঁটি লিরিকের মন-মাতানো সুরটি [illegible]ল, সে সুর এখন দিন-কে-দিন ক্ষীণ হ'তে [illegible]ীণতর হয়ে যাচ্ছে কেন?

মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য-সাগরে পড়ে বাঙালীর প্রাণ [illegible]খন দস্তরমত হাবুডুবু খাচ্ছিল, "সোনার তরী" তখন [illegible]বতার আশীর্ব্বাদের মত ভরা-জোয়ারে আমাদের [illegible]াছে ভেসে এসেছিল। বাঙালীর ধাতে মহাকাব্যের [illegible]ুত্ব যে একেবারেই যুৎসই নয়, বৈষ্ণব-কবির [illegible]ণিকা গান এতদিন-পর্য্যন্ত অল্‌জ্যান্ত বেঁচে থেকে [illegible]বিশেষভাবে তা প্রমাণিত করে' দিচ্ছে। সুতরাং [illegible]আমাদের গীতিকাব্যের পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মত [illegible]ঢুকে মহাকাব্য কিছুদিন উপদ্রব করেছিল বটে, [illegible]কিন্তু সে উৎপাত আমরা বেশীদিন সহ্য করে' [illegible]উঠতে পার্‌লুম না। তাই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ [illegible]প্রভৃতি কবি বাঙ্‌লার আসর অত-শীঘ্র জমিয়ে তুল্‌লেন—কারণ তাঁদের কাছ থেকে আমরা যা পেলুম তা মহাকাব্যের গুরুত্ব নয়, গীতিকাব্যের লঘুত্ব।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্ত্তী দুই কবি—বিহারীলাল ও—বিশেষ করে'—সুরেন্দ্রনাথ খণ্ডকবিতা লিখে থাকলেও, তার মধ্যে লিরিকের রসরূপ উচিতমত কোটাতে পারেন-নি। তাঁদের রচনা মহাকাব্য ও গীতি-কাব্যের মাঝখানে দোটানায় পড়ে ঐ দুয়েরই আকারলাভ করেছিল।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা,' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' এই শ্রেণীর কাব্য। অর্থাৎ, এগুলি ঠিক গীতিকাব্য না-হ'লেও এদের মধ্যে মহাকাব্যের কবল থেকে মুক্তিলাভের একটা প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা দেশে যে জিনিষ আম্‌দানি কর্‌লেন, তা একেবারে আন্‌কোরা—খাঁটি লিরিক বল্‌তে যা বুঝায়! সন্ধ্যাগগনের মেঘের স্বপনের মত সেগুলি যেমন বিচিত্র, তেম্‌নি সুন্দর, তেম্‌নি হাল্‌কা এবং প্রথম ফাল্গুনের বাসন্ত সমীরের মত তারা চকিতে প্রাণের ভিতরে তরল ও চপল ভাবের ইঙ্গিতে জাগিয়ে যায়। তারপরে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙ্‌লার কবিরা গীতিকাব্যের এই সুর ধরেই কাব্যচর্চ্চার মেতে উঠেছিলেন!

কিন্তু আগেই বলেছি, এখন আবার হাওয়া বদ্‌লে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এখন যে-শ্রেণীর কবিতা রচনা কর্‌ছেন, আকারে-প্রকারে তা মহাকাব্যের মত বৃহৎ ও গুরু না-হ'লেও, সেগুলির মধ্যে লিরিকের লঘুতাও আর নাই; এগুলির আকার ছোট হ'লে কি হয়, এদের ভাব এমন বিশাল ও গম্ভীর যে, পড়্‌তে গেলে পাঠককেও

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ'র লেখা কবিতার বই। দাম একটাকা। অকাশক গুরুদাস-লাইব্রেরী।

যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তাশীল হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের আগেকার কবিতা ছিল একেবারে নিশ্চিন্ত যৌবনের কবিতা; আর, তাঁর এখনকার অধিকাংশ কবিতা (তাঁর গানের কথা এখানে ধর্‌ছি না) হচ্ছে ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ, বিশ্বের মধ্যে বিক্ষিপ্ত জীবন-সমস্তার কাব্য। হয়ত-বা বাঙ্‌লার বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে এইটেই বেশী স্বাভাবিক এবং উপযোগী কারণ, এ-যুগের কর্ম্ম-সংঘাতের মধ্যে নিরিবিলিতে বসে স্বপ্নচয়নের অবকাশ বড় অল্প।

আমাদের সমালোচ্য কাব্যের কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বাঙলা গীতিকাব্যের পুরণো লিরিকের পরিচিত সুরটি এখনো তিনি ত্যাগ করেন-নি।

"আজ বসন্তে হঠাৎ চেয়ে
দেখছি আমার কুঞ্জ ছেয়ে
ফুল ফুটেছে মনের মরা গাছে,
বুকের বেড়ায় হিয়ার ফাঁকে
যেথায়-সেথায় ডাঁটায় শাখে
তারই মধুর গন্ধ জমে আছে।
... ...
মনের মধু-মালঞ্চেতে
বস্‌ল আবার আসন পেতে
পদ্মপাতায় সে কোন্ সাহসিকা,
বকুলফুলের দুকূলখানি
বুকের পরে কে লয় টানি'
চটুল চোখে—ও কোন্ চতুরিকা?"

—এ সুর রবীন্দ্রনাথের সেকালের সুর, একালে যা আর বড় শোনা যায় না।

নবীন বাঙ্‌লার তরুণ কবিদের অনেকেই আজকাল এমন হঠাৎ-গম্ভীর এবং অকাল-প্রবীণ হয়ে উঠেছেন যে, তাঁরা আর "শুধু অকারণ পুলকে" কোন হাল্‌কা ভাবের পল্‌কা সুরের গান ধর্‌তে পারেন না! আমাদের কাব্যলক্ষ্মীর মুখে তাইত আমরা আর কল্পনার রূপকথা শুনতে পাই না—নবীন কবিদের কাজের তাড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে এখন গেরস্থালীতে পাকা গিন্নির মত গাছ-কোমর বেঁধে হাতে-নাতে কাজকর্ম্ম কর্‌তে হচ্ছে! নবীন কবি এখন কাজের মানুষ হ'তে চান—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, কৃষির উন্নতি, পতিত-উদ্ধার, ম্যালেরিয়া-নিবারণ এবং শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার—একালে এমনি 'বস্তুতন্ত্র' ব্যাপার না-থাক্‌লে কাব্য নাকি অসার এবং অপাঠ্য হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যহীন আর্টকে একেবারে নিরুদ্দেশ করবার আয়োজন চল্‌ছে, কাজেই কবির মানসপুরের স্বপ্নোদ্যানে আকাশ-কুসুমের চাষ একেবারে নেতিয়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে! তিনি "নাগকেশরে"র কবি এই দুর্দ্দিনেও কল্পলোকের নিভৃত ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাই তিনি বল্‌তে পেরেছেন:—

"মনের বনের গহন-কোণে
আছে যে এক দেশ—
স্বপনরাণী থাকেন সেথায়
মেঘের মত কেশ;
... ...
জানই যখন অজ্ঞানাধিক—
আলোর বেশী কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন—সেত ভালো।
হাসি যখন অশ্রুজলে
যায়রে হেথায় ভেসে,
কিসের ক্ষতি—বাঁধ্ না বাসা
স্বপ্নরাণীর দেশে!"

'নাগকেশরে'র 'বসন্তসপ্তক', 'মধুমাসে' ও 'যা ঘরে চাঁদের আলো' প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই আ তাই দেখতে পাই, কবি উচ্ছ্বসিত আবেগে এ উদ্বেলিত আনন্দে অধীর হয়ে কল্পনার মায়ালো বিচরণ কর্‌ছেন। এ-সব কবিতায় শেখ্‌বার কিছু না বটে, কিন্তু সংসারে বাস্তবতার দংশনে যাঁরা জ হন, তাঁদের পক্ষে এ-শ্রেণীর কবিতা স্নিগ্ধ প্রলে মত কার্য্য করে।

যতীন্দ্রমোহনের রচনা-রীতিতে যত্রতত্র রবীন্দ্রনা প্রভাব দেখা যায় স্পষ্ট। এখনকার অন্যান্য কবি অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সুর ও ঝঙ্কার এ

ক্‌রে' নিতে পারেন-নি,—ভালো অনুকরণে সার্থকতা থাক্‌তে পারে, 'নাগকেশরে' তা পরিমাণে আছে। কিন্তু, নিছক ও অন্ধ করণে কোন কাব্য উচ্চশ্রেণীতে উঠ্‌তে না—যতই আশ্চর্য্য হোক্, সাহিত্যের গ্রামোফোনের একটুও মর্য্যাদা নেই। 'নাগকেশরে'র কবি ঠিক এ-শ্রেণীর অনুকারী নিজের চোখে পর্‌কলা পরে তিনি বিশ্বকে দেখেন তিনি স্বচক্ষে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ দর্শন করেছেন আত্মহৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা সেই সৌন্দর্য্যের কাশকে অধিক-সুন্দর করে' তুলেছেন। গকেশরে'র 'উৎসবে', 'কেয়াফুল', 'রাধা', রণ-স্মৃতি', 'শত্রু' ও 'নিষ্কৃতিহীন' প্রভৃতি তাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও ঝঙ্কার থাক্‌লেও গুলির ভাবে এবং প্রকাশ-কৌশলে কবির নিজত্বের , তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও খাঁটি কবিত্বের চয় আছে যথেষ্ট।

এই প্রসঙ্গে 'নাগকেশরে'র 'অন্ধবধূ'র কথা মনে ছে। এ কবিতাটিতেও কবির নূতনত্ব-সৃজনের াস দেখা যায়। এর আরম্ভটিও অতি সুন্দর। "অন্ধ" বলছে:—

"পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চল্‌না ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এযে ঝরা-বকুল! নয়?
তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।"

ালো ভাব লেখকের মনে আসে, ঠিক বিদ্যুতের কের মত! তখনি তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেল্‌তে -পারলে তার সার্থকতা আর থাকে না। এখানে বি বোধহয় সমগ্র ভাবটিকে ধারণা কর্‌তে রেন-নি। এ-কথা বল্‌ছি এইজন্যে যে, "অন্ধবধূ"র াই যেমন চমৎকার হয়েছে, তার আগাগোড়া ঠিক মন একসুরে বাঁধা হয়-নি। এর-মধ্যে সম্ভাব্য ছিল মেক, কিন্তু সে তুলনায় যা হয়েছে তা খুবই সামান্য। ন্ধবধূ"র কথায় সাধারণের মনে যে সহজ ভাব আসে, কবির কাছ থেকে আমরা তার চেয়েও অনেক বেশীর প্রত্যাশা করি—কিন্তু কবি এখানে আমাদের সে প্রত্যাশা ব্যর্থ করেছেন। ফলে যে কবিতাটি বাঙ্‌লা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট কবিতা হ'তে পারত, সেটি নিকৃষ্ট না হলেও বড়ই বাজার-চল্‌তি গোছের হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এখানে বিফল হ'লেও অন্যান্য অনেক জায়গায় কবি তাঁর কবি-নাম সার্থক করে' তুলেছেন। যেমন, 'শত্রু' নামে কবিতায় প্রণয়-বেদনার অশ্রুজলে অভিষিক্তা প্রেমিকা যেখানে আপনার জীবনেশ্বরকে 'শত্রু' বলে মনে কর্‌ছে—সেখানে আমরা বহুকবি-বর্ণিত প্রেম-বর্ণনার পরও কবির এই নায়িকার প্রেমের মধ্যে বেশ-একটু নূতনত্বের আস্বাদ লাভ করি:—

"কে বলে তাহারে দরদী আমার, অনুরাগী বলে কে—
মনে মনে আমি ভাল জানি মোর পরম শত্রু সে!
শত্রু না হলে যেখানে-সেখানে চোখে চোখে রাখে ঘিরে',
শত্রু না হলে ঘাটে-বাটে মোর পায়ে-পায়ে সে কি ফিরে,
শত্রু না হলে যেদিন হইতে আঁখিতে পড়িল আঁখি,
নয়ানের নিদ বয়ানের হাসি কাড়ি' লয় দিয়া ফাঁকি?"

"রামায়ণ-স্মৃতি"তে কবির "তীক্ষ্ণদৃষ্টি 'রামায়ণে'র আসল মর্ম্মটুকু ঠিক আবিষ্কার করতে পেরেছে:—

"তবু আজি ভাবি মনে—কতটুকু তার
স্মরণে প্রদীপ্ত আছে! কি কথা কাহার,
রাম আর বৈদেহীর মর্ম্মব্যথা ছাড়া—
চির-প্রেম-অশ্রু সেই রসের ফোয়ারা!
সেই চিত্র—সেই শ্লোক আসে ফিরে-ফিরে
ঝর-ঝর শ্রাবণের উতলা সমীরে
মল্লিকার গন্ধসম—সেই স্নিগ্ধ বাস
ঘনায় বক্ষের মাঝে গোপন নিঃশ্বাস!
আর যাহা আছে মনে, সবই বাষ্পে ঢাকা—
অস্ফুট অস্পষ্ট ছায়া—অন্ধকারে আঁকা।
সবই যায়—প্রেম থাকে জগতের আলো—
রামায়ণ-পাঠে তাই বুঝিয়াছি ভালো।"

"রাধা" নামে কবিতায় কবি বল্‌ছেন:—

"ব্রজভূমে বঙ্গভূমে—যেথানেই হোক্ যা'না কেন,
যে নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,

কুকে যা গোরায় হোক্ মন যদি দিয়ে থাকে বাঁধা—
আধা-অঙ্গ কাঁদে শুধু; কবি কহে সেই মোর রাধা।"

আমরা এই সামান্য তিনটি উদাহরণ দিলুম মাত্র; কিন্তু এ-ছাড়া আরো-অনেক জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকেও, যতীন্দ্রমোহন নূতন বৈচিত্র্য এবং নূতন ভাব ফুটিয়ে আপনার শক্তি জাহির করতে পেরেছেন।

তবু, অনুকরণের যা বালাই, যতীন্দ্রমোহন সব সময়ে তা এড়িয়ে চলতে পারেন-নি। তাঁর দু-চারটি কবিতায় ভাবমাধুর্য্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, সুর, ঝঙ্কার ও ভঙ্গী এমন-বেশী জেগে উঠেছে যে, তাদের কথাগুলিকে আর ধ্বনি মনে হয় না—মনে হয় একেবারে প্রতিধ্বনি। যেমন, তাঁর "পদ্মাতীরে" ও 'স্বপ্নরাণী'র প্রত্যেক পদটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' এবং 'সব-পেয়েছির-দেশ'কে বড় বেশীরকম স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহিত্যক্ষেত্রে অনুকরণ ততক্ষণ সহ্য হয়, যতক্ষণ-না অনুকারী এবং দর্শকের মাঝখানে আসল আদর্শ তার সমুজ্জ্বল রূপে এসে নকলকে দু-হাতে ঠেকে না দাঁড়ায়!

'নাগকেশরে'র কবি প্রেমিক কবি। আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধঘোষণা হয়েছে! ক্রিটিক্‌রা বলতে সুরু করেছেন, 'প্রেম এখন পুরণো—একঘেয়ে হয়ে গেছে, কাব্যে এখন গভীরতর অন্য-কিছু চাই!' ক্রিটিক্‌দের এই হুঙ্কারে ভয় পেয়ে নবীন ও তরুণ কবিরা পর্য্যন্ত, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবকে চাপা দিয়ে, মানসনদের তটে আধ্যাত্মিকতার টোপ ফেলে, বকধার্ম্মিকের মত ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন; কিন্তু এই অকালপক্ক আধ্যাত্মিকতার টোপ গিলে কাব্যরসিকদের যে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়ে উঠেছে, সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। প্রাণের স্বাভাবিক রক্তের টান বন্ধ করে' কবি যদি কিছু রচনা করেন, তবে তাতে ছন্দের ও শব্দের কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য থাকলেও স্বভাবসঙ্গত ভাবের সৌন্দর্য্য কখনো থাকবে না। (খালি intellectএর জোরে কখনো কাব্য ভালো হয় না—তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাব্য, যার মধ্যে কবির গোপন প্রাণের গভীর বার্ত্তা পাওয়া যায়।)

(ভাষা, ছন্দ, মিল ও ঝঙ্কার—এ-সমস্তকে সার্থক তোলে কবির ঐ প্রাণের বার্ত্তা। যতই পুরণো হোক্, যতই অবিচিত্র হোক্, কবি যদি খাঁটি কথাটি নির্ভয়ে সরল ভাবে বলতে পারেন, তবে পাঠকের প্রাণের 'পরে একটা উজ্জ্বল রেখা করবেই-করবে। যাঁরা গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদের গান পড়বার বা শোনবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা হয় এটা লক্ষ্য করেছেন যে, ভাষা বা ছন্দ যা —অর্থাৎ নির্দ্দোষ ও শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে-সব লক্ষণ উচিত, ঐ-সকল কবিতায় বা ছড়ায় তার নেই। তবু গ্রাম্য কবিদের রচনা অনেক আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করে কেন? তার আসল হচ্ছে এই যে, গ্রাম্য কবিদের ভিতরে ক্রিটিক উৎপাত নেই—তাই তারা যা বলে, অসঙ্কোচে প্রাণ খুলে বলে—মনের আনন্দে বনের বিহঙ্গের মুক্তকণ্ঠে তারা আকাশে-বাতাসে আপনাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ বাণী প্রেরণ করে।

প্রেমের ধর্ম্ম হচ্ছে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক —এ সনাতন ধর্ম্ম কখনো পুরাতন হয় না। তাই কাব্যের মধ্যে চিরন্তন হয়ে আছে এবং কোন কবি প্রেমকে পুলিপোলাওতে চালান প্রথম-শ্রেণীতে প্রমোশন পান-নি। অতএব ক্রিটিক্ যতই চীৎকার করে' ধিক্কার দিন আর যতই উৎপাত করুন, কবির মানস-নদ থেকে প্রেমের উৎপল উৎপাটন করতে কিছুতেই পারবেন না।

'নাগকেশরে'র কবিও নিন্দিত প্রেমের পক্ষ অ করে' আপনার স্বাভাবিক প্রাণের গতিকে করেন-নি—এমন-কি, তাঁর প্রাণকে এদিকে একেবারে দিশেহারা করে' ছেড়ে দিয়েছেন। বলেন:—

"প্রেম—সেই মহাবাক্য—প্রেম মহাবাণী—
কোথা রাজা, কোথা রাজ্য, কোথা রাজধানী!
এসেছে গিয়েছে কত বুদ্বুদের মত,
কত-না মহতী কীর্ত্তি হয়েছে বিগত—
ইতিহাস-কথাসার! প্রেম শুধু আছে,
লয়ে তার নিত্য সুধা নরচিত্ত মাঝে!

র শুধু পুণ্যচিত্র মানবের মনে
রহে জাজ্বল্যমান! জীবনের সনে
ক তাহার নিত্য; বিশ্ব যতদিন,
প্রেমের নক্ষত্র ধ্রুব অম্লান নবীন!
তাই তাহা বেঁচে আছে!"

"নাগকেশর" একরকম প্রেমের কাব্য বললেই —এর আগাগোড়া সর্ব্বত্রই কত সুরে, কত ণতে, কত ছন্দে ঐ এক প্রেমের কথাই ফুটে হে—কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো মিলনে নো বিরহে! 'নাগকেশরে' সবসুদ্ধ ছাপ্পান্নটি লা আছে—তার প্রায় অর্দ্ধেক কবিতাই হচ্ছে বারে নিছক প্রেমের কবিতা! এবং বাদ্‌বাকি কবিতাগুলির অধিকাংশের মধ্যেও কবি যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন আভাসে-ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যে প্রেমের জয়গান করেছেন।

সর্ব্বশেষে এটাও বলে রাখা ভালো, 'নাগকেশরে' প্রেম ছাড়া অন্য নানান্ রসের বৈচিত্র্যও নিতান্ত সামান্য নয় এবং কবি যখনি যে রস ফোটাতে চেয়েছেন, তখনি ঠিক লাগ্‌সৈ সুর, অকুণ্ঠ ভাব, অনিন্দ্য ছন্দ এবং সুন্দর ভাষা দিয়ে সাজিয়ে তাকে লোকের সাম্‌নে প্রকাশ করেছেন।... ...মোটকথা, 'নাগকেশরে' গুণগ্রাহী পাঠকের উপভোগ অতৃপ্ত থাকবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চক্র ও চক্রান্ত

"না হে, না, আমি এক পয়সাও বো না। গাড়ীতে সর্ব্বস্ব চুরি, তারপর াকের কাছে ভিক্ষে করে দেশে যাওয়া,— ব—"

"না, রেবতীবাবু, এ ছেলেটির তা নয়—"

"তা নয়তো, তবে সৎমার কথা শুনে বাপ াড়িয়ে দিয়েছে, এখন—"

"আজ্ঞে, তাও নয়। ও—"

"তবে দিল্লীতে গান শিখতে?"

বড়বাবুর কথা শুনিয়া নিরঞ্জন শ্যামলাল রেন্দ্রদ সফী সকলেই হাসিয়া উঠিল।

রেবতীমোহন মৈত্র দিল্লীর ডাকখানায় হিসাব বিভাগের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ অফিসেরই সামান্য কেরাণী। কেহ দুঃখ জানাইলে নিরঞ্জনের প্রাণ গলিয়া যাইত; যথাসাধ্য সে তাহার উপকার বা সাহায্য করিত, স্বয়ং অপারগ হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়াও প্রার্থীর প্রার্থনা যথাসম্ভব পূর্ণ করিত। ইহাতে কেহ তাহার সুখ্যাতি করিত, আবার এমন লোকও ছিল যাহারা মজা করিয়া যাহা-ইচ্ছা বলিয়া লইত, নিরঞ্জন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। সে জন্য আজ যখন সে বিপদগ্রস্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া বুক্ সেক্‌সনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেবতীবাবুর কাছে আসিল, তখন তাহাকে অনেক কথাই শুনিতে হইল। কোন কথা না শুনিয়া রেবতীবাবু তাহাকে বিদায় দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়িবার পাত্র নয়, সেও বালকটির বিপদ রেবতীবাবুকে না বুঝাইয়া নড়িবে না! সে বলিল, "আজ্ঞে, গান টান শিখতে বড় লোকের ছেলেরাই আসে, গরীব—"

"আহা, এ কথাইতো বল্‌ছি, কালাজ্বরও ঘোড়া রোগ হয়। হ্যাঁ শ্যামলাল, ওটা সাহেবের হুকুম নিয়ে War Controllerকে debit দিলেই হবে।... আমরা ঢের জানি হে বাপু, তোমরা কালকের ছেলে বৈ তো নও, ওরকম কত লোক কত কথা বলে কত কি ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। বিদেশে ও একটা মজা। হাঁ মুন্‌সিজি, তোমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল না সাহেবের হুকুম নিতে। তোমরা যেমন করে দেবে, আমরা সেই রকমই করবো, আমাদের নিজেদের মাথা-ব্যথার দরকার কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈ কি।"

"আজ্ঞে, এ ছেলেটি চাকরির জন্যে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চাকরির জন্যে, জানি, জানি, ও আর আমায় বল্‌তে হবে না। কেমন হে তিনকড়ি, Remittance registerটা গোলমালে submit হয়নি? এখন ভাল সাহেব পেয়েছ, যা খুসি করে যাচ্ছ, এর পর নিজেরাও ডুববে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও ডোবাবে।"

"এ ছেলেটি বড় গরীব—"

"কে বল্‌ছে—ধনী?" U. P. Exchange Account পাওয়া গেল না, একটা তার করে দাও না হে—"

"বাপ ছাঁপোষা—"

"বাঙ্গালীর ঘরে তাতো হয়েই থাকে, নতুন কথা আর কি! আঃ, ও আবার কি সিঙ্গিবাবু?"

"আজ্ঞে দেখুন দিকি C. I. T. বল্‌ছেন কি না আমাদের Salt statementএ Northern India Commissioner এর সঙ্গে দু আনা ভিন্ন পাইএর ... হয়েছে।"

"আঃ, জ্বালাতন! নিয়ে আসুন, দে... এই দেউকি বেটা আসছে, এই দি... আসছে যে। বেটা ডাকলে না কি ... বলিতে বলিতে দেউকি নন্দন আ... সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে সেলাম ক... বলিল, "বড়া সাব—" সিঙ্গিবাবু পাদ... করিয়া বলিলেন, "সেলাম দিয়া"। আ... মেড়ে পর্য্যন্ত বাহির করিয়া হা... হাসিতে চলিয়া গেল। রেবতীবাবু উ... হইয়া উঠিলেন। তাইত, ব্যাপার কি... Section-শুদ্ধ সকলকেই জিজ্ঞাসা করি... কাহার কি case গিয়াছে। কে... বলিল, approximate statement... ভুলের draftটা রয়েছে! কেহ ব... B. P. O. statement এর বিলম্বের ... হয়ত তার আসিয়াছে। কেহ বলিল, pendi... report দাখিল হয়েছে। যাহা হউ... রেবতীবাবু গালের পান ফেলিয়া সিগারে... নিবাইয়া জানালার উপর রাখিয়া শনৈঃ শ... "creeping like a snail unwilling t... the school" সাহেবের নিকট চলিলেন... নিরঞ্জনও বালকটিকে লইয়া অন্যত্র চলিল...

২

আজ চার-পাঁচ দিন হইল নিরঞ্জন বিধুভূষণকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কেহই বিশেষ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নয়, এমন কি মেসে থাকিতে দিতেও সম্মত নয়। যেমন দিন-কাল পড়িয়াছে লোকের সন্দে... বা ভয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। নিরঞ্জনে... বৈঠকখানা নাই, তথাপি সে তাহাকে কো...

...আপন বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছে। ...লোকের ছেলে বিপদে পড়িয়াছে, স্পষ্ট ...াই বা কি করিয়া বলে? কিছুদিন ...র্ণ ডাক্তার কিশোরীমোহন রায় ছেলেদের ...জন প্রাইভেট টিউটরের কথা তাহার ...হে বলিয়াছিলেন, তিনি যদি দয়া ...রিয়া ছেলেটিকে আশ্রয় দেন, এই ...সায় নিরঞ্জন রায় মহাশয়ের ডিস্‌পেন্সারির ...কে বিধুকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

...রায় মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির ...য়াছিলেন। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা ...রিতে হইল। বসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে ...ইলও বিস্তর। "ডাক্তার সাব কোথায় ...য়েছেন?" লোকের পর লোক আসিয়া ...জ্ঞাসা করে, "বন্দিগি জনাব, ডাক্তার ...াব কাঁহা গয়া?"

"মালুম নেই সাব।"

"কিস্‌বখ্‌ৎ আয়েঙ্গে?"

"কেয়া মালুম?"

"কেঁউ বাবুজী, ডাক্তার সাহাব কাঁহা ...ছি?"

"কম্পাউণ্ডার লোগোসে পুছিয়ে।"

"কেঁউ সাব, ডাক্তার সাহাব আয়া ...ই আভি?"

"ডাক্তার সাব কাঁহা বাবু?"

নিরঞ্জন রাগে বলিয়া উঠিল, "চুলোয়।"

"কেৎনা দুর বাবু সাব? কিসবখ্‌ৎ ...োটেঙ্গে?"

উত্যক্ত হইয়া নিরঞ্জন বিধুকে একটি ...বেঞ্চে বসাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া ...গেল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ডাক্তার-...বাবু আসিলেন, সঙ্গে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ডাক্তারবাবু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত একের ঔষধের ব্যবস্থা লিখিতে লিখিতে অন্যের জ্বরের অবস্থা শুনিতেছিলেন, তৃতীয় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে চতুর্থ রোগীর "খিচ্‌ড়ি "কোক্কা" খাইবার ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছিলেন্। পনের মিনিটের ভিতর প্রায় সকল রোগী দেখিয়া বিধুর দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন, "নাম?"

"আজ্ঞে, শ্রীবিধুভূষণ"—

"হাত দেখি—Be sharp, man, জ্বর ছেড়েছিল? পাইখানা হয়েছিল?"

ডাক্তারদের সময় যে কতখানি মূল্যবান, তাহা রোগী বা রোগীর অভিভাবকের দল কেহ আদৌ বিবেচনা করেন না। তাহার রোগ যে কি, এক কথায় কোন রোগীই কখনও ডাক্তারকে খুলিয়া বলে না। ইহারা যে তাঁহাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে একটুও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করে না, এ কথা সকল ডাক্তারদেরই জানা আছে, সুতরাং রায় মহাশয় বিধুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যথারীতি প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

Liq Ammon Acct—
Tinc Aconite—
Mag Suiph—
Add aqua—

এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ডাক্তার বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু এ ছেলেটি বড় বিপদে পড়েই—"

কলমটি রাখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কি জান, ডাক্তারের পয়সা দেবার সময় অনেকের

অনেক বিপদ হয়। অবশ্য এঁর কথা বলছিনি।" পরে নিরঞ্জনকে জবাবের অবসর না দিয়া কলমটি পুনরায় হাতে লইয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনের উপর লিখিলেন, "Half—"

"আজ্ঞে ক'দিন পূর্ব্বে ছেলেদের মাষ্টারের কথা বলছিলেন না ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছিনে,ত হে।"

"তা যদি এই ছেলেটিকে—"

বিধুর দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, "Then why did you keep me waiting so long ?" সেই সময় প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন হস্তে একটি ভিখারী আসিয়া ডাক্তার বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িল ; ডাক্তার বাবুকে জানাইল, বারো আনা পয়সা তাহার নাই, ছয় আনা মাত্র ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছে,কিন্তু কম্পাউণ্ডার বাবু তাহাতে ঔষধ দিতে সম্মত নন। ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনটি লইয়া ছয় দাগের স্থানে তিন দাগ করিয়া দিলেন। লোকটি "বাবুজিকা খয়ের" "বাচ্ছা জিতে রহ" "পরমাত্মা সুখী রাখে" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। তখন ডাক্তারবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ নিরঞ্জন, বলছিলুম কি, ইনি বেশ যত্ন করে পড়াবেন তো ? কতদূর পড়েছেন ? তোমাদের অফিসেই চাকরি করেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে না, ইনি এবার কলকেতায় আই, এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু ফেল হয়েছেন। সে জন্যে বাপ যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তাঁর অবস্থা খারাপ, তিনি আর পড়াতে পারবেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে এঁকে চাকরির অন্বেষণে বেরুতে হয়েছে। দেশে চাকরির বাজার জানেন তো ? তাই আর কি দিল্লীতে—"

"হ্যাঁ, দিল্লী এখন রাজধানী কি না! কোথাও কিছু জুট্‌লো ?"

"আমাদের অফিসে এখনতো খালি তবে শীগ্‌গির কটা লোক নেবে। দেখব'খন চেষ্টা করে। কিন্তু উনি কোথায় থাকে, খাই-খরচই বা চলে করে ? অর্থাৎ—"

"কিসে ফেল হলে হে ?"

"আজ্ঞে তা ঠিক বল্‌তে পারি নে।"

"সব দিকেই স্কোয়ার নাকি ? লিখে কিছু বুঝ্‌তে পার নি ?"

"যা লিখেছিলুম তাতে ফেল হবো হয় নি।"

"এক্‌জামিনারদের তোমার আক্রোশ ছিল বুঝি ?"

ডাক্তার বাবুর হাব-ভাব দেখিয়া কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিধু মনে মনে তাঁর উপর যথেষ্টই চটিয়াছিল কিন্তু এখন করিয়া কোন কথা বলা উচিত নয়, তাই চুপ করিয়া রহিল।

এই সময় রেবতী বাবুও ডাক্তার-খানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বসিবার জন্য চেয়ার টানিয়া দিলেন। বসিয়াই রেবতীবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে নিরঞ্জন যে, এখানেও ধাওয়া করেছ ?"

"কি করি বলুন, ভদ্রলোকের ছেলে বিপদে পড়েছে,—এখন নিরাশ্রয়—একটা ব্যবস্থা তার না হলে চুপ করে থাকি কি করে ?"

রেবতীবাবু বলিলেন, "দেখুন ডাক্তারবাবু, পয়সা নেই, কড়ি নেই, বাড়ী থেকে

বেরিয়ে পড়া এ একটা আজকালকার লেদের ফ্যাসান হয়েছে। এগুলো encourage করা কোনমতেই উচিত নয়।"

"এক-এ—না, না, আজকাল বুঝি বলতে আই-এ, যাহোক ফেল হয়েছেন, তাই বাপ করছেন, আর অমনি দিল্লী পাড়ি! বে করেছ ? পয়সা-কড়ি কিছু চুরি করে নেছ ?"

ডাক্তার বাবু একটা বিকট হাস্য করিলেন। বিধু ও নিরঞ্জন উভয়েই রাগে গর রহিল। তাহাদের ইচ্ছা হইল, এখনই বা হয় হইয়া পড়ে, কিন্তু ডাক্তারের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। তিনি যদি রাগ করেন, তাহা হইলে ছেলে-পুলের রোগের সময় মানুষ কাহার কাছে যাইবে ?

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "দেখ নিরঞ্জন, তোমায় সত্যই একটি মাষ্টারের প্রয়োজন কিন্তু আজকাল পুলিসের হাঙ্গামও তো জান ? জেনে-শুনে কাকেও আশ্রয় দিতে ভয় করে। না হলে ছেলেটি দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, বুদ্ধিমান বলেও বোধ হচ্ছে।"

"না মশাই, আজকাল যে ব্যাপার—হয়ত গোয়েন্দাই হবে।"

"তাতে আমার ভয় কি রেবতী বাবু ? নার্কিষ্ট না হয়!" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তারবাবু আবার বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমার নামটি কি বল্লে ?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।"

"নিবাস ?"

রেবতীবাবু বলিলেন, "তোমরা কোন্ শ্রেণী হে ?"

"আজ্ঞে আমরা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ—আমাদের বাড়ী বারুইপুরের কাছে—"

রেবতীবাবু বলিলেন, "গ্রামের নামটা বল দেখি। বলনা, লজ্জা কি ?"

"আপনারা চিনতে পারবেন কি ?"

"আচ্ছা বলই না, আমরাই কোন্ হ্যালি-বেরি কলেজ থেকে আসছি ?

"লাঙ্গলবেড়ে।"

"—লাঙ্গলবেড়ে ? বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যির বাড়ীর কোন্ দিকে ?"

"—আজ্ঞে ঐটিই আমাদের বাড়ী।"

"বিশ্বনাথ তোমার—?"

"বাবা।"

"বল কি ?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "রেবতীবাবু তাহলে চেনেন নাকি ?"

"খুব চিনি। দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। যদি একবার এদিকে—"উভয়ে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তার আর ভাবনা কি হে ?"

রেবতীবাবু বলিলেন, "কেমন হে নিরঞ্জন, দিনকতক না হয় উনি আমার বাড়ীতেই থাকুন। ছেলেটিকে একটু দেখবেন। আমার অবস্থা জানতো—"

"তাতো জানি, আপনার বাড়ী রাখেন যদি, সে তো ভালই। আর গেরস্থর ছেলে ভাত হাঁড়ির ভাত—"

"আর সাহেবকে বলে-কয়ে একটা চাকরিরও চেষ্টা করে দেবথ'ন।"

বিধু রেবতী বাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পাইল।

৩

রেবতীবাবু সাহেবের পেয়ারের লোক। তিনি বিধুর সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যও অকপটে জানাইলেন। সাহেব বিধুকে চল্লিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি দিতে প্রতিশ্রুত—প্রতিশ্রুত কেন—আগামী সোমবার হইতে তাহাকে নিয়োগ করিবারও আদেশ দিলেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে ঐ কাজে বাহাল হয়, ততক্ষণ কথাটা গোপন রাখিতে বলিলেন। কথাটা প্রকাশ না হয় সে জন্য রেবতীবাবুও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না। "কি জানি কেমনে কেবা বলি দেয় কাকে!" "A" Sectionএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অম্বুজাক্ষ দে সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার ছেলেও তো এফ, এ পাশ ছিল, তাহাকে ত্রিশ টাকায় কেন লওয়া হইল? আর এ ছেলেটাই বা কে? কি পাশ? তাহার সার্টিফিকেটই বা কে দেখিয়াছে? "C"Sectionএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নেহাল সিং বলিল, তাহার ভাই গ্রাজুয়েট ছিল সাহেব তাহাকে চল্লিশ টাকা দিলেন না কেন? Gazetted audit sectionএর auditor বিপ্রহরি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবকে বলিলেন, তাহারাও তো এফ্ এ, পাশ, বি, এ ফেল, তথাপি তাহাদের কুড়ি টাকায় প্রথমে লওয়া হইয়াছিল। সাহেব সকলের কথার জবাব দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন না, কেবল রেবতীবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া কথাটা প্রকাশ পাইল। রেবতীবাবু নিরঞ্জনের উপর সন্দেহ করিলেন।

অফিসে এক-এক Section সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক-একটা দল আছে একদল অপরদলের নিন্দামন্দ গুণ প্রভৃতি লইয়া মনোমালিন্য বাড়াইয়া তুলে। সাহেব রেবতীবাবুর কথায় উঠেন বসেন, অন্যদল তাহা সহ্য করিতে পারে না। যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দল নিজে কিছুই করিতে পারিলেন না তখন স্বয়ং কেরাণীদের বুঝাইয়া দিলেন, অফিসে রকম জুলুম চলিতেছে। ফলে বাহিরে লোক আনা, অন্যায় অবিচার প্রভৃতি দোহাই দিয়া তাহারা Comptroller General এর নিকট এক মেমোরিয়াল দাখিল করিল। সাহেব বুঝিলেন, ব্যাপার অনেকদূর গড়াইতেছে। তিনি বিধুকে টাকা বেতনে শিক্ষানবীশ লইবেন বলিয়া দিলেন; পরে যথানিয়মে পঁচিশ টাকায় পাকা চাকরি দিবেন। বিপ্রহরি, নিরঞ্জন, হুকুমচাঁদ, হোসেনবক্স প্রভৃতি অনেক এফ, এ পাশ আছে, তাহারা অনেকে আজও চল্লিশ টাকায় পাকা হইতে পারে নাই, সুতরাং বিধুকে তিনি উপস্থিত চল্লিশ টাকা দিতে পারিবেন না। রেবতীবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের কারণ—শত্রুপক্ষ হাসিল। তিনি মনে মনে নিরঞ্জনের উপর চটিলেন। বিধুর চাকরির কথা একমাত্র তাহাকেই তিনি বলিয়াছিলেন; সে পঁয়ত্রিশ টাকার গ্রেডে প্রথম ছিল, চল্লিশ টাকা তাহারই হইবার কথা। তা ছাড়া memorial, representation প্রভৃতি লিখিতে সে-ই প্রধান উদ্যোগী রচনা প্রায় তাহাকে ধরিয়াই সারা হয়। আপন sectionএর দুই-একজনকে ডাকিয়া

বাবু বলিলেন, "দেখলে হে, নিরঞ্জনের কেন, কি শত্রুতাটাই সাধলে!" সকলেই নের নিন্দা করিল। সেদিন আর বাবুর নিকট কেহ কোন কেস্ লইয়া তে সাহস করিল না, তিনিও অফিসের ন কাজ করিতে পারিলেন না, রুক্ষ চিত্তে াল-সকাল বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিলেন, ছোট মেয়েটা পন-মনে কলতলায় জল মাখিতেছে, অমনি ছেলেকে ধরিয়া খুব প্রহার দিলেন; ধরিতে আসিলে তাঁহাকে যা-ইচ্ছা-তাই লিয়া উঠিলেন। ভয়ী কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা রিয়া তিরস্কৃত হইয়া সে স্নান হইতে চলিয়া লেন। কেহ বুঝিতে পারিল না, ব্যাপার ? যথেচ্ছাক্রমে জামা-কাপড় ফেলিয়া ঠকখানায় আসিয়া বিধুকে তিনি জিজ্ঞাসা রিলেন, সাহেব চল্লিশ টাকা দিতে সম্মত ইলেন না, উপস্থিত কুড়ি টাকা দিবেন, াহাতে তাহার কি মত?

"চাকরি কাজ নেই—নিরঞ্জনদা বলেছেন াঙলা স্কুলে মাষ্টারি খালি—"

"বুঝেছি।" বলিয়া রেবতীবাবু বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

* *
*

কয়েকদিন রেবতীবাবু নিরঞ্জনের সহিত বাক্যালাপ করেন না; পথে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া যান। অফিসের সকলেই তাহার উপর চটা। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে—বিধুর চাকরির সে কি করিল? কেহ বা রাগ করিয়া বলে, ভদ্রলোকের ছেলে, যদিই বা সাহেব দয়া করিয়া একটা চাকরি দিতেছিলেন সেটার অন্তরায় হইয়া তাহার কি লাভ হইল? নিরঞ্জন প্রকৃতই সাদা-প্রকৃতির লোক, সে পেঁচ্ওয়া কথা বুঝিত না; সকলকেই সাদা কথায় জবাব দিত। ভিতরে ভিতরে যে একটা ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে, তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না। অদৃষ্টক্রমে এই সময়ে তাহার একটি ভুল ধরা পড়িল। ভুলটি সামান্য হইলেও Book Section ও "A" Sectionএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের মনোমালিন্যে উভয় পক্ষে খুব মসীযুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের ইংরাজী লেখার বহরে সাহেবের মনে ধারণা হইল, এটা একটা ভয়ানক ভুল, আর নিরঞ্জনই এই ভুল করিয়াছে! সুতরাং তিনি তাহাকে পঁয়ত্রিশ টাকার প্রথম হইতে ত্রিশ টাকার গ্রেডের সব-শেষে নামাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট বিস্তর কান্নাকাটি করিল কিন্তু কাহারও মন গলিল না। কেহ বলিলেন, "ফাঁকি দিয়ে কতদিন চালান যায় হে?" কেহ বলিলেন, "উপযুক্ত দোষের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে!" ব্যথিত অন্তঃকরণে নিরঞ্জন বাড়ী ফিরিল। পাঁচ-সাত দিন হইতে তাহার ছেলের ঘুষঘুষে জ্বর হইতেছিল, আজ বাড়ী আসিয়া নিরঞ্জন দেখিল, জ্বর ১০৫° ডিগ্রীতে উঠিয়াছে, ছেলে ভুল বকিতেছে। সে তখনই ডাক্তার বাবুর নিকট ছুটিল। ডাক্তারবাবু রেবতী-বাবুর কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের উপর খুবই চটিয়া ছিলেন; তাহাকে জব্দ করিবার শুধু অবসর খুঁজিতেছিলেন, ভগবান আজ সে সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। তিনি

নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া বলিলেন, তাঁহার যাইতে কোন আপত্তি নাই, তবে তাঁহাদের ক্লাবে ঠিক হইয়াছে যে তাঁহারা বাঙ্গালীদের বাড়ীতেও ভিজিট লইবেন; সুতরাং নিরঞ্জনকে অন্ততঃ চারিটি টাকা ভিজিট দিতে হইবে। নিরঞ্জন অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, ডাক্তারবাবু কিছুতেই টলিলেন না, অগত্যা তাহাকে তখন হকিম নূরমহম্মদের শরণ লইতে হইল। পরদিন বাঙ্গালীমহলে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল, নিরঞ্জন এমন কঞ্জুষ যে ছেলেটার অত-বড় ব্যারামে একটা ডাক্তার দেখায় না, একটা হাতুড়ে হকিমের হাতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আছে!

যে যাহাই বলুক, নিরঞ্জন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিধুর জন্ত বাঙ্‌লা স্কুলে একটি মাষ্টারি জোগাড় করিয়া দিয়াছিল। আজ কাল যে রকম ব্যাপার, তাহাতে যাহাকে-তাহাকে মাষ্টার নিযুক্ত করা স্কুলের পক্ষে বড়ই ভয়ের কথা। সে জন্ত সেক্রেটারি, হেড্ মাষ্টার মহাশয়েরা তাহাকে চাকরি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যে কলেজ হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছিল তাহার প্রিন্সিপালের নিকট বিধু-ভূষণের বিপক্ষে তাঁহার কিছু জানা আছে কি না এই মর্ম্মে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আজ তাহার জবাব আসিল,—সকলেই অবাক! হার্ডিঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল লিখিয়াছেন, বিধু আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সার্টিফিকেট পাঠাইবার দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা পাঠাইয়া দিবেন। হেড মাষ্টার মহাশয় রেবতীবাবুকে পত্রখানি দিলেন। রেবতীবাবু সেই দিনই অফিসে আসিয়া সাহেবকে দেখাইলেন। সাহেব বলিলেন, "ছেলে যে খুব বুদ্ধিমান, তা আমি তার কটা কথা কয়েই বুঝ্‌তে পেরেছি আচ্ছা, ও যে বল্‌লে, গেজেট দেখেছি আমাদের অফিসেও তো গেজেট আ জুন মাসের গেজেটগুলো আনান্ তো গেজেট আসিল; কিন্তু আই, এর result বিধুর নাম পাওয়া গেল না। সাহেব বলিলে "দেখ, অনেকবার গেজেটে pass list অনেক correction দেখেছি, দেখ ত এ পরের সব গেজেট।" দেখিতে দেখিতে সত্যই একদিনকার গেজেটে পাশের খবরের কত গুলি ভ্রম-সংশোধন পাওয়া গেল। লে আছে, "আই, এ resultএর প্রথম বিভাগে নিম্নে ১৫র দাগে রমানন্দ ইন্‌ষ্টিট্যুসনে শশাঙ্কশেখর খাসনবীসের পরিবর্ত্তে হার্ডি কলেজের বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য উত্তীর্ণ" পড়িতে হইবে। উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি ভুল!"

"আচ্ছা বাবু, কেমন করে এ ভুলটা হল?"

"ভুল যে কি করে হয় সাহেব, তার কারণ সব সময়ে দেওয়া যায় না। অফিসেই তো দেখতে পান, যেখানে হবে ৩৭, সেখানে লিখে বস্‌লো ৯। কেন লিখলে, কি করে লিখলে, তা কিছুই ধরতে পারা যায় না। যে লেখে সেও বুঝতে পারে না, কি করে লিখলে। এখানেও হয়ত এক রোল নম্বর লিখতে আর-এক রোল নম্বর লিখে বসেছে। ব্যস্, নাম কলেজ সব বদ্‌লে গেল!"

যাহা হউক সাহেব বিধুকে তাঁহার সহিত

...া করিবার জন্ত রেবতীবাবুকে বলিয়া ...লেন।

সেই দিন অপরাহ্নেই ডাক্তার রায় মহাশয় ...বতীবাবুর মুখে সকল কথা শুনিয়া ...লিলেন, "তবে আর দেরী কেন হে? ...ন্য শীঘ্রং। এই বেস্পতিবারেই তো দিন ...ছে। এখন ওর মনে আহ্লাদ হয়েছে, হয়ত ...বাড়ীতেই চলে যাবে!"

"আজ্ঞে শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি ...বে, বিশেষ নিরঞ্জন ছোকরা, জানেন ...তা—"

"রেখে দাও তোমার নিরঞ্জন! অমন ...র নিরঞ্জন দেখেছি, তুমি জোগাড়-যন্তর তো ...র। হিঁদুর ঘরে একবার দিয়ে ফেলতে ...ারে আর ফেরত চল্‌বে না। নিরঞ্জনকে ...ক্ষ আমিই করছি, এ দোরে সকলকেই ...াসতে হবে।"

"আজ্ঞে আপনি যদি ভরসা দেন আর ...মাদের ঘরের ভেতর আপনারাই এখানে ...াছেন—"

"ভরসা—নিশ্চয়ই—ও আর কালবিলম্ব ...রা নয়। ভালো কথা, এক কাজ কর। ...কে আর মাষ্টারি করতে দিও না। ...লকেতায় সেসন আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন ...ার ভর্ত্তি হবার সময় নেই, এখানে কিন্তু এখনও সময় যায় নি, এই সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ...কে সেণ্ট ষ্টীফেন্স্ কলেজে আজই ভর্ত্তি ...রে দাও। আর বলে দাও, তুমিই তার ...বাকে সব লিখবে; সে যেন এখন কিছু ...না লেখে।"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এটা উত্তম পরামর্শ—আপনি না হলে—"

"বুড়োর কথাটা শুনে চলো। তবে কথাটা উপস্থিত দু'দিন গোপন রেখো।"

"আজ্ঞে তা আর আমায় বলছেন কি!"

"জানি, তবে আমায় বলবার মানে হচ্ছে, মেয়েরা কোন কথা গোপন রাখ্‌তে পারে না, এই আর কি!"

রায় মহাশয় রেবতী বাবুকে সাবধান করিয়া দিলেন বটে কিন্তু নিজেই রায় গিন্নীকে কথাটা না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রায় মহাশয়ের বাড়ী একটা কৌন্সিল হাউস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অম্বুজাক্ষ বাবুর স্ত্রীই তাহার সভাপতি। সুতরাং গোপনে-গোপনে কথাটা শুনিতে বোধ হয় দিল্লীর বাঙ্গালীদের কাহারও বাকী রহিল না। রেবতীবাবুর সহিত পুরাতন কলহের কথা অম্বুজাক্ষ বাবুর মনে পড়িয়া গেল; তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তিনি তাঁহার পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যে যেমন লোক তাহার পারিষদও তেমনি জুটিয়া থাকে। বাবুর যেমনি ইচ্ছা প্রকাশ করা, পারিষদবর্গও সেই দণ্ডে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। শুনিয়া অম্বুজাক্ষ বাবু তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু মন্ত্রণা প্রকাশ না হয় এজন্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কাজেও তাহাই ঘটিল।

৪

আজ কয় দিন ধরিয়া অফিসে একটা গুজ-গুজ ফুষ-ফুষ চলিতেছে। অমন যুদ্ধের খবর ছাড়িয়া লোকে আজ কি একটা পর-চর্চ্চায় ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, "ও সব মিথ্যে। দিল্লীর লোকগুলোই ঐ রকম।" কেহ

নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া বলিলেন, তাঁহার যাইতে কোন আপত্তি নাই, তবে তাঁহাদের ক্লাবে ঠিক হইয়াছে যে তাঁহারা বাঙ্গালীদের বাড়ীতেও ভিজিট লইবেন; সুতরাং নিরঞ্জনকে অন্ততঃ চারিটি টাকা ভিজিট দিতে হইবে। নিরঞ্জন অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, ডাক্তারবাবু কিছুতেই টলিলেন না, অগত্যা তাহাকে তখন হকিম নূরমহম্মদের শরণ লইতে হইল। পরদিন বাঙ্গালীমহলে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল, নিরঞ্জন এমন কঞ্জুষ যে ছেলেটার অত-বড় ব্যারামে একটা ডাক্তার দেখায় না, একটা হাতুড়ে হকিমের হাতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আছে!

যে যাহাই বলুক, নিরঞ্জন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিধুর জন্য বাঙ্‌লা স্কুলে একটি মাষ্টারি জোগাড় করিয়া দিয়াছিল। আজ কাল যে রকম ব্যাপার, তাহাতে যাহাকে-তাহাকে মাষ্টার নিযুক্ত করা স্কুলের পক্ষে বড়ই ভয়ের কথা। সে জন্য সেক্রেটারি, হেড্ মাষ্টার মহাশয়েরা তাহাকে চাকরি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যে কলেজ হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছিল তাহার প্রিন্সিপালের নিকট বিধু-ভূষণের বিপক্ষে তাঁহার কিছু জানা আছে কি না এই মর্ম্মে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আজ তাহার জবাব আসিল,—সকলেই অবাক! হার্ডিঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল লিখিয়াছেন, বিধু আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সার্টিফিকেট পাঠাইবার দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা পাঠাইয়া দিবেন। হেড মাষ্টার মহাশয় রেবতীবাবুকে পত্রখানি দিলেন। রেবতীবাবু সেই দিনই অফিসে আসিয়া সাহেবকে উহা দেখাইলেন। সাহেব বলিলেন, "ছেলেটি যে খুব বুদ্ধিমান, তা আমি তার সঙ্গে কটা কথা কয়েই বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা, ও যে বল্‌লে, গেজেট দেখেছিল! আমাদের অফিসেও তো গেজেট আছে, জুন মাসের গেজেটগুলো আনান্ তো।" গেজেট আসিল; কিন্তু আই, এর resultএ বিধুর নাম পাওয়া গেল না। সাহেব বলিলেন, "দেখ, অনেকবার গেজেটে pass listএর অনেক correction দেখেছি, দেখ ত এর পরের সব গেজেট।" দেখিতে দেখিতে সত্যই একদিনকার গেজেটে পাশের খবরের কতক-গুলি ভ্রম-সংশোধন পাওয়া গেল। লেখা আছে, "আই, এ resultএর প্রথম বিভাগের নিম্নে ১৫৯ দাগে রমানন্দ ইন্‌ষ্টিট্যুসনের শশাঙ্কশেখর খাসনবীসের পরিবর্ত্তে হার্ডিং কলেজের বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য উত্তীর্ণ" পড়িতে হইবে। উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভুল!"

"আচ্ছা বাবু, কেমন করে এ ভুলটা হল?"

"ভুল যে কি করে হয় সাহেব, তার কারণ সব সময়ে দেওয়া যায় না। অফিসেই তো দেখতে পান, যেখানে হবে ৩৭, সেখানে লিখে বস্‌লো ৯। কেন লিখলে, কি করে লিখলে, তা কিছুই ধরতে পারা যায় না। যে লেখে সেও বুঝতে পারে না, কি করে লিখলে। এখানেও হয়ত এক রোল নম্বর লিখতে আর-এক রোল নম্বর লিখে বসেছে। ব্যস্, নাম কলেজ সব বদলে গেল!"

যাহা হউক সাহেব বিধুকে তাঁহার সহিত

দেখা করিবার জন্য রেবতীবাবুকে বলিয়া দিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নেই ডাক্তার রায় মহাশয় রেবতীবাবুর মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আর দেরী কেন হে? শুভস্য শীঘ্রং। এই বেস্পতিবারেই তো দিন আছে। এখন ওর মনে আহ্লাদ হয়েছে, হয়ত বা বাড়ীতেই চলে যাবে!"

"আজ্ঞে শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি হবে, বিশেষ নিরঞ্জন ছোকরা, জানেন তো—"

"রেখে দাও তোমার নিরঞ্জন! অমন ঢের নিরঞ্জন দেখেছি, তুমি জোগাড়-যন্তর তো কর। হিঁদুর ঘরে একবার দিয়ে ফেলতে পাল্লে আর ফেরত চল্‌বে না। নিরঞ্জনকে জব্দ আমিই করছি, এ দোরে সকলকেই আসতে হবে।"

"আজ্ঞে আপনি যদি ভরসা দেন আর আমাদের ঘরের ভেতর আপনারাই এখানে আছেন—"

"ভরসা—নিশ্চয়ই—ও আর কালবিলম্ব করা নয়। ভালো কথা, এক কাজ কর। ওকে আর মাষ্টারি করতে দিও না। কলকেতায় সেসন আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন আর ভর্ত্তি হবার সময় নেই, এখানে কিন্তু এখনও সময় যায় নি, এই সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে সেণ্ট ষ্টীফেন্স্ কলেজে আজই ভর্ত্তি করে দাও। আর বলে দাও, তুমিই তার বাবাকে সব লিখবে; সে যেন এখন কিছু না লেখে।"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এটা উত্তম পরামর্শ—আপনি না হলে—"

"বুড়োর কথাটা শুনে চলো। তবে কথাটা উপস্থিত দু'দিন গোপন রেখো।"

"আজ্ঞে তা আর আমায় বলছেন কি!"

"জানি, তবে আমায় বলবার মানে হচ্ছে, মেয়েরা কোন কথা গোপন রাখ্‌তে পারে না, এই আর কি!"

রায় মহাশয় রেবতী বাবুকে সাবধান করিয়া দিলেন বটে কিন্তু নিজেই রায় গিন্নীকে কথাটা না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রায় মহাশয়ের বাড়ী একটা কৌন্সিল হাউস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অম্বুজাক্ষ বাবুর স্ত্রীই তাহার সভাপতি। সুতরাং গোপনে-গোপনে কথাটা শুনিতে বোধ হয় দিল্লীর বাঙ্গালীদের কাহারও বাকী রহিল না। রেবতীবাবুর সহিত পুরাতন কলহের কথা অম্বুজাক্ষ বাবুর মনে পড়িয়া গেল; তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তিনি তাঁহার পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যে যেমন লোক তাহার পারিষদও তেমনি জুটিয়া থাকে। বাবুর যেমনি ইচ্ছা প্রকাশ করা, পারিষদবর্গও সেই দণ্ডে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। শুনিয়া অম্বুজাক্ষ বাবু তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু মন্ত্রণা প্রকাশ না হয় এজন্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কাজেও তাহাই ঘটিল।

৪

আজ কয় দিন ধরিয়া অফিসে একটা গুজ-গুজ ফুষ-ফুষ চলিতেছে। অমন যুদ্ধের খবর ছাড়িয়া লোকে আজ কি একটা পর-চর্চ্চায় ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, "ও সব মিথ্যে। দিল্লীর লোকগুলোই ঐ রকম।" কেহ

বলিতেছে, "এর মধ্যে মিথ্যে কি আছে? অবিশ্বাসের কারণটা কি?" দুইদলে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "দেখছ না, আজ নিরঞ্জন অফিসে আসে নি," কেহ বলিল, "দেখছ না, অমুক দুটোর সময় বাড়ী যাবার দরখাস্ত করেছে।" যখন তর্ক করিয়া কোন স্থির মীমাংসা হইল না, তখন দুই-এক জন সাহেসে ভর করিয়া স্বয়ং রেবতীবাবুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, কি একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি,—এটা কি সত্যি?"

রেবতীবাবু গরম হইয়া বলিলেন, "কিসের গুজব?"

"এই আপনার মেয়ের নাকি বে?"

"কে বল্লে?"

"সকলেই বলছে।"

"সকলে? সকলটা কে? একটা নাম কি নেই?"

"এই যে নিরঞ্জন আজ—"

"নিরঞ্জন বলেছে—that stupid fellow! সে জানলে কি করে?" টেবিল চাপড়াইয়া খাতা-পত্র ফেলিয়া রেবতীবাবু একটা মহা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিলেন। Section-শুদ্ধ লোক সেখানে সমবেত হইল। যাহারা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অম্বুজাক্ষ বাবুকে সংবাদ জানাইল। সেখানে একটা বিকট হাসির রোল উঠিল!

প্রকৃতিস্থ হইয়া রেবতীবাবু নিরঞ্জনকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। ফরাস আসিয়া সংবাদ দিল, নিরঞ্জন দুইটার সময় বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। রেবতীবাবুর আর কোন কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "What a devil he must be!"

বাড়ী ফিরিয়া রেবতীবাবু বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চুপি চুপি এই সকল আয়োজনই সারিয়া ফেলিয়াছেন। বাকী গায়ে হলুদ! আজ অফিসে অতটা রাগ করা ভাল হয় নাই, তিনি ভাবিলেন, নিরঞ্জনের হাতে ধরিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। নিরঞ্জনকে তিনি ডাকাইতে পাঠাইলেন। ছেলে আসিয়া খবর দিল, তিনি আসিতে পারিবেন না।

"আরে তুই কেন গেছ্‌লি, বিধুকে পাঠিয়ে দিলিনে কেন?"

"বিধুদা যে এখনও কলেজ থেকে আসেননি।"

"সে কি রে?" স্ত্রী ভগ্নী সকলকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই ঐ একই জবাব দিল, সে এখনও আসে নাই।

রেবতীবাবু দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণ অফিস থেকে এসেছি, এ কথা কেউ তো এতক্ষণ বলিস্‌নি?" জল পর্য্যন্ত না খাইয়া ছড়ি হাতে করিয়া তখনই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

৫

তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। রায় মহাশয় ডিস্‌পেন্‌সারীতে নাই, সাড়ে সাতটায় ফিরিবেন। রেবতীবাবু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। টেবিল হইতে খবরের কাগজটি লইয়া দুই একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবার তাহা রাখিয়া দিলেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁহার

কাগজ পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজি, লড়াইকা কেয়া হাল?"

"চল্ রহা হ্যায়" মাত্র বলিয়া তিনি Lancet নামক ডাক্তারি কাগজখানা টেবিল হইতে লইয়া diabetes mellitus-এর পথ্যাপথ্য বিচারটা একটু পড়িবার চেষ্টা করিলেন। পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীটি আবার বলিল, "বাবু জান, ধোতি জোড়াভি ছ'রুপেয়া হো গিয়া", "হাঁ এসাই হোগা" বলিয়া তিনি বন্ধুর লাইব্রেরিরর ক্যাটালগ দেখিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাও ভাল লাগিল না, উঠিয়া পায়চারণ করিতে করিতে আলমারির মধ্যস্থ ঔষধের শিশিগুলির গায়ের লেবেল ও বিজ্ঞাপন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে যে কি ব্যথা; তাহা তিনিই জানেন, অন্যে কি বুঝিবে? যাহা হউক সাড়ে সাতটার সময় ডাক্তার বাবু আসিলেন, রোগীদের ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রেবতীবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় মন দিলেন।

"অ্যাঁ, বলেন কি? আমি কিন্তু ঐ রকমই সন্দেহ করেছি।"

"এখন উপায় কি, বলুন।"

"নিরঞ্জনটা বড়ই ছোটলোক ত! কেন, তার এতে কি ক্ষতি হচ্ছিল?"

"সে যাই হোক, এখন উপায় কি?"

"কথা হচ্ছে, তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বলে তো আমার মনে হয়।" একটু ভাবিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, নিরঞ্জন কোথায়, খোঁজ করুন। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখি, কি করে সে এখান থেকে যায়। তখনই বলেছিলুম, মেয়েদের কাছে কোন কথা

বলতে নেই। নিশ্চয়ই মেয়ে-ব্যাপারে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে।"

"কি করব বলুন, এরা তো সব দিক্‌ বিবেচনা করে বল্লে কারও কাছে কিছু বলেনি।"

"যাই হোক, দেরী করবেন না, যা বল্লুম, এখনই ত করুন।"

রেবতীবাবু ডাক্তার বাবুর কথামত বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। নিরঞ্জনের বাসা তাঁহার বাসার কাছেই, সুতরাং ভাবিলেন, একবার সেখানটা হইয়া যাইবেন; কিন্তু মোড় হইতে তিনি শুনিলেন, কে যেন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, "রেবতীবাবু, ও রেবতীবাবু—""

তিনি উত্তর করিলেন, "কে হে?"

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "একটি ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন।" মিউনিসিপালিটির তেলের টিম্‌টিমে আলোয় রেবতীবাবু ভদ্রলোকটিকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভদ্রলোকটি রেবতীবাবুর অবস্থা বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, নীলরতন, চিনতে পারলে না?" এল, এম, এস কলেজের ব্রক্‌ওয়ে সাহেব রেবতীবাবুকে নীলরতন বলিয়া ডাকিতেন।

"এ্যাঁ, এ কি—বিশ্বনাথ—? টেঁপি, ও খ্যাঁদা, ওরে ও মোনা, একটা আলো নিয়ে আয়—তোরা কি আর বৈঠকখানার দোর খুলবিনে?" পুত্রের খবর লইবার জন্য বিশ্বনাথ বাবুর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তার উপর রেবতীবাবুর কথার ভাব দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশঙ্কা হইল। তিনি বসিবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, আগে খবর কি, বল দেখি?"

রেবতীবাবু নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন।

তাহার উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। সে তো নিশ্চয়ই বিবাহের কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখলে কালি, লোকের আক্কেল! ভদ্রলোকের এই না খাওয়া, না দাওয়া, কোন্ দেশের কুড় রাজ্যের কুড় থেকে আসছেন, এখনি খবরটা দেবার—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল; কালীবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রলোকেরা জানলা হইতে উঁকি মারিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার বাবু এসেছেন।"

"আসুন, আসুন, রায়-মশায়—"

"আসচি তো—এত লোকজন কেন? সব—"

বিশ্বনাথবাবুকে দেখাইয়া রেবতীবাবু বলিলেন, "বাপও এসে পড়েছেন, তবে ভু দিন—"

বিশ্বনাথ বাবুর বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "রেবতী, তুমি কি বলছ,—তবে কি বিধু নেই?" কেহ জবাব দিল না; সকলেই বিশ্বনাথের দিকে তাকাইল। তিনি আরও অধীর হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কি রেবতী, চুপ করে—"

"ওহে নিরঞ্জন, বলেই ফেল না, আর চাপা কেন? তোমার ইষ্ট-সিদ্ধি তো হলই।"

"কি বলবো ডাক্তার বাবু?"

"ডাক্তার বাবুই বলুন। চার-চারটে উপযুক্ত ছেলে গেছে, তাতেও যদি এ পোড়া জীবন রাখতে পেরে থাকি, তাহলে এ খবরটা শুনেও তা রাখতে পারবো! রেবতী, যখনই তোমায় তার পেয়েছি, তখনই আমি তাই বুঝেছি—মাগী বোঝে না, কাজেই—"

"আমার তার? সে কি?"

বিশ্বনাথ বাবু চোখ মুছিতে মুছিতে পকেট হইতে তারটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই যে—"

ডাক্তার বাবু রেবতীবাবু প্রভৃতি সকলেই তার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রেবতীবাবু তার করিয়াছেন, "বিধুর টাইফয়েড, আশা কম। বিশ্বনাথ শীঘ্র আসিবে।" নিরঞ্জন তারটি দেখিতে চাহিলে ডাক্তার বাবু তাহাকে অযথা কতকগুলি কুকথা শুনাইয়া দিলেন। তাহার যে কি দোষ, নিরঞ্জন তাহা বুঝিল না।

"আপনারা কি বলচেন মশাই—আজ সকালে যে তাকে আমি কলেজ যেতে দেখেছি। আর আমি তাকে লুকিয়ে রাখবো কেন?"

"তোমরাই জান, জব্দ করবে; মজা দেখবে অপদস্থ করবে।"

"দেখুন রেবতীবাবু, আমি গরীব বটে, কিন্তু ইতর নই। ভগবান জানেন—"

বাহির হইতে বিধু ডাকিল, "খাঁদু—" "ঐ যে বিধু" বলিয়া সকলে একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এই যে বিধু, কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ? তোমার বাবা এসেছেন।"

"আজ্ঞে, কলেজে আজ ড্রামা ছিল, সেই জন্যে—" বলিতে বলিতে বিধু আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। পিতা-পুত্রে উভয়েই কাঁদিয়া

ফেলিলেন; কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে বিশ্বনাথ বাবু চোখে জল মুখে হাসি লইয়া বলিলেন, "নীলু, ব্যাপারটা কি হে? তোমাদের যেন কি একটা হয়েছে! এ টেলিগ্রামটা কে দিয়েচে, কেন দিয়েছে বল দিকি?"

"বিশুদা, আর কোন কথা গোপন করবো না—কথাটা কি জান, আমি তোমার ছেলেটিকে ফাঁকি দিয়ে নেবার মতলব করেছিলাম, তাই পাঁচজনে পরামর্শ করে আমায় জব্দ করবার চেষ্টা করেছে।" এই বলিয়া রেবতীবাবু বিধুর আসা হইতে সমস্ত ঘটনাই খুলিয়া বলিলেন।

"বটে, তাঁরা তো বেশই করেছেন, বন্ধুর কাজই করেছেন। তুমি যেমন জোচ্চোর, তেমনি হয়েছে। কালই আমি মা-লক্ষ্মীকে দেখে যাব, আর গিন্নী যে ফর্দ্দ দিয়েছেন, তাও দেখাব, তার একটি কাণা কড়িও ছাড়বো না। নিরঞ্জন তো কৈ এ সব কথা আমায় বলে নি!"

সকলেই নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে যে কখন্ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা জানিতেও পারে নাই।

তারাকালী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে জান্‌লে তো—"

"নিরঞ্জন জান্‌তো না? কি বলচেন কালীবাবু?"

"নিরঞ্জন এর কিছু জানে না। আর সে কি ঐ প্রকৃতির লোক! সে জানতে পারলে কি আর এতটা হত! এর ভেতর লোক আছে হে, মাথা আছে, বুঝলে?

"হ্যাঁ কালীবাবু, এখন আমি বুঝতে পারচি। অমু সে দিন—"

"থাক্, থাক্, সে কথা আর কেন? তবে—"রেবতী, তোমার বুঝতে বড় দেরী লাগে। এখনও বুঝতে পারচ না মিথ্যে সন্দেহ করে একজনের কি সর্ব্বনাশ করলে! ছেলেটার এই ভীষণ অসুখ নিয়ে সে পাগল হয়ে আছে—বেচারাকে জব্দ করবে বলে তোমরা এমন চক্রান্ত করেছ যে একটা অভাগা শিশু—তার অসুখে এই বিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তারবাবুও তাকে দেখতে যাবার সুযোগ পান্‌নি, নিরঞ্জনকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন—আর নিরঞ্জন—"

কথাটা শেষ হইল না, অদূরে কান্নার রোল উঠিল।

বাহির হইতে নিরঞ্জন ভাঙ্গা গলায় বলিল, "ডাক্তারবাবু, ছেলেটা কেমন করছে, এত কাছে রয়েছেন, একবার যদি—"

বিশ্বনাথ কহিলেন, "এ্যাঁ তার ছেলের এমন ব্যামো—আর নিরঞ্জন্ আমায় নিয়ে দিব্যি এখানে এল! একবার খবরটা অবধি—ডাক্তারবাবু—"

"চল, চল" বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবু ও অন্যান্য সকলে নিরঞ্জনের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

স্বপ্নকে অনেকেই অর্থহীন অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করেন। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে, একবিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে নিদ্রাকালে স্বপ্নে তাহাই নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নানা রূপে দেখা দেয়। তাই কাব্যে উপন্যাসে বিরহী-বিরহিণীর প্রেমাস্পদকে স্বপ্নে দেখা একটা অতি-সাধারণ বিষয়। ভীতি ও আতঙ্ক হইতেও স্বপ্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে দেখিতে পাই; গভীর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিবার কথাও শুনি। কিন্তু বাস্তবের সহিত স্বপ্নের সম্পর্ক খুব অল্প বলিয়াই আমাদের ধারণা।

এমনও অনেক সময় হয় যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিষয়ও স্বপ্নে দেখা গিয়াছে; নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়া চলিয়াছি, বিশেষ ভাবনা-চিন্তা নাই, অথচ এমন একটা বিষয় স্বপ্নে দেখিয়া ফেলিব যাহা হয়ত কোন-কালে কল্পনাতেও কখনো স্থান পায় নাই!

আবার সময় সময় স্বপ্নে ভবিষ্যতের এমন-সব বিষয় অনুভূত হয়, যাহা অর্থহীন ত নহেই—পক্ষান্তরে গভীর অর্থপূর্ণ।

স্বপ্ন অর্থপূর্ণ বলিয়াই আগেকার কালের লোকের ধারণা ছিল। বহুদর্শী ব্যক্তিরা স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় করিতেন। দেশী-বিদেশী ভাষায় স্বপ্ন-ফল-সম্বন্ধীয় পুঁথির অভাব নাই। তবে স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ফলে তাহার বিপরীত ঘটে, এমনি কথাই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। ছেলেবেলায় ঠাকুর্দ্দা ঠাকুরমার কাছে স্বপ্নের কাহিনী বলিতে শুনিয়া তাঁহারা হয় বলিতেন, 'ভাল',—নয় কিছুই বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম যে নিশ্চয় তাঁহারা স্বপ্নের অর্থটা বেশ ধারণা করিয়া লইয়াছেন। স্বপ্নে আগুন দেখিলে কি ফল-লাভের সম্ভাবনা এবং সাপ দেখিলেই বা কি হয় ইত্যাদি নানা স্বপ্ন-বিচার বটতলার পুঁথিতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। আবার প্রথম রাত্রের স্বপ্নের একরূপ ফল, শেষরাত্রের স্বপ্নের ফল অন্যরূপ। কিন্তু এ-সমস্ত স্বপ্ন-ফল-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত যে সত্য নয় তাহাও আমরা বুঝি; সেইজন্যই এ-সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইতে চাহি না। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হইলেও বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট বা হতাশ হইয়া স্বপ্নের কারণ ও অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই।

স্বপ্ন-বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত বার্গসঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। যে স্বপ্নকে অমূলক বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া এতকাল সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন-সম্বন্ধে বার্গসঁর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সেদিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সিদ্ধান্ত এই—জীবনের প্রত্যেক ঘটনার স্মৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, কিছুই একেবারে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায় না। ইহারা সজীব থাকে এবং

সুযোগ পাইলেই আমাদের জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়, এমন-কি চেতন এবং অচেতন উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থার স্মৃতিও স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বার্গসঁর কথায় বলিতে গেলে, আমাদের অতীতের স্মৃতি কয়লায় সঞ্চিত বাষ্পের মত চাপ-দ্বারা পুঞ্জীভূত থাকে, স্বপ্নের পথে তাহারা হাড়ান্ পায়।

বার্গসঁর সিদ্ধান্ত যে কবিকল্পনা নয়, তাহা ভায়েনার প্রোফেসার Freud প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা হিষ্টিরিয়া রোগীর হৃদয়ের গোপন কথা ও লুকানো ভাব, যাহা অজ্ঞাতসারে রোগীর মনের উপর ক্রিয়া করিয়া রোগের সৃষ্টি করে, তাহা কৌশলে ব্যক্ত করাইয়া এই রোগ আরাম করিয়া থাকেন। স্বপ্ন কিম্বা এই প্রকার অর্দ্ধ-অতর্কিত অবস্থায় এই সমস্ত পীড়া দ্বারা দুর্ভাবনার কথা অলক্ষ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।* Freud প্রভৃতির মতে স্বপ্ন একেবারে নিরর্থক নয়—তবে যে অর্থ স্পষ্টভাবে সে প্রকাশ করে, তাহাই তাহার আসল চেহারা নয়। ইহা সাঙ্কেতিক, তাই ইঙ্গিতে ইহার অর্থ বুঝিতে হয়। মনুষ্য-হৃদয়ের এমন-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভাবনা স্বপ্নে ব্যক্ত হয় যাহা জাগরণে আমরা স্বীকার করিতে রাজি নহি। কারণ ইহাদের কল্পনা ক্লেশকর এবং ইহারা আমাদের বৈধ প্রকৃতির ঘোর বিরোধী। জ্ঞান-রাজ্যের দরজায় এক পাহারা-ওয়ালা খাড়া আছে, সে দেখে, যাহাতে অপ্রীতিকর স্মৃতিগুলি জ্ঞানের সীমানায় ঘেঁসিতে না পায়; কিন্তু কখনো কখনো অলক্ষ্যে রূপান্তর ধারণ করিয়া গুপ্তবেশে ইহারা প্রহরা এড়াইয়া জ্ঞানরাজ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহাই স্বপ্ন; এই সিদ্ধান্তের ফলে বাস্তবের অপেক্ষা কল্পনার দৌড়ই বেশী বলিয়া মনে হয়। অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি-ভাণ্ডারে কেবল অন্যায় অপ্রীতিকর ঘৃণ্য ভাব ও ভাবনাই জমা থাকিবে, এ কথা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

বার্গসঁর সিদ্ধান্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত ও প্রীতিকর। তিনি বলেন যে, আমাদের ভাল-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় সমস্ত স্মৃতিই এক জায়গায় সঞ্চিত থাকে। আমরা নিম্নে তাঁহার স্বপ্ন-বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—যে বিষয়ের আলোচনা করিতে চলিয়াছি, তাহা যে খুবই জটিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের কথা আছে তেমনি বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথাও আছে; কাজেই ইহার আলোচনা করিতে গেলে বিবিধ

* এই প্রণালীর চিকিৎসা-কালে চতুর উকিল যেমন নানা ফন্দিতে সাক্ষীকে জেরা করে, রোগীকেও সেইরূপ নানা প্রশ্ন করা হয়। তবে এক একটী সম্পূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু রোগীর নিকট এক-একটী শব্দ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। উকিলের জেরার উত্তরে যেমন সাক্ষী অলক্ষ্যে আপনার অজ্ঞাতসারে এমন-সব কথা বলিয়া ফেলে যাহা জ্ঞাতসারে সে বলিত না, তেমনি এই শব্দগুলির সাহায্যে রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার মনের ভাব-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি গোপন কথা বাহির হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিচিত্র সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে এবং সম্যকরূপে ইহার আলোচনা করিতে গেলে আমাদের স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। পাঠকবর্গের নিকট এই ত্রুটি নিবেদন করিয়া গ্রন্থের সূচনাতেই স্বতঃসিদ্ধ ও সাধারণ বিষয়গুলি বাদ দিয়া, একেবারে আলোচ্য বিষয়টীর অবতারণা করিব।

স্বপ্ন জিনিসটা এই,—স্বপ্নে আমি নানা বিষয় উপলব্ধি করি; সে সমস্তই অপ্রকৃত—তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে আমি মানুষ দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে যেন কথাবার্ত্তা কহি, সে যাহা বলে তাহাও শুনিতে পাই—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে স্বপ্নে কোন লোকের কোনই অস্তিত্ব নাই এবং বাস্তবিক আমি কোন কথা বলি না, বা তাহার কথা শুনিতেও পাই না। স্বপ্নে দেখি সত্যসত্যই বাস্তব মানুষ এবং বাস্তব জিনিস বর্ত্তমান; চকিতে নিদ্রাভঙ্গে কিন্তু সে সব অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

এখন প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই, সত্যই কি কিছুই ছিল না? অর্থাৎ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় নিদ্রিত অবস্থাতেও এমন কতকগুলি বাস্তব জিনিস কি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, যাহা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য?

চোখ বুজিয়া আমাদের দৃষ্টিমণ্ডলে কি ঘটিতেছে তাহা মনোযোগের সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন। কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি?—অনেকেই বলিবেন—না, কিছুই দেখা গেল না। এরূপ উত্তরে বিস্মিত হইব না। কেননা চোখ বুজিয়াও যদি কি[illegible] দেখিবার থাকে, তবে তাহা একটু অভ্য[illegible] চোখ-ছাড়া অপরের নিকট ধরা পড়ে না[illegible] কিন্তু যদি প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগের সহি[illegible] পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে চো[illegible] বুজিয়াও অনেক জিনিস দেখিতে পাও[illegible] যাইবে। প্রথমে একটা কালো ফুট্‌কি[illegible] এই কালো ফুট্‌কিতে কতকগুলি উজ্জ্ব[illegible] আলোকবিন্দু ধীরে বা ত্রস্তে আসিয়া উপস্থি[illegible] হয় এবং চকিতে অদৃশ্য হইয়া যায়, আবা[illegible] উপরে ও নীচে উঠা-নামা করিতেও থাকে[illegible] কখনো কখনো নানাবর্ণের নানা আকারে[illegible] বিন্দু দেখা যায়, ইহারা কাহারো চোখে অস্পষ্ট[illegible] আবছায়ার মত দেখায়, আবার কাহারো[illegible] চোখে এমনই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে বাস্তবে[illegible] সহিতও তাহাদের তুলনা হয় না! এই[illegible] বিন্দুগুলি কখনো-বা প্রসারিত হইতেছে[illegible] কখনো-বা সঙ্কুচিত হইতেছে—বর্ণ ও আকৃতির[illegible] মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কখনো-বা[illegible] সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বিলম্বে[illegible] সংঘটিত হইতেছে। এই-সব দৃষ্টি-বৈচিত্র্য[illegible] কোথা হইতে আসে? এই বর্ণ-রহস্য লইয়া[illegible] প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা[illegible] অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার[illegible] নানা নাম দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চোখের পাতা বুজিলে তাহার চাপে শোণিত-প্রবাহের দ্বারা অক্ষি-স্নায়ুমণ্ডলীর যে ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতেই এই বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। কারণ যাহাই হউক এবং এই বর্ণ-বৈচিত্র্যকে যে নামেই আমরা অভিহিত করি না কেন, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এরূপ ব্যাপার যে ঘটে

[illegible] উপরি-উক্ত বর্ণ-বিন্দুগুলিই যে আমাদের [illegible] উপাদান, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

[illegible] ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে M. Alfred [illegible]aury এবং সেই একই সময়ে St. [illegible]enisএর M.d'Hervey বলিয়া গিয়াছেন [illegible] যে-মুহূর্ত্তে আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়ি সেই [illegible]র্ত্তেই নানা আকারে পরিবর্ত্তনোন্মুখ এই [illegible]-বিন্দুগুলি কেন্দ্রীভূত ও একত্রিত হইয়া [illegible]মাদের স্বপ্নের বিষয়ানুসারে মনুষ্য ও পদার্থ-[illegible]চয়ের বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে রূপান্তরিত [illegible]। এই সিদ্ধান্তটিকে একটু সতর্কতার সহিত [illegible]মাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। আরো [illegible]াধুনিক কালের একজন ইয়াঙ্কি পণ্ডিত—[illegible]প্রফেসর Ladd একটী অপেক্ষাকৃত [illegible]ক্তিপূর্ণ কিন্তু জটিল সিদ্ধান্তে উপনীত [illegible]ইয়াছেন। তিনি বলেন, নিদ্রাভঙ্গে যে [illegible]প্নের দৃশ্য ধীরে ধীরে কাল্পনিক দৃষ্টি হইতে [illegible]ছিয়া যাইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া [illegible]ল্পনায় তাহা পুনঃ-চিত্রিত করিবার অভ্যাস [illegible]রিলে দেখা যাইবে যে, স্বপ্নের বিষয়ীভূত [illegible]র্ত্তি ও পদার্থ-সমূহ ধীরে ধীরে গলিয়া [illegible]াবার পূর্ব্বোল্লিখিত কতকগুলি বর্ণবিন্দুতে [illegible]রিণত হয়। কেহ যদি স্বপ্নে দেখে যে [illegible]সে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছে, জাগিবামাত্র সে সংবাদ-পত্রখানা মিলাইয়া যায় বটে, কিন্তু কালো কালো দাগে-ভরা একটী শাদা বিন্দু তখনো থাকিয়া যায়; আবার স্বপ্নের দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র জাগরণে মিলাইয়া গিয়া কতকগুলি উজ্জ্বল চিহ্ন-সমন্বিত একটি বৃহৎ বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সকল বর্ণ-বিন্দুই স্বপ্নে ঐ সংবাদপত্র বা সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছিল।

দৃষ্টির উপর আভ্যন্তরীণ এই বর্ণ-বিন্দুর লুকোচুরি ছাড়া বাহিরের নানা বস্তুরও প্রভাব রহিয়াছে। চোখ বুজিলেও মানুষের দৃষ্টিতে আলো ও অন্ধকারের তারতম্য ঘুচিয়া যায় না। এমন-কি, বিভিন্ন বর্ণের আলোকের পার্থক্যও কিছু-কিছু ধরিতে পারা যায়। দৃষ্টির উপর বাহিরের আলোকের এই প্রভাবও আমাদের স্বপ্নের এক প্রধান উপাদান। ঘরে হঠাৎ একটি মোমের বাতি জ্বালিয়া দিলে, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম খুব গভীর না-হইলে ইহা তাহার নিকট স্বপ্নে আগুন-লাগার চেহারা ধারণ করে। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য M. Tissieর দুইটী পর্য্যবেক্ষণের কথা বলিব।

B—Leon স্বপ্নে দেখিলেন, আলেক্‌জান্দ্রা থিয়েটারে আগুন লাগিয়াছে; সমস্ত স্থান অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তারপর হঠাৎ তিনি একটী বাগানের ঝরণার নিকট নীত হইলেন; সেখানকার চারিদিক্‌কার থামগুলির গায়ে-গায়ে যে শিকল বাঁধা ছিল—সেগুলিতেও রেখাকারে আগুন জ্বলিতেছে; তারপর তিনি যেন গ্যালারিতে গিয়াছেন; উহাও জ্বলন্ত; তিনি অগ্নি-নির্ব্বাণ-কালে নানা দুঃসাহসিক কার্য্যে যোগদান করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ চাহিয়া দেখিলেন, একজন শুশ্রূষাকারিণীর চোরা-লণ্ঠনের আলোকরশ্মি তাঁহার বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

M. Bernard স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্ম-ক্ষেত্রে (marine infantry) নৌ-পদাতিকভুক্ত আছেন; তিনি Fort-de-

France, Toulon, Loriet, Crimea, Constantinople প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন; তিনি বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে দেখিলেন; বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন; তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, কামানসকল অগ্নি উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। B—র মত তাঁহার বেলাও শুশ্রূষাকারিণীর লণ্ঠনের আলোক-রশ্মিপাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

হঠাৎ কোন আলোকরশ্মি চোখে পড়িলে নিদ্রিত ব্যক্তি তদনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্থায়ী মৃদু আলোকের প্রভাব ভিন্নপ্রকার।

A. Krauss একদিন নিদ্রাভঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে একটী সুন্দরী যুবতীর দিকে বাহু প্রসারিত করিতেছিলেন, ক্রমে এই যুবতী-মূর্ত্তি গলিয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রে রূপান্তরিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। চন্দ্ররশ্মি সচরাচর নিদ্রিত ব্যক্তির চোখের উপর আপনার মোহজাল বিস্তার করিয়া স্বপ্নে তাহার নিকট যুবতীর মোহিনী মূর্ত্তি উপস্থিত করে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পৌরাণিক গল্পের নিদ্রাবিলাসী মেষপালক Endymion ও চন্দ্রদেবী Seleneএর প্রণয়-কাহিনীর সহিত উপরি-উক্ত ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে—এ-কথা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি না?

আমি দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতির কথাই কহিয়াছি। ইহাই স্বপ্নের প্রধান উপাদান। তবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিও স্বপ্নের ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ চক্ষুর ন্যায় কর্ণেরও আভ্যন্তরীণ অনুভূতি আছে। এমন নানাবিধ শব্দ কাণের ভিতরে সর্ব্বদাই ভন্ ভন্, টিক্ টিক্ করিতেছে, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভব করা কঠিন, কিন্তু নিদ্রাকালে সহজ-শ্রাব্য। ইহা ভিন্ন ঘুমন্ত অবস্থাতেও বাহিরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিবার শব্দ, ইঁদুরের হুড়াহুড়ি-দৌড়াদৌড়ির শব্দ, জানালার গায়ে বৃষ্টি পড়িবার শব্দ, বাতাসের হুহু শব্দ প্রভৃতি আমাদের কাণে প্রবেশ করে এবং স্বপ্ন ইহাদিগকে অবস্থানুযায়ী কথাবার্ত্তা, হাসি-কান্না, গান-বাজনা প্রভৃতিতে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া লয়। Alfred Maury নিদ্রাকালে রান্নাঘরের চিম্‌টার (tongs) শব্দ তাঁহার কাণে ঢুকিল, আর অমনি তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া বিপদ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের জুনমাসের ঐতিহাসিক ঘটনায় তিনি যোগদান করিয়াছেন! এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতার ও পর্য্যবেক্ষণ-বৃত্তান্তের অভাব নাই। তাই আর অধিক আলোচনা না করিয়াই বলিতেছি যে, বর্ণ-বৈচিত্র্য শব্দ অপেক্ষা আমাদের স্বপ্নের উপর বেশী ক্রিয়া করে। আমাদের স্বপ্ন বিশেষভাবে দৃশ্য বস্তু। চোখ বুজিয়া থাকিলেও আমরা স্বপ্ন দেখি। Maximilian এর ন্যায় ব্যাপার অনেকের বেলাই ঘটিয়াছে, যে, স্বপ্নে কাহারো-না-কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন, অনেক-ক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিয়াছেন, তারপর হঠাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি লক্ষ্য করিলেন, যে তিনি কোন কথা কহিতেছেন না, কোন শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন না—কেবল স্বপ্নদৃষ্ট

ব্যক্তির সঙ্গে নীরবে ভাব-বিনিময় হইতেছে, স্পষ্টভাবে পরস্পরের বক্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে—অথচ একটী শব্দও কেহ প্রকৃত-পক্ষে শুনিতে পান নাই!

এ রহস্য সহজেই ধরিয়া ফেলা যায়। স্বপ্নে কোন-কিছু শুনিতে হইলে যেরূপই হউক একটা শব্দ কাণে প্রবেশ করা চাই;—সুতরাং স্বপ্নকালে যদি কোনরূপ শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট না হয় তবেই স্বপ্নে কথাবার্ত্তার শুধু মূক অভিনয় হইতে থাকে।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

কুঁড়ি

কেন জড়সড়? কিসের এ লাজ!
আমায় বল্।
দেখিয়া ফেলেছি?—তাই এ সরম!
হা দুর্ব্বল!

শাখার গোপন অন্তর হ'তে
কাহার প্রেমে
বাহিরিয়া, শেষে আলোকে সহসা
গেলি রে থেমে?

মিছে ঢাকাঢাকি!—হাসিটুকু যেগো
অধরে কাঁপে!
তবে কেন তারে রুধিছ কোমল
নিঠুর চাপে?

চাহিবনা?—ভালো, বিঁধিবনা আর
নয়নবাণে!
ত্বরা করে নাও মুকুল ফুটাও
আকাশ পানে!

ওকি! ওকি! ক্ষীণ বোঁটাটির পরে
দুলিছ কেন?
রুদ্ধ-হাসির তাড়নায় কি গো
বিলাস হেন!

হাল্কা হাওয়া কি চুমে গেল ধীরে?
জাগিল দিল্!
পারিলি না আর?—হাসির কোঠার
খুলিল খিল্!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

শরৎকুমার

শরতের ঘরখানি একতলায়, ঠিক বাগানের ধারেই, ঘরের পাশেই ছোট্ট একটু বারান্দা। রাত্রিকালে পড়িতে পড়িতে অবসন্ন বোধ করিলে, শরীরমনে বল সঞ্চয়ার্থে কত সময় সে এই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত। বাগানের ফুলের গন্ধে তখন কাহার হাসি মনে পড়িয়া যাইত? তারকার জ্যোতিতে কাহার নয়নের দৃষ্টি

তাহার দৃষ্টির উপর ভাসিয়া উঠিত। আকাশ-পৃথ্বী-মথিত এই আশানন্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে যখন পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিত তখন আর কোন পরিশ্রমকেই তাহার পরিশ্রম বলিয়া মনে হইত না। তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের সেই জীবন-ব্যাপী আশা আজ একটি মুহূর্ত্তে এমন করিয়া দগ্ধীভূত ভস্মে পরিণত করিলে তুমি?—হা ভগবান!

হাসির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজিও সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তরুলতায়, আকাশে বাতাসে চন্দ্রালোকের কি পুলক-কম্পন বহিয়াছিল! কিন্তু শরতের হৃদয়ে?—ইহার এক কণাও প্রবেশ করিল না। পুরাতন আনন্দ-দৃশ্যের দিকে চাহিয়া সে একান্ত নিরানন্দ মনে, আকুল হৃদয়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল—"উঃ, আজই যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম!"

পরদিনই সে আপনাকে বিলাত-যাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত করিয়া তুলিল। শরৎ আজন্ম-কাল হইতে মাতুল শ্যামাচরণের আশ্রয়েই পুত্রবৎ প্রতিপালিত। তিনিই তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছিলেন। সকালেই মামার নিকট হইতে শরৎ খরচপত্র লইয়া নয়টা না বাজিতে বাজিতে কোনরূপে আহারাদি শেষ করিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীর দোলায় নিউ-মার্কেটের দিকে ছুটিল।—গেটের কাছে নামিয়াই সম্মুখে দেখিল বন্ধুবর শ্রীধরকে। জিনিষপত্র চিনিতে এবং কিনিতে শ্রীধর যেমন পাকা শরৎ তেমনি কাঁচা। যে কাজে যে পটু সে কাজ করিতে তাহার লাগেও ভাল, অন্যথা ঠিক বিপরীত। অতএব দুজনের সঙ্গলাভে দুজনে সুখ বোধ করিল। তাহারা দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক অবশেষে চলিল লেড-ল কম্পানীর দোকানে। অভিপ্রায়, সেখানে শরৎ কলার, টাই, ও কামিজ প্রভৃতি কতকগুলো জিনিষ কিনিবে, আর পোষাক পরিচ্ছদ কিছু কিছু ফরমাসও দিয়া যাইবে। নানা কাপড়ের মধ্য হইতে দু-একটা কাপড় বাছিতে এবং গায়ের মাপ-জোক দিতে যে কতটা সময় যায় ইতিপূর্ব্বে সে জ্ঞানই শরতের ছিল না। এ কার্য্য সমাধা করিয়া টমাস কুকের গেটের কাছে যখন তাহারা নামিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুম করিয়া আফিসের গেটও বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন শনিবার।—দরজা বন্ধের আওয়াজটা এমন জোরে শরতের বুকে ধাক্কা দিল যে ক্ষণকাল জ্ঞান-শূন্যের মতই সে সেই ফুটপাথের উপর বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শরতের এতটা নৈরাশ্য শ্রীধরের নিকট ভারী হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল। তথাপি হাসিটা চাপিয়া লইয়া সান্ত্বনার স্বরে সে বলিল, — "এত মুষ্‌ড়ে পড়লে কেন হে? ক্যাবিন আজ এনগেজ করা হোল না তাতে আর ক্ষতিটা কি এমনই? জাহাজ ত আর আজই ছাড়ছে না—ছাড়বে সেই ১৫ই, আজ মাত্র মাসের ছ-তারিখ। চল চল আজ রেসের দিন, সেখানে যাওয়া যাক্, মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।"

ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান শরতের চেনা লোক, জিনিষ পত্র সহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া দুই বন্ধুতে পদব্রজে রেস কোর্সের দিকে চলিল। গেটের নিকট পৌছিয়া, দুখানা টিকিট কিনিয়া লইয়া তাহারা একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিয়াই শ্রীধর মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল—তাহার টিকি পর্য্যন্ত আর দেখা গেল না। এই জনাকীর্ণ অপরিচিত রাজ্যে একাকী পড়িয়া প্রথমটা শরৎ কেমন একটা বিজনতা উপলব্ধি করিল। ক্রমশঃ সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'বুকমেকার'গণ স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাজি খেলার টিকিট বিক্রয় করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে টাঙ্গান বোর্ডে যে যে ঘোড়া এ যাত্রা দৌড়িবে তাহাদের নাম লেখা। সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বাজিদারগণ তাহা পড়িতেছে, পড়িয়া ঘোড়া বাছিয়া সাধ্যমত বা অসাধ্যমত কোন একটা বা ততোধিক ঘোড়ার নামে বাজির টাকা জমা দিতেছে। শরৎকুমার এইরূপ দু-একটা ভিড়ের পাশ কাটাইয়া দৌড়চক্রের নিকটে বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এইস্থান—বিশেষতঃ এরূপ দৃশ্য তাহার নিকট সম্পূর্ণই নূতন।—শরৎ যে বিকাল বেলাটাও ঘরে বসিয়া পড়িয়া কাটায় এমন নহে, ততদূর ভাল ছেলে সে নয়। গড়ের মাঠের বেঙ্গলি ব্যায়াম ক্লবের সে একজন মেম্বর। প্রায়ই বিকাল বেলা সে এখানে আসিয়া কোনদিন বা খেলিত, কোনদিন বা খেলা দেখিত। কিন্তু ইহার পর আর কোন স্থানে যাইবার তাহার সময় হইত না; সখ্‌ও ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলা দৌড় হইয়া গিয়াছে। আর একটা আরম্ভের এখনো কিছু সময় আছে, তবুও বেড়ার ধারে ইতিমধ্যে লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আরোহী-(জকি) পরিচালিত বহু অশ্ব চক্র মধ্যে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কেতকার (Starter) সাঙ্কেতিক যন্ত্র খুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র মুহূর্ত্তে সেই সকল অশ্ব একই সঙ্গে চক্রপথ আলোড়িত করিয়া ক্ষিপ্ত বেগে ছুটিল। দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, অশ্বের প্রতিপদ-ক্ষেপে বাজিখেলোয়াড়দিগের হৃৎপিণ্ডে রক্ত-স্রোত দারুণ বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল; জকিগণ নিজ নিজ ঘোড়াকে সর্ব্বাগ্রে চালাইবার চেষ্টায় প্রাণের প্রতি মায়া মমতা ভুলিয়া গেল! কি এ বিকট উত্তেজনা! সর্ব্বগ্রাসী উন্মাদনা! বিরাট বিশ্বের ঝটিকা আবর্ত্তন যেন এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে উন্মত্ত দোলায় দোল দিতে লাগিল।—

একজন জকি মধ্য-পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। মাথা ফাটিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রতি মায়া মমতা দেখাইবার সময় ইহা নহে। একটা বেগবান অশ্ব জকির গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল তাহার জানুর উপর যেন ঘোড়াটার পায়ের আঘাত পড়িল। দুচারিজন কোমলহৃদয় দর্শক আহা আহা করিয়া উঠিল, শরৎ-কুমার দুইহাতে আপনার চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া পুনরায় চক্রের দিকে চাহিল তখন আর সেই হতভাগ্য

জকিকে সেখানে দেখিল না,—তখন ঘোড়াগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা আকাশভেদী রবে সম্মান-জয়ধ্বনি উঠিল। রণ্‌জির নাসিকা সর্ব্বাগ্রে দেখা গিয়াছে, তাহারই জিৎ। আহ্লাদে গর্ব্বে তাহার জকির মাথাটা যেন আধহাত উঁচু হইয়া উঠিল। 'বেটি' ও 'সুইটি' রণ্‌জির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ক্ষেপ দৌড় এইরূপে শেষ হইয়া গেলে, রণ্‌জির অনুবর্ত্তী ভাবে অশ্বগণ জয়ধ্বনির মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া চলিল।

আর সকলে বেড়ার ধার হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই শরৎকুমার সেই আহত জকির সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। আপনাকে ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়া সে অবিলম্বে আহতের শুশ্রূষার স্থানে আসিয়া দেখিল তাহার কলেজেরই একজন পরিচিত ডাক্তার জকির মাথা বাঁধিয়া দিতেছেন। শরৎ সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ দান পূর্ব্বক জকির জানু পরীক্ষা করিতে বলিলেন। শরৎ সাতিশয় তৎপর ভাবে পরীক্ষা পূর্ব্বক জানাইল, যে যতদূর মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা হয় নাই, জানু-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহকারে সে যেরূপ দক্ষতার সহিত পা বাঁধিয়া দিল তাহাতে ডাক্তার সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার তখন ক্লবে যাইবার সময়। শরৎ দৈবপ্রেরিত রূপে আসিয়া সাহেবকে এ সময় উদ্ধার না করিলে তাঁহার টেনিস খেলার এবং পানারামেরও যে বিলম্ব হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধন্যবাদ সহকারে শরতের নামের কার্ডখানা চাহিয়া লইলেন।

প্রাঙ্গণের একধারে দুইজনে কথা হইতেছিল। একজন ভগ্নহৃদয়ে কহিল—"এবারও হেরে গেলুম বিজনদা! এই শেষ chanceটা আমাকে দিতেই হবে"।

কথাটা বলিল শচীন্দ্র, ওরফে খোকা, হাসির ভ্রাতা। উত্তরে বিজন বলিল—"টাকা কোথা শচীন?"

"কেন, তোমার 'বেটি' ত দ্বিতীয় দাঁড়াল —তুমি ত বেশ টাকা পাবে।"

"বেশ টাকা পাব? হায়রে! টায়টোয়ে যদি ধার গুলো শোধ যায় তবেই ঢের; এর মধ্যে তোমার ধারই ত অনেক।" বলিয়া বিজন বাজির টাকা আনিতে ছুটিল। এই সময় শরৎ এদিকে আসিতে আসিতে শচীনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যালো?" শচীন হঠাৎ শরৎকে এখানে দেখিয়া প্রথমটা একটু যেন অবাক হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া শরতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলিল, "হ্যালো শর-দা! কতক্ষণ? তুমিও বাজি খেলছ নাকি?

"না, খোকাবাবু না"।

"তবে এখানে এসে কি লাভ?" সে অবজ্ঞার সুরে মুখভঙ্গী করিল। তারপর কি মনে হইল; খুব নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একটা কথা আছে শর-দা।"

"কি কথা?"

"এখানে না—ঐ গাছতলায় চল।" শরতের সহসা মনে হইল হয়ত ভাইকে দিয়া হাসিই বা তাহাকে কোন কথা বলিয়া

পাঠাইয়াছে কিম্বা যদিবা কোন চিঠিই লিখিয়া থাকে?" একবার তাহার পিতার অসুখের সময় হাসি তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। একটা অকারণ আশায় তাহার মাথাটা যেন সহসা ঘুরিয়া উঠিল! গাছতলায় আসিয়া দুই একবার ঢোক গিলিয়া বাধ বাধ করিয়া শচীন বলিল, "শর-দা, তোমার কাছে টাকা আছে?" শরতের ধীরে ধীরে একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল; একটুখানি সময় লইয়া বলিল—"আছে।"

"আমাকে কিছু ধার দেবে?"

"কত?"

"বেশী নয় শ তিনেক?"

"তিনশ! তাহলে যে আমার টিকিটের টাকা কম পড়বে!"

শরৎ বিলাত যাইবে—শচীন তাহা শুনিয়াছিল, বলিল—"সে ত দেরী আছে, তোমার ত আজই ছাড়ছেনা,—আমি তোমাকে কালই টাকা ফেরত দেব।—আমাকে এই শেষ chanceটা দাও শর-দা—দয়া কর, নইলে এ দেনা থেকে উদ্ধার পাবনা।"

"কিন্তু যদি এবারও না জেতো?"

"নিশ্চয়ই জিতব—bound to win, তুমি কি মনে কর ভগবান এমন নিষ্ঠুর এমন unjust!" তাহার এইরূপ উন্মত্ত বাক্যে শরৎ অবাক হইয়া গেল, তাহার মায়া করিতে লাগিল; ছেলে বেলা হইতে ছোট ভাইটির মত তাহাকে মনে করে। করুণ স্বরে কহিল—"কিন্তু তুমি দেখছনা—পরশুই আমায় ক্যাবিন ঠিক করতে হবে, নইলে এ-যাত্রা আমার যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"বন্ধ হবে না! আমি তোমাকে ঠিক বলছি।"

"ধর যদি নাই জেতো?"

"তবুও আমি কালই তোমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব।"

"কি ক'রে? তোমার বাবাকে ত আমি চিনি, তিনি ত দেবেন না।"

"মায়ের কাছে নেব; আমার পাশের পুরস্কার তাঁর কাছে আমার পাওনা আছে।"

"কিন্তু তোমার ত ধার অনেক—সব কি'—"

"আঃ, তাতে আর হয়েছে কি? সে ভাবনা আমার। ধর যদি আমার ঘোড়াটা প্রথম হয়—তাহলে আমার ভাগ্য ওলট পালট হয়ে যাবে। উঃ কি মজা!"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"ধর, তা হোলনা?"

"তাহলেও তোমার টাকা কালই চুকিয়ে দেব; দেবই দেব। তোমাকে শপথ করে বলছি।"

"শপথ করতে হবেনা—কিন্তু আর একটা বিষয়ে যদি শপথ কর ত আমি দিতে পারি।"

"কি?"

"তুমি কথা দাও এবার হারো বা জেতো আর কখনো এ রকম বাজির খেলা খেলবেনা?"

"যদি শপথ না করি?"

"তাহলে টাকা দেব না।"

শরৎকুমারের স্বর দৃঢ়—শচীন বুঝিল উপায়ান্তর নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পর বলিল—"বেশ তাই হবে, আমি শপথ করছি এই আমার শেষ বাজি খেলা।"

শরৎ পকেট হইতে ৩০০ শত টাকা বাহির করিয়া শচীনকে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে এবার শচীন জিতিল, তাহার ঘোড়া দ্বিতীয় হইল। ইহাতে ৫০০ শতের উপর সে টাকা পাইয়া গেল, কিন্তু তবুও তাহার সব ধার শোধ গেল না। বিজনকুমার তাহাকে যত টাকা ধার দিয়াছিল সব টাকা কাটিয়া লইয়া কেবল ৫০ টাকা মাত্র তাহাকে দিল। তাহাই শরৎকে দিয়া শচীন সানুনয়ে বলিল "শরদা, তুমি কিছু মনে করোনা, দেখলে ত বিজনদা আগে তার টাকা সব কেটে নিলে; আমি মনে করেছিলুম তোমাকেই আগে দেব; কিন্তু তা আর হোলনা। নাই দিক্‌গে ভয় পেয়োনা—আমি নিশ্চয়ই কাল তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।" বার বার এইরূপে শর-দাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক টমটমে আসিয়া উঠিল। এবং গাড়ী হাঁকাইয়া দুই বন্ধুতে গৃহযাত্রা করিল।

(৪)

বাজি খেলার নেশা হইতে শচীনকে রক্ষা করিতে পারিল এই ভাবিয়া শরৎ বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। তবে এই আনন্দ তাহার আত্মপ্রসাদে পরিণত হইতে পারিত, যদি ঋণের বদলে টাকাটা সে শচীনকে দানরূপে দিয়া দিতে পারিত। তাহা পারে নাই বলিয়া শরৎকুমারের মনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল; একটা ধিক্কারেরও উদয় হইল। এত বড় হইয়াছে সে, এখনো একটা পয়সার জন্য মামার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের ব্যয়ভার কোথায় নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবে—না এখনো তাহার জন্য মামারই ভাবিতে হয়। শচ বিলাত গেলে এ ভাবনা তাঁহার ক বাড়িয়া যাইবে! সে যদি কলিকাতায় বসি প্র্যাক্‌টিস করে তাহা হইলে অবশ্য এ দা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ধৈর্য্য ধরি কাজ করিলে অল্পদিনের মধ্যে এখানে তাহা পসার জমিবারও সম্ভাবনা—কারণ সার্জ্জারিতে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে। কি মামারই যে বিশেষ ইচ্ছা সে বিলাত যায়,— তিনিই ত একান্ত উৎসাহ সহকারে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি করিয়া পিতৃ-তুল্য মাতুলের এই গভীর স্নেহ-প্রণোদিত মঙ্গল-ইচ্ছাকে সে উপেক্ষা করিবে? তাহা নিজেরও যদি ইহাতে অনিচ্ছা থাকিত তাহা হইলেও সে তাঁহার এ ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু শরতের মনেও এ ইচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন এই ভিত্তিমূলে আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সুন্দর প্রাসাদের নক্সা আঁকিয়াছিল নিরাশার জলে তাহা মুছিয়া গিয়াছে,—তবুও সে বিলাত যাইতে চায়; কেন না ইহাই এখন তাহার শান্তি লাভের উপায়।

শরৎ শচীনের নিকট হইতে টাকা ফিরাইয়া পাইবার অপেক্ষায় রহিল। রবিবারে টাকা পাইবার কথা কিন্তু মঙ্গল-বারেও টাকা আসিল না। তবে কি শচীনকে টাকার জন্য শরৎ চিঠি লিখিবে? কিন্তু তাগাদা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিশ্চয়ই শচীন টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারে নাই,—পারিলেই নিজে আসিয়া দিয়া যাইত। চিঠি লিখিলে তাহাকে কেবল বিব্রত করা হইবে মাত্র!

কিন্তু মামার কাছে কি বলিয়া জবাব-দিহি করিবে সে? কি করিয়া আবার আজ টাকা চাহিবে?

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্যালী-পতি রাজা অতুলেশ্বরের ষ্টেটের ম্যানেজার। রাণীগঞ্জে ইঁহার যে কয়লার খনি আছে—প্রায় শনিবারে শ্যামাচরণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতে যান,—এবং হিসাব নিকাশ সহ প্রায়ই সোমবারে বাড়ী ফেরেন। এবার তিনি সোমবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু তখনও শরতের টাকা আসিল না, শরৎ বুঝিল, আর টাকা পাইবার আশা নাই।—এই দুশ্চিন্তার মধ্যে বিলাত যাওয়ার ইচ্ছাটাও তাহার যেন একরকম ডুবিয়া গেল।

মামা খাওয়া দাওয়ার পর অফিসঘরে কাগজের দপ্তর সম্মুখে করিয়া টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া একটা পায়রার পালকে কান চুলকাইতেছিলেন, এমন সময় শরৎ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পালকটা টেবিলে কলমদানীতে রাখিয়া তাহাকে সম্মুখের চৌকিতে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"ক্যাবিনের টিকিট কেনা হোল?"

"না এখনো হয়নি?"

"এখনো হয়নি! এ ষ্টীমারে তাহলে দেখছি তোর যাওয়াই হবে না! আজকালকার ছেলেদের যে কি রকম পাথুরে চাল হয়েছে,—তাঁরা থাকবেন চিট হয়ে বসে—আর কাজ গুলো যেন আপনি এসে ধরা দেবে! এমন গয়ংগচ্ছ কেন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

"টাকা কম পড়ে গেল।"

"টাকা কম পড়ে গেল! যত কিছু খরচ হতে পারে হিসাব ধরে তার উপর আমি যে একশ টাকা বেশী দিয়ে দিলুম। কত টাকা কম পড়েছে?"

"আড়াইশ!"

"আড়াইশ? সর্ব্বনাশ! অত টাকা কি করলে তুমি?" শরৎকে নীরব দেখিয়া লজ্জিত মনে করিয়া বলিলেন—"থাক্ আর বলতে হবে না—বুঝেছি ব্যাপারখানা কি! বিলিতি লোকে বেড়ে চোমরা করে ধরেছে, আপনাকে আর সামলাতে পার নি,—হাজার হোক ইংরেজ বাচ্ছার খোসামোদ! মনটা গলে মোম হয়ে পড়ে—তখন কি আর টাকা কড়ি মনে থাকে! উপেন-দাদা এ কথাটা বড্ড ঠিক বলেন—ইংরাজে যতদিন পায়ের জুত বুরুস না করে ততদিন রাঙ্গা মুখের মোহ ছোটে না। সাধে কি তোকে বিলাত পাঠাতে চাই—নিজের সাধ ত মিটল না, চিরকালই নিগার রয়ে গেলুম!"—

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল—"না মামা—"

"আরে আর লজ্জায় কাজ কি? যা হয়েছে তা হয়েছে,—তবে নবাবের ভাগ্নে যে নস্ ভবিষ্যতে এটা মনে রাখিস। সেকালে আমরা কি রকম চালে চলেছি শুনবি? একটি আফিসের কাপড়ে ১০টি বছর কাটিয়েছি, তার পর যদি তোমার মামীর অনুরোধের দায়ে না পড়তে হোত,—আর মাইনেটাও সেই সঙ্গে না বাড়ত তাহলে আরও কতদিন যে চাপকানটা আমায় চেপে থাকতেন তা বলতে পারিনে।"

কথাটা বলিয়া শ্যামাচরণ বাবু একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সম্প্রতি বৎসর খানেক মাত্র তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে।

মামীর নামে শরতেরও চক্ষু ছলছল্ করিয়া উঠিল। মামীর স্নেহে সে মাতার অভাব কখনো অনুভব করে নাই। তিনি তাহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে মেয়েরা অনেক সময় ঈর্ষাকাতর হইয়া মাকে অনুযোগ করিত। মা হাসিয়া বলিতেন, "তোরা আমার মেয়ে বইত নয়—ওযে আমার পুত্র সন্তান।" আসল কথা বালক পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া আপনার স্নেহে তিনি তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিতেন। তিনি যে তাহার আপনার মা নন্—মাতুলানী মাত্র, শরৎ শিশুকালে তাহা জানিতই না,—বড় হইয়া যখন জানিল, তখনও তিনি শরতের হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃরূপেই অধিষ্ঠিত রহিলেন।—

কিছুপরে শ্যামাচরণ বলিলেন—"কি এত কাপড় কিনেছিস নিয়ে আয় দেখি, কখনও ত ও রকম কাপড় পরা হয়নি,—দেখেও একবার চক্ষু সার্থক করি।—"

"না আমার কাপড়ে অত খরচ হয়নি। আপনি কাপড়ের জন্যে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার চেয়েও কম টাকাই লেগেছে।"

"তবে কিসে অত খরচ করে এলি?"

"একজন বন্ধুকে ধার দিয়েছি।"

এইবার তিনি সত্যসত্যই রাগিয়া গেলেন।

"বন্ধুকে ধার দিয়েছ! তোদের একটু ধর্ম্মজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান নেই? আজকাল-কার ছেলেরা কি এতদূর পাষণ্ড হৃদয়হীন! জানিস্ কত কষ্ট করে তোকে আমার বিলাত পাঠাতে হচ্ছে? বড় মেয়েটিকে এবার ভাল করে পূজার তত্ত্ব পর্য্যন্ত করা হোলনা। বেশ বুঝছি সেজন্যে তার কত গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। মেজ মেয়েটি আসন্নপ্রসবা,—তাকেও আনতে পারছিনে; আনলেই ত খরচ পত্র আছে। ছোটটির বিয়েটাও পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। শুধু ত তোর প্যাসেজ-মনি নয়—বিলাত যাবামাত্র ভর্ত্তির খরচ প্রভৃতি কত খরচ আছে। যতদিন তুই পাশ হয়ে ফিরে না আসবি ততদিন আমার আর মুক্তি নেই। আর তুই এর মধ্যে বন্ধুকে ধার দিয়ে নবাবি করতে গেলি!"

রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়া ভাবিলেন—"অত কথা না বলিলেই হইত।" শরৎ নতমুখে রহিল; মামা যে কতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে বিলাত পাঠাই-তেছেন ঠিক সে জ্ঞানটা এতদিন তাহার ছিলনা। আজ সহসা তাহার যেন অন্ধ নয়ন খুলিয়া গেল। কিছু পরে সে বলিল, "তবে মামা আমি বিলাত যাবনা—এই খানেই প্র্যাকটিস করি"।

"অমনি রাগ হোল! আজকালকার ছেলেদের একটা কথা বলার যো নেই; আমার বাবা রাগের সময় আমাকে কত গালিগালাজই না করতেন,—কিন্তু সেই বিষের মধ্যেও আমরা অমৃত উপলব্ধি করেছি। আমি ত কোন জন্মে দেবদেবী মানিনে, ঈশ্বর আছেন কি না আছেন তাও জানিনে, কখনো জানতে চাইওনি; কিন্তু বাবার মনে আঘাত লাগবার ভয়ে প্রতিদিনই শালগ্রাম শিলার কাছে মাথা নুইয়েছি। তুই ভাববি, এ কি চাতুরী? চাতুরী নয় এটা পিতৃভক্তি। এ সংসারে জ্ঞানবান স্রষ্টা পুরুষ কেউ আছেন কিনা জানিনে; কিন্তু আমার পিতৃদেব যে আমার স্রষ্টা পুরুষ তা

আমি জানি, তিনিই আমার মনে সাক্ষাৎ ভগবান্। সে ভক্তিটুকু আজকালকার ছেলেরা হারিয়েছে!"

"না মামা তা নয়। আজ আমি খুব ভাল করে বুঝছি আমার জন্য আপনি কত কষ্ট স্বীকার করছেন। কিন্তু তবুও ত আপনি কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত নন,—আমারও কি এ সম্বন্ধে একটা কর্ত্তব্য নেই মামা?"

"দেখ ঐ লম্বা-চওড়া কথাগুলো শুনলে আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে। ও সব বক্তৃতা রাখ্। এখনি টাকা দিচ্ছি—নিয়ে যা,—ক্যাবিন ঠিক করে আয়,—এ জাহাজে আর যাওয়া হবে না তবে পরের জাহাজে যেতে পারবি। তোর ভাল আমি যা বুঝি তাই কর্।"

"কিন্তু আমারও ত এখন বোঝবার ক্ষমতা জন্মেছে।"

শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গে এইবার সত্যই বিষের জ্বালা ধরিল। ছেলে-মেয়ের নিকট হইতে প্রতিবাদ তাঁহার অসহ্য! ইহাই তাঁহার স্বভাবের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা; ইহাতে তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তিরই একান্ত অভাব দেখেন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস গিয়াছিলেন—আর এখনকার ছেলেদের গুরু-জনের প্রতি একটা অবিসম্বাদী শ্রদ্ধাবিশ্বাসও নাই! হায় রে! ইহার পর তিনি আর আত্মসম্বরণ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না; ক্রোধ-বিকৃত স্বরে বলিলেন, —"লক্ষ্মীছাড়া, তোমার মজ্জায় দেখছি ইংরাজি স্বাধীনতা ঢুকেছে। (যেন তিনি এ দোষ হইতে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত!) তোমাকে বিলাত পাঠিয়ে সত্যই ফল নেই; আরো জানোয়ার বনে আসবে। যা ইচ্ছা তবে তাই তুমি কর।"

শরৎ ধীরে ধীরে পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। তিনি এতদূর প্রত্যাশা করেন নাই; ভাগিনেয়ের স্পর্দ্ধায় তিনি অবাক হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ সাহসে তিনি রাগ করিবেন না প্রশংসা করিবেন? কিন্তু ইহা স্থির করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চক্ষু খুলিতে হইল। একজন ভৃত্য একখানা তার-পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ সেখানা হাতে করিয়া শরৎকে বলিলেন "রসিদ লিখিয়া দাও।" টেলিগ্রাম পড়িয়াই শ্যামা-চরণ চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "রাজা বাহাদুর ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন, ডাক্তার নিয়ে আজকার গাড়ীতেই প্রসাদপুর যেতে হবে। তুই যা একজন ভাল ডাক্তার ঠিক করে আয়। আমি ততক্ষণ অন্যান্য আয়োজন করে ফেলি। আগামী ষ্টীমারে তোর যখন বিলাত যাওয়া হোলই না তখন তুইও সঙ্গে চল্। সার্জ্জারিটা ত তুই ভাল বুঝিস। তুই সঙ্গে থাকলে আমার ভাবনাটা অনেক কম হবে।"

শরৎ ইহাতে কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া ডাক্তার ঠিক করিতে গেল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মাসকাবারি

কেল্টিক রিভাইভ্যাল ও সাহিত্যের নূতন ধারা।

"স্বদেশী সাহিত্য" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বাংলা দেশে বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রের দলাদলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁরা "বাংলার প্রাণ" বলিতে বৈষ্ণবের প্রাণ বোঝেন এবং বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সুরটিকে পদাবলীর সুর মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আয়র্লণ্ডের "কেল্টিক রিভাইভ্যালের" উদ্যোগী-দিগের একটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও, আসলে মৌলিক সাদৃশ্য নাই, ইহা তিনি সুন্দররূপেই প্রতিপন্ন করেন। বাস্তবিক কেল্টিক রিভাইভ্যালের মধ্যে কেল্টিক মনের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে বিকাশিত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে অভিমুখ্য আছে, বৈমুখ্য নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের আদর্শের মধ্যেই সেই বিশ্ব-অভিমুখ্য, সেই সর্ব্বরস সর্ব্ব-প্রকরণ সর্ব্বকলারীতির সহিত আন্তর সম্বন্ধ, নিজের প্রাণ দিয়া তাদের প্রাণকে পরশ-পরশ করিবার সজীব চেষ্টা দেখিতে পাই না। স্বাদেশিক অভিমানেই তার উৎপত্তি এবং স্বাদেশিক অভিমানের মধ্যেই তার পর্য্যাপ্তি।

ইংরাজী সাহিত্যে, বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যে, যে নানা ভাবের ও নানা রসে বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং যে বৈচিত্র্য অনে সময় পরস্পর-সমঞ্জস না হইয়া অন্যো বিরুদ্ধ রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, এ একটা বড় কারণ ইংলণ্ডে বিচিত্র জাতি মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বিশেষ ভাবে কেল্টে সঙ্গে টিউটনের মিশলেই ইংরাজী সাহিত্যে ঐ দুই জাতির মানস বৈশিষ্ট্যগুলির রাসায়নি সংযোগের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তু ইংরাজ জাতির মধ্যে কেবলমাত্র টিউটন মনে বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে রূপ ধরিলে সে সাহিত্যে যে চেহারা হইত, ইংরাজী সাহিত্যে বিচিত্র-রসমণ্ডিত চেহারার সঙ্গে তার সারূপ খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত হইত, সন্দেহ নাই। ইংরাজীতে আজও যে শোনা যায় যে, আর্ট সাহিত্যের কাজ "To hold up a mirror to nature"—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিবি ধরিবার চেষ্টা মাত্র, ওটা একেবারেই স্যাক্সন মনের কথা। ইংরাজী কাব্যে ঐ বস্তুতন্ত্রতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে; ব্যক্তির হৃদয়াবেগের বা passionএর প্রদীপ্ত রাগচ্ছটা আছে; বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়-পরিহিত চৈতন্যের ঘাতপ্রতিঘাতের রম্য লীলাও আছে। বাস্তবিক সেই ঐন্দ্রিয় জীবনের গতি, বেগ, এবং চাঞ্চল্য সমস্তই ইংরাজী কাব্যে প্রস্ফূর্ত্ত, বিভাসিত। চসার হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত টিউটন মনের এই মানসমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে কেল্টিক প্রতিভার

অপূর্ব্ব কায়নিকতা, ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যানুভূতি, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতম প্রেরণাকে ধরিবার শক্তি, অনুভবের কূলপ্লাবী বন্যা, নিগূঢ় অধ্যাত্ম চেতনা—এই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ক্ষণে ক্ষণে মিশ্রিত না হইত, তবে ইংরাজী কবিতার সঙ্গে গ্রিহক বস্তুতন্ত্র লাতিন কবিতার বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। যেখানেই কেল্টিক প্রতিভার সঙ্গে টিউটন প্রতিভা আশ্চর্য্য সম্মিলনে মিলিয়া গেছে, সেখানেই ইংরাজী কাব্য অপূর্ব্ব।

তবু কেল্টিক রিভাইভ্যালের দল মনে করেন যে, সেই কেল্টিক প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ ইংরাজী কাব্যে হয় নাই। এক সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, ব্লেক্, প্রভৃতি কবিগণ ইংরাজী কাব্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় রসের সঞ্চার করেন, ভিক্টোরীয় যুগের কবিরা সেই রসটিকে তার যথার্থ ব্যাপ্তি ও বিকাশের পথে অগ্রসরমান করেন নাই। তাঁরা নব নব বিজ্ঞানের আবিষ্কারের তাড়নায় কবিতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিগম্য চিন্তাসমন্বিত ও বিশ্লেষপূর্ণ করিয়া তোলেন। কেল্টিক রিভাইভ্যাল তারই প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া আবার ঐন্দ্রিয় রূপরসগ্রাহ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অরূপ অধ্যাত্মরস-জগতের ব্যঞ্জনাকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী। সাহিত্যে ইহারা এক নূতন রস আনিয়া দিতেছে; এই নূতন রসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "মিষ্টিক"-পর্য্যায়ের কাব্যগুলির সারূপ্য আছে বলিয়াই কেল্টিক রিভাইভ্যালের দলের মধ্যে তাঁর স্তব সর্ব্বপ্রথমে বিঘোষিত হয়।

সাহিত্যে যে জিনিসটা একবার হইয়া চুকিয়াছে, যে রসের উৎস যতদূর উৎসারিত হইবার হইয়া অবশেষে নিরুদ্ধ হইয়া গেছে, তার পুনরুদ্ধার সাধন চলেনা। কেল্টিক রিভাইভ্যাল প্রাচীন কেল্টিক লোকসাহিত্য, গাথা, রূপকথা, পুরাণ প্রভৃতিকে নব বেশ-ভূষা পরাইয়া উপস্থিত করিবার চেষ্টাতেই যদি প্রধানত রত থাকিত, তবে তার সেই চেষ্টার মধ্যে জীর্ণতা অচিরাৎ দেখা না দিয়া পারিত না। কবি ইয়েট্‌স্ তাঁর প্রথম কাব্যগুলিতে সেই চেষ্টা দিয়া সুরু করেন; তাঁর Wanderings of Oisin প্রভৃতি তার সাক্ষী। কিন্তু ক্রমেই যতই তিনি গভীরতর রহস্য-লোকের সূক্ষ্মতম আভাস ও অভি-ব্যঞ্জনাকে কাব্যে রূপ দিয়া সাকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁর রচনায় কেল্টিক পুরাণ তার নির্ম্মোক ছাড়িয়া অত্যন্ত নূতন, অত্যন্ত আধুনিক হইয়া দেখা দিতে লাগিল। পুরাণটা তখন একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া দাঁড়াইল—কবির Soul-vision বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট অন্তর্হিতপ্রায় করিয়া আপনার প্রকাশে আপনি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তার সাক্ষী ইয়েট্‌সের শ্রেষ্ঠ কাব্য-The Shadowy Waters। আবার কবি সিঞ্জ, বেন্‌জন্‌সন্‌কে আদর্শ করিয়া আইরিশ লৌকিক কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র নাট্য রচিলেন। সে সব নাটক আবার অতিমাত্রায় টিউটন বা অ-কেল্টিক। কবি এ,ই, সেই বাহ্য খোলস-টুকুও পরিত্যাগ করিয়া আপন অধ্যাত্ম অনুভূতিকে একেবারে স্বোদ্ভাবিত প্রকরণ ও রীতিতে প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং এই কেল্টিক কবিদের সঙ্গে আর বৈষ্ণব

পদাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায় তাহাতো আমি দেখিতে পাই না।

ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনার উপলক্ষে অনেকে বলেন—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষও লিখিতেছেন—যে, ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে কোন ক্রমপারম্পর্য্য নাই, তাহা খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাবলীলাকে দ্যোতমান করিয়াছে। গ্রীক সাহিত্য, এমন কি ফরাসী সাহিত্যেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেমন একটা অখণ্ড ভাব-সুসঙ্গতি ও রীতি-সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজী সাহিত্যে তাহা নাই। এই cultural tradition না গড়িলে, ভিন্ন ভিন্ন বড় বড় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধ ভাব ও প্রকাশ-লীলায় জাতীয় মনের মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটার একটা অখণ্ড সংস্কার দাঁড়াইয়া যায় না। কথাটা একদিক্ হইতে যেমন ঠিক, অন্যদিক্ হইতে তেমনি ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। 'ট্রাডিশন' বা আবহমান রীতিধারা, যেমন বিচিত্র রস ও রসপ্রকাশের মধ্যে একটা সিমেণ্টের কাজ করিয়া সবটাকে আঁট করিয়া বাঁধিয়া রাখে, তেম্‌নি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি দিতেও বাধা দেয়। ইংরাজী সাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তি যতটা পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, অন্য কোন সাহিত্যেই বোধ হয় তাহা করা যায় না, একথাও অরবিন্দবাবু তাঁর আলোচনায় মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন। আমি মনে করি যে, সাহিত্যকে এবং সাহিত্য-সমালোচনাকেও এই 'ট্রাডিশন' নামক গণ্ডী হইতে মধ্যে মধ্যে মুক্তি না দিলে, সাহিত্য নব নব ধারাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। কেননা, ট্রাডিশনের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা মিথ্যা যাহা আবর্জ্জনা। ইংরাজী সাহিত্যও স্বাদেশিক অভিমানবশতঃ তার আপাত ট্রাডিশনরাহিত্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক স্মৃতি-ভাণ্ডারে সেই রকমের বিস্তর মিথ্যা ও আবর্জ্জনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে ইংরাজের যথেষ্ট মোহান্ধ সংস্কার আছে—শেক্‌স্‌পীয়রের বস্তুতান্ত্রিক প্রভাবে সে এমনি আচ্ছন্ন, যে সেই প্রভাবকে বাদ্ দিলে কবির দিব্য-বিভূতি-সমষ্টি শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে যে কতটুকু পাওয়া যায়, অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের স্পন্দন-লেখা পাঠকের মনে যে কতটুকু অনুরণন জাগায়, তার খোঁজ লইতে তার সাহস হয় না। এক একটা সময় আসে—মানুষের জীবনেও বটে, জাতীয় জীবনেও বটে—যখন এই সমস্ত চিরপূজিত পুত্তলিকা-গুলিকে জাতীয় স্মৃতিমন্দির হইতে টানিয়া ফেলিয়া নব আদর্শ, নব চেতনা, নব প্রাণকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হয়। কেল্‌টিক রিভাইভ্যাল যে পরিমাণে সেই কাজ করিতেছে, সেই পরিমাণেই ইংরাজী সাহিত্যের জীর্ণতার মধ্যে তাহা নব আশা ও নব প্রাণের সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের দেশেও সেই কাজেরই অপেক্ষা আছে। অথচ দেশের স্রোতের বিরুদ্ধে একলা দাঁড়াইয়া সে কাজ সম্পন্ন করা অতীব কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই ত তার এত মূল্য। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক অথচ ফরাসী-সাহিত্যের কঠিনতম বিচারক ও সকল ট্রাডিশন-বিপ্লবকারী রোমা রোলাঁর (Romain Roland) একটি

উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি শেষ করিতে চাই। উক্তিটি চমৎকার :—

"Every race, every art has its hypocrisy. The world is fed with a little truth and many lies. The human mind is feeble, pure truth agrees with it but ill: its religion, its morality, its states, its poets, its artists must all be presented to it swathed in lies. These lies are adapted to the mind of each race : they vary from one to the other : it is they that make it so difficult for nations to understand each other, and so easy for them to despise each other. Truth is the same for all of us : but every nation has its own lie which it calls its idealism : every creature therein breathes it from birth to death : it has become a condition of life : there are only a few men of genius who can break from it though heroic moments of crisis, when they are alone in the free world of their thoughts."

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আর্টের মধ্যেই কাপট্য আছে। এ জগৎ সামান্য একটু-খানি সত্য এবং অনেক খানি মিথ্যার দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মানুষের মন দুর্ব্বল; বিশুদ্ধ সত্য তার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না; সেই জন্য তার ধর্ম্ম, তার নীতি, তার রাষ্ট্র, তার কবি, তার শিল্পী সকলকেই মিথ্যার বাঁধনে আচ্ছাদিত করিয়া তার সাম্‌নে উপস্থাপিত করিতে হয়। এই মিথ্যাগুলি প্রতি জাতির মনের অনুরূপ করিয়া লওয়া হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনের কাছে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত; ইহারাই ত জাতিতে জাতিতে বোঝাপড়ার পথে অন্তরায় এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর ঘৃণা করার পথে সহায়। সত্য আমাদের সকলের পক্ষেই সমান—কিন্তু প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কতকগুলি মিথ্যা আছে। সেই মিথ্যাকেই সে তার ভাবাত্মক তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মনুষ্য সেই মিথ্যাকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাহা জীবনের অবস্থাবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল দুই একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাঁদের চিন্তার মুক্তলোকে একাকী বিহার করিতে করিতে কোন দুঃসাহসিক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সেই মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারেন।

স্বাদেশিক অভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে, উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের গভীর সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কারো পক্ষেই সম্ভাবনীয় নয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে বাংলা দেশে যে সকল প্রতিভাবান পুরুষ বাংলা-দেশের চিরসঞ্চিত মিথ্যার জালকে বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বসত্যের উদার মুক্তির মধ্যে বিচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁরাই বাংলার সবচেয়ে বড় মিত্র—যদিচ আজ দেশ তাঁদের প্রতি বিমুখ হইতেও পারে। জীবনে সব-চেয়ে বড় প্রয়োজন যেমন সত্যের প্রয়োজন, জীবনের প্রতিচ্ছবি-সাহিত্যেও সত্যকেই সবচেয়ে বেশি করিয়া পাওয়া চাই এবং দেওয়া চাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

রাজকন্যা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, ১ সানিপার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বঙ্গদেশে এমন কোন পাঠক নাই, যিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা পাঠ করেন নাই। বঙ্গবিদুষীগণের তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তিনী, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বহু গ্রন্থ বহু রচনা বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া জগৎ-সভায় প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বিদুষী বঙ্গমহিলা বাঙালীর গৌরব। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রতিভাশালিনী লেখিকার কথায় "নাট্যোপন্যাস"। আখ্যানটি ছোট এবং অল্প পরিসরে লেখিকা এমন বিপুল নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হয়। রাজকন্যার চরিত্রটি কোমলে কঠোরে অপূর্ব্ব হইয়াছে। শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রসন্নচিত্তে আপনাকে বলি দিয়াছেন। গ্রন্থখানি আরম্ভ হইয়াছে হাসি-গান ও উৎসবের আনন্দ-কৌতুকে এবং ইহার সমাপ্তি অশ্রুতে। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু লেখিকার কল্পিত সন্ন্যাসিনী বালিকাগণের গানে—"দুঃখে করিনা ভয়, মৃত্যু অমৃতময়, সত্য ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে মিথ্যা হউক ক্ষয়—পাপ হউক লয়!" বেশ ফুটিয়াছে। কাব্যে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, নাটকীয় ঘটনা-সন্নিবেশে লেখিকার প্রতিভা অসাধারণ, সে কথা নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, এ গ্রন্থে প্রতিভার সে লীলা আমরা দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। হাসি ও দীর্ঘশ্বাস পাশাপাশি আলো-ছায়ার মত অপূর্ব্ব শ্রীতে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানগুলি কবিত্বে উজ্জ্বল, সুরে সুমধুর। বইখানির ছাপা-কাগজও ভাল।

নিবেদিতা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩ সানিপার্ক, বালিগঞ্জ কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা; মহিলা-সমাজে অভিনয়ের জন্য এই নাটিকাখানি রচিত। নাটিকাখানিতে ঘটনার আড়ম্বর নাই। সুমঙ্গলা ধনীর কন্যা, বাল-বিধবা, পরের দুঃখ ঘুচাইতে সদা সে অগ্রসর, পরের উপকারই তাহার জীবনের ব্রত। হেমাঙ্গিনীর পিতা স্ত্রী ও কন্যা তাহার সম্পর্কিত তাহার পিতার আশ্রয়েই বাস করে। সুমঙ্গলার পিতা নিজের টাকা জমা দিয়া হেমাঙ্গিনীর পিতাকে চাকরি করিয়া দেন, হেমাঙ্গিনীর পিতার ঋণ শোধ করিতে গিয়া নিজের সম্পত্তি নষ্ট করেন। তথাপি সুমঙ্গলার পিতা বা মাতা তাহাদের উপর একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। হেমাঙ্গিনীর মাতা অত্যন্ত স্বার্থপর কুটিল-চিত্তা নারী—মেয়ের বিবাহে বৈবাহিকের জিদ মিটাইবার সাধ্য ছিল না—বৈবাহিক অনেক গহনা চায়—কথাটা কাণে যাইবামাত্র সুমঙ্গলা আপনার যথাসর্ব্বস্ব হাসিমুখে দান করিল। পরে তাহার পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরই হেমাঙ্গিনীর মাতা মিথ্যা অছিলায় তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিল। সুমঙ্গলা যখন এমনই বিপদে দিশাহারা, তখন দৈববাণী হইল, "বিশ্বপতি তোমার পতি। * * তোমার মন্ত্রে, তোমার তন্ত্রে বঙ্গের নির্জ্জীব রমণী-জীবনে তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর, তোমার শিক্ষায় তোমার দীক্ষায় তাহারা মহিমাময়ী নারী হইয়া উঠুক। * * * আত্মোৎসর্গ-সাধনায় বিশ্বের নর-নারীকে সন্তানরূপে লাভ কর।" এত বড় প্লট হয়-সাতটি দৃশ্যে বেশ ফুটিয়াছে। নাটিকাখানির বিশেষত্ব, ইহাতে পুরুষ চরিত্র আদৌ নাই—অথচ বাহির-মহলের নানা দ্বন্দ-কোলাহল এই মহিলা-দরবারের বাহিরে সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট শুনা গিয়াছে,—লেখিকার পক্ষে ইহা বড় অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। এই নাটিকাখানিতে হাস্য ও করুণ রসের মিলনটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। বৈষ্ণবী দিদির কথকতার অবতারণাটি অভিনব, কৌতুকপ্রদ। নাটিকাটিতে প্রাণ আছে, অল্প কথাবার্ত্তায় সামান্য ইঙ্গিতে বিবিধ নারী-চরিত্রগুলি বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে সুন্দর ফুটিয়াছে। হাসির গান, ভাবের গান নাটিকাখানিতে প্রচুর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যুগান্ত কাব্য নাট্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালিগঞ্জ। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। খানি রূপক নাট্যলীলা—দেবদেবীই এ নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রী। বিশ্বে বিষম বিশৃঙ্খলা, অন্যায়ের অত্যাচারে ভূমি জর্জ্জরিতা, করুণা নয়ন-হীনা, লক্ষ্মী ও বাণী বর্জ্জিতা, তখন শিব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্যায় বিনাশ করিয়া নবযুগ আনয়ন করিলেন—কিরূপে, তাহারই আভাষ রূপকের ছলে এই নাট্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্ররস প্রধান হইলেও ইহাতে করুণ ও হাস্যরসের অভাব নাই। নন্দী-ভৃঙ্গীর চরিত্র দুইটি বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস-সি প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতির সমস্যাগুলি যে কি, এই বইখানিতে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। * * ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ, অতএব এখানকার প্রধান সমস্যা হইতেছে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধান করা।" কোন্ পথে কৃষিতত্ত্বের গবেষণা হওয়া উচিত, কি করিলে সরকারী কৃষি বিভাগের কথা মূর্খ ও দরিদ্র কৃষকগণের নিকট পৌঁছিবে, কি উপায়ে ঋণজালে জড়িত কৃষকগণকে সে জাল হইতে মুক্ত করা যাইবে, কিরূপে দেশে কৃষিশিক্ষার বিস্তার হইবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন—এই সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য—এই সুবৃহৎ গ্রন্থে লেখক প্রচুর অধ্যবসায়ে অসাধারণ দক্ষতার সহিত সরকারী কৃষি বিভাগের জন্ম-বৃত্তান্তের ইতিহাস বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগের কার্য্যপ্রণালী, শস্যের উন্নতি, কৃষি উন্নতি-বিষয়ক প্রণালী-সমূহ, গো-পালন, গোষ্ঠ-সমস্যা, কৃষিশিক্ষার আয়োজন ও প্রয়োজন প্রভৃতির সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গ্রন্থকারের শক্তি, উদ্যম ও স্বদেশপ্রীতি অপরিসীম, তাই এত মাথা ঘামাইয়া, এত পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, এত অনুশীলন করিয়া তিনি এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, এই মহাসমরের পর বিশ্বজগৎ কৃষির উন্নতির দিকে অত্যন্ত ঝোঁক দিবে—তাই তিনিও তাঁহার দেশবাসীকে পূর্ব্বাহ্নেই সচেতন করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ, ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকার কৃষি-সমিতির সভ্য! বাঙলার নানা পল্লীতে ঘুরিয়া তথ্য-সংগ্রহ এবং জ্ঞানসঞ্চয়ও করিয়াছেন বিস্তর। তাই তাঁহার মত বিশেষজ্ঞের যুক্তি ও মতের মূল্য যে যথেষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভদ্র সন্তানের কৃষিশিক্ষার কতখানি প্রয়োজন, তাহা তিনি সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্য দেশের কৃষি-সমস্যায় প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি, লেখক তাহাও চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়াছেন। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এ গ্রন্থ বিরাজ করুক্—বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করুন, আবার বাঙলার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিবে।

নৃপেন্দ্র-স্মৃতি। স্বর্গীয় দীনদয়াল চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুর্গাদয়াল চৌধুরী, বেঙ্গল-বুক-ক্লাব, ১৪নং রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর। মূল্য বারো আনা। স্বর্গীয় কুচবিহারাধিপতি মহারাজা কর্ণেল স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ জি, সি, আই, ই; সি, বি বাহাদুরের জীবনের অনেকগুলি ঘটনার কথা এই বইখানিতে আছে। স্বর্গীয় লেখক স্বর্গীয় মহারাজের বাল্য-সহচর ও বন্ধু ছিলেন এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুর মতই প্রাণের সমস্ত স্নেহ-প্রেম ঢালিয়া তিনি নৃপেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রের নানা দিক নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে।

আলেয়ার আলো। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা ছয় আনা। এখানি উপন্যাস; গতবৎসর 'ভারতী'তে ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। এ গ্রন্থ

সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে গেলে আত্মপ্রশংসাই করিতে হয় এবং সেটুকু মোটেই সঙ্গত বা শোভন নয়। তবে সত্যের খাতিরে যেটুকু বলা উচিত, সেটুকু বলিতেই হইবে। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। মনস্তত্ত্বের আলোচনায় লেখক সফলকাম হইয়াছেন—তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রথম ভাগের গোপালের ছাঁচে ঢালা 'আদর্শ' নয়; তাহারা রক্ত-মাংসের জীব; সুখে-দুঃখে তাহারা টলে; বিবেক তাহাদের প্রাণে যে বাণী জাগাইয়া দেয়, জগতের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে তাহারা তাহা ঘোষণা করিয়া থাকে; সমাজ-গঞ্জনা বা লোক-লজ্জার ভয়ে তাহারা কর্ত্তব্য-পথ হইতে টলিতে চাহে না। মোহন ও হরেন দুইটিই বেশ সরল, সুদৃঢ় চরিত্র এবং ফুটিয়াছেও ভালো; নেকামি, ভাঁড়ামি বা গোঁড়ামির সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, আধুনিক বাঙালীর সুযোগ্য 'হীরো'। সরমা,—বেশ নরম, শান্ত স্বভাবের বাঙালীর মেয়ে—কিন্তু তাহার তেজ আছে, প্রাণ আছে; সে যে মানুষ, সে কথা সে কখনো ভুলিতে পারে না এবং এই জন্যই সরমাকে আমাদের এতখানি ভাল লাগিয়াছে। মুরারিবাবু স্নেহ-বৎসল পিতা, তবে একটু ভীরু প্রকৃতির—বাঙলা দেশের পিতার ছবিটি হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়া মুরারি-চরিত্রে বেশ ফুটিয়াছে। প্লটটিও মোটেই জড়ানো বা ঘোরালো নয়—ঘটনা সমান্য—এবং নাতিবিস্তৃত পরিসরে সে প্লটটুকু আপনাকে বেশ বিছাইয়া ধরিয়াছে। তবে গ্রন্থে দোষও আছে,—স্থানে স্থানে সমাজ-সংস্কারের ধুয়া মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে—এবং পাত্র-পাত্রীর টিপ্পনীও মাঝে মাঝে অনাবশ্যক রূঢ় হইয়াছে; সেকালের গোঁড়া কনসার্বেটিভ দলের সহিত মোহন ও হরেনের তর্ক মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি-ধরণের; কতকটা চোখরাঙানি ও গা-জুরি-ভাবের হইয়াছে। ইহাতে রসভঙ্গও যে না হইয়াছে, এমন নয়। যমুনা-চরিত্র বিশেষত্বহীন এবং তাহার স্থিতি বা গতির সার্থকতাও বড় একটা নাই। যাহা হউক উপন্যাসে লেখকের এই প্রথম উদ্যম,—সে হিসাবে রচনা খুবই আশাপ্রদ, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই চমৎকার।

গাজী। মৌলভী শেখ আব্দুল জব্বার প্রণীত। প্রকাশক মখদুমি লাইব্রেরী, কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা। বাসন্তী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা; বাঁধাই এক টাকা। গাজী—বাঙলার নবাব সেকন্দর শাহার পুত্র—'গাজী' তাঁহার উপাধি। তিনি 'একাধারে কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর'; রাজপুত্র হইয়াও মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই জীবন-কথা লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষা শুদ্ধ—সংস্কৃতানুসারী, রচনা প্রাঞ্জল; তবে স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিছু বেশী। লেখক বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের কাহিনী রচনা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-সাধনে যেমন সহায়তা করিতেছেন, তেমনি সাহিত্যের একটা দিকও বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট করিতেছেন। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

সতুর মা। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি গল্পের বই, আটটি গল্প ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্ট তেমন না থাকিলেও গল্পগুলি সুলিখিত; আখ্যান-ভাগ ভালো এবং রচনাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের ভারে পীড়িত নয়। তবে কয়েক স্থলে আদর্শ আঁকিতে গিয়া রঙের পোঁছ বেশী ঘন হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে আদর্শ হয়ত নীতিগ্রন্থের মাপকাঠি দিয়া দেখিলে খুলিয়াছে, তবে মানুষের দিক দিয়া স্বভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে, জ্যাবড়া হইয়াছে। গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ রসের এবং লেখিকা প্লটগুলিতে শেষ রক্ষাও করিতে পারিয়াছেন। গল্পের উপসংহার কোথাও ভারী বা এলোমেলো গোছের হয় নাই। মোটের উপর গল্পগুলি সুখপাঠ্য। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাইও ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ঘরের বাইরে
শ্রীযুক্ত সিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঘেন্না

গান্ধারীর যখন ছয় মেয়ের পরও আবার মেয়েই হইল তখন বিধাতা হইতে ধাত্রী পর্য্যন্ত সকলকে গালি দিয়া হরকুমার সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহিণীকে উপদেশ দিল—মেয়েটাকে নুন খাইয়ে দিয়ে তুমিও একটু বিষ খাও!

কলিযুগের প্রারম্ভে মহাভারতের গান্ধারী ছিলেন শত পুত্রের জননী। সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিবে আশা করিয়া যার বাপ-মা নাম রাখিয়াছিল গান্ধারী, সে এই ঘোর কলিতে বাংলা দেশের আবহাওয়ায় নাম-মাহাত্ম্যকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া হইল কি না সাত মেয়ের মা! তিনটি মেয়ে হইতেই গান্ধারী আপনার গর্ভের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া শেষ মেয়ের নাম রাখিয়াছিল বেণী। বেণীকেও উপ্‌চাইয়া আবার যখন মেয়ে হইল তখন সে কালীর কাছে অব্যাহতি চাহিয়া মেয়ের নাম রাখিল ক্ষান্তকালী। মা-কালী সেখানেও কন্যা দানে ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া কাতর হইয়া পরের মেয়ের নামে প্রার্থনা জানাইল আর-না-কালী। অত নিষেধ সত্ত্বেও ষষ্ঠ বারেও কালী যখন কন্যাই দিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা কুটিয়া মেয়ের নাম রাখিল রক্ষাকালী। কালী তাহাতেও রক্ষা করিলেন না, আবার মেয়েই হইল।

এই অশুভ উৎপাতে বাড়ীময় একটা এমন শোকের ছায়া পড়িল যে দাই তার পাওনা চাহিতেও সাহস করিল না, সে-ই যেন কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছে এমনি ভয়ে-ভয়ে সে পালাইয়া বাঁচিল।

মেয়ে হইয়াছে শুনিয়াই গান্ধারী সেই যে পাশ ফিরিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়াছিল, মেয়েটা ককাইয়া দম বন্ধ হইয়া মরিবার

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

মতন হইলেও একবার ফিরিয়া তাকে দেখিত না। একজন দাসী মোক্ষদা মাঝে মাঝে দয়া করিয়া মেয়েটাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া রাখিয়া যাইত। ক্ষুধা পাইলে বা ভিজা বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া মেয়ে কাঁদিয়া উঠিলে গান্ধারী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিত—ওরে তোরা কেউ ওর টুঁটিটা টিপে ওর কান্নাটা জন্মের মতন থামিয়ে দে রে!

বুড়ী মোক্ষদা তাড়াতাড়ি আসিয়া খুকীকে তুলিয়া লইয়া বলিত—আহা মা, কেষ্টর জীব!

গান্ধারী উগ্র স্বরে বলিয়া উঠিত—কেষ্টর জীব, কেষ্ট পেলেই ত হয়! আবাগী আমাদের জ্বালায় কেন?

এম্‌নি অনাদর উপেক্ষায় যার জন্ম, তার মা তার নাম রাখিল ঘেন্না।

ঘেন্নার উপর তার বাপ-মার ঘৃণার অবধি ছিল না বলিয়াই বাড়ীর আর-কেহই তাকে দেখিতে পারিত না। ঘেন্নার দিদিরা এই ঘেন্নার আগমনে বাপ-মায়ের কাছে বেশী অপরাধী হইয়া কুণ্ঠিত ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল; যে প্রথম মেয়ে, সে পথ দেখাইয়াছে বলিয়া অপরাধী; তার পর যে যেমন হইয়াছে তার অপরাধ তত উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে ও আগে যাদের জন্ম তাদেরও অপরাধ ক্রমশঃ গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। ঘেন্না সপ্তম মেয়ে; সুতরাং বাপমায়ের মেজাজ ও তাদের সব কয়টি বোনের অপরাধ তা হইতেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য ঘেন্নার উপর ঘেন্নার দিদিদেরও, মমতা দূরে থাক, একটা বিষম ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল।

ঘেন্না একদিনও মার কোল বা মার দুধ পাইল না; মোক্ষদার বহু কাজের মধ্যে স্বল্প অবকাশে তার কোল যতটুকু ঘেন্না পাইত আর গাইএর দুধ মোক্ষদা যতটুকু চুরি করিয়া বা জোর করিয়া আনিয়া তাকে খাওয়াইত তাতেই ঘেন্নার ঘৃণিত জীবন টিকিয়া রহিল। মোক্ষদা সমর্থ বয়সেই স্বামীপুত্র হারাইয়া এই বাড়ীতে দাসীপনা করিতে ঢুকিয়াছিল, এখন সে বুড়া হইয়া আসিয়াছে। এতগুলি মেয়ে হওয়াতে তার মুনিবদের যে বিপদ আর সেইজন্য তাদের প্রতি যে বিরাগ তাহা ন্যায্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও সে মেয়েগুলিকে অবহেলা করিতে পারিত না, কারণ সন্তান যে কি বস্তু তা যে সে হারাইয়া হাড়ে হাড়ে জানিয়াছে। তাই সে মুনিবদের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও লুকাইয়া চুরাইয়া এবং সময়ে সময়ে জোর করিয়াই মেয়েদের যত্ন আত্তি করিত। তাহা দেখিয়া যখন গান্ধারী চীৎকার করিয়া উঠিত—"তোর জন্যেই মোক্ষদা ঐ আপদটা আমাদের বাড়ী আজাড় করে সরছে না! তুই আমাদের বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা, নইলে বাবুকে দিয়ে জুতো খাইয়ে বের কর্‌ব।" তখন মোক্ষদা নিজের অপমান ভুলিয়া খুকীকে বুকে চাপিয়া বলিয়া উঠে—ষাট ষাট!

এই বাড়ীতে মেয়েদের প্রতি এই বিষম অবহেলা আর-একজনের বুকে বাজিত,—সে এই বাড়ীর বাজার-সরকার লালমোহন।

লালমোহনের বয়স বেশী নয়—বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। কিন্তু সে এই বয়সেই দুঃখের আঘাত ঢের সহিয়াছে। তাই সে পরের দুঃখ অতি সহজেই অনুভব করিয়া কাতর হইয়া উঠে। তার স্ত্রী একটি কন্যাকে জন্ম দিয়া নিজে যখন মারা গেল, তখন লালমোহন সেই কচি প্রাণটির মায়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু আনাড়ি অক্ষম পুরুষের সকল চেষ্টাকে ফাঁকি দিয়া মেয়েটির এতটুকু প্রাণ তার মায়েরই সন্ধানে যাত্রা করিল। সেই যে নিজের-হাতে-পালন করা মেয়ের মরণ লালমোহনের বুকে শোকের ছাপ মারিয়া দিয়া গেল, তা আর লালমোহন মুছিতে পারিল না; তার মর্ম্মস্থানটি সেই আঘাতে জর্জ্জর হইয়াই রহিল, একটু আঘাত সেখানে বড় বিষম হইয়াই বাজিত। যখন সে দেখিত যে মুনিবদের কঠোরতার ছোঁয়াচ লাগিয়া চাকর-দাসীদের মন পর্য্যন্ত মেয়েগুলির প্রতি মমতাহীন ও শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন লালমোহন মনে মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিত। সে যখন এ বাড়ীতে চাকরী করিতে আসে তখন বড় দুটি মেয়ের বিয়ে হইয়া গেছে, তারা শ্বশুরবাড়ীতে; পরের দুটির বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তারা আর সদরে বাহির হয় না; তার পরেরটি ম্যালেরিয়ার আর অযত্নের অত্যাচারে শয্যাগত মরমর; সুতরাং লালমোহন প্রভুর একটি মেয়েকেও চক্ষে না দেখিয়া সকল কটিকেই ভালো বাসিয়াছিল; তাদের জন্য তার ব্যথিত বক্ষে ক্ষুধিত স্নেহ থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিত। সবার শেষে আসিল মুনিবদের ফাল্‌তোর উপরেও ফাউ মেয়ে তাঁদের ঘেন্না! এই ঘেন্নার কচি জীবনের উপর দিয়া যে কি অযত্নের ঝড়ঝাপ্‌টা বহিয়া যাইতেছে তা সে বাহিরে রোকড়ের খাতা লিখিতে লিখিতে মুনিব ও চাকর-দাসীদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা হইতেই বুঝিতে পারিত। ঘেন্নার কান্না দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইলে হরকুমার যখন খড়মের খটাস খটাস শব্দে বাড়ী কাঁপাইয়া ঘেন্নার কণ্ঠ-রোধ করিতে ছুটিত, অথবা মায়ের মনে মমতার বদলে রোষ প্রচণ্ড হইয়া ওঠাতে যখন সে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিত, আর মোক্ষদা হয়ত পাতের ভাত ফেলিয়া এঁটো হাতেই কচি মেয়েটার শুক্‌নো মুখে শুক্‌নো মাই গুঁজিয়া দিয়া তাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বাহির-বাড়ীতে পালাইত, তখন লালমোহনের হিসাবে বড় ভুল ঘটিত আর তার জন্য সে মুনিবের কাছে যা-ইচ্ছা-তাই বকুনি খাইয়া মরিত।

একদিন লালমোহন মোক্ষদাকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিল—তুমি যখন নাইতে খেতে যাবে তখন ঘেন্নাকে না হয় আমার কাছে রেখে যেয়ো।

ঘেন্নাকে যত্ন করিবার এখন দু-দুজন লোক!

লালমোহন নিজের পয়সা দিয়া একটা দুধ খাওয়াইবার শিশি কিনিয়া আনিল। অভাগিনী ঘেন্না মার মাই কেমন জানিত না, মাঝে মাঝে মোক্ষদার শুক্‌নো মাই

টানিয়াই তার অভিজ্ঞতা; এখন সে এই কৃত্রিম মাইএর স্নেহধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল, বেচারী বর্ত্তিয়া গেল। ঘেন্না যখন পরম আগ্রহে তার কচি কচি হাত দুখানি দিয়া রবারের নলটাকে মুঠি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চপর চপর করিয়া দুধ টানিত, তখন লালমোহনের মধ্যেকার শোকার্ত্ত পিতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিত, সে অশ্রুজালের মধ্য দিয়া পরম স্নেহে সেই শিশুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। ঘেন্নাকে এই যে যত্ন, তা করিতে হইত সকলকে লুকাইয়া। মোক্ষদা যত্ন করিতে গিয়া মুনিবদের কাছে নিত্য শতেকবার কত যে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত তা ত লালমোহন বাহিরে থাকিয়াও বেশ টের পায়; আর মোক্ষদার অপমানে অপর চাকর-দাসীদের নিষ্ঠুরতার আনন্দও ত সে দেখে। এই যত্ন চুরি করিয়া করিতে হয় বলিয়া লালমোহনের আগ্রহ আনন্দ ও তৃপ্তি আরো বেশী হইয়া উঠিতেছিল দিনকার দিন।

একদিন লালমোহন বসিয়া খাতা লিখিতেছে, আর তার পাশে ছোট্ট একটি বিছানায় পাখীর ছানার মতন কৃশ শীর্ণ ঘেন্না হাতপা নাড়িয়া খেলা করিতে করিতে শিশি চুষিয়া দুধ খাইতেছে। গুপ্তচরের মুখে খবর পাইয়া হরকুমার নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল —ওটাকে এখানে কে আন্‌লে?

লালমোহনের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। লালমোহনের মুখে কথা ফুটিবার আগেই হরকুমারের নজর পড়িল ঘেন্নার মুখে দুধের শিশির উপর। হরকুমার লালমোহনের দিকে তাকাইয়া চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল—এসব কার হুকুমে তুমি কিনে আন্‌লে? আমার পয়সা ত আর খোলামকুচি নয় যে এম্‌নি করে ছিনিমিনি খেল্‌বে? এর দাম আমি তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব।

লালমোহন আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সে বলিতে পারিল না যে ওসব সরকারী পয়সায় কেনা নয়, ওগুলি তারই উপার্জ্জনের কিঞ্চিৎ সদ্‌ব্যয়।

লালমোহনকে অপরাধীর মতন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাকে দণ্ড দিবার ইচ্ছা হরকুমারের এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সে "এই দুধ খাওয়াচ্ছি! এই সোহাগ বার কর্‌ছি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া কচি মেয়ের মুখ হইতে দুধের শিশিটা হেঁচ্‌কা টান দিয়া কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিল।

আহারে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া ঘেন্না কাঁদিয়া উঠিতেই গান্ধারী ব্যস্ত হইয়া মোক্ষদাকে বলিল—ও মোক্ষদা, ছুটে যা যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, বাবু আবার রাগের মাথায় ওকে তুলেই আছাড় দেবে!

ঘেন্নার কান্নায় বিরক্ত হইয়া হরকুমার বলিয়া উঠিল—রোস্, তোরও কান্না আজ জন্মের মতন বন্ধ করে দিচ্ছি।

এমন সময় মোক্ষদা পাশ দুয়ার দিয়া আসিয়া চিলের মতন ছোঁ মারিয়া ঘেন্নাকে লইয়া পলায়ন করিল।

হরকুমার অপ্রতিভ হইয়া কচি শিশুর উপর ক্রোধের লজ্জা ভৎর্সনায় ঢাকিয়া লালমোহনকে বলিল—এই সবের জন্যেই আজকাল তোমার কাজের অমন ছিরি

হচ্ছে! ফের যদি এ রকম কর ত ভালো হবে না বলে রাখ্‌ছি।

ভালো যে হইবে না তা না বলিলেও চলিত, দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। লালমোহনের চোখ ফাটিয়া জল বাহির্ হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু পাছে ঘেন্নার বাপের সাম্‌নে একজন পরের চোখের জল ঘেন্নার অধিকতর দুঃখের কারণ হয় এই ভয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্গত অশ্রু অন্তরেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

বাবু হিসাব করিয়া সরকারের মাহিনা হইতে দুধের শিশির দাম কাটিয়া লইল, খাতায় ঐ জিনিসটির খরচ লেখা হইয়াছে কি না সেটুকু দেখাও সে আবশ্যক বোধ করিল না। হরকুমার নিজের মেয়ের প্রতি মমতা হইতেই সন্দেহও করিতে পারে নাই যে পরের মেয়ের জন্য পরে আবার খরচ করিবে। লালমোহন নীরবে দণ্ড সহ্য করিল। আবার সেইদিনই দুধের শিশি কিনিয়া আনিয়া এক জিনিসের জন্য তেকর খরচ সে আনন্দেই বহন করিল।

এখন হইতে সে ঘরের দরজায় খিল না দিয়া ঘেন্নাকে খাইতে শুয়ায় না। ঘেন্নার জন্য সে যত দুঃখ সহিতেছিল ততই ঘেন্না তার আপনার হইয়া উঠিতেছিল; ঘেন্নার বাপ-মা তাকে যে-পরিমাণে ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিত, লালমোহন সেই পরিমাণে অনুভব করিত সে ঘেন্নার কতখানি আপনার।

কিন্তু জন্মই যার অবাঞ্ছিত, জন্মক্ষণ হইতেই যার বাপ-মায়ের কামনা ও চেষ্টা হইয়াছিল তার মরণ, জীবন যার সুদুঃসহ, তার জন্য বিধাতার ভাণ্ডারে দুঃখের অনটন হয় না। ঘেন্নার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন মোক্ষদাকে যমরাজার দরকার হইল। মোক্ষদা যাইবার সময় মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন ম্লান দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া লালমোহনকে তার ইহজীবনের শেষ বাক্য বলিয়া গেল —সরকার মশায়, ঘেন্নাকে তুমি দেখো।

লালমোহনকে মোক্ষদার এই অনুরোধ করার কোনো দরকার ছিল না। তবু মোক্ষদার মৃত্যুকালের এই অনুরোধ লালমোহনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহকে অনেকখানি বেগ দিয়া গেল।

মোক্ষদা থাকিতে সে-ই ঘেন্নাকে আনিয়া লালমোহনের কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু এখন ঘেন্নাকে কেমন করিয়া অন্দর হইতে সদরে আনাইবে লালমোহনের এই হইল ভাবনা। লালমোহনের গোপন স্নেহ স্নেহ-পাত্রীর নাগাল পাইবার পথে যতই বাধা পাইতেছিল, ততই তা ব্যাকুল ও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ঘেন্নার কান্না কানে গেলেই লালমোহন ব্যস্ত হইয়া উঠে; অথচ কোনো লোককে বিশ্বাস করিয়া সে আপনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারে না। ভোরের গোলাপী আভা ফুটিতে না ফুটিতে লালমোহন শয্যা ছাড়িয়া কতরকমের ফুল তুলিয়া আনিয়া ঘরে লুকাইয়া রাখে, আর সমস্তদিন প্রতীক্ষা করিয়া মনটিকে অন্দরের পথেই ফেলিয়া রাখে কখন তার ঘেন্না-দিদি আসিয়া তার এই স্নেহের গোপন দান আনন্দে সার্থক করিবে।

ঘেন্না সকল উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর টিকিয়া যাওয়াতে তাকে সহ্য করা তার বাপ-মায়ের কতকটা অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু তাদের

একটি ছেলে হওয়াতে হরকুমার আর গান্ধারী তাকে লইয়াই এখন এমন ব্যস্ত আর আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল যে আর কোনো দিকে নজর দিবার বা অপর কাহাকেও অনাদর করিবার মতন অবসর তাদের বেশী ছিল না। বাপ-মায়ের মন অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকার ফাঁকে গা মেলিয়া ঘেন্না আনন্দেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এখন সে ইচ্ছা হইলেই যখন-তখন লালুদাদার কাছে গিয়া আপনিই উপস্থিত হয়। লালমোহন শিশি শিশি লজন্‌চুষ আর টিন টিন বিস্কুট আনিয়া লুকাইয়া রাখে, সন্দেশ-রসগোল্লারও অভাব থাকে না; সুতরাং লালুদাদার ঘরে কোন্ সময়ে কোন্ দিক দিয়া চুরি করিয়া যাওয়া নিরাপদ তা তিন বছরের ঘেন্না ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিল। ঐটুকু ছোট্ট মেয়ে যখন মা-বাপের দিবানিদ্রার অবসরে চোরের মতন ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চকিত চাহনির সার্চ লাইট ফেলিয়া ফেলিয়া সন্তর্পণে লালমোহনের কাছে আসিত, তখন তাহা দেখিয়া লালমোহনের বুক যেন ভাঙিয়া যাইত, সে ছুটিয়া গিয়া ঘেন্নাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঘরে আনিত আর তাকে খেলা দিয়া খাবার দিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া তাকে হাসাইয়া বকাইয়া তার মনের ভার সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। লালমোহনের বিচিত্র ভঙ্গীর রঙ্গ দেখিয়া আনন্দে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই ঐটুকু মেয়ে সেই উচ্ছ্বসিত হাসি হঠাৎ দমন করে, বাপের ভয়ে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলে;—আর লালমোহনের বুকের মধ্যে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া তার মর্ম্মস্থানটিকে পুড়াইতে থাকে।

লালমোহন আর ঘেন্নার এই যে গোপন মিলন তা কর্ত্তা-গিন্নির একেবারে অগোচর ছিল না; মুনিবদের প্রিয় হইবার ভরসায় চাকর-দাসীদের মধ্যে গুপ্তচর ছিল অনেকেই। কর্ত্তা-গিন্নি এখন কথাটা কানে তুলিয়াও গ্রাহ্য করে না, ভাবে—মরুকগে যাক। কিন্তু লালমোহন আর ঘেন্নার ভয় ঘুচাইয়া তাদের অনুমতি দেওয়াও কুকুরকে নাই দেওয়া হইবে মনে করে। ছেলের যত্ন করিতেই তাদের সময় যায়, মেয়েটা বাড়ীময় দৌরাত্ম্য করিয়া না বেড়াইয়া এক-জায়গায় যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ত থাকুক গিয়া।

সাত মেয়ের পর ছেলে! তার জন্য দোল্‌না বিছানা ঠেলাগাড়ী সোলার ঝারা ঝুম্‌ঝুমি চুষিকাঠি খেল্‌না কিনিয়া কিনিয়া ঘর বোঝাই হইয়া উঠিতেছিল, তবু বাপ-মার মন উঠিতেছিল না। মেয়েরা এমন সব বিলাসের দ্রব্য কখনো চক্ষেও ছাখে নাই। ঘেন্নার শিশুচিত্ত ঐগুলি খোকার সঙ্গে ভাগে উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেও মুখ ফুটিয়া চাহিতে তার সাহসে কুলাইত না; সে দু-চারবার ঐসব জিনিসে হাত দিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, তার মা অম্‌নি কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছে—ঘেন্না! ফের খোকার জিনিসে হাত দিচ্ছিস! কিছু যদি ভাঙে ত তোমারও হাত পা আস্ত থাক্‌বে না জেনে রাখো!

একদিন খোকা দোল্‌নায় শুইয়া একটা ঝুম্‌ঝুমি মুঠো করিয়া ধরিয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছিল আর তার হাতের উৎক্ষেপে ঝুম্‌ঝুমিটা থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া

বাজিয়া উঠিতেছিল। ঝুম্‌ঝুমিটার লাল রং আর ঝুমুর ঝুমুর শব্দ ঘেন্নার মন হরণ করিল; সে উৎসুক হইয়া ডিঙি মারিয়া খোকার দোল্‌নার মধ্যে দেখিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। সে চোরের মতন মিটমিট করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সে-তল্লাটে কেহ নাই, তার বাবা খোকার দোল্‌নার পাশে খাটের উপর গড়্‌গড়ার নল হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন সে সাহস করিয়া খোকার দোল্‌নার মধ্যে তার ছোট্ট হাতখানি ভরিয়া দিল; দোল্‌নার মধ্যে আরো কতকগুলি খেল্‌না ছিল, সেগুলি সে একটি একটি করিয়া তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া রাখিয়া দিল; তারপর খোকার হাতের ঝুম্‌ঝুমিটা ধরিল; খোকা হাত নাড়িতেই টান পড়িয়া ঝুম্‌ঝুমিটা তার মুঠি হইতে খুলিয়া ঘেন্নার হাতে রহিয়া গেল, আর খোকা অম্‌নি কাঁদিয়া উঠিল। খোকার কান্নায় থতমত খাইয়া ঘেন্না তাড়াতাড়ি ঝুম্‌ঝুমিটা খোকার হাতে গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু খোকা কিছুতেই আর ঝুম্‌ঝুমি ধরে না, হাত পা ছড়াইয়া কেবলই কাঁদে। খোকার কান্নার শব্দে চোখ মেলিয়াই হরকুমার দেখিল—ঘেন্নার হাতে খোকার ঝুম্‌ঝুমি! অম্‌নি রাগে দাঁত কড়্‌মড় করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাক্ষুসী, খোকার ঝুম্‌ঝুমি চুরি কর্‌ছিস্!" কথা শেষ করিবার আগেই হাতের লম্বা শট্‌কা নল দিয়া ঘেন্নাকে শপাশপ্ কয়েক ঘা বসাইয়া দিল। ঘেন্না চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই হরকুমার সিংহনাদ করিল—"চোপ্! চোপ্ বল্‌ছি! দোষ করে আবার কান্না!" ঘেন্না কাঁদিয়া উঠিয়াই বাপের ধমকে একবার বিষম রকম চম্‌কিয়া উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু বাপের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া খোকা কাঁদিয়া একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিল।

খোকার কান্না! এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া যখন খোকার বাপ মা চাকর দাসী ছুটাছুটি করিয়া সান্ত্বনা করিতে আসিয়া পড়িল ও সকলেই তাকে লইয়াই ব্যস্ত, সেই অবসরে ঘেন্না ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘর থেকে পলায়ন করিল।

ঘেন্নার হঠাৎ কাঁদিয়া ওঠা যেমন তীরের মতন গিয়া লালমোহনের প্রাণে বিঁধিয়াছিল, তার হঠাৎ থামিয়া যাওয়াটাও তেম্‌নি বাজিল। হায়রে! একি বিষম অত্যাচার যে দুঃখ প্রকাশ করিবারও অধিকার নাই! লালমোহন হিসাবের খাতা সরাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘেন্না আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া লালমোহনের কোলের মধ্যে ঢুকিল। লালমোহন হঠাৎ ঘেন্নাকে কোলের মধ্যে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহসিক্ত স্বরে ডাকিয়া উঠিল—"দিদি!" ঘেন্না তখনো রুদ্ধ রোদনের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; সে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া তার ছোট্ট হাতখানি দিয়া লালমোহনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—চুপ কর লালু-দা, চুপ কর, এখুনি বাবা আস্‌বে!

লালমোহনের চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; সে আদর করিয়া ঘেন্নার গায়ে হাত

বুলাইতে গিয়া দেখিল তার কচি গায়ে ছড়া ছড়া হইয়া নলের আঘাত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইসব আঘাত লালমোহনের মনের গায়ে তেমনি হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। লালমোহন ঘেন্নার সঙ্গে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না।

খোকার মুখ আহার দিয়া বন্ধ করিয়া গান্ধারী বামা-ঝিকে চুপি চুপি বলিল—বামা, মেয়েটা কোথায় গেল একবার ছাখ! মার খেয়ে ২তর যে চূর্ণ হয়ে গেছে—আড়ষ্ট হয়ে কোথায় ভির্মি-টির্মি যাবে!

ঘেন্না চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে লালমোহনের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরেও থাকিয়া থাকিয়া ঘেন্না কান্নার আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছিল। লালমোহন তাকে কোলে করিয়া ভাবিতেছে—বাপ-মা বলিয়া তাদের একে নিষ্ঠুর নিদারুণ দুঃখ দিবারও অধিকার আছে, সে কেউ নয় বলিয়া এ-কে ভালো বাসিবারও অধিকার তার নাই!

হঠাৎ তাকে সচেতন করিয়া বামা ঝি ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সর্‌কার-মশায়, এখানে ঘেন্না আছে? মা ডাক্‌ছেন।

লালমোহন যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে এম্‌নি ভাবে বলিল—এই এল, আর এসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি একটু কোলে করে নিয়ে যাও বামা।

"মেয়েটা সবাইকে জ্বালিয়ে মার্‌লে বাপু! এতবড় বুড়ো মেয়েকে ঘুমন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়! তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছ সর্‌কার মশায়!" বলিয়া বকিতে বকিতে বামা ঘেন্নাকে তুলিতে গেল। ঘেন্নার গায়ে হাত দিয়াই বামা বলিয়া উঠিল—ওমা! জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে!

লালমোহন ব্যস্ত হইয়া ঘেন্নার গায়ে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ! জ্বর হয়েছে? গা কি খুব বেশী গরম?

বামা লালমোহনের উদ্বেগ উপেক্ষা করিয়া আর-কিছু না বলিয়া ঘেন্নাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। লালমোহন ছুটা টাকা লইয়া চাদর গায়ে দিয়া বাজারে বাহির হইল।

বামা ঝি ঘেন্নাকে আনিয়া গান্ধারীকে বলিল—ঘেন্নার জ্বর হয়েছে মা!

গান্ধারী মেয়ের দিকে বক্র কটাক্ষ করিয়া খোকাকে কোল নাচাইয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল—ভয় নেই, ওরা মর্‌বে না।

এই কতকক্ষণ আগে ঘেন্নার দুই দিদি আর-না-কালী ও রক্ষা-কালীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বরপক্ষের লোকেরা হাজার দশেক টাকার ফর্দ্দ দিয়া গেছে; সুতরাং মেয়েদের উপর হরকুমার ও গান্ধারীর চটা মন আরো কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের মনে হইতেছিল—হায়রে ছেলে! এরা ছেলে হইলে অপরের ঘর হইতে এম্‌নি কষিয়াই টাকা আদায় করিতে পারিতাম। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকুক খোকা—কিছু আদায় না হইয়া যাইবে না।

ঘেন্না জ্বরের ঘোরে বলিয়া উঠিল—লালু-দা, একটু জল খাব।

গান্ধারী সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—কেবল লালু-দা আর লালু-দা! সাতকালের এক লালু-দা পেয়েছে! এখানে

তোর লালু-দা কোথায়? ঐ মাথার কাছেই ত জল রয়েছে নিয়ে খা না—আমার কোলে যে খোকা ঘুমুচ্ছে। আর দু-দুটো ধেড়ে মেয়ে, তারাই বা গেল কোন্ চুলোয়?

আর-না ও রক্ষা ছেলেমানুষ হইলেও অবহেলার পাঠশালায় দুঃখ গুরুমশায়ের কড়া শাসনে অল্প বয়সেই অনেক শিখিয়াছিল; তারা দেখিয়াছিল তাদের দিদিদের বিবাহ দিয়া বাপ-মায়ের অর্থনাশে মনস্তাপ, আর দেখিতেছে তাদের বিয়ে দিতে অর্থনাশের আশঙ্কায় বাপ-মায়ের অসন্তোষ। আজ এই কতক্ষণ আগে তাদের অনুগ্রহ করিয়া পছন্দ করিয়া কে জানে কাহারা হাজার দশেক টাকার ফর্দ্দ দিয়া তাদের বাপমায়ের মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া গিয়াছে; তারা তাই নিজেদের জন্মের ও জাতের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া অপরাধীর মতন ভয়ে ভয়ে বাপ-মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। এখন ছোট বোনটির, তাদের সকল বোনের জন্ম-অপরাধে সবার বেশী দণ্ডিত এতটুকু মেয়ের, কাতর স্বর তাদের কানে যাইতেই তারা আর লুকাইয়া থাকিতে পারিতেছিল না; তার উপর মায়ের মধুর আহ্বান শুনিয়া তারা ছুটিয়া আসিয়া জলের ঘটী তুলিয়া মায়ের কাছে বাহির হওয়ার লজ্জায় ও বোনটির প্রতি স্নেহে মৃদুস্বরে বলিল—ঘেন্না ভাই, জল খা!

ঘেন্না চট করিয়া চাহিয়া দেখিল সে ত লালুদাদার কোলে নাই। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, আমি লালু-দাদার কাছে যাব।

এতদিন সে যে-কাজ চুরি করিয়া করিত, আজ অক্ষম হইয়া সে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধ্য হইল।

গান্ধারী ঘেন্নার কান্নায় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আ মলো! আবার কাঁদে কেন? এখুনি ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে; কত কষ্টে খোকাকে ঘুম পাড়ালাম, সেও কাঁচা ঘুম ভেঙে খেঁত্‌খেঁত্ করবে। যা বামা, ফেলে দিয়ে আয় ওকে লালুর কাছে।—ওকে আর বাড়ীতে আস্‌তে হবে না। এক এক করে সবাই যমের বাড়ী গেলেই ত হয়, তোদেরও হাড় জুড়োয়, আমরাও বাঁচি!

মায়ের এই অনুরোধ যে তাহাদিগকেও তা বেশ বুঝিয়া ভয়ে ও লজ্জায় মুখ কাচু-মাচু করিয়া আর-না ও রক্ষা সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ঘেন্নাকে ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির-বাড়ীতে যাইতে যাইতে বামা-দাসী গজর গজর করিয়া বকিতেছিল—ভ্যালা মেয়ে সব জন্মেছিল বাবা!—ভিটেমাটি চাটি করে দিলে! ...

লালমোহন বাজার হইতে এক পাঁজা খেল্‌না আনিয়া বিছানার উপর রাখিয়া সবে গায়ের চাদর খুলিয়া আল্‌নায় রাখিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে বামা-কণ্ঠের সুস্বর শুনিতে পাইল—এই নাও সর্‌কার-মশায় তোমার আদুরীকে—একেবারে রসাতল কর্‌তে নেগেচে!

লালমোহন ফিরিয়াই দেখিল জ্বরের ধমকে ঘেন্নার মুখ ও চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে ধুকিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাকে বুকে করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা জল চোখে মুখে দিয়া মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

ঘেন্না একটু সাম্‌লাইয়া খেল্‌নাগুলি দেখিয়া কাতর স্বরে বলিল—খোকার খেল্‌নায় আর আমি হাত দেব না লালু-দা !

—এ খোকার খেল্‌না না দিদি, এ তোমার খেল্‌না, এ সব তোমার, আমি এনেছি।—বলিয়া এক বোঝা খেল্‌না লাল-মোহন ঘেন্নার সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল।

এই অতুল ঐশ্বর্য্য তার ! ঘেন্নার জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন চোখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে পরম স্নেহ ও পরিতোষের সঙ্গে খেল্‌না-গুলির উপর একখানি হাত রাখিয়া আর-একখানি হাতে লালুদাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা অরিল—এ খেল্‌না নিলে বাবা মার্‌বে না ?

লালমোহন বলিতে পারিল না—"না, মার্‌বে কেন ?" সে শুধু বলিল—আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা কর্‌ব ভাই।

আর-না ও রক্ষার বিয়ের ঝঞ্ঝাটে বাড়ী সুদ্ধ লোক ব্যস্ত থাকাতে লালমোহনই ঘেন্নাকে যত্ন ও শুশ্রূষা করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। হরকুমার মাঝে মাঝে লাল-মোহনকে ধম্‌কাইতেছিল বটে—"কাজকর্ম্ম কর্‌বে, না মেয়েটাকে নিয়েই থাক্‌বে ?" কিন্তু সে ধমকের মধ্যে বিশেষ বিষ ছিল না; সবাই ব্যস্ত, জরো মেয়েটাকে একজন দেখিবার লোক ত থাকা চাই।

হরকুমারের মেয়েদের বিয়ে হইয়া গেলে তারা আর বাপের বাড়ীর মুখো হইতে চায় না, এমনি তারা নিমকহারাম! শ্বশুর-বাড়ীতে বৌদের যে আদর, ততটুকুতেই তারা কৃতার্থ!

এখন বাড়ীতে একা ঘেন্না। তাকে এখন মায়ের হুকুমে খোকার কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া খেলা দিতে হয়। খোকা কাঁদিলে তাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে হয়; লালুদাদার কাছে যাইবার জন্য মন-কেমন করিলেই মায়ের পাঁচ-আঙুলের দাগ-তোলা চড়ের কথা মনে পড়িয়া ঘেন্নার উৎসাহ চঞ্চলতা দমিয়া যায়। কিন্তু মন যেখানে টানে সেখানে সকল বাধা অতিক্রম করিয়াও চুরি চলিতেই থাকে।

কিন্তু খোকা চলিতে ও বলিতে শিখিয়াই তাদের চুরি ধরিয়া শাসাইত—দাঁড়া মা ঘেন্না পোলাল্‌মুকী, তুই লেলো মুকপোড়ার কাচে এইচিস—মাকে বলে তোদের মজা দেকাব।

ঘেন্নাকে বাপ মা ভাই ঘেন্না করে বলিয়া বয়স তাকে ছাড়িয়া কথা কহিল না, ঘেন্নারও বিয়ের বয়স হইল। আবার গাত্র খোঁজা, বরপক্ষের লম্বা ফর্দ্দ, আর মেয়ের উপর তার বাপ-মায়ের সকল ঝাল ঝাড়া রীতিমতই চলিতে লাগিল। জন্মদুঃখিনীর এই এক নূতন দুঃখ উপস্থিত—কোথাও কিছু বলা কহা নাই, মা তাকে টানিয়া লইয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে, খোঁপার উপর মায়ের হাতের তেলোর ঠোকা আর মুখের উপর শুক্‌নো খড়্‌খড়ে গামছার রগ্‌ড়ানি সহ্য করিয়া তাকে কতকগুলো অপরিচিত পুরুষের সাম্‌নে গিয়া বসিতে হয়, হাঁটিতে হয়, হাত পা দেখাইতে হয়, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর ভাবিবার সময় না পাইয়া তখনি-তখনি দিতে হয়। মা চুল এই মাত্র বাঁধিয়া দিল, কিন্তু লোকগুলা সেই বাঁধা চুল এলো করিয়া ফেলিতে হুকুম

দেয়; তার ফর্‌সা গালের আর ঠোঁটের লাল রং কৃত্রিম কি না ধরিবার জন্য অচেনা লোকে ইস্ত্রিকরা কড়া রুমালের মধ্যে আঙুল ঢুকাইয়া তার গালের ও ঠোঁটের উপর মিনিট খানেক ধরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া আরো লাল করিয়া তোলে। যে মা আগে তাকে তাকাইয়া দেখিত না, সেও এখন নিত্য তাকে যখন-তখন বসিয়া ঘষে মাজে সাবান মাখায়। এমনিতর বহু দুঃখ ভোগের পর তাকে এক তেজ্‌বরে পাত্রের পছন্দ হইল, আর সবার চেয়ে বড় কথা দরে বনিল। অল্প খরচে শেষ মেয়েটিকে পার করিতে পারিয়া হরকুমার ও গান্ধারী আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঘেন্নার কপালে সুখ আছে, তাই এমন সুপাত্রে পড়্‌ছে।

শ্বশুরবাড়ী যাইতে ঘেন্নার কোনো দিদি তেমন করিয়া কাঁদে নাই, যেমন কান্না কাঁদিল ঘেন্না; তার যে লালু-দাদাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

কিন্তু বেশী দিন লালুদাদাকে ছাড়িয়া ঘেন্নার থাকিতে হইল না। সে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, আর সঙ্গে লইয়া আসিল অনেক গহনাপত্তর ও অনেকগুলি টাকার কোম্পানির কাগজ। বিধাতা তাকে শেষ দুঃখ দিবার সময়ও উপহাস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বাপ-মা আদর করিয়া মেয়েকে ঘরে তুলিল, গলা জড়াইয়া ঘটা করিয়া শোক করিল, তারপর চোদ্দ বছরের খোকাকে ঘেন্নার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল—বেঁচে থাকুক খোকা, একেই তুই মানুষ কর্‌—তোর মনটা একটা অবলম্বন পেয়ে ভালো থাক্‌বে।

হরকুমার ও গান্ধারী খোকাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল—দিদির মন জুগিয়ে থাকিস্, তোর ওপর মায়া পড়্‌লে আখেরে তোর ভাল হবে, তোর আর খেটে খেতে হবে না। এখন ওকে আর যেন ঘেন্না বলিস্‌নে, তুই-তোকারিও করিস্‌নে যেন।

খোকাকে মানুষ করিয়া অবলম্বন খুঁজিতে ঘেন্না বাপের বাড়ী আসে নাই, সে আসিয়াছিল তার লালুদাদার জন্য। এতকাল পরে বাড়ীতে ফিরিয়া লালুদাদাকে দেখিবার জন্য তার মন ছটফট করিতেছিল। বাপ-মায়ের শোকের ঘটা আর আদরের আড়ম্বর হইতে যেই মুহূর্ত্তে সে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারিল, অমনি সে সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে গিয়া বামাদাসীকে হুকুম করিল—বামা-দি, একবার লালুদাদাকে ডেকে দে ত।

বামা অবাক হইয়া দেখিল এ ত সে ঘেন্না নয় যে ভয়ে ভয়ে চোরের মতন কুণ্ঠিত হইয়া কিছু চায়; এ রাণীর মতন অসঙ্কোচে হুকুম করে। বামা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

বুড়ার সঙ্গে বিয়ে হইয়া ঘেন্নার উপকার হইয়াছিল অনেক। বুড়ার সংসারে ঘেন্নার শাশুড়ী ননদ কেহ ছিল না, ঘেন্নাকেই সেখান-কার কর্ত্রী হইতে হইয়াছিল। বুড়া ঘেন্নাকে যে পরিমাণ লোহাগ করিত সেই পরিমাণ ভয়ও করিত। এসব যে ঘেন্নার অভাবনীয় অভিজ্ঞতা—তাকেও লোকে ভয় করে, ভালো বাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তারও হুকুম পালন করিবার জন্য বাড়ীর কর্ত্তা হইতে

চাকর-দাসী সবাই হামেহাল হইয়া থাকে! ঘেন্নার মনের উপর যে সঙ্কোচ কুণ্ঠা ও ভয়ের চাপ ছিল তা সহজেই সরিয়া তাকে মানুষ হইয়া উঠিবার অবকাশ দিল। তার পর তার হাতে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া তার স্বামী যখন মারা গেল তখন কত যে অচেনা লোক পাড়াপড়সী ও আত্মীয়স্বজন হইয়া তার স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল তার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত লোকের আদর সত্ত্বেও তার চিত্ত একটি লোকের আদরের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল—সে তার লালু-দা। তাই ঘেন্না শ্বশুরবাড়ীর প্রতিপত্তি ছাড়িয়া বাপের বাড়ীতে অনাদরের সম্ভাবনার মধ্যে চলিয়া আসিল। কিন্তু এখানে আসিয়াও সে দেখিল হঠাৎ সোনার কাঠির স্পর্শে সব বদল হইয়া গিয়াছে—মা-বাপও তাকে আদর করে, সমীহ করিয়া খাতির করিয়া কথা বলে। ঘেন্না অনুভব করিল আপনার শক্তি, বদল হইয়া গেল সমস্ত মানুষটা!

ঘেন্না শ্বশুরবাড়ী যাওয়া অবধি লাল-মোহনের আনন্দ ছিল না; ঘেন্না বিধবা হইয়াছে শুনিয়া সে ত আধমরা হইয়াই গিয়াছিল। ঘেন্না এ বাড়ীতে আসিয়াছে অবধি তার কান্নার বিরাম নাই। ঘেন্নাকে দেখিবার জন্য তার মন যত উৎসুক হইতেছিল, ঘেন্নার বিধবা বেশ দেখিবার দুঃখ তত প্রবল হইতেছিল। বামা-দাসী গিয়া ডাকিতেই লালমোহনের বুকের মধ্যে হর্ষবিষাদের জোড়া আঘাত জোরে বাজিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে ঘেন্নার কাছে আসিয়াই ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল—দিদি!

ঘেন্না তাড়াতাড়ি লালমোহনের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া আপনার মুখটাকে লালমোহনের দৃষ্টি হইতে সরাইল। সকলে তার যে-দুঃখ কল্পনা করিয়া শোক করিতেছে তার চেয়েও লালমোহনকে দেখিতে পাওয়ার আনন্দ তার যে বেশী হইয়াছে ইহা সে লালমোহনকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া প্রণামের ছলে মুখ নত করিল।

ঘেন্নাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া লাল-মোহন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—করিস্ কি দিদি, করিস্ কি? তুই ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি শুদ্দুর—

ঘেন্না অপ্রতিভ স্মিতমুখ নত করিয়া বলিল—তা হোক, তোমার চেয়ে পূজ্য আমার কেউ নেই, তোমার চেয়ে আপনারও আমার কেউ নেই!

লালমোহন সকল দুঃখ ভুলিয়া হাসিমুখে ঘেন্নার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই। অমন কথা বল্‌লে আমার পাপ হবে যে!

ঘেন্না লালমোহনকে প্রণাম করিয়া কি যে বিষম কথা বলিয়াছে তা বামার মারফতে কর্ত্তাগিন্নির কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না। গান্ধারী গম্ভীর হইয়া কন্যাকে উপদেশ দিল—ছ্যাখো ঘিনু, তোমার এখন সোমত্থ বয়েস, পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা ভালো নয়। লালু চাকর বৈ ত না। চাকরের সঙ্গে চাকরের মতনই ব্যবহার কোরো।

মায়ের কথা শুনিয়া ঘেন্না হাসিল। তার ঘৃণিত নামটা কোমল হইয়া হইয়াছে ঘিনু! তার লালুদাদা পর, বুঝাইয়া দিতেছে তার আপনার জন বাপ মা! লালুদা চাকর, আর সে মুনিব!

লালমোহনের সঙ্গে দেখা করিয়াই ঘেন্না বুঝিতে পারিয়াছিল যে-জায়গাটি হইতে তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়া তারা মিলিতে পারিল না। অল্প কয়েক বৎসরের অদর্শনে তাদের দুজনের মধ্যে কি একটা ব্যবধান দেয়াল তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যা না সে, না লালমোহন অতিক্রম করিতে পারিল। সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিল, দুঃখ অনুভব করিল, কিন্তু ইহাও বুঝিল যে এ ব্যবধান অতিক্রম করা আর যাইবে না। কিন্তু যখন তার মা সেই দেয়ালের উপর উপদেশের ভার চাপাইয়া ব্যবধান আরো দুর্লঙ্ঘ্য ও পোক্ত করিতে চাহিল, তখন সেই ভারে সকল বাধা ভিতরই হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঘেন্নার মনে হইল—লালুদাদা আমার সেই লালুদাদা, তার কাছে আবার সঙ্কোচ!

সেই দিন হইতে ঘেন্না দিনের মধ্যে যখন-তখন লালমোহনের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, কারো মধ্যস্থতায় ডাকিয়া-ডুকিয়া নয়, বরাবর আপনি তার ঘরে।

গান্ধারী কন্যাকে স্মরণ করাইয়া দিল—তার বয়েস মাত্র সতেরো, ও লালমোহনের এখনো চল্লিশের কোটায় এবং সে ঘেন্নার স্বামীর চেয়েও বয়সে ঢের ছোট আর তার স্ত্রী বহুকাল হইল মারা গেছে।

ঘেন্না ঘৃণাভরে মায়ের দিকে শুধু একবার চাহিয়া তখনি তার লালুদাদার কাছে চলিয়া গেল।

চাকর-দাসীদের রসনা আসিরসের আস্বাদ পাড়ায় বিতরণ করিতে লাগিল। পাড়া মাতিয়া উঠিল।

পাড়ার বিজ্ঞ নসীবাবু ঘাড় নাড়িয়া পরম নিরপেক্ষ ভাবে বলিলেন—হতে পারে ওরা সচ্চরিত্র নির্দ্দোষ; কিন্তু মানুষের নির্দ্দোষ হওয়াও যেমন চাই, তেম্‌নি সাবধান বিবেচক হওয়াও ত চাই। যে-রকম ব্যবহারে সংসারের লোকে কথা বল্‌তে পারে তা ত ওরা পরিহার করে চলে না। সুতরাং কেউ যদি ওদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কানাঘুষো করে ত তাদেরই যে শুধু দোষ তা ত বলা যায় না! এই দেখ না সেদিন নবীন-নন্দীকে আর দয়াল-কুণ্ডুর ভাইঝি লক্ষ্মীকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডটাই না হল?

হরকুমার মাথা হেঁট করিয়া বাড়ীতে ফিরিল। যে মেয়ে হইতে তার উঁচু মাথা হেঁট হইল তাকে সে সেই দণ্ডেই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিত যদি না ঘেন্নার অবর্ত্তমানে ঘেন্নার কোম্পানির কাগজগুলি খোকার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত।

স্বামীর বিপদে সহধর্ম্মিণী গান্ধারী পরামর্শ দিল—ঘেন্নাকে দূর না করে লেলোকে দূর করে দিলেই ত সকল আপদ চুকে যায়।

হরকুমার বিপদ-সমুদ্রের কূল দেখিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এই ছ্যাখো! এই সহজ উপায়টা মনে আসেনি! মাথার কি আর স্থির আছে? ঠিক বলেছ তুমি, লেলোকে আজই তাড়াচ্ছি।

কথাগুলি ঘেন্নার শুনিতে দেরী হইল না, বামার যে দয়ার শরীর।

ঘেন্না তখন লালমোহনের কাছে যাইতে-ছিল, ফিরিয়া আসিল। তার জেদের জন্য লালু-দাদার চাকরী যাইবে? আজ থেকে সে

আর লালুদাদার ত্রিসীমানায় যাইবে না। তাতে দুজনেরই কষ্ট হইবে? নাচার!

প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া লালমোহনের দিন কাটিল; ঘেন্না-দিদির ছায়া পর্য্যন্ত সেদিন সে আর দেখিতে পাইল না। পাড়ার লোকের নিন্দা সহ্য করিয়া হাসি-মুখে সহজ ভাবে সে ঘেন্নার সঙ্গে অনর্গল কথা কহিত পাছে কুৎসার কালী ঘেন্নার মনে লাগিয়া তার মুখখানিকে একটুও ম্লান করে। কিন্তু সেই অপবাদ বেড়া হইয়া যখন ঘেন্নার আসা বন্ধ করিল তখন সে কাতর হইয়া পড়িল—হায় হায়! ঘেন্নার নিন্দার কারণ হইল অবশেষে সে! এর আগে তার মরণ হইল না কেন? এখন হরকুমার যদি তাকে কঠিন দণ্ড দ্যায় তবে তাও কতকটা সান্ত্বনা! কিন্তু কেউ যে তাকে কিছুই বলে না—এ যে ভীষণ শাস্তি!

হরকুমার পরদিন সকালেই লালমোহনকে ডাকিয়া শুধু বলিল—হিসেবপত্তর বুঝিয়ে দাও।

লালমোহন ঘেন্নার কাছ হইতে চির-নির্ব্বাসনের চরম দণ্ড বুঝিতে পারিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

ঘেন্নার কাছে খবর পৌঁছিল, লালমোহনের জবাব হইয়াছে। খবর দিল অবশ্য বামাই।

ঘেন্না বামাকে বলিল— বামা-দি, শিগ্‌গির একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়।

বামা অবাক হইয়া ঘেন্নার বজ্রগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল—গাড়ীর আড্ডায় নয়, গান্ধারীর ঘরে।

গান্ধারী তখন খোকার জন্য আনারসের সরবৎ করিতেছিল; তাড়াতাড়িতে সর উল্টাইয়া ফেলিয়া ছুটাছুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঘিনু, গাড়ীতে কোথায় যাবে মা?

ঘেন্না আপনার জিনিসপত্র বাক্‌সে ভরিতে ভরিতে বলিল—শ্বশুরবাড়ী।

বামার কাছে খবর পাইয়া হরকুমারও ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ শ্বশুরবাড়ী যাবে কেন মা-লক্ষ্মী?

বাক্‌সে চাবি ঘুরাইয়া ঘেন্না বলিল—এখন থেকে আমি সেখানেই থাক্‌ব।

হরকুমার অবাক গান্ধারীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—সেখানে তোমার টাকাকড়ির হিসেবপত্তর রাখ্‌বে কে?

ঘেন্না উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাবির-থোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বলিল—আমি নিজেই রাখ্‌ব। না পারিত লালুদাদাকে ডাকিয়ে নেব।

হরকুমার হাসিয়া বলিল—লালুকে তুমি কোথায় পাবে মা, পুরোনো চাকরকে কি কেউ ছাড়ে? লালু ত আর আমাদের পর নয়, ও ত আমাদের ছেলেরই সমান।

বাবার কথা শুনিয়া ঘেন্না ঘৃণাভরে ঈষৎ হাসিল। তাহা দেখিয়া মেঘ দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া গান্ধারী চেঁচাইয়া ডাকিল—ও বামা, আর গাড়ী আন্‌তে যেতে হবে, না। ও খোকা, তোর দিদি পালাচ্ছে ধরে রাখ্‌।

খোকা আসিয়া ঘেন্নার হাত ধরিয়া বলিল—দিদি আমাকে ছেড়ে যাবে কোথায়, যেতে পার্‌লে ত!

ঘেন্না আবার ঘৃণাভরে হাসিল। তাকে

বাঁধিয়া রাখিবার জন্য চারিদিকে কত টোপের আয়োজন!

ঘেন্না বাপের বাড়ীতেই থাকিল, কিন্তু তার আনন্দকে বিদায় দিয়া। বিধাতার দেওয়া সকল দুঃখের চেয়ে তার নিজের নেওয়া একটি দুঃখ অনেক কঠিন।

লালমোহনের হিসাব বুঝিয়া লইবার অবকাশ হরকুমারের হইয়া উঠিতেছিল না। হিসাব বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত লালমোহনকে বাঁধা হইয়া থাকিতেই হইল, একই বাড়ীতে থাকিয়া ঘেন্না-দিদির চির-অদর্শনের দারুণ দণ্ডে নিত্য নিরন্তর দলিত হইয়া।

হরকুমার ও গান্ধারী মেয়েটার সুবুদ্ধি দেখিয়া সুখী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন খোকা আসিয়া ব্যস্ত হইয়া খবর দিল—মা, মা, ঘেন্না পোড়ারমুখী ওপাড়ার চাটুজ্জেদের মাবাপ-মরা ক্যাব্‌লাটাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে, আর বল্‌ছে ওকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্যৌ র্মে পিতা মাতা পৃথিবী

প্রথমে কি, আগা না গোড়া, উপর না নীচ, ভিতর না বাহির? কোন জিনিষ গড়িতে বা আয়ত্ত করিতে হইলে পা হইতে আরম্ভ করিব না মাথা হইতে আরম্ভ করিব? মূল হইতে ক্রমে শিখরে আরোহণ করিব, না শিখর হইতে মূলে নামিয়া আসিব? পূর্ব্বে কোন্‌টি, পরেই বা কোন্‌টি—কতরা পূর্ব্বা কতরা পরায়োঃ?

নীচ হইতে, মূল হইতেই ত আরম্ভ করা উচিত। ভিত্‌ই যদি ঠিক না হইল তবে ইমারত দাঁড়াইবে কোথায়? প্রতিষ্ঠা যদি পাকা হয়, তবেই ত তাহার উপর স্থায়ী কিছু খাড়া করা যায়। জিনিষ যাহাকে ধরিয়া ভর করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথমে মনোযোগ দেওয়া যে কর্ত্তব্য এ ত অতি সহজ সাধারণ কথা। বাহির হইতেছে প্রতিষ্ঠা, বাহিরকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ভিতর। কাজেই আগে চাই বাহির, তারপর ভিতর। বাহির হইতেছে যাহা বেশী জানা, বেশী স্পষ্ট; আর ভিতরটা সন্দেহের জায়গা, সেখানকার সবই আবছায়া। যেটার উপর কিছু দখল আছে, সেইটা দিয়া সুরু করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহাই গড়ি না কেন সেখানে একটা সত্য থাকিবেই, কারণ গোড়ায় একটা পরিচিত সুদৃঢ় সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু প্রথমেই যদি অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি তবে হাত পা ভাঙ্গিয়া অন্ধকারের মধ্যেই চিরকাল গুমরাইয়া মরিতে হইবে, ইহারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ হইতেছে জানা হইতে ক্রমে অজানার দিকে, বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করা। ছোট যাহা নিকটের যাহা শিক্ষা-নবীসের কাছে সেইটাই প্রধান কথা। বৃহৎ যাহা দূরের যাহা সেটাকে আয়ত্ত করিতে

হয় কাছের চারিপাশের ছোট ছোট জিনিষকে আয়ত্ত করিয়া, ইহারাই ত প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠা পাকা কর, তাহার উপর জিনিষ গড়িয়া তোল, জিনিষ চিরস্থায়ী হইবে—এ কথা শুনায় ভাল, মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইহার কারণ হইতেছে এই যে মানুষের দৃষ্টি একান্ত স্থূলের উপর আবদ্ধ, স্থূলের সহিত মিলাইয়াই তাহার সকল কল্পনা খেলিতে চায়। যে সত্যটি প্রধানত খাটে স্থূল জিনিষের সম্বন্ধে, তাহাকে সে ধরিতে চায় বিশ্বসত্য বলিয়া। গোড়া হইতে আগা, ভিত হইতে চূড়ায় উঠা ইমারত গড়িবার বেলায় ঠিক ঠিক পদ্ধতি হইতে পারে। কিন্তু জগতের সব জিনিষ ইমারতের মতনই নিখর নিরেট হয় তাহা কে বলিতে পারে? আর যে-সব জিনিষ একান্ত নিখর নিরেট নয়, তাহারা যদি গোড়ার ভিতের উপর নির্ভর করিয়া না থাকে, অনেক সময়ে যদি মাথার উপর ভর করিয়াই চলে, তাহাই বা অসম্ভব কি? উপনিষদ এই রকমের একটা কথা বলিতেছেন না?—ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ :—

সৃষ্টির সব জিনিষই যে স্থূল জগতের নয় এ কথাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জড়জগৎ ছাড়া স্পষ্টই আমরা দেখি আছে প্রাণের জগৎ, মনের জগৎ। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতের সংখ্যাই বেশী আর প্রাধান্যে ইহারাই বড়। আর সূক্ষ্মজগতের—মনের, প্রাণের জিনিষ সব আদৌ স্থানু নহে, তাহাদের ধর্ম্মই হইতেছে গতি, চঞ্চলতা। তাহারা স্থির হইয়া কোথাও বসে না, কিছুকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, তাহারা চলে ভাসিয়া ভাসিয়া, বাষ্পবৎ উড়িয়া ঘুরিয়া। সুতরাং এ সকল জিনিষ গড়িতে হইলে কোথা দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে? প্রতিষ্ঠা নয়, যাইতে হইবে উৎসে।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির অর্থই এই। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের যে পরিণতি তাহা সৃষ্টি নয়। স্থূলের যে পরম্পরা তাহার মধ্যে প্রকৃত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নাই। সকল স্থূলই হইতেছে কার্য্য, কারণ রহিয়াছে উহার এক অতীত প্রদেশে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ভাব হইতে বস্তু ইহাই সৃষ্টির ক্রম। স্থূল, বস্তু হইতেছে প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সূক্ষ্ম, ভাব হইতেছে উৎস। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বস্তু হইবে ভাব, বাহির হইতে ভিতর—এটা উজানের পথ, স্রোতের প্রতিকূল ধারা। কিন্তু সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে, ভাব হইতে বস্তুর দিকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যে গতি তাহা সহজ স্বাভাবিক অনুকূল স্রোত।

প্রতিষ্ঠার, বাহিরের উপর জোর দেওয়ার অর্থ জড়বাদ। দেহটাই আসল, মূল কারণ, প্রাণ মন এবং আত্মা (যদি কিছু থাকে) এই দেহেরই পরিণাম বা Function মাত্র—এই ধারণা ভিতরে ভিতরে আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি দেহ অধিকৃত হইলে প্রাণ-মন অধিকৃত হইবে, বাহিরকে ঠিক ঠিক বুঝিলে ভিতরটাও আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু সত্য হইতেছে ইহার বিপরীত। আত্মাই মূল কারণ, আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মন-প্রাণ। দেহ হইতেছে সকলের শেষ নিম্নতম সৃষ্টি। এই আত্মাই প্রকৃত মূল, এখানে সকল জিনিষ

রহিয়াছে বীজভাবে। উপনিষদ জগতের যে চিত্র দিয়াছে তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়, তাহা মোটেই কবিকল্পনা নয়। সাধারণতঃ আমরা মনে করি, এই যে বাহিরের স্থূল জগৎ এইটিই হইতেছে মূল গোড়া, ইহা ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়াছে, শাখা-প্রশাখা তুলিয়া দিয়াছে আকাশের দিকে, আর আর জগতের দিকে। মানুষ দাঁড়াইয়া আছে দেহের উপর, এখান হইতেই প্রাণকে মনকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে আত্মার দিকে। কিন্তু এটি দেখিবার ভুল। আত্মাই উৎস আত্মাই মূল, আত্মাই সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আপনার সমুচ্চের গুহাহিত গর্ভ হইতে নীচের দিকে মেলিয়া দিয়াছে মনের প্রাণের দেহের সৃষ্টির এই বহু-পল্লবিত বাহু।

ধর্ম্মসাধনাও এই জড়বাদের হাত এড়াইতে পারে নাই। এক্ষেত্রে একটা খুব সাধারণ হিতোপদেশ আমাদের দেওয়া হয়—শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীরই হইতেছে প্রতিষ্ঠা, আত্মাকে মনকে এই শরীরই ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং আগে শরীরটি ভাল থাকা চাই, সুস্থ সবল নিরাময় হওয়া চাই, তবেই ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা-কিছু সম্ভব। নতুবা রোগে যে জীর্ণ, সকল রকম অস্বচ্ছন্দতায় যে খিন্ন, তাহার কাছে আত্মার কথা, ভগবানের কথা উপহাস মাত্র। সেই জন্যই দেখি প্রচলিত সকল রকম যোগ-সাধনাতে প্রথমে শরীর, শরীর-সম্বন্ধীয় যাহা তাহারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেহশুদ্ধি দিয়া আরম্ভ করিয়া সাধককে ক্রমে চিত্তে, মনে উঠিতে হয়, সকলের শেষে অধ্যাত্মের মধ্যে পৌঁছিতে হয়। হঠযোগ (আসন ও প্রাণায়াম) হইতেছে যোগের অধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রতিষ্ঠা, অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্য, এটিকে ছাড়িয়া অন্য পথ নাই।

কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনে বা যোগ-সাধনার এটি উল্টা পথ। আগেই হইতেছে সাধকের মন—তাহার আত্মা, তারপর শরীর। রোগজীর্ণ শরীর লইয়া যে ভগবৎ চিন্তা করিতে পারে না, রোগমুক্ত হইলেই যে সে ভগবানে স্থিরনিবিষ্ট হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। যাহার অন্তরাত্মায় ভগবানের স্পর্শ পড়ে নাই, সে সুখী সুস্থ হইলেও ভগবানকে মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু যে পাইয়াছে এই স্পর্শ, তাহাকে সুখে-দুঃখে, রোগে-স্বাস্থ্যে বাধ্য হইয়া ভগবানকে ভাবিতে হইবে। যোগ-সাধনারও গুপ্তরহস্য এইখানে, গোড়াতেই প্রথমেই ধরিতে হইবে অধ্যাত্ম সত্তা, এই জিনিষটি অধিগত হইলে তুমি এক নিভৃত তপঃ-শক্তির অধিকারী হইবে। এই তপঃশক্তির উচ্ছ্বসিত বন্যা তোমার আধারকে ছাপাইয়া চলিবে, এবং উহারই তেজে ও উহারই চাপে তোমার মন তোমার চিত্ত তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। কায়াসিদ্ধি যোগ-সাধনার গোড়ার উপকরণ নয়, শেষ ফল মাত্র।

সেই রকম, ছোট যাহা কাছের যাহা সেটা হইতেছে দূরের যাহা বৃহৎ যাহা তাহারই একটা রূপ, প্রকাশ বা প্রয়োগ। বড় জিনিষ কঠিন জিনিষ প্রথমে ধর, দেখিবে ছোট জিনিষ সহজ জিনিষ আরও কত সহজ সরল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতেই কেমন সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। যে যত ঊর্দ্ধে

আপনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই অনুপাতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে, অল্পশক্তিসাধ্য যে কর্ম্ম সে-সব কোন বিশেষ যত্নেরই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অন্ন লইয়া যে আছে তাহার ততখানি শক্তি ব্যয় করিবার প্রয়োজনও হইতেছে না, অবসরও জুটিতেছে না। সুধু তাহাই নয়, ছোট জিনিষ কেবল তখনই সুনিষ্পন্ন হয়, যখন বৃহতের প্রভা ও আবেগ তাহার পিছনে জাগ্রৎভাবে রহিয়াছে। আসল কথা এই, যে জিনিষকে আমরা বলিতেছি দূরের অজানার, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সেইটাই মানুষের বেশী কাছে বেশী জানা। অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে দেখি ভিতরটাই আগে, কাছে, বাহিরটাই পশ্চাতে, সুদূরে, মানুষ যদি কিছুর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহা আত্মার সমুচ্চ শিখরে।

আত্মাই আগে, মনই আগে তারপর দেহ, ভিতরই আগে তারপর বাহির, আগে শিখর তারপর মূল, আগে উৎস তারপর প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল অধ্যাত্মবাদীর কথা। অধ্যাত্মবাদী যাহা বলিতেছেন তাহা খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া জড়বাদীর কথা কি মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়, সেখানে কি কিছু সত্য পাওয়া যায় না? আমরা বলি, জড়বাদের মধ্যেও একটা সত্য, গভীর সত্যই আছে, কার্য্যতঃ সেটিকে যতই বিকৃত করিয়া ফেলা হউক না কেন। ফলতঃ অধ্যাত্মবাদী আর জড়বাদী দুইজনে হইতেছেন দুই অতিমাত্রা। প্রত্যেকেই চাহিতেছেন একটা বিশুদ্ধ অমিশ্র সত্য, সৃষ্টিকে একটিমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং ... মধ্যে ঢালিয়া সহজ সরল করিয়া ধরিতে কিন্তু সত্য জিনিষটি বড়ই মিশ্র দ্বন্দ্বপূর্ণ, সৃষ্টির রহস্য একটি কথায় ... করিয়া ফেলা যায় না। মিল একটা ... কোথাও আছে, থাকিবেই। কিন্তু ... মিল, আমাদের মনে হয়, ঐক্যে ততখানি নাই, যতখানি আছে সামঞ্জস্যে।

জড়বাদীর ভুল এইখানে যে মানুষকে তিনি কেবল জড় বা জড়ের দাস বলিয়া দেখিতেছেন। অধ্যাত্মবাদী এই ভুলটি সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, মানুষের উপর জড়ের বাহির-প্রভাব যতই থাকুক না কেন, আপাততঃ এটিকে যতই অবাধ অটুট মনে হউক না কেন, ইহারই মধ্যে, এই ... তমিস্রা ভেদিয়াই খেলিয়া উঠিতেছে ভিতরের আত্মার বিজলী চমক। জড়ের সহায়ে ... এই ভিতরের আলো'কেই আশ্রয় করিয়া— তাহা যতই ক্ষণিক যতই চঞ্চল হউক না— ইহারই ধ্যান করিতে হইবে, একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, ক্রমে ইহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা যদি পারি তবে জড়ের জড়ত্ব সহজেই দূর হইতে থাকিবে, আপনা হইতেই নবরূপে গঠিত হইতে থাকিবে। অথবা বেদ যেমন বলিতেছেন, পৃথিবী মানুষের মাতা বটে, কিন্তু তাহার পিতা হইতেছে স্বর্গ—সন্তানের উপর মাতার যতই দাবী থাকুক না, পিতার দাবীও যে আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না, শুধু তাহাই নয় একদিক দিয়া দেখিলে, মাতা অপেক্ষা পিতার দাবীই বেশী। এ সব কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু

অধ্যাত্মবাদীর ভুল এইখানে যে পিতার অধিকার সাব্যস্ত করিতে গিয়া, মাতার অধিকারকে অবশেষে তিনি অস্বীকার করিয়া ফেলিতেছেন। ভিতরকে, উপরকে, আত্মাকে ধরিতে হইবে, সেখান হইতেই নামিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতেছে না, ততক্ষণ বাহিরটা, নীচটা, দেহটাকে লইয়া কি করিতে হইবে? পারমার্থিক সত্য-হিসাবে যাহাই হউক, ব্যবহার-হিসাবে পৃথিবীর দিকেই মানুষের টান বেশী। তাহার অন্তরাত্মায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বর্গের দ্যুতি ফুটিয়া উঠিলেও সমস্ত দিনটিই যে তাহাকে পার্থিব জাল-জঞ্জালের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়! তবে কি স্বর্গের উপলব্ধিটুকুকেই কেবল আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে, আর পৃথিবীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, 'মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে? না, চক্ষু বন্ধ করিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইবে? অধ্যাত্মবাদী ফলতঃ তাহাই করিতে বলেন।

আমরা বলি ইহারও প্রয়োজন নাই। মানুষের উপর এতখানি জোর-জবরদস্তি সহিবে না। আর মাতা পৃথিবীও তাহা মানিবেন না। মানুষ যদি কেবল দেবতাই হইবে, তাহার যদি থাকিত শুধু আত্মা তবে অবশ্য কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সে যে অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্য, আত্মা ও দেহ এক সঙ্গে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পথ, জ্ঞানীরও পথ হইতেছে যুগপৎ পৃথিবী ও স্বর্গের সেবা করা, আত্মার ও দেহের তৃপ্তিসাধন করা—একসাথেই ভিতর ও বাহিরকে, উপর ও নীচকে গড়িয়া তুলা। ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিতেছে, অধ্যাত্মবাদীর এই মহান সত্য হইতে মহত্তর—বৃহত্তর সত্য হইতেছে ভিতর ও বাহির একসঙ্গেই সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে, উভয়েরই মধ্যে উভয়কেই ঘিরিয়া রহিয়াছে যে একটা পূর্ণ অখণ্ড সমগ্র কিছু তাহারই প্রেরণায়। আত্মা শরীরকে গড়িয়াছে, এ সত্য হইতে গভীরতর সত্য হইতেছে আত্মা ও শরীর দুইটিই আর একটি তৃতীয় জিনিষের বিভূতি যাহা 'পূর্ণস্যপূর্ণং' —গীতা যাহার নাম দিয়াছে 'পুরুষোত্তম', বেদ যাহাকে বলিয়াছে পিতার পিতা পিতৃষ্পিতা। কারণ, এমন কাল যেমন ছিল না, থাকিতে পারে না যখন শুধু শরীরকেই পাই, আত্মার অস্তিত্ব কিছু পাই না, সেই রকম এমন কালও নাই, থাকিবে না যখন দেখি আছে আত্মা, শরীর নাই। শরীর যেমন পরে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে আত্মাকে গড়িয়া তুলে নাই, আত্মাও তেমনি পরে শূন্য হইতে শরীরকে গড়িয়া ধরে নাই। এক অখণ্ড সত্তায় পরস্পর পরস্পরের সহিত বিধৃত, সৃষ্টির এক অখণ্ড আবেগ উভয়কে নিত্য প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

তাই বলিয়া ঐ দুএর মধ্যে যে পার্থক্য নাই তাহা নয়। পার্থক্য আছে, কিন্তু এ পার্থক্য অর্থে এমন নয় যে উভয়ে একান্ত বিসম্বাদী, উভয়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এক সঙ্গে তাহারা থাকিতে পারে না। পার্থক্য এই যে একটির মধ্যে মৌলিক বস্তুটির যতখানি জাগ্রৎ প্রকাশ হইয়াছে আর একটির তাহা হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র। কিন্তু তবুও উভয়ের মূল্য সমান, উভয়ের উপরই সমান জোর দিতে হইবে।

শুধু উত্তরের ধর্ম্মগত পার্থক্য অনুসারে জোরও দিতে হইবে পৃথক রকমে। ভিতরের যে জোর তাহা ভিতরেরই অর্থাৎ ভাব-গত, সেইসঙ্গে বাহিরের একটা সাধনা একটা কর্ম্ম চাই যেটা বস্তুগত। এই দুইকে সর্ব্বদা মিলাইয়া ধরিয়া চলিতে হইবে, দেখিতে হইবে ভিতরটি কতখানি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে বাহিরে, বাহিরের মধ্যে কতখানি ফুটিয়া উঠিতেছে ভিতরের প্রভা।

সুতরাং যখন বলি যাও ভিতরে দূরে অজানায় শিখর-ভাগে, তার অর্থ এমন নয় যে যতক্ষণ তাহা হইতেছে না ততক্ষণ বাহিরের কাছের জানার প্রতিষ্ঠার জিনিষ সব ভুলিয়া যাও বা অবজ্ঞা কর। তাহা নয়, খণ্ড জিনিষ স্থূল জিনিষ লইয়াই থাক; কারণ, জীবনটি এ সকলেরই সমষ্টি, কার্য্য-ক্ষেত্রে এ সকল লইয়া থাকিতে হইবে—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। কিন্তু দেখ তাহার মধ্যে বৃহতের সূক্ষ্মের প্রভাব জাগিয়া উঠিতেছে কি না; তাহারা ইহাদেরই বিরোধী হইতেছে কি না। অন্তরের সাধনা বড় কিন্তু তাহার যেন গতি হয় বাহিরের দিকে; বাহিরের সাধনা কর তাহার যেন মুখ থাকে ভিতরের দিকে, এই যুগল সাধনা যুগপৎ চাই। মানুষের খণ্ডতা চায় এক সময়ে একটিকেই ধরিয়া চলিতে, কিন্তু উহারা যে কখনো একটি ছাড়া আর একটি থাকিতে পারে না, উহাদের কেহই পূর্ব্বে, কেহই পরে নয়— অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গ্রভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ণ নি চিক্যুরন্যং।

নীচ চলিয়াছে উপরের দিকে আপন স্বধর্ম্মের অটুট আবেগে, অমরের প্রতিষ্ঠা মরেরই সহিত একাধারে। অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া উহারা একসাথে চলিয়াছে দুই জনে দুই ভঙ্গিমায়। লোকে কিন্তু এটিকে জানিলে ওটিকে জানে না, আবার ওটিকে জানিলে, এটিকে জানে না।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

খেলাঘর

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—হেমন্তর কক্ষ। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে]

নীরদা। (গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন) সমস্ত দিন বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। আর কতক্ষণ এমন করে কাটবে? বড় জোর দু ঘণ্টা—! তারপর—?

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন। নীরদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

কে ও? লীলাদি? কিছু করে আসতে পারলে?

লীলাবতী। তার দেখা পেলুম না। তবে চিঠি লিখে তার টেবিলের উপর রেখে এসেচি। সে ফিরে এলেই পাবে।

নীরদা। হুঁ।

লীলাবতী। উনি বোধ হয় চিঠিখানা এখনও খোলেন নি?

নীরদা। না। ঐটুকু এখনও যা রসা। গান গেয়ে প্রথমটা ভুলিয়ে রেখে ছিলুম। তারপর ঘর থেকে বার হতেই বন্ধুরা এসে পাকড়াও করলে। তাই আর চিঠি খোলবার অবসর পান নি। তার পর এতক্ষণ ত এই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল, এখন বাইরে বসে গল্প করচেন। এইবার সকলে চলে গেলে শোবার আগেই চিঠি বার করবেন। এবার ত আর ভুলোতে পারা যাবে না। আচ্ছা দিদি, তুমি তবে এখন শীগ্‌গির খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গে। উনি হয়ত এখনি এসে পড়বেন। অদৃষ্টে আমার যা আছে, তাই হবে, আর ভাবতে পারি না। তুমি যাও।

লীলাবতী। কিন্তু আমার কথা যদি শোন ভাই, তাহলে এ সব-কথাই কিন্তু ওঁকে জানানো ভাল। তাতে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

নীরদা। (হতাশভাবে চাহিয়া) হুঁ—তা জানি।

লীলাবতী। তা হলে এ চিঠিখানার জন্য অত ব্যস্ত না হলেও চলে। কামিখ্যেকে আমি ঠিক করে নেব—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই।

নীরদা। তুমি বড় ভাল, দিদি, কিন্তু কি হবে এত কথা বলে! আমি যা করব, তা ঠিক করে নিয়েছি।

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

হেমন্ত। (লীলাবতীর প্রতি) এই যে আপনি! এতক্ষণ কোথা ছিলেন? নীরো আজ কি চমৎকারই গান শোনালে! কিন্তু আমি একাই শুনলুম, আপনি থাকলে আরও আমোদ হ'ত। আচ্ছা, আর একদিন তখন হবে। কি বল নীরো?

নীরদা। আজ আপনার জন্যেই এই আয়োজন—আপনি শুনেচেন, তাহলেই সব সার্থক হয়েচে। নীরদা, আজ তবে ভাই চল্লুম! তুমি বেশ চেপে-চুপে চলো—কোন কাজে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বুঝলে?

হেমন্ত। হ্যাঁ, ওই কথাটিই ওকে ভাল করে বলে যান ত।

লীলাবতী। আজ তবে আসি। নমস্কার।

[নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

হেমন্ত। (নীরদার পার্শ্বে বসিয়া) আজ সমস্ত দিন তোমার ভারী খাটুনি গেচে।

নীরদা। নাঃ, তেমন আর কি!

হেমন্ত। বড্ড ঘুম পাচ্ছে বোধ হয়?

নীরদা। মোটে না। বরং আরও ফুর্ত্তি বোধ হচ্চে। তোমাকেই বরং শুক্‌নো দেখাচ্চে—আর দুটো গান শুনবে?

হেমন্ত। সুধায় কার অরুচি, বল? তবে আজ থাক্। তুমি ঘুমোও।

নীরদা। হ্যাঁ, সত্যি আমার বড্ড ঘুম পাচ্চে। আমি শুইগে। শোব কি, মরবো!

হেমন্ত। আমি এখনই আস্‌চি।

(উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন)

নীরদা। কোথায় যাচ্চ?

হেমন্ত। চিঠিগুলো আজ বাক্স থেকে মোটেই বার করা হয়নি।

নীরদা। আজ রাত্রে আর নেই বা বার করলে? কাল সকালে দেখো তখন।

হেমন্ত। (চিঠির বাক্সের নিকটে গিয়া) ভয় নেই গো, তোমায় বেশীক্ষণ বিরহ-যন্ত্রণা

ভোগ করতে হবে না। এখনই আমি আসচি। কেবল শুধু চোখ বুলিয়েই রেখে দেব। —এ কি! কে তালা খুলতে গেছলো যে দেখচি!

নীরদা। সে কি?

হেমন্ত। তাইত দেখচি! এর মানেটা কি! ঝী-চাকর অবিশ্যি কেউ সাহস পাবে না।—এই যে একটা চুলের কাঁটা পড়ে রয়েচে। এটা ত দেখ্‌চি, তোমারি মাথার কাঁটা,—না? দেখ দেখি!

নীরদা। (ব্যস্তভাবে) সত্যি নাকি? তাহলে ছেলেরা কেউ নাড়াচাড়া করছিল না ত?

হেমন্ত। ছেলেরা? তাদের ধম্‌কে দিও —আর কখনো না করে। যাক্‌,—তালা খুলে ফেলেচি যা-হোক্‌ করে। ইস্‌, এ-যে এককাঁড়ি চিঠি জমা হয়েচে!

নীরদা। তবে তুমি এখন তোমার চিঠি পড়গে—আমি এই শুলুম। একদিন আমার কথা রাখতে পারো না?

হেমন্ত। কতক্ষণ আর লাগবে! এই এলুম বলে।

[অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন]

নীরদা। (শয্যার উপর নিতান্ত অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়িলেন) বিদায় প্রিয়তম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—এই শেষ। একটু পরেই ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে সব ফুরিয়ে যাবে— ছেলেদের একবার শেষ দেখা দেখতে সাধ হয়, দেখে আসি—বাছারা আমার এই পাশের ঘরেই শুয়ে ঘুমুচ্চে। আহা, কিছু জানে না তারা, যাই একবার। (উঠিলেন) না,—ওদের ছোঁব না—বাছাদের সর্ব্বনাশ করব না—ছুঁত্‌ লেগে যাবে।—এতক্ষণে উনি চিঠি খুলেচেন—পড়চেন নিশ্চয়। এখনি যদি এসে পড়েন?—না, আর দেরী করা নয়!—মায়া! কিসের মায়া? (দীর্ঘনিশ্বাস) ওই যে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি না? সর্ব্বনাশ! দুম্‌ দুম্‌ করে এই দিকেই যে আস্‌চে। ওই যে এসে পড়ল বলে!—কি করি এখন?—যাই, পালাই—

[নীরদা বেগে বাহির হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হেমন্ত একখানা খোলা চিঠি হস্তে প্রবেশ করিলেন]

হেমন্ত। (কর্কশ কণ্ঠে) নীরদা—

নীরদা। ওঃ!

হেমন্ত। এ চিঠিখানা কি, জান?

নীরদা। জানি—যেতে দাও, আমায় বাইরে যেতে দাও।

হেমন্ত। (পথ রোধ করিয়া) না, দাঁড়াও। কোথায় যাবে, হতভাগিনি—

নীরদা। (বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে করিতে) আর আমায় কিন্তু বাঁচাতে পার না!

হেমন্ত। সত্যি কি এ কথা!—যা আমি এই চিঠিতে পড়চি?—কি ভয়ঙ্কর! বল, বল, না,—অসম্ভব—এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

নীরদা। হ্যাঁ সত্যি। ওগো, তোমায় যে আমি ভাল বাসতুম—জগতের সকল বিপদ তুচ্ছ করে ভালবাসতুম।

হেমন্ত। রাখ তোমার ও সব বাজে কথা।

নীরদা। সর—পথ ছাড়।

হেমন্ত। ছিঃ! এ তুমি কি করেচ?

নীরদা। দাও আমায় চলে যেতে দাও। আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে—তুমি কেন এ নিয়ে ব্যস্ত হচ্চ?

হেমন্ত। রেখে দাও ও-সব কাব্যের কথা! কোথায় যাবে তুমি? (ভিতর দিক হইতে দরজায় তালা বন্ধ করিলেন) দাঁড়াও ওখানে। এ যা তুমি করেচ তার কৈফিয়ৎ দাও।—তুমি কি করেচ, তা বুঝতে পারচ কি? বল—জবাব দাও—কি করেচ বল।

নীরদা। (শুষ্ক দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে চাহিয়া রহিলেন) হ্যাঁ পারচি—বুঝতে একটু-একটু পারচি।

হেমন্ত। (কক্ষের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে) কি ভয়ঙ্কর এ! উঃ! অ্যাদ্দিনে আমার চোখ্‌ খুললো। এই আট বছর ধরে যে আমার চিন্তায় সুখ, হৃদয়ের আনন্দ তার মনের ভিতরে এত! সে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, জালিয়াৎ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা—কি কুৎসিত! এ রকম একটা-কিছু যে ঘটবে, তা যেন আমার মন বলে দিচ্ছিল। যে বাপের মেয়ে তুমি—ব্যস্‌, চুপ করে দাঁড়াও—বাপের সব গুণগুলিই পেয়েছ! ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল না—বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না—কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, তাঁর। সে দিকে দৃষ্টি না করে আমি এখন কি সাজাটাই পেলুম। আমি তোমারই জন্যে সে সব খেয়ালও করিনি! আর তুমি এই রকমে তার শোধ দিলে?

নীরদা। ঠিক বলেছ তুমি! আমার অপরাধের সীমা নেই।

হেমন্ত। তুমি এখন আমার সুখশান্তি সব নষ্ট করে দিলে—তোমা হ'তে আমার উন্নতির পথও বন্ধ হল। কি ভয়ঙ্কর! ভাবতে গা শিউরে ওঠে। এখন আমি কিনা কামিখ্যের মত একটা ধাপ্পাবাজ জোচ্চোরের বাধ্য হয়ে-পড়লুম! সে এখন আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে করে নিতে পারে—হুকুম পর্য্যন্ত চালাতে পারে···আমার টুঁ করবার ক্ষমতাও নেই। তার হাতে আজ খেলার পুতুল আমি! আমার এই দুর্দ্দশা—এই শোচনীয় পরিণাম হল কেন, না, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন, একগুঁয়ে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বুদ্ধির জন্যে—

নীরদা। ওগো, আমি ত চলেই যাচ্চি, তবে আর তোমার এ জন্যে ভুগতে হবে কেন?

হেমন্ত। চুপ্‌, এ-সব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাইনে। তোমার বাবারও ও-ধরণের কথার পুঁজি ঢের ছিল। তুমি বলছ, চলে যাবে—কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে, শুনি?—এতটুকু লাভ নেই। যার কাছে ইচ্ছে এ কথা সে রাষ্ট্র করবে—তখন সবাই ভাববে, আমিও এর মধ্যে ছিলুম—আমারই ইঙ্গিত-মত তুমি এ কাজ করেছিলে, আর আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই আড়ালে ছিলুম! তুমি বুঝতে পারচ কি নীরদা, কি সর্ব্বনাশটাই আমার তুমি করেচ?

নীরদা। হ্যাঁ। তখন বুঝিনি যে—

হেমন্ত। শোনো, এর প্রতিবিধান করতেই হবে—আমার এ দুর্নাম কিছুতেই আমি রাষ্ট্র হ'তে দেব না। খুলে ফেল তোমার ঐ সাজ-সজ্জা—খুলে ফেল এখনই। এস, এখন একটা পরামর্শ করি। লোকটাকে যে-কোন রকমে হোক ঠাণ্ডা করতেই হবে—যত টাকা

চায় সে, দিয়ে একটা মিট্‌মাট করে ফেলতে হবেই। আর তারপর তোমায় আমায়? যেমন ছিলুম, জগতের চোখে ঠিক তেমনিই থাক্‌ব। তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে—যেমন ছিলে, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রকমে। ছেলে-মেয়েদের ছুঁতে পাবে না—তোমার কাছে তাদের রেখে আর আমার বিশ্বাস নেই। কি আপ্‌শোষ! এমন কথাও আমায় বল্‌তে হ'ল! যাকে আমি এত ভাল বাসতুম,—এখনো যাকে—না, আর না, সব ফুরিয়ে গেছে। এই মুহূর্ত্ত থেকে ভালবাসার কথা—সুখের কথা আস্‌তেই পারে না আর। কেবল কোনরকম করে বাইরের আবরণটা রাখতে হবে আর কি!

(বাহিরের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইল)

এত রাত্রে আবার কে? সেই পাজিটা নয় ত? হ'তে পারে। নীরদা, কোন জবাব দিও না—শুয়ে পড় তুমি—বলো, অসুখ করেছে।

(নীরদা কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়াই রহিলেন—হেমন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলিলেন। ঝী আসিয়া দেখা দিল)

মার চিঠি।

হেমন্ত। (ব্যস্তভাবে) দাও, আমায় দাও। যাও তুমি।

(দরজা বন্ধ করিলেন)

হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই ত! না, তুমি না—আমিই পড়ব। কি লিখেছে দেখি আবার—পাজি—বদ্‌মায়েস্!

নীরদা। তুমিই পড়।

হেমন্ত। চিঠিখানা খুল্‌তে কিন্তু হাত কাঁপ্‌চে। না জানি, আবার কি সর্ব্বনাশের কথা এতে আছে। না, তবু পড়তে হবে।

(চিঠি খুলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে চোখ বুলাইয়া লইলেন। চিঠির সঙ্গে আর একখানা কাগজ গাঁথা ছিল, সেখানার দিকে চাহিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

নীরদা। (নীরদা সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন)

হেমন্ত। না, আর একবার পড়ে দেখি—হ্যাঁ সত্যিই বটে, কাগজখানা সে ফেরত দিয়েছে—আসলখানা। আঃ, বেঁচে গেলুম—আমি—বেঁচে গেলুম—

নীরদা। আর আমি?

হেমন্ত। তুমিও অবিশ্যি। তুমি আর আমি দুজনেই বেঁচে গেলুম। এখন আর কেউ কিছু কর্‌তে পারে না। নীরদা, নীরদা—না—আগে এই লক্ষ্মীছাড়া কাগজখানাকে পুড়িয়ে ফেলি, তারপর অন্য কথা। আচ্ছা, পড়ে দেখি একবার কাগজখানা—

(কাগজখানার দিকে চাহিয়া)

না, না—ভারী কুৎসিত—ভারী বিশ্রী এ—এ আমি পড়তে পার্‌বো না—তা'হলে একটা বিশ্রী দাগ আমার মনে লেগে যাবে।

(খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া আলোয় ধরিলেন। যতক্ষণ সেটা পুড়িতে লাগিল, ততক্ষণ সেদিকে উভয়ে চাহিয়া রহিলেন)

যাক্—আর ভয় নেই। দেখ, নীরদা, ও লিখেছিল যে আজ সকাল থেকে এই ব্যাপার চল্‌চে।—আজ তাহলে সমস্ত দিন তুমি কি কষ্টই না ভোগ করেচ!

নীরদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ—

হেমন্ত। নিজের আগুনে নিজেই পুড়েচ! ভয়ঙ্কর! যাক্, এ সব কথা আর নয়। এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এখন আমরা প্রাণ খুলে আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি—আর কিসের ভয়! কি বল, নীরদা? শুন্‌চ আমার কথা? আর কোন ভয় নেই! কি?—তোমার যে এখনও ঘোর কাটেনি, দেখ্‌চি!—এ কি? অমন করে চেয়ে রইলে যে!—ও নীরো, শুন্‌চ? তোমার সব দোষ ভুলে গেছি—তোমায় আমি ক্ষমা করেচি। এখনো চেয়ে আছ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?—সত্যি নীরো, তোমায় ক্ষমা করেচি—আর কোন কথা আমার মনে নেই। আমি এখন বেশ বুঝতে পার্‌চি, আমার প্রতি ভালবাসার দরুণই তুমি এ কাজ করেছিলে।

নীরদা। সত্যিই সে কথা। তুমি বিশ্বাস করেছ? বল, সত্যি বল।

হেমন্ত। বিশ্বাস করেছি। স্ত্রীর স্বামীকে যে রকম ভালো বাসা উচিত, ঠিক সেই রকম ভালোই তুমি আমায় বাস; কেবল তোমার বুদ্ধি তত পরিষ্কার নয় বলেই এই অবিবেচনার কাজ করে ফেলেচ। কিন্তু, তাই বলে কি তুমি ভাবো যে, তোমার এই অল্প বুদ্ধির দরুণ তোমায় আমি কিছু কম ভাল বাসি? না, তা মনেও স্থান দিয়ো না। আর দেখ, আমার উপরেই তুমি এবার থেকে ষোল আনা নির্ভর করে চল। তোমার অকে-জোমি আর তোমার নির্ভরতার দরুণ আমার চোখে তাহলে তুমি আরও বেশী সুন্দর হবে। কেমন, বুঝেছ আমার কথা? রাগের ঝোঁকে যা বলে ফেলেচি, সে সব ভুলে যাও। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি তোমায় ক্ষমা করেচি, নীরো, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি, ক্ষমা করেচি।

নীরদা। তুমি মহৎ।

(ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া একটা দেরাজ খুলিলেন)

হেমন্ত। কোথায় যাচ্চ? কি করচ ওখানে?

নীরদা। (দেরাজ খুলিয়া) কাপড় নিচ্চি।

হেমন্ত। হ্যাঁ, ও কাপড় ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা হও। ভয় নেই তোমার—আমি থাকতে কিসের ভয় তোমার?

(পায়চারি করিতে লাগিলেন)

আঃ—ঘরটি কি চমৎকার ঠাণ্ডা—বাইরে কিন্তু বড্ড গরম।—মন থেকে সব কথা মুছে ফেলো, নীরো, আর কোন ভয় নেই। একটু স্থির হয়ে ঘুমোও, সকালে উঠে দেখবে, মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। যেমন আনন্দে আমাদের দিন কাটত, তেমনি আনন্দে কাটবে—আজকের এই তর্কাতর্কির কথা মনেও আসবে না। তুমি কি ভাবো, নীরো, তোমায় দুটো কড়া কথা বলেচি বলে আমার মনটা কেমন কচ্চে না? তুমি বোধ হয় জান না, নীরো, যারা খাঁটি মানুষ, তাদের মন কি রকম? স্ত্রীকে ক্ষমা করলে—তার কোন দোষ প্রাণের সহিত মার্জ্জনা করলে, স্বামীর মন কি রকম প্রফুল্ল হয়, তা তুমি

জান না, বোধ হয়। যাক্—এর পর, মনে তুমি আর এতটুকুও খোঁচ রেখো না। যখন যা হয়ে, সব আমায় নির্ভয়ে খুলে বলবে—আমার পরামর্শ-মত চলবে—এ কি! শোবে না?—এ বেশ কেন?

নীরদা। (জিনিষ-ভরা একটি ব্যাগ টেবিলের উপর রাখিয়া)। না, আজ আর শোব না। রাত্রি এখনো বেশী হয়নি। তুমি একটু বসো, কথা আছে।

হেমন্ত। কি কথা আবার!

নীরদা। ওইখানটায় বসো। একটু দেরী হবে—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হেমন্ত। (অশান্তভাবে উপবেশন করিলেন) তোমায় আমি কখনো বুঝতে পারলুম না।

নীরদা। ঠিক বলেছ। আমায় তুমি সত্যিই বুঝতে পারনি—আর আমিও দেখ্‌ছি, এদ্দিন আমিও তোমায় বুঝতে পারিনি। না, অস্থির হয়ো না। কেবল যা বলি, চুপ করে শুনে যাও। দেখ, আজ আমি আমাদের দেনা-পাওনা শেষ করতে চাই।

হেমন্ত। সে কি?

নীরদা। আমাদের আজ আট বচ্ছর বিয়ে হয়েচে, কেমন?—তোমার কি মনে হয় না, যে, এই আট বছরের ভেতর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজ এই প্রথম ঝগড়াঝাঁটি হলো?

হেমন্ত। ঝগড়াঝাঁটি আবার কিসের?

নীরদা। আজ এই এদ্দিনের ভেতর, কি তারও অনেক আগে—যবে থেকে তোমাতে-আমাতে পরিচয় হয়েচে—আমাদের দুজনের মধ্যে কখনো কোন বিষয় নি ছোট-একটা তর্কাতর্কি পর্য্যন্ত হয় নি।

হেমন্ত। সেটা কি ভাল হ'ত মনে যে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অভি আমি তোমায় জানাতুম, আর তুমি নিয়ে বৃথা মন খারাপ করতে—না তর্ক জুড়ে দিতে!

নীরদা। অভাব-অভিযোগের কথা আ আন্‌চি না। আমি বলতে চাই যে, আ এ-পর্য্যন্ত দুজনে একসঙ্গে বাস করে কো বিষয়েরই আগাগোড়া বুঝে দেখবার চেষ্টা করিনি।

হেমন্ত। তা বুঝে কি লাভ হত?

নীরদা। ঠিক বলেচ। কোন দিনই তুমি আমার কথা বোঝনি। দুজন তোমরা আমার সম্বন্ধে বরাবরই মস্ত ভুল করেচ—বাবা আর তুমি!

হেমন্ত। কি বল্লে! আমরা দু করেচি—যারা দুজন পৃথিবীতে সব-চে তোমায় ভাল বাসত!

নীরদা। (ঘাড় নাড়িয়া) আমায় তু কোন দিনই ভাল বাসনি—কেবল আমার প্রতি ভালবাসা দেখাতে মাত্র—তাতেই তোমার আনন্দ ছিল।

হেমন্ত। এ-সব কি কথা শুন্‌চি নীরো, তোমার মুখে?

নীরদা। যা শুন্‌চ, সব সত্যি—খাঁটি সত্যি। যখন বাবার কাছে থাকতুম, তিনি সব-তাতে নিজেরই মতামত বলে যেতেন। আমিও তাঁরই মতে মত দিতুম। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কিছু জানাতে গেলেই, তা তাঁর পছন্দ হ'ত না; কাজেই চুপ্ করে যেতুম।

বা আমাকে তাঁর খেলার পুতুল বলতেন। মায় নিয়ে তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই তেন,—যেমন আমিও তখন নিজের পুতুল-লি নিয়ে খেলা করতুম—তারপর যখন ধান থেকে তোমার কাছে এ বাড়ীতে লুম—

হেমন্ত। আমাদের বিয়ের কথা বল্‌চ ি?

নীরদা। হ্যাঁ—আমি বলছিলুম যে, বল হাত বদ্‌লান হলো এই আর কি! ার হাতে ছিলুম, তারপর তোমার হাতে দুম—তফাৎ কেবল এইটুকু। যাক্, খন তুমি নিজের পছন্দ-সই সকল কম ব্যবস্থা করে ফেল্লে। আমিও বাবার াছে যেমন ছিলুম, তোমার কাছে ঠিক তেমনিই রইলুম, অর্থাৎ তোমার মতেই ত দিয়ে যেতে লাগলুম। কোন বিষয়ে দুজনের মতামতের পার্থক্য হলেও বাধ্য য়ে আমায় তোমারই মতে সায় দিতে য়েছে। এই রকমে সারাটা জীবন কি ামাকে নিজের সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে লনা করে আসতে হয় নি? পিছন কিয়ে যখনি চাই, তখন কি দেখি, জান? দেখি যে তোমার সংসারে কেবল এক মুঠো পেটের ভাত আর একখানা পরবার কাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট থেকে, সামান্য একটা দাসীর মত ামাকে এতদিন কাটাতে হয়েছে,—আর তোমার মনের সঙ্গে চাতুরী করতে হয়েছে। বা আর তুমি দুজনেই আমার সম্বন্ধে ভয়ানক অন্যায়, ভয়ানক অবিচার করে চেচ—শুধু তোমাদেরই দোষে আমি জীবনে কোন কাজ করতে পারিনি। কোন কাজ করবার যোগ্যতাও আমার হয় নি!

হেমন্ত। তোমার পেটে এত! নীরদা, এ কি বলছ তুমি? তুমি কি এখানে সুখে ছিলে না?

নীরদা। একদিনের জন্যেও নয়। আমি মনে করতুম, আমি সুখী, কিন্তু সত্যি তা নয়!

হেমন্ত। সুখী ছিলে না তাহলে?

নীরদা। না। সুখ কাকে বলে?—আমোদে ছিলুম মাত্র। অনুগ্রহ তুমি আমার উপর যথেষ্টই করতে, সে কথা চিরদিন বলব। অনুগ্রহে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু আমাদের এই গেরস্থালীটা খেলাঘরের চেয়ে কি কোন বিষয়ে তফাৎ ছিল, বলতে চাও? আমি ছিলুম তোমার পুতুল-স্ত্রী—বাড়ীতে বাবার যেমন আমি খেলার পুতুল ছিলুম, ঠিক তেমনি!—আর আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট পুতুল! আমি ছেলেদের নিয়ে খেলা করলে তারা যেমন আমোদ পায়, —তুমি আমায় আদর জানালে আমিও সেই রকম আমোদ পেতুম। এই আমাদের বিবাহ—এই ছিল আমাদের সংসার!

হেমন্ত। যা তুমি বলচ, তা অনেকটা সত্যি —যদিও তুমি নিজের মতটা টেনেটুনে বাড়িয়ে বলে যাচ্ছ। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেচি। এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ সংসার অন্য রকমের হবে। খেলার সময় কেটে গেল—এইবার পড়া আরম্ভ।

নীরদা। কার পড়ার সময়?—আমার, না ছেলেদের?

হেমন্ত। ছেলেদের আর তোমারও।

নীরদা। হায়, তোমার স্ত্রী হবার উপযোগী শিক্ষা আমাকে দেবার যোগ্য পাত্র তুমি হ'তে পার না!

হেমন্ত। এই কথা তুমি বলচ!

নীরদা। আর আমি!—আমিই বা ছেলেদের লালন-পালন করবার কি শিক্ষা দেবার উপযুক্ত কি-করে হ'তে পারি?

হেমন্ত। কেন নীরদা?

নীরদা। তুমি নিজেই না এই মাত্র বলেচ—এই একটু আগে—যে, ছেলেদের আমার হাতে দিয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

হেমন্ত। রাগের মাথায় বলেচি সে কথা। ওই কথাটাই অত মনে করচ কেন, নীরদা?

নীরদা। না—, তোমার কথাই ঠিক। ও কাজের যোগ্য পাত্রী আমি নই। তার আগে অন্য কাজ আমায় করতে হবে। আমার নিজেরই প্রথমে শিক্ষার দরকার—কিন্তু তোমার দ্বারা ত সে কাজ হ'তে পারে না। সে কাজ আমি নিজে-নিজেই করব, আর এইজন্যে—কেবল এই জন্যেই—তোমার কাছ থেকে আমি এখন চলে যাচ্ছি।

হেমন্ত। (লাফাইয়া উঠিয়া) কি বল্লে?

নীরদা। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব আমি। তা নইলে নিজেকে বুঝব কেমন করে—অপরকে নিজের কথা বোঝাব কি করে? কেবল এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আর আমি থাকতে পারি না!

হেমন্ত। নীরো—

নীরদা। শোনো, এই মুহূর্ত্তে তোমার বাড়ী থেকে চল্লুম। নীলাদিদির আজকের রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারব।

হেমন্ত। তোমার এখন মতি নেই। কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না তোমায় আমি যেতে দেব না।

নীরদা। কোন ফল হবে না আমায় রুখে। আমার যা নিজস্ব, মাত্র আমি নিয়ে চল্লুম। তোমার কিছুই নিলুম না—এখনও নিলুম না পরেও নেব না।

হেমন্ত। এ কি পাগলামি করছ নীরো

নীরদা। পাগলামি নয়, এই কথা। কাল সকালে আমি নিজের বাড়ী গিয়ে উঠবো—আমার বাপের বাড়ীতে কোন কষ্ট হবে না সেখানে।

হেমন্ত। নির্ব্বোধ তুমি!

নীরদা। এবার থেকে বুদ্ধি হবে তা হলেই চোখ খুলবে। সেইজন্যে যাচ্চি।

হেমন্ত। তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে ছেলে-মেয়ে, নিজের ঘর সব ত্যাগ করে? এ কি রকম বিবেচনার কাজ, নীরদা লোকে কি বলবে, তা ভেবেচ?

নীরদা। লোকে কি বলবে, সে ভাববার আমার অবসর নেই। আমি কেবল বুঝতে পারচি যে এইটিই আমার দরকার।

হেমন্ত। অর্থাৎ সংসারে সব-চেয়ে পবিত্র, যা-কিছু ধর্ম্ম-সঙ্গত, সেই সব ত্যাগ করে তুমি যাবে নিজের স্বেচ্ছাচারিতা সার্থক করতে!

নীরদা। সব-চেয়ে পবিত্র, সব-চেয়ে ধর্ম্ম-সঙ্গত আমার কোন্ কাজ, শুনি!

হেমন্ত। তাও বলে দিতে হবে? স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য, ছেলে মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য, এই সব—

নীরদা। কিন্তু, তারই মত পবিত্র কাজ আরও আমার আছে।

হেমন্ত। কি তা শুনি।

নীরদা। আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

হেমন্ত। কিন্তু তা হলেও তুমি স্ত্রী! সন্তানের জননী! স্ত্রীর কর্ত্তব্য—জননীর কর্ত্তব্য যে সব কর্ত্তব্যের উপর।

নীরদা। এখন আর এ-সব আমি বিশ্বাস করি না—ধর্ম্ম জিনিষটাও আমি কোনদিন বুঝতে পারলুম না। সব গোল হয়ে যায়। আমি এখন কেবল এইটুকু বুঝি, যে নিজের হিতাহিত বুঝে আমি চলব—নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করব। লোকে কি বলবে বা ভাববে, সে ভাবে আমার প্রয়োজন নেই। মানুষের গড়া আইন জিনিষটাও আমি বুঝতে পারি না। আইন সম্বন্ধে আমার ধারণা যা ছিল এখন তা বদলে গেছে। মরণাপন্ন বাপের মুখ চেয়ে কাজ করবার অধিকারে কি স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবার অধিকারে যে আইন বাধা দেয়, সেটা অন্যের কাছে আইন বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়—আমি তাকে আইন বলে মানতেই পারি না।

হেমন্ত। অবুঝের মত কথা কইচ তুমি, তোমার দেখ্‌চি বুদ্ধি-ভ্রম হয়েচে।

নীরদা। এর চেয়ে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে আর কখনো কথা কই নি।

হেমন্ত। তাহলে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়েই তুমি তোমার স্বামী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, সব পরিত্যাগ করে চল্লে?

নীরদা। হ্যাঁ।

হেমন্ত। এ কথার তাহলে কেবল একটি মাত্র কৈফিয়ৎ আছে।

নীরদা। কি সে?

হেমন্ত। তুমি আর আমায় ভালবাস না?

নীরদা। না—

হেমন্ত। এই কথা তুমি আমায় বলতে পারলে, নীরদা?

নীরদা। বুক ফেটে গেল বলতে। কিন্তু কি করব, উপায় নেই। না, আমি আর তোমায় ভালবাসি না।

হেমন্ত। এইটিই তাহলে কবুল জবাব?

নীরদা। হ্যাঁ, অতি সহজ-পরিষ্কার জবাব, স্পষ্ট সত্য কথা। এইজন্যেই ত আমি এখানে আর থাকতে পারি না।

হেমন্ত। বলতে পার নীরদা, কি অপরাধ আমি করলুম যে তোমার ভালবাসা তুমি কেড়ে নিলে?

নীরদা। পারি বলতে। আজ রাত্রেই যখন এই ঘটনা ঘটল, আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম যে, সে মানুষ ত তুমি নও, যা তোমায় জেনেছিলুম, দেখেছিলুম—

হেমন্ত। বুঝলুম না তোমার কথা। স্পষ্ট করে বল।

নীরদা। এই দীর্ঘ আট বৎসরের ভিতর কখনো আমি অধীর হই নি, কারণ এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার নিত্য দেখা যায় না। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যখন এসে উপস্থিত হল, ভাবলুম, আমার ভাগ্যে এইবার হয়ত

আশ্চর্য্য কিছু ঘটে যাবে। হ'লও তাই। কামিখ্যের চিঠিখানা যখন ওখানে পড়েছিল, তা দেখে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি যে তুমি ঐ লোকটার ধম্‌কানিতে এত ভয় পাবে, তার অসঙ্গত কথাগুলোকে সত্যি বলে মনে নেবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, তুমি জোর গলায় সে লোকটাকে শুনিয়ে দেবে, "যাও তুমি, জগৎময় রাষ্ট্র করগে এই কথা"; তার পর সত্যি-সত্যি যদি সে রাষ্ট্র করে দিত, তখন—

হেমন্ত। তখন আর বাকী থাকত কি, বল? আমার স্ত্রীর দুর্নাম ত ঢাকা থাকত না।

নীরদা। যদিই সে রাষ্ট্র করে দিত, আমি ভেবেছিলুম, তুমি নিশ্চয় বুক ফুলিয়ে অগ্রসর হবে আর সমস্ত ব্যাপার নিজের ঘাড়ে নিয়ে জোর-গলায় বলবে যে তুমিই দায়ী।

হেমন্ত। নীরদা, তুমি কি তা—

নীরদা। বলতে চাও যে আমি তা করতে দিতুম না। সে কথা ঠিক। আমি কখনই তা করতে দিতুম না। কিন্তু তোমার ভাল সম্বন্ধে ধারণা এর চেয়ে আর কি বেশী আমি করতে পারতুম, বল? তোমার সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা পাছে কাজে উল্টো দাঁড়ায়, এই ভয়েই ত আমি ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বার আগেই সরে যেতে চেয়েছিলুম—কিন্তু তুমিই বাধা দিলে।

হেমন্ত। আমি তোমার জন্যে দিবারাত্র কুলির মত খাটতে পারি—তোমার দুঃখ তোমার অভাব স্বচ্ছন্দে বইতে পারি, কিন্তু নীরদা, আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিতে পারি না।

নীরদা। সেই জন্যেই ত এটাকে আমি আশ্চর্য্য ঘটনা বলচি।

হেমন্ত। তুমি কথা কইচ, নেহাৎ ছেলেমানুষের মত।

নীরদা। হ'তে পারে। কিন্তু তুমিও ঠিক সেই মানুষের মত কথা কইচ না, ত, যার কাছে আমি এতদিন আত্ম-বিক্রয় করেছিলুম? যে মুহূর্ত্তে তুমি বুঝতে পারলে যে আর তোমার কোন ভয় নেই—আমার দরুণ নয়, তোমার নিজেরই দরুণ—তখনি তুমি কথার সুর ফিরিয়ে নিলে। বুঝতে পার? আমার কথা? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আর ঠিক সেই সময়টা আমার চমক লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলুম যে এই আট বচ্ছর যার সঙ্গে আমি ঘর করেচি, এ লোক—সে নয়। কি আপ্‌শোষ! আর এই অপরিচিত লোকের জন্যেই আমি তিনটি সন্তান প্রসব করেচি। ওঃ, ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়!

হেমন্ত। বুঝলুম তোমার কথা। আমাদের দুজনের মধ্যে একদিনেই একটা মস্ত ব্যবধান এসে পড়েচে, কিন্তু সেটা কি দূর করা যায় না, নীরদা?

নীরদা। আমায় এখন যা দেখচ, আমি আর তোমার স্ত্রী নই!

হেমন্ত। তুমি চলে যাবে?

নীরদা। নিশ্চয়।

হেমন্ত। যাবে, যেয়ো, কিন্তু এখন না। রাত্রিটা এখানে থাকো।

নীরদা। (একখানা চাদর গায়ে জড়াইতে জড়াইতে) পরের বাড়ীতে আমি রাত্রি বাস করতে পারি না। চল্লুম তবে। বিদায়। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে না। আমি আর তাদের কি কাজে লাগব! তারা ভাল জায়গাতেই রইল।

হেমন্ত। যেখানেই যাও, তুমি আমারই স্ত্রী, এ কথা মনে রেখো। এও তোমারই বাড়ী—সে বাড়ীও তোমার।

নীরদা। জগতের চোখে হ'তে পারে, কিন্তু তোমার-আমার চোখে নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রইল না।

হেমন্ত। আমাদের কথা তাহলে তোমার মনেও হবে না?

নীরদা। তা হবে। এই বাড়ীর কথা, তোমার কথা, ছেলেদের কথা সর্ব্বদাই আমার মনে পড়বে।

হেমন্ত। চিঠি-পত্র লিখবে?

নীরদা। না—তুমিও লিখো না।

হেমন্ত। দরকার পড়লে টাকাকড়ি নিতে আপত্তি আছে?

নীরদা। যে পর, তার কাছ থেকে এক পয়সাও নেওয়া দোষের। তোমার কোন জিনিষ আমি নিয়ে গেলুম না। যা নিয়েচি, তা আমার নিজের। (ব্যাগটি হাতে লইয়া) তবে আমি চল্লুম।

হেমন্ত। তা হলে এখন থেকে আমি তোমার কাছে কেবল পরই থাকব? আপনার কি কখনো হব না, নীরদা?

নীরদা। (দরজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে যাবে তা'হলে—

হেমন্ত। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, নীরদা?

নীরদা। তুমি আর আমি—দুজনেই আমরা এতদূর বদ্‌লে যাব যে—না, না,—তা হয় না—আশ্চর্য্য বলে জগতে কিছু আছে, তা আর মোটেই আমি বিশ্বাস করি না।

হেমন্ত। কিন্তু আমি করি। বল, বল নীরদা,—দুজনেই আমরা এতদূর বদলে যাব যে—?

নীরদা। যে, আমাদের সত্যিকার বিবাহ হবে, আর আমরা আবার একত্র হব! বিদায় তবে।

(দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

হেমন্ত। (কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর বাহিরের দিকে চাহিলেন) নীরদা! নীরদা! চলে গেল—সত্যিই চলে গেল! কি ভয়ঙ্কর!

যবনিকা

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

আধুনিক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

(উপসংহার—ফরাসী হইতে)

পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে ভারতের নৈতিক সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—উহার সমস্তই একটা বিষম গর্ভযন্ত্রণা, একটা বিশৃঙ্খল গোলমেলে ব্যাপার।

ত্রিশকোটি মনুষ্য। সকল জাতের লোক। সকল ধর্ম্মমত, সকল রকমের ধর্ম্মভাব। জীর্ণকায় শুষ্কচর্ম্ম যোগী স্বপ্নজগতের বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া যে যোগানন্দে নিমগ্ন থাকেন সেই যোগানন্দ হইতে পজিটিভিজম পর্য্যন্ত সমস্তই উহার অন্তর্ভূত। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গঠন; আদিমকালের শাখাবংশ, গোত্র, বর্ণ, বহুপতি-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবারতন্ত্র, কুলপতি-পদ্ধতিমূলক পরিবারতন্ত্র, অবিভাজ্য সত্বাধিকারমূলক পরিবারতন্ত্র, য়ুরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্র। আইন-কানুন, লৌকিক প্রথা, উপস্থিত মতো সদ্যসাধিত সমাজ-সংস্কার। বৈদেশিক অভিভাবক ও শিক্ষকের শিক্ষাধীনে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রতন্ত্র। অতীতের প্রতি অনুরাগ, অতীতের প্রতি বিদ্বেষ, বিদেশীর প্রতি ঘৃণা, বিদেশীর প্রতি অন্ধ ভক্তি। বিভিন্ন দেশ আছে, মাতৃদেশ নাই। নাই সেই জলন্ত বিশ্বজয়ী দেশানুরাগ। আছে দেশানুরাগের ছায়ামাত্র।

কিন্তু আমরা যদি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখি ত দেখিতে পাইব, এই গোলমাল ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতা কার্য্যকারণের অকাট্য নিয়মে দিন দিন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং স্বকীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতেছে। অন্য প্রমাণের মধ্যে ইহা কি আর একটি প্রমাণ নহে যে, জাতি ও জলবায়ু-ঘটিত বিবিধ গৌণ পার্থক্য সত্ত্বেও মানব-সভ্যতা একটিমাত্র এবং সেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ নিয়তির ন্যায় অনিবার্য্য?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলের আল্পনা

এগারো

চাঁদের আলোয় পাপিয়ার প্রাণে কবিত্ব জাগিয়াছে—তাহার সপ্তস্বরের লহরে-লহরে আজ রাতে তাই আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে।

একখানা ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসিয়া ইন্দুলেখা একমনে পাপিয়ার সেই সুখের গান শুনিতেছিল।

জয়ন্ত নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গায়ের উপর ছায়া পড়িতেই ইন্দু বলিয়া উঠিল, "জয়ন্তবাবু বুঝি? আজ সারাদিন

পাপিয়াকে একবারও দেখতে পাই-নি কেন? ...চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ুন। ...ন, পাপিয়া কেমন গান গাইছে! আচ্ছা ...ন্তবাবু, পাপিয়ার গলার ষড়জ থেকে ...ার পর্য্যন্ত সব স্বরগুলোই বেরোয়—না? ...ন না, ওর ডাক্ কি ঠিক এম্‌নি নয়?" ...লিয়া ইন্দু সারেগামার পাপিয়ার নকল ...তে লাগিল,—'সা—আ, রে-এ, গা—আ, ...—আ'—প্রভৃতি!

জয়ন্ত জবাব দিল না!

ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া একবার এদিকে ...বার-একবার ওদিকে ঘাড় কাৎ করিয়া ...য়ন্তকে দেখিয়া বলিল, "উঃ! আজ ...ন দেখ্‌চি জয়ন্তবাবুর মুখ 'মেঘনাদ-বধ' ...ব্যের চেয়েও গম্ভীর! ব্যাপার কি,— ...খাও কবেন না বস্‌বেনও না, এ কেমন ...য়া!"

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে একখানা চেয়ার ...নিয়া লইয়া চাঁদের দিকে পিছন ফিরিয়া ...সিল। তারপর সঙ্কুচিত স্বরে কহিল, "ইন্দু, ...তোমার হাসি-ঠাট্টা আজ ভালো লাগছে না।"

ইন্দু ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া সেই অল্প-আঁধারে জয়ন্তের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি হয়েছে জয়ন্তবাবু?"

কোনরকম ভূমিকা না-করিয়া জয়ন্ত একেবারে বলিয়া ফেলিল, "দেশ থেকে আমার মা লিখেছেন, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে ত্যজ্যপুত্র হব।"

জয়ন্তের অগোচরে ইন্দুলেখার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মাথা হেঁট্ করিয়া সেই চাঁদের আলোয় আপন ছায়ার দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "আমার অবস্থা ত বুঝ্‌ছ ইন্দু, তোমাকে যদি বিয়ে করি তাহলে আমাকে খেটে খেতে হবে। এমন গরিবকে তুমি—"

ইন্দু বুঝিল, জয়ন্তের কথার শেষটা কি। হঠাৎ মাথা তুলিয়া সে কহিল, "থাক্, আর বল্‌বেন না। আমাকে কি আপনি এতই নীচ মনে করেন?"

যে দুর্ভাবনাটা এতক্ষণ শক্ত দড়ির মত জয়ন্তের মনটাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দুর এই এক উত্তরেই সে বাঁধনটা ছিঁড়িয়া গেল। হাঁপ ছাড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "ইন্দু, ইন্দু, আমি ত্যজ্যপুত্র হ'লেও তুমি আমাকে—"

খুব মৃদু স্বরে ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্ত নন্দিত কণ্ঠে বলিল, "তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তোমার পাশ থেকে আমি এক-পাও নড়্‌ব না!"

ভরা-পূর্ণিমার চাঁদ তখন ইন্দুর মুখের উপরে পরিপূর্ণ লাবণ্যের ধারা ঢালিয়া দিতেছে—তাহার মুখের রঙের সঙ্গে জ্যোৎস্নার রং যেন এক-হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত বিভোর হইয়া সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে নির্নিমেষ-নেত্রে। ইন্দুর মুখেও আর কথা ফুটিল না।

এরই মধ্যে জগৎবাবু যে কখন্ সেখানে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাহা টের পায় নাই!

স্নেহভরে খানিকক্ষণ দুজনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জগৎবাবু শেষটা হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দু, জয়ন্ত, তোমরা কি আজকাল

বসে-বসেই ঘুমবার অভ্যাস করেছ? এ অভ্যাস ভালো নয় গো ভালো নয়, কারণ পাশ ফির্‌তে গেলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা!"

তখন তাদের সাড় হইল,—দুজনেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু বলিলেন, "তোমাদের ঘুমের মাঝখানে আমি একটা মস্ত দুঃস্বপ্নের মত এসে পড়লুম,—নয়?"

জয়ন্ত লজ্জিত ভাবে বলিল, "আপনি এসেছেন আমরা জান্‌তে পারি-নি, ক্ষমা কর্‌বেন।"

—"এতে ক্ষমা করবার কিছু নেই জয়ন্ত! তোমাদের এযে জেগে ঘুমবারই বয়স! যৌবন হচ্ছে একটা দীর্ঘ নিদ্রা—এর স্বপ্ন হচ্ছে চাঁদের আলো, পাখীর গান, ফুলের গন্ধ! যতদিন পার সুখে ঘুমিয়ে নাও—কারণ এমন দিন আস্‌বে যেদিন সংসারের বিষাক্ত দংশনে আচম্বিতে এ নিদ্রা টুটে যাবে, তখন চারিধারে চেয়ে দেখ্‌তে পাবে সুধু ধূ-ধূ কর্‌ছে তপ্ত মরু! সেখানে ভয়ে পাখী ডাকে না, ফুল ফোটে না, জ্যোৎস্নার রস শুকিয়ে যায়! জয়ন্ত, জীবন বড় ছোট—যৌবন আরো ক্ষণিক!"—বলিয়া, জগৎবাবু ইন্দুর পাশে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।..... ইন্দু তাহার পিতার একখানি হাত লইয়া আঙুলগুলি আস্তে-আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকার পর জয়ন্ত বলিল, "জগৎবাবু, আপনার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে।"

জগৎবাবু জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, তোমরা একালের যুবক, হ'লে কি আমাদের যখন বয়স ছিল তখন দরকারি কথা কাকে বলে আমরা তা জান্‌তুমই না এমন-কি বাজে কাজ আর বাজে কথা এত-বেশী ভালোবাসতুম যে, কর্ত্তাদের আমাদের ভবিষ্যতে অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখ্‌তে পেতেন না! তোমার 'বিশেষ দরকারি কথা' শোনবার এখন আমার একটুও আগ্রহ নেই, এ পূর্ণিমাকে তুমি 'দরকারি কথা'র খোঁচা হত্যা কোরো না এই আমার অনুরোধ!"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি যদি এখন একটি গা গাও, তাহলে তোমার 'বিশেষ দরকারি কথা'র চেয়ে সেটা আমি বেশী মন দি শুন্‌ব।"

—"জগৎবাবু, আমি কর্ত্তব্যের অনু আপনাকে এতটা বিরক্ত কর্‌ছি।"

—"তুমি জ্বালালে দেখ্‌ছি! নাও ব নাও, এই আমি কাণ খাড়া করে র —তাড়াতাড়ি তোমার কর্ত্তব্যপালন ক নাও!"

—"আমার মা চিঠি লিখেছেন, আ যদি আপনার মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ তাঁর বিষয়-সম্পত্তির কিছুই আমি পাব না।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগৎ বাবু বলিলেন, "সে কি! এ বিবাহে কি তাঁর মত্ নেই?

—"না।"

জগৎবাবুর সমস্ত অবহেলার ভাব চুটি গেল। ভালো করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "কেন?"

...ক কিছুই লুকাইল না—একে-একে ...কথা খুলিয়া বলিল।

...জগৎবাবু অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে স্তব্ধ ...য়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরেধীরে ...লেন, "তুমি এখন কি কর্‌বে বলে ঠিক ...রছ?"

—"মায়ের কথা মত কাজ-করা আমার ...কে এখন অসম্ভব।"

—"কিন্তু আমি হ'লে এখানে মায়ের ...-মতই কাজ কর্‌তুম।"

—"বিষয়-সম্পত্তি কি এতই বড়!"

—"না, কর্ত্তব্যের জন্যে।"

—"কিন্তু তাতে কি কর্ত্তব্যপালন হবে ...গৎবাবু? আমি যদি এখন গৌরীকে ...বাহ করি, তাহলে অমিও সুখী হব না—সেও নয়!"

জগৎবাবু কোন সাড়া দিলেন না, আবার ...াবিতে লাগিলেন। এমন সমস্যায় তিনি ...র কখনো পড়েন নাই!

...খানিক পরে বলিলেন, "আমি যদি এখন ...তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ না দি, ...তাহলে তুমি ত মার কাছেই ফিরে যাবে?"

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

জয়ন্তের মুখের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া জগৎবাবু বুঝিলেন, এ-কথা তার খাঁটি প্রাণের কথা। ইন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে তখন তাঁহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বারান্দার রেলিংএ ভর্ দিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

জগৎবাবু বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার বোধ হয় তোমার মা এতটা কঠিন হ'তে পার্‌বেন না যে, সত্যসত্যই তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। হয়ত দুদিন পরে তাঁর রাগ পড়ে যাবে, তখন তোমার অবস্থা বুঝে তিনি তোমাকে ক্ষমা কর্‌তেও পারেন। সে যাই হোক্—তুমি বিষয় পাও আর না-পাও, আমি তোমার হাতেই ইন্দুকে সঁপে দেব। কারণ, তা ছাড়া আর উপায় নেই, আমার মেয়ের মন ত আমি জানি—সে যে তোমাকে বড় বেশী আপন বলে ভাবে! ওর চোখের জল আমি ত সইতে পার্‌ব না!"

জয়ন্তের মনে শেষ যে খট্‌কাটুকু লাগিয়া ছিল, এতক্ষণে তাও ঘুচিয়া গেল।

চেয়ারের উপরে আবার আড় হইয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আঃ!... ...দ্যাখ জয়ন্ত, এমন যে মূর্ত্তিমান কবিতার মত সুন্দর জ্যোৎস্না, তোমার দরকারি কথার দৌরাত্ম্যে তার অনেকখানি বাজেখরচ হয়ে গেল! সৌন্দর্য্যের অপচয়কে আমি একটা বড় পাপ বলে মনে করি। নাও, শীগ্‌গির একটা গান গেয়ে তোমার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত কর!"

জয়ন্ত গান ধরিল—জগৎবাবু ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিতে লাগিলেন। এবং খানিকপরে ঘাড়-নাড়া বন্ধ করিয়া বেমালুম ঘুমাইয়া পড়িলেন!

বারো

অন্নপূর্ণা অনেকদিন হইতে বুকের ব্যামোয় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার এ অসুখটা মাঝে-মাঝে বেশ আরাম হইয়া যায়, মাঝে-মাঝে আবার চাগাড় দিয়া উঠে। অন্নপূর্ণা যখন-তখন তাই হাসিয়া বলিতেন, "আমার দেহে জীবন আর মরণ দু-ভায়ের মতন

একসঙ্গে বাস করছে। ভায়ে ভায়ে যেদিন আর বনিবনাও হবে না, সেদিন আমার এই দেহ-ঘর ভেঙে যাবেই যাবে!"

সংপ্রতি অসুখটার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

দুপুরবেলায় অন্নপূর্ণা শুইয়াছিলেন; পাশে বসিয়া গৌরী শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেছিল। এমনসময় তাঁহার নামে একখানা চিঠি আসিল।

অন্নপূর্ণা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ের চিঠি?"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অন্নপূর্ণা ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া গৌরীর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

জয়ন্ত লিখিয়াছে :—

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলুম। কিন্তু মা, আপনি এত-বেশী রাগ করেছেন যে, আপনাদের কুশল-সংবাদ কিছুই দেন-নি; এমন-কি আমাকে আশীর্ব্বাদ করতেও ভুলে গেছেন। এথেকে আমি বুঝতে পারছি, আমি এখনি আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি; এর পর আপনার বিষয় থেকে আমাকে যদি বঞ্চিত করেন, তবে সে আঘাতটা আমার বুকে এর-চেয়ে বেশী নিদারুণ হয়ে বাজবে না।

জান্‌বেন, আমি যে সঙ্কল্প করেছি,—সে সঙ্কল্প এখনো ত্যাগ করি-নি; আপনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন শুনে আমার সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়েছে।

আপনার রক্ত আমার গায়ে নেই বলে আপনি আমার রক্তের দোষ দিয়েছেন। দোষ-গুণ জানিনা, কিন্তু আজ আমার [illegible] হচ্ছে, আপনার রক্ত যদি সত্যই আ[illegible] গায়ে থাকত, আমি যদি আপনার [illegible] ছেলে হতুম তবে ত্যজ্যপুত্রের [illegible] নিশ্চয় আপনি মুখের আগেও আ[illegible] পারতেন না! কিন্তু আমার সঙ্গে ত আপ[illegible] শোণিত-সম্পর্ক নেই,—আমার মা যে আ[illegible] পরলোকে।

গৌরীকে বল্‌বেন, তাকে আমি চির[illegible] বোনের মতই ভালোবাস্‌ব। আপ[illegible] সম্পত্তি পেয়ে সে যেন আমার অভাব ভু[illegible] আর কারুকে বিবাহ করে' সুখে-শান্তি[illegible] থাকতে পারে; এই আমার প্রার্থনা।

আশা করি, সবাই ভালো আছে[illegible] আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

জয়ন্ত

জয়ন্তের পত্র হাতে করিয়া অন্ন[illegible] অচল-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন—বসি[illegible] রহিলেন। ডাক্তারের অস্ত্রাঘাতে রো[illegible] পা-দুটো যখন ছিন্ন হইয়া যায়, রোগী যে[illegible] তখনো ব্যাপারটা বুঝিয়াও সহজে বি[illegible] করিতে চায় না যে, তাহার পা আর নাই[illegible] তার দেহ এখন একটা অচল মাংসপিণ্ড মা[illegible] অন্নপূর্ণার অবস্থাও এখন অনেকটা সে[illegible] রকমের! জীবনহীন শবের মত তাঁহা[illegible] মুখখানা বুকের উপরে এলাইয়া পড়িল এ[illegible] সে মুখের দিকে চাহিয়া, পত্রের মর্ম্ম বুঝি[illegible] গৌরীর আর বিলম্ব হইল না। দুইহাতে[illegible] মাটি আঁকড়াইয়া হেঁটমুখে সে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙিয়া অন্নপূর্ণা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "জয়ের মুখ থেকে আজ আমাকে এতবড় কথাটা শুনতে

হ'ল! সে ভেবেচিন্তে পেটে ধর্‌লে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র করতে পার্‌তুম না! হা ভগবান, এতদিনেও সে আমাকে চেনেনি, এখনো সে আমাকে বিমাতা বলে সন্দেহ করে! জয়, ওরে জয়, ছেলেরা যখন বড় হয় তখন এম্‌নি করে'ই কি মাকে ভুলে যায় রে!"—অন্নপূর্ণার চোখের পাতা প্রাণের কান্নায় ভিজিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "নারাণদাসী!"

বাহির হইতে ঝী সাড়া দিল, "ক্যানো মা!"

—"দেওয়ান-মশাইকে ডেকে আন্।"

খানিক পরেই দেওয়ান কালীশঙ্কর লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ ও গলা খক্‌খক্‌ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। অন্নপূর্ণা বধূবেশে যখন এ বাড়ীতে প্রথম আসেন, তখন হইতেই তিনি এই সাম্‌নের-দিকে-ঝুঁকে-পড়া থুত্‌থুড়ো বুড়ো দেওয়ানটিকে ঠিক এম্‌নি ভাবেই দেখিতেছেন। কালীশঙ্করকে কেউ বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "জমিদারীর হিসাব-নিকাশ করে' এমন সময় পাই না যে, নিজের বয়সের জমাখরচ রাখতে পারি!"—চুলের সঙ্গে কালীশঙ্করের বুদ্ধিটিও এমন পাকিয়া উঠিয়াছে যে, জমিদারীর সমস্ত ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিয়া অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। দেওয়ান-মশাইকে এ-বাড়ীর বৌ-ঝী কেউই লজ্জা করে না, তাই বাড়ীর যেখানে-সেখানে যখন-তখন তাঁহার পাকা বাঁশের লাঠির ঠক্‌ঠকানি এবং সর্দ্দিভরা গলার খক্‌খকানি শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেকগুলো সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া কালীশঙ্কর কিঞ্চিৎ হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বুকে হাত দিয়া খানিকক্ষণ হাঁপ্‌ ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "হঠাৎ ডাক্‌ পড়্‌ল কেন মা, তোমার অসুখ কি বেড়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না। জয়ের চিঠি এসেছে।"

ঘরের মেঝের উপরে হাতের ভর্‌ রাখিয়া বসিয়া কালীশঙ্কর বলিলেন, "খোকাবাবু কি লিখেছেন?"

—"গৌরীকে সে বিয়ে কর্‌বে না।"

কালীশঙ্কর খক্‌খক্‌ করিয়া কাশিতে কাশিতে গৌরীর দিকে করুণ চোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন; সে বেচারী তখন আড়ষ্ট-ভাবে বসিয়া-বসিয়া ক্রমেই ঘামিয়া উঠিতেছে!

কালীশঙ্কর হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এবারেও সেই এক কথা! তাঁর মাথায় এমন কুবুদ্ধি কে দিচ্ছে? কি বল মা, একবার কল্‌কাতায় যাব নাকি? তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি, যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি!"

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না, আমি উইল কর্‌ব—তারই বন্দোবস্ত দেখুন।"

কালীশঙ্কর ভয়ে-ভয়ে অন্নপূর্ণার পাথরের মত কঠিন মুখের পানে তাকাইয়া খক্‌খক্‌ করিয়া কাশিতে লাগিলেন। উইলে কি থাকিবে তিনি তা জানিতেন।

সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "একবার কল্‌কাতায় গেলে দোষ কি?"

অন্নপূর্ণা কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না—অল্পবয়স হইতে কর্ত্তৃত্ব করিয়া করিয়া তাঁহার এম্‌নি স্বভাব হইয়া গিয়াছিল

যে, তাঁহার কথার উপরে কেউ কথা কহিলেই তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেন। কালীশঙ্করের কথায় তাই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না! জয়কে আমার চেয়ে আপনি কি বেশী জানেন? সে যা ধরেছে তা কর্‌বেই!"

কালীশঙ্কর অত্যন্ত দমিয়া গিয়া মুখে হাত-চাপা দিয়া আবার কাশি সুরু করিলেন। তারপর ভয়ে-ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "এ বাড়ীর বংশধর হয়ে শেষটা কি সে পথে বস্‌বে—"

—"হ্যাঁ, আমার পেটের ছেলে হ'লে আজ তাকে একেবারেই পথে বসাতুম! বারবার আপনি এককথা বল্‌ছেন, কিন্তু জয় কি লিখেছে জানেন? লিখেছে, আমি তার বিমাতা—তাই—" রাগে দুঃখে অন্নপূর্ণার মুখে আর বাক্য সরিল না।

কালীশঙ্কর কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে ক্রমাগতই কাশিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা আপনাকে একটু সাম্‌লাইয়া আবার বলিলেন, "সে যদি আমাকে তার নিজের মা বলে ভাব্‌ত, তাহ'লে আমি তাকে আমার বিষয়ের একটা কাণাকড়িও দিতুম না। কিন্তু সে এখন আমাকে বিমাতা বলে ভাবে, তাই তাকে আমি একেবারে পথে বসাব না, গৌরীকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক বিষয় আমি তাকেই লিখে দেব। সে বুঝুক্, আপন মায়ের চেয়ে আমার মত বিমাতার দরদ কত বেশী!—যান, আপনি উইলের বন্দোবস্ত করুন-গে যান!"

কালীশঙ্কর আর কথা কহিতে ভরসা পাইলেন না; আস্তেআস্তে উঠিয়া গা ঠক্‌ঠক্ ও গলা খক্‌খক্ করিতে-করিতে বা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আজ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া গেল, তিনি আজ একেবারে তাহিত পড়িলেন; তাঁহার স্পন্দন-রোহিত চো ঠেলিয়া আজ যে সজল হাহাকার বাহির হইয়া আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তিনি তাহাকে থামাইয়া রাখিলেন।

গৌরীর দিকে ফিরিয়া ব্যথাভরা স্বরে বলিলেন, "গৌরী, মা, আমারও সত্যভঙ্গ হ'ল তোকেও সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না। জানিনে এ কার অদৃষ্টের দোষ—তোর, না আমার?"

গৌরীর পাণ্ডুর মুখ ক্রমেই নাটির দিকে নুইয়া পড়িতে লাগিল।

মমতাভরে গৌরীর মাথার উপরে এক খানি হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন, "মা, জয়কে তুই ভুলে যা! তার মন কাঁচের মত—তাতে ছায়াই পড়ে, দাগ পড়ে না; নইলে আপন হাতে যাকে মানুষ করেছি, সে আজ আমার আপন না-হয়ে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল!"

কাতর নয়নে একবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া, গৌরী আচম্বিতে মেঝের উপরে টলিয়া পড়িয়া গেল!

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি তাহার দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "নারাণদাসী, অ নারাণদাসী, শীগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে আয়—শীগ্‌গির! গৌরী অজ্ঞান হয়ে গেছে —নারাণদাসী, নারাণদাসী!"

তেরো

স্বর্ণেন্দু আজকাল জয়ন্তের সঙ্গে বড়-বেশী ঘনিষ্ঠতা সুরু করিয়াছে—সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা সব-সময়েই যখন-তখন সে জয়ন্তের বাসায় আসে-যায়, গান শোনে, গল্প করে। তাহাকে হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর এতটা পছন্দ হইল কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না-পাইয়া জয়ন্ত মনেমনে একটু আশ্চর্য্য হইত। বাস্তবিক, জয়ন্তকে দেখিলেই যে-স্বর্ণেন্দু মুখ গোম্‌ড়া করিয়া থাকিত, সেই-স্বর্ণেন্দু আজকাল তাহার সঙ্গে যেমন ঘরাজ প্রাণে মিশিতেছে সেটাকে পুরোদস্তুর মোসাহেবী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

আরো-বিচিত্র এই যে, স্বর্ণেন্দুর বেচাল দেখিলে জয়ন্ত আগেকার মতই নির্দ্দয়ভাবে তাহার প্রতি চোখাচোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে, তবু কিন্তু তাহার মুখে আহত হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

এই গেল-কাল সে এক রাজা-উজির-মারা গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, সে গল্পের নায়ক হইয়াছিলেন তাহার সেই মেজমামা! গল্পটা যখন অবাধ কল্পনার চরমে উঠিয়াছে—অর্থাৎ তাহার মেজমামার হীরা বসানো আংটি দেখিয়া বড়লাট-সাহেব যখন হাঁ-করিয়া থ হইয়া আছেন—তখন জয়ন্ত আর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না-পারিয়া দুহাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন্ স্বর্ণেন্দু-বাবু, থামুন্, থামুন্! আপনার মেজমামার বিচিত্র জীবনচরিত অনায়াসে হজম কর্‌তে পারি, আমার ধৈর্য্যের বহর তত বেশী লম্বা নয়—যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষান্ত দিন!"

স্বর্ণেন্দু তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত তাহার মেজমামার আশ্চর্য্য আংটি এবং বিস্ময়-স্তম্ভিত বড়লাট সাহেবের বর্ণনা বন্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর তাহার কুৎকুতে চোখদুটো মট্‌কাইয়া, একটা ঢোক্ গিলিয়া এবং একগাল হাসিয়া বলিল, "ও, আপনার ভালো লাগ্‌ছে না বুঝি?"

—"না। বাঙালীর রচিত জীবনচরিত আর মাসিক-পত্রের প্রবন্ধগৌরব, এ-দুটো জিনিষ জ্যান্ত মানুষের ধাতে সহ্য হওয়া অসম্ভব।"

—"হ্যাঁ, আমার মেশোমশাই—গ্যালো বছরে যিনি সি-আই-ই হয়েছেন, জানেন ত,—তিনিও বলেন মাসিকপত্রের—"

—"রক্ষা করুন স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার মেজমামার পিছনে-পিছনে যদি সি-আই-ই মেশোমশাইও এত ঘনঘন আবির্ভূত হন, তাহলে আমাদের দশা রাম-রাবণের মাঝখানে মারীচের চেয়েও ভয়ানক সাংঘাতিক হয়ে উঠবে যে!"

স্বর্ণেন্দু আর-কোন কথা কহিল না, —ফস্-করিয়া পকেট হইতে রূপার 'কেস্' বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তাহার মনের কথা তাহার মনই জানে, কিন্তু বাহিরে সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই হাসিমুখে বসিয়া রহিল।

আসল কথা, জয়ন্ত এই স্বর্ণেন্দু লোকটাকে অতিশয় ঘৃণা করিত—কারণ তাহার টাকার জাঁক যেমন বেশী, মিথ্যাকথা বলিবার শক্তিও তেম্‌নি। স্বর্ণেন্দু যাহাতে তাহার উপরে চটিয়া মেলা-মেশা বন্ধ করিয়া দেয়, জয়ন্ত সেই ফিকিরে প্রায়ই তাহাকে অপ্রস্তুত

করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত;—কিন্তু স্বর্ণেন্দুও যেন অপ্রস্তুত হইবে না বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিত! জয়ন্ত যত কড়া কথা বলে স্বর্ণেন্দুও তত মুখ টিপিয়া হাসে, এবং প্রত্যহ যথানিয়মেই আপনার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে আসিয়া বসে! আর-সকলে ভাবিত, ওঃ, এযে দেখচি যীশুখৃষ্টের মত ক্ষমাশীল এবং কম্‌লীর মত নাছোড়বান্দা!

কাল্‌কের সেই 'মেজমামার আশ্চর্য্য আংটি'র ব্যাপারের পর জয়ন্ত ভাবিয়াছিল, স্বর্ণেন্দু অন্তত আজকের দিনটা তাহার নিয়মিত হাজ্‌রিতে কামাই দিবে।

কিন্তু আজ সকালে জয়ন্ত যখন তানপুরা লইয়া গলা সাধিতেছিল তখন দ্বারপথে স্বর্ণেন্দুর হ্যাট্‌কোট্‌-পরা বকের মত কৃশ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেল।

স্বর্ণেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ডানহাতের একটা আঙুল কপালে ছুঁয়াইয়া হাস্যমুখে বলিল, "গুড্‌ মর্ণিং জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত মাথাটি নত করিয়া বলিল, "নমস্কার। স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি চলেন-বলেন সায়েবী-ধরণে অথচ আজ-পর্য্যন্ত কেতাদুরস্ত হ'তে পার্‌লেন না!"

—"কেন জয়ন্তবাবু, এমন কথা বল্‌লেন কেন?"

—"ভদ্রলোকের ঘরে ঢুক্‌লে সায়েবরা কি মাথায় টুপি পরেই ঢোকে!"

মাথা হইতে হ্যাট্‌টা তখনি খুলিয়া ফেলিয়া আধহাত জিভ্‌ বাহির করিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ঐ যাঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল মশাই, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল!"

—"ভুল ত হবেই! দেশে বসে দেশকে ভুল্‌তে চাইলে ভুল হবে না! কি সুখে আপনারা যে অমন ধড়া-চূড়ো পরেন আপনারাই তা জানেন!"

—"আর যা-বলুন তা-বলুন, কিন্তু ও-কথা বল্‌লে চল্‌বে না জয়ন্তবাবু! সায়েবী পোষাকে সুবিধে ঢের, চল্‌তে কোঁচা বাধে না, কষি খুলে যায় না, আর—আর—"

তানপুরাটা নামাইয়া রাখিয়া জয়ন্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর—আর—?"

—"আরো ঢের সুবিধে আছে—"

—"যেমন, গ্রীষ্মকালে মনে হবে টার্কিস্‌ বাথের গরম সিন্ধুকটা ঘাড়ে করে' বসে বেড়াচ্ছি, সতরঞ্চে বা ফরাসের ওপরে বস্‌তে গেলে মনে হবে যেন আমি 'গেঁটে বাতে'র আড়ষ্ট রোগী! ঐ কলার,—কুকুরের কলারের চেয়েও যা টাইট্‌ হয়ে গলায় বসে' হাঁপ ধরায়, ঐ রাতের পোষাকের প্লেট্‌-বসানো সার্ট,—দেহকে যা সর্ব্বদাই দরজার মত সটান খাড়া থাক্‌তে হুকুম দেয়, ঐ পায়ের জুতো,—নেমন্তন্নে গিয়ে যার ফিতে খুল্‌তে খুল্‌তেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যায়, এ সবও ত আপনি সুবিধে বলে মনে করেন?"

—"হ্যাঁ, একটু-আধ্‌টু অসুবিধে আছে বটে—"

—"একটু-আধ্‌টু কি, ও-পোষাকে বাঙালীর পনেরো-আনাই অসুবিধে সায়েবরা শীতের দেশে প্রাণের দায়ে অমন পোষাক পর্‌তে বাধ্য হয়েছে বৈ ত না! আমাদের এই চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়ার দেশে, পোষাক-পরিচ্ছদও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে! দেখুন, আমাদের এই কোঁচানো চাদর,—এ-যেন ভাঁজে-ভাঁজে

ছড়িয়ে-পড়া শতদল; এই গিলে-করা পাঞ্জাবীর আস্তীন,—এ-যেন ঢেউ-খেলানো নদীর মত; এই মোলায়েম কাপড়,—এ-যেন পূর্ণিমার জ্বলতা-মাখানো; এই কোঁচার রঙিন মুখ,—এ-যেন পাপ্‌ড়ি-মেলিয়ে-দেওয়া একটি ফুল! স্বর্ণেন্দুবাবু, আমাদের পোষাক দেখ্‌লে আপনার ও-সায়েব-আর্টিষ্টরাও আর্টের আদর্শ বলে মান্‌তে বাধ্য হবেন! আবার এই পোষাকে যদি বৈচিত্র্য আন্‌তে চান তাহলে নানা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পোষাকও অনায়াসে রঙে ছুপিয়ে নিতে পারেন,—বর্ষাকালে ভিজে বনের মত তাজা সবুজ রং, শরৎকালে পাকাধানের মত সোনালী রং, বসন্তকালে বাসন্তী রং, গ্রীষ্মকালে রোদে শুক্‌নো মাটির মত গেরুয়া রং, এম্‌নি যখন যেমন তখন তেমন। এ পোষাকের কাছে কোথায় লাগে আপনার ও ফড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ!"

—"ওঃ, জয়ন্তবাবু, আপনার কথাগুলো প্রায় কবিতার রগ্‌ ঘেঁষে গেছে! কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না যেন, যে, জীবনের সবটাই কবিতার মত কোমল নয়!"

জয়ন্ত সে কথা কাণে না-তুলিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, "পুরো সায়েবী পোষাক বরং সহ্য হয়, কিন্তু আমরা—বাঙালীরা যে অদ্ভুত পোষাকটাকে জাতীয় করে' তুলেছি, সেটা সূচের মত চোখকে বিঁধ্‌তে থাকে। আমরা অনেকে পায়ে পরি বস্ত বুট, তার ওপরে এদেশী কাপড়, তার ওপরে সায়েবী সার্ট বা কোট—কেউ কেউ আবার গলা-খোলা কোটের সঙ্গে নেক্‌টাই আর কলার পর্‌তেও লজ্জা পান না—তার ওপরে কোঁচান চাদর—কেউ কেউ দেখি মাথায় আবার টুপি পর্‌তেও সুরু করেছেন! কাপড়ের ওপরে সায়েবদের 'ড্রেসিং গাউন' পরে অনেককে দেমাকে বুক-ফুলিয়ে সদর রাস্তায় চরে বেড়াতেও দেখেছি! আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের যে কতটা অধঃপতন হয়েছে, আমাদের জাতীয়তা যে কত নীচে নেমে পড়েছে, আর, সেই সঙ্গে আমাদের নির্লজ্জতা যে কতটা চরমে উঠেছে, বাঙালীর এই 'ফেরঙ্গ-বঙ্গ-বেশে'র কিম্ভূতকিমাকার খিচুড়ি তার অকাট্য প্রমাণ!"

স্বর্ণেন্দু বলিল, "কিন্তু আপনি আমাকে ও-দলে ফেল্‌তে পার্‌বেন না! কাপড়ের সঙ্গে আমি কখনো সার্ট-কোট পরে পথে বেরুই-নি!"

জয়ন্ত আর-কিছু না-বলিয়া তানপুরাটি তুলিয়া লইয়া একটি ভজন ধরিল।

স্বর্ণেন্দু একপাশে বসিয়া গান শুনিতে শুনিতে মুরুব্বিআনা চালে তুড়ি মারিয়া বেতালা তাল দিতে লাগিল।

জয়ন্ত যখন থামিল, স্বর্ণেন্দু বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোফা, তোফা! আপনার গান শুন্‌লে প্রাণটা যেন মাৎ হয়ে যায়! সত্যি জয়ন্তবাবু, আপনার এই গান শুন্‌তে পাব বলেই রোজ সকালে এখানে এসে তীর্থের কাকের মত বসে থাকি!"

জয়ন্ত জানিত, কিছুদিন আগে এই স্বর্ণেন্দুর কাছেই তাহার গান ছিল অত্যন্ত অশ্রাব্য! অকস্মাৎ তাহার এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণটা বুঝিতে না-পারিয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

স্বর্ণেন্দু একখানা এসেন্সমাখা সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখের কাছে নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "অবিশ্যি এ-দেশে আপনার চেয়ে বড় আর নামজাদা গাইয়ে ঢের আছেন; কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকের গান থেকেই আমি রস পেয়েছি।"

—"ওর কারণ আছে। এদেশের অনেক গাইয়েই গানের মধ্যে সুরকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করে' তোলেন, কথাকে একেবারেই আমোল দেন না। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, কেবল সুরই যদি গানের সর্ব্বস্ব হ'ত, তাহলে কণ্ঠসঙ্গীতের কোনই সার্থকতা থাকৃত না—যন্ত্র-সঙ্গীতেই সে কাজটা ভালো করে' চল্‌তে পার্‌ত। সুরের সঙ্গে কথাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যেই যখন কণ্ঠ-সঙ্গীতের সৃষ্টি, গানে তখন সুর বা কথা—কেউই ফেলনা নয়, এ সত্য আমি কখনো ভুলি না!"

স্বর্ণেন্দু খানিকটা চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। তারপর একটা সিগারেট ধরাইয়া, জয়ন্তের মুখের দিকে না-চাহিয়াই বলিল, "আমি একটি লোককে জানি মশায়, সে যে কী চমৎকার গায়, তা আর কি বল্‌ব!"

—"কি গান তিনি?"

—"টপ্পা, খেয়াল। বড়বড় রাজা-মহারাজা তার গান শুন্‌তে লালায়িত। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনাকে একবার তাঁর গান শুনিয়ে আনি।"

—"বেশ ত!"

স্বর্ণেন্দু খুব খুসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, কালই সন্ধ্যার সময় আপনাকে আমি নিয়ে যাব।"

—"তাঁর নাম কি?"

কিন্তু স্বর্ণেন্দু বোধহয় শুনিতে পায় না; কারণ জয়ন্তের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়াই সে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

চৌদ্দ

পরদিন ঠিক্ সন্ধ্যার মুখে স্বর্ণেন্দুর গাড়ী আসিয়া জয়ন্তের বাসার সুমুখে দাঁড়াইল।

জয়ন্ত কাপড়-জামা পরিয়া তৈরি হইয়া ছিল। স্বর্ণেন্দুর সাড়া পাইয়াই উপর হইতে নামিয়া আসিল। জয়ন্তকে তুলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল।

ঘরমুখো জ্যান্তে-মরা কেরাণীর দল শশব্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া, অনেকক্ষণ রাস্তা পার হইয়া স্বর্ণেন্দুর গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটের একখানা তিনতলা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া থামিল। বাড়ীর দরজার কাছে একজন দ্বারবান বসিয়া বাঁ-হাতের চেটোর উপর ডানহাতের বুড়ো আঙুলের টিপ্‌ দিয়া 'শুকা' পিষিতেছিল, গাড়ী দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মস্ত-এক সেলাম ঠুকিল।

জয়ন্ত বাড়ীর বাহিরটার এবং দ্বারবানের দিকে একবার বিস্মিত চোখে চাহিয়া বলিল, "এই বাড়ী নাকি?"

স্বর্ণেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসি-হাসি বলিল, "হ্যাঁ।"

—"তাহলে এ গায়কটির বেশ টাকা আছে দেখ্‌ছি।"

—"রাজা-মহারাজকে গান শুনিয়ে

ছে তার আবার টাকার ভাবনা! ন নামুন,—কথাবার্ত্তা সব ভেতরে গিয়ে ..অথন।"

গাড়ী হইতে নামিয়া দুজনে বাড়ীর ভরে ঢুকিল। উঠানে একজন মুসলমান র দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাদের পথ খাইয়া উপরে লইয়া গেল।

জয়ন্ত চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ই গাইয়েটি কি মুসলমান?"

স্বর্ণেন্দু বলিল, "হ্যাঁ। বাঙালীর ভেতরে লো গাইয়ে কোথায় পাবেন?"

মুসলমান চাকরটা একটা ঘরের দরজা তে পুঁতির পরদা সরাইয়া দিল। স্বর্ণেন্দুর ছনে-পিছনে জয়ন্তও ঘরের ভিতরে প্রবেশ রিল।

স্বর্ণেন্দু একটা জান্‌লার দিকে আঙুল সিয়া বলিল, "আপনি ঐ জান্‌লাটার কাছে য়ে বসুন। বেশ হাওয়া পাবেন।"

জয়ন্ত সেইখানে গিয়া বসিয়া পড়িল। রপর ঘরের চারিদিকে কৌতূহলী চোখ াইয়া সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল।

ঘরখানি বেশ সাজানো-গুছানো। ঘরের লেটি রঙচঙে মাদুরে মোড়া, তার উপরে ক ও নরম গালিচা, তার উপরে মাপনের ক সাদা চাদর, তার উপরে কতকগুলো াটা মোটা তাকিয়া, একটা রূপার গড়্‌গড়া, পার পিক্‌দান ও পানের ডিবা। পঙ্কের াজ-করা দেওয়ালের দুদিকে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি দুখানা বড়-বড় আয়না। আয়না খানার উপরে-নীচে দুটো-করিয়া ব্রাকেট; উপরের ব্রাকেটে এক-একটি পোর্সিলেনের পুতুল এবং নীচে এক-একটি রূপার ফুল-দানীতে ফুলের তোড়া। ঘরের ছাদের মাঝখানে একটা ছোট ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড় ও পাখা। এ-সব দেখিয়া জয়ন্তের মুখের ভাব কিছু বদ্‌লাইল না,—কিন্তু দেওয়ালের ছবিগুলোর উপরে চোখ পড়িতেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিরক্তির সহিত ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার গায়কটি শুধু বিলাসী নন, তাঁর রুচিও ভারি জঘন্য ত!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "কেন?"

ছবিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জয়ন্ত বলিল, "এমন ছবি ভদ্রলোকের ঘরে থাকা উচিত নয়।"

একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া তাহার উপরে বুক রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ওঃ, তাই ও-কথা বলছেন! আর্টিষ্টদের রুচি অম্‌নি একটু তরল হয়েই থাকে!"

জয়ন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি তাহলে আর্টের কিছুই বোঝেন না। আর্ট হচ্ছে—"

স্বর্ণেন্দু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চুপ্‌, চুপ্‌! আর্টের ওপরে লেক্‌চার যা দিতে হয় বাইরে বেরিয়ে দেবেন! শুন্‌ছেন না, কে আস্‌চে!"

জয়ন্ত শুনিল, বাহির হইতে কাহার গহনার ঠুন্‌ঠুনানির সঙ্গে পায়ের চটিজুতার মৃদু আওয়াজ আসিতেছে। সে অবাক হইয়া দরজার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে তাকাইয়া রহিল।

জয়ন্তকে একেবারে

হতভম্ব করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল এক অপূর্ব্বরূপসী যুবতী—তাহার চক্ষে কটাক্ষ, ওষ্ঠে হাস্যের লীলা!

জয়ন্তের মুখের উপরে ঢুলে-পড়া তৃষা-ভরা চোখদুটি রাখিয়া যুবতী সাম্‌নে একটু হেলিয়া একটা সেলাম করিল। কিন্তু জয়ন্ত তখন এম্‌নি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল যে সেলাম ফিরাইয়া দেবার কথাটা বেবাক্ ভুলিয়া, বসিয়া রহিল ঠিক এক কাঠের পুতুলের মত!

স্বর্ণেন্দু বলিয়া উঠিল, "আরে ছুয়ো জয়ন্তবাবু, মেয়েমানুষ দেখে লজ্জা! ইনি হচ্ছেন হস্‌না-জান, আপনি যে এঁরই গান শুনতে এসেচেন!"

জয়ন্তের বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—স্বর্ণেন্দু তাহাকে বাইজীর গান শুনাইতে আনিয়াছে! স্বর্ণেন্দুর দিকে আগুনভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জয়ন্ত তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণেন্দু অর্থপূর্ণ চোখে বাইজীর দিকে চাহিয়া কি-একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, উঠ্‌লেন যে!"

দরজার দিকে আগাইতে-আগাইতে গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বলিল, "বাড়ী যাব!"

স্বর্ণেন্দু আড়্‌চোখে বাইজীকে আবার কি-একটা ইসারা করিল।

অনেকগুলো আংটি-পরা হাতখানি রং-মাখানো ঠোঁটের উপরে চাপিয়া বাঈজী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল! তারপর পরিষ্কার বাঙ্‌লায় বলিল, "বাবুসাহেব, বস্‌তে হুকুম হোক্!"

কোন জবাব না-দিয়া, বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়াই জয়ন্ত মাথা হেঁট ক[রিল]। তাহার মনে হইল, সে-দুটো চোখের [তা]রা যেন দু-দুটো অগ্নিশিখার মত তার [স]র্ব্বাঙ্গ দগ্ধাইয়া দিতেছে!

বাইজী হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া [প]রিচয় করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া গা[ঢ়] সুরে বলিয়া উঠিল—

"আজ ময়ঁ লড়ুঙ্গি
পিয়াকো বানে ন দেউঙ্গি!"

একটা গোখ্‌রো সাপ হঠাৎ [ফ]ণা জড়াইয়া ধরিলে মানুষ যেমন করে, [জ]য়ন্ত ঠিক তেম্‌নি করিয়াই বাইজীর হাতখা[না] আপন হাত হইতে সজোরে ঝাড়িয়া ফে[লি]য়া বিদ্যুতাহতের মত পিছনে হঠিয়া আসিল।

থর্‌থরে ঠোঁটদুখানি ফুলাইয়া বাঈজী অভিমানের সুরে বলিল, "বাবুসাহেব, আপ্‌কা গা বড় নরম—আপনি আমাকে [ঘৃ]ণা দিলেন!"

জয়ন্ত যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে অবশ দেহে ধুপ্‌-করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে!... ... ...

তেম্‌নি আচ্ছন্নের মত সে যে কতক্ষণ বসিয়া রহিল, তা সে জানে না! যখন ফের হুস্ হইল তখন দেখিল, এরি-[মধ্যে] কখন্ সারেঙ্গী ও তবল্‌চী আসিয়া [জু]টিয়া বাঁধিয়া সঙ্গত্ সুরু করিয়া দিয়াছে এবং সেই যুবতীটিও পায়ে ঘুঙুর পরিয়া [নৃত্য] ধরিয়াছে

"ক্যয়সে ভরুঁ ম্যয়
জল-কি গাগরিয়া!"

মনে-মনে জয়ন্ত আপনাকে ধিক্কার দি[তে]

লিল—ছিঃ ছিঃ, এ কী করিল সে! স্বর্ণেন্দুকে আগে সে দু-চোখে দেখিতে পারিত না বটে; কিন্তু লোকটা যে এত-বড় সয়তান, এমন সন্দেহ কোনদিনই করে নাই! কেন সে তাহাকে এখানে লইয়া আসিল—ইহাতে তাহার কি স্বার্থ? ... ... জয়ন্ত অনেক ভাবিয়াও কিছু বুঝিল না।

আস্তে-আস্তে সে মাথা তুলিল। বাইজীও অম্‌নি তরল চোখ ঢুলাইয়া মুখে হাসি মাখাইয়া এবং চপল চরণের সঙ্গে সমস্ত দেহখানি ঠমকে ঠমকে নাচাইয়া আবার একটা নূতন গান ধরিল:—

"হামারা যৌবন নেহি মানে পিয়া বিনা—"

পলক না-পড়িতে জয়ন্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহিরে ছুটিয়া গেল; তারপর এক-এক লাফে তিন-চারিটা সিঁড়ি পার হইয়া হুড়্‌মুড় করিয়া একেবারে সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল!

সেখান হইতে শুনিল, বাইজীর গান থামিয়া গিয়াছে এবং জান্‌লায় মুখ বাড়াইয়া স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিতেছে!

জয়ন্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরদিকে তুলিয়া পাগলের মত চেঁচাইয়া বলিল, "যেদিন ফের মাথা হবে সেদিন তুমি আর হাস্‌বার অবকাশ পাবে না—আমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতে হবে!"

উপর হইতে একজোড়া জুতো নীচে ফেলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু সকৌতুকে বলিল, "মশাই, এ জুতোজোড়া লোককে ছুঁড়ে-মারা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজেই লাগ্‌বে না,—অতএব, আপনি ত্যাগ কর্‌লেও আমরা এদের গ্রহণ কর্‌তে পারলুম না! নমস্কার মশাই, নমস্কার!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অনাদি মন্ত্র

আকাশে কি উঠে গীতি
বাতাসে কি ভাব বয়?
কি মন্ত্র অনাদি যন্ত্রে
ধ্বনিত নিখিলময়?

"ভালবাসা ভালবাসা—
বিশ্ব বাঁধা প্রেমবলে—"

নীরবে মহান্ রবে
এই কথা সবে বলে।

এ ধ্রুব পরম সত্য
খণ্ডিবারে যেবা চায়,—
সেই শুধু মিথ্যাবাদী
সেই ব্যর্থ দুনিয়ায়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

পঞ্চরাত্র

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বহুপ্রকার ভেদ নাট্যশাস্ত্র ও অলঙ্কার-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, বীথী ও ভাণ নামক দশপ্রকার দৃশ্যকাব্যভেদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) প্রধানতঃ এই দশটি রূপকের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধনঞ্জয় নিজ-রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থের "দশরূপক" সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিশ্বনাথ-রচিত সাহিত্যদর্পণে পূর্ব্বোক্ত দশ-প্রকার রূপক ব্যতীত নিম্নলিখিত উপরূপক নামক দৃশ্যকাব্যগুলির নামও দেখিতে পাওয়া যায়। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থানক, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা। এই দশপ্রকার রূপক ও অষ্টাদশ-প্রকার উপরূপকের নাম ও লক্ষণ প্রদত্ত হইলেও, ইহার সকলগুলির উদাহরণ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মহাবীর-চরিত, উত্তররাম-চরিত, বালরামায়ণ প্রভৃতি নাটক, মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি প্রকরণ, রত্নাবলী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা প্রভৃতি নাটিকা, বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটক, কর্পূরমঞ্জরী নামক গোষ্ঠী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ব্যায়োগ ও ভাণ শ্রেণীর অনেকগুলি দৃশ্যকাব্য মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু সমবকার, ঈহামৃগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক প্রভৃতির উদাহরণ অতি বিরল। সাহিত্য-দর্পণ ও দশরূপকে উদ্ধৃত কতকগুলি নাম-মাত্র এগুলির অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে।

ভাসরচিত দৃশ্যকাব্যগুলি প্রকাশিত হওয়াতে আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যভেদের উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাস মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ ও কর্ণভার নামক ব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র নামক সমবকার, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নামক ঈহামৃগ (২) ও উরুভঙ্গ নামক উৎসৃষ্টিকাঙ্ক রচনা করিয়াছেন। আজ আমরা পঞ্চরাত্র নামক সমবকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

আমরা পঞ্চরাত্র ব্যতীত এযাবৎ সমবকার-শ্রেণীর কোন দৃশ্যকাব্য প্রাপ্ত হই নাই। ধনঞ্জয়ের দশরূপকে "সমুদ্রমন্থন" ও বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণে "সমুদ্রমথন" নামক সমবকারের নাম উদাহরণরূপে প্রদত্ত

(১) "নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ॥
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্য-লক্ষণে।
এতেষাং লক্ষণমহং ব্যাখ্যাস্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥"
[নাট্য-শাস্ত্রম্, ১৮শ অধ্যায়, ২—৩ শ্লোক]

(২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ মধ্যে ইহা নাটিকা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ঈহামৃগের সমস্ত লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে ঈহামৃগ বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য।

হইয়াছে। এই দুইটি নাম একই রূপকের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নাম ভিন্ন উক্ত গ্রন্থখানির আর কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাজেই ভাসের পঞ্চরাত্র নামক নাটকখানি এই বিলুপ্তপ্রায় দৃশ্যকাব্যভেদের একমাত্র উদাহরণরূপে অতি আদরণীয়।

পঞ্চরাত্রে ভাস মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের অনুসরণ করেন নাই। কৌরব, পাণ্ডব প্রভৃতি নায়ক, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ও বিরাটের গোহরণ ঘটনা অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন কল্পনায় কথা-বস্তু গঠন করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে রাজা দুর্য্যোধনের যজ্ঞ-বর্ণনা। তিনজন ব্রাহ্মণ আসিয়া যজ্ঞের সমৃদ্ধি বর্ণনা করিতেছেন। যজ্ঞাবসানে যজ্ঞশালা অগ্নিপ্রদানে ভস্মীভূত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বালকেরা বালসুলভ চাপল্যবশতঃ যজ্ঞশালায় অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে নদীকূলে গিয়া দাহ্যবস্তুর অভাবে নির্ব্বাপিত হইল। ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। বিষ্কম্ভক এইখানেই শেষ হইল।

তাহার পর ভীম্ম ও দ্রোণ প্রবেশ করিলেন। কিছুপরে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনিও প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞাবসানে রাজগণ আসিয়া অভিবাদন করিলে দুর্য্যোধন বলিলেন, "বিরাটরাজ আসেন নাই?" শকুনি বলিলেন, "আমি দূত পাঠাইয়াছি। বোধ হয় পথে আসিতেছেন।" দুর্য্যোধন তখন দ্রোণকে যজ্ঞদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। দ্রোণ দুর্য্যোধনকে সলিলহস্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন—

"বার বৎসরের মধ্যে নিরাশ্রয় যাহা-দিগের কোথায় গতি তাহা জানি না, সেই পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্য ভাগ করিয়া লও। এই আমার ভিক্ষা—এই আমার দক্ষিণা।"(৩)

শকুনি ইহা ধর্ম্মবঞ্চনা বলিয়া দ্রোণকে অনুযোগ করিলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর শকুনি পরামর্শ দিলেন, "যদি পঞ্চরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনিতে পারেন, তাহা হইলে দুর্য্যোধন অর্দ্ধরাজ্য তাহাদের দিবেন।"

এই সময় দূত আসিয়া নিবেদন করিল কীচকবধহেতু বিষণ্ণ হওয়াতে বিরাটরাজ আসিতে পারিলেন না। কীচকবধবৃত্তান্ত শুনিয়া ভীম্ম দ্রোণকে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই ভীমের কাজ।" তখন দ্রোণ পঞ্চরাত্রের সর্ত্তেই সম্মত হইলেন। ভীম্ম তখন দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "বিরাটের সহিত আমার গুপ্ত শত্রুতা আছে। তোমার যজ্ঞে আসে নাই, এই হেতু-বশতঃ তাহার গো-গ্রহণ কর।" সকলে তখন যুদ্ধ-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম অঙ্ক এইখানেই শেষ হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে গোবালকগণ বিরাটরাজের জন্মদিনে ধেনু আনিয়া সজ্জিত

(৩) "যেষাং গতিঃ কাপি নিরাশ্রয়াণাং
সংবৎসরৈর্দ্বাদশভির্ন দৃষ্টা।
ত্বং পাণ্ডবানাং কুরু সংবিভাগম্
এষা চ ভিক্ষা মম দক্ষিণা চ॥"

করিতেছে, এমন সময় গোগুলি আক্রান্ত হইল। গোপালকগণ শরবর্ষণে ভীত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিরাটরাজের নিকট সংবাদ গেল।

বিরাট যুদ্ধযাত্রা করিবেন, এমন সময় শুনিলেন, বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তর তাঁহার রথ লইয়া নির্গত হইয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির আসিলেন। তাহার পর ভটমুখে শ্মশানের নিকট রথের গমন, যুদ্ধ ও কৌরবগণের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে যাঁহারা বীর্য্য দেখাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যুদ্ধাবসানে উত্তর পুস্তকে লিখিতেছিলেন। (৪) এটুকু আধুনিক Military Despatches স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৃহন্নলা আহূত হইলেন। এই সময় ভট আসিয়া নিবেদন করিল, অভিমন্যু কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, সে বিরাটরাজের পাচক কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়াছে। ভীম ও অভিমন্যু প্রবেশ করিলে কিছুকাল অভিমন্যুর সহিত কপট কথোপকথনের পর পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করিলেন। বিরাট অর্জ্জুনকে যুদ্ধবিজয়ের শুল্কস্বরূপ উত্তরা দান করিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন পুত্রের নিমিত্ত উত্তরা গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "আমি অন্তঃপুরস্থ রমণীগণকে মাতার ন্যায় পূজা করিয়াছি।" ভীমের নিকট উত্তরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় অঙ্কের এইখানেই সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্কে দুর্য্যোধন প্রভৃতি অভিমন্যু-উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত বাণ আসিয়া পড়িল। সেই বাণ দূতস্বরূপ উত্তর আনিল। উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহ-সংবাদ জানাইয়া দ্রোণ বলিলেন, "পঞ্চরাত্রের মধ্যেই পাণ্ডবদিগের বার্ত্তা আনিয়াছি।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ রাজ্য দিলাম। যাঁহারা সত্যপালন করেন তাঁহারা মরণের পরও জীবিত থাকেন।"

ইহার পর ভরতবাক্য উচ্চারণে যবনিকা পড়িয়াছে। দ্রোণের মুখে প্রদত্ত নিম্নলিখিত শ্লোকের শেষার্দ্ধই ভরতবাক্য :—

"হন্ত সর্ব্বে প্রসন্নাঃ স্মঃ প্রবৃদ্ধকুলসংগ্রহাঃ।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ
প্রশাস্তঃ নঃ॥"

এখন আমরা দেখিব, সমবকারের লক্ষণগুলি পঞ্চরাত্রে বিদ্যমান আছে কি না। ভরত নিজকৃত নাট্যশাস্ত্রে সমবকারের নিম্নপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"ইহার পর আমি সমবকারের লক্ষণ বলিতেছি।

দেব বা অসুর বিষয়ক ঘটনা সমবকারের বীজস্বরূপ। ইহার নায়ক প্রখ্যাত ও ধীরোদাত্ত। ইহার অঙ্কগুলিতে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার বিদ্রব ও তিনপ্রকার শৃঙ্গার থাকে। ইহাতে বারজন নায়ক থাকে ও সময়ের পরিমাণ অষ্টাদশ নাড়িকা। যে অঙ্কে যত নাড়িকা থাকিবে তাহার বিধি বলিতেছি।

ইহার অঙ্কগুলি প্রহসন, বিদ্রব, কপট ও বীথীযুক্ত হইবে।

ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রথম অঙ্ক দ্বাদশ নাড়ী

(৪) "দৃষ্টপরিস্পন্দানাং যোধপুরুষাণাং কর্ম্মাণি পুস্তকমারোপয়তি কুমারঃ।"

রিমাণ, দ্বিতীয় অঙ্ক চারনাড়ীপরিমাণ ও নায় সমাপ্তিবিশিষ্ট তৃতীয় অঙ্ক ছই নাড়ী রিমাণ হইবে।

অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত সময়কে নাড়ী বলে। যে রিমাণ নাড়িকার কথা বলিলাম উহা াচিত অঙ্কগুলিতে সংযোগ করা উচিত।

বন্ধ অনুযায়ী এক-একটি অঙ্ক এক ক বিষয়ক হইবে। সমবকারে ফলগুলি রস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

বিদ্রব তিনপ্রকার :—(১) যুদ্ধ, জল ভৃতি হইতে উৎপন্ন, (২) অগ্নি, গজেন্দ্র ভৃতি ভীতি হইতে উৎপন্ন ও (৩) নগর-রোধ প্রভৃতি হইতে জাত।

কপট তিন প্রকার; (১) বস্তু-গতি তে উৎপন্ন, (২) দৈববশতঃ জাত (৩) পরপ্রযুক্ত। এই তিনপ্রকার পট দ্বারা সুখ বা দুঃখের উৎপত্তি য়।

যাঁহারা বিধিজ্ঞ, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ র্য্যের উপযোগী ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে শৃঙ্গারের য়োগ করিবেন। বহুপ্রকার উপকরণ-ক, ধর্ম্ম-সমাপক, নিজমঙ্গলজনক, ব্রত, য়ম ও তপোযুক্ত শৃঙ্গারের নাম ধর্ম্মশৃঙ্গার। র্থের ইচ্ছাবশতঃ বা বহুপ্রকারে অর্থ তে জাত শৃঙ্গারকে অর্থশৃঙ্গার বলে। যথার্থ হইলেও স্ত্রী-সম্ভোগ-বিষয়ে রতি, ন্যা-বিলোভন-জাত শৃঙ্গার, স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত লে তাহাদের আবেগযুক্ত, রম্য, নিভৃত ার কামশৃঙ্গার নামে কথিত।

উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি বন্ধকুটিল যে ল ছন্দ তাহা কবিগণ সমবকারে ন্যরূপে প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ নানা রসবিশিষ্ট সমবকার তদভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রয়োগ করিবেন।"

"বক্ষ্যাম্যতঃপরমহং লক্ষণযুক্ত্যা সমবকারম্।
দেবাসুরবীজকৃতঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব॥
অঙ্কস্তথা ত্রিকপটঃ ত্রিবিদ্রবঃ স্যাদ্রিশৃঙ্গারঃ।
দ্বাদশনায়কবহুলো হ্যষ্টাদশনাড়িকা—প্রমাণশ্চ॥
বক্ষ্যাম্যস্যাঙ্কবিধিং যাবত্যো নাড়িকা যত্র।
অঙ্কস্তু সপ্রসহনঃ সবিদ্রবঃ সকপটঃ সবীথীকঃ॥
দ্বাদশনাড়ীবিহিতঃ প্রথমঃ কার্য্যঃ ক্রিয়োপেতঃ।
কার্য্যস্তথা দ্বিতীয়ঃ সমাশ্রিতো নাড়িকাশ্চতস্রশ্চ॥
বস্তুসমাপনবিহিতো দ্বিনাড়িকঃ স্যাত্তৃতীয়স্তু।
নাড়ীসংজ্ঞা জ্ঞেয়া মানং কালস্য যন্মুহূর্ত্তার্দ্ধম্॥
তন্নাড়িকাপ্রমাণং যথোক্তমঙ্কেষু সংযোজ্যম্।
অঙ্কোঽঙ্কবস্তুর্থার্থং কর্ত্তব্যো বন্ধমাসাদ্য॥...
অর্থং হি সমবকারে হ্রপ্রতিসম্বন্ধমিচ্ছন্তি॥
যুদ্ধজলসম্ভবো বা হ্যগ্নিগজেন্দ্র-সংভ্রমকৃতো বাপি।
নগরোপরোধজো বা বিজ্ঞেয়ো বিদ্রবস্ত্রিবিধঃ॥
বস্তুগতিশ্চক্রমবিহিতো দৈববশাদ্বা পরপ্রযুক্তো বা।
সুখদুঃখ্যোৎপত্তিকৃতস্ত্রিবিধঃ কপটাশ্রয়ো জ্ঞেয়ঃ॥
ত্রিবিধশ্চাত্র বিধিজ্ঞৈঃ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যযোগ—
বিহিতার্থঃ।
শৃঙ্গারঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ॥
যত্র তু ধর্ম্মসমাপকমাত্মহিতং ভবতি সাধনং বহুধা।
ব্রতনিয়মতপোযুক্তো জ্ঞেয়োঽসৌ ধর্ম্মশৃঙ্গারঃ॥
অর্থস্তেচ্ছাযোগাদ্বহুধা চৈবার্থতোঽর্থশৃঙ্গারঃ।
স্ত্রীসংপ্রয়োগবিষয়েষযথার্থমপীষ্যতে হি রতিঃ॥
কন্যাবিলোভনকৃতং প্রাপ্তৌ স্ত্রীপুংসয়োস্তু রম্যং বা।
নিভৃতং সাবেগং বা যস্য ভবেদ্বা কামশৃঙ্গারঃ॥
উষ্ণিগ্বানুষ্টুভ্ বা বৃত্তানি চ যানি বন্ধকুটিলানি।
তান্যত্র সমবকারে কবিভিঃ সম্যক্ প্রযোজ্যানি॥
এবং কার্য্যং তজ্জ্ঞৈর্নানারসসংশ্রয়ং সমবকারম্।"

[নাট্য-শাস্ত্র, ১৮শ অধ্যায়, ১০৯—১২৩ শ্লোক]

ধনঞ্জয় নিজকৃত দশরূপকে সমবকারের নিম্নপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নাটক প্রভৃতির ন্যায় সমবকারেও আমুখ

বা প্রস্তাবনা থাকিবে। দেবাসুর-ঘটিত বিখ্যাত ঘটনা ইহার কথাবস্তু হইবে। বিমর্শ ভিন্ন অন্য সন্ধিগুলি (অর্থাৎ, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ) ইহাতে থাকিবে। ইহার বৃত্তিগুলির মধ্যে কৈশিকীবৃত্তি থাকিবে না। ইহার নায়ক দ্বাদশজন ধীরোদাত্ত ও বিখ্যাত দেব বা দানব। ইহারা বহুবীররসযুক্ত ও ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ফলপ্রাপ্তি হইবে। সমুদ্রমন্থন ইহার উদাহরণ। তিন অঙ্কে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার শৃঙ্গার ও তিনপ্রকার বিদ্রব থাকিবে।

প্রথম অঙ্ক দুই সন্ধিবিশিষ্ট ও দ্বাদশ নাড়িকা পরিমাণ। শেষ অঙ্ক দুইটি যথাক্রমে চার ও দুই নাড়িকা পরিমাণ। দুই ঘটিকায় এক নাড়িকা হয়।

বস্তুর স্বভাব হইতে, দৈববশতঃ ও অরিকৃত এই তিনপ্রকার কপট হইয়া থাকে। নগর-অবরোধ, যুদ্ধ ও বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি হইতে বিদ্রব ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম হইতে তিনপ্রকার শৃঙ্গার। সমবকারে বিন্দু ও প্রবেশক থাকে না। প্রহসনে যেরূপ সেইরূপ বীথ্যঙ্গ সমূহ সমবকারে প্রযুক্ত হইবে।"

"কার্য্যং সমবকারেঽপি আমুখং নাটকাদিবৎ ॥
খ্যাতং দেবাসুরং বস্তু নির্বিমর্শাস্তু সন্ধয়ঃ।
বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নেতারো দেবদানবাঃ ॥
দ্বাদশোদাত্তবিখ্যাতাঃ ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্।
বহুবীররসাঃ সর্ব্বে যদ্বদম্ভোধিমন্থনে ॥
অঙ্কৈস্ত্রিভিস্ত্রিকপটস্ত্রিশৃঙ্গারস্ত্রিবিদ্রবঃ।
দ্বিসন্ধিরঙ্কঃ প্রথমঃ কার্য্যো দ্বাদশনালিকঃ ॥
চতুর্দ্বি নালিকাবন্তৌ নালিকা ঘটিকাদ্বয়ম্।
বস্তুস্বভাবদৈবারিকৃতাঃ স্যুঃ কপটাস্ত্রয়ঃ ॥
নগরোপরোধযুদ্ধে বাতাগ্ন্যাদিকবিদ্রবাঃ।
ধর্ম্মার্থকামৈঃ শৃঙ্গারো নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ।
বীথ্যঙ্গানি যথালাভং কুর্য্যাৎ প্রহসনে যথা।"

[তৃতীয় প্রকাশ, ৬২—৬৮ শ্লো

বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে সমবকারের নি লিখিত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"সমবকারে দেবাসুরাশ্রিত বিখ্যাত ব বস্তু হইবে। বিমর্শ ভিন্ন অন্য সন্ধি থাকিবে। তিনটি অঙ্ক হইবে। তাহার প্রথম অঙ্কে দুইটি সন্ধি ও শেষ দুই এক-একটি সন্ধি থাকিবে। দ্বাদশ ধীরোদাত্ত বিখ্যাত দেবতা অথবা মানব ই নায়ক হইবে। নায়কদিগের পৃথক্ পৃ ফললাভ হইবে। সমস্ত রস বীররসপ্র হইবে। কৈশিকী ভিন্ন অন্য বৃত্তি থাকি ইহাতে বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে যথোপযুক্তরূপে ত্রয়োদশ বীথ্যঙ্গ ইহা থাকিবে। ইহা তিনপ্রকার শৃঙ্গার, প্রকার কপট ও তিনপ্রকার বিদ্রব হইবে। প্রথমাঙ্কের বিষয় দ্বাদশ না মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইতে হইবে, দ্বি অঙ্কে চার ও তৃতীয় অঙ্কে দুই নাড়ীর (ঘটনা সম্পন্ন হইবে)।"

"বৃত্তং সমবকারে তু খ্যাতং দেবাসুরাশ্রয়ম্।
সন্ধয়ো নির্বিমর্শাস্তু ত্রয়োঽঙ্কাস্তত্র চাদিমে ॥
সন্ধী দ্বাবন্ত্যয়োস্তদ্বদেক একো ভবেৎ পুনঃ।
নায়কা দ্বাদশোদাত্তাঃ প্রখ্যাতা দেবমানবাঃ।
ফলং পৃথক্ পৃথক্ তেষাং বীররসোঽখিলে রসাঃ
বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ।
বীথ্যঙ্গানি চ তত্র স্যুর্যথালাভং ত্রয়োদশ।
গায়ত্র্যক্ষিঙ্মুখাস্তত্র চ্ছন্দাংসি বিবিধানি চ
ত্রিশৃঙ্গারস্ত্রিকপটঃ কার্য্যশ্চায়ং ত্রিবিদ্রবঃ।
বস্তু দ্বাদশনালীভিনির্ব্বাহ্যং প্রথমাঙ্কগম্।
দ্বিতীয়েঽঙ্কে চতস্রভির্দ্বাভ্যামঙ্কে তৃতীয়কে।"

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩৪—২৩৯ শ্লো

বিশ্বনাথ তিন-তিনপ্রকার শৃঙ্গার, কপট বিদ্রবেরও সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়াছেন।

"শৃঙ্গার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লইয়া ত্রিবিধ। কপট স্বাভাবিক, কৃত্রিম ও দৈবজাত এই তিনপ্রকার। বিদ্রব চেতনকৃত, অচেতনকৃত ও চেতনাচেতন-কৃত (৫) এই তিন প্রকার।"

"ধর্ম্মার্থকামৈস্ত্রিবিধঃ শৃঙ্গারঃ, কপটঃ পুনঃ ॥
স্বাভাবিকঃ কৃত্রিমশ্চ দৈবজো, বিদ্রবঃ পুনঃ।
অচেতনচেতনৈশ্চ চেতনাচেতনৈঃ কৃতঃ।"

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩৯—২৪০ শ্লোক]

আমরা তিনখানি গ্রন্থ হইতে সমবকারের লক্ষণ উদ্ধৃত করিলাম। কতকগুলি লক্ষণ তিনখানি গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে, কতকগুলি ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাই, দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে আছে। লক্ষণগুলির অর্থও ভরত, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ একপ্রকার করেন নাই। কাজেই সমবকারের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এই তিনজনের লক্ষণগুলি একত্র আলোচনা করা আবশ্যক।

বিশ্বনাথ সমবকার শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, "সমবকীর্য্যন্তে বহবোঽর্থা অস্মিন্নিতি সমবকারঃ।" ধনিক অবলোক-নামক নিজ রচিত দশরূপকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— "সমবকীর্য্যন্তেঽ স্মিন্নর্থা ইতি সমবকারঃ।"

সমবকারের যে লক্ষণগুলি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, সেগুলি এই। দেবাসুর বিষয়ক ঘটনা ইহার আখ্যান-বস্তু হইবে। ইহাতে বারজন নায়ক থাকিবে। এই নায়কেরা বিখ্যাত ও ধীরোদাত্ত(৬) হইবে। ইহাতে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার শৃঙ্গার ও তিনপ্রকার বিদ্রব থাকিবে। তিন অঙ্কে ইহা সমাপ্ত হইবে। প্রথম অঙ্কের সময় দ্বাদশ নাড়িকা; দ্বিতীয় অঙ্কের চার নাড়িকা ও তৃতীয়ের দুই নাড়িকা।

এই লক্ষণের মধ্যে নায়ক দেব বা দানব হইবে, ধনঞ্জয় এইপ্রকার লিখিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেব ও মানব লিখিয়াছেন। রাম-তর্কবাগীশ সাহিত্য-দর্পণের টীকায় লিখিয়াছেন, 'দেবমানবাঃ' ইহার পরিবর্ত্তে কোন কোন পুথিতে 'দেবদানবাঃ' এ পাঠও আছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় না, যে বিশ্বনাথ দেব বা মানবই লিখিয়া গিয়াছেন। ভাসের পঞ্চরাত্র নামক সমবকারে আমরা মানবদেহধারী পঞ্চপাণ্ডব, কৌরবগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ইঁহারাই নায়ক।

ধনিক নিজকৃত অবলোক নামক দশ রূপকের টীকায় লিখিয়াছেন "দেবাসুর প্রভৃতি দ্বাদশ নায়ক।" কাজেই কেবল দেব বা অসুরই যে নায়ক হইবে, ধনিক এ অর্থ করেন নাই। 'সমুদ্রমথন' নামক যে সমবকারের নাম উদাহরণ-রূপে ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নায়কগণ বোধ হয় কেবল দেব ও অসুর; আমরা অবশ্য এ গ্রন্থ দেখি নাই। নাম হইতে বিষয় অনুমান করিয়াই এ কথা বলিতেছি। কিন্তু পঞ্চরাত্রে

(৫) "চেতনাচেতনা গজাদয়ঃ।" বিশ্বনাথ।
(৬) "অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥"
[সাহিত্য-দর্পণ ৩।৩২

যখন মানব-দেহধারী নায়ক রহিয়াছে তখন ধনিক-কৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে "দেব-দানব প্রভৃতি" অর্থ কল্পনা করাই সঙ্গত। তাহা হইলে লক্ষণে কোন দোষ পড়ে না।

ভরত লিখিয়াছেন, নাড়িকা, নালিকা বা নালী শব্দের অর্থ অর্দ্ধমুহূর্ত্ত। ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ নাড়িকার অর্থ ঘটিকাদ্বয় লিখিয়াছেন।

এখন তিনপ্রকার শৃঙ্গার, কপট ও বিদ্রবের প্রয়োগসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভরত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, যে প্রত্যেক অঙ্কেই কপট, শৃঙ্গার ও বিদ্রব থাকিবে। ধনিক দশরূপকাবলোকে এই প্রকার মত স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ("প্রত্যঙ্কং যথাসংখ্যং কপটাঃ। তথা নগরোপরোধযুদ্ধ-বাতাগ্ন্যাদিবিদ্রবাণাং মধ্য একৈকো বিদ্রবঃ কার্য্যঃ। ধর্ম্মার্থকামশৃঙ্গারাণামেকৈকঃ শৃঙ্গারঃ। প্রত্যঙ্কমেব বিধাতব্যঃ।")

মন্দারমরন্দ নামক একখানি চম্পূকাব্য আছে। তাহাতেও দৃশ্যকাব্যের ভেদ ও লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আছে যে সমবকারের প্রথম অঙ্কে কপট, দ্বিতীয় অঙ্কে বিদ্রব ও তৃতীয় অঙ্কে শৃঙ্গার বর্ণিত হইবে। প্রত্যেক অঙ্কেই যে কপট, বিদ্রব ও শৃঙ্গার থাকিবে তাহা নহে।

"অঙ্কস্রস্তত্র চাদ্যে মুখ প্রতিমুখে তথা।
বস্তুস্বভাবদৈবারিকৃতাঃ স্যুতঃ কপটাশ্রয়ঃ॥
কথামপি নিবস্নাস্তথা দ্বাদশনালিকাম্।
দ্বিতীয়েঽঙ্কেঽপি চতুর্ণালিকাবধিকাং কথাম্॥
পুররোধরণাগ্ন্যাদি নিমিত্তা বিদ্রবাশ্রয়ঃ।
তৃতীয়েঽঙ্কে নিবদ্ধব্যা কথা চাপি ত্রিনালিকা।
ধর্ম্মার্থকামসম্ভূতাস্ত্রিস্রঃ শৃঙ্গাররীতয়ঃ॥"

[মন্দারমরন্দচম্পূ]

পঞ্চরাত্রের প্রথম অঙ্কে দ্রোণের [illegible] ভাব অবলম্বনে দান-প্রার্থনা, অগ্নি-প্রকা[illegible] রূপ বিদ্রব ও দুর্য্যোধনের যজ্ঞ-রূপ ধর্ম্মশৃ[illegible] বর্ণিত হইয়াছে। ভরত-কৃত ধর্ম্মশৃঙ্গা[illegible] লক্ষণ মানিলে দুর্য্যোধনের যজ্ঞে দীক্ষা [illegible] শৃঙ্গারের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইতে পা[illegible] পূর্ব্বে আমরা ভরতের যে লক্ষণ উ[illegible] করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে, [illegible] ধর্ম্মশৃঙ্গার নিজের মঙ্গলসাধক, ধর্ম্ম-সম্প[illegible] বহুপ্রকার উপকরণ সহিত ব্রত-নি[illegible] তপোযুক্ত। এ লক্ষণ দুর্য্যোধন-অনু[illegible] যজ্ঞবিষয়ে খাটে।

বিশ্বনাথ কিন্তু ধর্ম্মশৃঙ্গারের অন্যপ্রক[illegible] লক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে শৃ[illegible] শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, তাহাই ধর্ম্মশৃঙ্গার। ("[illegible] শাস্ত্রাবিরোধেন কৃতো ধর্ম্মশৃঙ্গারঃ।") [illegible] তর্কবাগীশ ইহার ব্যাখ্যা করিতে যা[illegible] বলিয়াছেন "নিষিদ্ধকালে নিষিদ্ধযোষিতি র[illegible] শৃঙ্গারঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধস্তদিতরো ধর্ম্মঃ শৃঙ্গার[illegible] এই অর্থ মানিলে পঞ্চরাত্রের প্রথমাঙ্কে [illegible] শৃঙ্গার দেখা যায় না। বিশ্বনাথ স্বা[illegible] বলেন যে সমবকারের প্রথম অঙ্কে কাম-শৃঙ্গা[illegible] অবশ্য থাকিবে। অন্যান্য অঙ্কে কোন্ শৃঙ্গা[illegible] থাকিবে তাহার কোন নিয়ম নাই।

বিশ্বনাথের মতে, অর্থলাভার্থ কবি[illegible] শৃঙ্গার অর্থশৃঙ্গার ও প্রহসন-শৃঙ্গার কাম-শৃঙ্গার[illegible] বিশ্বনাথের লক্ষণ পঞ্চরাত্রে খাটে না। [illegible] শৃঙ্গার, অর্থশৃঙ্গার ও কামশৃঙ্গারের যে প্রকা[illegible] অর্থ বিশ্বনাথ করিয়াছেন, তাহার কো[illegible] প্রকারই পঞ্চরাত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। [illegible] ভরতকৃত লক্ষণ মানিলে প্রথম অঙ্কে দুর্য্যোধন[illegible] যজ্ঞরূপ ধর্ম্মশৃঙ্গার, দ্বিতীয় অঙ্কে যুদ্ধরূপ

বৃহন্নলাকে উত্তরা দান করিবার প্রস্তাব [illegible] অর্থশৃঙ্গার ও তৃতীয় অঙ্কে উত্তরা ও [illegible]ভিমন্যুর বিবাহসূচক বর্ণনা কামশৃঙ্গার [illegible]লিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্কে [illegible]গ্রহণ ও যুদ্ধরূপ বিদ্রব, [illegible]রলা, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতির ছদ্মবেশরূপ [illegible]পট ও অভিমন্যুর সহিত কপট কথোপকথন [illegible]র্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধরূপ বিদ্রব [illegible] পাণ্ডবদিগের ছদ্মপরিচয় ও দ্রোণের ছলে [illegible]নগ্রহণরূপ কপট বিদ্যমান, কাজেই মন্দার-[illegible]রন্দ-রচয়িতার লক্ষণ খাটিতেছে না। [illegible]ত্যেক অঙ্কেই কপট, শৃঙ্গার ও বিদ্রব [illegible]খা যাইতেছে।

এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ লক্ষণ দেখিয়া [illegible]নে হয়, সমবকার-শ্রেণীর বেশী রূপক [illegible]শ্বনাথ, ধনঞ্জয় প্রভৃতিরও নয়নপথবর্ত্তী [illegible]র নাই। বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় উভয়েই [illegible]কেবলমাত্র সমুদ্রমন্থন নামক সমবকারের [illegible]ল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঐ গ্রন্থ-[illegible]নিকে উদাহরণ ধরিয়াই সম্ভবতঃ লক্ষণ [illegible]র্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। আমরা সমুদ্রমন্থন [illegible]ষ্ঠ পাই নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে অধিক [illegible]কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহা [illegible]নে হয় যে উক্ত আলঙ্কারিকেরা সমবকারের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে ভাসকৃত পঞ্চরাত্র স্মরণ করেন নাই। তাহা হইলে যাহা পঞ্চরাত্রে খাটে না এরূপ লক্ষণ আমরা সাহিত্য-দর্পণে বা দশরূপকে দেখিতে পাইতাম না। এই বিরুদ্ধ লক্ষণের আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাহিত্য-দর্পণ ও দশরূপক উভয় গ্রন্থেই আছে, যে সমবকারে বিন্দু ও প্রবেশক নাই। ("নাস্ত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ") বিশ্বনাথ বৃত্তিতে আবার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, "নাটকে বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে একথা বলা হইয়া থাকিলেও সমবকারে এ দুটি বিধেয় নহে।" ("বিন্দুপ্রবেশকৌ চ নাট-কোক্তাবপি নেহ বিধাতব্যৌ।")

অবান্তরকথাবিচ্ছেদে তৎসংযোগকারী বিষয়কে বিন্দু বলে। ("অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।")

প্রবেশক দুই অঙ্কের মধ্যে সন্নিবিষ্ট অনুদাত্ত-বাক্য-কথনকারী নীচ-পাত্রযুক্ত হইয়া থাকে। (৭) বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় সমবকারে প্রবেশক থাকে না, একথা বলিলেও পঞ্চরাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে আমরা নিয়োদ্ধৃত প্রবেশক দেখিতে পাই।

[তাহার পর বৃদ্ধ গো-পালক প্রবেশ করিল]

বৃ-গো। আমার গরুগুলির বাছুর ভাল থাকুক।

(৭) "নোত্তমমধ্যমপুরুষৈরাচরিতো নাপ্যুদাত্তবচনকৃতঃ।
প্রাকৃতভাষাচারং প্রবেশকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥"
[নাট্য-শাস্ত্রম্, ১৮।৩৪ [
"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা॥"
[সাহিত্য-দর্পণম্, ৬।৪৭]
"তদ্বদেবানুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
প্রবেশোঽঙ্কদ্বয়স্থাস্তঃ শেষার্থস্যোপসূচকঃ॥"
[দশরূপকম্। ১।৬০,৬১]

গোপ-যুবতীরা যেন বিধবা না হয়। আমাদের রাজা বিরাট একছত্র পৃথিবীর রাজা হোন্। মহারাজ বিরাটের জন্মদিন বলে গরু দিতে সমস্ত গোয়ালার ছেলে-মেয়েরা নূতন কাপড়, গয়না পরে নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। এদের কর্ত্তা হয়ে দেখি। (দেখিয়া) আরে একি? এই কাকটা শুক্‌নো গাছে উঠে, শুক্‌নো গাছের ডালে মুখ ঘষে সূর্য্যের দিকে চেয়ে বিকৃতস্বরে বিলাপ করছে। আমাদের ও গরুগুলির শান্তি হোক্, শান্তি হোক্। এদের কর্ত্তা হয়ে গোয়ালার ছেলে-মেয়েদের ডাকি। (পরিক্রমণ করিয়া) ওরে গোমিত্রক! গোমিত্রক!

গোমিত্রক। (প্রবেশ করিয়া) মামা, প্রণাম হই।

বৃ-গো। আমাদের ও গরুগুলোর শান্তি হোক্, শান্তি হোক্। ওরে গোমিত্রক! মহারাজ বিরাটের জন্মদিন বলে গরু দিতে সমস্ত গোয়ালার ছেলেমেয়েরা নূতন কাপড় ও গয়না পরে নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। ওরে গোমিত্রক! গোয়ালার ছেলেমেয়েদের ডাক্!

গো। যে আজ্ঞে মামা। গোরক্ষিণিকে! ঘৃত-পিণ্ড! স্বামিনি! বৃষভদত্ত! কুম্ভদত্ত। মহিষদত্ত! আয়, আয় শীগ্‌গির!

[সকলে প্রবেশ করিল]

সকলে। মামা, প্রণাম।

বৃ-গো। আমাদের, গরুগুলির, গোয়ালার ছেলে-মেয়েদের শান্তি হোক্, শান্তি হোক্। মহারাজ বিরাটের জন্মদিনে গোরু দিবার জন্যে এই নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। যতক্ষণ গরু না আসে, ততক্ষণ নাচ-গান করি আয়।

[সকলে নৃত্য করিতে লাগিল]

বৃ-গো। হিঃ হিঃ, বেশ নেচেছিস্, বেশ গেয়েছিস্। আমিও এবার নাচি। (নৃত্য করিতে লাগিল)

সকলে। হা-হা—মামা, ভয়ানক ধূলো উড়ছে।

বৃ-গো। কেবল ধূলো নয় রে, শঙ্খ-দুন্দুভির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

সকলে। হা-হা, মামা, ধূলোয় ঢাকা সূর্য্য, দিনের বেলায় চাঁদের মতন কেকাসে হয়ে আছে কি না আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে না।

গো। হা, হা, মামা। এই যে কোথাকার সব দইয়ের মত সাদা ছাতা ধরে ঘোড়ার গাড়ী সমস্ত গোয়ালাপাড়া তাড়া দিচ্ছে।

বৃ-গো। হী-হী—তীর ছুট্‌ছে রে। ওরে মেয়েরা! শীগ্‌গির ঘরে ঢোক্!

সকলে। যে আজ্ঞে মামা। (নিষ্ক্রান্ত হইয়া)

বৃ-গো। হা-হা। দাঁড়া, দাঁড়া। মারু, ধর্, ধর্। এই বৃত্তান্ত মহারাজ বিরাটকে জানা (নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক।

ভরত নিজ লক্ষণে সমবকারে প্রবেশ থাকিবে না, একথা বলেন নাই। ভরতের লক্ষণ অনুসারে পঞ্চরাত্রকে সমবকাররূপে গ্র করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু দশরূপক সাহিত্য-দর্পণের লক্ষণ সমস্ত ইহাতে খাটে না

এখন ইহা অনুমান করা কি অ যে নাট্যশাস্ত্রের সময় যে সকল সমবক প্রচলিত ছিল, তাহা দেখিয়াই ভরত লক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, সমুদ্রমন্থন আর দুই-একটি সমবকার দেখিয়া বিশ্বনা ও ধনঞ্জয় সঙ্কীর্ণতর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন আমাদের মতে ইহা হইতে ভাসের প্রাচীন সুপ্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চরাত্রে প্রথমেই সূত্রধারের মুখে একটি শ্লোকে সুকৌশলে নায়কগুলির নাম প্রদ হইয়াছে। সে শ্লোকটি এই ঃ—

"দ্রোণঃ পৃথিব্যর্জ্জুনভীমদূতো
যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য।
দুর্য্যোধনো ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরঃ স
পায়াদ্ বিরড়ুত্তরগোঽভিমন্যুঃ॥"

ইহাতে এগারজন নায়কের নাম আছে। ন অনুযায়ী দ্বাদশজন নায়ক থাকা উচিত। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ পাঁচপ্রকার সন্ধি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে খিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মূল ঘটনার তারণা (মুখ-সন্ধি) তাহার পর তাহার ধিকাশ (প্রতিমুখ-সন্ধি,) পরে অন্যান্য রোধী বা অনুকূল ঘটনার সহিত সংঘর্ষ র্ভ-সন্ধি,), এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি (বিমর্শ-ন্ধি) ও পরিশেষে সমাপ্তি (নির্বহণ-সন্ধি)। মবকারের প্রথম অঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ ন্ধি, দ্বিতীয় অঙ্কে গর্ভ-সন্ধি ও শেষ অঙ্কে র্বহণ-সন্ধি থাকে। বিমর্শ-সন্ধি সমবকারে যুক্ত হয় না। আমরা পঞ্চরাত্রের যে াখ্যায়িকা-বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্ব্বে য়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ ইহার ার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

সমবকারে কৈশিকীবৃত্তি থাকে না। কেননা, ইহা বীররসপ্রধান। শৃঙ্গারপ্রধান নাট্যে কৈশিকীবৃত্তি প্রযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র বেশভূষাযুক্ত, নৃত্য-গীতবহুল, স্ত্রীজন-সঙ্কুল, মনোহর বিলাসযুক্ত ও শৃঙ্গারের অঙ্গপূর্ণ বৃত্তিই কৈশিকী-বৃত্তি। পঞ্চরাত্র বীররসপ্রধান।

সমুদ্রমথন নামক সমবকারে নায়কদের পৃথক্ পৃথক্ ফললাভ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাদি লাভ, নারায়ণের লক্ষ্মীলাভ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ফল। পঞ্চরাত্রেও অভিমন্যুর উত্তরালাভ, পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ সমবকারে প্রযোজ্য। পঞ্চরাত্রের শ্লোক-গুলি নানাপ্রকার ছন্দে রচিত।

উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎ-প্রলাপ, ব্যাহার ও মার্দ্দব এই ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গ সমবকারে প্রয়োগ করিতে হয়। পঞ্চরাত্রে এগুলির প্রয়োগ আছে। মূল ব্যতীত ইহা বুঝান যাইবে না বলিয়া বাহুল্যভয়ে আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম।

পঞ্চরাত্রের একটি বিশেষত্ব যাহা আর কোন সংস্কৃতরূপকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না এই যে, ভাস এখানে প্রচলিত কাহিনী রূপান্তরিত করিয়া নাট্যের আখ্যানবস্তু কল্পনা করিয়াছেন। এ সাহস আর কোন কবির দেখা যায় না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বিধান আছে বটে যে, যদি কোন স্থলে নায়ক-চরিত্র বা রসের বিরুদ্ধ অনুচিত কোন ঘটনা থাকে তাহা হইলে হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে, না হয়, তাহা অন্যপ্রকারে রূপান্তরিত করিবে। রাম-চরিত লইয়া যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বালিবধ দেখাইলে নায়কের চরিত্রে দোষ পড়িবে বলিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। উদাত্ত-রাঘবে বালিবধ ঘটনা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহাবীর-চরিতে ভবভূতি রামবধার্থ আগত বালীকে রাম নিহত করিলেন, এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে নায়কচরিত্র বা রসের বিরুদ্ধ কোন বস্তু নাই, সেখানে নিজ কল্পনা অনুসারে প্রচলিত কাহিনীবিরুদ্ধ কথাবস্তু রচনা প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে কিছুর উল্লেখ থাকে না, সেখানে

না হয় অতিরিক্ত দুই-একটি ঘটনা কবি সংযোজন করিতে পারেন। কিংবা প্রসিদ্ধ ঘটনার হেতু বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিতে পারেন। হোমরের ইলিয়াদে আগামেমননের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর ব্যভিচার উল্লিখিত হইলেও, আগামেমননের পুত্র ওরেস্‌টিসের, ভগিনী ইলেক্‌ট্রার সহায়তায় মাতৃহত্যার বিশদ চিত্র নাই। এস্কিলাস্‌,সফোক্লিস্‌ ও ইউরিপিদিস্‌ এই তিনজন নাট্যকারই এই ঘটনা লইয়া নাট্য রচনা করিয়াছেন। তিনজন তিন প্রকারে মাতৃহত্যার চিত্র দেখাইয়াছেন। ওরেস্‌টিসের মনের ভাব তিন নাটকে তিন প্রকারে চিত্রিত। এখানে কবির স্বাতন্ত্র্য দেখা গেলেও কাহিনী অন্যরূপ কল্পনা করা কোথাও দেখা যায় না। তাহা অভিনয়ের সময় শ্রোতৃবর্গের মনঃপূত না হওয়ারই সম্ভাবনা। বিশেষ ভাস যে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পঞ্চরাত্রে ঘটনা মহাভারত-বিরুদ্ধ করিতে সাহস হইয়াছেন, ইহা স্মরণীয়। অন্যান্য অংশের কথা ছাড়িয়া দিলে কেবল এই বৈচিত্র্য হেতু পঞ্চরাত্র সংস্কৃত নাট্যগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

কাশফুল

একি তৃণ-সুগহন সবুজসায়রে
কাশের শুভ্র ঢেউ!
ওগো শরতের মেঘ নেমেছে ধরায়
বুঝি না জানিতে কেউ!

মরি জ্যোৎস্না-মদিরা পান করি কিগো
ঘাসেরও খুলিল রূপ!
আজ শারদ-রাণীর পূজার দেউলে
কে জ্বালালো এত ধূপ?

হায় শেফালি-মাল্য লাজে ম্লান হয়
কাশের বাহার দেখি।
আর পটুয়ার হাতে সুপটু তুলিটি
আপনারে ভাবে মেকি।

ওই পবনের আগে কাশগুলি দোলে,—
—পুলকে দুলিছে হিয়া!
ও কি জগতের সব মলিনতা আজ
মুছিবে পরশ দিয়া?

আহা ও তো নহে ফুল, অতি সুতরুণ
ধরার অঙ্গুলি ও!
ওগো জননী মাটীর পরশ ওতেই
তাই তো সবার প্রিয়!

ওরে ওরে কাশফুল! পরিচয় দিতে
তুলনা খুঁজে না পাই;
ওরে নির্ম্মলতাই পরিচয় যার
আর কিবা তার চাই!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আর্টে নব-ধারা

ছবিকে এতদিন আমরা সার্ব্বজনীন ভাষা রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কখনো নয়। কারণ, অনুবাদে মূলের প্রকৃত প্রতিকৃতি থাকে না—থাকে তার বিকৃত অনুকৃতি।

ছবিতে এ-সব আপদ-বালাই নেই। ছবির ভাষা সব দেশেই অনেকটা এক। অজ-পাড়াগাঁয়ের এক বাঙালী চাষাও র‍্যাফেলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তির ভাব মোটামুটি



অনন্তের পথে



ক্রীড়ক

একরকম বুঝ্‌তে পার্‌বে। ছবির ভাষা এম্‌নি সার্ব্বজনীন বলেই সেকালে নানাজাতির ধর্ম্মমন্দিরে ছবি এঁকে সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তার প্রমাণ রিম্‌স্ প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য গির্জ্জা এবং ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির ভিত্তি-চিত্র।

কিন্তু আধুনিক চিত্রকরদের অনেকেই চিত্রাঙ্কনের নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার কর্‌ছেন; ফলে ছবির সার্ব্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়্‌ছে। অবশ্য, এখানে ভালো-মন্দের বিচার হচ্ছে না—আমরা সুধু বল্‌তে চাই, একালের অনেক ছবির আসল ভাব মূর্খের মাথা ঢোকা ত দূরের কথা, পণ্ডিতের মাথাতেও ঢুক্‌বে না! এখানে ব্যাখ্যা কর্‌লে পণ্ডিতের মুখ হয়ত প্রসন্ন হবে, কিন্তু হতভম্ব মূর্খ বেচারী 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই থাক্‌বে!

দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বিখ্যাত আঁকিয়ের খান-তিনেক ছবি দিলুম। প্রথম দৃষ্টিতে ছবিগুলির ভিতরে যাহা দেখা যাইবে, তাহাই তাহার আসল অর্থ নয়—কেননা এগুলি চিহ্নাত্মক। বৈষ্ণব-কবির অনেক কবিতার



যাদুকর

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মত এই চিত্রগুলিও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

যেমন, প্রথম ছবি 'অনন্তের পথে'। এখানি দেখ্‌লে সকলেরি মনে হবে, এ বুঝি নায়ব্য-উপন্যাসের কোন গল্পের ছবি! কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়; এই পটে দেখানো হচ্ছে, দুটি আত্মা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে ইহলোক থেকে দুর্জ্ঞেয় পরলোকের দিকে। তাদের বাহন ঐযে উটটি দেখ্‌ছেন, ওটিকে উট ভাবলেই মুস্কিলে পড়্‌বেন—কেননা ঐ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যাজদেহটি হচ্ছে মূর্ত্তিমান সত্য! অসীম-অনন্ত শূন্যতার মধ্যে পড়েও ধ্বংসের সম্মুখে এসেও আত্মনিমগ্ন প্রেম আপনাতে অটল হয়ে আছে—এইটিই এখানে ছবির বিষয়।

তারপর—'খেলোয়াড়'। ছবির 'ক্ষেত্র-পৃষ্ঠে' (Back ground) একটি পাহাড়। ভালো করে' দেখ্‌লে দেখ্‌বেন, ওটি পাহাড়

নয়, একটি কাফ্রির মাথা,—জীবনের পর্ব্বত-প্রমাণ মূর্খতা ও অজ্ঞানতার প্রতিমূর্ত্তি। নীচে তিন-চারটি সংসারী লোকের মাঝখানে যে কঙ্কালটি দীপ হাতে করে' বসে আছে, সে হচ্ছে অন্ধ মৃত্যু—অক্ষিকোটর থেকে বিলুপ্ত দৃষ্টিকে সে খুঁজে বের্ করতে চায়! সামনেই বিরাট খেলোয়াড়ের মূর্ত্তি, হাতের পুতুলে কোন খুঁৎ আছে কি না, একমনে সে তাই পরখ করছে। চিত্রকর দেখাচ্ছেন, এই মিছে জাঁকজমকে ভরা জীবনটা হচ্ছে মস্ত একটা খেলনা!

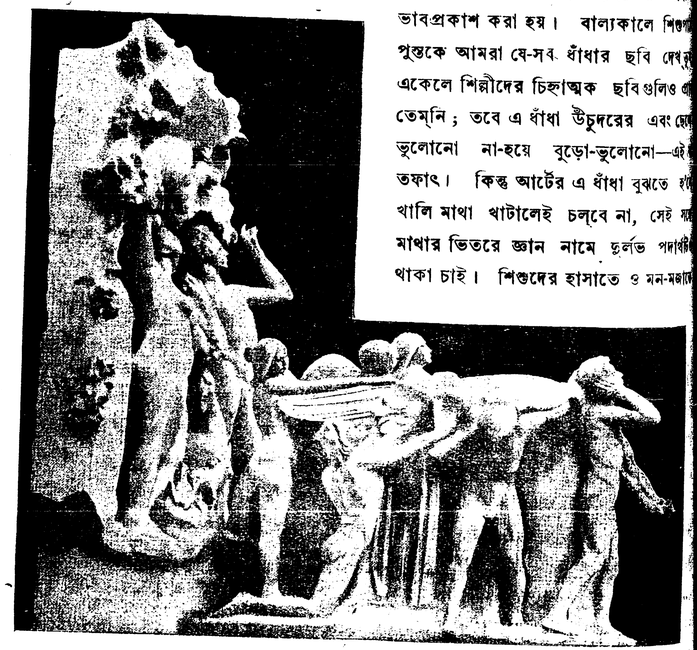

জীবনের বোঝা

তৃতীয় ছবি—'যাদুকর'। যাদু[কর] স্বহস্তে-সৃষ্ট দানব তার স্রষ্টাকেই উদর[স্থ] নিক্ষেপ করতে উদ্যত,—কারদানি দে[খা] গিয়ে যাদুকর-বেচারী ভারি ফ্যাসাদেই [প]ড়ে গেছে আর কি! এই ছবির আসল [ম]র্ম্ম হচ্ছে আমরা যেচে নিজের অমঙ্গলকে নি[জে] ডেকে আনি।

আজকাল শিল্পীসমাজে রূপকের ব্য[বহার] দিন-কে-দিন বেড়েই চলছে। শুধু প্রবন্ধ নয়,—প্রাচ্যদেশে জাপানী এবং ভারতী চিত্রপদ্ধতিতেও প্রায়ই রূপকের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করা হয়। বাল্যকালে শিশুদের পুস্তকে আমরা যে-সব ধাঁধার ছবি দেখ[তে] একেলে শিল্পীদের চিহ্নাত্মক ছবিগুলিও [ঠি]ক তেম্নি; তবে এ ধাঁধা উঁচুদরের এবং [খে]লো ভুলোনো না-হয়ে বুড়ো-ভুলোনো—এই [যা] তফাৎ। কিন্তু আর্টের এ ধাঁধা বুঝতে হ[লে] খালি মাথা খাটালেই চল্‌বে না, সেই সঙ্গে মাথার ভিতরে জ্ঞান নামে দুর্লভ পদার্থটি থাকা চাই। শিশুদের হাসাতে ও মন-মজা[তে]

[কে]বলেই ছেলেদের ধাঁধার কাজ শেষ হয়। কিন্তু এই শিল্প-ধাঁধার মধ্যে ও-রকম তরলতা নেই—এ চায় রসিকের চিত্ত-সায়রে ভাবের তরঙ্গ তুল্‌তে, নানা রহস্যের মধ্যে ফেলে জীবনের বিচিত্র রূপ জাগ্রৎ করতে!

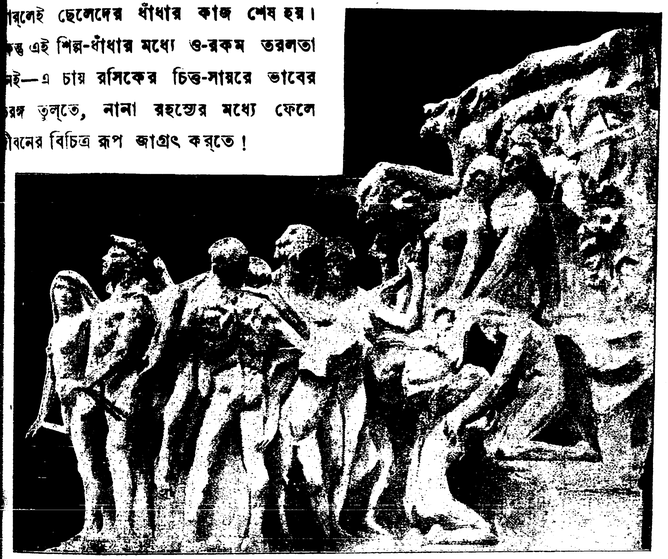

কর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্ব

আর্টের এক ধরা-বাঁধা রীতির মধ্যেই শিল্পীরা এতদিন লৌকিক সুখ-দুঃখের ছবি দেখিয়ে আস্‌ছিলেন। এই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিই ছিল আর্টের মাপকাঠি এবং এথেকে একটু এদিক-ওদিক হ'লেই আর রক্ষে ছিল না—সাধারণের চক্ষে শিল্পীর কার্য্য একেবারে খেলো হয়ে পড়ত।

কিন্তু নব-যুগের শিল্পীরা এই বাঁধা-দস্তুরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করতে চান,—তাঁরা বলেন, আর্টকে কোন-একটা সীমার মধ্যে বন্দী করে' রাখা চলে না, যদি তোমার কাজে সামঞ্জস্য আর সৌন্দর্য্য থাকে, তাহলে তুমি দস্তুরের ভিতরেই থাক আর বাইরেই যাও তাতে কিছু এসে-যাবে না, আমরা তোমাকে আর্টিষ্ট বলে মান্‌তে বাধ্য হবই।

সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে তাই এখন বিদ্রোহের বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী', মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড', লিওনিড্ আন্দ্রীভের ভাবাত্মক নাটক প্রভৃতি এই বিদ্রোহের অমৃত-ফল। সাহিত্যের ওস্তাদ কারিকররা দেখিয়ে দিলেন, নাটক-রচনার পুরাতন পদ্ধতিটিই আদর্শ পদ্ধতি নয়—ভালো আর্টিষ্টের হাতে পড়লে যে-কোন একটা নূতন আকারের মধ্যে নাটকের নাটকত্ব পরিস্ফুট হ'তে পারে।



ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্ণার্ড

ভাস্কর্য্য-ক্ষেত্রেও দেখি
গস্ত্ রোদাঁ, জর্জ গ্রে
র্ণাড ও মেষ্ট্রোভিক্
ভৃতি শিল্পী বিদ্রোহের
ই বীজ বপন কর্‌ছেন।
ভাস্কর বার্ণাডকে
লাকে মানবতার উপাসক
লে জানে। আমরা
খানে তাঁর কাজের
মুনা দিলুম। আগে
আমরা যে তিনখানি
হাত্মক ছবি দেখিয়েছি,
র্ণাডের কাজ সেগুলির
ত দুর্ব্বোধ না-হ'লেও
াপাত-দৃষ্টিতে তাঁর



যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন

ড়া মূর্ত্তিগুলিরও গুপ্তরহস্য বোঝা যাবে না;—কারণ, এখানেও রূপকের মধ্য দিয়ে
শল্পীর পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

কে জানে, সখি, কে জানে,
কেন হেন পরাণ কাঁদে কে জানে।
নয়নের জল, উথল চঞ্চল,
যতন বাঁধন না মানে,
না মানে, সখি, না মানে॥

পাখী গায় দূরে, বাজে বাঁশী পূরে,
কে ডাকে আমায় সে সুরে;—
হৃদয়-দুকূলে ঢেউ ছোটে ফু'লে,
আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে টানে,
সে টানে, সখি, সে টানে॥

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

২ ৩ ১
I মা মা পা II {-া পা ধা। মপা মগা রা। গরা সন্া সা।
কে জা নে {০ স খি কে০ জা নে ০০ ০০ ০

I ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০

যার চুলে ফুল সর্ব্বজয়া
বীণ্ মাতে তার জয়গানে !
আঁধার অতল শাম-সায়রে ফুট্‌ল কে !
স্নিগ্ধ হাসির শম্-শীতলে
জুড়িয়ে ভুবন উঠ্‌ল কে !
মেলিয়ে পাখা লাখ্ বলাকা
চল্‌ছে ছুটে কার পানে !
মুখখানি কার অমল উজল
অপ্সরীদের রূপটানে !
ফুলের চামর চুলিয়ে রে আজ
ফির্‌ছে সমীর কার লেগে !

তবক্-মোড়া ধূলোর পথে
আলোর হরিণ ধায় বেগে !
সোনার ধূলোয় হয় সোনালি অন্ধকার
পায়ের পাতায় লক্ষ চপল
আঁখির পাতার ছন্দ কার !
নীল কমলের বন থেকে কি
বেরিয়েছে সে মন থেকে !
মুগ্ধ পবন মুগ্ধ ভুবন
মজ্‌ল নয়ন রূপ দেখে !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী *

(৫)

রাজা অতুলেশ্বরের তৃতীয়া কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিল ঠিক জন্মাষ্টমীর দিনে। দুই কন্যার পর এবার রাজাবাহাদুর যে পুত্র-মুখ দর্শন করিবেন—এ বিষয়ে রাজবাড়ীর বালবৃদ্ধ সকলেই এক রকম নিঃসন্দেহ ছিলেন ;—নহিলে তাঁহার আভিজাত্য-তরণীর হাল ধরিবে কে ? রাজার বংশরক্ষা, কুল রক্ষা, রাজ্যরক্ষা হইবে কিরূপে ?

রাত্রিকাল হইতে এই বহু প্রত্যাশিত নবীন কাণ্ডারীর আগমন অভ্যর্থনা উপলক্ষে সকলেই ব্যতিব্যস্ত ; বর্হিবাটীতে ডাক্তার গণৎকার গুরুপুরোহিতদিগের সমাগম হইয়াছে ; অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দা আত্মীয়া, দাসীপরিচারিকায় পূর্ণ; তাহারা শঙ্খ, ধান্যদুর্ব্বা, নববস্ত্র, রত্নাদি প্রভৃতি বিবিধ আয়োজন-দ্রব্যাদি সাজাইয়া অতিথিবরণ জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, এবং নিশ্বাস ফেলিবার অবসর সত্ত্বেও গল্পগুজবে সুখনিশা অতিবাহিত করিতেছে। নীচের উঠানে সমবেত বাদ্যকার-গণ মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে অতিথির শুভাগমন বার্ত্তা লাভের জন্য কাণ পাতিয়া আছে। চারিদিকের উৎফুল্ল জনতা-বেষ্টিত সূতিকা-গৃহ জনবিরল, কেবল দুইজন মাত্র ধাত্রী সেখানে প্রসূতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে আর মহারাণী—অতুলেশ্বরের মাতা বসিয়া শীর্ষদেশে বসিয়া তাহাকে বীজন করিতে করিতে নাম জপ করিতেছিলেন।

রাজা চিন্তিত মনে শুষ্কমুখে সংবাদ

* "হাসি" গল্পের অনুবৃত্তি।

...র জন্য বারবার অন্তঃপুরে যাতায়াত ...তেছিলেন। তিনিই কেবল ভাবিতে ...য়া গিয়াছেন—তিনি কি চান—কন্যা বা ...; প্রসূতির চিন্তাতে এমনি তিনি ...ময়।

...অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দর-...রে যখন নহবতে প্রভাতী রাগিণী বাজিয়া ...ল ঠিক সেই সময়ে নবশিশু ভূমিষ্ঠ হইল। ...র রোদনধ্বনিতে অন্তঃপুরিকাগণের প্রাণে ...টা অপরিমিত উচ্ছ্বলিত আনন্দ আবেগ ...ইয়া দিল। দোলোৎসব রাগিণী আজ ...ার মধ্যে অস্ফুট, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ...কণ্ঠের সাড়া পাইয়া মঙ্গল-শঙ্খ তাহার ...তিধ্বনি গাহিল, হুলুধ্বনি উঠিল, বাদ্যকার-...গর ঢাক ঢোল কাঁসী ঘণ্টা,—সানাইএর ...নিনাদে মিলিত হইয়া আকাশে বাতাসে ...টা পুলক মত্ততা জাগাইয়া তুলিল। ...র্বাটী ও অন্তর্বাটীর সন্ধিস্থলে যে প্রহরী ...হারায় নিযুক্ত ছিল—সে তাহার কর্ত্তব্য ...লিয়া উর্দ্ধশ্বাসে রাজাকে গিয়া খবর দিল ...তাঁহার বংশধর ও ছত্রধর জন্মিয়াছে।

এই সকল কাণ্ড এমন চকিতে সম্পন্ন ...ইয়া গেল যে নবশিশু যে কি সন্তান ইহা ...জ্ঞাসা করিতেও মহারাণীর অবসর হইল ...,...বুঝি সাহসেও কুলাইল না।

ধাত্রী যখন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া ...াপনা হইতে বলিল—"কন্যা-সন্তান গো" ...খন মহারাণীর নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া ...ড়িল ; নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—...সূতির মুখে গরম দুধ দিতে তিনি ভুলিয়া ...গলেন। শিশুর রোদনধ্বনি শুনিয়া বারান্দা ...হইতে উঠিয়া—দ্বার ঠেলিয়া যাহারা সূতিকা-গৃহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা হা-হুতাশ করিতে করিতে কেহ বসিয়া পড়িল কেহ বা ফিরিয়া গেল ; শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি সহসা থামিয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে চারিদিকে যেন একটা হাহাকার প্রবাহ বহিল ; উঠানের বাদ্যধ্বনি কেবল থামিল না, যেমন বাজিতেছিল সেইরূপই বাজিতে লাগিল, বাদ্যকারদিগকে বারণ করিবার উদ্যমটুকুও তখন কাহারও রহিল না।

তাহার নবসংসারে এতদূর নিরানন্দ নিরাশা আনয়ন করিয়াছে তাহা না জানিয়া সদ্যোজাত সদ্যোস্নাত নব বস্ত্রে সজ্জিত শিশু মধু মুখে পাইয়া দুইটি অঙ্গুলির সহ চক চক শব্দে তাহা পান করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত দীপাশিখার প্রতি আনন্দ-বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধাত্রী কিছু পরে মহারাণীর কোলে কন্যাকে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"মেয়ে হয়েছে তাতে এত দুঃখ কেন মহারাণী ? সাত রাজার ধন এক মাণিক বলে কোলে তুলে নিন্। দেখুন দেখি কত রূপ !"

তখন প্রসূতি নিরাপদ হইয়াছেন,—তাঁহার সেবাশুশ্রূষা শেষ করিয়া ধাত্রী তাঁহার গায়ের উপর একখানা শুভ্র বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। সূতিকার দ্বার সকল এখন উন্মুক্ত, গৃহপ্রবিষ্ট অরুণালোকে বালিকা-শিশুর মুখ-খানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া মহারাণীর অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এ কি ! সত্যই এ কি রূপ ! কি লাবণ্য ? সুবর্ণবর্ণের গোলায় কে যেন ইহাকে ধুইয়া দিয়াছে ! মহারাণী অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়ের

রূপ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ কমিল না—বরঞ্চ বাড়িয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"এ শিশু যদি আমার অতুলের পুত্রসন্তান হইত—হায়রে!"

রাজা কন্যা দর্শনে আসিলে মা বলিলেন—

"এবারও তোমার মেয়ে হোল অতুল! ভেবেছিলুম ছেলে হবে—তা ভগবান সে আশা পূর্ণ করলেন না।"

রাজা সতৃষ্ণ নয়নে কন্যাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"তাতে দুঃখ কেন মা, —সংসারে কি মেয়ের দরকার নেই?"

"আমাদের সংসারে ছেলেরই যে দরকার ছিল। তা এবার হোলনা, অন্যবারে হবে।"

"নাই হোল মা।"

"বেশ বলছিস্ যাহক। তোর এত বড় বংশ এত বড় নাম সব লোপ পেয়ে যাবে নাকি?"

"লোপ পাবে কেন? মেয়েরাই আমার নাম রাখবে?"

"জ্বালাস্‌নে অতুল! তুই হলি রায় চৌধুরী—জামাই হবে চোর ঘটক, ফটক, চটক এই রকম সব ত!"

"এই জন্যে এত ভাবনা! আমি দেখো —নামের মামলা ঠিক মিটিয়ে নেব। জান—চাটুয্যে বাড়ুয্যে মজুমদার মহালানবীশ —সকলেই রায়চৌধুরী হতে পারে,—আমি যে জামাই করব—তার ল্যাজে নিশ্চয়ই রায়চৌধুরীটা বসিয়ে দেব—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা।"

"হাসাস্‌নে বাছা,—আহা এ মেয়ে যদি তোর ছেলে হয়ে জন্মাত রে!"

"অত দুঃখ কেন করছ মা! গেছ যে আমাদের আদি বংশ মেয়েই আমার প্রমাতামহী তাঁর পিতৃরাজ্যে হয়েছিলেন—আমার মেয়েও তাই আমার অন্য দু মেয়ের নামকরণ তুমি, আমি এ মেয়ের নাম রাখলুম জ্যোতির্ম্ময়ী। তোমার নাতি হয়নি যে ক্ষোভ হয়েছে—নাতনীকে রাণী ডেকে সে ক্ষোভ মিটিও। যদি তাতেও না ঘোচে—তবে না হয় রাজা বলেই ডেকো।" এই বলিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

* * *

জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক বলিয়া ঠাকুরমা যে পরিমাণে দুঃখিত ছিলেন—তাহার অধিক পরিমাণ দে সে তাঁহার নিকট হইতে আদায় লইল। কেবল ঠাকুরমার নহে সকলেরই সে আদরের সামগ্রী দাঁড়াইল।

রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর বয়স দশ এবং মধ্যমা কন্যা কিরণ্ময়ীর সুতরাং এতদিন পরে জ্যোতি আবির্ভাবে অন্তঃপুরিকাগণের মে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার প্রতি বর্ষিত লাগিল। বোন দুইটির ত সে খেলার পু তাহাকে পাইলে তাহারা আহার নিদ্রা যায়। রাজবাড়ীর আত্মীয়া পরিচারিকা অবস্থাও তথৈবচ, শত কাজের মধ্যেও করিয়া লইয়া তাহারা শিশুদর্শনে যে আর মহারাণীর ত কথাই নাই—জ্যোতি তাঁহার বক্ষের ধন। তাহাকে দণ্ডে

কেবল তার প্রসূতি, স্তন্যপান করাইবার সময় মাত্র কন্যাকে তিনি কোলে পান।

রাজান্তঃপুরে ভৃত্য প্রবেশের নিয়ম নাই। কেবল দুইজন মাত্র এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে গণ্য। রাজার শৈশব ভৃত্য হরিরাম— রাজার পিতার আমলের দৌবারিক পাঁড়ে। ইহারা এৎলা দিয়া মহারাণীর নিকট যাইতে পারে। পেন্সন-ভোগী পাঁড়ে এখন এত বৃদ্ধ হইয়াছে যে চোখেও ভাল দেখিতে পায় না—কাণেও কম শোনে—কিন্তু তাহার বিশ্বাস সে দেউড়িতে না থাকিলে রাজবাড়ীর আদব-কায়দা রক্ষা হওয়া অসম্ভব। তাই পেন্সন লইয়াও সে বাড়ী ছাড়িতে পারে না। চোখের গুণে সে রাজার বন্ধু-বান্ধবদিগকেও গেট হইতে নির্ব্বাসন হুকুম দিয়া থাকে আর কাণের দোষে পাত্রপাত্র নির্ব্বিশেষে গালি-গালাজ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। মাঝে মাঝে নূতন লোকের নিকট রাজাকে এজন্য অপ্রস্তুতও হইতে হয়। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নাকি বড়ই নাকাল হইতে হইত, যদি না—সেই সময় রাজা আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তবে রাজার আত্মীয় বন্ধুরা পাঁড়েকে সকলেই চেনে, তাই তাহার ব্যবহার ক্ষোভের পরিবর্ত্তে তাহাদের কৌতুকই উদ্রেক করে। রাজার অল্পবয়স্ক আত্মীয় বালকদিগের নিকট হইতে পাঁড়ের এজন্য উপদ্রবও কম সহ্য করিতে হয় না, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা-অপরাধ চিরদিনই বালকদিগের হাসি তামাসার বিষয়।

বৃদ্ধ পাঁড়ে এবং হরিরামের শিশুদর্শন আবেদন যথাসময়ে পেশ হইল। ষষ্ঠীপূজার পর অন্তঃপুরের দালানে একজন পরিচারিকা শিশুকে কোলে লইয়া দাঁড়াইল—পাঁড়ে নিদ্রিত বালিকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্ধনয়নকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া মস্তক আঘ্রাণে তাহাকে অভিনন্দন করিল। হরিরামের চিত্ত এত সহজে তৃপ্তিলাভ করিল না। পরিচারিকার নিকট হইতে তাহাকে নিজহস্তে তুলিয়া লইয়া সুনিপুণা ধাত্রীর মত আস্তে আস্তে দোল দিতে দিতে হর্ষবিস্ফারিত নয়নে তাহাকে দেখিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "রাজকুমারী কি হুবহু রাজার মত দেখিতে হইয়াছেন!"

একথা মহারাণী কিন্তু এ পর্য্যন্ত একবারও মুখে আনেন নাই। ইহার পর হইতে হরিরামের সংসারের শত মায়ার সহিত আর এক মায়ার যোগ হইল। সে প্রতিদিনই একবার করিয়া শিশুকে দেখিতে আসিত। যেদিন কোন কারণে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিত সেদিন শ্যামসুন্দরের আরতির সময়েও মনস্থির রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। কেবলি তাহার মনে হইত—হয় ত বা রাজকুমারীর কোন অসুখ হইয়াছে।

শিশু যখন আট দশ মাসের—তখন হইতে হরিরামের এক নূতন কাজ জুটিল। বালিকার নরম নরম রেশমী চুলগুলি সে মাথার উপর তুলিয়া চূড়া করিয়া বাঁধিয়া দিত, একখানি পীতধড়া পরাইয়া কটিদেশে সোনার পাটা কষিয়া দিত, এইরূপে সাজসজ্জা শেষ করিয়া তাহাকে বুকের উপর দাঁড় করাইয়া হরিরাম গান ধরিত—

নাচে আমার গোপালমণি দেখবি যদি আয়,—
তার—পীতধড়া মোহনচূড়া, নূপুর বাজে পায়।

ভৃত্যের গানের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা হাসিয়া হাসিয়া নাচিত। ঠাকুরমা এই নাচ দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, যে হরিরামের অবিলম্বে ৫ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইল—অধিকন্তু এত দামী ভাল ভাল কাপড় সে উপহার পাইতে লাগিল, যে তাহার স্ত্রী কন্যার বেশভূষা অন্যান্য পরিচারিকাগণের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাজাও মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার নাচ দেখিয়া প্রীত হইতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর মনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাচেরও উন্নতি দেখা গেল।

তিন বৎসর বয়স হইবার আগেই তাহাকে হরিরাম গায়িকা করিয়া তুলিল। নূপুর দুগাছি তাহার পায়ে সদাসর্ব্বদাই থাকিত, কিন্তু ভৃত্য বালিকার নিকট আসিবার সময় তাহার জন্য প্রতিদিন একগাছি করিয়া ফুলের মালা লইয়া আসে। মালাটি তাহার গলে পরাইয়া, হাতে একটি বাঁশি তুলিয়া দেয়; —বাঁশিটি দুই হাতে ধরিয়া পা-দুটি একটির উপর আর একটি রাখিয়া হরিরামের মোটা গলার সঙ্গে মিলাইয়া আধ আধ কোমল কণ্ঠে সে গান ধরে,—

নাচে আমার গোপালমণি দেখ্‌বি তোরা আয়,—
তার, পীতধড়া মোহন চূড়া—নূপুর বাজে পায়!
তার—বনমালা গলায় দোলে, (সে যে)
রুণুঝুণু রঙ্গে চলে—
তার, নয়ন-কোণে চাঁদের আলো ঝলকিয়ে যায়!
দেখবি যদি শ্যামের লীলা,
আয় গো ছুটে ব্রজবালা
তার হাতের বাঁশি,—শোন্‌রে আসি
কি মধুর গায়!

গান আরম্ভ হইবার পর হরিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বালিকার নৃত্য আরম্ভ হয়—মনোমোহন নৃত্য দেখিবার জন্য রাজবাড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। রাজার ইচ্ছা হইল কন্যার এই নৃত্য-গীতে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে একদিন পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু গুরু মজলিসে আনীত হইয়া বালিকা এ নিস্তব্ধ গম্ভীর হইয়া গেল যে পিতার অনুরোধেও একটি পা তাহার নড়িল না কন্যার যে বেশ একটু জেদ আছে সেই হইতে তাহা বেশ বুঝা গেল।

(৬)

জ্যোতির্ম্ময়ী যখন ৭।৮ বৎসরের বালি তখন রাজবাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুই তি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। রাজার কন্যারই বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে জমীদারের দুই পুত্রের সহিত। হিরণ্ময়ীর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে প্রসবের অকালমৃত্যু ঘটিল, আর ইহার অল্পদিন কিরণ্ময়ীও ইহলোক ত্যাগ করিল। পীড়ায় যে তাহার মৃত্যু হইল—অতুলে তাহা জানিতেও পারিলেন না। সব হইয়া যাইবার পর তাঁহার নিকট এ আসিল। রাণী তখন অন্তঃস্বত্তা ছিলেন—অল্প সময়ের মধ্যে উপরি উপরি দু কন্যার মৃত্যুশোক তাঁহার সহ্য হইল অকালপ্রসবে তিনিও ইহলোক ত্যা করিলেন। রাজবাড়ীর সকলেই শোকনি হইল, বালিকার জীবনেও একটা সুগভী কাল রেখা পড়িল, কিন্তু মর্ম্মাহত হইলে অতুলেশ্বর। এই আঘাতে মহাকাল-চক্রে কক্ষবিচ্যুত হইয়া তাঁহার জীবন যেন

প্রধাবিত হইল। দুঃখের মধ্য দিয়া ধান যেন তাঁহাকে নব জন্মদানে নূতন ন প্রবুদ্ধ করিলেন।

অতুলেশ্বর স্বভাবতঃ উদারপ্রকৃতি— ন মনে বুঝিতেন স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা শের পক্ষে জাতির পক্ষে কল্যাণজনক! ত এ সত্য তাঁহার মনে এমন বদ্ধমূল বে বসে নাই—যে আজন্ম সংসারের বেড়া লিবার সাহস তাঁহার জন্মায়। আজ নি বুঝিলেন—স্ত্রী-শিক্ষা কেবল মাত্র ল্যাণজনক তাহা নয়—স্ত্রী-জাতির জ্ঞান-ত্র উন্মেষের উপর জাতির গতি-মুক্তি কান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে। তিনি তিজ্ঞা করিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর াটবেলায় বিবাহ দিবেন না—এবং তাহাকে তিমত লেখাপড়া শিখাইবেন।

এই সময় প্রসাদপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট বদল ল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লাউডেন সাহেবের ত্নী রাজার এই শোকের সময় আন্তরিক াবে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। মশঃ উভয়ের মধ্যে বেশ একটু দ্যুত্ব জন্মিল, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায়— াজা তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত রিতে যেন দৈবশক্তি লাভ করিলেন। াঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার পরামর্শে াজান্তঃপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ইল। বাঙ্গলা পড়াইতে কলিকাতা হইতে ইজন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, ইংরাজীর জন্য ানীয় মিশনারী মেম দুইজন নিযুক্ত ইলেন। রাজবাটির বালিকাগণ এবং প্রজা-দিগের কন্যাও অনেকে এখানে শিখিতে লাগিল।—

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী—নিজে দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে আসিয়া সেলাই শিখাইতেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন—এবং মাসে একবার করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর মেধাশক্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন। যাহা তাহাকে শেখান হইত অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে তাহা অভ্যস্থ করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত জটীল পাঠ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। সদাসর্ব্বদা নিজের বাটিতে লইয়া যাইতেন।

রাজা বিকালে বায়ুসেবনে গমনকালে প্রায়ই কন্যাকে গাড়ীতে সঙ্গে লইতেন। সকালে সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখিত। অনেক সময় পিতার সহিত শীকারেও সে যাইত। মেয়েদের নির্ভীকতা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে,—ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী—রাজাকে ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। একবার জ্যোতির্ম্ময়ী শীকারস্থলে তাহার সাহসের আশ্চর্য্যরূপ পরিচয় দিয়াছিল। একটা শীকারী হাতী সেখানে কি কারণে কে জানে মাহুতের অবাধ্য হইয়া বেগে ছুটিয়া—সকলকে ভয়বিহ্বল করিয়া তুলিল। মাহুত যদি একেবারে বে-এক্‌তার হইয়া পড়ে তবে হস্তী যে কত লোককে পদদলিত, আহত করিবে তাহার ঠিক নাই। এই আতঙ্ক চাঞ্চল্যের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশান্তভাবে বংশীধ্বনির মত মধুর অথচ উচ্চস্বরে,—ডাকিল —"মিতিয়া—মিতিয়া"! সে স্বরে ধাবমান হস্তীর গতিবেগ সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল—ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইল,—জ্যোতির্ম্ময়ী

আবার ডাকিল "আও ভাইয়া—আও মিতিয়া" —হাতী ধীরে ধীরে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তীর নিকট আসিয়া শুণ্ড তুলিয়া ধরিল; বালিকা তাহাকে আদর করিয়া স্কন্ধে বিলম্বিত শীকার-ঝুলি হইতে একখণ্ড রুটি বাহির করিয়া তাহাকে প্রদান করিল,—সে সেলাম করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া শান্ত হইয়া গেল। বালিকা যে হাতীশালায়, ঘোড়াশালায় গিয়া জীবজন্তুর সহিত ভাব করে—ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি তাহা এই প্রথম জানিলেন। সুতরাং এ ঘটনায় তাঁহারা তেমন বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু ভৃত্য সকলে বলিল—"জন্মাষ্টমীর দিনে বালিকার জন্ম—তাহার দৈবশক্তি হইবে না?"

এইরূপ অনাচারের মধ্যে কন্যাকে লালিত পালিত করিতে দেখিয়া মহারাণী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেন,—কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না। রাজা মেয়েকে সঙ্গে রাখিয়া মনের মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া যদি শোক ভুলিয়া থাকেন, ত তিনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে নিরস্ত করিবেন? আর কতদিনই বা এ খেলা! যতদিন কন্যার না বিবাহ হয়—সেই কটা দিন বইত নয়? লউন এই কয়েক দিন রাজা তাঁহার সখ মিটাইয়া।—কিন্তু মহারাণী যখন দেখিলেন বার বৎসরের মেয়েরও বিবাহের নামগন্ধ রাজা মুখে আনেন না, তখন তিনি ভীত হইয়া জেদ ধরিয়া বসিলেন,—"মেয়ের বর খোঁজ,—বিবাহ দাও,—তাহাকে অন্তঃপুরিকা কর,—আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিও না।"

রাজা কিন্তু এবার অটল,—তিনি একান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"না মা আমি আর ছোটবেলায় মেয়ের বিবাহ দেব না, আমাকে ঐ অনুরোধটি কোরো না।" মা উত্তরে প্রথমত কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দুইটী কন্যার অকাল-মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাকেও নিস্তব্ধ করিয়া তুলিল! কিছুপরে দুঃখের চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মেয়েকে স্বয়ম্বরা করবি নাকি রে?" এইরূপ কৌতুক-বাক্যে পুত্রের মন হইতে শোকস্মৃতি তাড়াইয়া দিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়।

তাঁহাদের কথা হইতেছিল অন্তঃপুরের দালানে একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মহারাণী কোমল শয্যা গ্রহণ করিতেন না। রাজা মাতার কথায় পাশের উন্মুক্ত আকাশ-খণ্ডের দিকে চাহিয়া কণ্ঠাগত সুদীর্ঘ নিশ্বাস সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ফেলিয়া উত্তরে বলিলেন, "ক্ষতি কি? আগে ত সেইরকমই হোত।"

"সেকাল নেইরে—কতবার সে কথা বোঝাব তোকে? যা যায় তা কি আর ফেরে অতুল!" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহারাণীর মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে নয়নে জলও ভরিয়া উঠিল। এবার রাজার পালা,—মায়ের অশ্রুজল নিবারণ উদ্দেশে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিলেন,—

"কেন মা, কালচক্র ঘুরে ফিরে ত সেই একই পথে আসে,—একালকে সেকাল করে তুলব আমরা, সেজন্য ভাবনা কি! সেই চেষ্টাতেই ত আমি আছি—সেটা কি বুঝছ না মা?"

"বুঝছি বলেই ত ভয় পাই। অসাধ্য-সাধন করতে গিয়ে কি-একটা অদ্ভুত কাণ্ড

করে বসবি! তা বাছা বিয়ে এখন নাই দিলি—পাত্র দেখে রাখতে ক্ষতি কি?"

"বড় না হলে যখন বিয়ে দেবই না তখন পাত্র দেখে লাভও ত নেই। বরঞ্চ ক্ষতি এই—পরে আরও ভাল পাত্র যদি পাওয়া যায় তখন তাকে গ্রহণ করবার আর উপায় থাকবে না।"

এই সময় সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীর সময়োচিত আবির্ভাবে সে কথা বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল। বালিকা সেজন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে যাইবে বলিয়া সজ্জাড়ম্বর তাহাতে কিছুই ছিল না। বেশী সাজসজ্জা বা গহনা পরা রাজা ভাল বাসেন না, মেয়েরও সেইরূপ রুচি হইয়াছে। প্রতিদিন বিকালে যে সাজে সে পিতার সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে যায়—আজও তাহার সেই একইরূপ সাজ। সে পরিয়াছে ফিকা গোলাপী রঙের একখানি সাড়ী, শাদা রেশমের একটি জ্যাকেট ও শাদা রঙের জুতা মোজা। অলঙ্কারের মধ্যে উন্মুক্ত কেশ-বন্ধনী স্বরূপ শিরোভাগে মুক্তার কাজ করা একটি গোলাপি ফিতা, দুএকটি ব্রোচ; হাতে দুগাছি মুক্তার চুড়ি,আর কণ্ঠে একগাছি মতির মালা। জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষয়িত্রী গভর্ণেশ কুন্দবালা তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছিল। এই স্বল্পতর সাজে তাহার রূপখানি এত খুলিয়াছিল, যে মনে হইতেছিল বালিকা যেন কতই সাজ-সজ্জা করিয়াছে। রাজা কন্যার প্রতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সময় হয়েছে বুঝি, চল রাণী।"

রাজা কন্যাকে রাণী বলিয়াই ডাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন,—মহারাণীর নয়নে কন্যার রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগতঃ বলিলেন, "হায়রে! এত রূপ—মেয়ের, এ না জানি কার হাতে পড়রে, সে আদর করবে কি অনাদর করবে—তারই বা ঠিক কি? সাধে কি মেয়ে ছেলে হলে দুঃখ করি! মেয়ে-জন্মের ত কত সুখ! এই জন্যেই অতুল মেয়ের শিগ্‌গির বিয়ে দিতে চায় না, তাও বুঝি,—কিন্তু তবুও ত দিতে হবে রে বোকা!"

মহারাণী রাজার অজ্ঞাতসারে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা আর একটি অভূতপূর্ব্ব কাজ করিয়া বসিলেন।—১২ বৎসরের মেয়েকে আজও বাহিরে রাখিয়া রাজা ক্ষান্ত নহেন, তার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এক পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। মহারাণী অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু এত বড় একটা অনাচার তিনি চুপ করিয়া সহিতে পারিলেন না। পুত্রকে ডাকিয়া—শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন—"তুই কি জাত ধর্ম্ম সব খোয়াবি রে? নিদেন আমার মরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্।"

রাজা তাঁহার ক্রোধোক্তিতে না দমিয়া হাস্যমুখেই বলিলেন—"জান মা তোমার ঐ আঘাত আমার মাথাতেই পড়ছে! আমাকে অভিশাপ লাগছে? তুমি দেখে নিও—কে আগে মরে।"

রাজার এই কথায় মহারাণী জাতি ধর্ম্মের ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া গেলেন।

এই রকম কৌশলে বরাবরই পুত্র মাকে হার মানাইয়া আসিতেছেন। মহারাণী আকুল

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কণ্ঠে কহিলেন, "ঘাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, অভাগিনীর আঁচলের ধন তুই—অমন কথা মুখে আনিসনে বাছা,—তোর মেয়েকে নিয়ে তুই যা খুসী কর্‌গে।"

"কিন্তু তুমি অসুখী হলে ত তা পারব না মা। তোমার দুষ্টু ছেলের সব কাজই খুসী হয়ে তোমাকে মেনে নিতে হবে। জ্যোতির্ম্ময়ী ছেলে নয় বলে তোমার এত আক্ষেপ—তাইতেই না আমি তাকে ছেলে গড়বার চেষ্টাতে আছি!"

মায়ের রাগ ছেলের কথায় পড়িয়া আসিয়াছিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওরে নির্ব্বুদ্ধি, তুই ইচ্ছা কর্‌লেই কি তা হবে? শেষে তোর মেয়েটি চিত্রাঙ্গদা হয়ে দাঁড়াবে —দেখে নিস্।"

"অর্জ্জুনের মত নাতজামাই যদি পাও—তাতে ত তোমার আপত্তিও হবে না মা।"

"সেই বরই প্রার্থনা করি। তোর মেয়ে ভাগ্যবতী,—তা হোতেও পারে।" এইরূপে ক্রন্দনপর্ব্ব হাস্যে পরিণত হইলে মহারাণী বলিলেন—"তবু ত বাছা তোর বংশধর চাই। অর্জ্জুন নাতজামাই মেয়ের প্রাণ ঠাণ্ডা করবে—কিন্তু ছেলে নইলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কে বল দেখি? বিয়ে কর্ বাছা,—আর বাঁচব—আমার এই সাধটি পূর্ণ লক্ষ্মী ছেলেটি আমার।"

"সব সাধ কি সংসারে পূর্ণ হয় ছেলে হবার হলে আগেই হোত। মেয়ে নিয়েই তোমার সাধ বাসনা করতে হবে।"

"তাই বা দিচ্ছিস কই? মেয়ের ত দিতে চাচ্ছিস নে।"

"দুট মেয়ের ত ছোটবেলাতেই দিয়েছিলে,—কত সাধ তোমার পূর্ণ বল দেখি? তোমাদের মনের গতি বুঝে উঠতে পারিনে? পদে পদে ঠেক্‌ কিছুতেই তবু শিখতে চাইবে না!" রাগ করিয়া এই কথা বলিয়াই গেলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দে

মাসকাবারি

আর্টের অভিব্যক্তি ও আধুনিক আর্টের রূপ

জর্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল আর্টের অভিব্যক্তির ধারায় oriental, classical এবং romantic এই তিন শ্রেণীপর্য্যায় নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন আর্টের শৈশব অবস্থায় দেখা যায় যে, শিল্পীর অন্তর্ভাবসম্পদ্ ভাবপ্রকাশের জড় উপকরণ বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে যথাযথ প্রকাশ করিতে পারে নাই। কবি, শিল্পী বা ভাস্করের মনের মধ্যে যে আইডিয়াটি তাহা কাব্যে সুবিহিত আকার পায় চিত্রে বিক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জিত হইয়া

...ত অসমবিন্যস্ত বা অপরিমাণ হইয়া নষ্ট ...ছে। এই শ্রেণীর আর্টকে হিগেল ...ntal art নাম দিয়াছিলেন। তারপর ...ন দেখাইয়াছেন যে, আর্টের যৌবন দশায় ...র সঙ্গে ভাবের প্রকাশের সাযুজ্য ও ...্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাব আপন ...শের মধ্যে সুবিহিত সুপরিমিত ও সুষমা ...ষ্ট আকার লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে। ...ল এই আর্টকে classical art বলিয়া-...। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের সভ্যতা ...র নানা খাত কাটিয়া বিবিধ ধারায় ...মান; সেই বহুযুগব্যাপী জ্ঞানবিজ্ঞানের ...না, সামাজিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক ...ার ফলে মানুষের রসবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ ...তি ক্রমশ সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ...আর্টের প্রৌঢ়দশায় ভাবকে প্রকাশ ...তে গিয়া কবির বাণী নীরব হইয়া যায়, ...র ব্যর্থকাম হইয়া তুলি ফেলিয়া দেয়, ...র স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। শিল্পী তার সৌন্দর্য্য-...ধের মধ্যে এমন এক অনন্ত ব্যাকুলতা ...ভব করে, প্রেমের অনুভাবের মধ্যে এমন ...র্ব্বচনীয়তা আস্বাদ করে, এবং কি ভিতরে ...বাহিরে সর্ব্বত্রই এমন অতলস্পর্শ অসীম ...তাকে অভিভূত করিয়া দেয় যে, কেমন ...য়া যে তাকে প্রকাশ করিবে তাহা সে ...বিয়াই পায় না। এই অস্পষ্টসুন্দর, এই ...ক্তের ব্যঞ্জনাময় আর্টকে হিগেল romantic ...আখ্যা দিয়াছেন।

...হিগেল-কথিত এই তিন শ্রেণীর আর্টের ...ই হয় ত কোন সাহিত্যে সমকালেই ...ান দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ...ই বলিয়া ইহাদের পারম্পর্য্য নাই মনে করিবার কোন হেতু নাই। সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া কি সভ্যতার আদিম অবস্থার ছবি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেছে? হিগেল মনে করিতেন যে, রোমান্টিক আর্টেই আর্টের চরম পরিণতি। ইহার পর আর্টের আর ভবিষ্য বিকাশ হইবে না, তাহা ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবে। দার্শনিক জল্পনার বিজৃম্ভণ এবং জীবনের বিকাশ যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর মেলেনা, হিগেলের এই দম্ভোক্তিই তার প্রমাণ। আর্ট কত অভাবনীয় বিকাশের পথ ধরিয়া নব নব রূপে অভিব্যক্ত হইবে, কারণ তাহা সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করিতে চায় এবং জীবনের অভিব্যক্তি তো শেষ হইয়া যায় নাই। কোন স্পর্দ্ধিত তাত্ত্বিক—ব্যস্ এই পর্য্যন্তই আর্টের সীমা—ইহা বলিলে চলিবে কেন?

রোমান্টিক আর্টের পরে একালে realistic art বাস্তব আর্ট এবং symbolical ও mystical art রূপক ও অতীন্দ্রিয় রসাত্মক আর্ট দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ একদিকে সাহিত্যের একধারায় দেখি—নৃবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, মিথুনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র নূতন তথ্য স্তূপীকৃত হওয়াতে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার ভাঙিয়া চুরিয়া যাইতেছে। বংশানুক্রমগত (hereditary) অসুস্থ (pathological) অস্বাভাবিক (abnormal), ও সমাজ-প্রতিকূল (ante-social) কত যে পাপ অপরাধ ও বিকৃতির বিশ্লেষ ও উদ্ঘাটন

জোলা-ইব্‌সেন হইতে সুরু করিয়া এ কালের সাহিত্যে জমিয়া উঠিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, ধনীর সহিত শ্রমীর সম্বন্ধ—সকল সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা, সকল স্থিতি ও ব্যবস্থা, উলোট্ পালোট হইয়া ঘূর্ণী-বায়ুপ্রক্ষিপ্ত পর্ণরাশির মত উড়িয়া যাইতেছে। এর নাম রিয়ালিজম্ বা বাস্তবতা। রোমান্টিসিজ্‌ম্‌কে ইহা পরিহাস করে। সাহিত্যকে ইহা বিজ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দাঁড় করাইতে চায়। ইহা তথ্যকেই বড় করিয়া দেখে, সত্যকে নয়।

অথচ একালের সাহিত্যেরই আর এক ধারায় দেখি হিগেল-কথিত রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ই symbolism ও mysticismএ পরিণতি লাভ করিতেছে। symbolismকে আমরা রূপক বলি, কিন্তু তাহা অ্যালিগরি-জাতীয় সাবেক ধরণের রূপক নয়। অ্যালিগরি শ্রেণীর রূপকের মধ্যে দুইটা ধারা থাকে—একটা স্থূল ঘটনাবহুল বাস্তবচরিত্রসম্বলিত কাহিনীর ধারা, এবং অন্যটা সেই সব ঘটনা বা নায়ক নায়িকারা কোন্ কোন্ ভাবের বিগ্রহ, সেই বিগ্রহসমষ্টিগত রূপক-কাহিনীর ধারা। বাস্তব কাহিনী হিসাবেও অ্যালিগরির রসাস্বাদ হয়, আবার রূপক-কাহিনী হিসাবেও হইয়া থাকে। যেমন স্পেন্‌সারের Faerie queene কিম্বা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ অ্যালিগরির উদাহরণ। কিন্তু symbolical রূপকজাতীয় রচনায় অ্যালিগরি-শ্রেণীর দুইটা ধারা থাকিলেও সেখানে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব অর্থটার কোন প্রাধান্যই নাই। বাস্তব ঘটনা বা চরিত্র ব্যঞ্জনার দ্বারা যে আর এক গভীরতর অতীন্দ্রিয় অর্থকে ব্যঞ্জিত করিতে যে গভীরতর অর্থের আভাস দিতে symbolical আর্টে তারই প্রাধান্য। ধর, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের চিঠি ডাকঘর প্রভৃতির বাস্তব হিসাবে সার্থকতা নাই—এই সমস্ত রূপ একটি অ বা অপরূপ লোকের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ—অতীন্দ্রিয় লোকটাই এখানে সত্য, লোকটা মায়াছায়া মাত্র। আধুনিক ইউরোপে এই শ্রেণীর symbolical ও সাহিত্য অজস্র। মেটারলিঙ্কের প্রায় নাটকই এই জাতীয়। কেল্টিক কবি নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন।

এই symbolical আর্টের সঙ্গে আর্টের একটু বিভেদ আছে। symbolical আর্টে symbolical রূপকের মত দুইটা ধারা নাই—সেখানে বাহির ভিতর এক একটি মাত্র অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা, অখণ্ড নিবিড় আনন্দের সমুচ্ছ্বাস, দিব্য বোধি দেখিতে পাই। অনেক symbolical ও mystical, এ দুয়ের এই বিভেদ না ধরিবার দরুণ symbolic রচনাকেই mystical নাম দেওয়া থাকে।

Realism বা বাস্তবতার সঙ্গে symbolism বা mysticismএর আপা বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও আসলে বিরো নাই। কেননা বাস্তবতার পক্ষীয় যাঁ তাঁরাও আসলে চান্ বাস্তবের অন্তর্নি সত্য, ফরাসীরা যাকে বলেন—la veri vraie—the very essence of truth

তাই তাঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রণালীতে সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। আবার symbolist কিম্বা mystic সেই একই এষণায় নিরত। তাঁরাও খুঁজিতেছেন বাস্তবেরই অন্তর্নিহিত সত্য। দুয়ের মধ্যে বিরোধ কেবল এই জায়গায় যে, বাস্তবপন্থী সত্যকে বিচিত্র তথ্যের (Fact) জঙ্গলের মধ্যে হারাইতেছেন, তাঁরা আর্টের আনন্দের ও রসের জায়গায় বিজ্ঞানের শুষ্ক বিশ্লেষণ উপস্থিত করিতেছেন; অপর পক্ষে রূপকপন্থী ও মিষ্টিক সেই বিচিত্র তথ্যের জাল বুনিবার চেষ্টা না করিয়া বাস্তবকেই প্রত্যক্ষকেই অতীন্দ্রিয়ের ব্যঞ্জনায় অপরোক্ষের আভাসে পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। মিষ্টিক মাত্রেরই এই মন্ত্র :—এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ। ইনি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তুরীয় সত্তা ইহার অর্থাৎ বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্তার, পরম আনন্দ। এই উভয়ের আর দুই ধারা নাই, এক অখণ্ড ধারা।

বস্তুতপক্ষে বাস্তবপন্থা ও রূপকপন্থা এই দুই পন্থাতেই আর্ট-সাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে চলিয়াছে। মিষ্টিক পন্থা যথার্থভাবে এখনও দেখা দেয় নাই। সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক বা ইয়েট্‌স্ বা এ,ই, প্রভৃতি যাঁহাদিগকে মিষ্টিক বলা হইয়া থাকে, তাঁরা প্রায় সকলেই রূপকপন্থী। তাঁদের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে আইডিয়ালের বিভেদ আছে। কিন্তু যথার্থ মিষ্টিকের মধ্যে সে বিভেদ থাকেনা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

ভূদেব চরিত। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড অফিস হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি চরিত-গ্রন্থ। বাঙ্‌লা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের আদিযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, আমাদের জাতীয়তা যখন বিপন্ন, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন জাতির চক্ষে দরিদ্র ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছে, সেই সঙ্কট সময়ে মহাত্মা ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। কালের স্রোত তাঁহার চিত্তকে আঘাত করিয়াছিল—কিন্তু ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। তিনি সুদৃঢ় অটল মহিমায় আমাদের জাতীয়তার নিশানটিকে সবলে ধরিয়া উড্ডীন রাখিয়া ছিলেন—আমাদের শাস্ত্র-বিধি, আমাদের আচার-নীতি সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—প্রাচ্য আদর্শের গভীর মহিমা বজ্রস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে ভূদেব ভারতে এক নব যুগের প্রবর্ত্তক। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনের বহু কাহিনী সুন্দর সুশৃঙ্খল ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বংশ-পরিচয় এবং কি করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান আপন-শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিলেন, একই কালে বিদেশী রাজপুরুষ ও স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা এবং গৌরব আকর্ষণ করিলেন, সে কাহিনী বেশ প্রাঞ্জল সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই চরিত-গ্রন্থখানির প্রধান গুণ, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে ভূদেবকে পরিপূর্ণভাবে জানা যায়, ভূদেবের ব্যক্তিত্বও বিশেষত্ব রচনার গুণে সুন্দর ফুটিয়াছে। এইখানেই চরিত-গ্রন্থ-লেখকের কৌশল, কৃতিত্ব, ইহাই চরিত-গ্রন্থ-রচনার আর্ট।

ভূদেববাবু তখন ছাত্র; তাঁহারই উপর বাড়ীর

বিগ্রহাদির আরতি করিবার ভার; মিসনরীগণের সংশ্রবে ভূদেববাবুর মনে দ্বন্দ্ব বাধিল; তিনি একদিন রাত্রে ঠাকুরের আরতি করিলেন না। পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আরতি কর নাই কেন? ভূদেব বলিলেন, উহা পৌত্তলিকতা, উহা করিলে পাপ হয়। পিতা এ কথায় কোন তিরস্কার করিলেন না, শুধু বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র পুত্র; আমরা একবাড়ীতেই থাকি, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ কথা-বার্ত্তা বড় কম হয়। কাল হইতে ভোরে উঠিয়া দুইজনে গঙ্গাস্নানে যাইব, পথে একত্রে অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তা কহিতে পাইব। সেই ব্যবস্থাই হইল। পথে পিতার সহিত সহজ কথায় বার্ত্তায় পুত্র বুঝিলেন, নিজে শাস্ত্র কিছুমাত্র অধ্যয়ন না করিয়া স্বধর্ম্মের কোন কথা না জানিয়া তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অন্যায়; তিনি তখন নিজের শাস্ত্র, নিজের ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মোহ কাটিল। স্বদেশবাসী তাহার ফলে অমূল্য গ্রন্থ লাভ করিল।

মুসলমানের প্রতি ভূদেববাবুর এতটুকু বিদ্বেষ ছিল না; তিনি বলিতেন, হিন্দু-মুসলমান এক মাতৃ-স্তন্যে পরিপুষ্ট। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে "দুধভাই"। সামাজিক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটি বর্ণ-বিশেষরূপেই লক্ষিত হইবেন, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" ইহা মস্ত রাজনীতিজ্ঞের কথা। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ মনে করিতেন; সমস্ত সমাজের স্থায়ী উপকারকেই সারাৎসার ভাবিতেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের সুবিধা, মোটের উপর ব্যক্তিগত ইহ-পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য তাহাতেই অধিক, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

বাস্তবিক কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং কি কর্ম্মক্ষেত্রে—সকল স্থলেই ভূদেববাবু principle মানিয়া চলিতেন—এবং সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাঙলার শিক্ষা-বিস্তারের মূলে তাঁহার চেষ্টা সামান্য নয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই তারিখে সেক্রেটারি অব ষ্টেট্ শিক্ষাসম্বন্ধীয় ডেস্‌পাচে ভূদেববাবুর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন, "উক্ত কর্ম্মচারীর (ভূদেববাবুর) ঐকান্তিকতা এবং সুবুদ্ধি (zeal and intelligence) এবং গবর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থায় যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছি।" (have been much gratified at that officer's zeal and intelligence and the correct comprehension mainfested in his report of the progress of the Government in the establishment of his system.) আজ পল্লী-সংস্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের দিকে দেশবাসীর নজর পড়িয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে ভূদেব বাবু তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে স্বদেশজাত শিল্প প্রভৃতির উন্নতির দিকে আমরা ঝোঁক দিয়াছি, বহুকাল পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেব সে দিকেও আমাদের চোখ ফুটাইতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি," "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস," "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রভৃতি জ্ঞান-গভীর গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৌরব, জাতির গৌরব, যে-কোন-সাহিত্যে গর্ব্বের সামগ্রী। এ জীবনী-গ্রন্থে ভূদেব বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু তিনি যিনিই হউন, ভূদেব বাবুকে তিনি ভাল করিয়া চিনিয়াছেন এবং দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে চিনাইতেও পারিয়াছেন। এখানি গ্রন্থের প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। লেখক এই গ্রন্থ রচনা করিতে বিস্তর পুরাতন চিঠি-পত্র সরকারি রিপোর্ট প্রভৃতি ঘাঁটিয়াছেন, তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ। তবে আমাদের অনুরোধ, দ্বিতীয় ভাগে ভূদেব বাবুর জীবনের একটি critical study যেন তিনি পাঠক-গণের সম্মুখে ধরিয়া দেন। এ গ্রন্থে প্রকাশকের ত্রুটি একটি বিষয়ে লক্ষ্য হইল—গ্রন্থে সূচী দেওয়া হয় নাই, indexএর ধরণে গোড়ায় একটি সূচী দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, এ ত্রুটি অচিরে স্খালিত হইবে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে—এবং এত বড় গ্রন্থের মূল্য দুই টাকা মাত্র করিয়া প্রকাশক-মহাশয়

যে এ গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে সহজ-প্রাপ্য করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ঠাণদিদির কবিরাজী। বা সরল গৃহ-চিকিৎসা। (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ) শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক নানা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থহইতে সঙ্কলিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ও ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে নানা ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ ও তাহার প্রতিকারের অত্যন্ত সহজ ঔষধাদির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং রচনার ভঙ্গীটিও এমন সহজ যে অল্পশিক্ষিতা রমণীগণও পাঠ করিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য এবং ঔষধগুলিও পরীক্ষিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাচীনার দল ছেলেমেয়েদের ছোট-খাট অসুখ-বিসুখে নিজেরাই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন, এখন বাড়ীর ছোট ছেলেটির সামান্য একটু সর্দ্দি হইলে আমরা ডাক্তার ডাকি এবং ক্ষুদ্র শিশুকে প্রেসক্রিপসনের মিক্‌শ্চার খাওয়াইবার ব্যবস্থা করি। অসুবিধা ইহাতে কতখানি তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এবং কুড়ি-পঁচিশ টাকাই যখন আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর মাসিক আয়, তখন গৃহস্থের পক্ষে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ যে একান্ত কঠিন,এমন কি অসাধ্য, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর ছোটবেলা হইতে মিক্‌শ্চার, পেণ্ট ও তাপ-প্রভৃতির চাপে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হইতে পায় না। আমাদের প্রাচীন প্রথায় নানা গাছ-গাছড়ার মূল পাতা এবং টোট্‌কা ঔষধে বিস্তর উপকার হইত। সেই সব পুরানো হারানো ব্যবস্থা এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমেই এ গ্রন্থে জ্বরের কথা আছে। জ্বর কয় প্রকার, কোন্ জ্বরের কি লক্ষণ, উপবাসের উপকারিতা কি, এবং কিরূপ লক্ষণ-যুক্ত জ্বরে কিরূপ ঔষধ-পথ্যই বা দেওয়া উচিত তাহার পরিপূর্ণ বিবরণ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এমনি ভাবে অতিসার, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, দাহ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ রোগের লক্ষণ-ঔষধাদির কথাই বিবৃত হইয়াছে। ঔষধগুলি অত্যন্ত সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহা যথেষ্ট সুলভ। পরিশিষ্টে ঔষধগুলির ভারতের নানা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন নামের তালিকাও আছে। এ গ্রন্থ-খানি বাঙলার প্রবীণা ও নবীনা জননীগণের হস্তে বিরাজ করিলে কল্যাণের সম্ভাবনা আছে।

বজ্রমণি। শ্রীমতী সীতা দেবী প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি; "চোখের আলো," "স্মৃতিরক্ষা," "পথের দেখা", "রূপান্তর", "আলো ফুল" ও "সাথী"—এই ছয়টি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি গল্প মৌলিক এবং শেষেরটি ব্রেট হার্টের গল্পের অনুবাদ। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, ভাষায় প্রাণ আছে, রচনার ভঙ্গীও হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রায় সর্ব্বত্রই সহজ কথাকে বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া বলিবার চেষ্টা এবং জোর করিয়া হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করিয়াছে। গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ আছে এবং তাহা উপভোগ্য হইয়াছে। "চোখের আলো" ও "রূপান্তর" গল্প দুইটিতে রোমান্স বেশ ফুটিয়াছে; তবে এ দুইটি গল্পই একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। "স্মৃতি-রক্ষা" গল্পটিতে করুণ রস চমৎকার ফুটিয়াছে! বাঙালীর সমাজে উমার মত দুর্ভাগিনী বালিকার অভাব নাই, এ ধরণের গল্প বাঙলা সাহিত্যে বিরল নয় এবং ঘটনাও অসাধারণ নয়, কিন্তু রচনার গুণে এ গল্পটি অভিনব সজ্জা ধারণ করিয়াছে; শেষের দিকে প্লট জটিল হইয়া উঠিলেও লেখিকা শেষ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। ছোট গল্প-রচনায় লেখিকার হাত আছে।

বৈরাগ্যের পথে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্ এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের যে সকল অমূল্যবাণী ইতস্ততঃ সংরক্ষিত আছে, তাহারই মধ্য হইতে যেগুলি গৃহী, সংসারীর পক্ষে উপযোগী, তাহাকে পথ দেখাইবে, সেইগুলি বাছিয়া এবং বিষয়-অনুযায়ী সাজাইয়া গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাপিত তৃষিত

নর-নারীর চিত্তে এ অভয় বাণী শান্তি ও উৎসাহের বার্ত্তা বহিয়া আনে। এ-সকল বাণীর যত অধিক প্রচার হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।

সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ। শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এস, সি, এল, টি কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি কর্ত্তৃক মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ; ও ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি শরীর-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ—বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত হইলেও সাধারণে এ গ্রন্থ-পাঠে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত পরিচিত হইবেন। রচনা বেশ সহজ, ভাষা সরল। গ্রন্থখানি প্রত্যেক স্কুলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

হিন্দু-কণ্ঠহার। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের অফিস হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া, বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। হিত-কথা চরিত্র-বিকাশের একটি প্রধান সহায়। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিস্তর অমূল্য শ্লোক এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; দেবদেবীর ধ্যান, প্রণাম হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-চিত্তের বিবিধ সদ্‌গুণ, স্বাস্থ্য-সদাচার, রাজধর্ম্ম, ও সামাজিক বিবিধ কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সকল অমূল্য বাণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ পাঠ করিলে হিন্দুজাতির সার্ব্বজনীন উদারতা, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া পড়ে। এই সকল অমূল্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক-পাঠে মনের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দূর হয়, উদার ভাবে মন পরিপূর্ণ উন্নত হয়।

সরলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এই উপন্যাসের সমালোচনা এক কঠিন ব্যাপার। লেখক এই গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে একসঙ্গে যেন একটা হামানদিস্তায় পুরিয়া কষিয়া ঘুঁটিয়াছেন! তিনটি সমাজের ভাল-মন্দ লোক নানা ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে উঁকি দিয়াছেন—কিন্তু কেহই স্পষ্ট দেখা দেন নাই। নায়িকা সরলা বিস্তর রকমের আজগুবি ঘটনার মধ্য দিয়া চলা-ফেরা করিয়া আজগুবি রকমে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া "অন্ধকার ও বাতাসের মধ্যে মিশে গেল"। লেখকের রচনার ভঙ্গী ভালই, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই—অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই, তবে ভাষা মাঝে মাঝে দো-আঁশ্‌লা গোছের হইয়াছে। উপন্যাসের ভাবও উঁচু পর্দ্দার—নারী, নারীর সুখ-দুঃখ, নারীর অসহায়তা এ-সমস্তই এদেশের সমাজ কিরূপ বর্ব্বরের মত উপেক্ষা করিতেছে, সেদিকে লেখকের ইঙ্গিত বেশ তীক্ষ্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। সেইটুকুই এ উপন্যাসে একমাত্র প্রশংসার সামগ্রী। নহিলে ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে কৌশল কিছুমাত্র নাই—লেখক যে কয়টি সাধু-চরিত্র আঁকিয়াছেন, সেগুলি প্রাণহীন মাটীর পুতুল, বরং বদ্‌চরিত্রের লোকগুলো গোটা হইয়াছে, জীবন্ত হইয়াছে। আর একটা ব্যাপার নেহাৎ হাস্যকর,—মুসলমান না হইলে কি মানুষ ভাল হয় না? বিলাসের অ'বদুল্লা হওয়ার ত ইহা-ভিন্ন দ্বিতীয় কারণ খুঁজিয়া পাই না। বেচারা হিন্দু থাকিয়া গেলে কি ক্ষতি হইত? লেখক এই সকল সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ছাড়িয়া নিরপেক্ষভাবে উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিলে কালে তাঁহার রচনা সফল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

চম্‌চম্। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ কলিকাতা; ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লিখিত ছবি ও ছড়ার বহি। রচনা চলনসই—তেমন ঝর্‌ঝরে নয়,—ছন্দও নেহাৎ পঙ্গু, তবে ছবিগুলি ভাল। ছাপা-কাগজও ভাল।

শ্রীসতীব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৫ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৫ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা		শ্রীসুশীলকুমার দে এম-এ, পি, আর, এস,		৯৬
আধুনিক ভারতের শ্রমশিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮৬
উন্‌পাঁজুরে (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৫৬
উন্মেষণা (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৮১
এলো শীত ঘিরে কুয়াসায় (কবিতা)		শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৬৪
কলঙ্কী (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৬১
কবির তিরোধান (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৭৪
কিঙ্করী (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৫১
কে ? (গল্প)	...	শ্রীকল্যাণী দেবী	...	৭৩
গগন (কবিতা)	...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৮৯
চোখ ভরে দেখি আর (কবিতা)		শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৫৯
চোখের দেখা (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৬৯
জলের-আল্পনা (উপন্যাস)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৪৬, ৬৫০, ৬৮৩,	৮১
ঝরা পাতার গান (কবিতা)	...	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	...	৯৫
টুকনি (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৮৫
ডাক-পিয়ন (গল্প)	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	...	৯৯
দুর্ঘটনা (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৮৭
নাদিরশাহের জাগরণ (কবিতা)		শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৭৭
নাদিরশাহের শেষ (কবিতা)		শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৮৯
নেপালের কথা (সচিত্র)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল		৬৬
পাটেল বিল	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	৮৪
পাতিল-প্রমাদ বা প্রসহ্য-প্রতিবাদ		শ্রীনবকুমার কবিরত্ন	...	৮৪
প্রতিভার লক্ষণ	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৬৯
প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এল	...	৯৫

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
বরণ (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	১০০০
বসন্ত সঙ্গীত (গান)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৯২৩
বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ	...	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ	...	৬৬১
বন্দেমাতরম্ (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৫৮১
বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	...	৬২৮
বাংলার ব্রত	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫৬, ৬০২, ৭১২, ৭৭৭,		৮৮
বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত		শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৭০৭
বার্হস্পত্য-সূত্রম্	...	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	...	৭৬৭
বুকের ধন (কবিতা)	...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	...	৫৮১
বিদায়ের পর (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৫৯১
ভারতের গ্রাম	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৬৪৪
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষবাস		ঐ	...	৭৩৮
ভারতের নগর	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৮০৮
ভারতের দারিদ্র্যের কারণ	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৫৮
মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা	...	শ্রীকালীপদ মিত্র এম এ, বি-এল	...	৯২৭
মনের কুয়াসা (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৯৩৮
"মাতৃগুপ্ত"	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৫৫
মাসকাবারি—	...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ		
আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?			... ...	৫ ৪
বাংলার মাসিকপত্র	...		... ...	৭৬৩
ভারতের স্থান	...		... ...	৬৭৮
যুদ্ধ শেষ	...		... ...	৬৭৭
মাল্যদান (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৭২৮
ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৬৩৩
রাজা রামমোহনের স্বরূপ	...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	...	৬৪৬
রেখা লেখা (সচিত্র)	...	শ্রী :—	...	৫৬২
শরৎ-সুন্দরী (গান)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৫১৯
শিক্ষা ও সাধনা	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ	...	৭২৪
সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	...	৫৪১
সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫৭৫
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ৫৯৮, ৬৮০, ৮৩৭, ৯২০,		১০০০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুসময় (কবিতা) ...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৯৯৯
সোনার কাঠি (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৭৫৭
স্বর্ণ-মৃগ (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩৬
স্বরলিপি ...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	৫৯২, ৬৭৪, ৭০৮, ৮২২, ৮৮৯, ৯২৩
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...	... ...	৮৩৫
স্বপ্ন ...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ...	৯০২, ৯৯০
স্মরণে (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯৮৯
স্যাবাইন-রমণী (নাটিকা) ...	শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় ...	৭৯৫, ৯০৭
হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৬৯৪

চিত্রসূচী

চন্দ্রমুখী (বহুবর্ণ)		ফরাসী শিল্পী বুশে'র নক্সা ...	৫৬৮
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৬৮১	ভীমসেন থাপা	৬৬৯
জল্‌কে (বহুবর্ণ)		মা—শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	৯২১
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৭৬৫	মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা ...	৫৬৫
জঙ্গবাহাদুর	৬৭২	রোদাঁর নক্সা	৫৬৬
তীর্থযাত্রী		শাপসন্তপ্ত অহল্যা (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৭৫৫	শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ অঙ্কিত	৮৩৯
নেপালের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ...	৬৭১	সচকিতা	
পান্থ	৫৬৭	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৫৯৯
পৃথ্বীনারায়ণ	৬৬৭	স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৮৩৬
প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা ...	৫৬৩	হর-পার্ব্বতী (বহুবর্ণ)	
ঐ	৫৬৪	প্রাচীন চিত্র হইতে ...	৫১৭



হর-পার্ব্বতী।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৫ [৭ম সংখ্যা

শরৎ-সুন্দরী

(গান)

হাতে মুখ আড়াল ক'রে
কে যায় পথের বাঁক দিয়ে !
আঁখি ওর কার পানে ধায়
আঙুল গুলির ফাঁক দিয়ে।
সখীরা জান্‌লে না কেউ
হৃদয়ে উঠ্‌ল কি ঢেউ !
হাসি ওর খুসী ভরা
যায় নিকষে আঁক দিয়ে !

গোপনের ওই হাসি ওর দেখে কি সাঁঝের রবি
পুলকের পাঞ্জাখানির আকাশে আঁকায় ছবি !

হেরে তাই হ'ল কিও
সরমে রমণীয় !
ম'ল সব মাতাল আঁখি
ভোম্‌রা হেন পাক দিয়ে !

দু'টি ঠোঁট না যায় ছাখা, ছাখা ঠিক যায় না হাসি,
বাঁকা চোখ মিঠিয়ে চেয়ে ফোটালে শিউলি রাশি !

আলোতে ফিনিক ফোটে রূপসীর চলন লীলায় !
ভুবনে ঝড় যে ওঠে হাসি ওর যেম্‌নি মিলায় !

কাঁখে ওর কল্‌সী অথির
ঘেমেছে দুল্‌টি মোতির
নেমেছে কোঁকড়ানো চুল
চাঁদ্ কপালে থাক দিয়ে।

ওকি গো খাম্‌খেয়ালি
হাসে কি খাম্‌কা খালি !
আঁখি ওর চায় না শুধুই
যায় নীরবে ডাক দিয়ে !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কিঙ্করী

(গল্প)

কিঙ্করী সাধন বৈষ্ণবের মেয়ে। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন বাপের মৃত্যু হয়। ধানগাঁয়ে বাপের একখানি ছোট দোকান ছিল; বাপ সাধনের মৃত্যুর পর কিঙ্করীর মা রাধা বৈষ্ণবী স্বামীর দোকান খুলিতে না খুলিতে পাওনাদারের দল আদালতের পেয়াদা-সমেত আসিয়া সব জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া দোকান-ঘর সাফ করিয়া ফেলিল। পাঁচ বৎসরের মেয়ে কিঙ্করীকে লইয়া রাধা বৈষ্ণবী দারুণ দুর্ভাবনায় পড়িল।

কি করিবে কিছুই সে যখন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন ও-পাড়ার যদু গোঁসাই আসিয়া বলিলেন, "দিগম্বরের মেয়ে-যাত্রার দলে মেয়েটিকে দে,—সখী সাজিয়া এইবেলা হইতে কিছু-কিছু সে রোজগার করুক্!" ইচ্ছা থাকিলে গোঁসাইয়ের গৃহে রাধা বাসন-কোসন মাজিয়া দুইবেলা দুইমুঠা ভাত অনায়াসে খাইতে পারে, সে বিষয়ে গোঁসাইজীর কোন আপত্তি নাই, কারণ তিনি বাঁচিয়া থাকিতে—দেশের মেয়ে না খাইয়া মরিবে, ইহা ত আর তিনি চোখে দেখিতে পারেন না! এ কথাটাও সেই সঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন।

রাধা অকূলে কূল পাইল। মেয়েটি ছিল দেখিতে সুশ্রী; দিগম্বর একেবারে তাহাকে মাসিক পাচ-সিকা মাহিনায় যাত্রার-দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। পায়ে ঘুঙুর আঁটিয়া মেয়ে রাখাল-বালক সাজিয়া নাচিতে নাচিতে আধ-আধ ভাষায় কখনো গাহিত, "আয় রে কানাই, আয় গোঠে যাই, বাজায়ে মোহন বেণু—", কখনো-বা মাথায় রঙিন ন্যাকড়ার ফুলের মুকুট পরিয়া বিশাখা সাজিয়া গাহিত, "ও রাই, ছেড়োনা ছেড়োনা এ মান—" তখন সে-গান শুনিয়া আনন্দে-গর্ব্বে মার চোখে জল আসিত।

এমনি করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। তারপর নানা দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিঙ্করী এখন পাঁচ-সিকার জায়গায় সাত টাকা মাহিনা ও বিদেশে গেলে অতিরিক্ত আরও-কিছু পায়, এবং সখীর দল ছাড়িয়া সে এখন নায়িকার গ্রেডে প্রোমোশন পাইয়াছে। বছর-খানেক পূর্ব্বে মেয়েকে মানভঞ্জনের পালায় শ্রীরাধা সাজিতে দেখিয়া রাধা প্রসন্নচিত্তে ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দিগম্বরের দলে কেনারাম এখন মালিক। কেনারাম পূর্ব্বে দিগম্বরের দলে পালা বাঁধিত, সেজন্য দলে তাহার খাতির ছিল খুবই। সুতরাং দিগম্বরের মৃত্যুর পর ছত্র-ভঙ্গ দলটাকে হাত করিয়া বাঁধিয়া লইতে তাহার একটুও অসুবিধা হইল না। কেনারাম গুণের কদর বুঝিত। কিঙ্করী গাহিত ভাল, তার উপর চেহারায় চটক্ ছিল, তাই সে আড়াই টাকার জায়গায় কিঙ্করীর একেবারে সাত টাকা মাহিনা করিয়া দিয়াছে।

এই গুণের উপর আরো-একটা কারণ ছিল। কেনারামের তিন কুলে আপনার বলিতে কেহ ছিল না; সংসারে শুধু একটি-মাত্র আকর্ষণ ছিল, সে এই গান-বাজনার নেশা,—এই গান-বাজনার নেশাই তাহাকে দেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; নহিলে সে যে এতদিনে কোথায় থাকিত, কি করিত, কেহ তাহা বলিতে পারে না। ছেলে-বেলায় গ্রামে স্কুলে যাইবার পথে সে এক হাফ্-আখড়াইয়ের দলে জুটিয়া পড়ে, সেখানে তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া সে সকলের মন পাইয়াছিল; তারপর হঠাৎ একমাত্র অভিভাবক মাতুলের মৃত্যু হইলে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া দস্তরমত সে আসরে নামিয়া পড়িল;—কবির দলেই তাহার যাত্রার পালা বাঁধার হাতেখড়ি হয়, এবং সহসা একদিন "রাবণ-বধের" পালা লইয়া দিগম্বরের দলে আসিয়া সে যোগ দিল।

দলে আসিয়া কিঙ্করীর উপর প্রথমেই তাহার নজর পড়িল। চমৎকার মেয়েটি! দেখিতে যেমন সুশ্রী, নাচিতে-গাহিতেও তেমনি মজবুত! এই কিঙ্করীকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে যাত্রার পশার যেমন বাড়িবে, তাহার পালাগুলাও তেমনি উতরাইয়া যাইবে। অমনি সে কাজে লাগিয়া গেল। কিঙ্করীরও এদিকে একটা আশ্চর্য্য টান ছিল—অত্যন্ত সহজেই সে এই সুযোগটুকুকে আয়ত্ত এবং সফল করিয়া তুলিল। কিঙ্করীর চেহারায়, হাবভাবের লীলায় আর অভিনয়-কৌশলে দেশময় যাত্রার দলের সুখ্যাতি পড়িয়া গেল।

মাঘের-পাড়ায় জমিদার-বাড়ীতে যাত্রা করিতে গিয়া কিঙ্করী দৈবাৎ কলিকাতার এক থিয়েটার-ওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল! একে থিয়েটার-ওয়ালা, তায় কলিকাতার লোক, সে বুঝিল, কিঙ্করীকে কলিকাতার থিয়েটারে লইয়া যাইতে পারিলে শস্তায় অনেকখানি লাভের সম্ভাবনা! গোপনে কিঙ্করীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এ বিষয়ে বন্দোবস্তও সে পাকা করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু যাইবার দিন কেনারামকে না বলিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই কিঙ্করীর মন সরিল না। ব্যাপার বুঝিয়া কেনারাম চিন্তিত হইল, স্থিরদৃষ্টিতে কিঙ্করীর মুখের পানে চাহিল। চাহিতেই আর-একটা জিনিষ কেনারামের চোখে পড়িল। কিঙ্করীর সারা অবয়বে এক অপরূপ তারুণ্যের ছটা দেখা দিয়াছিল। আজ কিঙ্করীকে সে দেখিল, সম্পূর্ণ নূতন চোখে, নূতন মূর্ত্তিতে! দেখিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। কিঙ্করীও কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের পালার যশের কথাও সেই সঙ্গে কেনারামের মনে পড়িল; কেনারাম তখন পাকা চাল চালিল। সে কিঙ্করীকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। থিয়েটার-ওয়ালাকে অত্যন্ত নিরাশ-চিত্তে কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

কিঙ্করীর বয়স তখন পনেরো বৎসর সুমধুর লাবণ্য কিঙ্করীর দেহে তখন অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া খেলা সুরু করিয়াছে।

২

তারপর হঠাৎ একদিন যাত্রার দুর্দ্দিন আসিল। কলিকাতার স্কুল-কলেজ-ফেরত

ছোকরার দল পাড়ায়-পাড়ায় সখের থিয়েটার খুলিয়া যাত্রার সর্ব্বনাশ সাধিল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় রঙ মাখাইয়া বাঁশের মাচায় চড়িয়া হরেক রকমের চীৎকার করিয়া সারা গ্রামে তাহারা এমনি চমক লাগাইয়া দিল যে কেনারামের ব্যবসা তাহাতে একেবারে মাটি হইতে বসিল। যাত্রায় খরচ ও বায়নাক্কা বিস্তর, তাহার উপর ঐ জুড়িদের গানে নব্য পল্লীর কান ঝালাপালা, এবং ঐ যে আসরে বসিয়া যশোদা বৃন্দা প্রভৃতির নির্লজ্জ ধূমপান—এ সমস্ত ব্যাপার দর্শকের চোখে থিয়েটারের নেপথ্য-যবনিকার ফাঁক দিয়া অত্যন্ত বীভৎস কদর্য্য ঠেকিতে সুরু করিয়াছিল, কাজেই সখের থিয়েটারগুলা পর্দ্দা খাটাইয়া আমোদ জোগাইয়া অতি-সহজেই সকলের চিত্ত অধিকার করিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসিয়া চালের খুঁটিতে পিঠ-ঠেস্ দিয়া কিঙ্করী অনেক কথা ভাবিতেছিল।

আকাশের পূব্ দিকে একটু-একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল, বাতাসে ভিজা মাটির একটা মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কিঙ্করী স্বামীর আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কেনারাম গিয়াছিল ও-পাড়ায়, তাহারই কথায় বিধু গাঙ্গুলির বাড়ী দুর্গোৎসবে বায়না ঠিক করিতে।

বিধু গাঙ্গুলি দিগম্বরের আমলের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক, দেশের একজন প্রবীণ সৌখীন ব্যক্তি। দুর্গোৎসবে পূজার কয়টা দিন এ-দলের সাদর-নিমন্ত্রণ সে-বাড়ীতে বাঁধা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এবারে মহালয়ার পর-দিনও যখন বুড়া সরকার মহাশয় আসিয়া পালা ঠিক করিয়া দিয়া গেল না, তখন কেনারামের কেমন ভাবনা হইল, বুকটাও ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এখানকার অন্নও বুঝি-বা মারা গেল!

আখড়ায় সকালে কমলে-কামিনী পালার মহলা চলিয়াছিল;—স্ত্রী কিঙ্করী শ্রীমন্ত সাজিয়া গাহিতেছিল—

"ঘাটেতে সাজানো শত তরী,
যেতে দাও মাগো ত্বরা করি—
আঁখি-জল মুছি হাসিমুখে বল,
এসো রে আমার বাছনি রে—"

এমন সময় কেনারাম আসিয়া বলিল, "গান থামা কিঙ্করী—বিধু গাঙ্গুলির লোকের আজো দেখা নেই, কার জন্যে আর এ-সব কর্‌ছিস্?"

তখন দলে চকিতে কেমন বিমর্ষতার ছায়া পড়িল, বিপুল উৎসাহ দারুণ অবহেলার ঘা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আখড়ায় লোক ইদানীং পূর্ব্বেকার মত নিত্যই আসে, গান হয়, গল্পও চলে, কিন্তু কোনটাই তেমন জমে না। আজ কেনারামের কথায় সকলেরই মুখ শুকাইয়া দুঃখে বুক ভরিয়া উঠিল। দেখিয়া কিঙ্করীই তাই স্বামীকে বলিয়া-কহিয়া দুপুরবেলায় গাঙ্গুলি-বাড়ীতে বায়নার সন্ধানে পাঠাইয়াছিল, এবং এই সন্ধ্যার সময় স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া সে পুরানো সেই দিনের নানান্ কথা ভাবিতেছিল। দিনের শেষ আলোটুকু যখন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তখন বাহিরে কেনারামের গলা শুনা গেল—"আখড়া তুলেদে রে বিশু, দেশে আর থাকা হল না।"

কিঙ্করী উঠিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি হলো?"

"কি আর হবে! বাবুর ছেলে, ঐ যিনি জমিদারীতে পড়েন, সেই চোখে চসমা-আঁটা, তিনি বলেছেন, যাত্রা-ফাত্রা হবে না আর! শুধু কতকগুলো মুখ্যু গুলিখোরের বিকট চীৎকার, প্রাণ জ্বলে যায়, তার চেয়ে থিয়েটার হোক। তারা না কি, কি ঐ "মহম্মদ তিলিজী" আর "বেদম প্রহারের" পালা দেখাবে।" কেনারামের চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, "তাহলে আর উপায় কি!"

কেনারাম আগাইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল, "বাবুর আমাদের রুগ্ন শরীর। আজকালের ছেলে, তার কথা একেবারে ত আর ওড়াতে পারেন না, অথচ আমাদেরই বা ফেলেন কি বলে?—তাই তিনি বললেন, বেশ, তিন দিন ত—তার দুদিন ছেলেদের দল থিয়েটার দেখাক্ আর বাকী দিনটায় যাত্রা হোক্! যাত্রা আমি একবারে বন্ধ করতে পারি না। যে ক'দিন আমি বেঁচে আছি, সে ক'দিন অন্ততঃ ত নয়। তাই ঐ শেষের দিনের জন্য আমায় বললেন, তোমার কমলে-কামিনীর পালা দেখিয়ে দাও হে কেনারাম।"

কিঙ্করী বলিল, "ভগবান তাহলে একেবারে বিরূপ হননি। যাক্, তাহলে ভালো করে আখড়া বসাও—"

"আর কিসের আখড়া কিঙ্করী! বছরে একদিন একটা বাড়ীতে পালা দেখাবার জন্যে এত মাথা ঘামানোয় লাভ কি? এত খরচ-পত্র—"

"তা ঠিক—" কিঙ্করীর মুখে আর কথা ফুটিল না। নবমীর দিন পালা দেখানো হইবে ভাবিয়া একটুখানি আনন্দ তাহার বুক-ভরা বিপুল আধারের মধ্যে প্রদীপের আলোর মত যে ক্ষীণ রশ্মিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর এই শেষ-কথার ফুৎকারে সে আলোটুকুও নিবিয়া গেল। আহা, স্বামী কত যত্নে এই নূতন পালাটি বাঁধিয়াছে—এত টানাটানির মধ্যেও ঘরের জিনিষ বেচিয়া পয়সা জুটাইয়া কতখানি আশায় আখড়া বসাইয়াছে। থিয়েটারের দলগুলাকে গানে, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হারাইয়া দিবে বলিয়া স্বামী বড় দমে বুক বাঁধিয়াছে যে,—সে-ও কত করিয়া বিচিত্র নূতন সুরে শ্রীমন্তের গানগুলিতে প্রাণ জোগাইয়াছে—অত সাধে, অত আশায়, এমনি করিয়াই কি নিষ্ঠুর আঘাত দিতে হয়, ভগবান্?

যাত্রার দলে কিঙ্করী মানুষ হইয়াছে, এই যাত্রার দল একদিন তাহার শিশু-চিত্তে অপূর্ব্ব মোহের সঞ্চার করিয়াছিল, আর আজ বিচিত্র-রসে তাহার তরুণ-যৌবনটিকে ফেনিলোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে! গানের ছন্দের দীপ্ত মায়া-লোকে বসিয়া কতদিন যে সে আপনাকে অসামান্যা মনে করিয়া গর্ব্বে সারা হইয়া উঠিয়াছে! আবার এই যাত্রার দলের শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাহার কিশোর হৃদয়ে প্রেমের সাড়া মিলিয়াছে! কত সাধ, কত আশা, কত ক্ষোভ, কত তৃপ্তি বিচিত্র লীলায় ঢেউ তুলিয়া গিয়াছে! এই যাত্রার দল তাহাকে প্রাণ দিয়াছে, তাহার মনের খোরাক জোগাইয়াছে! সে-ও এই দলের জন্য কি না করিয়াছে

ছোটখাট সমস্ত ত্রুটির দিকে সর্ব্বক্ষণ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে রাখিয়া আসিয়াছে! এ দলে এই যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত পারিপাট্য বিরাজ করিতেছে, এ শুধু তাহারই গুণে! যাত্রার দলের জন্য খাটিয়া কখনও তাহার শ্রান্তি হয় নাই—বিদেশে দলের সামান্য একজনের অসুখ হইলেও স্বামী যখন ভাবিয়া কূল পায় নাই, কিঙ্করী তখন অপরূপ সহজ ভঙ্গীতে সেই রোগীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। দলের কাহারো টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইলে গোপনে আসিয়া যখনই তাহারা কিঙ্করীর কাছে হাত পাতিয়াছে, তখনই কিঙ্করী টাকা দিয়াছে, কখনও একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই! কেহ সে টাকা শোধ না দিলে কিঙ্করী কোনদিন অনুযোগ করে নাই বা স্বামীর কাছে নালিশের সুরে ইঙ্গিতেও সে কথা উত্থাপন করে নাই! তাই আজ দলের লোক পয়সা না পাইলেও নিত্য এখনও আখড়ায় আসিয়া যোগ দেয়, ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র আঁকিয়া কিঙ্করীর নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার করিয়া তোলে! আজ নিজের প্রয়োজনে টাকার টান দেখিয়া কিঙ্করী একান্তে বসিয়া শুধু চোখ মুছিত, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া দুঃখ জানায় নাই।

৩

নানা দুর্ভাবনায় কেনারামের শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; ভাদ্রমাস পড়িতেই রাত্রে অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাশি। দেখিয়া কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। একনিমেষে তাহার মুখ শাদা হইয়া গেল।

আর এখন দল! কিসের জন্য কাহার জন্যই বা দল! কেনারামের বলিয়াই যাত্রার দলের উপর তাহার এতখানি টান ছিল! দল ভাঙ্গিয়া দিয়া গায়ের গহনা বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য সে স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল; সঙ্গে আসিল শুধু বিশু।

কার্ত্তিকের শেষে জ্বরটা একটু ছাড়িলে ডাক্তার বলিল, এইবেলা হাওয়া বদলাইতে পারো ত সারিবার সম্ভাবনা আছে, নহিলে—

কথাটা ছুরির ফলার মত কিঙ্করীর মর্ম্মে বিঁধিল। কেনারামের কঙ্কাল-সার দেহের পানে চাহিয়া তাহার অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘর-বাড়ী সব বেচিয়া স্বামীকে সে পশ্চিমের একটা জায়গায় হাওয়া বদলাইতে পাঠাইল। নিজে সঙ্গে গেল না, যাওয়া চলে না—সে গেলে বিদেশে স্বামীর খরচ যোগান হয় কি করিয়া? তাই সে কলিকাতায় থাকিয়া গেল। বিশু চালাক ছোকরা—রোগ তদ্বিরের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় সে একটা কাজ বাগাইয়া লইয়াছিল; এখন বিশুই কিঙ্করীকে এক অফিসের বাবুদের মেশে একটা ঝীয়ের চাকরি জুটাইয়া দিল। তাহার মহা-দুর্ভাবনা দূর হইল।

সারাদিন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে সময় একরূপ কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিপদ ঘটিত রাত্রিবেলায়। চারিধার যখন নিস্তব্ধ আঁধারে ঢাকিয়া আসিত, তখন সেই আঁধারের অতল গহ্বর হইতে দূষিত বাষ্পের মত রাশি রাশি দুশ্চিন্তা আসিয়া কিঙ্করীকে ছাইয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিত। মাথার শিয়রের

জানালা খুলিয়া দিয়া সে একটা মাদুরে গড়াইয়া শুইয়া পড়িত। কলিকাতার পথে অত রাত্রেও চলন্ত মানুষের জুতার শব্দ,—অদূরে তেলের কলের এক-ঘেয়ে ঘর্ঘরধ্বনি—গাড়ী-ঘোড়া-মোটর-মাতাল-দিগের বিচিত্র কলরব বিচিত্র সুরে চারিধার ধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে—কিছুই তাহার মনে একটা আঁচড় টানিতে পারিত না। সে জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াই পড়িয়া থাকিত। থানার ঘড়িতে বারোটা, একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া যাইত, তবুও চোখে ঘুম আসিত না! অতীতের সহস্র স্মৃতি অজস্র শর সন্ধান করিয়া তাহাকে কাতর ব্যথিত করিয়া তুলিত। হায়রে, বেচারা স্বামী কোথায় কতদূরে কোন্ বিদেশে সেই রুগ্ন শরীর লইয়া পড়িয়া আছে! দেখিবার কেহ নাই, কথা কহিয়া দুইদণ্ড সান্ত্বনা কি আশ্বাস দিতেও কেহ নাই! পিপাসায় না জানি শুইয়া পড়িয়া কত ছট্‌ফট্ করিতে হয়, মুখে জলটুকুও হয়ত পড়ে না—আহার জোটে কি না, তাই বা কে জানে! ভাবিয়া সে আর কোন কূল পাইত না! দুঃখে চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিত, বেদনায় বুকের পাঁজরাগুলা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিত, কাহার শাপে তাহাদের অমন সোনার নীড় আজ এমন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল!

এমনি দুর্ভাবনার মধ্যে একদিন চূড়ান্ত ঘটনাটাও ঘটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর বক্ষে বিস্তর পোষ্ট অফিসের ছাপ পরিয়া এক চিঠি আসিয়া হাজির, খামের উপরে নানান্ দেশের অসংখ্য অস্পষ্ট ছাপ, খামের মধ্যে চিঠিতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে, "কাল রাত্রে মুখে রক্ত উঠিয়া কেনারাম বাবু হঠাৎ মারা গিয়াছেন।"

সব ফুরাইয়াছে! চিরদিনের সহচর, বন্ধু সহসা স্বপ্নের মত কোথায় কোন্ ছায়ার মধ্যে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাহিরের আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার গায়ে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল! "মাগো—"বলিয়া চীৎকার করিয়া কিঙ্করী ধূলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৪

তিনমাস পরে হঠাৎ একদিন গঙ্গার ধারে বিশুর সঙ্গে কিঙ্করীর দেখা। কেনারামের মৃত্যুর পর কিঙ্করী মেশের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল—দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া গঙ্গার ধারের ঠাকুর-বাড়ীতে যে সে কি করিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সে সব কথা কিঙ্করীরও স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে পড়ে না।

বিশু বলিল, "জন্ম-মৃত্যু বিধাতার লিখন, কিঙ্করী। এ রকম ভেবে-কেঁদে আর কি করবে, বল? তোমার চেহারা যা হয়েছে দেখচি, তাতে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না মোটে! আমারি প্রথমটা চিনতে কষ্ট হচ্ছিল! যাক্, জানো ত বিপদে ধৈর্য্য ধর্‌তে হয়। তুমি ত বোঝো সব, তোমায় আর কি বোঝাব, বল?"

বিশুর পানে চাহিয়া কিঙ্করী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিল না। বিশুকে দেখিয়া অতীতের সব কথা আবার নূতন করিয়া তাহার মনে পড়িল। সেই গান-বাজনার বিপুল সমারোহ, আনন্দ-

কৌতুকের বিরাট মেলা! সে কি ঘটা! আর আজ?

বিশু বলিল, "কিন্নুর কথা যখন ভাবি, তখন আর জ্ঞান থাকে না—আহা, বেঘোরে প্রাণটা দিলে বেচারা! তোমার সঙ্গেও বোধ হয় শেষটা আর দেখা হয়নি! আহা!"

কিঙ্করী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের কোণে জল উপ্‌ছাইয়া আসিল।

বিশু আবার ডাকিল, "কিঙ্করী—" বিশুর গলার স্বর ঈষৎ ভারী। কিঙ্করী মুখ তুলিয়া বিশুর পানে চাহিল, দেখিল, বিশুর চোখে জল।

কিঙ্করী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—তাহার চোখে বন্যা নামিল।

বিশু বলিল, "এখানে পড়ে থাকে না, কিঙ্করী—এসো, আমার সঙ্গে এসো—। বিধাতার কৃপায় আমার অবস্থা একটু যাহোক্ ফিরেছে এখন। নিজে ছোট-খাট একটা খাবারের দোকান করেছি—মন্দ চল্‌ছে না। তুমি পুরোনো বন্ধু—আমি থাক্‌তে তুমি পথে দাঁড়াবে, এ হতেই পারে না!"

বিশুর খাবারের দোকান বেশ চলিতেছিল। এই দোকানটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অবস্থাও ফিরিয়া গিয়াছিল। তবে দোকানে সে একা। স্ত্রী বেচারী দেশে ছিল, অবস্থা ফিরাইয়া স্ত্রীটিকে সে কলিকাতায় আনিয়াছিল, কিন্তু বেচারীর অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য সহিল না। সে আজ ছয়-সাত মাসের কথা, স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে! সংসারে আবার সে একা। দোকানে পয়সার মুখ দেখিয়া ও পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া সে স্ত্রীর শোক ভুলিয়াছিল। তবে রাত্রে দোকান বন্ধ করিবার পর নিরালা একলা যখন সে পড়িয়া থাকে, তখন সমস্ত জগৎ তার বিরাট শূন্যতা লইয়া বিশুর বুকের উপর চাপিয়া বসে! এই যে কাজ করা, গতর খাটানো, পয়সা-উপার্জ্জন, এ কেন? কেন? কাহার জন্য? কি হইবে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়া? বিশুর সমস্ত মন টন্‌টন্ করিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, দোকান পাঠ বেচিয়া দিয়া কোথাও সে চলিয়া যায়। কিন্তু রাত্রের সে সঙ্কল্প দিনে কাজের ঝঞ্ঝাটে চাপা পড়িত! সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলিতে না খুলিতে একটি-দুইটি করিয়া লোক আসিয়া দেখা দিত,—কাজেই কাজ এবং কাজের ভিড়ে রাত্রের বৈরাগ্যের সঙ্কল্প মন হইতে মুছিয়া যাইত।

এমনি করিয়াই বিশুর দিন কাটিতেছিল,—হঠাৎ এমন সময় গঙ্গার ধারে কিঙ্করীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

কিঙ্করী বিশুর কথায় রাজী হইয়া দোকানে আসিল। দোকান হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত স্রোতের মুখে এতদিন নিজের ভাবেই ভাসিয়া চলিয়া ছিল—আজ কিঙ্করী আসিয়া পাকা-হাতে নূতন করিয়া সেখানে হাল ধরিল।

সারাদিন কাজের ভিড়ে দুই জনের কথা-বার্ত্তা বড় হইত না। রাত্রের নির্জ্জনতায় দুই জনে বুকের মধ্য হইতে অতীত-স্মৃতির তল্পী বাহির করিয়া বসিত,—হাসি ও অশ্রুর রাশি সে! দুইজনে তখন নানা কথা হইত।

পল্লীর সেই যাত্রার আসর, স্নিগ্ধ শ্যামল সেই তরু-কুঞ্জ, অবারিত পথ-ঘাট, ছায়ায় ঘেরা সেই ছোট্ট নদীর তীর বায়োস্কোপের ছবির মতই কিঙ্করীর চোখের সাম্‌নে দিয়া অপরূপ বৈচিত্র্যে ভাসিয়া যাইত।

কাজের অন্ত ছিল না—তবু দুইজনেই বুঝিয়াছিল, কাহায় জন্যই বা কাজ করা! নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবন-দুইটাকে বোঝার মত দুই জনে ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে! সীমা-হীন এক অনন্ত পারাবারে দুইজনে যেন গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—কোনদিকে কূলের রেখাও দেখা যায় না! কি উদ্দেশ্যে, কিসের সন্ধানেই বা মিছা এই-ভাবে ভাসিয়া বেড়ানো—! তার চেয়ে হাত-পা এলাইয়া এই অসীম অনন্ত পারাবারে ডুব দিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়।

কিন্তু ডোবা গেল না। তাই একদিন ভাসিতে ভাসিতে একটা কথা বিশুর মনে হইল। আকাশে সেদিন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল—দোকানের পিছনে খোলা একটু জায়গা ছিল—সেইখানে একটা বেঞ্চে বসিয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেশ দিয়া কিঙ্করী আপন-মনে শ্রীরাধার বিরহ-গাথা গাহিতেছিল,

"এমন জোছনা রাতি, এমন মধুর বায়
তোমার বিরহ বঁধু, আর ত না সওয়া যায়—"

ঠিক রে ঠিক! সত্যই আর সহ্য হয় না! বিশুর বুকের মধ্যে এক অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া দুলিয়া উঠিল। কিঙ্করী মৃদু সুরে গান গাহিতেছিল। বিশু পা টিপিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। কিঙ্করীর মুখে জ্যোৎস্না একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া আর তাহার কণ্ঠে ঐ গান শুনিয়া বিশুর মনে হইল, কিঙ্করীকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের বিরহ-বেদনা যেন আজ এই চাঁদের আলোয় আপনাকে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে!

গাঢ় স্বরে বিশু ডাকিল, "কিঙ্করী—"

কিঙ্করী চম্‌কিয়া উঠিল।

বিশু বলিল, "আবার তুমি সেই সব কথা ভাবছ!"

কিঙ্করীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে বলিল, "না ভেবে পারি কৈ?"

বিশু কহিল, "ঠিক বলেছ। আমিও আর পারছি না! ভেবে লাভই বা কি বল,—শুধু মন খারাপ করা বই ত নয়। তাই আমি ভাবছিলুম, এ রকম করে ত আর টেঁকা যায় না, তাই বল্‌ছিলুম কি, জানো?"

কিঙ্করী বিশুর পানে চাহিল,—চোখের দৃষ্টি তাহার পুতুলের চিত্র-করা দৃষ্টির মত। কিঙ্করী কহিল, "কি?" স্বরটা শুষ্ক রুক্ষ মনে হইল। সে স্বর শুনিয়া বিশু কেমন ভড়কাইয়া গেল—তবুও সে জোর করিয়া কথা কহিল; বলিল, "আমার সঙ্গে যদি কণ্ঠী-বদল—"

কথাটা শেষ হইল না। কিঙ্করী ডাকিল, "বিশু—" এই ছোট ডাকটুকুতে আগুনের হল্‌কার মত এতখানি তীব্র ভৎর্সনা ঠিক্‌রিয়া পড়িল যে বিশুর সমস্ত সাধ-আশা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

এ ঘটনার পর দোকানের কাজে কিন্তু কোন গোল দেখা গেল না। বিশু ভৃত্যের মত কাজ করিতে লাগিল, এবং কিঙ্করীরও তাহাকে ফাই-ফরমাস করিতে এতটুকু সঙ্কোচ

দেখা গেল না। অর্থাৎ দুইজনের মনে-মনে এতখানি সংঘর্ষ হইয়া গেলেও বাহিরের লোক তাহার এতটুকু আঁচ পাইল না। দুইজনে পূর্ব্বের মতই কাজ করিতে লাগিল,—ঠিক যেন কলের পুতুল কলে কাজ করিতেছে!

ইহার একমাস পরে বিশুকে হঠাৎ একটা বড় কাজের অর্ডার লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইল।

কিঙ্করী নিজের হাতে বিশুর জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিল, বিদেশে সাবধানে থাকিতে সহস্রবার উপদেশ দিল। যাইবার সময় বিশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার আবার ভাল থাকা—!"

"কেন?" অসন্দিগ্ধ অচপল স্বরেই কিঙ্করী এ প্রশ্ন করিল। বিশু অত্যন্ত হতাশভাবে কিঙ্করীর পানে চাহিল; কিঙ্করী সে দৃষ্টি দেখিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল—তাহার চোখ সজল আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না।

বিশু চলিয়া গেলে কিঙ্করীর পক্ষে কিন্তু একলা দোকানে টেঁকা দায় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জীবনের ফাঁকগুলা কোথা দিয়া ভরিয়া আসিতেছিল, আবার সব শূন্য হইয়া গেছে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চাপা গলায় সে ডাকিল, "বিশু—" কেহ সাড়া দিল না; কিন্তু কবেকার সেই জ্যোৎস্না-রাত্রির এক হতাশ-কাতর দৃষ্টি কিঙ্করীর মনে ফুটিয়া উঠিল—জগতে আজ যেন আর কিছু নাই, শুধু ঐ হতাশ-কাতর-দৃষ্টি!

৫

দোকানে বিশুর এক বন্ধু জুটিয়াছিল, বনমালী। বনমালী প্রায় তাহারই বয়সী; সে বিস্তর কথা কহিতে পারে, এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের হেড-বিল-সরকার। তাহার দৌলতে অফিসে বিশুর কয়েকটি বাঁধা খরিদদারও জুটিয়াছিল।

কিঙ্করীর অবস্থা দেখিয়া বনমালীর দুঃখ হইল। বিশু ও কিঙ্করীর মধ্যে সম্পর্কটা সঠিক না জানিলেও রসজ্ঞ সে নিজে হইতে একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কাজেই রাত্রের নির্জ্জন অবকাশে বনমালী প্রায়ই আসিয়া দেখা দিত, যদি কথায় বার্ত্তায় কিঙ্করীকে সে একটুখানিও সান্ত্বনা দিতে পারে! বনমালী বেশ ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিত। সে দোকানে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, অনেক সময় বাঁশীর সুরে সব ভুলিয়া কিঙ্করীও সে বাঁশীর সঙ্গে গান ধরিত। তা-ছাড়া বনমালীর প্রতি কিঙ্করীর একটু মায়া পড়িয়াছিল; মায়া পড়িবার কারণ ছিল।

বনমালীর বাড়ী আমতার ওদিকে; এখানে চাঁপাতলায় একটা মেসে সে থাকিত—দেশে ছিল স্ত্রী ও একটি ছেলে। স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না। স্ত্রীর চরিত্র-সম্বন্ধে দেশের লোকে কাণাঘুষাও একটু-আধটু করিত। সে রহস্যালাপ বনমালীর অশ্রুত ছিল না, এবং স্ত্রীর চিত্তও বনমালীর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিল না, কাজেই স্ত্রীকে বনমালী মোটেই দেখিতে পারিত না,—তবে ছেলেটির জন্য তাহার থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করিত, তাই মাসে একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ সে একবার দেশে গিয়া ছেলেটিকে

দেখিয়া আসিত। সে-সময় ছেলের জন্য নানান্ জিনিষ সে কিনিয়া লইয়া যাইত, পুতুল, লজ্‌চুষ্, লাট্টু, টিনের বাঁশী—এই সব; মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইত।

কিঙ্করী বনমালীর এ দুঃখের কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। আহা, বেচারা বনমালী! ব্যাপারটা তাহার কেমন আশ্চর্য্য ঠেকিত। স্ত্রীলোক ভাল না বাসিয়া কি করিয়া থাকে! স্ত্রীলোক যে বড় দুর্ব্বল, একটা অবলম্বন যে তাহার চাইই! তাই সে বনমালীকে প্রায়ই বলিত, "বউটিকে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এস, ঠাকুরপো,—নিজের কাছে নিয়ে এসে তাদের রাখো— ছেলেটির মুখ চেয়ে বৌকে সহ্য করে চল ভাই, তার উপর কোন দুর্ব্যবহার করো না। ছেলেমানুষ, কাছে থাকলে ও-সব বুদ্ধি তার সেরে যাবে'খন।"

বনমালী বলিত, "তুমিও যেমন বিশুর বৌ!" বনমালী কিঙ্করীকে বিশুর বৌ বলিয়া ডাকিত—শুনিয়া কিঙ্করী মনে মনে হাসিত, কিন্তু কথায় বা ভঙ্গীতে কখনও আপত্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করে নাই! আজ এ সম্বোধনটা প্রাণের মধ্যে কোথায় এক সুপ্ত তারে ঘা দিল। সমস্ত প্রাণটা অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, "কেন আনবে না, শুনি!"

বনমালী বলিল, "পাগল হয়েছ তুমি! এখানে একটা কেলেঙ্কারী হবে কি শেষে?"

কিঙ্করী বলিল, "কিসের কেলেঙ্কারী! আচ্ছা, আমার কাছে নিয়ে এসে তুমি রাখো দেখি। আমি কেমন না বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে ভাল করে-দি, দেখ।" বনমালীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন—" বলিয়াই বাশীটা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে বসিল। কিঙ্করী নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বাঁশীর করুণ সুরে তাহার চিত্তে দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল! সে অপলক স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টি বনমালীর বাহিরটা ভেদ করিয়া সমস্ত অন্তরখানা দেখিয়া লইল—অশ্রুর রাশি সেখানে একেবারে টল্ টল্ করিতেছে! সেই সঙ্গে আর-একটা ছবিও চোখে পড়িল,—পল্লীর মাজা-ঘষা ছোট্ট একটি আঙিনা, হরিণ-শিশুর মত ছেলেটি লাফাইয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর মেটে দাওয়ায় বনমালীর তরুণী স্ত্রী বসিয়া দাঁতে ফিতা চাপিয়া ধরিয়া চুল বাঁধিতেছে, সম্মুখে আর্শি চিরুণী পড়িয়া আছে! আর্শির বুকে নবযৌবনা রূপসীর দৃষ্টির সগর্ব্ব ভঙ্গীটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।

মফঃস্বল হইতে বিশু বাড়ী ফিরিল জ্বর-গায়ে। কিঙ্করী চিন্তিত হইল, এতটুকু বিলম্ব না করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইল, ঔষধের শিশিতে ঘর ভরাইয়া ফেলিল। ঔষধ খাওয়াইয়া গা ফুঁড়িয়া ডাক্তারের দল নিমকের মর্য্যাদা এতটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। শিয়রে বসিয়া কিঙ্করী বিস্তর সেবা করিল, রাত্রি জাগিল, কাঁদিয়া কত ঠাকুরের মানত করিল, কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ করিয়া এক মাস রোগে ভুগিয়া বিশু এক প্রত্যূষে ইহজীবনের লীলা সাঙ্গ করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল।

ঘাট হইতে কিঙ্করীকে অতি কষ্টে যখন ঘরে আনা হইল, তখন সকলে দেখিল, এ যেন সে কিঙ্করী নয়, একটা ম্লান ছায়া! ঘরে ফিরিয়া কিঙ্করী সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিতে চাহিল না,—দেখিয়া সকলে বলিল, সবই বাড়াবাড়ি!

বনমালী পূর্ব্বের মতই দেখা করিতে আসিত, সান্ত্বনা দিত। সে বুঝাইত, জীবনটা হেলায় নষ্ট করিবার জন্য তৈয়ার হয় নাই। জীবনটাকে যখন রাখিতেই হইবে, নষ্ট করা চলে না, তখন মানুষের মতই সেটা রাখা দরকার। নহিলে পরের হাতে পুতুল হইয়া থাকাটা কিছু নয়! পরের দয়ায় চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—ছিঃ! কিঙ্করী তাহার কথায় উঠিয়া বসিল। বনমালী তখন শোক ভুলাইবার জন্য রাজ্যের খবর বহিয়া আনিতে লাগিল, কিঙ্করীও বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনিত,—কিন্তু মনে সে সব ঢুকিত কি না, কে জানে! দোকানের কাজেও অত্যন্ত ত্রুটি দেখা দিল। বনমালী মাহিনা দিয়া লোক রাখিল। কিঙ্করীকে দেখিবার শুনিবার জন্য অবশেষে বনমালীকে মেস ছাড়িতে হইল। সে এখন এখানেই থাকে, খাওয়া-দাওয়াও এই-খানেই, রাত্রে এইখানেই শোয়। কিঙ্করীর মনে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাঁশীও মাঝে মাঝে বাজাইতে হয়, গল্পও বাদ যায় না।

পাড়ার লোকে রহস্যের সন্ধানে উন্মুখ হইয়াছিল, এই ছোট-খাট ব্যাপারটায় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল,—ব্যাপারটা তাহাদের অনেকখানি রসালাপের খোরাক জোগাইয়া দিল—তাহারা এই বিষয়ের আলোচনায় মাতিয়া মস্‌গুল হইয়া উঠিল। আলোচনার দুই-একটা ইঙ্গিত বনমালী ও কিঙ্করী—দুই জনেরই কানে গেল। শুনিয়া বনমালী হাসিল, কিঙ্করী ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

রহস্যের বিচিত্র ইঙ্গিত-সত্ত্বেও দিনগুলা আবার সহজ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিঙ্করীর অদৃষ্টে দিনগুলা নাকি অবিরাম সহজে কাটিতে পারে না, তাই সাহেবের হুকুমে বনমালীকে অকস্মাৎ একদিন চাটগাঁয়ে চলিয়া যাইতে হইল; সেইখানেই তাহাকে এখন থাকিতে হইবে। সে চলিয়া গেল। কিঙ্করী নির্জ্জন অবসরে নিভৃত ঘরের কোণে পড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিল; দেখিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চারিধারে বিপুল পরিবর্ত্তন চলিয়াছে—পুরাতন মহল্লা ভাঙ্গিয়া নূতন মহল্লার পত্তন, বহুকালের সাবেক বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন পথ-ঘাট দেখা দিতেছে। সময় চলিয়াছে না স্রোত ছুটিয়াছে! কিঙ্করীর দোকান-ঘর অযত্নে কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের পর্দ্দাখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ধোঁয়ায় ঝুলে আচ্ছন্ন, তাহার নিজের মাথার চুলে অবধি পাক ধরিয়াছে। তাহার উপর লোক-গুলাও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে,—পূর্ব্বে যাহারা ডাকিয়া কথা কহিত, এখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! কিঙ্করী ইহার অর্থ বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি অসহ্য জীবন! কাহারো চিত্তে এতটুকু সহানুভূতি নাই! এই একলা শোকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে তাহার শ্রান্তি ধরিয়াছে, পা আর চলিতে চাহে না, ইহার জন্য করুণা দূরে থাক্—নির্ম্মম নিষ্ঠুর

আলোচকের মত ক্রূর হাসি মুখে লইয়াই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্ব্বলের পানে চাহিয়া আছে! কিঙ্করী ভাবিল, আর না! সেই অতীত—মধুর অতীত,—আহা, তেমন দিন কি জীবনে আর কোন দিন মিলিবে! না, না, না! দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে ঝড়ের মত আথালি-পাথালি করিয়া উঠিল। বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। মনের হৃদটুকু বেদনার শৈবালে এমনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে সে বাহিরের কোন আঘাতে আর এতটুকু চঞ্চল হয় না। বিছানায় শুইয়া আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে—আকাশে সেই চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, রাত্রি হয়, সবই ঠিক পূর্ব্বেকার মত, কিন্তু তাহার প্রাণে কোনটাই আর এতটুকু আলো বা আঁধারের পরশ লাগাইতে পারে না! আজ সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে!

৬

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। কিঙ্করী একা দোকানে বসিয়াছিল—সরকার তাগাদায় বাহির হইয়াছে, এমন সময় মস্‌মস্ করিয়া একজন লোক আসিয়া দোকানে ঢুকিল। কিঙ্করী চাহিয়া দেখিল, এ কি! স্বপ্ন? না, এ যে বনমালী! সত্যই ত, বনমালীই! বনমালীর চুল পাকিয়াছে, অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে সে—হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না! সেই বনমালী দুইদিনে এ কি হইয়া গিয়াছে!

বিস্ময়ের মোহ কাটিলে কিঙ্করী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ কিঙ্করী?"

কিঙ্করী বলিল "সত্যিই মনে পড়েছে? আবার তুমি ফিরে এসেছ!"

"এসেছি কিঙ্করী—কিন্তু শোনো, অনেক কথা আছে। আমি আবার কল্‌কেতায় বদলি হয়েছি। এখানে থাকতে চাই। ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে, তাকে স্কুলে পড়াতে হবে কি না! আর তোমার কথাই রেখেছি—ঐ ছেলের জন্যই স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা করে ফেলেছি!"

"কোথায় তারা?"

"তারা আমার এক আত্মীয়ের বাসায় এসে উঠেছে, রামকৃষ্ণপুরে—কিন্তু সেখানে থাকলে ত চলবে না। আমার ভারী অসুবিধা হবে, দেখব-শুনবো কি করে? তাই এধারে একটা বাসা খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। ভাবলুম, দেখি, তুমি কেমন আছ—তাই—"

"বাসা চাই!" আনন্দে কিঙ্করীর প্রাণটা দুলিয়া উঠিল। "কেন, এইখানেই তোমরা থাকো না! আমি দোকানের একধারে পড়ে থাক্‌বো'খন। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ হেথায় আমার একটু ঠাঁই আছে, ততক্ষণ কোথায় আবার তুমি পয়সা খরচ করে আলাদা বাসা নিতে যাবে! কি বল?"

চারিধারে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বনমালী বলিল, "বেশ।"

পরদিন মিস্ত্রী ডাকা হইল—ভাঙ্গা দেওয়ালে চুণ-বালি পড়িল—জানালাগুলা রঙের পরশ পাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিঙ্করী নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া দোকান-ঘরটিকে পরিপাটী ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। আজ তাহার জীর্ণ দেহে-মনে নূতন বল নূতন শক্তি সে ফিরিয়া পাইয়াছে!

স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনমালী অচিরেই দেখা দিল। স্ত্রীটি সাদা-সিধা ধরণের মানুষ—তবে ভারী কড়া মেজাজ। দশ বৎসরের ছেলে খাঁদু রোগা—গালের উপর মস্ত একটা জড়ুল —ছেলেটি শান্ত। খাবারের পাহাড় দেখিয়া সানন্দে খাঁদু বলিল, "এত খাবার কে খাবে, মাসিমা?"

কিঙ্করী তাহাকে বুকে টানিয়া বলিল, "তুমি খাবে বাবা।"

"এ-সব আমি খাব?"

"হ্যাঁ বাবা"—বলিয়া কিঙ্করী মিষ্টান্ন তুলিয়া খাঁদুর হাতে দিল। খাঁদু সানন্দে তাহা মুখে পুরিল।

এই ছেলেটিকে বুকে ধরিয়া আজ কিঙ্করীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল—এতদিনকার এত বেদনা মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইল! খাঁদুর মুখে চুমা দিয়া কিঙ্করী আদর করিল, "খাদু আমার—মাণিক আমার—সোনা আমার—"

খাঁদু কহিল, "আমি অনেক বই পড়ি মাসিমা—সব মুখস্ত আছে—শুন্‌বে? দ্বীপ কাকে বলে জানো? যে ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে জল,—তাহাকে বলে দ্বীপ। কেমন, শুন্‌লে ত? তার চারদিকে শুধু জল—কোন দিকে ডাঙা নেই। তুমি দ্বীপ দেখেছ, মাসিমা?"

"না বাবা।"

খাঁদুর সঙ্গে কিঙ্করীর দুই দিনেই বেশ ভাব জমিয়া গেল। কিঙ্করী বসিয়া বসিয়া রূপকথা বলিত, আর খাঁদু নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিত—শুনিতে শুনিতে নানা প্রশ্ন তুলিত, "রাজার নাম কি? কত বড় বাড়ী? রাজা যুদ্ধু জানে? আমি বড় হলে যুদ্ধু করতে যাবো মাসিমা। পরীর ডানা কি পাখীর মত? তার ল্যাজ আছে? পরী দেখেছ মাসিমা?" এমনি কি কথা! কিঙ্করী নিজের হাতে খাঁদুকে করাইত, খাবার দিত, পোষাক পরাইত খাঁদুর বাপ-মা অনেকখানি ঝঞ্ঝাটের হইতে রক্ষা পাইল। খাঁদু খাইতে বসি কিঙ্করী বলিত, "দেখ, খাঁদুকে একটা স্কুলে দাও, ও লেখা-পড়া শিখে মা হবে—ডাক্তার হবে, উকিল হবে, কত গ আন্‌বে ও। কি বল বাবা, তুমি উকিল হ ডাক্তার হবে, কেমন?"

"হ্যাঁ মাসিমা, আমি ডাক্তার হব, উকি হব।"

খাঁদুকে স্কুলে দেওয়া হইল। কি মাহিনা যোগাইত—মাহিনা দিয়া বাড়ীতে সে মাষ্টার রাখিল। ছেলেটিকে লইয়া সে এ নূতন জীবনের পত্তন করিল।

খাঁদুর মার কিন্তু এখানে মন টিঁকি ছিল না,—মাসখানেক পরে একদিন বলিল, "দেশে বোনের বড় ব্যামো। বোনে দ্যাওর এসেছে আমায় নিতে। তার স গিয়ে বোনকে দেখে আস্‌ব—" কিঙ্করী বলিল, "ছেলে ত দিদি তোমারই হ্যাঙ হয়েছে—আমাকে ছেড়ে খুবই ও থাক্‌তে পার্‌বে—ওকে আর নিয়ে যাব না, কি ব রাখতে পারবে ওকে?" একমুখ হাসি কিঙ্করী বলিল, "তা ওকে আমি খুব রাখ পার্‌ব বৌ। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে এসো গে!"

মা চলিয়া গেল। বনমালী বাড়ী ফিরি কিঙ্করীর মুখে শ্যালীপতির ভাইয়ের বর্ণ শুনিয়া দৃষ্টিটাকে একবার তীক্ষ্ণ করিল,—

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাখতে লে না ত, বিশুর বৌ!"

খাঁদু রাত্রে কিঙ্করীর কাছেই ভিতরের শয়ন করিত। বনমালী আজকাল প্রায়ই থাকিত না; যেদিন থাকিত, সেদিন ান-ঘরে শুইয়াই রাত্রি কাটাইত। বিছানায় শুইয়া খাঁদু লক্ষ্মীছেলেটির মাসির কাছে গল্প শুনিত—নিজেও কত বলিত—স্কুলের কথা, মাষ্টারদের কথা, ড়োদের কথা! বেহারী সেদিন পড়া তে পারে নাই বলিয়া মাষ্টার মশাইয়ের ছ কি মারটাই খাইয়াছে! মোধো নি পাজী যে পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাশে ঞ্চর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রোজ গাধার ডাক ক, সেদিন ভূতো তাহাকে ধরাইয়া হেডমাষ্টারের কাছে আচ্ছা বেত াইয়াছিল, মোধোও কিন্তু তেমনি, স্কুলের পর ভূতোকে ঠ্যাঙাইয়া দিয়াছিল, র উপর পড়িয়া ভূতোর দাঁত ভাঙ্গিয়া ! নূতন মাষ্টারটা এত-বেশী পড়া দেয় কোন ছেলেই তা মুখস্থ করিতে পারে নিজের কি, মুখস্থ ত করিতে হয় না, বই ধরিয়া পড়া লওয়া—ব্যস্! ারদের ভারী মজা! না, সে বড় হইয়া ার হইবে না, উকিল হইবে না, স্কুলের ার হইবে। এমনি নানান্ কথা অনর্গল সে য়া যাইত, আর কিঙ্করী তাহাকে বুকের চাপিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে সমস্ত শুনিত।

এই দশ বৎসরের বালকটি কিঙ্করীর র মধ্যে এমনি আধিপত্য বিস্তার করিল তাহার আর কেহ রহিল না, কিছু ল না। দশটা বাজিলে খাঁদুকে সাজাইয়া-গুছাইয়া সে স্কুলে পাঠাইত—নিজে দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সে মোড় বাঁকিলে কখন্ যে নিজের অজ্ঞাতে কিঙ্করী তাহার পিছু-পিছু স্কুলের ফটক-অবধি আসিয়া পড়িত, সেদিকে তাহার হুঁসই থাকিত না। খাঁদু হঠাৎ পিছনে মাসিকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলিত, "আঃ, কি কর্‌ছ মাসিমা? চলে যাও না, তুমি—এখনি ছেলেরা দেখতে পেলে আমায় ক্ষ্যাপাবে যে!" তখন মাসির চমক ভাঙ্গিত —তাইত! এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে সে! ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার খাঁদুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সলজ্জ মুখখানিতে চুমা দিয়া মাসি বলিত, "এই যে যাচ্ছি, বাবা।" বলিয়া আবার ঐ স্কুলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে কিঙ্করী দোকানে চলিয়া আসিত।

স্কুলের ছুটির পর দোকানের গলিতে ঢুকিয়া খাঁদু দেখিত, মাসিমা পথের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! খাঁদুর প্রতি কিঙ্করীর ভালবাসার সীমা ছিল না। খাঁদুর মুখে হাসি দেখিবার জন্য সে আপনার প্রাণটাকে আজ বলি দিতে পারে! এ যে কি সুখ! এত সুখ, এত আনন্দ তাহার অদৃষ্টে ছিল, এ কল্পনাও যে তাহার মনে কোনদিন ঠাঁই পায় নাই! আর খাঁদুও তেমনি 'মাসি' বলিতে অজ্ঞান! মাসির আদরে নিজের মা ও বাপের কথা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যে বেদনাও অল্প ছিল না। যখন-তখন এক অজানা ভয়ে কিঙ্করীর বুক থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত,

—যদি হঠাৎ খাঁদুর মা আসিয়া এখন ছেলের দাবী করে! খাঁদুকে কাড়িয়া লইয়া যায়! ভাবিতে গা শিহরিয়া উঠিত! তাহার উপর ছেলে আসিয়া যখন অনুযোগের সুরে বলিত, "আমি ও স্কুলে পড়ব না আর, মাসিমা—এত পড়া দেয় যে মুখস্থ হয় না!" তখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, নিজের ভয় ভুলিয়া রাগে সে পথে ঘাটে সকলকে ডাকিয়া বলিত, "দেখদেখি দিদি, মিন্সেদের আক্কেল! এই দশবছরের ছেলে, ওকে কিনা বারো খানা বই পড়তে দেছে! ছেলেটা কাল রাত দশটা অবধি জেগে বসে পড়ছিল, ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল তবু শোবে না! এত বললুম, শো বাবা, শো, ঘুমো—তা বললে, না মাসিমা, ঘুমুলে পড়া হবে না, আর পড়া না হলে মাষ্টার মশায় মারবে। আমার ভাই ভারী ভাবনা হয়েছে, ছেলেটা দিন-দিন পড়ার চাপে শুকিয়ে যেন দড়ি হয়ে যাচ্ছে। পরের ছেলে ভালোয় ভালোয়—" এই কথাটা মনে হইতেই আবার বুক কাঁপিয়া উঠিত—জিভ্ কাটিয়া মনে মনে সে বলিত, না, না, না, খাঁদু আমার, আমার! যে মা অমন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার আবার কিসের দাবী! সে আবার মা হইতে আসে কি বলিয়া? ওদিকে বাপেরও ত ঐ দশা! না, না, খাঁদু পরের নয়, সে আমার, আমার!

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাল ঘুম হইতেছিল না। শুইয়া সে ভবিষ্যতের নানা কথা ভাবিতেছিল,—খাঁদু বড় হইলে ডাক্তার হইবে, খুব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। গাড়ী-ঘোড়া, লোক জন, কত সে, ওঃ! কি অগাধ ঐশ্বর্য্য চারিদিক ঝলমল করিবে—খাঁদুর ছেলেমেয়ে ঘর ভরিয়া যাইবে! তাহাদের কল-হাসি, সরল দুষ্টামি—! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা বাহিরের দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বনমালী সে রাত্রে দোকানে ছিল না, খিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। বুড়া বয়সে তাহার এ নিত্য নূতন সখ দেখা দিতেছিল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কিঙ্করী দেখে, এ বনমালী নয়,—এ যে খাঁদুর মাসির দ্যাওরটি, যাহার সহিত খাঁদুর মা ঝোঁ বাড়ী গিয়াছিল। খাঁদুর মার কাছ হ সে আসিয়াছে, খাঁদুকে লইয়া যাই সেইখানেই সে এখন থাকিবে, সে স্কুল আছে, ভগ্নীপতি ছেলেকে দে শুনিবে। খাঁদুর মা কলিকাতায় আসিবে না। বনমালী ত ঐ ধরিয়াছে, বদখেয়ালিও খুব, রাত্রে ঘরে না—খাঁদুর মার এ-সব সহ্য হইবে ছেলেকে এখনই চাই! না,—বনমালী দাঁড়াইয়া দেরী করা চলিবে না—গ হাজির। খাঁদুকে ডাকিয়া দাও,—এখন

এই রাত্রে?

লোকটি কহিল, "হ্যাঁ, নৌকো এ ছাড়বে!"

ভয়ে কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর হিম হ গেল। কিন্তু কি করিবে সে? তাহা কোন জোর নাই! জোর করিলেই শুনিবে কে? আঁচলে চোখের জল মু খাঁদুর কাপড়-চোপড়, বই-শ্লেট, ব্যা

খানে যাহা ছিল, সমস্ত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া াদুর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইল। াঁদু ঘুমাইতেছে, মুখে ফুলের মতই শুভ্র র্শল হাসি! সু-স্বপ্ন দেখিয়াছে বুঝি! আহা, াছারে! কিঙ্করী লুটাইয়া পড়িয়া তাহার চি মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

বাহিরে ডাক পড়িল, "দেরী হয়ে যাচ্ছে গো—শীগ্‌গির খাঁদুকে নিয়ে এসো না।"

নির্ব্বাক বেদনায় কিঙ্করীর বুক ফাটিয়া াইতেছিল। কিন্তু কি করিবে সে! তাহার কোন জোর নাই—পরের ছেলে খাঁদু—কিঙ্করী খাঁদুর কে? কেহ নয়—সে পর, র—ওগো পর!

—কিন্তু সত্যই কি সে খাঁদুর কেহ য়? বোনের ছাওর আবার বাহির হইতে াড়া দিল, "আঃ, মিছে দেরী করছ কেন া! না পারো ত বল, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি—"

না, না, না—চোখের জল মুছিয়া খাঁদুকে কে করিয়া আনিয়া কিঙ্করী গাড়ীতে তুলিয়া ল, অত্যন্ত সাবধানে। বাছার ঘুমটুকু া ভাঙ্গে! আহা, কাল সকালে উঠিয়া খন খাঁদু আর মাসিমাকে দেখিতে পাইবে া, তখন—! তাহাকেও আর কাল ইতে ভোরে উঠিয়া কাহারো জন্য খাবার াজাইতে হইবে না! কতদূরে কোথায় াকিবে খাঁদু, কে জানে! হয়ত বা জন্মশোধ ই দেখা! গাড়োয়ান বলিল, "এই মাগী, ঠো—" বলিয়া সে ঘোড়ার রাশে টান দিল। াড়ী চলিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, কিঙ্করী গাড়ীর পানে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। গাড়ী গড়্ গড়্ শব্দে কলিকাতার নিস্তব্ধ রাজপথ সচকিত করিয়া ছুটিল—কিঙ্করীর মনে হইল, তাহার বুকের উপর দিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জরগুলাকে মড়্-মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল! গাড়ী চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইলে "খাঁদু, বাবা আমার—" বলিয়া চীৎকার করিয়া সে দ্বারের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে চোখ মেলিয়া কিঙ্করী চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাঁদু, মৃদু ঠেলা দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, "মাসিমা, ও মাসিমা ওঠোনা,—অনেক বেলা হয়ে গেছে যে। আজ আমার এগ্‌জামিন, মনে নেই বুঝি? উঃ! সকাল সকাল স্কুলে যেতে হবে না? কাল রাত্তির থেকেই ত বলে রেখেছি—বা রে—"

ঘরে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ধড়মড়িয়া উঠিয়া কিঙ্করী খাঁদুকে বুকে টানিয়া লইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া ভালো করিয়া আবার চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, না—এ ঘুম নয়, স্বপ্ন নয়, সত্য, সত্যই যে খাঁদু! খাঁদুকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া চুমা দিয়া সমস্ত অকল্যাণ মুছিয়া লইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে ছুটিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বর্ণ-মৃগ

কে এখানে পাঠিয়ে দিলে এই জাগরণ-মাঝ ?
মাথার 'পরে মেঘ-নগরে বজ্ররাগে ধ্রুপদ বাজে আজ।
পর্দ্দা দিয়ে আড়াল করে'
লুকোচুরি খেল্‌ছে ওরে !
সম্‌ঝাইতে পারিনে সেই মহাশিবের মহান্ অভিপ্রায় ;—
নিব্‌ল দিনের শেষ-সোনালি, আমার দিনের আঁধার কিনারায়।
দুঃখ-সুখে অবিচ্ছেদে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে
কর্‌ছ পরখ্ কে গো আমায় নিয়ে ?
কে তুমি মোর চিন্‌ব কবে ? কম্‌নে আছ শুধাই গো তোমায়।

ছিলাম না কি জন্মের আগে, বিস্মরণী বৈতরণীর পারে
রইব কিনা বল্‌বে কে আমারে ?
মাঝ্‌খানে এই আধেক-ভীতি-আধেক-পুলকভরা,
কান্নাহাসির এই দেয়ালা, একটু আশা একটু প্রীতি-ঝরা,
স্বপ্ন বলে'ই হচ্ছে মনে—বুঝ্‌ব কি গো সার্থকতা এর ?
আসলটুকু কখন্ পাব টের ?

মর্‌ছি ঘুরে' গোলোক-ধাঁধায়, বাইরে যাবার দ্বার
কোন্ মরণে, দিগ্‌বিদিকের পার ?—
পথের ধারেই ফুল-কিশোরীর স্বয়ংবরে আজ
রজনীগন্ধার সোহাগে মাতাল গন্ধরাজ,
কিন্তু পলক না ফেল্‌তে হায়
মধুর কণা সোয়াদ হারায়—
উঠ্‌ল গেঁজে রসের তাড়ী, এক চুমুকে নিঃশেষিয়া তায়
ইন্দ্রিয়েরা বাউরা হ'য়ে যায়।
এই প্রমাথী শত্রুগুলোয় কেমন করে' কর্‌ব ওগো জয়,
কোন্ সে পুরশ্চরণ শেষে ভয়কে আমি কর্‌ব না আর ভয়।

দৃগ্‌-গণিতে ঐক্য নাহি, সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হ'ল,
আমার মনের দূরবীনে তার কালীর ছায়া প'ল।
উঠ্‌ল তুফান বুকের তলায়, কপটতার তৃপ্তি ছুটে যায়,
ঘরের যারা পর হোল' রে—পুঁতুল সম কাচের চোখে চায়,
দৃষ্টিভরা শুষ্ক দেমাক, সহজ হাসি লুকিয়েছে কোথায় !
পাড়্‌লে কথা তাদের কাছে,
বখ্‌রা দিতে হয় গো পাছে
তাদের সুখের একটি রতি, আশঙ্কাতে পাশ কাটিয়ে যায়,
চাইনে কিছু তাদের কাছে—একটা কথা শুন্‌তে নাহি চায়।

ধন-দৌলৎ জোয়ার-ভাটা ; সুর্‌তি-খেলায় পড়্‌তা পড়ে কারো,
যে যত পায়, চায় সে ততই আরো ;—
ছেলেবেলায় দোলায় শুয়ে, হারিয়ে গেলে রঙীন্ 'চুষিকাঠি'
বায়না ধরে' অবুঝ কান্নাকাটি।
র‍্যালা করে' সেই বোকামি হায়
পড়্‌লে মনে আজ্‌কে হাসি পায়—
আজও কি সেই তেম্‌নিতরই ফেল্‌ছি না রে চোখের নোনা জল
হারাই যখন সোনার কুচি, যাদুকরীর কটাক্ষ টল্‌মল্ ?
প্রাণ-কমলের পাপ্‌ড়িগুলির মাঝ্‌খানে
লুকিয়ে তারে রাখ্‌ছি না কি সাব্‌ধানে ?
সে যদি হায় চায়না আমায়, ফল্গু-সমান বহায় সে উজান
সোহাগ-অভিমান।
বুঝ্‌তে যদি পারি গো তার ভালবাসার ভাণ
আজও কেন ডুক্‌রে ওঠে প্রাণ ?
বুঝে-সুঝেও আঁক্‌ড়ে ধরি ঢেউএর মাণিক হায়
ঝাঁপিয়ে পড়ি ভুলের দরিয়ায়।
ঝুটো বলে'ই মান্‌ছি বটে,—ক্ষেপার মতন তবু গো তাই খুঁজি !
সাঁচ্চা বলে'ই কর্‌ছি না কি পুঁজি ?
যারেই দেখি শুধাই এ নিখিলে
রয় দুনিয়া অবাক্ হ'য়ে, এই হেঁয়ালির জবাব নাহি মিলে।

চাঁদের হাসি ডুব্‌ল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে ?
সুধার নেশা লাগ্‌ছে না আর মিঠে।
বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে সাথে,
নেই সে চুমু শারদ জোছনাতে,
চুম্বকেরি টানে যখন যুগল এসে মিল্‌ত হাতে হাতে,
টান্ পড়িত ফুলের সে 'ছিলা'তে !

শিশু এসে জড়িয়ে গলা দিচ্ছে হেসে খুসির পরিচয়,
পুরাণো এই খেলার দেশে নতুন অভিনয়।
অরুণ রঙে রঙীন্ যে তার প্রাণ,
পূর্ণিমাকে দেয় সে হাসি, হাওয়াকে দেয় গান।—
আমার সাঁঝে ফুট্‌ছে গো তার রাত-পোহানোর আলো,
তার সে শাদা আমার কাছে কালো।
ওই যে হোথা হাস্‌ছে হাসি যুগল-তারার আলো,
কবির মত লাগ্‌ছে গো তার কতই না সে ভালো।
বুঝ্‌বে না সে কী যে জ্বালা, কি বিদ্রোহ লাল-শিখাতে,
পুড়ে-পুড়েই বুকের পাঁজর ছাই হ'ল রে দিবস-রাতে !

এম্‌নি খেলাই খেল্‌ছে মহাকাল—
'রাই' হয়ে সে ঢাল্‌ছে সোহাগ, বিলাস-দোলে দিচ্ছে জলদ্ তাল ;
পা'র কাছে তার ভেট দিয়েছে ঋতুপতি ফুলের শিরস্ত্রাণ,
মিলন-দিনে নিধুবনে ফাগুন-মধুপান।
চুল্‌টি বাঁধা
রইল আধা,
হঠাৎ কাণে লাগ্‌ল বাঁশীর তান,
চম্‌কে ওঠে সম্পা সম চম্পাতরুণ প্রাণ ;
সেই মরমীর মুখের রুচি বক্ষে চাপি' পাগল সে মুকুর,
যুগে-যুগের বাঁশীর কাঁদন, মিলন-রতি বিচ্ছেদে-মধুর।
ডাক দিয়েছে বর-নাগর উপমাহীন পরম-মনোরম,
ক্ষয় নাহি তার যৌবনেরি—ব্যাকুল ব্রজে অনন্ত সঙ্গম।
মন-যমুনায় ঢেউ তুলেছে বাঁশীর ব্যঞ্জনা,
বাজিয়ে নূপুর আয় রে রঞ্জনা,

আয় রে আয় হৃদ্‌মাঝার,
চাইগো তায় হইছি যার।
পরকে চাই, পরকে চাই,
নইলে পর সুখ তো নাই।
মুছিয়ে নীর পর চোখের,
ঘুচিয়ে দুখ পর বুকের,
চাইতে মোর কিচ্ছু নাই।
সুখ-সাধন উন্মাদন,
প্রেম-রভস রাস-ঝুলন
রঙ্গ মোর রস-লীলাই।
চাউনি আর রয় না থির,
লাগ্‌ল মিল দিল্ আঁখির।'
ভাঙ্গিয়ে নিদ্ গায় তোতায়,—
'মন্-চোরার সিঁধ্ কোথায় !'
ফুল-ফাঁদের বন্দীকে
দিগ্ ভোলায় কোন্ দিকে !
যৌবনের নৌকোতে
বাইছে দাঁড় জোর-স্রোতে—
সাঁঝ-বেলায় জল-কেলির
জল-তরং সুর মদির
ভাসিয়ে দেয় লাজ-বসন,
স্তন-কদম আধ্ মগন।
মুখ-মদের মৌ-ধারায়
মন মাতায় সুখ-ব্যথায়।
নিশ্বাসের খোস্‌বোতে
লিখ্‌ছে নাম দাস-খতে ;
গুল্‌ফ-মূল পা'র পাতায়
রক্তগুল্ লজ্জা পায়।
লাক্ষাকীট ঢাল্‌ছে রাগ
আল্‌তা-পায় খেল্‌তে ফাগ।
কস্তুরীর যশ লুকায়
শৈল-পার কুঞ্জ-ছায়।

কোন্ শাঙণ রোদ-জলে
মন্ত্রে কার মন গলে !
কোন্ বিহান স্বর্ণ-ধূল
ঝরিয়ে দেয় সব বকুল।
গাঁথ্‌ছে হার, নাই সে ফাঁস,
টুট্‌ছে আধ্—ঘোম্‌টা-পাশ।
মুখ-পরশ চুম্-সরস,
অঙ্গ আর রয় না বশ ;
রোম-কূপের ফাঁক দিয়ে
সব সুধাই নেয় পিয়ে।
মজিয়ে দেয় এক 'পেয়ার'
লাখ্ জনম, লাখ্ হিয়ার,
লাখ্ যুগের তৃষ্ণাতে
সাধ মেটায় দিন-রাতে।
সয় দরদ্ বেদ্‌নাতে,
ছয় ঋতুর ঝুল্‌নাতে।
হয় তিলেক অন্তরাল,
কল্‌জে-তল দেয় রে তাল,—
মন হাজির হয় কাণে,
চোখ বুজে তার ধ্যানে,
তার পথে, মন্-রথে
জয় করে' মন্মথে,
নেয় বরে' ফুল-ডোরে
প্রাণ-বঁধুর হাত ধরে'।
বন-বিহার ফুল-খেলায়
চন্দনের গন্ধ বায়,
বিলিয়ে দেয় নগ্ন প্রাণ,
মাঙ্‌তে ভিক্ চায় না মান,
আশ্লেষের সম্মোহন,
রয় না ভেদ পর-আপন।
লগ্ন যায়, লগ্ন যায়,
আয় রে রাই আয় রে আয়—

ভাঙ্‌ছে মান বংশীর ইন্দ্রজাল,
রসিয়ে দেয় অশোক লালে লাল।
এম্‌নি করে'ই খেল্‌ছে মহাকাল।

খেল্‌ছে যারা দেখ্‌ছি দিনে-রাতে,
ঐ খেলাতে মন যে নাহি মাতে ;—
নতুন খেলার ধ্যান করে চোখ অশ্রু-কোটর-তলে
অগাধ কৌতূহলে—
হারিয়েছে মোর ভাবের ঘরে অসার অভাব শুনে'
ক্লান্তি কড়া নিইছি মিছে গুণে'।
বুঝ্‌ছি এখন কি ঝক্‌মারি !
রাত-ভিখারী দিন-ভিখারী
করেছি হায় মন্‌টিকে মোর, তাই তো ভুগে মরি,
স্বার্থ-বেড়ায় আপ্‌নাকে হায় খর্ব্ব করি' করি'।
রসাতলের পাশার ছকে, হার জিতে হায় ফতুর হ'ল প্রাণ,
মেকির হাটে সওদা করে' আসল-পুঁজি হ'ল রে লোক্‌সান।

পূজার সাজির অপ্‌রাজিতা ফুট্‌ছে আমার সন্ধ্যামণির পানে,
মিঠা বিষের মথন-শেষে আনন্দ-সন্ধানে।
সয় না দেরি, মুল্‌তুবী আর—যে সুখ-রসে নিখিল পরিপূর,
এই সরাইএর দুয়ার থেকে আব্‌ছায়া তার দেখ্‌ছি বহুদূর।
সাগর-বারির বুদ্‌বুদেরা চায় আকাশের নীল বিথারেই চায়,
সৈকতে দেয় কইয়ে কথা, গোষ্পদে তার কুলায় না যে হায় !—
চাইছে বুক
দিব্য সুখ,
সুখ অভয়,
দ্বন্দ্ব-ক্ষয়,
মৃত্যুজিৎ
ছন্দগীত,
তার নাগাল পায় না মৃৎ।
নিত্য-রূপ, কল্পভূপ,

এক অনুপ-পূর্ণ সেই—
সেই ভূমায় অর্ঘ্য দেই।
নিখিল-শ্রীর তারার নাট-
মন্দিরের মন্ত্রপাঠ,
সাত্ত্বিকের শান্তি-শ্লোক,
মুক্ত ওই চৌদ্দ লোক—
বিশ্বাসের বিরাট্‌ মেরুর জ্যোতি
চিরন্তন কর্‌ছে দীপারতি।
ওগো আমার যুগেযুগের জীবন-ভুলানো,
কই গো তোমার পরশ-মণির হরষ-বুলানো !
দাও গো দেখা, দাও গো মোরে দেখা,
জাগ্‌তে নারি পারের বাসর এমন একা-একা—
দাও রাঙায়ে আঁধার রাতে আলোর অভিসার,
বন্ধু হে আমার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, 'সভ্যতা' মানবজাতির পক্ষে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ তাহা বলা কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, সভ্যজাতিরা বর্ব্বরজাতিদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এই হিসাবে বলিতে হয় 'সভ্যতা' মানুষের পক্ষে 'উন্নতি' নয়,—'অধোগতি'। শক্তিমন্ত্রের প্রচারক আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতও এমন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথাটা এত সহজে মীমাংসা করা চলে না। সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমরা আর-একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

এই যে বর্ত্তমানে পশুবলদৃপ্ত জর্ম্মাণীর সঙ্গে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের লড়াই বাধিয়াছে, তাহাতে একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার দেখা যাইতেছে। জর্ম্মাণী বলিতেছে যে, জর্ম্মাণ 'Kultur'ই মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বস্তু। পৃথিবীর আর সকল জাতি—টাকা-কড়ি ধন-দৌলত লইয়াই ব্যস্ত—সুতরাং প্রকৃত সভ্যতা লাভ করে নাই। আর পৃথিবীময় যাহাতে সেই অপূর্ব্ব জর্ম্মাণ 'Kultur' বিতরণ করা যায়, তাহাই জর্ম্মাণীর উদ্দেশ্য—আর তাহারই ফলে এই ঘোরতর যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ অন্য জাতিরা বলিতেছে যে, জোর করিয়া পৃথিবীর অন্য দুর্ব্বল-জাতিদিগকে পদানত

করাই জর্ম্মাণীর উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া জর্ম্মাণী যোগাড়-যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতকালের মানব-সভ্যতা কি জর্ম্মাণীর শক্তি-মন্ত্রের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে! অন্যান্য দুর্ব্বলতর জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা কি তাহার নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণীকৃত হইবে? আধুনিক যুগের উন্নত আদর্শ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পরম বাণী কি জর্ম্মাণীর বর্ব্বরতার কবলে পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইবে? না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই দুর্ব্বলতর জাতিদের স্বাধীনতা-রক্ষা, পৃথিবীময় শান্তি ও প্রেমের আদর্শ-স্থাপন, বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যই বর্ব্বর জর্ম্মাণীকে পদদলিত করা দরকার।—তাহার বিষদাঁত না ভাঙ্গিলে পৃথিবীর আর মঙ্গল নাই।

বেশ কথা। কথাটা শুনিলে প্রাণে আশা হয়; বুদ্ধদেবের দেশের লোক আমরা—আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু এতকাল আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে জর্ম্মাণীই প্রতীচ্য 'সভ্যতা'র মুকুটমণি। ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা যে সভ্যতার গর্ব্ব করে, জর্ম্মাণীর সভ্যতা যে তাহা হইতে কিছু ভিন্ন রকমের ছিল, ইহা ত আমরা এতদিন শুনি নাই! বরং যে কাব্য-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত, বিলাস-ব্যসনের জন্য জর্ম্মাণী বিখ্যাত ছিল, তাহা যে ইউরোপীয় সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ দান এবং উহারই আবহাওয়ার 'আওতার' মধ্যে তাহা যে বাড়িয়া উঠিয়াছে এই কথাই প্রতিনিয়ত শুনিয়া আসিয়াছি। সম্ভবতঃ যে মুহূর্ত্তে জর্ম্মাণী বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে পদদলিত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সভ্যতা ভিন্ন রকমের হইয়া উঠিল! উহার বদলে জর্ম্মাণী যদি চীন ও তুর্কীস্থান আক্রমণ করিয়া দখল করিত, তাহা হইলে কথাটা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা এখন আন্দাজ করিয়া বলা শক্ত।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে যে, জর্ম্মাণী নূতন বিশেষ কিছুই করে নাই। সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বকালেই যে-সকল জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই অন্য দুর্ব্বল জাতিকে জোর করিয়া পদানত,—এমন-কি, ধ্বংস পর্য্যন্ত করিয়াছে। তাহাদের সকলেরই যে উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল, এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। আর্য্যজাতি যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের আদিমনিবাসী দ্রবিড় প্রভৃতি জাতিদিগকে কতক মারিয়া, কতক বনে-জঙ্গলে তাড়াইয়া এই 'সুজলা সুফলা' ভূমিকে দখল করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের 'বৈদিক সভ্যতা' প্রচারের খুব বড়রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল, এমন কথা বলাও শক্ত। 'নেবুচেদনেজারে'র কর্ত্তৃত্বে পারসীক বাবিলন যখন হিব্রুজাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এমন সন্দেহ কেহই করে না। রোমের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য যে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রচার নয়—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যভোগ, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আর তৈমুরলঙ্গ ও চেঙ্গিস খাঁর বিপুল বাহিনী যখন ইউরোপ ও এসিয়ার দেশে দেশে রক্তের স্রোত

বহাইয়া, গ্রাম-নগর ধ্বংস করিয়া, দক্ষযজ্ঞ-ভঞ্জকারী শিবানুচর প্রমথদের তাণ্ডবলীলার পুনরভিনয় করিতেছিল, তখন যে কোন সুগভীর তাতার Culture প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসে তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহম্মদের নূতন মন্ত্রে জাগ্রৎ হইয়া আরবজাতি যখন বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়াছিল, তখন প্রথমটা তাহাদের মধ্যে নবধর্ম্ম-প্রচারের একটা মহৎ উদ্দেশ্য যে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ইউরোপ ও এসিয়ার কতকগুলি সিংহাসন দখল করাই যে তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে সেখানে যখন দলে দলে ইউরোপীয় নানা জাতি আড্ডা করিয়াছিল ও প্রাচীন অধিবাসীদিগকে শিকার করিয়া মারিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর কোন নূতন বার্ত্তা প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা যে এসিয়ার শান্তিপ্রিয়, অনুন্নত' নানা জাতির পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, তাহার মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের মহতী বাণী প্রচার করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এতখানি বিশ্বাস করাও কঠিন হইয়া উঠে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে জর্ম্মাণীর পৃথিবী-বিজয়ের চেষ্টা যে তথাকথিত দিগ্বিজয়-পরম্পরারই শেষ ফল, তাহা বলিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক ভুল হয় না।

সোজা কথায় পশু-জগতের ন্যায় মানব-জগতেও এ-যাবৎ মারামারি কাড়াকাড়িই জীবনের প্রধান কার্য্য ও নিজের স্বার্থের পরিধি বাড়ানোই প্রধান আদর্শ হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দিব্যদৃষ্টিতে আচার্য্য ডারুইন সাধারণ জীব ও উদ্ভিদ-জগতে যে জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মানব-রূপ বিশেষ জীবের মধ্যে যে তাহা অপেক্ষা অন্য তত্ত্ব বা নীতি কার্য্য করিয়াছে, তাহার ত কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে 'যোগ্যতমে'র আদর্শ যে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, এ-কথা কতকটা মানা যায়। নিম্নতর জীব ও আদিম মানবের ভিতর একমাত্র গায়ের জোরই 'যোগ্যতমে'র মাপকাটি ছিল। 'জোর যার মুলুক তার' এ কথা তখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শুধু 'গায়ের জোর' আর প্রধান মাপকাটি থাকিল না। গায়ের জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোরও আসিয়া যখন যোগ দিল, তখন যাহাদের গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর উভয়ই প্রবল ছিল, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। শুধু গায়ের জোর বা শুধু 'বুদ্ধির জোরে'র বিশেষ-কিছু মূল্য কোন কালেই হয় নাই। সেইজন্য যে-সকল জাতি গায়ের জোরের দিকে তেমন মন না দিয়া, কেবল বুদ্ধির চালনাই করিতে ছিল, তাহাদের সেই অসম্পূর্ণ 'মানসিক' সভ্যতা—প্রবলতর 'দৈহিক' সভ্যতার কাছে বিধ্বস্ত হইয়া ছিল। প্রমাণ, গথ-দিগের দ্বারা রোমের ধ্বংস, মোগল-পাঠানদের দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর নির্য্যাতন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীময় আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আসল কারণ এই যে, তাহারা গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর—দৈহিক ও মানসিক সভ্যতা—উভয় হিসাবেই 'যোগ্যতম' ছিল। তাই একদিকে নিগ্রোদের কেবল 'গায়ের জোর' ও আর-একদিকে এসিয়ার সভ্যজাতিদের কেবল বুদ্ধির জোর, কিছুই তাদের কাছে টিকে নাই। আর বলা বাহুল্য আধুনিক ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মাণীই সেই 'গায়ের জোর' ও 'বুদ্ধির জোর' উভয় হিসাবেই সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। তাই জর্ম্মাণীর পৃথিবী-জয়ের চেষ্টা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতারই চরম পরিণতির চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে যে বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে এই মহাযুদ্ধের আকারে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, এই 'সভ্যতার' মধ্যে কোথাও যেন 'খুঁৎ' আছে, কোথাও এমন মারাত্মক ব্যাধির বীজ লুক্কায়িত আছে যে, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-মানবের দেহটাই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এই যে স্বার্থের আদর্শ, ভোগের আদর্শ, ঐশ্বর্য্যের আদর্শ, মারামারি-কাড়াকাড়ির আদর্শ মানবসমাজে এ-পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া কি আর কোন আদর্শের ইঙ্গিত মানবসমাজে এ-পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই? এই যে দম্ভ, অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা ইহার বিপরীত প্রেম, সহযোগিতা ও ত্যাগের বাণী মানবসমাজ কি কোনদিন শোনে নাই? শুনিয়াছে বৈকি! কিন্তু কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে নাই। পৃথিবীতে প্রধানতঃ তিনজন মহাপুরুষ বা ভগবানের অবতার (যাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন) এই প্রেম ও ত্যাগের বাণী শুনাইয়াছেন। প্রথম রাজপুত্র সিদ্ধার্থ—যিনি রাজ্য, ভোগ-ঐশ্বর্য্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া মানবের দুঃখে কাঁদিয়া ভিখারীর বেশে বিশ্বের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—এই সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার পরমবাণী তিনি জগৎকে শুনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়—জেরুজেলমের যীশু-খ্রীষ্ট, যিনি সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও প্রেম ও ত্যাগের আদর্শ মানুষের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, নিজের প্রাণ দিয়াও অহঙ্কারী, ধনগর্ব্বী, অত্যাচারী মানবের মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়—নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি সমস্ত বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানগর্ব্বের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া মানুষকে প্রেমের রাজ্যের পথ দেখাইয়াছিলেন, বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার কুহকে আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা শুনাইয়া ছিলেন। ইঁহাদের সকলের কথাই মানুষ শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; আর এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ইঁহাদেরই শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। কিন্তু সত্যকথা এই যে, মানবসমাজ কোনস্থলেই গভীরভাবে ইঁহাদের কথা উপলব্ধি করে নাই,—রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে কোনদিনই ইঁহাদের ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুখে মানুষ যত-বড় কথাই বলুক না কেন, কার্য্যতঃ তাহারা সেই স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার সভ্যতারই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। তাই পৃথিবীর

অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান বা বৈষ্ণব হইলেও, জাতিতে জাতিতে মারামারি কাড়াকাড়ি কিছুমাত্র কমে নাই।

এই যে ত্যাগ, সহযোগিতা ও প্রেমের আদর্শ, উহা খাঁটি এসিয়ার আদর্শ। যদি মানব-সভ্যতাকে এই নব আদর্শের উপর স্থাপন করিতে পারা যায় তবেই তাহার মঙ্গল হইতে পারে। অবশ্য আমরা জানি যে অনেক পণ্ডিত এই "ত্যাগে"র আদর্শকে "দুর্ব্বলের ধর্ম্ম" বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত "সবলের ধর্ম্ম"—ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রতিযোগিতার আদর্শ মানুষকে কি কোন শান্তি দিতে পারিয়াছে? উহার অন্তরে যে লালসা—উহার বাণী যে "আরো চাই, আরো চাই"—উহা মানুষের অতৃপ্তিকে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।

আর ইহাই প্রকৃত 'বর্ব্বরতা'। উহার যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গর্ব্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর, ধন-দৌলতের পরিমাণ ও আরাম-বিলাসের উপকরণ থাকুক না কেন—উহা মূলতঃ বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে হয়ত হূণ, তাতার ও গথদের মত মূল বর্ব্বরতা নহে—জ্ঞানবিজ্ঞানের বার্ণিশে মার্জ্জিত নূতন ধরণের বর্ব্বরতা। আর যতদিন ইউরোপ এই বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আদর্শকে ধরিয়া চলিবে, ততদিন সে "Pan-christianism", "League of Nations", "Freedom of the World" প্রভৃতি যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, পৃথিবীতে কিছুতেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। মারামারি, কাড়াকাড়ি ও প্রবলের জয়,—ইহাই নির্ব্বিচারে চলিতে থাকিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জীব-হিসাবে মানুষ জীবজগতের সাধারণ নিয়মের অধীন। সুতরাং তাহার মধ্যে "Struggle for existence", "Natural Selection" (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন) প্রভৃতিই স্বাভাবিক। জোর করিয়া ত্যাগ, প্রেম ও সহযোগিতার আদর্শ তাহার মধ্যে প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্বের আবিষ্কার এ-বিষয়ে আমাদিগকে আশা দিয়াছে! প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রামই যে জীবজগতের সমগ্র নীতি নহে, একাংশ মাত্র—তাহা আমরা আজকাল বুঝিতেছি। জীবজগতের নিম্নতম স্তরেও প্রেম ও সহযোগিতার ক্রিয়া চলিতেছে। আর যতই জীবরাজ্যের ঊর্দ্ধস্তরে উঠা যায়, ততই এই নিয়মের সফলতা দেখা যায়। মানুষের ক্রমবিকাশের উচ্চস্তরে কালে যে এই উচ্চতর নীতি কার্য্য করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; বরং ইহাই যে মানুষের পক্ষে সত্য নীতি—দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা নহে—ভবিষ্যতের জীবতত্ত্ব তাহা হয়ত প্রমাণ করিয়া দিবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় যে, এই ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, প্রবলের হস্তে আত্মরক্ষায় তাহাকে অক্ষম করিয়া তোলে। কথাটা কিয়দংশে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু গণ্ডবলই কি মানুষের একমাত্র বল? সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন-দৌলত, ক্ষমতা, প্রভুত্ব—ইহাই কি জাতির একমাত্র লাভ? ইহা ছাড়া মানুষের আর কি কিছু কার্য্য নাই? জাতির আর কি কোন লক্ষ্য নাই? এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, হয়ত-বা এই

সকলের বাহিরে আরও কিছু মহৎ বস্তু আছে। আর ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শের ভিতর দিয়াই সেই বস্তু লাভ হইতে পারে। ইহাতে হয়ত মানুষের "Efficiency" বাড়িবে না, হয়ত-বা অনেক জাতি পরপদদলিত হইবে, হয়ত-বা কেহ কেহ প্রবলের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই ত্যাগ ও প্রেমের 'সভ্যতা'ই জয়ী হইবে, —এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা উহাই বিশ্বমানবের চরম পরিণতি। বর্ত্তমান যুদ্ধের লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই ভীষণ বর্ব্বর-'সভ্যতার' একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে। বলগর্ব্বী ও ধনগর্ব্বী জাতিরা ধনে-প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হয়ত-বা ত্যাগের মহিমা বুঝিতেও পারে। রক্তেরাঙ্গা পৃথিবীর বুকে হয়ত-বা একদিন প্রেম ও শান্তির নিশান উড়িতেও পারে। আর তাহাই যদি হয়, তবে এই ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ বৃথা যায় নাই বলিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

জলের আল্পনা

পনেরো

আল্‌বোলার নলটি মুখে লাগাইয়া জগৎবাবু স্তিমিত চক্ষে সোফার উপরে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া ধোঁয়ার দুটি সাদা রেখা ফুটিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া জান্‌লার দিকে উড়িয়া যাইতেছিল।

তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মাণিক একখানা পত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। জগৎবাবুর হাতে পত্রখানা দিয়া বলিল, "একজন লোক এসে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল। বল্‌লে, জরুরি চিঠি।"

চিঠিখানা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "কার চিঠি এ? কোত্থেকে এসেছে, তা বল্‌লে না?"

—"না হুজুর! দিয়েই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।"

তামাকের নল ফেলিয়া জগৎবাবু ভালো-করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর টেবিলের উপর হইতে চশ্‌মার খাপ্‌খানা তুলিয়া লইয়া, চশ্‌মা বাহির করিতে গিয়া দেখেন, খাপ্‌ খালি। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও চশ্‌মা নাই!

—"মান্‌কে!"

—"হুজুর!"

—"আমার চশ্‌মা কোথায় গেল?"

—"জানি না, হুজুর!"

—"ত্যাখ্‌ দেখি, নীচে পড়ে গেছে কিনা!"

মাণিক টেবিল, চেয়ার সোফার তলা ঘরের আশপাশ আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া বলিল, "চশ্‌মা নেই হুজুর!"

জগৎবাবু খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "নেই গেল কোথায়?"

—"জানি না হুজুর!"

—"আল্‌বৎ জানিস্‌! দেখ্‌ছিস্‌ জরুরি চিঠি, জানি না বল্‌লেই হোলো? দে, চশ্‌মা বার করে' দে!"

—"আমার কাচে নেই হুজুর!"

—"আল্‌বৎ আছে! নেই বল্‌লেই হোলো! খাপ্‌ রইল টেবিলে আর চশ্‌মা গেল উড়ে? চশ্‌মার ডানা আছে—না?"

বেগতিক বুঝিয়া মাণিক কাঁচুমাচু মুখে মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিল!

জগৎবাবুর মেজাজ ক্রমেই বেশী গরম হইতে লাগিল। সপ্তমে গলা চড়াইয়া তিনি বলিলেন, "পাজী, চোর কোথাকার! বলা নেই, কওয়া নেই—চোখের সাম্‌নে চশ্‌মা লোপাট্‌, দিনে ডাকাতি? বার কর্‌ চশ্‌মা!"

—"জানি না হুজুর!"

জগৎবাবু সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া রুখিয়া বলিলেন, "এম্‌নি এক চড়্‌ মার্‌ব মান্‌কে, যে মাথাটা তোর ঘুরে যাবে! খালি-খালি এককথা—চালাকি পেয়েছিস্‌, না?"

হঠাৎ জগৎবাবুর কপালের উপরে চোখ পড়িতেই, মাণিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হুজুর, চশ্‌মা ত আপনার কপালেই রয়েছে!"

কপালে হাত বুলাইয়া জগৎবাবু দেখিলেন, তাই ত! তখন তাঁহার মনে পড়িল, ঘরের কাগজ-পড়া হইয়া গেলে পর, চশ্‌মাখানা নাকের উপর হইতে টানিয়া সরাইয়া তিনি কপালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। বেকুব বনিয়া তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, "মাণিক, কিছু মনে করিস্‌-নে বাবা!"

প্রিয় ভৃত্য মাণিকচাঁদ জো পাইয়া মুখখানা কাঁদোকাঁদো করিয়া বলিল, "হুজুর আমাকে চোর বল্‌লেন!"

—"বড্ড ভুল হয়ে গেছে মাণিক, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! আচ্ছা, আচ্ছা,—দাঁড়া!" বলিয়া, পকেটে হাত পুরিয়া জগৎবাবু তিনটি টাকা বাহির করিয়া, সশব্দে মেঝের উপরে ফেলিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের বুঝিতে একটুও দেরি হইল না যে, টাকা-তিনটি তাহারই বখ্‌শীষ! কেননা, এমন লাভ তাহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে;—ধমক, চড়্‌চাপড় এবং বখ্‌শীষ দিতে জগৎবাবুর মত সমান তৎপর লোক অন্য-কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ!

চশ্‌মাখানা ফের নাকের ডগায় নামাইয়া জগৎবাবু চিঠিখানা খুলিলেন। তাতে লেখা ছিল:—

"জগৎবাবু,

আপনার মঙ্গলের জন্যে এই পত্র লেখা হচ্ছে।

আপনি যার হাতে কন্যা-সম্প্রদান করবেন, সেই জয়ন্তের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত কদর্য্য; আপনার অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি,—অথচ, এক বাইজীর সঙ্গে তার বিশেষ মাখামাখি আছে। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে সেই বাইজীর বাড়ীতে গিয়ে সে গানবাজনা করে' থাকে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে

আপনি এখনি —নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে সেই বাইজীর বাড়ীতে গেলে জয়ন্তের দেখা পাবেন।"

পত্রে লেখকের নাম-ধাম কিছুই ছিল না।

জগৎবাবু পত্রখানা হাতে-করিয়া জড়ীভূতের মত বসিয়া রহিলেন।

এও কি সম্ভব? জয়ন্ত,—যার স্বভাবে, ভাবে-ভঙ্গীতে, কথায়-বার্ত্তায় আজ-পর্য্যন্ত তিনি কোন খুঁৎ দেখিতে পান নাই,—সে কিনা—সে কিনা—আরে ছ্যাৎ, এ হ'তেই পারে না!

জগৎবাবু আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এ মিথ্যেকথা—ডাহা মিথ্যে!"

কিন্তু পত্রের শেষে এ কী লেখা রহিয়াছে? বৌবাজার ষ্ট্রীটে বাইজীর বাড়ীতে এখনি গেলে জয়ন্তের দেখা পাওয়া যাইবে!

জগৎবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আপন মনেই বলিলেন, "হ্যাঁ, দ্যাখা অম্‌নি পেলেই হ'ল কিনা! এ উড়ো-চিঠি নিশ্চয় কোন হিঁস্‌কুটে বদ্‌লোক পাঠিয়েছে!"—একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্...একবার খোঁজ নিয়ে এলে মন্দ কি? মনের ভেতরে মিছে একটা ধোঁকা রাখা কিছু নয়!"

জগৎবাবু চিঠিখানা আবার খামের ভিতরে পুরিয়া হাঁকিলেন, "মাণ্‌কে!"

মাণিকচাঁদ তখন চাকর-মহলে মেঝের উপরে পা-ছড়াইয়া বসিয়া কর্ত্তার চশমা-চুরি ও তাহার বথশীষ-লাভের কাহিনীটা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিতেছিল,—কর্ত্তার ডাক্ শুনিয়া সাড়া দিল, "হুজুর!"

—"শীগ্‌গির গাড়ী জুত্‌তে বল্!"

—"আচ্ছা হুজুর!"

জগৎবাবু মনের ভিতরে সম্পূর্ণ অবি[শ্বা]স লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন; [কি]গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে পর, স[ন্দে]যখন বাইজীর বাড়ীটা খুঁজিয়া বা[হির] করিল, তখন উপর হইতে গানের [সুর] পাইয়া জগৎবাবু গাড়ীর ভিতর হ[ইতে] মুখ বাহির করিয়া যাহা দেখিলেন, [তা]স্বপ্নাতীত!

ইলেক্‌ট্রিকের আলোকে রাস্তা হ[য়ে]দ্বিতলের একটা ঘরের ভিতর প[র্য্যন্ত] পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সেখানে না[রী] কণ্ঠে গান হইতেছে—এবং সেইসঙ্গে বাহু[র] ও পায়ের ঘুঙুরের শব্দও শোনা যাইতেছে। আর, সেই ঘরেরই একটা জান্‌লার কা[ছে] বসিয়া আছে,—জয়ন্ত!

জগৎবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার চা[হিয়া] দেখিলেন,—হ্যাঁ, ও মূর্ত্তি জয়ন্তেরই!

তাঁহার চোখ যেন পুড়িয়া গে[ল]। বিকৃতস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন, "এই! গা[ড়ী] ঘুমাও!"

ষোলো

হারমোনিয়ামের সাম্‌নে ইন্দুলে[খা] মাসিকপত্রের স্বরলিপি দেখিয়া একটা গা[ন] অভ্যাস করিতেছিল, এমনসময়ে জগৎবা[বু] সজোরে ধাক্কা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া ঘ[রের] মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

—"উঃ, অত জোরে কি দর্‌জা খুল্‌[তে] হয়, বাবা? একেবারে চম্‌কে গিয়েছিলুম!"

—"তোর বাজ্‌না থামা ইন্দু!"

পিতার গলার স্বর শুনিয়া, বাজ্‌না বন্ধ [ক]রিয়া ইন্দুলেখা অবাক্‌মুখে চাহিয়া রহিল।

—"ওঃ, মানুষ এমন কপট হ'তে [পা]র—এতদিন আমি কোন সন্দেহ কর্‌তে [পা]রি-নি!"

—"কি হয়েছে বাবা?"

—"হবে আর কি, আমার মাথা আর [মু]ণ্ডু! কি আশ্চর্য্য, দুনিয়ায় লোক-চেনা [দা]য়!"

—"হ্যাঁ বাবা, তুমি কার কথা বল্‌ছ?"

জগৎবাবু ঘরের ভিতরে এলমেল পায়ে [ঘু]রিতে-ঘুরিতে আপনমনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অ্যাঁ, আমার মেয়েকে আরেকটু [হ]লেই পথে বসিয়েছিলুম ত! ভগবান ভারি [বাঁ]চিয়ে দিয়েছেন!"

ইন্দুলেখার বুকটা কি-এক অশুভ [আ]শঙ্কায় দুপ্‌দুপ্ করিয়া উঠিল। কাতর [স্ব]রে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, [বল]না, কি হয়েছে?"

জগৎবাবু হঠাৎ ইন্দুর সুমুখে আসিয়া [দাঁ]ড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জানিস্ ইন্দু, [জয়]ন্তের সঙ্গে তোর বিবাহ হওয়া অসম্ভব!"

অসম্ভব! কেন,—কিছুই না-বুঝিয়া ইন্দু [ডা]গর্‌ফেলে চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া [চু]প করিয়া রহিল!

—"জানিস্, জয়ন্ত খারাপ স্ত্রীলোকের [বা]ড়ীতে যায়,—সে দুশ্চরিত্র!"

ইন্দুর প্রাণটা যেন দমিয়া বুকের ভিতরে [মি]শিয়া গেল—সে নিজের কাণকে বিশ্বাস [ক]রিতে পারিল না; ফস্-করিয়া বলিয়া [ফে]লিল, "না বাবা, না—এ মিছে কথা!"

—"মিথ্যেকথা! তুই কি আমাকে মিথ্যে-[বা]দী বলতে চাস্ ইন্দু? আমি যে এইমাত্র [স্ব]চক্ষে দেখে এলুম!"

ইন্দুর মুখ মোমের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এলাইয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে বলিল, "তুমি দেখে এলে? তুমি?"

—"হ্যাঁ, আমি—আমি! জয়ন্ত দুশ্চরিত্র —তার সঙ্গে তোর বিবাহ? সে হয় না ইন্দু!"—এই বলিয়া জগৎবাবু ঘর ছাড়িয়া অস্থির পদে আবার বাহির হইয়া গেলেন।

স্তব্ধ ও স্থির হইয়া ইন্দু সেইখানে বসিয়া রহিল।... ... ...

বহুদূরের তিমিরে-লিপ্ত প্রাসাদ-শ্রেণীর উপরে অতি-ধীরে রক্তরাঙা চন্দ্রলেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে বাগানের উপর হইতে অন্ধকারের পর্দ্দা আস্তে-আস্তে সরিয়া যাইতেছে এবং ঘরের সাম্‌নেই একটা বকুলগাছ বাতাসে থর্‌থর্ কাঁপিয়া আকুলস্বরে মর্‌মর্ করিয়া উঠিতেছে!

চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি, খাবার তৈরি হয়েচে!"

ইন্দু তাহার স্বরে চমকিয়া উঠিল; ধমক্ দিয়া বলিল, "কি চাস্ তুই?"

—"খাবার তৈরি হয়েচে!"

—"যা, চলে যা এখান থেকে! আমি খাব না!"

চাকরটা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দু তেম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ ঠায় বসিয়া রহিল।... ...তারপর ধীরে-ধীরে উঠিয়া আগে দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। কিন্তু ঘর তবু অন্ধকার হইল না—বাহির হইতে দুরন্ত একটি

মেয়ের মত, হাস্যময়ী জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

ইন্দু একে-একে সমস্ত জান্‌লা ভেজাইয়া বাহিরের সমস্ত আলো-কে ঘর হইতে নির্ব্বাসিত করিল। ঘরের বাহিরে শব্দময়ী, গীতিময়ী, দীপ্তিময়ী ধরণী; ঘরের ভিতরে সুধু নিস্তব্ধ, নিবিড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার!.. ...

সে অন্ধকার তাহার দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত এবং চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠিল!

* * * *

ইন্দুর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া জগৎবাবু বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে তখন অনেক লোকজন আসিয়া জমিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের গোল টেবিলের চারিধারে বসিয়া জন-চারেক ভদ্রলোক 'ব্রিজ্' খেলায় অত্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন; আর-এক কোণে কৈলাসবাবুর সাম্‌নে বসিয়া অবনী দাবার ছকের উপরে বিভোরভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জগৎবাবুকে দেখিয়া কৈলাসবাবু বলিলেন, "এই যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?"

—"বাড়ীর ভেতরে।"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া জগৎবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের ভিতরে সবাই তখন খেলায় তন্ময় হইয়া আছে,—তাই জগৎবাবুর মুখের অস্বাভাবিক ভাব কাহারো নজরে ঠেকিল না।

মাণিক আসিয়া আল্‌বোলার মাথায় কল্‌কে চড়াইয়া দিয়া গেল।

জগৎবাবু চিন্তিতমুখে মাঝে-মাঝে তামাকে এক-একটি টান্ দিতে লাগিলেন।

এমনসময় জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকি তাঁহাকে নমস্কার করিল!

জগৎবাবু এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষ বসিয়াছিলেন,—জয়ন্তকে দেখিয়াই চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নমস্কার করিয়াই জয়ন্ত বাড়ীর ভিত চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু জগৎবাবু গ কণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়াও জয়ন্ত!"

যাইতে-যাইতে জয়ন্ত আবার ফি দাঁড়াইল।

জগৎবাবু তেম্‌নি স্বরে বলিলেন, "জয়ন্ত, ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে গেলে আমি সুখী হব!"

ভ্রু-সঙ্কোচ করিয়া জয়ন্ত বিস্মিত ব বলিল, "কি বল্‌ছেন!"

—"ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপু আর না-ঢুক্‌লেই আমি সুখী হব!"

—"আপনি এইকথা বল্‌ছেন!"

—"হাঁ, আমার অন্তঃপুরে দুশ্চরিত্রে প্রবেশ নিষেধ।"

জয়ন্তের মুখ পাঙাশ হইয়া গেল। জগ বাবু কি তাহা হইলে—

—"তুমি যে এত অসৎ আমি জানতুম না। ছিঃ, ছিঃ, যাকে আমি সহ প্রাণে অনায়াসে আমার অন্তঃপুরে ঢুক দিয়েছি, সে কিনা অভদ্র ইতর স্ত্রীলোকে বাড়ীতে গিয়ে—"

বাধা দিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে জয়ন্ত বলিল, "জগৎবাবু, এ-সব কথা আপনি আমা গোপনে বল্‌তে পার্‌তেন।"

—"তাতে আবশ্যক? আমি ই করেই সকলের সাম্‌নে এই কথা তুলেছি

লুকোচুরিকে আমি ঘৃণা করি। দশজনের সাম্‌নে আমি তোমার মুখোস খুলে দিতে চাই! আজ থেকে তুমি আমার সদর মহলে আর পাঁচজনের মতই আস্‌তে-যেতে পার—তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমার বাড়ীর ভেতরে আর তুমি যেতে পার্‌বে না।"

ঘরের ভিতরে ততক্ষণে সকলের খেলা-ধূলো সব ঘুরিয়া গিয়াছে—লোকগুলির মুখ দেখিলে মনে হয়, এরা-সবাই যেন আকাশ হইতে সদ্য-সদ্য খসিয়া পড়িয়াছে!

বিশেষ-করিয়া দেখিবার মত হইয়াছিল, অবনীর মুখ! বিস্ময়, ঘৃণা ও আনন্দ প্রভৃতি নানা ভাবের আভাসে তাহার মুখখানা এম্‌নি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে মুখ অনায়াসে একজন ভালো চিত্রকরের চিত্রাদর্শ হইতে পারিত!

জয়ন্ত একবার সকলকার মুখের উপরে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "জগৎবাবু, অকারণে আমাকে অপমান কর্‌বেন না, আগে আমার কথা শুনুন—"

—"অকারণে! তুমি কি বল্‌তে চাও অকারণে আমি তোমাকে এ-সব কথা বল্‌ছি?"

—"নিশ্চয়! আমি নির্দ্দোষ।"

—"কী! তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী! জানো, আমি স্বচক্ষে তোমাকে কুস্থানে দেখে এসেছি?"

—"তা দেখ্‌তে পারেন। কিন্তু, আমি সেখানে গিয়ে থাক্‌লেও—"

—"থাক্, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না।"

—"জগৎবাবু!—"

—"চুপ্! তোমার কপটতা অসহ্য! আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে।"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, আমি চল্লুম। কিন্তু যে অপমান আজ আমাকে কর্‌লেন তার জন্যে পরে আপনাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে। আমি নির্দ্দোষ।"—বলিতে-বলিতে জয়ন্তের চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া সে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে সকলে তখনো হাঁ-করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে।

সকলের আগে অবনী মুখ খুলিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, জয়ন্তবাবুর চরিত্র এত খারাপ!"

জগৎবাবু আল্‌বোলার নলটা আবার তুলিয়া লইয়া তিক্ত-বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "থাক্, ও আলোচনায় আর কাজ নেই, অন্য কথা বলুন।"

অবনী আর-কিছু না-বলিয়া একটুখানি ঠোঁট্-টেপা হাসি হাসিয়া, আবার দাবার ছকের উপরে হেঁট্ হইল;—জয়ন্তের অপমানে তাহার মত খুসি আজ এখানে আর কেউ হয় নাই!

সতেরো

এক মেল পায়ে জগৎবাবুর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া জয়ন্ত যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রাগে দুঃখে অপমানে তখন তাহার আর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। দিশেহারার মত সাম্‌নে সে যে রাস্তা পাইল সেইদিকেই আপনমনে চলিয়া গেল। এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ সে এ-পথে সে-পথে ঘুরিতে

লাগিল ;—কতবার লোকের গায়ের উপরে পড়িয়া যা-তা গালাগালি খাইল, একবার এক-খানা গাড়ীর সুমুখে গিয়া পড়াতে গাড়োয়ান ছিপ্‌টি মারিয়া তাহার গণ্ড ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল—জয়ন্ত আজ কিন্তু কিছুতেই উচ্চবাচ্য করিতেছে না। তাহার বুদ্ধি এবং অনুভব-শক্তি আজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

গভীর নিশীথে গীর্জ্জার ঘড়ীটা আচম্‌কা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! পথে তখন লোকজন নাই বলিলেও হয়; কেবল একটা মাতাল গ্যাস্‌পোষ্টে ঠ্যাসান্ দিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া নেশার ঘোরে আপনমনে ঝিমাইতেছিল; হঠাৎ গাড়ীর শব্দে চম্‌কাইয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিল, "এই, চ্যাঁচাস্‌-নে—চ্যাঁচাস্ নে, অনেক কষ্টের নেশা বাবা, এক্ষুনি চট্‌-করে' চটে যাবে!"—বলিতে বলিতে গ্যাস্‌পোষ্ট ধরিয়া রাস্তার উপরেই সটান লম্বা হইয়া পড়িল।

তখন জয়ন্তের খেয়াল হইল। বুঝিল, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, ভজহরি এখনো তাহার জন্য জাগিয়া বসিয়া আছে। এমন ভাবে পাগলের মত পথেপথে ঘুরিয়া মরিয়া লাভ কি?... ...তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে আবার বাড়ীমুখো হইল।

জয়ন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা মস্ত চক্রান্ত হইয়াছে। নইলে স্বর্ণেন্দু আজ খাম্‌কা তাহাকে বাইজীর বাড়ীতে লইয়া যাইবেই-বা কেন, আর তাহার সেখানে যাওয়ার খবর জগৎবাবুই-বা এত-শীঘ্র টের পাইবেন কি-করিয়া? ...কিন্তু স্বর্ণেন্দুর এতে স্বার্থ কি? আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত আন্দাজ করিল, এর-মধ্যে অবনীরও হাত আছে; অবনী ইন্দুকে বিবাহ করিতে চায়, সে-ই তার পথের কাঁটা হইয়াছে; তাই অবনী তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দুর সাহায্যে আজ তাহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে! জয়ন্ত যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ ততই দৃঢ় হইয়া উঠিল; হ্যাঁ, আজ্‌কের ব্যাপারের মূলে আছে, ঐ অবনী!... ... ...

সারারাত অনিদ্রায় কাটাইয়া, খুব ভোরবেলায় জয়ন্ত যখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, ধরণীর মুখ হইতে তখনো কালো ছায়ার ঘোম্‌টা খসিয়া পড়ে নাই। পূর্ব্ব-তোরণে প্রাতঃসন্ধ্যার আরতি-প্রদীপে তখন আলোর ক্ষীণ শিখাটি সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং নীলগগনের ছেঁড়া মেঘের ভাঙা আসরে চিরমৌন শুকতারাটি করুণ নয়নে মেলিয়া পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে।

জয়ন্ত আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া ভোরের হাওয়ায় তাহার চিন্তাক্লান্ত প্রাণ অনেকটা শান্ত হইল। আস্তেআস্তে সে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ জগৎবাবুর বাড়ীর বাগানের দিকে চোখ পড়িতেই সে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাস্‌নাহানার সবুজ ঝোঁপের পাশে, ঠিক একটি প্রতিমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া ইন্দু একলাটি দাঁড়াইয়া আছে।

ডুবুডুবু লোক যেমন-করিয়া দূরের নৌকার দিকে তাকাইয়া থাকে, তেম্‌নি করিয়া জয়ন্তও ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ইন্দুও নিশ্চয় পিতার মুখে সমস্ত

শুনিয়াছে—আজ তাহার হৃদয়ে হয়ত তার আর একটুও ঠাঁই নাই—তাহার চোখে সে এখন নিষ্ঠুর প্রতারক বৈ অন্য-কিছু নয়! জয়ন্তের মনটা হা-হা করিয়া উঠিল।

তারপরেই সে ভাবিল, 'আচ্ছা, মিথ্যা এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের শান্তিসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌ব কেন? ইন্দু ত জানেনা, চক্রীর চক্রান্তে পড়ে আজ আমার এই বদ্‌নাম! তার কাছে যদি সমস্ত খুলে বলি, সে কি আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে না? আমি কি তার চোখে এতটা নীচু হয়ে পড়েছি?'... ...

আরো-খানিক্ ভাবিয়া জয়ন্ত স্থির করিল, সে এখনি ইন্দুর কাছে গিয়া তাহার ভুল ভাঙিয়া দিয়া আসিবে! ইন্দু বিশ্বাস করুক্ না-করুক, সে পরের কথা।

জয়ন্ত তখনি নীচে নামিয়া গেল।

বাগানের ফটক তত-সকালে খোলা ছিল না। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া জয়ন্ত দেখিল, ইন্দু তখনো ঠিক সেইখানটিতে তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

কম্পিত, সঙ্কুচিত স্বরে জয়ন্ত ডাকিল, "ইন্দু!"

ইন্দু চমকিয়া পিছন ফিরিল। জয়ন্তকে এ-সময়ে এখানে দেখিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না; সমস্ত ভুলিয়া ঠিক আগেকার মতই হাসিমুখে তাড়াতাড়ি তাহাকে কি বলিতে গিয়াই সে আবার থামিয়া পড়িল। —গেল কাল্‌কের সেই ব্যাপারটার কথা মনে হওয়াতে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! জড়সড় হইয়া চুপ-করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্ত বলিল, "ইন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ফটকটা একবার খুলে দেবে?"

ইন্দু কি যে করিবে, বুঝিতে পারিল না। সে জানিত জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহার পিতা রাগ করিবেন; অথচ জয়ন্ত যে চোখের সুমুখে তাহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবে, এও ত সে প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারিবে না!

ইন্দুর ইতস্তত দেখিয়া জয়ন্ত সমস্ত বুঝিল। অভিমানে তাহার মনটা ফুলিয়া উঠিল—আক্ষেপভরে বলিল, "থাক্ ইন্দু, থাক্ থাক্, আর আমার বল্‌বার কিছু নেই—স্রোতের শেওলার মত তোমাদের কাছে আমি ভেসে এসেছিলুম—আবার ভেসেই চলে যাব—আমি তোমাদের কোথাকার কে!"

মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া মিনতির স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত তাহার কথায় কাণ না-দিয়াই বলিল, "তোমার বাবা আমার ওপরে অবিচার করেছেন আর তুমিও আমার কি বল্‌বার আছে তা না শুনেই কুকুর-বিড়ালের মত আমাকে—"

গভীর যাতনায় ইন্দুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন জয়ন্তবাবু, থামুন! এমন কথা আর বল্‌বেন না, আপনি ভিতরে আসুন—আমি ফটক খুলে দিচ্ছি!"

ইন্দু আগাইয়া গিয়া ফটকের অর্গল খুলিয়া দিল।

ফটক ঠেলিয়া জয়ন্ত ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছে, সহসা উপর হইতে ক্রুদ্ধ—তিরস্কারের স্বর আসিল—"ইন্দু!"

সচমকে দুজনেই উপরে চাহিয়া দেখিল, বারান্দার রেলিং ধরিয়া জগৎবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

আকাশের মেঘের উপরে তখন প্রদীপ্ত আলোক-পদ্মের মত সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সুধু অন্ধকার আর অন্ধকার! নতমুখে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জয়ন্ত, তুমি আর যাই হও—আমি তোমাকে অন্তত ভদ্রলোক বলেও জান্‌তুম!"

জয়ন্ত আর দাঁড়াইল না—কাল্‌কের অপমানের উপরে আবার এই নূতন অপমানে পাগলের মত হইয়া, দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

... ...

জয়ন্ত যখন নিজের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার দেহের রক্ত ফুটন্ত তেলের মত তপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়াইয়া দিতেছে।

অবশ হইয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া, দুইচোখ বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ সে চুপচাপ রহিল—চাপা আবেগের নিশ্বাসে বুকখানা তাহার ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

খানিক পরে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া, দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে বলিল, "না—এমন চুপ করে' থাকা চল্‌বে না—আমি এখনি আবার জগৎবাবুর কাছে যাব—তাঁর মেয়ের সঙ্গে তিনি আমার বিবাহ দিন আর না-দিন—আমি তাঁকে যেমন করে' পারি বুঝিয়ে দেবই দেব, আমি কোন দোষে দোষী নই!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিল, একখানা টেলিগ্রামের লেপাফা হাতে করিয়া ভজহরি উপরে উঠিতেছে।

সাম্‌নেই বাধা পাইয়া জয়ন্তের মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ভজহরি বলিল, "খোকন, তোর নামে একটা তার এসেচে রে!"

—"টেলিগ্রাম! কোত্থেকে?"

—"আমি ত আর তোর মতন অ্যাংরেজি পড়া পণ্ডিত নই, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! এই নে,—পড়্!"

ভজহরি টেলিগ্রামখানা জয়ন্তের হাতে অর্পন করিল।

জয়ন্ত কম্পিত ভীত হস্তে টেলিগ্রামের মোড়ক্ ছিঁড়িয়া ফেলিল—কেননা, বাঙালীর সংসারে তারবার্ত্তায় ভালো খবর পাওয়া যায় খুব কম।

টেলিগ্রামে সুধু লেখা ছিল—

"অন্নপূর্ণা মৃত।"

—"মাগো!"—বলিয়া জয়ন্ত সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মন হইতে সমস্ত অপমানের কথা, জগৎবাবু ও ইন্দুর কথা ঢেউএর টানে খড়-কুটোর মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

ভজহরি খবর শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল—জয়ন্তের ভাব দেখিয়া তাহার বুক উড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে সে

ল, "অ খোকন, অমন করে' উঠ্‌লি নো, কি হয়েচে, বল্ ভাই, বল্!"

জয়ন্ত ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, র ভজা, মা আর নেইরে!"

—"অ্যাঁ, মা-ঠাক্‌রোণ? মা-ঠাক্‌রোণ ?"—ভজহরি স্তম্ভিত হইয়া গেল!

শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে অন্নপূর্ণাকে কত তেই জয়ন্ত দেখিয়াছে, তাঁহার স্নেহে প্রেমে হৃদয় তাহার কানায়-কানায় য়া আছে—সেই-সব তাহার চোখের খে এক-লহমায় যেন আকার ধরিয়া তের মত খেলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা মুখে াকে যতই কড়া কথা বলিয়া থাকুন, সে জানে তিনি তাহারই করুণাময়ী নী—তিনি বিমাতা নন—তাহার পায়ে া লাগিবার ভয়ে তিনি আপন বুক তিয়া দিতে পারিতেন, হাসিমুখে হেলায়! নিজের ছেলেকে ত সকল মা লোবাসেন, কিন্তু পরের ছেলেকে এমন জের মত ভালোবাসিতে আর কোন্ মা রেন? এই মাকে সে কিনা বিমাতা লয়া গালি দিয়াছে! হয়ত সে কথা ণিত অস্ত্রের মত তাঁহার বুকে গিয়া ধিয়াছিল, হয়ত সে আঘাত সহিতে পারিয়াই তিনি আজ তাহাকে ছাড়িয়া লয়া গিয়াছেন!

ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে জয়ন্ত বলিয়া উঠিল, জা, আমার জন্যেই মা গেলেন, আমি তৃহন্তা রে, মাতৃহন্তা!"—বলিয়া, সে নিজের পালে সজোরে করাঘাত করিল।

ভজহরি সাশ্রুচোখে জয়ন্তের হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন আর ও-সব কতা ভেবে মন খারাপ করিস্ নে রে, মার্‌তে কেউ কারুকে পারে না—ভাই, কপাল ছাড়া পথ নেই!"

জয়ন্ত উদাস ভাবে দেয়ালের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি বলিল, "খোকন্, এখন যে দেশে যেতে হবে ভাই, কখন্ গাড়ী আচে জানিস্?"

—"দেশে ফির্‌তে মন আর সর্‌চে না ভজা! কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কে আর আমাকে আগ্-বাড়িয়ে নিয়ে যাবে?"

—"তা বল্‌লে ত চল্‌বে না ভাই! মা-ঠাক্‌রোণের শ্রাদ্ধ যে এখনো হয়-নি, গৌরী দিদি ছেলেমানুষ—সে যে সেখানে একলাটি চোখের জলে বুক ভাসাচ্চে, তাকে দেক্‌বে কে, তার ভার যে এখন তোর ওপরেই!"

গৌরীর মুখ মনে করিয়া জয়ন্তের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—গৌরী, গৌরী! তার সাম্‌নে গিয়া সে কেমন করিয়া কোন্ মুখে দাঁড়াইবে!... ...

কিন্তু যাইতেই হইবে! এ যে কর্ত্তব্য!

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দেয়ালে পিঠ রাখিয়া, অন্নপূর্ণার মুখ ভাবিতে-ভাবিতে চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলার ব্রত

আমাদের দেশে দু রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর-কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলছে যোষিৎ প্রচলিত বা মেয়েলী ব্রত। এই মেয়েলী ব্রতেরও দুটো ভাগ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী-ব্রত —পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী-ব্রত, বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই-থাকে বিভক্ত এই মেয়েলী ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্ব্বেকার বলে বোধ হয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পূর্ব্ব এবং হিন্দু এই দুই ধর্ম্মের একটা আদান-প্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি, এই দুই প্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী-ব্রত এবং কুমারী-ব্রত, ব্রতকে এই তিনভাগে রেখে প্রত্যেকটির গঠন কেমন দেখা যাক। কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রত—প্রথমে সামান্যকাণ্ড —যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্ম্মারম্ভ, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তিমন্ত্রঃ, সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-ষাগাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। এর পরে ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দিয়া কথা-শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শো সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।

নারীব্রত—শাস্ত্রীয় ব্রতের অনে খানি এবং খাঁটি মেয়েলী-ব্রতেরও কত মিলিয়ে এগুলি। এইগুলি শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের যুগলমূর্ত্তি যেতে পারে। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভী ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে লৌকিক ব্রতের সরলতাও প্রায় নষ্ট পূজারী ব্রাহ্মণ এবং সামান্য কাণ্ডের অনুষ্ঠান-ন্যাস-মুদ্রা-তন্ত্র-মন্ত্রই এখানে প্রা পেয়েছে।

কুমারীব্রত—এই ব্রতগু অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া এদের গঠন এইরূপ—আহরণ যেমন, করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ আচরণ যেমন, কামনার প্রতিচ্ছবি, আল্প দেওয়া, পুকুর-কাটা ইত্যাদি এবং কা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতি ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতক থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধ শেষ-কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজা এবং তন্ত্র-মন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।

লোকের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জটিল অনুষ্ঠা এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচা উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দি

করা হয়েছে। বেশ বোঝা যায় ধর্ম্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রতমালা- ন চিনির ডেলার আকারে যেন নাইনপিল! খাঁটি পুরাণগুলির ইতিহাস- বে একটা দাম আছে। কিন্তু এই য় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের র বেলায় না লোক-সাহিত্য বা কিক ধর্ম্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে গ। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়। টা এদের ব্রতের মতো হ'লেও জোড়া- দেওয়া কৃত্রিম পদার্থে যে জড়তা এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির সমস্তটার লক্ষ্য করা যায়। যজু এবং সাম রের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রত- তে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে লির কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের প্রভেদ, শুধু তাই নয়—যে লৌকিক র ছদ্মবেশে এগুলিকে সাজানো হয়েছে খাঁটি মেয়েলী-ব্রতগুলির সঙ্গেও এদের একই রকম প্রভেদ। খাটি মেয়েলী গুলিতে তার ছড়ায় এবং আল্‌পনায় টা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের ার ছাপ পাই। বেদের সুক্তগুলিতেও থা আর্য্যজাতির একটা চিন্তা, তার ন উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ রই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং র মধ্যে এইজন্যে বেশ-একটা মিল দেখা ছে। নদী সূর্য্য এমনি অনেক বৈদিক তা, মেয়েলী-ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা উষাকে এবং সূর্য্যের উদয়কে আবাহন কচ্ছেন—

(উষাদেবতা। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি॥)

"সূর্য্যের মাতা শুভ্রবর্ণা দীপ্তিমতী উষা আসিয়াছেন!"

(সূর্য্যদেবতা। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি॥)

"তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের উর্দ্ধে বহন করিতেছে!"

আবার নদী-সকলকে উদ্দেশ ক'রে— "কোনো কোনো জল একত্রে মিলিত হয়, অন্য জল তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের বাড়বানলকে প্রীত করে।"

এর পরে যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্য্যস্তব—

"নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ,
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ-কারণ
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায়॥"

বৈদিক সূর্য্য আর শাস্ত্রীয় ব্রতের সূর্য্য— দুয়ে তফাৎ যে কতটা তা দেখতে পাচ্ছি। এইবার খাঁটি মেয়েলী-ব্রতের ছড়াতে সূর্য্যকে উষাকে এবং নদনদীকে কি ভাবে লোকে বর্ণন করছে দেখি—

(নদী থেকে জল-তোলবার মন্ত্র বা ছড়া।)

"এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলী-ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ"
"এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ॥"

(সমুদ্রে ফুল-ধরবার মন্ত্র বা ছড়া।)

"সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে?"

(সকালের কুয়াশা-ভাঙার মন্ত্র।)

"কুয়া ভাঙ্গুম, কুয়া ভাঙ্গুম বেথলার আগে—
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে"

(উষা ও সূর্য্যোদয়ের ছড়া।)

"উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি
ঐ যে দেখা যায় সূর্য্যের মার বাড়ি!
সূর্য্যের মা লো! কি কর দুয়ারে বসিয়া!
তোমার সূর্য্য আস্‌তেছেন
ঘোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।"

তারপর বসন্তের কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের প্রেমের একটুখানি রূপক যেমন—

"চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ,
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্য্য-ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল-খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্য্য-ঠাকুর বিয়া করতে চায়।"

বেদের সুক্ত সাধু ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়েছে আর ছড়ার ভাষা চল্‌তি বাংলা, সেইজন্যে একটা শোনাচ্ছে গম্ভীর, আর একটা শোনাচ্ছে ছেলেমানুষি রকম, কিন্তু যদি ইংরিজি ভাষায় তর্জমা করা যায় তবে মেয়েলী ছড়া আর বৈদিক সুক্ত দুইই প্রায় একই জিনিষ বোধ হবে।

"Young Moon, daughter of Spring has united her tresses, and the Sun goes seeking her through many lands. Spring's daughter the Young Moon has unfolded her silver robe and the Sun peeps into many houses seeking her. The slender Moon the Spring's lovely maiden is wearing the silv anklet, seeing which the Sun so her union in marriage."

কিন্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মে ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা একেবা বলা যায়না। কেননা সমস্ত প্রাচীন জা ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের বায়ু সূর্য্য চন্দ্র এঁরা উপাসিত ভারতবর্ষে ইজিপ্তে মেক্সিকোতে! সু বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালীর জিনিষ বলে ধরা যেতে পারে, এটা আ পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির চেহারাটি আমরা যখন দেখবো। একদি ভারতে প্রবাসী আর্য্যদের অনুষ্ঠান, আর-এ দিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, এক তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন একদল নদীমাতৃক পল্লিগ্রামের নি নীড়ে বসতি করছেন! এই প্রবাসী নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুআ যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট মূর্ত্তিতে এবং তারি বিরাট অনুষ্ঠানের ছ চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের ম উপরে, কর্ম্মের উপরে, তাদের সমস্ত ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি সবলে নিষ্পে করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ এবং পুরা চেয়েও যা পুরোনো এই সব লৌকিক অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্র করছে—দুইদিকে দুটো বড় জাতির প্রা কথা, মাঝে একটি দল-বিশেষের স্বপ্ন!

আর্য্য এবং আর্য্য-পূর্ব্ব দুজনেরই স যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নি

দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই কটা বদ্ধ, ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য জীবন এমনি-সব পার্থিব জিনিষ; দুজনে করছে বা কামনা করে' সেটা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক ঠান পুরুষদের আর ব্রত-অনুষ্ঠান মেয়েদের যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র াদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় , শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; বাঙালীর মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে া হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে ী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' এর সঙ্গে ধবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—

'বসুমাতা দেবী গো! করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।'

এই যে পৃথিবীর যা-কিছু তার উপরে র বিতৃষ্ণা এবং 'গোক'লে গোকুলে স গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন স্বর্গে বাস' এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও , এটা বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়। দিক সুক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে াদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই ধবীর, কিন্তু বেদসুক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, র সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, ার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি ন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে ুমাতার মধুর কাকলী—কিন্তু দুই গানই ধবীর সুরে বাঁধা!

খাঁটি ব্রতের অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এবং ার ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, দুয়ের মূলতঃ যে ভিন্নতা রয়েছে সেইটে পরিষ্কার ধরবার চেষ্টা করলে দেখবো যে, শাস্ত্রীয় ব্রতে প্রায় সকলগুলিতে যে-কামনা করেই ব্রত হোক না, কামনা চরিতার্থ করবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন—আমলকীদ্বাদশী ব্রত, প্রথম স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যসোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে—ওঁ আস্তেতানি মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী (বা শূদ্র হ'লে দাসী) পুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি ধনধান্যসৌভাগ্যাদি প্রাপ্যান্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ পর্য্যন্তং প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্ব্বক বা সলক্ষ্মীক বিষ্ণুপূজামলকীযুক্তভোজ্যদানপূর্ব্বকং ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত বিধিনামলকীদ্বাদশীব্রত মহং করিষ্যে—পরে সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সামান্যকাণ্ডের পুরো অনুষ্ঠান করে ব্রতকথা শ্রবণ,—মোটামুটি সব ব্রতেরই এই প্রক্রিয়া! পুত্রপৌত্র ধনধান্য কামনা, তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র যে ক্রিয়া, অন্য-কিছু কামনা করেও সেই-সব মন্ত্র, সেই-সব ক্রিয়া; কেবল কোনটা ব্রহ্মপুরাণের মতে, কোনটা বিষ্ণুপুরাণের মতে একটু-আধটু এদিক-ওদিক করে'। সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্দুকের একই চাবি!

মেয়েলী-ব্রত বা খাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যতরকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত-রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে এই কামনা করে পূর্ণিপুকুর, সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর-

কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল-পৌতা, পুকুর জল ঢেলে পূর্ণ করা, তারপর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারিধারে ফুল-সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল-ধরা—

"পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা ?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না" ইত্যাদি।

আবার যখন বৃষ্টির কামনা করে' বসুধারা ব্রত, তখন আল্‌পনায় আট তারা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো করে' বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে—এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

"গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী"!

হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদল-বদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে-ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই। বাংলার ব্রতগুলি কতক-কতক সংগ্রহ হ'তে আরম্ভ হয়েছে, সবগুলি সম্পূর্ণ আকারে এখনো সংগ্রহ ও প্রকাশ হবার অনেক দেরী, এবং অন্তঃপুরের জীবন-যাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব ব্রত করবার এবং ব্রতগুলির অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মনে রাখবার চেষ্টাও ক্রমে চলে গিয়েছে। এ অবস্থায় যা হচ্ছে তাতে খাঁটি-নকল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সবই আমরা গ্রহণ করতে চলে[ছি] ব্রতের আল্‌পনার মধ্যে আমরা দে[খি] পাই খাঁটি নক্সার মধ্যে মেকিও চলে[ছে] তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও হয়তো যেখান[কার] যা সেগুলো উল্টে কোথাও একছত্র নয়[না] কোথাও এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতে[র] এমনি সব কাণ্ড! এ ছাড়া নানাগ্রা[মের] নানা অনুষ্ঠান, একই ব্রত এখানে এ[ক] রকম ওখানে অন্য! এম্‌নি সব ন[ষ্ট] জঞ্জালের মধ্যে থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারা[র] একটা আদর্শ বার করে' আনতে হ'লে [এ] এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক[রা] ফল হবে না, পৃথিবীতে সমস্ত আদিম জা[তি] মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কি ভাবে চলেছে [তা] ইতিহাসগুলিও দেখা চাই। আমাদের যা-[কি] সমস্তই আর্য্যদের দেওয়া, শিল্প-সাহিত্য ধ[র্ম্ম] কর্ম্ম সমস্তই—এই ধারণাটার মূলে অনেক [সত্য] সত্যও যেমন আছে মিথ্যেও তেমনি রয়েছে[ন]। সূর্য্য আর্য্যদেরই দেবতা এটা আর এ[খন] বলা চলেনা, আর্য্যেতর জাতি যাঁরা ভার[তে] বর্ষের এবং পৃথিবীর নানা দেশের আদি[ম] অধিবাসী, তাঁরাও সূর্য্যকে উপাসনা করে[ন] দেখি। এদেশে ব্রতের ছড়া থেকে দে[খা] যাচ্ছে সূর্য্যকে 'রাঈ' বা 'রায়' কিনা 'রা[জা]' অথবা রাউল বা রাওল কি না রাজ[া] বলে ডাকা হচ্ছে। ইজিপ্তে সূর্য্যকে ডা[কা] হচ্ছে 'রা' বা রাআ, আবার সুদূর মেক্সিকে[ার] অধিবাসী সূর্য্যকে ডাকছে 'রায়মি'! এ[ই] এই সূর্য্যের নানা ব্রত সূর্য্যের উদয়-[অস্ত] ষড়ঋতুর মধ্যে দিয়ে তাঁর আনাগোনা নি[য়ে] নানা রূপক ও অনুষ্ঠান চলছে। মেক্সিকো[র] পুরাণ ও ইতিকথা থেকে এই অংশটুকু[র]

"The most picturesque if not most important solar festival is that of 'Citoc Raymi' (gradually increasing sun) held in June when nine days were given up to the ceremonial. A rigorous fast is observed for three days previous to the event, during which no fire was kindled. On the fourth day the Inca accompanied by the people en-masse proceeded to the great square of Cuzco to hail the rising sun, which they awaited in silence. On its appearance they greeted it with a joyous tumult, and, joining in procession marched to the Golden Temple of the Sun, where Llamas were sacrificed and new fire was kindled by means of an arched mirror followed by sacrificial offerings of grain, flowers &c."

(The Myths of Maxico and Peru. Luis Spence)

এমনি আবার মা-লক্ষ্মীকে আমরা সূর্য্যেরই বলে জানি, কিন্তু মেক্সিকোরও [এক] লক্ষ্মী আছেন যিনি অনেকটা আমাদেরই [লক্ষ্মীর] মত। আবার ভেক মণ্ডুক বা বেঙ—[কোন] হিন্দুই তাঁকে দেবতা বলেন না, [কিন্তু] মেক্সিকোতে বেঙ হলেন জলদেবতার [মূর্ত্তি] এবং ঋগ্বেদে মণ্ডুক-দেবতার স্তব দেখতে [পাচ্ছি]—(৭ মণ্ডলে ১০৩ সূক্ত মণ্ডুকদেবতা, বশিষ্ঠ ঋষি) বৃষ্টিকামনা করে' এই মণ্ডুক সূক্ত উচ্চারিত হচ্ছে। নিরুক্ত বলছেন, বশিষ্ঠ বৃষ্টি কামনা করে' যখন পর্জ্জন্য-ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই সময়ে মণ্ডুক সকল পর্জ্জন্য-দেবতার সূক্ত পাঠের সময় ধ্বনি করে' আপনাদের অনুমোদন ঋষিকে জানিয়েছিল সেইজন্য বশিষ্ঠ সেই মণ্ডুকগণকে স্তুতি করলেন এই বলে—

(মণ্ডুকদেবতা। বশিষ্ঠঋষি)

১। সম্বৎসর ব্রতচারি স্তোতাদিগের ন্যায় (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া (এখন) মণ্ডুক-গণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডুকগণকে জল দ্বারা সিক্ত করেন তখন পুত্র যেমন অখ্‌খল শব্দ করতঃ পিতার নিকটে গমন করে সেইরূপ এক মণ্ডুক অন্যের নিকট গমন করে।

৭। হে মণ্ডুকগণ! অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দ্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃষ্ট সঞ্চার হইল সেইদিন চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর।

৯। নেতা মণ্ডুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুকে হিংসা করেনা। সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্মস্থ তাপপীড়িত মণ্ডুকগণ গর্ত্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, ধূম্রবর্ণ

মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, হরিবর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা-ঋতুতে) মণ্ডুকগণ অপরিমিত গো-প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু রক্ষিত করুন। (ঋগ্বেদ-সংহিতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত)

আমাদের লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা থাকেন, মেক্সিকোতে লক্ষ্মীপেঁচার মন্দিরই ছিল যেটির নাম The Knue (Palace of Owls)!

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্মতি, কোন ধর্ম্মবিশেষের কিম্বা বিশেষ [illegible] মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ [illegible] যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, [illegible] পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপ [illegible] ঘটতো সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা [illegible] চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বি [illegible] অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কা [illegible] সফল করতে চাচ্ছে, এই হ'ল ব্রত-পুরা [illegible] চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সম-সাম [illegible] কিম্বা তারো পূর্ব্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকু

রেখা লেখা

আর্ট-স্কুলের ছাত্রদের প্রথম কাজ হচ্ছে, ভালো রেখা টান্‌তে শেখা। ভাষার প্রথম শিক্ষা যেমন বর্ণপরিচয়, শিল্পশিক্ষারও প্রথম ভাগ তেম্‌নি রেখা লেখা।

কিন্তু শিল্পের এই প্রথম কাণ্ডটি,—এই রেখাপাত করে' নক্‌সা লেখা, এতে রপ্ত হওয়া বড়ই শক্ত। প্রত্যেক শিল্পীই ছাত্রজীবনে সর্ব্বপ্রথমেই হাত-মক্‌স কর্‌তে নক্‌সা লিখ্‌তে বাধ্য হন; এবং এ-বিভাগে পূরো-দখল না-হ'লে তাঁরা বর্ণ-চিত্রের ক্লাশে প্রমোশন পান না। তবু, এতটা কড়াকড়ি সত্ত্বেও—প্রত্যেক শিল্পীই পয়লা নম্বরের নক্‌সা-লেখক (draughtsman) নন। এমন অনেক বিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্কর আছেন যাঁরা উঁচুদরের ড্রইংয়ে খুব কম পটু। (এখানে বলে রাখা দরকার ড্রইং মানে নক্‌সা ছাড়া আমরা আর-[illegible] ধর্‌ছি না।)

বিশেষ-করে' য়ুরোপীয় তৈলচিত্রের [illegible] এই ড্রয়িং বা নক্‌সার আদর ভারি কম। [illegible] তৈল-চিত্র আঁকেন তাঁদের মতে, নক্‌সা [illegible] মোটামুটি একরকম দক্ষতা জন্মালেই শি [illegible] কাজ চলে যায়। ইংরেজ শিল্পী Coll [illegible] ছাত্রদের শিক্ষা দিতে বসে দিব্যি সো [illegible] সুজি বলে দিয়েছেন, "In oil pain[illegible]ing the original drawing may [illegible] clumsy, untidy, vacillating—[illegible] short, have every possible fau[illegible] of execution" প্রভৃতি। (A Manu[illegible] of Oil Painting, p. 5.) এর ক [illegible] হচ্ছে এই যে, তৈল-চিত্রের পটে ভাল ক [illegible] নক্‌সা লেখা শিল্পীর পক্ষে মস্ত-একটা গণ্ড

[illegible], কেননা ছবিতে রং-মাখাবার সময়ে খুব-[illegible]-দিয়ে-আঁকা নক্‌সাও—মেঘের আড়ালে [illegible]দের মত—ঢাকা পড়ে যায়। কাজেই নক্‌সা [illegible]লো হোলো কি মন্দ হোলো তা নিয়ে [illegible]শীরা মোটেই মাথা-ঘামাতে রাজি নন।

কিন্তু আমাদের প্রাচ্য চিত্রকলায় এটি [illegible]বার যো নেই। চৈনিক, জাপানী বা [illegible]ারতীয় চিত্র সাধারণত জলীয় রঙে আঁকা [illegible]য়। কাজেই, স্বচ্ছ জলের তলায় যেমন [illegible]ৎস্যদের লীলা দেখা যায়, প্রাচ্য চিত্রের [illegible]র্ণ-আলিম্পনের তলা থেকে রেখার খেলাও [illegible]তেম্‌নি দর্শকদের চোখের সাম্‌নে জেগে [illegible]ওঠে। প্রতীচ্যের অনেক চিত্রকর অনভ্যাসের [illegible]রুণ নিখুঁত নক্‌সা আঁক্‌তে পারেন না, [illegible]কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকররা একসঙ্গে রেখা আর [illegible]রঙের জুড়ী চালিয়ে-চালিয়ে এমন হাত-দুরস্ত [illegible]করে' ফেলেন যে, প্রতীচ্য এখানে প্রাচ্যের [illegible]কাছে হার মান্‌তে বাধ্য! ছোট-বড় সমস্ত [illegible]জাপানী ছবিতেই রেখার এই আশ্চর্য্য [illegible]বাহাদুরি দেখা যায়। অজন্তার সুপ্রাচীন [illegible]ভিত্তি-পটেও রেখা-কাব্যের মাধুর্য্য বড় অল্প [illegible]নয়। মধ্য-যুগের মোগল-চিত্রে এবং [illegible]আধুনিক যুগের ভারত-চিত্রেও কারু রেখার [illegible]চারু মায়া-লেখা সকলকে মুগ্ধ করবে। [illegible]বিশেষ-করে' গগনেন্দ্রনাথের স্পষ্ট, শক্তি-[illegible]ব্যঞ্জক ও নিখুঁত রেখার টান এবং [illegible]অবনীন্দ্রনাথের আধ-ফোটা চন্দ্রকলার মত [illegible]বিলীয়মান, কোমল ও মৃদু রেখার স্বপ্ন-সুষমা [illegible]সকলের প্রাণ-মন ভুলিয়ে দেবেই-দেবে। [illegible]এই শিল্পী-ভ্রাতৃযুগলের রেখার ভঙ্গী সম্পূর্ণ [illegible]আলাদা হ'লেও একবিষয়ে এঁদের নক্সায় [illegible]একটা মিল পাওয়া যায়। এঁদের হাতের



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা

রেখা অনেকসময়ে শরীরিণী ও ইঙ্গিতময়ী গীতি-কবিতার মত।

য়ুরোপের অনেক আর্টিষ্ট রেখাপাতে ভালোরকম কারদানি দেখাতে পারেন-নি বটে; কিন্তু তাহ'লে কি হয়,—নক্সা লেখাতেও সেখানে আবার এত-বেশী শিল্পী উৎকর্ষ লাভ করেছেন যে, এখানে তাঁদের নামাবলী দিতে গেলে 'ভারতী'র পূর্ণ-এক সংখ্যায় কুলিয়ে ওঠা ভার। তাঁদের সকলকার নক্সা সূক্ষ্মতায় জাপানী ছবির সঙ্গে তুলনীয় না-হ'লেও, কল্পনা-বৈচিত্র্যে তাঁরা প্রাচ্য শিল্পীদের ছাড়িয়ে গেছেন।—কথাটা কঠোর বটে, কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্মানী প্রভৃতি দেশে রেখা-চিত্রের আদর বর্ণ-চিত্রের চেয়ে কম নয়। জার্মানী রেখাচিত্রের জন্যে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যত-বেশী বিখ্যাত, তার বর্ণচিত্র ততটা-বেশী সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে পারে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে Dürer, নক্সা-লেখায় অদ্বিতীয় বলে য়ুরোপ ঘোড়া নাম কিনেছিলেন। এ-যুগে ফ্রান্সের মত, সে যুগে ইতালী শিল্প-সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেছিল। ইতালীর শিল্পীরা তখন আর্টের আর সব-দিকেই অধিক-অগ্রসর হয়েও Dürerএর এই রেখাচিত্রের কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন-কি Compagnola ও Marcantonio প্রভৃতির মত অনেক ওস্তাদ-চিত্রকরও, Dürerএর নক্সার সুধু নকল নয়—চুরি-পর্য্যন্ত করতেও পিছপাও হন-নি! Martin Schonganer নামে আর-একজন জার্মান শিল্পীর আঁকা নক্সা (Temptation of St. Anthony) দেখে

মাইকেল এঞ্জিলোর মত তাকেরও রীতিমত তাক্ লেগে গিয়েছিল!

কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে রেখা-চিত্রের আদর একরকম নেই বললেই হয়। খুব ধ্যাব্‌ড়া আর জ্যাবড়া করে' হরেক-রকম রং লেপে না-দিলে এ-দেশের লোক ছবিকে ভালো বলতে নারাজ, সে দেশে নক্‌সার মত বর্ণহীন ছবির আদর হওয়াও শক্ত কথা বটে। আমরা—বাঙালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠজাতি বলে প্রসিদ্ধ এবং গর্ব্বিত; কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ যে প্রায় মাড়োয়াড়ীদের মতই চোতা আর ভোঁতা, তা না-মেনে আর উপায় নেই! তা-নইলে হাজার-হাজার বাঙ্‌লা গল্পের বইয়ে নিত্যই রেখাচিত্রের নামে যে বিষম কেলেঙ্কারী বেরুচ্ছে, আমরা অম্লানবদনে তা সহ্য করছি কি-করে'?... ...



মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা

বাঁধা দস্তুরের মোহ কাটাতে না-পারলে আর্টিষ্টের পক্ষে ভালো নক্‌সা লেখা অসম্ভব। একটা চল্‌তি আদর্শ সাম্‌নে রেখে যাঁরা রেখাপাত করেন, তাঁরা নিতান্তই শিক্ষানবীশ। তৈল-চিত্রে এ-পদ্ধতিতে কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু নক্‌সাতে এটি একেবারেই অচল। কারণ, নক্‌সার মধ্যে ছোট-বড়, সরু-মোটা প্রত্যেক রেখার টানে এক-এক বিশেষ শিল্পীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠা চাই;—"A drawing should be a personal expression"—হল্যাণ্ডের এক শিল্প-সমালোচক এই খাঁটি কথাটি বলেছেন, এবং এ কথাটি কোন রেখা-শিল্পীরই ভোলা উচিত নয়। যে-সব বড় শিল্পী রেখা-চিত্র এঁকে সুখ্যাতি পেয়েছেন, মন দিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে, তাঁদের প্রত্যেকের রেখাই প্রত্যেকের নিজের মতন। Rem-

bfandtএর রেখা হচ্ছে ত্বরিত, বিচিত্র ও জীবন্ত; Dürerএর স্পষ্ট, সুনিশ্চিত ও ব্যাপকভাবদ্যোতক রেখা এথেকে ভিন্ন। আবার, Gainsboroughর অনায়াস ও স্বাভাবিক সুষমায় ভরা রেখাগুলি থেকে Watteauর সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজালের মত রেখাগুলি সম্পূর্ণ আলাদা-ধরণের। এম্‌নি Holbein, Leonardo da Vinci ও Michiel Angelo প্রভৃতি শিল্পী,—যাঁরা রেখা-চিত্রেও ওস্তাদ বলে বিখ্যাত,—এঁদের প্রত্যেকেই রেখার মধ্যে আপনাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু এঁরা যদি বাঁধা-দস্তুরের বাইরে পা না-ফেল্‌তেন, তাহলে এঁদের নক্‌সাগুলি বাজারের আর-

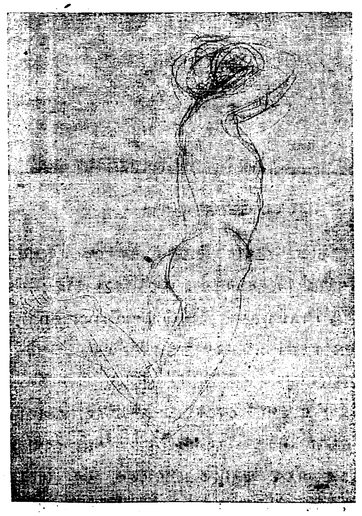

রোদাঁর নক্সা

পাঁচজনের আঁকা নক্‌সার মতই চল্‌তি ছাঁচে হয়ে থাক্‌ত,—কারুর মনে বিশেষ ভাবে একটা নূতন ভাবের সংকেত দেগে দিতে পার্‌ত না।

বর্ণচিত্রের চেয়ে রেখা-চিত্রের ওস্তাদি বোঝাও আরো শক্ত। বর্ণচিত্র একেই ত রঙ্‌চঙে হয়; তার-উপরে তাতে যে মাজা-ঘষা রূপ ও সম্পূর্ণতা থাকে, রেখা-চিত্রে তা আদৌ থাকে না;—সুতরাং জনকতক বাছা-বাছা সমঝ্‌দার ছাড়া নক্‌সার আসল গুণাগুণ আর-কেউ বুঝতে পার্‌বে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা ফরাসী-দেশের প্রসিদ্ধ রেখা-শিল্পী Steinlenএর আঁকা "পান্থ" নামে ছবিখানি দিলুম।

... ... দীর্ঘ পথের কিনারায় কাঙাল দুই নরনারী। আর হাঁটতে না-পেরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রমণী মাঠের উপরেই অবশ হয়ে বসে পড়েছে;—দৃষ্টি তার দৃষ্টিহীন! পৃষ্ঠের বোঝা ও বার্দ্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়ে, বৃদ্ধ পুরুষটি যষ্টিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—চক্ষু তার সুদূরে বিক্ষিপ্ত। দুজনেরই শীর্ণ চেহারা ও জীর্ণ পোষাক তাদের কঠোর দারিদ্র্যের পরিচয় দিচ্ছে। বহু-দূরে—প্রান্তর-প্রান্তে হয়ত কোন্-এক ভোগবিলাসীর রম্য প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে—কিন্তু মানুষ হয়েও এই দুই অভাগা আজ মানুষের কাছ থেকে একটুও দয়া-মায়ার প্রত্যাশা রাখে না, তাই সেদিকে তারা ফিরেও দেখ্‌ছে না।

সাধারণের চোখে দেখ্‌লে, এ নক্‌সা-খানিতে সুখ্যাতি কর্‌বার কিছুই পাওয়া যাবে না। ছবিখানি সম্পূর্ণ নয়, অনেক



পান্থ

জায়গাই কেবল ইঙ্গিত দিয়েই সারা হয়েছে—সবটা এঁকে দেখানো হয়-নি; লাইন-গুলিও সূক্ষ্ম ও সুন্দর নয়—অনেকটা ঠিক হিজিবিজির মতই! কাজেই, সকলে একে ছেলেমানুষের হাতের 'কাকের ছানা বকের ছানা' বলে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইবেন।

কিন্তু যিনি বোঝ্‌দার, তিনি দেখ্‌বেন, সম্পূর্ণতার চেয়ে ইঙ্গিতে বক্তব্য বিষয় ফোটানো যখন অধিক-কঠিন, তখন শিল্পী এখানে যথার্থ আর্টিষ্টের কাজই করেছেন। ভরির রেখা এখানে কেন যে সূক্ষ্মসুন্দর নয়, কলারসজ্ঞ তাও অনায়াসে বুঝ্‌তে পারবেন। সুখীর, সুস্থীর, বিলাসীর ছবি আঁক্‌বার সময়েই নক্‌সার রেখা হয় সূক্ষ্ম, সুন্দর ও কোমল; কিন্তু শোক-দুঃখ-হাহাকারের ছবি, ভগ্নজীবনের অশ্রুসজল 'ট্র্যাজেডী',—অসমান, কর্কশ ও ভাঙা-ভাঙা রেখাপাতেই ফোটে ভালো।

সাহিত্যেও ওস্তাদ-লেখকরা আর্টের এই গুপ্তকথাটি অনেক স্থলেই ব্যক্ত করে' দিয়েছেন। কঠিনকে তাঁরা কোথাও কোমল ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন-নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ- হেমচন্দ্রের "কূর্ম্ম-কমঠী কূট উর্ম্মিতে

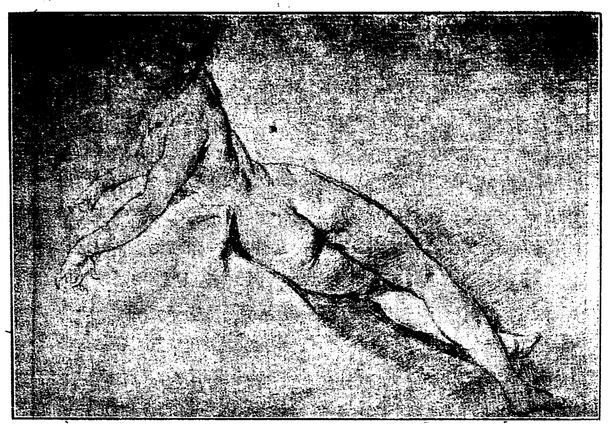

ফরাসী-শিল্পী বুশে'র নক্সা

লট্‌পট্‌" প্রভৃতি পংক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখ" প্রভৃতি স্মরণ করুন।

উপরে যে ইঙ্গিতের কথা বলেছি, রেখাচিত্রে তার সার্থকতা যতদূর হ'তে হয়! একখানি ছবির সমস্তটা এঁকে দেখালে তা চোখের উপরেই সম্পূর্ণ হয়ে জেগে ওঠে;—গুণী দর্শকের কল্পনা তা-থেকে কোন খোরাক্ পায় না। কিন্তু কোন বিষয়ের একটুখানি ইঙ্গিতমাত্র দিলে, চিত্রকরের অসম্পূর্ণতা দর্শককেই সম্পূর্ণ করে' নিতে হয়—এখানে যাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ভাব্‌বার ক্ষমতা যতটা-বেশী, ছবির রস আপন-আপন যোগ্যতা-অনুসারে তিনি ততটা বেশী উপভোগ কর্‌তে পারেন। নক্সাতে সম্পূর্ণতার চেয়ে ইঙ্গিত (Suggestion) অনেকসময়ে বেশী ফলপ্রদ হয় কেন, একজন জার্ম্মান-শিল্প-সমালোচক তার আর একটি উত্তর দিয়েছেন;—

"We are fully aware of the fact that often an apparently slight sketch embodies more genuine knowledge of natural forms than one has seen compassed by careful drawings, the "solidity" of which approximates them dangerously near to, what might be called, the "photographic" style of execution."

সম্পূর্ণ ছবি আঁক্‌লে শিল্পী সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হ'তে পারেন; কিন্তু ইঙ্গিত-প্রধান চিত্রের আদর কেবল দু-দশজন ভাবুক দর্শকের কাছে। ভারতীয় চিত্র-কলা-পদ্ধতি

অনেকস্থলেই এম্‌নি ইঙ্গিতপ্রধান বলেই Majority তাতে সাড়া দিচ্ছে না।

আর এইজন্যেই রেখাচিত্র বোঝা বড় শক্ত কথা। এমন এক সময় গিয়েছে, যখন রেম্‌ব্রাণ্ডের মত প্রতিভাবানের অঙ্কিত নক্সাকেও লোকে তুচ্ছ করে' উড়িয়ে দিত। যদিও সেদিন আর নেই, তবু রেম্‌ব্রাণ্ডকে সকলে কি এখনো বুঝতে পারেন? ব্রিটিস মিউজিয়ামে রেম্‌ব্রাণ্ডের একখানি নক্সা আছে, তার বিষয়, 'দুটি রমণী একটী শিশুকে হাঁট্‌তে শেখাচ্ছেন'। এই নক্সাখানি কিন্‌তে একজন ধনকুবের অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। এ ছবির রেখাগুলি আশ্চর্য্যরকমের জীবন্ত,—দেখলেই মনে হয়, রমণীদুটির রেখায়-আঁকা মূর্ত্তি যেন জ্যান্ত মানুষের মতই নড়্‌ছে আর সেইসঙ্গে শিশুটিও যেন সত্যি-সত্যিই ক্ষুদে মাতালের মত টলে-টলে চল্‌তে শিখছে! কিন্তু সাধারণ দর্শকরা তবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, এই সামান্য গুটিকতক আঁচড়ের মত রেখার জন্য একজন কোটিপতি খাম্‌কা কেন অতগুলো টাকা বাজেখরচ কর্‌লেন! মেয়ে-দর্শকরা হয়ত ভাববেন, 'ঐ টাকায় স্ত্রীর গলায় একছড়া মুক্তোর মালা গড়িয়ে দিলে তবু যা-হোক একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ হোত!'

ললিতকলা জীবনের যাত্রাপথে বসে হাতেনাতে কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে পারে না। সংসারী মানুষ অকেজো জিনিষের 'পরে হাড়ে-হাড়ে চটা। শিল্পী ও কবি তাই দুনিয়ার কাজের হাটে অপদার্থ নাম কিনেছেন।

শ্রীঃ—

উন্‌পাঁজুরে

আমার বয়স কত জানো?... ... আট-বছর! কিন্তু বয়স শুনেই তোমরা যেন মুখ বেঁকিয়ে বোসো না—কারণ, আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক্ ছেলে! লোকে তাই বলে, আমি নাকি এঁচড়ে-পাকা!

কিন্তু চালাক ছেলেদেরও যে ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করে' মর্‌তে হয়, এ দুঃখু আমার রাখ্‌বার ঠাঁই নেই। লেখাপড়ার সময়ে আমার চালাকি একেবারেই খাটে না। এই ভাখনা কেন, কাল সকালবেলায় একটু ফূর্ত্তি করে' লাট্টুতে সবে লেতুতিটি জড়াতে সুরু করেচি, আর অম্‌নি কিনা ধাঁ-করে' দাদা এসে আমার কাণ মলে লাট্টু কেড়ে নিলে! আচ্ছা বাবা, আমারও দিন আস্‌বে; দাঁড়াও না, আগে আর-একটু বড়সড় হই, তখন দাদার দাদাগিরি ফলানো বার করে' দেব!.. ...বড় হয়ে আমি দিন-রাত খালি মার্ব্বেল খেল্‌ব, লাট্টু ঘোরাব আর ঘুঁড়ি ওড়াব! মা, বাবা, দাদা কারুর কথা শুন্‌ব না—বক্‌লে-টক্‌লে বল্‌ব, আমি এখন বড় হয়েচি, বুড়ো-মিন্‌সের আবার পড়া-শুনো কি!

বড় হয়ে কিন্তু আর-একটা কাজ করতেই হবে! আমাদের ছিদামের মত একটা মণিহারীর দোকান না-করলে ত কিছুতেই চল্‌বে না! ছিদামটা হচ্ছে পাজীর পা-ঝাড়া—তার কাছে কিছু কিন্‌তে গেলেই হতভাগাটা পয়সা চেয়ে বসে! এটুকু বুদ্ধি তার মাথায় নেই যে, আমি হলুম গিয়ে ছেলে-মানুষ, পয়সা-টয়সা কোথায় পাব! হ্যাঁ, বড় হয়ে আমাকে একটা মণিহারীর দোকান করতে হবেই-হবে! তাতে টিনের বাঁশী, ভেঁপু, মস্তমস্ত কাঠের ঘোঁড়া, হাজার হাজার রাঙা-টুক্‌টুকে লাঠি, বস্তা-বস্তা রঙ্গফুস্, ব্যাটবল, ফুটবল এই-সব থাক্‌বে। আমার যখন যেটা খুসি হবে সেইটেই নেব, ছিদাম দাম চাইতে এলে মার্‌ব ব্যাটাকে এক থাব্‌ড়া—চোখ রাঙিয়ে বল্‌ব, আমার দোকান, আমি নিচ্চি, তুই পয়সা চাইবার কে রে ইষ্টুপিড্? ছিদাম তখন আচ্ছা জব্দ হয়ে মুখখানি চুণ করে' চলে যাবে—ওহো, কি মজা!...

এই-সব ভাবচি, এমনসময় দাদা এসে চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ রে হরে, বাঁদরের মত হাঁ-করে' বসে-বসে কড়িকাঠ গোনা হচ্চে বুঝি?"

দাদার দিকে আমি রেগে-মেগে কট্‌মট্ করে' তাকালুম।

দাদা সাম্‌নের চেয়ারখানা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে বল্‌লে, "হনুমানের মত আবার চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌চিস্ কি? দেব এক্ষুনি চোখে প্যাট্ করে' ছুঁচ্ বিধিয়ে! নে, নে, চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ কর্!"

এঃ! দাদাটা জ্বালালে দেখ্‌চি! একটু-খানি যে থির্ হয়ে বসে থাক্‌ব, তার যো নেই! খালি পড়্, পড়্, পড়্! কেন, পড়ে কি আমার চাক্‌রিতে হাত বেরুবে?

কি আর করি, মার খাবার ভয়ে সুড়্-সুড়্ করে' টেবিলের কাছে গিয়ে চাণক্য-শ্লোক পড়্‌তে বস্‌লুম। এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

"অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাত্রগণে
না দিবে আদর সদা রাখিবে শাসনে।"

দাদা মস্ত মুরুব্বির মত মাথা নেড়ে পা নাচাতে-নাচাতে বল্‌লে, "শুন্‌চিস্ ত হরে, চাণক্যের মত অত-বড় পণ্ডিত কি বল্‌চেন! এই-সব বুঝে-সুঝে ঠাণ্ডা হয়ে পড়াশুনো কর্—নৈলে তোর পিঠের ছাল-চাম্‌ড়া আর আস্ত থাক্‌বে না! শুন্‌তে পাচ্ছিস্?"—এই বলে দাদা পাখার বাঁট্‌টা দিয়ে ঠকাং করে' আমার পিঠের ওপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

মার খেয়ে-খেয়ে আমার পিঠখানা গরুর গাড়ীর গরুর মত এম্‌নি শক্ত হয়ে গেছে যে, পাখার বাঁটের অমন এক-আধ ঘায়ে আমার কিছু আসে-যায় না!... ... কিন্তু এই চাণক্য লোকটা কে? তার ওপরে আমার এম্‌নি রাগ হচ্চে! আমি যখন বড় হব, আমার গায়ে যখন জমিদার-বাবুদের দরোয়ান রঘুবীর পাঁড়ের মত খুব জোর হবে, তখন যদি এই চাণক্য-পণ্ডিতের একবার দেখাটি পাই, তাহলে আর ছেড়ে কথাটি কইব না—একেবারে তার মাথা থেকে টিকিটি ধরে, পটাস্ করে' উপ্‌ড়ে নেব!

দাদা আমার দিকে পিছন ফিরে বসে গুন্‌গুন্ করে একটা গান গাইছিল, তার

মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পার্‌লুম না—কিন্তু কথাগুলোর কতক-কতক মনে আছে—

"রয়ে রয়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে,
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে।
... ...
এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি, হান মম বক্ষোপরে,
নিভে যাক্ আঁখিতারা হেরিতে হেরিতে তোরে!"

—মাথা নাড়তে-নাড়তে টেবিল বাজিয়ে দাদা গান গাইতে লাগ্‌ল, আমিও জিভ্ বার করে' তাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লুম! দাদা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, কাজেই কিছু বুঝ্‌তেও পার্‌লে না। কেমন জব্দ!

হঠাৎ দাদা ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্‌লে, "হরে, তুই এইবার কথামালা পড্—আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একবার চট্ করে' ঘুরে আসি।"

লক্ষ্মীছেলের মত ঘাড় গুঁজে আমি 'কথামালা' পড়্‌তে লাগলুম। "এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল। * * * * এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। * * * * সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কেও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল। আইস ভাই আইস; আমি ভাবিতেছিলাম—"

দাদা তাড়াতাড়ি চলে গেল—আমারও অম্‌নি বামুন গেল ঘর ত লাঙল তুলে ধর্! বইখানা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিয়ে ভাবতে লাগলুম, দাদাটা গেল কোথায়? এই ঠিক দুপুরবেলা, রোদ কর্‌চে ঝাঁ-ঝাঁ, এটা ত আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাবুর মত বেড়াবার সময় নয়! অথচ দেখ্‌ছি দাদা বাঁশবাগানটা ঘুরে ডানদিকের পথ ধরে কোথায় চলে গেল!... ... ...ভাব্‌তে-ভাব্‌তে দাদার মৎলব্‌টা ঠিক এঁচে ফেল্‌লুম—আমি কম-বয়সেই খুব চালাক ছেলে কিনা! হুঁঃ, এ আর কিছু নয়, মুকুয্যেদের বাগানে বড়-বড় বাতাবি লেবু হয়েছে, দাদা নিশ্চয় সেই লেবু চুরি কর্‌বার ফিকিরে আছে! ঐ লেবুগুলোর ওপরে আমারও খুব নজর ছিল; কাজে-কাজেই আমি যে হাঁদা-গঙ্গারামের মত বসে-বসে পড়া মুখস্থ করে' মর্‌ব, আর দাদা বেড়ে মজা করে' লেবু পেড়ে-পেড়ে খাবে, তা কিছুতেই হ'তে পারে না! আমাকেও দেখ্‌তে হ'ল—দু'-একটা লেবুতে যদি আড়াল থেকে ছোঁ লাগাতে পারি!

চট্‌পট্ উঠে পড়ে তখনি দাদার পেছু নেওয়া গেল। বাঁশবাগানের মোড় ফির্‌তেই পুকুরের ধারে, একটা পেয়রা-গাছের তলায় দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম। সুধু দাদা নয়—তার সাম্‌নেই পট্‌লি-দিদিও চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে!

পট্‌লি-দিদি আমাদের গাঁয়ের যদুজ্যাঠা-মশায়ের মেয়ে! ওরা আমাদেরই জাত্—ওদের বাড়ীতে আমরা খুব যাওয়া-আসা করি বলে পট্‌লি-দিদির বাপকে আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকি। শুনেছি পট্‌লি-দিদির সঙ্গে আমার দাদার বিয়ের সমন্ধ হচ্চে।

কিন্তু পট্‌লি-দিদি অমন চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? দূর থেকেই দেখ্‌তে

পেলুম, দাদা কি যেন বল্‌চে, আর পটলি-দিদি তাই শুনে মাথা হেঁট্ করে' ফিরে দাঁড়াচ্চে। ও, বুঝেছি, পটলি-দিদি নিশ্চয় আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, আর তাই দেখ্‌তে পেয়ে দাদা তাকে ধম্‌কাচ্ছে! ঐ যে, পটলি-দিদির হাতে আধখানা পেয়রা রয়েছে!

একটা কৃষ্ণকলির ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বসে, আমি তাদের রকম-সকম দেখতে লাগ্‌লুম। পাছে দাদা আমাকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে আমি মাথাটা নীচু করে' বসে রইলুম।

খানিক পরেই দেখি, দাদা ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌লে—তারপর কর্‌লে কিনা—আস্তে আস্তে পটলি-দিদির হাত না ধরে টপ্ করে' তার মুখে একটা চুমু খেয়ে নিলে! পটলি-দিদি অম্‌নি দাদার হাত না ছাড়িয়ে, নিজেদের বাড়ীর দিকে দে-ছুট্ ত দে-ছুট্!

ও হরি, চুমু খাওয়া? কম-বয়সেই আমি বেজায় চালাক কিনা,—কাজেই মেয়েমানুষের মুখে ব্যাটাছেলের চুমু খাওয়া যে ভারি খারাপ, সেটা জান্‌তে আমার বাকি ছিল না! দাঁড়াও দাদা, মজাটা টের পাওয়াচ্চি—ভারি যে আমাকে মার্-ধর্ করা হয়, এবার কে আমাকে মারে একবার দেখে নেব!

দাদা আবার বাড়ীর দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল—আমিও লুকিয়ে-লুকিয়ে উঠে, সেখান থেকে একছুটে একদম্ বাড়ীতে এসে হাজির! দাদাকে আজ আমার হাতে মুঠোর ভিতরে পেয়েচি বলে প্রাণটা যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি 'কথামালা'-খানা টেনে নি খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে 'সর্প ও কৃষকে'র গ একটা জায়গা পড়্‌তে লাগ্‌লুম, "কৃষ দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে বলি অরে ক্রূর, তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রা নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃ আনিয়া, আমি তোর প্রাণরক্ষা করিলাম; তুই সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রে দংশন করিতে উদ্যত হইলি।—"

দাদা আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল। আমি আড়্-চোখে চেয়ে দেখ্‌লুম, দাদা ভা হাঁপাচ্চে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে দাদা আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল। আমিও অম্‌নি বইখানা মুড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

দাদা বল্‌লে, "কিরে, উঠ্‌লি যে?"

আমি দরজার দিকে এগুতে-এগুতে বল্‌লুম, "পড়্‌তে আর ভালো লাগ্‌চে না!"

—"কী! পড়্‌তে তোর ভালো লাগ্‌চে না?"

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম, "নাঃ!"

—"আবার 'না'! নবাব-বাহাদুর হয়েছি দেখ্‌চি যে! ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙে দেব, জানিস্?"

আমিও রেগে-মেগে বল্‌লুম, "ওঃ, ঘুসি অম্‌নি মার্‌লেই হ'ল কিনা! দাঁড়াও-না, আগে মাকে গিয়ে সব বলে দিয়ে আসি, তারপর তুমি ঘুসি খাও কি আমি ঘুসি খাই তাখা যাবে!"

দাদা মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসে বল্‌লে, "মাকে গিয়ে বল্‌বি? আমাকে আবার ভ তাখানো হচ্চে?"—বলেই আমার একট কাণ টেনে ধর্‌লে।

—"কাণ ছাড়ো বল্‌চি দাদা, নইলে মার কাছে গিয়ে এখনি বলে দেব যে, দাদা পেয়রাগাছের তলায় গিয়ে—"

আমার মুখের কথা মুখেই রইল—সব কথা শোন্‌বার আগেই দাদা চম্‌কে আমার কাণ ছেড়ে দিলে,—তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল!

আমি আজ দাদার সাম্‌নে এই প্রথম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্-ফিক্ করে' হাস্‌তে লাগ্‌লুম।

দাদার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না। অনেকক্ষণ পরে খুব চুপিচুপি দাদা বল্‌লে, "হরি, কি বল্‌ছিলি ভাই?"

—"কী আবার বল্‌ছিলুম! পটলি-দিদিকে চুমু খাওয়ার কথা বল্‌ছিলুম! এখন—"

তাড়াতাড়ি দু-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে দাদা বলে উঠ্‌ল, "চুপ্, চুপ্! অত চ্যাচাস নে ভাই, সবাই শুন্‌তে পাবে যে!"

—"কেন, তুমি যে বড্ড মার্‌বে বল্‌ছিলে! এখন মার-না দেখি!"

—"সে কি ভাই, আমি কি তোকে সত্যি-সত্যিই আর মার্‌তুম হরি, আমি যে ঠাট্টা কর্‌ছিলুম!"

—"তোমার ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর ও-রকম ঠাট্টা করব না। কিন্তু তুই ভাই মাকে আর বাবাকে কি আর-কারুকে কিছু বলিস্-নে যেন! লক্ষ্মী মাণিক আমার!"

—"বেশ, তা যেন বল্‌ব না! কিন্তু তুমি আমাকে কি দেবে বল?"

—"কি নিবি বল্! টাকা নিবি, টাকা? নিবি? এই নে! যা, খেল্‌না কিন্-গে যা—আমি আর তোকে বক্‌ব না!"

ছোঁ-মেরে দাদার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আমি আগে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলুম। তারপর উঠেই তখনি ছিদামের দোকানে দৌড়লুম। মস্ত একটা বোমা-লাটাই, ক'কাটিম কাকের ডিমে মাঞ্জা-দেওয়া সুতো আর অনেকগুলো দো-ঘয়লা ঘুঁড়ি—টাকা দিয়ে আজ এই-সব কিন্‌তে হবে!

... ...

তারপর থেকে দাদার কাছ থেকে প্রায়ই টাকাটা সিকিটা আদায় কর্‌তুম। আমি হাত পাত্‌লে দাদা আর না-বল্‌তে ভরসা পেত না! বাবা আমাকে দাদার হাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত, এদিকে দাদা যে আমার হাতের মুঠোয়, সে খোঁজ কেউ পেলে না! পড়াশুনোও আমাকে আর বেশী কর্‌তে হয় না—যখন-খুসি পড়্‌তে বসি, যখন-খুসি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই, ঘুঁড়ি ওড়াই, লাট্টু ঘোরাই আর মনের সুখে ডিগ্‌বাজি খাই! দাদা-বেচারী জুল্-জুল্ করে' আমার দিকে তাকিয়ে গুম্ হয়ে বসে থাক্‌ত—মনে-মনে সে যে আমার ওপরে ভয়ানক চটে আছে, বাগে পেলে সে যে আমার মুণ্ডুটা এক্ষুনি কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খায়, এ আমি তার মুখ দেখে বেশ বুঝ্‌তে পারি!

এদিকে সেই কথাটা মা-বাবাকে বলে দেবার জন্যে আমার মুখ যেন নিস্‌পিস্ কর্‌তে থাক্‌ত! কিন্তু আমারও কিছু বল্‌বার যো নেই, কারণ এখন যদি আমি পেটের কথা ফাঁস্ করে' ফেলি, তাহলে আর কি

আমার রক্ষে আছে? সব জানাজানি হয়ে গেলে, দাদার ভয় একবার ভেঙে গেলে, আমাকে বিষম মুস্কিলে পড়্‌তে হবে! আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে কিনা, কাজেই এটুকু বুঝ্‌তে আমার একটুও দেরি লাগ্‌ল না।

তবু একদিন প্রায় বলে ফেলেছিলুম আর কি! সেদিন দাদা, আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসেচি, মা পরিবেশন কর্‌চেন।

হঠাৎ আমার মাথায় কি খেয়াল ঢুক্‌ল, আমি বলে ফেল্‌লুম, "মা, পেয়রা-গাছের তলায় সেদিন কী মজাটাই হয়েচে!"

মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েচে রে?"

—"পট্‌লি-দিদিকে দাদা—"বল্‌তে-বল্‌তে আমি থেমে গেলুম। দাদার মুখ তখন ভয়ে আর রাগে কেমন-একরকম হয়ে উঠ্‌ল!

মা বল্‌লেন, "থাম্‌লি ক্যান্ রে হবে, কি বল্‌ছিলি বল্‌না!"

কম-বয়সেই আমি খুব চালাক বলে, ধাঁ-করে' কথাটা ঘুরিয়ে নিলুম। :—"পট্‌লি-দিদি আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, দাদা তাকে ধরে ফেলেচে!"

মা হাস্‌লেন, বাবা হাস্‌লেন, দাদা নিশ্বেস ফেলে বাঁচ্‌লেন।

... ...

এর-মধ্যে একদিন দাদার সঙ্গে পট্‌লি-দিদির খুব ঘটা করে' বিয়ে হয়ে গেল।... ...

বিয়ের দিন-পাঁচেক পরে, দাদা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়্‌চে, আমি গিয়ে বল্‌লুম, "আমাকে গোটা-দুয়েক টাকা দিতে হবে দাদা!"

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে, দাদা খিঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, "টাকা গাছের ফল পেয়েচিস্, না? বেরো এখানে থেকে!"

অনেকদিন পরে দাদা ফের আমার সঙ্গে চড়া-গলায় কথা কইলে! আমিও গরম হয়ে বল্‌লুম, "আমি পায়রা কিন্‌ব, টাকা দেবে ত দাও বল্‌চি!"

দাদা খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "তুই কি ভেবেচিস্ বল্ দেখি হরে? আমাকে তোর গোলাম পেয়েচিস্ শুয়োর?"

দাদার জোর-জোর কথা শুনে আমার হাড় যেন জ্বলে গেল! আমিও তেরিয়া হয়ে বল্‌লুম, "টাকা দেবে না তাহলে?"

—"তবে রে রাস্কেল! খালি খালি শাসানো?"—এই বলেই দাদা দুম্ করে' আমার পিঠে এক বোম্বাই কিল বসিয়ে দিলে!

কিল খেলে যে-রকম করে' চ্যাঁচাতে হয় তেম্‌নি করে'ই চেঁচিয়ে আমি বলে উঠ্‌লুম, "কী! আবার কিল মারা? আমি এই চল্লুম মার কাছে সেই কথাটা বল্‌তে!"

—"যা, বল্-গে যা উল্লুক, বল্‌গে যা, তোকে আমি আর থোড়াই কেয়ার করি!"—বল্‌তে-বল্‌তে দাদা আমার পিঠের ওপরে দু-হাতে ক্রমাগত ঘুসি আর চড় মার্‌তে লাগ্‌ল।

আমি রাগের আর মারের জ্বালায় অস্থির হয়ে, একছুটে মার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম। মা আর বাবা দুজনে বসে কি কথা কইছিলেন, আমি চেঁচিয়ে ঘর ফাটিয়ে বল্‌লুম, "মা, মা, দাদা আমাকে মেরেচে!"

—"কেন, কি দুষ্টুমি করেছিলি?"

—"কিছু না মা! দাদা পট্‌লি-দিদিকে চুমু খেয়েছিল, সেই কথা আমি তোমাদের বলে দেব বলাতে দাদা আমাকে—"

বাবার দিকে তাকিয়ে মা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন, "থাম্ হতভাগা, থাম্,—ও-সব কথায় তোর দরকার কি? এমন উন্‌পাঁজুরে ছেলেও ত কোথাও দেখি-নি বাপু!"

বাবা আমার কাণ মলে দিয়ে বল্‌লেন, "পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার! এখনি থেকে এঁচড়ে পেকে উঠ্‌চ? দূর হ, দূর হ!"

হতভম্ব হয়ে সেখান্ থেকে চলে এলুম।... ...

অনেক ভাবলুম। কিন্তু কম-বয়সে আমি এত-বেশী চালাক হয়েও, এটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না যে, দাদার ভয়টা হঠাৎ ভেঙে গেলই-বা কেন, আর চুমু-খাওয়ার কথা শুনে মা বাবা উল্টে আমাকেই-বা ধমক দিলেন কেন?... ... ...আচ্ছা, আচ্ছা, এখন না-পারি দুদিন পরেই সব সম্‌ঝে নেব—এ-সব কথা হয়ত বড় না-হ'লে বোঝা যায় না! *

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা

যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক উপাদানের সমবায়ে কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠে, তাহা একই ক্রমবিকাশের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ এবং একই ক্রমবিকাশের অনুসরণ করে। কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট যুগে, কোন জাতির বা লোকসমূহের মধ্যে যে সকল প্রবণতা থাকে, সেই সকল প্রবণাতাই আবার তাহাদের পরিবারের মধ্যে, সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে, বিধিব্যবস্থার মধ্যে, শাসন-তন্ত্রের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, শিল্পকলার মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, শ্রমশিল্পের মধ্যে, কৃষি-বাণিজ্যের বিবিধ শাখার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই সকল প্রবণতার ক্রমাগতই অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন হয়; কারণ যুগধর্ম্ম ও নূতন নূতন ঘটনা, লোকের ও জাতির চরিত্রেও ক্রমাগত অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অবশ্য, কোন বিশেষ ধরণের মানসিক প্রবণতা কোন বিশেষ বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতিকূল হইতে পারে, কোন বিশেষধরণের সাধারণ মনোভাব, চরিত্রগত কোন বিশেষ গুণের অন্তরায় হইতে পারে কিংবা কোন বিশেষ গুণকে বিকৃত করিতে পারে; কিন্তু সকলেই একই পরিমাণে

* এই গল্পে আশুন শেখভের যৎসামান্য ছায়া আছে। এই যৎসামান্য ছায়াকে কেউ যেন অসামান্য কায়া বলিয়া ভাবিবেন না। লেখক

সেই বিশেষ প্রবণতা ও মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি সর্ব্বপ্রধান প্রবণতা কি? একটি—যৌক্তিকতা (rationalism) এবং আর-একটি স্বাভাবিকতা (naturalism)। এই দুই প্রবণতা মহাকাব্যেরও প্রতিকূল, গীতি-কাব্যেরও প্রতিকূল; তাই ঐ শতাব্দীতে, ঐ দুই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যে নিতান্ত মামুলি ধরণের রচনা বাহির হইয়াছে। ঐ যুগে যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে—যথা Henriade, La Pucelle, ভল্‌টেয়ারের হাল্কা ধরণের কবিতা, রুসো ও Parny-র গীতিকবিতা—সে সমস্তই যুক্তিবাদমূলক কিংবা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাববাদমূলক। সেইরূপ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, অবরোহণ-পদ্ধতি অনুসারে এবং কতকগুলি সাধারণ প্রতীতি অনুসারে চলিয়াছে; পক্ষান্তরে ঊনবিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞান, আরোহণ-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছে। এইজন্যই ঊনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে বৈষয়িক সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অল্পই লক্ষিত হয়; ঊনবিংশতি শতাব্দী, বৈষয়িক সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ আবার সভ্যতার বিভিন্ন রূপের সহিত, শাসন-তন্ত্রের প্রত্যেক রূপের মিল আছে; এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য, তত্রত্য অধিবাসীদিগের দৈহিক ও নৈতিক গুণসমূহ,—মানব-ক্রমবিকাশের কোন এক সময়ে, কোন জাতির প্রাধান্য যেমন একদিকে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করে সেইরূপ আবার অন্য এক সময়ে দ্রুতবেগে তাহাকে অবনতির পথে লইয়া যায়।

সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতার মধ্যে আমরা সেই একই লক্ষণ সকল দেখিতে পাই যাহা ভারতের নৈতিক সভ্যতার আলোচনায়, আমাদের চোখে ঠেকিয়াছিল—সেই ইতস্তত ভাব, সেই গোলযোগ, সেই লৌকিক আচার-ব্যবহারের পরস্পর-বৈপরীত্য, সেই সহসা-সংসাধিত মৌলিক পরিবর্ত্তন—সবশুদ্ধ মিলিয়া সেই এশীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একদিকে মিলন-চেষ্টা, আর-একদিকে সংগ্রাম।

* * *

ভারতের অধিকাংশ লোকই পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। অতএব ভারতের বৈষয়িক আলোচনার আরম্ভেই কৃষিপ্রধান ভারতের আলোচনা করা আবশ্যক।

তিনটি আলোচ্য বিষয় যথা,—ভূ-সত্বাধিকারের পদ্ধতি; গ্রামের গঠনপদ্ধতি; প্রধান প্রধান চাষের বিবরণ।

* * *

এই ভূ-সত্বাধিকার পদ্ধতিটি বড়ই জটিল ও গোলমেলে ধরণের; এই পদ্ধতি হইতেই ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত ক্রমবিকাশ আমরা অবগত হই।

* * *

প্রথমে, যে-সকল সমাজ অ-সম্যক্-পরিপুষ্ট তাহাদের সমাজ-গঠন সাধারণসম্পত্তিমূলক হইয়া থাকে। কেহ কেহ রুস-দেশীয় "মির"র সহিত ও জাপানী 'মুরার' সহিত ভারতীয় গ্রামের তুলনা করিয়া থাকেন।

দুই ধাঁচার গ্রাম আছে।

প্রথম ধাঁচার গ্রাম দাক্ষিণাত্যে খুব

সাধারণ। প্রত্যেক পরিবারের পৃথক পৃথক গৃহ, পৃথক্ পৃথক্ মাঠ। কিন্তু সকল অধিবাসীই সাধারণ ধনসম্পত্তির অধিকারী, উৎপন্ন দ্রব্য সকলেই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়। দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রাম, কোন এক জাতের, কোন এক পরিবারের কিংবা কতকগুলি পরিবারের অধিকার-ভুক্ত। যে জাত এই গ্রামের স্বত্বাধিকারী সেই জাতের লোকই সাধারণধনসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকে; অন্য জাতের লোকেরা নিজের নিজের বাড়ীর ও মাঠের জন্য ভাড়াস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট কর দেয়। তাহারা গ্রামের স্বত্বাধিকারী নহে, তাহারা অধিবাসী মাত্র। এই ধাঁচার গ্রাম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সাধারণ।

* * *

এই আদিম-ধরণের সমাজ-গঠনের উপর আবার সামন্তপদ্ধতি চাপান হইয়াছে। মোগল শাসন-পদ্ধতির অধীনে এই সামন্ত তন্ত্রও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লোকেরা সম্ভ্রান্ত ও দাস এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল; এখন দাসদিগের দাসত্ব মোচন হইয়াছে, কিন্তু অনেক প্রদেশেই পুরাতন জাগীরদার বা সামন্তদিগের অধীনস্থ প্রজা এখনও বিদ্যমান আছে—যথা বাঙ্গলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, মধ্যভারতের মালগুজার ইত্যাদি (১)।

* * *

যে তত্ত্বটি প্রথমে প্রাচীন হিন্দু আইন স্থাপন করে, এবং মোগলেরা চীনেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিপুষ্ট করে, সেই তত্ত্বটি এই:—সমস্ত জমি সরকারের; এবং রাজস্ব ও ভূমিকর একই; উহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পরিশেষে ইংরেজের শাসন-তন্ত্রও এই তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া সমস্ত অনিশ্চিত ও অস্থায়ী অধিকারের বিরোধ নিবারণার্থ কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করে। ছয়টি বড় রকমের পদ্ধতি। বঙ্গদেশে, জমিদারের জমি:—কৃষকেরা জমিদারের রায়ৎ; রায়তেরা জমিদারকে খাজনা দেয়। জমিদারেরা আবার ১৭৯৩ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারকে চিরনির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনা দেয়: এই রাজস্বের পরিমাণ আজকাল—উৎপন্ন কাঁচা মালের উপর শতকরা ৫ হইতে ৬। নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া জমিদার ও রায়তের মধ্যে মামলা চালাইতে সরকার বাধা দেন না। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন, ১৮৬৮ অব্দের ৮ আইন, এবং রায়ৎকে ১৮৫ অব্দের রায়তী স্বত্বের আইনের সর্ত্ত অনুসারে জমিদার রায়ৎকে জমি হইতে অন্যায়রূপে উচ্ছেদ করিতে পারেন না, এবং অন্যায়রূপে খাজনাও বাড়াইতে পারেন না। রায়ৎদিগের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ জমিদারের

(১) M. Baden Powell-এর বিবেচনায়, (Land Systems of British India) এই দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রামগুলি—সামন্ততন্ত্র হইতে উৎপন্ন, গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোনও জাত—প্রাচীন কোন অধিপতির বংশ। আমার মতে, অনেক স্থলেই, এই স্বত্বাধিকারী জাত—প্রথম-বাসিন্দার বংশ, সামন্ততন্ত্রাধীন বংশ নহে।

খাজনা-হিসাবে প্রাপ্য (২)। অযোধ্যার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, জমি যেমন রায়তের তেমনি বড় বড় ভূস্বামীরও (জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি); উহাদিগকে রায়তের খাজনা দিতে হয়। কেবল বেনারস জেলাটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; অন্য সর্ব্বত্র, রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীরা ৩০ বৎসর অন্তর জমি নূতন করিয়া জরিপ জমাবন্দী করে; ভূমির উৎপন্ন মূল্যের শতকরা ৮ হইতে ১০ অংশ পরিমাণ ভূস্বামীদিগকে রাজস্ব দিতে হয়। ১৮৫৫ অব্দের শাহারানপুরে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সরকার উহাদের নিকট হইতে ভূমিকরের অর্দ্ধাংশের বেশী দাবী করিতে পারিবেন না (পূর্ব্বে সরকার কখন কখন ঐ দাবী করিতেন) বঙ্গদেশের ন্যায় এই সকল প্রদেশে জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তের স্বত্বাধিকার তেমন সুরক্ষিত নহে, রায়তেরা ভূস্বামীকে গড়-পড়তায় উৎপন্ন মূল্যের পঞ্চমাংশ খাজনা দেয়।

পঞ্জাবে অধিকাংশ ভূমি গ্রামের জন-সাধারণ-মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত:—রাজস্বের হার সাধারণতঃ ৩০ বৎসরের জন্য স্থিরনির্দ্দিষ্ট। শাহারানপুরের প্রবর্ত্তিত নিয়ম উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় পঞ্জাবেও প্রচলিত রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পঞ্জাবেও রাজ ও ভূমিকরের হার প্রায় একই সী পৌঁছিয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বড় বড় ভূম্যাধি কারী খুবই কম এবং রায়তেরা সরকারের খাস প্রজা; ভূমি-কর ও রাজস্ব সেখা একীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রতি ৩০ বৎস অন্তর রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হ এই রাজস্বের হার অতিশয় উচ্চ; M. Du বলেন,—কাঁচামালের হিসাবে, শতকরা হইতে ৩৩ অংশ; কিন্তু ইংরেজ-সরকা তাঁহার এই নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে অল্প কতকগুলি জমিদার আছে —তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রায় সকল চাষাই সরকারের খাস প্রজা; সরকার তাহাদিগকে ৩০ বৎসরের মুদ্দতে কিংবা তাহারও কম মুদ্দতে পাট্টা দিয়া থাকেন। সরকার উহাদের নিকট হইতে বাদ-খর্চ্চা মোট আয়ের অর্দ্ধেক দাবী করেন, কাঁচামালের হিসাবে ½ বা ½-এর অধিক দাবী করেন না। M.Duttএর গণনা-অনুসারে, শুষ্ক জমি শতকরা ১২ হইতে ২০ অংশ পরিমাণ এবং জল-সিক্ত জমি (সরকার কৃত খালের ফলে সিক্ত বুঝিতে হইবে) শতকরা ১ হইতে ৩½ অংশ পরিমাণ

(২) বঙ্গদেশে যে সকল জমিদারের ভূসম্পত্তি আয়তনে ১১,৭৮৬,৭২৫ square acres, (১ acre= ৩ বিঘা), তাহাদিগকে ৫০,০০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয়। ১১টা জমিদারির আয়তন গড়-পড়তায় ৩৯৭,৮৯৬ acre এবং উহাদিগকে গড়-পড়তায় ২৭৬,৫০২ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। অযোধ্যায় ভূসম্পত্তি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আরও ক্ষুদ্র।

Tenancy Act রায়ৎদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, এক—যাহাদের দখলীসত্ব, আর এক—যাহাদের উঠ বন্দী স্বত্ব। প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্বত্বাধিকার জমিদারেরই ন্যায় পাকাপোক্ত।

জনা দেয়। এই সংখ্যাঙ্কগুলি অতিরঞ্জিত লিয়া মনে হয়। (৩)

মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি ভূস্বামী আছে, বং কতকগুলি রায়ৎ আছে। জমিদারের কট সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব এবং রায়তের কট জমিদারের প্রাপ্য ভূমি-কর বা খাজনা ভয়ই সরকার স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ূমি-করের অর্দ্ধেক বা শতকরা ৬০ অংশ র্য্যন্ত রাজস্বের হার উঠিতে পারে। M. Dutt বলেন, ১৮৯০ অব্দের পুনর্বন্দোবস্ত নুসারে কতকগুলি জমিকে ভূমিকরের মান রাজস্ব দিতে হইবে। কিন্তু এ কথা রকার অস্বীকার করেন।

* * *

এই ভূস্বামিত্বের পদ্ধতি হইতে কতকগুলি কথা মনোমধ্যে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী একমাত্র সরকার—এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ এশিয়াদেশীয়।

তাহার পর, ইংরেজ আচার-ব্যবহার ও ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা রফা করিয়া সমস্ত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী যে সরকার, সেই সরকার কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছেন:—বস্তুতঃ এই উপ-ভূস্বামীদিগের স্বত্বাধিকার প্রকৃত ভূস্বামীর স্বত্বাধিকারেরই অনুরূপ; যেহেতু —উহাদের প্রাপ্য খাজনা ভূমি-করের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তথাপি মধ্যপ্রদেশে, রায়তের নিকট হইতে প্রাপ্য উপ-ভূস্বামীর খাজনা সরকার স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সেই ইংরেজী মতামতের প্রভাব, এমন কি, যে-সকল মূলতত্ত্ব ইংরেজের বড় দুই রাজনৈতিক দলকে পরিচালিত করে, সেই সকল মূলতত্ত্বের প্রভাবও ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যে "জমিদার" বড় কৃষক মাত্র সেই জমিদারকে ইংরেজদের রক্ষণশীল দল Land lord করিয়া দিলেন; যে দাস-কৃষকদিগের কখনই কিছুই ছিল না, উদার-নৈতিকদল তাহাদিগকে ভূস্বত্বাধিকারী করিয়া দিলেন।

পরিশেষে ভারত জয় করিতে, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানাদির মর্ম্ম বুঝিয়া ভারতের শাসন-প্রণালী স্থির করিতে ইংলণ্ড যে-সকল বাধা পাইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে পতিত হয়। কোনও দেশে আইন-ঘটিত এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে—বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে? কোন ভূস্বামী তাহার রায়ৎদিগের খাজনা কখনও বাড়াইবে না বলিয়া বচন-বদ্ধ হইলে, তাহাও বরং বুঝা যায়, কিন্তু কতক-গুলি প্রজাদিগের রাজস্ব কখনও বাড়াইবে না বলিয়া কোন গভর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ অন্য সমস্ত করদাতাদের সহিত কোন চুক্তি না করিয়া সরকারের সমস্ত ভাবী খরচের বোঝা সমস্ত করদাতার উপর চাপাইয়া দেওয়া—এই যে বন্দোবস্ত ইহা নিশ্চয়ই ন্যায়-বিরুদ্ধ, সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তটা আরও অদ্ভুত।

(৩) যে শ্রেণীতে স্বয়ং রায়ৎ ভূস্বামী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাকে "রায়তোয়ারী প্রণালী" বলে।

অবশ্য সাধারণ ভূস্বামী শুধু ৩০ বৎসরের জন্য রায়ৎদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন; এবং ৩০ বৎসর অতীত হইলে আবার খাজনা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাজ-সরকারই সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং এমন দেশে স্বত্বাধিকারী যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; তাই, সরকার রায়ৎদের সহিত আপসে চুক্তি করেন না, পরন্তু নির্দ্দয়ভাবে স্বকীয় হুকুম তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। ভারত-সরকার শুধু ভূমি-কর-নির্দ্ধারণ-কারী ভূস্বামী নহেন,—ভারত-সরকারের অসীম আধিপত্য; ভারত-সরকার কোন জনসভার সম্মতি না লইয়াই রাজস্বের হার নির্দ্ধারণ করেন। প্রজারা নিজের জমির যে উন্নতি সাধন করে, সেই হিসাবে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট কোন প্রদেশে ত্রিশ বৎসরের জন্য কোন প্রদেশে দশ বৎসরের জন্য জমির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন এবং প্রজারা স্বকীয় কায়িক শ্রমে যে আয় বৃদ্ধি করে, সেই আয়ের তুল্য পরিমাণ কিংবা প্রায়-তুল্য পরিমাণ রাজস্ব যদি কোন গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন তাহা হইলে সেই গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে? ইহার দ্বারা কৃষকদিগকে নিরুৎসাহ ও কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয় না কি?

উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে দুটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভারতের ভূমি-কর-পদ্ধতি হইতে ইহাই প্রদর্শিত হয় যে ভারতীয় সমাজ এখনো পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, এবং এই দরিদ্র দেশ স্বকীয় দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে চেষ্টা প্রযত্ন করে, এই পদ্ধতি অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে তাহার অন্তরায় (৪)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৪) এইজন্য ইংরেজ-শাসনকে দোষী করা আমার আদৌ অভিপ্রায় নহে। আমি শুধু দেখাইতেছি, যে-দেশে একটা বিশেষ সমাজ-কাঠামের মধ্যে অবরুদ্ধ ত্রিশকোটি লোক, সে দেশকে রূপান্তরিত করিবার বাধা প্রায় অলঙ্ঘনীয় বলিলেও চলে। কিন্তু আমি আর একটা কথা বলিব। ভারতে কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক নূতন জমাবন্দিতে, রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা, কৃষকদিগের কিংবা পত্তনীদারদিগের দ্বারা সংসাধিত উন্নতির মূল্য হিসাবে সেই মূল্যের তুল্য পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; কিন্তু ইংলণ্ডে ভূস্বামী কোন জমি কাহাকেও ভাড়া দিলে, একশো বৎসরের পর, সেই ভাড়াটিয়ার নির্ম্মিত সমস্ত ইমারৎ-আদি সহ সেই ভূমি পুনর্গ্রহণ করিতে পারে; যদি সেই ব্যক্তি আবার ভাড়া লইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার স্ব-নির্ম্মিত ইমারতাদির জন্যও ভূস্বামীকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু ভারতের পক্ষে তিনটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ ভারতের সম্বন্ধে এমন একটা আইন প্রয়োগ করা হয় কেন, যে আইন সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রবেত্তারা দুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন? তার পর, ইংরেজ ভাড়াটিয়া স্বাধীন, ভারতীয় রায়ৎ স্বাধীন নহে। (যে আইরিশ রায়তের অবস্থা ভারতীয় রায়তের অপেক্ষা কম প্রতিকূল ছিল,—ইংলণ্ডের মহাসভা সেই আইরিশ রায়ৎদিগেয় স্বত্বাধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন)। পরিশেষে বক্তব্য, ভারত-সরকারের ভূমিকর সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাটা (বাস্তব পক্ষে ভারতের রাজস্ব একটা কর, ভূমির ভাড়া নহে) সাধারণের স্বত্বাধিকারবিধি হইতে গৃহীত হয় নাই; প্রত্যুত ইংলণ্ডের ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার-বিধি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বুকের ধন

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হ'তে
দাদাঠাকুর বেচ্‌তে তাহা নারবো কোনমতে।
শূন্য বুকে ভরতে আমি ছাগল পুষি ঘরে
করিনিক ব্যবসা পাঁঠার তোমার পেটের তরে।
ব'লছ তুমি কালীপুজার জন্য নিবে পাঁঠা,
সেই ভয়েতে আমার গায়ে দিচ্ছেনাক কাঁটা।
উচ্ছন্নে যেতে হ'বে বল্‌ছো বটে ডাকি'
উচ্ছন্নে যেতে আমার নেইত কিছু বাকী।

অনেকগুলি ডাঁটো এবং অনেকগুলি কাঁচা
মা কালীরে বছর বছর দিয়েছি ত বাছা।
দেখা হ'লে বলো ঠাকুর এবার শ্যামা-মায়
পাগল বুড়ী ছাগল দিতে হয়না রাজী হায়।
পেটের ছেলে অনেক দেছে মিটেনি তার ক্ষোভ,
শেষ-বয়সের বুকের ধনে কেন গো মার লোভ?
সবই যদি নেবে তাহার কি নিয়ে সে থাকে?
তার চেয়ে মা সকাল-সকাল নিক্‌না বুড়ীটাকে!

শ্রীকালিদাস রায়।

বন্দেমাতরম্

(৭)

"আর বলো না পণ্ডিতমশায়, আমার সর্ব্বশরীরে রক্ত চন্‌চন্ ক'রে উঠ্‌ছে, আমি আর শুনতে পারি নে।" বলিল রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার পণ্ডিত দেবব্রত ভট্টাচার্য্যকে।

প্রায় দুই বৎসরকাল ভট্টচায মহাশয় বালিকার সংস্কৃত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাড়ীর সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছে—এইবার অচিরাৎ ভারতে দ্বিতীয় 'গার্গী' বা 'উভয় ভারতীর' অভ্যুদয় তাহারা দেখিবে। পণ্ডিতমহাশয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক,—দ্বিতীয় কেন ছাত্রীকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত করিয়া তোলাই তাঁহার অভিপ্রায়। কেন না এই জন্যই তিনি বেতনভোগী, অধিকন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে—পরলোকের অপেক্ষায় আর তাঁহাকে থাকিতে হয় না, ইহলোকেই হাতে-হাতে পুরস্কৃত হইতে পারেন। কিন্তু সকলের এত বাসনা কামনা ব্যর্থ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সংস্কৃত শিক্ষার উপলক্ষে দীক্ষিত হইল কিসে? না দেশানুরাগে।

রাজকুমারীর সংবাদপত্র পড়িবার নেশা কখনও ছিল না—এখনো নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিতে চাহুক বা নাই চাহুক, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না,—যতরাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া পণ্ডিতমশায় ছাত্রীকে শুনাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কোন্ ইংরাজের পদাঘাতে, কোন্ কুলির প্লীহা ফাটিয়াছে, ট্রেণের গাড়ীতে, ট্রাম গাড়ীতে ইংরাজ ফিরিঙ্গি কর্ত্তৃক কোন্‌দিন কোন্ ভারতবাসী লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াছে,

কোর্টে ইংরাজ ভারতবাসীর মকদ্দামায় কখন কিরূপ অবিচার হইতেছে, এই সব খবরই প্রধানত পণ্ডিতমশায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। শুনিয়া ক্রোধে বেদনায় জ্যোতির্ম্ময়ীর গোলাপী বর্ণ আগুনের মত রাঙ্গা হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের দেশ-পীড়নজনিত মনের জ্বালা যেন প্রশমিত হইয়া আসে।

এখন পণ্ডিতমশায় বলিতেছিলেন, মফস্বলের একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্রলোককে চাবুক মারিয়াছে। ভদ্রলোকটির অপরাধ, অন্যমনাবশত তাঁহাকে সেলাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

এই সংবাদে জ্যোতির্ম্ময়ী যেন নিজের অঙ্গেই কশাঘাত অনুভব করিয়া উদ্দীপ্ত কাতরস্বরে কহিল—"আমি আর শুনতে পারি না"। পণ্ডিতমশায় এত সহজে যদিও দমিবার পাত্র নহেন, কেন না মুখ বন্ধ রাখিতে হইলে দম ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি একটু হতাশার স্বরে কহিলেন—"তবে থাক্, এসব কথা তোমার মত বালিকার না শোনাই ভাল। পড়।"

"না এখন আমার পড়তেও ইচ্ছা করছে না।"

পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার হাতের অমৃতবাজার পত্রিকাখানির পাতা উল্টাইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অন্যমনে বলিলেন "তবে অন্বয় কর? কস্মিনশ্চিৎবনে ভাস্বরকো নামঃ সিংহঃ প্রতিবসতিস্ম।"

প্রথম পাঠ বালিকার অনেকদিন শেষ হইয়াছে—এখন সে পড়ে রঘুবংশ মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ না করিয়া বালিকা অন্বয় করিল—কস্মিন্‌শ্চিৎ প্রদেশে অম্বরকো নামঃ সিংহঃ ত্রাসয়তি সর্ব্বানি জনগণাম্।

পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, একটা গণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন, বালিকার দিকে চাহিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"রাজকুমারি, হাসি তামাসার কাল এ নয়।"

"আমি হাসি তামাসা করিনি—প্রাণ যা অনুভব করছি তাই বলছি। পড়তে পারি না এখন পণ্ডিতমশায়।" বলিয়া হাতের বই খানা জ্যোতির্ম্ময়ী ছুঁড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

গৃহের একপার্শ্বে তাহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দ বালা চৌকিতে বসিয়া নীরবে সেলাই করিতেছিল। বইখানা উঠাইয়া টেবিলে রাখিয়া সে কহিল, "রাজকুমারি—সংবাদপত্রে কত পীড়নের কথাই বা প্রকাশ হয়—! আমি তাই শুনেই এত অধীর হয়ে ওঠেন, যা কথা কানে গেলে না জানি কি করতেন! দেখুন দুর্ব্বল হলেই সহ্য করতে হয়, এই জগতের নিয়ম, ইংরাজ বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে দিন, আমাদের দেশে দুর্ব্বলা অসহায়া নারী জাতির যে কিরূপ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় একটু বড় হলে তখন বুঝবেন।"

পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন বেগতিক, কিছু দিন পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, আর তাঁহার অযত্ন অনাদর যে কতক পরিমাণে ইহার কারণ নয় তাহা ত তিনি মনে করিতে পারেন না। একটু তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন, —"তবে আমি আজ উঠি, আজ ত দেখছি তোমার পড়া হবেই না।"

"না পণ্ডিতমশায় বসুন, আর কিছু খবর থাকে বলুন। আমি ভেবে দেখছি—কষ্ট হয় ব'লে কথাগুলো শোনা বন্ধ করাটা ঠিক নয়। তাতে ত পীড়ন বন্ধ হবে না।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অনুজ্ঞায় পণ্ডিতমশায় পরিত্যক্ত চেয়ার পুনর্গ্রহণ করিলেন। কুন্দবালা বলিল—"আমি প্রত্যক্ষ ঘটনা দু-একটা জানি, শুনবেন রাজকুমারি? আমার একটি খুড়তুত ভাই ভাগলপুরের ষ্টেসন-মাষ্টার, তিনি স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখেছেন।"

"বল না কুন্দবালা?" বালিকা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে এই অনুরোধ করিলেন।

কুন্দ পণ্ডিতের দিকে চাহিতে গিয়া সম্মুখের দেয়ালের আয়নাখানায় অগ্রে দৃষ্টিপাত করিল,—মাথার শিথিল সাড়ীখানা ঠিক করিয়া লইবার ছলে কপালের কেশদাম অলক্ষ্যে ঠিক করিয়া লইয়া কহিল—"সেখানকার একজন বড় সাহেব—নাম কর্‌ব না, কল্‌কাতায় যাবেন,—ট্রেন ছাড়তে একটু দেরী ছিল, ষ্টেসনের খানাঘরে বসে গেলাশের উপর গেলাশে মদ ঢাল্‌ছেন—আর খাচ্ছেন, দুই ঘণ্টা দিলেও তাঁর হুঁস নেই, তৃতীয় ঘণ্টা পড়লো—আমার ভাই তাঁ'কে খবর দিলে যে এইবার গাড়ী ছাড়বে। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলেন। তিনি তখন নেশায় চুরচুরে। পথে দু-চারজন কুলি জনতা করে দাঁড়িয়েছিল,—লাথি-মেরে তাদের সরিয়ে পথ করে নিলেন—ধাক্কায় একজন লোক ঠিক গাড়ীর সামনে পড়ে গেল, তিনি এমন জোরে জুতোর ঘায়ে তাকে ঠেলে দিলেন—যে তার মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে উঠল,—সাহেব তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল, তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। খানিক পরে বলিল—"পণ্ডিতমশায় একটা কথা বলব? আমার মনে হয় খবরের কাগজে এ রকম দুর্ব্বল-পীড়নের কথা পড়ে আপনারা আনন্দভোগ করেন। আর জানেন, সেই মনে করেই আমার বেশী কষ্ট হয়।"

"আনন্দভোগ করি?" পণ্ডিতমহাশয়ের নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"নিশ্চয়ই! যেমন রাস্তায় মারমারি হলে, পথিকেরা মজা অনুভব করে সেই রকম। নইলে ভাই বোন মা-বাপ লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখলে বা শুনলে কেউ কি চুপ করে থাকতে পারে?"

"কি করব বল? উপায় কি?"

"কি করবেন? প্রতিকারের চেষ্টা করুন।"

"প্রতিকারের চেষ্টা!" পণ্ডিতমহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। লম্বা দাড়ীতে হাত বুলাইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তবেই প্রতিকার হবে। আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের প্রতিকার চেষ্টা, আর যূপকাষ্ঠে কণ্ঠদান—একই কথা।"

"প্রতিদিন জীবন্ত দগ্ধ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যূপকাষ্ঠে কণ্ঠদানও আমি ভাল মনে করি।" পণ্ডিতমহাশয় অসহায় বালকের মত কুন্দবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নীরবে প্রশ্ন করিলেন—"এ মেয়ে পাগলের মত বলে কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"আপনি ত আমাকে পড়িয়েছেন—উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ। ইংরাজিতেও একটা প্রবাদ আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান তার সহায় হন। জাতির মঙ্গল চেষ্টা করা ত আর বিদ্রোহিতা নয়—যে আপনি ফাঁসি যাবেন! আল্‌সেমির আরামটুকু ছাড়তে চান না বলেই এসব কাজে আপনারা উদ্যম-হীন। আমি স্ত্রীলোক হয়ে যে কাজ অসাধ্য-সাধন মনে করি না—আপনারা পুরুষ হয়ে সে কাজে ভগবানের মুখ চেয়ে নিবৃত্ত থাকেন। ভগবান ত মানুষের দ্বারাই কাজ করিয়ে নেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, তিনি মুগ্ধের মত কহিলেন—"কি করতে বল তুমি?"

"সহরে নগরে, গ্রামে পল্লীতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।"

কুন্দবালা বলিল—"এক সময় হিন্দু মেলা নামে কল্‌কাতায় একটা মেলা হয়েছিল,—তার উদ্যোগে দিনকতক নাকি ছেলেদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"হাঁ সে অনেক দিনের কথা,—আমরা তখন ছেলেমানুষ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশ্ন করিল—"বন্ধ হোল কেন?"

কুন্দবালা উত্তর করিল—"আমাদের ত কার্য্যের উৎসাহ সূর্য্য চন্দ্রের আলোক নয় যে স্থায়ী হবে; তেলের বাতি আর কতক্ষণ জ্বলে?"

"সংসারে ত তেলের বাতির প্রভাব কম নয়। সূর্য্য চন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না,—কিন্তু সহজেই আমরা প্রদীপে তেলের যোগান দিতে পারি। আমাদের দেশের কবিরা দেশনায়করা কি বহুদিন ধরে তাই করছেন না? যখন পড়ি "তোমার তরে মা সঁপেছি দেহ তোমার তরে মা সঁপেছি প্রাণ"—তখন আমার দেহপ্রাণ নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে,—যখন পড়ি—

"তবু—তারা হাসে খেলে—
তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর—গৃহ ধন্ ধান্য পূর
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু—তারা হাসে খেলে।"

তখন আর হাসতে খেলতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু সকলের মনের ভাব এই রকম না হলে ত কোন কাজ হয় না।" বলিল কুন্দবালা;—উত্তর স্বরূপ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"মনের ভাবের অভাব বশতই যে লোকে নিরুদ্যম—আমার তা মনে হয় না। গভরমেণ্টের অসন্তুষ্টি বলে ত একটা জিনিষ আছে!"

বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার অবাক্ হইয়া গেল,—কথাটা এমনই তাহার নিকট হাস্যজনক মনে হইল। হাসিয়া সে বলিল—"গভরমেণ্টের ভয়? কেন? গভরমেণ্ট, আমাদের ত শত্রু নয়, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা। আমাদের পীড়ন করে যারা—তারা সাধারণতঃ ছোট লোক ইংরাজ—নয়ত হীনচেতা গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের অপরাধের দায়ী কি গভরমেণ্ট?

গভরমেণ্টই ত আমাদের মঙ্গল কামনায় সহরে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন,—আর আমরা ব্যায়াম চর্চ্চা করতে গেলে তাঁরা নিষেধ করবেন? এ কখনই হতে পারে না। দেশের লোকের মন যে কত হীন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—এইরূপ বৃথা ভয়ই তার প্রমাণ। একথা শুনলে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিশ্চয়ই হাসবেন।"

পণ্ডিত বলিলেন—"আমরা ত গভরমেণ্ট কর্ম্মচারীকে গভরমেণ্ট থেকে পৃথক করতে পারি নে! তাঁরা পদে পদে তাদের কার্য্যে জানিয়ে দেন যে, আমরা তাঁদের জুত বহনেরও যোগ্য নই—কর্ম্মচারীদের আমাদের প্রতি এই যে অসম্মান ঘৃণা, গভরমেণ্ট তা থেকে কি আমাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"অবশ্যই করেন, নইলে শাসননীতির অর্থ কি? গভরমেণ্ট ত আর আমাদের জন্যে আর ইংরাজের জন্যে আলাদা আইন করেন নি। দণ্ডনীতি ত ইংরাজ ভারতবাসী উভয়ের পক্ষে একই! এই খানেই ব্রিটিস রাজ্যের উদারতা।"

"হাঁ বহির পাতাতে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক বিপরীত।"

"আপনি আবার ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে গভরমেণ্টকে এক করছেন। গভরমেণ্ট যে অত্যাচারীর পক্ষপাতী—এইরূপ মনে করাই যথার্থ বিদ্রোহিতা। আমি যদি বিচারক হতুম—আর দেখতুম কোন বাঙ্গালী ইংরাজের প্রতি অত্যাচার করেছে—তাহলে তাকে এক তিলও কম দণ্ড দিতুম না।—এ আমি খুব জানি। ন্যায়ের কাছে ত স্বদেশ বিদেশ নেই। আর এত বড় ভারত-সাম্রাজ্য যাঁরা শাসন করছেন—এ রকম পক্ষপাতী নীতি কি তাঁরা অবলম্বন করতে পারেন?"

পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি এখনো অর্ব্বাচীন, পরে বুঝবে তা পারেন কি না এবং করেন কি না? আমরা যদি ইংরাজের সমাধিকার পেতুম—তাহলে ত আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ থাকত না! দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে করতে পুত্রকন্যাকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে বৃদ্ধকালে নিশ্চিন্ত মনে বনগমন করতুম। ইলবার্টবিলের সময় কি হয়েছিল রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোরো। আর একজন ট্যাসফিরিঙ্গিও অস্ত্র ধারণের অধিকারী কিন্তু তোমার বাবারও লাইসেন্স দিয়ে তবে ঘরে অস্ত্র রাখতে হয়। তিনি ত কনগ্রেসের একজন নেতা, কোন্ দুঃখে কনগ্রেসের সূচনা—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানবে। তুমি এইমাত্র বল্লে রাজা আমাদের মঙ্গল চেষ্টার বিরোধী হতে পারেন না, কিন্তু কোন গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী দেশের লোকের কনগ্রেসে যোগ দিতে সাহস করেন না কেন?—না গভরমেণ্ট কনগ্রেসকে সুনজরে দেখেন না। আর রাজপুরুষের এই বৃথা সন্দেহ ভুল বিশ্বাসই আমাদের উদ্যম-হীনতার প্রকৃত কারণ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিল, এই বিষয়ের একটা দিক যেন সে আজ প্রথম দেখিতে পাইল। কিছু পরে বলিয়া উঠিল—"কোন মিথ্যা বা ভুল চিরদিন কখনো স্থায়ী হয় না। এমন এক সময় নিশ্চয় আসবে যখন রাজা প্রজা উভয়েই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবে। প্রজা বুঝবে আমাদের নিজেদের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের

জন্যে রাজ-ভয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে, আর রাজাও বুঝবেন, প্রজার মঙ্গলে রাজারই মঙ্গল—তাঁহারই শক্তি বৃদ্ধি, অতএব প্রজা-শক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রশ্রয় দেওয়াই রাজ-কর্ত্তব্য।"

কুন্দবালা বলিল—"কোন ভুল কি সহজে ভাঙ্গে রাজকুমারি? ভুল ভাঙ্গতে অনেক সময় জীবন পর্যন্ত নাশ হয়।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়নে অনুরাগ-আলোক,—স্বরে উৎসাহ-বহ্নি জলিয়া উঠিল, মূর্ত্তিমতী কল্যাণী যেন কহিল—"বেশ, প্রাণ দিয়েও যদি এ ভুল ভাঙ্গাতে হয় তাতেও আনন্দ ছাড়া দুঃখ কর্‌বার কি আছে? আমি এক জন সামান্য বাঙ্গালী মেয়ে, অন্যায়ের দমনে এত তেজ এত বল অনুভব কর্‌ছি আমি কোথা থেকে? আমাদের দেশের আকাশে বাতাসেই কি সে তেজ ছড়ানো নেই? আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি যেমন আজ এখানে এ রকম করে ভাবছি—তেমনি আরও অনেকেই ভাবছেন। প্রাণে প্রাণে আমাদের বৈদ্যুতিক সংবাদ চালিত হচ্ছে। আমরা কৃতকার্য্য হবই হব। সময় এসেছে—সময় এসেছে,—অন্যায় চিরদিন জয়ী হয় না।"

দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের নয়নে আনন্দমঠের দেবীমূর্ত্তি সহসা বিভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাল্মীকির প্রথম গীতি ধ্বনির ন্যায় উচ্চারিত হইল—দেবী, মা, তুমি ধন্য! বন্দেমাতরং!

(৮)

অতুলেশ্বর যখন নিতান্ত শিশু তখন তাঁহার পিতা রাজা ধর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাঁহার অভিভাবক পিতৃব্য নিঃসন্তান রাজা কর্ম্মেশ্বর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সন্তানের মতই স্নেহ করিতেন। কর্ম্মেশ্বর লোক মন্দ ছিলেন না—কিন্তু গান-দোষে তাঁহাকে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রসাদপুরের রাজাগণ চিরদিনই কলা-বিদ্যার অনুরাগী এবং উৎসাহদাতা। অতুলেশ্বরের পিতামহ রচিত সঙ্গীতাবলী বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর ন্যায় পূর্ব্বাঞ্চলে সমাদরে গীত হইয়া থাকে। কর্ম্মেশ্বরের যদিও রচনা ক্ষমতা নাই কিন্তু গানবাদ্য লইয়াই প্রায় তাঁহার সময় কাটে। যাত্রাদি পর্ব্বের ত কথাই নাই—সময় সময় কলিকাতা হইতে বাইজির দল—এবং থিয়েটারও আসে। তিনি শুনিয়াছিলেন—কলিকাতার কোন ধনীভবনে হীরা বুলবুল নামে দুই সুবিখ্যাতা গায়িকার সহিত সঙ্গত করিতে গিয়া অদ্বিতীয় পাখোয়াজি গোলাম আব্বসের এত পরিশ্রম হইয়াছিল যে গান শেষে হার্টফেল করিয়া তখনি তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় গোলাম আব্বসের অভাবে তিনি যে বাইজি দুই জনকে রাজসভায় ডাকিতে আহ্বান করিতে পারিলেন না—এই আপশোষে তাঁহারও হার্ট ফেল করিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার মোসাহেবের দল মাঝে মাঝে সখের যাত্রাও করিত এবং তাঁহার সভায় কবির লড়াইও চলিত। এই যুদ্ধে তিনি যাহাকে বাহবা প্রদান করিতেন—তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইত। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল!

একটু ফিকা-রঙের খোস মেজাজে রাজা কহিলেন—"আজ অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠবে কিনা বল ত হে?"

একজন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গান ধরিল—

আমরা মোদের রাজারেই জানি;
সূর্য্য চন্দ্রের না ধারি ধার যমকে না মানি।
রাজা মোদের ঢালেন সুধা—
তৃপ্ত করেন তৃষ্ণা ক্ষুধা—
সর্ব্বপ্রাণে স্তুতিগানে—তাঁরেই বাখানি।

তাহার গান শেষ হইলে দ্বিতীয় জন গায়িল—

শ্রীবৃন্দাবনে ওগো শ্রীবৃন্দাবনে—
ধরা দিল অমার শশী রাধিকার সনে।
যে দেখিল সেই মজিল—প্রাণে মনে।

তৃতীয় জন তখন উঠিয়া গায়িল—

প্রেমের বন্যা উথ্‌লে যখন উঠেগো মনে—
আধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে—
অমাবস্যায় ভরা চাঁদ ফোটে
আলোক-ফুলের ঝরণা লোটে—বিশ্ব-ভুবনে।

রাজা ইহাকেই সভা-কবির শিরোপা প্রদান করিলেন।

রীতিমত নেশা সুরু হইলে কিন্তু রাজা ভিন্ন লোক হইয়া পড়েন—তখন তাঁহাকে সামলান দায় হইয়া উঠে। সে সময় প্রায়ই তিনি পদব্রজে ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার দল-বল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে। অগ্রগামী রাজার আর্শে পার্শে পশ্চাতে থাকিয়া—মোসাহেবগণ কেহ ধরেন আলবোলা (নলটি কিন্তু রাজার মুখে) কাহারো হাতে মদের বোতল, কেহ লইয়াছেন গ্লাস, কাহারো গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিতেছে—কেহ বা সেতার তান-পুরা বহিয়া চলিয়াছেন। এই অপরূপ দৃশ্য যে দেখে তাহার হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অতুলেশ্বর কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিতেন। ছুটিতে যখন বাড়ী আসিতেন তখন কর্ম্মেশ্বর খুব সাবধান হইয়া চলিতেন—এরূপ দৃশ্য তাঁহার নজরে পড়িত না।—একবার মাত্র অসময়ে বাড়ী আসিয়া খুল্লতাতের এই অবস্থা তিনি দেখিয়াছিলেন—কিন্তু দেখিয়া তাঁহার হাসি পায় নাই, হৃদয় লজ্জায় বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সমবয়সী দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয়কে তখন হাসিতে দেখিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক গৃহে গিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। মদ্যপানে মানুষ যে কিরূপ পশুর অধম হইয়া পড়ে এই দৃষ্টান্তে তাহা তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি মদ স্পর্শ করিতেন না।

কর্ম্মেশ্বর পারতপক্ষে ইংরাজদের সহিত মিশিতেন না—কিন্তু দেখা হইলে নত হইয়া সেলাম করিতে বা মন যোগান' কথা কহিতে ত্রুটি করিতেন না। জমীদারের পক্ষে কার্য্য উদ্ধারের ইহাই অব্যর্থ পলিসি বলিয়া সেকালে জ্ঞান ছিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষাদীক্ষার ফলে অতুলেশ্বরের ভিন্নরূপ মেজাজ হইয়া উঠিল, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা করিতে আসিলে বা তিনি কাহারও নিকট গমন করিলে কখনো সেলাম করিতেন না। কিন্তু যেখানে কর্ম্মেশ্বর করেন সেলাম—সেখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেবল সেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে দেখায় নিতান্ত অদ্ভুত, সেইজন্য, কর্ম্মেশ্বরের নিকটে কোন ইংরাজ আসিলে তিনি সেখানে অনুপস্থিত থাকিতেন। তাহাতে কর্ম্মেশ্বর অসন্তুষ্ট

হইতেন। একদিন কিন্তু অতুলেশ্বর ধরা পড়িলেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন—কর্ম্মেশ্বর দুই একজন ইংরাজের সহিত বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। কুমার আসিতেই তিনি পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু অতুল ত কই কাহাকেও সেলাম করিল না! হাস্যমুখে সকলকে হাত বাড়াইয়া দিল! কর্ম্মেশ্বর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—একদিন যে এ শিক্ষার ফলভোগ করিতে হইবে তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না। অতুলেশ্বর যে-কয়দিন বাড়ী রহিলেন পুনঃ পুনঃ নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। সে কয়দিন ভাবনায় চিন্তায় মদের গ্লাস পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে উঠিল না—সভা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল,—মোসাহেবগণ সুখে নিদ্রা দিয়া বাঁচিল। কর্ম্মেশ্বরের উপদেশের ফল যে নিতান্তই বিফলে পরিণত হইয়াছে,—অচিরাৎ রাজা একদিন বুঝিতে পারিলেন। ইলবার্ট বিলের সময় বালক অতুলেশ্বর প্রসাদপুরে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং হইলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট। ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া কর্ম্মেশ্বরের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন কেজানে, রাজ্যে ঘোষিত হইল—অতুলেশ্বর এখন নাবালক—তাঁহার কোন কার্য্যকলাপ রাজার অনুমোদিত নহে। কুমার অতুলেশ্বরের কোন কার্য্যে প্রজাগণ যেন যোগদান না করে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতুলেশ্বর ব্যায়াম-সমিতি প্রভৃতি দেশহিতকর নানা সভা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন; রাজার আদেশে—অকালে সে সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। কুমার মর্ম্মপীড়িত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি নানারূপ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন—কিন্তু নিজের রাজ্যে তিনি নগণ্য পুরুষ হইয়া রহিলেন। কার্য্যতঃ কিছু করিতে না পারিলেও গানে কবিতায় তাঁহার দেশানুরাগ প্রকাশিত হইতে লাগিল।—

কর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হইল—জ্যোতির্ম্ময়ী জন্মিবার দুই একমাস মাত্র পূর্ব্বে। অতুলেশ্বর যখন রাজা হইলেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। তাহার পর রাজার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার জীবনের গতি কোন্ দিকে ফিরিয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন।

* * * * *

প্রাসাদসংলগ্ন নবনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া রাজা অতুলেশ্বর লেখাপড়া করেন। গৃহে জানালা দরজা অনেকগুলি, দক্ষিণের জানালা হইতে শীতকালে ধলেশ্বরী রজত-পাতের মত নয়নে প্রতিভাত হয়,—বর্ষাকালে ইহাই বিশাল আকার ধারণ করিয়া তেজস্বিনী স্রোতস্বিনী মূর্ত্তিতে রাজবাটীর অনতিদূরে বহিয়া যায়। গৃহের সম্মুখেই মুক্তছাদ—সকালে সন্ধ্যায় রাজা এইখানে বসিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করেন—জ্যোতির্ম্ময়ী সময় পাইলেই পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। আসিবার সময় বাগান হইতে তাঁহার জন্য কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনে। রাজা প্রভাতে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত আকাশে নবোদিত সূর্য্যের শোভা দেখিয়া তন্ময়ভাবে স্বরচিত গানে ঈশ্বর-বন্দনা করেন—বালিকা মুগ্ধভাবে তাহা শুনিয়া

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে। বৈকালিক বায়ু সেবনের পরেও প্রশান্ত রজনীতে পিতাপুত্রীতে এইখানে আসিয়া বসেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে রাজা কন্যাকে সেতার বাজাইতে বলেন; কখনো কখনো তাহার হাত হইতে সেতারটা টানিয়া লইয়া নিজেই বাজাইতে থাকেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার শিক্ষা হইয়াছে তাহার পিতারই নিকটে। মাঝে মাঝে রাজা যখন কন্যার সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বিপদ গণে। বিদ্যাশিক্ষায় সে যে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছে না—ইহা সে নিজে বেশ বোঝে।—রাজা কিন্তু পরীক্ষায় অসন্তুষ্টির কোন কারণ পান না। প্রথম প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিতের কাছে যখন দেশ-পীড়নের কথা শুনিত তখন পিতার নিকট সে কথা তুলিয়া তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিয়া লইতে চাহিত! রাজা কিন্তু এ সকল কথায় তাহাকে প্রশ্রয় দিতেন না—প্রায়ই রাগ করিয়া বলিতেন "এ-সব খবর তোমাকে কে দেয়? খবরের কাগজ পড় বুঝি? আমি বারণ করে দেব—বাড়ী ভিতরে যেন খবরের কাগজ না যায়। বেশ জেনো খবরের কাগজের অনেক কথাই অতিরঞ্জিত, তোমার কোমল মনের উপর ওসব খবরে অনর্থক আঘাত দিচ্ছে!" জ্যোতির্ম্ময়ীর মত বুদ্ধিমতী বালিকার নিকট পিতার মনের ভাব অপ্রচ্ছন্ন রহিল না,—তিনি যে কেন এসব কথা কন্যাকে জানিতে দিতে চান না—তাহার সে বেশ একরকম অর্থ করিয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার গেজেট—এ কথা কিন্তু একেবারেই পিতাকে জানাইল না, বুঝিল তাহা হইলে তাঁহার কাজটি থাকিবে না। জ্যোতির্ম্ময়ী এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সাবধানে পিতার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল—এই এক বিষয়ে তাহার মনের ভাব পিতার নিকট অপ্রকাশিত রাখিল, ভাবিল যদি বিধাতা দিন দেন তখন পিতাকেও তাহার পক্ষ করিয়া লইবে।—

রাজা আপাততঃ উল্লিখিত ঘরে টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কবিতার বই একখানা খোলা কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; গৃহদেয়ালে টাঙ্গান রাজপরিবারের বহু তৈলচিত্রের মধ্যে একখানির দিকে তিনি তন্ময়ভাবে চাহিয়াছিলেন। চিত্র খানি তাঁহার প্রমাতামহী যোগমায়া দেবীর বাল্যকালের অশ্বারূঢ়া মূর্ত্তি। রাণী যোগমায়ার পিতা সোমেশ্বর রায়ের অঙ্কিত ছোট পেনসিল-স্কেচ হইতে পরে ইহা একখানি বড় তৈল চিত্রে পরিণত হইয়াছে। এ-চিত্রে বালিকা যোগমায়া যোদ্ধৃপুরুষের সাজে সজ্জিত। তাঁহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ, বক্ষে ঢাল, হস্তে বর্ষা এবং কটিদেশে তরবারী বিলম্বিত। এই সাজে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাণী যোগমায়া দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য রাজ্য মধ্যে প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি এই যে, একসময় রাজ্যে বর্গি আক্রমণের বড় ভয় হইয়াছিল। তখন রাজজামাতা—রাণীর স্বামী দেশে ছিলেন না। দেওয়ান কোতোয়ালের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে বালক পুত্রদুইটির সহিত রাণীকে অন্যত্র কোথাও পাঠাইয়া দিয়া পণদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা বর্গিকে বিদায় দিবেন। কিন্তু রাণী

এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর নায়করূপে অশ্বারোহণ করিলেন। সৈন্যগণের মধ্যে তখন প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনী যুদ্ধে আগত এই বিবেচনা করিয়া ভীত বর্গীদল রাণীমূর্ত্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হইল।

যোগমায়ার এই অশ্বারূঢ়া মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আজ রাজা ভাবিতেছিলেন এই তেজস্বিনী রাণীর বংশধরগণ এখন কিরূপ হীনবল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজভবনে প্রহরীর হস্তেই বন্দুক তলোয়ার শোভা পায়! শীকারের সময় ছাড়া সৈন্য বেশে অস্ত্র ধরিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এখন নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে তিনি যাহাই বোঝান, নিজের মনে এ হীনতা তিনি খুবই অনুভব করেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মাত্র—উষ্ণ শোণিত পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর চঞ্চল হইয়া ওঠেনা, মরিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না।

একসময় কন্যার ন্যায় অত্যাচার-পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে তেজ সে উত্তেজনা তাঁহার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণী যোগমায়া দেবীর ছবিখানি রাজা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখনই তিনি এ ছবি দেখেন তাঁহার মনে হয় এ যেন জ্যোতির্ম্ময়ীরই প্রতিকৃতি। পুরুষ-বেশ ধারণ করিলে বুঝি বা তাহাকে ঠিক এই রকমই দেখাইবে। বড় ইচ্ছা করে এইরূপ সাজে তিনি কন্যার একখানি ছবি তুলিয়া লন। যোগমায়া দেবীর সেই বসন ভূষণ শিরস্ত্রাণ এখনও মাতার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে তাহাও তিনি জানেন। তবে এ প্রস্তাবে মাতা পুত্রে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিবে —সেই কল্পনাতেই তিনি এ ইচ্ছাটাকে মনে মনেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাতে বাধা পড়িল; দ্বারস্থ হরকরা গৃহপ্রবেশ করিয়া রাজাকে জানাইল যে "গৃহকর্ম্মচারী জ্ঞানবাবু জরুরি সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।"

রাজাদেশে জ্ঞানবাবু সমীপস্থ হইয়া কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার, মহারাণীর অনন্ত-ব্রতের ভেট ভট্টপল্লীতে পৌঁছিয়া দিয়া পুরোহিত ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"এ সংবাদ আমাকে দিতেছ কেন? মহারাণীকে গিয়া বল।"

"পুরোহিত জখম হইয়া আসিয়াছেন?"

"জখম! কেন? কে করিল?"

"ভুল ক্রমে তিনি মেমসাহেবদের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন—তাই—"

"তাই—কি? মেমসাহেবরা মারিয়াছে নাকি?"

রাজা অধীর হইয়া ব্যঙ্গের ভাবে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে জ্ঞানবাবু বলিলেন "সত্যই মেমসাহেবরা তাঁহাকে মারিয়াছেন—কুকুরের শিকল দিয়া মারিয়া ঠাকুরকে রক্তারক্তি করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ।"

ক্রোধে রাজার শোণিত সর্ব্বাঙ্গে যে টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তিনি আরক্ত নয়নে বলিলেন—"কোথায় তিনি?"

"আমরা তাঁহাকে রাজবাড়ীর উঠানে আনিয়া ফেলিয়াছি।"

রাজা দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইলেন। উঠানে আসিয়া দেখিলেন,—বৃদ্ধ পুরোহিতের আহত মস্তক কোলে রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে—সম্মুখে বসিয়া চিকিৎসক আহত স্থানে পটী বাঁধিতেছেন—আর রাজবাড়ীর লোকেরা উঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর আদেশে ফরমাস খাটিতেছে। রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যোতির্ম্ময়ী নত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল—তাহার যত্নরুদ্ধ অশ্রুজল আর বাঁধ মানিল না, আরক্ত নয়ন হইতে ক্রুদ্ধ করুণার ধারা উথলিয়া উঠিয়া তাহার গণ্ড বাহিয়া পুরোহিতের মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। সেই তেজস্বিনী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রাজার পুনরায় মনে হইল, যোগমায়ার আত্মাই নবশরীর ধারণ করিয়া বুঝি জ্যোতির্ম্ময়ীতে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে!

এই সময় ভিড় ঠেলিয়া পণ্ডিতমহাশয় জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বন্দে মাতরং!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিদায়ের পর

(Alice Meynell)

বলেছি বিদায় বাণী হ'ল বহুদিন,
নিবেদিত তুমি সে আমার,
শুধু তব নাম-মন্ত্র মর্ম্ম মাঝে লীন
অন্তরের আনন্দ অপার!
কোন্ ধর্ম্ম ধরি আমি উঠিব আবার
তোমারে রাখিয়া দ্বীপান্তরে?
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি যে আমার,
স্বর্গের সোপান স্তরে স্তরে!
প্রতি তীর্থ পথ দ্বারে তুমি যে প্রহরী,
অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মন্দিরে,
আমার আরতি পূজা ধ্যান চিত্ত ভরি
জাগে শুধু তোমারেই ঘিরে!

ভ্রান্তি ত্যজি এক পদ হ'লে অগ্রসর
তোমারেই হেরি আরো কাছে,
সম্মুখ যাত্রার পথে, ভরি চরাচর
তোমারি করুণা জাগিয়াছে!
কেমনে সরাব দূরে, কিসাধ্য আমার
তোমারে করিতে বিসর্জ্জন?
পূর্ণ করি দিবা রাত্রি আলোক আঁধার
নিয়মিত করিছ জীবন!
প্রাণের কামনা আশা সম্পদ শোভার
পরিপূর্ণ মিলিত ত্রিধারা,
সব ধায় তোমাপানে আজি একাকার
অবারিত জাহ্নবীর পারা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বরলিপি

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে।
সুখ বা দুঃখ দিতে কে আছে ধরণীতে,
একেলা পড়ে আছি মরু স্থলে।
(১) আমিও কোন্ ভুলে মালিকা গাঁথি ফুলে,
পরাতে মধুরাতে কাহার গলে,—
আমিও রচি গান ললিত নব তান
নিভৃতে গায়ি মরি কিসের ছলে।
(২) আমিও কি আশায় বিজনে সাজি হায়,
বাসনা ব্যথা বহি মরম তলে,
আমিও কাঁদি হাসি, কাহারে ভালবাসি
মোরে কে মনে করে আপনা ব'লে॥

রচনা—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী স্বরলিপি ও সুর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

II ২ সা সা। ৩ র্সা –া –া। ধা ণা। ১ ধপক্ষা পা –া I
আ মা রো ০ ০ আঁ খি কে০ ন ০

I ২ রা –গা। ৩ –মা –পা –া। মা মগমা। ১ রা সন্া –সা II
ভা ০ ০ ০ ০ সে গো০০ জ লে০ ০

II ২ সা রা। ৩ গা –পা –া। নর্ধা র্সা। ১ র্সা র্সা –নধা I
সু খ বা০ ০ ০ দুঃ খ দি তে ০

I ২ ধা না। ৩ র্সা –র্রা –া। র্সা র্নসা। ১ ধা পক্ষা –পা I
কে আ ছে ০ ০ ধ র ণী তে০ ০

I ২ পা পা। ৩ পা –া –ধা। মা পা। ১ মা গা –মরা I
এ কে লা ০ ০ প ড়ে আ ছি ০০

I ২ রা গা। ৩ –মা –পা –া। –মগা –মা। ১ রা সন্া –সা II
ম রু ০ ০ ০ ০ ০ স্থ লে০ ০

৪২শ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা স্বরলিপি ৫৯৩

II ২ সা সা। ৩ রা –া –া। রা –া। ১ রা রা –া I
(১) আ মি ও ০ ০ কোন্ ০ ভু লে ০
(২) আ মি ও ০ ০ কি আ শায় ০ ০

I ২ রা গা। ৩ মা –পা –া। গা গমা। ১ রা সা –া I
(১) মা লি কা ০ ০ গাঁ থি ফু লে ০
(২) বি জ নে ০ ০ সা জি হায় ০ ০

I ২ সা সা। ৩ রা –জ্ঞা –া। রা –সা। ১ ণধা –া পা I
(১) প রা তে ০ ০ ম ধু রা০ ০ তে
(২) বা স না ০ ০ ব্য থা ব০ হি ০

I ২ ধা সা। ৩ সা –া সা। রগা –মপা। ১ –মগা –রা –া I
(১) কা হ র ০ গা লে০ ০০ ০০ ০০ ০
(২) ম র ম ০ ত লে০ ০০ ০০ ০০ ০০

I ২ পা পা। ৩ নধা –না –র্সা। র্সা র্সা। ১ র্রসা –া –নধা I
(১) আ মি ও০ ০ ০ র চি গান ০ ০
(২) আ মি ও০ ০ ০ কাঁ দি হা সি ০

I ২ ধা না। ৩ র্সা –র্রা –া। র্সনা র্সা। ১ ধা –পক্ষা –পা I
(১) ল লি ত ০ ০ ন০ ব তান্ ০০ ০
(২) কা হা রে ০ ০ ভা০ ল বা সি০ ০

I ২ পা পা। ৩ পা –া –ধা। মা পা। ১ মা গমা –রা I
(১) নি ভৃ তে ০ ০ গা য়ি ম রি০ ০
(২) মো রে কে ০ ০ ম নে ক রে০ ০

I ২ রা গা। ৩ মা –পা পা। মগা –মা। ১ –গরা –সন্া –সা II
(১) কি সে র ০ ছ লে০ ০ ০০ ০০ ০
I সা রা। গা –া পা। ধনা –র্সর্রা,। –র্সনা –ধপা –ক্ষপা II
(২) আ প না ০ ব০ লে' ০০ ০০ ০০ ০০

way so exact an image of what you have just seen, just as you have seen it, that you may say, as a young American Sculptor, a pupil of Rodin, said to me on seeing for the first time a picture of Whistler's "Whistler seems to think his picture upon canvas—and there it is!" or you may find with Sainte Beuve, writing of Goncourt, "the soul of the landscape."—the soul of whatever corner of the visible world has to be realised." অর্থাৎ সাহিত্যে অথবা চিত্রকলায় ইম্‌প্রেশনিষ্ট এমন একটা অভিনব ও আকস্মিক দিক হইতে এইমাত্র তুমি যাহা দেখিয়াছ এবং যেমনটি দেখিয়াছ তার প্রতিরূপের আলোকপাত করিবেন যে, হুইস্‌লারের ছবি প্রথম দেখিয়া রোঁদা-শিষ্য এক আমেরিক্যান্ মূর্ত্তিকার যে কথা আমায় বলিয়াছিল, তোমাকেও সেই কথাই বলিতে হইবে। সে বলিয়াছিলঃ—হুইস্‌লার যেন চিত্র-পটের উপর তাঁর চিত্রটিকে ধ্যান করিয়াছেন —ব্যস্, অম্‌নি দেখ চিত্রখানি! গন্-কোর্ট সম্বন্ধে সাঁতব্যভও তাহাই বলিয়াছিলেন যে তাঁর ভূচিত্রে (landscape) ভূচিত্রের আত্মাকে পাওয়া যায়—দৃশ্যমান জগতের যে কোন কোন্‌টিই শিল্পীর উপলব্ধিগম্য, তার যেন আত্মস্বরূপটিকে পাওয়া যায়। এই যে দৃষ্টির ভিতরে দৃষ্টি, ছায়াভাসের ভিতরে ছায়াভাস, আলোকের অন্তর্মর্ম্মনিহিত আলোক—এই ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্ আর্ট-সাহিত্যে অধুনা যথেষ্ট বিকাশমান। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আধুনিক আর্ট-সাহিত্যের একটিমাত্র ধারা। ইহা ভিন্ন—পার্ণেশিয়ানিজ্‌ম্, সিম্বলিজ্‌ম্, ইমাজিস্‌ম্, পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজ্‌ম্, ফিউচারিজ্‌ম্ প্রভৃতি আর্ট-সাহিত্যের অন্যান্য বিশিষ্ট রূপ ও ধারাও আছে। এবং এ সকলই ন্যূনাধিক পরিমাণে অবনতিশীল আর্টের রোগ-লক্ষণ-পর্য্যায়ের মধ্যেই পড়ে। আর্থার সাইম্‌নস্ বলিয়াছেন যে, এ কালের এই সব সাহিত্য যতই সুন্দর ও অভিনব হউক না কেন, ইহা অভিনব সুন্দর এবং ঔৎসুক্যজনক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নয় ("a new and beautiful and interesting disease"।)

বার্ণাড শ এই কথাটাই মানিতে নারাজ। তিনি বলেন ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকলারীতি যখন প্রথম দেখা দিল, তখন লোকে তার রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তার নিন্দা করিল বটে, কিন্তু কালক্রমে দু-চারজন কলারসিকের প্রশংসাবাণী শুনিতে শুনিতে তারাও অবশেষে বোঝ ফিরাইল। তখন দাঁড়াইল এই যে, নিতান্ত পোটো ছবিতে (daub) শিল্পী অক্ষমতাবশতঃ যে অঙ্গসমাবেশ ঘটাইতে অপারগ হইয়াছে, তার সঙ্গে আর ইম্প্রেশনিষ্টের তথাকথিত প্রমাণ-রহিত অঙ্গ-সমাবেশ-রহিত ছবিগুলার পার্থক্য সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু এই অজ্ঞতাসুলভ রসগ্রহণের বিকৃতির জন্য ইম্প্রেশনিষ্ট কোন মতেই দায়ী নন্। ঠিক্ তেম্‌নি "ইব্‌সেনিজ্‌ম্" প্রভৃতি যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত ও আয়ত্ত না হইবার দরুণ, তাদের সম্বন্ধে নানা ভীতিপূর্ণ সংস্কার ও বিরুদ্ধভাব প্রাকৃত সাধারণের মনে পোষিত হইতেছে।

বার্ণাড শয়ের এই কথাগুলি আমার ত মনে হয় খুবই ঠিক। ম্যাক্সনর্দো লিখিয়াছেন যে, আধুনিক কাব্যে প্রতিধ্বনিপ্রিয়তা একটা রোগবিশেষ। সুইন্‌বার্ণ তার উদাহরণ। ছন্দকে বাজাইবার জন্য, ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিবার জন্য, শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনির আড়ম্বর আধুনিক কবিতার একটা রোগলক্ষণ। নর্দোর এই কথার প্রতিবাদে বার্ণাড শ লিখিয়াছেন যে স্বয়ং শেক্‌স্‌পিয়ারের অনেক গানে,—যেমন with hey, ho, the wind and the rain—গানটির অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে—এই ধ্বনিপ্রিয়তা দোষ দেখা যায়। ডি, জি, রসেটির Blessed damosel নামক কবিতার বিগ্রহরূপ যদি অবনতিশীল ও ক্ষিপ্ত (insane) আর্টের লক্ষণ হয়, তবে গ্যয়টে তাঁর Faustএর দ্বিতীয় খণ্ডে বিগ্রহের ছড়াছড়ি ও ছয়লাপ সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক কবি হন্ কেমন করিয়া? বার্ণাড শয়ের এই জবাবেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া শক্ত।

আসল কথা, ইংরাজিতে যেমন প্রবাদ-বচন আছে যে, give the dog a bad name and then hang it,—সেইরূপ 'কিছুনা কিছুনা' বলিতে বলিতেই আমরা কোন জিনিসকে বিকৃত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি।

যে সব কারণে এ যুগের আর্টকে অবনতি-শীল বলা হয়, সে সব কারণ প্রাচীন আর্টেও বিদ্যমান, ইহা বার্ণাড শ দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন আর্টে ঐ লক্ষণগুলিই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে নাই, বার্ণাড শয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। গ্যয়টে, শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কবিদের মধ্যে আধুনিক আর্টের অনেক রূপের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে সব আভাস আভাসেই পরিসমাপ্ত, প্রাচীন কাব্যে তাদের বিকাশও নাই বিশিষ্টতাও নাই। এ যুগে সেই আভাসিত দিক্‌গুলি যদি একান্ত হইয়া আর সকল দিক্‌কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তবেই কারো কারো মনে তাকে রোগ-লক্ষণ বা বিকার লক্ষণ অথবা অবনতি বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যদিচ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আগে এ কথাটাও ভাবা দরকার যে, ঐ লক্ষণগুলি অভিনব বলিয়াই কি এরূপ কঠিন বিচারযোগ্য হইতেছে, না সত্যই উহাদের মধ্যে বিকারধর্ম্ম সুপরিস্ফুট?

আমরা পূর্ব্ব মাসে বলিয়াছি যে, আর্টের অভিব্যক্তি শেষ হইয়া যায় নাই। হিগেল মনে করিয়াছিলেন যে রোমান্টিক আর্টেই আর্টের শেষ পরিণতি। কিন্তু তার পরে কত ধারায় আর্ট ধাবমান ও পূর্য্যমান, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলীয়মান তাহা বিচার করা যাইবে তখন, যখন কালের একটা পরিপ্রেক্ষণ (perspective) পাওয়া যাইবে। দীর্ঘকালের শেষে যখন কতকটা দূরে এই সব আর্ট-সাহিত্যকে ফেলিয়া দেখা সম্ভাবনীয় হইবে, তখনই আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলীয়মান তার বিচারও সম্ভাবনীয় হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

সচিত্র রামায়ণ। শ্রীযুক্ত ভবান রাও শ্রীনিবাস রাও ওরফে বালা সাহেব পণ্ডিত পান্ত্ প্রতিনিধি, বি-এ, অন্ধ্-অধিপতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও, চিত্র সন্নিবেশিত। বোম্বাই, মাজগাঁও, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা, হ্যারিসন রোড, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়। মূল্য বারো টাকা। এ গ্রন্থখানি বাঙ্লায় এক অভিনব সামগ্রী। অন্ধ্-অধিপতি রামায়ণের বিবিধ বিষয়ে বিবিধ চিত্র স্বহস্তে আঁকিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। রামায়ণের ঘটনা ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে কাহারো অবিদিত নয়—তাহারই মূল ঘটনাগুলির চিত্র এ্যালবামের ধরণে এ-পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। এ গ্রন্থে ষাটখানি ছবি আছে—সবগুলিই বেশ ভাল মোটা কাগজে ছাপা এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। ছবির রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান প্রভৃতি নিতান্ত নির্জ্জীব নয়, তাহাদের মুখে-চোখে ভাব আছে; আর্ট-হিসাবে উৎকৃষ্ট না-হইলেও চলনসই। প্রত্যেক ছবির পর-পৃষ্ঠায় ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। য়ুরোপ হইলে এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় কাব্যের চিত্রাবলী এতদিনে বিস্তর বিক্রয় হইয়া যাইত। বাঙ্লাদেশেও রসজ্ঞ বাঙালীর অভাব নাই, তাই আমাদের আশা আছে, বাঙ্লাদেশের ঘরে-ঘরেও ফটো-এ্যালবামের মত এই রামায়ণের চিত্র-এ্যালবাম্খানি সযত্নে রক্ষিত হইবে—গৃহের শোভা ইহাতে বাড়িবে, তদ্ভিন্ন রামায়ণের ঘটনাবলীর ও পাত্র-পাত্রীর সহিত অল্পবয়স হইতেই ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত সহজ উপায়ে পরিচয়-লাভেরও সুযোগ ঘটিবে। বহিখানির বাঁধাই ছাপা প্রভৃতিও চমৎকার—মাঝারি আকারের পেষ্টবোর্ডের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত, অর্থাৎ ভিতর-বাহির দুইই লোভনীয়। তবে গ্রন্থের মূল্য এ-দেশের পক্ষে একটু বেশী হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিং। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। এখানি শিখ-গুরু গোবিন্দের জীবন-চরিত। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে শিখজাতির অভ্যুত্থানের বিচিত্র ইতিহাস গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন-কথার সহিত বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় বিবৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যগুলির মূল্যও যথেষ্ট আছে—কারণ লেখক গুরুমুখী ভাষা জানেন, এবং শিখজাতির প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ। রচনার গুণে এই জীবন-চরিতখানি উপন্যাসের মতই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। পাতিয়ালার মহারাজ [illegible] ভূপেন্দ্র সিং মাহিন্দার বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহোদয় এ গ্রন্থ-প্রকাশে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এজন্য তিনি প্রত্যেক বাঙালীরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। গ্রন্থে [illegible] শিখগুরুর চিত্র ও মানচিত্রাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—[illegible] নানা দিক দিয়া গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের জীবন-চরিত-বিভাগে সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ-বাঁধাই ভাল।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমন্মথ কুমার দত্ত, আড়ংপাড়া খুলনা। কলিকাতা মেট-কাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই [illegible] সিকা মাত্র। এখানি কবিতার গ্রন্থ। ভূমিকা-লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "পর পর প্রাণ-প্রতিম চারিটি পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কবি তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে এই মর্ম্মব্যথাগুলি গ্রথিত করিয়াছেন। সুতরাং এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমরা [illegible] মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না—তবে অপর কবিতা-গুলিতে কিছু মাত্র বিশেষত্ব নাই। ভূমিকা-লেখকের গবেষণা-মিশ্রিত শ্লেষাত্মক টিপ্পনী পাঠ করিয়া দুঃখের সহিত বলিতেছি, সেগুলিতে "প্রসাদ-গুণ" কিছুমাত্র দেখিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



সচিত্র।
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৫২শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ [৮ম সংখ্যা

এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়

এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়
বরণের ব্যবসায়,
পড়ে গেল ছাই !
রঙের অধিকার, লাল নীল নাই আর
ম্লান মুখে ধরা কাঁদে তাই !
বনের বসবাস ছিল যেথা বারো মাস
আজ সেই দেব-দারু দীন,
খালি গায়ে হিমবায়ে কাঁপে সারাদিন !

নেড়া গাছ, যেন ভাঙা খাঁচা
পরাণ পাখীটি কাঁচা
সবুজ পাখায়,
উড়ে গেছে কোন দেশ, কুলায়ের অবশেষ
পড়ে শুধু করে হায় হায় !
নিরালা বাঁকাচোরা শুকান বাকলে মোড়া'
ঝড়ে উড়ে চলে যাবে বলে',
দিন নাই, রাত নাই, অনিবার দোলে !

ফুলবন আজিকে উজাড়,
ঝুমকো ফুলের ঝাড়
দোলেনা সোহাগে,
কামিনী সে অভিমানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
কাঞ্চন প্রবাসী তার আগে !
মাধবী, মালতী, বেলা, চলে গেছে ভেঙে মেলা,
উদাসিনী হয়েছে পারুল,
ফোটেনা তাম্বূল-রাগ দাড়িম্বের ফুল !

পলাশের অনল কোথায় ?
গোলাপের আল্‌তায়
ধুইল শিশিরে,
সোনার বরণ চাঁপা, পাতার তলায় চাপা
একেবারে মরে' গেল ফিরে !
বর্ণ-গন্ধে প্রাণ ভরা ললাটে চন্দন পরা
করবীরা নিয়েছে বিদায় !
"কুসুম ফুলের রং" আর না বিকায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বাংলার ব্রত

(২)

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যেরা যাঁদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্য-ব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্য্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্যব্রত'—ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়-ভরসা হাসি-কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য্য এবং না-আর্য্য বা 'অন্য-ব্রত'দের মধ্যে সবদিক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও, আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস; ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। পর পর স্তর পড়তে-পড়তে মাটির উপরের অংশ ক্রমে নীচে চলে যায়; তখন পুরোনো জিনিস বা পৃথিবীর পুরোনো জীব-জন্তুর সন্ধান নীচের তলায় গিয়ে জমা হয়। মানুষের ইতিহাসেও তাই। মানুষ যতই অদল-বদলের মধ্যে দিয়ে চলুক না কেন, এমন কতকগুলো জায়গা থাকে যার [illegible] মানুষের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সঞ্চিত জিনিস[illegible] ভাঁজের পর ভাঁজ পরে-পরে সাজা[illegible] থাকে;—আলমারিতে তার নিজের ব্যবস্থা[illegible] ছেলেবেলা থেকে বুড়ো-বয়সের পর[illegible] কাপড়, খেলার টুকিটাকি, নানা গাত্রা[illegible] আসবাবের মতো।

সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেক[illegible] গঙ্গামৃত্তিকা, গোরিক—এমনি সব নানা মা[illegible] একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তার[illegible] বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতু স্তর; তা[illegible] তলায় অন্য-ব্রতদের এই সব ব্রত—একেবা[illegible] মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডা[illegible]

এই সব অতি-পুরাতন ব্রত এখ[illegible] কেমন করে বাঙালীর ঘরে-ঘরে করা হ[illegible] এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সমাজ অন[illegible] যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুর[illegible] তার সঙ্গে-সঙ্গে তো বদলে যায়নি! সে[illegible] কুল, তার পূর্ব্বে, এবং তার—তার—তা[illegible] পূর্ব্বে যা, আজও তা। অন্ততঃ বেশির ভা[illegible] মেয়েলী কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরদা[illegible] সঙ্গে নাতনীর এবং ঠাকুরমাতে ও ত[illegible] ঠাকুরমাতে খুব তফাৎ নেই। শিবের বি[illegible] যেভাবে হয়েছিল Bar-at-law'র বিয়ে[illegible] ঠিক সেই-ভাবেই এখনো ঘট'ছ! [illegible] আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও এম[illegible] Roman Law'র মতো অনেক জিনিস[illegible] এখনো অটুট ভাবে কাজ কচ্ছে দেখা যায়

[illegible]েই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে পুরুষানু-[illegible]ে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য্য নয়। [illegible]ুষ মরে যায়, জাতিকে জাতি লোপ পেয়ে [illegible], কিন্তু তাদের ইচ্ছা এবং চেষ্টার প্রবাহ [illegible]দের পরেও বর্ত্তমান থেকে কাজ করতে [illegible]কে! আমেরিকার আদিম অধিবাসীর [illegible]ন দুর্দ্দশা ক্রিশ্চিয়ান জাতিরা করলে যে [illegible]দের পৃথিবীতে থাকবার জায়গাই রইল [illegible]! কিন্তু তাদের শিল্প, তাদের মন্দির-মঠ, [illegible]ড়াড়ি কতক মাটির মধ্যে, কতক মাটির [illegible]পরে জঙ্গলে, কতক বা লোকস্মৃতির অন্তঃ-[illegible]রে বেচে রইল,—যারা মারলে তাদেরই [illegible]ে যারা মরল তাদের ইতিহাস বলবার [illegible]ল! বাংলার এই ব্রতগুলিও তেমনি [illegible]মাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্য-[illegible]চারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা;—কখনো আল-[illegible]নার শিল্পে, কখনো কবিতা নাটক ও সাহিত্য [illegible]নার মধ্যে দিয়ে, কখনো-বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের [illegible]ক দিয়ে। এই ছবির উপরে কালে [illegible]কালে যে-সব নানা-মুনির আঁচড়, নানা [illegible]ক থেকে নানা জঞ্জাল পড়েছে সেগুলিকে [illegible]স্তে আস্তে না সরিয়ে দেখলে আমরা কিছু [illegible]র দেখতে পাবো তাতো বোধ হয় না।

মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যেভাবে [illegible]নুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত-অনুষ্ঠানের আদর্শ [illegible]বলে নিতে পারি কি না প্রথমে সেটা দেখা [illegible]যাক; এবং সেটা যদি আদর্শ ব্রত না হয় [illegible]তবে ব্রতের আদর্শটা পৃথিবীর কোথাও [illegible]খুঁজে পাই কি না দেখি। মানুষের এবং [illegible]সব জীবেরই বিচিত্র কামনা, চরিতার্থ হবার [illegible]পূর্ব্বে, বিচিত্র চেষ্টায় আপনাকে ব্যক্ত করে। [illegible]ক্ষা জাগল, জলপান ক্রিয়াটি কল্লেম, তৃষ্ণার শান্তি হল। ক্ষুধা বা খাবার কামনা জাগল, আহার্য্য সংগ্রহ, রন্ধন-ব্যাপার পরিবেষণ ও ভোজন-ক্রিয়া করলেম, ক্ষুধার শান্তি হল। ধনের কামনা জাগল, কাজ করতে দেশ বিদেশ চল্লেম।—এইভাবে মানুষ আজীবন কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। কি অনুষ্ঠান করলে যে কি হবে, তার কতক মানুষ আপনা-হতেই আবিষ্কার করে; কতক দেখে শিখে নেয়; কতক ঠেকে শিখে নেয়—এমনি। জীবনের কামনা যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থামছে ততক্ষণ, ধরতে গেলে, সমস্ত জীবজন্তুতে মিলে বিশ্ব-ব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান করছে। জলের কামনা কচ্চি কিন্তু উঠে গিয়ে জলের ঘটটা না ধরে, ঘরে বসে জলখাবার ভঙ্গীটা অনুষ্ঠান করছি, কিম্বা জলের কামনায় চলেছি উনুনের ধারে—এ হলে কামনা চরিতার্থ হলনা, কাজেই যে অনুষ্ঠান কল্লেম সেগুলো ভুল অনুষ্ঠান হল। ব্রতে জলের কামনা জলরূপে এবং পান-ক্রিয়া হয়ে ফোটা চাই। এবং যখন এটা হল তখনই কামনায় ক্রিয়া যোগ হয়ে ঠিক ফলটি পাওয়া গেল। মানুষের এই সহজ-বিবেচনার ছাঁচেই কতকটা তাদের আদিকালের ব্রতগুলি ঢালা হয়েছে দেখা যায়।

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া; কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক-উদ্দেশে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান

হয়ে উঠছে। একের সঙ্গে অন্য দশ-জনে কেন যে মিলছে—কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে—সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে এখন যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না; তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম; আর-একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাৎ। ব্রত যে কি ও ব্রত যে কেন তা এদেশের এবং অন্য দেশের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে বৃষ্টি কামনা করে একটি ব্রত ঃ—একটি মাটির চাকৃতি বা সরা; তার একপিঠে আল্পনা দিয়ে সূর্য্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ক্রশের মত একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্যদিনের সূর্য্যকে বুঝিয়ে; এরি চারিদিকে সরার কিনারায় সব পর্ব্বতের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধান-ক্ষেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; তারি ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্যপিঠে লাল-নীল-হলদে রঙের বাণে ঘেরা চক্রাকার সূর্য্যমূর্ত্তির আল্পনা লিখে পূজা বাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আল্পনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।

আমাদের দেশের একটি ব্রত 'ভাদুলী'। এটি বৃষ্টির পরে আত্মীয়-স্বজনের [illegible] থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জল-পথে [illegible] নিরাপদে ফিরে আসার কামনায়। ভাদু মূর্ত্তি—জোড়াছত্র মাথায় জোড়া-নৌ লিখে, চারিদিকে নদী সমুদ্র কাঁটাবন [illegible] হিংস্র জন্তু নৌকো ইত্যাদি আল্পনায় [illegible] এই ব্রত করা হয়। এক-একটি আল্প চিত্রে ফুল ধ'রে, এবং সেই আল্পনা কামনার প্রতিচ্ছবি একটির পর একটি সেই কামনাটি উচ্চারণ ক'রে—যেমন আল্পনায় ফুল ধরে বলা "নদী, কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও"—এমনি প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন আল্প রকম-রকম ছড়া ব'লে ফুল ধরে ভাদু প্রণাম ক'রে ব্রত শেষ। যেমন এই ব্র তেমনি অন্য অন্য ব্রতেও কখনো ফুল, সিঁদুরের ফোঁটা, এমনি নানা জিনিষ একটি আল্পনার উপরে রেখে ছড়া-কা শেষে ব্রতকথা শোনা হচ্ছে এ দেশে করা। ব্রতের ফুল ধরায় আর পূজা দেবতার চরণে দেওয়ায় একটু তফাৎ র ব্রতে ফুল ধরার অর্থ এ নয় যে কি বাঘ মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্ত্তিকে ফু উপাসনা; নদীর কামনা শেষ, বনের শেষ এইটে মনে রাখবার জন্যেই ফুলটা কতকটা হিসেবের খাতায় লাল-পেন্সি দাগ—গণনা ঠিক রাখতে। যার উপর পড়লো তিনি সাক্ষী রইলেন যে ব্রতী কামনা জানিয়েছে; যেমন বসুধারা ব্র ছড়াটিতে স্পষ্ট বলা হল—

"অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি।

অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি॥"

দুই দেশের দুটি ব্রতের মধ্যে একই জিনিষ কতকগুলি রয়েছে। কিছু কামনা করে দুটোই করা হচ্ছে। কামনার প্রতিচ্ছবি আল্পনায়; যেমন জল-পথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আল্পনায় ব্যক্ত হচ্ছে। এমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন—"নদী নদী! কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।" এই হল—জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রতের পর সকল ব্রতীরা মিলে ব্রতকথা শোনা। ব্রতের এ অংশটার সঙ্গে কামনার যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানেরও যোগাযোগ ততটা নেই। কেননা দেখি কোনো ব্রতে কথা আছে, কোনো ব্রতে নেই; এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম্ম শেষ করে গল্পগুজব করা—গ্রামের পাঁচজনে মিলে। ব্রতে এই সবই রয়েছে—কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডণ শিল্প! এর মধ্যে ছড়াগুলি সব একরকম নয়; কোথাও দেখবো সেগুলি নাটকের মত পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্ক ভেদে সাজানো। যদিও খুব ছোট কিন্তু এই সব ছড়াকে অভিনয় করার উদ্দেশেই যে গাঁথা হয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়। ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণ-আকারে যখন দেখবো তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে সেটা নাটক কি ছড়া। ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্য্যন্ত পাচ্ছি। কাজেই ব্রতগুলি আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিষ নয় এবং শিল্প ও আর আর সভ্যতার লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া শক্ত এমন কোনো বর্ব্বর জাতির অন্ধ-বিশ্বাসের নিদর্শন বলেও এগুলিকে ধরব না।

আর্য্যেরা যাঁদের অন্য-ব্রত অকর্ম্মা দস্যু দাস ইত্যাদি বলছেন, এই সব ব্রত এবং ভারতবর্ষে শিল্প কলার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেই সব অন্যব্রতদের সম্বন্ধে অন্য রকম সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। যেমন বাস্তুবিদ্যা, ময়শাস্ত্র; এবং ময় ছিলেন দানব! আর্য্যেরা যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধে বিজয় কামনা করছেন, ততক্ষণ অন্য-ব্রতরা তাদের পুরী-সকল অস্ত্রশস্ত্রে পাষাণ-প্রাচীরে সুদৃঢ় করে তুলছে—ইন্দ্রকে খুসি করতে বসে না থেকে। এবং সে সময় তাদের মেয়েরা যে কি ব্রত করছে তারও কতকটা আভাষ 'রণে এয়ো' ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি ঃ—"রণে রণে এয়ো রব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।" এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্যব্রত হলেও আর্য্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নীচে ছিল তাতো বলা যায় না। রণচণ্ডীর যে মূর্ত্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত সুশোভন আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে করে তাঁদের অন্যব্রত ছাড়া, অকর্ম্মা অমন্ত এসব উপাধি দেওয়া চলেনা।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্য্যজাতি এই সব অন্য-জাতির চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হননি। জগৎ-সংসারের এক নিয়ন্তাকে

স্বীকার বৈদিক আর্য্যদেরও মধ্যে অনেক দেরীতে ঘটেছে। তার পূর্ব্বে জলের এক দেবতা; আগুনের দেবতা; মেঘের দেবতা; বৃষ্টির দেবতা; এমন কি মণ্ডুক পর্য্যন্ত। অন্য-ব্রতদের মধ্যেও এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের 'সূর্য্য' ইজিপ্তে 'রা' অথবা 'রাআ' মেক্সিকোতে 'রায়মী' বাংলায় 'রায়' বা 'রাঈ'। বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্য-ব্রতদের মধ্যে খুঁজে পাবো। নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে, নানা সব ঘটনা, মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য-কামনায়, সৌভাগ্য-কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে, কি আর্য্য কি অন্যব্রত সব দলেই,—এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রত-অনুষ্ঠানের আর-এক পরিচ্ছেদ আমরা পড়তে পাই। লোকে আর্য্যধর্ম্মের চরম এক-নিয়ন্তার-নিষ্কাম উপাসনায় গিয়ে পৌঁছে হিন্দু-ধর্ম্মের নানা দেবদেবী আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে;—সেই প্রাচীন অবস্থা, সেই অন্যব্রতদের সমান অবস্থায় আর-বার ফিরে যাচ্ছে মনের গতি! কেবল এইটুকু তফাৎ যে, এখানে অন্যব্রতদের দেবতাকে এবং সেই-সেই দেবতার ব্রত-অনুষ্ঠানকে আর্য্যদের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে, তাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। হিন্দুধর্ম্মের এই উদারতার পিছনে রয়েছে সম্পূর্ণ অনুদার ভাবটি,—সবাই নিজের নিজের ধর্ম্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কবলে; এবং এরি জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়া-জালের মতো দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষী দিচ্ছেন; যেমন ব্যাসদেব বলছেন—"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং, সগোত্রধর্ম্মং ন হি সংত্যজেচ্চ।" অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অবিরোধী; যে দেশ-ব্যবহার সেইটেই প্রথম পালনীয়; কিন্তু সগোত্র পরিত্যাগ করা উচিত নয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে স্ত্রীলোকদিগের হিন্দু-অনুষ্ঠেয় কার্য্য অর্থাৎ "যে যে কার্য্য তাহারা ধর্ম্মবোধে করিয়া আসিতেছে অথচ মুনিপ্রণীত কোন বচনপ্রমাণে যে সকল ব্যবহার ও ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়না তাহা যোষিৎ ব্যবহার সিদ্ধা" বলে ধরেছেন।

পশ্চিম-দেশে 'হোলির' উৎসব একটি অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। মেড়া পোড়ানোর মতো একটা অনুষ্ঠান এখনো Bohemiaর গ্রামে গ্রামে চলছে। সেখানে এই উৎসবকে বলে—"Driving out the death"– "In Bohemia the children carry out a straw puppet and burn it. While they are burning it they sing— 'Now carry we death out of the village, the New Summer into the village,'" &c. কিম্বা "We have carried away death and brought back life".

এই যে পশ্চিম-দেশের হোলি-উৎসব বা বসন্তের ব্রত, এটিকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে

ধরার জন্যে মীমাংসা-দর্শনে হোলিকাধিকরণ বলে একটা অধ্যায় লিখতে হয়েছে। এবং এই অধ্যায়ে যে-সমস্ত হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের বা ব্যবহারের বেদাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ পাওয়া যায়না সে-সমস্তই হোলিকাধিকরণে ন্যায় মূলক সিদ্ধ বলা হয়েছে। বিলাতের May pole আমাদের চড়ক; গ্রীসের Spring festival বসন্ত-উৎসব এদেশের হোরি; এবং চাঁচড় মেড়াপোড়ানো, শীতকে তাড়িয়ে বসন্তের আগমনের রূপক থেকে এসেছে। এই ঋতুর উৎসবের অনুষ্ঠানে কোথাও মেষ কোথাও ষাঁড়, কোথাও ভল্লুক এবং কোথাও বা মানুষ বলির প্রথা রয়েছে। এটিকে হিন্দুশাস্ত্রকার মেনে নিলেন এবং এর সঙ্গে সমস্ত লৌকিক ব্রতকে হিন্দুর বলে স্বীকার করেও নিলেন দেখছি; কিন্তু শুধু এইখানে শাস্ত্রকারদের কর্ম্ম শেষ হলনা; পুরানো এবং অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলোকে রূপান্তর করে শাস্ত্রীয় বলে চালাবার চেষ্টাও হয়েছে দেখি। আবার নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, অঘোর চতুর্দ্দশী, ভূতচতুর্দ্দশী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, এমনি কতকগুলি ব্রত তিথি-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিশেষ তিথিতে যদি কোনো পুণ্যকার্য্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুণ্য অর্জ্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে—এই হল ব্রতগুলির মোট কথা। আর কতকগুলি ব্রত হিন্দুদের দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য। যেমন অনন্ত ব্রত ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত,—পুত্র কামনা সর্পভয়নিবারণ এমনি সব কামনা করে। এগুলি মেয়েরাই করে; যেমন অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নিত্যষষ্ঠী, সুবচনী, শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মুলাই ইত্যাদি।

এই সব গ্রাম্য-দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কার্ত্তিকের ব্রত। ষষ্ঠীদেবী পুত্রদান করেন, কার্ত্তিকও তাই। তারপর কতকগুলি ব্রাহ্মণদের মন-গড়া ব্রত—যেমন দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি ধন-গছানো। এগুলি কেবল নৈবেদ্য আর দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারীরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান; সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন; ঘৃত দাড়িম্ব এইসব জিনিষ বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়—এই ব্রত-গুলির মূল-কথাটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়! তারপর, কতকগুলি ব্রত সম্পূর্ণ মেয়েদের সৃষ্টি; যেমন, আদর-সিংহাসন—স্বামীর আদর কামনা করে একটি স্বামীসোহাগিনীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আদর-আপ্যায়নে খুসি করা—এবং আরো অনেক অশাস্ত্রীয় ব্রত, ঋতুর উৎসব, এর মধ্যে আসছে। এই যেগুলি সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্রত, এইগুলিই হল লৌকিক বা লোকপরম্পরায় পুরাকাল থেকে দেশে চলে আসছে। এর মধ্যে শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুয়েরই জায়গা নেই। যদিও এইসব ব্রত অনেক শাস্ত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে তবু এখনো অনেক-গুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা লৌকিক-ব্রতের স্থান কেমন করে দখল করতে চাচ্ছে, নতুন-নতুন ব্রত এবং নিজেদের শাস্ত্র ও দেবদেবীকে এনে

সেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে হলে, আর-একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখতে হয়; সুতরাং দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝাবো।

আদর-সিংহাসন ব্রত—এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত :—"মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামী-সোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্ন পূর্ব্বক নিজগৃহে ডাকিয়া আনিয়া পিঠালির দ্বারা বিচিত্র সিংহাসন রচনা করিয়া তদুপরি তাহাকে উপবেশন করাইবে, নাপিতাঙ্গনা দ্বারা হস্তপদের নখাদি ছেদন করাইয়া অলক্তক রাগে চরণদ্বয় রঞ্জিত করিয়া দিবে এবং তৈল হরিদ্রা ও কবরী বন্ধন করতঃ সীমন্তদেশ সিন্দুর রাগে রঞ্জিত করিবে এবং পুষ্পমালা প্রদান পূর্ব্বক সুগন্ধ দ্রব্য গাত্রে লেপন করিবে, পরে মনোহর দ্রব্যজাত সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিবে। এইরূপে সমস্ত বৈশাখ প্রতিদিবস এক এক জন অথবা এক জনকেই আদর অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা। বর্ষ-চতুষ্টয় পূর্ণ হইলে উদ্‌যাপন!" স্বামীর সোহাগ কামনা করে এই মানুষ-পুজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারী-ব্রাহ্মণদের লোভ হল; অমনি তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন "ব্রাহ্মণাদর।" "মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন এক এক অথবা একই ব্রাহ্মণকে নানা উপকরণে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। চারিবৎসরে উদ্‌যাপন।" এমনি, মধুসংক্রান্তি মিষ্টসংক্রান্তি—নিজের কথা মিষ্ট হবে এবং শাশুড়ি-ননদের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হবে না এই কামনা করে মেয়েরা যেমন নিজেদের মধ্যে ব্রত করছে অমনি মধু আর মিষ্টান্নের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-মাছি আস্তে আস্তে এসেছে দেখি—'ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ লড্ডুক দান কর'—বোলে।

তারপর, গ্রাম্যদেবতার পূজোগুলি; যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপীর। এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানদের পীরকে লোকে যেমন পূজো দিতে আরম্ভ, অমনি তাঁকে সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম্ম দখল বসালেন! কিন্তু বাংলায় সত্যনারাণের যে পাঁচালী তাতে পীরকে মুসলমানী পোষাকেই দেওয়া হয়েছে। কথা পর্য্যন্ত উর্দ্দু, যেমন—"জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর" ইত্যাদি। এই মুসলমান পীরের উপাসনা ও সির্ণি ভট্টাচার্য্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে, কিন্তু এরি মধ্যে বাংলায় আজকাল ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা এই ব্রতে মুসলমানী অংশটাকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টায় রয়েছেন। "ব্রতমালা বিধানের" ভূমিকায় ভাটপাড়ার শ্রীবীরেশ নাথ শর্ম্মা লিখছেন—"সত্যনারায়ণের বাঙ্গলা পাঁচালী বহু পুরোহিতের অসম্মত বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা সন্নিবেশিত করিলাম না—"! পীরের সির্ণি বা ভোগটা হচ্ছে সুজি, বাতাসা, হিন্দুয়ানীতে বাধে না এমন সব জিনিষ; এবং পায়েসের দলে সেটা প্রায় চলে গেছে। এখন, বাংলা পাঁচালী, যেটা থেকে মেয়েরা পর্য্যন্ত সহজে বুঝতে পারে যে পীর তিনি পীরই;—বিষ্ণুও নন্ সত্যনারায়ণও নন্, সেই পাঁচালীটাকে লোপ করে দিতে পারলেই সত্যনারায়ণের হিন্দুত্ব নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে।

আর-কতকগুলি ব্রত; যার নামটা রয়েছে পুরোনো কিন্তু ভিতরের মাল-মসলা সমস্তই

তুন,—যে-ভাবে পেটেণ্ট ওষুধের নকল য়ে থাকে কতকটা সেইরূপে! কুকুটী তটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোট-াগপুরের পার্ব্বত্য জাতির এ ব্রতটি; কুকুটী লেন তাদের দেবী; এবং যেমন নানা হিন্দু দেবতাকে, তেমনি কুকুটী-দেবীকেও কালে লোকে পুজো দিতে আরম্ভ রেছিল। মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তজন্মী বহু-সন্তানলাভ হচ্ছে কুকুটী ব্রতের ল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন রে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে নুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানের যে ল্প তার সঙ্গে ব্রতকথার যে কামনা তারও মন নেই। সংস্কৃত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ল্প হল, যথা—আদ্যে আদি ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য যাবজ্জীবমর্য্যন্তম্ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী াষণ্ডধর্ম্মরাহিত্য পুত্রপৌত্র-ধনধান্যাতুলসর্ব্বসম্পত্তিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শিবলোকপ্রাপ্তিকামা যথাশক্তি যথাজ্ঞানং ভবিষ্যপুরাণোক্ত কুকুটী-ব্রতমহং করিষ্যে।" পাছে কুকুটী-ব্রত করে অহিন্দু-পুত্রসন্তান হয়, সেজন্য আগেই াবধান হওয়া হচ্ছে—"পাষণ্ডধর্ম্মরহিত ত্র" যেন হয়। তার পর "শিবলোকপ্রাপ্তি।" সেখানে কুকুটের আদি-পুরুষ যে ময়ূরের ানা, তর্কের বেলায় চাই কি, তাঁকে াজির করা যেতে পারে! অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবে আটঘাট বেঁধে পণ্ডিতেরা ব্রতকথাটিকে কাটা-ছাঁটা করতে বসলেন। ব্রতকথাগুলি হচ্ছে ব্রতটির উৎপত্তির ইতিহাস। সেটাকে ঠিক রাখলে তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা; এবং ব্রতকথাটা চল্‌তি ভাষায় বলা চাই, কাজেই ব্রতীর কামনা ও ব্রতের ফলাফল সেখানে ঠিকঠাক বজায় রাখা দরকার। শাস্ত্রে এই সমস্যার যে ভাবে মীমাংসা কল্লেন তা এই :—ফলটি পরিষ্কার রইলো—মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ হয়, দীর্ঘজীবী পুত্র হয় এবং সুখে কালাতিপাত ও অন্তে শিবলোক। এ ক'টা বেশ সহজে মিলিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ব্রতের উৎপত্তি নিয়ে পড়লেন। রাজা নহুষের রাণী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিতপত্নী মালিকা দেখলেন সরযু-তটে উর্ব্বশী, মেনকা এঁরা হাতে আটথী সুতোর আট-গাঁট দেওয়া ডোরা বেঁধে শিবপূজো কচ্ছেন। রাণীর প্রশ্নে অপ্সরাসকল উত্তর দিলেন তাঁরা কুকুটীব্রত কচ্ছেন। রাণী স্বচক্ষে দেখলেন শিবপূজো হচ্ছে কিন্তু শুনলেন যে সেটা কুকুটীব্রত। গল্পের বাঁধুনিতে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেল। তার পরে মালিকা আর চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান-প্রণালী জেনে নিলেন। এখানে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটাই দেওয়া হল। তার পর ব্রতের নামটা কেন যে কুকুটীব্রত হল তার একটা মীমাংসা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার কল্লেন :—রাণী চন্দ্রমুখী ব্রত করতে ভুল্লেন এবং মালিকা ভুল্লে না। সেই ফলে চন্দ্রমুখী-সুন্দরী হলেন বানরী; এবং মালিকা হলেন ককুটী ব্রতের ফলে জাতিস্মরা কুকুটী। তার পর জন্মে জন্মে মালিকা ব্রত করে সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান; শেষে একদিন মালিকা দয়া করে চন্দ্রমুখীকে আবার ব্রত করতে শেখালেন। কুকুটী-জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন সেই জন্য ব্রতের নাম হল কুকুটী ব্রত! ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সব

কাঁকি সেগুলো যে পণ্ডিতেরা ধরতে পারেনি তা নয়। ফস্কা-গেরোকে আরো গেরো দিয়ে তাঁরা কসে কুকুটীব্রতের সবটাকে ভবিষ্য-পুরাণের সঙ্গে বাঁধলেন; ব্রতকথা আরম্ভ হল—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বার বার পুত্রশোকে দেবকী রোদন কচ্চেন দেখে লোমশ মুনি তাঁকে এই কুকুটীব্রতকথা বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ এক রকমের প্রক্রিয়া, যেখানে ব্রতের নাম হুবহু বজায় রেখে তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির ইতিহাস একেবারে বদলে ফেলা। আর-একরকমের কারিগরি হচ্ছে নামটা পুরো নয় তো আধাআধি বদলে দেওয়া—অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রেখে! প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় এরূটা মিটমাটের চেষ্টা এই রা'ল দুর্গা ব্রতটি। হরপার্ব্বতী পাশা খেলছিলেন; হঠাৎ শিব পাশা ফেলে বল্লেন—'কার জিৎ?' দুর্গাও বল্লেন—'কার জিৎ?' বড়ুর ব্রাহ্মণ ছিলেন পাশে, বলে উঠলেন—'মা'র জিৎ।' অমনি শিবের অভিশম্পাতে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি। দুর্গার দয়া হল। তিনি তাঁকে সূর্য্য-অর্ঘ দিয়ে রা'ল দুর্গার ব্রত করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানে সূর্য্যও রইলেন, দুর্গাও রইলেন। সূর্য্যের প্রাচীন নাম রা' বা রা'ল বোঝালে এটি সূর্য্যপূজা; কিন্তু "রা'ল দুর্গা" বল্লে এটি দুর্গার ব্রত। এই ভাবে 'অথ ব্রতোৎপত্তি' বিবরণ লেখা হ দুই দেবতারই মান বজায় রেখে যেমন—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।
ভক্তিবাহনে প্রভুদেব দিবাকর।
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার।
শুন সবে সর্ব্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা সূর্য্যের চরিত।
(ইত্যাদি)

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কি কি প্রক্রিয়ার তার কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। ব্রতগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখার কাজ সহজ নয়। প্রকাণ্ড একটা ব্রতপ্রক না লিখলে শাস্ত্রপুরাণের জট ছাড়ি আমাদের দেশের হিন্দুধর্ম্মের পুরা পূর্ব্বেকারও ব্রতগুলির নির্ণুৎ চেহারা করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি "আর্য্যগৃহের এবং আর্য্য-হৃদয়ের ছবি সেটা ঠিক। আর্য্যের চেয়ে বরং অনার্য্যের অন্য-ব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রত আল্‌পনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় সুস্পষ্ট যাচ্ছে। অনার্য্য-অংশ শাস্ত্রীয়-ব্রতগু মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলো হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্রমন্ত্রের আবরণে ঢাক চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু সব-সময়ে সে সফল হয় নি দেখি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলঙ্কী

এবার পূজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে থি, গাঁয়ের শিবতলার ঘাটে লোক একেবারে গিস্‌ করছে। শুনলুম, সেখানে নাকি -একজন সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়ে সেছে, আর তাকে দেখে গাঁয়ের যত-সব ক্ষার ভক্তির সাগর একেবারে উথ্‌লে ঠেছে।

সাধু-সন্ন্যাসীর জন্যে আমার একটুও থাব্যথা নেই। হাতের ঐ ত্রিশূল ঘুইয়ে রের ভিতরে তারা প্রণামী আদায় করে; বার ঐ ত্রিশূলই উঁচিয়ে এবং খুঁচিয়ে রের বাইরে তারা নির্জ্জন পথের একলা-থিকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়! তাদের ঐ ইমাখা দেহ আর গেরুয়া-রঙের কাপড়, -সব হচ্ছে পুলিস ভোলাবার ছদ্মবেশ! ণ্ডা-বদ্‌মায়েসকে দেখ্‌লেই চেনা যায়, তাই দের আমি ততটা ভয় করি না—যতটা র করি এই ছদ্মবেশী সাধু-সন্ন্যাসীদের। .... কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর নামে কী মোহ ছে জানি না, তাই এ-দেশের সুধু মূর্খ ল নয়,—পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের এই বস্ত 'ক্যারিকেচার'গুলির পদতলে মাথা কিয়ে দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব!

আমার এক শিক্ষিত বন্ধু আছেন, তিনি র সন্ন্যাসী-গুরুকে ভক্তি করেন দেবতার ত। গুরুকে এতটা ভক্তি করার কারণ নতে চাইলে তিনি সম্ভ্রমে উচ্ছ্বসিত হয়ে লন, "তুমি জান না হে, আমাদের গুরু চ্ছন অসাধারণ লোক! তিনি একাসনে বসে পাঁচবোতল মদ, দশ-ছিলিম গাঁজা, একটা আস্ত পাঁটা খেয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে হজম করতে পারেন!" আমি বল্লুম "এইজন্যে তুমি তাঁকে ভক্তি কর?" তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ।"... ... ...

বিকালবেলায় কি কর্‌ব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, যাই, একবার ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে শিবতলার ঘাটের সন্ন্যাসীটিকে দেখে আসি। সারাদিন লোকমুখে সন্ন্যাসীর যে-রকম গুণগান শুন্‌ছি, তাতে-করে' লোকটার মিথ্যা ভড়ং আর বাজে বুজরুকি ভেঙ্গে দেবার জন্যেও মনের মধ্য থেকে একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল!

শিবতলার ঘাটে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। সেই জনতার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্‌লাদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা আর মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা নারীজাতির কাছে একবিষয়ে সমান-ঋণী; —অন্তঃপুরের নির্ব্বিচার উদারতার গুণেই আজ-পর্য্যন্ত এঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচেবর্ত্তে আছেন!

চারপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে আজ এখানে লোক এসে জুটেছে—সেই শশব্যস্ত জনতার মধ্যে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের ভস্মাবৃত দেহ ও লট্‌পটে জটাজুট যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, প্রথমে তা কিছুতেই আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লুম না।... ... ...

অবশেষে যখন ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ

জটাজুট,—সন্ন্যাসী-ক্লাবের এই অপরিহার্য্য ইউনিফর্ম্ দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দান কর্‌লুম, তখন হঠাৎ দেখা গেল, বটতলার বাঁধানো রোয়াকের উপরে যে লোকটির পায়ের তলায় এতগুলো লোক মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়ে মর্‌ছে, তার মাথায় জটাজুটের বহর বা গায়ে কাঠকয়লার ছাই—এ-সব কোন জ্বালা-জঞ্জাল নেই! পাশেই ত্রিশূল আর ভিক্ষার ঝুলি আছে কিনা দেখবার জন্যে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লুম—কী আশ্চর্য্য, সেখানে সুধু একটা দামী চাম্‌ড়ার পেটমোটা ব্যাগ পড়ে হাঁস্‌ফাস্ কর্‌ছে!

ভেক্ নেই, ভিক্ষে মিল্‌ছে! কিন্তু একটু ভাব্‌তেই এই সন্ন্যাসীটির ব্যবসাবুদ্ধি যে কতটা ধারালো, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ জটাজুট প্রভৃতির কাছে ক্রমাগত ঠকে-ঠকে লোকের ভক্তি ক্রমেই শ্রান্ত ও 'অবিশ্বাসী' হয়ে পড়েছে—অতএব এখন ভোল্ না-ফেরালে সন্ন্যাসের ব্যবসা আর ভালোরকম চলা শক্ত!

ইতিমধ্যে 'আতাই-কোলা'র ছোটতরফ এসে সন্ন্যাসীর সাম্‌নে দণ্ডবৎ হয়ে, ঝনাৎ করে' এক গিনি প্রণামী ছাড়লেন। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ স্বরে প্রতি-নমস্কার করে' বল্লেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন!" ... ...হুঁ, ঠাকুরটির ভদ্রতা আর ব্যবসা-বুদ্ধি দুইই দিব্যি টন্‌টনে দেখ্‌ছি! ইনি চালাকের মত প্রণাম ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বোকার মত প্রণামী ফিরিয়ে দেন না!

একটু তফাতে বসে-বসে মজা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। কত লোক এল, কত লোক গেল। সন্ন্যাসী কারুকে ওষুধ দিলেন, কারুকে দুটো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করেই বিদায় কর্‌লেন। অনেকে হাত দেখাতে এল, কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লেন ও-সব গোণা-টোনা! তাঁর আসে না। কেউ-কেউ বন্ধ্যা নারীর ছেলে হবার জন্যে ধর্ণা দিয়ে পড়্‌ল, সন্ন্যাসী এঁকে বলে তাদের মুখবন্ধ করে' দিলেন যে খোদার উপরে খোদ্‌কারী করা তাঁর ব্যবসা নয়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বটতলা থেকে ভক্তের দল ক্রমেই কম্‌তে লাগ্‌ল। আমি কিন্তু তখনো উঠ্‌লুম না—এই সন্ন্যাসীটি কি দরের লোক তা না জেনে আমার যেতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না।

বটতলা যখন প্রায় জনশূন্য, সন্ন্যাসীর চোখ তখন আমার উপরে পড়্‌ল। খানিক-ক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে সন্ন্যাসী হঠাৎ হেসে উঠে বল্লেন, "আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেন না, তখন এখানে বসে মিছে সময় নষ্ট কর্‌ছেন কেন?"

আমি একেবারে হতভম্ব!

সন্ন্যাসী আবার হেসে বল্লেন, "আপনি পূজোর ছুটিতে সবে আজ কল্‌কাতা থেকে এখানে এসেছেন, এসেই আমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে সুরু করেছেন? ছিঃ, মানুষ হয়ে মানুষকে এত সহজেই কি অবিশ্বাস কর্‌তে আছে ফণীবাবু?"

তাই ত, অবাক কর্‌লে যে! আমি এঁকে অবিশ্বাস করি, আমি কল্‌কাতায় থাকি, পূজোর ছুটিতে আজই দেশে ফিরেছি, আমার নাম ফণী, সন্ন্যাসী যে সমস্তই ঠিকানা বল্‌ছেন! যে দু-চারজন দর্শক তখনো

...খানে বসে ছিল, বিষম বিস্ময়ে তাদের ...খ যেন কোটরের ভিতর থেকে ঠিক্‌রে ...ড়বার মত হয়ে উঠল!

তবে কি এ সন্ন্যাসী খাঁটি লোক—সত্যিই ...ক এঁর দৈবশক্তি আছে?... ... ... হঠাৎ ...ন্ন্যাসীর সাম্‌নের থালায় একরাশ টাকার ...কে আমার নজর পড়ল—সঙ্গে-সঙ্গে আমার ...নটা ফের রুখে আর বেঁকে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী খরচোখে আমার হাব-ভাব ...নরীক্ষণ কর্‌ছিলেন। যেন আমার মনের ...থা বুঝতে পেরেই তেম্‌নি হাস্‌তে-হাস্‌তে ...ল্‌লেন, "ফণীবাবু, আপনি ভাবচেন যে, ...লোকের কাছে প্রণামী আদায় করে' যে-...লোকের দিন চলে, সে নিশ্চয়ই ভণ্ড, চোর, ...জোচ্চোর! কেমন, আমি ঠিক বলেছি ...ক না?"

সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী? আমি লজ্জায় ...থা হেঁট করলুম।

—"ফণীবাবু, যান, বাড়ী গিয়ে আপনার ...উন্‌টেন পেন দিয়ে, আপনি যে সবুজ ...কালিতে লেখেন, সেই কালিতে পকেটবুকে ...ড়-বড় করে' লিখে রাখুন-গে যে, মানুষকে ...ালো করে' না-চিনে অবিশ্বাস করা ...মহাপাপ!"

আমি ফাউন্‌টেন পেনে সবুজ কালিতে ...লিখি, এটাও সত্য!

সন্ন্যাসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "ফণী-বাবু, এ টাকা আমি নিজের পেট-ভরাবার ...জন্যে নিচ্চি না—এ টাকায় আমি দরিদ্র-নারায়ণের পূজা কর্‌ব।... ... সন্ধ্যা হোলো, ...এখন বাড়ী যান। কাল বৈকালে আবার ...দি আসেন ত, আমি খুসি হব। এখানে কাঙালী ভোজন হবে, আপনি তাতে আমার সাহায্য করবেন।"

আমি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে একখানি পাঁচ টাকার নোট রেখে অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "আপনার দরিদ্র-নারায়ণের পূজায় আমার এই সামান্য অংশ গ্রহণ করুন।"

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন, "আপনার মঙ্গল হোক্।"

... ...

খুব ঘটা করে' কাঙালী-ভোজন হয়ে গেল। সুধু পেট-ভরে খাওয়া নয়—সেই সঙ্গে প্রত্যেক কাঙালী এক-একখানি করে' নতুন কাপড় ও চাদরও পেয়ে, হাসিমুখে সন্ন্যাসীর নামে জয়ধ্বনি কর্‌তে-কর্‌তে বিদায় হ'ল।

কাঙালী ও দর্শকের দল যখন একে-একে চলে গেল, সন্ন্যাসী তখন আস্তে-আস্তে ঘাটের কিনারায় গিয়ে নদীমুখো হয়ে বসে পড়লেন।

পূর্ণিমার রাত্রি,—তরল জ্যোৎস্নার চিকণ রৌপ্য-রঙে তুলি ডুবিয়ে, চাঁদ তখন কালো মেঘের ধারে-ধারে ঝল্‌মলে আলোর পাড় এঁকে দিচ্ছিল।

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে' শেষটা তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াগুম;—এই সন্ন্যাসীটির মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখ্‌বো,—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে!

গায়ের উপরে আমার ছায়া পড়তেই সন্ন্যাসী চম্‌কে উঠে মুখ তুল্‌লেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "আপনি এখনো যান-নি!"

—"না, আপনার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে না।"

—"তাহলে বসুন।"

সন্ন্যাসীর পাশে ঘাটের পৈঠার উপরে বসে পড়লুম।

একটু চুপ করে' থেকে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "আপনার দেখ্‌চি আমার উপরে খুব বিশ্বাস হয়েচে! যারা যত সহজে অবিশ্বাস করে, তারা তত সহজে বিশ্বাসও করে!"

আমি মৃদুস্বরে বল্‌লুম, "আপনার অলৌকিক শক্তি দেখেও আপনাকে যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে—"

বাধা দিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "অলৌকিক শক্তি দেখে সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস! তাহলে যাদুকরের মত মহাযোগী আর কে আছে ফণীবাবু?"

—"কিন্তু যাদুকররা যে ভেল্কী দেখায়, সেটা যে একটা লোকঠকানো ব্যাপার!"

—"আমিও অলৌকিক কিছু দেখাই-নি, যা দেখিয়েছি তা আপনাকে ঠকাবার জন্যেই দেখিয়েছি। একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাক্‌লে আপনিও আমার মত শক্তি দেখাতে পার্‌তেন!"

—"কিন্তু আপনি আমাকে দেখে যে-সব কথা বলেছেন, তা কি যে-সে লোক বল্‌তে পার্‌ত?"

—"সবাই পার্‌ত! আপনার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমি বুঝেছিলুম, আপনি আমাকে সন্দেহ কর্‌ছেন।...আপনার বাঁ-হাতে উল্কীতে নামের তিনটি আদ্য অক্ষর আছে, এফ, এন, জি। এফ আর এন-এ সাধারণত ফণীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য নাম হয় না, সুতরাং আপনার নাম আন্দাজ করাও কিছু শক্ত নয়।...এই ছোট গ্রামটিতে আমি এসেছি আজ কুড়ি-পঁচিশদিন। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই আমাকে দেখতে এসেছে—সবাইকে আমি চিনি। কিন্তু আপনাকে আমি কাল বিকালে প্রথম দেখ্‌লুম, তা-থেকে বুঝলুম আপনি নূতন আগন্তুক। ... এখন পূজোর ছুটি পড়েছে, অতএব পূজোর ছুটিতেই আপনি এসেছেন। আপনার পায়ের চটিজুতো, মাথার চুল-ছাঁটা, গায়ের পাঞ্জাবী—সব কল্‌কাতার হাল ফ্যাসানের বাবুর মত, কাজেই ধরে নিলুম আপনি আস্‌ছেন কল্‌কাতা থেকে। আপনার পাঞ্জাবীর বুক-পকেটের একজোড়া দেখ্‌লুম, সবুজ কালির অস্পষ্ট দাগ। বুক-পকেটের ও-রকম জায়গায় ও-রকম কালির দাগ সহজে লাগে না—আপনি যদি ওয়াটার ফাউন্‌টেন পেন গুঁজে না-রাখেন। ... ফণীবাবু, আপনি কত সহজে ঠকে গেছেন দেখ্‌ছেন ত? সন্ন্যাসীর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যাশা কর্‌লে এম্‌নিভাবেই ঠক্‌তে হয়! আমরা—সন্ন্যাসীরা মানুষ মাত্র;—মানুষের মতই আমাদের দেখ্‌বেন।"

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে নদীর ওপারের দিকে তাকালেন। সেখানে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় দেদার আলোর ফুলঝুরি ঝরে পড়ছিল—আজ যেন জ্যোৎস্নার দেওয়ালি-উৎসব ভরপুর জমে উঠেছে!...সন্ন্যাসীর কথা শুনে, আমিও বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আবার ধীরে ধীরে বল্লেন, "আমার ওপরে আপনার বোধহয় আর-একটুও শ্রদ্ধা নেই?"

—"আপনি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?"

—"কারণ, আপনি এখন বুঝেছেন যে, আমি কোন অলৌকিক কাজ করতে পারি না!"

—"হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে আমি আপনাকে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি নিজেই যখন আমার সে ভ্রম ভেঙে দিলেন, তখন এটা বুঝতে পার্‌ছি, আপনিই যথার্থ সাধু—লোক-ঠকাতে আপনি সন্ন্যাস-ব্রত নেন-নি।"

সন্ন্যাসী শূন্য-দৃষ্টিতে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে খুব মৃদু স্বরে বল্লেন, "না, লোক-ঠকাতে সন্ন্যাস-ব্রত নিই-নি—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে!"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অবরুদ্ধ হাহাকারের প্রতিধ্বনি ছিল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসী যেন অর্দ্ধস্বগত ভাবে আবার বল্লেন, "কিন্তু আজও বুঝ্‌তে পারি না, আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়... ... আমার অবস্থায় পড়্‌লে অন্য লোক কী কর্‌ত?.....আমি তা জান্‌তে চাই!"

সন্ন্যাসী ঘাড় হেঁট্ করে' কি-যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। বেশ বুঝ্‌লুম, তাঁর মন এখন বর্ত্তমান থেকে একেবারে অতীতে ফিরে গেছে!

আচম্‌কা মাথা তুলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি বল্‌তে পারেন?"

এই অসংলগ্ন প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে আমি বল্‌লুম, "আপনি কি বল্‌ছেন!"

—"আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়?"

—"কিন্তু আপনি কী করেছেন?"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে মুখ ফিরিয়ে, শান্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে থেকে, বল্লেন, "ও, আপনি আমার কথা কিছুই জানেন না,—না? আচ্ছা, আজ তবে আপনাকে আমার কথা বল্‌ব,—দেখি, এই দুঃখ-স্মৃতির কথা প্রকাশ করে' দিয়ে প্রাণে একটু শান্তি পাওয়া যায় কিনা!"

—এই বলেই সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁর কথা সুরু করে' দিলেন,—তিনি কে, কাদের কথা বল্‌ছেন সে-সব পরিচয়ের ধার দিয়েও গেলেন না!

... ...

"কনকলতাকে সুধু আমি ভালোবাস্‌তুম না, তাকে আমি পূজা কর্‌তুম দেবীর মত। এই কথাটি আপনাকে মনে রাখতেই হবে... ... ...সুধু ভালোবাস্‌লে তার জন্যে আমি যা করেছি, হয়ত আমার দ্বারা তা সম্ভব হোতো না; কিন্তু সম্ভব যে হয়েছে তার আসল কারণ আমি তাকে পূজা কর্‌তুম, পূজা!

তার প্রতি আমার এই অন্ধ ভক্তির কথা, সে জান্‌ত। কিন্তু আমাকে সে কি চোখে দেখ্‌ত, আমি আগে তা জান্‌তে পারি-নি।.....খালি এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌তুম, আমাকে সে ঘৃণা কর্‌ত না!

লেখা-পড়ার দিকে তার কি টান্ ছিল! তাকে পড়াতে বসে, কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন তার কাছে পৃথিবীর নানা দেশের কথা, নানা জাতির কথা, নানা সাহিত্যের

কথা সরল ভাষায় বলে যেতুম, সে তখন কী আগ্রহভরে তার ডাগর চোখদুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ত! তার সে দৃষ্টি আমি এখনো ভুলি-নি!

দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমি তাকে পড়িয়েছিলুম! ছয়বৎসর আমার সাম্‌নে সে রোজই এসে দাঁড়িয়েছে· ···সেই ছয় বৎসরের দিকে আজও আমার সমগ্র জীবন একাগ্র হয়ে আছে! আমার চোখের সুমুখেই তার কিশোরী তনু-লতায় যৌবনের প্রথম ফুল ফুটে উঠেছিল; কৈশোর ও যৌবনের মিলন-ক্ষণে তার চোখে-মুখে রূপ-মহিমার যে অপূর্ব্ব শিখা জ্বল্‌তে দেখেছি, আজ-পর্য্যন্ত আর-কোথাও তার তুলনা পাই-নি।

তখন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে বাস কর্‌তুম। যখন যেখানে, যে কাজে থাক্‌তুম, কনকলতার স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌ত। পৃথিবীর এত দৃশ্য, এত শোভা, এত লোকজন, আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ, এ-সবই যেন মনে হ'ত তুচ্ছ, অকারণ, খাপ্‌ছাড়া, —স্রষ্টার সৃষ্টি যেন সার্থক হয়েছে একমাত্র ঐ কনকলতার জন্যেই!

··· ···আপনি বোধহয় বুঝ্‌ছেন, যার অবস্থা এমন,—সে কখনো মনের ভাব লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। তখনো পর্য্যন্ত মুখ ফুটে যদিও আমি কনকলতার কাছে মনের একটি কথাও খুলে বলি-নি, কিন্তু তবু হয়ত আমার মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। কনকলতা বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেছিল যে, তার প্রতি আমার যে ভাব, সেটা, ছাত্রীর প্রতি ঠিক শিক্ষকের ভাবের মত নয়। কারণ, পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ মাথা তুলে ইদানীং যখনি সে দেখ্‌ত, টেবিলের এক-কোণে বসে আমি নির্নিমেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছি, তখনি সে আবার ঘাড় হেঁট করে' ফেল্‌ত, আর তার সারা মুখখানি —কোঁকড়া চুলে ভরা ছোট্ট কপাল-খানি থেকে সুডৌল চিবুকের তলা পর্য্যন্ত,—একেবারে লালে লাল হয়ে উঠ্‌ত। এমন-কি, তার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'লে, অনেকসময়ে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়ে আর বল্‌তে পার্‌ত না! ···কনকলতার সঙ্গে আমার ত আর নূতন পরিচয় নয়, এর আগে সে আমাকে কতবার দেখেছে, আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে, প্রাণ খুলে কত কথাই না কয়েচে! এতদিন পরে আজ তবে তার এমন ভাব কেন? এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ কেন?··· ···হাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছে! এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই,—কারণ, এদিকে রমণীর অনুভূতি পুরুষের চেয়ে ঢের-বেশী সচেতন।

এখানে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। আমাকে সে কি ভাবে দেখে, তা জান্‌তুম না—খালি এইটুকু দেখ্‌তে পেতুম, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যখনি তার ঘরটিতে গিয়ে ঢুক্‌তুম, তখনি তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত;—আমি গেলে সে খুসি হয়, এই টুকুই আমার যথা-লাভ!

এর বেশী আর-কিছুর আশাও আমার ছিল না। আমি আর সে যত-কাছাকাছি থাকি না কেন, আমাদের মাঝখানে এ

সম্ভবের পাঁচিল দাঁড়িয়ে, তাকে আর আমাকে আজীবন আলাদা করে' রাখ্‌বেই রাখ্‌বে! কনকলতার সঙ্গে আমার বিবাহ যে অসম্ভব, তা আমি জান্‌তুম। সমাজের দোহারা এখানে বড় কড়া—কারণ, আমি ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ!

·····এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কনক-লতা কখনো আমার হবে না, এ-কথা জানেও, অন্তত এই ভেবেও আমি সুখী হতুম যে, তাকে ত আমি রোজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার মধুর বাণী, তার কোমল স্পর্শ থেকে ত আমি বঞ্চিত নই! কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সুখের মেঘেও আচম্বিতে আগুন লাগ্‌বার উপক্রম হ'ল!

কনকলতার বাপ-মায়ের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, তাঁদের মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে—এইবার তার আইবুড়ো নাম ঘোচানো দরকার। অতএব অবিলম্বে পাত্র-সন্ধানের ঘটা লেগে গেল।

নদীর ভাঙন-ধরা কূলের মত আমার মনের একদিকটা যেন ধ্বসে পড়্‌ল। বুঝ্‌লুম, বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আর কখনো চোখেও দেখ্‌তে পাব না! অথচ বিবাহে বাধা দি, এমন শক্তিও আমার নেই! কিন্তু, তবু—তবু—

দুর্ভাবনায় দু-রাত্রি আমি ঠায় জেগে-জেগে কাটিয়ে দিলুম।

হঠাৎ মোহিতকে মনে পড়্‌ল। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত তাতে-আমাতে একসঙ্গে পড়েছিলুম। তখনো তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়—তবে কালে-ভদ্রে, পথে-ঘাটে! মোহিত হরের ছেলে, এম-এ বি-এল পাশ দিয়ে আজকাল পুলিস-কোর্টে ওকালতি কর্‌ছে। দেখ্‌তেও ভালো, জাতেও কায়স্থ। আর, এখনো অবিবাহিত।

মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ দেবার জন্যে কোঁমর বেঁধে আমি ঘটকালি সুরু কর্‌লুম! পাত্রের গুণবর্ণনা শুনে কনকলতার বাপ খুসি হয়ে এককথার উপরে আর দু-কথা বল্‌লেন না! মোহিত প্রথমটা বিবাহে নারাজ হয়েছিল; কিন্তু বরপণের পরিমাণ শুনে তার উকিলী বুদ্ধি নিম-রাজি হয়ে পড়ল এবং স্বচক্ষে যেদিন সে মেয়েকে দেখ্‌লে, সেইদিনই একসঙ্গে মোহিতের চক্ষু, মত্ আর বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল!

আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম। ঠিক কর্‌লুম, মোহিতের সঙ্গে এখন দিনকতক খুব মেলা-মেশা করে' আমাদের আগেকার সম্বন্ধটা বন্ধুত্বে পরিণত কর্‌তে হবে। তাহ'লে বিবাহের পরেও কনকলতা আর আমার চোখের আড়াল হবে না! এই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ-ব্যাপারে আমি ঘটক সেজেছি! অন্য-কোথাও বিবাহ হ'লে কনক-লতাকে আমি ত আর দেখ্‌তে পেতুম না!

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি কী ভ্রম করেছিলুম! কনকলতাকে চোখে দেখ্‌তে পাব—এই সামান্য দুর্ব্বলতায় আমি তখন একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তখন জান্‌তুম না যে, সেই দুর্ব্বলতার শাস্তি আমাকে চিরজীবন ধরে ভোগ কর্‌তে হবে।

কিন্তু এক ভ্রমের উপরে আমি আবার আর এক ভ্রম করে' বস্‌লুম। এই দ্বিতীয়

ভ্রমের যে শোচনীয় ফল হয়েছিল, জন্ম-জন্মান্তরেও আমি কি তা ভুল্‌ব!

… …অনেক চেষ্টা করে'ও, কনকলতার বিবাহের আগের দিনে আমি আর কিছুতেই আপনাকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। কখনো যা করি-নি, সেদিন আমি মনের ঝোঁকে তাই করে' ফেল্‌লুম। জানি না, সেদিন আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম কিনা!

বিবাহের আগের দিনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কনকলতার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব জেনেও, তাকে ছাত্রীরূপে পেয়ে এতদিন আমি তবু কতকটা পরিতৃপ্ত ছিলুম; কিন্তু এ দুর্লভ অধিকার থেকে এখন আমি বঞ্চিত হ'তে চলেছি, এই দুশ্চিন্তা আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ক্রমেই কাতর করে' তুল্‌লে।

মনের আবেগে সেদিন কনকলতাকে এক চিঠি লিখে ফেল্‌লুম।—

"কনকলতা,

কাল থেকে তুমি আর আমার ছাত্রী নও—আমার কাছ থেকে সমাজ তোমাকে কেড়ে নেবে। তোমার অভাব আমি জীবনে কখনো ভুল্‌তে পার্‌ব না। এতদিনের পরিচয় একদিনে ভোলা যায় না,—আর, আমি ভুল্‌তেও চাই না! কারণ তোমাকে ভুল্‌লে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব,—আমার অন্ধকার জীবন-পথে তোমার স্মৃতিই যে এখন পূর্ণিমার চন্দ্রালোক!

কনক, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার এ প্রেম তোমার দেহকে তোমার রূপযৌবনকে প্রার্থনা করে না—এ চায় সুধু তোমার স্মৃতিকে পূজা কর্‌তে এইটুকু বুঝে আমার এই অভাগা প্রেম তুমি মার্জ্জনা কোরো।

তোমার বিবাহিত জীবন সুন্দর হোক্, সফল হোক্, সুখের হোক্, এই আমার শেষ-কামনা।"

চিঠি পড়ে কনকলতার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল, তা আমি জানি না।

কিন্তু এখন ভাবি, উপন্যাসের ছন্নছাড়া ও নির্ব্বোধ প্রেমিকের মত এই হা-হুতাশ-ভরা পত্রখানা, তখন আমি লিখেছিলুম কোন্ উদ্দেশ্যে? আসন্ন বিবাহ-লগ্নে আমি কি তাকে প্রকারান্তরে এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলুম যে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমিও আমাকে ভুলো না—স্বামীর সংসার গিয়েও তুমি আমার প্রেমকে মনে রেখ'? … …আমার অবস্থায় পড়্‌লে মানুষের মনে এম্‌নি চিন্তা আসাই স্বাভাবিক বটে! অবশ্য এতদিন পরে যদিও ঠিক করে' কিছু বল্‌তে পারি না, তবু মনে হয়, আমার পত্র-লেখার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। আমি বোধ হয়, আর কিছু না ভেবে-চিন্তেই, কনকলতাকে সুধু আমার মনের অবস্থাটা জানাতে চেয়েছিলুম। কেন না, আমার প্রতি কনকলতার মনের ভাব কি-রকম, আমি তা জান্‌তুম না। সুতরাং, বিবাহের পরেও সে যে আমাকে মনে রাখ্‌বে, এমন ভাব্‌বার কোন সঙ্গত কারণ আমার ছিল না।

ভক্ত সুধু আপন মনে দেবীকে পূজা করে'ই তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। তার পূজা গোপন হ'লেও দেবীর কাছে যে তা গোপন নেই অন্তত এটা জান্‌তে পার্‌লেও ভক্তে

প্রাণে একটা শান্তি ও সান্ত্বনার সঞ্চার হয়। এইজন্যেই, পূজা নিন আর নাই নিন, ভক্ত তার পূজার কথা দেবীকে নিবেদন কর্‌তে চায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের কথা এখন থাক্। আমার তখনকার মনের ভাব যাই হোক্, কনকলতাকে আমি যে পত্র লিখেছিলুম, এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে সত্য আর বড় কথা। এবং এই পত্র-লেখা যে আমার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হয়েছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। এর স্বপক্ষে আমার বল্‌বার কিছু নেই সুধু এইটুকু ছাড়া—যৌবন হচ্ছে অদূরদর্শী এবং প্রেম হচ্ছে অন্ধ!

… … … …

তারপর দু-বৎসর কেটে গেল। মোহিতের সঙ্গে এর-মধ্যে আমার মাথামাখি এতটা ঘনিয়ে উঠেছিল যে, তার বাড়ীতে আমার কাছে আর সদর-অন্দরের ভেদ ছিল না।

কিন্তু স্কুল থেকে মোহিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে, তার স্বভাব যে এতখানি বদ্‌লে গেছে, তা আমি জান্‌তুম না। স্কুলে মোহিত ছিল ঠিক ভ্যাড়ার মত শান্ত, আর খরগোসের মত ভীরু। পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে, আমরা—সহুরেরা তার ওপরে মুরুব্বিআনাও কর্‌তুম যৎপরোনাস্তি। সে মুরুব্বিআনার ঠ্যালা অনেকসময়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠ্‌লেও, সে বাড় হেঁট করে' মুখটি বুঁজে সব সয়ে থাক্‌ত। পরে দেখে-শিখে ক্রমে অনেকটা চালাক-চতুর হ'লেও, আমাদের সঙ্গে সে কোনদিনই সমান-সমান চল্‌তে সাহস করে-নি,—গুরুর যতটা প্রাপ্য, তার কাছ থেকে আমরা সম্ভ্রম পেতুম ঠিক ততখানি! তারপর সে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল; আমরাও দল-ছাড়া হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়্‌লুম, তা কেউ জানি না।

কলেজে ঢুকে মোহিত যখন দেখ্‌লে সেখানে সব চেহারাই তার অচেনা, তখন নিজের মুখ থেকে দীনতার মুখোস খুলে ফেল্‌তে একটুও দেরি কর্‌লে না। সে যে পাড়াগেঁয়ে ছেলে, চাল্‌চলনে কথায়-বার্ত্তায় কারুকেই তা জান্‌তে দিলে না।

পাড়াগেঁয়ে ছেলের পক্ষে সহরে আসা, মস্ত এক অগ্নিপরীক্ষা। সহুরে ছেলেরা তাদের পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে ঠাট্টা করে এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না—তাদের পরস্পরের ভিতরে অনেকটা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, লাঞ্ছিত পল্লী-বালকরা আপনাদের 'পাড়াগেঁয়ে' নাম ঘোচাবার জন্যে সহুরেদের অনুকরণ কর্‌তে শেখে। কিন্তু অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে অনেক সময়েই তারা আসলকে উঁচিয়ে যায়; এমন-কি, যেখানে সহুরে ছেলেরাও ভয় পায়, সেখানেও ভরসা দেখিয়ে তারা প্রতিপন্ন করে, তারা পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়! সহরে এসে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা প্রায়ই যে চরিত্র হারিয়ে ফেলে, তার আসল কারণ এই।

মোহিতেরও সেই দশা হ'ল। কলেজে ঢুকে প্রথমে সে একটু-একটু করে' মদ খেতে শিখ্‌লে। লেখাপড়ায় ভালো হ'লেও অন্যদিকে তার পতনের পথ তৈরি হ'তে লাগ্‌ল।… … তারপর সে পুলিস-কোর্টে ঢুক্‌ল। সকলেই জানেন, যাদের চরিত্রের তেমন জোর নেই, পুলিস-কোর্ট তাদের পক্ষে চুলোয় যাবার পথে মস্ত-এক আস্তানা। এই পুলিস-কোর্টে

এসে মোহিত প্রথমে এক অভিনেত্রীকে মক্কেল রূপে লাভ করে।... ... ...তার পরের কথা না বল্‌লেও চলে।.....মোহিতের জীবনে এখন প্রধান উপভোগ্য হচ্ছে, সুরা আর নারী।

সেই পাড়াগেঁয়ে মোহিত যে এখন এতটা সহুরে আর লায়েক হয়ে উঠেছে, এ খবর আমি ক্রমে-ক্রমে, নানান্ লোকের মুখ থেকে শুনে জান্‌তে পেরেছি।... ...মোহিত নিজে আমার সঙ্গে খোলাখুলি মিশলেও, তার চরিত্রের কালো দিকটা আমার কাছ থেকে চেপে রেখেছিল। কেন? বোধ-হয় সে এখনো আমাকে মনে-মনে ভয় বা মান্য করে! এটা খুবই স্বাভাবিক। এক-সময়ে কেউ যদি কারুর কাছে গোলামী করে' থাকে, তাহলে পরে সে স্বাধীন ও ধনী হ'লেও, পূর্ব্ব-প্রভুর সাম্‌নে গেলে, মাথাটা অন্তত একটু নীচু না-করে' থাক্‌তে পারে না। ... ...মোহিতেরও হয়ত তাই হয়েছে। স্কুলের সেই বাল্য-জীবনের কথা সে আজও ভোলে-নি। তাই সে এখনো নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে ভাব্‌তে সাহসী নয়।

কিন্তু মোহিতের চরিত্রের কথা যখন জান্‌তে পার্‌লুম, তখন আমার মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। জগতে আমার সব-চেয়ে যে প্রিয়তম, তাকে আমিই মোহিতের হাতে সমর্পণ করেছি, আমার চোখে-চোখে থাক্‌বে বলে। কনকলতার সঙ্গে মোহিত কেমন ব্যবহার করে? তার হাতে পড়ে' সে কি অসুখী হয়েছে?

চেষ্টা করে'ও জান্‌তে পার্‌লুম না। কনকলতার মুখ দেখে কিছুই ধর্‌বার-ছোঁবার যো নেই। মুখে দুঃখ-যাতনার কোন চি থাকা ত দূরের কথা—তাকে যখনি দে মনে হয়, তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন হাসি উৎস উথ্‌লে উঠ্‌ছে। তার হাসি-খুসি এ আগেকার চেয়ে ঢের-বেশী বেড়েছে—এ কি, অসম্ভব-রকম। কিন্তু এইটেই আ অস্বাভাবিক মনে করি! কনকলতা আ ত অমন কারণে-অকারণে, যখন-তখন হাসি হাস্‌ত না! স্বভাবতই তার স্বভা ছিল ধীর, স্থির, গম্ভীর। তার ঐ স্থিরতা আমার বেশী ভালো লাগ্‌ত। বয়স বাড়্‌তে থাকে, মানুষের ধীরতাও বেড়ে ওঠ্‌বারই কথা। কিন্তু তা না কনকলতার এমন উল্টো ধরণ কেন? সে ধীরতা, সে গাম্ভীর্য্য কোথায় গে আগে যে মাঝে-মাঝে অল্প অল্প মৃদু-হাস্‌ত, এখন সে এত উচ্চ রবে এত-বেশী হাসে কেন?... এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। আমার মনটা ভারি দমে গে —মানুষের হাসিকে আমি বিশ্বাস করি না। জানি, সংসারের অনেক অবরুদ্ধ অশ্রু, অনে গোপন হাহাকার, অনেক নীরব ক্রন্দন, ঐ এ হাসির ধারার মধ্যেই ছাইচাপা আগুনে মত ঢাকা থাকে! এ হচ্ছে গর্ব্বিত মানবে স্বভাব। পৃথিবীকে সে আপনার দুর্ব্বলতা দেখায় না।—হ্যাঁ, কনকলতার হাসি দেখে আমার ভয় হয়।

পর্য্যবেক্ষণের শক্তিটা আমার চিরকালই আছে। লোকের সাজসজ্জা দেখে, তার ভাব-ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে', তার মুখের দু

রুটে কথাবার্ত্তা শুনে প্রায়ই আমি তার ভাবের কথাটা বলে দিতে পারি। বন্ধু-বান্ধবরা আমার এই শক্তি দেখে অনেক-সময়ে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। অনেকে বল্‌তেন, ভালো ডিটেকটিভের যে-সব গুণ থাকা উচিত, আমার নাকি প্রচুর পরিমাণে তা আছে! কিন্তু যাক্ সে কথা।

—কনকলতার হাসি দেখে আর যে-ই বুঝুক, আমি ভুল্‌লুম না। আমার মনে একটা বিষম ধোঁকা লেগে গেল! সেই সন্দেহই আমাকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক করে' রাখ্‌লে!

কিছুদিন পরেই আমার সন্দেহ পরিণত হ'ল নিশ্চিত সত্যে।

সেদিন সকালবেলায় হাতে কোন কাজ না-থাকাতে, মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম মোহিত বেরিয়ে গিয়েছে আর কনকলতার নাকি অসুখ করেছে। অসুখটা কি জান্‌বার জন্যে বাড়ীর ভিতরে গেলুম। আমার গলা পেয়ে কনকলতা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—"তোমার কি অসুখ করেচে কনক?"

—"অসুখ? এমন বিশেষ-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেচে।"—এই বলে কনকলতা একটুখানি হাস্‌লে—অত্যন্ত ম্লান একটু হাসি! মনে হ'ল, সে-যেন অভিনয়-শ্রান্ত নটের প্রাণপণ-চেষ্টার হাসি!

হঠাৎ কনকলতার কপালের উপরে আমার চোখ পড়ে গেল। তার কপালের এক জায়গা কেটে গিয়ে ফুলে ঢিপি হয়ে উঠেছে!

ধাঁ-করে' আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল—মুখ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল—"তোমার কপালে ও কি!"

একটা চাপা কান্নার আবেগে কনকলতার সর্ব্বাঙ্গ যেন থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল! কিন্তু তখনি সাম্‌লে নিয়ে সে আবার একটু হেসে বল্লে, "ও কিছু নয়—কাল আমার কপালটা জান্‌লায় ঠুকে গিয়েছিল কিনা—"

—"কনক, তুমি সত্যিকথা বল্‌ছ না। তোমার কপাল যেন জান্‌লায় ঠুকে গিয়েছিল—কিন্তু তোমার গলায়, হাতে অত কাল্‌-শিরের দাগ কেন?"

করুণ নয়নে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে মাথা নীচু কর্‌লে।

—"কনক, কে তোমায় মেরেছে, এমন পাষণ্ড কে আছে?"

কনকলতা মাথা তুলে আবার মৃদু-মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু সে বোধহয় নিজেই জান্‌তে পার্‌লে না যে, তার চোখ দিয়ে তখন টস্‌টস্ করে' জল ঝর্‌ছে!

—"কনক, মুখের হাসি আর ত তোমার চোখের জলকে সাম্‌লাতে পার্‌লে না! অনেকদিনই এ সন্দেহ করেছিলুম, আজ এতদিনে আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়!"

—দুহাতে আপনার মুখ ঢেকে দেয়ালের উপরে হেলে, বোবা পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "কে তোমাকে মেরেছে, তুমি না-বল্লেও আমি বুঝেছি।... ...আর এজন্যে আমিই দায়ী—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি আমিই!"

কনকলতা তখনো নির্ব্বাক।

—"তুমি জান-না কনক, তোমার দশা দেখে আমার বুকের ভেতরটা কী কর্‌ছে! ... ...কিন্তু মোহিতকে আমি ছাড়্‌ব না —তোমার গায়ে সে হাত তুলেছে!"

—সঙ্গেসঙ্গে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কে উপরে উঠ্‌ছে।

পলক না-পড়্‌তে কনকলতা চোখের জল মুছে ফেল্‌লে! বিদ্যুতের মত আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি সে বলে উঠ্‌ল, "ঐ উনি আস্‌ছেন! দোহাই আপনার— ওঁকে কিছু বল্‌লে আমি আর বাঁচ্‌ব না!"

উপরে উঠে, আমাদের দুজনকে সেখানে একসঙ্গে দেখে, মোহিত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকে বারবার সে তাকাতে লাগ্‌ল—বোধহয় ভাবছিল, কনকলতার মুখে তার কীর্ত্তি-কাহিনীর সমস্তটা আমি শুনেছি!

কনকলতা হাস্‌তে-হাস্‌তে সহজ স্বরে বল্লে, "তোমার কোর্টের বেলা হ'ল যে! যাও, যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে' এস!"

কনকলতার হাসিমুখ ও সহজ স্বর মোহিতের সব ধুক্‌ফুকুনি ঘুচিয়ে দিলে। আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, আমার দিকে ফিরে সে বল্লে, "কি হে, তুমি কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ। এত সকালে বেরিয়েছিলে যে!"

—"একটা বেআক্কেল মক্কেলের পাল্লায় পড়ে ভোর না হ'তেই আমাকে বেরুতে হয়েছিল।"

—"আচ্ছা, তোমার বেলা হচ্ছে, আজ এখন আসি"—অনেক কষ্টে শান্ত স্বাভাবিক স্বরে এই কথা বলে, তাড়াতাড়ি আমি বিদায় হলুম। আর বেশীক্ষণ থাক্‌লে হয়ত আমি মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌তুম না— কনকলতার মত অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল না!

... ...

... ...

বাড়ীতে এলুম পাথরের মতন ভারি মন নিয়ে। স্বার্থপর আমি—নিজের ক্ষুদ্র তৃপ্তির জন্যে একটি সুন্দর জীবনকে অসার্থক করে দিলুম!

কিন্তু মোহিতকে আমি একেবারে চিন্‌তে পারি-নি—এমন অমানুষ সে! সে ভিজে বেড়াল হয়ে আমাদের গোলামের মত থাক্‌ত, আমরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তুম না। তারপর সেই লোক ভিতরে-ভিতরে এ-হেন সয়তান হয়ে দাঁড়াতে পারে— কে এ-কথা ভেবেছিল? কনকলতার বিবাহের উদ্যোগে ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়ি মোহিতের সঙ্গে আমি তার সম্বন্ধ করেছিলুম। মোহিতের বর্ত্তমান চরিত্র কেমন সে খোঁজ কিছুই নেওয়া হয়-নি। নিজের এই সাংঘাতিক ভ্রমের জন্যে অনুতাপে আজ আমার বুক ভেঙে যায় যায় হ'ল!

সেইদিন সন্ধ্যাতেই আর-এক অঘটন ব্যাপার! কনকলতার কাছ থেকে এক পত্র পেলুম!

সে লিখেছে—

"প্রিয় মাষ্টারমশাই,

আজ আপনি স্বচক্ষে যা দেখে গেছেন— তারপরে আর কোন কথা লুকোনো চলে না। কারণ, এখনো লুকোচুরি কর্‌তে গেলে

আপনি হয়ত এমন একটা-কিছু করে' বস্‌বেন, যার ফল ভালো হবে না।

আমার জীবন সুখের নয়,—আপনার কাছে এ-কথা আর লুকোনো মিছে। যখন কুমারী ছিলুম তখন বিবাহের যে স্বপ্ন আমার তখনকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে' রেখেছিল, এখন সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে, একেবারে স্বপ্নেরি মতন!

সংসারে যে-দুটি দোষকে সকল নারীই সব-চেয়ে-বেশী ভয় করে, আমার স্বামীর— আপনার বন্ধুর ঠিক সেই দুটি দোষই পুরো-মাত্রায় আছে। তিনি মদ খান, আর এমন জায়গায় যান, যার নাম না-কর্‌লেও আপনি বুঝ্‌বেন। শুনেছি 'নারীর প্রাণে সবই সয়'। কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত স্বামীর এ স্বভাব সর্ব্বংসহা নারী হয়েও আমি সয়ে উঠ্‌তে পারি-নি। তাই দু-চার কথা না-বলে থাক্‌তে পারি না। সেটা যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামী তা বোঝেন না। তাঁর যুক্তি 'পুরুষের কথায় মেয়ের থাক্‌বার দরকার কি?' তিনি আমাকে চুপ করতে বলেন, চুপ না-কর্‌লে আমাকে গালি দেন, আমাকে ধমক দেন, আমাকে —আর যা করেন, তার চিহ্ন আজ সকালে আপনি দেখেছেন।

এম্‌নি ভাবে আমার দিন যাচ্ছে। বাবা মা কিছু জানেন না—তাঁদের আমি জান্‌তে দিই-নি। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আমার কষ্ট তাঁদের বুকে বাজের মত বাজ্‌বে। এ-সব কথা জান্‌লে তাঁরা স্নেহের বশে যা কর্‌বেন, তাতে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কম্‌বে না। সকল দিক ভেবে আমি তাই মৌনব্রত নিয়েছি।

বাবা-মা একালের নব্যতন্ত্রের লোক— আমিও শিক্ষা পেয়েছি তাঁদেরি মতন। কিন্তু তাহ'লেও এ-কথা ভোলা শক্ত যে, আমি হিন্দুর মেয়ে। আপনি হয়ত ভাব্‌বেন, তবে আমি স্বামী-নিন্দা কর্‌ছি কেন? ওটা হয়ত একালের শিক্ষার দোষ! স্বামী-নিন্দা করি আর যাই-ই করি, স্বামী-ত্যাগ ত আর কর্‌তে পার্‌ব না!—যদিও সেটা পার্‌লে ভবিষ্যতে পরলোকে যত যন্ত্রণাই হোক্, আপাতত ইহলোকের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারি—তবু তা যখন সম্ভব নয় তখন মৌনব্রতই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

অতএব আপনিও আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার স্বামী যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান যে, আপনি সব জেনেছেন। স্বামীকে কিছু বলেও তাঁকে আর বদ্‌লানো যাবে না—তাঁর চরিত্র এখন সংশোধনের অতীত। আপনি কিছু বল্লে হিতে-বিপরীত হবে।

আর-এক কারণে আপনাকে নির্লিপ্ত থাক্‌তে বল্‌ছি। সঙ্কোচে আমার কলম থেমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার নিজের মঙ্গলের জন্যে না-লিখেও আর অন্য উপায় নেই!

আমার স্বামী আপনাকে সন্দেহ করেন ... ... আমাকে সন্দেহ করেন!

এর কারণ জানি না। শুধু এইটুকু বুঝ্‌ছি যে, আপনি কিছু বল্‌তে গেলে তাঁর এই অন্যায়, কদর্য্য সন্দেহকে তিনি সত্য বলে মনে কর্‌বেন। ইতি

আপনার ছাত্রী।"

কনকলতার পত্র হাতে করে' আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম!

* * * * *

তারপর একসপ্তাহ কেটে গেল। এর-মধ্যে আমি কনকলতার আর-কোন খোঁজ-খবর নিই-নি, মোহিতের সঙ্গেও দেখা করি-নি। কী যন্ত্রণায়, কী দুশ্চিন্তায় এই সপ্তাহকাল কাটিয়েছি তা শুধু আমি জানি আর জানেন আমার ভগবান।

কনকলতার সেই পত্রের অক্ষরগুলো ঠিক জ্বলন্ত কয়লার মত আমার সমস্ত বুকখানা যেন দগ্ধে ছাই করে' দিচ্ছে! আমার চোখে এত অশ্রু নেই যে, সে আগুন নিবিয়ে ফেল্‌তে পারি!

মোহিত আমাকে আর কনকলতাকে সন্দেহ করে!

হ্যাঁ, কনকলতাকে আমি ভালোবাসি—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমার এ প্রেম আমি ছাড়তে পার্‌ব না—এ প্রেম আমার জীবন-প্রদীপে উজ্জ্বল শিখার মত জ্বল্‌ছে, দিবারাত্র জ্বল্‌ছে!··· ··· কিন্তু, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার এ প্রেম নিষ্কলঙ্ক! বিবাহের পরে কনকলতার কাছে আমি কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যেও, ভাবে-ভঙ্গীতে কি ব্যবহারে-ইঙ্গিতে আমার প্রেমকে প্রকাশ করি-নি। আর কনকলতা? আজ পর্য্যন্ত জানি, তার মনে আমার প্রেমের ঠাঁইটুকুও নেই। একজন পরিচিত আত্মীয়ের মত আমাকে সে গ্রহণ করেছে মাত্র!

তবে, মোহিতের এই সন্দেহের কারণ কি? অনেক ভাব্‌লুম, কিন্তু কোনই কূল-কিনারা পেলুম না। খালি এইটুকু বুঝ্‌লুম, মোহিতের বাড়ীতে আর আমার যাওয়া উচিত নয়।

এম্‌নি যখন মনের গতিক, তখন হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মোহিতের বাড়ী থেকে এক দরোয়ান এসে হাজির। মোহিত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; বিশেষ দরকার, এখনি না-গেলে নয়। ব্যাপার কি?

ভাব্‌তে-ভাব্‌তে মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম, সে তিনতলায় ছাদের উপরে আছে।

ছাদে গিয়ে দেখ্‌লুম, এককোণে আল্‌সেয়ে হ্যালান দিয়ে মোহিত শীতলপাটির উপরে চুপচাপ বসে আছে। তার সাম্‌নে একটা বিলাতী মদের লেবেল-মারা বোতল, একটা কাঁচের গেলাস, আর-একখানা থালায় করে কি-কতকগুলো খাবার।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমার সাম্‌নে এ-হেন ব্যাপার এই প্রথম। হঠাৎ মোহিত এতটা বেহায়া হয়ে উঠ্‌ল কেন?

তার সুমুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "মোহিত, তুমি আমায় ডেকেছ?"

মোহিত অত্যন্ত নীরস স্বরে বল্লে, "হ্যাঁ, বোসো ঐখানে।"

আস্তে-আস্তে বস্‌লুম। খানিকক্ষণ কেটে গেল। মোহিত আমার দিকে আর চোখে দেখ্‌লে না, কথাও কইলে না—খালি নিজের মনে থেকে-থেকে মদের গেলাসে চুক্‌চুক্ করে' চুমুক মার্‌তে লাগ্‌ল।

শেষটা আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "মোহিত, তোমার মদ-খাওয়ার সাক্ষী হ'তে এখানে আসি-নি, আমার অন্য কাজ আছে!"

মোহিত অবহেলা-ভরে বল্লে, "বটে!

অন্য কাজ আছে? কি কাজ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাও?"

—"ধর, তাই।"

—"তাহলে নিরাশ হবে। সে আজ নেমন্তন্ন খেতে গেছে।"

—"তবে তুমি মদ খাও, আমি বাড়ী যাই। অকারণে বসে-বসে মদ-খাওয়া দেখ্‌তে আমার একটুও আগ্রহ নেই।"

আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, মোহিত সশব্দে গেলাসটা নামিয়ে রেখে কর্কশ স্বরে বলে' উঠ্‌ল, "বোসো বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে!"

মোহিতের গলা শুনে অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। চাঁদের আলোয় দেখ্‌লুম, তার চোখদুটো হিংস্র পশুর মত জ্বল্‌ছে!

—"ছাখো, তুমি অনেকদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছ—আর তা হচ্ছে না।"

—"তুমি কি বল্‌ছ মোহিত!"

—"ও-সব ন্যাকামি রাখ, আমি ওকালতি করি—বদ্‌মাইস্ ঠেঙিয়ে খাই। বাঙ্‌লায় এত পাত্র থাক্‌তে যখনি তুমি যোগাড়যন্ত্র করে' আমার সঙ্গে তোমার ছাত্রীর বিয়ে দাও, তখন থেকেই আমি তোমাকে সন্দেহ করি—বুঝেছ?"

এই আচম্‌কা আক্রমণের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না, হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম—কোন কথা কইতে পার্‌লুম না!

—"অন্য-কোন অচেনা জায়গায় বিয়ে হ'লে পাছে তোমার প্রেমের পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়, সেই ভয়েই তোমার ছাত্রীটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ,—হুঁঃ, এ আমি বিলক্ষণ বুঝেছি!"

ততক্ষণ আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে আমি বল্লুম, "মোহিত—"

হা হা করে' হেসে মোহিত বল্লে, "তুমি চোখ রাঙাচ্ছ কাকে হে? আমাকে তুমি এখনো সেই পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে কর নাকি?"

—"মোহিত, এমন পাপ-মন নিয়ে তবে তুমি আমার কথায় বিয়ে কর্‌লে কেন?"

—"টাকার লোভে আর রূপের মোহে। এ ফাঁদে জেনে-শুনেও সবাই পা দেয়—"

—"থামো, থামো—"

—"আমি যীশুখৃষ্ট কি বুদ্ধদেব নই, সুতরাং সয়তানের প্রলোভনে সহজেই ভুলেছি।"

—"এ মিথ্যেকথা মোহিত, এ মিথ্যে-কথা!"

—"বটে! এ চিঠিখানাও কি মিথ্যে? ছাখো, চাঁদের আলোয় তোমার জিনিষকে তুমি বোধহয় চিন্‌তে পার্‌বে!"—এই বলে মোহিত আমার দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে ধর্‌লে।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কাগজখানার উপরে চোখ পড়্‌তেই চিন্‌লুম, সে আমারি চিঠি—বিয়ের আগের দিনে কনকলতাকে যে চিঠি লিখেছিলুম!

বল্‌বার কিছু না-পেয়ে চোরের মত আমি মাথা হেঁট কর্‌লুম।

—"কি, চুপ করে' রইলে যে? এ চিঠিও কি মিথ্যে? বল,—কথা কও, শুন্‌ছ?"

রুদ্ধকণ্ঠে কাতরস্বরে আমি বল্‌লুম, "হ্যাঁ, এ আমারি চিঠি মোহিত!"

—"এখন পথে এস বাবা, পথে এস!"

—"মোহিত, আমি মান্‌ছি, আমারি সব' দোষ। কিন্তু কনকলতাকে এর জন্যে তুমি দায়ী কোরো না। ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি, সে নির্দ্দোষ।"

—"হ্যাঁ, সে সীতা-সাবিত্রী! তা নইলে পরপুরুষের একখানা প্রেমপত্র নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখে দেয়!... ...এ-সব কথা বোঝাচ্ছ কাকে? কনক যদি খাঁটি হ'ত, তাহলে এ চিঠি পেয়েই সে হয় ঘৃণায় তখনি ছিঁড়ে ফেলে দিত, নয় তার বাপ-মাকে গিয়ে দেখাতো,—তারপর দূর করে' তোমাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু তার কিছুই সে করে-নি, উল্টে চিঠিখানা এতদিন ধরে হীরে-মাণিকের মত যত্ন করে' বাক্সে তুলে রেখেছে আর তোমার সঙ্গে সমান হাসিমুখে মেলামেশা করে' এসেছে! এই চিঠির সঙ্গে তার বাক্সে আর কি পেয়েছি জান? তোমার ফটো!"

হায় মানুষের প্রাণ! এই ভয়ানক সময়েও আমার সকল ভয় লজ্জা অপমান ভুলে আনন্দের আবেগে আমি আকুল-ব্যাকুল হয়ে গেলুম! মোহিতের কথায় আজ আমি এই প্রথম জান্‌তে পার্‌লুম, কনক আমায় ভালোবাসে—কনক আমায় ভালোবাসে! বিপদের মধ্য দিয়ে এই অমূল্য বার্ত্তা এসে, সুখের আবেশে আমাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে!

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের মধ্য থেকে মোহিতের ক্রোধকম্পিত স্বর আচম্বিতে আমাকে সচকিত করে' তুল্লে,—"চুপ ক' ভাব্‌ছ কি? তোমরা আর আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না—বুঝেছ? দৈব আ আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে—তা-নইলে কনক নেমন্তন্নে যাবার সময়ে ভুলে বাক্স খুলে রেখে যাবে কেন?... ...হ্যাঁ, তোমাদে স্বপক্ষে-বিপক্ষে যত কথা থাক্‌তে পারে সব আমি একে-একে ভেবে দেখেছি ভেবোনা মদ খেয়ে আমি মাতাল হয়েছি— না, আমার মাথা যতদূর ঠাণ্ডা থাক্‌বার তা আছে। নইলে আমার সাম্‌নে বসে এতক্ষণ তুমি বেঁচে থাক্‌তে না"—বল্‌তে বল্‌তে মোহিতের চোখদুটো আবার দপ্‌দপ্ করে' উঠ্‌ল!

হঠাৎ নীচের রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হ'ল —শব্দটা মোহিতের বাড়ীর সাম্‌নে এসে থাম্‌ল।

মোহিতও কাণ পেতে শুন্‌ছিল। অট্টহাস্য করে' সে বলে উঠ্‌ল, "ঐ তোমার ছাত্রী ফিরে এল! এতক্ষণ তারি অপেক্ষায় ছিলুম!"

ভয়ে শিউরে উঠে আমি বল্লুম, "মোহিত, মোহিত, তুমি কি কর্‌তে চাও?"

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে' সে বল্লে, "এখনি দেখ্‌তেই পাবে!"

—"তুমি—তুমি কনককে কি মার্‌বে?"

—"সুধু মার্‌ব না, আমার বাড়ী থেকে এখনি তাকে দূর করে' তাড়িয়ে দেব— সেইসঙ্গে তোমাকেও!"

—"কথা শোনো মোহিত, কথা শোনো! কনকের সর্ব্বনাশ কোরো না, কোরো না!

মনের সঙ্গে যুঝে সে আপনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তবু আমাকে তার মন জানতে দেয়-নি—তুমি না-বল্লে আমি আজ যা জেনেছি কখনোই তা জান্‌তে পারতুম না! তার এ আত্মসংযমকে তুমি ব্যর্থ করে' দিও না—তাকে মেরে-ধরে' কলঙ্কিনী বলে তাড়িয়ে দিয়ে সমাজে তাকে পতিত কোরো না—তার—তার—"

—"তোমার সয়তানী রাখো! এই আমি চল্লুম!"

—"তার চেয়ে আমাকে মারো, আমাকে অপমান কর—আমাকে তাড়িয়ে দাও, যা-ইচ্ছে কর, আর আমি তোমার পথে এসে দাঁড়াব না,—মোহিত, মোহিত!"

কিন্তু নিষ্ঠুর মোহিত আমার কাকুতিতে কর্ণপাতও কর্‌লে না, বিকট স্বরে একটা উচ্চ হাস্য করে' তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'ল! পর-পলকে আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল, রাজপথে কৌতূহলী জনতার মাঝ-খানে,—বিতাড়িত, প্রহারে-জর্জ্জরিত পদদলিত কনকের রক্তরাঙা, লাঞ্ছিত, আর্ত্ত মুখ!

একলাফে আমি মোহিতের সুমুখে গিয়ে পড়্‌লুম এবং দু-হাতে তার হাত চেপে ধরে বল্লুম, "খবর্দ্দার! এখান থেকে তুমি এক পাও নড়্‌তে পার্‌বে না!"

মোহিত এক-হ্যাঁচ্‌কায় আমার হাত ছাড়িয়ে পিছু হঠে যেতে গেল—এবং পর-মুহূর্ত্তেই প্রাচীরহীন ছাদের আল্‌সেতে পা-লেগে, টাল্ সাম্‌লাতে না-পেরে তার দেহটা একেবারে রাস্তার দিকে ঘুরে পড়্‌ল,—কিন্তু তাড়াতাড়ি ছাদের কার্ণিশটা ধরে ফেলে সে শূন্যে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল!

চোখের নিমেষে এই ঘটনা ঘটে গেল!

মোহিত কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ধর—ধর—বাঁচাও, পড়ে গেলুম—গেলুম—"

স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, বুকের উপরে দু-হাত বেঁধে, কঠিন পাষাণের মত অটল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে আমি অনায়াসেই বাঁচাতে পার্‌তুম—কিন্তু সে বাঁচ্‌লে আমার কনক মর্‌বে। প্রাণের ভিতরে কাণ পেতে আমি বিবেকের আদেশ শুন্‌তে পেলুম—কিন্তু আমার দেহ তখন এক অভাগী নারীর মুখ চেয়ে তেম্‌নি আড়ষ্ট হয়েই রইল!

মোহিত ছাদে ওঠ্‌বার জন্যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌তে-কর্‌তে পাথর-গলানো স্বরে বল্‌লে,—"ফণী, এস ভাই! আমার হাত-দুটো ধর—"

আমার ভয় হ'তে লাগ্‌ল, পাছে তার করুণ মিনতি শুনে আমার প্রাণে শেষটা দয়ার সঞ্চার হয়!

মোহিত তার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে' আর-একবার উপরে ওঠবার চেষ্টা কর্‌লে—কিন্তু তার দেহের ভার সইতে না-পেরে কার্ণিশের খানিকটা হঠাৎ হুড়্‌মুড়্ করে' ভেঙে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মোহিতকে আর দেখ্‌তে পেলুম না,—কেবল শুন্‌লুম এক আকাশ-ফাটানো শেষ-আর্ত্তনাদ, আর রাস্তা থেকে অনেক লোকের চীৎকার!

... ...পরলোকে মোহিতের অতৃপ্ত প্রতিহিংসা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে কিনা, জানি-না—কিন্তু ইহলোকে তাকে আর-কখনো দেখ্‌তে পাই-নি।

কনকলতা এখন কোথায়, তাও জানিনা,

—বিধবার শুভ্রবেশে তাকে দেখ্‌বার আগেই আমি দেশত্যাগী হয়েছিলুম।

হাতে নর-রক্ত মেখে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যে। আমার এ হত্যাকারীর হাত আর কি জীবনে শুভ্র হবে?"

... ...

সন্ন্যাসী আমার দিকে আর দৃষ্টিপাত না-করেই চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে, যেখানে ধূ-ধূ ময়দানের প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নার উপরে, একটি নিঃসঙ্গ বটের নিস্পন্দ ছায়ায় জমাট অন্ধকার স্তম্ভিত হয়ে ছিল, তারই ভিতরে অলৌকিক ছায়া-মূর্ত্তির মত মিলিয়ে গেলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক (১)

জীব যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে, তখন কিছু মূলধন লইয়া আসে। সেই মূলধন তাহার বংশানুক্রমিক গুণ—পিতৃ-পিতামহাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক গুণ। এই মূলধনের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল মাত্র এই মূলধনই জীবন-যুদ্ধে টিঁকিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। যেরূপ অবস্থার মধ্যে সে জীবন যাপন করে, তাহাও তাহার দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এমন কি অনেক দৈহিক ও মানসিক গুণ বাহ্য অবস্থার সংস্পর্শেই তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে।

এই সকল বাহ্য অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, পারিপার্শ্বিক। ইহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে (১) প্রাকৃতিক ও (২) সামাজিক। যে আবহাওয়া প্রভৃতির মধ্যে জীব বর্দ্ধিত হয় তাহাই হইল তাহার প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক (physical environment)। ইহা যে জীবের দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, আর শুধু একটি ব্যক্তিতেই এই প্রভাব আবদ্ধ নহে। জাতির উপরেও এই প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অল্প নয়। এমন কি প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদেরা এইটাকেই জাতির সভ্যতা-গঠনের প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর একটী পারিপার্শ্বিক হইল, সমাজ। ধরিতে গেলে এটী কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব। মানুষই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। আর এই সমাজ যে মানুষের উপর কি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজ তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, বিধি-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি লইয়া মানুষকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। জন্ম হইতে

(১) পারিপার্শ্বিক = Environment ; বংশানুক্রম = Heredity.

মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারই সঙ্গে তাহাকে কারবার করিতে হয়; ইহারই নির্দ্দিষ্ট পথ-অনুসারে তাহাকে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। মানুষের পক্ষে এই সমাজই প্রধান পারিপার্শ্বিক। আজ আমরা এই প্রবন্ধে যে পারিপার্শ্বিকের কথা বলিব, তাহা প্রধানতঃ সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই।

বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক—ইহাদের কোন্‌টী মানুষের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে;—মানুষের যে দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি তাহাদের কতটা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত আর কতটাই বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে গড়িয়া উঠে, দেখা যাক। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবশ্য বিভিন্ন মত।

কেহ কেহ বলেন, বংশানুক্রমের প্রভাবই মানুষের উপর বেশী কাজ করে; এমন কি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় সে প্রভাবের মাত্রা প্রায় দশগুণ বেশী। মানুষের যাহা কিছু দৈহিক বা মানসিক গুণ সে সকলই সে এই বংশানুক্রমের ফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সেই সকল গুণকে ফুটাইয়া তোলে মাত্র। পারিপার্শ্বিক নূতন বিশেষ-কিছুই দিতে পারে না। যাহা বংশানুক্রমে মানুষ প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কোন আজগুবি গুণ পারিপার্শ্বিকের হাজার চেষ্টাতেও তাহার মধ্যে ফুটিতে পারে না। এই জন্য ইঁহারা বলেন, সমাজ-সংস্কার ও জাতি-গঠন করিতে হইলে এই বংশানুক্রমের ধারাকে বিশুদ্ধ করা উচিত। ভাল মানুষ তৈয়ার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই ভাল পিতা-মাতা; নহিলে পারিপার্শ্বিকের হাজার সংস্কার করিলেও বিশেষ ফল লাভ হইবে না! ক্ষেত্র ভাল না হইলে তাহাতে নানা প্রকার সার দিয়াও ভাল শস্য উৎপন্ন করা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগের সংস্কারকেরা এই পারিপার্শ্বিক লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহাদের সকল চেষ্টা এই পারিপার্শ্বিককে ভাল করিবার দিকে। শিক্ষা এবং নানারূপ আচার, নিয়ম, প্রথা প্রভৃতির সংস্কার তাঁহারা যাহা করেন, তাহা এই মতের বশবর্ত্তী হইয়াই; কাজেই এদিকে তাঁহাদের সকল চেষ্টা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। এই চেষ্টার কতকটা ক্ষেত্র-সংস্কারের দিকে লাগাইলে বোধ হয় প্রচুর ফল পাওয়া যাইত।

এই সব কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতের বলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে যত খানি নগণ্য ধর হইয়াছে, অনেক পণ্ডিতের মতে তাহা ততটা নগণ্য নহে। সত্য বটে, নিম্নতর জীবের মধ্যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের বিশেষ কিছু মূল্য নাই; ইহারা বংশানুক্রমে যাহা লাভ করে তাহাই এক প্রকার সার-সর্ব্বস্ব। তাহাকেই আমরা তাহাদের সংস্কার বা সহজ বৃত্তি (Instinct) বলিয়া থাকি। এই সহজ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই উহাদের জীবন চালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতি যেন অনুগ্রহ করিয়াই উহাদের যাহা-যাহা দরকার, সেই সকল বৃত্তিগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ঠিক করিয়া দেয়। কিন্তু উহাদের ক্ষমতা ঐ সকল সহজ বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ। ইহার অতিরিক্ত নূতন কিছুই উহারা করিতে পারে না। উহাদের মেরুদণ্ড ও স্নায়ু প্রভৃতিও

ইহার অনুরূপ এই সকল সহজ বৃত্তিকে চালাইবার পক্ষে উপযোগী। কাজেই জীব যত বেশী নিম্নস্তরের হইবে, এই সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট সহজ বৃত্তির পরিমাণ তাহার মধ্যে ততই বেশী। উচ্চস্তরের জীবে এই সহজ-বৃত্তির ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিলতর হইতে দেখা যায়।

সর্ব্বোচ্চ জীব মানুষের মধ্যে এই সহজ বৃত্তির ক্রিয়া সবচেয়ে কম। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে এ দিকে বঞ্চিত করিলেও অন্য দিকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। নূতন নূতন বিষয় শিখিবার ও নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিবার ক্ষমতা তাহার অপরিসীম; তাহার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কোষগুলির গঠনও সেই রূপ প্রবল পরিবর্ত্তনশীল। কঠোর প্রকৃতি তাহাকে একদিকে যেমন প্রায় সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সংসারে পাঠাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনই জীবন-যুদ্ধে ক্রমশঃ নিজেকে শক্তিশালী করিবার উপায়ও তাহার ঠিক করিয়া দেয়। এই উপায় তাহার শিক্ষাপ্রবণতা।

এই শিক্ষা-প্রবণতার ভিতর দিয়াই সমাজ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সমাজের প্রচলিত আদর্শ আচার-অনুষ্ঠান বিধি-নিয়ম, প্রথা সংস্কার—এককথায় তাহার বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—মানব-শিশুকে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইতে হয়। পিতামাতা, পরিবার-পরিজন, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক-অধ্যাপক—সকলেই তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহার বংশানুক্রম তাহাকে যদি এই সকল বিষয় শিখিবার যোগ্য করিয়া দিয়া থাকে তবেই সে সমাজের এই সকল শিক্ষাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, আরও দশ জনের মত বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। আর বংশানুক্রম যদি তাহাকে সমাজের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না দেয়, তবেই তাহার বিপদ। সমাজ তখন আপনার "অযোগ্য দমন"—(suppression of the unfit)—এই নীতি অবলম্বন করিয়া সেই অসামাজিক জীবকে বিতাড়িত বা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা পায়। প্রতিনিয়তই সমাজে এই অযোগ্য-দমন-নীতির ক্রিয়া চলিতেছে। জেল, পুলিস, আদালত, বিচারক প্রভৃতি সকলই এই অযোগ্য-দমন নীতিরই সাজসরঞ্জাম।

এই অযোগ্য-দমন নীতির অনুরূপ কার্য্য প্রকৃতির মধ্যেও যে না চলিতেছে, এমন নয়। কিন্তু প্রকৃতি অন্য উপায়ে এই কার্য্য সাধন করে—জীব-বিজ্ঞানে সে উপায়ের নাম, survival of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। প্রকৃতি সেখানে যোগ্যতমকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখে; আর অযোগ্য অবহেলার ফলে নিজের অক্ষমতার ভারে জীবন-যুদ্ধে পিছাইয়া পড়ে। সমাজ সাধারণতঃ যোগ্যতমকে আদর করে না—অযোগ্যকে দমন করিয়াই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রকৃতি ও সমাজের উপায় ভিন্ন রকমের হইলেও উদ্দেশ্য উভয়ের একই—যোগ্যকে রক্ষা এবং অযোগ্যকে দমন।

সুতরাং দেখা গেল, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

বংশানুক্রম অপেক্ষা কম নহে—বরং এক হিসাবে বেশী। বংশানুক্রম মাল-মসলা যোগাইয়া থাকে বটে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক তাহাকে ইচ্ছামত বস্তুতে গড়িয়া তুলে। প্রকৃতি কাঠামো খাড়া করে—আর সমাজ তুলি দিয়া রঙ ফলাইয়া তাহাকে ইচ্ছামত রূপ দান করে। ফলতঃ বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক ইহাদের কার্য্য মোটেই বিপরীতমুখী বা পৃথক নহে। ইহারা পরস্পরের সঙ্গে নিষ্ঠ-রূপে সংসৃষ্ট, ধরিতে গেলে উভয়েই একযোগে মানুষের দেহ ও মনকে অহরহ নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। একদিকে বংশানুক্রম যেমন পারিপার্শ্বিকের জন্য উপাদান যোগাইয়া থাকে—অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকও তেমনই বংশানুক্রমের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির মধ্য দিয়া কি করিয়া বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, তাহা অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। হিন্দু সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির দ্বারা যেরূপে বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, মুসলমান সমাজ তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবাহ-বিধির দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে বংশানুক্রমকে চালিত করিয়া থাকে।

আর এক দিয়া কথাটার আলোচনা করা যাক। এই যে বংশানুক্রমিক গুণাবলী, তাহা কি মানুষের মধ্যে আবহমান কাল একই ভাবে আছে, না ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে? বৈদিক যুগের মানব-শিশু যে সকল বংশানুক্রমিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনকার মানবশিশুও কি ঠিক সেই সকল গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, না, তাহাদের বংশানুক্রমিক গুণাবলীর বৈচিত্র্য ও সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী? সহজ বুদ্ধির আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে আধুনিক শিশুর বংশানুক্রমিক গুণের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও সংখ্যা প্রাচীনকালের তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশী এবং বিস্তীর্ণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কিরূপে বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িয়া গেল?

বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যে পূর্ব্ব হইতে মানবশিশুর মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে প্রায় কোন পণ্ডিতেরই মত-ভেদ নাই। কিন্তু কিরূপে এই সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িতেছে, ইহা লইয়াই তর্ক। স্পেন্সার ও তাঁহার শিষ্যেরা বলেন যে বংশানুক্রমিক গুণ মোটেই একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তু নহে। ইহা ক্রম-বিবর্দ্ধনশীল, প্রতিপুরুষেই বাড়িয়া চলিয়াছে; আর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। মানুষ কতকগুলি গুণ বংশানুক্রমের ফলে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষ হইতে লাভ করে; আর কতকগুলি সে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে নিজে হইতে উপার্জ্জন করে। এই উপার্জ্জিত গুণগুলি (acquired characters) আবার জীবদেহে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্ত্তী পুরুষেরা পূর্ব্বপুরুষের সেই স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি বংশানুক্রমের ফলে নিজেরা লাভ করে। এইরূপে আজ যাহা স্বোপার্জ্জিত, ভবিষ্যতে তাহাই বংশানুক্রমে গিয়া দাঁড়ায়। উপরি-লিখিত জটিল প্রণালীতে বংশানুক্রমিক গুণের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে

এবং মানুষ বহুগুণযুক্ত হইয়া জটিলতর সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

আধুনিক কালের ডিভ্রিজ, বিসমান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদেরা কিন্তু উক্ত মত স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, স্বোপার্জ্জিত গুণ (acquired characters) কখনই ওরূপে বংশানুক্রমিক হইতে পারে না। সমস্ত বংশানুক্রমিক গুণই germplasm বা প্রাণ-বস্তুর মধ্য দিয়া সংক্রামিত হয়। Germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন হইতেই নূতন গুণের সৃষ্টি হয়—আর তাহাই বংশানুক্রমের ফলে পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এই germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া হয় না। ধরিতে গেলে হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন (mutation) ঘটিয়া থাকে। ডিভ্রিজ নানা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

তবে কি ইঁহাদের মতে স্বোপার্জ্জিত গুণ ও পারিপার্শ্বিকের কোন মূল্য নাই? ইহার উত্তরে এই সব পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বোপার্জ্জিতগুণ যদিও বংশানুক্রমিক হইতে পারে না, তবুও মানবশিশুর উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। জীবের চারিদিক যেমন বায়ুমণ্ডল ঘিরিয়া রাখিয়াছে—পারিপার্শ্বিক সমাজ তেমনই এই সকল স্বোপার্জ্জিত গুণাবলী লইয়া মানবশিশুকে চারিদিক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে। মানবশিশু প্রাকৃতিক গঠন-অনুসারে বড়ই পরিবর্ত্তন-প্রবণ (plastic)। আর সেই শক্তিবলে সে চারিপার্শ্বের স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি অনায়াসেই আত্মসাৎ করিয়া লয়। এই হিসাবে এই স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি সমাজের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। সকলেরই এইগুলি লাভ করিবার অধিকার ও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি বংশানুক্রমিক নহে।

আপাত দৃষ্টিতে এই দুই মতে বিরোধ দেখা গেলেও, বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে ততবেশী প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিছুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে নানা পরীক্ষা করিয়া বিসমানের শিষ্যগণ যে সকল স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেগুলি অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

(১) পারিপার্শ্বিক ও তদনুসঙ্গী কার্য্যের পরিবর্ত্তন, প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনে (germinal variation) উত্তেজক কারণ হইতে পারে।

(২) পারিপার্শ্বিকের সংঘর্ষে আমাদের প্রত্যঙ্গের যে সকল পরিবর্ত্তন হয়—তাহা গৌণরূপে প্রাণকোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(৩) পারিপার্শ্বিকের অবিশ্রাম আঘাতে দেহের যন্ত্র ও কোষগুলির উপর একটা সংস্কারের দাগ পড়ে এবং তাহার ফলে কোন কোন স্বোপার্জ্জিত গুণ অধিকতর করা জীবের পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারে।

(৪) মাতার সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আর সেই কারণে মাতার স্বোপার্জ্জিত গুণ শিশুর উপর অত্যন্ত বেশী মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

উপরিলিখিত কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে পূর্ব্ববর্ণিত দুই মতের মধ্যে মূলে বিশেষ প্রভেদ নাই। অন্ততঃ একথা বলিতে বোধ হয় বাধা নাই যে বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক দুইটী পরস্পর বিপরীতমুখী শক্তি নহে; ইহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে ও এক যোগে মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি

(৯)

সন্ধ্যাকাল, আকাশ-প্রান্তে ভাসমান, চতুর্থীর চন্দ্রকলা ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে, প্রতিবিম্বিত হইয়া মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। মন্দিরে সান্ধ্যঘণ্টা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি-অবসরে রসুনচৌকি-ধ্বনিত সান্ধ্য রাগিণী আকাশে বাতাসে ম্লান-মধুর তান তুলিতেছিল;—রাজা এ সময়ে প্রায়ই মুক্তছাদে আসিয়া বসেন, আজ ঘরের মধ্যে, টেবিলের নিকটে, দীপালোকের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখিতেছিলেন;—এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইল। সদ্যোলিখিত ছত্রগুলির দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বলিল—"বাবা কবিতা লিখছ?" রাজা হাতের কলমটা রৌপ্য কলমদানীতে রাখিয়া বলিলেন—"বস্ রাণি,—তোর patient কেমন আছেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একখানা ছোট চৌকি রাজার চৌকির নিকট টানিয়া পিতার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "তিনি ভালই আছেন। দু-একদিনের মধ্যেই বেশ আরাম হয়ে উঠবেন,—কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটাকে যে ভুলতে চাই রাণি।"

"দু-একটা কথা আমার কিন্তু বলার ছিল বাবা। থাক তবে পরেই বলব। কি লিখছ বাবা,—পড়না?"

"শুনবি?—বেশ শোন্,—সে ভাল কথা।"

রাজা সুস্পষ্ট কণ্ঠে আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন;—

বল্ ভাই বল্ কেন পেয়েছিল বল?
দলিতে ছলিতে কিরে অভাগা দুর্ব্বল?
তোদের স্বার্থের মুখে বলিদান যেতে সুখে—
নিরীহ পরাণগুলি সৃজিত কি ধরাতল?
ধাতার প্রসাদ মধু তোমাদেরি তরে শুধু,
তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলাহল?

* এই প্রবন্ধ-রচনায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি:—

(১) Baldwin—Social and Ethical Interpretation.
(২) Thomson—Heredity.
(৩) Karl Pearson—Science of National Eugenics.

তা নয়রে মহাবলি, এ শুধু বিবেকে দলি
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ কর্ম্মফল!
হরি নন সয়তান, কৃপাময় ন্যায়বান,—
এ শক্তি পেয়েছ দান,-বারিতে অন্যায় ছল।
তাহে যদি কর হেলা,আসিবে তোমারো পালা
সুখ মোহে দুঃখতাপ বাড়াইছ এ কেবল?
সাধিতে শক্তির কাজ, বাসনা যদি হে আজ
বিনাশি দুর্ব্বল-দুঃখ আন পুণ্য সুমঙ্গল।

পড়া শেষ হইলে নীরব-জিজ্ঞাসায় রাজা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সময়ের ন্যায় আবেগভরে মনোভাব প্রকাশ করিলনা, দুই ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিল, আনত দৃষ্টিতে তাহা নেত্রচ্যুত করিয়া কহিল—"এখন কিছু বলবনা ভেবেছিলুম, কিন্তু না বলে থাকতে পারছিনে; এখনো কি কাজ করার সময় হয়নি বাবা? কবিতাতেই মনের আকুলতা প্রকাশ করে ক্ষান্ত থাকবে?"

যে বেদনায় তাঁহার কবিতার ছত্রগুলি রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদনার জ্বালা স্বরে প্রকাশিত করিয়া অতুলেশ্বর কহিলেন—"একান্ত নিরুপায় রাণি, নিতান্ত শক্তিহীন! আমাদের এই নিষ্ফল ক্রন্দন একদিন কারো মনে, কারো তেজে সফলতা লাভ করবে,—এইরূপ আশাকরি;—কিন্তু—"

"বাবা,—তুমিও একথা বলছ?"

"সত্য কথা যে রাণি।.. সবল চিরদিনই দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রে আসছে,—করবেও। এ শক্তিকে রোধ করা যেরূপ শক্তির কাজ সে সামর্থ্য আমার আছে কি রাণি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"একথা আমি মানিনা। দুর্ব্বল-পীড়ন যে সবলের স্বভাব তা কখনই নয়। কারো কারো পক্ষে একথা ঠিক হতে পারে.. কিন্তু সাধারণ নিয়ম বিপরীত বলেই মনে হয়। নইলে পৃথিবীতে ত দুর্ব্বল তিষ্ঠোতেই পারত না। আর ইংরাজ জাতের পক্ষে যে একথা খাটেনা তাঁদের শাসন-নীতিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। আমরা যে আজ এ ভাবে ভাবতে শিখেছি তাওত ইংরাজি শিক্ষার ফল। আজ ব্রাহ্মণের সহিত ধোবা নাপিতও এক বিদ্যালয়ে এক আসনে বসে শিক্ষালাভ করছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে সমভাবে বেদপাঠের অধিকারী; কায়স্থ রমেশ দত্ত আজ বেদ অনুবাদ ক'রে ব্রাহ্মণের মুখ হেঁট করেছেন, যদিও আমি মনে করি উজ্জ্বল করেছেন।"

"ইংরাজের গুণের পক্ষপাতী তোর চেয়ে আমি কম নইরে—তবে—"

—"তবে উদার ইংরাজজাতও সময় সময় দুর্ব্বল-পীড়ন করে কেন? এ প্রশ্ন যখনি আমার মনে উদয় হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরটাও শুনতে পাই।"

রাজা কোন কথা কহিলেন না, নীরব কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বালিকা বলিল—"অবশ্য কোন জাতের মধ্যে সকলেই মহৎপ্রাণ হয় না—কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে, এই পীড়নের আসল অর্থ হচ্ছে,—যেখানে নিষ্পেষণে অপমান বোধ নেই, যেখানে অবমাননাই শিরোভূষণ রূপে ধৃত হয়, সেখানে দুর্ব্বল-রক্ষার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল-পীড়নেই সবল প্রকৃতি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে!"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; কিছু পরে কন্যা কথা কহিল—"দেখ বাবা সেদিন আমার হরিরাম, কেশব পাঁড়ের পা ধুইয়ে সেই মধুপাজল এক চুমুকে পান করে যেন ধন্য হয়ে গেল, আর পাঁড়েও তাকে এই পুণ্যদান ক'রে আপনার ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গর্ব্বস্ফীত হয়ে উঠলো। দেখে আমার যে কি দুঃখ হোল বলতে পারিনে। কিছুদিন পরে ইংরাজ-হস্তে পীড়নের ফলও এই রকম দাঁড়াবে। আমি—আর দেখতে পারিনে বাবা!"

"কি করব বল?"

"কিছু ক'রনা তুমি,—তুমি শুধু আমার সহায় হও। বাবা রাজ্যের যত বিদ্যালয় আছে, আমি তাতে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে চাই—অনুমতি দাও তুমি—"

রাজা কন্যার ভাষায় একটু বিস্মিত হইলেন; "আমি ব্যবস্থা করতে চাই।" বলিতে ত পারিত—"তুমি ব্যবস্থা কর।"

নিজের মনের অজ্ঞাতসারে—রাজা যোগমায়া দেবীর ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার মস্তকে সাদরচুম্বন করিয়া কহিলেন—"রাণীর আজ্ঞা কি অবহেলা করা যায়—হবে হবে"।

জ্যোতির্ম্ময়ীও উঠিয়া দাড়াইয়া একটি ছোট মেয়ের মত পিতাকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল—"না বাবা—'হবে' বল্লে আর চলবে না। ভবিষ্যৎকে এখন বর্ত্তমানে আগিয়ে নিতে হবে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে তোমার নাম করে হুকুম দিয়েছি—আমাদের পিছনের বড় আমবাগানে কাল থেকে ছেলেরা যেন প্রত্যহ ব্যায়াম শিখতে আসে। আজ থেকে ছমাসের মধ্যে তুমি তাদের পরীক্ষা নিতে চাও—এইরূপ জানিয়ে দিয়েছি।"

রাজা বলিলেন—"রাণি তুই যে রাজারও রাজা হলি?"

"না বাবা আমি রাজার সেনাপতি। আমার ইচ্ছা করে রাণী যোগমায়ার মত আমি দেশ রক্ষা করি।"

এবার উভয়ে নীরব প্রশংসায় যোগমায়ার তৈল চিত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন।

রাজা মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়ীর তেজস্বিতায় গর্ব্ব অনুভব করিলেন, কন্যার ইচ্ছা ও উদ্যমের প্রশংসা করিলেন, তাহার প্রস্তাব সর্ব্বহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইল -এরূপ কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটিতে পারে কি না।

এ দেশের জমিদার ও রাজাদিগের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহাদের কার্য্যক্ষমতার পরিসর যে কত কম, তাহা তিনি বাল্যকালে প্রতিপদে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন; বিদেশী রাজা যে ভারতবাসীর গূঢ় স্বভাবের এবং অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কত অক্ষম, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন! অধিকাংশ স্থলে শূন্যে আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া তাঁহারা বিদ্রোহিতার ভয় পান। একজন স্বল্পবুদ্ধি ভারতবাসীও তাহার হাস্যকারিতা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইংরাজের ন্যায় বুদ্ধিমান জাতিও—(সম্ভবত নিজের দেশের তুলনায়) তাহাতে

বিদ্রোহের আভাস প্রত্যক্ষ করিয়া এমন ভীত চঞ্চল হইয়া উঠেন যে, তখন রাজ-ভক্তি ও রাজবিদ্বেষের মধ্যে রেখা টানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে—এবং ইহার অনিবার্য্য ফলভোগ করিতে হয় বেচারা প্রজাদের। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে রাজার দেশহিতকর কার্য্যোদ্যম একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কন্‌গ্রেসের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন; কিন্তু ইদানীং তাহাতেও তাঁহার উৎসাহের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থ-দান করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যত ইহা হইতেও একরূপ দূরে দূরে থাকিতেন। সংবাদ-পত্রও তিনি ভাল করিয়া পড়িতেন না; বিশেষতঃ দেশের লোকের প্রতি পীড়ন সংবাদ সমস্তই বাদ দিয়া যাইতেন। যাহার প্রতিকার তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে, এইরূপ বিষয়ে আপনাকে নিদ্রিত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পারিলেন কই? দৈব—কন্যারূপে তাঁহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তুলিল।

তাঁহার মনের এইরূপ নিভৃত আলোড়ন বৃত্তান্ত কন্যাকে তিনি কিছুই জানিতে দিলেন না; সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর প্রাতঃকালে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবার অগ্রে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি রাজার যে কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু কেবল রাজপরিবার নহে রাজ্যের সকল লোকেই তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ। ক্লাউডেন সাহেবের নামের সহি ইহারা নানা রকম টাইটেল করিয়াছিল যেমন দয়াল, ভারতন্ন ন্যায়-অবতার—ইত্যাদি। কিন্তু ইহার টাতেই যখন তাহাদের মনের আশ না—তখন ইহার নাম দিল, হিন্দু ক্লাউ সাহেব। এ নাম দিবার কারণও ছিল, কোন পর্ব্বোপলক্ষে ইহারাও জুতাহীন শ্যামসুন্দরের মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজ সহিত একত্রে আরতি দর্শন করিতে সকলে যখন প্রণাম করিত, ইঁহারাও গাড়িয়া নতমুখে বসিতেন। প্রথম প্র তাঁহাদের এই ব্যবহার লোকের চক্ষে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক বোধ হই ছিল যে তাহারা ইহাদের সারল্যে বিশ্ব করিতে পারিতনা। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোয়েন্দ নিয়োজিত হইয়া ইহারা রাজার কা কলাপ ও মনোভাব বন্ধুতাসূত্রে অবগত হই পরে অনর্থ উৎপাদন করিবেন—এইরূ অনেকে সন্দেহ করিত। কিন্তু সত্যের ম পড়িয়াই আছে! কিছুদিন পরে সক নিজ নিজ অমূলক সন্দেহে মনে মনে ল বোধ করিতে লাগিল।

রাজার মুখে পুরোহিতের অ অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্প সাতিশয় লজ্জিত এবং মর্ম্মপীড়িত হইলেন।

(১০)

কোন স্বাধীন জাতিভুক্ত মহদন্তঃক ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বল-রক্ষা এমনি স্বভা সিদ্ধ যে ইহার অন্যথা দেখিলে আশ্চ নির্ব্বিভেদে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘা লাগে। অধিকন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর ঘ

কোন আত্মীয়কৃত হইলে এই আঘাত ব্যথার উপর লজ্জার জ্বালা তাঁহাকে দাহন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের আহত ন্যায়-বুদ্ধিতে প্রতিকার-চেষ্টা একবার জাগিয়া উঠিলে শত নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপ ভীমবলে তাহা কার্য্য করিতে সক্ষম—তাহার দৃষ্টান্ত, হিউম রিপন প্রভৃতি মহা-প্রাণগণ। এরূপ কার্য্যকরী ত্যাগক্ষমতা দুর্ব্বল পরাধীন জাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন "এ রকম এক একটা নিষ্ঠুর ঘটনা দেখে মনে করবেন না যে, আমাদের জাতটাই এত ভীষণ! একটা কথা বলব রাজা, আমাদের স্বভাব বিকৃতির জন্য আপনারাই কিন্তু অনেক পরিমাণে দায়ী।" রাজা হাসিলেন,—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা মনে পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—

"আমি যখন সুলতানপুরে ছিলুম তখন রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণে গিয়ে একবার বড় লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। ঘরের মধ্যে দুখানি রাজসিংহাসন রাখা হয়েছিল আমাদের তাতে বসতে বলে রাজা রইলেন দাঁড়িয়ে; আমি নিজে না ব'সে তারি এক খানাতে আমার স্ত্রীর পাশে রাজাকে বসিয়ে দিলুম।—"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ পত্নী হাসিয়া বলিলেন—"বেচারার চেহারাখানা যদি তখন দেখতেন রাজা!—সে চেহারা আমি কখনো ভুলতে পারবনা। আমার স্বামী থাকবেন দাঁড়িয়ে আর তিনি কিনা বসবেন—রাজতক্তে, এমন বে-আদপী তাঁর কাছ থেকে ত প্রত্যাশা করা যায় না; তিনি কাতর ভাবে তখনি উঠে পড়লেন।"

রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"মাপ করবেন মিসেস ক্লাউডেন, অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসাটা আমরা সত্যই বেআদপী মনে করি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন—"আমরাও অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসিনে। তবে মর্য্যাদা-দান-ছলে নিজের অমর্য্যাদা করে অতিথিকে অস্বচ্ছন্দ করে তুলিনে।"

রাজা বলিলেন—"চৌকিতে বসতে ত আমরা অভ্যস্থ নই মিসেস্ ক্লাউডেন। ও সব ফ্যাসান আধুনিক ইংরাজি অনুকরণ। আমরা গালচের উপরেই ঘরে সদা সর্ব্বদা বসি। আপনারা আমাদের রীতিনীতি জানেন না বলেই রাজার ব্যবহার অদ্ভুত ভেবেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—"আপনাদের রীতি নীতি সব বুঝিনে বলে অনেক সময় ভুল ধারণা জন্মায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বড় বড় হরফে আঁকা সুস্পষ্ট স্তুতিবাদগুলোকেও যদি রীতিনীতির দোহাই দিয়ে ভুল বুঝতে পারতুম—তাহলে খুসীই হতুম রাজা।".

রাজা এবার হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা হলেন আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা, একটু আধটু স্তুতিবাদ করতে হয় বৈকি। রাজা আছেন আমাদের বিদেশে লুকিয়ে, তাঁর ত দর্শন পাইনে; আপনাদেরই রাজাসনে বসিয়ে আমরা ভক্তি প্রকাশ করি। আপনারাও যেমন আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করতে পারেন না আমরাও তেমনি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে আমাদের কোন ব্যবহারে আপনারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন; কাজেই কোন কোন সময় অদ্ভুত ব্যাপারও যে একটা না হয়ে পড়ে তা নয়।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন --"বেশ, তাহলে অন্য দিকটাও দেখুন। ক্রমাগত দুহাতে সেলাম পাওয়া অভ্যাস হয়ে গেলে একদিন এক হাতের সেলামে কি মন ওঠে? তখন তার অন্যরূপ অর্থ করাই আমাদের পক্ষেও স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম থেকে উভয় পক্ষ যদি যথাযথ ভাবে চলে ত আর কোনরূপ অনর্থের কারণ ঘটেনা।"

রাজা বলিলেন—"সাহস পাই কই মিসেস্ ক্লাউডেন? সকলেই ত আর ক্লাউডেন সাহেব বা তাঁর মেম নন; সেলাম না করলে যখন পিঠে লগুড়াঘাত পড়বে জানি তখন পিঠ বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিলেন; তাঁহার পত্নী বলিলেন—"আমি হলে কিন্তু এ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন তেজে চলি যাতে লগুড়াঘাত পিঠে পড়তে অবসর না পায়। জানেন ত রাজা, একটা তেজী বেড়াল কি কুকুর দেখলে সশস্ত্র মানুষও পিছিয়ে দাঁড়ায়।"

"কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য—তারপর এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি হাতে হাতেই তার লাভ হয়। আপনারা স্বাধীন জীব, আপনাদের মুখে তেজের কথা শোভা পায়—কিন্তু অকারণে যারা নিষ্পেষিত, রাঙা মেঘ দেখলেও তাদের মনে আগুনের আশঙ্কা জাগে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী কহিলেন, "কিন্তু এরূপ ভয়কে বিসর্জ্জন না দিলে ত কোন জাতির মঙ্গল নেই।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনিই তাহলে দেখছি জ্যোতির্ম্ময়ীর গুরু। এইরূপ ভাবের কথা আজকাল তার মুখে ক্রমাগতই শুনি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; আবেগভরে বলিলেন —"What a darling girl she is!"

রাজা কহিলেন, "Daring too! এর মধ্যে সে এক কাণ্ড করে বসেছে,—প্রসাদপুরের যত স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের হুকুম দিয়েছে"। শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি একই সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন --"ভালই ত করেছে।"

"কিন্তু বহুপূর্ব্বে আমার শ্মশ্রুহীন অবস্থায় আমিও এই রকম কাজ একবার করতে গিয়েছিলুম, তাতে কমিশনার সাহেব তখন বাধা দেন।"

মেমসাহেব এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"Nonsense!" সাহেব কিন্তু ধীর ভাবেই বলিলেন—"বোধ হয় কমিশনার সাহেব কোনরূপ ভুল বুঝেছিলেন —তিনি কি স্পষ্ট করে নিষেধ করেছিলেন?"

"জানিনা। তবে ততদূর ত সব সময় আবশ্যক হয় না। অনেক সময় ইঙ্গিতে মন বুঝে আমরা কাজ করতে বাধ্য হই। আমার কাকা মহাশয় অন্ততঃ কমিশনারের সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝেছিলেন।"

"কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝতে হলে অনেক সময়ই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। আপনারাই তাঁকে তাহলে খুব সম্ভব ভুল বুঝে থাকবেন। নইলে ব্যায়াম চর্চ্চায় ত কোনই দোষ নেই। আমার বরঞ্চ মনে হয় জর্ম্মণ দেশের মত সকল দেশেই লোক শিক্ষা আর ব্যায়াম চর্চ্চা compulsory হওয়া

উচিত। আমরা এদেশের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হয়েছি—এতে বাধা দিলে আমরা নরকগামী হব। আমি এই ব্যায়াম সমিতির প্রেসিডেণ্ট হতে চাই।"

কৃতজ্ঞতায় রাজার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি কিরূপ বাক্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন --"যদি সকলেই আপনাদের মত সদাশয় লোক হতেন ত ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য হয়ে উঠতো। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন যে আপনাদের মধ্যে এমন লোকও অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের পশুতুল্য ভেবে পশুতুল্যই নিস্তেজ ক'রে রাখতে চান।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি অধোমুখ হইয়া রহিলেন; সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; রাজা আবার বলিলেন --"আমরা ত অকৃতজ্ঞ জাত নই;—আর সত্যসত্য অসভ্য জাতও নই। এ দেশের ছোটলোক আর আপনাদের দেশের ছোট লোকদের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। অথচ মানুষের কাছে মানুষ যেটুকু ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পারে ততটুকু ভদ্র ব্যবহার আমাদের দিতে তাঁরা সৌজন্যের অপব্যয় জ্ঞান করেন। রেলগাড়ীর এক কম্পার্টমেণ্টে কোন ভারতবাসী নিগারকে তাঁরা বরদাস্তই করতে পারেন না। পশুদের কষ্টনিবারণী আইন কার্য্যকরী কিন্তু আমাদের দেশের লোক সবল বুটের আঘাতে যখন মরে তখন অপরাধটা তার প্লীহারই উপর গিয়ে পড়ে! এবং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করে, কি উচ্চ বাচ্য করে, রাজ-আইনে সেই দণ্ডনীয়। অতএব নীরবে সইতে পার ত মঙ্গল, নইলে উচ্ছন্ন যাও।"

মনের আবেগে রাজা আজ মুক্তকণ্ঠ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দুঃখিত ভাবে বলিলেন— "সকল জাতের মধ্যেই ভাল মন্দ লোক আছে রাজা।"

"তা ঠিক! আসলে আমাদের দুঃখ সেজন্য নয়--গভর্ণমেণ্টের আচরণে যে বিমাতার ভাব প্রকাশ পায়—সেইটেই আমাদের প্রকৃত কষ্টের কারণ। দেখুন একজন অধম ফিরিঙ্গিরও যেসব রাজনৈতিক অধিকার আছে, কি অপরাধে যে আমরা তাতেও বঞ্চিত তা ত বুঝতে পারিনে। এই অবিচারেই আমরা মর্ম্মাহত।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"তবুও নিরাশ হবেন না, কেবল এ দেশে ব'লে নয়—আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন অধিকার আদায় করতে অনেক কষ্ট পেতে হয়! এই দেখুন এত চেষ্টাতেও আইরিসরা কি এখনো হোমরুল আদায় করতে পেরেছে? আর সাফ্রিজিষ্ট দল ত আমাদের দেশেরই মেয়ে, ভোট অধিকার পাবার জন্য তারা কি চেষ্টাই না করছে—তবুত গভর্ণমেণ্ট অটল। সকলে যেমন কালের মুখ চেয়ে বয়েছে—আপনাদেরও সেইরূপ থাকতে হবে। যদি যোগ্যতা দেখাতে পারেন—একদিন কৃতকার্য্য হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসীম অধ্যবসায় সহকারে প্রস্তুত হতে থাকুন।"

এই সময় চাপরাশি আসিয়া একখানা

কাগজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিল, তিনি রাজার সম্মতি লইয়া লেফাফা ছিঁড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

(১১)

রাজা এই সুযোগে বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেম সাহেবের অনুরোধে আবার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে একাকী রাখিয়া উঁহারা দুইজনে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

মেমসাহেব বলিলেন—"আমার একটা কথা অনেকবার মনে হয়েছে—বলব রাজা? কিছু মনে করবেন না। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আপনারা পরমুখপ্রত্যাশী কিন্তু যে সব বিষয়ের উন্নতি আপনাদের নিজের হাতে—তাতে ত আপনাদের সমবেত চেষ্টা দেখিনে? আপনাদের ঘরে স্ত্রীজাতি যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না?"

রাজা কহিলেন—

"সকল দেশেই রাজনীতির চেয়ে সমাজ নীতির সংস্কার কঠিন তাত বোঝেন? বিশেষ আমাদের সমাজ বহুদিনের সভ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ফল। বাইরের লোকে বুঝতে পারেনা—কিন্তু আমাদের পক্ষে সমাজনীতির কঠিন বেড়া ভাঙ্গা একরূপ দুঃসাধ্য সাধন।"

"তাই ত দেখছি। আপনাদের সমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মণসভা ত বিলাত-যাত্রার পর্য্যন্ত বিরোধী! হাস্যকর!"

"এটা হাস্যকর হলেও, সমাজনীতি ভাঙ্গতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক ভাল জিনিষও হারাতে হয়, এটা ঠিক।"

"উপায় নেই। কাঁটাগাছ বাছতে গেলে অনেক সময় দুচারটা ভাল গাছও নষ্ট করতে হয়।"

"আসল কথা রাজনৈতিক অধিকার অভাবে দেশের লোকে যেরূপ সমভাবে ক্লেশ অনুভব করে—যখন কোন সমাজনীতি সকলের পক্ষে সেইরূপ কষ্টকর হবে, তখনই তার সংস্কারে সমবেত চেষ্টা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এ দেশে লোক শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষা যে আদৌ নেই সেটাও নিতান্ত ভুল। এদেশে উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে অর্থের দিক ছাড়া অন্য বিষয়ে খুব যে একটা পার্থক্য আছে তা নয়। বরঞ্চ ধর্ম্মের ভাব চাষাভূষা এবং স্ত্রীজাতির মনে যত প্রবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা নেই। তার কারণ কথকতা পুরাণ পাঠ প্রভৃতি যে সব উপায়ে এ দেশে লোক শিক্ষা হয়—তা এখন সাধারণ গ্রাম্যলোক এবং স্ত্রীজাতির মধ্যেই আবদ্ধ। ইংরাজি শিক্ষানবীশ পুরুষদের মধ্যে তার চর্চ্চার অবসর কোথা!"

"সবদেশেই স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মের ভাব বেশী—"

ক্লাউডেন সাহেব এই সময় দেখা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অর্থাৎ গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা! পাদ্রি ও পুরোহিতরা যে এজন্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ—তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।"

সকলেই হাসিলেন; তিনি রাজার পাশের একখানা আরামচৌকি দখল করিয়া লইয়া

একটা চুরুট রাজার হাতের কাছে ধরিলেন। রাজা ধন্যবাদ দানে তাহা লইতে অসম্মত হইলে নিজেই তাহা ধরাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্লাউডেনের কথার উত্তরে কহিলেন, "এস্থলে আমিও আপনার সহিত একমত। আমাদের মেয়েরা দেশের পুরাতন আচারগুলি যত্নে রক্ষা করেন ব'লেই এখনো সেগুলি টিঁকে আছে।"

"আপনি সেটা কি ভাল মনে করেন না?"

"মন্দ মনে করিনে, যদি পুরাতন মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে সব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আচারগুলিকেই ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করলে দোষ হয়ে পড়ে বই কি।"

"তবেই ত আপনি স্বীকার করছেন—যেরূপ শিক্ষায় একটা বিচার-ক্ষমতা জন্মে আপনাদের মেয়েদের মধ্যে সেরূপ শিক্ষার প্রচার আবশ্যক।"

ক্লাউডেন সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ধূমপানে মগ্ন ছিলেন, চুরুটটা হাতে লইয়া তাহার ছাই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন "রাজার মুখ দিয়ে একথা স্বীকার করাবার কি দরকার আছে ডিয়ার?"

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন,—"আমি একথাটা ঠিক রাজাকে বলছি নে, দেশের লোকের উদ্দেশে বলাই আমার অভিপ্রায়।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"দেশের লোক এ কথার কি উত্তর দেবে জানিনে, তবে—স্ত্রীজাতির মনের প্রসারতা না বাড়লে দেশের মঙ্গল নেই; এটা আমি মনে করি বই কি। অতীতের তুলনায় আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষা দীক্ষা অবস্থা যে হীন হয়ে পড়েছে, চোখ চাইলেই ত তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীশিক্ষার দিকে লোকের লক্ষ্যও পড়েছে। দেখুন না দেশের কত মেয়ে বি-এ এম্-এ পরীক্ষাও দিচ্ছেন,—আর অনেক সুশিক্ষিতা মহিলা দেশের জন্য কাজও করছেন।"

"কিন্তু আপনাদের সমাজ প্রকৃতভাবে তাঁদের স্বদলভুক্ত জ্ঞান করে কি? তাঁরা হলেন একটা show! দরকার-মত অন্য-জাতির চোখের সামনে ধরে গর্ব্ব করার বস্তু। তাই নয় কি? দেখুন, আমি কলকাতায় গিয়ে দুচারটি ধনীঘরের পরদানসীন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। তাদের স্বামীরা কনগ্রেসের লোক আর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও কাগজ-পত্রে তাঁদের বক্তৃতা পড়েছি। কিন্তু মেয়েদের ব্যবহার দেখে আমাকে ভারী নিরাশ হতে হয়েছিল।"

রাজা তাঁহার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিলেন—তিনি কহিলেন—"একটি বাড়ীতে আমি কিরূপ অপ্রস্তুত হয়েছিলুম শুনবেন? তাঁরা থালা পূরে আমাকে নানারূপ মেঠাই খেতে দিয়েছিলেন। আমার কাছেই একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল; কি কুবুদ্ধি হোল আমার, প্লেট থেকে তার হাতে একটি মেঠাই দিলুম। অমনি গিন্নি ঠাকরুণ চড়াসুরে বলে উঠলেন, "করলেন কি মেমসাহেব! ও সব ত খায় না!—ফেলেদে ফেলেদে—রাক্ষসী অসুখ করবে; ততক্ষণ মেয়েটি দিব্য করে মেঠাইটির অর্দ্ধেক গালে পূরে দিয়েছে। বৌরা ঘোমটার মধ্যে থেকে চোখ টেপাটেপি করতে লাগলেন, একটা দাসী এসে বকতে বকতে তাকে টেনে নিয়ে গেল; বেচারী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, আমার আর অপ্রস্তুতের সীমা রইল না।"

রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "মানুষে মানুষকে স্পর্শ করলে আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়—আমাদের মনের এই যে সঙ্কীর্ণতা এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা আমার শোচনীয় বলে মনে হয়। তাছাড়া মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এতে যেরূপ বর্ণ-বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে সেটাও বড় অদ্ভুত! কিন্তু আমার বিশ্বাস বেশীদিন এরকম থাকবে না।"

"শিক্ষায় কালে এসব নিশ্চয়ই চলে যাবে। কিন্তু আমি অনেক পুরুষের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি—এখনো স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা তাঁরা ঠিক উপলব্ধি করেন না। অনেকে ভাবেন—শিক্ষায় নারীস্বভাব বিকৃত হয়ে যায়। তাদের প্রাণে আর তেমন স্নেহ-মমতা থাকে না। কেউ কেউ আমার মুখের উপরেই বলেছেন, ভারত-রমণীর মত আমরা ভালবাসতে পারিনে, ত্যাগ স্বীকার করতে জানি নে, ইত্যাদি।"

ক্লাউডেন সাহেবের চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি সেটা বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "ঠিকই ত বলেছে। আমি যদি আজ মরি—তুমি কাল নিশ্চয়ই আর একটা বিয়ে করে বসবে।"

পত্নী উত্তর করিলেন "আর তুমি! fair exchange, no robbery."

"আমি! By Jove! কক্ষণো না। আমি তোমার ছবির সামনে kneel down করে থাকব, দেখে নিও।"

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখুন Mrs. Clowden, আমাদের কোন মেয়ে আপনাদের এইরূপ রসিকতা শুনলে shocked হোত?"

সাহেব বলিলেন, "Good souls! তোমরা যদি তাদের মত হতে, তাহলে কোন স্বামী মরতে ভয় পেত না!"

মেমসাহেব বলিলেন—"রাজা, ওর কথা শুনবেন না, আমরাও good souls, আচ্ছা ভাবুন দেখি রাজা, সমাজ আইনে ভারতরমণী নিগড়-বাঁধা; ইচ্ছাতে হোক অনিচ্ছাতে হোক, নিষ্ঠুর পশু স্বামীরও পদসেবা করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করতে পারি—আমাদের ডাইভোর্স আছে—একাধিকবার বিবাহ আমাদের মধ্যে দুষ্য নয়—এ সত্ত্বেও আমাদের মেয়েরা স্বামীর জন্য কত দুঃখ করে? আপনারা উপন্যাসে স্ত্রীলোকের ত্যাগস্বীকারের বিষয় যা পড়েন তা একটুও বাড়ানো কথা নয়। মহারাণী (আপনার মা) শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, সব ছেলে-মেয়েগুলিকে বিলাত পাঠিয়ে আমি একলা আছি। কিন্তু তাদের মঙ্গল ভেবেই আমরা সে কষ্ট সহ্য করি। স্ত্রীজাতির মধ্যে কষ্ট-স্বীকার আত্ম-বিসর্জ্জন স্বাভাবিক, নইলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হয় না। শিক্ষাতে এ ভাব বাড়ে, কিন্তু কমে না।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Bravo! কিন্তু কোন পাদ্রি থাকলে তোমাকে contradict করতো,—আদমের অধঃপতন হয়েছিল কেন, বল দেখি?"

"এই দেখুন রাজা—সেই আদিকাল থেকেই মেয়েরা সহ্য করে আসছে। নিজের দোষে স্বর্গচ্যুত হলেন আদম—দোষ পড়ল বেচারী ইভের ঘাড়ে।"

রাজা বলিলেন—"আমি ইভ হ'লে আদম জাতীয় জীবের ত্রিসীমা মাড়াতুম না।"

"তাতে ত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। দোষের ভাগ নিজে নিয়ে গুণগুলি ফুটিয়ে আপনাদের উজ্জ্বল করে তোলাই ত আমাদের জীবনের কাজ।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"বড় বেশী রকম আত্মপ্রশংসা করছ, challenge করতে হোল দেখছি।"

রাজা বলিলেন—"না Mr. Clowden আত্ম-প্রশংসা এ নয়; মেয়েদের আদর্শ যা হওয়া উচিত তাই ইনি বলছেন; অন্ততঃ আমরা যে রকমটা চাই।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Very sorry for you রাজা। আমি কিন্তু কিছুতেই মেয়েদের স্কার্ট ধরে চলতে রাজি নাই।"

মিসেস্ ক্লাউডেন এ কথায় আর কোন কথা না কহিয়া রাজাকে বলিলেন—"দেখুন রাজা, এদেশে এসে আমার সর্ব্বপ্রথমেই কি অভাব মনে জেগেছিল, জানেন?"

"না ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"নারীবর্জ্জিত নিমন্ত্রণ আর নারীবর্জ্জিত সভাসমিতি। কোন দেশমঙ্গল কার্য্যে মেয়েদের সহযোগিতা না থাকলে সে কাজ কি সফল হতে পারে!" রাজা নীরবে তাঁহার সুগঠিত গুম্ফযুগের অগ্রভাগ-কুঞ্চনে -মনোনিবেশ করিলেন। মেমসাহেব বলিলেন "শিক্ষাতে মেয়েদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না, তাদের কার্য্য-পরিসর দৃষ্টি-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন,—"না dear, তোমার সঙ্গে আমি এক-মত হতে পারচিনে। জ্যোতির্ম্ময়ী কেবল শিক্ষার ফল নয়, অন্য অনেক মেয়েকে তুমি ঐ রকম করে শেখাও, সে ত জ্যোতির্ম্ময়ী হতে পারবে না। genius কি সকলেই?"

"কিন্তু শিক্ষাতে geniusও ফুটে ওঠে। রত্নেরও জহুরীর হাতে মার্জ্জিত হওয়া দরকার।"

রাজা বলিলেন—"তা ঠিক! এই ভারত-ভূমিই ত সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতীর দেশ। শিক্ষার প্রভাবে একদিন আবার ভারতবর্ষ নারী-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার মনে প্রবল।"

"আর কে বলতে পারে নারীজাতির দ্বারাই ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে না?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রাজা হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিবামাত্র কন্যা তাঁহার হাতে তাহার ব্যায়াম-সমিতির একখানি নিয়মাবলী আনিয়া দিল। তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মসূত্র লিখিত ছিল—

১। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।

২। ভারত-সম্রাটের শুভ কামনা করিবে।

৩। দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিবে।

৪। নারী-সম্মান রক্ষা করিবে; এবং দুর্ব্বলের সহায় হইবে। স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫। শরীর-মনের তেজ-বৃদ্ধিকর ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে।

৬। মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৭। অযথা বল প্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না; কিন্তু অপমানিত হইলে নত মুখে তাহা সহ্য করিবে না।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারতের গ্রাম

(ফরাসী হইতে)

দেশের মাটী বড় বড় ভূস্বামীরই হউক, বা কোন বিশেষ-অধিকার-বিশিষ্ট জাতেরই হউক, কিংবা নিজেদেরই হউক, চাষা ও কারিগরেরা গ্রামেই দল বাঁধিয়া অবস্থিতি করে এবং সমস্ত ভারতে গ্রামরূপ প্রতিষ্ঠান-গুলি একই রকমের। গ্রামের বাহ্য আকারেও অল্পই বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা কতকগুলি ছোট রাস্তাকে কাটিয়া চলিয়াছে। চৌকোণা জমির মধ্যে একটা এজমালি গৃহ, অনেক সময় মাটীর কিংবা কাঠের দ্বারপ্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলধরণের দেবালয়। উঠানের মধ্যে খড়ে ছাওয়া মাটীর ঘর; সেইখানে গো-মহিষাদি পশুরা আবদ্ধ থাকে। সমৃদ্ধ পল্লীতে, খাপ্‌রার ছাদ, দেয়াল চুণ-কাম-করা: গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর উত্তাপে, এই শাদা ও লাল বাড়ীগুলা যেন একটা আনন্দের ভাব ধারণ করে।

* *
*

প্রত্যেক গ্রামে, পরিবারগুলি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত; প্রত্যেকে নিজের ব্যবসায় চালাইতেছে: কৃষক, পশুপালক, কারিগর, ছোট ব্যবসাদার, নীচকর্ম্মে নিযুক্ত লোক। কোন পরিবারের অন্তর্ধানে সমস্ত গ্রামটারই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

সকল গ্রামেই এক একজন কুলক্রমাগত প্রধান থাকে। যে গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই-ই থাকে, সেখানে ঐ দুই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত দুইজন প্রধান দৃষ্ট হয়। গ্রামস্থ প্রধানের অধীনে, একটা পঞ্চায়ৎ থাকে। পঞ্চায়ৎ নিছক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং অতি পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। (১)

* *
*

পঞ্চায়তের অধীনে ১২ জন কর্ম্মচারী। একজন জরিপ জমাবন্দী করে। আর একজন ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল গণনা করে, পঞ্জিকা তৈয়ারী করে, কখন কখন পাঠশালায় গুরু-মহাশয়েরও কাজ করে। আর কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাজে নিযুক্ত; যথা —নাপিত, কুমোর, ছুতোর, কামার, বাসন-মাজুনী, ভারী, দর্জি, খড়ম-কার, চৌকিদার। তাছাড়া বড় বড় গ্রামে, গুরুমহাশয়, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, তাঁতি, রজক ইত্যাদি। ইহাদের নীচে অস্পৃশ্য জাত; সমস্ত ঘৃণিত কাজের ভার উহাদের উপর; চর্ম্মশোধক, ঝুড়ী-কার, মেথর; এই সকল জাতের লোকেরা মাংস খাইতে পারে, এমন কি গোমাংসও খাইতে পারে, সুরাপানও করিতে পারে। ইহাদের অবস্থা অন্য গ্রাম্যলোক হইতে খারাপ নহে। বস্তুত, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থেই উহারা নীচ বলিয়া খ্যাত। উহাদের নিজ জাতের মধ্যে উহারা অন্য হিন্দুদের মতই সগৌরবে অবস্থিতি করে। উহাদের জাত-ব্যবসায় উহাদের একচেটিয়া ও বিলক্ষণ লভ্যজনক।

* *
*

ভারতের কৃষক শান্তিপ্রিয়, মৃদুস্বভাব, মিতভোজী, দানশীল; যে সকল জাতের লোককে আহ্বান করা নিষিদ্ধ নহে, তাহাদের সম্বন্ধে বেশ আতিথেয়। কিন্তু সে চরিত্রবলহীন, দৈহিক দৌর্ব্বল্যবশত কোন বড় কাজে হাত দিতে পারে না। তাহার মনের গতি বাঁধা নিয়মের বশবর্ত্তী; তার বাপ-দাদা যে সব ভুল করিয়াছে, সে ঠিক তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গল,—সমস্ত হাতিয়ার গ্রামেই গঠিত হয় এবং সেই সকল হাতিয়ার আদিম-কালের মতো অত্যন্ত সাদাসিধা। গো-মহিষাদির জোয়ালও নিতান্ত সে-কেলে ধরণের। উহারা মাটী বেশী খুঁড়িয়া তোলে না; কেবল জমির উপর আঁচড় কাটিবার মতো লঘুভাবে লাঙ্গল চালায়।

চিরদিন শিশুর মতো অবস্থিত ভারতের চাষা ব্যয়-সংযম করিতে পারে না; তাহার হাল্‌কা মন, তাহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাই। বিবাহে, শ্রাদ্ধে উহারা ব্যয়ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মোৎসব অসংখ্য। দীনতম কুটীরেও এই সকল উৎসব ব্যয়বাহুল্যসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; রোগে আক্রান্ত হইলে, কিম্বা খারাপ ফসল হইলে অমনি চাষা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। চাষাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে হয়। কোথায় টাকা ধার পাইবে? ব্যাঙ্ক নাই; বড় জমিদার খুবই কম। উহাদের নিকট যাইতে সাহস হয় না; তবে কাহার কাছে টাকা চাহিবে? —এক মহাজন আছে—সুতরাং সুদখোর মহাজন ছাড়া তার গত্যন্তর নাই।

সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলে এক ধাঁচের কুসীদ-জীবী আছে। প্রায়ই তাহাদের বর্ণনা পাঠ করা যায়। তাহারা মারোয়াড়ী (মারোয়াড়ের অধিবাসী)।

বাপমায়ের আদর-আসকারা পাইয়া শৈশবে উহারা খুব দুরন্ত হইয়া উঠে। আট বৎসর বয়সে কোন নগর বা গ্রামে উহাদিগকে মারোয়াড়ীর ঘরে শিক্ষানবীসী কাজে পাঠান হয়। যথোচিত আহারাভাবে উহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; উহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারও করা হইয়া থাকে। উহারা প্রথমে কিছুই পায় না, তাহার পর প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু পয়সা পায়। তাহার পর, মাসে মাসে কিছু টাকা পায়। ক্রমে সে তাহার মুরুব্বির

(১) ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এই প্রধানদের ভিন্ন ভিন্ন নাম; উত্তরাঞ্চলে, "মুকদ্দম" ও "লম্বরদার" (এই "লম্বরদার" শব্দটার ব্যুৎপত্তি অর্দ্ধ ইংরেজি ও অর্দ্ধ ফার্সি।); মধ্যদেশে, "পাটেল," "মণ্ডল," "দেশাই," "দেশমুখ" ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে "পাটেল" নামই বিশেষরূপে প্রচলিত। যে গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোন বিশেষ জাত, সেখানকার প্রধানকে জাতিদার বলা হয়; লম্বরদারও বলা হয়। গ্রামের মুন্সি (secretary) গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। সেই জমাবন্দি করে:—পাটোয়ারী, মজুমদার বা তলাটি। ধর্ম্মযাজক:—সংস্কৃতে পুরোহিত, গুজরাটিতে "গোর" অর্থাৎ গুরু। নাপিত:—নাই বা হাজাম (হাজাম শব্দটা আরবী)। কুমোর, ছুতোর, কামার, ধোবা, ভিস্তী বা পখালী। দর্জ্জি, মুচী, চৌকিদার, রাখোয়াড় বা পাহারী ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দই হিন্দী।

অংশী হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় বড় বড় কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে গিয়া কোন গ্রামে নিজের হিসাবে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে: লবণ, তৈল, শস্ত, খাদ্যসামগ্রী খুজ্‌রা বিক্রয় করে। সহরে মালপত্র স্বল্পমূল্যে পাইকেরী হিসাবে থোকে খরিদ করিয়া তাহাই আবার খুজ্‌রা হিসাবে ধারে বিক্রয় করে; অনেক সময় ওজনেও ঠকায়। গহনা-পত্র ঘরকন্নার সামগ্রী কাপড়-চোপড় বন্ধক রাখিয়া অধিক সুদে টাকা ধার দেয়। তাহার খাতক সর্ব্বস্বান্ত হইলে, ধারের টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য হেন-উপায় নাই, যাহা উহারা অবলম্বন করে না। বাঁধা রাখা জমি, গৃহের আসবাবপত্র বিক্রয় করে, ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া গ্রেফ্‌তার করে, দেনদারের মা, বোন, মেয়েকে দাসী করিয়া রাখে, কারখানায় মজুরনী করিয়া খাটায়, বেশ্যাগৃহে পাঠাইয়া দেয়।

অনেক প্রদেশে, গবর্ণমেণ্ট সুদখোরের হাত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তু-ভিটা যাহাতে হস্তান্তর না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রক্ষা করা দূরে থাক্ সেই সকল উপায়ে, আমার মনে হয়, তাহাদের অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে। চাষার জমি ছাড়া আর কিছুই নাই; মহাজন পীড়াপীড়ি করিলে, ঋণমুক্ত হইবার জন্য সে তাহার সমস্ত জমি কিংবা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু এক্ষণে এই ক্ষমতা তাহাকে আর দেওয়া হয় না। কতদিনে না জানি ভারতের চাষা অনেকে মিলিয়া এক জোটে চাষবাস করিতে শিখিবে, কৃষি-বেঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে! তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায়, শিক্ষাই একমাত্র উদ্ধারের উপায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা রামমোহনের স্বরূপ *

রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মানস-জগতের মধ্যে এত বিচিত্র দেশ এবং মহা-দেশ আছে যে, তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় লইতে গেলে সেই এক-একটা খণ্ড দেশেরই ব্যাপ্তি ও জটিলতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যেমন, রাজাকে যদি শুধু হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসাকার ও সমন্বয়কার হিসাবেই দেখিতে যাই, তবে বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনার মূলধারা ও উপধারা-গুলির দুর্গম পথ তাঁর সঙ্গে পার হইতে হইবে—লিভিংষ্টোনের নীলনদের উৎসস্থান আবিষ্কারের চেয়ে সে যে ঢের বিস্ময়কর আবিষ্কার! এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম-সাধনার মান-চিত্রখানি রাজার হাতে যখন প্রস্তুত হইল,

* রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে পঠিত।

তখন সেই সমগ্রের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন অথচ চিরনবীন কোন্ স্বরূপটিকে তিনি নিজে দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমাদের দৃষ্টিগম্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। তাঁর মানস জগতের মধ্যে এই একটা বিরাট মহাদেশ।

আবার রাজাকে যদি খৃষ্টান শাস্ত্রের বা মুসলমান শাস্ত্রের মীমাংসাকার রূপে দেখি-বার চেষ্টা করি, তবে অপর অপর গহন-জটিল মহাদেশের মধ্যে উপনীত হই।

আবার ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়িয়া যদি বিধিশাস্ত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও লোকাচারের দিক্ হইতে তাঁর কীর্ত্তির আলোচনা করি, তবে কি ব্যবহার-বিজ্ঞানবিৎ (Jurist) হিসাবে কি সমাজতাত্ত্বিক (Sociologist) হিসাবে কি রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ (Political thinker) হিসাবে তাঁর অদ্ভুত মনীষা তাঁর অলোক-সামান্য ভবিষ্যদ্দর্শিতা এক অজ্ঞাত-বিরাট জগতের অরণ্য-পর্ব্বত-নদী-ক্ষেত্রবিচিত্র নব নব দেশের মত আমাদিগকে কেবলি বিস্ময়ে অভিভূত করিতে থাকে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এই যুগ-গুরুর যিনি যোগ্য শিষ্য, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর এক রচনায় লিখিয়াছেন:—"His name was Legion. Hindoo Pandit, Zabardasht Moulvi, Christian Padre, the Rishi of a new man-wantara or yuga, the Imam or Mahdi of a new tradition, the prophet or Nabi of a Newer Dispensation—by what name shall I call this man?"

বাস্তবিক এই Legion বা ব্যূহই তাঁর যোগ্য নাম। রাজা রামমোহন রায় এক-মানুষ নন্, তিনি ব্যূহ-মানুষ।

যাঁরা আজ এই সভার আয়োজন করিয়াছেন তাঁদের ইচ্ছা যে, আজিকার এই জাতীয় উৎসবের দিনে, এই সভাকে যে সকল মনীষী অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁরা শ্রোতৃ-বৃন্দকে এই জাতির এযুগে যিনি উদ্বোধক, প্রবর্ত্তক ও চালক তাঁর বিরাট মানস-জগতের এক একটি মহাদেশে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। আমি সে কাজের পক্ষে অযোগ্য; আমার উপর সে ভার নাই। আমি শুধু ভাবিতেছি যে, এই যে বিরাট ব্যূহরূপী মানুষ—আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ যাঁর নাম দিয়াছেন Legion—তিনি আমাদের মত অসংখ্য অযোগ্য অকৃতী সাধারণ মানুষদের কি একেবারেই নাগালের বাহিরে?

গীতায় আছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁর অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং ভয়ানক বিশ্ব-রূপ দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন ভীত হইয়া তাঁকে তাঁর পূর্ব্বপরিচিত মানুষরূপেই দেখি-বার ইচ্ছা করিলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রসন্ন হইয়া আবার সেই রূপ ধারণ করিলেন তখন অর্জ্জুন সংবৃত্ত, সচেতা ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আমার মনে হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের ঐ বিরাট বিশ্বরূপ তাঁর মানুষ-রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে কোন্ দিক্ দিয়া ধরিব ভাবিয়া না পাইয়া তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে যতটা অভিভূত হই, ভক্তিতে ও প্রীতিতে

ততটা উচ্ছ্বসিত হইনা। অথচ জগতে কোন মহাপুরুষই জনগণের শুধু বিস্ময়ের পাত্র নন, প্রীতির আস্পদ এবং ভক্তির ও পূজার বস্তুও বটে।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যূহ-মানুষটির ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁর নিভৃত মর্ম্মস্থানে যদি যাইবার চেষ্টা করি, তবে দেখিব সেই ব্যূহের কেন্দ্রে একটি সুধার উৎস নিয়ত উৎসারিত। সে সুধা কিসের সুধা? বিশ্ব-মানবপ্রীতির অক্ষয় অফুরন্ত অপরাজিত সুধা। রাজা রামমোহনের সকল কর্ম্ম, সকল ভাব, সকল সন্ধান, সকল শাস্ত্রমীমাংসা ও বিধিমীমাংসার মূলে এই বিশ্বমানব-প্রীতি। এ প্রীতি দেশকালে বদ্ধ নয়, জাতিবিশেষে বদ্ধ নয়, ইহা দেশ-কাল-জাতির সকল সীমা অতিক্রম করিয়া নিখিল বিশ্বমানবে পরিব্যাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

সেই বিশ্বমানব-প্রীতি তাঁর জীবনে অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল বলিয়াই তিনি যে শুধু হিন্দু ধর্ম্মকে নানাপ্রকার লোকাচারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুর মুক্তির রাস্তা খুলিয়া দিলেন তাহা নহে, মুসলমান ধর্ম্মকেও তার সরিয়ৎ বা বিধিনিষেধ-কাণ্ড এবং খৃষ্টান ধর্ম্মকেও তার বহুবিধ আচার ও সংস্কারের নিগড় হইতে উদ্ধার করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টানকেও তাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের পথে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রালোচনায় যেমন তিনি হিন্দুর সঙ্গে একাত্ম, মুসলমান শাস্ত্রালোচনায় তেমনি তিনি মুসলমানের সঙ্গে একাত্ম, এবং খৃষ্টান শাস্ত্রালোচনায় তেম্‌নি আবার খৃষ্টানের সঙ্গেও অভিন্নাত্ম। মানুষকে তার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে—এই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র; তা সে মানুষ যে দেশের যে জাতিরই মানুষ হউক্‌না কেন। তাঁর জীবনচরিতে পড়িয়াছি যে, বন্ধু অথবা ভক্তশিষ্য কাহাকেও উচ্ছ্বসিত আবেগে যখন তিনি বলিতেন, "Brother, our religion is universal" তখন তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িত। এই বিশ্বমানবপ্রীতিতেই সেই মহাজ্ঞানীর ভক্তিসাধনা চরিতার্থ হইত। যেখানে, যেদেশে, যে জাতির মধ্যেই মানুষ ধর্ম্ম বা সমাজে অজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন, সেইখানে সেই মানুষের মোহপাশ ছিন্ন করিতে রাম-মোহন বীরের ন্যায় অগ্রগামী; যেখানে স্ত্রীলোক নিগৃহীত, সেখানে তার উদ্ধার-সাধনে তাঁর প্রাণপণ প্রযত্ন; যেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল, সেখানেও তার পরাভবে তিনি ম্রিয়মাণ, তার জয়-বার্ত্তায় তিনি আনন্দিত।

কোন সময়ে ভারতবর্ষকে ক্যানাডা প্রভৃতি কলোনির মত self-government বা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হইতেই হইবে, রাজা রামমোহন রায় ইংরাজ শাসনের সেই প্রারম্ভকালেই এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রিমকোর্ট ও ভারতেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদন-পত্র হইতেই দেখি যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারত-বাসীকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত, হৃতমান ও বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি কি অগ্নিময় বাণীই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরকে তিনি লিখিতেছেন, "They appeal to

you by the honour of that great nation which under your royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed." গভর-মেণ্টের নিকট হইতে license না পাইলে এদেশে কোন সংবাদপত্রাদি বাহির হইতে পারিবেনা, প্রধানত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদি এরূপ উক্তি বাহির হইতে পারে, তবে আজ রাজা রামমোহন জীবিত থাকিলে এখনকার প্রেসঅ্যাক্‌ট সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে কি বলিতেন এবং কি করিতেন, তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুধু স্বজাতি-প্রীতিতেই সেই মহান্ আত্মার প্রীতির পর্য্যবসান নয়, সকল মানবের ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে তাঁহার চিত্তকে তিনি জড়াইয়া রাখিয়া-ছিলেন। কোথায় স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তাতে তাঁর এতই আনন্দ যে তিনি ঘটা করিয়া টাউনহলে এক ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার নেপ্‌ল্‌সে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে এবং সে সংগ্রামে নেপ্‌ল্‌সের লোকদের পরাভব ঘটিয়াছে, এই সংবাদে তিনি এম্‌নি ম্রিয়মাণ হইলেন যে, সেদিন মিঃ বকল্যাণ্ড নামক ইংরাজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতে পারিলেন না। তাঁকে চিঠি লিখিলেন —"এক দুর্ঘটনার সংবাদে আমার মন এমনি বিচলিত হইয়াছে যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে, সকল ইউরোপীয় ও এশিয়ার জাতিরা স্বাধীন হইল, এ দৃশ্য আমার জীবিতকালে আমি দেখিয়া যাইতে পারিব-না।" কিন্তু "Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful"। ইংলণ্ড যাইবার পথে নেটালে এক ফরাশী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া সেই নিশানকে অভিবাদন করিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া চিরজীবনের মত তাঁর পা ভাঙিয়াছিল। সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি পুনঃপুনঃ আবেগের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "Glory, glory, glory to France!" মানুষের স্বাধীনতার জন্য এমন passion এমন একান্ত আবেগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, কে কবে কোথায় শুনিয়াছে!

বন্ধুগণ, রাজা রামমোহন রায়ের সকল পাণ্ডিত্য, সকল মনীষা, সকল ধ্যান, সকল চেষ্টার মূলে—অন্তরতম প্রদেশে—এই বিশ্ব-মানবপ্রীতি উৎসস্বরূপ রহিয়াছে। এই তাঁর যোগ, এই তাঁর ভোগ, এই তাঁর পরমধ্যান, এইখানেই তাঁর পরম রসাস্বাদ। আমরা আজকাল নরনারায়ণের পূজার মহিমা কীর্ত্তন করি; সকল নরের মধ্যে সেই বিশ্বনরকে সেই পরম এককে এ যুগে কে এমন সুনিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দের বেগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সেই নর ও নারীর সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তার স্বরূপে তাকে উদ্ঘাটিত-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

সমস্ত জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে? শুধু ধর্ম্মে নয়, শুধু সমাজে নয়,—শিক্ষাদীক্ষা বিধিবিধান এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষেত্রেও—সকল মানুষের মুক্তির জন্য যে মহাপুরুষ তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জলের আল্পনা

আঠারো

জগদীশপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ন্ত একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিল। ষ্টেশন হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকখানি তফাতে। অন্য-অন্য বারে অন্নপূর্ণা তাহার জন্য ষ্টেশনে বাড়ীর পাল্‌কি পাঠাইয়া দিতেন,—'গরুর গাড়ী যে বড় শক্ত, জয়ন্তের নরম গায়ে সে ব্যথা সহিবে না!'—এবারে অন্নপূর্ণা নাই—কে আর পাল্‌কি পাঠাইবে? দেশে আসিয়া অন্নপূর্ণার অভাব জয়ন্ত এই প্রথম অনুভব করিল!

মেঠো মেটে পথখানি মস্ত-বড় একটা অচৈতন্য অজগরের মত, আঁকিয়া-বাঁকিয়া দূরের সবুজ বনের ভিতরে হারাইয়া গিয়াছে।—দু-ধারে শষ্যভরা ক্ষেত, সর্ব্বাঙ্গে ফিকে-হলুদী রোদ মাখিয়া বর্ণবৈচিত্রে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। গরুর গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চিমাইয়া-চিমাইয়া চলিতে সুরু করিল; জয়ন্ত গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল, ভজহরি পায়ের তলায় বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।... ...

পশ্চিমের রক্ত-সাগরে শেষ-ডুব দিবার আগে, সূর্য্য যখন ধরণীর শ্যামল মুখের পানে অন্তিম দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, গাড়ী তখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্ত ধীরে-ধীরে ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ঐ দূরে তাহাদের বাড়ী দেখা যাইতেছে! আগে-আগে জয়ন্ত যখন দেশে ফিরিত, তখন দূর হইতে এই বাড়ীখানি প্রথম চোখে পড়িলেই তাহার মনটা উল্লাসে যেন উচ্চকিত হইয়া উঠিত! আজ কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাহার প্রাণটা হুহু করিতে লাগিল; তাহার আজন্মের স্নেহনীড় এবং শৈশব-স্মৃতির মহাতীর্থ ঐ বাড়ীখানি আগে যেন জীবনে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল—আর আজ যে মৃত্যুর মত স্তব্ধ, শ্মশানের মত নিরানন্দ!

গাড়ী ক্রমে বাড়ীর কাছে আসিল। হঠাৎ জয়ন্ত দেখিল, বাড়ীর একটা জানলায় পটের ছবির মত একটি স্থির মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া, তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। জয়ন্ত চিনিল, সে গৌরী!

ধীরে-ধীরে তাহার মুখ বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল,—গভীর লজ্জায় তাহার দেহ মন কেমন-যেন এলাইয়া আসিল।

বাড়ীর সুমুখে আসিয়া গরুরগাড়ী থামিল।

চোখ তুলিয়া জয়ন্ত দেখিল, জানলা হইতে গৌরী কখন্ সরিয়া গিয়াছে।

চারিদিক নীরব শোকে ভরা; কোথাও দাস-দাসী লোকজনের সাড়াশব্দ নাই,—বাড়ীতে দল পাকাইয়া দরোয়ানেরা বসিয়া থাকিত, আজ তাহাদেরও কাহাকেও দেখা যাইতেছে না ও বাড়ীর উপরের-নীচের বেশীর ভাগ জানলা-দরজাই খোলা নাই,—বৃহৎ সদর দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ;—হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এ দরজা যেন কতকাল ধরিয়া এম্‌নিই বন্ধ আছে!

এই অস্বাভাবিক নির্জ্জনতার ও জীবন-হীনতার মাঝখানে, বাড়ীখানাকে দেখাইতেছে ঠিক যেন পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীর মত!

ভজহরি সবিস্ময়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

জয়ন্ত সদর দরজায় করাঘাত করিল—একবার, দুইবার, তিনবার। সে শব্দ চারিদিকের একান্ত স্তব্ধতার নিরবচ্ছিন্ন সুর ছিঁড়িয়া দিল,—কিন্তু দরজাও খুলিল না, কারুর সাড়াও মিলিল না।

পাশের আম-কাঁঠালের বাগান হইতে একটা ঘুঘু সুধু শেষ-বেলায় করুণ বিলাপের সুরে দু-একবার ডাকিয়া, আবার যেন কি ভয় পাইয়া থামিয়া পড়িল।

ভজহরি বন্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার! এরা কেউ বাড়ী নেই নাকি?"

—"আমি পথ থেকে দেখেছি ওপরে গৌরী দাঁড়িয়েছিল।"

—"তবে?"

—"কিছুই ত বুঝছি না।"

এমনসময় বাড়ীর ওদিক্‌কার বাগানের পথে খক্‌খক্ কাশি ও ঠক্‌ঠক্ লাঠির শব্দ উঠিল।

—"এই যে! পেন্নাম হই দেওয়ান-মশাই, পেন্নাম হই!"

কালিশঙ্কর ধীরেধীরে আগাইয়া আসিলেন। বিষণ্ণমুখে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, "জয়, আর কি দেখতে এলে ভাই, সব শেষ হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত সজলনয়নে কালিশঙ্করের দিকে চাহিল। বুকের মাঝে মা-হারানোর ব্যথা নূতন করিয়া আবার উথলিয়া উঠিতেছিল, কোনক্রমে আবেগ সামলাইয়া সে বলিল, "কালিদাদা, আমাকে একটা খবরও দিতে নেই—যাবার আগে মাকে একবার প্রাণ-ভরে' শেষ-দেখা দেখে নিতুম!"

—"কি কর্‌ব ভাই, কে জানে এত-হঠাৎ এমন হবে—দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে! জানই ত, অনেকদিন থেকেই মার বুকের ব্যারাম ছিল, সেই অসুখই শেষটা তাঁর কাল হ'ল।... ...আর, খবর দিতে বল্‌ছ, কিন্তু—" বলিতে-বলিতে কালিশঙ্কর থামিয়া পড়িয়া, অধোবদনে খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—"থাম্‌লে কেন কালি-দাদা, কি বল্‌ছিলে বল না!"

—"বল্‌ব? শুন্‌লে তুমি কষ্ট পাবে কিন্তু না বলেও ত উপায় নেই ভাই!"

কালিশঙ্করের ধরণ-ধারণ দেখিয়া জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কালি-দাদা, আমার কাছে তুমি অত কিন্তু হোচ্ছ কেন?"

—"তোমাকে খবর দিয়ে ডেকে

আন্‌লে মা রাগ কর্‌তেন। মর্‌বার আগে গৌরী-দিদিকে তিনি হুকুম দিয়ে গেছেন, 'যার জন্যে আমার সত্যভঙ্গ হয়েছে এ বাড়ীতে সে যেন আর কখনো ঢুক্‌তে না পায়'! —লজ্জা-সঙ্কোচে অস্পষ্ট স্বরে, কালিশঙ্কর তাড়াতাড়ি কথাগুলো কোনরকমে বলিয়া ফেলিলেন এবং এই কঠিন ও অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়া মাটির দিকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়ন্তের মুখের উপরে তাহার অন্তর্গূঢ় ব্যথা-বেদনার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুব নীচু গলায় সে বলিল, "তাই বুঝি দর্‌জা বন্ধ?"

কালিশঙ্কর কোন জবাব দিতে পারিলেন না,—শুধু অপ্রতিভ ভাবে খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—"তাহলে গৌরী আমাকে এ বাড়ীতে আর ঢুক্‌তে দেবে না?"

কালিশঙ্কর হতাশমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ভজহরি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটিল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কী, আমার খোকন তার নিজের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পাবে না!"

কালিশঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এ বাড়ী মা গৌরীদিদিকে দান করে' গেছেন ভজহরি!"

ভজহরির চোখে একটা দুরন্ত ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুম্‌কী দিয়া বলিল, "কী! কি বল্‌লেন? তাহলে খোকন তার বিষয় থেকে সত্যিসত্যিই বঞ্চিত হয়েচে?"

তাহার সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখিয়া পাইয়া, দুই পা পিছু হঠিয়া কালি বলিলেন, "না, না, বিষয়ের অর্দ্ধেক জয়ন্তর!"

—"না, কখনি না—মা-ঠাক্‌রোন তেমন লোক ছিলেন না—এ-সব চক্র আমার খোকনকে ঠকাবার ফিকির!"

—"জয়কে কে ঠকাচ্ছে ভজহরি? না, গৌরীদিদি?"—বলিয়া কালিশঙ্কর এ ম্লান হাস্য করিলেন।

মাথানাড়া দিয়া মাথার ঝাঁক ঝাঁকড়া চুলগুলোকে এদিকে-ওদি দোলাইয়া ভজহরি বলিল, "ও-সব কতা জানি না, জান্‌তে চাইও না!"

—"জয়ের ওপরে আমার কি দরদ ভজহরি? আমি যে ওকে কোলে-পি করেছি!"

—"কে আর দরদ আচে! ব্যাচা মা হারিয়ে এতখানি পথ না-খেয়ে না-ঘুমি ছুটে এল, আর তোমরা কিনা ওকে ধ পায়েই ভিখিরীর মত তাড়িয়ে দিতে চাও দরদ থাক্‌লে এমন কতা মুখে আন পার্‌তে!"

—"কি কর্‌ব ভজহরি, এযে হুকুম!"

—"মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়—নইলে মা-ঠাক্‌রোণ কখনো এ হুকুম দিতে পার্‌তেন না। তাঁকে কি আমি জানি না? খোকন যে তাঁর বুকের নি ছিল গো!"

কালিশঙ্কর নিরুত্তর হইয়া কাশি লাগিলেন।

ভজহরি কাঁধের গামছা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "খোকনকে নিয়ে আমি এ বাড়ীতে ঢুক্‌বই,—তোমরা কে আমাকে রুক্‌তে পার, দেকি! ভজা বুড়ো হ'লেও এখনো লাটি ধরে দাঁড়াতে পারে—আর এই হাতে সে অমন দু-দশ-শো লোকের মাতা পাকা বেলের মত ফটাফট্ ফাটিয়েচে"—বলিয়া আপনার মাংসপেশী-ভরা হাত-দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সাম্‌নের দিকে বাড়াইয়া দিল!

কালিশঙ্কর অসহায়ের মত ভজহরির মুখ থেকে সরিয়া জয়ন্তের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন—ভজহরির এমন ভয়ানক চেহারা তিনি আর-কখনো দেখেন নাই।

জয়ন্ত এতক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অস্তমান সূর্য্যের দিকে অর্দ্ধমুদিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া-ছিল। ভজহরির চীৎকারে মুখ ফির'ইয়া ব্যথাভরা শান্ত স্বরে বলিল, "ভজা, চল্, ফের গাড়ীতে গিয়ে উঠি চল্!"

—"সে কি খোকন, তাকি হয়! কিচ্ছু ভাবিস-নে, বাড়ীতে আমরা ঢুক্‌বই—কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না!"

—"না রে ভজা, না! মা যে আমার ওপরে অভিমান করে' হুকুম দিয়ে গেছেন, —তাঁর এ শেষ হুকুম কি আমি ঠেল্‌তে পারি? নে, চল্!"

—"না খোকন!"

রুষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে জয়ন্ত বলিল, "ভজা!"

ভজহরি তার খোকনের তীব্র দৃষ্টির সাম্‌নে একেবারে জড়োসড়ো হইয়া পড়িল; আর দ্বিতীয় কথাটি না-কহিয়া কেঁচোর মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া সে আবার গাড়ীর উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত ফিরিয়া সহজ স্বরে বলিল, "কালি-দাদা, তবে আসি ভাই! গৌরীকে বোলো তার ওপরে আমি একটুও রাগ করি-নি। তোমরা রইলে, দেখো, তার যেন কষ্ট না-হয়!"

কালিশঙ্করের দুইচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। জয়ন্তের একখানা হাত আপনার বুকের উপরে টানিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবরুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "জয়, জয়, আমাকে যেন দোষী কোরো না ভাই! আমি তোমাদের খেয়েই মানুষ,—কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝছ ত?"

—"কালিদাদা, আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি কারুর ওপরে রাগ করিনি —রাগ কর্‌বার অধিকার আমার নেই—এ আমারি কপালের দোষ! তবে, মনে এই বড় খেদ রয়ে গেল যে, মার শেষ কাজটাও আমি নিজের হাতে কর্‌তে পার্‌লুম না।"—আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলিয়া জয়ন্ত ধীরেধীরে আবার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

কালিশঙ্কর লাঠির উপরে ভর্ দিয়া অভিভূত প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গরুর ল্যাজ্ মলিয়া গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল। সে নিদারুণ বিদায়-দৃশ্য কালিশঙ্করের আর সহ্য হইল না—তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গলা খক্‌খক্ ও লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিতে-করিতে তিনি আবার বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এবং যাইতে-যাইতে কোঁচার খুঁটে বারংবার আপনার চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জয়ন্ত তাহার শৈশবের

সোনার স্বপনে জড়ানো, বুকভরা স্নেহপ্রেমের রসে জীয়ানো সেই বাস্তুভিটার দিকে, নিষ্পলক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মৌন মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—জন্মের মত, জন্মের মত!

গাড়ী যখন খানিক তফাতে গিয়া পড়িয়াছে, জয়ন্তের আবার মনে হইল, গৌরীর ঘরের জান্‌লায় যেন একটি শ্বেত-বসনা মূর্ত্তি ছবির মত তেম্‌নি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে জয়ন্ত এবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল না,—কিন্তু তাহার বেদনাভরা ব্যর্থবাসনার সজলদৃষ্টি যেন আপনার প্রাণের মাঝখানে অনুভব করিল।

তাহার বাড়ীখানি দেখিতে-দেখিতে ক্রমেই স্পষ্টতর সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ঠিক পথের বাঁকের উপরে অন্ধকারের নীড়ের মত একটা মস্ত বাঁশঝাড়, আলোকহীন নিষ্প্রভ আকাশের দিকে তাহার শতশত কঙ্কালসার হাতগুলো বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ী মোড় ফিরিতেই জয়ন্তের বসতবাড়ীখানা তাহার আড়ালে হারাইয়া গেল।

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভজহরির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ভজহরি ধরা-ধরা গলায় বলিল, "একি কর্‌লি খোকন! নিজের ভিটে ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে পরের মত কোতায় চল্‌লি?"

জয়ন্ত চোখ মুদিয়া শ্রান্ত স্বরে বলিল, "এ মায়ের আদেশ, এর ওপরে আর কথা কোস্‌-নে ভজা!"

চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ যখন মুখ রাঙা করিয়া বনের কালো-কালো পাতার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, গাড়ীখানা তখন একটা তেমাথায় আসিয়া পড়িল।

জয়ন্ত হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ভজা, এ পথে শ্মশানে যাওয়া যায়, না?"

বসিয়া-বসিয়া ভজহরি ঢুলিতেছিল,—জয়ন্তের স্বরে সচমকে মুখ তুলিয়া চোখ কচ্‌লাইয়া বলিল, "অ্যাঁ,—কি বল্‌চিস্?"

—"ঐটে ত শ্মশানের পথ?"

—"হুঁ!"

জয়ন্ত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া পড়িয়া বলিল, "ভজা, তোরা এইখানে একটু দাঁড়া —আমি এখনি আস্‌ছি।"

দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া ভজহরি বলিল, "সে কি রে! তুই কোতা যাবি?"

—"শ্মশানে।"

ভজহরি আঁকুপাঁকু করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই রাত্তিরে, এই অন্ধকারে শ্মশানে? এ্যাঁ—বলিস্ কিরে, ক্ষেপ্‌লি নাকি?"

—"না ভজা, আমি যাবই! এ পৃথিবীতে মা যেখানে জন্মের মত শেষ শোয়া শুয়েছেন, দেশ থেকে বিদায় হবার আগে সে ঠাঁইটা একবার চোখেও দেখে যাই।" —জয়ন্ত হন্‌হন্ করিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

ভজহরি তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া ও একগাছা লাঠি লইয়া জয়ন্তের পিছনে পিছনে উঠিতে-পড়িতে ছুটিল।

নদীর ধারে থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যে, অস্ফুট চন্দ্রালোকে বড়বড় অশথ্-বটের তলায়, খানিক কালো খানিক আলো মাখিয়া

উঁচু-নিচু ঢিপি-ভরা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো শ্মশান-ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে গাছের মাথায়-মাথায় ধাক্কা মারিয়া, অশরীরি প্রেতের মত অশান্ত বাতাস গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিতেছে, আর বটের দীর্ঘ ঝোলা-ঝোলা জটগুলো যেন কাহাদের শীর্ণ অঙ্গুলির মত বাঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা-গুলো চেরা গলায় অশ্রান্ত স্বরে ডাকিতেছে আর ডাকিতেছে,—সে-যেন প্রেতলোকের নরক-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ!

ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, ভয়ে-ভয়ে সে বলিল, "রাম, রাম, রাম!"

গভীর নিশীথে মড়াদের এই হাড়ের বিছানায় হঠাৎ জ্যান্ত মানুষের পদক্ষেপে কাদের যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল—কারা যেন আশপাশ আনাচ-কানাচ হইতে ফুস্‌ফুস্ করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল—সেই শব্দে ভজ-হরি অত্যন্ত আতঙ্কে আৎকাইয়া উঠিল!

—"ভজা, ও কিছু নয় রে, আমাদের দেখে শেয়ালগুলো পালিয়ে গেল!"

ভজহরির গলায় একটা ঘড়্‌ঘড় শব্দ উঠিল মাত্র—সে কোন জবাব দিতে পারিল না।

—"ভজা, আলোটা একটু তুলে ধর্!"

ভজহরি কাঁপিতে-কাঁপিতে লণ্ঠনটা কোন-মতে মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল।

সেই আলোতে এদিক-ওদিক চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল, কাছেই একটা সদ্য-জ্বালানো ভস্মভরা চিতা! এইখানেই অন্নপূর্ণার নশ্বর দেহ শেষ অগ্নিশয্যায় শয়ন করিয়াছিল।

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে সেই নির্ব্বাপিত চিতার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। চিতার ভস্মরাশির মধ্যে তখনো টুক্‌রো-টুক্‌রো কতগুলো হাড় দেখা যাইতেছে —তাহার সেই স্নেহময়ী করুণারূপিনী জননীর কোমল ফুলের মত দেহের ইহাই শেষ চিহ্ন!

জয়ন্ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, ওমা! ইহলোকে আমার ওপরে অভিমান করে' তুমি চলে গেলে, পরলোক থেকে এখন আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর!" এই বলিয়া চিতার মধ্যে বিহ্বল পাগলের মত উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল—অজস্র অশ্রুজলে শ্মশানশয়নের অস্থি-ভস্ম সিক্ত করিয়া তুলিল।

ভজহরির চোখ একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। সমস্ত ভয়-ভাবনা ভুলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তকে চিতা হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "যাঠ্, যাঠ্ চিলুতে শুয়ে এমন সোনার দেহের অকল্যেণ করা! তুই যদি এমন করিস্ খোকন, আমি তাহলে মাথা খুঁড়ে মর্‌ব! চল্, এই রাত্তিরেই এখন নদীতে চল্, শ্মশান ছুঁলে নাইতে হয়!"

উনিশ

কলিকাতায় ফিরিয়া জয়ন্ত শুনিল, জগৎবাবু ইন্দুকে লইয়া দেওঘরে চলিয়া গিয়াছেন!

তাহার মাতৃশোকের উপরে এ আঘাত বড় নিদারুণ বাজিল। জগৎবাবু চলিয়া গিয়াছেন! সে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেও পারিল না!

না-বলিয়া মা গেলেন, গৌরীও আশ্রয় দিল না, দেশে তাহার ঠাঁই নাই—এ-হেন

দুঃসময়ে জয়ন্ত যাহার কাছ হইতে একটু-খানি শান্তির প্রত্যাশা করিতেছিল, তাহাকেও দেখিতে না-পাইয়া তাহার উদাসী প্রাণমন একেবারে হ্যাতাইয়া পড়িল।

ইন্দুর উপরে তাহার রাগ হইল, ঘৃণা হইল, অভিমান হইল!—যাহার জন্যে সে আজ সর্ব্বস্বহারা, সেও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না! একদিনের মিথ্যা কলঙ্কে এতদিনের ভালোবাসা যে ভুলিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে কখনো ভালোবাসে নাই;—ইন্দুর প্রেম কপট প্রেম—এ প্রেমে প্রাণপণে নির্ভর করা তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে; পরকে সে আপন করিতে ত পারিলই না—মাঝখান থেকে সুধু আপন-জনকেই পর করিল!

আজ কয়দিন ধরিয়া জয়ন্তের হৃদয় এম্‌নি-সব কথা ভাবিয়া রাগে-দুঃখে-অভিমানে তোল্‌পাড় হইয়া উঠিতেছে আর দিনে দশবার সে এই-বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে, ইন্দুকে সে ভুলিবে, ভুলিবে—ইন্দুকে সে ভুলিবেই!... ... ...জয়ন্ত একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে, ইন্দু হয়ত এখনো তাহাকে ভালোবাসে, ইন্দু হয়ত তাহার পিতার ইচ্ছাতেই দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছে!

বাস্তবিক, প্রেম এম্‌নি পল্‌কা, একটুতেই এম্‌নি বাঁকিয়া পড়ে,—প্রেমিকের মনো-জগতে এম্‌নি "ক্ষণেকে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ!"

আজ সকালে জয়ন্ত যখন অস্কার ওয়াইল্ডের কাব্যরসের ভিতরে আপনার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিহিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল, তখন ভজহরি আসিয়া দরদ-ভরা কণ্ঠে বলিল, "আহা, পথে একটা ভিখিরী পড়ে আচে দেকে এলুম, তার ওপরে 'মার কৃপা' হয়েচে খোকন!"

বই হইতে চোখ তুলিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বসন্ত হয়েছে! কোথায়?"

—"এই আমাদের বাসার দুচারখানা বাড়ীর পরেই! ব্যাচারী একজনদের রোয়াকে উঠে শুয়েছিল, তা তারা তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে! সে এখন পথে পড়ে'-পড়ে' চেঁচিয়ে কেঁদে মরচে—দেকে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু দুঃখু করে' কি আর করব বল্ খোকন—এ-সবই গ্যালোজন্মের কর্ম্মফল! কার কপালে কি আচে, কে বল্‌তে পারে—হরি হে, তোমার মহিমে বোঝা ভার!"—বলিয়া ভজহরি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হরির উদ্দেশ্যে একটি দৃশ্যমান প্রণাম করিল।

জয়ন্ত বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিতে-দিতে বলিল, "ভজা, আমার সঙ্গে আয়!"

—"কোতায় খোকন?"

—"আয়, দুজনে মিলে ধরাধরি করে' সে বেচারীকে একখানা গাড়ীতে তুলে হাঁস্‌পাতালে দিয়ে আসি!"

ভজহরির মুখ শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া গেল। হাঁউমাউ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই তাকে ছুঁবি কিরে!"

—"চোখের সাম্‌নে একটা মানুষ পথের ওপরে পড়ে ছট্‌ফটিয়ে মর্‌বে, আর আমরা হাত-গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাই দেখ্‌ব? মানুষ হয়ে মানুষকে সাহায্য কর্‌ব না!

ছিঃ ভজা, তোর মুখেও এমন কথা শুন্‌তে হোলো!"

ভজহরি বোকা বনিয়া লজ্জিত মুখে মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে জয়ন্তের পিছনে-পিছনে চলিল,—সে খোকনকে বুঝাইতে পারিল না—তাহার আসল ভয় ও ব্যথা কোন্‌খানে!

* * * * *

এই ঘটনার দুদিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত বাসায় ফিরিয়া বলিল, "ভজা, আমার জ্বর হয়েছে, গলায় আর কোমরে ভারি ব্যথা!"

সেই রোগী ভিখারীকে ছোঁয়া-ঘাঁটার পর হইতেই ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল,—জয়ন্তের জ্বর ও গায়ে ব্যথা হইয়াছে শুনিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল!

তাড়াতাড়ি জয়ন্তের কপালে হাত রাখিয়া সে বলিল, "তাইত রে, তোর গা যে আগুণ!"

জয়ন্তকে ধরিয়া তখনি সে বিছানায় শুয়াইয়া দিল। ঘরের সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করিয়া রোগীর শিয়রে আসিয়া বসিল। কাতর স্বরে বলিল, "খোকন, তখুনি মানা করেছিলুম, গোঁয়ারতুমি করে' ভিখিরীটাকে ক্যানো ছুঁলি বল্ দেকি!"

জয়ন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এতদিন ধরে নিজের স্বার্থেই প্রাণকে খাটিয়ে দেখলুম ত, কিন্তু কি কর্‌তে পারলুম ভজা! আর আজ একদিন পরের উপকারে প্রাণকে খাটাতে গিয়ে যদি নিজের প্রাণের ভয় করি, তবে তেমন দুর্ব্বল প্রাণে দরকার কি বল্ ত?"

ভজহরি মহা চটিয়া বলিল, "অত আর বক্‌বক্ কর্‌তে হবে না, চুপচাপ শুয়ে থাক্! ক্যাতাব পড়ে তোর জ্ঞান হয়েচে না ঘোড়ার ডিম হয়েচে—হয়েচিস্ খালি কতার ভট্‌চায্!"

জয়ন্ত সেই স্নেহের ভৎর্সনায় একটু-খানি হাসিয়া পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল।

ভজহরি তাহার কপালে কয়েকটি পয়সা ছুঁয়াইয়া দেবতার কাছে মানত্ করিয়া তুলিয়া রাখিল।

শেষরাত্রে জয়ন্তের জ্বর আরো বাড়িয়া উঠিল—জ্বরের ঘোরে সে যা তা ভুল বকিতে সুরু করিল।

ভয়ে ভাবনায় আকুল হইয়া ভজহরি সারা রাত ঠায় জাগিয়া বসিয়া রহিল এবং দুইহাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বারংবার বলিতে লাগিল, "ঠাকুর; তুমি প্রাণ চাও ত আমার প্রাণ নাও, আমি মরি তায় ক্ষেতি নেই, খোকন আমার সেরে উঠুক্!"

কুড়ি

সক্কাল বেলায় অবনী সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক্‌টি দিয়াছে, অম্‌নি বাহির হইতে হেঁড়ে গলায় ডাক্ আসিল, "অবনী, বাড়ী আছ হে?"

—"কে, স্বর্ণ নাকি? আরে এস, এস, বাড়ীর ভেতরে এস।"

মিনিট-খানিক পরেই স্বর্ণেন্দু জুতো মস্ মস্ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

অবনী চাকরকে আর-এক পেয়ালা চা

আনিতে হুকুম দিয়া স্বর্ণেন্দুকে বলিল, "হাঁহে, এ ক-দিন তোজবাজির মত হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে বলত? একেবারে এ-মুখো হও-নি বড় যে?"

স্বর্ণেন্দু একসঙ্গে চোখ-মুখ-নাখ কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "আরে রাম রাম, সে কথা আর বল কেন? তোমাদের ঐ জয়ন্ত ছোঁড়াটা যে শুক্‌নো বাঁশের মত এমন নীরস, তা কি ছাই আগে জান্‌তুম? সে শাসিয়ে এসেছে, আমাকে ধর্‌তে পার্‌লে দেখে নেবে—অর্থাৎ, আমাকে যত-খুসি ঘুষি-চড় মার্‌তে একটুও কসুর কর্‌বে না! জানই ত, গায়ের জোরের জন্যে আমি কখনই বিখ্যাত নই—সুতরাং মুষ্টি-বৃষ্টি থেকে আত্ম-রক্ষা কর্‌তে হ'লে অদৃশ্য হওয়া ছাড়া আমার পক্ষে গতিরন্যথা! তাই এ-পাড়ায় আসি-নে আর! এতদিনে বোধহয় তার রাগ পড়ে গেছে—কি বল?"

—অবনীর চোখদুটোর ভাব এমনধারা হইয়া গেল, যে, তার সঙ্গে অনায়াসে খুব বড়বড় ছানাবড়ার তুলনা করা যাইতে পারে! আশ্চর্য্য স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"জয়ন্ত তোমাকে মার্‌বে বলেছে! কেন হে?"

—"সে কথা পরে হবে-অখন, আগে ওদিক্‌কার, অর্থাৎ জগৎবাবুর খবর কি বল দেখি শুনি! জয়ন্ত এখনো সেখানে যাওয়া-আসা করে নাকি?"

—"হঠাৎ তুমি এটা জান্‌তে চাইছ কেন?"

—"কারণ আছে, বল না!"

—"দেখ স্বর্ণ, ব্যাপারটা যে কি, স্পষ্ট সব শুনি-নি—তলিয়েও বুঝি-নি। তবে জগৎবাবু একদিন ভয়ানক ক্ষাপ্পা হয়ে একঘর লোকের সুমুখেই জয়ন্তকে যাচ্ছে-তাই অপমান করে' একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। তাঁর কথাবার্ত্তায় বুঝলুম, জয়ন্তের চরিত্র নাকি ভালো নয়।"—এই বলিয়া অবনী সেদিনকার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপরে পা-দুটো তুলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু দু-পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে লাগিল। তাহার তপ্ত মুখ দেখিয়া বোধ হয়, জয়ন্তের দুর্দ্দশার কাহিনীটা তাহার কাণে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত মধুবৃষ্টি করিতেছে!

অবনী চায়ের পেয়ালাটি শেষ-চুমুকে নিঃশেষ করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, রুমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেদিন জয়ন্তের মুখ দেখে আমার ভাই প্রথমটা একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তুমি ত জানই, আমি সকলকেই ক্ষমা কর্‌তে পারি—কেবল চরিত্রহীনকে নয়। জয়ন্ত যে ভেতরে-ভেতরে এমন ডুবে-ডুবে জল খায় আমি ত কখনো কল্পনাও করি-নি।"

ঠোঁট্ টিপিয়া একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "দুর্নীতি দুর্নীতি করে' আঁৎকে ওঠা, তোমার চিরকেলে পাগ্‌লামী। ঐজন্যেই তোমার সঙ্গে আমার সব-জায়গায় বনে না!"

অবনী বিরক্ত স্বরে বলিল, "না-বনে না বন্‌বে! ওটা আমার পাগলামী নয়—ওটা আমার প্রিন্সিপ্‌ল্।"

—"যাক্, বাজে তর্ক নিয়ে খাম্‌কা মাথা গরম কর্‌তে চাই না।"

—"হ্যাঁ, তাই ভালো; তোমার মত্ আমার মত্ দুটি সরল রেখার মত; যতই টানাটানি কর্‌বে ততই বেড়ে যাবে, কিন্তু মিল্‌বে না কিছুতেই।"

—"তাহলে ও অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করে' লাভ নেই। আচ্ছা, জয়ন্ত সেদিন নিজের পক্ষ-সমর্থন করে' কিছু বলে-নি?"

—"বল্‌লে, সে নির্দ্দোষ। আরো কি-সব বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু জগৎবাবু তাকে আর-কিছু বল্‌তে অবকাশ দিলেন না।"

—"তবে আর কি, তোমার ইন্দুলেখা-লাভের পথ এবারে নিষ্কণ্টক হ'ল!"

অবনী একটুও আনন্দের ভাব না দেখাইয়া, কেমন হতাশ স্বরে বলিল,—"কিছুমাত্র হয়-নি! ইন্দুলেখার মন খারাপ বলে জগৎবাবু তাকে নিয়ে দেওঘরে চলে গেছেন। যাবার আগে আমি আর-একবার বিবাহের কথা তুলেছিলুম, কিন্তু জগৎবাবু স্পষ্টই জবাব দিলেন ইন্দুলেখা আমাকে পছন্দ করে না। দেখ দেখি স্বর্ণ, আমাকে ইন্দুর পছন্দ হোলো না—তার পছন্দ হোলো কিনা ঐ দুশ্চরিত্র জয়ন্তকে! স্ত্রীলোকের মর্ম্ম বোঝা ভার!"

স্বর্ণেন্দু টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলিয়া লইয়া তার পিছনদিক দিয়া কাণ খুঁটিতে-খুঁটিতে, পরম আরামে চোখদুটি মিমিত করিয়া বলিল, "তাহলে জয়ন্তের সঙ্গে ইন্দুলেখার বিবাহ না হ'লেও তোমার আশা-ভর্‌সা একেবারে ফর্‌সা?"

—"কাজেই। আমি আর ও-কথা নিয়ে মিছে ভেবে মর্‌তে প্রস্তুত নই। যা অসম্ভব—তা অসম্ভব।"

—"তা যদি হয় তবে আমার আর কোন হাত নেই। জয়ন্ত তোমার পথের কাঁটা হয়েছিল, আমি অনেক ফন্দি এঁটে তাকে সরিয়ে দিলুম। কিন্তু ফন্দি এঁটে তোমার ইন্দুর মন-ফেরানো ত আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বে না!—স্ত্রীলোকের প্রেম হচ্ছে দামোদরের বন্যার মত;—বুঝেছ অবনী, সে একবার বাঁধ ভাঙ্‌লে সুপথ-কুপথ কিছুই বাছে না—যেদিকে চলেছে সেদিক থেকে আর কোনমতেই ফেরে না! আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে জয়ন্তকে আমি বিদায় করেছি বটে, কিন্তু ইন্দুর মন থেকে সে এখনো বিদায় হয়-নি!"

বোকার মত হাঁ-করিয়া স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবনী বিস্মিত স্বরে বলিল, "কী পাগলের মত বক্‌ছ!"

—"অর্থাৎ, আমিই কৌশল করে' জগৎবাবুকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছি যে, জয়ন্ত লোকটা বাইরে সাধু, কিন্তু ভিতরে ভণ্ড!"

চেয়ারখানা টানিয়া স্বর্ণেন্দুর কাছ-ঘেঁষিয়া বসিয়া অবনী কৌতূহলের সহিত বলিল, "আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি!"

স্বর্ণেন্দু খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, "তুমি যে-রকম নীতিবাগীশ, তাতে সব কথা তোমাকে খুলে বল্‌তে আমার ভরসা হচ্ছে না। উল্টে হয়ত শেষটা আমাকেই দুষে বস্‌বে!"

অবনী বুঝিল, জয়ন্তের বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু কি-একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। বর্দ্ধিত কৌতূহলে সে বলিল, "স্বর্ণ, তোমার এ

লুকোচুরি আমার ভালো লাগছে না ভাই। স্পষ্ট করে' সব খুলে বল।"

বলিবার জন্য স্বর্ণেন্দুরও পেট ফাঁপিয়া উঠিতেছিল; আসল কথা ঢাকিয়া রাখিলে সেযে কতবড় একজন সেয়ানা বুদ্ধিমন্ত লোক সেটাও যে ঢাকা থাকিয়া যায়! অতএব সে আর-কোন ইতস্তত না-করিয়া সেদিনকার সমস্ত ঘটনা গড়্‌গড়্‌ করিয়া বলিয়া গেল।

অবনীর মুখ শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া সে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া, স্তম্ভিতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, "স্বর্ণ, এ কাজটা গর্হিত হয়েছে। এতে তোমার বুদ্ধির চেয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশী করে' পাওয়া যাচ্ছে! কেননা, তুমি কি ভাব্‌ছ জয়ন্ত এতবড় মিথ্যে অপবাদটা মুখ বুঁজে মাথা পেতে নেবে? সে যখন তোমার নাম করে' আসল ব্যাপারটা জগৎবাবুর কাছে খুলে বল্‌বে,—তখন?"

—"স্পষ্টই বল্‌ব, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনা। এমন-কি হুস্‌না-বাইকেও যদি আন্‌তে হয়, চাইকি তাও আন্‌ব। তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। বাইজী এসে সাফ্‌ বল্‌বে, জয়ন্ত হামেসাই তার বাড়ীতে গিয়ে মদটদ্‌ খায়, গান-বাজ্‌না শোনে। আরো বল্‌বে, সে আমাকে কখনো চক্ষেও দেখে-নি।"

অবনী একেবারে থ হইয়া গেল। তারপর চোখ পাকাইয়া বলিল, "উঃ, এমন ভয়ানক মিথ্যাকথা সাজাতে তোমার বুক একটুও কাঁপ্‌বে না?"

স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মিথ্যাকে তোমরা যতটা ভয়ানক বলে কল্পনা কর, মিথ্যার আসল রূপ ততটা ভয়ানক নয় হে! সত্য ত পঙ্গু, দুর্ব্বল,—জগতে মিথ্যার মত কার্য্যকর আর কি আছে?"

স্বর্ণেন্দুর একখানা হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া অবনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "থামো, থামো! তোমার এ সয়তানী দার্শনিকতার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। জয়ন্তকে আমরা ভালো না-বাস্‌লেও অকারণে তার ওপরে এই অপবাদ দেওয়াতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। যদি আসল ব্যাপারটা কোনগতিকে জাহির হয়ে যায়, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে পড়্‌তে হবে। তখন সমাজে আমি যে আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না!"

স্বর্ণেন্দু ব্যাজার হইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "এইজন্যেই তোমাকে ত আমি কিছু বল্‌তে চাইছিলুম না। জয়ন্ত আমাদের কি-রকম ঘৃণা আর তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে, সে-সব এরি-মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?"

অবনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জয়ন্ত হয়ত তোমাকেই ঘৃণা কর্‌ত। আমার সঙ্গে তার মতে মিল্‌ত না,—এই পর্য্যন্ত।"

স্বর্ণেন্দু ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর ইন্দুলেখাকে বিবাহ করে' সে তোমার মুখের গ্রাস যে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, সেটাও বুঝি কিছু নয়? অবনী, তোমার সেদিনকার কথা আমি এখনো ভুলি-নি, বুঝ্‌লে?"

—"এইটুকুর জন্যে একজন সৎলোককে মিথ্যে কথা কয়ে অসৎ বলে প্রতিপন্ন কর্‌তে

হবে! তোমার মত আমি এখনো ততটা পাষণ্ড হ'তে পারি-নি!"

—"সৎ আর অসৎ একটা কথার কথা! যারা সৎ, তারা কখনো অসৎ হবার অবকাশ পায়-নি বলেই সৎ!"

—"যাই বল আর যাই কর, এ-ব্যাপারে আমি নেই। পিছল পথে চলে শেষটা যদি আছাড় খাই, তখন আমাকে তুল্‌বে কে? ... ... উঁহুঃ, এ ব্যাপারে আমি নেই!"

—"তা না থাকো, না থাক্‌বে! কিন্তু তোমার মুখটা অন্তত বন্ধ রেখ।"

—"যখন সব শুনেছি তখন আমি মুখও বন্ধ রাখ্‌তে পার্‌ব না। শেষটা তোমায় সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়ি, আর জয়ন্ত-বেচারীর ঘাড়ে যে কলঙ্কের বোঝা চেপেছে সেইটে আমার ঘাড়েই এসে চাপুক্‌ আর কি! না স্বর্ণ, সে-সব হচ্ছে না—"

বিষম রাগে স্বর্ণেন্দুর কটা মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—চোখদুটো ভাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। ঠোঁট্‌ কাম্‌ড়াইয়া টেবিলের উপরে দুম্‌-করিয়া একটা ঘুসি মারিয়া সে চ্যাঁচাইয়া বলিল, "তুমি এমন কাপুরুষ? ধিক্‌!"

অবনী তাহার রাগ দেখিয়া ভ্রুক্ষেপও করিল না; দৃঢ়স্বরে বলিল, "দুর্নীতি আর দুর্নামের সুমুখে আমি চিরকালই এম্‌নি কাপুরুষ থাক্‌ব! ইন্দুলেখার সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ হয়, তুমি সেইজন্যে সাহায্য কর্‌বে বলে ভরসা দিয়েছিলে! এরই নাম তোমার সাহায্য করা? কী ভয়ানক! তোমার মত বন্ধুর হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!"

স্বর্ণেন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"

—"স্বর্ণ, তুমি যদি চুরি করেই থাক, সে আমার জন্যে কর-নি! তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি, জয়ন্তের ওপরে তোমার রাগ আছে বলেই তুমি এ-কার্য্য করেছ! যাক্‌—এইবেলা কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতা থেকে মানে-মানে সরে পড়! আমি সব কথা শীঘ্রই প্রকাশ করে' দেব—নইলে আমাকে গুরুতর পাপে পাপী হ'তে হবে!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ

(Spectroscopy)

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অগষ্ট তারিখে যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন তথ্য প্রচার করে। ঐ দিনে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হয়, এবং শুধু ভারতবর্ষ হইতেই তাহা দেখা গিয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখি যে পৃথিবীর কোন এক স্থান হইতে যদি পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতেই যে পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে, এমন নয়। সেইজন্য ঘটনা-স্থলটী (ভারতবর্ষ) বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, যতদিন বিদ্যার গৌরব থাকিবে, ততদিন উক্ত সূর্য্য-গ্রহণ জগতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই ঘটনা হইতে বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক খুলিয়া গেল। বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) জন্মলাভ করিল। বর্ণ-বিশ্লেষণ হইতে জগতের যে কতখানি লাভ হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের কাহারো অবিদিত নহে। আমার মনে হয়, উক্ত সূর্য্যগ্রহণ-দিবসে বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রথম কাজে লাগানো হইল; সেই সঙ্গে কত মৌলিক তথ্যও প্রচারিত হইল। আলোক-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রে (spectroscopy) নেত্র সংলগ্ন রাখিয়া তথ্যান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধনীগণ তাঁহাদের সহায়তা কল্পে মুক্ত-হস্ত হইলেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য-নূতন তথ্যের আবিষ্কারে জগৎ মুগ্ধ হইল, নব-নব সত্য লাভ করিতে লাগিল।

পূর্ণগ্রহণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কখনো কোথাও 'কালে-ভদ্রে' ঘটে। সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণকালে (total eclipse) রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র সাহায্যে যে সকল মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, কেবলমাত্র দূর-বীক্ষণ সাহায্যে সে গুলির সন্ধান অসম্ভব। পূর্ণগ্রহণকালীন দৃগ্‌বিষয়গুলির গুণ ও ধর্ম্ম কেবলমাত্র রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র সাহায্যেই সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা সম্ভব। ১৮৬৮ সালের পূর্ণগ্রহণ-প্রসূত ফলাফল অতি চমকপ্রদ। পরবৎসরে ৭ই অগষ্ট তারিখে উত্তর আমেরিকা হইতে আবার সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে আবার বৈজ্ঞানিকগণ রশ্মিনির্ব্বাচণ যন্ত্র (Spectroscope) ব্যবহার করেন। এবারকার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলও বিশেষ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমেরিকায় লিপিবদ্ধ পরীক্ষা-ফলের সহিত ১৮৬৮ সালের ভারতে লিপিবদ্ধ ফলাফলের কোথাও প্রভেদ নাই। উভয় গ্রহণেরই ফল রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উপর একইরূপ। উভয় গ্রহণের ফলাফল ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান-পরিষদে বিচারার্থে প্রেরিত হয়। বিচারে বর্ণ-বিশ্লেষণের (Spectrum analysis) জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। উপাদান-নিরূপণে বর্ণ-বিশ্লেষণ যে একটি সূক্ষ্ম প্রণালী - ইহাতে বৈজ্ঞানিকদিগের আর কোন সন্দেহ নাই। কাজেই উন্নত সমাজে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সকলে এই অভিনব বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে বস্তুর উপাদান-নিরূপণে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইল। বহু যোজন দূরে অবস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির উপাদান নির্ণীত হইতে লাগিল।

এমন চমৎকার বর্ণ বিশ্লেষণ-প্রণালীর একটা বিস্তারিত বিবরণ বাংলা ভাষায় নাই। একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মি লাগিয়া অতি সুন্দর সাতরঙা ছবির সৃষ্টি করে; সেই সাতরঙা ছবির নাম বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum)। সূর্য্য বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-নিঃসৃত আলোক 'সাদা চোখে' এক-জাতীয় বলিয়াই মনে হয়।

সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের আলোক 'আসল আলো' বলিয়াই বিজ্ঞান-জগতে প্রসিদ্ধ; এবং প্রদীপ, বাতি, বিজলীবাতি (electric light) ইত্যাদি 'নকল আলো' বলিয়া পরিচিত। আসল আলো ও নকল আলোর বিভিন্নতা 'সাদাচোখে' ধরিতেই পারা যায় না। একটি উজ্জ্বল, অপরটি উজ্জ্বলতর; একটি লাল, অপরটি নীল,—এইরূপে তাহাদের মধ্যে 'সাদা চোখে' মাত্রা ও বর্ণবোধ ব্যতীত আর কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে উক্ত আলোগুলি অন্য রূপে দেখা দেয়। সেগুলি অতি সুন্দর রঙিন ছবির আকার ধারণ করে। এই ছবির (বর্ণ-পুচ্ছের) আকার-প্রকার, গঠন উপাদান আলোকপ্রদ দ্রব্য-বিশেষের উপর নির্ভর করে। এক এক রকম পদার্থের এক এক রকম বর্ণ-পুচ্ছ। একের বর্ণ-পুচ্ছ অপরের বর্ণ-পুচ্ছের সহিত মেলে না; একের ছবি অপর ছবির অনুরূপ নয়। তাহা হইলেই দেখি, প্রত্যেক দ্রব্য গ্যাসে পরিণত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইলে এবং সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক দ্রব্যের এক একটি বিশিষ্ট রঙিন ছবি বা বর্ণ-পুচ্ছ (Spectrum) আছে। এই বর্ণ-পুচ্ছ-পর্য্যবেক্ষণে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সাদা আলো ত্রিশিরা কাচের মধ্যে গিয়া মনভুলানো রঙিন ছবিতে পরিণত হইল! যেমন-তেমন রঙিন নয়, সে এক বিচিত্র লীলায় লীলায়িত অপরূপ রঙিন! এক একটি জিনিষের এক এক রকম রঙিন ছবি। জিনিষ চিনিবার এ কি কম সুবিধা! এমন চমৎকার উপায় আজ পর্য্যন্ত আর বাহির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum) যদি কাগজে চিত্রিত করিয়া রাখা যায় এবং যদি কোন অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের সহিত জ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, যে ঐ জ্ঞাত বস্তুটি অজ্ঞাত বস্তুর উপাদান-স্বরূপে তাহাতে বর্ত্তমান। ইহাকেই বলে, বর্ণ-বিশ্লেষণ প্রণালী; ইহাদ্বারা এইরূপে পদার্থের উপাদান স্থির হয়। রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্‌গণও পদার্থের উপাদান নির্ণয় করেন বটে, কিন্তু সে অন্য উপায়ে—তাঁহাদের ফ্লাস্ক চাই, বকযন্ত্র (retort) চাই, টেষ্ট টিউব চাই, re-agent চাই, precipitate চাই, তবে তাঁহারা আসরে নামিবেন; জিনিষ-টাকে ভাঙিবেন, চুরিবেন। কত বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের পর তবে সেটীর উপাদান নির্ণীত হইবে। আর পদার্থ-বিদ্‌গণ অজ্ঞাত বস্তুটিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া লইয়া সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া শুধু বর্ণ-পুচ্ছ-দৃষ্টেই তাহার উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইখানেই উভয়ের পার্থক্য। তাই বলিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রণালী উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। যে রাসায়নিক প্রণালী এতকাল বস্তুবিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যে প্রণালী এযাবৎকাল বস্তু-বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে সকল নিপুণ হস্তে কত কত সূক্ষ্ম মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার

করিয়াছে, তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা নির্ব্বোধের কাজ। ইহার রাজ্যও বহুদূর-ব্যাপী। ইহার শিষ্য-সংখ্যাও অল্প নহে।

বর্ণ-বিশ্লেষণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিতে পারে না এবং বস্তুদ্বয়-মধ্যে সংশ্লেষণ-সাধনেও অক্ষম। ইহা অজ্ঞাত বিরাট রাজ্যে অকুতো-ভয়ে প্রবেশ করিয়া উপাদানের সন্ধান আনিয়া দেয় মাত্র। তার পর রসায়ণবিদ্ তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া নূতন রাজ্য-স্থাপনে অগ্রসর হন। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে বিরাট রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ঈপ্সিত অমূল্য রত্নগুলি তিনি আহরণ করেন। বর্ণ-বিশ্লেষণকে কত সতর্কতার সহিত কত সূক্ষ্মভাবে কাজ করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যখন রাসায়নিকের নিক্তি, পদার্থ-বিদের অনুবীক্ষণ পদার্থের নূতন উপাদান-নির্দ্ধারণে অপারগ হইয়া বিমর্ষচিত্তে করতল-লগ্ন কপোলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে, তখন রঙিনবসনা বর্ণ-বিশ্লেষণ-সুন্দরী স্মিত মুখে আসিয়া নব উপাদানের অমোঘ সন্ধান-দানে তাহার বিমর্ষচিত্তে হর্ষোৎপাদন করিয়া দুর্ব্বল চিত্তকে শত হস্তীর বলে বলী-য়ান করিয়া আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করে।

এক কাচ্চা লবণকে ১৬,০০০ সমভাগে ভাগ করা যাক্; ইহার এক ভাগকে মোটামুটি এক মিলিগ্রাম বলিব। রসায়ন-বিদ্ তাঁহার অতি-সূক্ষ্ম নিক্তির সাহায্যে অতিকষ্টে এক মিলিগ্রামের ওজন স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞাপনে তিনি অক্ষম। সুধু তাহাই নয়। লবণ সোডিয়ম্ ও ক্লোরিনে গঠিত; সুতরাং এক মিলিগ্রা লবণের মধ্যেও সোডিয়ম ও ক্লোরিন আছে এক মিলিগ্রাম লবণের মধ্যে যে সোডিয় আছে, কোনো রাসায়নিক উপায়ে তা ধরিবার ক্ষমতা রসায়ন-বিদের নাই। তাঁহা বল-বুদ্ধি সব এইখানেই শেষ। এখন দে যাক্, পদার্থবিদ্ কি করেন। সেই এ মিলিগ্রাম লবণকে তিন লক্ষ সমভাগে ভি ভাগ করেন। এক-একভাগে একটি অ সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কণা পড়িল। এই ক্ষু কণার মধ্যে যে সোডিয়ম আছে, বর্ণ-বিশ্লেষ সাহায্যে পদার্থবিদ্ সেই সোডিয়মের অস্তি বাহির করিয়া দিবেন।

পদার্থের উপাদান-নিরূপণে রাসায়নি প্রণালীকে স্থূল ও বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীকে সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে। এত সূক্ষ্ম প্রণালী উদ্ভবে বুধগণের মনে হইয়াছিল বুঝি বা নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার হইবে। যে সকল মূল পদার্থ জগতে বিরলভাবে ছড়ানো আছে, অথবা যে-সকল মূল পদার্থের বস্তুগত বিশিষ্টতা ও কোন জ্ঞাত দ্রব্যের বিশিষ্টতার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, সে সকল মূল পদার্থ রাসায়নিক প্রণালীর স্থূলতা হেতু এতদিন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ণ-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা হেতু সেই সকল মূল পদার্থের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ফলে তাহাই ঘটিল। অনুমান সত্যে পরিণত হইল। নূতন মূল পদার্থের সন্ধান মিলিল।

হিডেল্‌বার্গ কলেজের অধ্যাপকদ্বয় বুন্‌সেন্ ও কির্‌চফ (Bunsen, Kirchhoff) বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীর জন্মদাতা। উক্ত পণ্ডিত-দ্বয়ের দ্বারাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এতৎ-

লনের সূত্রপাত হয়। তাঁহাদের অভিনব শ্ম-নির্ব্বাচন-যন্ত্রের সাহায্যে(Spectroscope) জ্ঞানাগারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহারা -বিশ্লেষণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের রশ্রম সার্থক হইল। দুইটী নূতন ধাতুর বিষ্কার হইল। এই আবিষ্কারে তাঁহারা জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন। এই ন আবিষ্কৃত ধাতুদ্বয়ের নাম কেসিয়াম্ ও বিডিয়াম্ (Caesium and Rubidium)। ছুকাল পরে এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-দ্বারাই লিয়াম ও ইন্‌ডিয়াম্ নামক (Thalium nd Indium) আর দুইটী ধাতু আবিষ্কৃত হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নক্ষেত্রে বর্ণ-বিশ্লেষণ ুত লীলা দেখাইয়াছে বটে। কিন্তু াতিষে ইহার কার্য্য আরও অদ্ভুত ও কপ্রদ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-বিধিবলে Newton's Law of gravitation) শূন্যস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি, আবর্ত্তন-পথ রস্পরের দূরত্ব স্থির করিতে পারা যায়; বং তাহাদের আনুষঙ্গিক ঘটনা—জোয়ার-াটা ও গ্রহণ-কাল—নির্দ্ধারিত করিতে ারা যায়। সেই মাধ্যাকর্ষণই আবার মানবকে থিবীর সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া াধিয়াছে। কাজেই পৃথিবী ছাড়িয়া মানুষের ূন্যে উঠিবার শক্তি নাই। তবে কাহার াহায্যে বহু যোজন অন্তরে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্রের সংবাদ মানুষ সংগ্রহ করিবে? কোন্ এরোপ্লেনে চড়িয়া মানুষ জ্যোতিষ্ক ণ্ডলীর খোঁজ-খবর লইবে? আলো এ ৌত্যকার্য্য সাধন করে। আলোর পুষ্পক রথে চড়িয়া মানুষ এ বিশ্বজগতের সংবাদ সংগ্রহ করে। আলোক-পরী উড়িয়া আসিয়া গ্রহ-উপগ্রহের অস্তিত্ব, গঠন-উপাদান ও আকার-প্রকারের পরিচয় দেয়! গ্রহ-উপগ্রহ-বিনিঃসৃত আলোকের বর্ণ-বিশ্লেষণই শত-যোজনে স্থিত গ্রহ উপগ্রহে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। মানব এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-সোপান বহিয়াই তারকাবলীর রাসায়নিক গঠন ও বাহ্যিক আকার-প্রকারের পরিচয় পায়। বর্ণ-বিশ্লেষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেবলমাত্র দূরবীক্ষণের সাহায্যেই তারকাবলীর পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা হইত। কিন্তু এই চেষ্টাপ্রসূত ফল আশানুরূপ হয় নাই! কেবলমাত্র তাহাদের আকার, আকারের পরিমাণ ও বর্ণ-নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং দূরবীক্ষণ-প্রণালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পূর্ণ তথ্য-নিরূপণে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল।

১৮৫৯ সালে বর্ণ-বিশ্লেষণকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি-কল্পে আহ্বান করা হইয়াছে! বাণী-সঙ্গিনী, রঙিন-বসনা বর্ণবিশ্লেষণ-সুন্দরী সুধীবৃন্দের প্রাণের আহ্বানে প্রীত হইয়া আসরে নামিয়া স্মিত মুখে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কি মহৎ উন্নতি-সাধনে বুধবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা শত মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ত্রিশিরা কচের সাহায্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মির মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। পার্থিব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণের * ন্যায় সূর্য্যরশ্মিরও বর্ণ-

* বর্ণ-বিশ্লেষণের পরিবর্ত্তে, জ্যোতি-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ, কোন্ শব্দটি অধিকতর অর্থ-বোধক, সুধীবৃন্দের নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। লেখক

বিশ্লেষণ সম্ভব। সুধু সূর্য্যরশ্মি কেন, গ্রহ-উপগ্রহ-নিঃসৃত রশ্মি, অচঞ্চল তারকা-রশ্মি (fixed stars), ধূমকেতু-রশ্মি, নেবুলী হইতে প্রবাহিত রশ্মিরও বর্ণ-বিশ্লেষণ সম্ভব। যাবতীয় পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী-লব্ধ বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum) আমাদের বেশ পরিচিত। ধরা যাক্ সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুচ্ছ অঙ্কিত করা হইল। ইহার সহিত পার্থিব বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের তুলনায় যদি জানিতে পারা যায় যে কতকগুলি পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-পুচ্ছের সহিত সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুচ্ছের সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিব যে ঐ-সকল মূল পদার্থ সূর্য্যের মধ্যেও অবস্থিত। এইরূপে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাদান অভ্রান্তরূপে স্থির হইয়াছে। বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী সাধারণতঃ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় ও তাহার উপকারিতা কি—সেটী এখানে মোটামুটি ভাবে বলা হইল। প্রত্যেক পদার্থের বস্তুগত বর্ণ-পুচ্ছ প্রস্তুত করাই প্রথম সোপা এই প্রথম সোপান-নির্ম্মাণের জন্য পদার্থটি আলোকময় করিয়া লইতে হইবে। যেমন-তেমন আলোকময় করিলে চলিবে —এমন করিয়া আলোকময় করিতে হই যেন তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে আলো নিঃসৃত হইয়া বর্ণ-পুচ্ছ গঠিত সমর্থ কালো জিনিষ বর্ণ-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হই পারে না। যদি কালো জিনিষকে বর্ণ-বিশ্লে ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে প্রথ জ্যোতির্ম্ময় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তারপর তাহার জ্যোতি বিশ্লেষণ করি বর্ণ-পুচ্ছ-প্রণয়নে সহজেই সক্ষম হইব। তা হইলেই দেখা যাইতেছে, বর্ণ-পুচ্ছ-প্রণয়নে বিস্তারিত বিবরণ জানিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বস্তুকে কি প্রকারে আলোকময় করা যাইতে পারে, সে-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বিশে প্রয়োজন। বারান্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

নেপালের কথা *

সমর-ক্ষেত্রে নেপালী বীরের সাহস ও নির্ভীকতা জগৎ-বিখ্যাত। নেপালী হিন্দু, আমরাও হিন্দু—কাজেই নেপালীর বীরত্বের গর্ব্ব আমরাও মুখে করিয়া থাকি। ঘরের বড় বেশী দূরে নহে—অথচ নেপালের বৃত্তান্ত আমরা কয়জনে জানি? টডের কল্যাণে রাজপুতানার অলি-গলির বার্ত্তা আমাদের নেহাৎ অবিদিত নয়। টডের রাজস্থান-অবলম্বনে নাট্যকার নাট্য-রচনা করিতেছেন, কবি কাব্য লিখিতেছেন, চরিত-কার কীর্ত্তি

* নেপালী ছত্রি। শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

কাহিনী লিপি-বদ্ধ করিতেছেন, চিত্রকর ছবি আঁকিতেছেন, কিন্তু নেপালের কথা, কৈ, কাহারো মুখে বড়-একটা ত শুনা যায় না!

"নেপালী ছত্রির" গ্রন্থকার বহু সন্ধানে নেপালের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আজ তাহা উপহার দিয়াছেন। তাঁহার এ উপহার বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিবে; তাঁহার এ উপহারের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

নেপালের ইতিহাস কি কেবলই কাটাকাটি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের লোমহর্ষণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ? না। নেপালের



পৃথ্বীনারায়ণ

তরাই প্রচুর নর-রক্তে রাঙা, সন্দেহ নাই, তবু তাহারই মধ্য দিয়া এই অসম-সাহসিক নির্ভীক জাতির অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, অসাধারণ রাজভক্তি, অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও রাজনীতিজ্ঞতা এমনই মহিমায় উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া আছে যে তাহা দেখিয়া শ্রদ্ধায় শির নত হয়। দেশের দারুণ বিগ্রহ-বিপ্লবের ফাঁক দিয়া নেপালী জাতির যে সভ্যতার আদর্শ আমাদের চোখে পড়ে, তাহা দেখিয়া প্রকৃতই বলিতে হয়, There is a civilisation without furniture.

মুসলমান চিতোর অধিকার করিলে চিতোর-রাজবংশীয় অযুত-রাম নগর ত্যাগ করেন; তাঁহার দুই পুত্র খাঞ্চা ও মিঞ্চা হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। ইংরাজী ১৪৯৫ খৃঃঅব্দে ভীরকোট এলাকায় খিলম নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া তাঁহারা আবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন; ক্রমে তাঁহদেরই একজন নয়'-কোটের ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন। এই বংশেরই দ্রব্যসাহ নামে একজন গোর্খা নগর অধিকার করিয়া গুর্খা রাজ্যের পত্তন করেন (১৫৫৯ খৃঃঅব্দ)। ইহারই বংশে অযুতরামের

৩৭তম পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের বীরত্বে বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের একচ্ছত্রী-করণ সম্পন্ন হয়।

১৭৪২ খৃঃঅব্দে বারো বৎসর বয়সে পৃথ্বী-নারায়ণ গোর্খা রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই পৃথ্বীনারায়ণই পরে সমগ্র নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। কাঠমাণ্ডুতে পৃথ্বীনারায়ণের রাজধানী স্থাপিত হয়। (১৭৬৮ খৃঃঅব্দ)। নেপালের প্রাচীন রাজ্য-গুলি ক্রমে ক্রমে পৃথ্বীনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করে।

'কাষ্ঠমণ্ডপ' হইতে কাঠমাণ্ডুর নাম-করণ হইয়াছে। কাঠমাণ্ডু, ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর এই তিনটি ছিল নেপালের প্রধান নগর। ইহারই উত্তর-পশ্চিম দিকে পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তরালে গোরক্ষ-নাথের মন্দির; এবং তাহা হইতেই নগরের নাম হইয়াছে গোর্খা। এই গোর্খা নগর হইতেই গুর্খা নামের উৎপত্তি; "ছত্রি" শব্দ "ক্ষত্রিয়ের" অপভ্রংশ মাত্র।

পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহপ্রতাপ সা (১৭৭১—১৭৭৫ খৃঃঅব্দ) রাজা হন; পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রণবাহা-দুর সা (১৭৭৮—১৮০৪ খৃঃঅব্দ) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিংহাসন-অধিরোহণের সময় রণবাহাদুর নাবালক ছিলেন; তাঁহার পিতৃব্য বাহাদুর-সা রাজ্য-পরিচালনা করিতেন। বাহাদুর-সাই নেপালের প্রথম রাজমন্ত্রী। বাহাদুর-সা পৃথ্বীনারায়ণের পুত্র। ইঁহারই চেষ্টায় কাশ্মীরের প্রান্ত হইতে শিকিম পর্য্যন্ত নেপাল রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

রণবাহাদুরের মাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মী বাহাদুর-সার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; বাহাদুর-নার শক্তি ও জনপ্রিয়তায় রাজেন্দ্র-লক্ষ্মীর মনে সর্ব্বদাই অশান্তি ছিল। তাঁহা[র] চক্রান্তে বাহাদুর সা দুইবার নির্ব্বাসি[ত] হন্ এবং পরে ১৭৯৫ খৃঃঅব্দে রণবাহা[দু]ছুতা তুলিলেন, বাহাদুর সা রাজ্যের জমি করাইয়া রাজস্বের যে ব্যবস্থা করাইয়াছে[ন] তাহা লাভ-জনক ও সঙ্গত হইলেও দু[ই] জরিপের দ্বারা তিনি ধরিত্রীর অপমা[ন] করিয়াছেন, অতএব এ মহাপাতকের শাস্তি প্রাণদণ্ড! কাজেই বাহাদুর সা নির্ব্বা[সিত] হইলেন।

এমন খামখেয়ালী রাজার ভবিষ্যৎ ম[ঙ্গল] হইতেই পারে না। তাই আমরাও দে[খি] রণবাহাদুর সার রাজত্ব নানা অত্যাচার [ও] নিষ্ঠুর অপকর্ম্মে পরিপূর্ণ। তাঁহার অত্যাচা[রে] অতিষ্ঠ হইয়া দেশের লোক শেষে তাঁহা[কে] দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার চা[রি] বৎসর বয়স্ক পুত্র গির্ব্বানযুধকে সিংহাস[নে] অধিষ্ঠিত করে। গির্ব্বান ১৮০৭ খ্রীঃঅ[ব্দে] ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা এ[বং] প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই স[ময়] হইতেই নেপালের রাজ-কার্য্য প্রকৃত প[ক্ষে] প্রধান মন্ত্রীর হস্তগত হয় এবং এই [রা]মন্ত্রীই ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়ার [ন্যা]নেপাল রাজ্যে সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠেন। এই গির্ব্বানযুধের রাজত্ব-কালেই ইংরাজে[র] সহিত নেপালের যুদ্ধ হয়। দূরদর্শী ভীমসে[ন] থাপা এ যুদ্ধের প্রতিকূলেই মত দিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ এবং সাধারণ প্রজা তখ[ন] এমনই রণোন্মত্ত যে ভীমসেনের কথা তাহা[রা] গ্রাহ্যই করিল না। ভীমসেনের কৌশলে যুদ্ধ শেষ ও সিগৌলিতে ইংরাজের সহি[ত] গুর্খার সন্ধি স্থাপিত হয়।

গির্ব্বানযুধের মৃত্যুর পর (১৮১৭ খ্রীঃ-অব্দ) তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র বিক্রম সা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং ভীমসেন থাপা ও রাজার বিমাতা মহা-রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী এক-যোগে রাজ্য-পরিচালনা করেন। ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ী ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাণী সপত্নী-পুত্রকে হত্যা করাইতেছে, মন্ত্রী সেনা-পতিকে হঠাইতেছে, এমন কি রাণী রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্যও ফন্দী আঁটিতেছে, এমনই কদর্য্য ব্যাপার; মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভীমসেনের পরিচালনা-কৌশলে রাজবাড়ী হইতে ষড়যন্ত্রের মূল ছাঁটিয়া দেওয়া হইল;—কোথাও এতটুকু গোপন অভিসন্ধি না চলে, সে বিষয়ে ভিতরে-বাহিরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও মন্ত্রী ভীমসেন। বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা আসিল; রাজ্যও শাসন-ব্যবস্থায় শ্রীসম্পন্ন হইল। কিন্তু ১৮৩২ খৃঃঅব্দে মহারাণীর মৃত্যু হইলে অন্দরে আবার সেই পুরাতন অনল জ্বলিয়া উঠিল। ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীর সিং ভীমসেনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া-ভাঙ্গাইয়া তরুণ রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের কাণভারি করিতে লাগিলেন;



ভীমসেন থাপা

মানুষের মন, কান-ভাঙ্গানিতে কয়দিন ঠিক থাকে? তরুণ রাজা শেষে নানাভাবে ভীম-সেনকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন! ভীমসেনের ব্যবস্থাদি উল্টাইয়া দিয়া, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; শেষে মহারাণীর একবৎসর-বয়স্ক একটি পুত্র রোগে মারা গেলে রাজা অভিযোগ তুলিলেন, ভীমসেন থাপাই শিশুকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। যেখানে প্রবল ষড়যন্ত্র, সাক্ষ্য প্রমাণের সেখানে অভাব হয় না। এক্ষেত্রে জাল দলিল-পত্রের সাহায্যে সাক্ষ্য-প্রমাণও খাড়া করা হইল এবং বিশ্বাসী

রাজভক্ত বৃদ্ধ মন্ত্রীকে দারুণ ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বাসঘাতকের কালো কালি গায়ে মাখিয়া কারাগারে বন্দী হইতে হইল! ক্ষোভে অপমানে ভীমসেন থাপা কারাগারেই আত্ম-হত্যা করেন। বর্ব্বর রাজাদেশ তাঁহার মৃতদেহকে রাজপথে ফেলিয়া দিল, হিন্দুর শেষ সম্মান হইতেও বঞ্চিত করিল; এমন কি, সে মৃত-দেহ অবধি কাহাকেও দাহ করিতে দেওয়া হইল না।

যতই শক্তিধর হোক, একটানা অত্যাচার বেশীদিন কখনোই সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে না। ফলে দাঁড়াইল এই, রাজ-হস্ত হইতে সকল ক্ষমতা অচিরে মন্ত্রীহস্তে আসিয়া পৌছিল। মন্ত্রিত্বের পদ লইয়াই এখন যাহা-কিছু মারামারি, কাটাকাটি ও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত মহিমায় মূক বিগ্রহমূর্ত্তির ন্যায় সিংহাসন অধিকার করিয়া শুধু বসিয়া রহিলেন।

ভীমসেনের মৃত্যুর পর রাজ-নিগ্রহ আবার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। প্রথম মহারাণীর মৃত্যু ঘটিলে প্রজারা রব তুলিল, নিষ্ঠুর মহারাজই বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। মহারাজ রেসিডেণ্টকে গিয়া বলিলেন—এই মিথ্যা রব যে তুলিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া আনা হোক্—তাহার গায়ের চামড়া তুলিয়া তাহাতে লবণ ও তৈল ঘসা চাই। এ বর্ব্বর প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাত করে নাই বটে, কিন্তু ফল ফলিল।

উত্যক্ত প্রজার দল ও সৈন্যগণ তখন দরবারে এক দরখাস্ত দাখিল করিল—ইহাই নেপালের Petition of Rights (৭।১২। ১৮৪২)। দরবারকে সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে হইল এবং কনিষ্ঠা মহারাণী লক্ষ্মী দেবীর হস্তে রাজ্য-চালনার ভার পড়িল।

লক্ষ্মীদেবীর কর্তৃত্বাধীনে ফতেজঙ্গ নামে মাত্র মন্ত্রী হইলেন; কাজ চালাইতে লাগিল, মহারাণীর প্রিয়পাত্র প্রধান সেনাপতি গগন সিং। গগন সিংয়ের সহিত মহারাণীর ঘনিষ্ঠতা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল; শেষে এমন হইল যে এই ব্যাপারের কদর্য্য আলোচনা মহারাজের কাণে আসিয়া আঘাত করিল। ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে লাল ঝা নামক একব্যক্তি পূজা-রত গগন সিংকে জানালার ফাঁক দিয়া গুলি করিয়া মারিল (১৪।৯।১৮৪৬)। ওদিকে গগন সিংয়ের হত্যার কথা শুনিয়া মহারাণী লক্ষ্মীদেবী প্রতিহিংসা-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত সর্দ্দার ও কর্ম্মচারী-দিগকে ডাকাইয়া আনিলেন; এবং যাহাদের তিনি এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বিনা-বিচারে দণ্ড দিতে সম্মত হইলেন না—তখন ক্রোধোন্মত্ত লক্ষ্মী-দেবী সম্মুখে-দণ্ডায়মান সেনাপতি বীর-কিশোরের বক্ষে মুক্ত তরবারি বসাইয়া দিলেন। চকিতে বিষম বিপ্লব বাধিয়া গেল; ফতেজঙ্গ নিহত এবং জেনারেল অভিরাম আহত হইলেন। মহারাণী উপর-তলায় গিয়া আদেশ দিলেন, "আমার শত্রুদিগকে নির্ম্মূল কর।" তখন ভীষণ হত্যা-ক্রিয়া চলিল, চক্ষের নিমেষে মৃতদেহে স্তূপ জমিয়া উঠিল! একত্রিশ জন প্রধান এবং কুড়িজন মধ্যবিত্ত সর্দ্দার এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইল।



নেপালের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী

ফতেজঙ্গ নিহত হইলে অদ্বিতীয় রাজ নীতিজ্ঞ জঙ্গ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তারপর রাজা ও রাণীতে বচসা বাধিল। লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "আমার বড় ছেলেকে সিংহাসন দাও, নহিলে আরো ভীষণ রক্তারক্তি ঘটিবে।" মহারাণীকে অটল দেখিয়া মহারাজ রাগ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পাটন নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। মহারাণী তখন জঙ্গবাহাদুরের নিকট যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু জঙ্গবাহাদুর তাহাতে সম্মত হইলেন না। যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম পূর্ব্বেই রাণীর আদেশে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; জঙ্গ-বাহাদুর এখন কারারুদ্ধ যুবরাজকে গোপন-হত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেন। মহারাণী দেখিলেন, জঙ্গবাহাদুরকে কৌশলে তিনি বাগাইতে পারিবেন না, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন—বীরধুজ বাশনিয়াৎ নামক এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যুবরাজকে, মহারাজকে, এবং জঙ্গবাহাদুরকে কৌশলে

একই ঘরে একই সময়ে কোনমতে আনাইয়া সকলকে হত্যা কর। গগনসিংয়ের পুত্র উজীর সিংহ এবং বিজলীরাজ নামে এক পণ্ডিত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নেপালের সৌভাগ্যক্রমে বিজলীরাজের চোখ ফুটিল। তিনি বুঝিলেন, এত বড় হত্যা-কাণ্ডে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি, অথচ ওদিকে লক্ষ্মীদেবীর পুত্রের রাজ্যলাভে শুধু ব্যক্তিগত লাভ ও সুখ। তখন তিনি জঙ্গবাহাদুরকে রাণীর অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। জঙ্গবাহাদুর সতর্ক হইলেন। বীরধূজ রাণীর আদেশ জানাইয়া জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিতে আসিলে তিনি বলিলেন, কার্য্যতঃ যখন বীরধূজই মন্ত্রিত্ব চালাইতেছেন, তখন আর এমন অবস্থায় জঙ্গবাহাদুরের সহিত মহারাণীর কোনো পরামর্শই চলিতে পারে না। জঙ্গবাহাদুরের জেরায় বীরধূজ ভড়কাইয়া গেল প্রমাদ গণিয়া ভীত হইল। তখন জঙ্গবাহাদুরের ইঙ্গিতে কাপ্তেন রাণা মীর তাহাকে নিহত করিল। রাজাকে এ ষড়যন্ত্রের কথা অচিরে বলা হইল। শুনিয়া জঙ্গবাহাদুরের হাতে রাজা সকল দিক রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। জঙ্গবাহাদুর অমনি সশস্ত্র সৈন্যদল লইয়া রাজবাটী অবরোধ করিলেন—চক্রান্ত-কারীরা নিহত হইলে জঙ্গ-বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন, যুবরাজের প্রতি হৃদয়ে যখন তিনি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছেন, তখন নেপালে আর তাঁহার থাকা হইতে পারে না। মহারাণী নিরুপায় চিত্তে তীর্থ-দর্শনের ছুতা ধরিয়া নেপাল পরিত্যাগ করিলেন—যাইবার সময় অব্যবস্থিত-চিত্ত মহারাজকেও সঙ্গে লইতে



জঙ্গবাহাদুর

ছাড়িলেন না। জঙ্গবাহাদুরের সুকৌশলে এক ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের হাত হইতে নেপাল রক্ষা পাইল।

জঙ্গবাহাদুর অবশ্য বিতাড়িতা লক্ষ্মী-দেবীর ও তাঁহার দুই পুত্রের ভরণপোষণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুরের রাজ্য-পরিচালনা-কালে ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। জঙ্গবাহাদুর ইংরাজের সাহায্যের জন্য বিস্তর গুর্খাসৈন্য প্রেরণ করেন।

গুর্খাসৈন্য আজিমগড় ও জৌনপুর রক্ষায় নিযুক্ত হয়। আজিমগড়ের নিকট একদল

বিদ্রোহীকে গুর্খাসৈন্য একদিনে পাঁচ মাইল কুচ করিয়া গিয়া আক্রমণ করে, এবং দশমিনিটের মধ্যে আজিমগড় ও জৌনপুর বিদ্রোহ-মুক্ত হয়। তার পর লক্ষ্ণৌ-রক্ষাও গুর্খা সৈন্যের সাহায্যে সংসাধিত হয়। চান্দা ও সোহানপুরের বিদ্রোহীদলও গুর্খা-সৈন্যের হাতে পরাভব স্বীকার করে। তারপর গুর্খাসৈন্যই গোরখপুর, ফাইজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দমন করে। গুর্খাসৈন্য এ সকল যুদ্ধেই 'কুক্‌রি'মাত্র ভরসা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন, জঙ্গ বাহাদুর স্বয়ং। বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ইংরাজের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃঅব্দে বহু ভারতীয় তীর্থপর্য্যটনান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন।

লাহোরের রাণী বন্দিনী চান্দা কুয়র ছদ্মবেশে ইংরাজের কেল্লা ছাড়িয়া একেবারে নেপালে আসিয়া আশ্রয় লন। জঙ্গবাহাদুর তাঁহার পরিচয় জানিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ-সংবাদ পাইয়া রাণীকে চাহিয়া পাঠাইলেন—জঙ্গ-বাহাদুর বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রিতা রমণীকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিলেন না। জঙ্গবাহাদুর রাণীর বাসের জন্য নিজেরই একখানি বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দেন এবং দুইজন বিশ্বাসী গুর্খা রমণীকে পাহারায় রাখেন, ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাণীর সহিত যাহাতে কাহারো কোনরূপ পত্র-ব্যবহার না চলে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জন্য। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ বন্দোবস্তে প্রীত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর দরবার হইতে রাণীর জন্য বরাদ্দ করিলেন, মাসিক আটশত টাকা ভাতা এবং প্রত্যহ চাল, ডাল প্রভৃতির সিধা।

জঙ্গবাহাদুর ১৮৫০ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিল নয়জন গুর্খা অফিসার, একজন জ্যোতিষী বা কবি, এক-জন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিত্রশিল্পী, একজন সুবাদার ও চারিজন সূপকার। জাতিচ্যুত হইবার কথা উঠিলে জঙ্গবাহাদুর বলিয়াছিলেন,দৌত্য-কার্য্যের জন্য চীনে ত গুর্খাকে নিত্যই যাইতে হয়; সেখান হইতে ফিরিবার সময় গুর্খা কর্ম্মচারীরা চিরদিন যেমন কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসে, ইংলণ্ডে গেলেও সেই ব্যবস্থা অনুসৃত হইবে।

১৮৫৬ খৃঃঅব্দে নানারূপে উত্যক্ত হইয়া জঙ্গবাহাদুর সহসা পদত্যাগ করেন। রাজ-গুরু বিজয়গুরু-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত নেপালী সর্দ্দারেরা তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের জন্য বিস্তর অনুরোধ করেন। রাজগুরু রাজমুকুট অবধি তাঁহাকে ধারণ করিতে বলেন,কিন্তু জঙ্গবাহাদুর হাসিমুখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, ওসব কিছুই তিনি করিবেন না; তবে শরীর সুস্থ হইলে রাজকার্য্য-পরিদর্শন করিবেন।

তাহার পর হইতে জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত নীতির আদর্শেই নেপালরাজ্য পরিচালিত হইতেছে। তিনি একাধারে অসা-ধারণ রাজনীতিকুশল ও যোদ্ধা ছিলেন। নেপালের ইতিহাসে জঙ্গ বাহাদুরের নাম চির-দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ রাজপুরুষ, শুধু নেপালে কেন, সমগ্র জগতে খুব অল্পই জন্মিয়াছিলেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি হইতে নেপাল-ইতি-হাসের কঙ্কালমাত্র আমরা সঙ্কলন করিলাম।

এই যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনীর সহিত নেপালীর বিশেষত্ব, গৌরব, এবং মহত্ত্বের পরিচয়ও এ গ্রন্থে যথেষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। নেপালীর ধর্ম্মপ্রবণতা এবং সরলতার কাহিনীও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাহাতে নাটকীয় উপাদানও প্রচুর। এক জঙ্গ বাহাদুরের আদর্শ চরিত্র লইয়াই তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য, রাজনীতি-কুশলতা লইয়া কত নাটক, কত কাব্য, কত উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে! এবং লিখিত হইলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা অমূল্য সামগ্রীই হইবে! এ-দেশের কয়জন খবর রাখেন, হিমালয়েরই এক নিভৃত প্রান্তে এমন অসাধারণ মনুষ্যত্ব, অপূর্ব্ব ধী, অদম্য শক্তি ও বিরাট মহত্ত্বে অলৌকিক মহিমায় বিকশিত হইয়াছিল!—পাশ্চাত্য জগতেও এমন চরিত্র কয়টা দেখা যায়? অথচ আমাদের অনেকের ধারণা নেপালে শুধু বর্ব্বর পশুবলে বলীয়ান দুর্দ্ধর্ষ গোঁয়ার গুর্খারই বাস, মনুষ্যত্বের সেখানে একান্ত অভাব!

গ্রন্থকার বিপুল অধ্যবসায়ে বাঙালীর কাছে নেপালের যে অপরূপ বার্ত্তা শুনাইয়াছেন, বাঙালী তাহা শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের রচনা ভালই,—ইতিহাসের কাহিনীটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত—এবং অবাধ গতিতে সুদূর অতীত যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি সে ধারা অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গীতে বহিয়া আসিয়াছে।

গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের দুইটি অনুরোধ আছে,—দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা ও কাগজ যেন চারুতর করা হয়,কারণ এ গ্রন্থ অবহেলার বস্তু নহে। আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ, নেপালের রাজা রাজড়ার কাহিনী ইহাতে পর্য্যাপ্ত আছে, সেই সঙ্গে প্রজাপুঞ্জের ঘরের কথা, তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী আরো প্রচুরভাবে সংগ্রহ করিয়া দিলে শুধু যে আমাদের কৌতূহলই চরিতার্থ হইবে, তাহা নহে, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

বলগো সখি বল আমায়,
আমি যাব কিনা জলে এ বেলায়?
আমি যাব কিনা, আমি যাব কিনা,
আমি যাব কিনা, যাব এ বেলায়?
সে কি এ বিজন পথে একেলা চলে?
বাঁশী নিয়ে বসে গিয়ে কদম্ব-তলে?
কি হবে তবে কি হবে!
হেসে যদি মোর পানে চায়?

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কখনো ত চোখে চোখে তারে দেখিনি,
কখনোত মুখে মুখে কিছু কহিনি;
কি করে তবে কি ক'রে, কোন্ ছলনায়?
পশিয়া হৃদয়-পুরে বাঁশীর সুরে,
আমার গোপন কথা সবারে শুনায়!
সখি লাজে মরি, আমি লাজে মরি,
মরি জ্বলি লাজ বেদনায়॥

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

II { ১ গা মা পা। ০ ধা ধা ণা I ১ পধা –ণর্সা –ণধা। ০ –পা মগা মা I
বল্ গো স খি বল্ আ মায়্ ০০ ০০ ০ আ০ মি

I ১ পা র্সা ণা। ০ ধা পা গমা I ১ –পধা –পমা –গরা। ০ –া গা মা I
যা ব কি না জ লে০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I ১ পা –া –া। ০ (–া –া –া) } । ০ –া মগা মা I ১ পা র্সা না।
লায় ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মি যা ব কি

। র্সা –া র্সর্রা I ১ ণা র্রা র্সা। ০ ধণর্সা –ণধপা মগমা I
না ০ আমি যা ব কি না০০ ০০০ আমি

I ১ পা র্সা ণা। ০ ধা পা গমা I ১ –পধা –পমা –গরা। ০ –া গা মা।
যা ব কি না যা ব০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I ১ পা –া –া। ০ –া –া –া II
লায় ০ ০ ০ ০ ০

II { ১ –া –া গা। ০ মা ধা ধা I ১ ধা ধণা –র্সণা। ০ পা ধা –া।
০ ০ সে কি এ বি জ ন০ ০০ প থে ০

I ১ –া –া না। ০ র্সা র্রা না I ১ র্সা –া –া। ০ –া –া –া I ১ –া –া র্সা।
০ ০ এ কে লা চ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বাঁ

। ০ গা গা র্মা I ১ র্রা র্রা র্সনা। ০ র্সা –া –া। ০ –া –া না
শী নি য়ে ব সে গি০ য়ে ০ ০ ০ ০ ক

। ০ র্সা নর্সর্রা র্সা I ১ ধণা –র্রর্সা –ণধা। ০ –পমা –গমা –া } I
দ ম্ব০০ ত লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I ১ ধা ধা পা। ০ –া –া পা I ১ গমা –পধা –পমগা। ০ –া গা মা I ১ পা –া –া।
কি হ বে ০ ০ ত বে০ ০০ ০০০ ০ কি হ বে ০ ০

। ০ –া –া –া I ১ না না না। ০ না –া –া I ১ –র্সা –া –া। ০ র্সা –া র্সা I
০ ০ ০ হে সে য দি ০ ০ মোর্ ০ ০ পা ০ নে

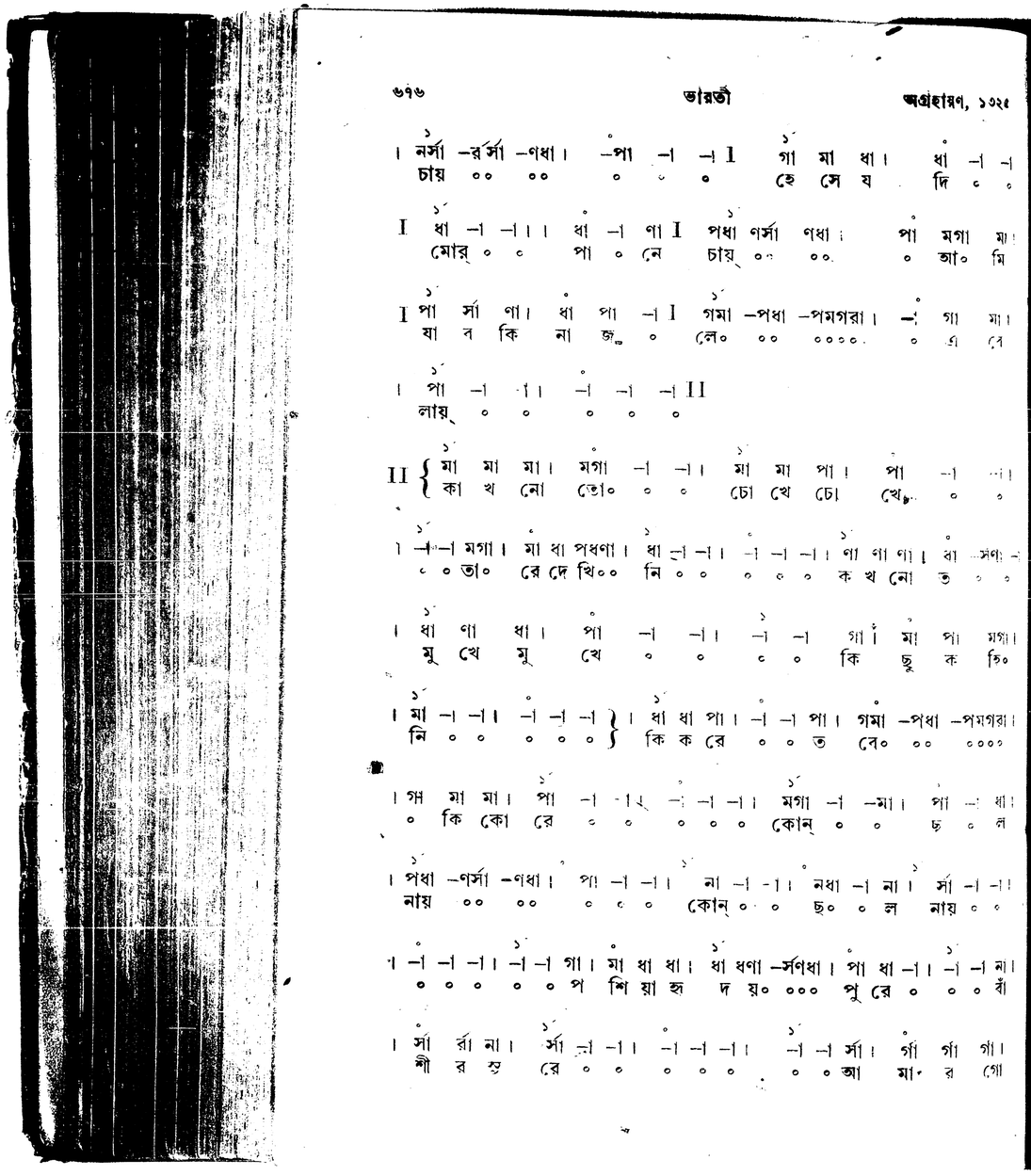

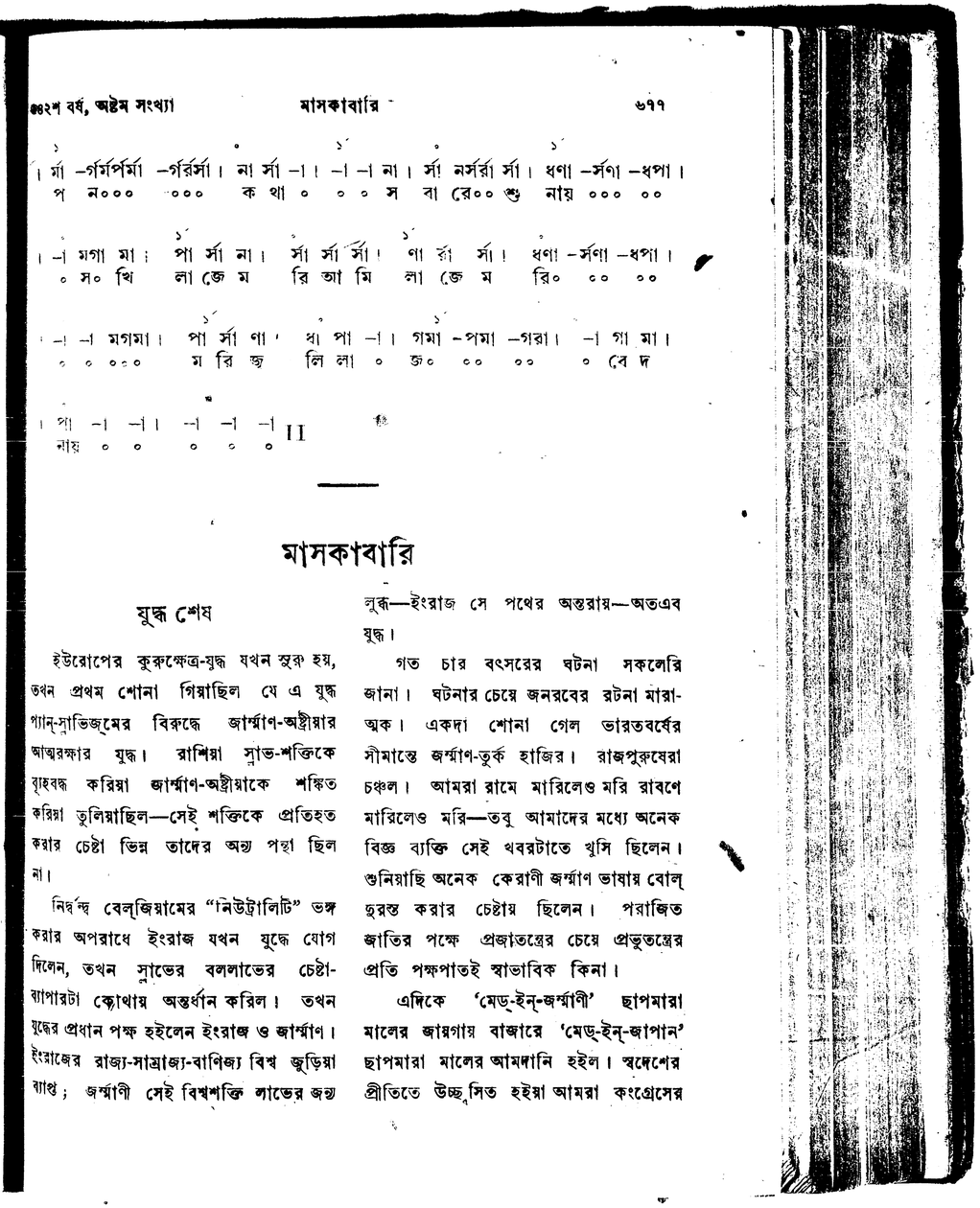

মাসকাবারি

যুদ্ধ শেষ

ইউরোপের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যখন সুরু হয়, তখন প্রথম শোনা গিয়াছিল যে এ যুদ্ধ গ্যান্-স্লাভিজ্‌মের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ার আত্মরক্ষার যুদ্ধ। রাশিয়া স্লাভ-শক্তিকে বৃহবদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়াকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা ভিন্ন তাদের অন্য পন্থা ছিল না।

নির্দ্বন্দ্ব বেল্‌জিয়ামের "নিউট্রালিটি" ভঙ্গ করার অপরাধে ইংরাজ যখন যুদ্ধে যোগ দিলেন, তখন স্লাভের বললাভের চেষ্টা-ব্যাপারটা কোথায় অন্তর্ধান করিল। তখন যুদ্ধের প্রধান পক্ষ হইলেন ইংরাজ ও জার্ম্মাণ। ইংরাজের রাজ্য-সাম্রাজ্য-বাণিজ্য বিশ্ব জুড়িয়া ব্যাপ্ত; জর্ম্মাণী সেই বিশ্বশক্তি লাভের জন্য লুব্ধ—ইংরাজ সে পথের অন্তরায়—অতএব যুদ্ধ।

গত চার বৎসরের ঘটনা সকলেরি জানা। ঘটনার চেয়ে জনরবের রটনা মারাত্মক। একদা শোনা গেল ভারতবর্ষের সীমান্তে জর্ম্মাণ-তুর্ক হাজির। রাজপুরুষেরা চঞ্চল। আমরা রামে মারিলেও মরি রাবণে মারিলেও মরি—তবু আমাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই খবরটাতে খুসি ছিলেন। শুনিয়াছি অনেক কেরাণী জর্ম্মাণ ভাষায় বোল্ দুরস্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। পরাজিত জাতির পক্ষে প্রজাতন্ত্রের চেয়ে প্রভুতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতই স্বাভাবিক কিনা।

এদিকে 'মেড্-ইন্-জর্ম্মাণী' ছাপমারা মালের জায়গায় বাজারে 'মেড্-ইন্-জাপান' ছাপমারা মালের আমদানি হইল। স্বদেশের প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমরা কংগ্রেসের

দলাদলির নেশা ও গালাগালির খেউড় জমানো ছাড়া দেশীয় শিল্প চালাইবার কোন চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিপ্লব। সেখানকার "বলসেবিক" দল প্রজার বলকেই সম্বল করিয়া জারের প্রভু-তন্ত্র এবং ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল। জর্ম্মাণ প্রভুতান্ত্রিকেরা আপাতঃ বলী হইলেও তারা দাস এবং দাসেরা চিরকালই দুর্ব্বল। জর্ম্মাণ কাইজার, জর্ম্মাণ রণবাহিনীর দ্বারা অর্দ্ধেক ইউরোপ জিতিয়া লইলেও তাঁর রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিত্তিই যে দুর্ব্বল ও শিথিল, সে কথাটা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়ার স্লাভ-শক্তিকেই বিভীষিকা গণ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং রাশিয়ার এই বিপ্লবে তিনি খুসিই ছিলেন, কেননা অতবড় শত্রু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়াতে কাইজার আরামের নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন।

তারপর, এই বৎসরের গোড়ায় যখন ফ্রান্স-ইংলণ্ড সেই সমগ্র জর্ম্মাণ-বাহিনীর প্রচণ্ড অভিঘাতে হঠিতে হঠিতে একেবারে প্যারিসের দরজায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং যুদ্ধ-জয়ের আশা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তখন কে জানিত যে সহসা কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রবল জর্ম্মাণশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রতিপক্ষ মিত্রশক্তির কাছেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে? কাইজার তাঁর সিংহাসন ছাড়িবেন? অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী ভাগ হইয়া যাইবে? দুনিয়ার সব বাদশাগিরি ঘুচিয়া যাইবে?

রাশিয়ার বল-সেবী মন্ত্র যে জর্ম্মাণ-প্রভুতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিয়া আনিয়াছিল, সে খবর ত গোড়ায় প্রকাশ পায় নাই।

অবশ্য আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে মিত্রপক্ষ বলশালী হইয়াছিল, এটা সত্য। মার্শাল ফোসের অপূর্ব্ব রণচাতুর্য্যে জর্ম্মাণী যে প্যারিসের প্রান্ত হইতে তাড়া খাইয়া ক্রমশ হটিয়া পড়ে, এও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় সত্য, জর্ম্মাণীর মধ্যেই অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল—নহিলে এত শীঘ্র যুদ্ধের শেষ হইতেই পারিত না।

প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চির-বিদায় লইল। সর্ব্বত্র যথার্থ আত্মক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই জন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন! আমরাও ইতিহাস-বিধাতার প্রলয়-লীলার ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টির অপূর্ব্ব ছবি দেখিবার সুযোগ পাইলাম।

"উঠেচে আদেশ
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

ভারতের স্থান

যুদ্ধের পরে ভারতের অবস্থা কি হইবে? রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন্ "League of Nations" জাতি-সংঘের কথা বলিয়াছেন; ইংলণ্ড বলিতেছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সকলেই স্বারাজ্যের অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষে রিফর্‌ম্ স্কীমের যে খস্‌ড়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিনা এবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। তার উপর যদি বা সেটা বর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে রাউলাট্-কমিটির রিপোর্টে শাপের

ব্যবস্থাটাও আছে। অতএব লিগ্ অব্ নেশন্‌সের মধ্যে ভারতের স্থান হইবে কিনা, ইহা লইয়া এদেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত চিন্তাকুল।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষ যদি সত্যই নেশন হইত, তবে এ সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকিতনা। রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুটো অধিকার পাইলেই কোন জাতি নেশন্-পদ-বাচ্য হয় না। নেশনের একটা আত্মাও থাকা চাই, একটা দেহও থাকা চাই। আমাদের নেশন্-সত্তার আত্মা-পদার্থটি যে কি, তাহা এ পর্য্যন্ত অনেক গুণী-জ্ঞানী চিন্তা করিয়া ঠাহর পাইলেন বলিয়া মনে হয় না। শোনা যায়, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। যদি তাহা হইতাম, তবে দুটো পার্থিব অধিকার দুটো বিষয়-সম্পৎ পাইবার জন্য আমাদের এমন একান্ত লোলুপতা কেন? তবে যে পশ্চিমকে আমরা materialist বা বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করি, তার সেই বৈষয়িকতা আয়ত্ত করিতে আমাদের এমন প্রাণপণ প্রয়াস কেন?

তারপর, আত্মবস্তু স্থির হইলে তবে দেহ মেলে। আমাদের আত্মবস্তুই যখন এক নয়, বহু—তখন দেহটাও এক নয়, বহু খণ্ডেই খণ্ডিত।

ইউরোপের জাতিদের সঙ্গে যখন আমরা আমাদের মনে মনে তুলনা করি, তখন রাষ্ট্রক্ষেত্রের অধিকার-অনধিকারের কথাটাকেই মনের সাম্‌নে রাখি। এটা ভুলি যে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে "a great subjective life and centuries of dream preceded a great objective manifestation of power and wealth" (A. E.)—অর্থাৎ ইউরোপের জাতিদের শক্তি ও ধনের যে বাহ্যবিকাশ তাহা অনেক দিনকার বৃহৎ আন্তর জীবন, বহু শতাব্দীর বহু স্বপ্নের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। সেই বৃহৎ আন্তর জীবনের লক্ষণগুলি আমাদের মধ্যে কোথায়? অন্যান্য দেশে বড় বড় ভাবুক, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিকদের যে সব আদর্শ, যে সব ভাবনা-কল্পনা রাষ্ট্রতত্ত্বকে গড়িয়া তোলে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের সব কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে—এদেশে ভাবের সঙ্গে কাজের সে শুভ পরিণয় ঘটিয়াছে কি? আমাদের দেশের যদি কোন একটা ইতিহাস থাকে, যদি কোন ঐতিহাসিক সাধনা থাকে তবে তার বিশেষত্ব কি, সেটা আমাদের ঐতিহাসিক—দার্শনিকদের আলোচ্য! কিন্তু সে আলোচনা যদি বা কিছু কিছু ঘটিয়া থাকে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁরা শফরী-বৃত্তি করিতেছেন, তাঁরা কি তার কিছুমাত্র খবর রাখেন? "The better minds in every race, eliminating passion and prejudice, by the exercise of the imaginative reason have revealed to their countrymen ideals which they recognised were implicit in national character." (A. E.'র National Being হইতে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাঁরা মননশীল, তাঁরা সকল অন্ধ প্রবৃত্তি ও সংস্কারকে দূর করিয়া কল্পনা-প্রদীপ্ত যুক্তির সাহায্যে তাঁদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে যে সকল আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, সেইগুলি তাঁদের দেশবাসিদের

গোচর করিয়া থাকেন। আমাদের জাতির মধ্যে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাঁরা এই জাতীয় আদর্শের সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তাঁদের সে আবিষ্কার এতটুকুও স্পর্শ করে নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীর দল ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড গড়িবার চেষ্টা করেন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে; এবং তাঁরাই আবার ভারতবর্ষকে সমাজের ক্ষেত্রে সংস্কারের হাজার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য প্রয়াসী হন্। এই সকল অসারশূন্য আন্দোলন এদেশকে প্রকৃত নেশন্ হইয়া উঠিতে দিবেনা। দেশের আত্মবোধ হয় নাই; দেশের দেহও তাই গড়িতেছেনা। এই আত্মবোধের বোধনের জন্য দেশের এখন সবচেয়ে দরকার অনেকগুলি যথার্থ চিন্তাশীল, মনীষী ব্যক্তি। তাঁরা দেশের শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ, সামর্থ্য, ধর্ম্ম, দর্শন—জ্ঞানের সকল বিভাগে—দেশের মনকে জাগাইয়া তুলিবেন। তখন দেশের স্বরূপ-পরিচয় পাইব; তারপর রূপ আপনি গড়িয়া—মণ্টেগুকে তার জন্য বায়না দিতে হইবেনা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

স্মৃতির সৌরভ। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে মুদ্রিত, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড়টাকা। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জর্জ্জ এলিয়ট প্রণীত Scenes of Clerical Life—উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। এই উপন্যাসখানি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল; এখন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাসের উপাখ্যানে মানুষের সুখ-দুঃখের যে খেলা দেখিতে পাই, তাহা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ; তাহা শাশ্বত সত্য, কাজেই তাহা সকলের উপভোগের সামগ্রী। অনুবাদের ভাষা মন্দ নয়,চলনসই। পাত্রপাত্রী বিদেশীয়; কিন্তু তাহাদের সুখ-দুঃখ আমাদের প্রাণে বেশ দাগ টানিয়া যায়। ইহা পাঠ করিয়া বাঙলার অনেক ধুরন্ধর ঔপন্যাসিক যদি বুঝিবার চেষ্টা করেন, উপন্যাসের স্বরূপ কি, তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় কিসে, তাহা হইলে এ সব অনুবাদেরও একটা সার্থকতা থাকে। বহিখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

আলেখ্য। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ভবানীপুর, ৩৩ নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোড হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভবানীপুর, ইন্দুপ্রকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি সন্দর্ভ-পুস্তক। প্রবন্ধগুলি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের। আলোচনাটুকু কথোপকথনচ্ছলে গ্রথিত; তাহাতে আর যাই হোক, গ্রন্থখানি একেবারে খাঁটি হয় নাই। লেখক 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'স্ত্রী-শিক্ষা', 'পণপ্রথা' 'গৃহবিচ্ছেদ' প্রভৃতি সামাজিক সন্দর্ভ এবং 'জ্ঞান ও ধর্ম্ম' 'মানব-জীবনে ভগবানের সাড়া' ও 'মায়া'—এই তিনটি আধ্যাত্মিক আলোচনা সংগৃহীত হইয়াছে। সামাজিক সন্দর্ভগুলিতে নূতন কথা বিশেষ-কিছু নাই, সেই পুরাতন মামুলি কাসুন্দিই ঘাঁটা হইয়াছে। লেখকের যুক্তিও তেমন নিপুণ হয়। আধ্যাত্মিক সন্দর্ভগুলি ফাঁপা উচ্ছ্বাস মাত্র।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

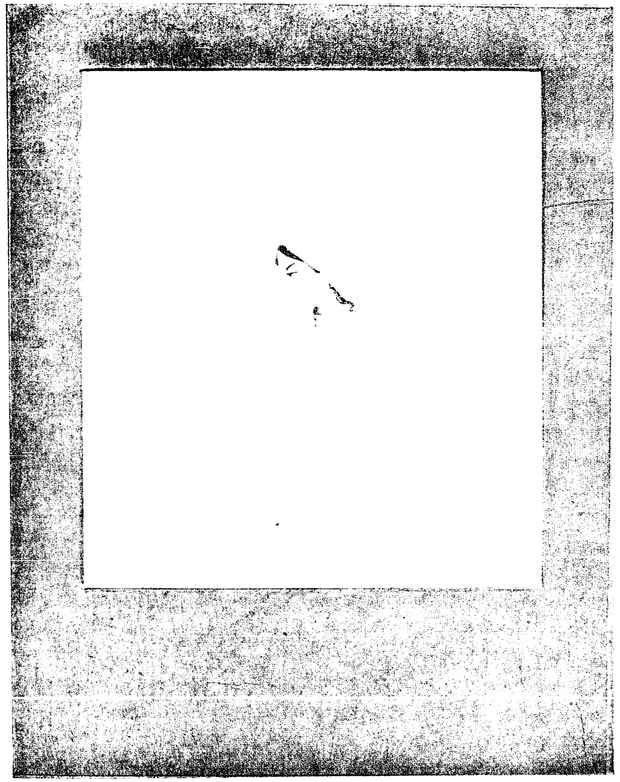

চন্দ্রমুখী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৫ [৯ম সংখ্যা

জলের-আল্পনা

একুশ

ঠিক তেলে-বেগুনের মত জ্বলিয়া স্বর্ণেন্দু যখন চলিয়া গেল, অবনী বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল :—

'তাইত বলি, জয়ন্তের মত লোক কখনো অমন কুস্থানে যেতে পারে? সে মাঝে-মাঝে যে-সব গান গায়, সেগুলোর কোন-কোনটা নীতির দিক্ দিয়ে খুব ভালো হয় না বটে, কিন্তু তাতে-এতে যে ঢের তফাৎ! ... ... সেদিন তার অপমানে আমি যে সত্যি-সত্যিই খুব-বেশী দুঃখিত হয়েছিলুম, তা নয়; কিন্তু আজ তার কথা ভেবে আমার প্রাণটা কেমন কাতর হয়ে উঠ্‌ছে! ... ... স্বর্ণেন্দু আমারি বন্ধু; জয়ন্ত হয়ত মনে-মনে ঠাউরেছে, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে তাকে সরাবার ফিকিরে বন্ধুর সাহায্যে আমিই এই ষড়যন্ত্রটা পাকিয়ে তুলেছি! সে কখনো চুপ করে' থাক্‌বে না, জগৎবাবুকে একদিন-না-একদিন সব কথা খুলে বল্‌বেই! জগৎবাবুও নিশ্চয় আমাকেই সন্দেহ কর্‌বেন! ... ... তাইত, আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যাহোক,—এখন উপায়? যদি আমি আগে-থাক্‌তেই জগৎবাবুর কাছে সমস্ত প্রকাশ করে' না দি, তাহলে শেষটা দেখ্‌ছি আমাকেই এই কুৎসিত অপযশের ভাগী হ'তে হবে! ... ...

'জগৎবাবুর বাড়ীতে জয়ন্তের মান বাড়ুক্ বা কমুক্, তাতে আমার সুবিধে-অসুবিধে কি? ইন্দুলেখাকে আমি ত অ্যাম্‌নেও পাব না, অম্‌নেও পাব না—সে ত আমাকে চায় না! জানি না, আমার ওপরে ইন্দুর এই বিষদৃষ্টি কেন? ... ... বেশ দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় পালকের চেয়ে হাল্‌কা হচ্ছে,

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

খুলো; ধূলোর চেয়ে হাল্‌কা, বাতাস; বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, নারী; আর নারীর চেয়ে হাল্‌কা কি?—কিছু না!'

অবনী বসিয়া-বসিয়া এম্‌নি নানান কথা ভাবিতেছে—হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাবু ঘরে আছেন,—বাবু?"

অবনী সাড়া দিতে-না-দিতেই ভজহরি ঝোড়ো কাকের মতন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

অবনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি জয়ন্তবাবুর চাকর না?"

ভজহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ! আমার খোকনকে বাঁচান!"

—"কে?"

—"আমাদের খোকন গো, আমাদের বাবু!"

—"জয়ন্তবাবু? কেন, তাঁর কি হয়েছে!"

—"জ্বর হয়েচে—কাল শেষ-রাত থেকে ভুল বক্‌চে!"

—"জ্বর হয়েচে ত অত ভাব্‌না কিসের?"

—"কে জানে এ কী জ্বর! বল্‌লুম ভিখিরীটাকে ছুঁস্‌নে—তা সে ত শুন্‌লে না!"

—"তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নি! ভিখিরীর কথা আবার কি বল্‌ছ?"

ভজহরি তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখনো বুক চাপ্‌ড়াইয়া, কখনো কপালে করাঘাত করিয়া কোনরকমে সব কথা খুলিয়া বলিল।

অবনীর তখন মনে পড়িল, সেদিন বাড়ী আসিবার সময়ে সেও জয়ন্তের বাড়ীর কাছে একটা বসন্ত-রোগী ভিখারীকে রাস্তায় পড়িয়া-পড়িয়া কাত্‌রাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু আর-পাঁচজনের মত সেও ভয়ে তাহার কাছে না-ঘেঁষিয়াই চট্‌পট্‌ চলিয়া আসিয়াছিল।... ...জয়ন্ত নিশ্চয় সেই ভিখারীটাকেই পথ হইতে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে!... ... এইখানে জয়ন্তের নির্ভীক উদারতার সঙ্গে আপনার ভীরু অক্ষমতার কথা ভাবিয়া অবনী মনে-মনে লজ্জিত হইল। জয়ন্তকে ভালোবাসিত না বলিয়া সে তাহার ভিতরকার সাঁচ্চা মনটিকে এতদিন দেখিতে পায় নাই; আজ জয়ন্তের আসল পরিচয় পাইয়া অবনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা অন্ধকারের ঠুলি আচম্বিতে খসিয়া পড়িল!

ভজহরি ব্যাকুলভাবে বলিল, "খোকনের পেচনে শনি লেগেচে গো! আজ ক-দিন হোলো সে তার মাকে হারিয়েচে—"

—"জয়ন্তবাবুর মা মারা গেছেন!"

—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তার ওপরে এই ব্যাপার! তার একন আপন বল্‌তে আর কেউ নেই! তাই আপনার কাচে ছুটে এলুম—আপনি খোকনের বন্ধু, এ-পাড়ায় আর কার কাচে যাব বলুন বাবু? আমি মুক্যু-সুক্যু মানুষ, কোতায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, কি কর্‌তে হয় কিচুই জানি-না যে! আর দেরি কর্‌বেন না,—তাকে আমি অ্যাক্‌লা ফেলে এসেচি!"

জয়ন্তের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া অবনীর প্রাণটা কেমন আপনা-আপনি ভিজিয়া আসিল! যদিও জয়ন্ত তাহার বন্ধু নয়, তবু এমন অসময়ে তাহাকে সাহায্য করা যে শত্রু-মিত্র সকলেরই কর্ত্তব্য, এটা বুঝিয়া অবনী বলিল, "আচ্ছা, তুমি তোমার

বাবুর কাছে যাও—আমি একেবারে ডাক্তার নিয়ে পরে যাচ্ছি।"

ভজহরি ধড়ে যেন কতকটা প্রাণ পাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

... ...

... ...

ডাক্তার জয়ন্তকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীর গায়ে বোধহয় বসন্ত ফুটিবে। এত-বেশী জ্বর, ভুল-বকা, গলায় ও কোমরে ব্যথা, এ-সব বসন্তেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

অবনী ভারি ভাবনায় পড়িয়া গেল। যদি জয়ন্তের কিছু হয়, তবে সে দায়িত্ব কে ঘাড়ে করিয়া লইবে?

ভজহরিকে ডাকিয়া সে বলিল, "ভজহরি, তোমার বাবুর বাড়ীতে কি এমন কেউ নেই, যিনি এখানে এসে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌তে পারেন?"

—"হ্যাঁ, গৌরীদিদি আচে।"

—"তিনি তোমার বাবুর কে?"

—"খোকনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কতা ছিল। গৌরীদিদি খোকনদের বাড়ীতেই মানুষ হয়েচে গো বাবু!"

—"জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আর-কারুর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বুঝি? কৈ, তা ত জানতুম না!"

ভজহরি খুব সংক্ষেপে জয়ন্তের বাড়ীর কথা বলিল। জয়ন্ত যে দেশে গিয়া পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিল না। যাহাকে একবার আপন মনে করিত, তাহার কাছে কিছুই ঢাকিয়া রাখিতে পারিত না,—এটা ছিল ভজহরির মস্ত দুর্ব্বলতা! অবনী যে এই অসময়ে তাহার খোকনকে দেখিতেছে-শুনিতেছে, তাইতেই ভজহরি একেবারে গলিয়া গিয়া তাহাকে পরম আপনজন বলিয়া ধরিয়া লইল!

ভিতরে-ভিতরে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অবনী তা জানিত না। জয়ন্তের অসহায়তা তাহার চোখে আরো করুণ হইয়া জাগিয়া উঠিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা বলিল, "ভজহরি, তাহলে তোমার দেশে খবর পাঠালে কেউ কি আস্‌বে না?"

ভজহরি হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

অবনী বলিল, "আচ্ছা, তবু খবর ত পাঠানো যাক্‌, তারপর যা-হয় দেখা যাবে। তোমাদের বাসার সাম্‌নের জগৎবাবুকে জান ত?"

—"জানি বৈকি! এই বিপদের সময়ে তিনিও যদি একানে থাক্‌তেন বাবু, তাহলে অনেকটা সুরাহা হ'ত।"

—"হ্যাঁ। তাঁকেও একটা খবর দি। তিনি এলেও আস্‌তে পারেন।"

অবনী তখনি টেলিগ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

বাইশ

জ্বরের মাঝখানে জয়ন্তের হঠাৎ একটু সাড় হইল।

সে তাহার কপালের উপরে কাহার দুখানি পদ্মের মতন নরম করপুটের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিল। এ হাত ত ভজহরির নয়!... ...জয়ন্ত চোখ মেলিতে গেল, পারিল না। তাহার চোখে ভারি বেদনা।

তাহার সারা দেহেও তখন গরম সুঁচের মত কি-যেন পট্‌পট্‌ করিয়া বিঁধিতেছে আর

বিঁধিতেছে,—সে যন্ত্রণা অসহ্য! জয়ন্ত ক্ষীণ কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, ইন্দু?"

ভজহরি পাশেই বসিয়াছিল; সে বলিয়া উঠিল, "আ আমার পোড়াকপাল! তোমার ইন্দু কোতায়—ওযে গৌরীদিদি! জগৎ-বাবুকে তার করা হয়েছিল, তা তিনি বলে পাঠিয়েচেন, একন আস্‌তে পার্‌বেন না! কিন্তু গৌরীদিদি খপর পেয়েই ছুটে এয়েচে! আপন লোক না-হ'লে কি দরদ হয়,—কি বলেন দেওয়ান-মশাই!"

জয়ন্তের কানে কালিশঙ্করের খক্‌খক্ কাশির আওয়াজ গেল। বিস্মিত অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "গৌরী—গৌরী! গৌরী এসেছে—" বলিতে-বলিতে সে আবার নীরব হইয়া পড়িল।

গৌরী জয়ন্তের মাথার উপরে দুখানি থর্‌থরে হাত রাখিয়া চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

জয়ন্তের সমস্ত দেহে তখন ভীষণ রোগের মারাত্মক চিহ্ন দেখা দিয়াছে,—সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে ভজহরি বলিল, "আমার খোকনের যদি কিচু হয়, তাহলে আমি আত্মঘাতী হব। হে মা শীতলা—"

গৌরী দুই ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া ভজহরিকে চুপ করিতে বলিল।

ভজহরি খানিকক্ষণ জয়ন্তের দিকে তাকাইয়া কোন-রকমে মুখ বন্ধ করিয়া রহিল; তারপর আবার বলিল, "আচ্ছা দেওয়ান-মশাই, ডাক্তার-সায়েব কি সত্যি-সত্যিই বলে গেলেন যে, খোকনের চোকের ভেতরেও মার অনুগ্রহ হয়েচে? না, এ মিচে কতা—না?"

গৌরী তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কী সব কথা বল্‌ছ ভজহরি! যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও!"

ভজহরি কাঁচুমাচু মুখে হাত যোড় করিয়া বলিল, "এবারটা আমায় মাপ কর দিদি!"

—"আচ্ছা, ফের্ কথা কইলে তুমি এখানে আর থাক্‌তে পাবে না!"

ভজহরি দুইহাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজিয়া লুকাইয়া-লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সারা দিন গেল। বিছানার উপরে কলাপাতে শুইয়া জয়ন্ত সমস্ত ক্ষণটা খালি ছট্‌ফট্-ছট্‌ফট্ করিয়াছে—এ-পাশ ও-পাশ ফিরিয়া, চিৎ হইয়া, উপুড় হইয়া, কোন-রকমে কিছুতেই সে একটুও স্বোয়াস্তি পাইতেছে না—তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছে সে যেন হাজার-হাজার ধারালো বর্ষার উপরে শুইয়া আছে! ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সে এই মর্ম্মভেদী যাতনা চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না—তাহার দেহের শত-শত ক্ষতের মুখ দিয়া ভিতরের হাহাকার যেন বাহিরে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

বিকৃত মুখে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার সে বলিয়া উঠিতেছে, "আর পারি না—আর পারি না, মলে যে বাঁচি—এর-চেয়ে মরা ভালো গো, মরা ভালো!"

কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ভজহরির চোখ যেন কানা হইয়া গেল—বৃদ্ধের জীর্ণ বক্ষের মধ্যে এত অশ্রুও ছিল!

গৌরী কিন্তু পাষাণ-প্রতিমার মত অটল হইয়াই আছে। তার প্রাণের ভিতরকার কথা অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু বাহিরে

তাহার চোখের প্রান্তে এতটুকু অশ্রু, তাহার প্রশান্ত মুখে এতটুকু অশান্তির লক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। রোগীর ঔষধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা—যখন যেটির দরকার,—কলের কাঁটার মত গৌরী তা করিয়া যাইতেছে—একটি কথাও না-কহিয়া!

সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত কতক-চেতন কতক-অচেতনের মত শুইয়া ছিল; হঠাৎ সে জড়িত স্বরে আস্তে-আস্তে যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ইন্দু,—ইন্দু, তুমি এলে না—তুমি আমাকে এমন করে' দাগা দিলে!" জয়ন্তের মুদিত চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রোগের এই নরক-যাতনার মধ্যেও ইন্দুর স্মৃতি জয়ন্ত ভুলিতে পারে নাই! গৌরীর প্রাণের কোন্ কোণে যে গভীর ব্যথা তুষানলের মত প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, জয়ন্তের এই কথায় তাহা যেন জ্বল্‌জ্বলে হইয়া উঠিল!—পাছে ভজহরি তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া বলিল, "আলোটা বড় বাড়িয়ে দিয়েছ ভজহরি, ওটা কমিয়ে দিয়ে আসি!" ..... কিন্তু আলোর শিখা না-কমাইয়া গৌরী যে আরো-বেশী বাড়াইয়া ফেলিল, দুঃখ-কাতর ভজহরি অতটা খেয়াল করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে অবনী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। গৌরীকে দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল—গৌরীও লজ্জিত হইয়া ভিতর হইতে সরিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভজহরি, তোমার বাবু এখন কেমন আছেন?"

তাহার স্বর বোধহয় জয়ন্তের কানে গেল—সে চম্‌কাইয়া উঠিল। সেটা অবনীর চোখ এড়াইল না।

তেইশ

জগৎবাবু ভাবিয়াছিলেন, দেওঘরে আসিলে ইন্দুলেখা, জয়ন্তের অভাব শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছেন, ইন্দুলেখা যেমন ছিল তেমনটি আর হইল না—বরং দিন-কে-দিন যেন আরো-বেশী মন-মরা হইয়া পড়িতেছে।

ইন্দু এখন সকলসময়েই অন্যমনস্ক থাকে, ঘরের ভিতর হইতে সহজে বাহিরে আসিতে চায় না, অকারণে চটিয়া চাকর-বাকরদের ধমক দেয়। আর এই ইন্দুই দুদিন আগে ছিল বিদ্যুতের মত চঞ্চল, তার হাসির কলরোল ছিল ঝরণার মত অবিরল! এখন তাহার চোখের কোলে কালির দাগ ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতেছে, তাহার কপোলের উপর হইতে গোলাপী আভাটুকু ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার নধর দেহখানি ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কী যে করিবেন, জগৎবাবু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, দিন-কে-দিন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন বল্ ত!"

ইন্দু লোক-দেখানো শুক্‌নো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌চ, তোমার চশ্‌মার নম্বর বদ্‌লানোর দরকার হয়েচে।"

—"তোর কি এখানটা ভালো লাগ্‌চে না?"

—"খুব ভালো লাগ্‌চে।"

—"তবে?"

—"তবে—কি, বাবা?"

—"তবে তুই অমন মন্‌-মরা হয়ে থাকিস্‌ কেন?"

—"বাবা, তুমি খালি খালি ভারি এক-কথা কও, যাও,—আর আমি তোমার কথার জবাব দেব না!"

ইন্দুর কপালের উপরকার এলমেল কতকগুলো চুল গোছাইয়া দিতে-দিতে জগৎবাবু বলিলেন, "মা ইন্দু, আমার কাছে লুকোস্‌-নে, সত্যি করে' বল্‌ দেখি বাছা, তুই কি এখনো জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌তে চাস্‌?"

ইন্দু চলিয়া যাইতে-যাইতে নির্ব্বাক ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিয়া গেল, না।

তারপরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া, অকারণে অত্যন্ত জোরে দুম্‌-করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল!

... ...

এর-মধ্যে জগৎবাবু হঠাৎ একদিন অবনীর কাছ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন:—"জয়ন্তের অত্যন্ত জ্বর; বসন্ত হবার সম্ভাবনা; আপনি কল্‌কাতায় এলে ভালো হয়; রোগীকে দেখ্‌বার লোক নেই।"

টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎবাবুর মন প্রথমটা একটু নরম হইয়াছিল—কারণ, জয়ন্তকে তিনি সত্যসত্যই স্নেহ করিতেন, ভালো বাসিতেন। কিন্তু তারপরেই তাঁহার মনে পড়িল জয়ন্তের চরিত্রের কথা! বুঝিলেন, এখন কলিকাতায় গেলে চলিবে না। জয়ন্তের সঙ্গে তিনি যখন কিছুতেই ইন্দুর বিবাহ দিতে পারিবেন না, তখন এ-দুজনের মধ্যে যাহাতে আর-না দেখাসাক্ষাৎ হয়, এখন তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য—তিনি পিতা, আগে তাঁহাকে আপন মেয়ের শুভাশুভ দেখিতে হইবে ত!... ...আর, জয়ন্ত এখনো তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে কেন? সে ধনীর ছেলে, দেশে তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে,—ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া যাক্‌ না! তিনি পর, তাঁহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন? সে কি ভাবিয়াছে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? না, অসম্ভব!

সুতরাং উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম করিলেন—"জয়ন্ত দেশে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাক্‌; এখন আমার যাওয়া চল্‌বে না।"

অবনীর টেলিগ্রামখানি জগৎবাবু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; পাছে ইন্দুর মন চঞ্চল হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু বলিলেন না।

জগৎবাবু এত সন্তর্পণে আট-ঘাট বাঁধিয়া চলিয়াও ইন্দুর মনকে কিছুতেই ভালো করিতে পারিলেন না। অবশেষে, এমন চমৎকার জল-হাওয়াতেও ইন্দুর রোজ ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর হইতে লাগিল। এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া জগৎবাবু বিদেশবাসের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্দু হঠাৎ গোঁ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল, সে কোনমনেই কলিকাতায় যাইবে না!

ইন্দু তাঁহার মেয়ে, তাঁহার কোলেই সে মানুষ, তাহার চরিত্রের সমস্তই তিনি বুঝিতেন; তবু আজ তাঁহার কাছে এই তরুণী মেয়ের মনটি একটা বিষম হেঁয়ালির মত খাপ্‌ছাড়া ঠেকিল।

আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন, "কল্‌কাতায় যাবি-নি কি রে?"

ইন্দু দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি এখানেই থাক্‌ব!"

—"এখানকার জল-হাওয়া তোর যে সহ্য হচ্ছে না!"

—"এখানকার জল-হাওয়া যদি আমার সহ্য না-হয়, তবে কল্‌কাতার ধূলো আর ধোঁয়া আরো অসহ্য হবে!"

—"কিন্তু—"

—"যতই 'কিন্তু' বল আর যতই ঘাড় নাড়ো বাবা, আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়্‌ব না, কিছুতেই না! দেখ দেখি—" এই বলিয়া ইন্দু ঘরের জান্‌লাটা খুলিয়া দিল। তারপর বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেখ দেখি বাবা, এখানে কেমন নীল আকাশ, কেমন ছবির মতন পাহাড়, কেমন খোলা মাঠ, সবুজ বন, ঢেউ-খেলানো নদী! এ দেখ্‌লে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! এ-সব ছেড়ে কল্‌কাতায় আমি যেতে চাই না। আস্‌বার সময়ে তুমি আমাকে জোর করে' নিয়ে এসেছ, এখন যাবার সময়ে তুমি যতই জোর কর, আমি এখন যাচ্ছি না বাবা!"—এই বলিয়া ইন্দু খুব হাসিতে লাগিল।

ইন্দুর হাসি দেখিয়া জগৎবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু জগৎবাবু যেই অদৃশ্য হইলেন, ইন্দুর মুখের ভাব অম্‌নি ধীরেধীরে বদ্‌লাইয়া গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উদাস ভাবে বিছানায় গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে নিপুণ অভিনেত্রীর মত পিতাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এখন বাহিরের অভিনয়ে আপনার ভিতরের মনকে সে কিছুতেই বোঝ্‌ মানাইতে পারিল না!

এইভাবে আরো-কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সেদিন দুপুরে কি-একটা কারণে জগৎবাবু যখন প্রিয়ভৃত্য মাণিকচাঁদকে উচ্চৈস্বরে ধমক্‌ দিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং মাণিক যখন সে ধমক্‌ একটুও আমোলে না-আনিয়া হাতের আড়ালে নীরবে হাস্য করিতেছে, তখন ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল।

জগৎবাবু ধমক্‌টা আপাতত বন্ধ রাখিয়া পত্রখানা খুলিলেন। পত্রখানা অবনীর। সে লিখিয়াছে:—

"শ্রদ্ধাস্পদ জগৎবাবু,

জয়ন্তের অসুখের জন্যে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, আপনাদের কোন খবর নিতে পারি-নি। সেজন্যে কিছু মনে কর্‌বেন না।

আমার টেলিগ্রামের আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা-থেকে বুঝেছি এখনো আপনি জয়ন্তের উপরে বিরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই চিঠিখানি পড়্‌লেই বুঝ্‌বেন যে, জয়ন্তের উপরে রাগ করে' তার প্রতি আপনি কতটা নিষ্ঠুর অবিচার করেছেন!

আপনি জানেন না, জয়ন্ত কী হতভাগ্য! আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর ক্রমাগত

দুঃখ-শোকের আঘাতে সে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তার মা মারা গেছেন, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ থেকে,,—আপনার কন্যাকে ভালোবেসে বঞ্চিত হয়েছে, দেশের ভদ্রাসনে তার আর মাথা রাখ্‌বার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু এত নির্য্যাতনের পরেও সে শান্তি পেলে না—আরো-এক ভীষণ দুঃখ এসে তাকে জীবন্মৃত করে' দিয়ে গেছে। রাস্তায় বসন্তরোগে মৃতপ্রায় একটা ভিখারীকে বাঁচাতে গিয়ে, সে আপনিই ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল—এ-যাত্রায় কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ-জীবনে পৃথিবীকে সে আর দেখ্‌তে পাবে না,—তাকে অন্ধ হয়ে থাক্‌তে হবে!"

এই-পর্য্যন্ত পড়িয়াই জগৎবাবু আঁৎকাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার হাত হইতে খসিয়া চিঠিখানা মাটির উপরে গিয়া পড়িল। আপনা-আপনি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! অন্ধ? ... ... জয়ন্ত অন্ধ?"—তাঁহার বুকটা শিহরিয়া উঠিল!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত মুখে তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং পত্রখানা মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন:—

"আপনাকে আর-একটি বিশেষ সংবাদ দিচ্ছি। আপনি সেদিন দুশ্চরিত্র বলে জয়ন্তকে যে অপমান করেছিলেন, সেটা আপনার পক্ষে সুবিচার হয়-নি; কারণ, সে নির্দ্দোষ। একজন ভালো গায়কের গান শুনিয়ে আন্‌বে, এই অছিলায় ভুলিয়ে জয়ন্তকে, আমাদেরই স্বর্ণেন্দু কুস্থানে নিয়ে যায়। জয়ন্ত সরল মনেই স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে গিয়েছিল,—সে যে কোন গায়িকার বাড়ীতে যাচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও এমন সন্দেহ কর্‌তে পারে-নি। তারপর যখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারে তখন সুবিধা পাবা-মাত্রই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসে। জয়ন্তের উপর স্বর্ণেন্দু অত্যন্ত চটা; তাইতেই সে এ-হেন ষড়যন্ত্র করে' মনের ঝাল ঝেড়েছে। আমি আসল সত্যটা জান্‌তে পেরেছি স্বর্ণেন্দুর নিজের মুখ থেকেই; সুতরাং জয়ন্ত যে নিরপরাধ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেকসময়ে চাক্ষুষ প্রমাণও যে যথেষ্ট প্রমাণ নয়, এ-থেকে আপনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাবেন।

"এত দুঃখ-শোক অপমান-নির্য্যাতনেও, ভীষণ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও জয়ন্ত আপনার কন্যাকে ভুল্‌তে পারে-নি—এমন-কি, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বক্‌তে-বক্‌তেও সে খালি 'ইন্দু ইন্দু' করে' কাত্‌রে উঠেছে! তার প্রেম যে এত গভীর, আমি তা জান্‌তুম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনার টেলিগ্রামের উত্তর তার কানে গিয়েছে। বিছানায় পড়ে রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে-করতেও সে বারংবার বলেছে, "আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনেও ইন্দু এল না!" আপনার উত্তরটা বোধহয় অসুখের চেয়েও নিদারুণ হয়ে তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে।

জগৎবাবু, আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি তা বিবেচনা করুন। আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনীয়। নমস্কার। ইতি

স্নেহপ্রার্থী
অবনী।"

পত্রপাঠ যখন সাঙ্গ হইল, জগৎবাবুর বুকের স্পন্দন তখন যেন থামিয়া গেল! পাষাণীভূতের মত নিশ্চল হইয়া বহুক্ষণ তিনি বসিয়া রহিলেন;—তারপর রুদ্ধ যন্ত্রণার আবেগে দুইহাতে কপালের দু-পাশ চাপিয়া ধরিয়া সাম্‌নের টেবিলের উপরে মাথা রাখিলেন—তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি এমন ভাবে আর-কখনো আহত হয় নাই! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জয়ন্তের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তিনিই দায়ী! একমাত্র তিনিই দায়ী! কোনমতেই আত্মসংবরণ করিতে না-পারিয়া শেষকালে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,—আমি নরাধম—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—যুধু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

পাশের ঘরে জানলার ধারে বসিয়া ইন্দু তখন উদাস চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া অবধি, তাহার দুঃখ-দীর্ণ চিত্তের কাছে এখন সুধু একমাত্র সান্ত্বনা, ধরণীর এই শ্যামল মুখ। ... ... খানিক দূরে দুধারের আকের আর মড়ুয়ের ক্ষেতের মাঝখানে, শুক্‌নো নদীর সাদা বালির বাঁকা রেখাটি যেন নিঝুম দুপুরের ভরা-রোদে গা-এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মাঝে মাঝে পায়ের তলায় চলন্ত ছায়া ফেলিয়া, চাষার মেয়েরা বালি খুঁড়িয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে; তীরের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া কতকগুলো গরু, মোষ ও ভেড়া চরিতেছে; কোথাও-বা উঁচু-নিচু পাথরের ঢিপির উপরে দু-চারটে বক ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে—যেন ছবিতে আঁকা।

অনেক দূরে আকাশ-পৃথিবীর সীমারেখা আড়াল করিয়া, পাষাণে-পরিণত মস্ত-একটা স্থির-মেঘের মত কালো পাহাড় হুম্‌ড়ি খাইয়া আছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আলোক-ছায়ার বিচিত্র পরিবর্ত্তন! ... ... এম্‌নি-সব নানান দৃশ্যের মাঝে ইন্দুর দৃষ্টি লক্ষ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এমনসময় হঠাৎ তার কাণে পিতার অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর আসিয়া ঢুকিল। সচমকে, বিস্মিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল—"বাবা, তুমি কি বল্‌ছ?"

যাতনায় অস্বাভাবিক কণ্ঠে জগৎবাবু ডাকিলেন, "ইন্দু—ইন্দু!"

ইন্দু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পিতার মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল!

জগৎবাবু টেবিলের উপরে পত্রখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন,—মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না।

পত্র পড়িতে-পড়িতে ইন্দুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল—তারপর চিঠি-পড়া শেষ-হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে মাটির উপরে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িল। ... ...

জগৎবাবু তাহাকে যখন কোলে করিয়া তুলিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন, ইন্দু তখন অনেকটা সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছে।

আস্তেআস্তে বিছানা হইতে নামিয়া, সে ক্ষুব্ধ—তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "বাবা!"

জগৎবাবু মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—"বাবা, অবনীবাবুর টেলিগ্রামের কথা ত তুমি আমাকে বল-নি!"

জগৎবাবু আজ তাঁহার নিজের মেয়ের সুমুখেই দোষীর মত মাথা হেঁট্ করিলেন।

—"বুঝেছি বাবা, পাছে আমার ভাব্না বাড়ে, সেই ভয়েই টেলিগ্রামখানা তুমি আমাকে দেখাও-নি! কিন্তু আজ্‌কের চেয়েও কি সেদিনকার ভাব্না বেশী গুরুতর হ'ত বাবা? এখন যে চিরজীবন ভাব্‌তে হবে!"

জগৎবাবু নিরুত্তর।

—"নাও বাবা, জিনিষপত্তর্ সব বাঁধ্‌তে হুকুম দাও,—আমরা আজ্‌কেই কল্‌কাতায় ফির্‌ব!"

চব্বিশ

—"গৌরী!"

—"বল।"

—"তুমি কি এখনো বসে আছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"না, আর তোমাকে জেগে থাক্‌তে হবে না গৌরী! আমি ভালো আছি। যমের মুখ থেকে যে খসে পড়েছে, তার জন্যে আর ভয় কি?"

—"অমন কথা বোলোনা গো, আমার বড় কষ্ট হয়।"

—"যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কষ্ট দেওয়াই আমার স্বভাব। দেখ্‌চ-না, মাকে এত কষ্ট দিলুম যে, তিনি এ পৃথিবীতে কিছুতেই আর টিক্‌তে পার্‌লেন না! আজ মা ত নেই, খালি তুমি আছ। এখন তোমাকে কষ্ট দেব-না ত আর কাকে দেব বল?"

—"তুমি ঘুমোও গো, ঘুমোও! দেখ্‌ছ না, রাত যে অনেক হ'ল।"

—"রাত হ'ল কি দিন হ'ল সে খোঁ তারা রাখুক্—দিন-রাত যাদের জন্যে জাননা, অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন!"—

—জয়ন্ত পাগলের মত কঠোর হা করিল। সে হাস্য গৌরীর বুকে হাড়গুলোর উপরে ধাক্কা মারিয়া যেন বজ্রে মত ধ্বনিয়া উঠিল! দু-হাতে ভর্ দি আস্তে-আস্তে বিছানার উপরে উঠিয়া বসি জয়ন্ত উর্দ্ধমুখে বলিল, "গৌরী, পৃথিবীতে কি এখনো চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, আলো জাগে? এখনো কি আকাশ তেম্‌নি নীল গাছ তেম্‌নি সবুজ, ফুল তেম্‌নি রাঙা আমার কাছে কিন্তু সব মুছে গেছে— একেবারে, একেবারে! আমার মনে ভিতরে যে মস্ত জগৎ ধু-ধু কর্‌ছে, সেখানে আর চাঁদ হাসে না, সূর্য্য ওঠে না, ফোটে না—সেখানে এখন সুধু একজন বাসিন্দা আছে, দিন-রাত সে সুধু অবিরাম স্তব্ধতার ধ্যান কর্‌ছে—তার নাম, অন্ধকার তাকে তোমরা জান—কিন্তু আমার মত স্পষ্ট করে' তাকে তোমরা কেউ দেখ-নি, কেউ দেখ-নি!"—জয়ন্তের স্বরে কী গভীর ক্রন্দনের সুর!

গৌরী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থামো!"

জয়ন্ত আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল। প্রাণের আবেগ তাহার দেহ ভাঙিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "গৌরী, মার অভিশাপে আজ আমি এমন হতভাগ্য!"

—"মা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন! এমন কথা মুখেও এন না!"

—"দেখ্‌ছ, আমার কি পাপ মন! নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আবার মাকে দুষ্‌ছি! তাঁর অভিমানকে অভিশাপ মনে কর্‌ছি! বাইরের চোখের সঙ্গেসঙ্গে আমার মনের চোখও অন্ধ হ'ল নাকি?"

গৌরী নিসাড় হইয়া রহিল। জয়ন্তও নীরবে আনমনে কি ভাবিতে লাগিল!

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে এখন আর কেউ আছে?"

—"না।"

—"আচ্ছা, তাহলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।... ...তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাস?"

গৌরী স্তব্ধ।...অন্ধ জয়ন্ত দেখিতে পাইল না গৌরী কেমন-করিয়া তাহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি কী মমতা-ভরা!

—"এই অন্ধ, রোগের ক্ষতে কুৎসিত, অকৃতজ্ঞ জয়ন্তকে এখন এ-দুনিয়ায় কেউ ভালোবাস্‌বে না গৌরী, কেউ ভালোবাস্‌বে না। বোধহয়, তুমিও না।"

গৌরী জোর-করিয়া কথা কহিল। ব্যথাভরা স্বরে বলিল, "অন্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা কর্‌ব?... ...আমি?"

জয়ন্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! দুই হাতের দুই মুঠোর মধ্যে বিছানার চাদর চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "তাহলে তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো! বেস না গৌরী, আমায় ভালো বেসনা! তোমার ভালোবাসা আমি তোমাকে কি-করে' ফিরিয়ে দেব? আমি ত তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ব না! তোমাকে স্নেহ কর্‌তে পারি বোনের মত—কিন্তু আমার প্রাণে তুমি আর-কিছু খুঁজে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমি কপটতা কর্‌তে চাই না। এ মন যাকে সমস্ত সমর্পণ কর্‌তে চেয়েছিল, অসময়ে সে আমাকে ত্যাগ করেছে। তাকে যেমন ভালোবেসেছিলুম, তেমন ভালোবাসা আর ত আমি তোমাকে দিতে পার্‌ব না! গৌরী, আমার এই নিষ্ঠুর সত্যকথায় তুমি রাগ কোরো না! বল, এ-কথার পরেও তুমি কি আমাকে ত্যাগ কর্‌বে না?"

কোনক্রমে কান্না চাপিয়া লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গৌরী বলিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর—কিন্তু আমি সুধু তোমার ঐ পা-দুটি পূজো কর্‌তে চাই—সে অনুগ্রহ থেকে আমাকে আর বঞ্চিত কোরো না!"

জয়ন্তের সাম্‌নে গৌরী কখনো তাহার মনের কথা এমন-করিয়া আর বলে নাই—বলিতে পারে নাই! প্রাণের দায়ে ভীরুও নির্ভীক হইয়া উঠে!

জয়ন্ত ধীরে-ধীরে বলিল, "গৌরী, আমি তোমার সঙ্গে যে নির্দ্দয় ব্যবহার করেছি, সে-সব ভুলে করুণাময়ী দেবীর মত তুমি আমার এই রোগশয্যার শিয়রে বসে এসে আছ —দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা ভুলে। তোমার সেবা-শুশ্রূষা না-পেলে এ-পৃথিবী থেকে নিষ্ঠুর জয়ন্তের নাম এতদিনে মুছে যেত। যে প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, সে প্রাণের উপরে এখন তোমারি অধিকার। এ অধিকার থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু ভেবে দেখ গৌরী,—আমি অন্ধ, কুৎসিত,

জীবন্মৃত। আমার এ-দেহে এখন পাথরের মত, এতে আর একবিন্দুও প্রেম নেই। দুর্ব্বহ একটা বোঝার মত, তুমি কি সারা-জীবন আমাকে ঘাড়ে করে' বইতে পারবে?" —এই-বলিয়া জয়ন্ত গৌরীর একখানি হাত লইয়া আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

গৌরীর হাত জয়ন্তের মুষ্টির মধ্যে কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না।

—"গৌরী, তোমার রূপ আছে গুণ আছে অর্থ আছে। ইচ্ছে করলে তুমি রাজার রাণী হ'তে পার। তবে কেন তোমার জীবনকে ব্যর্থ করতে চাও? দেখ, এখনো ভেবে দেখ, যে ভুল তুমি করতে চাইছ—সে ভুল একবার করলে জীবনে আর শোধ্‌রাতে পারবে না—"

জয়ন্তের কথায় গৌরীর দেহ কেমন-একটা বিহ্বলতার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; তাহার গোপন প্রাণের মধ্যে যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এতদিন শৈল-কন্দরে বন্দী নির্ঝর-স্রোতের মত আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছিল,—আজ যেন সে বাহিরে আসিবার রন্ধ্র, খুঁজিয়া পাইল। আজ আর সে আপনাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না,—আচম্বিতে জয়ন্তের কোলের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বাসরুদ্ধ অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো, থাক্—থাক্, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না! এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি—এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর গাঢ়, কোমল স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভেবেছিলুম আমার এ ব্যর্থ জীবনটা নির্জ্জল, নির্জ্জন, মরুভূমির মত সংসারের বাইরে পড়ে চিরকাল হা-হা করে' মরবে; কিন্তু তার মাঝখানে তুমি যখন নদীর একটি স্নিগ্ধ ধারার মত কোন নিষেধ না-মেনে বয়ে আস্‌তে চাইছ, তখন এস গৌরী, তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আর আমার নেই! দেখ, যদি এ মরু-প্রাণ তোমার প্রেমের রসে আবার একটু সরস হয়, এর জ্বলন্ত তৃষা তোমার স্পর্শে আবার যদি শান্ত হয়!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব

হিন্দু বাঙ্গালীর বর্ত্তমানে জাতীয় মস্তকাবরণের ব্যবহার না দেখিয়া অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদিগের জাতীয় কোন মস্তকাবরণ ছিল না। এই ধারণাটী যে ইতিহাসের প্রমাণে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমাদের আলোচনা দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মস্তকাবরণের প্রথম উদ্দেশ্য মস্তককে শীতাতপের প্রভাব হইতে রক্ষা করা। মনুষ্য কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বে যে, স্বাভাবিক উপায়ে মস্তক-আবরণের চেষ্টা

পাইবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমাবস্থায় মস্তকের কেশচ্ছেদন কখনও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তৎকালে মস্তকের কেশ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া যে জটারূপে পরিণত হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই জটিল কেশ মস্তকে বদ্ধ হইয়াই প্রথম শীতাতপ নিবারণ করিত। শিব ও দুর্গা উভয়েরই যে আমরা "জটাজূটের" উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমরা মানুষের উল্লিখিত আদিম অবস্থা প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

ক্রমে কেশের পরিপাট্য বিধানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কেশ সকল মস্তকে সংযত হইয়াই মস্তকাবরণের কার্য্য করিতে লাগিল। এই সংযত কেশের কার্য্য অধিকরূপে সম্পাদন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের শোভা সংবর্দ্ধনের জন্যই শিরোভূষণের কল্পনাও রচনা হয়। শিরোভূষণের কয়েকটী নামের আলোচনা হইতেই পুরাতত্ত্বের এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। শিরোভূষণের নাম 'কিরীট' ও 'মুকুট'। 'মৌলি' শব্দ অমরকোষে এইরূপে 'কিরীট' ও 'সংযত কেশ' উভয়ার্থ-বাচী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে:—"চূড়া কিরীটং কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্ত্রয়ঃ॥" 'মুকুট' শব্দও মৌলী বা সংযত কেশের অর্থই প্রকাশ করে। 'চূড়া' শব্দ মুকুটাদির অগ্রভাগ যেমন বুঝায়, তেমনই শিখা বা কেশগুচ্ছকেও বুঝায় যথা:—"শিখাচূড়া কেশপাশী" ইত্যমরঃ।

ইহা হইতে মস্তকের উপর শিখাকারে বদ্ধ কেশরাশির অনুকরণেই যে মুকুট বা কিরীটের কল্পনা হইয়াছে, তাহাই অনুমিত হয়।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক বোধ হয় যে, 'চূড়া' শব্দের রূপান্তরেই সাধারণ প্রচলিত 'চুল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চুলশব্দ কেশের বাচক হইলেও কেশ যে আদিকালে চূড়াকারে বদ্ধ হইত, তাহাই ইহার মূল চূড়া শব্দের সহিত যোগ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

'কিরীট' ও 'মুকুট' বিশেষ শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয়। সচরাচর যে মস্তকাবরণের ব্যবহার হইত, তাহা অন্য প্রকারের ছিল। ইহার নাম ছিল "উষ্ণীষ"। ইহার পর্য্যায় শব্দ সকল অভিধানে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 'বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোবেষ্ট, চেলোণ্ডুক।' শব্দকল্পদ্রুমে "পাগ্‌ড়ী" ইতিভাষা বলিয়া ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'শিরোবেষ্ট' শব্দের দ্বারা পাকে পাকে মস্তক বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র বদ্ধ হইত তাহাই যে 'উষ্ণীষ' বলিয়া কথিত হইত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উষ্ণীষ যে কিরীট হইতে পৃথক্‌রূপ মস্তকাবরণ, অমরকোষে ইহার যে নানা অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা:—

"উষ্ণীষঃ শিরোবেষ্ট কিরীটয়োঃ॥" "উষ্ণীষ' শব্দের শিরোবেষ্ট ও কিরীট এই দুই অর্থ।"

উষ্ণীষ শব্দ কিরীটেরও বাচক হওয়াতে উষ্ণীষ বা পাগড়িই যে প্রচলিত মস্তকাবরণ ছিল এবং কিরীট উহারই অনুকরণে বিশেষ শিরোভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এই তথ্যই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

উষ্ণীষ যে বৈদিক কালের ঋষিদিগেরই মস্তকাবরণ ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। "লোহিতোষ্ণীষা ঋত্বিজশ্চরন্তি"

অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটী অতীব সুপরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত। ইহাতে লোহিতোষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক ঋত্বিক্ যে যজ্ঞ-ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তমান হইত, তাহাই জানিতে পারা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৈদিক কার্য্যে সেই পূর্ব্বনিয়মের অনুবর্ত্তনেই উষ্ণীষের জন্য রক্তবর্ণ বস্ত্রের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথানিয়মে উষ্ণীষ রচনা না হইলেও পুরোহিত সেই রক্তবস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকেন। এইরূপে বিলুপ্ত প্রথার নিদর্শন আমাদের দেবকার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উষ্ণীষ ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক প্রমাণ ব্যতীত পৌরাণিক বহুল প্রমাণই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশেই আমরা উষ্ণীষ-ধারণের উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা :—

"চীর্ণব্রতোঽথ যুক্তাত্মা সশক্তঃ স্নাতুমর্হতি ॥
বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিমন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্ ॥
যজ্ঞোপবীত দ্বিতয়ং সোদকলু কমণ্ডলুম্ ॥
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলম্ পাদুকেচাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মেচকুণ্ডলে ধার্য্যে ব্যপ্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥"

কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ১৫শ অধ্যায়ঃ।

"আচরিতব্রত, বিশুদ্ধচেতাঃ, শক্তিমান্ ব্যক্তিই সমাবর্ত্তন স্নানের অধিকারী। স্নাতক, বংশযষ্টি, অন্তর্ব্বাস, উত্তরীয়-বস্ত্র, যজ্ঞোপবীতদ্বয় ও জলসহিত কমণ্ডলু, এই সকল ধারণ করিবে। নখ কেশ কর্ত্তন করিয়া, শুচি হইয়া ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ, চর্ম্ম-পাদুকা, কাষ্ঠ-পাদুকা স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে।"

এস্থলে সমাবর্ত্তনের পর উষ্ণীষ ধারণের উল্লেখ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় উষ্ণীষ ধারণ করা হইত না ইহাই প্রতিপন্ন হয়। মনুতে ব্রহ্মচারীর ছত্রাদি বর্জ্জনের বিধি দেখা যায়, যথা :—

"অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপাণচ্ছত্র ধারণম্ ॥"

"গাত্রে তৈলমর্দ্দন, চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান, ছত্র ও পাদুকা ধারণ ব্রহ্মচারী পরিত্যাগ করিবে।" ছত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণীষও বর্জ্জিত হইত বলিয়াই বোধ হয়, তাহাতেই সমাবর্ত্তনের পর ছত্রাদির সহিতই উষ্ণীষ-ধারণও উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরে পুরাণের সমাবর্ত্তন বর্ণনায় কেশ কর্ত্তনের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মচারী যে দীর্ঘ কেশ ধারণ করিত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই দীর্ঘ কেশের দ্বারাই উষ্ণীষের কার্য্য হইত বলিয়াই তখন উষ্ণীষের কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিদ্বিজের নিত্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে এই প্রকারে উষ্ণীষ ধারণের বিধান দৃষ্ট হয় :—

যজ্ঞোপবীত দ্বিতয়ং সোত্তরীয়ঞ্চ ধারয়েৎ ॥
সুবর্ণকুণ্ডলে কৈব ধৌতবস্ত্রদ্বয়ংতথা ॥
অনুলেপন লিপ্তাঙ্গঃ কৃতকেশনখঃ শুচিঃ ॥
ধারয়েদ্বৈণবং দণ্ডং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম ॥
উষ্ণীষমমলংছত্রং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ ॥
ধারয়েৎ পুষ্পমাল্যেচ সুগন্ধে প্রিয়দর্শনঃ ॥
নিত্যমধ্যায়শীলঞ্চ যথাচারং সমাচরেৎ ॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ২৪শ অধ্যায়।

"দ্বিজগণ, উত্তরীয়সহ যজ্ঞোপবীতদ্বয়, সুবর্ণময় কুণ্ডল-যুগল, বৈণবদণ্ড, সজল কমণ্ডলু, উষ্ণীষ, নির্ম্মল ছত্র, পাদুকাযুগল ও উপানৎ-যুগল এবং সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ধারণ করিবে। সতত পবিত্র থাকিবে, কেশ ও নখ ছেদন করিবে, নিত্য অধ্যয়নশীল হইবে, গাত্রে

চন্দনাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে!"

গৃহীর সাধারণ জীবন-ব্যাপারের মধ্যে উষ্ণীষ-ধারণ এই প্রকারে অন্তর্ভূত হইয়াছে :—

"ধারয়েদ্বৈণবীং যষ্টিমন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম ॥
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলং পাদুকে বাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মেচ কুণ্ডলে নিত্যং কৃতকেশনখঃ শুচিঃ ॥
"শুক্লাম্বরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ।
নজীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্বৈ বিভবে সতি ॥"

সৌরপুরাণ ১৭শ অধ্যায়।

"গৃহী বেণুযষ্টি, অন্তর্বাস, বস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত দ্বিতীয়, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ এবং পাদুকাযুগল অথবা উপানৎ যুগল আর সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় নিত্য ধারণ করিবে। ছিন্নকেশ, ছিন্ন নখ, শুচি, শুক্লবস্ত্রধারী, সুগন্ধ ও প্রিয়দর্শন হইবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিনবস্ত্র পরিবে ন'।"

আহারের সময় শিরোবেষ্টন ও উপানৎ পরিত্যাগের বিষয় পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিত শিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যোভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বংবিদ্যাত্তদাসুরম্ ॥"

কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ২১শ অধ্যায়ঃ।

"বেষ্টিতশির হইয়া, বিদিঙমুখ হইয়া (অগ্ন্যাদিকোণে মুখ ফিরাইয়া) কিংবা চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান করিয়া ভোজন করিলে সেই ভোজন অসুরের তৃপ্তিকর হয় জানিবে।"

এ-সম্বন্ধে মনুসংহিতায়ও তুল্যরূপ ব্যবস্থাই দেখা যায় :—

"যদ্বেষ্টিত শিরাভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈরক্ষাংসিভুঞ্জতে ॥"

৩য় অধ্যায়।

ইহা হইতে ভোজনকালে ব্যতীত অন্য সময়ে যে উষ্ণীষ-ধারণের নিয়ম ছিল তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়।

উষ্ণীষ ব্যতীত অন্য প্রকারের মস্তকাবরণের প্রমাণও আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হই। এই আবরণের নাম "শিরস্ত্রাণ"।

উষ্ণীষ যেমন পাগ্‌ড়ীর ন্যায় আবরণ, ইহা তেমনই টুপির ন্যায় আবরণ। শিরস্ত্রাণ বিশেষরূপে যুদ্ধাস্ত্ররূপেই আমাদের নিকট পরিচিত। ইহার নাম হইতেই শিরঃ বা মস্তকের রক্ষাই যে ইহার কার্য্য, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। অমরকোষ অভিধানে শিরস্ত্র শব্দ যুদ্ধোপকরণবাচী শব্দ সকলের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা :—

"অথ শীর্ষকম্।
শীর্ষণ্যঞ্চ শিরস্ত্রে ॥"

"শীর্ষণ্য" শব্দ যেমন শিরস্ত্রাণের বাচক, তেমনই ইহা নির্ম্মল কেশেরও বাচক, যথা :—

"শীর্ষণ্য শিরসো বিশদেকচে ॥" ইত্যমরঃ।

এই প্রকারে "শিরস্ত্র" বা টুপিরূপ মস্তকাবরণের সহিতও মূলে চুলেরই যোগ দেখা যাইতেছে।

একই 'শীর্ষণ্য' শব্দ নির্ম্মল চুল ও টুপির বাচক হওয়ায় টুপি যে বিলাসোপকরণরূপেই নির্ম্মল চুলের উপর ব্যবহৃত হইত, তাহারই যেন আভাস পাওয়া যায়।

বৈদিক ও পৌরাণিককালে যেমন উষ্ণীষ

ধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়, তান্ত্রিক-কালে তেমনই শিখাধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়। তাহাতেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক ক্রিয়ার ন্যায় উষ্ণীষের কোন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না; তাহাতে তৎ পরিবর্ত্তে শিখা বন্ধনেরই বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক দীক্ষায় শিখাধারণ বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিখাধারণ যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। শিখাদ্বারা উষ্ণীষ এই প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়াই ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দু যদি কোন মস্তকাবরণ নিজের জাতীয় মস্তকাবরণ বলিয়া দাবী করিতে চায়, তবে প্রাচীন উষ্ণীষকেই নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চোখের দেখা

ঘাটের পথে বটের ছায়া তলে
একটু দাঁড়ায় অন্য মনের ছলে,
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—
যুঁইটি ফোটার বেলা,
ভুরুর কোণা সুরু কোথায় নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়া তলে।

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা চাঁদের আলো—
চাই না আমার চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেও নেই যে অধিকার!
ভিক্ষা বলে' যেটুকু পাই ভালো—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো।

গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁঝে
প্রাণের ভিতর সোণার সারং বাজে।
পিছন হ'তে কেমন জানি কেন
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বসিল যেন,
ফুলল হবে আকাশ তবু অস্তমেঘের ভাঁজে,
গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁঝে।

একলা কাটে জ্যোস্না আমার শূন্য আঙিনাতে,
ঝাঁ-ঝাঁ করে বিজন রাতি ঝিঁঝিঁ যখন মাতে।
যতেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত,—
টাট্‌কা-টানা একটি ছবি ফুটবে সবার সাথে,
ফুট্‌ফুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে!

এম্‌নি করে'-মনটি চুরি কোরো,
যেথান-সেথান ঘুরে বেড়ায়—
কাঁচপোকাটি ধোরো;
মেরে রেখো কোটোয় তুলে,
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে
টিপ্ করে' সই কপালটিতে পোরো;
এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

প্রতিভার লক্ষণ

প্রতিভা জিনিষটা নাকি অনেক রোগের মতই বংশগত,—গ্যাল্‌টন, রিবট প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মত-বাদী। কিন্তু এই নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। দুই পক্ষেরই যুক্তি এবং প্রমাণ দেখলে কোন-একটা স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মুস্কিল,—মনে হয় যেন দুই দলই ঠিক কথা বলছেন।

বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, সঙ্গীত-প্রতিভা প্রায়ই বংশানুক্রমিক। গ্যালেসট্রীনা, বেন্‌দা, ভুসেক, হিলার, একহরন,—এঁরা সকলেই নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ের ছেলে ছিলেন; বিথোভেনের বাপ ও ঠাকুরদাদা দুজনেই সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন; এই প্রসঙ্গে প্রুশিয়ার বিখ্যাত Bach পরিবারেরও নাম করা যেতে পারে। এই পরিবারে যথাক্রমে আটপুরুষ ধরে সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল; Viet Bach নামে একজন রুটিওয়ালা এই পরিবারের আদিপুরুষ, সে রুটি সেঁকত আর সময় পেলে মাঝে মাঝে বেহালা বাজাত। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই পরিবার থেকে যে কত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক বেরিয়েছিলেন, তার হিসাব করা যায় না। কবিদের ভিতরও আমরা দেখতে পাই, ম্যান্‌জোনি, ল্যুকান, ট্যাসো, এরিষ্টো, কনসিল্লা, র‍্যাফাইন, সোফোক্‌ল্‌স্, কোলরিজ, ডুমা, ও দোদে প্রভৃতির প্রতিভা উর্দ্ধতন পুরুষ থেকে নেমেছিল। প্রাকৃত বিজ্ঞানে,—পিলিনিস্, ডারউইন, ডি ক্যানডোল, হুকার, হর্শেল, জুস্যো, Sassure, জিওফ্রে, সেণ্ট হিলেয়ার প্রভৃতি, দর্শনশাস্ত্রে স্ক্যালিজার্স, Voissus, ফিচার, হুম্‌বোল্ট, শেলজেল, গ্রাম প্রভৃতির এবং রাজনীতিতে—পিটস্, ফক্‌স, ক্যানিং, ওয়ালপোল, পিল, ডিসরেলী প্রভৃতি সকলেরই প্রতিভা বংশগত।

সিসেরো, কনডরসেট, কুভিয়ার, বাকোঁন, গেটে, সিডনি স্মিথ, কাউপার, নেপোলিয়ান, ক্রমওয়েল, চ্যাটারব্রিয়াণ্ড, স্কট, বায়রণ, লামারটিন, সেণ্ট অগষ্টিন, গ্রে, সুইফ্‌ট্, ফন্‌টেনেল, ম্যানজোনি, ক্যাণ্ট, ওয়েলিংটন ও ফস্‌কলো প্রভৃতির প্রতিভা তাঁদের মায়ের দিক থেকে এসেছিল; আর বেকন, র‍্যাফেল, ওয়েবার, সিলার, মিলটন, এলবার্টি, ট্যাসো প্রভৃতি, আপন আপন পিতৃ-প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। এই-সব প্রমাণ দেখলেও, একটা কথা মনে হয় যে, কেবল জনকয়েক প্রতিভাবানের পিতৃ-মাতৃ কুলের কেউ কেউ ছাড়া—ধরতে গেলে আর সকলে এমন-কিছু বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি।

আর এক দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করেন নি; আবার যাঁরা বিবাহ করেছেন তাঁরাও নিঃসন্তান অবস্থায়ই মারা গিয়েছেন। বেকন একজায়গায় দুঃখ করেছেন "The noblest works and foundations have proceeded from childless men" ইংলণ্ডের বেশীভাগ

কবিরই বংশলোপ হয়ে গিয়েছে,—সেখানকার সেক্‌স্‌পীয়ার, বেন-জনসন, মিলটন, অটওয়ে, ড্রাইডেন, রো, এডিসন, পোপ, সুইফ্‌ট্‌, গে, জনসন, গোল্ডস্মিথ, কাউপার, হব্‌স, ক্যামডেন প্রভৃতির বংশের কেহই আর বর্ত্তমান নাই।

মাইকেল এঞ্জিলো, কাণ্ট, নিউটন, পিট, ফক্‌স, ফনটেনেল, বিথোভেন, গ্যাসেণ্ডি, গ্যালিলিও, লক, গ্রে, হিউম, গিবন, মেকলে, ল্যাম্ব, লেনার্ডা ডা ভিন্সি, কোপারনিকাস, ভলটেয়ার, ফ্লুবেয়ার, ফস্‌কোলো, ও ম্যাজিনি প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যেও অনেকেই বিবাহই করেন নি!

অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে যে, এঁদের বিবাহিত জীবন মোটেই সুখকর হয়নি। সেকস্‌পীয়র, দান্তে, মারজোলো, বায়রণ, কোলরিজ, এডিসন, ল্যাণ্ডর, কারলাইল, কমটে, হেডন, মিলটন, ডিকেন্স প্রভৃতির দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল।

প্রতিভাশালী লোকদের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এঁরা যেমন বাপ-মার প্রতিভা নিজেদের মধ্যে পেয়ে থাকেন, তেম্‌নি অনেক স্থলে তাঁরা নিজেরাই আবার পাগল, অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানের জন্মদাতা হন। অনেকে বলেন যে, প্রতিভা জিনিষটি বংশের ভিতর দিয়ে নামতে নামতে ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে পড়ে, শেষে একটা কদর্য্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন প্রতিভাবানের সন্তানদের চরিত্র আলোচনা করে দেখা যাক্‌:—সিপিও আফ্রিকেনাসের ছেলে একেবারে নিরেট মূর্খ ছিল; সিসেরোর ছেলে ভয়ানক মাতাল ছিল; লুথারের ছেলে অতিশয় অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল; উলিয়াম পেন, থেমিষ্টকল, এরিষ্টাইড, পেরিক্‌ল্‌স্‌, থুসিডাইড প্রভৃতি আপন আপন সন্তানের জন্য অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। কারডানের দুই ছেলে, কিন্তু দুটিই ছিল অবতার-বিশেষ; একটি বিষ খাইয়ে লোক-মারার দরুণ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিল, আর-একটি চুরি-জুচ্চুরি প্রভৃতি নানা গুণের জন্যে বার ছয়েক শ্রীঘর-বাসের পরও সায়েস্তা হয়নি। প্রেত্রার্কের ছেলে ছিল অত্যন্ত অলস ও ভয়ানক বদমাইস। রেম্‌ব্রাণ্ড তাঁর ছেলে টিটাসকে অঙ্কন-বিদ্যা শেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিশেষ-কিছু সুবিধা করে উঠতে পারেন-নি।

ওয়ালটার স্কটের পুত্র, পিতার সাহিত্য-সেবার জন্যে মনে মনে বিশেষ লজ্জিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই গর্ব্ব করে বল্‌তেন, "সৌভাগ্যের বিষয় আমি বাবার একখানি বইও পড়িনি।" মোজার্টের ছেলেকে কোন সভায় একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "সঙ্গীতে আপনার কেমন অনুরাগ?" এই কথা শুনে সে পকেট থেকে একমুঠো টাকা বার করে টেবিলের উপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে বল্লে, "দুনিয়ায় এই আওয়াজ ছাড়া আর কোন যন্ত্রের বাজনা আমার কাণে বিষ ঢেলে দেয়।"

বংশগত প্রতিভার বিরুদ্ধমতবাদীরা বলেন, প্রতিভাশালীরা একদিকে যেমন প্রায়ই পাগল, রুগ্ন কিংবা বদমাইস সন্তানের

জন্ম দিয়ে থাকেন, তেমনি তাঁরা নিজেরাই আবার অনেক সময় ঐ সব গুণ-বিশিষ্ট বাপ-মায়ের সন্তান হন। এই সমস্যায় পড়েই বোধ হয় La Bruyère বলেছেন "These men have neither ancestors nor decendants they themselves form their entire posterity." সোফোক্‌ল্‌সের পিতা একটি দুরন্ত মাতাল ছিলেন। পিটার দি গ্রেটের বাবাও অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত এবং দুর্ব্বৃত্ত মাতাল ছিলেন। প্রতিভাবানদের জন্মদাতাদের সম্বন্ধে এ-রকম আরো অনেক প্রমাণ খাড়া করা যেতে পারে।

ডি কাণ্ডল এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, জারজ সন্তানদের মধ্যেও অনেক প্রতিভাবান পুরুষ দেখা গিয়েছে। ইরেজ্‌মাস গর্ব্ব করে বলতেন, "I am not the fruit of a conjugal duty." আইজাক ডিসরেলী তাঁর Memoirs of Toland নামক পুস্তকে এক জায়গায় বলেছেন, জারজদের বুদ্ধি প্রায়ই সাধারণ শ্রেণীর চেয়ে একটু বেশী সাফ হয়ে থাকে, —থেমিষ্টকেল্‌স, চার্লস মারটেল, উইলিয়াম দি কঙ্কারার, ডিউক অব্‌ বারউইক, লেনার্ডা ডা ভিন্সি, বোক্কাসিও, এ, ডুমা, কারডান, ডা'লেম্‌বার্ট, স্যাভেজ, প্রায়ার, ভি গিয়ারডিন, লা হার্প, আলেকজন্দর, ফার্নে প্রভৃতি ব্যক্তিই তার জলন্ত প্রমাণ।

প্রতিভা যেমন সব সময়ে বংশানুক্রমিক হয় না, তেমনি পাগলামী রোগটাও যে সব সময়ে বংশানুক্রমিক হয় সে কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে গড়পড়তা হিসাব কর্‌তে গেলে প্রতিভার চেয়ে পাগলামীর হিসাবটাই বেশী দাঁড়িয়ে যায়। পাগলামীর মতন বদমাইসী এবং মদের উপর অত্যন্ত ঝোঁক্‌ প্রায়ই বংশের ভিতর দিয়ে নেমে থাকে। এক্ষেত্রে বিলাতের বিখ্যাত জুক্‌স্‌-পরিবারের নাম করা যেতে পারে। ম্যাক্স জুক্‌স্‌ নামে একজন মাতাল থেকে এদের বংশের উৎপত্তি হয়, পঁচাত্তর বৎসর ধরে এই পরিবার ২০০ চোর ও খুনে, ২৮০ জন রুগ্ন (অন্ধ, বুদ্ধিহীন, যক্ষ্মারোগী), এবং ৯০টি বেশ্যা সরবরাহ করে এসেছে। এদের সায়েস্তা করবার জন্যে সরকারকে প্রায় তিনকোটী টাকার উপর খরচা করতে হয়েছিল।

আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেকের খুব ছেলে-বেলাতেই প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দান্তে নয় বছর বয়স থেকে বিয়াত্রিচের উপর প্রেমের কবিতা লিখতে সুরু করেছিলেন। ট্যাসো দশ বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন। প্যাস্‌ক্যাল, কম্‌টে, ফারনিয়ার, জোনাথান, এডওয়ার্ডস, Niebuhr, মাইকেল এঞ্জিলো, গ্যাসেমি, Boussuet, ভলটেয়ার প্রভৃতির প্রতিভা সাত থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল। পিকো ডিলা মিরাণ্ডোলা ছেলে-বয়সে লাটিন, গ্রীক হিব্রু, চালডিয়ান ও আরব্য ভাষা শিখেছিলেন। গেটের যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি একটা ছোট গল্প লিখে সাতটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তর্জ্জমা করে দেখিয়েছিলেন। Wieland সাত বছর বয়সে লাটিন বেশ

ভালরকম দখলে এনেছিলেন। Kotzebue সাত বছর বয়সে প্রহসন রচনা করতে চেষ্টা করেন এবং আঠার বছর বয়সের সময় তাঁর প্রথম বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়। সিলারের যুগান্তকারী Raüber যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। পোপের বিখ্যাত কবিতা Ode to Solitude বার বছর বয়সের সময় রচিত হয় এবং ষোল বছর বয়সের সময় তিনি Pastoral নামক কবিতাটি রচনা করেন। মেয়ারবীয়র পাঁচ বছর থেকেই পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করেন। ক্লড যোসেফ ভার্নে চার বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকতে সুরু করেন এবং কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর হয়ে উঠেছিলেন। ওয়েটনের যখন পাঁচ বছর মাত্র বয়স, তখনই তিনি লাটিন, গ্রীক, এবং হিব্রু ভাষায় লিখতে পারতেন, দশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি চালডিয়ান, সীরিয়ক এবং আরব্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। র‍্যাফেল চোদ্দ বছর বয়সেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, Restif de la Bretonna এগার বছর বয়স থেকেই মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে শিখেছিলেন এবং চোদ্দ বছর বয়সের সময় তিনি একটি কবিতা লিখে তাঁর প্রথম বার জন উপপত্নীর নামে উৎসর্গ করেন।

পাগলা-গারদের অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুব ছেলে-বেলাতে যাদের প্রতিভা স্ফুরিত হয় একটু বয়স হলেই তাদের মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, আর পাগলদের ছেলে-পিলেদের ভিতরও এ-রকম অকালপক্কতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রতিভাবানদের মধ্যে ভবঘুরে হয়ে বেড়ানোর একটা বিশেষ বাতিক লক্ষ্য করা যায়;—বিনা কাজে, বিনা উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকে কত সময়ে কত যে বিপদে পড়েন, তার ঠিক নেই। কেন এবং কিসের ঝোঁকে যে তাঁদের এমন বাতিকে ধরে, তার কোন বিশেষ কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন না! চিকিৎসকেরা বলেন, মাথা-খারাপের এও একটা বিশেষ লক্ষণ। হাইন, এ্যালফেরি, বায়রণ, গিয়োরডনো ব্রুনো, লিওপার্ডি, ট্যাসো, গোল্ডস্মিথ, ষ্টার্ণ, গটিয়ার, মুসে, লেনো প্রভৃতি সকলেরই এইরকম খামকা ঘুরে বেড়ানোর বদ্-অভ্যাস ছিল।

হোল্ডারিন প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে এমনি লক্ষ্মীছাড়ার মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, প্রেত্রার্ক, প্যাইসিল্যো, Lovoisier, সেলিনি, Cervantes,—এঁরা এই বদ-অভ্যাসের দরুণ কত সময় কত যে ফ্যাঁসাদে পড়েছিলেন, তবুও তাঁদের খেয়াল ছোটে-নি। মেয়ারবিয়র প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে লক্ষ্যহীনের মত ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দেশ-ভ্রমণের সময় তিনি রেলগাড়ীতে বসে বসে গীতি-নাট্য লিখতেন। ওয়াগ্নার রীগা থেকে হেঁটে প্যারিতে গিয়েছিলেন।

প্রতিভার দরবারে স্ত্রীলোকের আসন খুবই অল্প,—একেবারে নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, আজকাল জোর করে

এই সত্য প্রচার করায় বিশেষ ভয় আছে। তবে একমাত্র ভরসা যে কথাটা আমাদের নিজেদের বানানো নয়। একটা ব্যাপার বহুকাল থেকে লক্ষ্য করে আসা হচ্ছে, যে সব দেশে হাজার হাজার মেয়ে গান শেখে অথবা গান-বাজনার বিশেষ চর্চ্চা করে থাকে, তাদের মধ্যে একজনও ভাল গান রচনা করতে পারে না। আমেরিকায়, যেখানকার মেয়েরা বিশেষ রকম উন্নতিশীল বলে জগতের মধ্যে পরিচিত, সেখানকার ছয়শত স্ত্রী-চিকিৎসকের মধ্যে একজনও তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু আমেরিকায় কেন, রুষিয়ার কয়েকজন মাত্র স্ত্রী-চিকিৎসক ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জায়গার কোন স্ত্রীলোকই এই বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে মেরি সোমারভিল, জর্জ ইলিয়ট, জর্জ স্যাণ্ড, ড্যানিয়েল ষ্টার্ণ, মেরিনি, স্যাফো, মিসেস্ ব্রাউনিং প্রভৃতি কয়েকজনকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের সকলের প্রতিভা একত্র করলেও এক মাইকেল এঞ্জিলো, এক নিউটন অথবা এক বালজাকের প্রতিভার সম্মুখে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। মিলের মতন লোক, যিনি স্ত্রীলোকদের দিকে অতিরিক্ত পক্ষপাতী না হয়ে কখনো কোন বিচার করতে পারেন-নি, তিনিও বলেছেন—"স্ত্রীলোক-দের মধ্যে মৌলিকতার অত্যন্ত অভাব; আসল কথা তাঁরা বড় বেশী-রকমের রক্ষনশীল।"

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমান যন্ত্রের মতন, পাগলাদের খেয়ালও বাড়ে কমে। অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, প্রতিভাধরদের জীবনের উপরেও ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশেষ রকমে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী মেইন ডি বিরান একজায়গায় বলেছেন—গুমোট্ পড়লেই আমার মন একেবারে দমে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি যেন উবে যেতে থাকে, অনেক চেষ্টা করেও মনটাকে কোন কাজে লাগাতে পারিনা; এমন কি, কর্ত্তব্য কাজগুলোতে পর্য্যন্ত যেন বিরক্তি ধরে, কিন্তু আকাশ আবার পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের ফুর্ত্তি ফের ফিরে আসে, কাজে মন লাগে।" দেখা গিয়েছে যে, প্রতিভাবানদের অনেকে শীতকে ভারি ডরাতেন। নেপোলিয়ানের মত অমন যে দিগ্বিজয়ী বীর, যিনি বড় বড় লড়াই হেসে-খেলে ফতে করে এসেছিলেন, তিনিও জুলাই মাস পর্য্যন্ত ঘরে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখ্‌তেন। ভলটেয়ার ও বাফোঁ বছরের কোন সময়েই ঘরের আগুন নিবিয়ে শুতে পারতেন না। বায়রণ বলতেন ঠাণ্ডাকে আমি যমের মত ভয় করি। স্প্যালাজোনি, লিওপার্ডি, গুইষ্টি, Paisiello, Varillas, Mèny, আরনড্ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত শীতভীত ছিলেন।

গিয়োরডিনি রোদে না বসলে লিখতেই পারতেন না। যখন রোদ না থাকত তখন ঘরে দশ-বারটা লণ্ঠন জেলে, আর-একটা বড়গোছের আগুন করে তার সাম্‌নে বসে তবে লিখতেন। নভেম্বর মাসে ফস্-কলো এক জায়গায় লিখেছেন—"এখন

আমি সর্ব্বদাই আগুনের সামনে বসে থাকি, বন্ধুবান্ধবেরা ঠাট্টা করে—কিন্তু কি কর্ব্ব, আগুন ছেড়ে আমি উঠতে পারিনা, যদিও আগুনের সামনে বসে বসে আমার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে।" মিলটন তাঁর কয়েকটি লাটিন কবিতায় স্বীকার করেছেন যে, শীতকালে তিনি লিখতে পারতেন না, বসন্ত কিংবা শরৎকাল ছাড়া অন্য সময় বাগ্‌দেবী যে তাঁর কাছ থেকে কোথায় সরে পড়তেন, তার খোঁজ পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠত।

১৬৭৮ খৃঃ অব্দের শীতকালে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "এ-রকম শীত যদি আর বেশী দিন থাকে তাহলে আমার কল্পনার অবাধ গতি হয়ত চিরদিনের জন্য থেমে যাবে।"

পুস্‌কিনের মাথা শরৎকালে সব-চেয়ে সাফ থাকত। আবার বসন্তের সময় তাঁর মন এমন অবসাদে ভরে আসত যে, সে সময় তাঁর দ্বারা আর কোন কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলারের কতকগুলো চিঠিতে বুঝতে পারা যায়, শীতের সময় তিনিও বড় কাতর হয়ে পড়তেন, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "এমন সময় কোন কাজ করা দূরে থাক্, কোনরকমে বেঁচে থাকাই আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আকাশের ও প্রকৃতির অবস্থা যতই দেখছি আমি যেন ততই দমে যাচ্ছি।" রুযো বলেছেন, "গরমের সময় তাঁর রচনা-শক্তি যেমন খুল্‌ত, তেমন আর অন্য কোন সময় না।" দান্তে তাঁর প্রথম সনেট ১২৮২ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন তারিখে লেখেন, ১৩০০ খৃঃ অব্দের বসন্তে তিনি বিখ্যাত Vita Nouva শেষ করেন। ডারউইন, প্রেত্রার্ক, মাইকেল এঞ্জিলো, ম্যানজোনি, মিলটন, বালজাক, গিয়োরডনো ব্রুনো, বায়রণ, ভলটেয়ার ও গেটে প্রভৃতির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট রচনার একটিও শীতের সময় রচিত হয়-নি। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিভাবান লোকে কোন্ সময় কি কি কাজ করেছিলেন, লম্‌ব্রোজো এক জায়গায় তার একটা সুন্দর তালিকা দিয়ে দেখিয়েছেন। জ্যোতির্ব্বেত্তারা—এমন-কি, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত যা-কিছু বড় কাজ করেছেন, তার বেশীর ভাগই গ্রীষ্ম-কালে করা হয়েছে। শীতের সময় কারো কারো প্রতিভা খুলত বটে, কিন্তু প্রতিভা-বানদের মধ্যে সেটা স্বাভাবিক নয়, আর এ-রকম দৃষ্টান্তও খুব বিরল।

এই-সব প্রতিভাবানের সকলেরই যে ঠিক গ্রীষ্মকালেই প্রতিভা স্ফুরিত হ'ত এমন কথাও নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে না। তবে মোট কথা এই, শীতের সময় এঁরা এতটা কাবু হয়ে পড়তেন যে, (দুই-একজন বাদে) সে সময় কোন কাজে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। কখন, কার প্রতিভার বিকাশ হ'ত তার একটা ছোটখাট তালিকা দেওয়া গেল—স্প্যালান-জোনির বসন্ত কালে, গুইষ্টি ও আরক্যান-জেলিওর মার্চ্চ মাসে, লামারটিনের আগষ্টে, কারিক্যানো, বায়রণ ও এলফেরির সেপ্টেম্বরে, ম্যালপিঘি ও সিলারের জুন এবং জুলাই মাসে, ভিক্তর হিউগোর মে মাসে, বেরানজারের জানুয়ারিতে, বেলির নভেম্বরে, মেলির

এপ্রিল মাসে, ভল্‌টা'র নভেম্বরে ও ডিসেম্বরে, গ্যালভিনির এপ্রিলে, গ্যাম্বার্টের জুলাই মাসে, পার্টা'র আগষ্টে এবং লুথারের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে।

বাক্‌ল তাঁর History of Civilization গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, "যেখানে আগ্নেয় পর্ব্বতের আধিক্য সেই প্রদেশই হচ্ছে প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান।" জ্যাকবি বলেন, "বড় ব্যবসাক্ষেত্র ও বড় বড় সহরেই বেশীভাগ প্রতিভাশালী লোক আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কিন্তু তা ছাড়া প্রাকৃতিক অবস্থা আর জল-হাওয়ার উপরও এ বিষয় অনেকটা নির্ভর করে।

প্রতিভা-বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। কিন্তু তা বলে আফ্রিকার মতন গরম দেশ হলেও চল্‌বে না—তাতে-করে' প্রতিভা শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে যেতে পারে। গরম দেশের পরেই, প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ ও পাহাড়ে জায়গা। অবশ্য, এই-সব জায়গার সঙ্গে বাইরের দেশগুলির ভাবের আদান-প্রদান থাকাও বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এইটী নাই বলেই সুইজারল্যাণ্ডের মত অমন সুন্দর দেশেও প্রতিভাবান লোকের আবির্ভাব এত কম। ইউরোপের মধ্যে ইটালি, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে যত প্রতিভাশালী লোক জন্মেছেন, সেখানকার আর কোন দেশে তত হয়-নি। খোঁজ করলে আরো দেখা যাবে যে, ঐ সকল দেশের মধ্যেও, অধিক-উষ্ণ এবং পর্ব্বতীয় স্থানগুলিতেই প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছে বেশী।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কে ?

(১)

"সখিরে তু বোলো
* * * * *
কি আছে সো আঁখিয়াতে মই পরাণ হারালো"

সত্যই কি আমি সেই আঁখি দুটী দেখিবামাত্র 'পরাণ' হারাইয়াছিলাম?

তাকে প্রথম দেখি, একটী মেলায় জনতার মধ্যে। ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একজনের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি এক তরুণী। তিনিও একবার আমার দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই চক্ষু নত করিলেন; কিন্তু সেই যে চারিচক্ষুর মিলন, আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত তা ভুলিতে পারি নাই।

(২)

তাহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি এখানে ডাক্তারি পাশ করিবার পরে অল্পদিন বিলাতে ছিলাম। সেখান হইতে বিলাতি হরফের তক্‌মা আদায় করিয়া লইয়া দেশে ফিরিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছি। মা মাঝে মাঝে বিবাহের

জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন। হচ্ছে, হবে বলিয়া আমি কথাটা চাপা দিই এবং কোন "সম্বন্ধের" কথা উল্লেখ করিলেই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠি,—পৌত্রমুখদর্শন-লোলুপ মা আমার, ছেলের রকম সকম দেখিয়া অবাক হইয়া যান, বোধ হয় ভাবেন সমুদ্রের পারে হৃদয়খানা হারাইয়া আসিয়াছি —বুঝিবা। আমি মনে মনে হাসি। তখন কোন বিদেশিনীর নহে, সেই অপরিচিতা স্বদেশিনীর চোখ দুটী মনে জাগিয়া ওঠে। কিন্তু সেই জন্যই কি বিবাহে ইচ্ছা নাই? হাস্যকর! তাও নাকি হয়! তবে যে কারণেই হউক আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই এইটে ঠিক। পাঠক ইচ্ছামত একটী কারণ নির্ণয় করিয়া লইলে আমার আপত্তি নাই।

(৩)

আমাদের বাড়ীর পাশের খালি বাড়ীতে নূতন ভাড়াটিয়ারা আসিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম, ইংরেজী কায়দাতেই চলেন। কর্ত্তার বড় ছেলে সুবোধবাবু সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার প্র্যাকটিসের সুবিধার জন্যই সকলে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া বসিতে না বসিতে কেহ কেহ নবজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। আমি পাশেই থাকি, আমার ডাক পড়িল। তাঁহাদের আরোগ্য করিয়া সুযশও লাভ করিলাম। ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে ভাবটা এতই জমিয়া উঠিল যে অবসর পাইলেই সন্ধ্যাবেলাটা সেখানে কাটাই।

তাঁহার ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী চমৎকার গায়িতে পারেন, মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার গান শুনিয়া ভাবি, ইনি কি স্বর্গের দেবী?

এতদিনের পর আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গিল, হায়রে!

(৪)

কিরূপে বিবাহের প্রস্তাব করিব মনে মনে এতবারই তাহা আবৃত্তি করিয়াছি, যে এখনো সে কথা আমার মুখস্থ। অথচ কোনমতেই সে কথা উর্ম্মিলাকে বলিতে না পারিয়া অবশেষে সুবোধের কাছেই কথাটা পাড়িলাম।

আমি যে এজন্য ব্রাহ্ম হইতেও প্রস্তুত অযাচিত ভাবে একথাও জানাইয়া দিলাম। মনে জানি মা তাহাতে আপত্তি করিবেন; হইলে কি হয়, সে আপত্তি অগ্রাহ্য বা খণ্ডন করিতে যদি না পারি, তবে আর ভালবাসিলাম কি?

কিন্তু হায়! সব আশা, সব কল্পনা আমার আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল, সুবোধের নিকট শুনিলাম উর্ম্মিলা engaged.

(৫)

বাড়ী ফিরিবামাত্র মা বলিলেন, "বাছা সুবোধ, কনকলতার গায়েহলুদ হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তুই যদি বিয়ে করিস্ তবেই আমার সইদের জাত-ধর্ম্ম রক্ষে হয়। আর মেয়েটী সত্যিই সোণার টুকরো, এমন মেয়ে আর কোথাও পাবিনে।"

আমি আপত্তি করিলাম না। একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় বিনা ঔৎসুক্যে, বিনা আগ্রহে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে বরণ গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীআচার স্থলে নীত হইলাম। শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনির মধ্যে অবগুণ্ঠনমুক্তা কন্যার দিকে চাহিলাম, নয়নে নয়নে মিলিত হইল; চমকিয়া উঠিলাম।

এ যেন ঠিক সেই দুটী আঁখিরই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই।

সত্যই কি আজিকার এই নববধূ সেই আমার বহুপূর্ব্বের পরিচিতা ... ...!

না, এ মোহ, চোখের ভুল! কে জানে?

বাসর-গৃহে সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গায়িলাম—

"হায় মিলন হোলো!
যখন নিবিল চাঁদ, বসন্ত গেলো।"

শ্রী ... ... দেবী।

বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

ঐ আহ্বান-গীতি বাজে,
জয় জয় জয় জয় প্রণমি রাজরাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জন্মভূমির কাজে।
হের দূরিত তিমির রাত্রি,
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ
বীর সৈন্যের সাজে;
যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে,
আর লুণ্ঠিত না রব ভূমে,
সম-আসন লব করমে
জগত-জাতির মাঝে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে; ইত্যাদি।

মোরা নহি ত দীন-হীন নহি ত তুচ্ছ,
সাহসে গর্ব্বে শির সমুচ্চ,
শোভে অঙ্গে শাণিত অস্ত্রগুচ্ছ,
অনল-উজ্জ্বল তেজে;
মোদের হৃদয়ে মঙ্গল-প্রীতি,
নির্ব্বাণ জড়তা-ভীতি,
বারিতে পীড়ন-নীতি
আজি মৃত্যু ডরিব না যে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে; ইত্যাদি।

মোরা শৌর্য্যে বীর্য্যে হইব প্রধান,
নির্ভয়ে বক্ষে ধরিব কামান,
উছলি উঠিবে জননী-প্রাণ,
আর না দহিবে ক্ষোভে লাজে।
সবে ন্যায়ের দণ্ড বহিয়া,
ধর্ম্মের জয়-গান গাহিয়া,
অসাধ্য সাধন যত সাধিয়া
শিরোপা বাঁধিব তাজে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান গীতি বাজে; ইত্যাদি।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

(কোরাস)—

I মা —া II মা —পা ধা ধা। ধা —া —া পা।
ঐ ০ আ ০ হ্বা ন গী ০ ০ তি

I পধা —পা পা —া। —া —া II —া —া। র্মা র্মা গী গী।
বা০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ জ য় জ য়

। র্রা র্রা র্সা র্সা I পা পা পা ধা। —া পা পধা পা।
জ য় জ য় প্র ণ মি রা ০ জ রা০ ০

। পা —া ধা পা। র্সা —া র্সা —া I —া —া পা র্সা।
জে ০ স বে জা ০ গি ০ ০ ০ এ স

। র্রা —া র্রা —া। পা —র্রা র্সা পা। ধা পা মগা —পা।
লা ০ গি ০ জ ০ ন্ম ভূ মি র কা০ ০

I মা —া —া —া। —া —া "মা —া" II
জে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

II ধা পা। { র্সা —া র্সা র্সা। র্সা র্সা —পধা পা।
হে র { দূ ০ রি ত তি মি ০০ র

। র্রা —া র্রা —া। —া —া র্রা র্রা। র্মা —া র্জ্ঞা র্রা।
রা ০ ত্রি ০ ০ ০ মো রা দী ০ প্ত প্র

। র্সা —া পা ধা I পধা পা পা —া। —া —া ধা পা } }
ভা ০ তে র যা০ ০ ত্রী ০ (০ ০ হে র) }

। —া —া র্সা র্রা। র্গা —া র্গা —া। র্গা —র্মা র্রা র্গা।
০ ০ চ লি উৎ ০ সা ০ হে ০ কো টী

I র্মা া র্মা —া। —া —া —া —া। র্গা —া —র্রা র্সা।
ভ্রা ০ তৃ ০ ০ ০ ০ ০ বী ০ র সৈ

। —না —না ধা —না। র্সা —া —া —া। —া —া মা পা।
ন্যে র সা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ যা পি

। ধা ধা —া ধা। ধা —া ধা —পা I পধা —পা পা —া।
রূ থা ০ আ ল ০ শু ০ ঘু০ ০ মে ০

। —া —া ধা —পা। র্সা —া র্সা র্সা। র্সা —া ধা পা।
০ ০ আর্ ০ লু ০ ষ্টি ত না ০ র ব

I র্জ্ঞা —া র্রা —া। —া —া —া —া। র্মা র্মা —া র্মা।
ভূ ০ মে ০ ০ ০ ০ ০ স মা ০ ন

। র্রজ্ঞা —া র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্রা —া র্রা। র্সা —া র্সা র্সা।
আ ০ স ন ক রি ০ ব গ্র ০ হ ণ

। পা র্রা র্সা পা। ধা পা মগা —পা I মা —া —া —া।
জ গ ত জা তি র মা০ ০ ঝে ০ ০ ০

। —া —া "মা —া" II
০ ০ ঐ ০

II ধা পা। { র্সা র্সা —া র্সা। র্সা র্সা পধা পা।
মো রা { ন হি ০ ত দী ন হী০ ন

\+ ০ ০
I র্রা র্রা –া র্জ্ঞা। র্রা –া র্রা –া। র্মা –া র্জ্ঞা র্জ্ঞা।
ন হি ০ ত তু ০ চ্ছ ০ সা ০ হ সে

১ + ৩
। র্রা –া র্সা –া I ণা –ধা পা ধা। (পধা –ণা ণা –া)}
গ ০ র্ব্বে ০ শি ০ র স মু০ ০ চ্চ ০

৩ ০ ১
। ণা ণা সা র্রা। র্গা –া র্গা –া। র্গা –র্মা র্রা র্গা।
মু চ্চ শো ভে অ ০ ঙ্গে ০ শা ০ ণি ত

\+ ৩ ০
I র্মা –া র্মা –া। র্মা –া র্মা –া। র্গা র্গা র্রা র্রা।
অ ০ স্ত্র ০ গু ০ চ্ছ ০ অ ন ল উ

১ + ৩
। র্সা না ধা –না I র্সা –া –া –া। –া –া মা পা।
জ্জ্ব ল তে ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ মো দের

০ ১ +
। ধা ধা –া ধা। ধা –া ধা ণা। পধা –ণা ণা –া।
হৃ দ ০ য়ে ম ০ ঙ্গ ল প্রী০ ০ তি ০

৩ ০ ১
। –া –া –া –া। র্সা র্সা –া র্সা। র্সা র্সা ণধা –ণা।
০ ০ ০ ০ নি র্ব্বা ০ ণ জ ড় তা০ ০

\+ ৩ ০ ১
I র্জ্ঞা –া র্রা –া। –া –া –া –া। র্মা –া র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্রা –া র্সা র্সা।
ভী ০ তি ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ রি তে পী ০ ড় ন

\+ ৩ ০
I ণধা –র্সা ণা –া। –া –া ণা ণা। ণা –র্রা র্সা র্ণা।
নী০ ০ তি ০ ০ ০ আ জি মৃ ০ ত্যু ড

১ + ৩
। ধা পা মগা –পা I মা –া –া –া। –া –া "মা –া" II
রি ব না০ ০ যে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

০ ১
II ধা ণা। র্সা –া –া র্সা। র্সা –া ণধা ণা।
মো রা শৌ ০ ০ র্য্যে বী ০ ০ র্য্যে

\+ ৩ ০
I র্রা র্রা র্রা র্জ্ঞা। র্রা –া –া –া –া। র্মা –া র্জ্ঞা র্জ্ঞা।
হ ই ব প্র ধা ন ০ ০ ০ নি ০ র্ভ য়ে

১ + ৩
। র্রা –া র্সা –া। ণা ধা পা ধা। ণা –া –া –া।
ব ০ ক্ষে ০ ধ রি ব কা মান্ ০ ০ ০

০ ১ +
। সা র্রা র্গা –া I র্গা র্গা র্গা –র্মা I র্রা র্গা র্রর্গর্মা –া।
উ ছ লি ০ উ ঠি বে ০ জ ন নী০০ ০

৩ ০ ১
। র্মা –া –া –া। র্গা –া র্রা র্রা। র্সা না ধা না।
প্রাণ্ ০ ০ ০ আর্ ০ না দ হি বে ক্ষো ভে

\+ ৩ ৩
। র্সা –া র্সা –া। –া –া মা পা। ধা ধা –া ধা।
লা ০ জে ০ ০ ০ স বে ন্যা য়ে ০ র

১ + ৩
। ধা –া –া ণা I পা ধণা ণা –া। –া –া –া –া।
দ ০ ০ ণ্ড ব হি০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ +
। র্সা –া র্সা র্সা। র্সা র্সা ণধা ণা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা –া।
ধ ০ র্ম্মে র জ য় গা০ ন গা হি য়া ০

৩ ০ ১
। –া –া –া –া। র্মা র্মা –া র্মা। র্জ্ঞা –া র্রা র্রা।
০ ০ ০ ০ অ সা ০ ধ্য সা ০ ধ ন

\+ ৩ ০
I র্সা র্সা ণধা র্সা। ণা –া –া –া। ণা র্রা র্সা ণা।
য ত সা০ ধি য়া ০ ০ ০ শি রো পা বাঁ

১ + ৩
। ধা পা মগা –পা I মা –া –া –া। –া –া "মা –া" II
ধি ব তা০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

বাংলার ব্রত

(৩)

লক্ষ্মী-ব্রতটী মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হৈমন্তিক শস্য ঘরে আসবে, তখনকার ব্রত এটি। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা। সকাল থেকে মেয়েরা ঘর-গুলি আল্‌পনায় বিচিত্র পদ্ম, লতা-পাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন,—লক্ষ্মী-পেঁচা এবং ধান-ছড়া হল এই আল্‌পনার প্রধান অঙ্গ। বড় ঘর—যেখানে ধান-চাল, জিনিষপত্র রাখা হয়—সেই ঘরের মাঝের খুঁটির—মধুম খামের গোড়ায় নানা-আল্‌পনা-দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। আল্‌পনায় নানা অলঙ্কার, এবং চৌকিতে, লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ-মূর্ত্তি না লিখে, কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিম্বা পদ্মের উপরে পা কিম্বা অন্য নানা-রকম চিত্র লিখে দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা অন্য চিত্র আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড়—ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁদুরের কৌটা এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ রচনার পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। রচনার পাতিল (হাঁড়ি) খানির গায়ে লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন ও ধান-ছড়া; রচনার পাতিলটির উপরে লক্ষ্মীর সরা; সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলুদে কালো এই কয় রঙে লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আল্‌পনা। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদবর্ণ, কালীর পরিরেথ, এবং অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল; নীল-বর্ণ পট-ভূমিকার কারুকার্য্যে দেওয়া হয়। লক্ষ্মী-সরার উর্দ্ধে আধখানা নারিকেলের মালই;—মেয়েরা এই মালইকে কুবেরের মাথা বা মাথার খুলি বলে। যশোর-অঞ্চলে সরার পশ্চাতে একটি শীষ সমেত আস্ত ডাব,—সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গহনা ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোট মেয়ের মতো করে সাজানো হয়। কলার থালুই দিয়ে ধানের গোলার অনুরূপ কতকগুলি ডোলা, তাহাতে নানাবিধ শস্য পূর্ণ করে আর-একটি কাঠের খেলার নৌকার প্রত্যেক গলুয়ে নানা-বিধ শস্য—ধান, তিল, মুগ, মসুরি, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সম্মুখে রাখার প্রথাও আছে। পূজা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ব্রতীর উপবাস। দেশভেদে কোনো গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবের—এই তিনটিকে তিন রঙের পিটুলীর পুতুলের আকারে গড়ে দেওয়া হয়। এম্‌নি নানা গ্রামে অনুষ্ঠানের একটু অদল-বদল আছে।

মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, এই কোজাগর পূর্ণিমার ব্রতটির মধ্যে অনেক-খানি অনার্য্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত,—যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনার পাতিল; কুবেরের মাথা—যেটা সব-উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সরার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ের মতো ডাব—হলুদ-সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া,—এক লক্ষ্মীর বাহন, আর এক লক্ষ্মীর শস্য-মূর্ত্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য্য বা অন্ত্য-ব্রতদের! আমার এই কথার সমর্থন করার জন্যে হিন্দুস্থানেই যদি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় তবে একটু মুস্কিল। কেন না, শুয়োরের দাঁত—সে বরাহ-অবতারের যুগে বেদ-উদ্ধার করে পবিত্র হয়ে গেছে; মড়ার মাথা—সেও তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের হাতে উঠেছে; বাকি থাকেন পেঁচা ও ধান-ছড়া; হয়তো গরুড়ের বংশা-বলীতে পেঁচাকেও পাব; এবং ধানই যে লক্ষ্মী, সেটা ত লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লুকোনো আছে। কিন্তু ভারত-সমুদ্র ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের পারেও যখন দেখি ধানছড়া মূর্ত্তিতে পূজো পাচ্ছেন—ঠিক এম্‌নি আর-এক মা-লক্ষ্মী বা 'ছড়া-মা'—মেক্সিকো পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্য্যদের মধ্যে, তখন কি বলা যাবে?

আমাদের দেশে যেমন ধান, ও-সব দেশে তেম্‌নি জোয়ার, জনার বা ভুট্টা হচ্ছে প্রধান শস্য। এই-সব শস্যের রক্ষা যে দেবতারা করেন তাঁদের বলা হয় 'মাম্মা'। আলুকে বলে এরা 'আক্সু' এবং আলু-দেবীকে বলবে এরা 'আক্সুমাম্মা'। জনারকে বলে এরা 'সর' বা ছড়; তার দেবীকে বলে এরা 'সরমাম্মা';—ঠিক উচ্চারণটা হয়তো 'সরাম্মামা' 'ছড়াম্মামা'। কিন্তু যা বলেই ডাকা হোক, এই পেরু-দেশের মা-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি হচ্ছে ভুট্টার ছড়—যেমন আমাদের ধানছড়া। শস্য-সংগ্রহের কালে সেখানে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি গড়ে। পূজার পূর্ব্বে তিন রাত্রি জাগরণ করে ছড়াম্মামা বা সরম্মামাকে নজরে-নজরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণিমা-জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজোর দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্ত্তির সাম্‌নে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ করা ব্যাং সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্য—ভুট্টা, মুগ, মুসুরী ইত্যাদি চূর্ণ করে ভরে গুঁজে দেওয়া হয়। এই ব্যাং হলেন জলদেবতার স্ত্রী (বেদেও মণ্ডুককে জল ও ধন দান করেন বলা হয়েছে)। পূজার রাত্রে নাচ গান এবং নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে মেয়েরা এলোচুলে নৃত্য করতে-করতে একটি কুমারীকে হলুদে-সিঁদুরে অলকা-তিলকা দিয়ে মুখটি সাজিয়ে—কতকটা আমাদের লক্ষ্মী-পূজোর ডাবটির মতো—এবং নানা অলঙ্কার ভালো কাপড় পরিয়ে পূজারীর সাম্‌নে উপস্থিত করে। পূজারী কুমারীকে পূজা দেন; ও সকলের একসঙ্গে মৃত্যুর নাচ সুরু হয়। তার পরে সেই কুমারীকে বলি দিয়ে তার সদ্যছিন্ন রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটি রচনার পাতিলে রেখে পুরোহিত ছড়াম্মাকে প্রশ্ন করেন—মা তুমি তুষ্ট হয়ে রইলেতো? যদি পুরোহিতের প্রতি আদেশ হয়—রইলুম, তবে জনারের ছড় তারা পূজার ঘরে তুলে রাখে; আর যদি আদেশ হয়—রইবোনা, তবে জনারের ছড় পুড়িয়ে নতুন ছড়াম্মামা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।

"Sometimes an image of Saramama was carved in stone in the shape of an ear of maize. The Saramama was also worshipped in the form of a doll or huantay-sara, made out of stalks of maize renewed at each harvest much

as e great Corn-Mother of M ১ (Chicomecohuatl) ··· after ha made, the image was watched over for three nights (কোজাগর) and then sacrifice was done to it. The priest or medicine-man of the tribe would then inquire of it wheather or not it was capable of existing until that time in the next year. If its spirit replied in the affirmative it was permitted to remain where it was until the following harvest. If not, it was removed, burnt and another figure took its place..." (Page 295.—Myths of Mexico and Peru. duise Spence.)

এইবার Chicomecohuatl—যিনি মেক্সিকোর great Corn-Mother বা মা-লক্ষ্মী, তাঁর পূজার অনুষ্ঠান দেখি—"A more important festival of Chicomecohuatl however, was the Xalaquia which lasted from June 28 to July 14, commencing when the maize-plant had attained its full growth. The women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long. Chianpinolli was consumed in immense quantities, and maize-porridge was eaten. Hilarious dances were nightly performed in the teopan (temple), the central figure in which was the Xalaquia, a female captive or slave, with face painted red and yellow to represent the colours of the maize-plant..... Throughout the duration of the festival she danced and on its expiring night she was accompanied in the dance by the women of the community, who circled round her ....when daybreak appeared.....the entire community then approached the Teo Calli (pyramid of sacrifice) and its summit reached the victim was stripped to a nude condition, the priest plunged a knife of flint into her bosom, and, tearing the still palpitating heart offered it up to Chicomecohuatl. In this manner the venerable goddess weary with the labours of inducing growth in the maize-plant was supposed to be revivified and refreshed. (Page 86-89 Myths of Mexico and Peru.)

এখন, দক্ষিণ-আমেরিকার জল-দেবী ব্যাং এবং শস্য নষ্ট করবার একটি ওস্তাদ যে ইন্দুর, তার যম লক্ষ্মী-পেঁচা; সেখানকার নর-বলির হৃৎপিণ্ড এবং এখানকার নারিকেল-মালই, বা কুবেরের মাথা বা যশোরের সেই তেল-হলুদ-সিঁদুরে সাজানো ঘোমটা-দেওয়া গয়না-পরানো ডাবটি এবং মেক্সিকোর হলুদে সিঁদুরে অলকা-তিলকা দিয়ে ভূষিতা ব্রত-দাসীটির সঙ্গে বস্তুত যোগাযোগ চোখে না দেখলেও, দুই দেশের লক্ষ্মী-ব্রতর মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনুভব না করে থাকা যায় না!

লক্ষ্মী-পূজার এদেশে আর-একটা অনুষ্ঠান রয়েছে;—যেটা নজর করে দেখলে, শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীপূজা-পদ্ধতি যে, অনার্য্য এবং প্রাচীন লৌকিক একটি ব্রতের স্থান, পরে

অধিকার করেছে তা বেশ বোঝা যায়। গৃহস্থের বড়-ঘরের লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে, ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় 'অলক্ষ্মী-বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপান্বিতা। লক্ষ্মীপূজার একটি অনুষ্ঠান, যথা—"প্রদোষ সময়ে বহির্দ্বারে গোময়নির্ম্মিত অলক্ষ্মীকে বামহস্ত দ্বারা পূজা করিবে। আচমনান্তে সামান্যার্ঘ্য ও আসন-শুদ্ধি করিয়া অলক্ষ্মীর ধ্যান যথা, ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানাং কৃষ্ণগন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যক্ত-শরীরাং মুক্তকেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীত ভস্মনাং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জ্জনীং গর্দ্দভারূঢ়াং লৌহাভরণভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কলহ-প্রিয়াম্—এই বলিয়া ধ্যান করিয়া আবাহন পূর্ব্বক অলক্ষ্মীর পূজা; পূজান্তে পাঠ্য মন্ত্র যথা, ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থান-বাসিনী সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ পূজঞ্চ শাশ্বতীম। পরে গৃহমধ্যে গিয়া লক্ষ্মীপূজা যথাবিধি আরম্ভ—গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বা-লঙ্কারভূষিতাম্" ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মী-বিদায় নিজেরা করেনা; পূজারীকে দিয়ে এ কাজ সারা হয়। এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্য-দেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে আলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা-কুৎসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুল ও ঘরের আবর্জ্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন। মেয়েরাও ব্রহ্মকোপের ভয়ে অলক্ষ্মীর পূজোর জায়গা বাইরেই করলেন; এবং যথাবিধি পূজা করা না-করার দায়-দোষ সমস্তই ভয়ে পূজারীরই নিতে হল এবং এখনকার হিন্দু-পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের শালগ্রাম-ফেলার মতো তখনো একটু যে গোলোযোগ না হল তা নয়। মেয়েরা পূজারীর কথা শুনে প্রাচীনা লক্ষ্মীকে বেশি-রকম অপমান করতে ইতস্ততঃ কল্লেন। এখন অলক্ষ্মীই বলি আর যাই বলি, একসময়ে তিনি তো লক্ষ্মী বলেই চলছিলেন, কাজেই তাঁর কতকটা সম্মান ধূর্ত্ত পূজারী বজায় রেখে মেয়েদের মন রাখলেন;—নিজেরও মনে অলক্ষ্মীর কোপের ভয় না-হচ্ছিল তা নয়; ঘরের বাইরে হলেও, মা-লক্ষ্মীর আগে আলক্ষ্মীর পূজা হবে, স্থির হল।

লক্ষ্মীপূজোর সঙ্গে কলার পেটোর উপরে তিনটি পিটুলীর পুতুল সবুজ হলুদ লাল, তিন রঙে প্রস্তুত করে, রাখা হয়। এই পুতুলগুলিও অনার্য্য-লক্ষ্মীপূজার নিদর্শন। এই তিন পুতুলকে বলা হয়—লক্ষ্মী, নারায়ণ আর কুবের। কিন্তু এঁরা আসলে যে কি তা আমরা দেখব। সবুজ হলুদে লাল পুতুল, আর অলক্ষ্মী-বিদায়ের ছেঁড়া খানিক মাথার চুল—এইগুলির কোনো অর্থ অন্য-দেশের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাই কিনা দেখি। পূর্ব্বেই দেখেছি, মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।—"the women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long"

মেক্সিকোর পুরাণে আরো দেখা যাচ্ছে শস্যের রক্ষয়ত্রা তিন-বর্ণের তিন-দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ-শস্যের সবুর্জ; এক

ফলন্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ এবং আর-এক আতপতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দূরবর্ণ।

মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক-এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে 'Centeotl' এবং তাঁদের একজন Xilonen সবুজ, অপক্ক-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী।

"A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize-plant".....'Xilonen—she typified the xilote or green ear of the Maize. (Page 85, Myths of Mexico and Peru.)

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড় লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন। প্রথম ফাল্গুনমাসে বীজ-বপনের পূর্ব্বে। কৃষীরাই বেশী এ-ব্রত করে—রবি আর বৃহস্পতিবারে। এঁকে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী—সবুজবর্ণ। এই পূজা করে' তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পূর্ণিমায়—যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী,—হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অঘ্রাণে, যখন পাকা ধান ঘরে এসেছে; —ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরো-কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন,—যেমন ভাদ্রে, কার্ত্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি ঐ তিন লক্ষ্মীব্রতরই ছাঁচে ঢালা। দেখা গেল, প্রাচীন লক্ষ্মীব্রতের অনার্য্য কতক অনুষ্ঠান গেল ঘরের বাইরে—যেমন অলক্ষ্মী; কতক রইল ঘরের মধ্যে—যেমন কুবেরের মাথা ও তিন পুতুল ইত্যাদি। সব-চেয়ে বড় লক্ষ্মীপূজো কোজাগর-পূর্ণিমায়। তারি ব্রতকথা থেকে বেশ বোঝা যায়, অলক্ষ্মী আর লক্ষ্মী দুই দেবতার পূজো নিয়ে দেশের মধ্যে একসময় বেশ-একটু গোলোযোগ চলছে। কথাটি এই—

এক দেশের রাজার নিয়ম ছিল হাটে কেউ কিছু যদি বিক্রি করে উঠতে না পারতো, তবে তিনি রাজ-ভাণ্ডার থেকে হাট শেষ হলে হতাশকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঝড়তি-পড়তি সবই নিজের জন্যে কিনে রাখতেন। এম্‌নি একদিন এক লোহার দেবীমূর্ত্তি এক কামারের কাছ থেকে হাট-শেষে রাজা কিন্‌লেন—কামার যখন রাজ-বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল। রাজা সত্যপালনের জন্যে সেই লোহার দেবী কিন্‌লেন এবং ঘরে আন্‌লেন। লোহার মূর্ত্তি ছিল অলক্ষ্মীর। লক্ষ্মী অম্‌নি সেই রাত্রেই বিদায় হয়ে যান; রাজা বল্লেন আমি সত্যপালন করেছি এতে দোষ কি? লক্ষ্মী রাজাকে বর দিলেন তিনি পশু-পক্ষীর কথা বুঝবেন কিন্তু লক্ষ্মী আর রাজ্যে রইলেন না। এম্‌নি-এম্‌নি প্রথমে রাজলক্ষ্মী তার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যশলক্ষ্মী সবাই একে-একে গেলেন; তার পর ধর্ম্ম আর কুললক্ষ্মী চল্লেন। রাজা ধর্ম্মকে বল্লেন—কুললক্ষ্মী যেতে চান্ তো যান, কিন্তু ধর্ম্ম, আপনি তো যেতে পারেন না, কেননা আমি সত্যধর্ম্ম পালন করতেই এ কাজ করেছি। ধর্ম্ম রাজ-বাড়ীতেই রইলেন।

এর পরের কথাটুকুর মর্ম্ম:—রাণী দেখেন রাজা পিঁপড়েদের দিকে চেয়ে একদিন ভোজনের সময় হেসে উঠলেন। পিঁপড়ে-

গুলো রাজার পাতে খাবার সময় ঘী না দেখে রাজাটা যে গরীব এই বলাবলি কচ্ছিল। রাজা হঠাৎ হাসলেন কেন, এই কথা রাণী জানতে চাইলে, অনেক পেড়াপিড়িতে রাজা সম্মত হয়ে—কথাটা প্রকাশ কল্লে তাঁর মৃত্যু জেনেও—গঙ্গাতীরে রাণীকে নিয়ে গিয়ে একটা ছাগল আর ছাগলীর ঝগড়া শুনলেন:—নদীর মধ্যে একবোঝা ঘাস দেখে ছাগলী সেটা চাচ্ছে আর ছাগল তাকে বলছে, আমি কি রাজার মতো বোকা যে তোর কথায় প্রাণ হারাতে যাবো। রাজা তখন রাণীকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর রাণী অনেক কষ্টে লক্ষ্মীপূজো করে তবে রাজা রাজ্য সব ফিরিয়ে আনলেন।

দুই ধর্ম্ম, দুই দেবী, দুইদল মানুষে যে দুই পূজো নিয়ে একটা বেশ গোলোযোগ চলেছিল এবং শেষে নূতন লক্ষ্মীই যে দেশের প্রাচীন লক্ষ্মীর পূজা দখল করেছিলেন এবং হাটে যে পূর্ব্বকালে প্রাচীনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বিক্রি হতে আসতো এবং সেটি রাজা কিনে ধর্ম্মলোপের ভয় করেন নি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মেয়েরা যে-যে-মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অন্য দেশের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে আমাদের পূজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে, লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য-উৎসব। কিন্তু পূজারীরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করে যে শ্লোকটি মেয়েদের শুনিয়ে দেন, সেটা থেকে কিছুতে বোঝা যাবেনা যে এই ব্রত অক্ষলন্ত, ফলন্ত এবং সুপক্ক শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় শ্লোক বল্‌ছে—

"লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্ব্বব্রত সার,
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ॥"

ধানের কি কোনো শস্যের নাম-গন্ধ এতে পাওয়া গেল না। প্রাচীনকালের প্রধান উৎসব এবং শস্য দেবতারা খুবই প্রসিদ্ধ বলে এই ব্রতকে হিঁদুয়ানীর চেহারা দেবার জন্য এর উপর এত জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে যে আসল-ব্রতটি কেমন ছিল তা আর এখন কতকটা কল্পনা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোট এবং অপ্রধান বলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা অটুট অবস্থায় রয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাঁটি ও নিখুঁৎ চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই 'তোষ্‌লা' ব্রতটি। কোথাও একে বলে "তুঁষ্‌তুষ্‌লি!" পূর্ব্ব-বঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গে দু-জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই:— অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি-সকালে স্নান করে গোবরের ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে,কালো দাগ-শূন্য নতুন সরাতে বেগুন-পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুর্ব্বা-ঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে সিম মূলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সার-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্ব্বর করে তোলবার

ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ব্ববঙ্গে এক, পশ্চিম-বঙ্গে আর-এক হলেও ছড়াগুলি পড়তে-পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবন-যাত্রার এমন-একটি পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না। পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত, এবং সকালবেলার ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি বহুযুগ-আগেকার বাংলাদেশের এক-খানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দেখছি শীতের হাওয়া বইছে,—গ্রামের উপরে বড় গাছের আগায় এখনো কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজে-ভিজে; বেড়ার ধারে-ধারে আর চালে-চালে সিমপাতার সবুজ; ক্ষেতে-ক্ষেতে মুলোর ফুল, সর্ষের ফুল—দুধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে; নতুন সরায় বেগুন-পাতা চাপা দিয়ে, সার-মাটি নিয়ে মেয়েরা দলে-দলে তোষ্‌লা ব্রত করতে ক্ষেতের দিকে চল্লো এবং সেখানে মুলোর ফুল, সিমের ফুল, সর্ষের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল—

প্রথম, তোষ্‌লার স্তুতি—

"তুঁষ-তুঁষলি, তুমি কে!
তোমার পূজা করে যে,—
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত॥
তোষ্‌লা লো তুঁষকুন্তি!
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি,
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি॥"

তারপর অনুষ্ঠান-উপকরণের বর্ণনা, যেমন—

"গাইয়ের গোবর, সর্ষের ফুল,
আসনপিঁড়ি, এলোচুল,—
গেয়ের গোবরে সর্ষের ফুল,
ঐ কোরে পূজি আমরা মা-বাপের কুল।"

'আসনপিঁড়ি এলোচুল'। এখানে আমরা সেই মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি। এর পরে মেয়েরা তোষ্‌লা-ব্রতের কামনা জানাচ্ছে—

"কোদাল-কাটা ধন পা'ব,
গোহাল-আলো গরু পা'ব,
দরবার-আলো বেটা প'াব,
সভা-আলো জামাই পা'ব,
সেঁজ-আলো ঝি পা'ব,
আড়ি-ম'পা সিঁদুর পা'ব।
ঘর করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।"

তারপর, পৌষের সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রত সাঙ্গ করে একটি সরায় ঘীয়ের প্রদীপ জেলে সেগুলি মাথায় নিয়ে সারি-বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষ্‌লা ভাসাতে চলেছে। পায়ের তলায় মাটি ঠাণ্ডা; হিম বাতাস, নদীর শীতল জলের পরশ পেয়ে, কন্‌কনে বইছে। এই শীতের জল-স্থল-আকাশের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে মেয়েরা নদীতে যাবার পথে—

"কুলকুলনি এয়ো রাণী,
মাসে মাসে শীতল পানি,
শীতল শীতল ধাইলো,
বড় গঙ্গা নাইলো।"

এর পর, নিথর শীতের মধ্যে সূর্য্যের ও পৃথিবীর মিলনের একটু আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌লো—

"শীতল শীতল জাগে,
রাই বিয়ে মাগে।"

এর পর, গঙ্গাতীরে জলের কলধ্বনি, পাখীদের কাকলীর সঙ্গে সূর্য্যের বরযাত্রার বাদ্য বাজ্‌ছে—

"আমাদের রায়ের বিয়ে
ঝাম্‌-কুর্‌-কুর্‌ দিয়ে।"

তখনো রাত্রের শিশিরে-ভেজা শাক-খরজার পাতাগুলি ঘুমিয়ে রয়েছে; সেই সময় বরবেশে সূর্য্য আসছেন; তারি সূচনা একটু 'ঝক্‌মিকে সোনার আলো।

"বেগুন-পাতা ঢোলা-ঢোলা
রায়ের কানে সোনার তোলা।"

এইখানে নদীতে তোষ্‌লার সরা ভাসিয়ে তোষ্‌লার সার-মাটি আর সূর্য্য—চাষের দুই প্রধান সহায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েদের জলে ঝাপাঝাপি বালি-খেলা—

"তোষ্‌লা গো রাঈ, তোমার দৌলতে
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই,
ছ-বুড়ি ন-বুড়ি গাঙ্‌-সিনানে যাই,
গাঙের বালিগুলি দুহাতে মোড়াই,
গাঙের ভিতর লাড়ু কলা ডব্‌ডবাতে খাই।
তুষ্‌লী গো রাঈ, তুষ্‌লী গো ভাই,
তোমার ব্রতে কিবা পাই?
ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা গুলি খাই,
তোমাকে নিয়ে জলে যাই,
তুষ্‌-তুষ্‌লী গেল ভেসে—
বাপ-মার ধন এল হেসে,
তুষ্‌-তুষ্‌লী গেল ভেসে—
আমার সোয়ামির ধন এল হেসে।"

এর পর, সূর্য্যের উদয় দর্শন করে স্নান করে ব্রতশেষে নদীতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় বর্ণন করে ছড়া—

"রায় উঠছেন রায় উঠছেন বড়-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতেরে তেল-গামছা?
দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন মেজো-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতেরে শাঁখা সিঁদুর?
দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন ছোট-গঙ্গার ঘাটে।
রায় উঠছেন অয়ে, তামার হাঁড়ির বর্ণে,
তামার হাঁড়ি, তামার বেড়ি—"

এর শেষটুকুতে হিঁদুয়ানী আপনার নাম দস্তখত করে এক আঁচড় দিয়েছে—'উঠ উঠ মা-গৌরী নিবেদন করি'। হঠাৎ মা-গৌরী এসে কেন যে বোড় ধরেন তা বোঝা গেল না। ঝক্‌ঝকে আয়নার উপরে পেরেকের আঁচড়ের মতো এই শেষ লাইনটা; বা যেন মিশানারি-স্কুলেপড়া মেয়ের মুখে—'বড় ক্রেম নমস্কার'—খাপ্‌ছাড়া, শ্রুতিকটু, অর্থহীন। এর পর মেয়েরা ঘরে এসে পৌষমাসের পিঠে খাবার আয়োজন করে যে ছড়া বল্‌ছে—সেটাও এ-লাইনটার চেয়ে সহজ আর সুন্দর—

"আখা'জন্তি, পাখা চলন্তি,
চন্দন-কাষ্ঠে রন্ধন ঘরে,
জীরার আগে তুষ পোড়ে,
খড়িকার আগে ভোজন করে,
প্রাণ স্বচ্ছন্দে নতুন বসতে
কাল কাটাবো মোরা জন্মায়ন্তে।"

তোষ্‌লা-ব্রতের অনুষ্ঠান—এই শীতের প্রভাতের দৃশ্য-পটগুলি আর সদ্যস্নাত মেয়েদের মুখে সিন্দুর এবং মার্জ্জিত তামার বর্ণ রক্তবাস সূর্য্যের উজ্জ্বল বর্ণনা আমাদের সহজেই সেই-কালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে দেখি মানুষে আর বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে;—গড়াপেটা শাস্ত্রীয় ব্রতের এবং হিন্দুয়ানীর আচার-অনুষ্ঠানের চাপনে মানুষের মন যেখানে সব-দিক দিয়ে অনুর্ব্বর, নিরানন্দ এবং প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। এই তোষ্‌লা ব্রতের জীবন্ত দৃশ্যকাব্যটির সঙ্গে ছোট-একটি শাস্ত্রীয় ব্রত মিলিয়ে দুয়ের মধ্যে কি নিয়ে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট ধরা পড়বে। হরিচরণ ব্রত। বছরের প্রথম মাসে, খুব ছোটো মেয়েরা এই ব্রত করছে—চন্দন দিয়ে তামার টাটে হরিপাদপদ্ম লিখে। কিন্তু এই ব্রতে ছোটো মেয়ের মুখের কথা বা প্রাণের আনন্দ এমন-কি ছোটোখাটো আশাটুকু পর্য্যন্ত নেই। পাকা-পাকা কথা এবং জ্যাঠামিতে ভরা এই শাস্ত্রীয় ব্রতটি অত্যন্ত নীরস। হরির পাদপদ্মে পূজো দিয়ে পাঁচ-ছয়-বছরের ছোট মেয়েগুলি বর চাইছে—গিরিরাজ বাপ, মেনকার মতো মা, রাজা সোয়ামি, সভা-উজ্জ্বল জামাই, গুণবতী বৌ, রূপবতী ঝি, লক্ষ্মণ দেবর, দুর্গার আদর—"দাস চান্, দাসী চান্, রূপার খাটে পা মেল্‌তে চান্, সিঁতেয় সিঁদুর, মুখে পান, বছর-বছর পুত্র চান্!" আর চান্—"পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে একগলা গঙ্গাজলে মরণ এবং উষোতে পারলে ইন্দ্রের শচীপনা, না পাল্লে কৃষ্ণের দাসীগিরি!"

হরিচরণ-ব্রত করছে এই যে মেয়েগুলি বৈশাখের সকালবেলায়, আর শীতের সকালে শীর্ণধারা নদীতীরে, তোষ্‌লা ব্রতের দিনে, সর্ষে সিম এম্‌নি নানা ফুলে সাজানো সরা ভাসিয়ে, স্রোতের জলে নেমে, সূর্য্যের উদয়কে এবং শস্যের উদ্গমকে কামনা করছে যে মেয়েগুলি,—এই দুই দলে কি বিষম পার্থক্য, দুই অনুষ্ঠানেই বা কি-না তফাৎ! একদল একগলা গঙ্গাজলে আত্মহত্যায় উদ্যত; অন্যদল বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সূর্য্যের আলোতে হলুদ, সাদা ফুলে-ফুলে-ভরা ক্ষেতের মতো জেগে-ওঠবার জন্যে আনন্দে উদ্‌গ্রীব!

প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্য্য-রকম সৌন্দর্য্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর সম্পূর্ণ-নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে লোকানুষ্ঠান বলব কি ষড়ঋতুর এক-একটি উৎসব বোলব ঠিক করা শক্ত। চৈত্রের এই অশথ-পাতার ব্রত—যার সমস্ত অনুষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে, কিশলয় থেকে ঝরে-পড়া পর্য্যন্ত কচি, কাঁচা, পাকা এবং শুক্‌নো পাতার একটুখানি ইতিহাস; তাকে কি বলব?

বসন্তের বাতাস লেগে গত শীতের শুক্‌নো পাতা গাছের তলায় ঝরে পড়েছে; নদীর ধারে অশথ, কুঞ্জলতা, চাঁপাসুন্দরী আর শ্যাম পণ্ডিতের ঝি—কেউ পাকা-পাতার তামাটে লাল, কেউ কাঁচা-পাতার সতেজ সোনালি সবুজ, কেউ কচিপাতার কোমল শ্যাম, কেউ শুক্‌নো-পাতার তপ্ত সোনা, কেউ বা ঝরাপাতার পাণ্ডুর রঙে সেজেছে। 'অশথ-পাতা,' কুঞ্জলতা, চম্‌কাসুন্দরী; আর

এই তিন বনসুন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন শ্যাম পণ্ডিতের ঝি। শ্যাম পণ্ডিতের সাত-সাত বৌ, জোয়ান সাত বেটা, পণ্ডিতের গিন্নি, আর বুড়ো পণ্ডিত নিজে,—ছোট, বড়, আরো-বড়, একেবারে বুড়ো,—কচি মেয়েটি, কাঁচা বয়সের বৌ-বেটা, পাকাগিন্নি আর বিষম শুক্‌নো কর্ত্তা।

"অশথপাতা কুঞ্জলতা চম্‌কাসুন্দরী!
গঙ্গাস্নান করতে গেলেন শ্যাম-পণ্ডিতের ঝি;—
সাত বৌ যায় সাত দোলায়,
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়,
কর্ত্তা যান গজহস্তীতে,
গিন্নি যান রত্ন-সিংহাসনে,
ঠাকুর ঠাকুরুণ দোলনে যান।

এই ছড়াটি পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, বসন্তের দিনে নদীর ধারে চাঁপা কুঞ্জলতা অশথ এদের একটা উৎসব চলেছে—সবুজে পাঙাশে নতুন-ফুটে-ওঠা থেকে আস্তে ঝরে-পড়ায় দলে-দলে বুড়ো-বুড়ি ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী এই উৎসব দেখতে আস্‌ছে—কেউ হেলতে দুলতে, কেউ নাচতে নাচতে, কেউবা গজেন্দ্রগমনে! এর পরেই ঠাকুর ঠাকরুণ। এঁরা যে কোন্ দেবতা তা বলা যায় না। শিব-দুর্গা হতে পারেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন পিতৃ-পুরুষদেরও কেউ হতে পারেন! এঁদের দুজনে কথা হচ্ছে—

ঠাকুর জিজ্ঞাসেন—ঠাকুরুণ! নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কি ব্রত করে?

উত্তর—অশথপাতার ব্রত করে!

প্রশ্ন—এ ব্রত করলে কি হয়?

উত্তর—সুখ হয়, সহায় হয়, সোয়াস্তি হয়।

এর পর ঠাকুর দেখলেন ছেলে বুড়ো সবাই মিলে একটি করে পাতা মাথায় রাখছে আর জলে ডুব দিচ্ছে আর পাতা-গুলি জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ঠাকুর ভেবে পান না মানুষরা সব করে কি? এই বসন্ত-কালে, লোকে এ কি পাগলামি করতে লাগল! তখন ঠাকুরুণ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করে বলছেন, এরা গাছে আর মানুষে মিলে এক-এক পাতার কামনা জানিয়ে ব্রত করছে।

এরা—"পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
পাকাচুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুক্‌নো পাতাটি মাথায় দিয়ে—
সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
মণি-মুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে
কোলে কমল পুত্র ধরে।"

এই ব্রতটিকে বসন্তদিনে মানুষ আর গাছ-পালায় মিলিয়ে একটুখানি রূপক—ছোট-একটু নাটকের মতো করে গাঁথা হয়েছে ছাড়া আর কি বলা যাবে? এইতো একটুখানি ব্রত, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসন্তের দিনে নতুন এবং পুরোনোর, মানুষের এবং বনের নিশ্বাসটুকু যখন এক-তালে উঠছে পড়ছে দেখি তখন এটিকে ছোটো বলতে ইচ্ছা হয় না; এইটুকুর মধ্যে কতখানির ইঙ্গিত, কতখানি রস না পাচ্ছি!

মেয়েলী-ব্রতে দেব-দেবীকে দেখি, একে-বারে নির্ম্মল,—তরল যতটা হতে হয়। "ভাদ্রে ভাদুলী—নদী বৃষ্টির জল" রোদ আর

বৃষ্টি—দুয়ের মাঝে তিনি জোড়া-ছত্র মাথায় বর্ষা এবং শরতের আশা আশীর্ব্বাদে ভরা দুই ঋতুর দিন-রাত্রির দুই নৌকায় পা রেখে আসছেন।

সেঁজোতি হলেন—

"সাঁঝ পূজন সেজোতি
বারোঘরে তেরো বাতি।"

সন্ধ্যা, সাঁঝের বাতি, জোতি ফুল, সন্ধ্যার একটুখানি ঝিক্‌মিক্—এই সব মিলিয়ে জ্যোতিরূপিণী সেঁজুতী। এঁদের সন্ধান কোন্ শাস্ত্র দেবে?

খাঁটি মেয়েলী-ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পূজো নয়। এর মধ্যে ধর্ম্মাচরণ কতক; কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি। কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্ম্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্ততঃ এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।

'আদর-সিংহাসন' ব্রতে মানুষ আদর চেয়ে—মিষ্টি কথা পাবার কামনা করে তো শাস্ত্রীয় হরিচরণ-ব্রতের মতো তামার টাটে দেবতার-পাদপদ্ম লিখে পূজা করে বরপ্রার্থনা করছে না! সে যেমন-আদরটি কামনা কচ্ছে সেটি একটি জীবন্ত প্রতিমার মধ্যে ধরে দেখবার আয়োজন করছে। সত্যি এক স্বামিসোহাগিনীকে সামনে বসিয়ে বসনে-ভূষণে সাজিয়ে যেমন আদর সে তার মূর্ত্তিমতা কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে এতেই তার আদর-পাওয়ার কামনা চরিতার্থ হবে নিশ্চয়। এইখানে ব্রত আর পূজোতে তফাৎ।

মেয়েলী-ব্রতগুলির সব-কটি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। কালে কালে তাদের এত ভাঙচুর অদলবদল উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে যে কোন্‌টা পূজো কোন্‌টা ব্রত ধরতে হলে আদর্শ ব্রতের লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে গোলে পড়তে হয়। খাঁটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে:—খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই,—জল চেয়ে পাদপদ্ম লিখে তাতে ফুল দিলে চলবেনা;—জলকে প্রত্যক্ষ করতে হবে বৃষ্টির অনুকরণে ঝারা দিয়ে কিম্বা বৃষ্টির ছবি লিখে বা বৃষ্টির বর্ণনা করে ছড়া বেঁধে অথবা এই তিন ক্রিয়ারই একত্রে অনুষ্ঠান করে। ইচ্ছা, বাইরের কোনো ঘটনা-থেকে —যেমন আকালের দিনে শস্যের কামনা— কিম্বা নিজের অন্তর-থেকে অকারণে উঠে মনকে দোলা দিচ্ছে এবং সেই দোলা মানুষের নানা চেষ্টায় প্রতিফলিত হয়ে একটা চরিতার্থতা পাচ্ছে, ধরতে গেলে, এই হল ব্রত। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা রয়েছে। ক্রিয়া যখন একের মধ্যেই ধরা রইল তখনতো সেটিকে ব্রত-অনুষ্ঠান বলা চলে না; ব্রতে দোল, দশে একই প্রেরণার বশে, একই ক্রিয়া করে চলেছে। তবেই বলতে হবে ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত

হওয়া দরকার। আমাদের নিত্যভোজন ও পরিপাক—আমাদের ইচ্ছা এবং শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া; কিন্তু সেটাকে তো ব্রত-অনুষ্ঠান বলব না; কিন্তু পাকস্পর্শ কিম্বা পিঠে-পার্ব্বন এর এক-একটা অনুষ্ঠান। যখন একজন মুসলমান নমাজ করছে প্রতিদিন, তখন সে ধর্ম্ম করছে বলতে হবে, কিন্তু সে ব্রত-অনুষ্ঠান করছে তখন, যখন সে আর দশহাজার মুসলমানের সঙ্গে একত্র হয়ে ইদের পর্ব্বদিনে এক ভঙ্গীতে নতি-প্রণতি দিচ্ছে দেখি। আবার হাজার লোক যখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মার-মার করে ছুটেছে তখন সেটিকে কোনো অনুষ্ঠান বলবনা, কিন্তু হাজার সেপাই যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে প্রতিদিন মাঠে কুচ্ করছে দেখি তখন একটা অনুষ্ঠান চলেছে বলব।

কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যখন একেরই মধ্যে কিম্বা অসংহত ভাবে দশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবস্থায় রইলো তখন সেই একেরই সঙ্গে বা একে-একে দশের সঙ্গে তার লোপ হয়ে গেল। কিন্তু এক ভাব, এক ক্রিয়া যখন সমস্ত জাতিকে প্রেরণা দিলে তখন সেটি ব্রত হল, এবং বেঁচেও রইল দেখি।

আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন! শাস্ত্রীয় ব্রত-গুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলী ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরও পূর্ব্বেকার পুরুষদের; —তখনকার—যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম্ম বলে একটা ধর্ম্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যে-গুলির নাম ব্রত।

এই-সব ব্রতের মূলে কিসের প্রেরণা রয়েছে বলা শক্ত। মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, না মানুষের শিল্প-সৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই ব্রতগুলি সেটা পরিষ্কার করে দেখার পূর্ব্বে ব্রতগুলির সঙ্গে পরিচয় আরো-একটু ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া দরকার। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ; খাঁটি ব্রতের লক্ষ্য ও লক্ষণ দুইই তাতে নেই; সুতরাং সেগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল খাঁটি মেয়েলী ব্রত কি-ভাবে আপনাদের প্রকাশ করছে তাই দেখি।

প্রথমে দেখি, কতকগুলি ব্রত—যাতে কামনা এবং আল্‌পনা ও ছড়া একটি অন্যকে অনুকরণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, কামনা হল সোনার চিরুনি, সোনার কৌটো, আয়না, পাল্‌কি। সেখানে পিটুলীর আল্‌পনা দিয়ে একটা চিরুনি একটা কৌটা, পাল্‌কি একটা, আয়না একটা আঁকা হল এবং তাতে ফুল ধরে ধরে বলা হল—

"আমরা পূজা করি পিঠালীর চিরুনি,
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
আমরা পূজা করি পিঠালীর কুটুই,
আমাগো হয় যেন সোনার কুটুই।
আমরা পূজা করি সোনার পাল্‌কি,
আমাগো হয় যেন সোনার পাল্‌কি।"

এখানে, চিরুনি-দেবতা, কৌটা-দেবতা, পাল্‌কি-দেবতা ইত্যাদিকে পূজা করে বর

চাওয়া। একেবারে কাজের কথা, এবং যতটুকু কাজের কেবল ততটুকু, একটু বাজে কিছু নেই। যা চাই তারি অনুরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কল্পনা করে বর প্রার্থনা।

আর-এক রকম, তাতে কামনার অনুরূপ ছড়া কিন্তু আল্‌পনাটি ভিন্নরূপ। মাদার-গাছ এঁকে বলা হচ্ছে,—

"আমরা পূজা করি চিত্রের মান্দার,
আমাগো হয় যেন ধান চাউলের ভাণ্ডার।"
"আমরা পূজা করি পিঠালীর মান্দার,
সোনায় রূপায় আমাগো ঘর আন্ধার!"

মাদার-গাছের সঙ্গে ধান-চাল, সোনা-রূপোর পরিষ্কার যোগ নেই অথচ তাতে ফুল দিয়ে বর চাওয়া হল এবং এখানেও কাজের জন্য যতটুকু, ততটুকু হল—আল্‌পনা, এবং ততটুকু হল ছড়া! গদ্য-সাহিত্য আধুনিক, সুতরাং কথায় এখন যা বলি, পূর্ব্বে যখন পদ্যই সাহিত্যের ভাষা তখন ছড়াগুলি পদ্যেই বলা হত। কিন্তু এই ধরণের ছড়াকে কবিতা কিম্বা গান, কি নাটক কিছুই বলা যায় না। এরা কেবল পদ্যে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে—এই মাত্র। 'জল দে বাবা' না বলে বলছি 'দে জল, দে জল বাবা!' এতে জল আছে স্পষ্ট বোঝাচ্ছে কিন্তু কাব্যরস তো নেই! এই ধরণের ছড়া কিম্বা এই ছাঁচের ব্রতগুলিতে পদ্য, আল্‌পনা ও নানা-চলাবলা থাকলেও, এগুলিকে কোনো দিন চিত্রকলা কি কাব্য বা নাট্য-কলা বলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু পরে যে দু-একটি ব্রতের ছড়া প্রকাশ করছি সেগুলির গঠনের এবং বাঁধুনীর প্রণালী দেখলেই বোঝা যাবে তার মধ্যে নাট্যকলার লক্ষণ কেমন পরিস্ফুট।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা ও সাধনা

ভাবুক এড্‌মণ্ড হোম্‌স্ আমাদের দেশে অপরিচিত নন। Creed of Buddha (বুদ্ধের ধর্ম্ম) নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাধনা সম্বন্ধে ইঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সম্প্রতি শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইঁহার মতামতের একটু পরিচয় দিব।

হোম্‌স্ খুব বড় করিয়াই শিক্ষা জিনিসটিকে দেখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে কতকগুলি খবরের সমষ্টিমাত্র বুঝি, যা ছেলেদের যেন-তেন-প্রকারে গলাধঃকরণ করাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইনি শিক্ষাকে মানুষের জীবনে সাধনারই প্রথম সোপানরূপে দেখিয়াছেন।

হোম্‌স্ মানুষের সাধনাকে প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বীজ যেমন বাহিরের আনুকূল্যে অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণায় যতদিন তার বৃক্ষ-জীবন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, কেবলি বাড়িতে থাকে, মানুষের আত্মাও তেমনি পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠে। কি করিলে তার অন্তর্নিহিত

শক্তি গোড়া হইতেই অবাধে বিকশিত হয় সেইটিই শিক্ষকের ভাবিবার বিষয়।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তাহার বৃদ্ধির সহায়তার জন্য প্রকৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি (instincts) দিয়াছেন, যেমন খাইবার এবং হাত-পা নাড়ার প্রবৃত্তি; এই ভাবে অজ্ঞাত-সারে শিশুর শরীর পুষ্টিলাভ করিতে থাকে; তেমনি তার আত্মার বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা আছে। যে কেহ শিশুকে লক্ষ্য করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে সে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে ভালবাসে—

(১) কথা বলা এবং শোনা
(২) অভিমান করা
(৩) আঁকা
(৪) নাচা এবং গান করা
(৫) প্রশ্ন করা
(৬) জিনিষ তৈরি করা

এই সমস্ত প্রবৃত্তির কি উদ্দেশ্য, তাহা একটু তলাইয়া দেখা যাক্।

(১) কথাবার্ত্তা বলা ও শোনাই পরে লেখা ও পড়ার মধ্যে প্রসারতা লাভ করে। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু অন্যান্য জীবনের সঙ্গে তার যোগ স্থাপনা করে।

(২) শিশু যখন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে, তখন প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা নিজেদের অন্য-কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া—অর্থাৎ প্রবীণ বা আর-কিছু সাজিয়া অভিনয় করে। এই উভয় প্রবৃত্তিতেই দেখা যায় যে শিশুরা কল্পনা ও সহানুভূতির সাহায্যে বাহিরের প্রাণীদের মধ্যে আপনাদিগকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

(৩) শৈশব হইতেই ছেলেরা ছবি ভাল-বাসে, পরে নিজেরা আঁকিতে চায়। পেন্সিল ও কাগজ, খড়ি, কয়লা, রংএর বাক্স প্রভৃতি দিলেই শিশু কিছু-না-কিছু আঁকিতে বসিয়া যায়। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু নিজের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আপনার আনন্দ প্রকাশ করে।

(৪) নাচে এবং গানে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ, সকলেরই এটি জানা কথা। এই দুইটি প্রবৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে শিশুর জীবন বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

(৫) শিশুর প্রশ্ন করার অভ্যাসও সুবিদিত।

(৬) শিশুকে এক বাক্স খেলনা ইট দিলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি তৈরির কাজে কাটাইয়া দিবে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ঘরকন্নার খেলা সকলেরই জানা আছে। এই প্রবৃত্তি দুটির সাহায্যে শিশু প্রকৃতির কলকারখানার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পায়। প্রকৃতির এই দ্বারটি জ্ঞানের চাবির দ্বারাই খোলা যায়।

প্রথম দুটি বৃত্তির সাহায্যে শিশুর আত্মা প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়—দ্বিতীয় দুটির সাহায্যে সৌন্দর্য্যের দিকে এবং শেষের দুটির সাহায্যে সত্যের দিকে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের দিকে প্রকৃতি নিজেই অহরহ শিশুর আত্মাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

হোম্‌স্ বলেন শিক্ষকের কাজ শিশুর এই স্বভাব-দত্ত বৃত্তিগুলির বিকাশের সাহায্য করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই বিকাশের নাট্যলীলায় শিশুকেই প্রধান অভিনেতা করিতে হইবে। শিশু আপনার

আনন্দে আপনাকে বড় করিয়া তুলিবে—শিক্ষক বাগানের সুদক্ষ মালীর কাজ করিবেন মাত্র।

গ্রন্থকার ইংলণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন,—যেখানে এই প্রণালী-অনুসারে কাজ হয়। ইহাতে হোম্‌সের কথার মূল্য আরো বাড়িয়া গেছে, কারণ কল্পনার সঙ্গে তথ্যের মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, তবে একটু উল্লেখ করিতে পারি।

(১) এখানে ক্লাসে ছেলেদের কথাবার্ত্তা বলায় কোন বাধা নাই। পাঠের সময় তাদের প্রশ্ন করিতে এবং অবাধে মতামত ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করা হয়। এ ছাড়া খেলা, অভিনয় প্রভৃতি কাজ তারা নিজেরাই আলোচনার দ্বারা ঠিক করে।

(২) অভিনয় ত ইস্কুলের একটি প্রধান অঙ্গ। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অভিনয়ের জন্য তারা নিজেরাই দস্তুরমত নাটক তৈরি করে এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বা বড় কোন ইতিহাস হইতে সেই সময়-কার প্রচলিত সাজসজ্জা ঠিক করিয়া লয়। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক বা কোন ভাল উপন্যাসের অংশবিশেষও তারা অভিনয় করে। এইরূপে অন্য মানুষের স্থলে নিজেদের অধিষ্ঠিত করিতে করিতে তারা ক্রমে উদারতা, দয়া, প্রীতি ও সহানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

(৩) আঁকা-শেখানোর সম্বন্ধে সেখান-কার শিক্ষক বলিতেছেন, "আমি প্রত্যেক শিশুকে একটি করিয়া আইভি-পাতা দিলাম; এবং লতাটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। পরে আমি বলিলাম, এইবার তোমরা মাঝে মাঝে পাতাটির দিকে দেখিয়া পাতাটি আঁকো দেখি।" অনেকেরই আঁকায় অবশ্য ভুল হইল, কিন্তু আমি বোর্ডে শুদ্ধ করিয়া আঁকিয়া দিই নাই। আমি তাদের বলিলাম, 'এই এই জায়গায় কি পাতাটির সঙ্গে তোমার ছবির মিল আছে? কি তফাৎ? কি রকম করিলে ইহা বদলানো যায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি শিশুদের দিয়াই তাদের ভুল বলাইয়া লই। বোর্ডে ছবি আঁকিয়া দিই না।" এই স্থলে ছবি দেখিয়া ছবি আঁকার নিয়ম নাই।

(৪) এই বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের লোক-গাথা (folk-song) এবং মরিস্ নৃত্য শেখানো হয়। আর একটি উপায়ে ইহাদের পাঠের মধ্যেই সুরের জাল বোনা হয়। ইহারা যখন সেলাই, অঙ্কন বা অন্য কোন কাজ স্থিরভাবে করিতে থাকে, তখন শিক্ষক কোন উচ্চ অঙ্গের সুর বাজাইতে থাকেন, সেটা তাদের কাজ ও চিত্তের গভীর তলদেশে সুর সঞ্চারিত করিতে থাকে।

(৫) প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের (Nature-study) ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসু বৃত্তি খোরাক পায়। যখনি ফুল, পাতা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক জিনিষ সম্বন্ধে ক্লাসে আলোচনা হয়, প্রত্যেক শিশুর হাতে তখনি একটি করিয়া সেই জিনিষ ও একখানি আতস কাচ (lens) দিয়া জিনিষটিকে খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হয়, যখনি কোন বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তৎক্ষণাৎ শিশুরা তার কারণ বাহির করিতে চেষ্টা পায়; এই চেষ্টাতে তারা খুব বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ

করে এবং শিক্ষকের সাহায্যে ইহার সত্য কারণ ও সেই বিশেষত্বের সঙ্গে সমস্ত জিনিষটির সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। এইরূপে কেবল যে তাদের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের শক্তি বাড়ে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন-বৃত্তিরও উন্নতি হইতে থাকে।

(৬) পাখীরা যেমন বসন্তকালে বাসা বাঁধে, এখানকার শিশুরাও তেমনি হাতের কাজ করিতে ভালবাসে। এ কথা সত্য যে সাধারণ স্কুলের মত বাগান-করা বা রন্ধনবিদ্যা সম্বন্ধে প্রণালী-বদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু মধের বাগান করা, রন্ধন করা, কাঠের কাজ করা ইস্কুলের একটি প্রধান অঙ্গ, গড়িবার এই বৃত্তিটিকে এইটুকু কাজের মধ্যেই থামিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষক সমস্ত বিদ্যালয়টি গড়িয়া তুলিবার ভার শিশুদের হাতে দিয়াছেন, যাহাতে ক্রমে ক্রমে ইহা স্বায়ত্তশাসনকারী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়।

এই ত গেল বাহিরের প্রণালীর কথা; কিন্তু ইহার ভিতরে শিক্ষার যে গভীর তত্ত্বটি আছে সেটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হোম্‌সের বইখানি পড়া দরকার। তিনি বলেন, মানুষের আত্মা যদি আপন প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপে নানাদিকে প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তার ছোট-আমির নাগপাশ-বন্ধন আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িবে। পৃথিবীর বারো আনা পাপের মূল হইতেছে, অহঙ্কারে ছোট-আমিকে সত্য-আমি বলিয়া মনে করায়। মানুষের বড়-আমি যদি একবার খোরাক পাইয়া সত্য ও সতেজ হইয়া ওঠে, তাহা হইলে ছোট-আমি আপনিই কোথায় মিলাইয়া যাইবে এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপ তাহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। শিশুর প্রসারণী বৃত্তিগুলি এই বড়-আমির প্রকৃতি-দত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অতএব ইহাদের খোরাক যোগানোই শিক্ষা ও সাধনার একমাত্র কাজ।

সব দেশেই নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষাকে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের মত এক একটা "বিষয়" করিয়া তোলার চেষ্টা দেখা যায়; হোম্‌সের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। হোম্‌স্ বারম্বার এই কথাই বলিয়াছেন, বাহির হইতে যা দি, তার দ্বারা আমরা আত্মাকে আঘাত করি; ভিতর হইতে শিশু আপনি যা লয়, তার দ্বারাই তার আত্মা পুষ্টি লাভ করে। হোম্‌সের শিক্ষার আদর্শ যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একটি জায়গা উদ্ধৃত করি—

"Far from wishing to secularise education, I hold that it cannot be too religious. And, far from wishing to limit its religious activities to the first forty minutes of the morning sessions, I hold that it should be actively religious through every minute of every school session, that whatever it does it should do to the glory of God."

তাৎপর্য্য—"শিক্ষাকে পার্থিব ব্যাপার করিয়া তোলা দূরে থাক্, আমার মতে ইহা একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত। এবং ধর্ম্মশিক্ষাকে প্রথম চল্লিশ মিনিটে আবদ্ধ না রাখিয়া আমার মতে ইস্কুলের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ইহার

অধিকার করা উচিত, যাহাতে ইস্কুলের সমস্ত কাজ ভগবানের মহিমা প্রচার করে।"

যাঁহারা Creed of Buddha সাধন-তত্ত্বের সহিত পরিচিত, তাঁহারা এই পুস্তকে আত্মোপলব্ধির পথের প্রথম অংশটি দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইবেন, সেই পথে কি করিয়া মানুষের আত্মা একেবারে শিশুকাল হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিতে পারে, প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের এই আগ্রহ চিত্তকে মুগ্ধ করে। তাই মনে হয় ভাবুক সাধকেরাই যেন মানুষের শিক্ষার ভার নেন,—পণ্ডিতদের সংসদ নয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাল্যদান

(১২)

আমাদের দেশেই বিশেষতঃ বুঝি সকল মঙ্গল-কার্য্যের মূলেই মতানৈক্য সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতিও যে তাহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

প্রথমতঃ—অতুলেশ্বরের মাসহারাভোগী প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বেকার আত্মীয় অনাত্মীয়-দল যাঁহারা কর্ম্মেশ্বরের মোসাহেবি করিয়া দিনপাত করিতেন তাঁহারা এই অবসরে পুরাতন স্মৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া পুরাতন রাজার স্তুতিবাদ ছলে বর্ত্তমান রাজার মতি-গতির নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই এমন একটি আলোচনা আছে, যাহাতে আমাদের দেশেও মতের একতা দেখা যায়। সকলেই তাঁহারা এক বাক্যে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, প্রসাদপুর আর পুরুষের রাজ্য নহে, তাঁহারা বাস করিতেছেন এখন নারীরাজ্যে! আহা সে কি সুখের দিনই গিয়াছে!" রাজার পশ্চাতে মদের বোতল লইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন রাঙ্গারসে আকণ্ঠ তাঁহাদের ভরিয়া উঠিত! আর এখন তামাকটা আফিংটাও কষ্টে জোটে! হাঁরে!

যুবকেরা গন্‌গন্ করিতে লাগিল, অন্য-কারণে। রাজকুমারী পণ্ডিত মহাশয়কে সমিতির সেক্রেটারী করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোধ হইল। যদিও ইহারা সকলেই প্রায় প্রসাদপুরের স্কুলে পড়ে, অতএব পণ্ডিত-মহাশয়ের ছাত্র,—হইলে কি হয় সংস্কৃত শেখান এক কথা, আর ব্যায়াম-বিদ্যার অধ্যক্ষতা করা অন্যকথা। হাজার হোক তাহারা রাজার আত্মীয় কুটুম্ব, তাহাদের মধ্যে এ পদের উপযুক্ত লোক কি কেহ ছিল না! প্রকাশ্যে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট এ আপত্তি তুলিতে তাহারা সাহসী হইল না। তবু ভাবে-গতিকে এই অসন্তুষ্টি বুঝিয়া লইয়া, তর্ক-যুক্তিতে মিষ্টবাক্যে বালিকা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পণ্ডিত মহাশয় সেক্রেটারী হইয়াছেন বলিয়া, তাহাতে তাহাদের অপমান নাই। চিরদিনই এদেশে ব্রাহ্মণেই অস্ত্রবিদ্যারও গুরু হইয়া আসিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি, অসুরগুরু শুক্র, এবং কুরু পাণ্ডব-গুরু দ্রোণাচার্য্য সকলেই ব্রাহ্মণ।

অতএব এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের নিরস্ত্র কর্ত্তৃত্বে তাহাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ বা নজীর নাই।

এইরূপ নানা বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া তেজস্বিনী নারী অবশেষে জয় লাভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সমিতি বড় ছোট ছেলের দলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজবংশীয় এবং প্রজাবংশীয় যুবকদিগের সম্মিলনে রীতিমত ব্যায়াম কার্য্য চলিতে লাগিল। লাঠিখেলার সর্দ্দার হইল হরিরাম, তাহার সহকারী স্বরূপ আরও কয়েকজন পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা ছোট খাঁড়া চালাইতেও শিখাইত। ইহাছাড়া কুস্তি, দৌড়ঝাঁপ, হাডুডুডু, ব্যাটবল প্রভৃতি নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া চলিত। প্রত্যেক খেলার জন্য সপ্তাহে দুই এক দিন করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী ছোট লাঠি লইয়া অন্তঃপুরেও একটি ক্লাশ খুলিয়া দিল। ফুটবল ক্রিকেট খেলা হইত একটু দূরের মাঠে, কিন্তু লাঠি খেলা ইত্যাদির জন্য ছেলের দল সপ্তাহে তিনদিন রাজবাড়ীর পশ্চাতের আম-বাগানে আসিয়া জড় হইত। রাজা খেলার সময় সবদিন উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলেও অধিনায়কতা করিত তাঁহার কন্যা। ছেলেরা সকলেই বয়সে তাহার বড়—বালিকার পিতার বয়সী দুচারজন লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন—যেমন পণ্ডিত মহাশয়! কিন্তু সকলকেই জ্যোতির্ম্ময়ী সেনাপতির ন্যায় পরিচালনা করিত। কোন ছেলের পদাঙ্গুলিটুকুও সীমানা রেখার বাহিরে পড়িয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর ইঙ্গিতে সে তটস্থ হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইত। লাঠিখানা কেহ ঈষৎ অযথা ভাবে ধরিলে জ্যোতির্ম্ময়ী নিজে লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিত। কোন দলে কোন ছেলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দী হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দিত জ্যোতির্ম্ময়ী। কেবল হার-জিতের মীমাংসা করিতেন স্বয়ং রাজা। জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচালনায় পণ্ডিত-মহাশয়ের ন্যায় শ্মশ্রুধারী ব্যক্তিও যেন লাটিমের ন্যায় ঘুরিতেন। তাহার উৎসাহ-কটাক্ষে শ্রান্ত খেলোয়ারগণও নব বলে যেন বলীয়ান হইয়া উঠিত। সমিতির অভিধান হইতে শ্রান্তি ক্লান্তি কথা দুইটা একেবারেই যেন উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপে নামে মাত্র পণ্ডিত-মহাশয় রহিলেন কর্ত্তা কিন্তু আসলে কর্ত্তৃত্ব করিত তাঁহার ছাত্রী। ইহাতে রাজ-আত্মীয়গণের মনের মেঘও ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। রাজা এই ক্ষণজন্মা নারীর কার্য্য-কলাপ মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া ভাবিতেন,—নাজানি কোন্ মহাকার্য্য সাধন-উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম?—অথবা এই অসাধারণ রমণীর জীবনের পরিণতি অবশেষে সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইবে? মনোদেবতার নিকট হইতে রাজা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইতেন না।

বাধার আর শেষ নাই। ব্যায়াম পরী-ক্ষার দিন সন্নিকট, রাজা সহসা ঘোড়া হইতে পড়িয়া জখম হইলেন। তিনি অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন জীবন-পুরের সীমানা পরিদর্শনে, ইহার প্রান্তে তাহার এক সরিকের জমীদারী। সরিক অপর কেহ নহেন, বিজনকুমারের পিতা। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ শঙ্কর রায় যোগমায়া দেবীর দূরসম্পর্কীয় খুল্লতাত ছিলেন। রাজা কন্যাকে রাজ্যা-

ধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবংশকে বিষাদপুর জমীদারী দিয়া যান। কিন্তু এই দানে সন্তুষ্ট বা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, শঙ্কর রায়ের সন্তানসন্ততিগণ বংশপরম্পরায় চিরদিনই যোগমায়া দেবীর বংশের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কন্যাকে আবার কোন্ রাজা বিষয়বিভব প্রদান করে? রাণীর নামে রাজসিংহাসনে বসায়? প্রধান বংশের কাহাকেও তিনি পোষ্যপুত্র লইতে পারিতেন না কি? তাহা না করিয়া ন্যায়তঃ প্রসাদপুর-বংশকেই তিনি ত ফাঁকি দিলেন।

যাঁহার বিষয় ছিল তিনি যে ইচ্ছা করিলে এক কানাকড়িও তাহাদের নাও দিতে পারিতেন, এ কথা মনে করিয়া কেহ এ বংশের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ অবকাশ পাইলেই প্রসাদপুরের রাজাকে তাহারা ক্লেশ দিয়াই আনন্দ অনুভব করে। উভয় পক্ষীয় প্রজার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ত এজন্য প্রায় লাগিয়াই আছে। অথচ প্রকাশ্যে ইহাদের মধ্যে ভদ্রতা-সৌজন্যের ত্রুটি নাই। কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে উভয় দলেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। এবং দেখা হইলেই উভয় পক্ষ—বিশেষতঃ বিষাদপুর-পক্ষ মিষ্ট সম্ভাষণে আত্মীয়তার উৎস ছুটাইয়া দেন।

আপাততঃ বিজনকুমারের পিতা সুজন রায় বিষাদপুরে আসিয়াছিলেন—অতুলেশ্বরের প্রজাগণ তাঁহার আগমনে অতিরিক্ত উৎপাত সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুজন রায়ের মস্তিষ্ক এত উর্ব্বর যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আগে হইতে বুঝিয়া সাবধানতা অবলম্বন করাও সহজ নহে। যাহা হউক, রাজা উভয় সীমানার মধ্যে লোকজন যথেষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং প্রায়ই প্রতিদিন নিজে একবার এদিকে আসিয়া খোঁজ খবর লইয়া যাইতেন।—

আজ পরিদর্শনের পর গৃহে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—জীবনপুরের পুল পার হইয়া বন্য রাস্তায় পড়িবামাত্র ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তেজস্বী আরব প্রভুর একান্ত বাধ্য, কিন্তু আজ রাজার ইঙ্গিতে সে চলিল না, কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইল।—রাজা এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, রাত্রি হইয়া পড়িলে বিপদ ঘটিতে পারে—তিনি ঘোড়াকে কশাঘাত করিলেন—অগত্যা ঘোড়া ছুটিল, কিন্তু দশপদ জমি অগ্রসর হইতে না হইতে হঠাৎ গাছ হইতে একটা বিকটাকার জন্তু রাজার মাথার উপরে লাফাইয়া পড়িল—এই অসতর্কিত অবস্থায় ঘোড়া ও অশ্বারোহী দুজনেই পড়িয়া গেলেন।

জন্তুটাও সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়িয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল—রাজাকে আক্রমণ করিবে বা ঘোড়াকে—সে যেন ভাবিবার জন্য মুহূর্ত্ত কাল সময় গ্রহণ করিল। এই অবসরে ভূপতিত অবস্থাতেই বক্ষের পিস্তল ডান হস্তে বাহির করিয়া লইয়া রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। কুঁইকুঁই শব্দে কাতরোক্তি করিয়া জন্তুটা শুইয়া পড়িল। রাজা তখন দেখিলেন, সে একটা বনমানুষ! সেই সময় রাজার পশ্চাৎবর্ত্তী ঘোড়সওয়ার দুইজন রঙ্গস্থলে আসিয়া পড়িয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাইতে বিলম্ব করিল না।

রাজা পড়িয়া জানুদেশে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। সওয়ারদের সাহায্যে কষ্ট-শ্রষ্টে পুনরায় ঘোড়ায় উপর বসিয়া কোনরূপে বাড়ী আসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার মৃত শীকারও তাঁহার সঙ্গে আনীত হইল।

প্রসাদপুরের টেলিগ্রাম আফিস ৯টার পর বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং সে রাত্রে আর কলিকাতায় তার পৌঁছিল না। পরদিন সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য যথাসময়ে ডাক্তারাদি সহ যে প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহা পাঠক ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন।

রাজবাড়ীর সকলেই বুঝিল—এই নূতন রকম উৎপাত সুজন রায়েরই সৃষ্টি। তাহার পিতা মাতা কেন যে পুত্রের দুর্জ্জন নাম না দিয়া অনর্থক এই সাধুনামটির পর্য্যন্ত অবমাননা করিয়াছেন, এই পুরাতন আক্ষেপোক্তি আবার অনেকেরই মুখে নূতন সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজবাড়ীর মনের কথা বাহিরে প্রকাশ হইতে না হইতে সুজন রায় নিজেই রাজাকে নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিলেন যে "তাঁহার পলাতক পোষ্য নরবানর কর্ত্তৃক রাজা আহত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার দুঃখের শেষ নাই। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার লোকজন এ কয়দিন উহাকে ধরিতে পারে নাই, রাজা উহাকে মারিয়া ভালই করিয়াছেন।" পত্রে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, একদিন রাজাকে দেখিতেও আসিলেন। তখন জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার নিকটে ছিল, তাহার মহিমময়ী সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জীবনে এই প্রথমবার মনে একটা অনুতাপও জাগিল—যে ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, অত্যাচার তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে সংকল্প জাগিল যে এই কন্যার সহিত বিজন কুমারকে বিবাহসূত্রে গাঁথিয়া উভয় রায়-বংশকে এক করিবেন। ইহাতে রাজকন্যা এবং রাজত্বের অধিকারী হইবেন তাঁহারা —এবং পরস্পরের মনোমালিন্যও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে।

এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় তিনি বিলম্ব করিলেন না,—রাজাকে দেখিবার পর মহারাণীর চরণধূলি গ্রহণ বাসনায় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এবং রীতিমত ভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। মহারাণী ইহাতে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, মেয়ের ত বিবাহ দিতেই হইবে, এমন সুবিধামত ঘর বর আর মিলিবে কোথা! তবে নিজের ছেলের উপর তাঁর বিশ্বাস নাই,—রাজা যে এ প্রস্তাবটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা ত বলা যায় না!

মহারাণী তাই আহ্লাদ প্রকাশের মধ্যেও একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"আমার ত বাবা খুবই ইচ্ছে দুহাত বাঁধা পড়ে, দুই পরিবার এক হয়ে যায়। কিন্তু আজ কাল সেদিন নেই তাও ত দেখছ বাবা! মেয়েকে যে রকম স্বাধীন করে তুলেছে বাপ, কোন দিন সে কারো গলায় নিজে মালা তুলে না দিলে বাঁচি।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন—"তা স্বয়ম্বর সভায় আমার ছেলে যদি বসে, তার গলাতেই মালা উঠবে—বাকিমা; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

মহারাণীও হাসিলেন,—বলিলেন "তা বেশ! বিজনকুমার কি এখানে এসেছে? তাকে তবে পাঠিয়ে টাটিয়ে দিও। মেয়ে ছেলে দুজনের পরিচয় আগে হোক্। আজকাল ত আমাদের ইচ্ছাতেই শুধু কাজ হবে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন—"বিজন কলকাতা-তেই আছে। আমি যত শীঘ্র পারি বাড়ী গিয়ে তাকেই জমীদারী দেখতে এখানে পাঠাব।"

মহারাণী রাজার কাছে, সুযোগমত একদিন এ কথা পাড়িলেন,—রাজা কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বসিলেন,—বলিলেন, "বাপকো বেটা ত? অমন কুচক্রী বাপের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে কখনই আমি বিয়ে দেব না। তবে মেয়ে যদি কোন দিন আপনা থেকে ওকে বিয়ে করতে যায় ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তারও কোনই সম্ভাবনা নেই।"

মহারাণী মনে মনে ভারী রাগিয়া গেলেন,—রাজার যে কি রকম মতিগতি হইয়াছে,—ভালকথা যা বলা যায় তাই মন্দ হইয়া ওঠে! তবুও হাল ছাড়িলেন না—ভাবিলেন, "বেশ, তবে তাই হবে,—মেয়ে নিজেই যাতে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়—সেই চেষ্টাই দেখা যাবে।"

(১৩)

ঘোড়া হইতে পড়িয়া রাজার যেরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, আসলে সেরূপ কোন ক্ষতি হয় নাই। জানুর অস্থি সরিয়া পড়িলেও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সেই জন্য যথাশীঘ্র তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া দু-এক দিনের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যও অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতার দলের মধ্যে শরৎকুমার একাকী মাত্র রাজ-চিকিৎসকরূপে তাঁহার সেবার জন্য এখানে রহিয়া গেলেন।

রাজা পড়িয়া গিয়া পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে ছেলেদের ব্যায়াম খেলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারে না। ছেলেরা আপনারা খেলে, ঝগড়া করে, সর্দ্দারদের উপর সর্দ্দারি করিয়া শিক্ষার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। পণ্ডিত-মহাশয়ের সাধ্য কি তাহাদের রাশ টানিয়া সোজা রাখেন! অথচ শরৎকুমার যখন মাঝে মাঝে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ান—তাঁহাকে সর্দ্দাররূপে মানিতে তাহারা অপমান বোধ করে না। কেন না প্রতিপদেই তাঁহার নায়ক যোগ্য ভাব তাহারা অনুভব করিয়া স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট হইয়া উঠে।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিকাল বেলা পিতার নিকট থাকিয়া প্রায়ই শরৎকুমারকে এ-সময়টা খেলিবার ছুটি দেন। শরৎ কোনদিন বা ফুটবল কোনদিন বা ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন,—আর কোনদিন বা লাঠি খেলার স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কাহারও ভুল চুক দেখিলে সংশোধন করিয়া

দেন। শরৎকুমার ইহাদের মধ্যে সম্প্রতি দুইটি অভিনব খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

গৎকা, এবং ইংরাজি প্রথায় দস্তানা ধারণে ঘুসা-ঘুসি খেলা।

এইস্থানে গৎকা খেলার একটু ব্যাখ্যা করিলে যাঁহারা এ খেলা দেখেন নাই তাঁহাদের বুঝিতে সুবিধা হইবে।

গৎকা চামড়া মোড়া একরূপ ছোট লাঠি, ইহা থাকে খেলকের ডান হাতে, আর বামহাতে থাকে একটা হরিণ শৃঙ্গ, ইস্ক্রুপ দ্বারা আঁটা দুইটা ছোট হরিণ শৃঙ্গ দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা ঢাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন স্থলে ইহাদ্বারা বিপক্ষের প্রহার হইতে সাধারণতঃ আত্মরক্ষা করা হয় এবং সুবিধামত বিপক্ষকে ইহা দ্বারা খোঁচা দেওয়াও চলে। এই খেলায় ডান পা সম্মুখে রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অর্দ্ধভঙ্গ ঠাটে দাঁড়াইতে হয়।

রাজা বেশ ভাল হইয়া উঠিলেন। জন্মাষ্টমীর উৎসব দিনে বালিকা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবে, সেইদিন তাহার ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা উৎসব। কিছুদিন হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভাদ্রমাস, কি জানি যদি বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, মাঠের স্থানে স্থানে ছোট তাম্বু পড়িল। ফুটবল প্রভৃতি দৌড়ঝাপ খেলার মুক্তমাঠ এক পাশে রাখিয়া অন্যপাশে একটা বড় চালা বাঁধা হইল, চালার মধ্যে প্রেসিডেণ্টের মঞ্চের চারিদিকে দর্শকদিগের স্তরনির্ম্মিত আসন, এবং মধ্যস্থলে ঘুষাঘুষি ও লাঠি খেলা প্রভৃতির স্থান নির্ম্মিত হইল।

শরৎকুমার কলিকাতার অভিজ্ঞ লোক; তাঁহার উপরেই প্রধানতঃ এই আয়োজনের নেতৃত্ব ভার পড়িয়াছে, তিনিও প্রসন্নচিত্তে এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন! রাজা কন্যার সহিত মাঝে মাঝে এখানে তত্ত্বাবধান করিতে আসেন; শরতের কার্য্যোদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়া পিতা কন্যা উভয়েই মুগ্ধ হইয়া যান। শরৎ যেন চলিয়া কাজ করিতে জানে না, সে কাজ করে ছুটিয়া।—অধিকন্তু রাজা এ সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশও ইঙ্গিতও করিতে পারেননা—যাহা ইতিপূর্ব্বে শরৎ ভাবিয়া ঠিক করিয়া না লইয়াছে।

ছেলের দলের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। দুর্গা-পূজার প্রতিমা গঠনের সময় যেরূপ আনন্দোৎসাহে বালকেরা মূর্ত্তি গঠন নিরীক্ষণ করে—সেইরূপ আনন্দে তাহারা মত্ত। প্রভেদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহারা দর্শক নহে, সকলেই এক একজন গঠন-তৎপর পটুয়া। পণ্ডিত-মহাশয়ের হাতে-কলমে কিছুই বড় একটা করিতে হয় না। বিনা শ্রান্তিতেও হাঁপাইয়া উঠিয়া তিনি কেবল মাঝে মাঝে বন্দেমাতরং বলিয়া ডাক ছাড়েন,—ছেলেরাও কাজ করিতে করিতে পণ্ডিত-মহাশয়ের সহিত সমস্বরে বন্দেমাতরং শব্দে গগন ফাটাইয়া তোলে। ছেলের দল এই এক বিষয়ে নির্ব্বিরোধে তাঁহাকে মানিয়া চলে।

এইরূপ আনন্দমত্ততার মধ্যে যথাসময়ে উৎসব আয়োজন সম্পন্ন হইল। মাঠ, চালা, তাম্বু, রঙ্গিন বস্ত্রে, নিশানে, ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া উঠিল।

প্রেসিডেণ্টের নামে প্রসাদপুরের সকল

ইংরাজই নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজার নামে ধনী দরিদ্র সকল প্রজাই আহূত হইল। আশে-পাশের জমীদার এবং কর্ম্মচারীগণও নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। যাঁহারা পত্র পান নাই—তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিজনকুমার কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদপুরে আসিয়াছেন—এবং তাঁহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর মহানন্দের দিন। কিন্তু সে আনন্দে তাহার অধীরতা প্রকাশ পায় নাই। ম্যাজিষ্টেট সাহেব সস্ত্রীক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ছেলেরা বন্দেমাতরং ধ্বনিতে তাঁহাদের সমাদৃত করিয়া মঞ্চে আনিয়া বসাইল। রাজা কন্যাকে লইয়া প্রেসিডেণ্টের পাশেই বসিলেন, বিজনকুমার তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ইংরাজ ও জমীদারগণও বসিলেন এইস্থানে।

সভাপতি এবং তৎপত্নীকে ফুলগুচ্ছ এবং ফুলমাল্য উপহারে জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনন্দিত করিবার পর কতকগুলি গেরুয়াবস্ত্রপরিহিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ বেশী বালক গান আরম্ভ করিল—

ভিক্ষাং দেহি জননি গো ভরিয়ে দে এ ঝুলি;
আর কিছু চাহি না ত শুধু পদধূলি।
শুধু মাগো চাই বর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
তোমার সেবায় প্রাণ পুণ্য করে তুলি।
মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,
তোর দুঃখ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে।
তব মুখ সব আগে যেন নিত্য মনে জাগে
তোমার চিন্তাতে যেন সব চিন্তা ভুলি।

গানের পর প্রেসিডেণ্ট অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার পর খেলা আরম্ভ হইল। ফুটবল প্রভৃতি খেলা কাল হইবে, চালার ভিতরে যে সব খেলা হইতে পারে—তাহারই দিন আজ। প্রথমে আরম্ভ হইল কুস্তি। তাঁহার মীমাংসা হইয়া গেলে—১৫ মিনিট কাল অবসর দেওয়া হইল। ইহার পর লাঠালাঠি প্রভৃতি খেলা আরম্ভ হইবে।

(১৪)

সকলে খেলা দেখিতে মত্ত, কিন্তু বিজনের সেদিকে মন ছিল না; সে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে আড়নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিম্নলিখিত কবিতার লাইনটি মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল।

"Fain would I climb,
but that I fear to fall—"

যদি জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মনের কথা জানিতে পারিতেন তাহাহইলে কি রাজ্ঞী এলিজেবেথের মতন বলিতেন—

"If thy mind fail thee,
do not climb at all"

বিজনের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কত জরীজড়াও কিংখাপ বস্ত্রে, কত রাশি রাশি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ওঠেন, আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর সাজসজ্জার অনাড়ম্বর বিজনের চক্ষে ভারী নূতন বলিয়া ঠেকিল। বালিকা পরিয়াছে একখানি জরী-কিনার নীলাম্বরী বারাণসী সাড়ি, তদুপযোগী একটি জ্যাকেট ও ওড়না। অলঙ্কার দুচারিখানি যাহা পরিয়াছে বসনের মধ্যে সেগুলি একরূপ ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল তাহার শিরোভূষণ—ওড়নার উপরিস্থিত হীরক টায়েরা—রাজা আজ তাহার জন্মদিনে এই উপহারটি প্রদান করিয়াছেন। এই মুকুটচ্ছটায় তাহাকে চিত্রাঙ্কিত দেবী মূর্ত্তির ন্যায়ই জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারত-কন্যা এত সুন্দরী! ইংরেজগণ প্রথমেই দেখিয়া বঙ্গান্তঃপুরের মহিমা কল্পনা করিতেছিলেন। আর বিজনকুমার? সেই জ্যোতির নিকট কিরূপে পৌঁছিবে, কখনও পৌঁছিতে পারিবে কি না তাহাই ভাবিয়া একান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যায়াম-ক্রীড়ার ১৫ মিনিট কাল বিরাম অবসরে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন তাম্বুতে আহারে আহূত হইলেন।

দেশী বিলাতি কোনরূপ ভোজায়োজনেরই ত্রুটি ছিলনা। রাজা ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নীকে করদান পূর্ব্বক লঞ্চ গৃহে লইয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব করপ্রসারণ পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন—"May I have the pleasure of" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে আস্তে আস্তে কি বলিল—তিনি হাসিয়া বলিলেন—"Very well, let thy Will be done, my queen" বলিয়া আর একজন ইংরাজ-পত্নীকে হস্তদান পূর্ব্বক লঞ্চে লইয়া গেলেন।

ইংরাজরা সকলেই এবং অনেক বাঙ্গালীও ইঁহাদের অনুসরণ করিলেন। বাকী সকলকে ছেলেরা দেশী ভোজের ঘরে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু বিজনকুমার উঠিল না।—জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তাম্বুতে গিয়ে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে?" বিজন কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়া পাইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন—"বেশ, আপনি তবে এই খানেই কিছু খান—"

একজন যুবক ভলণ্টিয়ার মঞ্চের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিলেন, "সন্তোষ, কিছু খাবার এখানে আনতে বলবে তুমি?"

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতে শরৎকুমার পুরোবর্ত্তী হইয়া আর একটি ছেলের সহিত মিষ্টান্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার-দা নিজেই যে খাবার নিয়ে হাজির!"

শরৎ হাতের থালা টেবিলে রাখিয়া কহিল' "আশা করি অন্যায় কাজ করি নি?" বালিকা কহিল "অন্যায়! খুবই ন্যায় কাজ করেছেন। নহলে আমার অতিথি অভুক্ত থাকতেন, সে পাপ লাগত আমাকে।"

"বেশ আপনারা খান। চল কান্তি, আমরা লেমনেড আর আইস ক্রিম নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া শরৎকুমার চলিয়া গেলেন, বিজন থালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—কত রকমের খাদ্য! স্যাণ্ড-উইচ, প্যাটি, নানাবিধ কেক; নানা রকম মিষ্টান্ন! অন্য সময় হইলে এ সকলের লোভ সম্বরণ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ আতিথ্যকারিণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী! তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কেমন যে বিভ্রম উপস্থিত হইল—সহজ ভাবে সে কোন খাদ্যই উঠাইয়া লইতে পারিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিল—"খান না বিজন বাবু! এখনি ত আবার সভা পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

শরৎ সম্ভাষিত হয়—দাদারূপে—আর বিজন যে ব্যক্তি যথার্থই রাজকুমারীর একজন আত্মীয়, সে হইল বাবু পদবাচ্য—হায়রে!

কিন্তু আর খাইতে দেরী করাটা সত্যই ভাল দেখায় না; মনের জ্বালা মনে চাপিয়া বিজনকুমার একটা 'ম্যারাং' হাতে তুলিয়া লইল। মুখে তুলিতে গিয়া তাহার মনে হইল—আদব-কায়দার ত্রুটি হইতেছে না ত? রাজকুমারীকে তাহার কি খাইতে অনুরোধ করা উচিত ছিল না? সে সহজ ভাবে বলিতে চেষ্টা করিল—"আপনি খাবেন না?" বলিয়া হাতটা তাহার দিকে বাড়াইবা মাত্র 'ম্যারাং'টা হস্তচ্যুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পদ বস্ত্রের উপর পড়িয়া ফাটিয়া গেল; মধ্যস্থিত ক্রিমে তাহার নীলাঞ্চল শাদা হইয়া উঠিল। এম্‌নি বিজনের দুর্গ্রহ,—ঠিক এই সময় কি শরৎকুমার আসিয়া পড়িবেন! তাহার সহচর ভলেন্টিয়ার এই ঘটনায় কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া লইল; শরৎকুমার নিঃশব্দে হাতের ট্রে-খানা টেবিলে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল একখানা বাহির করিয়া লইয়া বেশ সচ্ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে বালিকার কাপড়ের ক্ষীরটা মুছিয়া তুলিয়া দিল। বিজনকে অপ্রস্তুত দেখিয়া তাহার লজ্জা দূর করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ম্ময়ী মধুর হাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কিছু মনে করবেন না—বিজনবাবু, সেদিন আমিও এক-জন মেমের কাপড়ে কাফি ফেলে দিয়ে ছিলুম।—তাড়াতাড়িতে অনেক সময় এমন-তর হয়েই থাকে।" কিন্তু বিজনকুমারের মন এ বাক্যে প্রবোধ মানিল না। লজ্জায় তাহার শিরা উপশিরা কাঁপিয়া উঠিল আর শরৎকুমারের সহজ নিঃসঙ্কোচ ভা ঈর্ষান্বিত হইয়া মনে মনে তাহাকে শত অভিশাপ দিতে লাগিল। বিজন যদি জানি কিছুদিন পূর্ব্বে হাসিকে একটি ফুল দিতে শরৎকুমারের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল হইলে বোধ হয়—তাহার মনের জ্বালার নিবৃত্তি হইতে পারিত।

শরৎ পুনরায় কাজে চলিয়া গে বিজনের আহারান্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভলেন্টিয়া গণ ট্রে-গুলি লইয়া গেল। মঞ্চে জনপ্রাণী নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী ও বিজনকুমা বিজন ভাবিতে লাগিল, এমন অবসর সে বৃথা যাইতে দিবে? সে কি পু নহে?—একজন নারীকে প্রসন্ন করিবা মত একটি কথাও কি সে কহিতে জা না? তাহার ব্যায়াম-দক্ষতার পরি পাইলে রাজকুমারী যে সন্তুষ্ট হইবেন—ই সে বুঝিল। কিন্তু কি করিয়া এক পাড়িবে, কি করিয়া জানাইবে, সে ফুটবলে, ক্রিকেটে, লাঠি-খেলা দক্ষ।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল; খেলার স্থা লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল; দ্বিতী ঘণ্টা পড়িলেই মঞ্চ পূর্ণ হইয়া উঠিবে বিলম্বের সময় নাই, ভাবিবার অবসর নাই; বিজনকুমার সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারি, বাহিরের লোক কি কেহ এ খেলায় যোগ দিতে পারে?" জ্যোতির্ম্ময়ী কিছু না ভাবিয়া আনমনেই একরকম বলিল, "পারবে না কেন?"

"আমি কি লাঠিখেলায় যোগ দিতে রি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী তখন সজাগ হইয়া কহিল—স্তু আজকে পরীক্ষার দিন; আমার নতুন লোয়ারদের সঙ্গে আপনার মত দক্ষ াকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ঠিক হবে?"

"না আমি কোন সর্দ্দারের সঙ্গেই লতে চাই।"

শরৎকুমার ঠিক এক মিনিট আগে এখানে াসিয়া পরিত্যক্ত চৌকি গুলি সাজাইয়া াখিতেছিলেন,—নিকটে আসিয়া বলিলেন—আমি বিজনবাবুর সহিত খেলিতে প্রস্তুত াছি।"

শরৎ যে একজন নিপুণ খেলোয়ার তাহা জ্যোতির্ম্ময়ী জানিত না—তবু তাহার মান ক্ষা হইল ভাবিয়া সে আনন্দবোধ করিল। বন্ধু খেলাতে ত হারজিত আছেই,—শরৎ য় হারিয়াই যাইবে।

শরতের এই প্রস্তাবে বিজনও অসন্তুষ্ট ইল না—শরৎকে হারাইয়া আপনার পৌরুষ গৌরবে সে যে রাজকুমারীর নিকট সম্মান লাভ করিবে সে বিষয়ে সে খুবই আশ্বস্ত বোধ করিল।

বালক একদলের খেলা হইয়া গেলে—প্রেসিডেণ্টের আদেশমত শরৎ ও বিজন-কুমার রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। গৎকা খেলায় তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

উভয়েরই ইংরাজি সাজ, উপরের কোটটা মাত্র খুলিয়া রাখিয়া, তাঁহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া লইয়া গৎকা ও শৃঙ্গ হস্তে খেলার স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দাঁড়াইলেন। দুজনেই দেখিতে ভাল, শরৎ একটু দীর্ঘকায় এবং দৃঢ়পেশী,—বিজনকুমার ধনীপুত্র, তাহার ক্ষীর-নবনী-গঠিত দেহ অপেক্ষাকৃত কোমল সুকুমার ও লাবণ্যপূর্ণ। বিবাহ সভায় সৌকুমার্য্যে বিজনকুমার নারী-সমাজে যে একচেটিয়া প্রশংসালাভ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর রুচি একটু অদ্ভুত বলিতে হইবে। শরতের মাংসপেশীবহুল দেহগঠনে একটা পৌরুষিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নারীবক্ষ সহসা একটা অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব মোহময় সুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—তাহার সম্মুখে সত্যই কি একটা জীবনোপন্যাস অভিনীত হইতেছে! এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন কোন অনামিকার তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ! মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন উপলব্ধি করিল, সেই অনামিকা সে নিজে। একটা মোহময়, সুখময় চাঞ্চল্য-আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

উভয়ের যুদ্ধ চলিল—পরস্পরে আত্মরক্ষা করিয়া পরস্পরকে পরাজয় করিবার জন্য—কত ছলে কত কৌশলে তাহাদের লাঠি ও শৃঙ্গ পরিচালিত হইতে লাগিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা দেখিতে লাগিল।

একবার শরৎকুমার সহসা ওষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত হইয়া উঠিলেন। সে আঘাত-ব্যথা নিজের বক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী অনুভব করিয়াও, তাহাতে কাতর হইল না,—বরঞ্চ এই শোনিতপাতেও সে একটা সুখ অনুভব করিল। এমন কি তাহাকে মুমূর্ষু দেখিতেও সে প্রস্তুত—কিন্তু পরাজিত দেখিতে চাহে না।

দর্শকগণের দারুণ ঔৎসুক্য-আবেগের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। শরৎকুমার বিজনের হস্তের লাঠি—বিনা-আঘাতে হস্তগত করিয়া লইলেন, বিজনের সহিত যে সকল দলবল আসিয়াছিল তাহারা নতমুখ হইয়া রহিল;—আর এ পক্ষে বন্দেমাতরম্ শব্দে সভা ফাটিয়া উঠিল—ইংরাজগণও সেই সঙ্গে হুররে বলিয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মোহ তখনও ভাঙ্গে নাই, শরৎকুমার বিজিত-গৎকা মঞ্চে আনিয়া তাহাদের পদতলে রাখিয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। ইহাদের জন্য আগে হইতে পুরস্কার ঠিক ছিল না, রাজা নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া তাহার হস্তে পরাইয়া দিলেন,—আর জ্যোতির্ম্ময়ী টেবিলে রক্ষিত একগাছি ফুলমাল্য লইয়া সহাস্য বদনে তাহার কণ্ঠে অর্পণ করিল।

ইহার পর বালকদিগের পুরস্কার বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

* * * * *

মহারাণী পরদার মধ্য হইতে সব দেখিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন—বিজনের গলায়, এই মালা পড়িবে। তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত ভাবে সুখী হইতেন,—কিন্তু তাহা হইল না,—তবুও নিতান্তই যে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহাও নহে। জহরীর নিকট জহরের অনাদর হয় না। শরৎকুমারের বীরত্বে মনে মনে তিনি তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নাতনীকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"স্বয়ম্বরা হলি নাকি রে? সন্ন্যাসী বই আর কি কোন বর মিলল না—আমার নাতনীটির?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ লজ্জায় লাল না হইয়া মলিন হইয়া গেল। এই মাল্যদানের অর্থ কি লোকে এইরূপ করিবে নাকি! ইহা ত তাহার স্বপ্নেরও অগোচর! আর শরৎকুমার? তিনি কি ভাবিয়াছেন? অন্যে যে যাহাই ভাবুক—শরৎকুমার কখনই এরূপ ভাবিবেন না!

তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে ভারী একটা অস্বস্তিকর লজ্জা বেদনা অনুভব করিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষবাস।

(ফরাসী হইতে)

এক্ষণে ভারতের প্রধান প্রধান চাষ কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

এক পক্ষে, অধিবাসীদের খাদ্যের জন্য যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যথা:—চাউল, জোনার তৈলজ শস্য, ইক্ষু। কেবলমাত্র নদ-নদীর ব-দ্বীপ-প্রদেশে কিংবা নদীর তীরে ধান্য উৎপন্ন হয়—এবং (ব্রহ্ম দেশ গণনার মধ্যে না-আনিয়াও) এই ধান্যোৎপন্ন চাউল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। যে সকল প্রদেশ তত সমৃদ্ধ

নহে, সেই সব প্রদেশের লোক জোয়ারা, বাজ্‌রা ও শাকসবজি খাইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড হইতে প্রতি বৎসর ২০॥০ লক্ষ টন্ অশোধিত চিনি উৎপন্ন হয় এবং তামাকের চাষও খুব পরিব্যাপ্ত। সাধারণত 'ছোট' চাষ—খুব 'ছোট' চাষেরই প্রাধান্য।

পক্ষান্তরে, রপ্তানির উৎপন্ন দ্রব্য:—তুলা, পাট, নীল, আফিম, রেশম, চা, সিন্‌কোনা, কাফি, এবং সেই সব শষ্য যাহা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের বাহিরে দেশীয় লোকের ব্যবহারে আসে না।

প্রায় সর্ব্বত্রই বৎসরে দুইবার ফসল হয়।

*
* *

উপরে চাষের কথা সাধারণভাবে বলিয়াছি, এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশের চাষের বিশেষ বিবরণ বলিব।

বঙ্গদেশ

সমুদ্রের কূল। সেই সব জলাভূমি যেখানে খাগ্‌ড়া জন্মায়, সেই সব অনূপ দেশ যেখানে শীর্ণ, তাপদগ্ধ বায়ুদলিত দুর্লভ গুল্ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সব দীর্ঘ বিল যেখানে বকেরা ডুব দিতেছে, যেখানে হাজার হাজার বক এক পায়ের উপর ভর দিয়া ঘুমাইতেছে, কিংবা ডানা ঝাপ্‌টাইয়া পরস্পরের সহিত লড়াই করিতেছে, আর একদিকে শুকনীরা ঠোঁট্ দিয়া পালক খুঁটিতেছে, কিংবা তাহাদের লম্বা নির্লোম গলা বাড়াইয়া রহিয়াছে।

সমুদ্র হইতে দূরে, নারিকেল, তাল, সুপারী, খেজুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি। খাল নদীর উপর দিয়া বড় বড় নৌকা মাল লইয়া সারি সারি চলিয়াছে। কতকগুলি নৌকা বাষ্পাকৃতি বৃহৎ পাল তুলিয়া তর্‌তর্ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর ধারে গ্রাম। গ্রামের ধূসরবর্ণ কুটীরগুলি কলাগাছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। জলের ভিতর পাট ও ধান; মাঠে মস্‌লার গাছ, আফিম ও নীলের চারা। আকাশ কখন কখন ঘন নীল, অনেক সময়ই বাষ্পপূরিত। সায়াহ্নে চমৎকার শোভা।

প্রথমে অগ্নিশিখার আকারে সূর্য্য অন্তর্হিত হয়; তাহার পর সমস্ত আকাশ রক্তিমাভ স্থূল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সূর্য্য কোথায় অস্ত যাইতেছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ আকাশের মুক্ত বায়ু মেঘগুলাকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। গভীর নীলিমা; নক্ষত্র সকল ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে; এবং চন্দ্রমা ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া, খাল, বিল, ধানের ক্ষেত কনক-কিরণে প্লাবিত করে।

আরও আগে অভ্যন্তর প্রদেশে মন্থরগতি নদীর ধারে, মধুর তরঙ্গ-লীলা। লাল-খাপ্‌রায়-ছাওয়া মাটির কুটীরসমন্বিত গ্রামগুলি সুন্দর গাছের ছায়ায় অবস্থিত। আম, বট, পিপ্পল, তেঁতুল, তাল, কার্পাস—এই সমস্ত গাছের কুঞ্জবন। মাঠে আফিম, নীল, তুঁতের চারা। বরাবর জলের ধারে ধারে বিভিন্ন জাতীয় ধান্য।

অশ্রুতপূর্ব্ব উর্ব্বরা ভূমির উপর অধিষ্ঠিত, আইলের দ্বারা সুরক্ষিত বাঙ্গলার চাষা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ

খুবই বিরল; এক শতাব্দী যাবৎ কেহই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় নাই।

কি দেশীয় কি য়ুরোপীয় সকল জমিদারেরই সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি। বিস্তারে লক্ষ পর্য্যন্ত বিঘা ভূমি হইতে পারে।

একজন উপন্যাস-লেখক, এক ধনী জমিদারের বাসস্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

(নগেন্দ্রের বাড়ীর) বাহিরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎপুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গো-গণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপান আরোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারাণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত। অতিশয় উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ড দ্বয়ের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতালা কোঠা। এক সারিতে দফ্‌তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান, ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারী বাড়ী।" উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান, আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চকমিলান চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময় বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান দরদালান পায়রায় ভরিয়া গিয়াছে, কুঠারী সকল আস্‌বাবে ভরা—চাবিবন্ধ।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট নাটমন্দির। তিন পাশে দেবতাদের পাকশালা পূজারিদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে স্থলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা :চন্দন তিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে; চাকর-দাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদের সহিত কথাই কহিতেছে, অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসীঠাকুর জটা এলাইয়া চীৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু একহাত উচ্চ করিয়া দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৌরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা

ভাগবদগীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। মাথায় আর্কফলা নাড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া..... কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগীরঞ্জন রসকলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে .....গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোর-বয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।.....

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য; তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্চ্চায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। .....এই মহল নূতন নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটী।

তাহার পাশে পূজাবাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত, ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী আত্মীয় কুটুম্ব কন্যা মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীর ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা কলকল করিত এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন .....ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরও জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জাল দিয়া পা গোট করিয়া প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন, কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রু-লোচনা হইয়া বাড়ীর সমস্ত পরনিন্দা করিতেছে.....কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া দশনাবলী বিকট করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া আছেন..... কোথাও বা বড় বটী পাতিয়া বামী ক্ষেমী .....লাউ কুমড়া বার্ত্তাকু পটোল শাক কুটিতেছে.....এই তিন মহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান-পথে নীলমেঘতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীর বেষ্টিত....."

*
* *

আসাম।

ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহে, বর্ষার জলে আসামের ভূমি উর্ব্বরা হইলেও উহার আর্দ্রতা দেশের পক্ষে হানিজনক, এমন-কি যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ দেশে বাস করিয়াছিল সেই মোগলদের পক্ষেও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন, এই উপত্যকার উত্তর প্রদেশটি প্রায় অনালোড়িত অপরীক্ষিত; দক্ষিণ

আসামে চাউল, আফিম, তামাক, রাই-সর্ষে বিশেষত চা উৎপন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আসামের চা আজকাল চীন ও সিংহলের চায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে।

* * *

হিমালয়!

বিশাল বিস্তৃত সমভূমি হইতে পর্ব্বত সকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ স্থানে শীত-দেশের উদ্ভিদ, মাঝামাঝি জায়গায় নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফুল উদ্ভিদ, তাহার পর উষ্ণদেশের উদ্ভিদ যাহা বৃষ্টির প্রাচুর্য্য-বশতঃ খুব সতেজে বাড়িয়া উঠে। কোথাও বা স্রোতের তোড়ে ঢালুস্থানসকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, কোথাও বা উর্ব্বরা উপত্যকা প্রসারিত। বেগ্‌নী রঙের ফুল-বিশিষ্ট রডোডেন্‌ড্রন, দেবদারু, কোমল হরিৎবর্ণের বাঁশ, "সিডার," কৃষ্ণপ্রায় হরিদ্‌বর্ণের পাইন-গাছ, বাদাম-গাছ, মেপ্‌ল্ গাছ, চেস্‌ট্-নট্ গাছ, এবং শৈবাল, ও পরগাছা,—যাহা উর্দ্ধোত্থিত বাষ্পের দ্বারা, ও পর্ব্বতগাত্রে লম্বমান মেঘের দ্বারা সর্ব্বদাই আর্দ্র। বসন্তকালে 'ক্লেমাটিস্'-লতা, মেড্‌লার-গাছের সাদা ফুল; শরৎকালে, বেগ্‌নী ও ধূমল বর্ণের ভার্জিনিয়া-লতা। বর্ষাকালে ছোলার ফর্সা ক্ষেত, বাজ্‌রার লাল রঙের ক্ষেত, দার্জিলিঙ্গের কাছাকাছি চায়ের বাগান। প্রস্তরের উপর স্রোতস্বিনী গর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের উচ্ছ্বসিত শুভ্র ফেনে শতবর্ণের অরণ্য-ভূমিকে ধবলিত করিতেছে, বড় বড় ফর্ণের মধ্যে ও গাছের মধ্যে রডডেন্‌ড্রন বন আধিপত্য করিতেছে —এই সমস্তের উপরিভাগে সরু সরু সুঁড়ি পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; বোঝা-বৃজকির বোঝাই লইয়া অশ্বতর-পৃষ্ঠ টাট্টুঘোড়া, গরু ও ভেড়া উপরে উঠিতেছে। তাহাদের পিছনে মোগলজাতীয় চালক দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, চ্যাপ্‌টা-মুখ, বাঁকা চোখ গ্রীষ্মকালে উহারা নগ্নপ্রায়, শীতকালে দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও চর্ম্মাদি পরিধান করে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। একই প্রকার পরিচ্ছদ, কিন্তু তীব্র শীতেও বুকের কাছে কাঁচুলী গোল করিয়া কাটা ও খোলা। তাহার মধ্য হইতে কঠিন ও ঈষৎ নীলাভ বক্ষদেশে দেখা যাইতেছে। সুঁড়ি পথের বাঁকে, সূর্য্য জলদ-জাল বিদ্ধ করিয়া, কোনও এক শৈলের কঠিন গাত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে,—উহার উপরিভাগ বরফ-নদীর ঘর্ষণে মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। এরই মধ্যে সূর্য্য মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে; আরও ঘন হইয়া কুয়াসা নীচে নামিতেছে, পথিককে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখন ঘোড়ার চালক-দিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ঘোড়াদিগকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবলই উপরে উঠিতে হইতেছে, ক্রমাগতই উপরে উঠিতে হইতেছে। একটা দম্‌কা বাতাস আসিলে তাহার বেগে নীচে পড়িয়া যাই আর কি! এইবার পর্ব্বতের গ্রীবাদেশ! এইখানে রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া থামিতে হয়.....বৃক্ষশাখা হইতে লতা ঝুলিতেছে, কুয়াসা ক্রমশ পিছে হটিয়া যাইতেছে—বৃক্ষশাখার নীচে, একটা ঝরণা

যেন হঠাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১০টা, ২০টা, ১০০টা খুব উজ্জ্বল পাথরের চাক্‌লা। ঝটিকার দ্বারা তাড়িত হইয়া, মেঘগুলা ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর-আকাশে একটা প্রজ্জ্বলিত রেখা। উহা কি মেঘ? না, পর্ব্বত-গাত্রের একটা বিশেষ অংশ হইতে আলোক হঠাৎ প্রতিফলিত হইয়াছে। ওগুলা কি শৈলমালা? অত উচ্চ অসম্ভব! চারিদিকে পর্ব্বত। বাতাসের জোর দ্বিগুণ বাড়িল, মেঘগুলা আরও দ্রুত ছুটিতেছে। দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কুয়াসার মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র। কোথাও অরণ্য; কোথাও ভূগুদেশের পশ্চাদ্ভাগে উপত্যকা; উপত্যকার উপর দিয়া কতকগুলি স্রোতস্বিনী বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও কতকগুলি শৈলপিণ্ড একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা ভীষণ বরফ্-নদী। একটা বৃহৎ ফাটল। সমস্ত শৈলমালা—শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ শিখর উচ্চতায় ৯০০০ metre; যে চূড়া সবচেয়ে নীচু তাহারও মাথা Mont Blancকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, গৌরীশঙ্করের তিনটা শিখর এবং ঐ দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘার মহাবল প্রস্তরখিলান। অস্তমান সূর্য্য এই বরফ-সমুদ্রকে অগ্নি-সমুদ্রে পরিণত করিয়াছে। মনে হয় যেন রক্তবর্ণ তরঙ্গরাজি টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, ফুলিয়া উঠিতেছে। ধীরে ধীরে দীপ্তি কমিয়া আসিতেছে: বরফ-নদীগুলা প্রথমে লাল, তাহার পর বেগ্‌নী, তাহার পর ধূমল-বর্ণ হইয়া উঠিতেছে,—অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হইতেছে। মেঘেরা তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি, কুয়াসা; আর কিছুই দেখা যায় না; যে গাছে ঠেসান দিয়া আছি, সেই গাছটি পর্য্যন্ত আর দেখা যায় না।

* * *

হিন্দুস্থান

বৃহৎ উর্ব্বরা সমভূমি; গঙ্গা ও তাহার শাখানদী সকল উহার উপর দিয়া প্রবাহিত। ধান্য, ইক্ষু, আফিম, নীল, তৈলাক্ত শস্য; ছোলা, ভুট্টা, সর্ষপ, বাজরা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গম্। উচ্চ তৃণপুঞ্জের মধ্যে, বহুসংখ্যক গরুর পাল। কালো কালো মহিষ, মনে হয় যেন ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক—এবং ছুচাল ককুদ-বিশিষ্ট ছোট ছোট গরু চাঁদোয়া-দেওয়া গাড়ী অথবা লাঙ্গল টানিতেছে—লাঙ্গলের ফলা কাঠের, ফলার মুখ লোহার। সর্ব্বত্র, সমভূমি হইতে উচ্চ বাঁধের দ্বারা খালসকল সংরক্ষিত; কূপ; গরুরা ক্যাঁচ্-ক্যাঁচে জল-তোলা যন্ত্রগুলাকে লইয়া ঘুরপাক দিতেছে; লোকগুলা নগ্নপ্রায়, —সাদা ধুতি কালো গায়ে জড়ানো—বড় বড় মসকে জল বহিয়া লইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর হইতে, শরৎ কালে, হিমালয়ের শুভ্র শৈলমালা দৃষ্টি-গোচর হয়—ঐ সকল পহাড়ের উপর জমিদারদিগের বাসস্থান: হিন্দুধরণের মণ্ডপ-গৃহ, ইংরাজ গথিক-ধরণের দুর্গপ্রাসাদ; উদ্যান উপবনে, বংশ, বট তালাদি বৃক্ষ রোপিত। বানর, পেচা কাক ও টিয়া পাখিতে উদ্যান উপবন পরিপূর্ণ।

* * *

পঞ্জাব

পঞ্জাব একটা বৃহৎ একঘেয়ে সমভূমি; ঢেউ-খেলানো ভাব জমিতে আদৌ নাই। কেবল নদী-সমূহের বৃহৎ গতি-পথ-সকল ঐ সমভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। নদীগুলির তেমন গভীরতা নাই; এমন-কি বসন্তকালে একেবারেই শুকাইয়া যায়। মাটি খড়িময় বা বালুকাময়। শুষ্ক আব্-হাওয়া, শীতকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালে জ্বলন্ত উত্তাপ। যে উত্তরাংশ, হিমালয়ের শেষ সম্বলস্বরূপ ক্ষুদ্র পাহাড়-অঞ্চলের সহিত সংস্পৃষ্ট, সেই উত্তরাংশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মাটি তেজালো; সর্ব্বত্রই বৃক্ষ, পুষ্প, মাঠ বেশ কর্ষিত; গ্রামগুলি লোকাকীর্ণ। যে সময় আফ্‌গান ও মারাঠার আক্রমণ-ভয়ে গৃহ দুর্গাকারে নির্ম্মিত হইত, এখনকার গৃহগুলি সেই সময়কার মতো। গম, জোয়ারা, তৈলজ শস্য, নীল; কোন কোন স্থানে ধান্য; তা ছাড়া খেজুর, আম, কমলানেবু, কলম্বী নেবু, ডুমুর; শীতকালে, নদীর খোলে তর্মুজ। পাহাড় হইতে যতই দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই সেখানকার বর্ষা কম হইয়া পড়ে। বন ও গ্রাম অতি বিরল। দক্ষিণ ভাগে কেবল নদীর উপত্যকাগুলিই উর্ব্বরা। এই সকল উপত্যকার অন্তবর্ত্তী স্থানে জলাভূমি—এই ভূমিতে বৃক্ষাদি খর্ব্বাকৃতি,—এইখানে অসংখ্য গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, ছাগল চরিয়া বেড়ায়। তাহার পর রাজস্থানের মরুভূমির আরম্ভ; সূর্য্যদগ্ধ ধূলারাশির মধ্যে এইখানে প্রবেশ করিতে হয়—বায়ুর ঘূর্ণিপাকে এই ধূলারাশি আনীত হয়।

*
* *

কাশ্মীর

অদ্ভুত আকৃতির কতকগুলি সূচাগ্র শিখরের নীচে, বরফ-নদী সমূহ, দেবদারু সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, বিতাট বা ঝিলমের প্রসিদ্ধ উপত্যকা। আব্‌হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। নদী, খাল; খালের ধারে ধারে পপ্‌লার-ঝাউ, 'এল্‌ম্' ও 'প্লেন্' গাছ; ফলের বাগান, ধান্য যবাদি রোপিত ক্ষেত্রভূমি; বাদাম গাছের নীচে গ্রামসমূহ; কাঠের ঘর; এই সকল ঘরে বলিষ্ঠ, ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘকায় পুরুষ এবং ফর্সা-রঙ, মহৎভাবব্যঞ্জক ও সুপরিমাণ মুখশ্রীবিশিষ্ট রমণীরা বাস করে।

সিন্ধুদেশ

পশ্চিমে পর্ব্বত, দক্ষিণে জলাভূমি (সিন্ধুনদীর ব-দ্বীপ), পূর্ব্বদিকে বালুময় মরুভূমি। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বেলুচি সর্দ্দারদিগের জন্য মৃগয়ার উপবন; উদাসীন ও অলস-প্রকৃতি সিন্ধীরা পূর্ব্বে ঐখানে তাহাদের গো-মহিষাদি রাখিত। ইংরাজেরা বড় বড় পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জলাভূমি সকল, এমন-কি মরুভূমিরও কিয়দংশ উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এই সকল ভূমি হইতে গম, ছোলা, বাজ্‌রা, তৈলজ শষ্য, শণ, আফিম ও তামাক উৎপন্ন হয়, শরৎকালে চাউল, মক্কা, তুলা, নীল ও ইক্ষু।

*
* *

গুজ্‌রাট

নর্ব্বদা ও তাপ্‌তীর সমৃদ্ধ উপত্যকা। ইংলণ্ডের অনুরূপ ভূদৃশ্য; বেশ জল-সেচিত বিস্তৃত প্রান্তরে সুন্দর বৃক্ষাদি; কিন্তু তা ছাড়া আবার নীল সমুদ্র, উপকূলে গভীর ঢালু খাত, বড় বড় তালজাতীয় বৃক্ষ এবং প্রাচ্যদেশের সূর্য্য। ঝোপ্‌ঝাড় ও গুল্ম-বেড়ার মধ্যে গৃহগুলি অবস্থিত; গৃহের ছাদ লাল খাপ্‌রার; বটের, কাদাখোঁচা, বুনো হাঁস, কাঠবিড়ালী, হাজার হাজার টিয়া পাখী,—সকাল-সন্ধ্যায় উহাদের চীৎকারে কাণ ঝালাপালা; লালমাথাবিশিষ্ট সারস পক্ষী এবং শাম্‌লা ও সাদাটে রঙের অসংখ্য বানর। কার্পাস, রেশম, নীল, ফলের গাছ, ধান্য এবং যবাদি অন্যান্য শস্য।

*
* *

মধ্য-ভারত

পূর্ব্বদিকে, সাতপুরার বৃহৎ মালভূমি; পর্ব্বতের উপত্যকা; পর্ব্বতগুলা খাড়া উঠিয়াছে এবং নিম্ন-সমভূমির দিকে নামিয়া গিয়াছে; গোঁদ্‌জাতীয় লোক এবং দ্রাবিড়ীয় ও আর্য্যদিগের কর্ত্তৃক বিতাড়িত অন্যান্য জাতির আশ্রয়স্থান।

পশ্চিম দিকে, নর্ব্বদা, তাপ্‌তী এবং গোদাবরীর শাখাসমূহের সমৃদ্ধ উপত্যকা-সমূহ; গম, তুলা, রেশম, তৈলজ শস্য, আফিম।

*
* *

করমণ্ডল উপকূল

প্রথমে, দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অনুর্ব্বরা ভূমি, দুইটি উর্ব্বরা ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছে; কৃষ্ণা ও গোদাবরীপ্রসিক্ত প্রদেশ; উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে জল-সেকের বৃহৎ বৃহৎ পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐ-সকল প্রদেশ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে খেজুর, তামাক, তুলা ও ধান্য উৎপন্ন হয়।

আরও দক্ষিণে একটা বিস্তৃত সমভূমি; ঐখানে গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ বৃক্ষাদি জন্মে; ত্রিচনপলির শৈলদৃশ্য; নিম্নসমভূমি উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কাবেরীর ব-দ্বীপ; ব-দ্বীপ-খণ্ডে অসংখ্য খাল, ফলের বাগিচা, তামাক, ধানের ক্ষেত, এবং উচ্চ তালজাতীয় বৃক্ষসকল শুভ্র আকাশের গায়ে যেন ছবি-আঁকা।

*
* *

মালাবার উপকূল

'ঘাট' নামক দীর্ঘ গিরিমালা; তাহার শৈল-দুর্গপ্রাসাদ, অলিন্দ, বনসঙ্কুল ঢালু স্থান সকল নীলসমুদ্রের উপর সগর্ব্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উত্তরদিকে আরও রূঢ় ধরণের উদ্ভিদ; কুর্গ্‌-প্রদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ অরণ্য, বটবৃক্ষের গায়ে লতা জড়াইয়া আছে; ৩০, ৪০, গজ উচ্চ বাঁশের ঝাড়; তাল বৃক্ষাদিকে ছাড়াইয়া বিবিধ রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিয়া আছে। হাতী, বাঘ, বুনো মহিষ, হরিণ, চিতা,—লতায় জড়ানো বৃক্ষাদির মধ্যে অবস্থিত।

ঘাট এ সমুদ্রের মাঝে, একটা বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি; সেখানে খুব গরম দেশের সমস্ত ফসল সংগৃহীত হয়—এমন-কি দক্ষিণ অঞ্চলে কফিও জন্মে।

*
* *

কানারী দেশ

কানারীর অভ্যন্তর প্রদেশের মাটি কালো; ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীরা এই জমি চাষ করে; উহাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। আরও দক্ষিণে, ঘাট ও তিলেভেলীর সুন্দর মাঠ-ময়দানের মাঝে একটা বিস্তৃত শুষ্ক সমভূমি।

*
* *

ব্রহ্মদেশ

বৃষ্টি-বহুল ব্রহ্মদেশের চারটি পৃথক অঞ্চল। ইরাবতীর উপত্যকা; ইরাবতীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ; উত্তরদিকে শাণ্ দেশের পাহাড়। পশ্চিমে যোমাগিরি; যোমা-গিরি ও সমুদ্রের মাঝে একখণ্ড বিস্তীর্ণ সমভূমি—অ্যারাকান্, শাল্ পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে আর-একটা সমভূমিখণ্ড—তেনাসেরিম। পর্ব্বতের উপর গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ অরণ্য; সেগুনগাছ, বাঁশ, তালজাতীয় বৃক্ষ, গরম-ভিজা জায়গায় পাতা-বাহার, শৈবাল, পর্‌গাছা। ইরাবতীর উপত্যকা, অ্যারাকান্ ও তেনাসেরিম সমস্ত মিলিয়া একখণ্ড বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত; কোন কোন স্থানে তামাক, গরমমশ্‌লা, তৈলজ শস্য।

*
* *

অতএব, ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে সকল প্রকার ভূমি, সকল প্রজার আব্-হাওয়া, অতি বিচিত্র প্রকারের উৎপন্ন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধিসম্বন্ধে যে এত গর্ব্ব করা হয় তাহা নিতান্তই ভুল। কত শুষ্ক অঞ্চল! মধ্যদেশের পর্ব্বত, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল, সিন্ধুদেশ, রাজস্থান ও বেলুন ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি। এমন কত অঞ্চল আছে যাহা অর্দ্ধশতাব্দী এমন-কি এক শতাব্দী ধরিয়া খাটিলেও আবাদ করিতে পারা যাইবে না! আসামের উত্তরাঞ্চল, যে অংশ ব্রহ্মদেশ হইতে আসামকে পৃথক করিয়াছে,—সেই সমস্ত প্রদেশ, ও মধ্য-প্রদেশ সমূহের বনজঙ্গল। এবং ভারতের যে সকল প্রদেশ খুব উর্ব্বর সেখানেও শুষ্কতার আশঙ্কা। একবার যদি যথোচিত বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলেই যোজন-যোজন ভূমি ফসল-শূন্য হইয়া পড়ে: জলসেকের পূর্ত্তকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিতে এখনো শত শত বৎসর লাগিবে ও ক্রোড় ক্রোড় টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইংলণ্ড এই উদ্দেশে প্রভূত পূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যেন উহা ঐ কাজের একটা আদ্‌রা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির তিরোধান

(স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহান্তে)

ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা; আন্‌মনে হায়; সেই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠ্‌ল নিমেষ তরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্ পুবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যেজে,
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে।

ধনজনের ধার্‌ত না ধার, চিন্‌ত তারে অল্প কটি লোকে,
নয় দারোগা নয় খেতাবী,—খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে;
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তায় দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চলে,—রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে।

বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে শরৎ-প্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে;
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধরে,—
কবি জানে,—পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হ'য়ে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সোনার কাঠি

(গল্প)

বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে আমি। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বিয়ে হল। স্বামী দেখতে যেমন, গুণও তাঁর তেমনি! পয়সা-কড়ি বেশ আছে, তবে তিনি একা; সংসারে আত্মীয়-স্বজন তেমন-কেউ নেই।

ফুলশয্যার রাত্রে আমার ব্যবহারটা তাঁ অত্যন্ত রূঢ় ঠেকেছিল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলুম। তিনি যখন আদর করে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কনক, এই শূন্য সংসারটিকে সব দিক দিয়ে তুমি পূর্ণ

করে তোলো—"তখন সে কথা শুনে কোনমতে আমি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না। আমার সমস্ত অতীতটা বুকের উপর এমনি পাষাণ-ভার চেপে ধরলে যে, সহস্র চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। দুনিয়াটাকে তখন এমনি বিশ্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলুম যে, আমার স্বামী,আমার দেবতা,—তাঁর এই মধুর আদর-টুকুকে বুকের মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করতে পারলুম না—এমনি অভাগী আমি! স্বামী আমায় বললেন, "কনক, আমি অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া, যখন খুব ছোট, তখন মা-বাপ দুই হারিয়েছি। আরাম পাব বলে সংসার পেতে বসব, এ কথা কোনদিন আমার মনে হয় নি। লোকের কথায় একটা অত্যন্ত হাল্কা কৌতূহল নিয়েই তোমায় দেখতে গেছলুম। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, তাই স্বার্থপর আমি তোমায় এই শ্মশানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ্মী তুমি, তোমার রূপ আর লাবণ্যের জ্যোৎস্নায় এ শ্মশানে আলো জাগিয়ে তোলো, তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল সৌরভে চারিধার ভরপূর করে দাও, আমি মুগ্ধ হয়ে তাই দেখি।"

রূপ আর লাবণ্য! পুরুষ কি এই দুটোকেই চিনেছে শুধু রে! নারীর এই যে মন—ওগো, সেই মনটাকে কেন তোমরা অবহেলা কর? কি তুচ্ছ রূপ আর লাবণ্যের কথা তোলো,—শুনে আমাদের লজ্জা হয়! সে ত দেহের উপর একটা পালিশ মাত্র, রোগে তা ঝরে যায়, একটু তাপেই সে ম্লান হয়ে পড়ে—কিন্তু এই মন,—এ যে রাজার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও ঢের দামী, ঢে বেশী যে তার শোভা!

স্বামীকে মুগ্ধ করবার মত রূপ আ লাবণ্য আমার অঙ্গে প্রচুর ছিল, আমি জানতুম,—তাই তার উল্লেখে একটুও গ গেলুম না! স্বামী মুগ্ধ চিত্তে মুখে চুম্ করলেন; আমি পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত অচঞ্চল বসে রইলুম। স্বামী যেন একটু ব্যথিত হলেন, বুঝলুম,—একটা নিশ্বাস চেপে তিনি বললেন, "শুয়ে পড়।"

... ...

আমায় সুখে রাখবার জন্য স্বামীর সে কি চেষ্টা পড়ে গেল! দাসী-চাকরের উপ ঘন-ঘন নিয়ম-জারী হতে লাগল,—নিজে তিনি তদ্বিরের ঘটা বাধিয়ে দিলেন! তা উপর দামী গহনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ তিনি মু ফেললেন,—হীরে-পান্না-চুনি-মুক্তোর ভা আমি নুয়ে পড়লুম! পাথরের মেজেয় চ বেড়ালে পাছে পায়ে ব্যথা লাগে, তাই অর্ডা দিয়ে পায়ের জন্য জুতো-মোজা আনি দিলেন,—কোন্ কাপড়টি, কোন্ জামা কখন্ পরলে আমাকে ভালো মানায়, হরে রকম কাপড়-জামা আনিয়ে আমায় তা পরি ঠাউরে দেখে-দেখে কাপড়ে-ব্লাউসে তোর আমার ঠেসে ফেললেন। একটু যদি চুপ করে আকাশের পানে কখনো চেয়ে বসে থাকতুম ত তিনি অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, বলতেন, "তোমার মনটা একটু খারাপ দেখচি,—যাও, দুদিন তোমার বাবার ওখানে বেড়িয়ে এসোগে!" সত্যি, এত আদর আমি কখনো পাইনি! আমার লজ্জা হত! আমি

মন অপ্রতিভ হয়ে পড়তুম। কৃতজ্ঞতায় ক আমার ভরে উঠত, তবু একটু মুখের সি দিয়েও তাঁর কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে ারতুম না, এ কি কম আপশোষ! অত াদরে প্রাণে আমার বেদনা বাজত! কিন্তু পায় ছিল না, উপায় ছিল না! আমার কের মধ্যে কি কাঁটা যে দিবারাত্রি খচ্ খচ্ রছিল! আমি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর সে ালবাসা অনুভব করতুম! আমার সমস্ত তীত তখন নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমার বুকে সহ্য শর নিক্ষেপ করত। তাই যখন স্বামীর স আদরের আতিশয্যে আনন্দের উত্তেজনায় ামার অভিভূত মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়বার থা, তখন সেই ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের বিষে ভতরটা আমার জ্বলে খাক্ হয়ে উঠত! আমি চুপ করে পড়ে থাকতুম! নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসত,—চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবীটা তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সব অনুভূতি নিয়ে কোথায় মিলিয়ে যেত!

* * * * * * * *

এমনি করেই দিন কাটছিল। সেদিন বিজয়া-দশমী। সন্ধ্যার সময় আমি একখানা শাদা কাপড় পরে ঘরের কোণে কি-একটা বই নিয়ে বসে ছিলুম। স্বামী ঘরে এলেন, পিছনে চাকর; চাকরের ঘাড়ে প্রকাণ্ড এক পাৎলা টিনের বাক্স। সেটা ঘরে রেখে চাকর চলে গেলে স্বামী বাক্সটা খুল্‌তে খুলতে বললেন, "এতে তোমার কাপড় আছে, বোম্বাই থেকে আনিয়েছি, আর এই নাও, এক ছড়া হার।" সুন্দর একছড়া মুক্তোর মালা। মালাটা নিজের হাতে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে স্বামী বললেন, "তোমার পছন্দ হয়েছে?"

হাঁ-কি না, কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না। আমি শুধু একবার তাঁর পানে চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম—আহা, তাঁর চোখে-মুখে কি সে আগ্রহ! কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর পানে চেয়ে থাকতেও পারলুম না—কে যেন মাথাটা আমার জোর করে ধরে নুইয়ে দিলে। তিনি কি বুঝ্‌লেন, জানি না,—শুধু ভারী রকমের একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমার সর্ব্বশরীরে কে যেন কাঁটার চাবুক মারতে লাগল। ভিতরটা আমার হাহাকার করে উঠ্‌ল। আমি তখন সেই হারটিকে বুকের উপর মুঠি ভরে চেপে ধরে মেজেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম, ওগো দেবতা আমার, স্বামী আমার, এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো। আমি তোমার এত আদর সহ্য করতে পারছিনা। কেন তুমি এ অভাগীকে এমন করে আদর কর গো? তুমি জানো না, আমি যে মহাপাতকিনী, আমার পাপের সীমা নেই! আমি এখানে তোমার এই ঘরে বসে আছি, এতে আমার নিশ্বাসের হাওয়ায় তোমার ঘর বিষিয়ে উঠছে, পবিত্র মন্দির কলুষিত হচ্ছে! তোমায় যে এই ফিরিয়ে দিচ্ছি, ওগো, সে অহঙ্কারের জন্য নয়, তেজের জন্য নয়,—আমার আবার কিসের তেজ, কিসের অহঙ্কার! তা নয় গো, তা নয়!

ভাবলুম, না, সব কথাই বলব! কিসের ভয়! অনর্থক আর এ কৃতজ্ঞতার ভার বাড়িয়ে তুলবো না! আমায় যদি ভিখারিণী হয়ে পথে

দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষোভ নেই, কিন্তু তাঁর কোমল চিত্তে আর এমন আঘাত দেব না, কখনো না!

উঠে ভাল করে চুল বাঁধলুম, সাবান মেখে গা ধুয়ে এলুম, স্বামীর-দেওয়া নতুন কাপড়খানি বাক্স থেকে বার করে পরলুম, বাছা-বাছা গহনায় গা সাজালুম, তারপর সুইচ্ টেনে দশ-বাতির ঝাড়টা জেলে দিলুম। দিয়ে আয়নার সামনে একবার এসে দাঁড়ালুম—হাঁ, ঠিক! আজ বিদায়ের পূর্ব্বে দেহের রূপকে ষোল কলায় ফুটিয়ে তুলে স্বামীর পায়ে পাপের ভার নামিয়ে দেব! তারপর তাঁর পায়ের ধূলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। গঙ্গায় অতল জল আছে, আশ্রয়ের অভাব কি!

রাত্রি তখন ন'টা। দাসী এসে বললে, বাবু আজ গাড়ী করে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না? তা সোফার দু'ঘণ্টা হল, গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই বাবু বলে দিলেন, তোর মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে আয়, গাড়ী চলে যাবে, না, তিনি বাগবাজারে বেড়িয়ে আসবেন?

বাগবাজারে আমার বাপের বাড়ী।

আমি বললুম, তোর বাবু কোথায় রে?

দাসী বললে, দোতালার বৈঠকখানায়।

—কি কর্‌ছেন?

—কেদারায় শুয়ে কি বই পড়ছেন।

আমি বললুম, কাছে আর-কেউ আছে?

—না।

আমি বললুম, তোর বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারিস্?

দাসী চলে গেল।

আমি মনটাকে বেঁধে নিলুম। সব কথা খুলে বলব বলেই স্থির করেছিলুম—কিন্তু তবু সেই-সময়টা যখন একেবারে এত-নিকট হয়ে এল, তখন বুকখানা কেঁপে উঠল—তাইত! এখনি যদি তিনি তাড়িয়ে দেন! এত আদর, এত ভালবাসা, এ যে জন্ম-জন্ম সাধনা কর্‌লেও কোনো নারীর ভাগ্যে মেলে না! এই সব ফেলে—মনকে চোখ রাঙিয়ে উঠলুম, খবরদার—তোর এতে কিসের অধিকার রে! জানিস্ না, রাক্ষসী তুই, রাণীর সাজ পরে কত-বড় হৃদয়-রাজা গ্রাস কর্‌ছিস্! লজ্জা করে না তোর?

স্বামী এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমায় ডেকেছ? কি শান্ত মিষ্ট সে স্বর! তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, মুখে সেই মৃদু হাসির রেখাটি তেমনি সুন্দর ফুটে আছে! মনে একটু দুর্ব্বলতা এল—বললুম, এ সাজ পছন্দ হয়েছে তোমার?

তিনি বললেন, বেড়াতে যাবে?

আমি বললুম, গেলে তুমি সুখী হও?

তিনি বললেন, মানে, সকলেই যাচ্ছে। আজ বিজয়ার রাত্রি! তা তুমি যদি বাগ-বাজারে যেতে চাও—

মন আরো নুয়ে পড়ছিল; জোর করে তাকে খাড়া করলুম। মুখ নীচু করে বললুম, সেখানে যাব না। যেতেও চাইনা কোনদিন।

বলেই তাঁর পায়ে প্রণাম করলুম, একেবারে দুটি পা আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজে সেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম। চোখ দিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

তিনি বললেন, ও কি করছ কনক?

আমি কোন কথা না বলে সেই দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। তিনি আমার দু'হাত ধরে আমায় টেনে তুললেন।

বললেন, হঠাৎ আজ এমন করছ কেন?

—আমার বুক কেমন করছে।

—বাগবাজারে যাবে?

—না, না।

—তবে কি চাও, বল?

—আমি বড় পাপী গো, আমি মহাপাতকিনী—আমি যে কত-বড় বিশ্বাসঘাতক—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, পাগলের মত এ কি বকছ?

—না। আমি পাগল নই, পাগলের মত কিছুই বকি-নি। আজ আমি সব কথা খুলে বলব, তুমি শোনো। শুনে আমায় তাড়িয়ে দাও, এই রাত্রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও, তাতেও আমি এতটুকু দুঃখিত হব না। তুমি জানো না, এতদিন তোমার অসীম অগাধ ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর অমর্য্যাদা আমি করে এসেছি। তুমি যখন অত আদর করেছ, তখন আমি পাষাণের মত শক্ত হয়েছি, তা গ্রহণ করতে পারিনি। সে আদর আমার প্রাণে কি আগুন জেলে দিয়েছে, তা তুমি জানোনা। কেন দিয়েছে, তা তুমি শোনো। শুনে বিচার কর, দণ্ড দাও। যত কঠিন দণ্ডই সে হোক, আমি তা অম্লান বদনে মাথা পেতে নেব।

স্বামী কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললুম, তুমি আমার অতীত জানো না; আমি আজ সব কথা খুলে বলব, তুমি শোনো—

তুমি জানো, বাবার সখ ছিল, আমায় খুব ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। বাড়ীতে মাষ্টার-পণ্ডিত রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজেও দুবেলা আমার লেখাপড়ার তদ্বির করতেন। অর্থাৎ সে দিকটায় তিনি এমনি ঝোঁক দিয়ে ফেলেছিলেন যে আমার বয়স পনেরো পার হতে চললেও আমার বিয়ে দেবার কথাটা তাঁর খেয়ালেই আসেনি। ভাগ্যে সমাজ-দেবতা তাঁর বিরাট লগুড় ঘাড়ে নিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করছিলেন! তাই তাঁর দূতদলের অন্তরালের কাণাঘুষোগুলো একদিন যখন প্রচণ্ড রূপ ধরে প্রকাশ্য আসরে অবতীর্ণ হল, তখন বাবা একটু চঞ্চল হলেন। সেদিন বাবা খেতে বসে আমার পানে বারবার চেয়ে-চেয়ে দেখে মাকে বললেন, তাইত, কনকটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, ওর আর বিয়ে না দিলে চলছে না। কি বল?

মা পাখা নিয়ে কাছে বসে বাতাস করছিলেন; পাখাটা রেখে দুধের বাটিটা বাবার পাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমায় ত বলে-বলে পারলুম না। মেয়ে নিয়ে পাড়ায় কারো বাড়ী পা দেবার জো নেই আমার।

বাবা বললেন, কিন্তু এইটে আমি বুঝতে পারিনে, মেয়ে আমার—তার বিয়ে কবে দি না দি, তাতে পাড়ার পাঁচজনের এত মাথা-ব্যথা কেন!

মা দুধের বাটিতে চিনি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বললেন, কথার শ্রী দেখ! সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে ত—সে চুপ করে থাকবে কেন?

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, তা ঠিক!

তখন সুযোগ পেয়ে বিস্তর ঘটক-ঘটকী এসে বাবাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। ফলে আমার শাস্তি সুরু হল! সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন হুট্ বলতেই মাথায় ভিজে গামছা চেপে পাতা কেটে চুল বেঁধে, নানা ধাঁচে সেজে-গুজে আড়ষ্ট কাঠের পুতুলটির মত আমায় বৈঠক-খানায় গিয়ে বসতে হত, বিচিত্র পাত্রের দল আর তাদের অভিভাবকদের মন ভোলাবার জন্য। সেখানে হত সেই মামুলি ব্যাপারের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ,—আমার রূপের তারিফ, নাম-জিজ্ঞাসা, গৃহিণীপনায় কতটা মুন্সিয়ানা জন্মেছে, তারি পরিচয় নেওয়া,—ব্যস্! হাড় আমার জ্বলে উঠ্‌ত। আমি কি কচি খুকী যে আমাকে এই সব উদ্ভট প্রশ্ন! মানুষের মধ্যে যে-জিনিসটা আসল, যেটা আছে বলেই মানুষ মানুষ, সেই জিনিস, এই মনটার সম্বন্ধে, এত লোক আসে যায়, কৈ, কোন রকম খবরা-খবর ত কেউ চায় না—সেটাতে কারো নজরই নেই! হায়রে, এরা চায় শুধু নারীর এই দেহখানা—! কেউ দেখবে, কতখানি রূপ আছে! বিলাসের বিচিত্র উপকরণ, রঙিন খেলনা,—সেটি নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে, ইচ্ছা হলে পেড়ে নানা ভাবে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখে অলস উদ্দেশ্যহীন সখ মেটাবে! নয় কেউ চাইবে, সুস্থ, সবল পেশী,—যার জোরে সংসারের জাঁতা কলটাকে আচ্ছা করে ঘুরিয়ে নেওয়াবে! ছিঃ এই পুরুষ! এরই সঙ্গে নারীর জীবন-মরণের সকল সম্পর্ক কত জন্ম-জন্মান্তরের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা!

আমার ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। এ ত বিয়ে নয়, এ যেন এক লটারির খেলা চলেছে! নেব-নেব করে বিস্তর লোক এসে নাকটা কানটা মাপছিল আর হাত বাড়াচ্ছিল, আবার ফিরছিল,—ভাবছিল, তাইত যদি ঠকে যাই! এর চেয়ে আরো-ভালো ত মিল্‌তে পারে! সকলেরই মনের ভাব, লাভটা ষোল গণ্ডায় খতিয়ে নেওয়া চাই! জানিনা, আমার মধ্যে কোন্ পদার্থটির অভাব তারা লক্ষ্য কর্‌ছিল; কিন্তু তাদের এই কুণ্ঠিত ভাব দেখে বাবা সাহস পাচ্ছিলেন না—কাজেই এইভাবে ঢেউ খেতে খেতে আমার নাকে-মুখে জল ঢুকে দম আটকে গেলেও এই স্রোতেই গা ভাসিয়ে আমি চলেছিলুম।

সেদিন পাত্রের দল দেখা দেয়নি,—সন্ধ্যার একটু আগে আমি রাস্তার দিকের বড় ঘরের খড়খড়িটার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম, রাস্তা দিয়ে খুব ঘটা করে এক বর যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলুম, পাশে ছিল কিরণ-দিদি। আমার এক পিসিমা আছেন, কিরণ দিদি, তাঁরই মেয়ে। সে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাবে পুরীতে, তাই সেদিনটা আমাদের ওখানেই এসে উঠেছিল। পরের দিন তার পুরী যাবার কথা।

আমরা দুজনে বরের সাজসজ্জার সমালোচনা কর্‌ছিলুম। বরটি দেখতে কালো, মোটা-সোটা, সাটিনের জামার উপর গোড়ে মালা আর গার্ড-চেন ঝুলিয়ে গম্ভীর হয়ে গাড়ীতে বসে আছে;—পাশে কনে, তারও রঙটা ময়লা, বেঁটে মোটা চেহারা।

কিরণদি বললে, কি বেহায়া বর, মাগো,—লজ্জা করলে না ওর,—ধেড়ে মিন্সে—এমনি সেজে-গুজে খোকার মত বাজনা-বাদ্যি করে যেতে!

আমি বললুম, এ তোমার অন্যায়। ওর যদি ঐ রকম সখ্ হয়!

কিরণদি বললে, এ যে সৃষ্টিছাড়া সখ, ভাই!

এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়ল ও-ধারকার ফুটপাথের উপর। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে,—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, রঙ খুব ফরসা, চোখে সোনার চশমা, মুখে একটু দুষ্টু হাসি মিটমিট্ করছে। একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে সে বর-কনে দেখছিল। আমি কোন কথা লুকোব না; সেই ছেলেটির চেহারাখানি আমার দেখতে খুব ভাল লাগছিল, চকিতে কেমন নেশা লেগে গেল। আমি তাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলুম, এমন সময় কিরণদি বললে, দেখ্ ভাই, কি সুন্দর ছেলেটি।

আমি বললুম, কৈ—? যেন দেখিনি এমনি ভাবেই কথাটা বললুম। ওকেই যে আমি দেখছিলুম সে কথাটা প্রকাশ করতে আমার কেমন লজ্জা হল!

কিরণদি বললে, ঐ যে লো—ঐ সামনেই, ও ফুটপাথে।

আমি বললুম—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

কিরণদি বললে, ঐ ছেলেরই বর সেজে বসলে মানায়, তা না, মাগো, এই ধেড়ে-কেষ্ট বর! সত্যি ভাই,তোর অমনি বরটি হয়!

আমি তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললুম, য্যাঃ!

কিরণদি বললে, আচ্ছা, ওরই সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়!

আমি রাগের ভাণ করে তার পিঠে ছোট একটা কিল বসিয়ে বললুম, দেখ, ভাল হবেনা বলছি। ও সব কি কথা!

আমার চোখ ছলছলিয়ে এল। কিরণদি বললে, ও বাবা, এ ঠাট্টাটুকু গায়ে সইল না! অমনি আমার অভিমানিনীর চোখে জল এল!

তারপর কিরণদি বললে, সরে আয়লো, ছেলেটা আমাদের দেখছে। ঐ দ্যাখ্‌না!

আমি চেয়ে দেখলুম, ছেলেটি একদৃষ্টে আমাদের জানলার পানে তাকিয়ে আছে!

আমাদের সরে আসতে হল। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল—কেবলই ওকে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কেন, তার কোন কারণ আজ পর্য্যন্তও বুঝতে পারিনা।

পরের দিনও তার চেহারাটা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল,—এমনি সময় শূন্যমনে সেই খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিককার ফুটপাথে। দেখি, সেই ছেলেটি; একগোছা বই নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাড়ীর সামনে এসে তার গতি একটু মন্থর হয়ে গেল। তার উৎসুক দৃষ্টি এক ব্যাকুল সন্ধানে আমাদের খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়ল! তাকে দেখব, এ কল্পনাও আমার ছিল না। দেখে মনটা কি যে হল! প্রাণের মধ্যে একটা মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল। আমি শার্সির পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলুম। কেবলই মনে জাগছিল, কিরণদির কথাটা। ঠিক, চমৎকার চেহারাই বটে! হঠাৎ কিরণদি

পিছন থেকে বলে উঠল, কিগো, কি দেখা হচ্ছে অত-গোপনে ?

আমি রেগে বলে উঠলুম, যাও কিরণদি, আবার ঐ রকম ঠাট্টা ? রাগের আমার কোন কারণ ছিল না, কথাটা বলেই তা বুঝতে পরলুম ; এবং লজ্জিত হলুম যখন কিরণদি বললে, সত্যি ভাই আমি ত কিছু লক্ষ্য করে তোকে ও কথা বলিনি। তুই কি দেখছিস্ তা জানি-ও না। ও কে রে ? সেই ছেলেটি না ?

কথাটা বলেই কিরণদি এসে সাশির ধারে দাঁড়াল। সেই ছেলেটিরও তখন, জানিনা কি কারণে, জুতোর ফিতে হঠাৎ আল্‌গা হয়ে গেল, সে দিব্যি জুতোর ফিতে বাঁধতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার গাটা শির্-শির্ করে উঠল। কিরণদি হেসে বললে, ওঃ !

আমি বললুম, ওঃ কি ! না, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগেনা, বলছি !

কিরণদি বললে, কিলো,—ধরা পড়ে গেলি নাকি ? সেই যে বলে,—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরে পড়ে, কে জানে !

আমি বেশ তীব্র স্বরেই বললুম, কিরণ-দি—

—না হলে তোর এত দরদ কেন ভাই ? বলে, ঠাকুরঘরে কে, না কলা খাইনি ! আচ্ছা, বল্ না, খুলে। মামাকে তাহলে বলে খবরটা নি। আমার কেমন মনে হচ্ছে,—দেখছিস্ না, ওরও ঠিক এইখানটিতে এসে জুতোর ফিতে খুলে গেল—ঐ তোর বর, নিশ্চয় !

'যাওঃ' বলে আমি সেখান থেকে সটান্ একেবারে ছাদে উঠে চিলের ছাদের পাশে এসে বসলুম। আল্‌সের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখলুম, সে চলেছে, কেমন আপনা-ভোলা-ভাবে ! তার পাঞ্জাবির পকেটে রুমালের মুখটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিল ! আর পায়ের রঙটুকু সকালের সেই রৌদ্রের আলোয় যেন চাঁপা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। আমি গোপন করছিনা—আমার তখন সত্যই মনে জাগছিল, কিরণদির কথা—'ঐ তোর বর'—ঠিক ! তাই, নিশ্চয় তাই ! নাহলে দু'দুবার এমন করে দেখা হবে কেন ? কাল হঠাৎ চোখে পড়ল—আজও সকালে দেখতে পাব, সে আশা ত একবারও মনে হয়নি,—তবু এমন মেঘ না চাইতে জল এল ! এমন ত কতদিন সকালে সন্ধ্যায় খড়খড়ির ধারে দাঁড়াই, কৈ কোন দিন ত চোখে পড়েনি ঐ মূর্ত্তি, ঐ রূপ ! মনে মনে তখন রাজ্য গড়তে লাগলুম। বাড়ীতে যেন খুব ধুম বেধে গেছে, আমার বিয়ে ! ভারী ঘটা করে বর এল—শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখি, এ, সে-ই !

আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, স্বামী, ঐ আমার স্বামী ! নাহলে আবার এমনভাবে দেখা হবে কেন ?

এ কল্পনা আমায় একেবারে দেখতে দেখতে কেমন নাচিয়ে তুললে—সমস্ত শরীরে মনে আগুন ধরে গেল। আমার আর বসে-দাঁড়িয়ে চলে-ফিরে সোয়াস্তি রইল না ! দুপুর-বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই সাশির আড়ালে একখানা বই নিয়ে একটা ইজিচেয়ার টেনে তার উপর বসে পড়লুম !



তীর্থযাত্রী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

খড়খড়ির সাশি খোলা রইল। কাকেও আশঙ্কা করবার কিছু ছিল না, কারণ এমন আমি হামেশাই বসে থাকি। বসে বই খুলে কেবলই ভাবছিলুম, কিরণদির কথা! তার চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত! সে সন্দেহ করে ফেলেছে! প্রথমটায় রাগ দেখিয়ে ছিলুম, কিন্তু এখন কিরণদির সে ঠাট্টাটুকুও ভারী আরামের বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, কিরণদিকে কেন বকলুম! কেবলি মনে হচ্ছিল, কিরণদি কখন্ আসবে! এখানে এসে আমায় এ অবস্থায় দেখলে ঠাট্টা যে করবে নিশ্চয়, তা বুঝছিলুম—তবু মনে হচ্ছিল, করুক ঠাট্টা, সে বেশ লাগবে! সে যে সন্দেহ করেছে,—তাতেও আমার আরাম বোধ হচ্ছিল। বসে বসে আরো ভাবছিলুম, বই নিয়ে সে যাচ্ছিল—নিশ্চয় স্কুলে কি কলেজে,—নাহলে এ-বেলায় বই নিয়ে ও-বয়সের মানুষ আর কোথায় যাবে? যখন গিয়েছে, তখন ফিরবেও ঠিক! কিন্তু কখন, কখন সে ফিরবে? আবার মনে হচ্ছিল, তাই বা ভাবি কেন! এমন ত হতে পারে, কোন বন্ধুর বাড়ী থেকে হয়ত বই নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, তাহলে আজ বিকেলে এখানে আসবার সম্ভাবনা কোথায়? দেখাই বা আবার হবে কি করে?

বই খুলে এমনি সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় কিরণদি এল, এসে বললে, কি বই পড়ছিস্ রে?

হাতে বই একখানা ছিল বটে, কি বই তাও কি দেখেছিলুম? না। মলাটটা দেখে আমি বললুম, ভূধর চক্রবর্ত্তীর 'মনোরমা'।

—কেমন বই?

—জানিনা, তবে মন্দ লাগছে না।

—ভূধর চক্রবর্ত্তী লেখে ভাল। ও কোন্ বইটা রে? সেই নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে ঝাঁপ খাচ্ছে গোড়াতেই?

—হ্যাঁ।

—দেখি, ও বইটা সত্যি আমার ভারী ভাল লেগেছিল। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যায়; না? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! দেখি—বলে বইটা হাতে তুলে নিলে। দু'চার পাতা উল্টে-পাল্টে বললে, দূর, সেটা ত 'প্রণয় না হলাহল' উপন্যাসে আছে। এটাতে ত সেই যমপুরী থেকে পালানোর ব্যাপারটা! তুই ত তবে খুব পড়ছিস্ লো?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললুম। কিরণদি আমার কপালের উপর নিজের মাথাটা রেখে বললে—ভাই কনক, আমার আজ সারাদিন, জানিনা কেন, কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। তাহলে হয়ও বেশ। চমৎকার দেখতে কিন্তু ভাই! আমি তাই এ-ঘরে এলুম, আজ সকালে সে বই নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ছাদে চুল শুকোতে শুকোতে দেখছিলুম। ও নিশ্চয় কলেজে যাচ্ছিল।—আমি মামীমাকে বলে এলুম, এ ঘরে আসতে। বলেছি—তোমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালী করব; পাত্র চাও? আজই পাত্র দেখাব। মামীমা বললে, পাণটা খেয়ে আমি যাচ্ছি।

আমি বললুম, ছি ভাই কিরণদি, এ কি করছ তুমি?

কিরণদি বললে, কি আর করেছি—মানুষটা যাবে, মামীমাকে দেখাব।

—যাবে যে ঠিকই, তা তুমি জানলে কি করে?

—আমার মন বলছে, সে যাবেই এ পথে। তুই ত ওবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেলি, আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম—ও দু'পা করে যায়, আর নানা ছলে এই খড়খড়িটির পানে ফিরে-ফিরে চায়—!

ঘণ্টাখানেক পরেই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। সেই ফুটপাথে তারই দর্শন মিলল। বেশ জোরে জোরে সে আসছিল, কিন্তু এবারও দেখলুম, আমাদের বাড়ীর কাছ-বরাবর গতি আবার মন্থর হল। মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কাজেই আমি খড়খড়ির পাখির ফাঁক দিয়েই দেখছিলুম, মা না টের পায়! মা বললে, বেশ ছেলেটি! আহা, জামাই করে বুকে তুলে নিতে সাধ হয় বটে!

ছেলেটি লক্ষ্য করলে, যে আমাদের খড়-খড়ির পাশ থেকে তাকে দেখা হচ্ছে—তার মুখখানা সস্মিত হয়ে উঠল। সে চলে গেল। মাও অন্য ঘরে গেল।

কিরণদি বললে, কনক, আয় দেখি, ছাদে যাই—ও কোন্ দিকে যায়, দেখব।

আমি বললুম, তুমি ক্ষেপেছ!

—হ্যাঁ ক্ষেপেছি। বেশ, তুই না যাস, আমিই দেখিগে—

কিরণদি ছাদে দৌড়ুল, আমিও বসে থাকতে পারলুম না—ছাদে গেলুম। আলসের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম, বাঃ, এ ত বেশী দূর নয়—ওদিককার ফুটপাথ যেখানটায় বেঁকেছে, ঠিক সেই মোড়টার উপর তেতালা বাড়ীখানার মধ্যে সে ঢুকল।

কিরণদি মহানন্দে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, রোস, সন্ধান নিচ্ছি। বলে দৌড়ে নীচে ছুটে গেল।

অর্থাৎ কিরণদি কেমন করে' জোগাড়-জাগাড় করে সরকার মশাইকে সেই বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দিলে; আর ঘণ্টা পরে সরকার মশাই ফিরে এসে বললে—একটি বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে বেড়াতে বেরুচ্ছিল—তারই কাছে সন্ধানে জানা গেল, ওরা আমাদেরই পাল্টা ঘর; ওরা চাটুয্যে।

কিরণদি বললে, মামীমাকে বলে' যাচ্ছি ঘটক পাঠাতে—মামা বেরিয়েছেন, ফিরে আসবেন কাল; আমার সঙ্গে ত আর দেখা হবে না!—আমাকে যে চলে যেতে হচ্ছে, না হলে মামাকে একেবারে পাকা কথা ঠিক করতে পাঠিয়ে দিতুম।

… … … …

কিরণদি ত চলে গেল; তারপরই বাড়ীতে নন্টুর খুব অসুখ হল,—কাজেই ঘটক পাঠানো ঘটে উঠল না। কিন্তু প্রত্যহই আমাদের দুজনের সেই চোখের খেলা চলতে লাগল। সকালে, বেলা ঠিক দশটার সময় বইয়ের গোছা নিয়ে তাকে কলেজে যেতে দেখতুম, —এবং বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আবার এই পথেই সে ফিরত! সে বেশ বুঝে নিলে, এখানে তাকে দেখবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি! আমিও বুঝলুম, আমাকে দেখবার জন্য তার ঔৎসুক্যও বড় কম নয়!

একদিন মজা দেখব বলে ঐ সময়টিতে দোতালার খড়খড়ির ধার ছেড়ে ছাদে আলসের আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলুম—মনে ভাবলুম,

আমি তাকে ঠিক দেখব; কিন্তু ও ত আর দেখতে পাবে না, তাতে দেখা যাক্, ওর মনের ভাবখানা কেমন হয়! ও কি করে!

সেদিনও ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে বইয়ের গোছা নিয়ে সে দেখা দিলে—আমাদের খড়খড়ির পানে উৎসুক দৃষ্টি নিত্যকার মতই তেমনি অধীর আগ্রহে আমার আশায় ছুটে এল; কিন্তু দেখা মিলল না! তার চোখদুটি তখন একেবারে ম্লান হয়ে গেল। অত্যন্ত মলিন হতাশ মুখখানি নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে পড়ল—আমার ভারী আমোদ হল! তারপর সে কি করে, তা দেখবার জন্য আমি আলসের আর একটা ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে লাগলুম। দেখি, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল—তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি-একটা মস্ত-প্রয়োজনীয় জিনিষ বাড়ীতে ফেলে এসেছে, গাচ্ছে না, এমনি ভঙ্গী করে আবার সে ফিরল। আমি একেবারে মাথা তুলে ছাদে দাঁড়িয়ে উঠলুম, সে ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে,—দৃষ্টি তার সেই খড়খড়ির পানেই। আমার দুঃখ হল; তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব বলে আঁচলটা একটু আকাশের দিকে আমি উড়িয়ে দিলুম—এবং তখনি রাস্তার পানে ফিরে তাকালুম। আমায় তখন দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল—তারপর সে কি হাসি, কি প্রসন্নতা, সার্থকতার কি সে আনন্দ যে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল! আমি তা স্পষ্ট দেখলুম। বেচারা ফ্যাসাদে পড়ে গেল আর কি! এখন করে কি? আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েই আবার পকেটে হাত পুরে দিলে, তারপর চকিতে মাথাটা নেড়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ফিরে দাঁড়াল—অর্থাৎ ভাবটা এমনি দেখালে, যেন যার জন্য আমি ফিরেছিলুম, তা পেয়েছি গো, পেয়েছি!

এমনি করেই আমার চিত্তে তীব্র নেশা তীব্রতর হয়ে উঠছিল। একদিন হল কি,—সন্ধ্যার সময় এক মাসীর বাড়ীর নিমন্ত্রণ গেছলুম—পরদিন ভোরেই ফেরবার কথা; কিন্তু মাসীর অত্যন্ত জেদে মা বললেন, তা'হলে সন্ধ্যার সময়ই বাড়ী ফিরব।

শুনে আমি জ্বলে উঠলুম! কি! সারাদিন তাকে দেখতে পাব না আজ, সে বেচারাও হতাশ মলিন মুখে ফিরে যাবে! নিজে দেখতে পাব না সে দুঃখ ত ছিলই,—কিন্তু সে আমায় দেখতে পাবে না, এইটেই বেশী বাজছিল!

না, কখনো তা হবে না। গোঁ ধরে মাকে বললুম, আমি এখনি বাড়ী যাব—

—সে কি হয় কখনো?

—কেন হবে না? সেখানে বাবার কষ্ট হবে, তা ভাবছ?

—একবেলার জন্যে আর কষ্ট কি! লোকজন ত আছে সব—

—না মা, তবু বাবার কষ্ট হবে। বাবাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আমোদ করতে পারব না আমি। তোমার সাধ হয়, থাকো।

—তোর গিন্নেপনা রাখ্ দেখি।

আমি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুললুম। মাসী এবং বাড়ীর সকলেই বললেন, বাপের উপর বড্ড মায়া, বুঝি!

অর্থাৎ আমায় কেউ রাখতে পারলে না।

আমি একা ফিরলুম,—বাড়ী পৌছুলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। মনটা ধড়ফড় করছিল! গাড়ীটার উপর রাগ ধরছিল, ভারী আস্তে চলেছে! সব বৃথা হল বুঝি! গাড়ী থেকে নামছি, এমন সময়ে পিছনে কার কাশির শব্দ পেলুম, ফিরে দেখি, সে। এক ছুটে উপরের ঘরে গিয়ে সার্শির ধারে এসে দাঁড়ালুম—দেখি, সেই সতৃষ্ণ আঁখির দৃষ্টি ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়েছে! চোখোচোখি হয়ে গেল। দুর্জনেই দুজনের পানে চেয়ে হেসে ফেললুম। হেসেই আমি ভাবলুম, ছি ছি, এ কি করলুম! লজ্জায় তখনি সরে এলুম।

... ...

না, আর বাড়াবো না, খুব সংক্ষেপেই সেরে নিচ্ছি।

বাড়ীতে নন্কুর অসুখ সারতেই পশ্চিমে যাবার কথা উঠল। আমি ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়লুম। সকলেই যাবে; সেখানে গেলে তাকে ত দেখতে পাবো না—অথচ কি করেই বা বলি, আমি যাব না? আমায় এখানে একলা রেখে ত আর যাবে না কেউ!

যাবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এল—কি করি, কি করি! মহা দুর্ভাবনায় পড়লুম। মার উপর রাগ ধরছিল,—কৈ, মা ত বাবাকে বলে একদিনও ঘটক পাঠাবার ব্যবস্থা করলে না। কিরণদিই বা কি-রকম লোক! একটা কথা দিয়ে সে সম্বন্ধে একেবারেই চুপচাপ! বাঃ দুনিয়ার উপর রাগ ধরে গেল—স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর দুনিয়া!

যে দিন আমাদের পশ্চিম যাবার কথা তার আগের দিনের কথা বলছি। আমি বাইরের ঘরে বাবার কতকগুলো কাগজ-পত্র দেখে শুনে গুছিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখছিলুম—হঠাৎ খড়খড়িতে একটা ঠক্ করে শব্দ হল। এগিয়ে গেলুম—দেখি, সে একেবারে এ ফুটপাথে, ঠিক আমাদের খড়খড়ির নীচেয় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। গা ছমছম করতে লাগল। মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করে যেন ঢেউ তুলে নাচতে লাগল। এগুব কি পেছুব, ঠিক করতে পারলুম না।

সে-ও একবার আমার পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। আমার চোখে জল এসেছিল। সেও অপ্রতিভ হয়ে পড়ল,—তার চোখে সে ভাব পষ্ট আমি লক্ষ্য করেছিলুম। কোন মতে সে বলে উঠল,—গলাটা কাঁপছিল,—সে বললে, মাপ করবেন, বড় দুঃসাহসের কাজ করেছি আমি। কিন্তু শুনলুম, আপনারা পশ্চিম যাচ্ছেন! আপনি পশ্চিমে যাবেন না—আপনাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।—শেষের দিকটায় তার গলার স্বর এমনি করুণ হয়ে এল যে আমার প্রাণটা বেদনায় ঝরে পড়বার মত হল!

কথাটা শুনে আনন্দ যেমন হল,—তেমনি ক্ষোভও হল। ছি—এমন করে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে! আমি একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়—আর ওর সঙ্গে পথের আলাপ বৈ ত না—কোনো পরিচয় নেই—কেউ কারো সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতা!

জানি না, মনের কোন্‌খানে একটা ঘা লাগল। মনের মধ্যে যে রঙিন ফানুসটা জমছিল, ঘা খেয়ে সেটা ছিঁড়ে পুড়ে গেল—আর তখনি একটা কি-রকম বিশ্রী কালো কালির দাগ চোখের সামনে ফুটে উঠল!

তবু সরে আসতেও পারলুম না। পা যেন কে এঁটে ধরে রেখেছিল।

সে বললে, যদি যান, তাহলে জেনে রাখবেন, ১২নম্বর বাড়ীর চুনি চাটুয্যেকে আর জীবনে দেখতে পাবেন না।

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না—ছি!

চোখের দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা হেনে আমি সরে এলুম—সে ঘরে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালুম না। একেবারে ছুটে তেতালার ছোট ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে বসে পড়লুম। ভয়ঙ্কর কান্না পাচ্ছিল। তীব্র অনুশোচনায় মন ভরে গেল। বড় সাধের কল্পনা হঠাৎ দম্‌কা ঘায়ে ছিঁড়ে গেলে মনের যেমন ভাব হয়, তেমনি ভাব হল। পরক্ষণেই কিন্তু মমতায় প্রাণ আবার ভরে উঠল! আহা, কি করুণ ঐ নিবেদন! ঠাকুর-ঘরের দরজায় মাথা রেখে বললুম, হে ঠাকুর, আমাদের পশ্চিম যাওয়া বন্ধ করে দাও।

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রে বাবার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রাম পড়ে বাবা বললেন, না, কাল মধুপুর যাওয়া আর হল না। আমায় ভোরেই মফঃস্বল যেতে হবে। প্রজারা কাছারি লুঠ করেছে!

শুনে আমার সে-যে কি আনন্দ হল! এ ঘটনায় তার উপর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। তবে এ-ই আমার স্বামী, এ-ই সে নিশ্চয়! না হলে ঠাকুর কথা রাখবেন কেন! তখন পরদিন সকালেই তাকে এ খবরটুকু জানাবার বড় ইচ্ছা হল। খুসী হবে! একটা কাগজে মোটা অক্ষরে লিখলুম—"মধুপুরে যাওয়া হল না।" ভাবলুম, সে যখন যাবে,—এই পথেই ত যাবে, তখন কাগজখানা রাস্তায় ফেলে দেব'খন।

আবার মনে হল, না—ছি! মনকে শক্ত করে বললুম, না—না।

ঘড়িতে দশটা বাজল, আর অমনি আমাকে জোর করে যেন কে খড়খড়ির ধারে টেনে এনে বসিয়ে দিলে! পথে নানা সাজের লোক চলেছে. ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছে, গরিব-দুঃখী লোক তাদের দুঃখের ভারে নুয়ে পথে চলেছে, ও-বাড়ীর উড়ে বামুনটাও রান্নাঘরের জঞ্জাল ধুয়ে মুছে তালি-দেওয়া একটা আল্‌পাকার কোট গায়ে এঁটে তার উপর গরদের চাদর বেঁধে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে! সবই দেখছিলুম, মনটাকে অন্য দিকে ফেরাব ভাবছিলুম। কিন্তু সে কেবলি বেঁকে দাঁড়াচ্ছিল, আর হুম্‌কি দিয়ে বলছিল, —কেন 'না'! কিসের 'না'! ও যে তোর স্বামীরে, ও ত পর নয়, পথের লোক নয়, স্বামী, স্বামী, স্বামী! ওর কাছে তোর কিসের লজ্জা! আমি মনকে কেবলি চেপে ধরে বলছিলুম, ন', না, না। এমনি সময়ে ওদিকে সেই মূর্ত্তি আবার যথাসময়ে ফুটে উঠল, তার সকল আকর্ষণ নিয়ে। আনন্দে আমার চিত্তও নেচে উঠল!

সে কাছে এল, একেবারে সামনে, ওধারের ফুটপাথে। আমি অমনি কাগজখানা খড়খড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলুম। কাগজটা উড়তে উড়তে পথের উপর পড়ল।

চম্‌কে উঠলুম,—যদি কেউ দেখে! সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখতে লাগলুম, দেখি, কি করে! সে একেবারে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এল—পথে নেমে তার জুতো ফিতেয় হাত রেখে ঝুঁকে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলে, নিয়ে পড়লে! পড়ে একবার উপর-পানে প্রসন্ন হাসি-ভরা দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

আমার মনে হল, ছি, ছি, এ কি করলুম! ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় আমার মনের নিভৃত মন্দির থেকে ইষ্টদেবতাকে টেনে এনে একেবারে পথের মধ্যে এমনভাবে আজ বসিয়ে দিলুম—প্রাণের নীরব পূজাকে আজ কাঁশর ঘণ্টার হট্টরোলে মিশিয়ে দিলুম!

তার উপরও রাগ ধরল! কেন ও কাগজটাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে গেল! কেন, —কেন? খবরটুকু জানা হলে কাগজখানা কেন সে ছিঁড়ে ফেললে না? কেন ছিড়লে না? এ অন্যায়, ভারী অন্যায়! ঠিক করলুম—বেশ, কলেজ থেকে ফেরবার সময় কখনো আজ দেখা দেব না ত, কখনো না—খুব শাস্তি হবে তখন।

... ...

কিন্তু ছুটোর সময় আড়ালে বসে থাকতে পারলুম না ত! কে আবার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সেই খড়খড়ির ধারেই আমায় বসিয়ে দিলে। পথের পানে তাকাতেই দেখি, সে আসছে—একটু দূরে সে ছিল, কিন্তু ও কারা! সঙ্গে দু'জন সঙ্গী যে! হাতে, ও? দেখেই বুঝলুম, আমারই হাতের লেখা সেই কাগজখানা। সে-কাগজখানা সে খুলে দেখাচ্ছিল, আর সঙ্গী দুজন অমনি হেসে লুটিয়ে কৃতার্থ বন্ধুর সার্থকতায় তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল! দূর থেকে আমাদের খড়-খড়িটার পানে আঙুল নেড়ে সে কি ইসারা করলে। তারাও অমনি চেয়ে দেখলে।

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! কি! এই প্রেম, এই খেলা—এ তোমার কৌতুকের উৎস খুলে দিয়েছে! হতভাগা, কাপুরুষ! ইচ্ছে হল, বাঘের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ হাসিশুদ্ধ মুণ্ডুগুলো ঘাড় থেকে উপড়ে তুলে নি! অভদ্র, ইতর!

তিনবন্ধুতে এগিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে এল। আমি সজোরে সাশিটা বন্ধ করে দিলুম। চোখে এমন কঠিন দৃষ্টি হেনেছিলুম যে যদি তারা মানুষ হত ত তখনি আহত মূর্চ্ছিত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ত! কিন্তু তা হল না। কাজেই আমার নিজের মনকে আমি রাগের আগুনে পোড়াতে লাগলুম!

মনে করলুম, ছাদ থেকে এখনি লাফিয়ে পড়ি, হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে যাক; আর এই লক্ষ্মীছাড়া দেহখানা, যার রূপের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে আছি, সেই দেহটা কদর্য্য মাংসপিণ্ড হয়ে পথে লোকের পায়ের তলায় পড়ে পিষে কাদা হয়ে যাক! দারুণ ধিক্কারে, ভীষণ অন্তর্দ্দাহে আমার লোকালয় ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাবার সাধ হতে লাগল। আমি কেঁদে ফেললুম!

তবু মরতে পারলুম না! কোথাও পালানোও হল না—কে যেন মনকে চড় মেরে বললে, কি! তোর একটা খেয়ালের খেলা ভেঙে গেছে বলে এই মা, এই বাপ, তাদের মুখে চুণকালি দিয়ে আত্মহত্যা করবি, আর

কদর্য্য কুৎসায় তাদের অঙ্গ ছেয়ে যাবে! তাই আমি মরতে পারিনি গো, তাই পারিনি! না হলে সেই নীচ পশুটা মানুষের উপর যে ঘৃণা জন্মে দিয়েছিল,—

তারপর যেদিন তোমায় দেখলুম, সেদিন ঐ চোখে কি আশ্বাস, নির্ভরভার কি সে আভাষ পেয়েছি, তা আমিই জানি। তুমি দিনে-দিনে যত আদর, যত সোহাগ, যত ভালবাসা দিয়েছ, ততই আমার প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠেছে! কেবলি মনে হয়েছে, এ কি, এ কি পাষাণে তুমি ফুলের আশা করছ! তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে মন আমার মাথা নুইয়ে লুকোবার পথ খুঁজে পায় না,—তাই যখনি তুমি ভালবেসেছ, আদর করেছ, তখনি আমি কুণ্ঠিত হয়েছি! মুখের হাসিটুকু দিয়েও আমার প্রাণের অসীম সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি—

আজ জানাচ্ছি,—ওগো—পাষাণী অহল্যার মত এ পাষাণীকেও কি পরশ দিয়েছ তুমি—আজ আর কোন ভয় নেই আমার, —এখন শাস্তি দাও, মাথা পেতে নেব, হাসিমুখে নেব আমি—

... ...
... ...

—শাস্তি চাইছ?

আমার সমস্ত বুক কেঁপে উঠল। আমি চোখ বুজলুম।

স্বামী আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে চুমু দিয়ে বললেন, এই নাও শাস্তি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বাংলার মাসিকপত্র

বাংলায় মাসিক পত্র বিস্তর জন্মিয়া উঠিয়াছে। সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে বসিলে বাংলা সাহিত্যের ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে আমার মনে একটু সংশয়ের উদয় হয়। দেখি, হয় প্রত্নতত্ত্ব—তত্ত্বটুকু বাদ দিয়া; নয় পত্নীতত্ত্ব, অর্থাৎ বাজে গল্প ও উপন্যাস—হয় গণেশের তাম্রশাসন, নয় অত্যন্ত সাধারণ নায়ক-নায়িকার হা-হুতাশ, মর্ম্মবেদনা, হৃদয়-বিদারক ঘটনা; এই সব একাদশ শ্রেণীর নায়ক নায়িকার তথা-কথিত প্রণয় অথবা বস্তুত nervous titillation, স্নায়বিক উত্তেজনার কাহিনীটা এমনি রোচক নয় যে, তার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সহ্য হয়। "কমলিনী একটি সুন্দরী তরুণী, নায়ক ললিত তাকে দেখিয়া মুগ্ধ কিন্তু বিবাহ হইতে পারেনা বলিয়া নায়ক কিম্বা নায়িকা কিম্বা উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ।—অথবা অনেক গোলমালের পর কমলিনী তার নায়ককে লাভ করিয়া তাকে ভাল করিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইত ও রাত্রে গা টিপিয়া দিত।" 'স্বর্ণলতা'র আমল হইতে এই ত বাংলার গার্হস্থ্য উপন্যাসের নমুনা। খুব হালে দেখিতেছি যে, প্রণয়ে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটা তৃতীয় পক্ষের অবতারণা করিয়া নবেলকে জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। সেদিন একজন বলিতেছিলেন যে,আধুনিক বাংলা সব

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

গল্প-উপন্যাসেই মিথুন-সমস্যা (sex-problem) দেখা দিয়াছে। অবশ্য ঐ তৃতীয় পক্ষের অবতারণাটাই যদি সমস্যা হয়, তবে তাঁর কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত বাংলায় একটি মাত্র 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস বাদে নিতান্ত ছায়াভাসের মতনও, মিথুন-সমস্যা আর কোন উপন্যাসেই দেখা দেয় নাই।

—*—

এদিকে "মহান্ মানব মানস"-লোকে যে সৃজন-প্রলয়-লীলা চলিয়াছে, বাংলা মাসিক সাহিত্যে তার অভিঘাত নাই। মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্যও বটে, নব নব পরীক্ষার পথে ধাবমান—পুরাতনের জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে ব্যস্ত; কিন্তু মানুষের যে প্রচণ্ড চিত্ত-বেগে এই সকল রূপ-স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত আক্ষিপ্ত হইতেছে, আমাদের দেশের লেখকদের তা কি কোথাও নাড়া মাত্র দিল না? আমাদের সমাজের বিশেষ সমস্যা কি এবং তার মীমাংসা কি, বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমাদের দেশেরই বা কি চিন্তা করিবার আছে, বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্যতার আদান প্রদানের কোন্ কোন্ রাজপথ উন্মুক্ত হওয়া দরকার—এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা, কোন ভাবনা আমাদের দেশের মধ্যে আছে বলিয়াই ত মনে হয় না। অথচ আমরা সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া ডিগ্রি লই; আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারার সঙ্গেও যে আমাদের সকলের অপরিচয় একথাও বলা চলে না। গর্কির উপন্যাস বাঙালী পাঠক সাধারণের প্রিয়; কিন্তু গর্কি তাঁর নবেলের ভিতর দিয়া যে বিরাট্ গণ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পনা করেন, সে কল্পনা আমাদের মনকে তো চেতায় না। গর্কির "Confessions"কে নবেল বলিতে পারি, ভাবী মানব-সভ্যতার খসড়াও বলিতে পারি—অথচ তাতে নবেলের যে প্রধান ঔৎসুক্য গল্পের ঔৎসুক্য—তাহা বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব হয় নাই। রোম্যা রোলাঁর John Christopher আমরা অনেকেই পড়িয়াছি ও পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। একদিকে এক আর্টিষ্টের ব্যক্তিগত জীবনের, অন্যদিকে ফরাসী-জার্ম্মাণ সভ্যতা প্রবাহের সম্মিলিত সেই বিরাট এপিক্ কাহিনী পড়িয়া কমলিনী ও ললিতের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী আমাদের রুচি-রোচন হয় কেমন করিয়া, সেই কথাই আমি ভাবি! যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি, যে পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ-মালার নিয়ত উত্থান-পতন আমাদের চোখের সাম্নে ঘটিতেছে, তাতে এর চেয়েও বৃহত্তর উপন্যাস, বিচিত্রতর গল্পের সম্ভাবনা জাগিতেছে। এই বিপুল বিশ্ব-স্রোত, এই সমস্যার তরঙ্গ-লীলা; তারি মাঝখানে আজ মানব ও মানবী তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত।

আমি গল্প উপন্যাসের অভক্ত নহি এবং "সারবান্ সাহিত্যের" জন্য কিছুমাত্র বাগ্র নহি। আমি শুধু বলি যে প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, উপন্যাস এই পাঁচ মিশালো খিচুড়ি-লেখা ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অর্থাৎ মাসিক পত্রে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পরিবেষণ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য তখন দর্শন বা প্রত্নতত্ত্ব কেহ পড়িবেনা। মাসিক পত্র দিলেই কি কেহ পড়ে?. তার ফল হইবে এই যে, বিলাতী ম্যাগাজিনের মত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা গল্প-মাসিকে বাড়িয়া গিয়া জঞ্জাল যত জমিতে থাকিবে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের দরও তেমনি বাড়িতে থাকিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

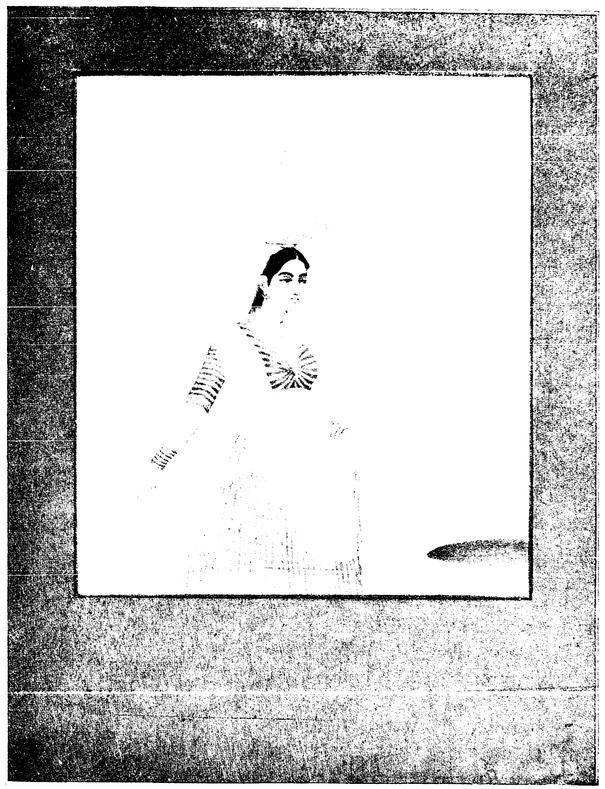

জল্‌কে

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ]　　মাঘ, ১৩২৫　　[১০ম সংখ্যা

বার্হস্পত্য-সূত্রম্

শুক্রাচার্য্য যেমন অসুরগণের গুরু, বৃহস্পতি তেমনি দেবগণের গুরু বলিয়া পৌরাণিক প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। লোকায়ত বা চার্ব্বাক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক বৃহস্পতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। অর্থ ও রাজনীতির প্রণেতা আর-এক বৃহস্পতির পরিচয় কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ চার্ব্বাক-দর্শনের প্রণেতা ও রাজনৈতিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বৃহস্পতির মতের উল্লেখ আছে। সুতরাং, কৌটিল্যের পূর্ব্বে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বৃহস্পতি যে আপনার মত সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কৌটিল্য, বার্হস্পত্য পদ্ধতির মত উদ্ধৃত করিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের পূর্ব্বে, বৃহস্পতির যে একাধিপত্য ছিল এ কথা বলা যায় না। কারণ, কৌটিল্য যেখানেই বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আরও দুইটি নীতি-বেত্তার মত উল্লেখ করিয়াছেন;—তাঁহাদের নাম মনু ও উশনস। অর্থশাস্ত্রে পরাশরের মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যে কয়জন রাজনীতি-প্রণেতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে বৃহস্পতির মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক না হউক, অতি প্রসিদ্ধ, ও প্রাচীন কালের শেষ-যুগের প্রচলিত মত বলিয়া বোধ হয়।

"বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥২
"ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩

× × ×

"ততস্তাং ভগবান্ নীতিম্ পূর্ব্বং জগ্রাহ শঙ্করঃ।
সঙ্ক্ষিপ্ত ততঃ শাস্ত্রং মহাস্ত্রং ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥৮১

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

"বৈশালাক্ষমিতি প্রোক্তং তদিন্দ্রঃ প্রত্যপদ্যত।
দশাধ্যয় সহস্রাণি সূত্রব্রহ্মণ্যো মহাতপাঃ ॥৮২
ভগবানপি তচ্ছাস্ত্রং সঙ্কিক্ষেপ পুরন্দরঃ।
সহস্রৈঃ পঞ্চভিস্তাত যদুক্তং বাহুদন্তকম্ ॥৮৩
"অধ্যায়ানাং সহস্রৈস্তু ত্রিভিরেব বৃহস্পতিঃ।
সঙ্কিক্ষেপেশ্বরো বুদ্ধ্যা বার্হস্পত্যং তদুচ্যতে ॥৮৪
মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়।

কৌটিল্য শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্বগামী আচার্য্য-গণের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদি সংহরণ করিয়া অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

"পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্তি
অর্থশাস্ত্রাণি পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ
প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য
একমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্ ॥"

কৌটিল্য তাঁহার পূর্ব্বগামী যে সকল রাজশাস্ত্রবিদ্‌গণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, —তাঁহাদের নাম—ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌনপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তী-পুত্র (বাহুদন্ত), উশনস, বৃহস্পতি এবং পরাশর। ইহাঁদের মধ্যে চারিজন শাস্ত্রকার মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ, পিশুন, কৌনপদন্ত, ও বাতব্যাধি,—বৃহস্পতি ও কৌটিল্যের মধ্যযুগের শাস্ত্রকার ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই। তথাপি, কৌটিল্য, চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, ইত্যাদি নাম-ধারী রাজনৈতিক যে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক একথা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যনীতিশাস্ত্র ভারতের একাধিক পণ্ডিতগণের আলোচ্য ও অনুশীলনীয় বিষয় ছিল। এবং কৌটিল্যের সময়ে, এই শাস্ত্রের নানা প্রচলিত মতের সমন্বয় ও পরিপুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কৌটিল্যের পরবর্ত্তী যুগে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। এবং তাঁহারই গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কামন্দকীয় নীতি রচিত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরে, এই নীতিবাদের আদর্শ তিব্বত, চীন, শ্যাম, যব ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি নানাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

কৌটিল্যের পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের মধ্যে একজনের নাম-সংযুক্ত একখানি সূত্রগ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, সেটি "বার্হস্পত্য-সূত্রম্"। এই প্রবন্ধে আমরা সূত্রটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব।

এই গ্রন্থটি কৌটিল্যের উল্লিখিত বৃহস্পতি-রচিত কি না বলা বড় কঠিন। কারণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে যে যে বিষয়ের উপলক্ষে বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমাদের আলোচ্য সূত্রটীতে সে সকল বিষয়ের অবতারণা নাই। সম্ভবতঃ বৃহস্পতির রচিত একাধিক গ্রন্থ ছিল, এবং বোধ হয় যে বার্হস্পত্যসূত্র- কৌটিল্যের সম্মুখে ছিল— অধুনা আবিষ্কৃত পুঁথিখানি ঠিক সেটি নহে। তথাপি সূত্রটি যে অতি প্রাচীন এ কথা অনেকটা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। চাণক্যের নামে পরিচিত এইরূপ একটী সূত্রগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্র-সাহিত্যের পরিণতিকাল খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ২০০ বর্ষ ধরিলে, এবং অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ ধরিলে, বার্হস্পত্যসূত্র

মোটামুটি খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরের রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানি ঠিক এই কালের রচনা না হউক, অন্ততঃ ঐ সময়ের রচিত ও পূর্ব্বে প্রচলিত কোনও আদর্শ গ্রন্থের প্রবাদ বা ছায়া অবলম্বনে রচিত বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না। দিন যেমন রাত্রিকে অনুসরণ করে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, তেমনই ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ, সূত্র-গ্রন্থকে চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। বার্হস্পত্যসূত্র সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। "বার্হস্পত্য-সূত্র-টীকা" নামে একটি পুঁথি Oppert সাহেব তাঁহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (Vol I, No. 6061)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পুঁথিটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। বার্হস্পত্যসূত্রের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; একখানি বিলাতের Royal Asiatic Society'র সংগ্রহে আছে (Winternitz : Catalogue, No. 160 (3) p 219); দ্বিতীয়খানি মান্দ্রাজে Government Oriental Library তে আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ত্রিবন্দ্রম্ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক রাও বাহাদুর রঙ্গস্বামী আয়ঙ্গর মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি এই পুঁথিটির একখানি নকল পাইয়াছি। Royal Asiatic Society'র পুঁথিটিতে দেবগিরির যাদব-রাজগণের উল্লেখ আছে। এবং এই প্রমাণের বলে Thomas সাহেব পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। কিন্তু সাহেব এ কথাও বলিয়াছেন যে এই অংশ এবং শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্রাদির বিবরণের অংশ প্রক্ষিপ্ত ধরিলে, পুঁথিটি যে বহুপ্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মতের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, কামন্দকীয় নীতি ও শুক্রনীতির বহুল প্রচারের পর এই সূত্র-গ্রন্থটী এই আকারে সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য যে কৌটিল্য, কামন্দক বা শুক্রাচার্য্যের নাম উল্লেখ এই পুঁথিটীতে পাওয়া যায় না। এই সূত্রটীর প্রধান বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব এই যে কৌটিল্যের পূর্ব্বগামী কোনও আচার্য্যের নামযুক্ত সূত্র আকারের রাজনীতিগ্রন্থের এই প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিঞ্চিৎ সূত্রাকারে এবং অধিকাংশে ভাষ্যরীতিতে রচিত। "দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্। স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ॥" সুতরাং কেবল সূত্ররীতিতে রচিত রাজনীতিশাস্ত্রের গ্রন্থের এই প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতের রাজনীতি যে বিশেষভাবে মৌলিক ও পুরাতন বিজ্ঞান তাহা এই সূত্রগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির প্রতিপত্তি প্রাগৈতিহাসিক প্রবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জ্যোতিষগ্রন্থের নানা বচনে তাহার ছায়াচিহ্ন আছে :—

"নৃপেন্দ্র-মন্ত্রী নৃপলব্ধকামো
বিদ্যাবিনোদী চতুরঃ প্রগল্‌ভঃ।
আচারপূজ্যো মধুরস্বভাবো
বারে ভবেদ্দব গুরোর্মনুষ্যঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

আমাদের পুঁথিটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১১০টী সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে

৭০টী, তৃতীয়ে ১৪৭, চতুর্থে ৫০টী, পঞ্চমে ৩০টী এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪টী সূত্র আছে। সূত্রগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে সংযোগ ও সঙ্গতি আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, পরস্পরের মধ্যে সূত্রগুলির কোনও বিশেষ যোগ বা সম্বন্ধ নাই। এক একটী সূত্রে এক এক নূতন কথার সমাবেশ আছে—অনেক স্থলে একটির সহিত অন্যটির কোনও সম্পর্ক নাই। বিষয়-অনুসারে কোনও শ্রেণীবিভাগ করিয়া, কিম্বা অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাৎসায়ণের কামসূত্রে আমরা বিষয়-বস্তুর যে শ্রেণীবিভাগ ও সন্নিবেশ-পদ্ধতির পরিচয় পাই, আমাদের আলোচ্য সূত্রটিতে তাহার একান্ত অভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের স্থানে স্থানে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিষয়-বস্তুর কিঞ্চিৎ ধারাবাহিকতা আছে। সূত্রটির দুই-এক স্থানে বৌদ্ধগণের নাম উল্লেখ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক অধ্যায় হইতে কয়েকটি সূত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

"বৃহস্পতিরথাচার্য্য ইন্দ্রায়
নীতিসর্বস্বমুপদিশতি ॥

১। আত্মবান্ রাজা ॥
২। আত্মবন্তং মন্ত্রিণমাপাদয়েৎ ॥
৩। ধর্মমপি লোকবিকুষ্টং ন কুর্য্যাৎ ॥
× × ×
৫। স্ত্রীবালমূর্খৈঃ সহ ন বিবদেদ্
ধর্মনীতিকৃত্যা
৬। ঐন্দ্রজালিকং ন কুর্য্যাৎ ॥
× × ×
৩০। মলবেষং ন কুর্য্যাৎ ॥
৩১। মৃগয়াতিসঙ্গং চ নাচরেৎ ॥
৩২। স্ত্রীদ্যূতিসাঙ্গাদযশো বর্দ্ধতে ॥
৩৩। আয়ুশ্চ ক্ষীয়তে ॥
× × ×
৩৭। বৃথা ধর্মধ্বজিনং ন বিশ্বসেৎ ॥
৩৮। নিন্দের চ ॥
× × ×
৪৯। অপ্রিয়মপি বচনং শৃণুয়াৎ ॥
× × ×
৫৬। সন্ন্যাসিনৃপবেশ্যামন্ত্রবাদোপজীবেষু
চিরং ন সেবে
× × ×
৮৫। ধর্মগুপ্তিঃ গুহযাত্রাগুপ্তিঃ,
কার্য্যগুপ্তিঃ বৈরণ
যশোভঙ্গে সত্যমপি নেতি বদেৎ।
× × ×
৯০। আত্মানমনৃণী কুর্য্যাৎ ॥
× × ×
৯২। নিত্যকর্ম ন ত্যজেৎ ॥
৯৩। জনঘোষে সতি ক্ষুদ্রকর্ম ন কুর্য্যাৎ।
৯৪। নষ্টে ন স্থাতব্যম্ ॥
৯৫। দূর পরিহরণীয়ং গুরুতরমপি
তদ্রাজ্যরা
× × ×
৯৭। অল্পহানিঃ সোঢব্যা ॥
× × ×

১০৯। জ্ঞাতিষু যত্র বৈরং তৎকুলদ্বয়মামূলং
নশ্যতি ॥
১১০। যঃ শাস্ত্রং দণ্ডনীতিং
পরিত্যজত্যনর্থকো
শলভ ইব বহ্নিং প্রবিশত্যজ্ঞানাৎ ॥
ইত্যাহ ভগবানাচার্য্যঃ সুরেন্দ্রগুরুঃ ॥
ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১। গুণবতো রাজ্যম্ ॥
২। বিদ্যাগুণোঽর্থগুণঃ সহায়গুণশ্চ ॥
৩। স্বকুলরঞ্জনং চ চরিত্রলক্ষণম্ ॥
৪। কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যানি ॥
৫। সর্বথা লৌকায়তিকমেব
শাস্ত্রমর্থসাধনকালে ॥
৬। কাপালিকমেব কামসাধনে ॥
৭। আর্হতং ধর্মে ॥
৮। লোকায়তিকমসেনার্থং ক্ষিপ্রং
নশ্যতি তৎ ॥
৯। কাপালিকার্হত বৌদ্ধাশ্চ ॥
১০। এতেষু তিষ্ঠন্ শলভবহ্নিবৎ ॥
× × ×
১৪। যদা বেদোক্তকর্মজ্ঞানং শিবং বিষ্ণুং
শ্রিয়মপি পরিত্যজ্য সর্বং শূন্যমিতি
বদন্তি তদা বৌদ্ধাভিধান পাষণ্ডী ॥
× × ×
২২। পরাপবাদার্থং বেদশাস্ত্রধর্মাদীন্ পঠতি ॥
২৩। সর্বান্ নিন্দতি ॥
২৪। মহেশ্বর বিষ্ণাদীনামপি ॥
২৫। সোঽপ্যশনার্থং ধর্মং বদতি ॥
২৬। বদনার্থং পরান্ স্তৌতি সঃ বৌদ্ধঃ ॥
× × ×
৪১। নীতেঃ ফলং ধর্মার্থকামাপ্তিঃ ॥
৪২। ধর্মেণ কামার্থৌ পরীক্ষ্যৌ ॥
× × ×
৫১। সর্বাণি রত্নান্যপি দীয়ন্তাং-
স্বকার্যজীযশোরক্ষণে ॥
৫২। মন্ত্রকালে ন কোপয়েৎ ॥
৫৩। ধর্মপ্রধানং পুরুষার্থম্ ॥
× × ×
৫৫। অপথ্যভোজনো মৃত্যুপ্রীতিকরইব
সত্যব্রতঃ
শাস্ত্রেষু নিষ্ঠিতঃ পুরুষঃ সাগরমপি শোষয়েৎ ॥
× × ×
৫৮। সজ্জনো ন ভয়াৎ ব্যতিবর্ত্ততে ॥
× × ×
৬১। অজিতাত্মানং শাসিতুং নোৎসহেত ॥
× × ×
৬৩। দুর্জনমধ্যে সূর্য্যবৎ প্রকাশতে সুজনঃ ॥
৬৪। অধর্মব্যবস্থিতান্ ন্যায়বৃত্তেন বারয়েৎ ॥
৬৫। অকীর্ত্তিং নার্জয়েৎ ॥
× × ×
৬৮। বালো নিবার্য্যমধর্ম পাঠাঙ্কুশেন গজইব ॥
৬৯। গুরুবচনমলঙ্ঘনীয়ম্ নয়ানুগতং চেৎ ॥
৭০। গুরুমপি নীতিবিযুক্তং নিরাসয়েৎ ॥
ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। জিত ক্লেশস্য পৌরুষম্ ॥
২। দেশান্তরবাসেন জিতক্লেশো ভবতি ॥
৩। সর্ব-বল-কাল-দেশ-সাম-প্রকৃতিসহায়া-
মবয়সাংজ্ঞানং কার্যম্ ॥
৪। উপবাসাদিসহিষ্ণুত্বংচ ॥
৫। সুগন্ধবাসান্ কেশান্ কুর্য্যাৎ ॥

৬। বহ্বাদং মধুরমেব কুর্য্যাৎ ॥
১০। মোক্ষপূর্ব্বান্ দ্বারংত্রয়ম্ ॥
১১। শাক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ শৈবাঃ ॥

× × ×

১৩। মহাপথবৎ বৈষ্ণবম্ ॥
১৪। কেবলপ্রধানিকমশ্বরথযানবৎ ॥
১৫। লৌকায়তিক ক্ষপণক বৌদ্ধাদি-বহু-
শার্দূল-দুষ্ট-মৃগ-কীর্ণ-শূন্যাটবীগুহামার্গবৎ।
১৬। এতন্নিরূপ্যমেক্ষমাশ্রয়েৎ ॥
১৭। জ্যোতির্নাথস্থিতং সদা নিরূপয়েৎ ॥
১৮। চাতুর্বর্ণ্যং রক্ষেচ্চ ॥

× × ×

২১। দানমানালঙ্কারবিদ্যাভিঃ সিদ্ধিংলভেত ॥
২২। অষ্টাদশতীর্থানি নিরূপয়েৎ ॥

× × ×

২৭। শৃঙ্গারবেষং কুর্য্যাৎ ॥

× × ×

৩০। ইতিহাসপুরাণানি মানয়েৎ ॥

× × ×

৩৬। ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ দোষদুষ্টমপি ॥

× × ×

৪৯। ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ শরণাগতং
সর্বপাতকযুক্তমপি রক্ষেৎ ॥
৫০। দুষ্টনিগ্রহং কুর্য্যাৎ ॥
৫১। শিষ্টপরিপালনং চ ॥

× × ×

৫৫। আসবানি সেবয়েৎ ॥
৫৬। অতি ন ॥
৫৭। মাংসানি চ ॥
৫৮। ঘৃণা কার্য্যা ॥
৫৯। বৌদ্ধাদয়ো ন ॥

৬২। পঞ্চাশৎ কোটিযোজনা পৃথিবী ॥
৬৩। সপ্তদ্বীপবতী চ ॥
৬৪। সপ্তসমুদ্রাবৃতা চ ॥
৬৫। কর্মভোগাতিভোগদিব্যশৃঙ্গারসিদ্ধ
কৈবল্যা ইতি দ্বীপাভিধানাঃ ॥
৬৬। মধ্য কর্মভূমিঃ ॥
৬৭। তন্মধ্যে মে রোরাম্বুঃ।
৬৮। তত্রোত্তরে হিমবান ॥
৬ । তস্য দক্ষিণে নবসাহস্রী ভূঃ ॥
৭০। তত্র দাক্ষিণাত্য ভারতঃ খণ্ডঃ ॥
৭১। তত্র সাক্ষাৎ ধর্মাধর্মফলাঃ সিধ্যন্তি ॥
৭২। তত্র দণ্ডনীতিঃ ॥

× × ×

৮০। গঙ্গাসরস্বতীকালিন্দী গোদাবরীকাবেরী-
তাম্রপর্ণী-ঘৃতমালা কুলনদ্যশ্চ ॥
৮১। অষ্টাদশ বিষয়াশ্চ ॥
৮২। অষ্টাদশসাগরা নৃপাঃ ॥

× × ×

১১৯। অথ বৈষ্ণবক্ষেত্রাঃ।
১২০। বদরিকাশালগ্রামপুরুষোত্তম-দ্বারকা-
বিল্বাচলানন্তসিংহ শ্রীরঙ্গাঃ ॥
১৪০। কৃতে জ্ঞানিনঃ ॥

× × ×

১৪২। ত্রেতায়াং কর্মিণঃ নীতিবিশারদাঃ ॥
১৪৫। তিষ্যে পাদেঽজ্ঞানকর্মা ঘনা
দণ্ডনীতিকোবিদা নরাঃ ॥
১৪৬। তদুত্তরং বিরুদ্ধধর্ম-বর্ণ-বেষা
দণ্ডনীতিবর্জিতাঃ ॥
১৪৭। পশ্যন্তি প্রজা অমৃতবাদতৎপরাশ্চেত্যাহ
আচার্য্যঃ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

১। ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে উত্থানম্ ॥
২। ধর্মমর্থং চ চিন্তয়েৎ ॥
৩। কুক্কুটশব্দং শুভং ॥
৪। গজাদিদর্শনং চ ॥
৫। গজশব্দ মঙ্গলস্তুতি বেদপাঠনং চ ॥
৬। দেবতাপুণ্যকথা চ ॥
৭। রাজণ্যস্মরণং চ ॥
৮। নেত্রাঞ্জনং চ ॥
৯। আদর্শদর্শনং চ ॥
১০। অলঙ্কারয়েৎ ॥
১১। তাম্বূলচর্বণং চ ॥

× × ×

১৪। তূর্য্যঘোষাশ্চ ॥
১৫। দিব্যপ্রমদাদর্শনং চ ॥

× × ×

২৬। অবশ্যনিরূপনীয়ান্যেতানি কর্মাণি ॥
২৭। মন্ত্রমূল্যে বিজয়ঃ ॥

× × ×

৩০। বন্ধুভিঃ বান্ধবৈর্হিতৈঃ বহুশ্রুতৈঃ
ধীরৈঃ সহ
যৎ কর্মারভতে তদুত্তমম্ ॥

× × ×

৪৭। কামাদীন্ যে জয়ন্তিতে সর্বানরীন্
জয়ন্তি ॥
৪৮। পূর্বমুপকারং ন কারয়েৎ ॥
৪৯। উপকারং নিয়তং কুর্য্যাচ্চ ॥
৫০। নাভাবিব্যসনং পূর্বংজ্ঞাত্বা ব্যসন
প্রতীকারং কার্য্যমিতি গুরুরাহ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

১। চত্বার উপায়াঃ ॥
২। ত্রয়শ্চ ॥
৩। মায়োপেক্ষাবধশ্চ ॥
৪। সুরিষু সাম ॥
৫। শঙ্কিতেষু সামভেদৌ ॥
৬। লুব্ধেষু সামদানভেদাঃ ॥
৭। কষ্টেষু সামভেদদানমায়োপেক্ষাবধাঃ ॥
৮। সামং পূর্বং প্রযোক্তব্যম্ ॥

× × ×

১২। সর্বভয়েষু জ্ঞাতিভয়ং ঘোরম্ ॥
১৩। গোষু পয়ঃ ব্রাহ্মণে কোপশ্চ ॥

× × ×

১৭। লোকবিরুদ্ধং নাচরেৎ ॥

× × ×

২০। শত্রুপক্ষাদাগতং ন বিশ্বসেৎ ॥
২১। গুণতঃ সংগৃহ্লীয়াৎ ॥
২২। ভাবৈঃ পরীক্ষয়েৎ ॥

× × ×

২৮। হৃদয়ে যথাবৎ শুভাশুভং পূর্বমুদেতি
ন দুষ্টাচারঃ সর্বত্র কারয়েৎ ॥
২৯। চপলা ন বহুমান্যাঃ ॥
ইত্যাহ আচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

১। দেশকালযোগ্যং কর্ম নয়ানয়ৌ
চ বেদয়েৎ ॥
২। বিপরীতং ন বেদবীর্য্যদর্পেণ ॥
৩। হিতানি নিরূপয়েৎ ॥
৪। নয়ো মাত্রভিনিরূপ্য কার্য্যতে ॥

৬। অহিতং বিকারং যস্য প্রতিভাতি
সমন্ত্রযোগ্যঃ ॥
৭। অর্থমার্জয়েৎ ॥
৮। যস্যার্থরাশিরস্তি তস্য মিত্রাণি ধর্ম্মশ্চ
বিদ্যা চ গুণবিক্রমৌ চ বুদ্ধিশ্চ ॥
৯। অধনেনার্থমার্জ্জয়িতুং ন শক্যতে
গজং গজেনেব ॥
১০। ধনমূলং জগৎ ॥
১১। সর্বাণি তত্র সন্তি,
নির্ধনো মৃতশ্চণ্ডালশ্চ।
১২। এবং ধর্মমূলং চ বিদ্যামর্জয়েৎ ॥
১৩। বিদ্যামূলং জগৎ ॥
১৪। বিদ্যা পুনঃ সর্বমিত্যাহ গুরুঃ ॥
ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তোঽয়ম্ গ্রন্থঃ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

নাদিরশাহের জাগরণ

[স্থান—পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত। কাল—নিশাবসান।]

নাদির! নাদির!—
কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ!—
মেঘে-চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ!
চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরাট প্রেতের কায়া!
আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া!
কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার
পায় নি পরশ তুরাণী টুঁটির রক্তের ফোয়ারার!
থিভা হ'তে সিস্তান্—
সারা মুল্লুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফ্‌গান্!

নাদির! নাদির!—
ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জ্বলে!
থির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে!
মনুচেহরের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে
'হেল্‌মদ্'-বারি, পান করি' তায় কি আশা জাগিছে প্রাণে!
রোস্তমেরি সে বিশাল মুষ্টি দেখা'ল কৃপাণ-ধরা
বক্ষে বাহুতে একি উল্লাস বিজয়-অশনি-ভরা!
দিকে দিকে জয়রব—
হাহাকার করে ফেরুপাল যত, নরবলি-উৎসব!

নাদির! নাদির!—
শুনিয়াছি আমি, উঠিয়াছি তাই জাগি',
ইস্পাহানের গুলাব-বাগান—কে ছোটে তাহার লাগি'!
সিরাজী-সিরাপ দ্রাক্ষার চুনী করে নাই চোখ রাঙা,
শাহজামসীদ্-প্রাসাদের ভিত—হেরি নাই সে কি ভাঙা!
উত্তর হ'তে হুহু হুহু হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,
লাফাইয়া ছোটে ঝর্ণার জল শ্বেতচমরীর পারা,
তুহিন, তুষাররাশি,
বাজ-বিদ্যুৎ,—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি'।

নাদির! নাদির!—
আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে
মাটীতে এ মাথা রাখিবার আগে দলে' নেওয়া পা'র তলে।
পশু-মেষ যেই পালন করেছে—মানুষ-মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল!
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্ব্বলতার গ্লানি,
লুটাইব পায় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী,
—কাবুল কান্দাহার
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্‌নী নিশাপুর পেশাবার।

ইস্পাহানের ইস্পাত হ'তে রক্তের ধোঁয়া-ধার
নিবিবেনা কভু, প্রাণের মমতা ঘুচাইব সবাকার।
কোহি-রহমতে 'চেহেল্-মিনার' গড়েছিল জান্‌জান্—
আমিও গড়িব কাঁচামাথা দিয়ে, দেহ করি' খান্ খান্।
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,
তখ্‌তের 'পরে চড়িয়া শুনিব বান্দারা গায় নীচে—
'ধন্য নাদির শাহ!
মারিবে, তবুও একবার দেখি, অভাগারে ফিরে' চাহ।'

'নাদির! নাদির! নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয়!'—
পাপ-সয়তান কুহরিছে কাণে কাপুরুষ-সংশয়!
খোদার বান্দা এন্‌সান্ যেই নাই তার নিস্তার,—

চিবাইয়া খাবে আপন কলেজা, যদি সে ফেরেস্তার
'আখেরি-জমানা'-দিনের নিশানা তুলিবারে চায় ধরি',
মরণের পরে 'দোজোকে' নামিবে দু'বার করিয়া মরি'!
—হাহা, মোর হাসি পায়!
মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি দুনিয়ায়!

বুল্‌বুল্ আর সিরাজের গুল্ নয় শুধু আল্লার,
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার!
শুধু মিট্‌মিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা!
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা?
শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারীবিষ থলে জলে—
বাহবা কি বাহবা রে!
আল্লার মত দিলাবর যেই—এ খেলা খেলিতে পারে।

বাম হাতখানি তুলিয়াছে ঊষা 'পামীর'-পাহাড়-চূড়ে,
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াসা ফুঁড়ে';
আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে
পূবের শিকারী নীলবালুচরে দাঁড়াইল রাঙা মুখে!
উহারি মতন ঊর্দ্ধে উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,
'হিন্দু-তাতার-তুরাণী-শোণিত!' চীৎকার করে' ডাকি'।
—ইরাণ! গানের রাণি!
রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি।

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, তাই তোর অপমান!
মূর্খ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত থোরাসান!
গজ্‌নীর রাজা দিয়েছিল দাম? মনে নাই তার ব্যথা?
তারি শোকে কবি ত্যেয়াগিল প্রাণ, হাসি পায় শুনি' কথা!
সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক দুই-চারি,—জীবনের দান এই!
নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই।
দাস যারা গান গায়,
ভীরু হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটাতে চায়!

দূর করে দাও গোলাপের মালা, পেয়ালা ভাঙ্গিয়া দাও!
'নাদির! নাদির!'—শুধু ওই সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষ-কারায় শুধু সেই কামনাই।
বর্ষাফলকে ঝলসি' উঠেছে মধুর রক্তরেখা,
ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে, যতদূর যায় দেখা!
—কাবুল কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার!

শ্রীমোহিতলাল মুজমদার।

বাংলার ব্রত

(৪)

আল্‌পনার অংশটাকে দৃশ্যপটের হিসাবে নিয়ে, ছড়া ও ক্রিয়া থেকে ভাদুলীব্রতের অনুষ্ঠানের যে মূর্ত্তিটি পাওয়া যায় তা এই ঃ—

ক্রিয়া আরম্ভ হল;—ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কলসী-কাঁকে জল তুলতে চলেছে একটি ছোটো মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও-বড়-নয় এমন-একটি ঘোমটা-দেওয়া নতুন বৌ এবং সঙ্গিনীগণ।

(জল-তোলার গান বা ছড়া)

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
ভাদুলীঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ।

একে একে নদীর জলে ফুল দিয়া—

(ছোটো মেয়ে)—

নদী, নদী, কোথায় যাও?
বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।

(ছোটো বৌ)—

নদী, নদী, কোথায় যাও?
সোয়ামি-শ্বশুরের বার্ত্তা দাও।

ইতিমধ্যে একপসলা বৃষ্টি এল; সকলে জলে-স্থলে ফুল ছিটাইয়া—

নদীর জল, বৃষ্টির জল, যে জল হও,
আমার বাপ-ভায়ের সম্বাদ কও।

বৃষ্টির শেষে, মেঘে-কালো আকাশ দিয়ে একঝাঁক সাদা বক উড়তে-উড়তে চলে গেল; একদল কাক কা কা করতে-করতে বড়-একটা বকুল-গাছ ছেড়ে গ্রামের দিকে উড়ে পালালো; আকাশ একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

(মেয়ে)—

কাগারে! বগারে! কার কপালে খাও?
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে
কোথায় দেখলে না'ও?"

মেঘ-ফাটা-রৌদ্র ভরা-নদীর বুকে বালু-

চরের একটু মরীচিকার মতো ঝিক্‌মিক্ করেই মিলিয়ে গেল।

(মেয়ে)—

চড়া! চড়া! চেয়ে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে দেখে হেসো।

কোন্ গ্রামের একটা দড়ি-ছেঁড়া ভেলা স্রোতের টানে হুহু করে বেরিয়ে গেল।

(মেয়ে)—

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে মেনে রেখো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রত-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পালা বা দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হল;—বনজঙ্গলে ঘেরা কাঁটা-পর্ব্বত, অন্ধকার রাত্রি, দূরে নানা জন্তু ও সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে।

(মেয়ে সভয়ে)—

বনের বাঘ! বনের মোষ!
তোমরা নিওনা আমার বাপ-ভায়ের দোষ।

(সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে)—

বাপ-ভাই গেছেন কোন্ ব্রজে?
সোয়ামি-শ্বশুর গেছেন কোন্ ব্রজে?

(বনদেবী আশ্বাস দিয়া)—

তাঁরা গেছেন একপথে,
ফিরে আসবেন আর-পথে।

উদয়-গিরিশিখরে সূর্য্যোদয়ের আভা লাগলো; উদয়-গিরিকে ফুল-দিয়ে পূজো কোরে

(সকলে)—

কাঁটার পর্ব্বত! সোনার চূড়া! উদয়গিরি!
তোমারে যে পূজলাম সুমঙ্গলে,
আসুন তাঁরা আপন বাড়ি।

(বনদেবীর প্রতি সকলে)—

তোমার হোক্ সোনার পিঁড়ি।

সূর্য্যোদয়ের আলোর মধ্যে জোড়া-ছত্র মাথায় দিনরাত্রি শরৎ-বর্ষার দুই নৌকোয় পা রেখে সমুদ্রের উপরে ভাদুলীর আবির্ভাব।

(সাগরের গান)

সাত-সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে!

(বনদেবী সাগরের প্রতি)—

সাগর! সাগর! বন্দি।

(মেয়ে)—

তোমার সঙ্গে সন্ধি।

(সাগরকে ঘিরিয়া সকলে)—

ভাই গেছেন বাণিজ্যে,
বাপ গেছেন বাণিজ্যে,
সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে!

(আকাশ-বাণী)

ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ।

(সকলে মিলিয়া নমস্কার)—

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর
জোড়নৌকায় পা।
আসতে-যেতে কুশল করবেন
ভাদুলী-মা!

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে ভাদুলী-অনুষ্ঠানের তৃতীয় দৃশ্য বা পালা সুরু হল;—ভাদ্রের শেষদিন, নতুন শরতের সকাল ঘুমন্ত-গ্রামখানির উপরে এসে পড়েছে, মেয়েদের খিড়কির পুকুর কানায় কানায় পরিপূর্ণ, তারি উপরে সোনার রোদ

ঝিক্‌মিক্ করছে, পুকুরের পাড়ে জোড়া তাল-গাছ। তাতে বাবুই-পাখীর বাসা।

(বাবুই-পাখী গাইছে)—

পুঁটি! পুঁটি! উঠে চা'।
ভাদুলী মায়ে বর দিল
ঘাটে এল সপ্ত না'।

কুটীরের ঝাঁপ খুলে, নৌকো-বরণের ডালা হাতে সব মেয়ে-বৌ একে-একে বাহির হচ্ছে।

(বুড়ি পড়্সী)—

পড়্সী লো পড়্সী!
তাল-তাল পরমায়ু, তালের আগে চোখ!
ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয় কোন্ বাড়ীর নোক্?

(মেয়েরা, বৌরা)—

আমার বাড়ির নোক্, আমার বাড়ির নোক্!

দূরে ডঙ্কা পড়লে একদল বাবুই কিচ্‌মিচ্ করে বাসা ছেড়ে উড়লো।

(মেয়েরা সকলে)—

বাবুই বাসা দল দল!
নৌকা ব'রতে ঘাটে চল, ঘাটে চল!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সকালবেলার নদীতীরে ভাদুলীর পালা সাঙ্গ হচ্ছে;—গঙ্গার অনেক-দূরে-দূরে ঘর-মুখো নৌকো, সাদা-সাদা পালগুলি দেখা দিয়েছে। কতকগুলি নৌকো পরের পর এসে ঘাটে লাগল, যাত্রী ওঠা-নাবার, নৌকো ভেড়াবার কোলাহল; প্রবাসীরা সব পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে ডাঙায় নামছে।

(মেয়েরা নৌকাবরণ কোরে)—

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম,
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম!
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দুর দিলাম,
বাপ-ভায়ের দর্শন পেলাম।

(বৌরা জলে কলাবৌ ও ফুল ইত্যাদি ভাসাইয়া)—

কলার কাঁদি! কলার কাঁদি!
তোমাকে দিলাম গঙ্গায়,
আমরা গিয়া রাঁদি।

(যাত্রী ও নাবিকদলের গান)

একুল ওকুল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।
এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,
এক নৌকা ছাড়লাম।
ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই,
সকল নৌকা পেলাম।

(সুতো ধরিয়া সকলকে ঘিরিয়া মেয়েরা)—

দিক্ দিক্ সকল দিক্
সকল দিকেই বামুন।
ব্রজে হোক্ বাণিজ্যে হোক্
দেবতায় বেঁধে রাখুন।

[গায়ে নামাবলী কোশাকুশি হাতে গ্রামের আচার্য্যির প্রবেশ]

(আচার্য্যি)—

নম নম ভাদুলীদেবী ইন্দ্রের শ্বাশুড়ি
বছর বছর রক্ষা কোরো ব্রতীর পুরী।

[যবনিকা]

যার যে-কথাটি এবং ক্রিয়াটি কেবল সেইটুকু নির্দ্দিষ্ট করা এবং প্রত্যেক দৃশ্যের গোড়ায় যা-যা আল্‌পনা দেওয়া হয় সেইগুলি একটু বর্ণনা করে দেওয়া ছাড়া, ছড়াগুলির সংস্থানে আমি কিছুমাত্র উল্টোপাল্টা করিনি; অথচ কেমন সহজে আপনি এর নাট্য-অংশটা

বেরিয়ে এল! এই ব্রতের প্রত্যেক ছড়া, ঘটনা-স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আপনিই এক-এক অঙ্কে ভাগ হয়ে রয়েছে দেখি। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘরের লোকরা সন্ধান করছে, যারা বাইরে গেছে তাদের নিরাপদে দেশে আসার প্রতীক্ষা করছে, কামনা করছে। এটি প্রতীক্ষা ও বিরহের অঙ্ক। তৃতীয়, চতুর্থ দৃশ্য হল মিলনের;—নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ছে, পথে-ঘাটে আনন্দ। এটাকে একটা মহানাটক বলা চলে না কিন্তু নাট্যকলার অঙ্কুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়।

ছেলে-ভুলোনো ছড়া একটিমাত্র ভাব, দৃশ্য বা ঘটনা নিয়ে যেমন কোরে সেটাকে বর্ণন করে, ভাদুলীব্রতের ছড়াগুলি তো জিনিষটাকে আমাদের সাম্‌নে তেমন কোরে উপস্থিত করছেনা! ছেলেভুলোনো ছড়া, যেমন—

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ী এস,
সেঁজ নেই, মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বস।
ডিবে ভরে পান দেব গাল ভরে খেও,
খিড়কি-দুয়োর খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেও।

কিম্বা যেমন—

আঁটুল-বাঁটুল-শ্যামলা-সাঁটুল
শ্যামলা গেছে হাটে,
শ্যামলাদের মেয়েগুলি
পথে বসে কাঁদে!

আবার যেমন—

ইকড়িমিকড়ি চাম্‌চিকড়ি
চাম্‌কাটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামুদার
দামুদার ছুতোরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

এবং—

ভাতে পড়ল মাচি
কোদাল দিয়ে চাঁচি ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, মাসি, পিসি, মজুমদার, দামুদার, ছুতোরের পো—এম্‌নি নানা ঘটনা, নানা পাত্রপাত্রী যথেষ্ট রয়েছে; কিন্তু এদের নিয়ে অভিনয় বা নাটক করা চলেনা। কিন্তু ভাদুলীর অনুষ্ঠান গাছ-পালার মধ্যে, নয়তো ষ্টেজে সিন্ খাটিয়ে একদিন লোককে দেখিয়ে দেওয়া চলে।

ভাদুলী-ব্রতের মতো আরো ব্রত রয়েছে যার ছড়াগুলি আলাদা-আলাদা টুকরো-টুকরো জিনিষ নয় কিন্তু একটি সমগ্র পদার্থ, পুরো একটি নাটিকা—যদিও খুব ছোটো!—ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখানি। এই সব ছড়ায় নানা রসের সমাবেশ দেখা যায়,—শুধু কামনাটুকু জানানো এই-সব ছড়ার উদ্দেশ্যও নয়। দুই রকমের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একশ্রেণীর ছড়া কামনাকে স্বর দিচ্ছে—সুর দিচ্ছেনা; কিম্বা মনের আবেগের অনুরণনও তার মধ্যে নেই। এই ভাবের ছড়া দিয়ে মেয়েদের এই সেঁজুতী ব্রতটি গাঁথা হয়েছে। সেঁজুতী খুব একটি বড় ব্রত। "সকল ব্রত কল্লেন ধনি, বাকি রইল সাঁজ-সুঁজনী।" এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিষ আল্‌পনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে. ফুল ধরে এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো-টুকরো। কেবল কামনা জানানো ছাড়া আর কিছু পাইনে, যেমন—

সাঁজপুজন সেঁজুতি
ষোল ঘরে ষোল ব্রতী;
তার একঘরে আমি ব্রতী।
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর—
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর।
(দোলায় ফুল ধরে)—
বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ি যায়।
আসতে-যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায়।
(বেগুনপাতায় ফুল ধরে)—
বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তোলা।
(এম্‌নি প্রত্যেক জিনিষে ফুল ধরে)—
মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের ফোঁটা!
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা।
গুয়ো গাছ! কাঁকুনী গাছ!
মুঠে ধরি মাজা।
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর,
ভাই হয়েছেন রাজা।
শর, শর, শর!
আমার ভাই গাঁয়ের বর।
বেণা, বেণা, বেণা!
আমার ভাই চাঁদের কোণা!
আম-কাঁটালের পিঁড়িখানি
তেল কুচ্‌ কুচ্‌ করে।
আমার ভাই অমুক যে
সেই বসতে পারে।
বাঁশের কোঁড়া! শালের ঢোঁড়া।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘী,
আমি যেন হই রাজার ঝি।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ,
আমি যেন হই রাজার বৌ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি,
আমি যেন হই রাজার রাণী।
কুলগাছ, কুলগাছ, ঝেঁকুড়ি!
সতীন বেটি মেকুড়ি।
ময়না, ময়না, ময়না!
সতীন যেন হয়না।
হাতা, হাতা, হাতা!
খা সতীনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি!
সতীন মাগি টেরী।
পাখী, পাখী, পাখী!
সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি!
বঁটি, বঁটি, বঁটি!
সতীনের শ্রাদ্ধে কুট্‌নো কুটি।
অসৎ কেটে বসৎ করি,
সতীন কেটে আল্‌তা পরি।
চড়ারে, চড়িরে, এবার বড় বান,
উচু করে বাঁধবো মাচা,
বসে দেখবো ধান।
ওই আসছে টাকার ছালা,
তাই গুণতে গেল বেলা।
ওই আসছে ধানের ছালা,
তাই মাপতে গেল বেলা।
কেনরে নাতি এত রাতি?
কাদায় পড়িল ছাতি,
তাই তুলতে এত রাতি?
এস নাতি, বস খাটে,
পা ধোওগে গড়ের মাঠে।
সোনার ভেঁটা দেব হাতে,
খেল্‌ করবে পথে পথে।

গঙ্গা-যমুনা জুড়ি হয়ে,
সাত-ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে,
গঙ্গাযমুনা পুজ্যন্,
সোনার থালে ভুজ্যন্।
চন্দ্রসূর্য্য পুজ্যন্,
সোনার থালে ভুজ্যন!
সোনার থালে ক্ষিরের লাড়ু,
শঙ্খের উপর সুবর্ণের খাড়ু।
অরুণঠাকুর বরণে,
ফুল ফুটেছে চরণে।
যখন ঠাকুর বর দেন,
আপনার ফুল কুড়িয়ে নেন।

ইত্যাদি—

এইবার মাঘ-মণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি। পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ব্রত চলে। এই ব্রতের ছড়া দেখি তিন-অঙ্কে ভাগ করা রয়েছে। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্য্যের উদয় বা শীতের পরাজয় ও সূর্য্যের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ে, শেষ অংশে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়। প্রথম দৃশ্যপট উঠলো—

প্রথম দৃশ্য

শীতের শেষ রাত্রি, কুয়াসা তখনো ঘন হয়ে চারিদিক ঢেকে রয়েছে, রাত্রের ফুল-ছুটি শিশিরের ভারে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকে পড়েছে, একটুখানি বাতাসে ঘাসের শীষগুলি দুলে-দুলে সেই ফুলছুটির সঙ্গে দিঘির জল থেকে-থেকে স্পর্শ করতে লেগেছে। মালীর বাগানে ছোটো-ছোটো ফুলবালারা আর গ্রামের ব্রতীরা পুকুরের পাড়ে সব পা-মেলে ফুলের আগায় পুকুরের জল নিয়ে খেলা করতে লেগেছে।

(ফুলবালারা)—

চোখে-মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?

(ফুলেরা)—

ইতল বেতল সরুয়া সরুয়া দুটি ফুল লাগে!

দিঘির ওপার থেকে নাগেশ্বরের মন্দিরের মালী প্রশ্ন করছে—"ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন মালী"—

(মালী)—

বলি, কি কি ফুলে মুখ পাখালি?

(ফুলেরা)—

ইতল বেতল দুই ফুলে!
সরুয়া মরুয়া দুই ফুলে!

(মালী)—

সেই ফুলে খা'ন কি?

(ফুল)—

নল ভেঙে জল খান?

(ফুলবালারা, ফুলেরা, ঘাসেরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে)—

যে জল ছোঁয়নালো কাকে বগে,
সে জল ছুঁই মোরা দুর্ব্বার আগে!

ব্রতীরা, ফুলবালারা, ফুলেরা সকলে আছোঁয়া পুকুরের পরিষ্কার জল মুখে-চোখে দিচ্ছে; সাজি-হাতে মালিনীর প্রবেশ এবং এই কাণ্ড দেখে মালিনীর রঙ্গভঙ্গ ও উচ্চ হাস্য।

ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মেলেনীটা খট্‌খটাইয়া হাসে।

হেসে যে মালিনী কি বলছে তা পরের উত্তর-প্রত্যুত্তর থেকে বেশ এঁচে নেওয়া যায়।

মালিনী বলছে যেন—একি? একি? আজ যে বড় "ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে!" ওমা এই শীতের রাত না পোহাতে গেরস্তর মেয়ে তোমরা এই আঘাটায় কেন গো?

(মেয়েরা)—

হাসিস্‌নালো, খুসিস্‌নালো,
তুই তো আমার সই!
মাঘ-মণ্ডলের বর্ত্ত করুম্,
ঘাট পামু কৈ?

(মালিনী)—

আছে আছেলো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট!

(মেয়েরা)—

রাত পোহালে বামুনগো পৈতে-ধোয়নের ঠাট।
সেখানে আমরা যাবনা মালিনী, জল ভালো নয়—"পৈতা-কচ্‌ল্যানো জল পুকুরেতে ভাসে।"

(মালিনী)—

আছে আছে লো ঘাট, গোয়ালবাড়ির ঘাট!

(মেয়েরা)—

গয়লাগো দই-ক্ষিরের হাঁড়ি-ধোওনের ঠাট।

(মালিনী)—

নাপিতবাড়ির ঘাট?

(মেয়েরা)—

নাপিতগো খুর-ধোওনের ঠাট!

(মালিনী)—

ধোপাবাড়ির ঘাট?

(মেয়েরা)—

ধোবাগো কাপড়-ধোওনের ঠাট!

(মালিনী)—

ভুঁইমালির ঘাট।

(মেয়েরা)—

ভুঁইমালিগো কোদাল-ধোওনের ঠাট!

(মালিনী হাসিয়া)—

মেলেনী-বুড়ির ঘাট?

(মেয়েরা)—

মেলেনী-বুড়ির ফুল-ধোওনের ঠাট!

(গান)

মালী— আধাগাঙ্গে ঝড়বিষ্টি,
আধাগাঙ্গে মালী,
মধ্যখানে পড়ে রয়েছে
জৈত্ ফুলের ডালি।
মেয়েরা—কৈ যাসলো মালিনী
ফুলের সাজি লৈয়া?
মালিনী—ফুল ফুটেছে নানা রকম
ডাল পড়েছে নুইয়া।
সকলে—আগের ফুল তুলিস্ নালো
কলি-কলি!
গোড়ের ফুল তুলিস্ নালো
বালি-বালি!
মালিনী—মধ্যের ফুল তুইলা আনিস
নাগেশ্বরের মালী।
নাগেশ্বরের মালীরে!
কোন্ কোন্ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি?
কোন্ কোন্ ডালে খাইলি-লইলি?
কোন্ কোন্ ডালে নিশি পোহাইলি?
মালী—জইতের ডালে রাঁধিলাম-বাড়িলাম,
অতসীর ডালে খাইলাম-লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম!
সকলে—জইত-গাছেকে ডাল নামাইয়া দে.
সূর্য্যি-ঠাকুর চাইছেন ফুল
সাজি ভরিয়া দে।

এইখানে ফুল-তোলার পালা সাঙ্গ হয়ে দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হল—কুয়াশার মধ্যে একটি ফুলগাছের সামনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মেয়েরা বেত্রলতা হাতে)

কুয়া ভাঙ্গুম্, কুয়া ভাঙ্গুম্, বেত্‌লার আগে।
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে।
ওরে রে বরই গাছ, ঝুল্লন দে!
দে দে বরইরে, ঝুল্লন দে!

বেত্রলতার আগে জল ছিটাইয়া কুয়াশা ভাঙার অভিনয়। সকলে মিলিয়া তার পরে সূর্য্যের স্তব।

(মেয়েরা)—
উঠ উঠ সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া!
(সূর্য্য)—
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের* লাগিয়া।
(মেয়েরা পরস্পরে)—
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য্য কোন্‌খান দিয়া?
(মালিনী)—
উঠিবেন সূর্য্য বামুন-বাড়ির ঘাটখান দিয়া!
(মেয়েরা)—
উঠ উঠ সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
(সূর্য্য)—
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।
(মেয়েরা)—
উঠিবেন সূর্য্য কোন্‌খান দিয়া?
(মালিনী)—
গোয়াল-বাড়ির ঘাটখান দিয়া।

এমনি কত ঘাটেরই নাম হল কিন্তু কোনো ঘাটেই সূর্য্য উদয় হলেন না। শেষে বুড়ি মালিনীর ঘাট, যেখানে ফুলের গন্ধ-জল পুকুরেতে ভাসছে সেইখানে সূর্য্যোদয় হল—কুয়াসা ভেঙে। এইবারে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ের পালা আরম্ভ হল।

প্রথম দৃশ্য

বাসর-ঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য্য। কুঞ্জের মধ্যে সকাল হচ্ছে।

(চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে)—
কাউয়ায় করে কল্‌মল্! কোকিলে করে ধ্বনি!
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, মা বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার মা তোমার শ্বাশুড়ি, মা বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বাপ বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার বাপ তোমার শশুর, বাপ বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বইন বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার বোন তোমার ননদ, বইন বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, ভাই বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার ভাই তোমার দেওর, ভাই বলিও তারে
(চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে)—
কাউয়ায় করে কল্‌মল্! কোকিলে করে ধ্বনি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সূর্য্যের বাড়ির সম্মুখ, বৈতালিকের গান)

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন বাড়ি-বাড়ি।

* শিশিরের

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর বিয়া করতে চায়।
(পড়সী)—
বিয়া করলেন সূর্য্য ঠাকুর
দানে পাইলেন কি?
(বৈতালিক)—
হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন
আর মাধবের ঝি।
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন
আর মাধবের ঝি।
লেপ পাইলেন, তোষক পাইলেন,
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,
থালা পাইলেন, খোরা পাইলেন,
আর মাধবের ঝি।
(পড়সী)—
মায়ের জন্য আনছেন কি?
(বৈতালিক)—
শাঁখা সিঁদুর!
(পড়সী)—
বাপের জন্য আনছেন কি?
(বৈতালিক)—
হাতি ঘোড়া!
(পড়সী)—
বৈনের জন্য আনছেন কি?
(বৈতালিক)—
খেলানের সাজি।

(গৌরী বা সন্ধ্যা—সূর্য্যের আগের স্ত্রীকে দেখিয়া চুপি চুপি)

(পড়সী)—
সতের জন্য আনছেন কি?
(বৈতালিক)
কুঁইয়া পুঁটি!
(গৌরী)—
খামুনা লো খামুনা লো, শিয়রে থুমু।
রাতখান পেহাইলে কাউয়ারে দিমু।

(শাঁখ বাজাইয়া, উলু দিয়া, কনে-বরণের ডালা ইত্যাদি লইয়া একদল মেয়ের প্রবেশ।)

(মেয়েরা)—
উরু উরু দেখা যায় বড়-বড় বাড়ি।
ঐযে দেখা যায় সূর্য্যের মার বাড়ি।
(সূর্য্যের মার বাড়ির দরজায় গিয়া)—
সূর্য্যের মা* লো কি কর দুয়ারে বসিয়া?
তোমার সূর্য্য আসতেছেন জোড়-ঘোড়ায় চাপিয়া
(সূর্য্যের মা)—
আসবেন সূর্য্য বসবেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
গা হেলাবেন সোনার খাটে,
পা মেলাবেন রূপার পাটে,
ভাত খাইবেন সোনার থালে,
বেঞ্জন খাইবেন রূপার বাটিতে,
আঁচাইবেন ডাবর ভরা,
পান খাইবেন বিড়া বিড়া,
সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া,
খয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা,
চুন খাইবেন খুট্‌রী ভরা,
পিক্ ফেলাইবেন লাদা লাদা!

বরবেশে সূর্য্য চন্দ্রকলা-বধূকে লইয়া জাঁকজমকে আপনার পুরীতে প্রবেশ কল্লেন।

* বেদে উষাকে সূর্য্যের মা বলা হয়েছে।

(নট-নটীর নৃত্যগীত)

নট—সোনার বাটি ঝুমুর-ঝুমুর
মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্য্যঠাকুর
নাইতে গেলেন কৈলো।
নাইয়া-ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈলো॥
নটী—বাটি বাটি কুমার আটি,
সক্কল পুড়িয়া গেল।
লক্ষটাকার বাটি আমার
হারাইয়া গেল।
নট— গেছে গেছে ইহ বাটি
আপদ-বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম-নে
চাকা সোনা দিয়া।
উভয়ে—সোনার বাটি ঝুমুরঝুমুর
মিষ্টি বাটির তৈল।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্য্যের অন্তঃপুর। সূর্য্যের বাপ-মা এবং ভাই-ভগিনী খুড়ো-খুড়ি ও ভাণ্ডারী সিক্‌দার যে যার কাজে। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। এদিকে, ওদিকে বিয়ের দান-সামগ্রী ছড়ানো। চন্দ্রকলার দেশ থেকে সবার জন্য উপহার এসেছে, কেবল সূর্য্যের বড়-স্ত্রী গৌরী বা সন্ধ্যা কিছু না পেয়ে চোখ মুছতে-মুছতে সূর্য্যের ধাইমার কাছে গিয়ে বাপের বাড়ি যাবার জন্য বলছেন।

(গৌরী)—
'আগা'টনী পানবাটনী ধাই-শ্বাশুড়ি গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা? *
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(ধাই)—
কি জানি, কি জানি বউ গো,
জান গিয়া তোমার শ্বশুরের ঠাঁই।

(গৌরী)—
বাড়ির কর্ত্তা শ্বশুর-ঠাকুর গো!
আমারে নি নাইয়র দিবা?
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(শ্বশুর)—
কি জানি, কি জানি বউ গো,
জান গিয়া তোমার শ্বাশুড়ীর ঠাঁই।

(গৌরী)—
বাড়ির গিন্নি শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী গো,
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(শ্বাশুড়ী)—
কি জানি, জান ননাশের ঠাঁই।

(গৌরী)—
আনাজ-তরকারি-কুটনী ননা'শ-ঠাকুরাণী গো—

(ননাশ)
জি জানি, জান দেওয়রের ঠাঁই।

(গৌরী)
লেখইয়া পড়ইয়া দেওয়র গো—

(দেওয়র)—
জান সিক্‌দারের ঠাঁই।

(গৌরী)
আড়লের ভাঁড়লের কর্ত্তা সিক্‌দার হে—
(সিকদার টাকে হাত বুলাইয়া)—
জান তোমার সোয়ামীর ঠাঁই।
(গৌরী সূর্য্যের কাছে গিয়া)—
ঘরগৃহস্থী সোয়ামী হে!
আমারে নি নাইয়র দিবা?
আমারে নি নাইয়র দিবা?

* নাইয়র দেওয়া=বাপের বাড়ী পাঠানো।

(সূর্য্য রাগিয়া)—
আনব চিকন্ চাটিলের চটা *
ভাঙিব গৌড়া নাইয়রের ঘটা!

এইখানে সূর্য্যের পুত্র লাউলের পালা আরম্ভ হল—"রাওল বা সূর্য্য-পুত্র ঋতুরাজের বিয়ে"। রাতুল থেকেও লাউল কথাটি আসা সম্ভব।

প্রথম দৃশ্য—ঋতুরাজ রাওলের সঙ্গে মাটির কন্যা হালামালার বিয়ের আয়োজন চলছে। সকলে নানা আয়োজনে ব্যস্ত; সূর্য্যের বাপ হুঁকো-হাতে চালা বাঁধাতে ব্যস্ত। বাঁশ দড়ি খড় ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো। লোকজন, ঘরামিরা কাজের একটু অবসরে হাঁড়ি বাজিয়ে গান ধরেছে—

(গান)
কাউয়া বলে কা,
রাত পোহাইয়া যা!
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসার কাঁধা,
আজ লাউলের বড় বাড়ি বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা।
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
বড় বাড়ি বাঁধা।
কলাবাগান বাঁধা।
কাউয়া বলে কা,
রাত পোহাইয়া যা!

(কাদা-মাটির ঝুড়ি মাথায় একদল মালি-মালিনীর প্রবেশ)
কাদা মাটির তলেলো কাদামাটি,
তাতে ফেলাইলাম কাঁঠালখানি,
কাঁঠালের আগে লো তুলাখানি,
তা'তে বসাইলাম বামুনহাটি।

(ঘটক-ব্রাহ্মণের প্রবেশ)
(ব্রাহ্মণকে হুঁকা দিয়া সূর্য্যের বাপ)—
বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া,
ভাদুলা তামুক খাইও।
আমার লাউয়ের বিয়ার সময়,
ফুল মন্ত্র পড়িও।
(হাঁড়ি পাতিল লইয়া কুমোরের প্রবেশ)
(সূর্য্যের বাপ)—
কুমার ভাইয়া, কুমার ভাইয়া,
ভাদুলা তামুক খাইও।
আমার লাউয়ের বিয়ার সময়
হাঁড়ি পাতিল দিও।
(ধোপা,নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ।)
(সূর্য্যের বাপ)—
ভাদুলা তামুক খাইও,
ভায়া, ভাদুলা তামুক খাইও!

দ্বিতীয় দৃশ্য—লাউলের বিয়ের ভোজ। অন্দর-বাড়ীতে রন্ধনশালায় সূর্য্য ঘুরে-ঘুরে তদারক করছেন—গামছা মাথায়। জেলে সঙ্গে সিক্‌দারের প্রবেশ।

(সিকদার)—
সূর্য্যগো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল,
তা'তে উঠিলনা কিছু মাছ।
(জেলেনীদের মাছ লইয়া প্রবেশ)
জেলেনীরা—উঠলো লো, উঠলো মাছ।
সিক্‌দার—নিবে কে?

* বাঁশের চটা।

জেলেনী—ওই আস্‌ছে বামুন-মেয়ে
খালুই হাতে করে।
(মেয়েরা খালুই ভরিয়া মাছ লইল)
সিকদার—নিলাম লো, নিলাম লো !
মাছ কোটে কে ?
ব্রাহ্মণী—ওই আসছে মাছকুটুনী
বঁটি হাতে করে।
(মাছকুটুনী মাছ কুটিতে বসিয়া গেল)
সিক্‌দার—কুটলাম লো কুটলাম !
মাছ ধোয় কে ?
মাছকুটুনী—ওই যে আসে ধোয়নী
ঘটি হাতে করে।
(ধোয়নী মাছ ধুইতে লাগিল)
সিকদার—ধুলাম লো ধুলাম !
মাছ রাঁধে কে ?
মাছাধোয়নী—ওই যে আসে রাঁধুনী
আগুন হাতে করে।
(রাধুনীর রাঁধা আরম্ভ)
সিকদার রান্নার ধোঁয়াতে চোখ মুছিয়া, নাক সিটকাইয়া
—খাইবে কে ?
রাঁধুনী—ওই আসছে খাউনী
থালা হাতে করে !
(সকলে খাইতে বসিয়া গেল)
সিক্‌দার (সনিশ্বাসে)—এঁটো নেবে কে ?
খাউনীরা—ওই আসছে এঁটো-নেওনী
গোবর হাতে করে !
সিকদার চটিয়া সকলকে ধাক্কা-ধোক্কা দিয়া—
যা নেওনি, মাছকুটুনি, আশধোয়নী,
মাছর ধুনী, ভাতখাওনী, পাত্‌কুড়োনি যা।
(সিকদারণী)—
আমরা নিমো, ধুমো, রাঁধমো,
কুটমো,খামো, ফেল্‌মো, যেমন-তেমন কৈর‍্যা !

ব্যস্ত হইয়া সূর্য্যের বাপের প্রবেশ।
(বাপ)—
পান দিবে কে ?
সিক্‌দার—ওই আসছে পান-খাওয়ানী
ডিবা হাতে করে।
বাপ— বিছানা পাতিবে কে ?
সিকদার—ওই আসছে বিছানা-পাতুনি
তোষক হাতে করে।
সিকদারণী—শুইবে কে ?
—ওই আসছে শুয়নী বালিস
হাতে করে।
সিকদার—রাত পোহাইবে কে ?
—ওই আসছে রাত-পোহানী
কাউয়া হাতে।
(গান)
কাউয়া বলে কা !
রাত পোহাইয়া যা !

তৃতীয় দৃশ্য—হালা-মালার বাড়ি, ছাদনা-তলায় একদল স্ত্রী ও পুরুষ বরবেশী লাউলকে আর হালা-মালাকে লইয়া। সকলে ফুল ছিটাইতে ছিটাইতে—

এপারে লাউল, ওপারে লাউল,
কিসের বাদ্য বাজে ?
রাজার বেটা সওদাগর
বিয়ে করতে সাজে।
সাজো সাজন্তি লাউল
মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজার কন্যা
তুইলা দিব বিয়া।
সাজ সাজন্তি লাউল
পায়ে নেপুর দিয়া।

ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা
তুইলা দিব বিয়া।
(ফুল ছিটাইয়া গান)
আমের বইল আসে লো লোচা লোচা।
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।
(মালি-মালিনীর গান)
ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়,
সে ফুল গেল দখিন্ গাঁয়।
মালিনী—দখিন গাঁইয়া মালীরে !
মালী— ফুলের ডালা লবিরে ?
মালিনী—হাতে কলসী, কাঁখে পোলা
কেম্‌নে লব ফুলের ডালা রে !
এইখানে মাটির সঙ্গে রায় বা সূর্য্যের ছেলে রাওলের (লাউলের) বিবাহের ও মিলনের পালা শেষ হল। এর পরে ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফুলে-ফুলে উর্ব্বরা করে বিদায় হচ্ছেন। মেয়েদের লাউলকে ধরে রাখবার চেষ্টা।—
কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া ?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে
বাজনা জানাও গিয়া।
ধোপা জানাও গিয়া,
নাপিত জানাও গিয়া,
পুরুইত জানাও গিয়া।
কিন্তু ঋতুরাজের তো থাকবার জো নেই, তাঁকে একলা যেতেই হবে। আবার শীতের মধ্যে দিয়ে তিনি ফিরবেন—এই আশ্বাস দিলেন এবং মেয়েরা বিদায়-ভাজের আয়োজন করে লাউলের ছোটো ভাই শিবাইকে পাত কেটে আনতে বলে চাল ধুতে বস্‌লো।
চাউল ধুমু, চাউল ধুমু,
চাউলের মালো পানি
চাউল ধুইতে পড়লো চাউল,
পাটি বিছাইয়া ধলো চাউল
যত বর্ত্তিয়ে জানি।
তারপর আলোচাল দুধের জলে লাউলের স্নান।
আলোচালে কাঁচা দুধে লাউল ছান করে
শ্বশুর-বাড়ী বউ থুইয়া লাউল ভাতে মরে।
(এদিকে শিবাই কলাপাতা কাটছেন)
মালী— লাউলের বাগানে
কেরে কাটে পাত ?
শিবাই—লাউলের ছোট ভাই
শিবাই কাটে পাত।
মালী— শিবাই রে, শিবাই রে !
না কাটিও পাত।
শিবাই—বাইছা বাইছা কাটুমনে
সব্‌রি কলার পাত।
মালী— সব্‌রি কলার পাতে নাকি
লাউলে খায় ভাত ?
বাইছা বাইছা কাট গিয়া
চিনিচম্পা কলার পাত !
এদিকে লাউলের বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়াতে বসেছেন—
১
লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে
কি কি নাম থুমু ?
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।
বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয়া কমল নাম থুমু।
জল দিয়া জয় নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা
রাজা নাম থুমু।
লাউলের ঘরে ছেইলারে
কি কি গয়না দিমু ?

হাত জোখা বলয়া দিমু,
গলা জোখা হার দিমু,
বুকজোখা পাটা দিমু
কোমর জোখা টোড়া দিমু,
পাঁওজোখা গুজরী দিমু,
দুই চরণে নেপুর দিমু,
লাউলের ছেইলা নাচবে,
রাজার রাজ্য হাসবে।

২

লাউলের ঘরে ছেইলালো
দুধ খাইবে কিসে ?
রাজার বেটা পাশা খেইলা
বাটি জিনিয়া নিছে।
পাশা খেলিয়া জিনলাম কড়ি,
কিনে আনলাম কপিলেশ্বরী,
কপিলেশ্বরী কিবা খায় ?
পুকুর-পাড়ে দুর্ব্বা খায়।
দুর্ব্বা খাইয়া লো সই শুকাইল দুধ,
কি দিয়া পালবো মোরা লাউলের ঘরে পুত ?
লাউলের ঘরের পুত নালো শক্ত বেড়ার মাটি,
বর্ত্তি গো ভাই যেন লোহার কাটি !

লাউলের ছেলেকে ঘুম-পাড়িয়ে হালামালা একশত বহিন সঙ্গে জলে নাইতে চল্লেন।

আসলো শত বইন্ জলেরে যাই ;
জলেরে যাইয়া লো ঝাপ্পাটি খেলাই।

হাতের শাঁখা, টাকা-কড়ি, পায়ের নুপুর এমনি সব নানা জিনিষ জলে ফেলে-ফেলে কুড়িয়ে খেলা।

খেলতে খেলতে নালো দুপ্পুর বেলা।

যখন জল থেকে উঠে এসে লাউলকে তারা ডাকছে তখন মধুমাস শেষ ; ঋতুরাজের যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে ; তিনি চলেছেন। বৈশাখের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঝড়-বাতাসে লাউলের আসন যেখানে মেয়েরা দেখছে সেখানে ফুলে-ভরা জইতের একটি ডাল ভেঙে পড়েছে—

জইতের মটকা ডাল ভাইঙ্গা পড়লো ঘরে,
লাউলের দুধভাত ছচি হইয়া পড়ে !

তখন মেয়েরা লাউলকে একটু অপেক্ষা করে কিছু খেয়ে যেতে মিনতি করছে—

খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত ;
আমরা শত বইনে ফেলাম-নে পাত।

বৈশাখের মেঘ গর্জ্জন করে উঠলো, ঝড় হুহু বইলো, উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ড-ভণ্ড করে গরম বাতাসে ধুলো উড়লো, মলিন-মুখে মেয়েরা ঋতুরাজকে বিদায় দিলে ;—

আজ যাও লাউল,
কাল আইসো।
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও॥

[পালা সাঙ্গ]

এই মাঘমণ্ডল-ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্য যা, তাঁকে সেই-রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াসা ভেঙে দিলে সূর্য্য-উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হল সূর্য্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হ'ল কুয়াসা ভেঙে দেওয়া ও সূর্য্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্য্যকে রাজা-বর এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি বাপেরবাড়ির যে-সব ছবি আছে, সূর্য্যের রূপকের ছলে সেইগুলোকে মূর্ত্তি দিয়ে

দেখছে। তৃতীয় অংশে সূর্য্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব ; টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্ত্তি মানুষে গড়েছে, এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হল ; তাকে জামায়ের আদরে খাওয়ানো-দাওয়ানো হলো ; তার ছেলেকে ঘুম-পাড়ানো, দুধ খাওয়ানো, মানুষ করে তোলার নানা কাজ। এই পুতুল-খেলা আর-একটু অগ্রসর হলেই মা-যশোদার নীলমণিকে ক্ষীর সর ননী খাওয়ানো ;—"খাওয়াবো সর, মাখাবো ননি।" এবং জগন্নাথকে খিচুড়ি-ভোগ রাজভোগ দিয়ে, তাঁর রাজবেশ হস্তীবেশ এম্‌নি নানাবেশ এবং রুক্মিণীহরণ চন্দনযাত্রা এম্‌নি তাঁর নানা লীলা গড়ে নিয়ে মূর্ত্তি-পূজার পুরো অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়।

ভাদুলী-ব্রতটি আমরা দেখলেম বর্ষা—দেশ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় হচ্ছে, আর শরৎ আসছে—এরি একটা উৎসব। মাঘ-মণ্ডল ব্রতে শীতের কুয়াসা কেটে সূর্য্যের আলোতে ঝল্‌মল্ বসন্ত দিনগুলি আসছে তারি উৎসব। দু-জায়গাতেই মানুষের মনের কামনা নাট্য-ক্রিয়ায় আপনাকে ব্যক্ত করলে। এমনি শস্যপাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ প্রচুর শস্যের কামনা করছে ; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্যে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়-হাতে দাও দাও করছে তাও নয় ; সে যে ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল-ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এম্‌নি নানা ক্রিয়ার প্রকাশ কচ্ছে। বর্দ্ধমান-অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্যপাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্রমাসের মন্থন-ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থন-ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অরহর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয় ; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং ইঁদুর-মাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয় ; দ্বাদশী পর্য্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে ; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র-দ্বাদশীতে এই উৎসব ; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান ! নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন-দেওয়া-আল্‌পনা ; কোথাও মাটির ইন্দ্র-মূর্ত্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্যপাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত-ধরাধরি-করে বেদীর চারি-দিক ঘিরে নাচ গান সুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দ্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে ;—

ভাঁজো লো কল্‌কলানী, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।
এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘী,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি ?

এর পর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে-মুখে ছড়া-কাটাকাটি করে—

পূর্ণিমার চাঁদ হেরে তেঁতুল হলেন বঙ্ক!
গড়ের গুগ্‌লী বলে—আমি হব শঙ্খ!
ওগো ভাঁজো তুমি কিসের গরব কর?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার!

সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচ-গান, ছড়া-কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিক্‌মিক্—এই ছবির একটি সুন্দর বর্ণনা পূর্ব্ববঙ্গের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা পাই—

ষোল ষোল বর্ত্তির হাতে ষোল সরা দিয়া,
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এর পরে রাত্রি শেষ; মেয়েরা আপন-আপন শস্‌পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিম্বা নদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্য-বপন-ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হল এবং অনুষ্ঠান শেষ হল উৎসবের নৃত্যগীতে। কিন্তু দুঃখের দিনও বছরের মধ্যে আসে—যখন পাতা ঝরে যায়, মাটি তেতে ওঠে, জল ফুরিয়ে যায়! সেই সব দিনে মনের নিসন্নতার ছবিও ব্রতে ফুটেছে দেখি! সেদিনের বসুধারা ব্রতের ছড়ায় কেবল জল আর জল!

কাল বৈশাখী আগুন ঝরে!
কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই!

উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই,—কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো ছড়াটুকু হতাশ জানাচ্ছে। অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই-বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরিহে রক্ষা কর' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতু-বিপর্য্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিল প্রাণ-সংশয়, সেই তখনকার মানুষরা কোনো অনির্দ্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিন্ত হতে পারতো না; সে বৃষ্টি দাও বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলছে। এবং সে নিশ্চয় জানছে বৃষ্টির কামনা করে দল-বেঁধে তারা মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে শিকের খোঁচায় ফুটো করে বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে যে বসুধারা-ব্রতটি করছে, তাতে করে বৃষ্টির দাতা যে দেবতা তিনি তুষ্ট হচ্ছেন এবং এই প্রক্রিয়ার বলে মেঘও জল দিতে বাধ্য! এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না। কিন্তু তখনকার লোকে যে-বিশ্বাসে ব্রত করতো তার মূলে যে কামনা, এখনো পূজায় বা প্রার্থনাতে সেই কামনা, কেবল অনুষ্ঠানটা ভিন্ন রকমের; ব্রতে কামনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের স্পষ্ট সম্পর্ক দেখি, যেমন—

বট আছেন, পাকুড় আছেন,
তুলসী আছেন পাটে।
বসুধারা ব্রত করলাম
তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল,
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল-গঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে,
অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে!

ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি! আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাটে,

নৃত্যে;—এক-কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত-কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা!

বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিম্বা নাট্য আকারে, আলপনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে—কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে। নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি-আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে' আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হতো। ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো-ছোটো যাত্রার পালার মতো গাঁথা হয়েছে সেখানে নাট্য নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি।

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।

আবার যেমন—

ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়,
সে ফুল গেল দখিন গাঁয়।
দখিন-গাঁইয়া মালিরে!
ফুলের ডালা লবি রে?
কাঁখে কলসী, হাতে পোলা,
কেমনে লব ফুলের ডালা রে!

এই-সব ছড়াকে গান ছাড়া কি বলব? ছড়াগুলির বাঁধুনী আর কথা-সাজানোর ভঙ্গী এমন তালে-তালে যে এগুলিতে সুর এবং নাচ দুয়েরই টান স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। এমনি মাঘমণ্ডল ব্রতে কুয়াশা ভেঙে সূর্য্য-ওঠবার ছড়া এবং ভাদুলী ব্রতের ছড়া-গুলিতেও গীত, নাট্য দুইই রয়েছে। দুই ব্রতেই পাত্র-পাত্রী স্থান-কাল ভেদে ছড়াগুলি নাটকাকারে গাঁথা। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় একসময়ে এগুলি মন্ত্রের মতো করে বলা হতোনা,—অভিনীত হতো!

ব্রতের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে বলি আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান, তা নয়; এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল, তাও নয়! ধর্ম্ম এবং শিল্প দুইই এখানে স্বাধীন ভাবে আপনাদের দুটো দিক অবলম্বন করে চলছেনা। ব্রতের মূলে কতখানি ধর্ম্ম-প্রেরণা, কতখানি-বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত।

এখনো পাড়াগাঁয়ে রাখালেরা 'কুলাই-ঠাকুরের' ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে। সেটি থেকে ধর্ম্ম আর শিল্প ক্রমে কেমন করে স্বয়ংপ্রধান হয়ে উঠছে তার একটু আভাস পাব। পৌষ-সংক্রান্তির একপক্ষ পূর্ব্ব থেকে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি সন্ধ্যার সময় এই গানটি গেয়ে পূজার চাল ভিক্ষে করে বেড়ায়—

সকলে—ঠাকুর কুলাই ভোঁ
হ্যাটা চল রে॥ ধ্রু॥
হ্যাটা চল পাঁচিল পার।
বাঘ— ঝপৎ গিরিরে॥ ধ্রু॥
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব॥
সকলে—সুন্দের বনেরে॥ ধ্রু॥
বাঘ— সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হাম্বুর করে রব।
য়্যাক্ বাঘ রে॥ ধ্রু॥
সকলে—ঠাকুর কুলাই ভোঁ ইত্যাদি—

এই ছড়া তো শুধু আউড়ে যাবার নয়; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে-জোরে হাঁটা,

ঝাপাৎ-করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক-ওদিক দেখা এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস্ পর্য্যন্ত। এর সঙ্গে পাড়া-গাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জেলে রাখাল-ছেলেরা এবং ছেলে মেয়ে-বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাব-ভঙ্গী, খড়ের ঘর, প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে একপক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই আমরা পাবো। বাঘের ভয় থেকে গরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা করে রাখালেরা বাঘ সাজিয়ে এই বাঘের ছড়া প'ড়ে ব্রত করবে এইটেই আশা করা যায়। কিন্তু এখানে দেখছি চাল প্রার্থনা করে রাখালেরা এই বাঘের গান গেয়ে-গেয়ে রোজগার করছে। এখানে দেখছি অনুষ্ঠানের গীত-কলার অংশ ব্রতের বাকিটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে গান নাচ দুইই যদৃচ্ছা করছে; এবং ব্রতের দিন কেবল বাঘের মূর্ত্তিকে পূজো দিয়েই কাজ সারছে! এইখানে ধর্ম্মাচরণ আর শিল্পকলা দুটির ছাড়াছাড়ি হল। ব্রতের ধর্ম্মাচরণের অংশ মূর্ত্তি-পূজার দিকে এগিয়ে গেল এবং শিল্প-অংশ ক্রমে বহুরূপীর বাঘের অনুকৃতি থেকে আরম্ভ হয়ে শিল্পের উচ্চতর একটি স্থানে পৌঁছতে চল্লো। পূজার দিকে পড়লো পূজ্য মূর্ত্তি আর পূজক; আর শিল্পের দিকে এল দর্শক আর প্রদর্শক; এবং ব্রতকথা স্বাধীনভাবে কবিরা গাইতে লাগল—যেমন চণ্ডীর গান, শীতলার গান। এর থেকে রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা, পাঁচালী, কবি। এম্‌নি পরে পরে ব্রতের সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে-যেতে নিছক যাত্রা, নাটক, থিয়েটারে এসে দাঁড়ালো—সেইসব শিল্পকলা যার গোড়া-পত্তন হয়েছিল ব্রতীর কামনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়। খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতে দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আল্‌পনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিম্বা বাঘ সেজে কি আর-কিছু সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্ম্ম-কামনায় সেটা করছে এ হতেও পারে, নাও হতে পারে; বাঁধাবাঁধি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরূপীর বাঘে যেমন দাঁড়ালো, অমনি সেখান থেকে লাট-সাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্য্যন্ত হতে তার আর কোনো বাধা রইলো না। মাঘ মণ্ডলের সূর্য্যদেব যেদিন ফুলের টোপর মাথায় রায়ল বা লাউল মূর্ত্তিতে ধরা পড়লেন, সেইদিন থেকে গ্রীক আপোলো থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল, পুরীর জগন্নাথ পর্য্যন্ত সব রাস্তা খোলসা হয়ে গেল। কল্পব্রত ও পুন্যিপুকুরের বেলের ডাল পাথরে গড়া হয়ে বুদ্ধ-যুগের কল্পদ্রুম এবং আজ-কালের অস্‌লার কোম্পানীর ইলেক্‌ট্রিক বাতির ঝাড় হয়ে দাঁড়াতে চল্লো—প্রতি পদক্ষেপে ব্রতের ধর্ম্মানুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে-হতে। ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড় হয়ে ক্রমে স্বস্বপ্রধান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে,—ধর্ম্ম ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা রয়েছে দেখি। এই স্বতন্ত্রতা শিল্প-সাহিত্য এবং ধর্ম্মের প্রচারের পক্ষে দরকার কিনা এবং এই পার্থক্য থাকা ভালো কি মন্দ সেটা বিচার করতে বসা কেবল তর্ক করা মাত্র। এইটে ঘটেছে। একসময়ে দেব-মন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির এবং পুজাপার্ব্বনের সঙ্গে দেবতার চরিত বর্ণন করে চন্দন-যাত্রা রাস-যাত্রা রুক্মিণী-হরণ এম্‌নি নানা অভিনয় ও চিত্র-কার্য্য ইত্যাদি জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে-সম্পর্ক সে-গলাগলি-ভাব ছেড়েছে; ধর্ম্ম-মন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্প প্রদর্শনীতে সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আর থিয়েটারে কি গানের মজলিসে কিম্বা চিত্র-প্রদর্শনীতে গিয়ে বলা চলেনা যে আমরা ব্রতী, ব্রত করতে বসেছি!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্যাবাইন-রমণী

নাটিকা

[রোমক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা]

প্রথম অঙ্ক

[সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী মুক্তকেশী স্যাবাইন-রমণীদিগকে টানিতে টানিতে অস্ত্রধারী রোমানরা পর্ব্বত হইতে বাহির হইল; রমণীরা সকলেই আঁচড়াইয়া ও চীৎকার করিয়া বাধা দিতেছে, কেবল একজন একেবারে শান্ত নিদ্রিতপ্রায়। রোমানরা নাকের ঘায়ে অস্থির ও কাতর হইয়া রমণীদিগকে একজায়গায় জড়ো করিল এবং একটু সরিয়া গিয়া নিজেদের বিস্রস্ত বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লইল—সকলেই হাঁপাইতে ছিল। ক্রমে কোলাহল থামিল—রমণীরা রোমানদের গতিবিধি দেখিয়া সুস্থির হইল; পরে আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা সুরু হইল]

প্রথম রোমান। সত্যি, আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি—দিব্যি করে' বলতে পারি আমার যিনি, ওজনে তিনি দুশো মণের কম নন……

দ্বিতীয়। সব-চেয়ে যেটি বড় আর মোটা, সেইটিকে বেছে নেবার কি দরকার ছিল? আমি বেশ দেখে-শুনে ছোট্ট রোগাটিকে নিয়েছি—

প্রথম। ও কি হে? তোমার নাকে কি হল! সেই রোগা ছোট-খাটোটির এত দাপট…

দ্বিতীয়। আর ভাই, বল কেন! একেবারে বেরালের মত আঁকড়ে ধরে ছিল…

প্রথম। যা বলেছ! এরা বেরালের জাত, বেরালের মতই আঁচড়ায়। আমি কত যুদ্ধে গিয়েছি, কত তলোয়ারের চোট্ খেয়েছি, কত লাঠির ঘা, নুড়ি-পাথর

হজম করেছি—কত ঘর-বাড়ী পর্য্যন্ত আমার ঘাড়ে পড়েছে, কিন্তু এমন দশা আর-কখনো হয়নি··হায়, হায়, আমার এমন সাধের নাকটি একেবারে গেছে!

তৃতীয়। ভাগ্যে আমাদের গোঁফ-দাড়ি ভাল করে কামানো ছিল, তাই রক্ষে—নইলে বোধ হয় গোঁফদাড়ির একগাছি চুলও থাকত না—দেখেছ ত, তাদের আঙুলগুলো কেমন সরু সরু, সুন্দর, কিন্তু ঐ নখগুলো,—আঃ, কি বিশ্রী ধারালো! বলছি কেন? আচ্ছা, বেরালই বা বলি কেন? বেরাল তো তাদের নাম নয়। আমার-যিনি, তিনি সারা পথ কোন কথা বলেন নি বটে, কিন্তু মাথার চুল আমার একগাছিও আর মাথায় রাখেননি!

চতুর্থ। (দেখিতে খুব মোটা এবং লম্বা; একটু চড়া সুরে) আমি তার হাতদুটো বগলে চেপে ধরে আনছিলুম—কিন্তু সে আমাকে এমনি কাতুকুতু দিয়েছে যে, হেসে খুন হবার জোগাড়!

[রমণীগণের অবজ্ঞার মৃদু হাসি শুনা গেল]

প্রথম। ওহে, ওরা শুনতে পাচ্ছে...

দ্বিতীয়। ওহে, সব এসো, কান্না থামাও, গুছিয়ে ফিটফাট হও। প্রথম দিন থেকেই এঁরা আমাদের তাচ্ছল্য করলে আমাদের আর দুঃখের সীমা থাকবে না। দেখছো, পলাস কি রকম! ও-ই ঠিক মান রাখতে পারবে—

পঞ্চম। সত্যি, গায়ে একটা দাগও লাগেনি যে হে পলাস! তোমারটিকে কি করে নিয়ে এলে?

পলাস। (বিনয়ের ভাণ করিয়া) তা ভাই জানি না। গোড়া থেকেই সে আমায় এম্‌নি জড়িয়ে ধরলে, যেন আমি তার চিরকালের স্বামীটি—কিন্তু তোমরা আমায় অবাক করলে! কেন, এরা তো বেশ শান্ত, নিরীহ। যেই আমি তাকে তুলে নিলুম, অম্‌নি সে দু'হাত দিয়ে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরলে—ভয় হচ্ছিলো, বেশী জড়িয়ে ধরে' শেষে চেপে না মেরে ফেলে! হাতগুলো তার রোগা বটে, কিন্তু ভারী শক্ত···

প্রথম। পলাস, তোমার খুব জোর বরাত, যাহোক—

পলাস। বল্‌ছি ত শান্ত, নিরীহ। সে মনে-মনে বুঝতে পারলে, তাকে আমি ভালবাসব, খুব খাতির করব। অর্দ্ধেক পথ ত সে ঘুমন্ত ছোট্ট ছেলেটির মতই এলো ···এ-সব বলছি বটে, কিন্তু তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস করছ না···

স্থূলকায় ভদ্রলোক। মশাইরা—থাক্, ও-সব কথা এখন রাখুন। কোন্‌টি কার, এখন বেছে নেওয়া যায় কেমন করে? অন্ধকার রাত্রে খাঁচার মধ্যে থেকে মুর্গী চুরি করার মত তাদের নিয়ে এসে···

রমণীগণ। (ক্রুদ্ধস্বরে)। দেখেচ মিন্সের উপমার ভঙ্গী!

প্রথম। ওহে, ওরা যে আমাদের কথা সব শুনতে পাচ্ছে।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। (মোটা গলায়) আচ্ছা, ওদের এখন বেছে নেওয়া যায় কি করে? আমারটি কিন্তু ভারি আমুদে, সেটি আমি কাউকে নিতে দিচ্ছি না—আমার উপর যে কেউ চাল চালবে, সে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। গোবর-গণেশ!

তৃতীয়। আমারটিকে তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারব—তাঁর সে স্বর আমি ভুলব না, মরে' গেলেও না।

পঞ্চম। আমারটির হাতের নখ দেখেই চেনা যাবে।

সিপিও। আমারটিকে তার চুলের মিষ্টি গোস্‌ব্‌ থেকে চিনতে পারবো।

পলাস। মনের সৌন্দর্য্য আর বিনয়েই আমারটিকে চেনা যাবে। ওহে শোন, আজ থেকে আমাদের জীবন-ধারায় কিছু পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আমরা আজ গার্হস্থ্য জীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি—একা থাকার কষ্ট আজ থেকে আর ভোগ করতে হবে না।

চতুর্থ। ঠিক বলেছ হে, আজ থেকেই আমরা সংসারে প্রবেশ করতে চলেছি!

রমণীগণ। (ব্যঙ্গের সুরে) তা বই কি! একবার চেষ্টা করে দেখুন না—আসুন না সব এগিয়ে!

প্রথম। ওহে, তোমরা কি করছো? ওরা যে সব শুনতে পাচ্ছে।

দ্বিতীয়। আর দেরী নয়, এবার সময় হয়েছে···

তৃতীয়। কিন্তু আগে যাচ্ছে কে?

[সকলে নির্ব্বাক ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; রমণীগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিল]

চতুর্থ। আমি আগে যাচ্ছি না—যত কাতুকুতু খাবার, তা খেয়েছি—আর-কেউ চেষ্টা করগে, তবে আমার উপর যে কেউ চাল চালবে, সেটি হবে না। আচ্ছা পলাস, তুমিই আগে যাও না!

পলাস। মুখ্যু, দেখছো না, আমার প্রেয়সী এখনও ঘুমুচ্ছেন! পাথরের কাছে কালো ঝোপের মত যে জায়গাটা, ঐ যে ঐ দিকে চেয়ে দেখ না, ঐ যে তিনি! কি শান্ত, নিরীহ!

সিপিও। তোমরা গোল চোকাতে যে গোলমাল বাধাচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে, ঐ নিষ্ঠুর জীবগুলির কাছে এগুতে তোমাদের কারও সাহস নেই। আমি একটা ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক করেছি—

চতুর্থ। বেশ বেশ, বল ত ভাই।

সিপিও। আচ্ছা, আমার পরামর্শটা শোনো। খুব ধীরে-সুস্থে, চল, সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই—সবাই সবাইয়ের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলুন—ওদের স্বামীদের ভয় করলুম না, আর ওদের—

স্থূলকায় ভদ্রলোক। ওদের স্বামী! ছি, ছি, কি বলছো তুমি!

[রমণীদের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল —ক্রন্দনের লক্ষণও প্রকাশ পাইল]

প্রথম। ওহে, ওরা যে সব শুনতে পাচ্ছে।

সিপিও। আবার মুখ খুলছো! লক্ষ্মী-ছাড়া স্বামীগুলোর কথা কেউ তুলো না। বোঝ না, ঐ কথাটায় সুন্দরী অবলাদের মনে ভারী ব্যথা! আচ্ছা, আমার ব্যবস্থায় কারও অমত নেই ত?

সকলে। কোন আপত্তি নেই, কোন আপত্তি না—সবাই মত দিচ্ছি।

সিপিও। আচ্ছা, তাহলে সকলে···

[সৈনিকেরা আক্রমণে ও রমণীরা আত্ম-রক্ষায় প্রস্তুত হইল। রমণীদের ধারালো নখ উদ্যত দেখা গেল—আঁচড়াইতে আর চুল

ছিঁড়িতে তাহারা প্রস্তুত। সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মত একটা শব্দ শুনা গেল। সৈনিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল অর্থাৎ পরস্পরের পিছনে লুকাইতে গিয়া সকলেই ক্রমে আরও পিছাইয়া আসিল। রমণীরা হাসিয়া উঠিল —সৈনিকেরা হতভম্ব হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।]

প্রথম। সিপিও, আমার মনে হয়, তোমার এ ব্যবস্থায় কিছু খুঁৎ ছিল—সক্রেটিস থাকলে বলতেন, আমরা পিছন দিকে এগুলুম।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। আরে এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না যে!

পলাস। ওহে বীরত্ব দেখাও, ভয় পেয়ো না—ক'টা নখের আঁচড়ে কি আসে যায়? একবার শেষ পর্য্যন্ত লড়তে পারলে তারপর কত সুখ, কত মজা! চলো, সব এগিয়ে চলো।

[সৈনিকেরা সকলে গোলযোগ করিয়া রমণীদের আক্রমণ করিল, কেবল পলাস স্থিরভাবে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল! সকলে কিছুক্ষণ আক্রমণের পর দ্রুত পশ্চাৎপদ হইল। পরে সব চুপচাপ—সৈনিকেরা নিজের নিজের নাকে হাত বুলাইতে লাগিল]

সিপিও। (নাকি সুরে) সবাই বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, ওরা এবার মোটেই চীৎকার করেনি! ভারী খারাপ লক্ষণ, চেঁচানো যে ছিল ভাল—

প্রথম। কিন্তু এখন করা যায় কি?

দ্বিতীয়। গার্হস্থ্য জীবন উপভোগের জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছে—

তৃতীয়। আচ্ছা, রাজ্য ত বসানো গে আর কেন? ঢের হয়েছে—এবার বিশ্র না নিলে আমার আর চলছে না।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। মশাইরা, দুর্ভাগে বিষয় এই যে, স্ত্রী-জাতির মনস্তত্ত্ব ভাল ক জানে, এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই যুদ্ধ করে' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, আম একেবারে অসভ্য, বেরসিক বনে গেছি- রমণী কি বস্তু, তা পর্য্যন্ত একবারে ভু গেছি!

পলাস। (সবিনয়ে) না, সকলে তা ব ভোলে নি।

সিপিও। এরা যে এক-সময়ে স্বামী ঘর করেছে, সেই সব স্বামী, যাদের আম যুদ্ধে হারিয়েছি—এই থেকে আমি সিদ্ধা করছি, অপরিচিত স্ত্রীলোককে হাত করা কোন উপায়—কোন গূঢ় উপায় নিশ্চ আছে—কিন্তু সে উপায়টা যে কি, তা ব করা যাচ্ছেনা।

চতুর্থ। আচ্ছা, ওদেরই যদি উপা জিজ্ঞাসা করা যায়?

প্রথম। বলবে না, বলবে না।

(রমণীরা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উঠিল)

দ্বিতীয়। ওহে, করছো কি! সব শুনতে পাচ্ছে।

সিপিও। আমি একটা ব্যবস্থা ঠি করেছি—

চতুর্থ। তুমিই বুদ্ধিমান বটে, বিচক্ষণ—

সিপিও। এ-সব সুন্দরী বন্দিনীদে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ওদের ধ দূরে থাক্, ওরাই আমাদের বন্দী করেছে। মুখ আঁচড়াতে, চুল ছিঁড়তে আর বগ

কাতুকুতু দিতে এরা এম্‌নি ব্যস্ত থাকে যে, আমাদের কথাই শুনতে পায় না! আর শুনতে পায় না বলেই আমাদের কথায় ভোলে না, আর সেইজন্যেই ত ওদের মনে বিশ্বাস জন্মে দিতে পারছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

[রোমানরা সবাই "ব্যাপারটা এই" বলিয়া গম্ভীরভাবে ভাবিতে বসিল এবং রমণীরা তাহাদের কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল]

সিপিও। তবে শোন, সামরিক ব্যবস্থা-মতে আমাদের দল থেকে একজনকে দূত করা যাক্, আর আমাদের সুন্দরী বিপক্ষদেরও তাই করতে বলা হোক্—তখন দুপক্ষের দূতেরা সাদা নিশেনের তলায় দাঁড়িয়ে একটা ব্যবস্থা—

[সৈনিকেরা বক্তৃতায় বাধা দিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সিপিও সকলের মতে দূত নির্ব্বাচিত হইয়া শ্বেতপতাকা হাতে লইয়া রমণীদিগের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিল—"ওহে, আমায় একলা ফেলে তোমরা পালিয়ো না যেন"]

সিপিও। (প্রার্থনার সুরে) সুন্দরীগণ, আপনারা যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন। দেখতেই পাচ্ছেনত, আমার হাতে সাদা নিশেন রয়েছে—সাদা নিশেন অতি পবিত্র বস্তু এবং আমার দেহ এখন যদি আপনারা স্পর্শ করেন, তাহলে সেটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ হবে, জানবেন। অতএব রমণীগণ, শুনুন, সবেমাত্র কাল আমরা আপনাদের ধরেছি। ধরে আমরা আনন্দ যদিও লাভ করেছি, তা কিন্তু পুরোমাত্রায় নয়। কারণ, এর মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসম্বাদ—

ক্লিওপেট্রা। কি আস্পর্দ্ধা! একটা ছড়ির ডগায় এক টুকরো সাদা ন্যাকড়া বেঁধে ভাবছে, এই-সব কথা বলে অপমান করবে!

সিপিও। (সানুনয়ে) আজ্ঞে, ক্ষমা করুন। এ-সব অপমানের কথা নয়—ভুল বুঝছেন আপনারা। সত্যি, দিব্যি করে বলছি, আমরা আপনাদের প্রেমে পড়েছি—আমাদের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি দেখে একটা প্রার্থনা জানাতে সাহস হচ্ছে। দয়া করে আমাদের মত আপনাদের ভিতর থেকেও একজনকে দূত ঠিক করুন—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, আমরা জানি, সব শুনেছি, তোমায় আর-কিছু বলতে হবে না—

সিপিও। সে কি! কি করে শুনলেন? আমরা তো খুব চুপিচুপি সব বলাবলি করছিলুম

রমণীগণ। হয়েছে, হয়েছে, ও সব কথাই আমরা শুনেছি—

ক্লিওপেট্রা। তোমার ও ন্যাকড়া নিয়ে যেখান থেকে এসেছো, সেইখানে ফিরে যাও। যাও, বলছি। আমরা গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি—না, আরও দূরে চলে যাও। আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে হবে না। ঐ ওখানে হাঁ করে রয়েছে, ওটা কে? [পলাসকে দেখাইয়া] ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও...

রোমানরা। (আস্তে আস্তে) এইবারেই ঠিক কাজ আরম্ভ হলো—

[রোমানরা আস্তে আস্তে সরিয়া গেল এবং কেহ কেহ রমণীদের মনে বিশ্বাস

উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কানে হাত চাপা দিল]

প্রথম রমণী। কি অপমান, কি ভীষণ অত্যাচারই আমাদের উপর করছে! আহা, বেচারা স্বামীরা—

দ্বিতীয় রমণী। বেচারা স্বামীদের কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অবিশ্বাসিনী হবার আগে শপথ করে বলছি, হাজার রোমানের চোখ কানা করে দেবো। প্রিয়তম আমার, ঘুমাও, ঘুমাও—এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমার মান ঠিক বজায় রাখব—

তৃতীয়া রমণী। আমিও তাই দিব্যি করছি···

চতুর্থ রমণী। আমিও—

ক্লিওপেট্রা। শপথ তো তোমরা সবাই করলে, কিন্তু তাতে হবে কি? এই বর্ব্বর অশিক্ষিত লোকেরা কি ও-শপথের মান রাখতে জানে? ধর না কেন, যে আমায় ধরে এনেছে—যদিও তার নাক আমি কামড়ে নিয়েছি—

প্রথম রমণী। এখনও তোর তাকে মনে আছে?

ক্লিওপেট্রা। (অবজ্ঞাভরে) মরবার সময় পর্য্যন্ত তাকে মনে থাকবে—বর্ম্ম তলোয়ার আর সৈনিকদের গায়ে কি সব থাকে, সে সবের সেই বদ্ গন্ধ, উঃ, কি নির্দ্দয়ভাবেই আমায় পীড়ন করেছে! হায় প্রিয়তম, কোথায়, তুমি কোথায়!

প্রথম রমণী। ওদের সবাইয়ের গায়েই, ভাই, বিশ্রী গন্ধ—

দ্বিতীয় রমণী। ভাল্লুকের মত চেপে ধরা ওদের সবাইয়েরই স্বভাব। বোধ হয়, এটা একটা সামরিক নিয়ম—

তৃতীয় রমণী। ছেলে-বেলায়, আমার মনে আছে, একজন ছোকরা সৈনিক একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল—বলছিলো, সে অনেক দূর থেকে এসেছে, আর সেখানে—

ক্লিওপেট্রা। ওলো, এটা আমাদের ছেলেবেলাকার গল্প বলবার জায়গা নয়—

তৃতীয় রমণী। হাঁা, সেই ছোকরার কথা বলছিলুম—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা জুনো, যখন প্রত্যেকেরই ঘাড়ে একটা করে সৈনিক আপাতত রয়েছে, তখন তোমার সেই ছোকরার কথা শুনে আমাদের আর কি হবে? এখন কি করা যায়, তাই ভাবো। একটা মতলব আমি ত ঠিক করেছি—

ভেরোনিকা। (ঘুম হইতে উঠিয়া আসিল —চেহারা খুব রোগা এবং আশ্চর্য্যরকম লম্বা—চোখদুটি তখনও অর্দ্ধমুদ্রিত—অলস-ভাবে ক্লিওপেট্রার কথায় বাধা দিয়া সে কথা কহিল) কৈ, তারা কৈ? ও কি, অতদূরে! কাছে আসছে না কেন? ওরা কাছে না থাকলে আমার ভারী লজ্জা করবে —এতক্ষণ ঘুমের ঘোরে ছিলুম। আমার যে ছোকরাটি এনেছে, তাকে তো কৈ দেখতে পাচ্ছি না—তার গায়ে বেশ একটা গন্ধ—

ক্লিওপেট্রা। ঐখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছো না? ঐ যে, মুখ হাঁ করে—

ভেরোনিকা। আমি ওর কাছে যাবো—

ক্লিওপেট্রা। ওলো, সবাই ওকে ধরে রাখ্—আচ্ছা, ভেরোনিকা, এরি মধ্যে কি

তোমার প্রিয়তম স্বামীকে একেবারে ভুলে গেলে?

ভেরোনিকা। ওগো না, সত্যি বলছি, তাকে কখনো ভুলবো না। কিন্তু ওদের কাছে তোমরা যাচ্ছো না কেন? বোধ হয়, নিজেদের ভেতর কিছু ঠিক করেছো—যাই হোক না, সব করতেই আমি প্রস্তুত আছি। —কারো সঙ্গে রাগারাগির পরই ভাবটা বড় বেড়ে যায় কি না!

ক্লিওপেট্রা। শোন ভাই সকলে, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য আমাদের বেচারা স্বামীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। এইটে সকলে শপথ কর—ওরা যেমন ব্যবহারই করুক, আমরা পাহাড়ের মত অটল থাকবো। যখনই মনে হচ্ছে, বেচারা স্বামী আমার একলা রয়েছে—শূন্য শয্যায় পড়ে বৃথাই ডাকছে —ক্লিওপেট্রা, ক্লিওপেট্রা, তুমি কোথায়? যখনই তার প্রেমের কথা মনে পড়ছে—

(রমণীরা কাঁদিতে লাগিল) এসো, শপথ করো—ভাবছো কি? স্বামীরা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে—

রমণীরা। শপথ করছি, এরা আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুক, আমরা স্বামীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না।

ক্লিওপেট্রা। এই ঠিক,—তাদের কথা মনে হলেই আমার একটু শান্তি আসে—প্রিয়তম, ঘুমাও, শান্তিতে ঘুমাও। আমাদের তারপর একটা কাজ আছে—রোমানদের মত একজনকে দূত ঠিক করা, আর তাকে—

প্রথম রমণী। তাকে বলে দেওয়া, ওদের ঐ দুটোর চোখ ক'টা গেলে দেওয়া—

দ্বিতীয় রমণী। না, না, তা নয়, ওরা শুধু আমাদের নখের পরিচয় নিয়েই যাবে? আমাদের মনের কথা কি, তাও জেনে যাক্।

ভেরোনিকা। যখন ওদের হাতেই রয়েছি, তখন এ-সব কথা আর কেন?

ক্লিওপেট্রা। চুপ করো, ভেরোনিকা,—রোমান আইনে যাই-ই থাক্ না কেন, জোর যার মুল্লুক তার নয়। আমাকে তোমরা দূত ঠিক করো, আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসবো যে আমাদের এখানে আটকে রাখবার ওদের কোন অধিকার নেই—আমাদের ছেড়ে দিতে ওরা বাধ্য। ওরা যে আইনেরই দোহাই পাড়ুক, আর যাই বলুক না কেন,—এটা সত্যি যে ওরা একেবারে নিরেট বর্ব্বরের মত কাজ করেছে—

রমণীগণ। যাও, যাও, ক্লিওপেট্রা, তুমিই যাও—

প্রথম রমণী। ভেরোনিকা, তোমায় কিছু বলতে হবে না, চুপ করো—

ক্লিওপেট্রা। মশাই, ও সাদা পতাকা-ধারী দূত-মশাই, এখানে এগিয়ে আসুন—আমি একটু কথা কইতে চাই—

সিপিও। আমার অস্ত্রশস্ত্র কি সরিয়ে ফেলবো?

ক্লিওপেট্রা। না, তার দরকার নেই—তা করতে হবে না। ভেবো না যে, তোমার ঐ সব অস্ত্র দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি। চলে এসো, ভয়ের কিছু নেই—তোমায় আমি কামড়াবো না। সেদিন রাত্রে যখন সেই নিস্তব্ধ রাত্রে বাড়ীতে ঢুকে বেচারা স্বামীর হাতের ভিতর থেকে আমাকে বর্ব্বর ডাকাতের মত জোর করে কেড়ে নিয়ে এলে, তখনতো এত ভীতু

ছিলে না! আচ্ছা, যাক—যদি আসবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে এগিয়ে এসো—

সিপিও। ভদ্রে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি—

ক্লিওপেট্রা। মুগ্ধ হয়ে গেছি! রাহাজান, চোর, পাগল কোথাকার—খুনে, পাজি, রাক্ষস, হতভাগা—কাজ যা করেছ, সে কি বিশ্রী, জঘন্য—

সিপিও। ভদ্রে—

ক্লিওপেট্রা। কি ভীষণ আমায় পীড়ন করেছো ভাবো! তোমায় দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে! —গায়ে তোমার সৈনিকের গন্ধ, নাকে আঁচড়ানোর দাগ, ও-সব যদি না থাকতো, তা হলে—

সিপিও। ক্ষমা করবেন—এ সব আপনারাই করেছেন—

ক্লিওপেট্রা। আমি? ও, তুমিই সেই লোকটা? (ঘৃণাভরে দেখিল) আচ্ছা, কিছু মনে করো না—আমি চিনতে পারি নি।

সিপিও। (সানন্দে) কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—আপনার চুলে সেই ভারবেনার গন্ধ ছিল না? এখনো আছে?

ক্লিওপেট্রা। যে গন্ধই থাক্, তোমার তাতে কি দরকার?—ভারবেনার গন্ধ কি সব-চেয়ে ভাল নয়?

সিপিও। ঠিক। আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম—

[সিপিও অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল—মঞ্চের দক্ষিণে রোমানরা এবং বামে রমণীরা—উভয় পক্ষই ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া সন্ধি-প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিল]

ক্লিওপেট্রা। কিছু বলো বা নাই বলো সে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার গ সম্বন্ধে আমিতো কিছু বলিনি—আচ্ছা, সম্বন্ধে মুখ্যুর মত বক্‌বক্ করবার দরকার? থাক্, ঢের হয়েছে—ভদ্রলোকে মত মশাই, এখন এগিয়ে এসো আমাদে নিয়ে কি করতে চাও, বল—

[সিপিও সবিনয়ে মাথা নীচু করিল এ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর মুখে হা দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিল—রোমানরা সবাই খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগি এবং রমণীরা গভীর অবজ্ঞাভরে দাঁড়ায় রহিল]

ক্লিওপেট্রা। (লজ্জায় রক্তিম হইয়া) খিল্‌খিল্ করে হাসলে কথার উত্তর হবে না তোমরা কি ভয়ঙ্কর—আচ্ছা, বলছো না কেন—আমাদের নিয়ে কি করতে চাও—তোমরা কি করতে চাও? তোমরা সবাই বোধ হয় জানো—আমাদের সকলেরই বিবাহ হয়েছে এবং আমাদের স্বামী আছেন!

সিপিও। ভদ্রে, যদি অভয় পাই ত বলি, তোমাদের হাতে আমরা প্রাণ-মন দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—

ক্লিওপেট্রা। সত্যি! তোমরা সব তাই ভাবছো? তোমরা পাগল!

সিপিও। আমাদের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ—আমরা সব ফুলবাবুর মত বেড়াচ্ছি না—আমাদের কাজকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেও ব্যস্ত নই। আমাদের কথা একবার ভেবে দেখ। একটু দয়া কর,—যদি সকালে তোমাদের স্বামীরা উঠে দেখে, তোমরা কাছে নেই—তাহলে মনে মনে কিছু

তাদের জন্যে একটু দুঃখ হবে, জানি? কিন্তু ভাখ, আমরা সব একলা রয়েছি—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি। সত্যি, বড় একলা—

ভেরোনিকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) ওদের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে—

সিপিও। যে শুভ মুহূর্ত্ত হারিয়েছি—হে ভদ্রে, যাক্, ক্ষমা কর—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের স্বামীদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করছি—

ক্লিওপেট্রা। [সমম্ভ্রমে] তোমার মুখে এ কথা শুনে খুসী হয়েছি—

সিপিও। কিন্তু সে মুখ্যুগুলো—তারা তোমাদের ছেড়ে দিলে কেন?

[রোমানরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঠিক বলছো, সিপিও, ঠিক বলছো"—কিন্তু রমণীরা ক্রোধভরে—"কি নীচ,—আমাদের স্বামীদের অপমান করছো—মিথ্যাবাদী বদমায়েসের দল"]

ক্লিওপেট্রা। (কর্কশ স্বরে) যদি এভাবে সন্ধি প্রসঙ্গ করো, তা হলে প্রার্থনা করছি—আমাদের স্বামীদের বিষয় বলবার সময় একটু সম্মান রেখে কথা কয়ো।

সিপিও। নিশ্চয়। খুব সম্মানের সঙ্গেই বলবো—কিন্তু দেখ, যতই আমরা সম্মান করি না কেন, তারা তোমাদের অযোগ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ঠিক এ সময়, যখন তোমাদের অমানুষিক যাতনা আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করছে—পাহাড়ের ঝরণার মত স্বামী-বিরহ-বেদনা-জনিত উষ্ণ অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে—এমন কি, এই পাথরগুলো তোমাদের দুঃখে নড়েচড়ে দুঃখ আর বিরক্তি জানাচ্ছে—

ক্লিওপেট্রা। থাক্, আর বেশী আড়ম্বর করে বলতে হবে না—

সিপিও। যখন সমস্ত প্রকৃতি,—বেশ থাক্—আচ্ছা, তোমাদের স্বামীরা কোথায়? তাদের কেন দেখছি না? তারা তো এলোই না—নিশ্চয় তারা তোমাদের ত্যাগ করেছে—যদিও তোমাদের রাগ হবে শুনে, তবুও বলছি—তারা অতি নীচের মত তোমাদের ত্যাগ করেছে—

[কোমরে হাত রাখিয়া রোমানরা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল—রমণীরা উত্তেজিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল—প্রসারপিনা মৃদুস্বরে বলিল, "ঠিক কথা, সত্যি তারা তো এখানে নেই—এই সময়েই তো তাদের এখানে আসা উচিত ছিল।"]

ক্লিওপেট্রা। বাঃ, চমৎকার! সত্যি, তোমাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী ভারি সুন্দর—কিন্তু ভাবছো কি যে রাত্রে ডাকাত পড়ে আমাদের চুরি করে' নিয়ে আসে—

সিপিও। সে কি, আমরা যে সারারাত প্রহরীদের সঙ্গে—

ক্লিওপেট্রা। আর যদি দিনের বেলায়—

সিপিও। না, না, না, দিনের বেলায় চুরির কথা ভেবো না—

[ভেরোনিকা অলসভাবে বলিল—"কি বিশ্রী! অতদূরে এরা রয়েছে কেন? দূরে থাকলে যে আমার ভারী লজ্জা করে! আরও কাছে আসছে না কেন?]

স্ত্রীলোকেরা। (মৃদু স্বরে) ওকে থামাও, চুপ করাও—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, তোমাদের সব দোষ সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে আমরা দুঃখিত,

কারণ যৌবনের স্রোতে তোমরা বিপথগামী হয়েছো। আর তোমাদের কষ্টের জন্যেও আমরা সহানুভূতি করছি। যাক্,—এবার কিন্তু এমন কথা বলবো, যাতে তোমাদের সব আশা ঘুচে যাবে, তোমরা লজ্জিত হবে। আচ্ছা, মশাইরা, আমাদের ছেলেদের অবস্থা কি হবে, ভেবেছেন ?

সিপিও। হাঁ, ঠিক বলেছ, সত্যি সে একটা গুরুতর সমস্যা। আচ্ছা, অনুমতি দাও, দলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কয়ে আসি—

[পরস্পর পরস্পরের দলে ফিরিয়া গৈল এবং আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।]

সিপিও। ভদ্রে—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, বল, কি হলো ?

সিপিও। বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডার পর আমার বন্ধুরা অর্থাৎ প্রধান রোমানরা তোমাদের বলতে বল্লেন—যে তোমরা আবার শীঘ্রই নতুন সন্তান লাভ করবে—

ক্লিওপেট্রা। [চমকিয়া] কি ! তোমরা এত বর্ব্বর !

সিপিও। শপথ করছি, মশাইরা সব শপথ করুন—

[রোমানরা গোলমাল করিয়া শপথ করিল]

ক্লিওপেট্রা। কিন্তু চারদিকের দৃশ্য তত মনোরম নয়—

সিপিও। (রাগতভাবে) চারদিকের দৃশ্য !

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, এ বড় ভয়ানক জায়গা —চারদিকে পাহাড় আর চুড়ো—একেবারেই বিশ্রী। এখানে এ পাথরটা রয়েছে কেন ? সরিয়ে ফেল—

সিপিও। আচ্ছা, সরিয়ে ফেলছি—

[পাথরটি সরাইল]

ক্লিওপেট্রা। আর এ রকম গাছপালা—আমার এখানে দম আটকে যাচ্ছে—এ একটা বিশ্রী গাছ এখানে, তোমরা বড় ক্লান্ত, নয় ? আচ্ছা—আমি যাচ্ছি, এখনি এসে উত্তর দেবো—

সিপিও। উত্তর, কিসের উত্তর ?...

ক্লিওপেট্রা। কেন, আমায় যে একটা প্রশ্ন করলে ?

সিপিও। আমি, ক্ষমা করো—আমি কি বোকা হয়ে যাচ্ছি ? তোমায় আবার কিসের বিষয় প্রশ্ন করবো—

ক্লিওপেট্রা। আমায় অপমান করবে, ভাবছো !

সিপিও। অপমান করব ? আমি ?

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, তুমি এখনি বল্লে না, যে বোকা না কি হয়ে যাচ্ছো—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ তুমিই—ওসব কথা আমি কিছু বলিনি—নিজে বলে আবার ভুলে যাচ্ছো—

সিপিও। কে ? আমি ?

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, আমি চল্লুম—কথা কইতে দেরী হলে কিছু মনে করো না, ততক্ষণ একটু নিজেকে সাফ বুঝে দেখো। তোমার চেহারাখানি দেখবার জিনিষ। আচ্ছা, তোমার কি একখানা রুমালও নেই ? মুখটা মুছে ফেল, ঘামে একেবারে ভিজে গেছে যে, যেন কত পাথর বয়ে এসেছ ! [সরিয়া যাইবার ভাণ করিল)

সিপিও। কিছু মনে করো না—আমার বিশ্বাস, তাই করে এলুম—কিন্তু তোমাদের জন্যেই করতে হলো—

ক্লিওপেট্রা। আমার জন্যে ? কৈ, আমি তো ওসব কিছু বলিনি—

সিপিও। আচ্ছা, ক্ষমা কর। যাক্—কি বলছিলুম ?

ক্লিওপেট্রা। আমি তা কি করে জানবো ?

সিপিও। ও বুঝেছি, আমায় নিয়ে ঠাট্টা করছো—

ক্লিওপেট্রা। তুমি সেটা লক্ষ্য করেছো, দেখচি।

সিপিও। আমায় নিয়ে ঠাট্টা ! আর না—

ক্লিওপেট্রা। কি করে আটকাবে ?

সিপিও। আমি এখনও অবিবাহিত—ভগবানকে ধন্যবাদ—

ক্লিওপেট্রা। আ মরি, আবার ভগবানকে ধন্যবাদও আছে ! বা, বেশ বলেছো—তোমাদের শপথে বিশ্বাস করলে কি বিপদেই পড়তুম—(সঙ্গীদের) ওলো, শুনেছিস্, এদের যে স্ত্রী নেই, এর মধ্যেই এরা কৃতজ্ঞ—

সিপিও। কি সর্ব্বনাশ ! হয় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা থামাও, নয়—

ক্লিওপেট্রা। নয় ত কি ?

সিপিও। নয়ত বাড়ী চলে যাও—হ্যাঁ, আমি বলছি, তোমরা বাড়ী ফিরে যাও—ঢের হয়েছে। আর কেন ? এই শেষ সত্যি, রাজ্য তো বসালুম, কিন্তু সে কি এই সব অসঙ্গত তর্ক-বিতর্ক শোনবার জন্যে ?

ক্লিওপেট্রা। অসঙ্গত ?

সিপিও। তা না ত কি !

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমায় অপমান করছো...

সিপিও। বা, কাঁদতে আরম্ভ করলে—কি চাও, বলতো ?—আমায় বার বার দোষ দিচ্ছ কেন ? প্রবীণ হতে চল্লুম, কিন্তু তুমি দেখছি, আমায় পাগল করে দেবে ! ঢের হয়েছে, কান্না থামাও গো, বলি কি ব্যাপার,মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না যে ! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছো—ব্যাপারখানা কি ?

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের যেতে দেবে ?

সিপিও। নিশ্চয়। রোমানগণ, তোমাদের সবাইয়ের মত আছে ? আমি তো হাল ছেড়েছি—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা সব চলে যাক্—ইটুরিয়া থেকে এবার কতকগুলো স্ত্রীলোক ধরে আনা যাবে—

সিপিও। আচ্ছা, বেশ। তাই ভালো —এ জীবগুলো স্ত্রীলোকই নয়—এরা একেবারে—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সত্যি বলছো !

সিপিও। সত্যি আবার কি ?

ক্লিওপেট্রা। আমাদের যেতে দেবে ! হয় তো ফন্দী করেছো, যেই যাবো, অমনি গিয়ে ধরে আনবে—

সিপিও। না, না, দৌড়ে পালাও—এখানে কি আঠা দিয়ে আমরা জুড়ে রেখেছি ?

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের রেখে আসবে ?

সিপিও। কি সর্ব্বনাশ ! তারপর—

ক্লিওপেট্রা। তোমরা তো জানোই, যখন এখানে এনেছো, তখন আমাদের রেখে আসতে ভদ্রতার খাতিরে তোমরা বাধ্য—পথটাও বড় সহজ নয়—

[রমণীরা বিদ্বেষভরে হাসিল—রাগে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সিপিও কিছু বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল এবং মাটীতে পা ঠুকিয়া দলের কাছে ফিরিয়া গেল —রোমানরা সবাই রমণীদিগের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া রহিল—রমণীরা আস্তে আস্তে পরামর্শ আরম্ভ করিল]

ক্লিওপেট্রা। তোমরা সবাই শুনেছো—আমাদের এরা যেতে দেবে—

ভেরানিকা। কি ভয়ানক!

দ্বিতীয় রমণী। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে—এ একেবারে অসহ্য! নিরীহ ভাল মানুষ আমরা, আমাদের ধরে নিয়ে এসে—রাত-দুপুরে বাড়ীশুদ্ধ জাগিয়ে তুলে জিনিষ-পত্র সব ভেঙ্গে-চুরে তচ্‌-নচ্‌ করে—ছেলেগুলোর ঘুম ভাঙ্গিয়ে, আর তারপর কিনা এখন এখানে টেনে এনে বলে,—তোমাদের চাই না!

প্রথম রমণী। বেচারা স্বামীরা আমাদের বৃথাই বসে' কষ্ট করছে—

দ্বিতীয় রমণী। ব্যাপারটা সব ভাবো দিকি। সেই রাতদুপুরে একেবারে মরার মত সবাই যখন ঘুমুচ্ছে—

তৃতীয় রমণী। আচ্ছা, তোমাদের কারো ফিরে যাবার পথ জানা আছে?

চতুর্থ রমণী। কি আশ্চর্য্যি! তুমি কি ভাবো যে সারা পথ লক্ষ্য করতে করতে এসেছি—তাতো করিনি, আর করাও যায় না—তবে বেশ মনে আছে, পথটা অনেক—

তৃতীয় রমণী। এটা ঠিক, এরা আমাদের ফিরিয়ে রেখে আসবে না—

[রমণীগণের চাপা হাসির শব্দ]

ভেরোনিকা। (দুঃখের সুরে) দেখেছো, আমার সেই লোকটিকে ওরা পিছন করে বসিয়েছে? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি—

প্রথম রমণী। ভেরোনিকা, থামো,—তোমায় ছেড়ে সে যাবে না—আমাদের ব্যবস্থাটা আগে শেষ হয়ে যাক্‌—

প্রসারপিনা। আচ্ছা, আমাদের তো স্বামী নিয়ে কথা—এরা বা তারা, তা নিয়ে কি আসে যায়! তারা বেশ, অথচ এরাও মন্দ নয়—স্বামী নিয়ে গোলযোগ করবার দরকার নেই। বাড়ী গেলেই সে স্বামীটি আগেই খাবার করে' দিতে বলে, বরং এ নতুনটিকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাবে—সে স্বামীটি তো আমার হাতের তৈরি খাবার খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে, বোজ বকাবকি করে। কিন্তু এ আহাম্মকটা আমার রান্না পেলে খুব আমোদ করে খাবে—

ক্লিওপেট্রা। ছি ছি প্রসারপিনা, কি বলছো—ইতিহাসে আমাদের দুর্নাম থেকে যাবে যে!

প্রসারপিনা। কত ইতিহাস আমাদের ব্যাপার জানতে পারবে? আর এখানে রোমেতে এটা মোটেই খারাপ নয়।

ক্লিওপেট্রা। প্রসারপিনা, কি বিশ্রী কথা তুমি বলছ! ভাবছো কি, ওরা ঐ সব কথা শুনছে? কিন্তু শোন—আর একটা মতলব ঠিক করেছি—যদিও সেই প্রিয়তমদের কাছে ফিরে যাবো, তবু কথাটা হচ্ছে, পথও অনেক, নিজেরাও ভারী ক্লান্ত—

প্রথম রমণী। আমার শরীর তো অবশ হয়ে একবারে নুয়ে পড়ছে ভাই।

দ্বিতীয় রমণী। হাজারই বলো এ সহ

যায় না—হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, রাতদুপুরে ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাড়ী-শুদ্ধ জাগিয়ে তুলে—

ক্লিওপেটা। সেই জন্যেই তো বলছি, এখানে দুদিন থেকে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্‌—তা হলে এরাও সন্তুষ্ট হবে, আমাদেরও কিছু করবে না। যখন দেখবে, আমরা বেশ শান্ত, প্রফুল্ল—আমাদের সঙ্গও তখন এরা ছেড়ে দেবে। সত্যি আমার সেই রোমানটির জন্যে দুঃখ হচ্ছে···তার নাকটি সত্যিই একেবারে দেখবার জিনিষ দাঁড়িয়ে গেছে···

তৃতীয় রমণী। কিন্তু দুদিনের বেশী এখানে থাকছি না···

চতুর্থ রমণী। একদিনই আমার যথেষ্ট··· আচ্ছা একটু বেড়ালে হয় না?

ক্লিওপেট্রা। ওঠো, ওঠো, ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে···

ক্লিওপেট্রা। (সিপিওকে) বলি, মশাই, ও মশাই—

সিপিও। (না ফিরিয়া) কি চাও, বল—

ক্লিওপেট্রা। দয়া করে একবার এদিকে আসবে?

সিপিও। বল না, আমি ঠিক আছি···

ক্লিওপেট্রা। ঠিক করেছি, তোমাদের হুকুম-মত এখনি বাড়ী ফিরে যাবো···এতে রাগ হবে না তো?

সিপিও। না, মোটেই না—

ক্লিওপেট্রা। কিন্তু কথা হচ্ছে···ঠিক করেছি, আমরা একটু বিশ্রাম করবো—বিশ্রামের জন্যে এখানে একদিন থাকতে দেবে? এ জায়গাটি আমাদের সবার বড় ভাল লেগেছে···

[রোমানগণ একসঙ্গে ফিরিয়া লাফাইয়া উঠিল]

সিপিও। (সহর্ষে) জায়গার কথা কি বলছো ··যেখানে যত দেবতা আছে, সবার নামে শপথ করে বলছি—

হেমহিলা। ওগো প্রাচীন রোমানবৃন্দ·· না, না, ওর নাম কি—ওহে···সব ওঠো—জাহাজ ঠিক করো—চ—চলো।

ক্লিওপেট্রা। আমরা সবাই একটু বেড়াতে চাই—

সিপিও। আঃ—রোমানগণ—ওঠো না, দাঁড়িয়ে ওঠো—সেজে নাও—ডান, বাঁ —ডান, বাঁ---সারে-সারে দুজন করে---

[সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার আদেশ-মত সব রোমানই এক-একটি রমণীকে লইয়া তাহার পিছন-পিছন সার-বন্দী হইয়া সগর্ব্বে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল] ডান, বাঁ—ডান, বাঁ---এক, দুই—এক, দুই---

পলাস। (মঞ্চের উপর একা শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল—হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এদিক ওদিক চাহিয়া) সে কৈ? কৈ সে? ওহে, সব দাঁড়াও—তাকে হারিয়ে ফেলেছি যে, কৈ, সে গেল কোথায়?

[ভেরোনিকা নববধূর মত দাঁড়াইয়া ছিল—মুখ মাটির দিকে নত]

পলাস। (অন্ধের মত তাহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া) ক্ষমা করুন,—ভদ্রে—তাকে আপনি দেখেছেন?

ভেরোনিকা। তুমি মুখ্যু, আহাম্মক—

পলাস। কাকে? আমাকে বলছেন?

ভেরোনিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মুখ্যু—

পলাস। ও কি, আমায় ধমকাচ্ছো কেন? আমি কি করলুম?

ভেরোনিকা। তোমাকেই ধমকাচ্ছি। মুখ্যু কোথাকার—দেখতে পাচ্ছো না? প্রিয়তম, ত্রিশ বছর যে তোমার জন্যে আমি বসে আছি। ওঃ! চলো—চলো—আমার হাত ধরে আমায় সঙ্গে নাও—

পলাস। কাকে নেবো?—

ভেরোনিকা। আমাকে! আবার কাকে? —দেখতে পাচ্ছো না, আমিই সে—আঃ— কি মুখ্যু, আহাম্মক—

পলাস। তুমি? না, না, তুমি তো সে নও—

ভেরোনিকা। হ্যাঁ, আমি বলছি—আমিই সেই—

পলাস। না, না, তুমি সে নও—(মাটীতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল)

ভেরোনিকা। দেখছো, আমি একা পড়ে আছি—আমার লজ্জা করছে—ওঠো, চলো—

পলাস। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না, না, তুমি সে নও—আর-কেউ—

ভেরোনিকা। কিন্তু আমি বলছি, না—আমিই সেই। আঃ—বিরক্ত করে তুল্লে দেখছি—আমার মত আবার কাকে দেখবে —আমার সে স্বামীটি ত্রিশবছর ধরে' বসে আসছে—তুমি সে নও, আর-কেউ—আ এখন ছেলেমানুষ তুমিও সেই কথা বলছো দাও, তোমার হাত দাও—

পলাস। (ভয়ে উঠিয়া পড়িয়া) তুমি সে নওগো, আর-কেউ। হায়, হায় ওগো আমায় রক্ষা করো, সকলে রক্ষা করো— আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

ক্রমশঃ

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নগর

(ফরাসী হইতে)

ভারতের নগরে যাহা প্রথমেই চখে পড়ে, এবং যাহা হইতে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায় তাহা কি?—না, য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকদের মধ্যে একটা পার্থক্য। অবশ্য, দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী নগরে বাস করে; আবার কাহারও কাহারও আফিস্ ও দোকান আছে। কিন্তু [illegible] পৃথক্ সহর; চিনীয় সহর ও চীনের নিজ য়ুরোপীয় বাসস্থান যেরূপ পৃথক্—এ সেইরূপ পৃথক্।

বোম্বায়ে, কলিকাতায়, মাদ্রাজে, ইংরেজ টোলা য়ুরোপকে স্মরণ করাইয়া দেয়; বড় অট্টালিকা, হোটেল, ব্যাঙ্কের বড় [illegible]

[illegible]রৎ, ব্যবসায় তেজারতি ও সওদাগরীর [illegible], ইংরেজী কারখানায় তৈয়ারী জিনিসের [illegible] খরিদ্দার-সমন্বিত বড় বড় দোকান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে [illegible]রূপ ছিল, কলিকাতায় সেইরূপ ক্লাসিক্ [illegible]ণের অট্টালিকা; বোম্বায়ে, ভিনিস্ লম্বার্ড্ [illegible]রোমের গথিক ধরণের ইমারৎ,—যে ধরণটা [illegible]মরা লণ্ডনের ইদানিন্তন অট্টালিকা-সমূহে [illegible]খিতে পাই।

বাসগৃহ সকল ইংরেজী আদর্শের—ছোট [illegible]ন্তু সুখ-সুবিধাসমন্বিত, সিঁড়ি আছে, [illegible]রাণ্ডা আছে; অধিকাংশ বাড়ীই উদ্যানের [illegible]ধ্য অবস্থিত; উপকণ্ঠস্থ বাগান-বাড়ীর [illegible]ান-উপবনে ফলের গাছ, তালজাতীয় [illegible] ও বাঁশ-ঝাড় রোপিত হইয়া থাকে। [illegible], সুন্দর সুন্দর পরিসর-ভূমি, সুব্যবস্থিত ও [illegible]স-আলোকে আলোকিত বড় বড় রাস্তা। [illegible]ড়ী, অম্‌নিবাস্, ট্রামওয়ে। বোম্বায়ে [illegible]জন বড় বিশপ থাকেন। অনেক য়ুরোপীয় [illegible]নিন্দা। দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের [illegible]রোপীয় ধরণের পোষাক, আবার অনেকের [illegible]শী পরিচ্ছদ; পাগ্‌ড়ী ও জুতা। দেশীয় [illegible]লা অল্পই দেখা যায়;—কেবলই দাসী [illegible]করাণী।

যে সকল নগরে ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা [illegible]ত বেশী নয়, সেখানে ছাউনী—(যেখানে [illegible]ন্যরা থাকে তাহাই প্রকৃতরূপে ছাউনী [illegible]মের যোগ্য—কিন্তু ইংরেজটোলা মাত্রকেই [illegible]উনী বলা হইয়া থাকে)—সরকারী ইমারৎ, [illegible]ধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহ, [illegible]নিবাস, হাসপাতাল, কালেজ, অ্যাংলিক্যান [illegible] প্রেসবিটিরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জ্জা। বড় বড় গাছের ছায়া-সমন্বিত রাস্তা। য়ুরোপ ও এশিয়ার বৃক্ষ-ভূষিত উদ্যান, রমণীয় বাগান-বাড়ী;—অনেকগুলি তালায় বারণ্ডা; সেই সব বারণ্ডা আতপ-তাপ হইতে সুরক্ষিত। সাদাসিধা ভাব, ইংরেজি সুখ-সুবিধা, একটু প্রাচ্যধরণের জাঁকজমক; সহজ-যাপ্য জীবন; অনেক ভৃত্য,—দাসবৎ পদানত ও আজ্ঞাবহ।

* * *

দেশী সহর। বড় বড় রাস্তা;—ট্রামওয়ের দ্বারা কর্ত্তিত,—এই ট্রামওয়ে, খোলা-ময়দানে অবস্থিত য়ুরোপীয় সহরের সহিত দেশী সহরকে সংযুক্ত করিয়া দেয়। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর রাজপথ; রং-করা কাঠের বাড়ী অথবা চুন-কাম করা মাটির বাড়ী,—তার নীচু চাল বা ছাদ; অন্তঃপুরের জান্‌লা-বারণ্ডা ও গরাদে-দেওয়া জান্‌লা। য়ুরোপীয় ধরণে শিক্ষিত ধনী লোকদিগের সুরম্য গৃহ:—কলিকাতায় বাঙ্গালী জমিদার, বোম্বায়ে গুজ্‌রাটী ও পার্সী কুঠীওয়ালা ও বণিকবৃন্দ। চারিদিকেই বড় রাস্তার ভিতর সরু সরু অপরিচ্ছন্ন আঁকা-বাঁকা জটিল গলিঘুঁজি; ইঁটের ছাদ-ওয়ালা মাটীর ঘর, চুন-কাম করা দরমার বেড়া। বেড়ার ভিতরে কলাগাছ, বাব্‌লা-গাছ, ডুমুর-গাছ। রাস্তার উপর জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নিজ গৃহের দরজার সম্মুখে অথবা স্বকীয় উন্মুক্তদ্বার কুটীরের ভিতর কাজ করিতেছে। দাড়ি-কামানো হিন্দু ও লম্বা-দাড়ী মুসলমান; রঙ্গীন শাড়ী-পরা রমণীগণ—তাহাদের জঙ্ঘা ও জানু অনাবৃত, একটা শাদা শাড়ী গায়ে জড়ানো ও তাহা কাঁধের উপর দিয়া গিয়াছে;

নগ্নশিশু; কোথাও কোন শিল্পী চিকনের কাজ করিতেছে, কোথাও কুম্ভকার, কোথাও বা কাঠের খোদাইকার আপন আপন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ বা চাউল কুটিতেছে, কেহ বা ময়দা পিষিতেছে।

বাজারের চতুর্দ্দিকে রাস্তার ভীড়। সকল ছাঁচের সকল জাতীয় লোক, সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছদ। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গো মহিষের পাল। অনেক নগরেই প্রাচ্যদেশ-সুলভ প্রকৃত বাজার। বোম্বায়ে, কলিকাতায়, আবৃত হাট-বাজার; ভারতের সমস্ত ফল; জাহাজে আনীত সিংহল ও শিঙ্গাপুরের ফল; সমুদ্রের মৎস্য, গুগ্‌লী ও কচ্ছপ; মাংস, শিকার-পাখী, শাকসব্‌জি; গরম-মস্‌লা, আফিম।

বোম্বাই ও কলিকাতায় বন্দর; বড় বাষ্পপোতের চারিপাশে দেশী নৌকার ভী জাহাজ-ঘাটের উপর লোকের ঠেলাঠে এদিকে এক প্রাচীরের আড়ালে, ফেরীওয়ালা দোকানদার তাহার জিনি থলিয়া খুলিয়া বসিয়াছে; কোথাও এক গণৎকার ভাগ্য গণনা করিতেছে; কো সাপুড়িয়া তুবড়ী বাজাইতে বাজাইতে মা উপর একটা বেজি ছুঁড়িয়া ফেলিতে সুন্দর গোখ্‌রো সাপ সোজা হইয়া উঠি তার লেজ কুণ্ডলী-পাকানো; ফুলিয়া উঠিয়াছে—চ্যাপ্‌টা হইয়া গি তাহা হইতে একটি ছোট্ট মাথা বা হইয়াছে—দৃষ্টি স্থির।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকু

জলের-আল্পনা

পঁচিশ

পরের দিন সকালে জয়ন্ত বুকের উপরে দুইহাত রাখিয়া বিছানায় শুইয়া আছে—সূর্য্যের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে;—সে স্তব্ধ হইয়া সেই আলোকের তাপ আপন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

এমনসময় ভজহরি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খোকন, ও-বাড়ীর জগৎবাবু তোমার সঙ্গে দ্যাখা কর্‌তে চাইচেন।"

জয়ন্ত ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "জগৎবাবু!"

—"হ্যাঁ, তিনি আর সেই মেয়েটি।"

জয়ন্তের মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আ ভ্রু-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "ইন্দু?"

"হুঁ। গাড়ী থেকে দেক্‌লুম ছি পত্তর্ সব নামানো হচ্চে—বোধহয় সবাই এক্ষুনি বিদেশ থেকে এল।"

চিন্তিত মুখে নীরস স্বরে জয়ন্ত "ওঁদের ওপরে নিয়ে এস।"

একটু পরেই জগৎবাবুর পিছনে-পি ইন্দু আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক জগৎবাবুর মুখ বিষণ্ণ, চোখ ছল ভাব-ভঙ্গি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত। অত্যন্ত জড়সড়—তাহার মাথাটি বুকের হেঁট্ হইয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত দরজার দিকে অন্ধ চোখ তুলিয়া বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

জয়ন্তের দিকে তাকাইয়াই জগৎবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—এই সেই জয়ন্ত, সেই হাস্যপ্রফুল্ল, গৌরকান্তি, পরমসুন্দর জয়ন্ত! মানুষের দেহ এত-শীঘ্র এমন বদ্‌লাইতে পারে? জগৎবাবুর পা-থেকে-মাথা-পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল!

ইন্দুও বিবশ হইয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িল—একবার দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া, জয়ন্তের দিকে আর সে ভরসা করিয়া মুখ তুলিতে পারিল না!

জয়ন্ত শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "চুপ করে' কি দেখ্‌ছেন জগৎবাবু? এই জ্যান্ত মড়াটাকে দেখে কি আপনাদের ভয় হচ্ছে?"

জগৎবাবুর চমক্ ভাঙিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, জয়ন্তকে একেবারে আপন বুকের ভিতরে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম!"

জগৎবাবুর সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে জয়ন্ত চুপ-করিয়া পড়িয়া রহিল।—

অনেকক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া জয়ন্ত একটু সরিয়া বসিল।

জগৎবাবু কাতর স্বরে বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার ওপরে রাগ কোরো না বাবা, আমি এই জোড়হাতে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! তোমার নির্ম্মল চরিত্রে আমি সন্দেহ করেছিলুম—তোমাকে অপমান করে' আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—এ মহাপাপ আজ আমাকে দগ্ধে-দগ্ধে মার্‌ছে, আমার দিন-রাতকে বিষময় করে' তুলেছে—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর! ইন্দু, উঠে আয় মা, উঠে আয়—জয়ন্তের পায়ে ধরে বল্ তোর বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্‌তে!"

কিন্তু ইন্দুর তখন সাড়্ ছিল না—মৃত দেহের মত স্থির হইয়া, নিষ্পলক নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া সে তেম্‌নি ঠায় বসিয়াই রহিল।

মনের আবেগে জয়ন্ত ইন্দুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জগৎবাবুর মুখে ইন্দুর নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল! আপনার অন্ধ চক্ষুকে ঘরের চারিদিকে বুলাইয়া, অত্যন্ত অভিমানে ফুলিয়া-ফুলিয়া বলিল, "না, না, ইন্দুকে আর আস্‌তে হবে না! আপনার ভ্রম ভেঙেছে আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট! তবে, আজ না এসে আর কিছুদিন আগে যদি আস্‌তেন, তাহলে রোগের যাতনার ভেতরেও হয়ত আমি শান্তি পেতুম।"

এই সময়ে অবনী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত নেত্রে সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "এই যে, আপনারা এসেছেন! আমি জানি, আপনারা আস্‌বেন!"

জগৎবাবু অবনীর দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, আপনার কাছে আমি চিরদিন কেনা হয়ে রইলুম। আপনি যদি চিঠি লিখে সমস্ত না প্রকাশ করে' দিতেন, তাহলে আমার বুক থেকে এক মহাপাপের বোঝা কোনদিনই হয়ত নাম্‌ত না—" থামিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন,

"কিন্তু আর দু-দিন আগে যদি এ খবরটা পেতুম!"

অবনী বলিল, "তাহলে সত্যিই ভালো হ'ত জগৎবাবু!"

জয়ন্ত দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "অবনীবাবু আপনাকে কি খবর দিয়েছেন জগৎবাবু?"

—"অবনীবাবুর পত্রেই ত কাল আমরা জান্‌তে পারি, তুমি নিরপরাধ! স্বর্ণেন্দুর চক্রান্তের কথা তিনি সব প্রকাশ করে' দিয়েছেন। সেই পত্র পেয়েই আমরা কল্‌কাতায় ছুটে আস্‌ছি!"

জয়ন্ত একেবারে অবাক হইয়া গেল। পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পর্য্যন্ত এই অবনীকে সে প্রত্যহ তাহার কাছে-কাছে ছায়ার মত লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছে এবং ভজহরির মুখে এও শুনিয়াছে যে, অবনী নিজেই ভালো-ভালো ডাক্তার আনাইয়া, তাহার দেশে খবর দিয়া যাহাতে চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না-হয় সে-সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে। অবনী তাহার প্রতিবেশী হইলেও এর-আগে তাহার বাসায় বড়-একটা আসিত না; তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব বলিয়া কোন-কিছু ছিল না। বরং সে তাহার এক রকম শত্রু ছিল বলিলেই হয়। স্বর্ণেন্দুর সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের ভিতরে অবনীরও যে যোগ ছিল, জয়ন্তের এ বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত অটল আছে। সুতরাং, অবনী যে কেন তাহার সঙ্গে হঠাৎ এতটা আত্মীয়তা করিতেছে, যাচিয়া উপকার করিতেছে, এর কোন হদিস্ না-পাইয়া জয়ন্ত মনে-মনে ভাবিত, সে বোধ হয় তাহাকে জব্দ করিবার ফিকিরে নূতন কোন চাল্ চালিতে চায়! তবু এ সন্দেহ সে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিত না—কারণ অবনীর চাল্‌চলনে পরের বিপদে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন মন্দ অভিসন্ধি জয়ন্ত এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই!

কিন্তু আজ জগৎবাবুর কথা শুনিয়া জয়ন্তের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। এই অবনীকে সে বিশ্বাস না-করিয়া তাহার উপকারকে অপকার বলিয়া ভাবিয়াছে বলিয়া জয়ন্ত মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কৃতজ্ঞ স্বরে সে বলিল, "অবনীবাবু, আপনি জগৎবাবুকে চিঠি লিখে আমার যে উপকারটা কর্‌লেন, তার জন্যে—"

বাধা দিয়া অবনী বলিল, "তার জন্যে কি ভাষায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা নিয়ে আপনাকে একটুও মাথা ঘামাতে হবে না জয়ন্তবাবু! আমি যা করেছি নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যেই করেছি। সত্যি কথা বল্‌তে দোষ নেই যে, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন আগে বিশেষ মধুর ছিল না। এমন অবস্থায় স্বর্ণেন্দুর দোষের জন্যে আমাকে দায়ী হ'তে হয়—কারণ, সে আমার অন্তরঙ্গ না-হ'লেও বাল্যবন্ধু, আমার সঙ্গেই সে ঘোরে-ফেরে, জগৎবাবুর বাড়ীতে যায়। আর,—ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে জয়ন্ত বাবুর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হ'ত—তিনি যেন আমাকেই সন্দেহ কর্‌তেন!"

জয়ন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। কিন্তু সে-সব কথা আজ ভুলে যান—অসময়ে যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু এ পৃথিবীতে আর-কোথায় পাব?"

আনন্দে আপ্লুত হইয়া জয়ন্তের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া অবনী বলিয়া উঠিল, "তোমার ওপরে অনেক অবিচার করেছি জয়ন্ত, তার বদলে তুমি আমাকে যে বন্ধুত্ব আজ দান কর্‌লে, সে দান আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিলুম!"

এমনসময় ভজহরি ব্যজার-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনারা আমার খোকনকে একটু জিরুতে দিন,—ওর দেহের দশা দেখ্‌চেন না!"

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, তোর কি এখনো বুদ্ধি হ'ল না! ভদ্রলোকদের—"

ভজহরি মুখভার করিয়া বলিল, "তুই থাম্ খোকন! ভজা বয়েসে তোর চেয়ে তিনগুণ বড়, আঁতুড়ঘরে তুই যখন ট্যাঁ করিস্-নি, ভজার বুদ্ধি আর মাতার চুল তকুনি পেকে উটেচে! ভজার বুদ্ধিতে চল্‌লে আজ তোর এ হাল হ'ত না। তোর অসুক্ বাড়্‌লে ভুগ্‌তে হবে ত আমাকেই!"—

অবনী হাসিয়া বলিল, "ভজহরি, তোমার কথাই ঠিক্, জয়ন্তবাবুকে এখনি এত বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।"

ভজহরি যো পাইয়া বলিল, "বলুন ত বাবু, বলুন ত! শুন্‌লি খোকন? না, অ্যাখনো বল্‌বি ভজার মত অবনীবাবুরও বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু নেই?"

জগৎবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ ভজহরি, জয়ন্তকে আজ আমরা আর বিরক্ত কর্‌ব না। ইন্দু, এস!"

ইন্দু এতক্ষণ তেম্‌নি নীরবে বসিয়াছিল। পিতার আহ্বানে যেন হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে জাগিয়া, ধীরে-ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করুণ নয়নে একবার জয়ন্তের দিকে চাহিয়া বিদ্রোহী পা-দুটোকে টানিয়া টানিয়া—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে, ইন্দু আপন ঘরে একলাটি বসিয়া-বসিয়া কত-কি যে ভাবিতেছিল!

আজ সকালে যে দৃশ্য সে দেখিয়া আসিয়াছে, সারাদিন আর তা ভুলিতে পারে নাই; জয়ন্তের সেই দুটি দৃষ্টিশূন্য কাতর অন্ধ চক্ষু, দু-দুটো বিষধরের মত রহিয়া-রহিয়া তাহার মর্ম্মের মাঝে দংশন করিতেছে,—আর রুদ্ধ যাতনায় তাহার প্রাণ যেন বুকের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে!..... ...ইন্দু ভাবিতেছিল, এর আগে সেও যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তবে এমন নিদারুণ দৃশ্য আর ত তাহাকে দেখিতে হইত না!

আরো ঢের কথা ইন্দুর মনের তটে স্রোতের মত আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সকালে জয়ন্তবাবুর বাসায় সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে মেয়েটিও মুখ বাড়াইয়া অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল—তাহার চোখে যেন পলক পড়িতেছিল না। ইন্দু তাকে চেনে না—কখনো দেখেও নাই; কিন্তু সে যে কে, তা সে তখনি বুঝিতে পারিয়াছিল। জয়ন্ত বাবুর মুখে সে অনেকবার যার কথা শুনিয়াছে, এ নিশ্চয়ই সেই গৌরী!

তাহার ঘরের সাম্‌নেই রাস্তার ও-ধারে

জয়ন্তের বাসা। তাহার ঘর হইতে জয়ন্তের ঘরের ছোটখাট জিনিষটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জান্‌লার পাল্লা ভেজাইয়া, খড়্‌খড়ির ফাঁকে চোখ রাখিয়া আজ সারাদিন সে বসিয়া আছে! সমস্ত দিন গৌরী জয়ন্তের শিয়রে বসিয়া জয়ন্তকে পাখার হাওয়া করিয়াছে, তাহার যখন যেটির দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়াছে।

ইন্দুর চোখের সুমুখে, তাহারি কর্ত্তব্য যেন গৌরী জোর-করিয়া কাড়িয়া লইতেছে! এ দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠিলেও সে চোখ ফিরাইয়া মনকে বুঝাইতে পারে নাই! .....জয়ন্তের উপরে তাহার রাগ হইয়াছে, গৌরীর উপরে তাহার হিংসা হইয়াছে!

তারপরেই আবার বারবার মনে পড়িয়াছে, কাহারও উপরে রাগ, অভিমান, হিংসা করিবার তাহার আর কোন অধিকারই নাই! জয়ন্তের মনে আর কি তার একটু-খানিও ঠাঁই আছে? যে লোক সব ছাড়িয়া একদিন সুধু তাকেই আপন করিতে চাহিয়াছিল, জীবন-মৃত্যু যখন যুঝাযুঝি করিতেছে—সেই অসময়ে সে যে তার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকায় নাই! এ নিষ্ঠুরতার কি ক্ষমা আছে?... ... ...

শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস একটা গানের খানিকটা তাহার ঘরের ভিতরে বহিয়া আনিল।

সেই চির-চেনা স্বর ইন্দুর ভাবনা-বিভোর চিত্তকে আচম্বিতে সচেতন করিয়া তুলিল—

"... ...গেঁথেছ যে রাগিনী
একাকিনী দিনে দিনে,
আজিও যায় বোপে
কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে,
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারি পরশন
হরষণ সুধাঢালা,
ফাগুন আজো ঘেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,
আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে?

একদা তুমি প্রিয়ে,
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে গেছ ভুলে!
একদা তুমি প্রিয়ে....."

ইন্দুর সমস্ত দেহ যেন শ্রবণময় হইয়া উঠিল, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আবেগভরে দুইচক্ষু মুদিয়া সে শুনিতে লাগিল,

"একদা তুমি প্রিয়ে—"

কে এ প্রিয়া?... ...এ কি, সে? তাকে কি এখনো তার মনে আছে—এ প্রিয়া কি বিস্মৃত প্রিয়া নয়?

ইন্দুর মুখের উপরে জাগ্রত ফাল্গুনের নন্দিত বাতাস উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া গেল, আর সেই স্মৃতি-জাগানো বাতাসের মোহন ছন্দের সঙ্গেই যেন তাল রাখিয়া অন্ধ জয়ন্ত গায়িতে লাগিল,

"ফাগুন আজো ঘেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,
আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে?"

এ কি অভিমানীর কাতর জিজ্ঞাসা, না, ব্যর্থ প্রেমের হতাশ তিরস্কার?.....ইন্দু ত ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না! স্মৃতির যে মালা সে গাঁথিয়াছে, সে যে প্রাণপণ যত্নে তাকে মর্ম্মের ভিতরে চাপিয়া আছে! পাছে শুকাইয়া যায় সেই ভয়ে ইন্দু যে অশ্রুধারায় সে স্মৃতিমাল্যকে স্নিগ্ধসজল করিয়া রাখিয়াছে!

ইন্দু কাঁদিতে-কাঁদিতে ব্যথিত চোখদুট মেলিয়া দেখিল, জয়ন্ত তার ঘরের সাম্‌নের বারান্দায়, একলাটি চাঁদের আলোতে বসিয়া আপনমনে গান গায়িতেছে।

উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিল, গৌরী তখন সেখানে নাই।

সাতাশ

সেদিন বসন্তের হাওয়ায় জয়ন্তের মন হঠাৎ-কেমন উতল হইয়া উঠিল।

গৌরী যখন তাহাকে বারান্দায় বসাইয়া গৃহস্থালীর কাজে চলিয়া গেল, তখন চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখ-চোখের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই আলোক-দূতের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়া, অভ্যাসমত সে আকাশের দিকে মুখ তুলিল—কিন্তু দেখিল সুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! তখন মনে পড়িল তাহার এই জীবনব্যাপী নিবিড় তিমিরে চাঁদের ছবি আর-কখনো জাগিবে না!... ...ভবিষ্যতের যে আশার সাম্রাজ্য এতদিন সে মনে-মনে গড়িয়া তুলিয়াছিল—নিয়তির একটি আঘাতে আজ তাহা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে,—কল্পনার সেই বিশাল ধ্বংসস্তূপে আজ তাহার জীবন্মৃত হৃদয় সুধু দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল আর হাহাকার সম্বল করিয়া পড়িয়া আছে!... ...

তাহার স্মৃতির শ্মশানে আজ সমস্ত অতীত পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে!

জয়ন্ত সকাতরে বলিয়া উঠিল, "ভগবান, চোখ কেড়ে নিলে, কিন্তু এ পোড়া চোখের জল ত তবু শুকল না—তোমার এ কি অবিচার!"

জয়ন্ত অনেকক্ষণ আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া বসিয়া রহিল। কী যে ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে!

ইন্দুদের বাগান হইতে কোকিল-পাপিয়ার মিলিত কণ্ঠে বাসন্ত-জ্যোৎস্নার বন্দনাগান ফুটিয়া উঠিল। মাঝে-মাঝে বাতাস জাগিয়া তাহার কাণেকাণে যেন নিষ্ঠুর কৌতুকে বারংবার বলিয়া যাইতে লাগিল, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ!

... ...জয়ন্তের ক্ষুধিত অন্তরের ভিতর হইতে তাহার প্রেম-বেদনার ভাষা ধীরে-ধীরে প্রাণের আবেগে, গানের কথায় ফুটিয়া উঠিল,—

"একদা তুমি প্রিয়ে,—"

তাহার তৃষাতাপিত চিত্তের সমস্ত অতৃপ্তি আজ যেন এই রাগিনীকে সুরের একটা হাহাকারের মত করুণ করিয়া তুলিল!

একবার, দুইবার, তিনবার গায়িয়া জয়ন্ত আবার নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ; হঠাৎ জয়ন্তের মনে হইল তাহার পাশেই যেন কাহার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে!

হাত বাড়াইতেই আর-একজনের নরম হাত তাহার হাতে ঠেকিল। জয়ন্ত বুঝিল এ গৌরী, তাহার গান শুনিয়া এখানে আসিয়াছে।

সে একটু লজ্জিত হইল। মনের আবেগে সে এ-বাড়ীতে গৌরীর অস্তিত্বের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—নহিলে এ গানটা গৌরীর সাম্‌নে কখনোই গায়িত না। সঙ্গীতে তাহার হৃদয়ের যে প্রতিধ্বনি ছিল, তাহা শুনিয়া গৌরী নিশ্চয় কাতর হইয়াছে!

গৌরীর হাতখানি ধরিয়া জয়ন্ত অনুতাপ-ভরে মৃদুস্বরে ডাকিল, "গৌরী!"

সাড়া মিলিল না—তাহার হাতের ভিতরের হাতখানি যেন অসহায়-ভাবে আরো এলাইয়া পড়িল।

—"গৌরী, তোমার কাজ এরি-মধ্যে সারা হয়ে গেল?"

—"জয়ন্তবাবু, আমি গৌরী নই!"

—"ইন্দু! তুমি!"—সবিস্ময়ে এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ইন্দুর হাত ছাড়িয়া দিল!

কোন কথা না বলিয়া জয়ন্তের পায়ের কাছে ইন্দু বসিয়া পড়িল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগ্‌টা যখন কাটিয়া গেল, জয়ন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "ইন্দু, তুমি কখন্ এখানে এলে?"

ইন্দু আস্তে-আস্তে বলিল, "আপনার গান শুনে বাড়ীতে আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না।"

—"আমার গান এখনো কি তোমার ভালো লাগে ইন্দু?"

—"জয়ন্তবাবু, আপনার গান আমার ভালো লাগে না! আপনি এমন কথা কি-করে' বল্‌লেন!"

জয়ন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এ জীবন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল ইন্দু, কৈ, তখনো ত তুমি একটি ছত্র লিখে আমার খবরটা নেওয়াও দরকার মনে কর-নি! তাই ভেবেছিলুম, আমার কথা তুমি ভুলে গেছ!"

জয়ন্তের কথাগুলো শাণিত অস্ত্রের মত ইন্দুর প্রাণকে যেন ছিঁড়িয়া খান্‌ খান্ করিয়া দিল;—সে আঘাত কোনরকমে সহিয়া আহত কণ্ঠে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার অসুখের খবর আমি পাই-নি। বাবা জান্‌তেন, কিন্তু আমার কষ্ট হবে ভেবে আপনার কথা আমাকে তিনি বলেন-নি!"

জয়ন্ত চুপ করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে এসেছ আর কেউ কি দেখেছে?"—

—"আপনার চাকর দেখেছে।"

—"তবে আর কেউ দেখ্‌বার আগেই তুমি বাড়ী যাও। ভেবনা, আমি রাগ করে' এ-কথা বল্‌ছি। তোমাকে এখানে আর কেউ দেখ্‌তে পায়, এ আমার ইচ্ছা নয়!"

—"আর কেউটা কে জয়ন্তবাবু? আপনার গৌরী? কেন, তাঁকে আমার ভয় কি?"

জয়ন্ত বাধো-বাধো গলায় বলিল, "ভয়ের কথা বল্‌ছি না। কিন্তু—"

—"থাম্‌লেন কেন? বলুন!"

—"নিতান্তই শুন্‌বে ইন্দু? তোমাকে এখানে দেখ্‌লে গৌরী কিছু মনে কর্‌তে পারে!"

—"তিনি আর বেশী কি মনে কর্‌বেন? আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তিনি কি তা জানেন না?"

জয়ন্তের মাথা-হইতে-পা-পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিল! বিস্মিত স্বরে বলিল, "ইন্দু, এ কী বল্‌ছ!"

জয়ন্তের চমকিত বিস্মিত মুখের দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া, ইন্দু প্রশান্তভাবে অবিচল স্বরে বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? যাঁকে স্বামী বলে—"

বিবর্ণমুখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "তুমি এখনো আমাকে বিবাহ কর্‌তে চাও!"

—"কেন চাইব-না জয়ন্তবাবু! আপনাকে ছাড়্‌লে আমি দাঁড়াব কোথায়?"

—"ইন্দু, ইন্দু, তুমি কি ভুলে গেছ আমি অন্ধ, রোগে ক্ষতবিক্ষত—কুৎসিত?"

নারীর স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া ইন্দুর মুখবন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু সে বুঝিল, আজ যদি সে নীরব হইয়া থাকে, তবে সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাকে এই নীরবতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতএব মনকে শক্ত করিয়া সে বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হবার পর আপনি যদি এমন হ'তেন, তাহলে আমি কি আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে পারতুম?"

জয়ন্ত বলিল, "কিন্তু আমাদের বিবাহ ত হয়-নি! তখন তুমি বাধ্য হয়ে যা কর্‌তে—"

জয়ন্তকে মুখের কথা শেষ না-করিতে দিয়াই ইন্দু বলিল, "এখন স্বেচ্ছায় তাই কর্‌ব! দুটো মন্ত্র পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাব্‌ছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!"

—"তাই যদি হবে ইন্দু, তাহলে একটা তুচ্ছ অপবাদ শুনেই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? অপবাদে লোকে কি স্বামীকে ত্যাগ করে?"

ইন্দু বেদনাবদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বারবার আপনি খালি ঐ কথাই ভাব্‌ছেন! কিন্তু আমি যে স্বাধীন নই, আমার মাথার ওপরে যে বাবা আছেন, সেটা ত একবারও মনে কর্‌ছেন না!"

—"কিন্তু তোমার বাবা যে অন্ধের হাতে তোমাকে দেবেন না, তুমিও ত সেটা ভাব্‌ছ না!"

—"অন্ধ! কী হয়েছে তাতে জয়ন্তবাবু? অন্ধ বলে বাবা আপনাকে ত্যাগ কর্‌বেন?—আমি কি বাবাকে চিনি না? এমন মানুষ তিনি নন!"

—"তুমি তোমার মনের কথা বল্‌ছ ইন্দু,—কিন্তু অন্ধের হাতে কন্যা-সম্প্রদান কর্‌তে যে কোন পিতাই সম্মত হবেন না!"

—"জয়ন্তবাবু, বিশ্বাস করুন, আপনি অন্ধ হয়েছেন বলে বাবার মত্ বদ্‌লায়-নি। আমি তা জানি।"

পৃথিবীতে দুটি জিনিষকে ভোলা যায় না—প্রেম ও মৃত্যু! ইন্দুর কথায় তাই জয়ন্তের মনের বাঁধ্ একটু-একটু করিয়া ক্রমেই আল্‌গা হইয়া আসিতেছিল—ইন্দুকে সে যে এখনো ভালোবাসে! কিন্তু যে গৌরী তাহার অসহায় রোগশয্যার পাশে বসিয়া দিবারাত্র অনাহারে-অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, প্রাণপণে যে তাহাকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে আর ত সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না! এ যে তাহার মহা কর্ত্তব্য! গৌরীর মুখ ভাবিয়া জয়ন্ত ইন্দুর আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিল। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ইন্দু, কেন তুমি আর-দুদিন আগে আস-নি! মায়ের প্রাণে

ব্যথা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর হেতু হয়েছি, এখন যার দয়ায় প্রাণে বেঁচে আছি, সেই গৌরীকে ত্যাগ করে' আমি ত মনুষ্যত্ব হারাতে পারব না! সে মহাপাপ কর্‌লে আমার ইহকাল-পরকাল দুই যাবে। ইন্দু, তোমাকে আমি ভালোবাসি—চিরকাল ভালোবাস্‌ব—সেই ভালোবাসা সম্বল করে'ই আমাকে জীবন কাটাতে হবে—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব!"

শুনিতে-শুনিতে যাতনায় ইন্দুর কাণ যেন বধির হইয়া গেল;—মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিল না— আপনার অজ্ঞাতসারেই সে হঠাৎ হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া জয়ন্তের দুই-পা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলস্বরে বলিল, "ওগো, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না!"

প্রেম হচ্ছে বাতির শিখার মত; তখনি সে বেশী-করিয়া জ্বলিয়া উঠে, শেষমুহূর্ত্ত যখন কাছে ঘনাইয়া আসে।

ইন্দুর সেই ব্যাকুল আত্মনিবেদনে জয়ন্তের শিরায়-শিরায় তপ্ত রক্তপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত চিত্ত একেবারে ইন্দুর বুকের উপরে গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল!... ... ...কিন্তু জয়ন্ত প্রাণপণে আপনাকে আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া, অতি কষ্টে অস্ফুট বিদীর্ণ স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি বাড়ী যাও!"

ঝর-ঝর-ঝর অশ্রুজলে, জয়ন্তের দুই পা ইন্দু ভাসাইয়া দিল।... ...

জয়ন্ত তবু পাথরের দেবমূর্ত্তির মত অচল-অটল হইয়া বসিয়া রহিল—বসিয়াই রহিল!

আটাশ

বামুন লুচি বেলিতেছিল এবং গৌরী নিজের হাতে একে-একে সেগুলি ভাজিয়া তুলিতেছিল। বামুনের হাতে জয়ন্তকে খাওয়াইয়া গৌরীর মনের সাধ মিটিত না—রান্নাবান্নার ভার তাই সে আপন হাতে গ্রহণ করিয়াছিল।

ভজহরি আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। গৌরীর দিকে হাতের কলিকাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "দিদি গো, একটু তামুক্ খেতে বাসনা হয়েচে, ধাঁ-করে' একটুক্‌রো আগুন দাও-দিকি!"

আগুন দিয়া গৌরী বলিল, "ভজহরি, তুমি ওপরে বাবুর কাছে যাও, তিনি একলা আছেন।"

ভজহরি কলিকাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলিল, "অ্যাক্‌লা থাক্‌বেন ক্যানো, ও-বাড়ীর সেই ঠাক্‌রোণটি যে এয়েচেন।"

চকিতে মুখ ফিরাইয়া গৌরী বলিল, "ও-বাড়ীর ঠাক্‌রুণটি আবার কে?"

—"ঐ যে গো, ইন্দু না বিন্দু—আমার বাছা অত নাম-টাম্ মুকস্ত টুকস্ত থাকে না! ঐযে খোকন যাকে বৌ কর্‌বে বলে ক্ষেপেচিল—বুঝেচ? তা দ্যাকো দিদিমণি, খোকনের তাকে পছন্দ হ'লে হ'বে কি, মেয়েটা বাপু হদ্দবেহায়া! এই দ্যাকনা, মাঝ্-রাস্তা দিয়ে পায়ে জুতো পরে মদ্দের মত গট্‌মট্ কর্‌তে-কর্‌তে অ্যাক্‌লা আমাদের বাসায় এসে ঢুক্‌ল—যেন ভয়-ডর লজ্জা-সরম কাকে বলে জানে না। ও খেষ্টানি, বুঝেচ দিদিমণি, নিশ্চয় যীশু ভজে! ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লো না, তাই রক্ষে—নৈলে ও খোকনের জাত্ না-মেরে ছাড়্‌ত না!"—আপনমনে ইন্দুর সম্বন্ধে তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে-করিতে এবং কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ভজহরি চলিয়া গেল।

গৌরী চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল—শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া! ভজহরির শেষ-কথাগুলোর একটাও তাহার কাণে ঢুকে নাই।

বামুনঠাকুর বলিল, "মা-ঠাক্‌রোণ, কড়া যে জ্বলে যাচ্চে!"

তখন গৌরীর হুঁস্ হইল। তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করিয়া বাকি লুচিগুলো ভাজিয়া তুলিয়া সে বলিল, "ঠাকুর, লুচিগুলো চাপা দিয়ে তুমি একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।"

গৌরীর মনে হঠাৎ একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল—উপরের ঘরটা একবার উঁকি-মারিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য!

উপরে উঠিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া সে জয়ন্তের ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেইখান হইতে দেখিতে পাইল, জয়ন্তকে সে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাতেই সে বসিয়া আছে। তাহার পায়ের কাছে একটি রমণী-মূর্ত্তি—মুখখানি তার হেঁট-করা। চাঁদের আলোয় তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—কিন্তু গৌরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—কে সে!

গৌরী শুনিতে পাইল ইন্দু বলিতেছে—"দুটো মন্ত্র-পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাব্‌ছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!"

—শুনিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে দোল্ খাইয়া দুপ্‌দুপ্ করিয়া উঠিল!... ...

তারপরেই জয়ন্ত কথা কহিল। জয়ন্তের কথা শুনিয়া গৌরীর আবার আশা হইল,—অত্যন্ত আগ্রহভরে সেইখানে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া সে দুজনের কথা শুনিতে লাগিল।

কিন্তু, ইন্দুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেও, জয়ন্ত কাতর স্বরে যে কথাগুলি বলিল, তাহা শুনিয়া গৌরীর মনে হইল, কে-যেন তাহার কাণের ভিতরে হুড়্‌হুড়্ করিয়া দ্রবীভূত অগ্নির ধারা ঢালিয়া দিল। আদালতে দাঁড়াইয়া আসামী যখন বিচারকের মুখ হইতে ফাঁসীর হুকুম শোনে,—গৌরীর অবস্থা তখন ঠিক সেইরকম!

এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে গৌরী বুঝিতে পারিল, জয়ন্ত তাহাকে গ্রহণ করিবে সুধু কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হইয়া,—জয়ন্তের প্রাণ তাহার প্রতি একান্ত বিমুখ!... ...সে যদি জয়ন্তকে বিবাহ করে, তাহাহইলে অন্ধ জয়ন্তের নিরানন্দ জীবন চিরদিন ব্যর্থপ্রেমের হতাশ হাহাকারে ভরিয়া থাকিবে—তাহার বাহিরের দেহ এবং ভিতরের মন দুইই একসঙ্গে সমান-অসার্থক হইয়া যাইবে!... ... ...

গৌরী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অপার ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ওদিকে জয়ন্তের পায়ে পড়িয়া অভাগী ইন্দু অনেকক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলিল, কিন্তু জয়ন্তের কঠোর মৌনব্রত কিছুতেই আর ভঙ্গ করিতে পরিল না; দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া অভিভূতের মত বসিয়া, জয়ন্ত আপনার বুকের তুফান বুকের ভিতরেই

চাপিয়া রাখিল। ইন্দুর চোখের প্রতি অশ্রুবিন্দু তাহার পায়ের উপরে পড়িতেছে, আর জয়ন্তের মনে হইতেছে, তাহার কঙ্কাল হইতে যেন এক-একখানা হাড় খসিয়া-খসিয়া সেই অশ্রুসাগরে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে!

অবশেষে ইন্দু বারান্দার রেলিং ধরিয়া, আপনার অবশ দেহটাকে কোনমতে টানিয়া দাঁড় করাইল। তারপর আস্তে-আস্তে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি নিয়তির চেয়েও নিষ্ঠুর! আপনি ভালো থাকুন সুখে থাকুন—এই আমার শেষ-কামনা।"

জয়ন্ত তেম্‌নি মূক হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

নয়নাগ্রে সমস্ত প্রাণ একাগ্র করিয়া, জয়ন্তের দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ইন্দু ধীরে-ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে দেখাইতেছিল ঠিক যেন একখানি জীবন্ত বিষাদ-প্রতিমার মত!

তাহার পদশব্দে জয়ন্ত চমকিয়া মুখ তুলিল—পাগলের মত সাম্‌নে দুইহাত বাড়াইয়া, ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইন্দু, ইন্দু!"

ইন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—"তোমার চোখের জল আমার পা থেকে ইহজীবনে আর শুকবে না—ইন্দু, এ অভাগাকে ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো!"

ইন্দু কলের পুতুলের মত দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্ত আবার বলিয়া উঠিল, "যেওনা ইন্দু, যেওনা—যেওনা!"

ইন্দু আবার দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন জয়ন্তবাবু!"

—"না, না, কিছু বল্‌ছিনা,—তুমি যাও, তুমি যাও"—বলিতে-বলিতে জয়ন্ত মূর্চ্ছিতের মত টলিয়া মাটির উপরে হেলিয়া পড়িল।

সে পতনশব্দ শুনিয়া ইন্দু ও তাহার পিছনে-পিছনে গৌরী তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া আসিল।

গৌরীকে দেখিয়াই ইন্দুর মুখ শুকাইয়া পাঙাশ হইয়া গেল—থতমত খাইয়া পায়ে পা বাধিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৌরী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—একেবারে জয়ন্তের পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু গৌরী কোন সাহায্য করিবার আগেই জয়ন্ত দুইহাতে ভর্ দিয়া আবার উঠিয়া বসিল।

গৌরী তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোথায় লেগেছে?"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "গৌরী! তুমি কোত্থেকে এলে?"

গৌরীর মুখে মিথ্যা কথা বাধিয়া গেল। ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমি এইখানেই ছিলুম।"

—"এইখানে ছিলে! কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ।"

—"ইন্দু—ইন্দুকে—"

—"হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি!—" ফিরিয়া ইন্দুর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া গৌরী আবার বলিল, "এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

—"ইন্দু! ইন্দু এখনো আছে!"

—"তোমার কোথায় লেগেছে বল-না?"

—"কোথাও লাগে-নি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যাওয়াতে পড়ে গিয়েছিলুম।···অনেক রাত হ'ল ইন্দু, এবার তুমি বাড়ী যাও!"

ইন্দু দরজার দিকে ফিরিতে-না-ফিরিতে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। কোমল স্বরে বলিল, "তুমি কোথা যাও বোন্!"

ইন্দু অবাক হইয়া গৌরীর মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গৌরী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "উনি যেতে বল্‌ছেন বলেই অম্‌নি তুমি চল্‌লে দিদি? এত সহজে কি নিজের পাওনা ছাড়তে আছে ভাই! যা আদায় কর্‌তে এসেছ জোর করে' তা আদায় করে' নিয়ে যাও!"

আরো-বেশী ব্যস্ত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "ইন্দুকে যেতে দাও গৌরী, রাত হয়ে যাচ্ছে যে!"

সে কথায় কাণ না-দিয়া ইন্দুকে জোর-করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া গৌরী বলিল, "যে সংসারে আর দুদিন পরে তুমি ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বস্‌বে, এরি-মধ্যে সেখান থেকে পালাই-পালাই কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

ইন্দু হতভম্ব হইয়া মাথা তুলিল, এ নির্দ্দয়া কি তাহার দুঃখে বিদ্রূপ করিতেছে?

জয়ন্ত বুঝিল, গৌরী সব দেখিয়াছে, সব শুনিয়াছে! মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া সে বলিল, "গৌরী, যা তা কী বল্‌ছ?"

গৌরী ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "যা তা কিছুই বল্‌ছি না।"

—"গৌরী!"

—"না, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমাকে এঁর হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে দেশে ফিরে যাব!"

—"দেশে ফিরে যাবে?"

—"হ্যাঁ, দেশে।"

—"আমি ত সে কথা বল্‌ছি না গৌরী! তুমি দেশে ফিরে যাবে কেন?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া গৌরীর কান্না আসিতে-ছিল,—কোনক্রমে অশ্রুর বেগ্ সাম্‌লাইয়া সে বলিল, "আমার ত আর-কোথাও ঠাঁই নেই!"

—"গৌরী, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে চাও?"

—"না, তোমার কষ্ট হবার ভয়েই আমি দেশে ফিরে যাব!·····চোখ হারিয়ে তুমি যে-যন্ত্রণা দিন-রাত ভোগ কর্‌ছ, তার ওপরে যদি আবার মনের সুখও হারাও, তবে তুমি বাঁচ্‌বে কেমন করে'?" বলিতে-বলিতে দুঃখের আবেগে গৌরীর গলা ধরিয়া আসিল; একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তোমার চেয়ে আপনজন আমার কেউ নেই গো, কেউ নেই! কিন্তু নিজের সুখের জন্যে আমি যদি তোমার দরদ না-বুঝি তাহলে আমিও মর্‌ব, তোমাকেও মার্‌ব! আমার কাছে তুমি কিছু লুকিও না—আমি তোমার মন জানি! তুমি ত আমাকে ত্যাগ কর্‌ছ না—আমিই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, এতে তোমার আর দোষ কি বল? আমি যখন মন স্থির করেছি, তখন তোমার কোন বাধাই আর মান্‌ব না!——"

গৌরী হঠাৎ থামিয়া, জয়ন্তের একখানি

হাত ধরিয়া, ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দিদি, তোমার হাতখানি দাও ত!"

ইন্দু আচ্ছন্নের মত আস্তে-আস্তে একখানি হাত বাড়াইয়া দিল।

ইন্দুর হাতে জয়ন্তের হাত রাখিয়া, গৌরী অনিমেষ নয়নে বাহিরের আকাশ-ভরা চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রান্তের মত দেয়ালের উপরে হেলিয়া পড়িয়া, কেমন ধুঁকিতে-ধুঁকিতে জয়ন্ত বলিল, "আমার জন্যে তোমারও চোখে জল পড়্‌বে? এম্‌নি পাষণ্ড আমি,—যার কাছে যাব তাকেই কাঁদাব!"

জয়ন্তের নিষ্প্রভ মুখের উপরে প্রশান্ত দৃষ্টি রাখিয়া পরিষ্কার স্বরে গৌরী বলিল, "কৈ, আমার চোখে জল কৈ? চোখের জল ফেলে আমি তোমার অকল্যাণ কর্‌ব? এমন কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না! যতদিন বাঁচ্‌ব দেবতার কাছে প্রার্থনা কর্‌ব, তোমাদের যাতে মঙ্গল হয়।"— একটি করুণ অথচ সুন্দর শুভ্র হাসির সঙ্গে মনের সমস্ত মালিন্য বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুর দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে গৌরী বলিল, "একটু বোসো ভাই, অনেক কথা আছে! ওঁর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এইবেলা নিয়ে আসি!"……এই-বলিয়া, চোখদুটি নামাইয়া, ক্ষণকাল আনমনে দাঁড়াইয়া রহিল—ঠিক যেন সন্ধ্যা-বেলার ঝরাফুলের একটি এলানো পাপ্‌ড়ির মত;— তারপরেই সে চকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি

মিশ্র-বাহার—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

আমার গীতি-কুসুম, প্রীতি-পবনে, গন্ধে-বরণে ফুটেছে হৃদয়-মাঝ!
এসহে মম বসন্ত-কুঞ্জে, ওহে রাজরাজ।
আমি ছন্দে গাঁথিয়া বাণীর মালা,
সাজায়ে রেখেছি ডালা, পরাব তোমার গলে হে;—
আমার ছুটেছে সব সঙ্কোচ-মোহ টুটেছে সরম লাজ!
আমি নব নব সুরে রচিয়া গান
বীণায় তুলেছি তান, তোমারে শুনাব বলে হে;—
তুমি হইবে তাহে সুপ্রসন্ন, যশঃ-গৌরবে মানিব ধন্য,
চরম আশা হইবে পূর্ণ, পরমানন্দ পুণ্য, বহিবে মরম-তলে হে,—
এসহে এস মনের দেবতা, নিরাশ কোরোনা আজ॥

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

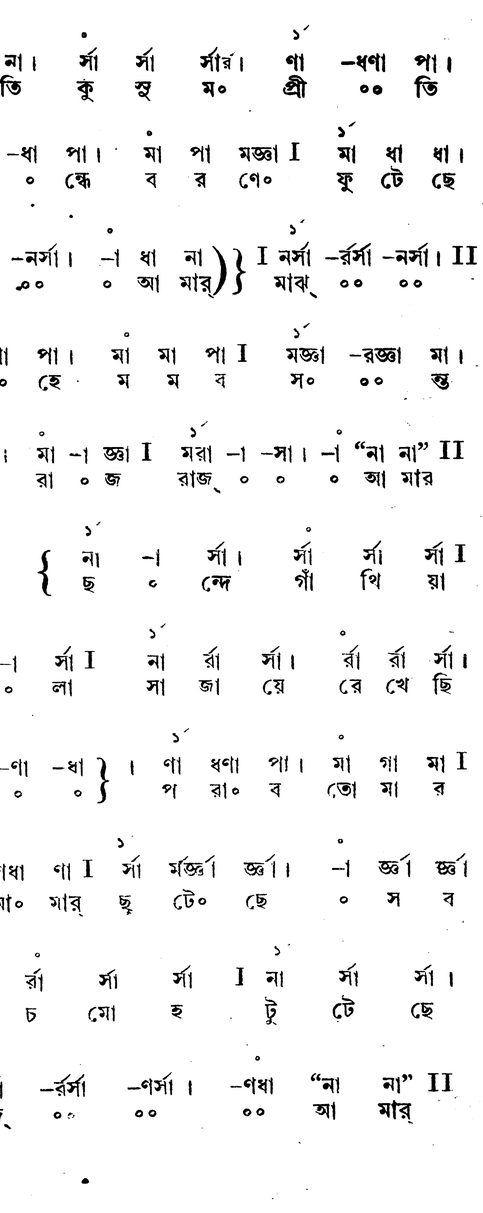

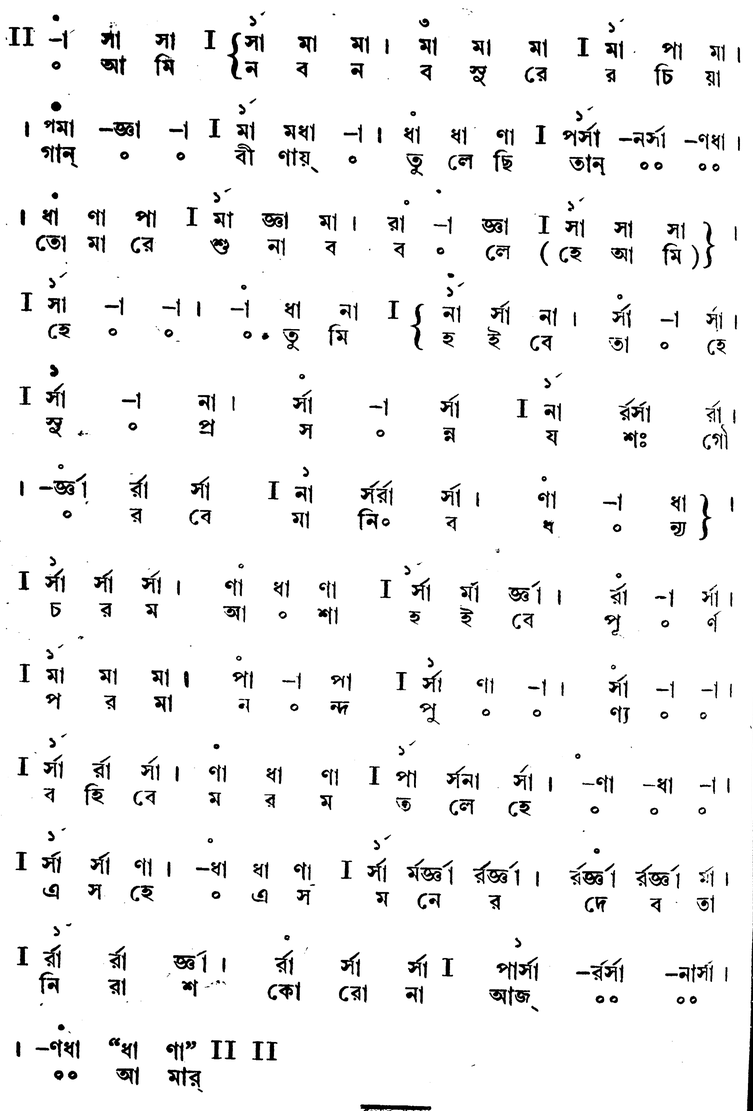

উন্মেষণা

(১৫)

প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসব দর্শন শচীন্দ্রের ভাগ্যেও ঘটিয়া গেল। জন্মাষ্টমীর ছুটি উপলক্ষে বিজনকুমারের অতিথিরূপে সে সময়ে সে বিষাদপুরেই বাস করিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হাসি ধরিয়া পড়িল "দাদা, কি দেখে এলে গল্প কর না? কাগজে ত পড়লুম খুব সেখানে ঘটা হয়ে গেছে।"

হাসি অপেক্ষা শচীন বয়সে বৎসর দুই মাত্র বড়। ছেলেবেলা ৬।৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একত্র খেলাধূলা করিয়াছে এক পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছে; কিন্তু যখন হইতে রীতিমত ভাবে শচীনের পাঠ্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের সহিত ভাবটা জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে হাসিকে সে বেশ-একটু খাট নজরে দেখে, মস্ত মুরুব্বিয়ানা চালে চলিয়া—দরকারে অ-দরকারে পদে পদে জানান্ দেয় যে, সে তাহার শ্রদ্ধা-ভাজন দাদা—বয়স্য বন্ধু নহে। হাসি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই—বিশেষত যদি সে কথা তাহার স্কুল বা বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়—তাহা হইলেই ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, —"তোর সে খবরে কাজ কি?" হাসির এমন রাগ ধরে! সেদিন পর্য্যন্ত দুজনে মায়ের কোল অধিকার করিবার জন্য ঝগড়া করিয়াছে, রূপকথা শুনিবার জন্য দিদিমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, বাবার দুই হাত দুজনে অধিকার করিয়া লইয়া দুপাশে চলিতে চলিতে নিজের গল্পের স্রোতে অন্যের মুখ বন্ধের চেষ্টা করিয়াছে। বাগানে ফুল তুলিয়াছে, তারা গণিয়াছে, পরস্পরকে হারাইবার অভিপ্রায়ে কবিতা মুখস্থ করিয়াছে। আর আজ হঠাৎ দাদা যে কি করিয়া এতটা বাড়িয়া উঠিল—সে তাহা বুঝিতেই পারে না। দেহায়তনে শচীন চিরদিনই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দাদার শরীরের বাড়টা হাসির নজরে পড়ে না,—মুখের নবীন গোঁপ-দাড়ির রেখাকেই সে ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে ঠাওরাইয়া লইয়া রাগ করিতে করিতেও হাসিয়া বলে—"ইস্, ভারী যে মুরুব্বি-আনা,—তবু ত এখনো শর-দার মত গোঁপ দাড়ি হয়নি!" শর-দা এ সম্বন্ধে বুঝি তাহার আদর্শ পুরুষ! একদিন দেখা গেল,—এই সামান্য শ্মশ্রুরেখাও শচীনের বালক-বদন হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে,—সম্ভবতঃ হাসির—হাসির জ্বালাতেই ইহার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবুও ত তাহার হাসি শচীন থামাইতে পারিল না। দাদার শ্মশ্রুহীন চেহারা দেখিয়া আরো বেশী করিয়া হাসিয়া হাসি বলিল—"বেশ হয়েছে দাদা! দেখ ভাই একবার আয়না দিয়ে নিজের মুখখানা। ঠিক আমার মতই তোমার মেয়েলি চেহারা হয়েছে! বিজনদাও এইরূপ কামায়—না?"

শচীনের অসহ্য হইল, সে রাগিয়া মুখ গোম্‌সা করিয়া চলিয়া গেল।

আজ মা গিয়াছেন নিমন্ত্রণে, দাদার সান্ধ্য ভোজনের সময় পরিবেষন করিতেছিল হাসি। সে যে চুপ করিয়া বসিয়া তাহাকে খাওয়াইবে—এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আজ হাসির প্রশ্নে শচীন ধমক দিয়া উঠিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিল না—। প্রসাদপুরের উৎসব-দৃশ্যের তরঙ্গিত স্মৃতি, তাহার মুরুব্বিয়ানার বাঁধ ঠেলিয়া আজ উপরে উঠিতে চাহে, সে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ। তাই প্রসন্ন-ভাবেই কহিল—

"শুধু একটি জিনিষ দেখলুম।"

"কি জিনিষ?"

"প্রসাদপুরের রাজকুমারীকে!"

হাসি আগ্রহে বলিয়া উঠিল—"দেখেছ তাঁকে? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শুনেছি খুব সুন্দরী তিনি?"

"সুন্দরী! অতুলনীয়া তিনি। শুধু রূপে না গুণেও। আমাদের দেশে এমন মেয়ে আছে তা না দেখলে মনেই করা যায় না!"

হাসি হাসিতে লাগিল। কথায় কথায় এরূপ অকারণ হাসি শচীনের কখনই ভাল লাগে না। সে রাগ করিয়া বলিল—"তুই কেবল হাসতেই জানিস্! তাঁর গুণের যদি একটি কাণাকড়াও পেতিস! জানিস তোর চেয়েও বয়সে রাজকুমারী ছোট কিন্তু অত-বড় একটা ব্যায়াম-সমিতি তিনিই গড়ে তুলেছেন। আর ছেলেরা সৈনিকের মত উৎসাহে তাঁর ইঙ্গিতে অস্ত্র-চালনা করছে!"

বিস্ময়ে হাসির হাসি থামিয়া গেল;—বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "সত্যি নাকি?"

"সত্যি নাত কি মিথ্যা বলছি? প্রসাদপুর যেন একটা সেনানিবাস, আর সেই ছোট্ট বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী সেখানে সেনাপতি!"

হাসি বলিল"—শর-দাও ত সেখানে আছেন? তিনিও বোধ হয় একজন সেনা হয়েছেন? দেখা হোল তাঁর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ আমি দেখেছি তাঁকে,—কিন্তু তিনি আমাকে দেখেননি!"

"তোমাকে দেখেন নি?"

"কি করে দেখবেন? তিনি যে আজ কাল মস্ত লোক? আমার মত লোক তাঁর নজরে পড়ে কি এখন?"

শরৎ শচীনকে দেখেন নাই সত্য—কিন্তু অপরাধটা তাঁর নহে শচীনেরই। শরদার ঋণটা যে এখনো শোধ দেওয়া হয় নাই, একথা শচীন ভোলে নাই। এই লজ্জায় সে নিজেই শরৎকে এড়াইয়া চলিয়াছিল, এমন কি সেই জন্য সে বিজনের পাশে মঞ্চেও বসে নাই।

দাদার কথার উত্তরে হাসি যেন তাহার প্রতিধ্বনির মতই বলিল—"মস্ত লোক!"

"হাগো হ্যাঁ। রাজকুমারী যে তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন!"

"রাজকুমারী তাঁকে মালা দিয়েছেন? তিনি কি স্বয়ম্বরা হলেন নাকি? সেইজন্যেই কি প্রসাদপুরের এ উৎসব?"

শচীন অধীর চিত্তে কহিল "থাম্‌বি একটু! এইজন্যেই ত তোকে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। একটা কথা শুনতে শুনতে দশটা কথা তোর মুখ দিয়ে ছোটে! জানিস্ ওটা ভারী বদ-এটিকেট।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বল বল, আমি আর কথা কব না।"

"বিজনদাতে শরদাতে গৎকা খেলা হোল, শরদা জিত্‌লেন, তাই রাজকুমারী তাঁকে মাল্যোপহার দিয়েছেন।" হাসি আহ্লাদে করতালি দিয়া উঠিল "শরদা জিতেছেন?"

"অত আহ্লাদের আমিত কোন কারণ দেখিনে। বিজনদাই আসলে best player, কিন্তু এর মধ্যে শরদা একটু কারচুপি খেলে-ছিলেন। ধারাল শিংটা নিজে বেছে নিয়ে ভোঁতা শিংখানা বিজনদাদাকে দিয়েছিলেন।"

বলা বাহুল্য বিজনের দল এইরূপ রটনা করিয়াছিল। হাসি রাগিয়া গেল, বলিল "কক্ষণো না। শরদা কখনোই এমন অন্যায় করবেন না, আমি তাঁকে বেশ জানি।"

"তুই ত সব জানিস!"

"নিশ্চয় জানি!"

"বেশ, জানিস্ ত জানিস্, শরদা এখন আর আমাদের বন্ধু নেই এটাও জেনে রাখ্। শুন্‌লি ত রাজকুমারী তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন।"

শচীন ভগিনীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এইরূপ খোঁচা দিল। হাসি নীরব হইয়া গেল, শচীন তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া, চটিজুতার ভিতরে আধখানা, বাহিরে আধখানা পা রাখিয়া জুতাজোড়ার সহিত পাজোড়া টানিতে টানিতে হাত ধুইবার অভিপ্রায়ে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাসী ঘটি-গামছা লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া দুই-একটা কুলকুচা করিয়াই চটপট গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজকুমারীর গুণের কথা শুনিয়া হাসির হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; ঘরে আসিয়া হৃদয়ের উথলিত সেই শ্রদ্ধানুরাগে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া তাহার মনে হইল, রাজকুমারীর ঠিকানা ত তাহার জানা নাই! শুধু প্রসাদপুর ঠিকানায় পাঠাইলেই কি তাঁহার হাতে পৌঁছিবে? না দাদার নিকট ঠিকানাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হইবে? কিন্তু তাহা হইলেই ত দাদা কারণটা ধরিয়া ফেলিবে? তাঁহাকে কথাটা জানাইতেও ত ইচ্ছা করে না! সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে সে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শচীনের বিদায়-দিনের কথা মনে পড়িল। আজ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। সেদিনের মত জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক হাস্যোজ্জ্বল নহে। অবসর পাইয়া আজ আকাশের স্থানে স্থানে তারকারাশি গুচ্ছে গুচ্ছে দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল,—কোন কোন গুচ্ছস্থিত এক-একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্ত মহিমায় অন্য সকলকে হীন-প্রভ করিয়া চন্দ্রের স্থল আজ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

পশ্চিম দিকে জ্বলিতেছিল শুক্রতারা; মাথার উপর জ্বলিতেছেন, বৃহস্পতি; কিন্তু হাসি উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিল সপ্তর্ষিকে। কিন্তু এই সাতটি তারা যে এলোমেলো ভাবে কোথায় এখন হারাইয়া পড়িয়াছে হাসি তাহাদের সঙ্কেতে ধ্রুব-তারাটির নির্দ্দেশ পাইল না। আকাশ হইতে বাগানের দিকে তখন সে দৃষ্টিপাত করিল,—গাছপালার মধ্যে শতসহস্র জোনাকি পোকা একইসঙ্গে তাহার নয়নে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। —হাস্নুহানার গন্ধরাশি—তাহার নাসিকার

উপর প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেদিনও এই গন্ধে দিক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত যে সঙ্গীত-ধারা উথলিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা নীরব। সইসের বোন—জোয়ানীর অনেক দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর শরদা? তিনি এখন কোথায়? সম্ভবতঃ রাজকুমারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছেন। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া ক্রমশ কপোল বাহিয়া নীচে পড়িল।—কেন? হাসি ত তাঁহাকে ভালবাসে না, তাঁহার প্রেম ত সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—তবে?

ভালবাসে না—ইহাই কি ঠিক? না—সে ভালবাসে,—কিন্তু সে ভালাবাসা ত তার প্রেম নয়, তাহা সখ্যতা, তাহা শ্রদ্ধা, তাহা মহৎ হৃদয়ের প্রতি আকর্ষণ। যদি সে মাতার মনের ভাব না জানিত, সম্ভবতঃ এই সখ্যতা এই শ্রদ্ধা কোন দিন প্রেমে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু মাতৃ-ইচ্ছার মধ্যে সে আত্মবিলুপ্ত করিয়া দিয়া চিরদিনই শরৎকুমার হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, এবং চিরদিনই রাখিবে—তবে? তবুত অধিকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে! চিরদিন যাহাকে আপনার বলিয়া জানে—সে আজ পরের হইয়া গেল—একবিন্দু অশ্রুও কি সেজন্য পড়িবে না!

দাদার নিকট আর তাহার রাজকুমারীর ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল না।

মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কুন্দবালা প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসবের পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিল। মাতা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এখন সে প্রসাদপুরে ফিরিয়া যাইবে। যাইবার আগে সে হাসিকে দেখিতে আসিল। হাসি ও কুন্দ দুজনেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী। ছোট্ট মেয়েটি হাসি প্রথম যেদিন হাস্যপ্রফুল্ল মুখে স্কুলে দৈনিক ছাত্রীরূপে ভর্ত্তি হইয়াছিল সেইদিন হইতে সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর বোর্ডার—বালিকা কুন্দের হৃদয় অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যতদিন হাসি স্কুলে ছিল কুন্দ বালিকাকে তাহার স্নেহাঞ্চল ছায়াতলে রক্ষা করিত। স্কুল ছাড়িবার পরেও উভয়ের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কুন্দ প্রসাদপুরে কাজ লইয়া পর্য্যন্ত তাহারা একটু দূরে পড়িয়াছে সত্য, দেখা শুনাও নাই, চিঠিপত্র লেখাও একরকম বন্ধ; তথাপি কলিকাতা আসিলেই কুন্দ একবার হাসিকে দেখিতে আসিতে ভোলে না। দৈববশত ঠিক পরদিনই কুন্দ হাসিকে দেখিতে আসিল। রাজকুমারীকে দিবার জন্য তাহার চিঠিখানি হাসি কুন্দকে দিল।

(১৬)

রাজা ভাল হইয়াছেন; ব্যায়াম-উৎসবও শেষ হইয়া গিয়াছে। শরৎকুমারের আর কলিকাতায় যাইবার বাধা নাই, তিনি আজ বিকালে বাহিরে না গিয়া জিনিষ-পত্র প্যাক্ করিতেছিলেন। অভিপ্রায়, আজ সন্ধ্যাবেলা রাজাকে এ কথা জানাইয়া পরদিনই বাটী যাত্রা করিবেন।

মেজের উপর ট্রাঙ্ক দুইটা খোলা, কাপড় চোপড় তাহার মধ্যে সাজান হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর যে দুএকখানা বই ও ছোট-খাট দুই-একটা জিনিষ পড়িয়াছিল—তাহা

পোর্টম্যাণ্টে উঠাইয়া লইয়া তিনি দেয়ালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেয়ালের গায় রাজকুমারীর দত্ত মালাগাছি টাঙ্গান ছিল, কুন্দফুলের গড়েমালা, মাঝে মাঝে চাঁপা ও গন্ধরাজের মিলান্। মালাগাছি দুদিনের বাসিমালা—পাছে স্পর্শে একটি ফুলও ঝরিয়া পড়ে—হাত দিতে শরতের সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া আঘ্রাণ লইবামাত্র একটি মনোহর সুগন্ধে তাহার নাসিকা যেন ভরিয়া উঠিল,—শরতের মনে হইল—এ বুঝি স্বর্গেরই পারিজাত মালা। যাহার হস্তস্পর্শে ইহা এত পুণ্যময় গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে স্মরণ করিয়া শরৎ শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে মস্তক অবনত করিলেন।

আর যেই যাহা বুঝুক শরৎ রাজকুমারীকে ভুল বুঝেন নাই! এ মাল্য যে রাজকুমারীর বরমাল্য নহে, জয়মাল্যোপহার তাহা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ভুল বুঝিবার জন্য যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আত্মম্ভরিতার প্রয়োজন—শরতের স্বভাবে সেরূপ হাস্যকর গর্ব্বভাবের বিশেষ অভাব। জ্যোতির্ম্ময়ী রাজকুমারী,—জ্যোতির্ম্ময়ীর আকাঙ্ক্ষা বাসনাও অসাধারণ; মহৎকার্য্যেই তাঁহার সমস্ত মনোপ্রাণ উৎসর্গীকৃত; শরতের মত একজন নগণ্য সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার যে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে—ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর। ইহার উপর তাঁহার নিজের হৃদয়েও এক্ষেত্রে প্রেমের চাঞ্চল্য নাই। অতএব রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার একদিকে শ্রদ্ধা-সম্মানপূর্ণ অন্যদিকে বেশ নিঃসঙ্কোচ,—স্বাভাবিক। এই শক্তিময়ী রমণীর সান্নিধ্য, তাহার সখ্যতা, তাহার প্রশংসা শরতের ক্ষত হৃদয়ে যে মহৌষধ-সুধা ঢালিয়াছিল—সেজন্য রাজকুমারীর প্রতি তিনি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

হাসিকে কি শরৎ ভুলিয়াছেন? এত শীঘ্র কি ভোলা যায়? কিন্তু তাঁহার উপেক্ষিত হৃদয় বিস্মৃতিদেবের নিকট যে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল তাহা একেবারে অগ্রাহ্য হয় নাই। রাজকুমারীর সখীত্বের আশ্রয়ে তিনি বল পাইয়াছেন, ভুলিবার নূতন পথ চিনিয়াছেন। উপেক্ষিত প্রেমিকেরও জীবন বৃথা যায় না, কর্ম্মের পথে তাহা সার্থক হইয়া উঠে;—রাজকুমারী তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন—তিনি তাঁহার নমস্য দেবী।

বিদায়ের দিনে হাসি যে বনফুলটি শরৎকে পরাইয়া দিয়াছিল সেটি শরতের বুকের পকেটেই থাকিত,—তাহা বাহির করিয়া লইয়া তিনি দেখিলেন—বুকের চাপে ফুলটি পেষিত হইয়া গিয়াছে—তবু যেন ঠিক তেমনিটিই আছে, একটিও দল ইহার খসে নাই। রাজকুমারী-দত্ত ফুলমাল্যের দোলন-গুচ্ছের সহিত সেই ফুলটি তিনি সযত্নে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর মালাগাছি—অতি সাবধানে দেয়ালের হুক হইতে খুলিয়া একটি শূন্য কাগজের বাক্সে পূরিলেন। বাক্সটি যখন নিরাপদে ট্রাঙ্কে উঠিল তখন তাঁহার প্যাকিংও শেষ হইল,—তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজার গৃহপার্শ্বেই শরতের ঘর;—রাজকুমারী থাকেন অন্তঃপুরে—তাহার চূড়ামাত্র এখান হইতে নজরে পড়ে; সেই চূড়ার দিকে চাহিয়া, মন্দির মধ্যে বিরাজিত

দেবীমূর্ত্তির মহিমা তিনি কল্পনা করিলেন। তখন কি আর কাহাকেও তাঁহার মনে পড়িয়াছিল? যেখানে ব্যথা—সেইখানেই প্রথমে হাত পড়া স্বাভাবিক—কিন্তু তবুও হৃদয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে চায়।

রাজকুমারী কিন্তু তখন অন্তঃপুরে ছিলেন না। তিনি শরতের ঘরের পাশেই—রাজার নিভৃত উপবেশন-কক্ষে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজা মধ্যাহ্নের পর যেখানেই গমন করুন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন—এই সময় প্রায়ই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে লইয়া মোটারে বেড়াইতে যান। আজ তিনি এখনো ফেরেন নাই—রাজকুমারী একটু উৎকণ্ঠিতচিত্তে পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেদিনকার সেই আকস্মিক বিপদের পর হইতে—রাজার আসিতে বিলম্ব দেখিলেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে একটু ভাবনা জন্মে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ণ কাল প্রভাতের মতই অরুণ রাগে সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য্যগোলক গাছপালার মধ্য দিয়া পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে। ভাদ্রের ভরা নদীর বক্ষে—লাল আলোর বিদ্যুৎ লহরী চমকিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—গাছপালা মাঠ এখনো আর্দ্র; মাঠের ধারে, গাছের শাখায়, আটচালার গায়ে সজ্জিত উৎসবের শুষ্ক ফুলমালা সহসা যেন নবীন হইয়া দুলিয়া উঠিয়াছে। মাঠে আজ খেলা চলিতেছে না, ব্যায়াম-উৎসবের পর দুইদিন ছেলেরা ছুটি পাইয়াছে। তবুও মাঠ শূন্য নহে, ছেলের দল—মাঠ, তাম্বু, আটচালা অধিকার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হারমোনিয়মের সঙ্গে হঠাৎ সেই গানটি আটচালার ভিতর হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

ভিক্ষাং দেহি জননী গো ভরিয়ে দে ঝুলি।

বোধ হয় সেদিনকার মত তাহারা আবার অভিনয় আরম্ভ করিল। গানটি শুনিতে শুনিতে রাজকুমারী ক্ষণকালের জন্য অন্য চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। সার্থকতার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মাঠে সাজান শুষ্ক ফুলগুলির মত সে আনন্দ পরমুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া পড়িল: জ্যোতির্ম্ময়ীর বাসনা পূর্ণ হইয়াছে সত্য,—তাহার ব্যায়াম-সমিতিতে আজ কত লোক, কত যুবক, কত সুনিপুণ,—খেলোয়াড়। কিন্তু তথাপি কয়জন ইহারা? —দেশের পক্ষে কয়জন? বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যখন এইরূপ আয়োজন হইবে—তখনই না একদিন তাহার মনোগত আশা-অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে!

ভারতের সর্ব্বদেশের লোক বীর বলিয়া পরিচিত,—সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত, কেবল বঙ্গবাসী এই অধিকার-বিচ্যুত। একটা জনরব—বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ—এই অখ্যাতি অপবাদ কেমন করিয়া রটিল—কে রটাইল? যেদিন বাঙ্গালীর এই মিথ্যা কলঙ্ক অপনীত হইবে—স্বয়ং রাজা ইহাদিগের বীরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাদিগকে সেনার অধিকার দান করিবেন—সেইদিন—সেইদিন জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরতম আশা পূর্ণ হইবে,—তাহার আত্মা প্রসন্ন হইয়া উঠিবে।

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী কি একলাই এরূপ করিয়া ভাবিতেছে? নহে নহে তাহা নহে, বাঙ্গলার দিন আসিয়াছে—সম্ভবতঃ দেশের

অনেকেই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে কাজ করিতেছেন—তাহার চিন্তা—তাহার চেষ্টা—তাহার কার্য্য সেই শত সহস্রের মধ্যে একটি কণা। "তাহাই হউক —তাহাই হউক—হে ভগবান তাহাই হউক। —তুমি দেশের সকল লোকের মনের আকাঙ্ক্ষা-বাসনার সহিত আমার এই শক্তিকণাকে মিলিত সংযোজিত করিয়া ইহাকে মহান্ করিয়া, বিরাট করিয়া তোল।"

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিল। সূর্য্যদেব তাঁহার রক্তিম করমালা জ্যোতির্ম্ময়ীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া যখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নদীর পরপারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন বালিকা গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই সুবিস্তৃত বারান্দারই একধারে শরৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজকুমারীকে দেখিয়া তিনি নিকটে আগমন করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন—"ডাক্তার-দা! আপনিও বুঝি বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন? বেড়াতে যাননি যে কোথাও?"

"কাল বাড়ী যাব মনে করে, জিনিষ-পত্র প্যাক্ করছিলুম।"

"বাড়ী যাবেন? এত শীঘ্র?"

"শীঘ্র আর কই—প্রায় দু-মাস ত আপনাদের অতিথি হয়ে আছি—"

"এমন শীঘ্র শীঘ্র সময় চলে যায়! মনেই হয় না যে আপনি এতদিন এসেছেন! আপনার বোধ হয় অনেক কাজের ক্ষতি হচ্ছে?"

"কাজের ক্ষতি!—না তা ঠিক বলতে পারিনে—"

শরৎ একটু থামিয়া থামিয়া কথাগুলা বলিলেন—রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি দেখছি আদর্শ বিনয়ী,—"

দূরে অশ্বের পদশব্দ হইল—উভয়েই সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন,—কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। রাজকুমারী বলিলেন—"ডাক্তার দা—বাবা এখনো এলেন না—আমার একটু ভাবনা হচ্ছে।"

"ভাবনার কি কারণ? তিনি যে অবস্থাতেই পড়ুন আত্মরক্ষা করতে পারবেন —আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!"

"তা ঠিক। আচ্ছা বাঙ্গালীদের ভীরু বলে একটা অপবাদ আছে—না?"

শরৎ হাসিলেন—বলিলেন,—"মেকলে এইরূপ বলে গিয়েছেন—।"

"কিন্তু এমন মিথ্যা কথাটা আপনারাও ত অম্লানবদনে মেনে নিচ্ছেন? বাঙ্গালী যদি ভীরু জাত হোত তাহলে তাদের জমীদারী থাকত না। প্রত্যেক জমীদারীতে ত সারা-দিন লাঠালাঠী চলছে—আর লাঠিয়ালেরা ত অকাতরে প্রভুর জন্য প্রাণ দিচ্ছে। এরা যদিও সামান্য লোক তবু বীরত্বে কি এরা কোন শিক্ষিত রাজসৈন্যের চেয়ে কম?"

"গভর্ণমেণ্ট তা বোঝেন কই?"

"আপনারাও ত বোঝাবার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। আমি কলকাতায় গিয়ে স্বদেশী চিত্র-মেলায় একখানা ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম! ছবিখানি বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের; তিনি প্রাণভয়ে অন্তঃপুরের রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছেন! ভীরুতার

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি! আর এই চিত্রকল্পনার জন্য নবীন চিত্রকর নাকি দেশের নামজাদা চিত্রকরদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন! দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল এসেছিল; ইচ্ছা হচ্ছিল ছবিখানা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলি।"

ক্রোধের আবেগে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল! শরৎকুমার নীরব হইয়া রহিলেন। বালিকা পুনরায় উত্তেজিত ভাবে কহিল "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কলঙ্ক! কক্ষণো লক্ষণসেন প্রাণভয়ে অমন করে চোরের মতন পালান নি।"

"অসম্ভব বলেই ত মনে হয়। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নাকি ঐ রকম বলেছেন?"

"আর সেই মিথ্যা ইতিহাসকে আমরা অমর অক্ষরে ধরে রেখে নিজেদের ভীরুতার প্রচারে প্রশংসা আদায় করে গর্ব্ব অনুভব করছি। উঃ, আমার সমস্ত রক্ত আগুণ হয়ে ওঠে! আচ্ছা—গণেশদেব, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের চিত্র আমাদের চিত্রশালায় নেই কেন? চিত্রকরের কল্পনা-তুলিতে কেবল পলাতক লক্ষণসেনই চিত্রিত হলেন?"

শরৎকুমার লজ্জিত ভাবে মুখ নত করিলেন। বালিকা কহিল "আসবেন ডাক-দা একবার ঘরের ভিতর—" বালিকার অনুবর্ত্তী হইয়া শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, যোগমায়া দেবীর চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন;—"ইনি বাবার প্রমাতামহী; বর্গির উপদ্রবের সময় ইনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেখুন কেবল রাজপুতানায় নয় বাংলাদেশেও বীরাঙ্গনা আছে। আর আমি বেশ বলতে পারি দরকার হলে এখনো অনেক মেয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেবে। আমাকে ভারী গর্ব্বিত বলে মনে করছেন—বোধ হয়?"

"মোটেই না। আপনি যথার্থই বীরাঙ্গনা।"

এই প্রশংসালাভে একটা নূতন রকম আনন্দে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়প্রাণ যেন ভরিয়া উঠিল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের চমক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ত কত প্রশংসা করেন—ম্যাজিষ্টেট দম্পতি ত আদর করিয়া কত কথা বলেন,—পিতার চক্ষেও ত জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বদা সুখ্যাতির আবেগ দেখিতে পায়, কিন্তু কাহারও প্রশংসায় এমনতর একটা আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিন পূর্ণ হইয়া উঠে নাই!

মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন যেন একটু লজ্জিত হইল। কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে সলজ্জভাবে কহিল—"আচ্ছা—ডাক্তার-দা—আপনার ত একটা ambition আছে?"

শরৎ কোন উত্তর না দিয়া হাসিলেন, বালিকা বলিল—

"আপনার ambition যে কি, তা কিন্তু আমি বলতে পারি; ভাল ডাক্তার হওয়া—না?"

"নিশ্চয়ই!"

"আমার কি ambition শুনবেন? আমাদের জাতকে সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত

দেখা। আচ্ছা, আমাদের দেশের মুখপাত্র যারা—তাঁরা কেন এজন্যে চেষ্টা করেন না?"

"করেন বই কি? কত লেখালেখি করেন।"

"কাগজে ও-রকম ক'রে এক কলম মাঝে মাঝে লিখলে কি কাজ হয়? দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে এ-ভাব জাগিয়ে তোলা চাই; সে রকম চেষ্টা কি করছেন তাঁরা?"

"তা ঠিক জানিনা। এইটুকু জানি, যে আপাততঃ দেশের মুরুব্বিরা বঙ্গবিভাগ আইন যাতে না হয় তার চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন।"

"হলোই বা বঙ্গবিভাগ,—তা নিয়ে এত গোলযোগ কেন? ক্ষতি কি তাতে?"

"একেই আমাদের মধ্যে একতা নেই; তাতে আমরা আরও তফাৎ হয়ে পড়ব,—সকলে এই আশঙ্কা করেন।

"বৃথা আশঙ্কা। ভিতরে একতা থাকলে বাইরের লোকে কি তা ভাঙ্গতে পারে?—যদি দেশের লোকে বঙ্গবিভাগ না চায় তা হলে গভর্ণমেণ্টের এ কাজে একতা বাড়বে তবু কমবে না!"

"আপনার বাণীই সফল হোক্!"

ইহারা ঘর হইতে পুনরায় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা হারমোনিয়মের সঙ্গে ধ্বনিত গান বন্দেমাতরম্ শব্দে ডুবিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত মশায় দেখছি ছেলের দলে ঢুকলেন।"

"উনি ত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র?"

"উনি আমার গুরুদেব। ওঁর মধ্যে যে খাঁটি জিনিষ আছে তা সংসারে বড় দুর্ল্লভ। কুন্দ যখন ওঁকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে, আমার এমন রাগ ধরে!"

শরৎ হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন—"জানেন ত খাঁটি জিনিষ মাত্রেরই ভার বেশী; হাল্‌কা জিনিষের পক্ষে সেটা স'য়ে নেওয়া ত সবসময় সহজ নয়। বিশেষ যখন আধার বস্তু balast হারিয়ে নিজেই টলমল করতে করতে চারদিকে একটা laughing গ্যাসের সৃষ্টি করেন—তখন দর্শক বেচারাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় একবার ভেবে দেখুন দেখি? আমাকেও এই অবস্থায় কোন কোন সময় পড়তে হয়েছে! জানেন ত মানুষ স্বভাবতঃই পাপী; আদমের পাপ বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে আসছে। আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের জন্যে আশা করি মার্জ্জনা পাব?"

বলিতে বলিতে শরতের মনে পড়িল, হাসিকে। পণ্ডিত মহাশয়ের ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তায় হাসি যে কিরূপ হাসিত—তাহা তিনি কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আর—জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট স্তরে যে কথা জাগিতেছিল—তাহার মনে পড়িল সেই কথা। শরতের কথায় রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ডাক্তার-দা, ভেবে দেখুন দেখি পণ্ডিত-মহাশয়ের সেদিন কি আহ্লাদ হবে—?"

"কোন্‌দিন?"

"যেদিন তিনি বাঙ্গালীদের সৈনিকবেশ দেখবেন—অবশ্য যদি এমন দিন কখনো আসে! আচ্ছা, আমরা যে পথ ধরেছি—এটা কি ঠিক পথ ডাক্তার-দা? ব্যায়াম-শিক্ষাতে ছেলেদের মনের তেজও কি

বাড়বে? আর গভর্ণমেণ্টের চোখে—একদিন সেটা সূর্য্যচন্দ্রের মতই এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে যে তখন আর এদের বীরত্ব অগ্রাহ্য করতে পারবেন না?"

"গভর্ণমেণ্ট কি বুঝবেন না বুঝবেন বলতে পারিনে,—তবে ছেলেরা এতে যে তেজস্বী হয়ে উঠবে,—তাতে সন্দেহ নেই।"

"কেজানে এক এক সময় আমার মনের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্য জমাট বাঁধে—মনে হয় এ যেন আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সাগর বাঁধার প্রয়াস হচ্ছে!"

"না রাজকুমারি, আপনি ক্ষুদ্র শক্তি নন, শক্তিতে আপনি মহীয়সী। আপনার কার্য্যের ফল যে একদিন খুব বড় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ করবেন না।"

অতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই শরৎকুমার একথা বলিলেন; তাঁহার বাক্যে সত্যের একটি মূর্ত্তি প্রতিভাত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় একটা আনন্দ-প্রবাহ রাজকুমারীর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই স্রোতোবেগে চালিত হইয়া কহিলেন—"আপনি জানেন না—ডাক্তার-দা—আমি কতটা দুর্ব্বল! এক এক সময় কাজ করবার কোন শক্তিই থাকে না আমার। আচ্ছা ডাক্তার-দা—আপনি আমার সহায় হবেন?"

"যদি অধিকার দেন,—সর্ব্বপ্রাণে"।

এই উত্তরে সহসা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী সচেতন হইয়া উঠিল। ঠাকুরমার ঠাট্টা মনে পড়িয়া গেল। শরৎকুমার তাহাকে ভুল বুঝিলেন না ত?—

অকারণে সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বালিকা বলিল—

"মাপ করবেন—শরৎবাবু কি বাজে বকছি!—আমার সহায় বন্ধু আর কেউ হতে পারবে না—আমি নিজেই—"

পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—রাজা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন—"রাণী!" জ্যোতির্ম্ময়ী চমকিয়া উঠিল—উভয়ে কথা-বার্ত্তায় এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল—যে কখন্ যে রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়াছেন—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উঠিল—"বাবা এসেছেন!" বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত করিয়া লইবার জন্য সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎ অপরাধীর মত বারান্দাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন;—হঠাৎ কি কথায় কি ব্যবহারে রাজকুমারীকে তিনি অপ্রসন্ন হইবার কারণ দিলেন—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রাজকুমারীও বোঝেন নাই কোন্ ভাবের এ উন্মেষণা! কেন তিনি বিরক্ত হইলেন? কাহার প্রতিই বা বিরক্ত হইলেন? নিজের প্রতি না শরতের প্রতি?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

একালের বাংলা-সাহিত্যে অল্প যে-কয়েকজন লেখক সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান একজন। সমালোচন-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাড়াইবার ক্ষমতা রাখেন, নবীন সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দেখাই যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত এবং এই কঠিন কার্য্যে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণপ্রণ আগ্রহ এবং অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এদিকে তিনি ছিলেন একাকী; এবং সহস্র বিরুদ্ধ মতের মধ্যে এম্‌নি একাকী দাঁড়াইয়াই তিনি সমান অটলতা ও সফলতার সঙ্গে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া চলিতেছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করিতে পারেন, এমন লোক ত চোখে পড়িতেছে না। সুধু রসিক সমালোচক বলিয়া নয়—জীবনচরিত রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের জীবনচরিত তাঁহার অমর কীর্ত্তি। ইদানীং কিছুকাল ধরিয়া তিনি মহাত্মা রাম-মোহন রায়ের জীবনচরিত রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার যে সামান্য কিছু-কিছু নমুনা সাময়িক-পত্রাদিতে বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, অজিতকুমারের রামমোহনচরিত সমাপ্ত হইলে, বাংলা ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত-রূপে সমাদর লাভ করিত। শুধু এদেশের সাহিত্য নয়, বিদেশের সাহিত্য লইয়াও অজিতকুমার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি সাধারণ পাঠকের চোখের সাম্‌নে সাহিত্যের খাঁটি রূপটি ফুটাইয়া দেখাইতে পারিতেন এবং হৃদয়ের মধ্যে সাহিত্য-রস-গ্রাহিতার একটা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্ম্মের সহিত বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয়-সাধন করিয়া দিবার জন্য তিনি যে-সকল সুলিখিত প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার রসগ্রাহিতা, বিচারক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি এই অল্পবয়সেই পরি-পক্কতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার উপার্জ্জিত জ্ঞানকে তিনি অকেজো রাখিয়া যান নাই।

কেবল একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক রূপে নয়—সৎচরিত্র, সদালাপী, সুরসিক বন্ধুরূপেও আজ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। স্বাভাবিক সুকণ্ঠের জন্যও তিনি সকলের নিকট আদর পাইতেন;—যে-কোন বন্ধু-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার মধুর স্বরলহরীতে, গানের পর গানে সে-সভার সকলকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত ভুলাইয়া রাখিতেন। অজিত কুমার আজ নাই, বন্ধুদের সভাও আজ নীরব;—তেমন-করিয়া অশ্রান্তভাবে রবীন্দ্র-নাথের গানও আর-কেউ বোধ হয় শুনাইতে পারিবে না! রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমৃত-রসধারায় হৃদয়-মন অভিষিক্ত করিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য



স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

তাঁহার দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণে অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

মৃত্যুকালে অজিতকুমারের বয়স হইয়াছিল চৌত্রিশবৎসর মাত্র। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে পরিপূর্ণতা লাভের অবকাশ দিল না। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল তাহা বলা বাহুল্য এবং ভারতীর যে কি ক্ষতি হইয়াছে তা শুধু আমরাই জানি। তাঁহার অভাবে আমাদের অনেক সংকল্প আজ নিভিয়া আসিতেছে। ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

সমালোচনা

হেরফের। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫এ রামকৃষ্ণ বাগচী লেন, কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাত সিকা। এখানি উপন্যাস। উপাখ্যান মোটামুটি এই,—রজত ও শিশির এক-কলেজে বি-এ পড়িত। রজত বড়-লোকের এক-ছেলে, তার কবি, প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সংগ্রহে' তার লেখার ভারী আদর; ঘরে তাহার বিধবা মা সুনয়নী, আর তরুণী স্ত্রী সন্ধ্যা এবং অগাধ সুখৈশ্বর্য্য। শিশির গরিবের ছেলে, স্কলার-শিপ-হোল্ডার—কলিকাতায় এক মেশে নীচের তলায় স্যাঁতানে ঘরে থাকে। দৈবাৎ একদিন কলেজে শিশিরের সঙ্গে রজত সখ্য স্থাপন করিল এবং একেবারে তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া মা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সন্ধ্যা স্বামীর সাহিত্য-যশের গর্ব্বে গরবিনী। শিশিরকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই রজত তাহাকে সন্ধ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তখন তিনজনে বসিয়া নানারূপ সাহিত্যালোচনা চলিত। রজত শিশিরকে সাহিত্য-রচনায় উৎসাহিত করিল—কিন্তু যখন দেখিল, শিশিরের লেখার আদর তাহাকে ছাপাইয়া উঠিল, এমন কি রজতের বন্ধু সংগ্রহ-সম্পাদকও তাহার লেখা ফেলিয়া শিশিরের লেখার আদর করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে হিংসা জ্বলিল। প্রসাদলোভী বন্ধুদের উত্তেজনায় রজত শেষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে শিশিরের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং স্বনামে-বেনামে শিশিরের রচনার নিন্দা করিয়া কাগজে সমালোচনা বাহির করিতে লাগিল। সেই সূত্রে শিশিরকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করিয়া সে গৃহে মাতা ও স্ত্রীর কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। শিশির কিন্তু রজতের এই শত্রুতা গায়ে মাখিত না। সন্ধ্যার কাছে বিদ্যুৎ নামে একটি তরুণী প্রায়ই বেড়াইতে আসিত—সে বেচারী এক রূপজীবীনীর কন্যা। বিদ্যুৎ মার সহিত একসঙ্গে বাস করিত না—বোর্ডিংয়ে সে মানুষ হইয়াছিল। সে মার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুই জানিত না—মাও তাহার কাছে সে পরিচয় গোপন রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার গৃহে শিশির ও বিদ্যুৎ দুইজনের মনে অনুরাগ সঞ্চার হয়। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ একদিন মাকে "সমাজগণ্ডীর বাহিরে" পল্লীর এক গৃহে একদল স্তাবক বাবুর সম্মুখে হাবভাবময় নৃত্যে নিযুক্ত দেখিল; দেখিয়া ঘৃণায় ক্ষোভে সে সে-স্থান ত্যাগ করিল। মাও মেয়েকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। মা আর বাঁচিল না। মরিবার সময় শিশিরকে ডাকিয়া মেয়ের সচ্চরিত্রতার বিবরণ বলিল, এবং তাহার হাতে মেয়ের ভার সঁপিয়া মরিল। উক্ত ঘটনার পর বিদ্যুৎ কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে চাকরি করিতে গেল এবং শিশিরও সেখানে গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। ঘটনা মোটামুটি এই। লেখক এই গ্রন্থে আরম্ভ হইতেই এমনি বিচিত্র কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছেন যে পাত্র-পাত্রীর কার্য্য-কলাপ কোন্ সূত্র ধরিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং বহিখানি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকের আর স্বস্তি থাকে না। ইহার চরিত্রগুলি সবই রক্ত-মাংসের জীব এবং যে-সকল নরনারীকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে সর্ব্বদা চলিতে-ফিরিতে দেখি, ঠিক তাহাদেরই মত এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রী নিজের নিজের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, হাসি ও অশ্রু লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের গায়ে কোথাও একটা পুঁথির ছাপ মারা নাই, বা কাহাকেও পরম গম্ভীরভাবে আদর্শ শিখাইবার জন্য অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতেও আবির্ভূত বলিয়া মনে হয় না—পাত্র-পাত্রীর মনের ছোট ভাবটুকু হইতে বাহিরের বিরাট কার্য্য-কলাপ অবধি দস্তুরমত সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ; সর্ব্বত্রই সজীবতার লক্ষণ একান্ত পরিস্ফুট। অনেক সুলিখিত উপন্যাসে দেখা যায়, লেখকের শক্তি ও সতর্কতার ফাঁকে ঘটনা প্রভৃতির একটু-আধটু অস্বাভাবিকতা উঁকি দেয়—সৌভাগ্যের বিষয়, এ বহিখানিতে সে ত্রুটি কোথাও

চোখে পড়ে না! সবচেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার ভাষা। খুব সহজ স্বচ্ছ ভাষায় এমনি কৌশলে রচনাটি ঢালা হইয়াছে যে মানুষগুলা একেবারে জল্‌জ্বলে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্লটেও কোথাও ঘোর-প্যাঁচ বা হেঁয়ালির চিহ্ন নাই—তবে ত্রুটিও যে দুই-একটা চোখে না ঠেকিয়াছে, এমন নয়। রজত বেচারাকে ক্ষণপ্রভার মজলিসে না বসাইলে কোন ক্ষতি ছিল না; বরং ঐ ব্যাপারে রসটা একটু গাঢ় বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যা ও বিদ্যুতের চরিত্র আমাদের চমৎকার লাগিয়াছে। আমরা চাই সমাজে এমনি সন্ধ্যার মত স্ত্রী—যে স্বামীর নীচতা বা অত্যন্ত নির্লজ্জ ক্ষুদ্রতায় সায় দিয়া "লক্ষ্মী বৌটি" হইয়া ঘরের কোণে চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে না! দৃপ্ততেজে স্বামীর নীচতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বামীর ত্রুটি দেখাইয়া দিবে, এবং সন্ধ্যার মতই স্বামীর সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত করিবে। প্রত্যেক আদর্শ স্ত্রীর তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। নহিলে দুশ্চরিত্র স্বামীর দুশ্চরিত্রতায় মৃদু ক্রন্দনে অনুযোগ তুলিয়া স্বামী-দেবতার পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া স্ত্রী যে স্বামীর পদযুগল বুকে ধরিয়া বলিবে, "লাথি মেরেছ, বেশ করেছ প্রভু, দেবতা আমার, দুঃখ নাই, তবে তোমার পায়ে যে বড় বেদনা বেজেছে, দেবতা!" এবং শেষে দেবতার শ্রীচরণে তেল মালিশ করিতে বসিয়া যাইবে, তেমন স্ত্রী কোনকালেই 'সহধর্ম্মিণী' পদবাচ্যা হইতে পারেন না। তেমন স্ত্রী সংসারে ডাল-ভাত রাঁধিতে পারে, তবে সে মাটীর পুতুল লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। দিন কয়েক পূর্ব্বে এমনি আদর্শে বাঙলা কেতাবে স্ত্রী ঢালাই চলিতেছিল—আমাদের সৌভাগ্য, সাহিত্যের সে স্রোত ফিরিয়াছে। আমরা এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে দেখিতে চাই, সুনয়নীর মত বলিষ্ঠ-চিত্তা মা, সন্ধ্যার মত কোমলে-কঠিনে গঠিতা প্রেমময়ী কর্ত্তব্য-পরায়ণা স্ত্রী বিদ্যুতের মত স্বাধীন-চিত্তা নারী এবং শিশিরের মত আদর্শ আত্মনির্ভরশীল যুবা! এ উপন্যাসখানিতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ-আশার বার্ত্তা আমরা পাইয়াছি। গ্রন্থখানি বাঙলার উপন্যাসের রাজ্যে বেশ একটা দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসপ্রিয় প্রত্যেক বাঙালীকে এই নির্ম্মল অনাবিল সমাজ-চিত্রখানি একবার চোখের সম্মুখে ধরিতে বলি। বইখানির ছাপা-কাগজ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

নিয়তি। সামাজিক নাটক। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কলিকাতা ফাইন আর্ট কটেজে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। এই নাটকখানির কলেবর ক্ষুদ্র নহে—সুবৃহৎ। গ্রন্থে লেখক সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। গরিব চাষাভুষার ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের অভাবও দুই-একটি দৃশ্যে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন মদ খাওয়ার পরিণাম, চরিত্র-হীনের প্রায়শ্চিত্ত, অর্থ-লোভীর দুর্দ্দশা—নানা বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে এবং এই ব্যাপারগুলি ফুটাইবার জন্য ডাকাতের দল, বারাঙ্গনা, পুলিশ, মদ্যবিক্রেতা, ইয়ারগণ—এমনি নানা প্রাণীকে লেখক নাটকে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু একই নাটকে এতগুলি ব্যাপার ঠাসিতে হইয়াছে বলিয়া লেখক কাহারো প্রতি তেমন সুবিচার করিতে পারেন নাই—কেবল এক জমিদার-পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি জীববিশেষকে লইয়া এক বিশেষত্বহীন ঘটনার কাঠামো মাত্র খাড়া করা হইয়াছে—নাটকে প্রাণ-বস্তুটির একান্ত অভাব। নাট্য-রচনায় যে কৌশলের প্রয়োজন এ গ্রন্থে তাহার ইঙ্গিত কোথাও দেখিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শাপসন্তপ্ত অহল্যা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ।

[শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

ভারতী

৪২শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৫ [১১শ সংখ্যা

পাটেল-বিল্*

অসবর্ণ বিয়ের কথা মহাত্মা পাটেল যেম্‌নি উত্থাপন করেছেন, অম্‌নি দেখা গেল, বুড়ো-বাংলা বাইরে থেকে ধার-করে-আনা টোপর মাথায় দিয়ে গড়ের মাঠের সমাধি-স্তম্ভটির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়তে লাগলো—না-না-না! এরা মৃত্যুকেই চায়! পাঁচকে অনেকখানি মিথ্যে এবং অনেকগুলো শূন্যের উপরে খাড়া কোরে কবর ও হাড়কাঠ—দুটোই সাক্ষী রেখে পাড়া-পড়্‌সির সেদিনের রামলীলায় সমস্ত বাংলা যোগ দিয়েছে, কাগজের ঢাক-পিটিয়ে এই যে মিথ্যে কথাটা জগতে প্রচার করবার চেষ্টা হচ্ছে, সেটাকে অপ্রমাণ করা চাই। বুড়োর দলকে বাংলার মাথায় এই উপহাস কিছুতেই চাপাতে দেওয়া নয়। বুড়োরাই তো বাংলার সবখানি নয়! সবদিক দিয়েই নতুন বাংলা আপনার কথা, আপনার আশা-ভরসা নিয়ে জগতের সাম্‌নে এসেছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো সভাপণ্ডিত বা কোনো সনাতন মোড়লের সাধ্য নেই। আমরা জানি মাঠের গোরটার কাছ থেকে এবং শ্মশানের মশানের কাছ থেকে যে অসম্মতির চীৎকার শোনা যাচ্ছে, সেটা অসবর্ণ বিয়েতে সারা বাংলার মানুষদের অসম্মতি বোলে কোথাও গ্রাহ্য হবে না। অসবর্ণ বিয়ে করবে দেশের সাহসী যুবক-দল। বিয়ে দেবে তার চেয়েও অসম-সাহসী মেয়ের বাপ-মা। আইন হচ্ছে তাদের নিরাপদে থাকার জন্য। পাড়ার বুড়ো এবং পড়সী মোড়লদের এতে ঘুমের ব্যাঘাত কেন হবে? এবং এ-নিয়ে তারা চেঁচামেচি করবেইবা কেন?

বাঙালীর সমাজের সম্মতি-অসম্মতি জানাবার জন্যে বেহার থেকে সভাপতি ধরে আনায়, এদের সভার অসম্মতি খুব যে

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউট হলে পাটেল-বিলের সমর্থন-সভায় সভাপতির বক্তৃতা।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

পাকা-রকমের, তার পরিচয় তো পাওয়া যায় না।

সুখের বিষয়, সারা বাংলার নামে বুড়োর দলের সেদিনকার সভায় বাইশখানা বক্তার আসনের মধ্যে একুশখানাই খালি পড়েছিল—সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত দেখেছি। শুনেছি তারপরে অন্ধকারে পঞ্চাশ-হাজার সেখানে কীর্ত্তন ও আইনের কর্ত্তন করবার জন্যে জুটেছিল এবং সহরের রাস্তায় কোনো গোলযোগ না ঘটিয়ে সাড়ে-ছ'টার ট্রাম ধর্ম্মতলায় লাগবামাত্র তাতে চড়ে ঘরে গিয়েছিল—এত চট্‌পট্‌ যে কেউ তাদের দেখেনি। বায়স্কোপের চেয়েও সচল অথচ মোটেই সজীব নয় এমন ছবির মতো এই একটা মহাসভার জনতা যা এল এবং গেল, শুনছি, তাকে সত্যিকার বলে সহজেই বিশ্বাস হয়তো খবরের কাগজ পড়ে অনেকেই করছেন। কিন্তু দেশের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই অসবর্ণ বিয়ের আইন যাঁরা করতে চলেছেন, ধর্ম্মতলার এ কারসাজিটা তাঁদের চোখে ধুলো দিতে পারবেনা, আশা করা যায়।

এই আইন পাশ হবার পূর্ব্বে যে-দলের যা বল্‌বার, সেটা ব্যক্ত কর্‌বার স্বাধীনতা সবারই আছে। সেদিনের লোকেরা সেদিনের ও সেদিকের কথা বোলে প্রেতাত্মাদের নিশ্চিন্ত করে ছেড়েছেন; এখন এদিনের লোক ইহকালের ব্যবস্থাটা কোরে না-নিয়ে, অচল হয়ে বসে থাক্‌বে, কেবলই ভূতপূর্ব্বদের ভাবনা ভেবে, এটাই বা কেমন করে আশা করা যায়?—বিশেষত যখন বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছে।

একদিকে পাহারা দিচ্ছে টোলের সশিষ্য পণ্ডিত, আর-একদিকে ততোধিক পণ্ডিত মোড়ল-মহাশয়েরা, মধ্যে রয়েছে হিন্দুমাত্রেই। এইটেই কি ঠিক? না, এটাও ঠিক যে দুই-দুই জমাদারের সব ধম্‌কানি, সব চাপন সময়-সময়ে অগ্রাহ্য কোরে ঠেলে ফেলে সমাজে বন্দী অথচ স্বাধীন-চেতা তাঁরা মানুষকে চিতার আগুন এবং আজীবন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার উপায় নিজের শক্তিতে কোরে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। সমাজের জমাদারের সঙ্গে, যাদের নিয়ে সমাজ ও যাদের নিয়ে জাত, তাদের লড়াই ইতিপূর্ব্বে হয়ে গেছে এবং হবেও—জাতির কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য। বিদ্রোহের আগুন সমাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে জ্বলে তা নিবারণের উপায় মনুসংহিতার পুঁথি পুড়িয়ে ছাই-চাপা দেওয়া নয়,—যাতে জ্বালা নিবারণ হয়, তাই করা।

জ্বালার উপর জ্বালা দেবার জন্যে যখন দরোয়ান রয়েছে, এবং যন্ত্রণা সয়েও দারোয়ানদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বার লোকও রয়েছে যখন যথেষ্ট, তখন যে-আইন পুরস্কার, সেটাকে তিরস্কার বোলে কতক লোকে নেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! সরকারি আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার একদল অপছন্দ করছেন। অবশ্য নিজেদের ঘর নিজেরা গুছিয়ে নিতে পারলেই ভালো; কিন্তু যতদিন জমাদার ক'জন দরজায় থেকেও প্রভুত্ব খাটাচ্ছে, ততদিন ঘর এবং ঘরের লোকও যে তাদের খপ্পরে বন্দী এ-কথাটা যদি সত্যি না হতো, তবে অন্য-সব ব্যাপারে যাঁরা সদর্পে সদম্ভে

অগ্রসর ও নেতা হতে ব্যস্ত, তাঁরা এ-সময়ে আইনের স্বপক্ষ-দলকে মিষ্টি কথায় গোপনে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় কোরে নিজের-নিজের সাফাইয়ের পথ পরিষ্কার রাখতে ব্যস্ত হতেন না! এবং বুড়োদের খবরের কাগজে কেবল বিপক্ষ-দলের সভার খবরগুলো বার করবার ও স্বপক্ষদের খবর চেপে-যাবার চেষ্টা চল্‌তোনা। হিন্দু-সমাজের দরোয়ান ক'জন যদি শুধু পাহারওয়ালা হতো, তবে তাদের হাতে হিন্দু-সমাজ এ-পর্য্যন্ত যা সয়েছে ও সইছে তার শোধ নিশ্চয় নিতো—খুনোখুনি ব্যাপার কোরে। কিন্তু জমাদারগুলো বন্দীদের সঙ্গে নানা কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা এম্‌নি পাতিয়ে বসেছে, যে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বন্দীদের দিন চলা দায়! ধোবা-নাপিত বন্ধ হতে পারে, জাতঃপাত থেকে আরম্ভ কোরে নির্য্যাতন কতটা যে এগোতে না-পারে তার ঠিক কি! কাজেই হিন্দুসমাজ নিজের ভিতর থেকে যে আপনার ক্ষত আপনি শুধ্‌রে নেবে, তার আশা খুবই কম। ডাক্তার-সাহেবের দরকার আছেই-আছে। ভিতরটা যখন এমন অপটু যে ভিতরের রোগ নিজে দূর কোরে দেবার সাধ্য নেই, তখন বাইরের বোলে ডাক্তারের চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে শুধু তো গঙ্গোদকে নির্ভর কোরে নেতারাও একদিন থাকেন না! তবে এক্ষেত্রে কেন যে তাঁরা আমাদের আর-এক মনুর জন্মানো পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছেন তা বোঝা যায় না! বড়-কবিরাজের অনিশ্চিত আগমনের আশা ও ধৈর্য্য যতখানি তাঁদের আছে, বেচারা রোগীর জীবন ততখানি অপেক্ষা করতে চাইবে কিনা বলা যায় না। আমার ভয় হয় তাঁরা যখন কবিরাজ এনে হাজির করবেন, তখন দেখা যাবে এদেশে সমাজটি ঠিক শিবেরও অসাধ্য অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে!

অসবর্ণ বিয়ের আইন পাশ হলেই যে দেশশুদ্ধ কোমর-বেঁধে সেই কাজে লেগে যাবে, সে-আশা খুবই কম: সতীদাহ-আইনের পশ্চাতে বৃটিশ-রাজশক্তি ও ইচ্ছা ছিল। কাজেই সে শুভ কাজটা চট্‌ করে নির্ব্বাহ হয়ে গেল। কিন্তু বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ—এম্‌নি সব আইনগুলির সঙ্গে মুখ্য-ভাবে আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার যোগ! সতীদাহ ধর্‌তে গেলে সাহেবরা বন্ধ করেছেন—সতীকে আগুনের মুখ থেকে জোর করে টেনে এনে এবং ধর্ম্মের নামে নরহত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি দিয়ে। বিয়ের আইনের বেলায় তো তা হবার যো নেই! কাজেই বালিকা-বিধবার দুঃখ ঘুচ্‌তে, চারবর্ণের আত্মীয়তা বাড়তে নিশ্চয় আরো-গোটা-কয়েক যুগ কেটে যাবে, ভাবনা নেই। তবে এ-আইন হ'লে আপাতত এইটুকু লাভ হবে—কড়া পাহারা শিথিল হবে, জেলখানার নিরেট দেয়ালে আর-একটা ফাঁক বাড়বে, দুই জমাদারের অযথা ধমক মান্‌তে না চাইলে যাদের এদেশে টিঁকে থাকা, এমন কি পৃথিবীতে টিঁকে থাকা দায় ছিল, তারা রক্ষা পাবে; এরা জাত-হাড়কাঠের কাছে মানুষকে পশুর মতো যখন-খুসি যেমন-খুসি ধোরে-ধোরে গলা-কাটতে পারবেনা; আর ছেলের বাজারও কিছু সস্তা হবে।

হিন্দুসমাজের দরজার বাইরে দরওয়ানদের

যতই দাপট থাক্, এটা নিশ্চয় যে মনুর আমলের খাঁচা-কলের অনেকগুলো কাঠি ও খিল ভেঙে, খাঁচার মধ্যেকার পূর্ণতা ক্রমেই কমে চলেছে। এবং বেরিয়ে যারা যাচ্ছে, বাইরে থেকে ফিরে এসে সেই খাঁচা-কলের পূর্ণতা পুনরায় ভর্ত্তি করবার জন্যে তারা মোটেই ব্যস্ত হচ্ছে না। এতে যদি কারু মনোকষ্ট হয় তো সে মনুর; এবং অন্ন-যাবার ভয় যদি কারু হয় তো সে আমাদের দরোয়ানগুলোর।

একালে মনু যদি বর্ত্তমান থাকৃতে পার্ত্তেন, তবে হয়তো তাঁর কলটা তিনি মেরামৎ কোরে, শুধরে এখনকার উপযোগী কোরে নিতে পার্ত্তেন। কিন্তু মনু নেই—যিনি বানালেন খাঁচা ও খুটিনাটি; রয়েছে কেবল ভাঙা খাঁচায়-ধরা মানুষগুলি; এবং দরজায় মনুর আমলের থেকে বহাল-করা দরোয়ানীর উপযুক্ত জন-দুই;—যাদের কলকব্জা-জ্ঞান কয়েদী যারা, তাদের চেয়েও কম। তারা বংশানুক্রমে এ-পর্য্যন্ত ধম্‌কেই এসেছে এবং সেইটেতেই তারা মজবুদ্। এ-ক্ষেত্রে মন্বন্তর পর্য্যন্ত খাঁচা-কলের কোনো ব্যবস্থা হওয়া কঠিন; এবং কয়েদীর সব-ক'টিকেও সেখানে ধোরে রাখা শক্ত—যদিনা কয়েদী স্বইচ্ছায় স্বস্থানে থাকে এমন-একটা ব্যবস্থা করা না হয়। হ'লে তারা ফাঁক পেলেই পালাবে এবং খাঁচার শিক আরো ফাঁক হয়—এই প্রার্থনাই বৃটিশ-গভর্মেণ্টকে জানাবে।

'কিংকর্ত্তব্যং'? এই-জাতীয় একটা সমস্যার মীমাংসা একবার সত্যিকার পাখীদের নিয়ে আমাকে করতে হয়েছিল। একসময়ে খাঁচার দরজায় ডবল-তালা লাগিয়ে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পাখীকে আমি লালন-পালন করছিলেম। খাঁচাটা ছিল বহু-কালের; কাজেই পাখী সেখানে তালা-সত্ত্বেও আস্তে-আস্তে কম্‌তে লাগল। আজ এ-ফাঁক বন্ধ করি, কাল ও-ফাঁক দিয়ে পাখী পালায়; অথবা নিজেরাই নতুন-নতুন ফাঁক আবিস্কার করে। যারা পালায় তারা দেশ ছেড়ে নয়তো পাখী-লীলা সাঙ্গ করেই পালায়। সব যায় দেখে 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'-বুদ্ধিই আমি করলেম। খাঁচাটাকে আর খাঁচা রাখলেম না। ডবল-তালা সরিয়ে সেটাকে আশ্রয় এবং আহারের স্থান, আর, সমস্ত-বাগানটাকে পাখীদের বিহারের স্থান করে দিয়ে আমি সরে দাঁড়ালেম। দেখলেম তখন পাখীরা ইচ্ছা-সুখে খাঁচার মধ্যে আনাগোনা কর্‌তে লাগলো এবং আমার বাগান ছেড়ে আর কোথাও নড়া আর প্রয়োজন বলেই বোধ কর্‌লে না। শুধু যে এতে পোষা-পাখীরাই কাছে রইল তা নয়, বাইরেরও পাখী নিকটে পেতে আমাকে কোনো মায়া-জালই বিস্তার করতে হ'ল না। হিন্দুসমাজের খাঁচা-ও-কলে-পড়াদের জন্য উপরের মতো কিছু-একটা ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ তা ন্যায়-বাগীশেরা বুঝুন; আমি যখন ব্যাধ নয়, তখন ফাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে ফাঁদেরও দুরবস্থা, নিজেরও বিপদ ঘটা সম্ভব। কিন্তু এটা ঠিক যে হিন্দুসমাজের চাবি কতকটা খুলে গেলে সমাজ পরিত্যাগ কোরে যারা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা অন্য সমাজে গিয়ে মিল্‌ছে, তাদের আর সেটা করবার কারণ থাকবে না। কিন্তু ঐ দুই দরোয়ান—দরজার

সঙ্গে যাদের দরোয়ানীও যায়, তারা বল্‌বে—ডবলের উপরেও ডবল তালা নইলে চল্‌ছে না, হুজুর!

চারবর্ণ এ-ওর সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেলে হিন্দুসমাজের চেহারা কতকটা যে বদ্‌লে যাবে, তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-বদলটা যে খুব ভীষণ-আকারের একটা-কিছু হবে, তাতো মনে হয় না। চারবর্ণ কেন, রাম-ধনুকের সব-ক'টা বর্ণ নিয়েই আমি বাল্যকাল থেকে এ-পর্য্যন্ত কারবার করে আস্‌ছি। এটা দেখেছি বর্ণকে স্বস্ব-স্থানে অমিশ্র-অবস্থায় রেখে চালচিত্র পর্য্যন্ত করা চলে, তার উপরে আর ওঠা যায় না। জীবন্ত ছবির বেলায় এক বর্ণকে আর-এক বর্ণে না মেলালে উপায় নেই।

এই আইন যদি-বা পাশ হয়, তবে এদেশের জল-হাওয়ার গুণে তার ফল ফল্‌তে এত বিলম্ব হবে যে ততদিন খুব-বুড়োর দল নিশ্চয়ই লোপ পাবে; সুতরাং তাঁরা নির্ভয়ে থাকুন। ভয় কেবল তাদেরই, যারা কচি-বয়েস থেকেই প্রেতলোকের ভাবনা খুব বেশি-কোরে ভেবে মাথা ধরাচ্ছে।

আর আমরা—যারা এই অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন করতে এসেছি, আমাদেরও যে কোনো ভয় নেই, তা কেমন কোরে বলি, যখন অপর-পক্ষের হাতে কাগজের খাঁড়ায় এখনি শান্ পড়ছে জান্‌ছি; এবং জান্‌ছি ভালোবাসা, আত্মীয়তা, বন্ধুতা এম্‌নি সব সোনার কৌটোর ভিতর কৌটোর মধ্যে যেখানে আমাদের প্রাণটুকু লুকিয়ে রেখেছি, সেখানেও ঘুণ-ধরাবার পরামর্শ গোপনে চলেছে—এরি মধ্যে।

এই ঘুণ এবং কাগজের খাঁড়া—দুটোই আমাদের সোনার ঘরের আশেপাশে অনেকবার দাঁত বসিয়ে বুড়োদেরই মতো এমন ভয়ঙ্কর ফোগ্‌লা হয়ে পড়েছে যে অনায়াসে সে-দুটোকে আমরা উপেক্ষা কোরে কাজ করে যেতে পারি—নতুন কোরে অস্ত্র-আইনের দরখাস্ত না লিখে। প্রাচীনের দলকে এটা আমাদের স্পষ্ট করে বোলতে হবে যে চীনের প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা থেকে আমরা মরতে রাজি নই এবং তোমাদের জাতরূপী-জাঁতাকলের মুঠো হয়ে নিজের জাতকে নিজেরা পিশে মারতেও রাজি নই।

খুব নরম কোরে বল্লেও, অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন কোরে যতগুলো সভা, সবগুলোকেই বিপক্ষ-দলের কাগজগুলো বল্‌বে নাস্তিকের সভা;—যদি-না এই-সব স্বপক্ষ-সভার বিবরণ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশের সৎসাহস দেখাতে সাধারণ খবরের পেয়াদা যে সম্পাদকরা এ-পর্য্যন্ত যা কোরে আসছে, তা না করে—অর্থাৎ তাদের কাগজটা দেশের সবদিকের সব-রকমের খবরের জন্যে নয়, কিন্তু নিজেদের ঘরে পয়সা মুড়ে আন্‌বার থলি প্রস্তুতের জন্য, এইটেই মনে না করে। আর খুব গরম কোরে যদি আমাদের কোনো খবরের কাগজে এই আইনের বিপক্ষ-দলের গালাগালির প্রতিবাদ করা চলে, তবে ভদ্রলোক এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে—"ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং। ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন। সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং, ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ।" ওগো আমরা নাস্তিকও নয়, অহিন্দুও নয়, এবং তোমাদেরই মতো আমরাও পরলোকের

বিষয় চিন্তা কোরে থাকি ; কিন্তু সময় এসেছে যখন নাস্তিক হতে হবে—"স চাপি কালোঽয়-মুপাগতঃ শনৈর্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।" —এমন সময় এসেছে তোমরা যাতে ভালো-মানুষটি বল্‌বে এমন-সব তোমাদের মন-যোগানো কাজ কোরে জাতাসুরের জাঁতার চাপনে দেশসুদ্ধকে মর্‌তে দিলে গোলোকে স্থান দেবে বল্লেও সে কাজে রাজি নই। কেননা, ইহলোকের জীবন-যাত্রা তাহ'লে আমাদের পক্ষে দুস্কর হয়ে উঠবে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কাজেই যা বল্‌বার, তা বলতে হবে। হিন্দুস্থানের হিন্দু একজাত নয়, কাজেই একও নয় ; কিন্তু এক হতে পারে। কেননা ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জর্ম্মানিতে সেটা হয়েছে। ভারতবর্ষেই বা সেটা হওয়া আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ঐ জাতের জাঁতা নিয়ত ঘুরে-ঘুরে এককে শতখণ্ডে যতদিন চূর্ণবিচূর্ণ কর্‌তে থাকবে, ততদিন সেটা কিছুতে হবে না।

সময়ের সঙ্গে যদি আমরা চলতে চাই, তবে আমাদের সমাজের পুরাতন ডিঙিখানাকে বেশ-কোরে নতুন ও মজবুৎ কোরে স্রোতে ভাসাতে হবে। মিউজিয়ামের উপযুক্ত বোলে সেটাকে ডাঙায় তুলে আগ্‌লে বসে থাক্‌লে তো চল্‌বে না ! ডিঙিও চল্‌বে না, আমরাও চল্‌বো না—যদি জল ছোঁয়া কিনা এই তর্ক নিয়েই কাল কাটাতে থাকি। যে-সব ধর্ম্মের কর্ম্মের ও চিন্তার স্রোত আমাদের কাছ দিয়ে বহে যাচ্ছে, তা থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ যাঁরা কচ্ছেন, তাঁরাও কি জানেন না যে বাণ যেদিন এসে উপস্থিত হবে—যে-অবস্থায় আছি সে-অবস্থায় থাকা আর সেদিন সম্ভব হবে না, —ভেসে যেতেই হবে এবং সে-সময় অকর্ম্মা মাঝি এবং অচল ডিঙি—দুটোই বৃথা চেষ্টা কর্‌বে যাত্রীদের বাণের মুখে ভাসিয়ে রাখ্‌বার জন্যে ! আমরা ডুব্‌বোই ! ভব-সাগরের পারে যাবার আশায় যে-ডিঙিখানা ডাঙার উপরে নিয়ে বসেছিলুম, সেটা যখন সত্যিকার সাগরের তোড়ে চূর্ম্মার্ হয়ে যাবে, তখন তার ঘুণ-ধরা ফোপ্‌রা কাঠগুলো আমাদের দুই-মুঠোর চাপনে গুঁড়ো হয়ে গঙ্গামৃত্তিকার চেয়েও তরল পদার্থে পরিণত হ'বে এবং তারি বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমরা চট্-কোরে রসাতলের দিকে চলে যাবো। যদি যেমন চল্‌ছে এম্‌নিভাবে হিন্দু-সমাজরূপ ডিঙি-খানিতে একটুও অদল-বদল, একটুও সংস্কার না কোরে, জল-ছোঁয়া প্রভৃতি দরকারি কাজ থেকে একেবারে আগ্‌লে রেখে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি—ইহকাল-পরকাল, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দুটো তাল-পাকিয়ে, আজগুবি লাড়ু হাতে লাড়ু গোপালটির মতো ভালোমানুষ, তবে ভরা-ডুবি রক্ষা হবে না। পূর্ব্বতন ঋষিদের কালে হিন্দুসমাজের মধ্যে নানা সংস্কার নানা দিক দিয়ে আস্‌তে দেওয়া হতো বোলেই, সমাজ তখন এপার ওপার দুপারেই যাত্রীদের বহন করে চলেছিল। এখন যাঁরা সমাজের খবরদারি কর্‌তে ব্যস্ত, তাঁরা সমাজকে প্রধানত ইহকালের সুবিধা-অসুবিধার জন্য না প্রস্তুত রেখে, পরকালে সাক্ষী দেবার জন্যে পোঁট্‌লা বেঁধে রাখ্‌তে চান। এটা তাঁরা ভুলে যান যে সমাজ হচ্ছে জীবন্ত মানুষদের নিয়ে এবং ইহজীবনের কাজে লাগ্‌বার জন্যই তার বিশেষ প্রয়োজন। প্রেতলোকে গিয়ে পিণ্ড দেবার জন্য সমাজের সৃষ্টি

হয়নি ; ইহলোকের কাণ্ডকারখানার জন্যই রয়েছে সমাজ ; কাজেই ইহলোকের কাজে লাগাতে হলে সময়-মতো সংস্কারাদি কোরে সমাজের কল্-বল্ ঠিক রাখতে হবে না হলে আর বেশীক্ষণ সে আমাদের কাজে আস্‌বে না। সংস্কারের দ্বারা হিন্দুসমাজের কতটা বিপদ, সে-ভাবনার চেয়ে সংস্কারের অভাবে তার কি দুর্দ্দশা হবে সেইটেই বেশী কোরে ভাববার বিষয়। কিন্তু ভাবতে বল্লেই যাঁরা চটে উঠে মনুসংহিতা আউড়ে যান, তাঁদের সঙ্গে চেঁচিয়ে তো আমরা পার্‌বো না ! লেখালেখি করেও যে পেরে উঠি তা নয়। কেননা খবরের কাগজের প্রায় সব বাঙালী তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে বসেছে। এ অবস্থায় গভর্মেণ্টের কাছে আইনের সাহায্য না চেয়ে, মনুমেণ্টের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করা বৃথা। ভিতর থেকে সমাজসংস্কার যখন একপ্রকার অসম্ভব, তখন বাইরে থেকেও যদি সেটা না আসে, তবে বল্‌তেই হবে ভিতরে-বাইরে আমরা একে-বারেই মলেম ! একমাত্র তখন বুড়োর দলের শীঘ্র বিলুপ্তির কামনা বিধাতার কাছে করা ছাড়া আর যে আমরা কি কর্‌বো ভেবে পাইনা। কিন্তু হায় বিধাতা যে অভিসম্পাত দিয়ে বসেছেন যে বুড়োর দল এদেশে অনেক যুগ বাঁচ্‌বে !

কিন্তু অকস্মাৎ বোলে একজন তো আছে, —যে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল ! যার বস্‌বার কথা শ্রোতার জায়গায়, তাকে বসিয়ে দিলে সভাপতির সিংহাসনে ! যখন এমন অঘটন চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে, তখন হঠাৎ এই অবসর বিয়ের বিলের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের সংস্কারও ঘটে যেতে পারে এবং যাকে শাপ বলে ঠাউরে ছিলেম সে বর হয়েও দেখা দিতে পারে। বিয়ের আইন নিয়ে যখন লড়াই, তখন যে-পক্ষে যুবার মেলা, সেই-পক্ষেই জয়ের মালা নিশ্চয়ই এসে পড়েছে, এই বিশ্বাসেই বয়সের ধর্ম্ম না মেনেই আমি এ-দলে ভিড়েছি এবং এর জন্যে বুড়োরা হয় তো আমাকে কিছু একটা উপাধি দিয়েছেন এবং হয় তো আমার ছবি খুব জাঁকালো-রকমে কাগজে ছাপিয়ে ঘরে-ঘরে বিলি করছেন। কিম্বা দেখলেম হয়তো এর একটাও হল না ; অকস্মাৎ সব উল্টেপাল্টে গিয়ে বুড়োরই গলায় পড়লো বরণ-মালা, আর আমি যে ফাঁকে সেই ফাঁকাতেই অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে হাঁপ্ ছাড়লেম ! এই ভাবে অকস্মাৎও যদি হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার ঘটে যায়—যেমন একবার আমার এক দূর-সম্পর্কে বড়দাদার ঘটেছিল, তা হলেও ভালো। দাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন খুব ছোটোখাটো মানুষটি। তিনি নিজের মাপে আফিস্-গাড়িখানি বানিয়েছিলেন। সেখানি খুব বুড়ো হয়ে মর্‌বার সময় নাতিকে বখ্‌শিস্ দিয়ে গেলেন। এদিকে দাদার শরীর হল তাঁর ঠাকুরদাদার চেয়ে আড়াই-গুণ লম্বা-চওড়া, কাজেই পিতামহের গাড়িখানি চড়ে-বেড়াতে তাঁর কষ্ট বাড়্‌ছিল বই কম্‌ছিল না।

আমি একদিন বল্লেম দাদা, গাড়িখানি একটু কেটে-কুটে এদিক-ওদিক করে বাড়িয়ে নিন্, আরাম পাবেন। পিতামহের গাড়ি, তার উপর করাৎ চালাতে দাদার মায়া হ'ল।

কেবল আমার অনেক অনুরোধে গাড়ির চারখানা চাকা মোটা লোহা আর কাঠ্-কাট্‌রা দিয়ে মজবুৎ করে নিলেন। তারপর একদিন যিনি অকস্মাৎ তিনি এক ফুঁয়ে দাদার সেকেলে গাড়ির কচ্ছবের পিঠের মতো ছাদ-খানা রাস্তার মধ্যে থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। দাদা দেখলেম, সেই ছাদ-খোলা গাড়িতে গলির মোড়ে উপস্থিত—ছাতা-মুড়ি দিয়ে। আমি কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা কোরে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে শুধোলেম—দাদা, এ কি কাণ্ড! দাদা খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন—ছিল পাল্কি, হল ফেটিন্! একটু হাওয়া-খাবার আর হাত-পা ছড়িয়ে বস্‌বার সুবিধে হল! ভাগ্যি তুমি বলেছিলে চাকা-চারখানা মজবুৎ রাখতে; না হলে, আজ কি বিপদই হতো।

দাদার ফিটেনের মতো এই অবসর্ণ বিয়ের আইনটা সবখানি অকস্মাতের জিম্মায় রেখে কিন্তু বাড়ি যেতে আমার সাহস হয় না। কি জানি অকস্মাৎ হয় তো বুড়োদের ভাবগতিক দেখে আমাদের রাজপুরুষেরা ভাবতে পারেন এ-আইনের সমর্থন এ-দেশের জনপ্রাণীও করেনি! তাই আমরা-সবাই—যারা এখনো বুড়োদের মতো ভয়ঙ্কর বুড়ো হইনি এবং হতেও চাইনে, তারা এই সংস্কারের সমর্থন করে সোজা হাত ওঠাবো নির্ভয়ে; কেন না জানি যে জাতির কল্যাণের জন্য যা, তাকে সমর্থন করে হাত ওঠালে যদি যা চাই তা এখনি নাও পাই, তবু কারু কাছে লজ্জা পেতে হবে না। আর যে-হাত সবার উপরে রয়েছে সে-হাতের ইঙ্গিত মেনে যদি সংসারের সব কাজে সায় দিয়ে যেতে পারি, তবে আমাদের নিরাশও হতে হবে না—হারও মান্‌তে হবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাতিল-প্রমাদ

বা

প্রসহ্য-প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে,
বর্ণ-গর্ব্ব রাখিব—পণ;—
এই চিঁড়ে-ফলারিয়া চিড়িতন আর
ইক্ষু-দাঁতন ইস্কাবন!
পাতিলের বিল নাকচ বাতিল
করিব আমরা পষ্ট কই,
হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,
মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই!

দ্যাখ তাসের মতন মোরা চারি জাতি,
আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
তাসের কেল্লা সাকিম, রয়েছি
ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস!
অঘরে অজাতে বিয়ে হবে নাকি?
ছিছি শুনে লাজে মরিয়া যাই!
তাতে যে বর্ণ-সঙ্কর হয়
গীতাকার ব্যাস বলেছে ভাই!

বলেছে মৎস্যগন্ধার ছেলে
অজাতে অঘরে বিবাহ নয়,
সত্যবতী ও জাহ্নবতীরে
ধামা-চাপা দিয়ে গাও রে জয়!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হো হো পাতিলের বিল করিতে বাতিল
উদয় হয়েছি আমরা হে,
এই তামাটে ও মেটে ভুস্‌টে পাঁশুটে
কুচ্‌কুচে কালো জাম্‌রা হে!
ছি ছি ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয়?
বধির হও রে কর্ণ—উঃ!
আরে বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো,
নিকে হয় অসবর্ণ—হুঁঃ!
দ্যাখ উচ্চবর্ণ আমরা বেজায়,
আমরা দেশের ভর্‌সা তাই,
শুধু কলিকাল বোলে রংটা বেতর,
একটু কলি দিলে হব ফর্সা ভাই।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ জম্বুদ্বীপে বাস কোরে হ'ল
জামের মতন জেল্লাটা হে!
মোদের Arctic Homeএ ফিরে যদি যাই,
মেরে দিই তবে কেল্লাটা হে!
শুধু জাম খেয়ে রঙে জাম্‌ড়ো পড়েছে,
নইলে আর্য্য আমরা খাঁটি ও সাচ্চা,

তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্বর্ণ্য
কিবা কালো, ধলো, বুলু, ব্রাউন্ বাচ্ছা!
তবে রঙের বড়াই কর একজাই,
কৃষ্ণচর্ম্ম শর্ম্মা জাগো!
খেঁটে খুন্তি-কলমে লেখ বক্তৃতা
সাড়ে-সাতান্ন ফর্ম্মা দাগো!
দ্যাখ রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম
রঙের টঙের সঙের পাঁতি
রঙে আছি, তাই টঙে বোসে আছি,
কেউবা কাগ্‌জী, কেউবা পাতি।
কেউবা মাচায়, কেউবা তলায়,
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে
ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ সতীদাহ রদ, বিধবা-বিপদ
বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া,
বাস্ রহিত-গোত্র রুইতন বলে
রঙের এ টঙে দিয়ো না নাড়া।
দ্যাখ ভেস্তে দিয়ো না রঙের খেলাটা,
ফেলোনাকো দেখে হাতের তাস,
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেক্কা?—
আরে! কোথা গেল? সর্ব্বনাশ!)
আহা গুলিয়ে দিয়ো না, রোসো বাপু, রোসো,
এই যে—চিঁড়ের তিরির গায়—
দ্যাখ লেখা আছে হরতনের টেক্কা,
আর ভয় মোরা করি কাহায়?

তবে ভেঁজে নাও তাস, বাস ভায়া বাস্,
লম্বা টিকিতে লাগাও মাঞ্জা,
মোদের সেট্-ভাঙা তাস, কোরোনাকো ফাঁস,
কসে খেলো,—হবে ছক্কা পাঞ্জা !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

ছাখ অ-আ-ই-উ বলি হাই যদি খালি
তোলা যায় স্বরবর্ণেতে,
টিক্‌টিকি তবে কি করিতে পারে ?—
তোলে না তা কেউ কর্ণেতে।
কিন্তু স্বরে ব্যঞ্জনে ঝঞ্ঝাট যাই
বাক্যের হয় সৃষ্টি গো,
অম্‌নি অর্থেরও খোঁজ পোড়ে যায়, পড়ে
আইনেরও খর-দৃষ্টি গো !
তাহে ফ্যাসাদের পর ফ্যাচাং আসিয়া
করয়ে সমাচ্ছন্ন হে,
এর হেতুটা কি জানো ?—স্বরে-ব্যঞ্জনে
বিবাহটা অসবর্ণ যে !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

ছাখ বর্ণধর্ম্মে করি অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি—
হেঁহেঁ ফ্যাল্‌ফ্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু ?
বোসো ঐখানে শুনিবে যদি।
ঐ ঘুঁটিঙের চুন চেয়ে সাতগুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে।
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা !
হল পার্ব্বতীসুত লম্বোদরের
চুনে-হলুদিয়া বর্ণ ডাহা !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

ছাখ ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে
শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,
নাই পেয়ে-পেয়ে অলপ্পেয়েরা
মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায় !
আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়,
ধর্ম্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ !
এখন ছোট-মুখে শুনি বড় বড়-কথা,
তর্কে না ছায় টিকিতে, ওঃ !
আরে শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস্ ?
ভারি দেখি আস্পর্দ্ধা যে !
জোড়া-ঠ্যাং-ওলা শাস্ত্র আমরা
আমাদিগে নাই শ্রদ্ধা রে !
তর্ক তোদের শুনে হাসি পায়,
হায় রে গণ্ডমূর্খ হায় !
শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয় মূঢ়,
পূর্ণ সে গূঢ় সূক্ষ্মতায় !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
নাস্তিক সব তার্কিক hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

হেঁহেঁ তপন-তনয়া তপতীর কেন
নরকুলে বিয়ে হইল রে,
আর ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম্ বিবাহে
ঘট্‌কালি কেন কৈল রে।
মানুষের ছেলে দেবতার মেয়ে—
এ ত অনুলোম বিবাহ নয়,
এই ত প্রশ্ন ?—শ্রদ্ধাযুক্ত
চিত্তে শুনহ কিসে কি হয়।—
ছাখ সূর্য্যসুতারে বিবাহ করিলে
যম শনি হয় বড়-কুটুম,
তাই তপতীর সাথে বে'র কথা হ'লে
দেবতাকুলের ঘুচিত ঘুম।
কারণ শনি কি যমকে শ্যালক বলিলে
হন যদি ওঁরা ক্রুদ্ধ হে,
তবে হয়ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে
কিম্বা উড়িবে মুণ্ড-সুদ্ধ রে !
আবার জায়া যদি কভু বায়না ধরেন
ভায়ের বাড়ীতে যাইতে গো,
তবে যম-ঘরে তাঁরে হয় পাঠাইতে,
আশা ছেড়ে দাও তার চাইতে ও।
কিন্তু সূর্য্যের মেয়ে থুবড়ো থাকিবে
সে যে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,
তাই ঘট্‌কালি করি বিলোম বিবাহ
দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয়।
ছাখ সকল অবিধি বিধি হয় তেজী
তেজপাতাদের পক্ষেতে,
আর যমকে তো লোকে বলেই শ্যালক—
তাই বাধিলনা সম্পর্কেতে।
(কোরাস্) ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল—বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

হুঁহুঁ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও !
ফের লোকগুলা আসে যে ঝুঁকে,
বলে হরের ঘরণী গঙ্গা কেমনে
করিল বরণ শান্তনুকে ?
বলি অত খবরে কি দরকার শুনি
তামাসা পেয়েছ ? ভারি যে ইয়ে ?
গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,
যা না সেথা দড়িকলসী নিয়ে !
হেসে কুটিকুটি, ভারি যে আমোদ,
ফষ্টিনষ্টি সবারি কাছে ;
বলি যাওনা ঢেউয়ের বহর দেখগে,
হুঁহুঁ হাঁ-করা মকর মুখিয়ে আছে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

ওকি ফের গুজ্‌গাজ্ কাণ্ড কি আজ,
ফের হাউচাউ, চাও কি বাপু ?
হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবারে,
বচনে কখনো হব না কাবু।
কি ? শৈব বিবাহ ? গোস্বামী-মত ?—
বাধ্য নহিক শুনিতে অত ;
গোস্বামী-মত হবে সে পরাহে,
শ্রদ্ধাহীনের তর্ক যত !
ছাখ শুনে যাও শুধু, তর্ক কোরো না,
কথার উপরে কয়ো না কথা,
নিজের গলাটা জাহির করিতে
বাহির কোরো না ছুতো ও নতা।
আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে,—
এই সনাতন দেশের রীতি,

মোদের দিয়ে-থুয়ে তোরা ভক্তি করিবি,
নিয়ে-থুয়ে মোরা জানাব প্রীতি।
তর্ক কোরো না, তর্কের শেষ
হয় না কখনো জাননা তা কি ?
হেঁহেঁ গণেশের কলা-বৌকে দেখিয়ে
শেষে উদ্ভিদ-বিয়ে চালাবি নাকি ?
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

ছাথ মোরা সনাতন রঙের গোলাম,
বর্ণের দাস আমরা সবে,
ভিন্ন রঙের টেক্কা যে মারি
সে কথা স্বীকার করিতে হবে।
ওই পরের নহলা কেবলি ন ফোঁটা,
আমার নহলা চৌদ্দ সে,
একথা যেজন জানে না সে মূঢ়,
মানে না যে—চোর বৌদ্ধ সে।
আমরা ফ্যাশানের ঝোঁকে হব না নেশান,
যা আছি তা মোরা রব নাগাড়,
দলাদলি কোরে, কিলোকিলি কোরে
ভাগে ভাগে সোড়ে যাব ভাগাড় !
শত্রুরা বলে চোটে গেছে রং,
যা আছে সে শুধু রঙের ঢং,
যাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,
রঙের ঢঙের আমরা সং !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং।

ছাথ ছুঁৎ-মার্গের আমরা পাণ্ডা,
বর্ণ-গর্ব্বে বনেদ গাঁথা,
মোদের বর্ণ যদিচ বর্ণনাতীত,
কিছু তামা কিছু তামাক-পাতা !
তবু বর্ণে আমরা শ্রেষ্ঠ শুনেছি,
শ্রুতি সে, যে হেতু শোনা সে যায়,
অহো শ্রুতি অমান্য করিবি কি তোরা
ইহ পরকাল খোয়াবি হায় !
জাগো জাগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,
জাগহ, কিন্তু মেলো না চোখ,
বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা
জানা ভালো নয় যতই হোক।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ বাধায়ে
বল্‌তো মানিবি কারে সালিস ?
তবে জেগে চোখ বুজে চেঁচারে,—যদি এ—
নিরেট গুরুর সল্লা নিস্।
সোনামুগ কালো কলায়ে তিসিতে
ভুসিতে মিশিয়া রয়েছি বেশ,
বর্ণগর্ব্ব রয়েছে বজায়
চোখ খুলে কেন বাড়ানো ক্লেশ ?
বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,
Inter-caste ? কখনো নয়।
সনাতন চিড়িতন হরতন
ইস্কাবনের গাহরে জয় !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

টুক্‌নি

(গল্প)

দার্জিলিঙে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি খোকা এই-এতটুকু একটা ছোট্ট ভুটিয়া ছেলের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে আছে। ভুটিয়া ছেলেটা কখনো হামাগুড়ি দিয়ে খোকাকে পিঠে-চাপিয়ে 'ডংকি' হয়ে ছুটছে, কখনো গলায় একটা ফিঁতে-বেঁধে কুকুর সেজে খোকার সঙ্গে-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করতে-করতে ঘুরছে, কখনো-বা একখানা বেতের মোড়াতে তাকে বসিয়ে 'রিক্‌স' ঠেলছে ;—এম্‌নি নানারকম খেলা। আমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"এ কে রে ?"

খোকা বল্লে—"ও টুক্‌নি।"

আমি বল্লুম—"কোথায় পেলি ?"

খোকা বল্লে—"রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

মোটামুটি ইতিহাসটা এই যে খোকা বিকেলে চৌরাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিল ; সেইখানে টুক্‌নির সঙ্গে তার দেখা ; যেমন দেখা অম্‌নি ভাব ; এবং যেমন ভাব, অম্‌নি সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হয়ে বাড়ি আসা।

খোকাকে যখন প্রশ্ন করছিলুম, টুক্‌নি তার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। বাহিরের দেহটা তার চুপ করে থাকলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার ভিতরটা ভারি ছট্‌ফট্ করছে। খোকার সঙ্গে তার খেলা অকালে ভেঙে যাওয়াতে সে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং সেই-খেলা পুনরায় জোড়্‌বার জন্যে তার আর তর্-সইছিল না। আমি তার এই অধীরতা চেয়ে-চেয়ে লক্ষ্য কর্‌ছিলুম।

টুক্‌নি খুবই ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তার চেহারার মধ্যে ভারি-একটা মজা ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা একাণ্ড কাঁচা মাটির পুতুলকে থেব্‌ড়ে-থুব্‌ড়ে ছোট্ট করে ফেলা হয়েছে। মোটা-মোটা—যেন পাহাড়ের গা থেকে কুঁদে বার-করা হাত-পা ; খুব চ্যাটালো বুক ; এবং মস্ত-একখানা মুখের উপর ছোট্ট-একটু নাক ও আধ-বোজা চোখের টানের একটু ইসারামাত্র। দেহটি স্বাস্থ্যে ভরা ; কিন্তু সেই-দেহের নানা অঙ্গ যেন নানা-বয়সের মানুষের দেহ থেকে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দেহের কোনোখান্‌টা তার বয়েসকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে, কোনোখান্‌টা পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এত অসামঞ্জস্য থাক্‌লেও মোটের উপর তার চেহারা যে খুব বিশ্রী, কি খুব অদ্ভুত বলে চোখে ঠেকে তা নয়। ছেলে-বয়সের একটা অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি বিদ্যুতের আভার মতো তার দেহের উপর এমন-একটা চিকণ ছড়িয়ে দিয়েছে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য একেবারে ঢেকে গেছে। এই স্ফূর্ত্তি যদি তার না থাক্‌ত, তাহ'লে তার চেহারা ভয়ানক ভীষণ হয়ে উঠত এবং খোকা আকৃষ্ট না হয়ে তার দিক থেকে ভয়ে পালিয়ে আস্‌ত।

খোকাকে আমি ছেড়ে দিলুম। টুক্‌নি

যেন হাঁপ্-ছেড়ে বাঁচল! লাফাতে-লাফাতে ছুটে গিয়ে খোকার সঙ্গে আবার খেলা জুড়ে দিলে। আমি আমার কাজ কর্ম্মে মন দিলুম।

রাত্রিবেলা শোবার সময় ঘরে গিয়ে দেখি খোকার খাটিয়ার নীচে টুকনি জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। আমি ব্যস্ত হয়ে তাকে ঠেলে তুলে বল্লুম—"এই টুকনি! তুই বাড়ি যাস্‌নি যে?"

টুকনি আমার দিকে চোখ-পাকিয়ে বল্লে—"হম্ নেই যায়েগা!"

—"নেই যায়েগা কি রে?"

—"হাঁ, হম্ নেই যায়েগা!"

টুকনি এমন সুরে "নেই যায়েগা", বল্লে, যেন আমার বাড়িতে তার থাকা, না-থাকার উপর কথা-বল্‌বার কর্ত্তা যদি কেউ থাকে তো সে নিজেই! আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম—"এই ছাখো, খোকা এক ফ্যাসাদ্ বাধিয়ে বস্‌ল! কার ছেলেকে এনে ঘরে পুর্‌লে, এখন বার করা দায়!"

স্ত্রী বল্লেন—"আঃ, থাকুক না বাপু আজ্‌কের রাতটা! কাল খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করলেই চল্‌বে।"

আমি মহা ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"তুমি বুঝচ না! এই এতটুকু ছেলে—ওর বাপ-মায়ের প্রাণে কি হচ্ছে বল দেখি!"

স্ত্রী বল্লেন—"তাহ'লে ওর বাপ-মাকে একটা খবর পাঠাও।"

আমি টুকনিকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়ে দেখি, সে এরই মধ্যে শুয়ে-পড়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে। তাকে আবার ঠেলে তুলে বল্লুম—"এই! তোর বাড়ি কোথায়?"

টুকনি আমার চোখের দিকে তার সেই আধ-বোজা ঘুমন্ত চোখদুটো টেনে তুলে খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইল; তারপর একটা ঝট্‌কা-মেরে বলে উঠ্‌ল—"নেই বোলেগা!" বলেই সে ধপাস্-করে শুয়ে পড়্‌ল।

আমি ধমক দিয়ে বল্লুম—"তোকে বল্‌তেই হবে।"

টুকনি আমার দিকে পিছন-ফিরে শুয়ে অত্যন্ত একটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"নেই বোলেগা!"

আমি তাকে আরো দু-চারবার ডাকা-ডাকি করলুম; সে সাড়াই দিলে না। শেষে নিরুপায় হয়ে চাকরদের কাছে খোঁজ কর্‌তে লাগলুম; কিন্তু কেউই কোনো খবর দিতে পার্‌লে না। গিন্নী বল্লেন—"তবে আর কি করা যাবে!"

আমি তখন হাল ছেড়ে দিলুম।

পরদিন সকালে চা খাচ্চি, খোকা এসে বল্লে—"বাবা, টুকনি আমার ডংকি ভাগিয়ে দিচ্চে।"

আমি বল্লুম—"কেন?"

সে বল্লে—"জানি না। যতবারই উঠ্‌তে যাচ্চি, সে আমার হাত-ধরে খালি বল্‌চে—'নেই'!"

আমি টুকনিকে ডেকে বল্লুম—"এই! কি বল্‌ছিস?"

সে ঘাড়টাকে গোঁ-ভরে নীচু করে বল্লে—"হম্ ডংকি হ্যায়!"

আমি তার হাতখানা ধরে বল্লুম—"তুই তো ভুটিয়ার বাচ্ছা, তুই ডংকি হবি কি করে?"

সে সজোরে হাত টেনে নিয়ে বল্লে—

"নেই! হম্ ডংকি হ্যায়!"—বলেই খোকাকে পিঠের উপর তুলে গট্-গট্-করে ঘর-থেকে বেরিয়ে গেল। তার রকম-সকম দেখে গিন্নীর ভয় হল। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ছেলেটা যে-রকম কাঠ-গোঁয়ার, ভয় করে বাপু! ওরে নন্দ, দেখ্ দেখ্, খোকাকে নিয়ে কোথায় গেল!"

নন্দ-বেহারা তাদের পিছন্ পিছন ছুট দিলে।

দশটার সময় খোকা বেড়িয়ে ফিরে এল। শুনলুম সমস্ত-ক্ষণ টুকনি তাকে পিঠে-করে ঘুরেচে—একবারও নাম্‌তে দেয়নি। তা-ছাড়া খোকার হাতে একটা গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে বলে দিয়েছিল খোকার যখন ডংকিকে ছুট্-করাবার ইচ্ছে হবে সে যেন ঐ ডালের বাড়ি খুব-কসে মারে। টুকনির গায়ের দু-জায়গা দেখ্‌লুম প্রহারের দাগে রাঙা হয়ে রয়েছে। আমি খোকাকে বল্লুম—"ছি খোকা, এম্‌নি-করে মার্‌তে হয়!"

খোকা কাঁদো-কাদো হয়ে বল্লে—"আমি তো মার্‌তে চাইনি; টুকনি যে ভয় দেখালে, না মার্‌লে ডংকি খদের দিকে নেমে যাবে। আমি একটুখানি আস্তে মেরেছিলুম; ও বল্লে, আরো জোরে মারো, নইলে ডংকি ভারি দুষ্টুমি করবে!"

গিন্নী আঁৎকে-উঠে বল্লেন—"এই দেখ কী কাণ্ড! ছেলেটাকে খদে ফেলেই যদি দিত! না বাপু,—তুমি ওকে বিদেয় কর।—এখনই বিদেয় কর।"

টুকনি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিল; কি বুঝলে তা জানিনা; কিন্তু গিন্নীর কথা শেষ হতেই সে চিম্‌নির তলা থেকে ধাঁ-করে একখানা আধ্-পোড়া কাঠের চ্যালা তুলে নিয়ে গিন্নীর হাতের সাম্‌নে ধরে বল্লে—"হম্ বদ্‌মাস্ হ্যায়, হম্‌কো মার্ লাগাও।"—বলেই পিঠ-পেতে দাঁড়াল।

গিন্নী তার রকম দেখে হেসে উঠলেন। সে হাসি টুকনির মনে ধরলনা, প্রহার না পাওয়াতে তার মুখখানা ভারি ক্ষুণ্ণ দেখাতে লাগল।

গিন্নী বল্লেন—"ভারি মুস্কিল বাধালে দেখ্‌চি! ঐ বুনোটাকে তাড়াতেও মায়া করে, রাখ্‌তেও ভয় হয়।"

খাবার সময় টুকনি আবার গোল-বাধিয়ে বস্‌ল। গিন্নী এসে বল্লেন—"দেখো এসে কি কাণ্ড!"

আমি গিয়ে দেখি খোকার খাবার টেবিলের নীচে টুকনি চুপ-করে গুঁড়ি-মেরে বসে আছে। তার খাবার নিয়ে ডাকাডাকি হচ্ছে, সে কিছুতেই যাবেনা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কি হয়েছে রে টুকনি?"

সে বল্লে—"হম্ কুত্তা হ্যায়!"

খোকা বল্লে—"বাবা, ও বল্‌ছে যে ও আমার কুকুর; আমি খেয়ে-খেয়ে টেবিল থেকে যা ফেলে দেব, ও তাই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খাবে।"

টুকনি কিছুতেই সেখান-থেকে নড়্‌ল না; গোঁ-হয়ে বসে রইল। অগত্যা টেবিলের উপর-থেকে মাটিতে খাবার ফেলে তাকে কুকুরের মতনই খাওয়ানো হল। তাতে তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে!

খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে ডেকে বল্লুম—"টুকনি, তুই এইবার বাড়ি যা- তোর

বাপ-মায়ের কাছে। তারা হয় ত তোর জন্যে কাঁদ্‌চে।"

কাঁদচে!—এই কথাটাতে হঠাৎ টুকনি যেন থম্‌কে গেল; কেমন-একরকম ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌-করে চাইতে লাগ্‌ল—তার চোখের পাতাগুলো ক্রমে ভারি হয়ে এল। সে ছুটে গিয়ে জান্‌লার উপর উঠে দূর-পাহাড়ের কোন্‌-এক ঝাপ্‌সা কোণের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর আস্তে-আস্তে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

আমি বল্লুম—"কি রে যাবি না?"

সে ধীরে-ধীরে ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না।"

আমি বিস্মিত হয়ে তার পিঠে হাত-রেখে স্নেহের স্বরে বল্লুম—"কেন বল্‌ দেখি?"

সে খানিকক্ষণ চুপ-করে রইল: মনের মধ্যে কি যেন হাত্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তারপর তার হাতখানা একটু-একটু-করে উঠতে-উঠতে বুকের মধ্যিখানটিতে এসে থেমে-পড়তেই বুক-থেকে একটি কথা ঠেলে উঠল—"খোকাবাবু!"—আর-কিছু সে বল্‌তে পারলেনা।

টুকনির ধরণ-ধারণ সবই অদ্ভুত; সে যে কি বল্‌তে চায়, ভালো করে বুঝতে পার্‌লুম না। কিন্তু তবু তার সেই চোখের চাহনি, তার সেই-ধীরে-ধীরে বুকের মধ্যি-খানটিতে হাত-দেওয়ার ভঙ্গী, তার ঐ একটি কথার উচ্চারণের সুর আমাকে কেমন অভিভূত করে ফেল্লে। আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পার্‌লুম না; —তাকে বিদায় দেবার ভাষা মুখে আন্‌তে পার্‌লুম না। সে যে চোখের আভাসে কাতর মিনতি জানিয়ে আমাকে বশ কর্‌লে তা নয়,—তার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও দয়া-ভিক্ষার একটুখানি ইসারাও ছিলনা, মমতা-প্রার্থনা করবার মতো ভঙ্গীও দেখিনি; তবু আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম।

আমি স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম—"আমি ওকে বিদেয় কর্‌তে পার্‌বনা; তুমি পার ত কর।"

গিন্নী বল্লেন—"তবে ও থাক্‌। যখন খুসী হবে, যাবে।"

আমি যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম।

কিন্তু খানিক বাদে আবার গোল বাধল। গিন্নী অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে এসে বল্লেন—"ঐ সর্ব্বনেশে ছোঁড়াটাকে কিছুতেই বাড়িতে রাখা হবে না!"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"ব্যাপার কি?"

গিন্নী বল্লেন—"আর একটু হলেই সর্ব্বনাশ হত!"

আমি বল্লুম—"কেন? কি হয়েছে?"

গিন্নী বল্লেন—"ঐ টুকনির কাণ্ড! খোকাকে পিঠে-করে সিঁড়ি-বেয়ে তুল্‌তে গিয়ে ফেলে দিলে! তার কপালটা এই এতখানি ফুলে উঠেছে। যদি অজ্ঞান হয়ে যেত!"

আমি বল্লুম—"কৈ, দেখি খোকাকে!"

বল্‌তে-বল্‌তেই খোকা এসে হাজির হ'ল; সঙ্গে টুকনি। দেখলুম তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে; সে থেকে-থেকে খোকার কপালের ফুলোটার দিকে কাতর-চোখে দেখ্‌ছে।

আমি বল্লুম—"দেখ্‌-দিকিন্‌ টুকনি, কি করেছিস!"

বল্‌তেই টুকনির চোখ ছল্‌-ছল্‌-করে এল; সে খোকার কাছে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি তার সেই কপালের ফুলোটার উপর হাত-দিয়ে চেপে ধর্‌তে গেল, যেন

তার হাতের চাপে ঐ ফুলোটা এখনই সমান করে দিতে পার্‌লে সে বাঁচে! কিন্তু খোকা উঃ-করে উঠ্‌তেই সে হাত সরিয়ে নিলে। গিন্নী তাড়তাড়ি খোকাকে টুকনির কাছ থেকে টেনে নিলেন। তারপর আমার মুখের ভাব দেখে বল্লেন—"না। টুকনিকে কিছুতেই রাখা হবেনা।"

আমি চুপ করে রইলুম।

গিন্নী বল্লেন—"টুকনি, তুই এ-বাড়ি থেকে বেরো।"

টুকনি সিধে দাঁড়িয়ে রইল।

গিন্নী আবার বল্লেন—"বেরো বল্‌চি!"

টুকনি ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে, হাতের একটা আঙুল ধরে সজোরে মোচ্‌ড়াতে লাগ্‌ল;—পা তার নড়্‌লনা।

গিন্নী ডাক্‌লেন—"নন্দ!"

নন্দ-বেহারা এসে হাজির হ'ল। গিন্নী তাকে বল্লেন—"যেমন কোরে পারিস্‌ ঐ ছোঁড়াটাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়।"

নন্দ টুকনির হাত ধর্‌তে গেল। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"মুখ দেখছনা? টুকনি অপ্রস্তুত হয়েছে। অমন-কাজ ও আর কর্‌বেনা;—এবার ওকে মাফ কর।"

গিন্নী বল্লেন—"না, না! ও বাড়ি থাক্‌লে আমার আর স্বস্তি থাক্‌বেনা। খোকাকে নিয়ে দিনরাত কি করে বেড়াচ্চে দেখচনা? খোকার উপর যে-রকম টান, যদি চুরি করে নিয়েই পালায়!"

আমি হেসে বল্লুম—"না, অতটা হবেনা।"

গিন্নী বল্লেন—"তা না-হলেও কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব? ও যদি আদর-করে খোকাকে বুকে চেপে ধরে, তা হলেও যে খোকার হাড়-খানা-গুঁড়িয়ে যাবে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওর সাম্‌নে খোকাকে ছেড়ে-রাখ্‌তে আমার আর সাহস হচ্ছেনা।"

আমি নিরুপায় হয়ে বল্লুম—"বিদেয় যদি কর্‌তে চাও, অমন মার-মূর্ত্তি হয়ে বিদেয় দিয়োনা! একটু আদর-করে বিদেয় দাও। —হাজার হোক্‌ ছেলেমানুষ!"

গিন্নী নরম হয়ে এলেন। আদর-করে টুকনিকে ডাক্‌লেন—"আয়, শোন্‌, আমার কাছে আয়!"

টুকনি এই আদরের আহ্বানে চোখ-তুলে একবার চাইলে, কিন্তু এগিয়ে গেলনা। তার চোখ দেখে বোঝা গেল ঐ ডাকে তার মন সাড়া তো দিলেইনা বরং কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। টুকনি যতই ছেলেমানুষ হোক্‌, আমাদের ভাষা তার যতই অজানা থাক্‌, দেখলুম, আমাদের মনের ভাব বুঝতে তার আট্‌কায় না। আশ্চর্য্য!

গিন্নী আরো ডাকাডাকি কর্‌লেন, তবু সে কাছে এলনা। এক-এক-সময় পিছনে লাঠি লুকিয়ে কুকুর কি বেড়ালকে আদর-করে ডাক্‌লে যেমন সে কিছুতেই কাছে আসেনা—এ ঠিক তেম্‌নি! গিন্নী তখন উঠে গিয়ে তার হাত-ধরে কাছে এনে বসালেন। হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"মেঠাই কিনে খাস্‌, বুঝলি!"

টুকনি টাকার দিকে দেখলেওনা; তাড়া-তাড়ি টাকাটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে, হাতখানা ঝেড়ে ফেল্লে; তারপর ঘরের এক-কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

গিন্নী হতাশ হয়ে বল্লেন—"আদর তো কর্‌লুম, এখন যা-কর্‌বার, তুমি কর।"

আমি চুপ করে রইলুম দেখে গিন্নী নন্দকে ইসারা করলেন। নন্দটা যমদূতের মতো এসে টুকনিকে টান্‌তে-টান্‌তে ঘর-থেকে বার করে নিয়ে গেল। টুকনি কিছুতেই যাবেনা সেইটে জানাবার জন্যে সমস্ত শরীরটা নেতিয়ে দিয়ে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে পড়্‌ল। নন্দ তাকে কিছুতেই রেহাই দিলেনা—সজোরে হ্যাঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি সেই দৃশ্য আর দেখতে পার্‌লুম না; চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তারপর হঠাৎ দেখি টানাটানির কোন্ ফাঁকে নন্দর হাত-ছাড়িয়ে ছুটে এসে টুকনি গিন্নীর পায়ের উপর ঝপাৎ-করে পড়্‌ল;—দু-হাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে। গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"ছাড়্, ছাড়্!" কিছুতেই সে ছাড়েনা,—মাথা গুঁজে পড়ে রইল। দু-ফোঁটা চোখের জল বোধ হয় তাঁর পায়ের উপরে পড়েছিল। কারণ, হঠাৎ দেখি গিন্নী টুকনিকে কোলের উপর তুলে নিয়েছেন,—টুকনি তাঁর বুকের মধ্যে মুখ-লুকিয়ে ফোঁপাচ্চে!

বলা বাহুল্য, টুকনিকে বিদেয় করা হ'ল না।

দুপুরবেলা খোকা যখন ঘুমতে গেল, টুকনি বাড়ির সব ঘরগুলোর ভিতর ঢুকে, কৌচের গায়ে হাত বুলিয়ে, চৌকির উপরে বসে, ম্যাটিঙের উপর গড়াগড়ি খেয়ে, আয়নার সাম্‌নে মুখ-ভেংচে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। তাকে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য করেছিল ইলেক্‌ট্রিকের বাতি। সে একখানা টুল টেনে এনে তার উপরে দাঁড়িয়ে-উঠে হাত-বাড়িয়ে বাতির চাবি অনবরত খুল্‌তে আর বন্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল। বাতি যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই আধ-বোজা চোখদুটো বিস্ময়ে জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌তে থাকে। সে এক-একবার টুল থেকে তড়াক্-করে লাফিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোর পথ চোখ-দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; তারপর ছুটে গিয়ে আবার সেই টুলের উপর দাঁড়াতে লাগ্‌ল। আমি তার কাছেই বসেছিলুম; প্রতিমুহূর্ত্তেই আশা কর্‌ছিলুম সে হয় ত এখনই এসে তার এই বিস্ময়টা আমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেবে। কিন্তু সে আমাকে কোনো প্রশ্নই কর্‌লেনা; আপনার বিস্ময়কে আপনি পরিপাক কর্‌তে লাগ্‌ল। তার এই একঘেয়ে কৌতূহলের ছুটোছুটি দেখে-দেখে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়লুম; কিন্তু তার বিন্দুমাত্র অবসাদের লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর, ঘুম-থেকে-উঠে খোকার গলার আওয়াজ যখন বার হ'ল তখন সে একবার কান-খাড়া করে শুনেই নিজের খেলা ছেড়ে ছুটে গেল।

সেদিন সমস্ত-দুপুর-বেলাটা মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কার মতো হচ্ছিল যে এইবার টুকনির বাপ-মা ছেলের সন্ধানে এইখানে এসে পড়্‌ল বলে! কিন্তু দুপুর থেকে বিকেল হ'ল, বিকেল সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু টুকনির বাপ-মায়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিকেলে সে যখন খোকার সঙ্গে চৌরাস্তায় বেড়াতে গেল, তখন ভাবলুম নিশ্চয় সে রাস্তায় তার বাপ কিম্বা মায়ের হাতে গ্রেফ্‌তার হবে; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখি সে দিব্যি ফিরে এল। তাকে জিজ্ঞাসা

কর্‌লুম—"কি রে, তোর মা-বাপের সঙ্গে দেখা হয়নি?"

সে বল্লে—"নেই!"—বলেই ছুটে পালিয়ে গেল; আর প্রশ্ন কর্‌বার অবসর দিলে না।

রাত্রে খাবার পর আবার দেখি টুকনি মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে খোকাকে পিঠে-করে দোতলায় তুল্‌ছে। গিন্নী ধমক দিয়ে বল্লেন—"টুকনি, আবার!"

গিন্নীর স্বরে বোঝা গেল খোকাকে পিঠে-করা একেবারে বারণ হয়ে গেছে।

টুকনি গিন্নীর ধমকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গিন্নী বল্লেন—"তুই ফের যদি খোকাকে পিঠে কর্‌বি তাহ'লে তোর গলা-টিপে বাড়ি-থেকে বার করে দেব।"

টুকনি আস্তে-আস্তে খোকাকে নামিয়ে দিলে; খোকা হুড়্‌দাড়্-শব্দে উপরে উঠে গেল; টুকনি সিঁড়ির রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ি-বেয়ে ওঠ্‌বার যেন আর স্ফূর্ত্তি নেই,—শক্তিও নেই। খানিক পরে সে আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে এক-পা-এক-পা-করে উপরে উঠে গেল। তারপর চুপ-করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরদিন সকালে দেখি টুকনির চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। তার গায়ের রং যে অত ফর্সা আগে তা বুঝতে পারিনি। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে গিন্নী বল্লেন—"উঃ, ওর গায়ে এত ময়লাও ছিল! যত সাফ্ করি, তত ময়লা বেরোয়। দুখানা আস্ত-সাবান খরচ হয়ে গেল! খোকার সঙ্গে বেড়াবে, অত নোংরা থাক্‌লে তো চল্‌বে না, তাই আজ ওকে সাফ্ করে দিলুম।"

দেখ্‌লুম, ময়লা উঠে গিয়ে টুকনির টেপো-টেবো গাল-দুটোয় রক্তের আভা ফেটে পড়ছে; মাথায় তেল পড়ে শুক্‌নো চুলগুলো চক্‌চকিয়ে উঠেছে; জুতো, জামা, টুপি পরে একেবারে ফিট্‌ফাট্! গিন্নী তার দিকে চেয়ে বল্লেন—"এতক্ষণে মানুষের মতন হ'ল;—ছিল যেন একটা জানোয়ার কি ভূত!"

গিন্নী ঘটা-করে তাকে সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি দেখলুম সেই সজ্জার ভারে আসল টুকনি কোথায় তলিয়ে গেছে! তার সেই ফুলে-ফুলে-দুলে-দুলে-ওঠা স্ফূর্ত্তিটা আঁটসাঁট কোট-পেণ্ট্‌লেনে যেন তুব্‌ড়ে চুপ্‌সে গেছে। তার মুখ দেখে মনে হ'ল যেন বেচারা নিতান্ত অসহায়! চল্‌ছে, ফির্‌ছে—প্রতিপদে যেন বাধা ঠেলে-ঠেলে। এইভাবে সে খোকার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে যখন এল, তার সে-মূর্ত্তি আর নেই! জামা-কাপড়ের বাঁধন ছিঁড়ে তার সেই চঞ্চল স্ফূর্ত্তি তখন সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়্‌ছে। আষ্টেপৃষ্ঠে ধুলো মাখা; জুতোর গোড়ালি উড়ে গেছে, পায়জামার একটা পা নেই, জামার বোতামগুলো কোথায় কে জানে, এবং পিঠের দিকটা সাম্‌নের মতোই খোলা হাঁ-হাঁ করছে!

এই অবস্থা দেখে গিন্নী তাকে খুব ধম্‌কাতে লাগ্‌লেন। তার মুখ দেখে আমি বুঝলুম মার হজম করা তার পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু এই তিরস্কার সে সইতে পারে না। সে বকুনি খেয়ে খানিকক্ষণ তাঁর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, তারপর একদৌড়ে একেবারে খোকার খাটিয়ার নীচে গিয়ে সেঁধলো। গিন্নী হেসে বল্লেন—

"আচ্ছা-ছেলে বাপু, ওর সঙ্গে পারবার যো নেই।"

খানিক বাদে খোকা এসে বল্লে—"বাবা, টুকনি কোথায়?"

আমি বল্লুম—"চল্, খুঁজে বার করি।" বলে খোকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। ঘরে ঢুকতেই খাটিয়ার নীচে থেকে কান্নার একটা ফোঁস্-ফোঁস্ আওয়াজ কানে এল। নীচু হয়ে দেখি হাত-দিয়ে চোখ-ঢেকে, টুকনি উবুড়-হয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদছে। খোকা ডাকলে—"টুকনি আয়।"

টুকনি কোনো সাড়া দিলে না।

আমি বল্লুম—"টুকনি বেরিয়ে আয়।"

তবুও কোনো সাড়া দিলে না।

শেষে গিন্নীকে ডাকলুম। টুকনিকে মাটিতে পড়ে কাঁদতে দেখে তাঁর যে মায়া করছিল সে তাঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। তিনি ডাকলেন—"টুকনি।" আর-একবার ডাকলেন—"টুকনি!" শুধু ঐ ডাক! বাঁশরী সুরে সাপ যেমন-করে আসে, ঠিক তেম্নি-করে টুকনি বেরিয়ে এল। একবার কাতর-চোখে গিন্নীর দিকে চাইলে, কিন্তু যেমন তাঁর উপরে চোখ পড়া অম্নি তার মুখের উপরকার কালো ছায়াটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। সে লাফাতে-লাফাতে ঘর থেকে ছুট দিলে।.....

গিন্নীর শাসনে পড়ে টুকনি সিধে হয়ে আসছিল। দুর্দান্ত পশুকে যেমন-করে বশ করে, বোধ হয় তেম্নি কোনো কৌশলে গিন্নী তাকে বশ করছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারতুম না, কিসের দায়ে টুকনি এই শাসনের বশ্যতা স্বীকার করছে। বাঘও মানুষের বশ হয় জানি, কিন্তু কিসের জন্য তা আমি বুঝতে পারিনা!

টুকনির চঞ্চলতাটাকে মুক্ত রাখলে ভাবনার কারণ আছে জেনে গিন্নী তার ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়েছিলেন। অবশ্য সেগুলো খোকারই খুঁটিনাটি কাজ। সে-গুলো সে করত; কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যেত যে তা-থেকে সে যেন কোনো রস পাচ্ছে না। সকাল-বিকেল দুবেলা খোকা যখন তার চোখের সাম্নে ডংকির পিঠে উঠত, সে এমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত যে দেখে মায়া হয়! মনে হ'ত সে ঐ ডংকিটাকে হিংসে করছে। সে তখন আমাদের দিকে বারবার চেয়ে দেখত,—যদি আমরা-কেউ তাকে একবার বলি, তা'হলে সে এখনি খোকাকে পিঠে করে ছুট-দিয়ে মনের আশটা মিটিয়ে নেয়।...

তিন-চার দিনের মধ্যেই টুকনির এমন বদল হয়ে গেল যে তাকে দেখলে মনে হ'ত না, এ সেই-টুকনি;—যেন একটি শান্তশিষ্ট ছেলে! কিন্তু এক-একবার দেখতুম হঠাৎ তার এই শান্তভাব ঠেলে দুর্দান্ত ঘোড়ার একটা তড়্বড়ানি ভিতর থেকে ঝাঁকি-মেরে উঠছে। সে তখন ছুটে-ছুটে খোকাকে পিঠে তুলতে যেত; কিন্তু গিয়েই হঠাৎ থেমে-পড়ে খোকার হাত-দুটোকে পিঠের দিক থেকে আস্তে-আস্তে গলায় জড়িয়ে-নিয়ে গোঁ-হয়ে বসে পড়ত। তারপর খোকাকে ছেড়ে কোথায় ছুটে বেরিয়ে যেত!

নানারকম খেলনা নিয়ে খোকা তাকে প্রায়ই ডাকত; সে খোকার সঙ্গে খেলায় যোগ দিত বটে কিন্তু তাতে তেমন স্ফূর্তি

বোধ হয় হত না। সে খেল্তে-খেল্তে হঠাৎ পুতুলগুলোকে বিরক্তির সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠত। খোকা ধমক দিলে আবার সেই ছড়ানো-পুতুলগুলোকে জড়ো করে যেন দায়ে পড়ে খেল্তে বস্ত।

খেলায় তার মন ছিল না বটে কিন্তু খোকা যে-পুতুলগুলি তাকে বিলিয়ে দিয়েছিল সেগুলির প্রতি তার মায়া ছিল অসীম। সেগুলিকে সে দিন-রাত কাছে-কাছে রাখ্ত। খোকা দুপুরবেলা ঘুমুলে সেগুলি বার করে ঝেড়ে-পুঁছে আবার তুলে রাখত—ছোট্ট বুক-পকেটটির ভিতর খুব ঠেসাঠেসি করে। এই পুতুলের গায়ে কারো হাত দেবার যো ছিল না। আমি একদিন আদর করে ঐ পুতুল নিয়ে খেল্তে গিয়েছিলুম, সে অম্নি বাঘের মতো থাবা তুলে ফোঁস্ করে উঠল। তাড়িতাড়ি লুকিয়ে ফেল্লে।

গিন্নী টুকনিকে দেখতেন আর বল্তেন—"নিশ্চয় আর-জন্মে টুকনি খোকার ভাই ছিল! বোধ হয় এ-জন্মে মনে-মনে চিন্তে পেরেছে, নইলে অজানা অচেনা ছেলের উপর ঐ ছেলেমানুষের এতটা প্রাণের টান কোথা থেকে এল?"

যে-জন্মেরই হোক্, টুকনি যে খোকার ভাই এই ধরণের একটা সংস্কার গিন্নীর মনে নিশ্চয় জন্মে গিয়েছিল; কারণ টুকনিকে তিনি যে-চোখে দেখতেন, যে রকম স্নেহ, যে-রকম আদর দিতেন, তাতে কিছুতেই মনে হত না যে টুকনি পরের বাড়ির ছেলে!

টুকনি কি-চোখে আমাদের দেখতো তা টুকনিই জানে! কিন্তু আমাদের বাড়িতে সে যে দিন-দিন মুস্ড়ে পড়ছিল, আর-কেউ লক্ষ্য না করলেও, আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেতুম; মনে হত তার যা খোরাক, তা যেন এ-গৃহস্থের বাড়িতে দিন-দিন বাড়ন্ত হয়ে আস্ছে। এই বাড়ির আবহাওয়া প্রথম-দিন তাকে যে কৌতূহল দিয়ে আকর্ষণ করেছিল, আজ তা কোথায়? ইলেক্‌টিকের বাতি এখন রোজই জ্বলে, কিন্তু তার সেই আধ-বোজা চোখ আর তেমন করে জ্বলে ওঠে কৈ? মেজের ম্যাটিং তেমনই পড়ে আছে, তাতে সে কখনো শোয়, কখনো বসে-মাত্র, কিন্তু তেমন-করে লুটো-পুটি দিয়ে গড়াগড়ি খাবার ক্ষুধা যেন আর নেই। কৌচগুলোর সঙ্গে এখন যা সম্পর্ক, সে কেবল ঝাড়-পোঁছের মধ্যে;—তেমন-করে সন্তর্পণে তার স্পর্শটি চুরি-করবার প্রলোভন আজ কোথায় উবে গেছে! কোথাও যেন আর তেমন আকর্ষণ নেই; কেবল দেখতুম আমার আয়নার টেবিলের উপরে ফ্রেমে-বাঁধা খোকার যে-ছবিখানি ছিল, তার দিক থেকে তার চোখ আর ফেরে না। তার পানে সে অনবরত চেয়ে-চেয়ে দেখত —একটা দুর্দমনীয় লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে-দিয়ে!

আমি তাকে বল্তুম—'নিবি?'

সে সমস্ত দেহসুদ্ধ-ঘাড়খানা নেড়ে বল্ত —"হুঁ!"

আমি যেই বল্তুম—"আচ্ছা, দেব এখন!" অম্নি সে আমার গায়ের কাছে এসে কুকুরের মতো গা-ঘস্তে থাকত। টুকনি আর-কোথাও আমায় গ্রাহ্য করতনা, কেবল এই ছবির প্রলোভনে একটুখানি আকর্ষণ আমার জন্যে রেখেছিল! সেই জন্য এই ছবিখানি

আমি হাতে-রেখেছিলুম; তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে ফেল্‌তে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না।...

টুক্‌নির বাপ-মায়ের কথা আমরা এক-রকম ভুলেই বসেছিলুম।—সে আমাদের কাছে এমন সহজ হয়ে এসেছিল যে সে যে আমাদের বাড়ির ছেলে নয় এ-কথা মনেই হ'ত না। কিন্তু আমরা ভুল্লেও, টুক্‌নির বাপ-মায়ের কোনো ভুল হ'ল না। একদিন বিকেল-বেলা বেড়াতে যাচ্ছি, এমন-সময় সেই বাপ-মা একসঙ্গে এসে হাজির হ'ল। তাদের মুখে শুনলুম বাড়ি-থেকে পালানো টুক্‌নির স্বভাব। প্রায়ই সে বাড়ি-ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এবার যে জঙ্গল ছেড়ে মানুষের বাড়িতে ঢুকেছে, বাপ-মা তা কেমন করে টের পাবে? কাজেই এই এক-হপ্তা তারা জঙ্গলে-জঙ্গলে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হচ্ছিল। শেষে এই হাটের দিন সহরে এসে খোঁজ পেয়েছে।

টুক্‌নির বাপ গম্ভীর স্বরে বল্লে—"টুক্‌নি ঘর চল্!"

আমি আশা কর্‌ছিলুম টুক্‌নি সেই প্রথম-দিনের মতো এখনই বলে বস্‌বে—"নেই যায়ে গা!" কিন্তু দেখি টুক্‌নি সুড়-সুড় করে বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে তার আর কথা নেই। কেবল তার চোখ-থেকে মায়ার টানের একটি ছল্‌ছলানি সন্ধ্যার ম্লান আকাশকে ভার-করে তুল্‌তে লাগল। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা বেরুলনা। গিন্নীর চোখের পাতা ভেরে এল; খোকার মুখ কাঁদো-কাঁদো; বাড়ির চাকর-বাকর সবাই পুতুলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টুক্‌নির বাপ বল্লে—"সেলাম হুজুর!" বলেই টুক্‌নির হাত-ধরে টান্‌তে-টান্‌তে নিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, তার দিকে আমরা চেয়ে রইলুম। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দূর-আকাশের পাখীর মতো সে মিলিয়ে গেল। গিন্নী আর বেড়াতে গেলেন না; সাজসজ্জা ছেড়ে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়ায় চুপ-করে বস্‌লেন; খোকা কোথায় লুকিয়ে পড়ল দেখতে পেলুম না। সবাই একে-একে নীরবে সরে গেল; আমি কেবল একা সেই সন্ধ্যার আলোয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝাপ্‌সা-চোখে দেখতে লাগলুম—কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকের মাঝের শ্বেতপদ্মটি বিদীর্ণ হয়ে রক্তের ধারা ঝরে-ঝরে পড়ছে!

হঠাৎ মনে হ'ল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড়ের মতো কে ছুটে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি খোকার সেই ছবিখানি নেই।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নাদিরশাহের শেষ

[স্থান—প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির। কাল—হত্যা-রাত্রি, নিশীথ।]

তুমি চলে' যাও এখনি এ রাতে উদ্‌বেগ্‌-সর্দ্দার!
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেরী আছে মরিবার।
কে মারে আমারে!—এখনো ছেড়েনি আকাশের গ্রহতারা,
জমিন্ ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আল্‌বোরজে'র চূড়া,
সুলেমান আর হিন্দুকুশের পাঁজর হয়নি গুঁড়া!
আমি না শাহান্-শাহা!
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি?—বাহারে বাহা!

চলে' যাও ফিরে ইমাম জাফর! ডেকে দিও দুরাণীরে,
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে'।
কাল, কোহিনুর-তাজ শিরে আর তখ্‌ত-তাউসে চড়ি',
আর একবার খুন্-খুস্‌রোজ্ খেলিব পরাণ ভরি'!
দিল্লীর শাহ রেখেছিল পা'য় উষ্ণীষ তরবার,
তাই নিয়ে যাও, পরে' যেন কাল আব্‌দালি-সর্দ্দার।
আলির বংশধর!
মনে থাকে যেন ইমাম হুসেন, কারবালা-প্রান্তর।

সেথ শিয়া সুফী দরবেশ যত বাঁচে না যেনই কেহ,—
কাটিয়া পাড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ;
ওমরাহদের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ,—
ভাঙ্গা-মগজের চর্ব্বি-চেরাগে রোস্‌নাই হবে খুব!
জাফর! তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,
'রোজ্ কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে।
—কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার।

আঃ বাঁচা গেল! তবু মনে হয় কে যেন রহিল পাছে!
না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দ্দায় পড়িয়াছে।
একি হ'ল একি! বড় তাজ্জব!—ছায়া নয়, ও যে ছবি!
একবার সেই দেখেছিনু ওরে, ভুলে গিয়েছিনু সবি;—
দিল্লি-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,
একা বসেছিনু, মস্‌জেদ্ সেই রুক্‌নোদ্দৌলার,—
হঠাৎ দেয়ালে ছায়া,
ঠিক এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চৌপায়া!

দূর দূর! আরে দেখ দেখ—য়েন পাহাড়ী সাপের চোখ!
অবশ করিয়া বেহুঁস করিল, হরিল সকল রোখ্;
ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে আফ্‌শোষ্,
মনে পড়ে যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দ্দোষ।
দেখ, সয়তান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা আনি',
চোখ দিয়ে বুকে বিষ ঢেলে' দিয়ে, মাথায় মুগুর হানি',
—এ কি হল, হায় হায়!
এ বুড়া বয়সে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায়!

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুষে' নেয় নাভি-শিরা!
কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার গিরা!
'হাশিশ্' খাওয়ায়ে, অজ্ঞান করে' রেখেছিল এতদিন—
'জম্‌জম্'-জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন্ জিন্!
রক্তের নেশা একেবারে যেন ছুটে' যায় লহমায়,
পরীর আঙুলে পরাইল চোখে স্তাম্বুলি সুর্ম্মায়!
—ডুবে' যাই, গলে' যাই!
তাজ সম্‌শের ফেলে দিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।

নাদির! এখনি ভুলে গেলে, তুমি দুনিয়ার দুষ্‌মন্!—
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম্ম-সিংহাসন;
কোটী শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আস্‌মান্
আঁধারিয়া তুমি দিনের জলুস্ করিয়া দিয়াছ ম্লান;

পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিশু, জননীর কোল ছিঁড়ে',
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিয়েছ মানুষের সুখ-নীড়ে;
আপন ছেলের চোখ,
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক!

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে,—খোদারি সে কারসাজি—
সয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি?
স্থির হও মন, ভেবে দেখি আজ কে করেছে সেই খেলা—
আমি ত' মানুষ সবারি মতন, কাদা ও মাটীর ঢেলা!
বুকে মারো ছুরি, গল্‌গল্ করে' বাহিরিবে রাঙা-জল,
এই দেখ চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টল্‌টল্,
—এত কুদ্‌রৎ তার!
আল্লা তালা আক্‌বর! এযে মতলব বোঝা' ভার!

বারুদের মত কালোমেঘে বাজ তোপ দাগে, দেখ নাই?
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে কত দেশ হ'ল ছাই!
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যাঁর
হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বার বার,
ইসারায় তাঁরি জেগেছিল দূর ইরাণের সীমানায়
যুবা আফ্‌সারী—নাদির, এ নাম দিয়েছিল বাপ মা'য়;
মেষ-পালকের আজি,
দুনিয়ার সেরা দুষ্‌মন্ নাম,—এ কাহার কার্‌সাজি?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কা'রো,
ভুলেছিনু আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো!
লক্ষপরাণ হানিবার কালে ভুলেছিনু এক প্রাণ—
সে যে সেই-মত করে ধুক্ ধুক্, তেমনি দয়ার দান!
তারি সাথে আজ মুখোমুখী করে' দিয়ে গেল মাঝরাতে,
দেখিতেছি তা'য় আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে—
বিস্‌মিল্লা রহমান!
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক্ বেইমান্।

নাদির! নাদির!—সাড়া নাহি দেয়, একেবারে মরিয়াছে!
আরে সয়তান! সয়তানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে!
সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল,
তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নখ যে এখনো লাল!
বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নর-শির-পর্ব্বত
করে নাই খুসী, ক্ষীণ মনে হ'ল দরবার-নহবত,—
আজ তার হ'ল ভয়!
নাদির! নাদির! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয়!

মরিয়াছি আমি, চলে' গেছি আজ সেই পাহাড়ের ধারে—
প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে ভুলেছি যা'রে;
জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রৌদ্র মিশে আছে কুয়াসায়,
ঝিক্ ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি গিরিদের পা'য়-পা'য়,
দেবদারু-শাখে জড়ায়েছে লতা সোণালিঝুমুকাভরা,
আখ্‌রোট্-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আপেল পাকিবে ত্বরা—
এই সেই গ্রামপথ,
এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মস্‌নদ্!

নওরোজ্-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে সুতালী চাঁদ;
তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিয়াছে ফুল-ফাঁদ!
কস্তুরী-কালো পশ্‌মিনা চুলে বিনায়ে চামেলি-মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন? গজল্ গাহনি বালা?
আঙ্গুরের রস কোথা পেয়ালায়?——
তহ্‌মিনা! তহ্‌মিনা!
চাও, কথা কও! কোথা সুখ নাই নাদিরের তোমা বিনা!
আজ নওরোজ্-রাতে,
আশেক এসেছে যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে।

কবেকার কথা! আমি ভুলেছিনু, তহ্‌মিনা ভুলিল না!
স্বপনেও তার চোখদুটি মোর মুখ 'পরে তুলিল না!
তুষার-রশ্মি অচপল দুটি সন্ধ্যা-তারার মত
নয়নে বিঁধিল বড় ঘৃণাভরে হৃদয়ের এই ক্ষত।

লুটাইনু পা'য়, বলিনু বাঁচাও,—সঞ্জীবনী সে পাতা
জেনেছিল তার মায়ের নিকটে, আর কেহ জানে না তা!
তহ্‌মিনা চলে' যায়,
দূরে, দূরে—শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকায়।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পার্‌বিন্' 'মস্তারা'—
একি থম্ থম্ করে আস্‌মান্ নীল-ইস্পাত পারা!
মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে,
জ্বলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে মুর্দ্দারা তাঞ্জামে!
ঘূর্ণি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে রক্তের দরিয়ায়,
দব্ দব্ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মুরছায়!
ঢাল যেন তরবারে—
সারা ময়দান ঝন্ ঝন্ করে, ফেটে যায় হাহাকারে!

কি ঘোর পিপাসা! জিহ্বা তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার!
কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই ভিজাবার।
দূরে দেখা যায় ঝর্‌ণা ঝরিছে, কাছে গেলে আর নাই!
এ কি দিল্‌লগী আল্লা গাফুর! মাফ চাই, মাফ চাই!—
আঃ বাঁচা গেল! বোখার ছুটেছে,—কি যেন আওয়াজ হয়?
বাহিরে বুঝিবা পাহারা-বদল? নাঃ, ও কিছুই নয়।
খোদা যে মেহেরবান্!
স্বপনে এখনি দেখাইল তাই 'হাশরে'র ময়দান।

কে পশিল ওই চোরের মতন? কারা আসে পাছে পাছে?
দুরাণীর লোক,—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, এস ভাই এস কাছে।
কিরীচ্ খোলা যে! আরে বেতমিজ্ বজ্‌দেল্ কাপুরুষ!
নাদির দাঁড়ায়ে সমুখে তোদের, এখনো হয়নি হুঁস্!
হা হা, হঠে' যায়!—মারিবে, তবুও স্বর শুনে' হঠে' যায়!
আয় চলে' আয়, ধর্ গর্দ্দান, কাজ নাই তামাসায়।
আফ্‌সারী সর্দ্দার!
তুমিও এসেছ!—বংশের কাঁটা ঘুচাইবে এইবার?

ভয় নাই, এস ; নাদির মরেছে.—নহিলে এখনো তুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ মাথা না নোয়ায়ে, জানু পাতি' মাটী চুমি' !
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার,—
তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু-ফেরেস্তার ।
এসেছিস বড় ওকৃত বুঝিয়া, তা না হ'লে কুক্কুর !
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর ।
নসীবের কেরামত !—
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ !

তক্‌রার রেখে ধর্ তরবার ! আহমদ্ আব্‌দালী
এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি' ।
পিঠে কেন ? আহা, ঘাড়ে মারে ফের ! স্থির হ'য়ে মার বুকে—
বড় সে কঠিন !—খুব করে' ছুরি বসা'ও, মরিব সুখে ।
আহাহা আল্লা ! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুণা কিছু মাফ হ'বে ?
শেষ হয়ে গেল—বাপ !—
ইরাণের ধ্বজা, ইরাণের গ্লানি, বিধাতার অভিশাপ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ।

আধুনিক ভারতের শ্রমশিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা

(ফরাসী হইতে)

ভারতের শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি কিরূপে হইল তাহা ঠিক বুঝিবার পক্ষে কতকটা সাহায্য হইবে বলিয়াই আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় নগরের বর্ণনা করিয়াছি ।

শ্রমশিল্প

প্রাচীন ভারতের শ্রমশিল্প প্রধানত কলা-শিল্প বা বিলাস-শিল্প ছিল ; জয়পুর, লাহোর ও দিল্লীতে কাগজ বা হস্তিদন্তের উপর ক্ষুদ্রাকারের চিত্র ; লক্ষ্ণৌয়ে পোড়া মাটির ছোট ছোট মূর্ত্তি, সাঙ্গীতিক যন্ত্রাদি, খোদাই-কাজকরা কাঠের জিনিস, রত্নালঙ্কার, সোণার রূপার ও তাঁবার দ্রব্য, মিনার কাজ, স্বর্ণরেখাঙ্কিত ফুলকাটা ইস্পাৎ, লাক্ষা, কাঠ ও মার্ব্বেলের উপর খোদাই-চিত্র (আগ্রা), মৃণ্ময় পাত্রাদি,কাচের দ্রব্যাদি, পেটা চামড়ার জিনিস, জরির কাপড়, গালিচা, কাশ্মিরী কাপড়, মস্‌লিন, রেশম ও তুলার কাপড় ।

প্রাচীন অভিজাতবর্গের দৈন্যদশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজের প্রতিযোগিতা-নিবন্ধন এই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে । বিলাতি জিনিসের নকল করায় ভারতীয় শিল্প-সামগ্রীর রমণীয়তা ও মৌলিকতাও নষ্ট হইয়াছে । পক্ষান্তরে য়ুরোপের নিকট হইতে ভারত মুদ্রাঙ্কনবিদ্যা, এন্‌গ্রেভিং, ও ফোটোগ্রাফি শিখিয়াছে (১)

*

* *

ভারতে, য়ুরোপে-প্রচলিত বড় বড় শ্রমশিল্প খুব কমই সংস্থাপিত হইয়াছে । রেলওএ-কোম্পানীরা তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী নির্ম্মাণ করে । পশ্‌মী কাপড়, মাটীর বাসন, চর্ম্মশোধন, মদ-চুয়ানো, কাগজ-তৈয়ারি এই সমস্তের কারখানা আছে ; কিন্তু উহাদের সংখ্যা খুবই কম । (২)

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে, ১৮৬ তুলার কারখানা, মূলধন ১৫৬,৯৭৪,০০০ টাকা ; টাকু—৪,৭২৮,৩২৪ ; মজুর :—১৬৩,২৪১ ;—১৯০০-১৯০১ অব্দে মূলধন—১৬৫,৩০৫,০০০ টাকা ; টাকু—৪,৯৩২ ; ৬০২ । জুট ও শনের ৩৩টা কারখানা ; ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে মূল-ধন—৫১,৯০০,০০০ ; টাকু ২৯৩,২১৮ ; মজুর—১০১,৬৩০ ; ১৯০০-০১ অব্দে, মূল-ধন—৫৪,০৫০,০০০ ; টাকু ৩১৫,২৬৪ ।

১৮৯২ অব্দে ২৬টা য়ুরোপীয়দিগের, ১৮টা পার্শীদিগের, ৬৪টা হিন্দুদিগের, ৭টা মুসলমানদিগের ও ৩টা ইহুদীদিগের তুলার কারখানা । বেতনের হার এখনও নিম্ন ।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসীরা বৃহৎ-শ্রমশিল্পের চেষ্টা সবে-মাত্র আরম্ভ করিয়াছে । তাহাদের চেষ্টার পথে অসংখ্য বাধা আছে । কতকগুলি বাধা উপকরণ-সম্বন্ধীয় :—যথা লৌহখনি ও কয়লার অভাব । কতকগুলি বাধা সামাজিক ধরণের, যথা—বর্ণভেদপ্রথা ও পারিবারিক সাধারণ স্বত্বাধিকার-প্রথা । আর কতকগুলি বাধা মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক : সকলের মধ্যেই মনোযোগের অভাব, ব্যবসায়িক শিক্ষা-সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব ; অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত লোকের মধ্যে লিখন-পঠন-সাপেক্ষ কাজেই (liberal) বেশী অভিরুচি (৩) ।

---

(১) আধুনিক ভারতের শিল্পকলা আমি আলোচনা করিব না । উহার কোন আকর্ষণ নাই । ইংরেজ বাস্তু-শিল্পীরা, ইংরেজী ধরণেরই হউক, আধা-বিলাতী আধা-প্রাচ্য ধরণেরই হউক, বড় বড় স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে । প্রস্তর-মূর্ত্তিগঠনের অস্তিত্বই আর নাই । আর যদি ছবির কথা বল, পারসীকদিগের অনুকরণে শুধু ক্ষুদ্রাকার ধরণের চিত্র আছে ।

(২) এই সব শ্রমশিল্পের অধিকাংশই আনুসঙ্গিক সাজ-সজ্জার শ্রমশিল্প । তাই, রেলওএতে যে-সব যন্ত্রপাতি লাগে সে সমস্তই য়ুরোপ হইতে আনান হয়,—পেরেক, ইস্কুরু, ছোট ছোট চাকা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি—

(৩) ভারতীয় শ্রমজীবীর শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক ; এই দুর্ব্বলতার কারণ—পুষ্টিকর আহারের অভাব ও বাল্যবিবাহ । যাহা হউক কয়েক বৎসর হইতে, ভারতবাসীরা, যাহা তাহাদের

বাণিজ্যব্যবসায়

কোম্পানীর আমলের আরম্ভভাগে রপ্তানি ১০ লক্ষ পৌণ্ড ছাড়াইয়া যায় নাই।

১৮৯৪-১৯-এর পূর্ব্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য—গড়ে ৭৩,১৫৯,৫৩৪ টাকার রপ্তানি মাত্র ছিল।

কোম্পানীর আমলের শেষাশেষি—১৫৮, ৫১৯,৩৯৬ ও ২০০, ১৭১, ২৫০।

১৮৭০-৭১ অব্দে—৩৯৯, ১৩৯, ৪১৮ ও ৫৭৫, ৫৬৯, ৫০৬।

১৮৯৮-৯৯ অব্দে—৮৯৯, ৯৭১, ৪০০৬ ও ১, ২০২, ১১১, ৪৪৫।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (১৮৭৮)। (১২ মাস কাল) গড়ে সাহায্য পায়—

পূর্ত্তকর্ম্মে ৫৫৭,০০০ লোক নিযুক্ত হয়, ১৩, ৭৫০ জনকে আশ্রমে আশ্রয় দেওয়া হয়। মৃত্যুর বৃদ্ধি ১,২৫০,০০০।

মাদ্রাজ (১৮৮৯)।

মাদ্রাজ, বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, আজমীর (১৮৯২)।

ভারতের উত্তরাঞ্চল, বাঙ্গলা, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে (১৮৯৭) সরকারী বিবরণ অনুসারে ১৮৭৯ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৪, ২৪৮,০০০ লোক সরকার হইতে সাহায্য পায়। মৃত্যুর বিবরণ-তালিকায় দেখা যায়—১৮৯৭ অব্দে ৭, ৬৫৮, ৬৪২ এবং ১৮৯৮ অব্দে ৫, ৬৯, ৫৫২ জনের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কারণে—১, ৪৪৬, ১৪১; পর বৎসরে ঐ জায়গায় ১, ৩৪৪, ৯২৭ লোক মরে: আমাশা ও উদরাময় ২০৯,০৩৫-এর জায়গায় ৩৯৬, ৭১৪। জ্বর: ৩, ৮১৭ ৪৫৬ এর জায়গায় ৪,৯৮৯,৯১১। ওলাউঠা: ১৫০,৮১৭ এর জায়গায় ৫৫০,৭৪৭। বসন্ত রোগ ৫৫, ৭১৩-এর জায়গায় ১৬০, ২১৭। মৃত্যুর এই বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের উপর আরোপ করিতে হইবে।

পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্য-প্রদেশ, বোম্বাই (১৯০০-১৯০১) ১৯০০র আগষ্ট মাসে প্রথম সপ্তাহে সাহায্য পায়—৬, ৩৫৬,০০০ (যাহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজার রাজ্যের লোক)। মৃত্যু-সংখ্যা—৮, ৩৩৪, ১৫৫।

এখন দেখা যাক পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটিত এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ কি? অবশ্য ভারতের কৃষিকার্য্য, মৌসুমের বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে। উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তিন মাস বর্ষা। জুন মাসের মাঝামাঝি ও সেপ্টেম্বরের শেষ। যথেষ্ট বৃষ্টি না হইলে, আদৌ ফসল হয় না, কেন না, বৎসরের অবশিষ্ট অংশে আর বৃষ্টি হয় না। যেখানে সরকার হইতে খাল বাঁধ প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে কেবল সেই সকল প্রদেশরই রাজস্ব সুনিশ্চিত; পক্ষান্তরে ভারতের যে-সব প্রদেশে বাঁধ নাই, খাল নাই, জলের চৌবাচ্চা নাই, সেই সকল প্রদেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তথাপি দুর্ভিক্ষ বলিলে সচরাচর যাহা

চরিত্রের সহিত খাপ্ খায় না এইরূপ কতকগুলি শ্রমশিল্পের উপযোগী গুণের পরিচয় দিয়াছে; বঙ্গ ও আসামের বাষ্পপোতে দেশীয় লোকেরাই কাপ্তেন ও টাণ্ডেলের কাজ করে; যেখানে যন্ত্রপাতি খুব জটিল ধরণের সেইরূপ কল-কারখানাতেও সকল শ্রমজীবী ও সকল হেড্ মিস্ত্রীই ভারতবাসী লোক।

বুঝায় ভারতের দুর্ভিক্ষ সেরূপ নহে। সুদূরবর্ত্তী জিলাতেও রেল-যোগে খাদ্য আনা যাইতে পারে এবং ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এত বেশী, ভারতবাসীর অভাব এত অল্প, ও বহির্দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য এত সচল ও সচেষ্ট যে ভারতের কোন প্রদেশেই বেশীদিন খাদ্যের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার প্রমাণ,—১৮৯৬-১৭০৭ ও ১৮৯৭-৯৮—কঠোর দুর্ভিক্ষের এই কয়েক বৎসর ক্রমান্বয়ে ২৭, ৮২৭, ২৬২ ও ২৬, ৩৫৯, ৯৮৮ (hundred weight) চাউল; ১, ৯১০, ৬২৬ ও ২, ৩৯২ ৬০৭, গম; ২, ৬৯৬, ২১৭ ও ২, ২৩২, ৬৯৪ (hundred weight), অন্যান্য শস্য রপ্তানি হয়। ১৮৯৯-১৯০০-দুর্ভিক্ষের এই বৎসরে,—৩১, ৮৬৯, ৫৯১, ৯, ৭০৪, ০৯৭ ও ৩, ০৭৬, ৪০৯ (hundred weight) রপ্তানি হয়। ১৮৯৮-৯৯ এই অনুকূল বৎসরে:—৩৭, ৩৯৭, ৪০১,—১৯২১, ৪৯৬ ও ৪, ৫১৩, ২০৮ রপ্তানি হয়। ঐ সকল বৎসরে শস্যের আমদানিও ছিল (১৮৯৭-৯৮) ১, ০৭২, ৪১৫ (hundred weight) মাত্র, (১৮৯৯-১৯০০)— , ৫০৯, ৫৭৫; (১৯০০-০১) ১, ৯৫৫, ০৯৫—পক্ষান্তরে সচরাচর স্বাভাবিক অবস্থার বৎসরে (১৮৯৪-৯৫) শষ্যের আমদানি হয় ৮৪৩, ৫২৩ hundred weight।

১৮৯৯-১০০—৯২২, ৭৮১, ৬৫৬ ও ১, ১৭০, ৩৯৭, ০৯২।

১৯০০-০১—£৭০, ৩১৪, ২৩৭, £৪১, ২৯৭, ৩০৭।

১৮৯৯-১৯০০—আমদানির অঙ্কে—মূল্যবান ধাতু ছিল £১৩, ৯৮২, ৪৫৭।

১৯০০-০১ অব্দে—£১৬, ৩৮৪, ৫০৮;

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে রপ্তানির অঙ্কে ছিল £৫, ৩০৪, ২৫৮।

১৯০০-০১ অব্দে রপ্তানির অঙ্কে ছিল £৯, ৪৮৮, ৯৩০।

১৯০০-০১ অব্দে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির অতিরেক (মূল্যবান ধাতু-সমেত) ছিল £১০, ৯৮৩, ০৭৩।

পক্ষান্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সমস্ত রপ্তানিই কাঁচা মাল এবং সমস্ত আমদানিই কারখানার তৈয়ারী জিনিস্।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত ভারত এখনো দুর্ব্বল, কুণ্ঠিত—ভারতের বিস্তার ও জন-সংখ্যার হিসাবে জগতের বিপণিতে যোগ্য আসন অধিকার করিতে এখনো সমর্থ হয় নাই।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

আধুনিক ভারতের বৈষয়িক অবস্থা ত এইরূপ। নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া পূর্ব্বেই আমাদের যে ধারণা হইয়াছিল এই বৈষয়িক অবস্থার আলোচনায় সেই ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে:—ভারত দরিদ্র।

*

* *

ইহার প্রমাণ আমরা দেখাইতেছি।

Lord Curzon অনুমান করেন, ব্রিটিশ ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ৪৫০ ক্রোর টাকা হইবে। কৃষি হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় গড়পড়তায় ২০৲ টাকা, উহার সহিত শ্রমশিল্পোৎপন্ন আয় যোগ করিলে, ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। অতএব গভর্ণমেণ্টের অনুকূল

হিসাব অনুসারেও, প্রত্যেক ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় গড়পড়তায় হয় ৫০ ফ্র্যাঙ্ক, কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, ভারতে ধন অত্যন্ত অসমানভাবে বিভক্ত এবং কৃষককে স্বল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

এই দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আছে। আয়ের উপর কর:—৪৮২, ৪৮২ ব্যক্তির আয় ৫০০ টাকার উপর, তন্মধ্যে ৮১,০৬৯ ব্যক্তির আয় ২০০০, টাকার উপর। আয়ের অঙ্ক সবগুদ্ধ ধরিলে ৫০, ৬৩০, ০০০ হয়।

ব্যাঙ্কের মূলধন ১৮৮৯ অব্দে নির্দ্ধারিত হয়;—ভারতে অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক-সমূহের মূলধন ৪৪, ০২৮, ৭১০ টাকা; ভারতের বাহিরে অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহের মূলধন ৮, ৯৪৪, ৯৬৩ পৌণ্ড।

সমস্ত যৌথ-কোম্পানীর (ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য, শ্রমশিল্প, নৌ-চালন, খনি, চাষ) মূলধন,—১৮৯৯-১৯০০ অব্দে,—২৩, ৬২৫, ৫৫০ পৌণ্ড মাত্র উঠিয়াছিল।

বেতন—(১৯০০) গড়পড়তায় কতকগুলা বেতনের হার দিতেছি:—রাজমিস্ত্রী, ছুতোর কিংবা কামার:—কলিকাতায় ১৮, হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত; দিল্লিতে ১৫, ৫।—কর্ম্মক্ষম বলিষ্ঠ বয়সের কৃষি-মজুর—কানপুরে ৩, ৫৬ হইতে ৫; দিল্লিতে, ৭, ৭৫; বোম্বায়ে ১১; নাগপুরে ৫।

*

* *

কিন্তু ভারতে গুরুতর রকমের দুর্ভিক্ষ পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে—ইহাই ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটা দারুণ প্রমাণ।

১৭৭০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত ২০ বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

শেষের দুর্ভিক্ষগুলার বিবরণ:—

মাদ্রাজ বিভাগে (১৮৭৭)। খুব সঙ্কটকালে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) ২, ২১৮,০০০ লোক সাহায্য পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতের দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবে হয় না, অর্থের অভাবেই হয়। ইংরেজি বাক্য-অনুসারে ইহা money-famine অর্থাৎ অর্থের দুর্ভিক্ষ। ভারতের চাষা এত দরিদ্র ও এত-কম মিতব্যয়ী যে তাহার কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে না। মাঝামাঝি ফসলের বৎসরের পর, যে বৎসরে একেবারেই ফসল হয় না, সে বৎসরে চাষা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে যে খাদ্য পাঠাইয়া দেন, চাষা তাহা ক্রয় করিতে পারে না। আবার সরকারও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন, তাহার অধিক নহে। সরকার ধার করিতে পারেন কিংবা টেক্স বসাইতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাজকোষ ঋণভারে ভারাক্রান্ত; এবং করের কথা যদি বল; ভূমি-করই একমাত্র কর যাহা উৎপাদক; কিন্তু সমস্ত দেশ কর-ভারে অতিমাত্র ভারাক্রান্ত। যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেই প্রদেশের সাহায্যার্থ, অন্য সমস্ত প্রদেশকে ত দুর্ভিক্ষে পরিণত করিতে পারা যায় না।

পুনঃ পুনঃ ধার করিতে না হয়, কর বাড়াইতে না হয়—এইজন্য সরকার "দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়াছেন; বিশেষ

বিশেষ-টেক্স হইতে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করা হয়। সররাচর বৎসরে, এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে রেল-পথ ও খাল তৈয়ারী হয়; যে সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বেশী, এই রেল-পথ ও খালের দ্বারা সেই সব প্রদেশে খাদ্য চালান দেওয়া হয়; এই ভাণ্ডারের কিয়দংশ ঋণ শোধ করিবার জন্য (এই ঋণের মুখ্য অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষের খরচের দরুণ) প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে কর্ম্মশালা খোলা হয়, এই কর্ম্মশালায় অভাব-ক্লিষ্ট দৈন্যগ্রস্ত লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের কাজ চালাইতে পারে।

১৮৯৭-৯৮ অব্দে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার হইতে ৩, ৫৪৮, ৫৯২ পৌণ্ড এবং ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪, ১৭৪, ৪২৮, পৌণ্ড সাহায্য দেওয়া হয়। ভারতের ন্যায়, ইংলণ্ডেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে প্রায়ই প্রভূত ব্যক্তিগত দান প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্ঘটনা

(১৭)

খেলায় হারিল বিজনকুমার, শরৎকুমারের কণ্ঠে উঠিল রাজকুমারীর ফুলমালা; ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন সুজন রায়। জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুত্রবধূ করিবেন—এই সংকল্পে কিছুদিন যে উপদ্রব-বাণ কার্ম্মুকাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আবার রীতিমত ভাবে তাহার বিক্ষেপণ-আয়োজন আরম্ভ হইল। নদীতে একটা নূতন চড়া পড়িতেছিল; সে চড়া যে রাজার জমীদারী-ভুক্ত, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই; আইন-আদালত বুঝিয়া এতদিন সুজন রায় নিজেই তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন; হঠাৎ এক রাত্রে রাজ-প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া এই চরের একাংশ নিজ এলাকাভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিস্ফল হইল; জিতিল রাজদলই,—কিন্তু উভয়পক্ষেই জখম হইল অনেক লোক। ইহার মধ্যে রাজসর্দ্দার বলবন্তসিং গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই সংবাদ পাইয়া দেওয়ানের সহিত পরামর্শে

(৪) সরকারের প্রতিপক্ষীয় লোকেরা বলে, পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এখন বেশী কিন্তু ইহা কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। পূর্ব্বে, যে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক অনশনে মরিত; সেই দুর্ভিক্ষকেই দুর্ভিক্ষ বলা হইত; আজকাল এইরূপ বলা হয় যে, বঙ্গদেশ ও অযোধ্যায় ১৯০০-০১ অব্দে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; তখন এই বৎসরেও উক্ত দুই প্রদেশের কোন প্রদেশেই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯০০-০১ অব্দে যে সকল প্রদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেখানেও অনশনে অল্প লোকই মরিয়াছিল! খারাপ খাদ্যের দরুন আমাশা, ওলাউঠা ও জ্বর হইয়া, এই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে, সঠিক বিবরণ-তালিকার অভাব ছিল; যে ওলাউঠায় মরিত, তাহার মৃত্যু দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর মধ্যে পরিগণিত হইত না, তাছাড়া লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মৃত্যু-সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্যাপৃত থাকায় আজ বিকালে যথাসময়ে রাজা গৃহে ফিরিতে পারেন নাই।

পিতাকে স্বাগত করিয়া লইতে সিঁড়ির ঘরে আসিবামাত্র, তাঁহার চিন্তা-বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সব কথা ভুলিয়া গেল। তাহার সৌৎসুক কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"বাবা!"

এই ক্ষুদ্র সম্বোধন-শব্দের মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিক আকুল প্রশ্ন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন—"চল্ রাণি, ঘরে গিয়ে সব কথা বলছি।" বলিয়া কন্যার স্কন্ধে স্নেহহস্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী হরকরাকে কহিলেন—"ডাক্তারকে ডেকে আন।" জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল,—"ডাক্তার-দা তোমার অপেক্ষায় বারান্দাতেই আছেন। তিনি কাল বাড়ী যেতে চান।"

পিতা, কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর শরৎকুমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"বস ডাক্তার। তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে যাও, কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি কই!" শরৎকুমারের মুখ হাস্য-প্রফুল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—"আমি ত যাবার কথা এখনো আপনাকে জানাইনি।"

—"মনের কথা মুখের অপেক্ষায় সব-সময় যে অব্যক্ত থাকেনা এই ত দায়। কিন্তু আপাততঃ একটা যে মহা দায়ে পড়া গেছে, তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

বলিয়া রাজা সংক্ষেপে তাঁহার লাঠিয়াল-গণের জখম হওয়ার বৃত্তান্ত বলিলেন। শরৎ কহিলেন—"রোগীর চিকিৎসা ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আপনি যদি সেজন্য আমাকে অমন করে অনুরোধ করেন ত লজ্জায় পড়তে হয়। আপনার হাসপাতালে এত প্রবীণ চিকিৎসক থাকতেও আপনি যে আমার মত নবীন চিকিৎসকের উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করছেন এতে ত আমিই কৃতজ্ঞ।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মন হইতে কিছু-পূর্ব্বের অপ্রসন্নভাব একেবারেই মুছিয়া গিয়াছিল; সে তাহার আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি শরতের মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া কহিল—"ডাক্তার-দা, আপনার বিনয়ের এক-কড়াও যদি পেতুম আমি!"

"বিনয় না রাজকুমারি, সত্যই আমি আপনাদের সদয় ব্যবহারে সর্ব্বপ্রাণে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া শরৎ সহসা থামিয়া গেলেন; ক্ষণপূর্ব্বে এইরূপ ভাষার পর রাজকুমারীর নয়নে, স্বরে, কথায় যে বিরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই—রাজার দিকে চাহিয়া শরৎ কহিলেন—"ঘটনাটা ঘটেছে কোন্ সময়? আঘাত পেয়েছে তারা কখন্?" রাজা কহিলেন—"শেষ-রাত্রি থেকে মারামারি সুরু হয়ে আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত চলেছিল।"

—"এ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষতস্থানে কোন ডাক্তারের হাত পড়েনি বোধ হয়?"

—"না। তবে লাঠিয়ালরা সাধারণতঃ নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করে। অনেক ডাক্তারের চেয়ে তাদের মধ্যে কেহ-কেহ এ-রকম ডাক্তারিতে বরঞ্চ বেশী পটু। তবে এবারকার দাঙ্গায় আমার লোকজনেরা তেমন প্রস্তুত ছিলনা; তাই বেশী লোকও

জখম হয়েছে আর দুএকজন বেশী রকম চোটও পেয়েছে। সর্দ্দারের অবস্থা এতই খারাপ যে তুমি আছ বলেই ভরসা হচ্ছে যে তবুও হয়ত বেঁচে যাবে।"

—"কিন্তু এ-রকম আঘাতের চটপট্ প্রতিবিধান আবশ্যক। আমায় কি সেখানে যেতে হবে?"

—"না। পাল্‌কী করে তাদের আনা হচ্ছে। এখনি এসে পড়বে।"

বলিতে বলিতে খবর পাওয়া গেল,—আহতেরা হাসপাতালে আসিয়া পৌছিয়াছে। নীচে মোটার প্রস্তুত ছিল—শরৎকে সঙ্গে লইয়া পবন-বেগে অবিলম্বে রাজাবাহাদুর হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্যান্য আহতদিগের শুশ্রূষা-ভার হাস-পাতালের চিকিৎসকগণের উপর দিয়া শরৎ সর্দ্দারের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন —তাহার এক-দিকের কণ্ঠাস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—মনে হয় যেন ভোঁতা খড়্গের আঘাতে স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রোগী অর্দ্ধ অচেতন। শরৎকুমার ক্লোরা-ফর্ম্ম দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ সুপ্ত করিয়া ক্ষত-স্থান ছেদনপূর্ব্বক সতর্কতা এবং তৎপরতার সহিত ভগ্নাস্থিগুলি যথাস্থানে পুনঃ-সংযোজিত করিয়া ঔষধাদি লেপনপূর্ব্বক সুনিপুণ-ভাবে বাঁধিয়া দিলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে তাঁহার হস্ত-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে একটা গোলযোগ উত্থিত হইল; রাজা তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, হাসপাতালে প্রবেশ-উদ্যত একজন বৃদ্ধ লোককে প্রহরী বাধা দিতেছে। রাজাকে দেখিয়া প্রহরী সেলামপূর্ব্বক স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সেই অবকাশে বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল —"হুজুর, ধর্ম্মাবতার! রক্ষা করেন, আমার ছাইলার মুখের চাপা (চোয়াল) ভাঙ্গা গেছে —ডাক্তরের নামডাক শুইনা আইছি।"

রাজা বুঝিলেন ইহারা বিপক্ষ-দলের লোক। কহিলেন—"কোথায় তোমার ছেলে?"

—"ঐ ডুলির মধ্যে গাছের তলায়; হুকুম হইলেই আনি!"

একজন কম্‌পাউণ্ডার একটু দূরে বারান্দারই এক-অংশে দাঁড়াইয়াছিল, সে রাজার পিছন হইতে বৃদ্ধকে মুখ-খিঁচাইয়া চাপাকণ্ঠে কহিল—"তোর জমীদারের কাছে যা না। যার শিল যার নোড়া—তার ভাঙ্গলেন মাথা,—আবার এখানে ডাক্তর দেখাতে এসেছেন—মলো যা!" তাহার সকল কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল না তবে সে যে বৃদ্ধকে ভর্ৎসনা করিতেছে—ইহা বুঝিয়া বলিলেন—"চুপ করহে! মনুষ্য-ধর্ম্মের নিকট পক্ষবিপক্ষ শত্রুমিত্র নাই। যাও সর্দ্দার তোমার ছেলেকে নিয়ে এস।"

দুর্ম্মুখ কম্‌পাউণ্ডার রাজাদেশেও আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখের কথা-গুলা চিবাইতে চিবাইতে অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"হ্যাঁ তারপর আরাম হয়ে আবার আমাদের রাজার বিরুদ্ধে লড়।" এই কথা বলিয়া রাজাকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপের অবসর না দিয়াই সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ব্যক্তি রাজার পা ধরিয়া কহিল—"রামাবতার! আপন এলাকায় আমাগো

একরত্তি ভিটা দিতে আজ্ঞা হয়—আমরা আর কোনখানে যামু না—চিরদাস হইয়া থাকিমু।”

রাজাজ্ঞায় তাহার পুত্র তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে আনীত হইল।

রাজ-সর্দ্দারের কণ্ঠের বাঁধন শেষ করিয়া শরৎকুমার বিপক্ষদলের লোকেরও চোয়াল ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হস্তাদি প্রক্ষালনের পর রাজাকে বলিলেন—“এদের ব্যাণ্ডেজ দুদিনের আগে আর খোলার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে আমার একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এলে ভাল হয়। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর যে-রকম ঔষধাদির দরকার—সে সব প্রায়ই এখানে কিছু নেই। আমি নিজে গিয়ে সে সব দেখে শুনে আনতে চাই। আজই রাতে যদি ছাড়ি তাহলে জিনিষ-পত্র নিয়ে ঠিক সময়েই আবার ফিরে আসতে পারব।”

তাহাই স্থির হইল। অনাদি নামে একটি বালককে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই শরৎকুমার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ফিরিবার পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রিকাল,—ফাষ্ট ক্লাশ ট্রেনের একটি কামরায় তাঁহারা দুইজনমাত্র আরোহী। অনাদি এক-প্রান্তের শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া, ষ্টেসন হইতে কেনা আট আনা মূল্যের ডিটেক্‌টিভ নভেল একখানা পাঠে মগ্ন; অন্য-প্রান্তের শয্যায় শুইয়া শরৎকুমার মুক্ত বাতায়ন পথে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কত উজ্জ্বল নিরুজ্জ্বল; কত পরিচিত অপরিচিত, একই তারকারাশি ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে রিয়া-ফিরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নয়নের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। গতির দ্রুততায় চেনা তারাগুলিকেও সহসা তিনি চিনিতে পারিতেছিলেন না। ‘ওরায়নে’র রাজ-সিংহাসনের অর্দ্ধেকখানা একবার তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন,—তাহার দুইটি নক্ষত্র পরিচিত সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে যেন সম্ভাষণ করিয়া গেল। শরতের নেত্র তখন ঘুমে ভরিয়া আসিতেছে—ঘুমের ঘোরে তাঁহার মনে হইল, উহার মধ্যে জলজ্বলে বড় তারাটি জ্যোতির্ম্ময়ী আর ছোটটি হাসি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তন্দ্রানিমীলিত নেত্রে সেই দুইটি তারা মিলিয়া-মিশিয়া এক-হইয়া গেল; —শরৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অর্দ্ধরাত্রে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেন থামিবা মাত্র একজন স্থূলকায় পাশ্চাত্য মূর্ত্তি সজোরে দ্বার খুলিয়া অনুবর্ত্তী ভৃত্যের সহিত কামরায় উঠিয়া পড়িল। মূর্ত্তিটি এতই রৌদ্র-দগ্ধ যে তিনি যে কোন্ জাতীয় জীব—অর্থাৎ খাঁটি ইয়োরপীয় বা ফিরিঙ্গি—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার ভৃত্য কামরার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ কুলির নিকট হইতে সাহেবের আসবাব-পত্র উপরে তুলিতে লাগিল। সাহেবের দৃষ্টি ঘুরপাক খাইতে লাগিল—নীচের শয্যা দুইটার উপর। বিজুলি-আলোকে দুইটা ‘বার্থই’ নিগার-অধিকৃত দেখিয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল—ইহাদের একটাকে অন্ততঃ বজ্রবলে ধরিয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করেন। সুখের বিষয় এই যে, এ যুগে—ইচ্ছামাত্রেই সুরাসুরেরও মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। পরিচিত ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া এ দুইটাকে যে গৃহ

বহিস্কৃত করিবার চেষ্টা করিবেন—তাহারও সময় নাই। তখনই গাড়ী-ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। ভৃত্য জিনিষপত্রগুলা কামরার এক পাশেই স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিয়া শয্যাটা উপরের বার্থের উপর ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সাহেবের নিজের হাতে ছিল একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ। তিনি সেটাকে অনাদির পায়ের কাছের খালি জায়গার উপরে রাখিয়া—তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর পুনরায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উপরের বেঞ্চ দুই হাতে ধরিয়া স্খলিত বাক্যে বলিলেন—“Sir Babooneau—will you get down.” তাঁহার মুখ হইতে তখন ভুর্‌ভুর্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। অনাদি জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতির মেম্বার, ইংরাজ ফিরিঙ্গি দেখিয়া সে দমিবার পাত্র নহে, সাহস দেখাইবার এমন সুযোগও কদাচিৎ ঘটে, সুতরাং সে নভেলখানা বন্ধ করিয়া—সাহেবের ব্যাগটার উপরে বেশ ভাল-রূপেই পা লম্বা করিয়া দিয়া বলিল—“Why should I get down, you sir pigledy? You may go out if you like!” বানরটায় স্পর্দ্ধায় সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। উপরের বেঞ্চ হইতে হাত নামাইয়া বিকৃত কণ্ঠে—“all right sir” বলিয়া তাহার প্রতি ঘুষি বাগাইলেন। অনাদি লাফাইয়া শয্যাত্যাগ করিল, কিন্তু সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সাহেবের এক ঘুষি তাহার মাথায় পড়িল। যদি সেই উদ্যত বজ্রমুষ্টি সুরাপানের ফলে হীনবল হইয়া না পড়িত, তবে অনাদির প্রাণরক্ষা দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই স্খলিত মুষ্ট্যাঘাতের বিনিময়ে সাহেবের মাথায় অনাদির যে সবল ঘুষি দুইটি পড়িল, তাহাতে সাহেব বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন।

তখন বাম হস্ত ঢালরূপে মুখের সম্মুখে রাখিয়া, ডান হস্ত বাড়াইয়া কহিলেন—“Beg your pardon sir—We are quits now, let us be friends.” পদানত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ ধর্ম্ম, সাহেবের আহ্বান-বাক্যে অনাদি প্রফুল্ল-ভাবেই হাত বাড়াইয়া দিল।

গোলমালে ইতিপূর্ব্বেই শরতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনাবশ্যক তৃতীয় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি নীরবে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যেমন মিটমাট হইয়া গেল অমনি তিনি অনাদিকে রুমাল ভিজাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিয়া সঙ্গের ব্যাগটা খুলিয়া ঔষধ বাহির করিলেন। সাহেব এ-সময়েও নিজের ব্যাগটার কথা ভোলেন নাই; তাড়াতাড়ি সেটা অনাদির বেঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া, শরতের পরিত্যক্ত শয্যায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—আর শরৎ সুনিপুণ হস্তে তাঁহার আহত মস্তকে পটি বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তাহাকে কহিলেন—“আমি বরঞ্চ উপরে যাইতেছি আপনি এইখানেই শয়ন করুন।”

শরৎ উপরে উঠিলেন; নভেল পড়িবার প্রবৃত্তি আর অনাদির তখন ছিল না,—বইখানা বালিসের নীচে গুঁজিয়া সেও শুইয়া পড়িল। সাহেব বিনাবাক্যব্যয়ে কিছুক্ষণ সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাহার পর

ব্যাগটা খুলিয়া একটা শিশির তীব্র উপাদান —একনিঃশ্বাসে পান করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। কামরা আবার নীরব হইয়া পড়িল।

খানিক পরে অনাদির মনে হইল,—তাহার বুকের উপর যেন পাথরের ভার চাপিয়াছে—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। অতি কষ্টে ঘুমের ঘোরেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল,—সাহেব দুই হাতে তাহার বক্ষ চাপিয়া বলিতেছেন—"You savage, you niggard, you dared to insult me! Don't you know who I am! My nick-name is Satan!"

অনাদির তখন সকল শক্তি অবসিত, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে লোকের যেরূপ অবস্থা হয় সেইরূপ অবস্থা,—দারুণ কষ্টের একটা চেতনা ছাড়া অন্য কোনরূপ জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় সে অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শরৎকুমার সে শব্দে সহসা জাগরিত হইয়া—লাফাইয়া নামিয়া পশ্চাৎ হইতে সাহেবের কোট ধরিয়া সজোরে টানিলেন। সাহেব পড়িতে-পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে দরজার কাছে তাহার ফুলগাছের টুক্‌রিতে একখানা কুক্‌ড়ি বেঁধান ছিল; সেই কুক্‌ড়ি খানা তুলিয়া লইয়া বাঘ যেমন মুখের শীকার ফেলিয়া আক্রমণকারীকে দেখে সেইরূপ ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখনও নেশায় তাঁহার পা টল মল করিতেছিল, হাতেরও জোর ছিল না সুতরাং কুক্‌ড়িখানা কাড়িয়া লওয়া শরতের পক্ষে কঠিন হইল না। তবে পিঁপড়ারও মরণ-কামড়ের জোর আছে, সাহেবের স্খলিত হস্তের আক্রমণও একেবারে ব্যর্থ হইল না। টানাটানির সময় কুক্‌ড়ির অগ্রভাগ শরতের হাতের কব্জার উপর একটু বিঁধিয়া গিয়া দুএক ফোঁটা রক্ত পড়িল। কুক্‌ড়িখানা জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শরৎ বাথরুমে গিয়া হাতটা জলের নীচে রাখিতেই রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে আসিয়া দেখিলেন, —সাহেব তাঁহার শয্যায় শুইয়া স্খলিত বচনে অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতেছেন আর অনাদি যেন তখনো ঠিক সচেতন হইয়া উঠে নাই; কেমন যেন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। তাঁহার ভয় হইল—হয়ত বা সে বক্ষে বিশেষ আঘাত পাইয়াছে। নিজের হাতের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তাঁহার স্পর্শে অনাদির সে মোহভাব কাটিয়া গেল; তিনি তখন প্রফুল্লচিত্তে তাহার কপালে আর্দ্র হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে ভৃত্য আসিয়া সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ করিল। প্রসাদপুরের একটা ষ্টেশন আগে বিষাদপুর—সেইখানে তাহারা নামিয়া গেল। শরৎ পরে জানিলেন—এই ফিরিঙ্গিপুঙ্গব বিষাদপুর-সরকারের আসাম-টি-ষ্টেটের দুর্দ্দান্ত ম্যানেজার।

(১৮)

অনাদি বাড়ী আসিয়া, ট্রেনের বিপদের ঘটনা বেশ মজাইয়া-জমাইয়া যখন-তখন রাজকুমারীর নিকট গল্প করে। সেই এক কথা কতবার শুনিয়াও রাজকুমারীর বিরক্ত ধরে না; তিনি শুনিয়া হাসেন, কৌতুক

অনুভব করেন; অনাদির গল্পের ভাষায় প্রতিবারই তিনি একটু নূতন রং দেখিতে পান।

আজও সেই কথাই হইতেছিল। রাজকুমারী কহিলেন—"তুমি যে অনাদি-দা রাঙা মুখ দেখে ভয় পাওনি,—তার অব্যর্থ মুষ্টিকেও ব্যর্থ করেছ—এতে আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে—কি বলব?"

অনাদির বয়স অষ্টাদশ কিন্তু ধরণ ধারণে, ভাবে, সে আরও ছোট। রাজকুমারীর প্রশংসায় সে আহ্লাদিত হইয়া কহিল—"দেখ রাজকুমারি ভাই—তোমার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি কি না?"

—"তা যদি না করতে ত তোমার সঙ্গে জন্মের আড়ি হোত। কোনো সাহসের কাজে আমার ভাইদের আমি মরতে দেখলেও খুসী হব—কিন্তু—"

—"তোমার ভাগ্যে সে সুখটা ঘটতে ঘটতে রয়ে গেছে দিদি; যদি ডাক্তারদা না থাকতেন ত নিশ্চয়ই সে সাপটা আমাকে মেরে ফেলত। দেখ ভাই রাজকুমারি, ডাক্তারকে যতই আমি দেখছি, চিনছি ততই তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা বাড়ছে। একটা কথা বলব ভাই?"

—"বল না অনাদি-দা।"

—"তুমি কিন্তু হাসবে। বল হাসবে না?"

—"বেশ হাসবনা,—বল তুমি।"

—"আমার মনে হয় কি জান? আমি যদি স্ত্রীলোক হতুম ত ডাক্তারকে নিশ্চয়ই বিয়ে করতুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শপথ-সত্ত্বেও হাসিয়া কুটিকুটি হইল। অনাদি সলজ্জে কহিল—"আমি জানি তুমি হাসবে! আচ্ছা তবে ও কথা যাক,—সেই সাপটার কথা শোন। সত্যি সত্যি এতদিন পরে ইভের direct বংশধরের আমি দেখা পেয়েছি। যেই ঘুসি চালালুম অমনি beg your pardon, তারপর যেই ঘুমিয়ে পড়েছি অমনি ছোবল্। এ রকম লোক সংসারে আছে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না!"

—"সাহেব কিন্তু তোমাদেরই অপরাধী করে নালিস করেছে শুনছি!"

—"সত্যি নাকি? রাজা-মামা নালিস-ফরীদ ভালবাসেন না—নইলে আমাদেরই ত নালিস করার কথা। সে সাপের বাচ্ছা নালিস করে কোন্ সাহসে?

—"সাপের বাচ্ছা এই সাহসেই।"

—"তা বেশ! মরবার আগেই পিঁপড়ার পালক গজায়! যখন হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটার টানে তাঁকে শ্রীঘর গর্ত্তে চালান্ দেবে তখন আমরা ঘরে এসে পিক্‌নিক্ করব, কি বল ভাই রাজকুমারি?"

রাজকুমারী হাসিয়া এই বাক্যের অনুমোদন পূর্ব্বক আগে হইতেই সে মকদ্দমার ডিক্রি ডিশমিশ জারি করিয়া সেদিনকার মত এ-গল্পের উপসংহার করিলেন।

সে ফৌজদারী মকদ্দমা দুই চারিদিনের মধ্যেই শেষ হইল; কিন্তু ফল দাঁড়াইল ঠিক বিপরীত। বিচারে অনাদির পক্ষেরই হার হইল! বিচারক সবডিভিজনের মুন্সেফ সুজন রায়েরই সম্পর্কীয় লোক; তাঁহার রায়ের প্রধান যুক্তি ইংরাজ মিথ্যা বলেনা।

এই যুক্তি-সমর্থক প্রমাণও তিনি যথেষ্ট দেখাইলেন। প্রথমতঃ, সাহের অনাদিকে বিছানা হইতে উঠিতে বলায়—অনাদি যে তাঁহাকে ঘুষি মারিয়াছিল তাঁহার স্ফীত কপাল এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যে কুকড়িখানা তিনি শরৎকুমারের হাত হইতে টানিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে কুকড়ি খানাও যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। একথাও যে সাহেবের বানানো কথা নহে—ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। অতএব ইহারা দুইজনেই অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ যুক্তির বলে মুন্সেফ-মহাশয় সামান্য মারামারির (assaulting charge) অপরাধে অনাদির সশ্রম একমাসের কারাবাস ব্যবস্থা করিলেন; আর শরৎকুমারকে খুন অভিপ্রায় জনিত (culpable homicide) গুরুতর দোষে দোষী করিয়া সশ্রম পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। জামিনে অবশ্য তাঁহারা উভয়েই আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্বিচারের জন্য তাঁহাদের দরখাস্ত পড়িল।

মুন্সেফের বিচারে রাজা আশ্চর্য্য হইলেন না,—কিন্তু বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষোভ বিস্ময় এবং ক্রোধের সীমা রহিল না। বিচারক যিনি, তিনি ত নিরপেক্ষরূপে সত্য বিচার করিবেনই—ইহাই তাহার বিশ্বাস। ক্লাউডেন সাহেবের আদর্শে এ সম্বন্ধে তাহার মতামত রচিত হইয়াছে। আর নিজের দেশের লোক হইয়া মুন্সেফ মহাশয়—এরূপ অবিচার করিলেন!

কেবল ক্ষোভ নহে—ইহার সহিত একটা লজ্জার ব্যথা একটা নৈরাশ্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

ব্যায়ামশিক্ষার কি ফল, যদি দেশের লোকের নৈতিকবল, ধর্ম্মবল না থাকে? যে দেশের কাব্য-গাথা, পুরাণ-ইতিহাস সত্যের, ন্যায়ের জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেশের লোকের আজ এত অধোগতি! তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার উঠিল। দুরাশা! দুরাশা! তাহার চারিদিকে কর্ম্মনাশা দুর্ভেদ্য অন্ধকার! দুষ্কৃতি-তরঙ্গময় সাগর দুস্তর,—! সাধ্য নাই তাহার সাধ্য নাই, তরণী রক্ষা করিতে সাধ্য নাই তাহার!

রাজ-লাইব্রেরিতে থিয়সফিষ্ট পত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ-কাল জ্যোতির্ম্ময়ী ক্রমাগত তাহাই পড়ে, পড়িয়া একজন জাগ্রত গুরু পাইবার জন্য মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগে!

সে আজ কাতর প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাহিয়া করযোড়ে মনে-মনে কহিল—"ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ণধার, কোথায় তুমি কোথায়? আলোক দেখাও, গুরুবেশে—ধ্রুব-তারারূপে উদয় হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল তুমি—এই দুর্ব্বলা শক্তিহীনা ক্ষুদ্র নারীকে।" মেঘভেদ করিয়া একটি জ্যোতি-রেখা যেন সহসা তাহার নয়নে চমকিয়া উঠিল।

* * * *

এই কষ্টের উপর তাহার আর একটা কষ্টের কারণ ঘটিল। কোর্ট হইতে ফিরিয়া শরৎকুমার প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইলেন। 'Physician heal thyself' এই প্রবাদ-বাক্যের উপদেশ এখানে সার্থক হইল।

দাঙ্গাহেঙ্গামায় আহত রোগীগণ শরতের চিকিৎসায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে—তাহার নাম-যশ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ট্রেনে নিজের হাতে কুকড়ির যে আঘাত লাগিয়াছিল—সামান্য বোধে তাহা অগ্রাহ্য করায়—হঠাৎ কয়েক দিন পরে তাহার বিষময় ফল দেখা দিয়াছে। তাঁহার উপদেশ অবলম্বন করিয়াই রাজচিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। সম্ভবত কোন রোগযুক্ত পশু-বধের পর কুকড়িখানা ভালরূপে পরিস্কার করা হয় নাই সেইজন্য বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং শরৎকুমার সুস্থ সবল বলিয়াই ইহার আঘাতের ফল যথাশীঘ্র প্রকাশ পায় নাই;—ডাক্তারেরা এইরূপই মনে করিতেছেন।

অস্ত্র করার পর শরতের অবস্থা প্রথম দিন খুবই খারাপ ছিল; দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত ভাল—কিন্তু এখনো আশানুরূপ ভাল নয়। সকলেই চিন্তিত; রাজা, রাজকন্যা উভয়েই এ ঘটনায় নিতান্ত অসুখী। সেবার ত্রুটি নাই,—অনাদির সহিত আরও দুই একটি বালক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। কিন্তু অনাদি যেরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, মাতা ভগিনী স্ত্রীও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সেবা করিতে পারে না। দ্বিতীয় রাত্রিও কোনরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা প্রফুল্ল মুখে ভরসা দিয়া গেলেন। রাজা গৃহে গিয়া অনেক দিনের পর সেই রাত্রিতে কবিতা লিখিতে বসিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ী অন্যদিনের ন্যায় সেদিনো সেই সময়ে ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহে তখন অনাদি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে নিকটে আসিয়া বলিল—"আসবে দিদিমণি ঘরে?—কেউ নেই এখন,—এস।"

বালিকা বলিল—"একটু ভাল দেখছ—অনাদি?"

—"নিশ্চয়। আজ আর তেমন ছটফট করছেন না,—তেমন অচেতন-ভাবও নেই,—সহজভাবে যেন ঘুমচ্ছেন।—এস না রাণি দিদি ঘরে—আজ দেখে খুসী হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। রোগীর মুখ প্রশান্ত—তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তন্দ্রাঘোরে বলিলেন—"হাসি তুমি? আর ঐ তারাটি—ঐ উজ্জ্বল—তোমার চেয়েও উজ্জ্বল বড় তারাটি—কে ও? চেন না,—হাসি? জ্যোতির্ম্ময়ী উনি—রাজকুমারী।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল;—তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রোগীর কপালে স্নেহহস্ত বুলাইলেন; সে স্পর্শে শরৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন—রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু দুর্ব্বল কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন—"তুমি রাজকুমারি?" রাজকুমারী অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিলেন—"চিনিয়াছেন?" একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শরৎ কহিলেন—"চিন্‌ব না কেন? আমার কি হয়েছে?"

তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করায় রাজকুমারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন—"কিছু হয় নাই,—কিন্তু উঠবেন না—আপনি ঘুমোন—আমি যাই।"

"যাবেন না রাজকুমারি—বসুন আপনি।" তাহার রুগ্ন কণ্ঠ একান্ত অনুরোধপূর্ণ।

অনাদি নিকটে একখানা চৌকি আনিয়া দিল,—জ্যোতির্ম্ময়ী বসিলেন। শরৎ বলিলেন—"রাজকুমারি?"—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী ভীত স্বরে কহিলেন,—"ডাক্তার দা?" শরৎ আবার কথা কহিলেন,—বলিলেন—"রাজকুমারি—বড় দুর্ব্বল—বড় একলা মনে হচ্ছে,—আপনার হাতখানি দিন।" রাজকুমারী তাহার হাতখানি ধরিলেন,—অশ্রুতে সে হাত সিক্ত হইয়া উঠিল; অনাদিও বালকের ন্যায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

পরদিন শরৎকুমারের জ্বর ত্যাগ হইল; —বিপদ-মেঘ কাটিয়া গেল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বাংলার ব্রত

(৫)

ব্রতের ছড়াগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার যে যোগ, ব্রতের আল্‌পনাগুলির সঙ্গেও ঠিক সেই যোগটিই দেখা যায়। কতকগুলি ছড়া রয়েছে কেবল কামনা উচ্চারণ করাই যার কাজ—

বাঁশের কোঁড়া, শালের ঢোঁড়া,
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি;—
আমি যেন হই রাজার ঝি।

কিম্বা—

আমরা পূজা করি পিটালীর চিরুনি।
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
ইত্যাদি।

আর-কতকগুলি ছড়া, যার উদ্দেশ্য শুধু কামনাটা উচ্চারণ নয়, কাজের জন্য যেটুকু তার চেয়ে অনেকটা বাজে সুর-সার, চলা-বলা তাতে রয়েছে;—যেমন দেখলেম মাঘমণ্ডল-ব্রতের সূর্য্যের বিয়ের ছড়াগুলিতে। আল্‌পনাগুলি তেম্‌নি দেখি দুই শ্রেণীর। একরকম আল্‌পনা—সেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্ত্তি,—কতকটা ইজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো। এই সব আল্‌পনায় মানুষ নানা অলঙ্কারের কামনা করে পিটুলীর সব গহনা এঁকেছে। সেঁজুতী-ব্রতের আল্‌পনায় ঘর-বাড়ি, চন্দ্র-সূর্য্য, সুপুরীগাছ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর সবই মানুষ এঁকেছে কিন্তু এদের তো শিল্পকার্য্য বলে ধরা যায় না—এগুলি মন যা চায়, তারি মোটামুটি মানচিত্র। কিন্তু এই যে নানারকমের পদ্ম মানুষ কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেছে, কিম্বা এই যে কলা-লতা খুন্তি-লতা শঙ্খ-লতা চাল্‌তা-লতা প্রভৃতি লতামণ্ডন, এই যে নানারকম আসনের পিঁড়ি-চিত্র এগুলি মণ্ডনশিল্প,—মানচিত্র নয়। যেখানে অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি, সেখানে শুধু অন্নের বাটিগুলি যেমন-তেমন করে এঁকে দিলেই কামনা সফল হতে পারতো, কিন্তু তা নয়; মানুষ সেখানে দেখছি অনেক লতাপাতা এঁকে পিঁড়িখানিকে সুন্দর করতে

চেয়েছে,—কাজের অতিরিক্ত অনেকখানি লেখা তাতে রয়েছে। তারপর এই "তারা-ব্রতের" সূর্য্য, চন্দ্র, তারা—এরা কিছুর অনুকরণ নয়; শিল্পীর কল্পনা থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। পিঁড়িগুলিতে কামনার প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেয়ে কারিগরি করবার ইচ্ছাটাই প্রবল দেখা যাচ্ছে। আর, বছরের শেষে পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে "পৃথিবী-ব্রতের" এই যে আল্‌পনাখানি,—নরনারীর জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস নিয়ে পদ্মপাতার উপরে একবিন্দুর মতো এই যে টল্‌টল্ একটি সৃষ্টি—এটিকে তো কি পরিকল্পনার দিক দিয়ে, কি কারিগরির দিক দিয়ে মানচিত্র কিছুতে বলা যায় না। পূর্ব্বকালে মানুষ যে-কোনো-কারণে-হোক্ মনে করতো যে-জিনিষ সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিম্বা তার প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ করবে। সে-হিসেবে আল্‌পনায় জিনিষটির প্রতিরূপ দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখছি মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না —যতক্ষণ-না শিল্পসৌন্দর্য্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা পরিতৃপ্তির পক্ষে আল্‌পনা সুন্দর হল কি না হল তাতে বড় আসে-যায় না।

এই যে লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনাতে মানুষ বিচিত্র-রকমের পদ্মফুল এঁকেছে, একটির সঙ্গে যার আর-একটির মিল নেই—এমন-কি আসল পদ্মফুলের সঙ্গেও নয়, এরি বা উদ্দেশ্য কি? মানুষের মনে কোথায় একটা গোপন উৎস রয়েছে, যেখান-থেকে এই-সব আল্‌পনা নতুন-নতুন এক-একটি সৃষ্টির বিন্দুর মতো বেরিয়ে আস্‌ছে? ব্রতের আল্‌পনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ-একটি যোগ রয়েছে—কিন্তু অন্তরের কামনার সঙ্গে বাহিরের চেষ্টার যোগ থাকলেই যে সব-সময়ে শিল্প-আকারে কাজটা দেখা দিচ্ছে তাতো নয়; বরং দেখি কামনা আর তার সিদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যত কম অবসর এবং বাধা ততই মানুষের ক্রিয়া সুন্দর হয়ে দেখা-দেবার সুবিধা পাচ্ছে না।

শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বশে যাই করি তাইতো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা-জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা, কি নৃত্যকলা দুয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধু আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্যে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজে সাজ্‌ছি ঘর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুটিনাটি কাজে, এটা-ওটা জিনিষে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। এ-সময় মানুষ সুন্দর-অসুন্দর বেছে নেবার

সময় পায়, যেমন-তেমন করে একটা-কিছু করবার চেষ্টাই থাকে না। হঠাৎ যদি বাঘ এসে সাম্‌নে পড়ে তবে তার গায়ের চিত্র-বিচিত্র ছাপ, তার গঠনের সৌন্দর্য্য, এ-সব কিছুই চোখে পড়ে না; ভয় এবং পালানো তখন এতই কাছাকাছি আসে যে সৌন্দর্য্য বোধ করবার অবসর মন পায়না বল্লেই হয়। কিন্তু খাঁচার ওদিকে বাঘ, এদিকে আমি; কিম্বা দূরে বাঘ লাফিয়ে চলেছে; তখন আবেগ আর ক্রিয়ার মাঝে অনেকটা অবসর; সেখানে বাঘের নানা সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে।

ব্রতের অনুষ্ঠান, শিল্পের উৎপত্তির অবসর কেমন করে এনে দিচ্ছে সেটা দেখা যাক্। ব্রত-আচরণ আর শিল্প-ক্রিয়া—দুয়ের যে নৈকট্য দেখা যায়, তাতে করে দুয়েরই উৎপত্তি যে মানব-মনের একই প্রবৃত্তি থেকে, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাক্‌ছে না। দুয়েরি মধ্যে দেখছি একটা জিনিষ রয়েছে, যা দুইকেই চালাচ্ছে। সেটি হল কামনার আবেগ। যা কামনা হল, তাই পেলেম তখনি,—এ হলে ব্রত হল না। আবেগ থাকা চাই—যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। এই হল ব্রতের মূল কথা।

ব্রতগুলির মধ্যে এই আবেগটির অবসর কোন্‌খানে রয়েছে দেখবো। এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ যখনকার যা, তখনকার জন্যে ব্রত করছেনা। ভবিষ্যতের একটা-কিছু পাবার জন্যেই ব্রতগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখি। 'গঙ্গা শুকুশুকু, আকাশে ছাই'!—সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে 'বসুধারা ব্রতের' অনুষ্ঠান। এই যে জ্যৈষ্ঠের সারা-মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে—এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ার প্রকাশ হবার জন্য। এম্‌নি যখন খুব জল—আষাঢ় শ্রাবণ দুইমাস—তখন কুমারী-ব্রত নেই। এর পরে ভাদ্র মাস পড়তেই শরতের দিনগুলির জন্যে ব্রত সুরু হল। শস্য হবে, যারা বাণিজ্যে গেছে তারা ফিরবে—এম্‌নি সব নানা কামনা 'ভাদুলী-ব্রতটি'র মধ্যে নাট্যকাব্য হয়ে দেখা দিলে এবং আশ্বিনের শস্য-উৎসবে তার পরিসমাপ্তি হল। এম্‌নি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি কামনা অনেকদিন পর্য্যন্ত—কোথাও একমাস কোথাও বা দুইমাস—অতৃপ্ত থাকছে—চরিতার্থতার পূর্ব্বে। শস্য-ফল্‌বার আগেই শস্য-উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য—এম্‌নি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল। চিত্র করতে হলে বড়-শিল্পী তো যেমন দেখলেন, তেম্‌নিটি আঁক্‌লেন না। দেখলেন, দেখে সেটা মনে রাখলেন, এবং হয়তো দেখার থেকে অনেক পরে সেটাকে মন থেকে প্রকাশ করে দিলেন,—দেখা ও প্রকাশ-করার মাঝে যে-সময়টা, সেই হল যথার্থ শিল্প-কাজের অনুকূল। দেখলেম, কল টিপলেম—ফটো উঠলো, এ হলে জিনিষটা ঠিক অনুকরণ করা গেল বটে কিন্তু শিল্প বলতে অনুকরণের চেয়ে বড় যে-জিনিষটা তা হল না। ব্রতের আল্‌পনাতেও তেম্‌নি। সোনার চিরুনি চাই, পিটুলীর চিরুনি এঁকে ব্রত

করলুম। এখানে আল্‌পনায় অনুকৃতি পর্য্যন্ত রইলো। কিন্তু আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী ধানের ক্ষেতের মধ্যে দেখা দেবেন কিম্বা বসন্তে ফুল ফুটবে, সূর্য্য উঠবে—এই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি যখন মনকে তোলাপাড়া করে রয়ে-বসে প্রকাশ হতে চল্লো, তখনি দেখি বিচিত্র-আল্‌পনায় পদ্ম, লতা, পাতা; সূর্য্যোদয়ের নানা রূপক ও ছড়া এবং ফুলের ডালার গান, আমের মুকুলের গান; নানা রঙ্গ-রস।

আল্‌পনা যে কত সুন্দর এবং কত রকমের, তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্টস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিষ মেয়েরা না-শিখেই লিখছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণীবিভাগ করলে আল্‌পনার ফর্দ্দটা এই রকম দাঁড়ায়:—প্রথম—পদ্মগুলি। দ্বিতীয়—নানা লতা-মণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়—গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদি। চতুর্থ—নদ, নদী ও পল্লী-জীবনের দৃশ্য। পঞ্চম—পশু-পক্ষী মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ—চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সপ্তম—আভরণ ও নানা আসবাব। অষ্টম—পিঁড়ি-চিত্র।

আল্‌পনার শিল্প হচ্ছে সমতল-ভিত্তিকে চিত্রণ, এবং যা আঁকছি তার পরিষ্কার চেহারাটি দেওয়া। হাতা হাতার মতো না হয়ে হাতের মতো হলে চলেনা—ব্রতের কাজে। একটা জিনিষের ঠিক চেহারাটি দু-চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা চিত্রকরমাত্রেই জানেন। একজন এম্‌এ ক্লাসের ছাত্রকে তার হাতের কলমটা আঁক্‌তে বল্লে সে মাথায় হাত দিয়ে বসবে, কিন্তু তারি হয়তো পাঁচবছরের ভগিনীটি এই আল্‌পনার সব-ক-খানা অনায়াসে এঁকে যাবে নির্ভুল—হাতা, বেড়ি, গহনা, ফুল, পাতা, সবই। মানুষ আর জানোয়াদের বেলায় মেয়েরা একটু গোলে পড়েছে। কিন্তু এ-ছাড়া যেখানে কল্পনা-খাটানো চলে এমন-সব বড়-বড় আল্‌পনা এবং নানা লতা ও পাড়ের আবিষ্কারে তারা সিদ্ধহস্ত।

সুবচনী-পুজোর আল্‌পনাটিকে আমরা সুবচনী-ব্রতকথার প্রতিরূপ-চিত্র বলে ধরতে পারি। রাজার পুকুরে অনেক হাঁস। তার সর্দ্দার ছিল এক খোঁড়া-হাঁস। এক ব্রাহ্মণ-কুমার সেই খোঁড়া-হাঁস মেরে খেয়েছিল এবং সুবচনীর কৃপায় তার মা সেই হাঁসকে বাঁচিয়ে তবে রাজার কোপ থেকে নিস্তার পেয়েছিল। এই গল্পটাকে দেখাচ্ছে এই সুবচনীর আল্‌পনা। সেজুতীর আল্‌পনা, ভাদুলী-ব্রতের নদী ও তালগাছ—এ-দুটির মধ্যেই নিছক কামনা জানানোর চেয়েও একটু বেশি কাজ মানুষে করেছে;—কোঁচা-দুলিয়ে সুপুরীবাগানে কর্ত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোড়া-বাংলার দরজায় দুই সেপাই পাহারা দিচ্ছে। এই সুপুরী-বাগানের কর্ত্তার সঙ্গে হাতে-পো কাঁখে-পো মানুষের প্রতীকটির অনেক তফাৎ। যদিও খুব কাঁচা-হাতের কিন্তু কর্ত্তার ছবিতে বাস্তবিকতা অন্যটির চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে। এম্‌নি নদীর আল্‌পনা। এখানে গ্রামের মাঝ দিয়ে যে-নদীটি বয়ে চলেছে, তার বাস্তবিক চেহারাটা দেবার চেষ্টাই নেই; সমস্ত দৃশ্যটি একটি সুন্দর মণ্ডন-হিসেবে চিত্রকারিণী দিয়েছেন। এর পর, বাঁশের কোঁড়া—শালের কাজের মতো। তারপর নানা মন্দিরের

আল্‌পনাগুলি; এগুলিকে খাঁটি মণ্ডন-চিত্র বলা যেতে পারে, যদিও এগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব যোগ। কিন্তু তাই বলে এগুলি যেমন-তেমন করে মানুষে আঁকেনি। মন্দিরের কারুকার্য্য, তার গঠনের তারতম্য, চিত্রকারিণী প্রত্যেকদিন নজর করে দেখে-দেখে তবে মন থেকে এগুলি প্রকাশ করেছেন বেশ বোধ হয়।

পদ্মের আল্‌পনাগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব কমই যোগ দেখা যায়। দু-রকমের পদ্ম দেখা যাচ্ছে। প্রথম-শ্রেণীর পদ্মগুলিতে পদ্মের বাস্তব-আকৃতি কতকটা দেওয়া হয়েছে এবং জ্যামিতির ঘরগুলিকে পদ্মের আকারে বাঁধা হয়েছে। কোনো-কোনো জায়গায় পদ্মের সঙ্গে শঙ্খ জুড়ে সেটিকে লক্ষ্মীর আসন বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যে-সব অষ্টদল পদ্ম এবং সেই-সব পদ্মকে ঘিরে যে-সব নানা লতামণ্ডন, সেগুলিকে মণ্ডন ছাড়া আর কি বলা যাবে? বারো-রকম লতায় ঘিরে আল্‌পনা বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠানে লেখা হয়! কন্যার বাড়ীতেও এই রকম একটি বৌ-ছত্র দেবার নিয়ম। এগুলো ব্রতী বা ব্রতের নয়। বোম্বাই অঞ্চলে অতিথির সম্মানের জন্যে ভোজনের জায়গাটি রঙ্গোলী (আল্‌পনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা। উৎসবের দিনে বিশেষ-ব্যক্তির সম্মানের জন্যে যে সাজানো-গোছানো করতে হয়, এই আল্‌পনাগুলিকে সেই কোঠায় ফেলাই ঠিক। বোম্বায়ের অতিথি-অভ্যর্থনার জন্যে যে-আল্‌পনা তারি কতকটা প্রতিরূপ হচ্ছে আমাদের নববধূ-আগমনের পান-সুপারী-লেখা আল্‌পনাটি। এই ধরণের আল্‌পনাগুলির সঙ্গে মনের নানা ভাবের যোগ থাকলেও এগুলি ব্রতীর কামনা জানাচ্ছেনা। লক্ষ্মীর আসনে শঙ্খ, ইন্দ্রের আসনে বজ্র, আবার অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে নানা ব্যঞ্জনের বাটি আর বর-কণের পিঁড়িতে 'একবৃন্তে দুই ফুল'—এগুলো প্রধানত জানাচ্ছে আসনের পার্থক্য;—এটি দেবীর, এটি দেবতার, এটি নবকুমারের, এটি বরবধূর। এবং ব্যক্তিবিশেষের রুচি-অনুসারে এই-সব আল্‌পনায় অদল-বদল হয়। যেমন, বিয়ের পিঁড়িতে পদ্ম ও ভ্রমর ইত্যাদিও চলে; এবং এই অদল-বদলে বিবাহাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত হয় না। এমন কি, পিঁড়িতে খানিক পিটুলী-গোলা মাখিয়েও কাজ চলে। কিন্তু ব্রতের আল্‌পনা ব্রতীর কামনার পরিস্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠলো, তারপর সেটা আল্‌পনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে সেটা ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তারপর আল্‌পনা, তারপর ছড়া; শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস—এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেলে।

মেয়েলী ব্রতের কথাগুলি কেমন সেটা দেখবার পূর্ব্বে আল্‌পনার শঙ্খলতা-মণ্ডনটির বিষয়ে একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আল্‌পনার সমস্ত লতামণ্ডনগুলিতে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে সেগুলি মেয়েরা নিজে-থেকেই আবিষ্কার করেছে, এবং এক বাংলার আল্‌পনা ছাড়া, কি মান্দ্রাজে, কি বোম্বায়ে, কোথাও এত সুন্দর এই ধরণের

লতামণ্ডন দেখিনি। মান্দ্রাজের দড়ির কাঁস এবং বিন্দুই আল্‌পনা-চিত্রের ভিত্তি। কিন্তু বাংলার মেয়েরা প্রকৃতির মধ্যে যে-সব পাতা-লতা, তাকেই ভিত্তি করে আল্‌পনার কলালতা, কল্‌মীলতা, খুন্তিলতা, চাল্‌তালতা, চাঁপালতা, শঙ্খলতা সৃষ্টি করেছে দেখি। শঙ্খের ঘোর-পেঁচগুলি প্রাচীন গ্রীস ও ক্রীটদেশের একটি প্রধান মণ্ডন। কিন্তু এই বাংলাদেশের শঙ্খলতায় শঙ্খের স্বরূপটি যেমন সুস্পষ্ট এমন আর কোনো দেশেই নয়। এই শঙ্খলতার ঘোরপেঁচ শঙ্খ থেকে কি জলের আবর্ত্ত থেকে সেটা ইউরোপের মণ্ডনগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় না এবং এ নিয়ে সেখানকার পণ্ডিতে-পণ্ডিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। কোনো পণ্ডিতে বলেন এই লতামণ্ডন প্রথম ইজিপ্তে; কেউ বলেন ক্রীটদেশে; আবার কেউ বলেন ইউরোপ-খণ্ডে গ্রীসদেশেই এর প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু কোথাও বাংলার মতো শঙ্খলতার নিখুঁত চেহারাটি আমরা পাইনে। ক্রীট, ইজিপ্ত এবং গ্রীস—সব থেকে দূরে এই বাংলাদেশ, এবং ঐ-সব প্রাচীন সভ্যতা থেকে কতদূরে এখনো রয়েছে বাংলার এককোণ যশোর। সেখানকার মেয়েদের হাতের এই শঙ্খলতাটি! এই লতামণ্ডন যে খুবই প্রাচীন, আধুনিক কোনো-কিছু থেকে নকল নয়, তা নিশ্চয়ই বলা যায়। বাঙালীর মেয়ের সব-চেয়ে পুরোনো এবং সব-চেয়ে সুন্দর ও যত্নের অলঙ্কার শাঁখা। শাঁখ-লক্ষ্মীর চিহ্ন এবং কড়ি ছিল এককালে এ-দেশের পয়সা। কাজেই শাঁখ এবং তা-থেকে শঙ্খলতা আবিষ্কার এ-দেশে যে কেন খুবই প্রাচীন কালে হবেনা, বুঝিনে। তাছাড়া বাঙালী-জাতিও বড় কম-দিনের নয়। ইজিপ্তের রাণীরা এবং গ্রীসের সুন্দরীরা ঢাকার মস্‌লিন পর্‌তেন যখন, তখন যে বাংলাদেশ ও বাঙালী বর্ত্তমান ছিল অন্তত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না; এবং পূর্ব্বকালের কোনো ঢাকাই-সাড়ির পাড়ে লুকিয়ে এই শঙ্খলতা গ্রীসে ও ইজিপ্তে চালান যায়নি, তাইবা কে বলতে পারে? একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মণ্ডন পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে—এটা মানুষের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা; কাজেই এ-বিষয় নিয়ে তর্ক চল্লেইনা।

বাংলার ব্রতগুলির মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই এক-দোলায় অনেকগুলি ছেলের মতো গলাগলি করে রয়েছে দেখছি। এখন ব্রতের সব-শেষের অংশ যে ব্রত-কথা তারি দু-একটি নমুনা কেমন দেখবো।

ব্রতকথা

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি পুরাণ-ভেঙে যেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কথাগুলিকে ঠিক বাংলার ব্রতকথা বলে ধরা কিছুতে চলে না; শুধু তাই নয় কথা-সাহিত্য হিসেবেও সেগুলির মূল্য বেশী নয়। একটি নমুনা দিই:—

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রতকথা—"প্রহ্লাদ জন্মান্তরে সুরাপায়ী অতি-কদাচার এক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা নর্ত্তকী ও বেশ্যা-ভবনে দিনযাপন করিতেন। দৈবযোগে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর দিনে ঐ বেশ্যার সহিত সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের কলহ হয় এবং কলহ করিয়া দুইজনেই সেইদিন রাত্রি অনাহারে জাগরণে

অতিবাহিত করে। অজ্ঞানতঃ তাহাদের উক্তপ্রকারে নৃসিংহ-ব্রতের ফললাভ হয় ও সেই ফলে ব্রাহ্মণপুত্র পরজন্মে প্রহ্লাদ এবং সেই বেশ্যা স্বর্গের অপ্সরা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন, মহাদেব ত্রিপুরা-বধের জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন, বহুতর ঋষি অনেক রাজা এই ব্রত করিয়া স্বস্ব অভিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ব্রতের ফল কোটীকল্প বিষ্ণুলোকবাস, পুত্রহীনের পুত্র, ধনধান্য, সার্ব্বভৌম সুখ, অধিক কি বলিব ব্রহ্মাও চারিমুখে নৃসিংহ-ব্রতের ফলের কথা বলিয়া উঠিতে পারেন না।"

এটা থেকে হয়তো প্রহ্লাদচরিত্র-উপাখ্যান খুব বড়-করে লেখা যেতে পারে, কিন্তু এখন এটি যা, তা পেটেণ্ট-ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইবার খাঁটি মেয়েলী-ব্রতের কথাটি কেমন দেখা যাক্। মেয়েলী ব্রতকথা যতগুলি বাংলায় ছাপা হয়েছে, তার প্রায় সব কথাই সংগ্রহকারেরা মেয়েলীভাষাকে কোথাও নিজেরা, কোথাও-বা বড়-বড় সাহিত্যিকের সাহায্যে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। একমাত্র শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার-মহাশয় তাঁর ব্রতকথায় কথাগুলির স্বরূপ অনেকটা বজায় রেখেছেন, যেমন —

ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রতকথা—"এক সওদাগরের দুই কন্যা। একজনে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করত, একজনে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করত —(বলা যেতে পারে ভুবন-চতুর্থী আর ভূষণ-চতুর্থী) যে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করত তার নাম কাঁকন। আর যে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করত তার নাম মাখন। অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করে কাঁকনের গায়ে অলঙ্কার ধরে না, ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করে মাখন কিছুই পায় না।" এর পরে কাঁকন পড়ল রাজার ঘরে, মাখনের বিয়ের হল রাখালের ঘরে। "মাখন রাখালের ঘরে গিয়ে, খুদ পান্ কুড়া পান্, ফুলজল দিয়ে কচি কাঁটালের পাতা দিয়ে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করেন। দেখতে দেখতে রাখালের ঘর ধানে-কলায়ে ভরে উঠলো। এদিকে পক্ষীর ডাক, ওদিকে গাই-বাছুরের হাম্বা, এদিকে ধানের গোলা, ওদিকে কলায়ের ধামা, মিষ্টি গাছের ফল, নদীর জল,—যাকে যা দেবার দেন্-থোন্ জ্ঞাৎ-গোষ্টি নিয়ে থাকেন.....ওদিকে কাঁকনের রাজার রাজ্যে যত জিনিষ ছিল অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করে সব অলঙ্কার হয়ে উঠলো। রাজার রাজ্যে অলঙ্কার, সিফাই লস্করের ঢাল-তরোয়ালে অলঙ্কার, হেলে চাষার হাল লাঙ্গলে অলঙ্কার, কামারের হাতুরে অলঙ্কার, কুমারের চাকে অলঙ্কার, জেলের জালে অলঙ্কার, তাঁতি নাপিত ধোবা যার যা-কিছু সব তা'তে অলঙ্কার! কেউ কোন কাজ করে না, যে করতে যায় করতে পারে না! হাড়ি-পাতিলে অলঙ্কার, আথায় অলঙ্কার, কাট-কুঁদায় অলঙ্কার, কেমন করে পাক করবে? চালে অলঙ্কার রাঁধতে পারে না, ফল-ফুলে অলঙ্কার, তরিতরকারিতে অলঙ্কার। সকলে অলঙ্কার নিয়ে বসে থাকে খেতে পায় না কেঁদে মরে। না, শেষে রাজার রাজ্যে হাহাকার উঠলো—হাল কৃষি হয় না, কিনতে গেলে কেউ বেচেনা, বেচতে গেলে কেউ কেনে না—কে বেচবে কে কিনবে? যা বেচতে যায় তা'ও অলঙ্কার—" রাজা সন্ধান

পেলেন রাণী দেশসুদ্ধ লোককে অলঙ্কার-চতুর্থী করিয়ে এই বিপদ ঘটিয়ে বসেছেন। রাণীকে বল্লে তিনি বলেন—এর উপায় আমার সেই রাখাল-বৌ ছোট বোন যদি করতে পারে। রাজ্যসুদ্ধ গিয়ে রাখাল-বৌয়ের শরণাপন্ন হল, সেদিন রাখাল-বৌ মাখনের ভুবন-চতুর্থী ব্রতের প্রতিষ্ঠার সময়। রাজা-রাণীর কথায় মাখন বল্লেন—"কি বা বলি? —সোণা-পিতলের অলঙ্কার, খাওয়া না, দাওয়া না, বোন বা তা'র ব্রত করলেন কেন? সুখে-স্বচ্ছন্দে খাবেন, ঘী দিয়ে মাটির প্রদীপ জাল্‌বেন, হাল চলবে, গাই বলবে, লক্ষ্মীর হাতের ক্ষীর-অলঙ্কার ক্ষেত-ভরে ফুটে উঠবে, বোন, সেই ব্রত করুন।"

—'সরাটোপা কাঁটালের পাত
ব্রত করলে ঘরের ভাত।'

রাণী কাঁকন তখনি ভুবন-চতুর্থী ব্রত করলেন। অম্‌নি রাজ্যের অলঙ্কার খসে পড়ল।—"যেমন ছিল তেমন ঢাকের মত ঢাক বাজে, হালের মত হাল চলে, মাটির গায়ে ফুল ফুটে, কুমারের চাকে হাঁড়ি, জেলের জালে রুই-কাৎলা।" সকলে নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আঃ বাঁচলাম!

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

মিশ্র—খেমটা।

সমর-সঙ্গীত

কে উহারা নবীন সৈনিক?
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, তেজোদৃপ্তবল, সাহসী নির্ভীক?
(কোরাস্)
ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক!
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক।

(১) বিশ্বভালে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিছে ধক্ ধক্!
শোণিতভুক্ কৃপাণ মুক্ত চমকে লক্‌লক্!
বজ্রবলে কামান তোপ, গরজি উগারে ভীষণ কোপ
কম্পিত করি সপ্তলোক ছারখার করি দিক্।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

জার্ম্মাণ সনে করি'ছ যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজীন্ ইতালীক, মারাঠা গুর্খা শিখ ।
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
সমর-রঙ্গে, মত্ত সঙ্গে, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক !
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,—
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক ।

(২) ধরণী বংশ হইল ধ্বংস রক্ষা নাহি নাহি !
সুরাসুর নর অপ্সর কিন্নর করিছে ত্রাহি ত্রাহি !
রক্ত-তুফান সাগরে বয়, শবের স্তূপ পৃথ্বীময়,
প্রেত পিশাচ ভক্ষে লক্ষে, হাসিয়া হা হা হা হিক্ !
বিকট বিষম দৃশ্য-নাট্য ভীষণ সন্ত্রাসিক !

জার্ম্মাণ সনে করিছে যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালিক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্ !
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
যুঝিছে রণে, হরষ মনে, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক ।
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক ।

(৩) সমর-বাদ্য ভীমনাদে ঘোষণা করিয়া বলে,
ধর্ম্মযুদ্ধে হও প্রবুদ্ধ এস এ পতাকা তলে ।
বিপুল দক্ষ মহা মহা বীর, বলবান দেহ উন্নতশির
ছোট বড় মিলে আসে দলে দলে জাতি বিজাতিক ।

জার্ম্মাণ সনে করিছে যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালিক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্ ।
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
অগ্রগামী বীর, সঙ্কটে স্থির, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক ।
বল জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক !

(৪) আকাশ হইতে বর্ষা-ধারে হইল পুষ্পবৃষ্টি !
রুদ্র কাণ্ড শমিত সাঙ্গ রক্ষা পাইল সৃষ্টি !
উঠিল রব ধন্য ধন্য, দেবতা মানব সুপ্রসন্ন,
আশীষপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিছে অনিমিখ্—
কে উহারা নবীন সৈনিক ?
অসাধ্য কাজে, অগ্রে সাজে, অসম সাহসিক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক ।
বল, জয় জয় জয় জয় জয় !
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক ।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী । সুর—শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় ।
স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ।

১ ০ ১ ০ ১
II গা – া গা । গা – া – I রা – া – া । – া – া – I রা রা – গা ।
কে ০ উ হা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ন বী ০

০ ১ ০ ১ ০
। সা – ন্া সা I রা – া – া । – া – া – I গা – া ধা । পা – া ক্ষা ।
ন ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ০ ০ বু ০ দ্ধি তে ০ উ

১ ০ ১ ০ ১
I গা – া – া । – া – া – I র্সা – া গা । র্রা – া না I র্সা – া – া ।
জ্জ্বল্ ০ ০ ০ ০ ০ তে ০ জো দৃ ০ প্ত বল্ ০ ০

০ ১ ০ ১
। – া – া – I না – া না । র্সা – া না I পা – া – া ।
০ ০ ০ সা ০ হ সী ০ নি র্ভীক্ ০ ০

(কোরাস্)

। –া রা রা I রা রা গা । হ্মা পা পা I পা না ধা ।
০ ও রা আ মা দে র্ ছে লে আ মা দে

। পহ্মা পা –া I পা –া পা । না –ধা না I র্সা –া –া । –া র্সা র্সা ।
র্ ভাই ০ ব ০ ঙ্গ প ০ দা তিক্ ০ ০ ০ ব ল

I র্গা র্গা র্রা । র্রা র্সা র্সা I নধা না র্সা । –া –া –া I
জ য় জ য় জ য় জ০ য় জ য়্ ০ ০

I না না –া । র্সা –া না I পা –া –া । –া –া –া I
বা ঙ্গা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ০ ০

I হ্মা হ্মা –া । পা –া হ্মা I রা –া –া । –া রা রা I
বা ঙ্গা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ও রা

I রা –া –া । গা –া –া I হ্মা –া –াপ । গহ্মা –া –া I পা –া –া ।
বা ০ ০ ঙ্গা ০ ০ লী ০ ০ সৈ ০ ০ নিক্ ০ ০

এই কোরাস্ সর্ব্বত্র এক সুর।

–া –া –া II
। ০ ০ ০

II সরা –গা রা । পা পা –া I গা রা গা । রা –া সা I
(১) বি০ ০ শ্ব ভা ০ লে প্র ল য় অ ০ গ্নি
(২) ধ০ র ণী বং ০ শ হ ই ল ধ্বং ০ স
(৩) স ম র বা ০ দ্য ভী ০ ম না ০ দে
(৪) আ কাশ্ ০ হ ই তে ব ০ র্ষা ধা ০ রে

I সা ধ্া সা । গা –া –া I সা –া –া । –া –া –া I
(১) জ্ব লি ছে ধক্ ০ ০ ধক্ ০ ০ ০ ০ ০
(২) র ০ ক্ষা না ০ হি না ০ ০ ০ ০ ০
(৩) ঘো ষ ণা ক রি য়া ব ০ ০ লে ০ ০
(৪) হ ই ল পু ০ ষ্প বৃ ০ ০ ষ্টি ০ ০

I পা পধনা না । ধা –া পা I হ্মা ধা পা । হ্মা –া রা I
(১) শো নি০ ত ভু ০ ক্ত কৃ পা ণ মু ০ ক্ত
(২) সু রা০ সু র ন র অ প্স র কি ন্ন র
(৩) ধ ০ র্ম্ম যু ০ দ্ধে হ ও প্র বু ০ দ্ধ
(৪) রু ০ দ্র কা ০ ণ্ড শ মি ত সা ০ ঙ্গ

I গা হ্মা পা । না –া –া I পা –া –া । –া –া –া I
(১) চ ম কে লক্ ০ ০ লক্ ০ ০ ০ ০ ০
(২) ক রি ছে ত্রা ০ হি ত্রা ০ ০ হি ০ ০
(৩) এ স এ প তা কা ত ০ ০ লে ০ ০
(৪) র ০ ক্ষা পা ই ল সৃ ০ ০ ষ্টি ০ ০

I র্সা –া র্সা । না –া না I ধা ধা ধা । পা হ্মা পা I
(১) বি ০ শ্ব ভা ০ লে প্র ল য় অ ০ গ্নি
(২) ধ র ণী বং ০ শ হ ই ল ধ্বং ০ স
(৩) স ম র বা ০ দ্য ভী ০ ম না ০ দে
(৪) আ কাশ্ ০ হ ই তে ব ০ র্ষা ধা ০ রে

I রা গা রা । গমা রা –া I সন্া –া রা । সা –া –া I
(১) জ্ব লি ছে ধক্ ০ ০ ধক্ ০ ০ ০ ০ ০
(২) র ০ ক্ষা না ০ হি না ০ ০ হি ০ ০
(৩) ঘো ষ ণা ক রি য়া ব ০ ০ লে ০ ০
(৪) হ ই ল পু ০ ষ্প বৃ ০ ০ ষ্টি ০ ০

I পা –ধা পা । র্সা –া র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা –া –া I
(১) ব ০ জ্র ব ০ লে কা মা ন তোপ্ ০ ০
(২) র ০ ক্ত তু ফা ন সা গ রে বয়্ ০ ০
(৩) বি পু ল দ ০ ক্ষ ম হা ম হা বীর্ ০
(৪) উ ঠি ল র ০ ব ধ ০ ন্য ধ ০ ন্য

I সা রা গা। গা পা পা I গা র্গা র্রা। সা –া –া I
(১) গ র জি উ গা রে, ভী ষ ণ কোপ্ ০ ০
(২) শ বে র স্তূপ্ ০ ০ পৃ ০ থ্বী ময়্ ০ ০
(৩) ব ল বান্ ০ দে হ উ ০ ন্ন ত শির্ ০
(৪) দে ব তা মা ন ব সু ০ প্র স ০ ন্ন

I সা –গা রা। রা সা সা I না –রা সা। পা –া –া I
(১) ক ০ ম্পি ত ক রি স ০ প্ত লোক্ ০ ০
(২) র ০ ক্ত পি শা চ ভ ০ ক্ষে ল ০ ক্ষে
(৩) ছো ট ব ড় মি লে আ সে দ লে দ লে
(৪) আ শী ষ পূ ০ র্ণ মু ০ গ্ধ দৃ ০ ষ্টি

I ধা –া ধা। –া ধা পা I সা –া –া। –া –া –া I
(১) ছার্ ০ খার্ ০ ক রি দিক্ ০ ০ ০ ০ ০
(২) হা সি য়া হা হা হা হিক্ ০ ০ ০ ০ ০
(৩) জা ০ তি বি ০ জা তিক্ ০ ০ ০ ০ ০
(৪) দে খি ছে অ ০ নি মিখ্ ০ ০ ০ ০ ০

I সা সা সা। না –া না I ধা –া ধা। পা –া পা I
(২) বি ক ট বি ষ ম দৃ ০ শ্য না ০ ট্য

I গা গা গা। রা –া রা I সা –া –া। –া –া –া I
(২) ভী ষ ণ স ০ ন্ত্রা সিক্ ০ ০ ০ ০ ০

I পধা না না। না ধা ধা I পা ক্ষা পা। ক্ষা –া রা I
(১),(২),(৩),(৪) জা০ ০ র্ম্মা ন স নে ক রি ছে যু ০ দ্ধ

I রা গা ধা। ধা –া ক্ষা I পা –া –া। –া –া –া I
ফ রা সী ব্রি ০ টা নিক্ ০ ০ ০ ০ ০

I না –া –া। র্সা –া না I পা –া –া। –া –া –া I ক্ষা –া ক্ষা
মা ০ ০ কি ০ ন গ্রীক্ ০ ০ ০ ০ ০ বেল্ ০ জিন্

। পা –া ক্ষা I রা –া –া। –া –া –া I রা গা ক্ষা। ক্ষা গা ক্ষা I
ই ০ তা লিক্ ০ ০ ০ ০ ০ মা রা ঠা গু ০ র্খা

I পা –া –া। –া –া –া I গা –া –া। গা –া গা I গা –া গা।
শিখ্ ০ ০ ০ ০ ০ তার্ ০ ০ মা ০ ঝে কে ০ উ

। গা –া –া I রা –া –া। –া –া –া I রা রা গা। সা না সা I
হা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ন বী ০ ন ০ সৈ

I রা –া –া। –া –া –া I গা –া ধা। পা –া ক্ষা I গা –া –া।
নিক্ ০ ০ ০ ০ ০ (১) স ০ ম র ০ র ঙ্গে ০ ০
(২) যু ০ ঝি ছে ০ র ণে ০ ০
(৩) অ ০ গ্র গা ০ মী বীর ০ ০
(৪) অ সা ০ ধ্য ০ কা জে ০ ০

। –া –া –া I র্সা –া গা। র্রা –া র্সনা I র্সা –া –া। –া –া –া I
(১) ০ ০ ০ ম ০ ০ ত্ত ০ স০ ঙ্গে ০ ০ ০ ০ ০
(২) ০ ০ ০ হ ০ র ষ ০ ম নে ০ ০ ০ ০ ০
(৩) ০ ০ ০ স ০ ০ ঙ্ক ০ টে স্থির ০ ০ ০ ০ ০
(৪) ০ ০ ০ অ ০ ০ গ্রে ০ সা জে ০ ০ ০ ০ ০

I না –া না। র্সা –া না I পা –া –া II
(১),(২),(৩) সা ০ হ সী ০ নি ভীক্ ০ ০
(৪) অ স ম সা ০ হ সিক্ ০ ০

(কোরাস্) ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক ইত্যাদি।

ডাক-পিয়ন

(গল্প)

আমাদের পাড়ায় চিঠি বিলি করিত সুন্দররাম। জাতিতে সে হিন্দুস্থানী কাহার। পশ্চিমের এক পল্লীতে তাহার বাড়ী; সেখানে আপনার-জনদের ফেলিয়া পেটের দায়ে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল চাকরি করিতে। বৎসরান্তে 'পূজা'র কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটি লইয়া সে একবার বাড়ী যাইত।

আমার ও আমার প্রতিবেশীদের কাছে তাহার পাওনা ছিল, বৎসরে দুইবার:—দোলের পরে ও পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে। তাহার এই পাওনা দাবী করার মধ্যে একটু মজার কথা আছে।

আমার সমান কিম্বা আমার চেয়ে বড়-দরের লোকের কাছে সে যে-জায়গায় আট-আনা পাইবার আশা করিত, আমার কাছে সেখানে, কি জানি কেন, সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল চার টাকার কম কিছুতেই লইবে না! কিন্তু আমি যে কি দিতাম, সে-কথা বলিতে আমার এখন লজ্জা করে।

সে আশা করিত, উপেনবাবু তাহাকে অন্তত চারিটি টাকা দিবে, কিন্তু যথাসময়ে সেই চারি-টাকার চেয়ে ঢের কম যখন তার হাতে পড়িত তখন সে যে খুব নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইত না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম, সে মনে করিতেছে, এখন বাবু দিতে পারিল না বটে কিন্তু আগামী বারে নিশ্চয় পোষাইয়া দিবে! —অথচ আমি তাহাকে ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাসই দিতাম না। এবারেও যেমন, আর-বারেও তাহার ভাগ্যে সেই একটি-সিকির বেশী কখনো জুটিত না। তত্রাচ আমার প্রতি তাহার আশা শেষপর্য্যন্ত সমান বজায় রাখিয়াছিল।

সে-বছর পূজার মাস-তিন পূর্ব্বে একটা বড় মকর্দ্দমা জিতিয়া আমার বেশ মোটা লাভ হইয়া গেল।

অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পাইয়া মনে করিলাম প্রতি-বৎসর মনের মধ্যে যে-সব অতৃপ্ত বাসনাগুলা জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে, এবার এই পূজার সময় তাহার কতক পূর্ণ করিয়া লইব। মনের নোট-বুকে তারই একটা ফর্দ্দ লিখিতে বসিয়া গেলাম।

রাস্তার ধারের বারান্দায় বসিয়া আছি—এমন সময় সুন্দররাম বরাবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া আমার হাতে এক-খানি পত্র দিল। তারপর আমার মুখ-পানে চাহিয়া বলিল—"পূজার এখোনো কোতো দিন দেরী আছে বাবু?" আমি বলিলাম,—"এখনও এক মাসেরও বেশী।" সে বলিল—"এখোনো এতো দেরী!" বলিয়া সে আপন-কাজে চলিয়া গেল। পূজার কথা তুলিতেই আমার মনে পড়িয়া গেল তার বখ্‌শিসের কথা। ফর্দ্দের মধ্যে এতক্ষণ এই অঙ্কটা ধরা হয় নাই; মনে-মনে সে-ক্রটি তখনি সংশোধন করিয়া লইলাম। একটু মোটা-রকমের অঙ্কই ফেলিলাম;—আহা বেচারা, অনেকদিন হইতে আশা করিয়া আছে! এবারে তাহাকে খুসি করিবই।

দেখিতে-দেখিতে কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। পূজার বাজারে, মনের নোট বুকের সেই ফর্দ্দের মতো খরচ করিতে লাগিলাম। প্রায় সবই সমাধা হইল; এখন বাকি কেবল সুন্দররামের দাবী। কিন্তু কোথায় সুন্দর-রাম? চুপিচুপি চিঠি বিলি করিয়া সে সরিয়া পড়ে;—আমার সঙ্গে কৈ দেখা করেনা ত! ভাবিলাম—এখনো পূজার কিছু বিলম্ব আছে, তাই বোধ হয় তার তেমন তাড়া পড়ে নাই।

পূজা আরো নিকট হইয়া আসিল; অন্যবৎসর এর অনেক আগে সে পাওনা চুকাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু এ-বৎসর তাহার কি হইল বুঝিতে পারিলাম না। মনে-মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রতি-মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল সে এখনই আসিয়া হাত-পাতিয়া দাঁড়াইবে কিন্তু কৈ, শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বখ্‌শিশ চাহিতে আসিল না।—কেন? তবে কি সে রাগ করিয়াছে? না, অভিমান?

ষষ্ঠীর দিন পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখি—সুন্দররাম পাশের বাড়ীতে চিঠি বিলি করিয়া বাহির হইতেছে। আমার চোখে চোখ পড়িতেই সে যেন মুখটা ঘুরাইয়া লইল। আমি হাসিলাম—বুড়ার অভিমান বড়ই বেশী দেখিতেছি! মনে হইল ডাকিয়া উহার হাতে একখানা নোট গুঁজিয়া দি। আহা, বেচারা!

একটু পরেই সুন্দররাম ঘুরিয়া-ফিরিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে এক-খানি চিঠি দিল, কোনো কথা না বলিয়াই ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া আমার এই আনন্দ হইতেছিল যে এখনই সে বখ্‌শিসের কথাটা পাড়িবে, কিন্তু তাহাকে গোঁ-ভরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমার ভারি রাগ হইল। ইস্—বেটা যেন নবাব! নিবি ত ভিক্ষা, এত দেমাক কেন তবে! আমি আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না। চিঠিখানা খুলিতে গিয়া দেখি ব্যাটা ভুল করিয়াছে। চিঠি আমার নয়।

সেইদিন বৈকালে বাড়ীর বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি, সুন্দররাম আর-একজন পিয়নের সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া সকালবেলাকার চিঠিখানা ফেরত দিয়া ধম্‌কাইয়া বলিলাম,—"তুই কার চিঠি কাকে দিস্? এ আমার নয়!"

সুন্দররাম অন্যমনস্কে আমার হাত হইতে চিঠিখানা লইল। দেখিলাম তাহার চলা-ফেরা ধরণ-ধারণ সমস্তই একটা অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এমন কি, যে বখ্‌শিসের জন্য অন্য-বৎসর এ-সময় তাহার সমস্ত মন ব্যস্ত হইয়া থাকে, এখন তার কথা যেন তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে নাই। ব্যাপার কি, আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় সেই পিয়নটা বলিয়া উঠিল—"ইয়ে দেখো!—ইস্ লিয়ে মাষ্টার না উস্‌রোজ তোম্‌রা দো রূপেয়া ফাইন কিয়া থা।" বলিয়া সে আরও গম্ভীর স্বরে হইয়া বলিয়া উঠিল,—"গবরমিণ্টিকা কাম্‌মে এসা ভুল্‌চুক্ না করনা।"

সুন্দর সে-উপদেশ কানে তুলিল বলিয়া মনে হইল না; সে চিঠিখানা ব্যাগে পুরিয়া অন্যমনস্কে চলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল তাহাকে ডাকি কিন্তু সে তার অবসর দিল না।

বিজয়া দশমী। পূজার আনন্দ-অবসানের সঙ্গেসঙ্গে সুন্দররামের কথাটা কেবলই মনের মধ্যে তোলাপাড়া হইতেছিল। আর সে-দিনকার তার সেই অন্যমনস্ক মুখ আমি ভুলিতে পারিতেছিলাম না। কি জানি কেন, তার উপর আমার আর রাগ ছিল না। মনে কেবলই ক্ষোভ হইতেছিল বেচারাকে ডাকিয়া টাকা-কয়টা দিলাম না কেন? সে বোধ হয় কাজে কিছু ভুলচুক করিয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই বখ্‌শিসের দিকে তার খেয়াল নাই,—আমার উপর রাগও নয়, অভিমানও নয়।

সুন্দররামের নামে তুলিয়া-রাখা টাকা কয়টা লইয়া আমি ভারি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। আমার মনের সাধ এ-বৎসর মোটামুটি মিটিয়াছে—কেবল এইটাই যে বাকি! দান করিবার জন্য মানুষের মন যে এতটা উতলা হইতে পারে, পূর্ব্বে জানিতাম না;—আর নিজে অনুভব না করিলে বোধ হয় এ-কথা কেহ তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁইয়া বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

একটা অস্বস্তির বোঝা বুকে লইয়া আমি সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দররামের মূর্ত্তি পথের উপর দেখা দিল। আমি একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলাম,—"ওরে সুন্দর, উপরে আয় ত."

সে শান্ত বালকটির মত ধীরে-ধীরে আমার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি একটু অভিমানের সুরে বলিলাম—"তা বেশ ক'রেচিস্ সুন্দর,—আমার কাছে পাওনাটা বুঝি ছেড়ে দিয়েছিস্?—তা' বেশ, বেশ,—কোথায় পাব বল্—গরীব মানুষ আমি—"

শুনিতে-শুনিতে সে কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল; আমার দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল—"আপ্‌নির কাছে কি হামার পাওনা হামি ইচ্ছে করিয়ে ছোড়েছি বাবু—ভগবান্ ছোড়িয়ে দিয়েছে হুজুর—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে বসিয়া পড়িল। তারপর একটু সাম্‌লাইয়া, পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থানী-ভাষায় লেখা ছেঁড়া চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন বাবু, আর হামার টাকার কি দোর্‌কার আছে—!"

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম—"ভাল বুঝ্‌লুম না সুন্দর—কি হয়েছে তোর?"

সে বলিল,—"বাবু মুল্লুকমে হামার জরু আছে। একটা সাত ব'ছরের লেড়্‌কাও ছিল—বছর-বছর তা'রই জন্যে কেতো কি খেলানা-উলানা, কেতো ভাল ভাল পোষাক-উষাক্ নিয়ে যেতুম বাবু—"

বুঝিতে পারিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম,—"থাক্ সুন্দর, আর তোকে বল্‌তে হ'বে না—" আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সাম্‌লাইয়া লইলাম।

সুন্দর আমার নিষেধ মানিল না;

বলিল—"না বাবু, আপ্‌নিকে শুন্‌তে হোবে। আপনার বড় দয়া। হামি এম্‌নি আপ্‌নির কাছে হামার বোকসিস্ ছোড়েনি হুজুর" বলিয়া সে আরও যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, তাহাদের বাড়ীর পাশে এক বড়লোকের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, তারই দেখাদেখি সুন্দরের মেয়ে নানা দামী জিনিষের আবদার ধরিত। তার জন্য সে—

আমি বলিলাম, "ও কথা থাক্ না সুন্দর—"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুন্দর বলিল—"গেল বারে মেয়ে হামার একজোড়া জরির জুতা মেঙেছিল বাবু—দিতে পারিনি! সেই মেয়ে হামার মোরে গেলো—" বলিয়া সে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় কোথা হইতে আমার ছয় বৎসরের মেয়ে আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ডাকিল—"বাবা—"

সেই শব্দে চোখের জল মুছিয়া সুন্দর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; আমার মেয়েটির দিকে একবার সবেগে অগ্রসর হইয়া আসিল; তার পর হঠাৎ পিছু হটিয়া ধীরে-ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

গগন

আরেক জগতে আছি গগনের কাছাকাছি,
হ'ল সত্য আশঙ্কা-কল্পনা!
আছে স্নেহ,নাই শোক, কোথা সে অমর লোক,
রে নন্দন আনন্দের কণা?
কপাল হইতে হাত সরাইয়া অকস্মাৎ
হেরি তায় রক্ত দরদর্—
লুকান' সঙ্গীন কা'র খোঁচা দেয় বার বার,—
ঝরে ধারা তপ্ত ঝরঝর্।
কোথা রে দুলাল কই, এ-আমি সে-আমি নই,
আমা-ছাড়া একা সে কোথায়?
কথা কই স্বপ্ন দেখে' যেন কত দূর থেকে
বাছা এসে শিয়রে দাঁড়ায়।
চাপা কান্না পড়ে ঝরে' অশ্রু-লোণা পথ ধরে',
গলে' যায় একমুষ্টি ছাই,—
এ কি কষ্ট, কি কুয়াসা কণ্ঠমাঝে বাঁধে বাসা,
সান্ত্বনার প্রাণে শান্তি নাই।

এ ঘর পছন্দ তোর হ'ল না কি বাছা মোর?
নিবে গেলি মাণিক আমার!—
এসেছিলি স্বপ্ন দিয়া অফুরন্ত আলো নিয়া
চমকিয়া খনির আঁধার।
আজি যে ঢুকিতে ঘরে কি-যে বুক চেপে' ধরে,
নির্জ্জনতা ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
সাধ-না-মেটার দেশে বুঝি তোর ভালবেসে
পূরোপূরি মিটিল না আশ!
আচম্‌কা থেকে থেকে নাম ধরে' উঠি ডেকে,
কি বলিয়া গেলি ইসারায়?
ছিঁড়ে যদি যাবি হেন' এত জোরে তবে কেন
গিরা দিলি শিরায় শিরায়!
কা'রা যেন আসে সরে' অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'
চোখে পড়ে মুখের 'আদল'—
নিবন্ত চাঁদের ফালি, গলে' পড়ে জ্যোৎস্নাকালি
প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

ভাঙ্গে আধ-জাগা ঘুম, যাই তারে দিতে চুম,
ভাবি, আছে কোল্‌টিতে শুয়ে,
অন্ধকারে কত খুঁজি বিছানা ছাড়িয়া বুঝি
অভিমানে ঘুমায় সে ভুঁয়ে।
আচম্বিতে মনে হয় চোখ টুটে' জল বয়,
সব আছে সেই না কি নাই,
লুকোচুরি খেলা দিতে এত বড় পৃথিবীতে
লুকাতে কি পেল না রে ঠাঁই ?

কাঁদে রাতি ব্যথা-ঝড়ে, তারি কথা মনে পড়ে,
সেই কাঁদে হিয়ার মাঝার,
স্বপনের আরসীতে যাই তারে পরশিতে,
ছায়া হাতে ঠেকে বারে বার।
কাঁদে সেও মোর মত মরমে দারুণ ক্ষত,
চায় ছুঁতে আমারি মতন ;
দু'জনের মাঝ্‌খানে কি যে বাধা সেই জানে,
রূপ-হারা তার পরশন।

জীবনের বালুঘড়ি ঝিরি-ঝিরি পড়ে ঝরি,
কত পল, অনুপল আছে !
আয়ু-বিহগের পাখা কি মোচড়ে রক্ত-মাখা,
আঁখিদুটা ছেঁচে দিয়ে গেছে !
পথের বালকে দেখে' কথা কই শত ডেকে,
গগনেরি মত সে তাকায়,
তেমনি মুখের ছাঁদ, অধরে সে চারু ফাঁদ,
তারি মত হাসিটি বিলায়।

মর্ত্ত্য দিবা-স্বপ্নভরা কচি চোখে এত ত্বরা
কে পরাল ভোলার কাজল !
নূতন অধর-পুটে নূতন অমৃত লুটে'
কোথায় আছিস্ ওরে বল্।
তোর সে চোখের খেলা না হেরিলে ভোর-বেলা
আলো যে হ'ত না মোর ঘরে'
তোরি স্নেহরেণু মোরে নিরমল রূপ ধরে'
নিশিদিন ছিল পুণ্য করে' !

এই যে নিখিল খেলা মিলন-প্রয়াগ-মেলা,
খেলা বলে' ভুলেও ভাবিনি—
আঁকুপাঁকু হ'ল সার যুদ্ধশেষ পুরস্কার,—
দংশে আঁখি সাগর-নাগিনী।
তিলার্দ্ধ আমারে ছেড়ে থাকিতে হইলে যে রে
চাহিতিস্ মিনতি-কাতর,
এবে না দেখিয়া মোরে আছিস্ কেমন করে'
রে তরুণ পারুল-কেশর !
তুহারি আঙুল ধরে' আমি যে নতুন করে'
শিখেছিনু চলিতে হাঁটিতে,
ধূলার আল্‌পনা-আঁকা পা দু'খানি ছন্দমাখা
পারিজাত ছড়াত মাটিতে !
তুহারে তুলিয়া পিঠে সয়েছি প্রহার মিঠে
খুসি-ভরা হাতের মুঠায়,
বায়না আব্‌দার ধরে' মেঝেয় আছাড়ি' পড়ে'
দিই নি তো লুটাতে ধূলায়।
খেলার পুঁতুল তোর ফেলিছে আঁখির লোর
গুমরিছে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া,—
হেরি বাতায়ন খুলি' মূর্চ্ছে বসন্তের তুলি
সে জগৎ গিয়াছে উপিয়া।

ওরে যাদু, মোর সাথে না খাইলে এক পাতে
খিদে তোর মিটিত না যে রে,
কি ভালই বেসেছিলি ! হাসি খেলা নিরিবিলি
ফুরাইল কি গ্রহের ফেরে !
আহ্লাদ-পুতুলি এলি, আদরে-আদরে গেলি
দেখায়ে আসল হাসিরেখা,
শেষ আঁখিনীরে ভাসি' ফুটিল সোনার হাসি,
সে হাসি কাঁদায় মোরে একা !

কলিজার ভাঁজে ভাঁজে আগুনের ফুল্‌কি-মাঝে
আমি সেই হাসির কাঙাল !
দরদ-ভুলান' সেই সুধার তুলনা নেই,
কোথা গেলে পাব রে নাগাল !

আজিকে ভিতর মোর ছেয়েছে বিষের ঘোর,
'বাহির' সে মিলাইয়া আছে,
ওই বাহিরের সাড়া হয়ে' গেছে আমা-ছাড়া
চোখের জলের ঘসা-কাচে।
শূন্য এ কান্নার দিন, ভয়ের জোয়ার ক্ষীণ
থম্‌থমে ক্ষয়ের ভাঁটায়—
উষার অতল-স্পর্শ হারায়েছে মোর হর্ষ,
সোনালি বুদ্বুদ টুটে' যায়।
কৃষ্ণচ্ছায়া বাষ্পে ভরি' আকাশে নিবিড় করি'
তারা-শিশু বলে কি উতলা !
এ বক্ষে দক্ষিণে বামে কি দোলা দিবস-যামে—
দোলে দুই অয়নের দোলা !
কী যে এবে অনুভবি ভাষাতে সে ব্যথা-ছবি
ফুটাইতে বৃথায় প্রয়াস –
শুনি শুভ-শঙ্খমাঝে কি মহাবেদনা বাজে,
ভরা চোখে ভরে জলোচ্ছ্বাস !

এ কি রে দম্‌কা হাওয়া পিছনে করিছে ধাওয়া ?
ঘূর্ণিপাকে ঘোরে সারা মন,—
চক্রবালে তারা ফোটে তেমনি সে জেগে ওঠে,
মনে-মনে-চেনা সে নয়ন।
আসিবে আসিবে ফিরে' সে মোর স্নেহের তীরে
প্রভাত যেমন ফিরে আসে,—
মৃত্যু কি ভুলায়ে তারে তিলার্দ্ধ রাখিতে পারে,
হেন শক্তি নাহি তার পাশে।

পাঁজরে পোড়ার দাগ ঢাকা দিয়ে রাত্রি জাগ্,
রাত্রি সে ব্যথার রূপান্তর,
পলকে-পলকে-গাঁথা একি বেড়া-জাল পাতা,—
কি নির্ম্মম মমতার ঘর !
সত্যই কি হ'ল শেষ, স্নেহের আকুল রেশ
তোলে না সুদূর প্রতিধ্বনি ?
এই আছে, এই নাই, আঁখি পালটিয়া চাই,
না হেরি আলোর আগমনী।
সে যে গেছে এক হয়ে' অনন্ত ধারায় বয়ে'
জীবনের ফেনবিম্বে ভাসি'—
ব্যাপি' চিরন্তন-অদ্য অমর-জনম-পদ্ম
রসে-রাগে ওঠে পরকাশি'।

পূর্ণিমার কোন্ পারে চির-জ্যোৎস্না ডাকে তারে,
সরে অজগর রাত্রিরূপ,
মৃত্যু সে চুম্‌কি-প্রায় ঝিকিমিকি' নিবে যায়,
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।
মহানিশা বাষ্পময়ী ছেয়েছে আমার মহী,
সঙ্কুচিত ব্যোম চরাচর,
একটি অণুর মাঝে রূপাতীত হয়ে রাজে
অতীন্দ্রিয় তন্দ্রা ও জাগর।

তিমির-কুহেলি থেকে ফিরে এসেছিল কে কে ?
জগৎ-ডুবান' দুখামৃত
মুখে তার উথলায়, পলাতক বেদনায়
কি ধূসর ছায়ায় বিস্মিত !—
কা'র মৃত্যুজিৎ স্নেহে ফিরে প্রাণ শবদেহে ?
কবে তাঁর দেউলে, গগন,
তোকে বুকে করে' সেই দেবতার সম্মুখেই
নত-শিরে হব নির্বেদন।

এই মর্ম্মকাতরতা কোথা শেষ হে দেবতা ?
নিতে বাকি আরো কতখানি !
কি বিচিত্র কল্প তব পূর্ণ কর চিরনব
মায়া-রঙা যবনিকা টানি' ?

অগণিত প্রাণী নিয়ে কি-নিষ্ঠুর দাগা দিয়ে
একি খেলা খেল' মহেশ্বর ?
না যদি সৃজিতে হায় কিবা ক্ষতি ছিল তায়,
—অপার যে ব্যথার লহর !

যদি এ রাতের বাসা ভরে' দিলে ভালবাসা,
কেন তবে ভাঙ্গ' গো নিঠুর ?
পুটপাকে লৌহপ্রায় পোড়াইয়া নিরুপায়
কি করুণা দেখাও ঠাকুর ?

না-না তুমি স্নেহরূপে গলে' পড় চুপে-চুপে,
জলে' ওঠ দুঃখরূপ ধরে'—
লীলাময়, এ কি দীক্ষা, মর্ম্মান্তিক কি পরীক্ষা,
কি রহস্য জন্ম-জন্মান্তরে !
মনোবনে অলিগলি রাঙা করে' এ বিজলি
বজ্রফালে পাঠাইছ কেন ?
তারি মাঝে পোড়া পথে জয়-ভরা তব রথে
রুদ্রভেরী শোনাইছ হেন !

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বপ্নের উপর স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রভাবের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারা যায়; কিন্তু আমাদিগকে সংক্ষেপেই সারিতে হইবে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত এই স্পর্শানুভূতি সম্মিলিত হইয়া স্বপ্নের প্রয়োজন-মত মূর্ত্তিটি গঠন করে। রাত্রে আমরা হাল্‌কা কাপড় পরিয়া নিদ্রা যাই, সেইজন্য ঘুমন্ত অবস্থাতেও প্রায়ই আমাদের এই কথাটি মনে লাগিয়া থাকে যে, আমরা হাল্‌কা কাপড় পরিয়া আছি। যদি স্বপ্নে আমরা পথে বাহির হই, তবে তাহা এই রাত্রির কাপড়েই; পথের লোক কিন্তু এই অপরূপ পরিচ্ছদের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করে না। এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, এরূপ স্বপ্ন খুব সাধারণ। আরো একটী স্বপ্নের কথা লিখিতেছি—এ বিষয়ে অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। এটি বায়ুপ্রবাহে উড়িয়া যাওয়া কিম্বা শূন্যে ভাসিয়া চলার স্বপ্ন। একবার এই স্বপ্ন দেখিলে আবার যে দেখিতে হইবে তাহা একরূপ সুনিশ্চিত; এবং ইহার প্রত্যেক বারের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে হয়, "এর পূর্ব্বেও স্বপ্নে আমি আপনাকে শূন্যে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার এ আর স্বপ্ন নয়, প্রত্যক্ষ সত্য! শেষটা বেশ ভাল রকমই জানা গেল যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেরও নড়চড় হইতে পারে।" এই শ্রেণীর স্বপ্ন হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াই যদি কেহ চেষ্টা করেন, তবে অবস্থার বিশ্লেষণ-দ্বারা স্বপ্ন দেখিবার কারণাবলী নির্ণয় করিতে পারিবেন। তিনি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার পায়ের নীচে কোন অবলম্বন নাই। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি যে শয়ন করিয়া আছেন সে জ্ঞান না থাকায়, অথচ তাঁহার

পদদ্বয় যে ভূমিস্পৃষ্ট নহে, এ অনুভূতিটুকুও বর্ত্তমান থাকায়—তাঁহার মনে হয় যেন তিনি শূন্যে ভাসিতেছেন! ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, স্বপ্নে মানুষ যখন ওড়ে, তখন কাৎ হইয়াই ওড়ে! জাগিয়া উঠিলে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে-পাশে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন, স্বপ্নে ঠিক সেই পাশেই কাৎ হইয়া উড়িতেছিলেন! সেই উড়িয়া চলিবার চেষ্টায় পার্শ্বদেশে যে একপ্রকার সঙ্কোচন অনুভূত হইতেছিল—বাস্তবিক তাহা শয্যার সহিত দেহের স্পর্শানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রকার স্পর্শানুভূতি আমাদের দৃষ্টি-মণ্ডল অবধি সঞ্চারিত হইয়া দৃষ্টি-মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্দু-গুলিকে কিরূপ নানা মূর্ত্তি ও আকৃতিতে রূপান্তরিত করে, তাহার আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ম্যাক্স সাইমন একটী অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যেন পাশাপাশি দুইটী স্বর্ণস্তূপ রহিয়াছে। ইহারা উচ্চতায় সমান নয়। কোন কারণে তাঁহাকে যেন স্বর্ণ-স্তূপ দুইটীকে সমান-উচ্চ করিতে হইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা করিতে পারিতে-ছিলেন না এবং না-পারার দরুণ মনে মনে বিষম অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। প্রতি বারের ব্যর্থতা যখন তাঁহার হৃদয়ের গুরু ভার বাড়াইয়া তুলিতেছিল, তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার একখানি পা বিছানার চাদরে জড়িত হইয়া পড়ায় পদদ্বয় অসম-অবস্থায় রহিয়াছে—ঘুমন্ত অবস্থায় পদদ্বয়কে সম-অবস্থায় আনা তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিতে-ছিল না। এই অসামঞ্জস্যের অনুভূতির সহিত দৃষ্টি-মণ্ডলের কোন বিশেষ অবস্থার সম্মিলনে স্বপ্নে দুইটী অসমান স্বর্ণ-স্তূপের সৃষ্টি হইয়াছে।

নিদ্রাকালে দেহের উপরের স্পর্শানুভূতি অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরের অন্ত্র ও স্নায়ু মণ্ডলীর বিপর্য্যয়ের অনুভূতি অধিকতর প্রখর হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় কাজে ব্যস্ত থাকি বলিয়া দেহের আভ্যন্তরীন এই পরিবর্ত্তন আমরা সহজে অনুভব করি না। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে, কণ্ঠপ্রদাহ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠনালীতে একরূপ বিশ্রী প্রদাহও অনুভূত হয়। জাগিয়া উঠিয়া কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই অনুভব করা যায় না এবং স্বপ্নকে স্বপ্ন ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরেই হয়ত স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার সত্যে পরিণত হয়! মৃগী রোগ, হৃৎপিণ্ড-সম্বন্ধীয় পীড়া প্রভৃতি নানা ব্যারামে রোগীর পূর্ব্বানুভূতির অনেক কথা শুনা যায়। কাজেই সপেন্‌হয়রের মত দার্শনিক পণ্ডিত যে স্বপ্নের ভিতর হৃদয়ে এক আকস্মিক ব্যাকুলতা এবং বিবেকের দুয়ারে এক অপূর্ব্ব বাণীর প্রতিধ্বনি অনুভব করিয়াছিলেন, কিংবা আর্টিগ্‌নেসের ন্যায় চিকিৎসক যে কোন কোন বিশেষ ব্যাধি-নির্ণয়ে স্বপ্ন-বিবরণের উপর নির্ভর করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সম্প্রতি মস্‌ টিসি—যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি,—দেখাইয়াছেন, আমাদের

পাকস্থলী, ফুসফুস এবং ধমনীর বিপর্য্যস্ততার ফলে আমরা কিরূপে বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার মোদ্দা কথাটা এই—আমরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রা যাই, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়াদি বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলে—অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য অনুভূতি বা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, এরূপ ধারণা ভুল। কারণ, তখনও আমাদের ইন্দ্রিয়াদি পূর্ব্বের ন্যায়ই সজাগ থাকে। তাহাদের অনুভব-শক্তি জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় তেমন অভ্রান্ত হয়না সত্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় এমন-সব জিনিষ আমরা অনুভব করিতে পারি, জাগিয়া যাহা করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সর্ব্বসাধারণের সম্পর্কিত যে জগৎ, তাহাতেই বাস করি, কিন্তু নিদ্রাকালে আমাদের সম্পর্ক শুধু নিজেদের সঙ্গেই। এ-অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষেত্র একদিকে সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের অনুভব-শক্তি বিশেষভাবে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে ইহার তীক্ষ্ণতা একটু ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তাই নিদ্রাকালে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা প্রায়ই এলোমেলো ঝাপ্‌সাভাবে। যাহা হউক, এই সমস্ত অনুভূতিই কিন্তু আমাদের স্বপ্নের প্রধান উপাদান।

শুধু এই অনুভূতিই স্বপ্ন ঘটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ ইহা অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট এবং অনিশ্চিত। স্বপ্নের অন্যান্য উপাদান পূর্ব্ববর্ণিত বর্ণ-বিন্দু ও আকৃতিসমূহ, যাহা চোখ বুজিলে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তাহাদেরও কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। সাদা জমিতে কতকগুলি কালো দাগ,—স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট ইহারা কোন একখানা পুঁথির পাতার মূর্ত্তি, কিংবা নবনির্ম্মিত গৃহের কালো পর্দ্দা-ঝুলানো সম্মুখ ভাগ, কিংবা অন্য আরো নানাপ্রকার রূপও গ্রহণ করিতে পারে। এই-সব অনির্দ্দিষ্ট উপকরণ হইতে কে একটী নির্দ্দিষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিবে?—আমাদের স্মৃতি। স্মৃতিই স্বপ্নের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

স্বপ্ন সাধারণতঃ নূতন-কিছুই সৃষ্টি করে না। অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, যাহাতে স্বপ্নে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সৃষ্ট হওয়ার কথা শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেহালার গীত-রচয়িতা তার্ত্তিণি সম্বন্ধীয় একটি সুপরিচিত কাহিনীর এখানে উল্লেখ করিব। একটী Sonata রচনা করিবার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, শয়তান (The Devil) আসিয়া তাঁহার বেহালাটা তুলিয়া লইল এবং তাঁহার ঈপ্সিত Sonataটি চমৎকার ওস্তাদী হাতে বাজাইয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া তার্ত্তিণি স্বপ্নের স্মৃতি হইতে সেই Sonata টী লিখিয়া লইলেন—তাহাই পরে "Devil's Sonata" নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। এই-সব প্রাচীন কাহিনীর কোন্‌টী ইতিহাস্ আর কোন্‌টী কিম্বদন্তী তাহা নির্ণয় করা শক্ত। এরূপ স্থলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভিন্ন কোন কাহিনীকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা

যায় না। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ষ্টীভেন্‌সনের কথা বলিতেছি,—একটী অতি-বিস্ময়কর প্রবন্ধে (A Chapter on Dreams) তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত মৌলিক গল্পই তিনি একরূপ স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ষ্টীভেন্‌সনের জীবনে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তিনি এক অদ্ভুত অবস্থায় (in a psychical state) জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সে সময় তিনি কখন্ জাগিয়া আর কখন্ যে ঘুমাইয়া থাকিতেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আমাদের ত ইহাই ধারণা। কোন সমস্যার সমাধান, অসুবিধা-দূরীকরণ, কল্পনা হইতে সাহিত্য-সৃষ্টি প্রভৃতির পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমাবেশ ও বিশ্লেষণ করিবার মত মনের অবস্থা যখন মানুষের থাকে, তখন তাহারা বাস্তবিক-পক্ষে নিদ্রিত থাকিতে পারে না। অন্ততঃ মানুষের যে বৃত্তি-সমূহ এই-সব কার্য্য করে, সে বৃত্তিগুলিকে ঘুমন্ত-অবস্থার বলিতে পারি না। নিদ্রায় আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিদূরিত হয়; তখন কেবল আমাদের স্মৃতিই স্বপ্নের জাল বুনিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই এই স্মৃতিকে তখন আমাদের পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ইহা বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি—আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার আভাসও কোন দিন পাই নাই,—এখন নিদ্রিত অবস্থায় সেই স্মৃতি অতীতের গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে; আবার এমনও হইতে পারে যে জাগ্রৎ অবস্থায় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে—অন্যমনস্কভাবে, যে সকল বিষয় আমরা অনুভব করিয়াছি, ইহা সেই সকল ব্যাপারের স্মৃতি! অথবা এমনও হইতে পারে, যে, ইহা নানা ঘটনার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্মৃতি, এখান-সেখান হইতে ভাসিয়া আসিয়া ঘটনাচক্রে একত্র জোড়া লাগিয়া এক সামঞ্জস্য-হীন অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি নিদ্রাকালেও যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলে, তাই সে এই অসম্বদ্ধ ও দুর্ব্বোধ স্বপ্নেরও কারণ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়।—যাক্, যে প্রশ্ন আমরা তুলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি স্বপ্ন-রচনায় এই যে মাল-মসলার জোগান দেয়, তাহা ঐ স্মৃতির সাহায্যেই দেয়—এবং এই যে বিবিধ অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অনুভূতি, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, এগুলিকে সঠিক, সুসমঞ্জস এবং সুস্পষ্ট আকারে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা, ঐ স্মৃতিরই শুধু আছে!

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

ঝরা-পাতার গান

লুটিয়ে আছি গাছের তলে
ব্যথায় ভরা প্রাণ,
পথের শত পথিকজনে
গাইব দুখ-গান।
ছোট্ট বটে এ-বুকখানি,
ছোট্ট কথা নয়;—
আলো-বাতাস অনেক-দিনের
এই বুকেতে রয়।
শাখার শিরে ফাগুন-প্রাতে
মেলছু যবে আঁখি,
আকাশ থেকে চুমা দিলে
সপ্ত-রঙের পাখী।
বাতাস এসে কানে-কানে
দিয়ে গেল গান;
রৌদ্র-ঝারা ফুটিয়ে গেল
বুকের মাঝে প্রাণ।
গাইল কোকিল কোন্ বনেতে—
উছল সুধা-সুর,
বইছে আজো শিরায়-শিরায়—
পরাণ পরিপূর।
বৈশাখেরি রুদ্র হাওয়া,
মেঘের গরজন,
তাদের সাথে কতই খেলা
—ভয়ের আলোড়ন!
গাঁথা আছে এই বুকেতে
বর্ষা-ধারার গান,
চম্‌কে-দেওয়া তড়িৎ-শোভা,
নদীর কলতান,
মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের
স্বপন-পূর্ণিমা,
অস্ত-যাওয়া রক্ত রবির
স্বর্ণ-গরিমা।
দুই-শালিখের গোপন-কথা
এই-বুকেতে রয়,
পাপিয়ারি আকুল উছাস,
প্রেমের অভিনয়।
রঙের ভাতি, পাখীর গীতি,
ঋতুর অভিনয়,
যা' দেখেছি, যা' পেয়েছি
সবাই বুকে রয়;—
লুটিয়ে আছি ধূলার সাথে
আজ্‌কে ভাঙা-প্রাণ,
তাদের কথা—হাজার ব্যথা
জাগ্‌ছে অফুরাণ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

স্যাবাইন-রমণী *

নাটিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[চারিধারে জমাট অন্ধকার পত্নী-বিরহ-কাতর পতিগণের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে—বোধ হয়, বৃষ্টি পড়িতেছে, হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে এবং সম্ভবত আকাশ ঘন মেঘাবৃত]

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—দুইধারে দুইদল স্যাবাইন রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতেছে, মুখে বুলি, "পঁচিশ মিনিট ব্যায়াম করলেই শরীরের সব অসুখ আর বেদনা সেরে যায়"। মঞ্চের মাঝখানে পুত্রবান পিতার দল একসার লম্বা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে; প্রত্যেকের কোলে একটী করিয়া সন্তান—তাহাদের মাথা ক্লান্তভাবে একপাশে ঢুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ভঙ্গীতে গভীর হতাশা! বড় করুণ ও হৃদয়-ভেদী দৃশ্য। অনেকক্ষণ আর কিছু শোনা গেল না, কেবল সেই অস্ফুট স্বর, "পঁচিশ মিনিট রোজ এমনি ব্যায়াম করলে..."]

মারটিয়াসের প্রবেশ, তাহার হাতে একখানা চিঠি।

মারটিয়াস। মিলেছে! স্যাবাইনগণ, আমাদের স্ত্রীদের ঠিকানা—মিলেছে!

অস্পষ্ট স্বর। ব্যস্, ব্যস্, ঠিকানা পাওয়া গেছে!

(মারাটিয়াস তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ছোট ঘণ্টা বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল)

অনেকে। চুপ, চুপ!

মারটিয়াস। স্যাবাইনগণ, দীর্ঘসূত্রতা আর কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার জন্য ইতিহাস কখনই আমাদের নিন্দা করবে না—দীর্ঘসূত্রতা বা অনিশ্চয়তা স্যাবাইনদেরই চরিত্রগত নয়—তাদের প্রবল প্রচণ্ড স্বভাব যুক্তি কি অভিজ্ঞতার লৌহদ্বার-পথে রুদ্ধ হবার নয়। হে পত্নী-হারা স্বামীগণ, স্মরণ করুন—হীন দস্যুদল যে-রাত্রে আমাদের অসহায়া রমণীদের হরণ করে, তার পরদিনকার সেই সকালবেলার কথা একবার স্মরণ করুন। স্থানের সীমা লঙ্ঘন করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পায়ে ঠেলে বিকট হুঙ্কারে দেশ প্রতিধ্বনিত করে চঞ্চল পদ-ক্ষেপে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছিলুম, ভদ্রগণ, একবার সে কথা স্মরণ করুন—

(স্যাবাইনগণ ভীতভাবে চুপ করিয়া রহিল)

মারটিয়াস। সমবেত ভদ্রবৃন্দ, স্মরণ করুন, কৈ—?

ভীতস্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—প্রেয়সী আমার—ওহো, কোথায় তুমি!

(স্যাবাইনগণ নির্ব্বাকভাবে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

মারটিয়াস। (উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সজোরে)। সেই খবরের আফিসে—হাঁ, সেইখানে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি আপনাদের মনে আছে? সে হতভাগা আফিস এ-পর্য্যন্ত কোন খবরই

---

* Leonid Andreyeff রচিত Sabine Womenএর অনুবাদ।

পায়নি আর পুরানো ঠিকানা ছাড়া কোন সংশোধিত তালিকাও তাদের নেই... সাতদিন ক্রমাগত সন্ধানের পর আমরা কি বিষম বিড়ম্বিত হয়েছি! শেষে একদিন জলন্ত উত্তর এল—'কোথায় চলিয়া গিয়াছে'—কিন্তু বন্ধুবর্গ, আমরা তাতে কি সন্তুষ্ট ছিলুম?—মনে করে দেখুন।

[স্যাবাইনগণ নির্ব্বাক রহিল]

মারটিয়াস। না। আমরা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে স্থির থাকিনি। নীরস হলেও কথাটা একবার শুনুন—এই আঠারো মাসে কি করেছি, তা একবার শুনুন। সমস্ত বিখ্যাত খবরের কাগজে সংবাদ-দাতাদের পুরস্কার ঘোষণা করে' বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের আহ্বান করেছি, তাঁরা প্রতিরাত্রে নক্ষত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের অসহায়া স্ত্রীদের ঠিকানা ঠাওরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন—

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—প্রেয়সী আমার—ওহো ঃ—

মারটিয়াস। আমরা যে কেবল এক হাজার মুরগির ছানা, হাঁসের বাচ্চা, আর ধাড়ি রাজ হাঁস বলি দিয়েছি, তা নয়—উদরস্থ পাখী বা জন্তুর কাছ থেকে খবর পাবার আশায় হাজার হাজার বেরালেরও পেট চিরেছি! কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমস্ত অমানুষিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঐ আকাশের নক্ষত্রগুলো, যাদের পানে আমরা প্রত্যহ সকরুণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতুম—নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় তারা আমাদের কোন খবরই দেয়নি! খবরের আফিসে বরং খবর একটু মিলেছিল,—চলে গেছে, তারা চলে গেছে! কিন্তু কোথায়? কোন্ অজানার দেশে?

[স্যাবাইনদের মধ্যে চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল]

ভীত স্বর। প্রসারপিনা! প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। বন্ধুগণ—নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে কি আশ্চর্য্য উত্তরই আমরা পেলুম! ওরা অত উপরে থেকে জগতের সমস্ত জানে, কিন্তু—যাক, আমাদের সাফল্যের কথা আমি সগর্ব্বে বলছি, শুনুন। যে-সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় আমাদের বিজ্ঞ আইন-বেত্তারা কি করছিলেন, সে কথা একবার আপনারা স্মরণ করুন—কৈ, স্মরণ হয় কি?

[সকলে নির্ব্বাক]

মারটিয়াস। ভদ্রমহোদয়গণ, স্মরণ করুন। আপনাদের সঙ্গে কথা কওয়া দায় হল, দেখছি'। আপনারা সব মূর্ত্তির মত মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে! আশ্চর্য্য! আপনাদের সকলের সে সব কথা মনে আছে বলেই আমার বিশ্বাস, কেবল বিনয়াধিক্য-বশত মুখে প্রকাশ করছেন না। না? বলুন, মনে করুন, কৈ, বলে ফেলুন। সে-সময় আমাদের আইন-বেত্তারা কি করছিলেন?

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—ও হো হো—কোথায় তুমি?

মারটিয়াস। কে ওখানে? চুপ! এর মধ্যে বার বার প্রসারপিনাকে টেনে আনছ কেন? আচ্ছা, আমি আপনাদের সাহায্য করছি—আমরা ব্যায়াম অভ্যাস করছি কেন, তা আপনারা জানেন ত—কেন, বলুন।

ভীত স্বর। (পিছন হইতে) আমাদের দেহ সবল করবার জন্য—

মারটিয়াস। (সোল্লাসে) হাঁ—ঠিক বলেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, সবল দেহে আমাদের কি প্রয়োজন? আপনারা ধৈর্য্য-রক্ষা অসম্ভব করে তুললেন, দেখ্‌ছি, আপনাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে দিলুম—এখন বলুন, সবল দেহ নিয়ে কি হবে?

দ্বিধাপূর্ণ স্বর। আমরা যুদ্ধ করব।

মারটিয়াস। (হতাশভাবে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া) হা ভগবান—যুদ্ধ করব! আর এ-কথা একজন স্যাবাইনের মুখে শুনতে হল! যারা আইনের বন্ধু, নিয়মের দাস, বিবেকের পুত্র, ন্যায়-পরায়ণতার অবতার,—তারাও বলবে, যুদ্ধ করবার জন্য সবল দেহের প্রয়োজন! এ কথা বলুক সেই নীচ দস্যুরা—আমাদের সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত স্ত্রীদের যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই রোমানদের মুখেই শুধু এ কথা সাজে!

ভীত স্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। তুমি চুপ করবে কি? প্রসারপিনা! যেমনই কাজের গোড়ার তত্ত্বে গিয়ে পৌঁচেছি," অমনি তুমি প্রসারপিনা প্রসারপিনা বলে ডাক ছাড়ছ! ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বুঝতে পেরেছি, এ বিরহ-যাতনায় আপনাদের স্বতঃ-উজ্জ্বল স্মৃতি আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই বেশ, আমি নিজেই সব সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। সেই রোমানদের ঠিকানা জোগাড় করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে',—বুঝেছেন কি—সে সমস্ত পথ ভারী ভারী আইনের বইগুলো—সমস্ত বিধিবিধান আর পুনর্বিচারের মীমাংসা-সংগ্রহ—অর্থাৎ বুঝতে পারছেন কি—আমাদের বিবাহের ন্যায়সঙ্গতি আর ওর নাম কি, হরণের বে-আইনী অপরাধ প্রমাণের জন্য উকিলেরা যে চারশো' খণ্ড পুস্তক সঙ্কলন করেছেন—সে সমস্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমাদের আজ শক্তির প্রয়োজন! ন্যায়-সঙ্গত অভিযোগ আর নির্ম্মল বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমরা সেই দস্যুদের আইনের জোরে বুঝিয়ে দেব যে, তারা চোর, আর স্ত্রীদের বুঝিয়ে দেব যে তারা অপহৃত—শুনে আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠবে! এখন যখন তাদের ঠিকানা পাওয়া গেছে, তখন তাদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। চেয়ে দেখুন, বন্ধুগণ—

(চিঠিখানি নাড়িতে লাগিল এবং স্যাবাইনরা পায়ের আঙুলে ভর দিয়া চাহিয়া রহিল)

—একজন 'অনুতপ্ত তস্কর' এই নাম দিয়ে একখানি চিঠি এসেছে। না জেনে-শুনে পাপ করার জন্য এক অজানা বন্ধু যথেষ্ট অনুতাপ করে এ চিঠি লিখেছে—সে জানিয়েছে যে, আর কখনও এ রকম ভাবে কারো স্ত্রীকে সে হরণ করবে না; তা ছাড়া ভগবানের কাছে সে দয়া প্রার্থনা করেছে। নামটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা—বড় জলের ফোঁটায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে—বোধ হয়, চোখের জলেই—দেখুন, এই ত বিবেকের শক্তি! সে আরও জানিয়েছে যে, আমাদের স্ত্রীদের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেছে—

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। আবার! তুমি শুনবে না? তোমার প্রসারপিনা তো একটা ঘরের ব্যাপার

বই নয়! ঠিক যে-সময় আমরা সাধারণ সমস্যা-সমাধানে লেগে গেছি—একটা মতলব ঠাওর করে এনেছি—সে সম্বন্ধে সব কথা এখনি বলছি—যে সময় আমরা জয় বা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, সে সময় তুমি কিনা কোথাকার এক তুচ্ছ প্রসারপিনা না কি নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছো! এ সমবেত-মণ্ডলীর নামে আমি তোমায় চুপ করতে বলছি! চুপ কর। ভদ্রবৃন্দ, আপনারা অগ্রসর হোন! সোজা হয়ে দাঁড়ান! সারবন্দী হয়ে দাঁড়ান—বেশ স্ফূর্ত্তি করে এগিয়ে আসুন। না, পাগল করলে, দেখছি! ডান দিক কোন্‌টা, বাঁ দিক কোন্‌টা, তাও কেউ জানেন না? বলি, যাচ্ছ কোথায় হে তুমি? থামো—

[একটি সার-ছাড়া স্যাবাইনকে ধরিয়া বুঝাইতে লাগিল] তোমার ডান পা কোন্‌টা জানতে চাও ত সোজা হয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াও,—এবার উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াও। না, না, মুখ দক্ষিণ দিকে আর পিঠটা পূবে। আরে, তোমার মুখ কোথায়? ওহে, ওটা তোমার মুখ নয়, ওটা তোমার পিঠ, পিঠ—এই তোমার মুখ—বুঝেছ? নাঃ, এ অসহ্য! তোমার ডান্ পা কোন্‌টা জানতে চাও ত পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখ। আপনাদের কারও কাছে ছুরি আছে? সব পকেট ওল্টান্। অত্যাচারের কোন চিহ্ন যেন সঙ্গে না থাকে! যাতে কাটে বা খোঁচা লাগে—এমন কোন অস্ত্রও কাছে রাখা সঙ্গত হবে না! জানেন বন্ধুগণ,ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ আর নির্ম্মল বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এবার বিধি-বিধানের এক-একখানা বই সব হাতে নিন। বেশ! —বাঁধা হলে ভালই হোত—যাক, সে পরে দেখা যাবে। এখন বুঝলে কি, সবল দেহে কি প্রয়োজন? চমৎকার, সুন্দর! ভেরীবাদক, তোমরা সব আগে যাও, মনে রেখো—"অপহৃত স্বামীর অভিযান" সেই সুরটা বাজাতে হবে! চল—না, না, থামো—কেমন করে' চলতে হয়, জানো?

[স্যাবাইনগণ নির্ব্বাক রহিল।]

মারটিয়াস। জানো না? বেশ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দু'পা এগোও, এক পা পেছোও। সামনে দু'পা এগিয়ে যাওয়ার অর্থ, আমাদের প্রচণ্ড আত্মার অনির্ব্বাণ অনল-তুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য অগ্রগতির চিহ্ন এ—আর এক পা পেছুনো অর্থাৎ এ যুক্তি, অভিজ্ঞতা—পরিণত মনের চিহ্ন। এতে বোঝাচ্ছে যে আমরা কাজের ফলাফল বিচার করছি—ঐ এক পা পেছিয়ে যাওয়াতেই আমাদের সুমহান অতীত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ,আমাদের সনাতন কুলধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলছি। ইতিহাস লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না, আর আমরা স্যাবাইনরা এই গৌরবময় মুহূর্ত্তে আমরাই ত ইতিহাস। ভেরীবাদক, ভেরী বাজাও, ভেরী বাজাও!

[ভেরীর কাতর বিলাপধ্বনি একবার যেন হঠাৎ সামনের দিকে হেলিয়া ধীরে ধীরে পিছনের দিকে দুলিয়া গেল এবং সমস্ত স্যাবাইন-সৈন্য সেই সঙ্গে অগ্রসর হইল, দুই পা সম্মুখে—এক পা পিছনে—এই নিয়মে ধীরে ধীরে তাহারা রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য, প্রথম অঙ্কেরই মত, তবে এখানে-ওখানে সুশৃঙ্খলতার চিহ্ন বর্ত্তমান। একটি

কুটীরের কাছে একজন রোমান অলসভাবে দাঁড়াইয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে নাকে হাত বুলাইতেছে—বামদিকে পশ্চাতে সেই একই ধরণে গম্ভীরভাবে স্বামী-সৈন্যদল নিয়ম মত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে—দুইপা আগাইতেছে, এক পা পিছু হঠিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই রোমানরা একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইল; পরে নাকে হাত না বুলাইয়াই কৌতূহলের সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল—তাহাদের মন্থর গতি দেখিয়া সেই রোমানটি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইল এবং জোরে হাই তুলিয়া অলসভাবে হাত পা নাড়িয়া পাশের একটা পাথরে অবশভাবে বসিল—মারটিয়াসের ইঙ্গিতে ভেরী থামিয়া গেল।]

মারটিয়াস। (হতাশভাবে) স্যাবাইনগণ, থামো, থামো, সব থামো—

(স্যাবাইনরা স্থিরভাবে দাঁড়াইল)

মারটিয়াস। ওহে, সব থামো, থামো। আরে, এ গড়ানে পাথরকে কি কিছুতেই থামানো যাবে না! থামবে না? হাঁ, হাঁ, এবার থেমেছে। সব ঠিক হও—ভেরীবাদক, তোমরা সব পিছনে যাও—অধ্যাপকগণ, আপনারা সামনে আসুন—ওহে, সব এবার ঠিক হয়ে দাঁড়াও—

[ভেরীবাদকের দল পিছনে এবং অধ্যাপকগণ সম্মুখদিকে গেলেন এবং বাকী সকলে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আপনারা সব ঠিক হোন—

[অধ্যাপকগণ তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া বসিয়া এক একটি ছোট টেবিল পাতিয়া তাহার উপরে হাতের সেই আইনের মোটা বইগুলি রাখিলেন, তারপর খড় খড় শব্দ করিয়া বই খুলিলেন, যেন বন্দুক-ছোড়ার মত শব্দ হইল—রোমানটি (সে সিপিও) উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া পরিচিতের মত কথা কহিল]

সিপিও। বলি, মশায়রা এখানে কেন? ব্যাপার কি? আমায় কিছু করতে হবে নাকি? যদি সার্কাস করতে এসে থাকেন, তাহলে আগে থেকেই বলে রাখছি, মঞ্চ এখনো সব তৈরি হয়নি—

মারটিয়াস। (গম্ভীরভাবে) চুপ করো, নীচ দস্যু—(স্যাবাইনদিগকে)—স্যাবাইনগণ, এতদিন পরে আমরা সেই অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁচেছি। আমাদের পিছনে আছে, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা নির্জ্জনতা—কিন্তু সামনে দ্বন্দ্ব, ভীষণ দ্বন্দ্ব,—ইতিহাস যা কখনো শোনে নি! স্যাবাইনগণ, উত্তেজিত হয়ো না—নিজেদের সংযত করো—শান্ত হও—ভিতরের ক্রোধকে সংযত রেখে অদৃষ্টের ফলের জন্যে ধীরভাবে অপেক্ষা করো—স্মরণ রেখো—আমাদের এখানে আসার কারণ কি!

(স্যাবাইনগণ সব নিস্তব্ধ রহিল)

মারটিয়াস। স্মরণ করো—ওহে সব স্মরণ করো, এ-সব মোটা মোটা আইনের বইগুলো নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বেড়াতে আসিনি—বলো, বলো, আমরা এসেছি কেন?

সিপিও। কৈ, মশায়রা স্মরণ করুন, চট্‌পট্ বলুন, বলুন—

মারটিয়াস। (সিপিওকে) ওহে, ভেবে

দেখচো কি! তোমরা সব সময়েই এইরকম নির্ব্বাক—

সিপিও। আপনার কিন্তু বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়—

মারটিয়াস। সেইটেই একমাত্র সত্য—পাথরের মূর্ত্তির মতই এরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—কেবল চোখের পাতা কাঁপানো ছাড়া এরা আর কিছুই করতে পারে না। আচ্ছা, "স্মরণ করুন, সব স্মরণ করুন" এই কথাগুলো জোর করে না বলে কেউ ভাল বক্তৃতা দিতে পারে?

সিপিও। [মাথা নাড়িয়া] না, তা পারে না—আর তা না হলে অদ্ভুত শোনাবে কি করে?

মারটিয়াস। ঠিক, ঠিক বলেছো—এটা দেখচি, তুমি বুঝতে পেরেছো—কিন্তু এদের জন্য—

স্যাবাইনদের ভিতর হইতে কম্পিতস্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার—ওঃ, কোথায় তুমি?

সিপিও। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঐ যে, উনি বোধ হয় স্মরণ করেছেন!

মারটিয়াস। [অবজ্ঞাভরে] হ্যাঁ—ও সব সময়েই স্মরণ করছে। স্যাবাইনগণ, সব ঠিক হও—এইবার আমাদের স্ত্রীদের উপর চূড়ান্ত দাবী বসাবো—যদি ওদের বিবেক এখনো না জেগে থাকে, তাহলে ওদের ধিক্! ওহে নীচ দস্যু, তোমার বন্ধুদের সব ডেকে নিয়ে এসো—ভীষণ শাস্তির জন্য সকলে প্রস্তুত হও—

সিপিও। আচ্ছা, আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসি—

[কুটীরে গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ক্লিওপেট্রা, ও ক্লিওপেট্রা—বাইরে এসো—এরা কারা সব তোমাদের দেখতে চাইছে"—এককোণ হইতে উঁকি মারিয়া স্যাবাইনদের চিনিতে পারিয়া পলাস সানন্দে বলিল—"এদের স্বামীরা এসেছে। রোমানগণ চীৎকার করে সব ওঠো, ওঠো, দেখ, এদের স্বামীরা সব এসেছে"—জলভরা চোখে মারটিয়াসের দিকে দৌড়িয়া গিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিল—মারটিয়াস একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পলাস বারবার বলিতে লাগিল,—"এদের স্বামীরা এসেছে—এদের স্বামীরা এখানে এসেছে"—

ঘুম-ভরা চোখে রোমানরা যে-যার ঘর হইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইল এবং মঞ্চের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইল—যতক্ষণ না তাহারা সকলে একত্র হইল, ততক্ষণ মারটিয়াস বেশ নটের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্থূলকায় ভদ্রলোক। সত্যি, কি ঘুমই ঘুমিয়েছি! এমন সুখের ঘুম অনেকদিন ঘুমুনো হয়নি! রাজ্য বসাবার দিন সেই ঘুমিয়েছিলুম, আর আজ এই ঘুমুলুম! এ সব নির্ব্বাক অভিনেতারা এখানে কি করছে?

প্রথম রোমান। ওহে, এরা সব ওদের স্বামীরা—

স্থূলকায় রোমান। ও তাই বুঝি—কিন্তু আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে। প্রসারপিনা, একটু সরবৎ আনো তো—

স্যাবাইনদের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বর। প্রসারপিনা—ওঃ—ওঃ—ওঃ—

স্থূলকায় রোমান। ও আবার কি চায়? ও কি আমার স্ত্রীকেই ডাকছে নাকি?

প্রথম রোমান। যে ডাকছে, সে যে স্বামী—

স্থূলকায় রোমান। ওঃ, তাই বুঝি! ভুলে গেছলুম—আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে—সেই গরম গরম খাবার খেয়ে আর তোফা মনের সুখে ঘুমিয়ে আমার পিপাসা বড় বেড়ে গেছে—এখন একটা আস্ত পুকুর বোধ হয় শুষে ফেলতে পারি! কি বলবো, প্রসারপিনা খাবার যা তোয়ের করে! আহা, চমৎকার! সত্যি—ভাই সব—রান্নায় এমন ওস্তাদী হাত—সত্যি, কি বলবো?

প্রথম রোমান। থাক্, চুপ করো—

স্থূলকায় রোমান। আচ্ছা—কিন্তু ভাই, কেমন একটা ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম—ভাবলুম, খুব ঘুমচ্ছি আর হঠাৎ দেখলুম রোমটা পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—তারপর একেবারে ঝপ্ করে পড়ে গেল—

প্রথম রোমান। কিন্তু আমাদের স্ত্রীদের কি হোলো? তাদের সব ডাকাডাকি করা হচ্ছে, অথচ আসছে না কেন? কি বিশ্রী স্বভাব সব—

দ্বিতীয় রোমান। বোধ হয় কাপড়-চোপড় বদলাচ্ছে—

প্রথম রোমান। হায় রমণী, তোমার নামই হচ্ছে মায়া—হয়তো এসেই বলবে—অ, এরা বুঝি—এরা যে আমাদের সেই আগেকার স্বামীরা! সত্যি, স্ত্রীলোকদের মনস্তত্ত্বটা আমি মোটেই বুঝতে পারলুম না—ও আমার ধারণার বাইরে একেবারে—নাঃ!

চতুর্থ। ওহে, আমারও যে তেষ্টা পাচ্ছে—এ মরা মানুষগুলো কতকাল এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? ঐ যে, এরা আবার বাজনা এনেছে—নিশ্চয়, একটা সুরও অন্তত বাজাবে—দেখ, দেখ—এবার ওরা নড়ছে—না, জ্যান্তই!

মারটিয়াস। রোমানগণ, এতদিন পরে আজ আমরা সামনা-সামনি মিলেছি। আচ্ছা, সত্যি করে আমার কথার স্পষ্ট জবাব দাও। ওহে রোমানগণ, সেই বিশে-একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে তোমরা যে কাজ করেছিলে, তা কি তোমাদের মনে আছে?

[রোমানরা অপ্রতিভ হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল]

মারটিয়াস। ওহে, সব স্মরণ করো, তোমাদের মনেই পড়ছে না, এ কি সম্ভব? ভাবো, চেষ্টা করো, স্মরণ করে বলো, সত্যি বলছি, তোমাদের যতক্ষণ না মনে পড়ে, ততক্ষণ এক-পাও আমরা নড়বো না—

স্থূলকায় রোমান। (ভীত হইয়া পাশের রোমানকে চুপিচুপি বলিল)—তোমার বোধ হয়, মনে আছে, এগ্রিপ্পা? এ্যা, তোমারও মনে নেই! নিশ্চয় একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার হবে—কি বল?

রোমানরা। না, না, আমাদের কারোরই মনে নেই—এত বেশী ঘুমিয়েছি যে আমাদের স্মরণ-শক্তি বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে—সব ভুলে গেছি! আচ্ছা, আমরা বরং যখন যাবো, তখন বলো, কি ব্যাপার—তাইত, এদের মতলব কি?

মারটিয়াস। [উচ্চস্বরে] আচ্ছা, আমি

তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—রোমানগণ, সব শোনো, বিশে একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে এমন ভীষণ একটা অন্যায় পাপ কাজ তোমরা করেছ, যা ইতিহাসের পিঠে ঘন কালি লেপে দিয়েছে!—তোমাদেরই একদল লোক, তাদের পরিচয় আমি পরে দিচ্ছি—আমাদের সুন্দরী স্যাবাইন-রমণীদের দুর্বৃত্তের মত হরণ করে নিয়ে এসেছে—

সকলের মনে পড়াতে রোমনরা আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, ব্যাপারটা বুঝেছি—সত্যি কথা, খুব সত্যি হ্যাঁ, সেদিন বিশে এপ্রিলই বটে—

স্থূলকায় রোমান। (গম্ভীরভাবে) সত্যি, স্যাবাইনদের মাথা আছে, দেখচি। খুব মনে রেখেছে ত!

মারটিয়াস। আর তোমরাই হচ্ছো সেই দস্যুরা - হ্যাঁ, আমি জানি, এ কথা ঠিক! এখন হয় ত তোমরা গোলমাল করবে—কথাটা ওল্টাবার জন্যে কূট তর্ক তুলে নিতান্ত হীনের মত আইনের অপমান করবে—কিন্তু সেটী আর হচ্ছে না—সেইজন্যই আমরা একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন, আপনারা আরম্ভ করুন...

সারের শেষ থেকে একটানা সুরে অধ্যাপকরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—স্বরটি মনে হইল, স্থান ও কালের ও-পারস্থিত দেশ হইতে আসিতেছে—"স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-হরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম বিভাগ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পৃষ্ঠা; সাধারণ দস্যুতা বিষয়ে বলা যাইতেছে—অতি পুরাকালে—বর্ত্তমান সময়ের বহু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি নির্ভয়ে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদের মনে অবিচারের কথা মোটেই জাগে নাই, যেহেতু তাহাদের মন বলিয়া কোন পদার্থই ছিল না—সেই অতি-পুরাকালে—"

মারটিয়াস। শোনো, সব শোনো, রোমানগণ, মন দিয়ে সব শোনো—

সিপিও। আচ্ছা, একটু খাটো করে বলে ফেলো হে! মস্ত ভূমিকা ফেঁদে বসচে যে! অত কথা শোনবার যে সময় নেই!

মারটিয়াস। না, এ আর খাটো করা যাবে না—

সিপিও। কিন্তু দেখছো না, তোমাদের শ্রোতারা যে ঘুমোতে যাবে—সব ঘুমে ঢুলছে—

মারটিয়াস। এমন অবস্থা নাকি!

সিপিও। দেখছো না, ঢুলতে তো আরম্ভ করেইছে, আর ঘুমে ঢুলছে বলেই তোমাদের একটি কথাও ওদের কানে যাচ্ছে না—আচ্ছা, ভাল কথা, শেষ দিক থেকে আরম্ভ কর না—যাক—আচ্ছা, যা বলবার তা বল, মোদ্দা স্পষ্ট সোজা করে বলো—

মারটিয়াস। এ ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের। যাক্, তোমার বন্ধুদের অক্ষমতা গ্রাহ্য না করেও আমি স্পষ্ট বলছি—শোন—ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা আমাদের স্ত্রীদের হরণ করে খুব একটা বড়-অন্যায় কাজ করেছো আর তোমরাই হচ্ছো সেই নীচ দস্যুরা। কোনরকম বিদ্যার মারপ্যাঁচ দিয়েও এ কাজকে ন্যায়-সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারবে না—আর তা করতে গেলে, আকাশ-পাতাল এখনি কেঁপে উঠবে—

সিপিও। সত্যি—সত্যি কথা, এমন-কি, এটাও আমরা অস্বীকার করি না—

মারটিয়াস। অস্বীকার কর না? বেশ, তা হলে বল, আমরা এখানে এলুম কেন?

সিপিও। কি করে জানবো? বোধ হয় বেড়াবার মতলবে—

মারটিয়াস। না, তা নয়, এ সব প্রমাণ করবার জন্যেই আমরা এসেছি—তা হলে স্বীকার করছো, তোমরাই সেই দস্যু?

সিপিও। নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু ঐ দস্যু কথাটা, মনে হচ্ছে, যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

মারটিয়াস। ব্যাপারটা তোমরা সবাই বুঝেছ তো—না বুঝে থাকো, বলো—অধ্যাপকরা সব এখনও ঠিক হয়ে আছে। অধ্যাপকগণ, আপনারা ঠিক আছেন?

সিপিও। না, না, আর অধ্যাপক নয়। আগাগোড়া আমরা সব বুঝতে পেরেছি—ভাই সব, আমার কথায় সায় দাও, না হলে আবার অধ্যাপকের দল সুরু করবে—

রোমানরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছি—বেশ বুঝতে পেরেছি—

মারটিয়াস। আচ্ছা, তাহলে—এ-সব কিসের জন্যে?

সিপিও। আমরা কি করে' জানবো?

মারটিয়াস। এইখানেই তো বোঝবার গোলমাল। স্যাবাইনগণ, আনন্দধ্বনি করো, জয়ধ্বনি করো—এরা দোষ স্বীকার করছে। আমাদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থাতেই এরা বিবেকের প্রচণ্ড স্বর শুনতে পেয়েছে, ঐ যে আকাশ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছে! আমাদের কর্ত্তব্যের বাকী এখন সুধু ফিরে যাওয়া, আর—

কম্পিত স্বর। আমার প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—বন্ধু, ঠিক বলেছো। রোমানগণ—আমরা এনেছি আমাদের স্ত্রীদের নামের সম্পূর্ণ নির্ভুল তালিকা—সে ফর্দ্দ মিলিয়ে এখন ভদ্রলোকের মত তাদের ফিরিয়ে দাও—সব অনিষ্ট, সব ক্ষতি-সত্ত্বেও—ওর নাম কি, অধ্যাপকগণ, আইনের কথায় কি বলে···

অধ্যাপকগণ। ঝড়তি-পড়তি...

মারটিয়াস। না, না, না—ক্ষতি—হ্যাঁ, সব ক্ষতির জন্যেই তোমরা দায়ী। অধ্যাপকগণ, পাতাটা সব পড় তো—থাক্—আমাদের স্ত্রীরা সব আসছে—ভাই-সব, ঠিক হয়ে দাঁড়াও—মনকে দমন করে রাখো—তোমাদের বিশেষ করে বলছি, যতক্ষণ না বিচারের মীমাংসা হয়, ততক্ষণ হৃদয়ের আবেগকে সংযত করো। দু পা এগোও, এক পা পেছোও। থামো, থামো—স্যাবাইন-রমণীগণ, এসো, এসো—এই যে ক্লিওপেট্রা, এসো—

[রমণীরা মাটীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর অথচ বিনয়-নম্রভাবে মঞ্চের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল]

ক্লিওপেট্রা। (নতমুখে) যদি আমাদের তিরস্কার করতে এসে থাকো, মারটিয়াস,—তাহলে আগেই বলছি, আমাদের তিরস্কার করো না। আমরা অনেক বাধা দিয়েছি, অনেক চেষ্টা করেছি, এমন কি অত্যাচার করবার আগে পর্য্যন্ত আমরা মাথা নোয়াই নি—সত্যি বলছি, প্রিয়তম—

মারটিয়াস। তোমার জন্যে কাঁদিনি, এমন এক মুহূর্ত্তও আমার কাটেনি! সারা-দিনরাত তোমার জন্যে কেঁদেছি—

(কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার আভাসে অপর রমণীরাও কাঁদিতে লাগিল)

মারটিয়াস। শান্ত হও, ক্লিওপেট্রা—এরা নিজেদের দস্যু বলে স্বীকার করেছে—চলো, ক্লিওপেট্রা, এখন বাড়ী ফিরে চলো—

ক্লিওপেট্রা। (মুখ না তুলিয়া) আমার ভয় হচ্ছে, আবার তিরস্কার করবে। কিন্তু এখানে এদের সঙ্গে থেকে থেকে এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে—মারটিয়াস, এ-সব পাহাড় তোমার ভাল লাগছে না?

মারটিয়াস। ক্লিওপেট্রা, এ কি বলছো, বুঝতে পারছি না। পাহাড় নিয়ে কি হবে? কি বলছো তুমি?

ক্লিওপেট্রা। তোমাদের বোধ হয় রাগ হবে, কিন্তু সত্যি কথাটা বোঝ, আমাদের মোটেই দোষ নেই—মারটিয়াস, সত্যি বলছি, তোমার নিয়ম-মত আমরা কেঁদেছি কিন্তু তোমরা কি বলছো বা চাইছো, তার কিছুই বুঝতে পারছি না—আরও কাঁদতে বলো, কাঁদবো, আরও কাঁদবো। ভগ্নীগণ, এরা ভাবছে, আমরা এদের জন্যে যথেষ্ট কাঁদিনি। এসো ভগ্নীরা, এদের সে ভুল শুধ্‌রে দাও—কাঁদো, কাঁদো সকলে,—মারটিয়াস, তোমায় কত ভাল বাসতুম—

[রমণীদের চোখ অশ্রুর ধারা বহিল]

সিপিও। ক্লিওপেট্রা, শান্ত হও,—তোমাদের এ সময় উত্তেজিত হওয়া ভারি খারাপ। আর, মশাইরা, শুনছেন, আপনারা বাড়ী যান, বাড়ী ফিরে যান। ক্লিওপেট্রা, এসো—চলো, শোবে চলো—তুমি শোওগে—আমি খাবার-দাবার দেখছি—

মারটিয়াস। খাবার নিয়ে কি হবে? কি সব বলছো—ক্লিওপেট্রা, শান্ত হও, —ভিতরে একটা বোঝবার গোলমাল হয়েছে —তোমরা বুঝতেই পারছো না যে, তোমরা অপহৃত হয়েছো—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বল্লুম ত, তোমরা এখনি তিরস্কার করবে। সিপিও, প্রিয়তম, আমার রুমালখানা কি তোমার কাছে?

সিপিও। হ্যাঁ, এই যে নাও—

মারটিয়াস। আচ্ছা, রুমাল কি হবে—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) একটা রুমাল নিয়ে ঠাট্টা! কাঁদবার সময় আমার রুমাল না হলে চলে না যে! আর এ সব তোমারই দোষ মারটিয়াস! তুমি কি নিষ্ঠুর—

রমণীরা সকলেই কাঁদিতে লাগিল—স্যাবাইনরা এবং জন-কয়েক রোমানও কাঁদিতে লাগিল।

ভীত স্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। (গম্ভীর স্বরে) স্যাবাইনগণ, শান্ত হও, সংযত হও—ঠিক থাকো, নড়ো না। এক পলকের মধ্যেই আমি সব ঠিক করছি। বোধ হয়, আইনের দিক থেকে কোন গোলমাল হয়েছে! এ দুর্ভাগা রমণী ভাবছে যে, ওর রুমাল চুরি করেছে বলে ওকে দোষী করা হচ্ছে—স্বপ্নেও ভাবছে না যে, ও অপহৃত হয়েছে! এইটিই আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন (অধ্যাপকগণ পড়িবার উদ্যোগ করিলে রোমানরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল; সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিল)

সিপিও। স্বীকার কর, স্বীকার কর ক্লিওপেট্রা, তাড়া-তাড়ি স্বীকার কর, নৈলে এখনি ওরা আবার সুরু করবে—

ক্লিওপেট্রা। আমার স্বীকার করবার কিছু নেইত! এ-সবই মিথ্যা নিন্দা—

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আরম্ভ কর—

সিপিও। স্বীকার করো ক্লিওপেট্রা, বলো তাড়াতাড়ি! হায় হায়, ওরা মুখ খুল্‌লো বলে—এখুনি আবার আরম্ভ করবে। স্যাবাইনগণ, থামো, থামো, একটু দেরী কর —এরা স্বীকার করেছে—তোমাদের মুখ বুজোও অধ্যাপকগণ, এই যে,এই যে ক্লিওপেট্রা স্বীকার করছে—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, ভালো—আমি স্বীকার করছি—[অন্য রমণীদিগকে] ভগ্নীগণ, স্বীকার কর—

সিপিও। তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ, এরা সবাই স্বীকার করছে। সব ঠিক হয়ে গেছে—ঠিক হয়ে গেছে—ব্যস্, চুকে গেছে—

মারটিয়াস। (হতবুদ্ধি হইয়া) মশায়রা, আর একমিনিট দেরী করুন। আচ্ছা ক্লিওপেট্রা, বিশে-একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে তুমি আর এই সব রমণী এদের দ্বারা অপহৃত হয়েছো—এ কথা স্বীকার করছো?

ক্লিওপেট্রা। (অবজ্ঞাভরে) না, আমরা নিজেরা পালিয়ে এসেছি! লজ্জা হয় না বলতে?

মারটিয়াস। বলেছি, বুঝতে পাচ্ছে না। অধ্যাপকগণ—

ক্লিওপেট্রা। মারটিয়াস, তোমরাই অতি নীচ কাজ করেছো, তোমরাই ঘুমিয়ে ছিলে, আমাদের রক্ষা করনি—তোমরাই আমাদের এদের হাতে তুলে দিয়েছ—তোমরাই আমাদের ভুলে ছিলে, আমাদের ত্যাগ করেছো, আর এখন এসে আমাদেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলছো—আমরা পালিয়ে এসেছি। মারটিয়াস, আমরা হৃত হয়েছি, অতি হীনভাবে অপহৃত হয়েছি। (কাঁদিতে কাঁদিতে,) বিশ্বকোষ খুলছ কেন! যে-কোন রোম-ইতিহাসে এ-বিষয় পড়তে পারো ত, তাতে জ্বল্‌জ্বলে অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

সিপিও। (খুব জোরে) অধ্যাপকগণ, মুখ বুজোও, বুজোও বলছি। (অধ্যাপকদের মুখ খোলাই রহিল—রোমানরা অতিশয় ভয় পাইল এবং জনকতক মঞ্চ ছাড়িয়া পলাইল)

মারটিয়াস। রোমানগণ, স্যাবাইনগণ—সব শোন—এক মুহূর্ত্তেই সব গোলমাল আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এ গোলমালটা যন্ত্রগত—অধ্যাপক, দেখি, তোমার অবস্থাটা দেখি। এই তো—হুঁ, এটা আমার জানা উচিত ছিল। কব্‌জা ভেঙে গিয়েছে সেইজন্যে মুখ বন্ধ হচ্ছেনা। যাক্, বাড়ী গিয়ে ঠিক করে নেবো। এদের যে চুরি করে আনা হয়েছে সেইটে এরা স্বীকার করেছে—তাই যথেষ্ট! আমি নিজের কানে সে কথা শুনেছি—এতদিনে আমাদের কাজ সফল হলো—আকাশ-পাতাল একসঙ্গে কেঁপে উঠেছে —ক্লিওপেট্রা চলো, এবার বাড়ী ফিরি—বাস্তুদেবতার—

ক্লিওপেট্রা। আমি তোমার বাস্তুদেবতার কাছে ফিরে যেতে চাই না—

স্যাবাইন রমণীরা। চুলোয় যাক্ তোমাদের বাস্তুদেবতা! আমরা আর ফিরে যাব

না—এখানেই আমরা থাকবো। বেশ আছি এখানে। আমাদের অপমান করছো তোমরা! আমাদের সব হরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছো? রোমানগণ, আমাদের রক্ষা কর,—আমরা যাব না।

(অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে করিতে রোমানরা ক্রমশঃ পশ্চাতে সরিয়া গেল এবং রাগতভাবে স্যাবাইনদের পানে দেখিতে লাগিল)

একজন রোমান। রোমানগণ, সব অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হও—তোমাদের স্ত্রীদের রক্ষা করতে হবে—রোমানগণ, সব অস্ত্র নাও—সজ্জিত হও—

মারটিয়াস। (ঘণ্টা বাজাইয়া) ব্যাপার কি? এখনি একটা যুদ্ধ ঘটবে যে! ওঃ, আমার মাথা ঘুরছে। স্যাবাইনগণ—আমার মাথা ঘুরছে—

প্রসারপিনা। (অগ্রসর হইয়া ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে) রোমানগণ, উত্তেজিত হয়ো না—একা মারটিয়াসের সঙ্গে আমি একটু কথা কইবো—

(স্যাবাইনদের সার হইতে কম্পিত কণ্ঠের বিরহ-কাতর আহ্বান—প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার···ওঃ···

প্রসারপিনা। [ধীরে] কে? প্রিয়তম! কেমন আছ? মারটিয়াস, এখানে এসো, ভয় পেয়ো না—তোমার সব সৈন্যেরা পালাবে না। তোমার স্ত্রী ক্লিওপেট্রা কি আমরা কেউই আর বাড়ী ফিরে যাবো না—বুঝতে পারছো? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?

মারটিয়াস। অবাক হয়ে গেছি, ক্লিওপেট্রা, তা হলে আমি বাঁচবো কি করে? ক্লিওপেট্রাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না—আর সে যে আমার একেবারে আইন-সঙ্গত স্ত্রী—আচ্ছা, তুমি কি ভাবো, কোনরকমেই সে আসবে না?

প্রসারপিনা। না, কোনরকমেই না...

মারটিয়াস। তবে আমি কি করবো?—দেখতে পাচ্ছো, তাকে আমি কত ভালবাসি—তাকে না পেলে কি করে বাঁচবো?

(কাঁদিতে লাগিল)

প্রসারপিনা। আরে, কাঁদছ কি! মারটিয়াস—(আস্তে-আস্তে বলিল) সত্যি, তোমার জন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছে—আচ্ছা, তোমায় চুপি চুপি বলছি, শোন, একটা উপায়, কেবল এক উপায় আছে—তাকে চুরি করো···

মারটিয়াস। কিন্তু সে কি আসবে?

প্রসারপিনা। [ঘাড় নাড়িয়া] যদি চুরি করো, তাহলে না এসে কি করে থাকবে?

মারটিয়াস। কিন্তু সেটা তো ভারি অন্যায় কাজ হবে। বুঝেছি, আমায় কু-মতলব দিচ্ছ তুমি, যাতে অত্যাহিত করি—তাহলে আমার ন্যায়-বুদ্ধির কি হবে—না, তোমরা স্ত্রীলোক, তাই ভাবো, জোর যার মুল্লুক তার! হায় নারী—

প্রসারপিনা। থাক্, ও-সব কথা আগে অনেকবার শুনেছি। মারটিয়াস, দেবতারা যেদিন তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনটা ভারি খারাপ ছিলো। তোমরা যে কি রকম মুখ্যু, তা বলা যায় না—যদি আমাদের পুরুষের অধীনে থাকতেই হয়, তাহলে যারা বলবান, তাদেরই বেছে নেবো। আর বলবান ঐ ওরাই। তুমি কি ভাবো, আমরা বারবার

চুরি যেতে, আবার ফেরত্ চাইলেই ফিরে যেতে অর্থাৎ এই রকম একবার হারাতে আরবার ফেরত্ যেতে খুব ভালবাসি?

স্বর। প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার··

প্রসারপিনা। হ্যাঁ, এই যে প্রিয়তম, কেমন আছ?···আর লোকেরা আমাদের নিয়ে জিনিষপত্রের মত নাড়া-চাড়া করবে—যেই একজনের কাছে দুদিন কাটিয়েছি অমনি আর-একজন চুরি করে নিয়ে যাবে,—আবার যেই সে-নতুনটির কাছে দুদিন থেকে সরে গেছি, অমনি সে পুরোনো লোকটি এসে বলবেন—চলো, ফিরে চলো! সত্যি, মারটিয়াস, যদি এর বিরুদ্ধে লাগতে চাও, যদি আপনার স্ত্রীকে নিজের করে' নিতে চাও, তাহলে এক-কাজ করতে হবে—বেশ বলবান হতে হবে—কারো কাছ হতে মেগে নিয়ো না! আর স্ত্রীর জন্যে প্রাণপণে লড়ো অর্থাৎ যদি মরতে হয়, তাহলে তার রক্ষার্থেই মরো। সত্যি বলছি, মারটিয়াস, শোন, যে-স্বামী তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে-করতে প্রাণ দিতে পারে, সেই স্বামীর সমাধির উপর লুটিয়ে মরাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, গৌরব সে! মারটিয়াস, এটাও ঠিক জেনো, স্বামী খারাপ হলে স্ত্রীকেও খারাপ হতেই হবে—

মারটিয়াস। কিন্তু ওদের যে সব অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, আমাদের যে কিছুই নেই...

প্রসারপিনা। যাও, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আনো—

মারটিয়াস। তাছাড়া ওদের গায়েও বেশ জোর, কিন্তু আমাদের তো তা নেই—

প্রসারপিনা। যাও, গায়ে জোর করগে—সত্যি, মারটিয়াস—তুমি এমন মুখ্যু!

মারটিয়াস। (তার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া) তুমি কি মুর্খ, নারা, আমায় পরীক্ষা করছ! প্রলোভন দেখাচ্ছ! কিন্তু মারটিয়াস ভুলছে না! বেঁচে থাক্ আমাদের এই আইন! পাশব অত্যাচারে পর-স্ত্রীদের হরণ করতে চায় যারা, তারা তা করুক—বাড়ী ধ্বংস করতে হয় করুক—জিনিষপত্র ভাঙ্গে ভাঙ্গুক—আমরা কখনো কোনও আইন-বিরুদ্ধ কাজ করব না—আইন অমান্য করব না। এ হতভাগ্য স্যাবাইনদের দেখে জগৎ যদি হাসে হাসুক—তারা কখনো আইনের অপমান করবে না—আইনের বিরুদ্ধে যাবে না। সৎলোক দরিদ্র হলেও সম্মান পায়—সম্মানের দাম অনেক বেশী! আমরা সে ভব্যতার সম্মান খোয়াব না। স্যাবাইনগণ, ফিরে চলো, ফিরে চলো বন্ধুরা। সব কাঁদো, স্যাবাইনগণ, নয়নে ধারা বইয়ে কাঁদো—শোক করো সব, বুক চাপড়াও—আর কাঁদতে লজ্জা করো না—ওরা ঢিল মারে ত মারুক, ঠাট্টা করে করুক, তাতে কান দিও না, তোমরা শুধু কাঁদো—ওদের যা ইচ্ছে হয়, করুক! স্যাবাইনগণ, কাঁদো,—আজ লাঞ্ছিত অপমানিত আইনের জন্যে তোমরা কাঁদো মনুষ্যত্ব পদদলিত দেখে কাঁদো। কাঁদো, আর কাঁদো। সেই সঙ্গে এই কথাটি মনে রেখো—আইনের মর্য্যাদা অলঙ্ঘনীয়। স্যাবাইনগণ, চলো—সব ঠিক হও—ভেরীবাদকগণ, এবার অভিযানের সুর ধর। দুপা এগোও, এক পা পেছোও—দুপা এগোও, একপা পেছোও—

[রমণীরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল]

ক্লিওপেট্রা। মারটিয়াস, দেরী কর, একটু দেরী কর—

মারটিয়াস। দূর হয়ে যা, মায়াবিনী নারী —আমি তোকে চিনিনা, চাই না! আইনের অপমান! না, কথনো তা হবে না। ওহে, অত তাড়াতাড়ি নয়—আস্তে আস্তে চল সব—

[ভেরীতে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল—রমণীরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্যাবাইনদের দিকে যাইতে চাহিল; কিন্তু রোমানরা জোর করিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিল। জয়ী রোমানরা আনন্দধ্বনি করিল। হাস্য বা ক্রন্দন, কোন-দিকেই লক্ষ্য না করিয়া, আইনের মোটা মোটা বইয়ের ভারে নত হইয়া স্যাবাইনরা একই ভাবে চলিতে লাগিল—দুই পা আগাইয়া, একপা পিছাইয়া—মুখে এক-কথা, —"দুপা এগিয়ে, একপা পেছিয়ে ... ..."]

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

উগ্র-ক্ষত্রিয় পরিচয়। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্ধু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা, সেণ্ট্রাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শাস্ত্রাদি হইতে তথ্য-সংগ্রহ-দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, উগ্র-ক্ষত্রিয়গণ রাজপুত জাতি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; এবং তাঁহারা বেদোক্ত বাহুজাত উগ্র-রাজন্যবংশধর ক্ষত্রিয়। রচনাটি কথোপকথনের আকারে গ্রথিত।

উষসী। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ২০১-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। "সুনন্দা", "পৌষ-পার্ব্বণ", "পিতৃদায়", "আনন্দ-প্রদীপ", "ময়না" ও "রূপকথা"—এই ছয়টি গল্প এই গ্রন্থে আছে। "ময়না" গল্পটি ব্রেট-হার্টের একটি গল্প-অবলম্বনে লিখিত; বাকী গল্পগুলি মৌলিক। "পৌষ-পার্ব্বণ" ও "পিতৃদায়" গল্পদুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে—গল্পদুটি নিখুঁত। "পৌষ-পার্ব্বণে"র গোপাল ও সুরমা, এবং "পিতৃদায়ের" অলকা—এই তিনটি চরিত্র বেশই ফুটিয়াছে। অল্প ঘটনায় ও বিনা-আড়ম্বরে তাহাদের চিত্ত-বৃত্তি সুন্দর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। অপর গল্পগুলির বর্ণনায় লেখিকা ভাষাকে স্থানে-স্থানে বড় মোচড় দিয়াছেন—মাঝে মাঝে অনাবশ্যকভাবে ভাষাকে ফেনানোও হইয়াছে। যাই হোক, এ ত্রুটি সামান্যই; কালে সারিয়া যাইবে। ছোট গল্প-রচনায় লেখিকার হাত আছে। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই চমৎকার।

বিবেকানন্দ। (সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা)। শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার। কলিকাতা, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাত্মা বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব কর্ম্ম-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিবেকানন্দ ভারতের অসাধারণ প্রতিভাশালী কর্ম্মবীর। তাঁহার কীর্ত্তি-কথার যত অধিক প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থের রচনা চলনসই, তবে মাঝে মাঝে একটু মুরুব্বির ধরণে পাঠককে চমক লাগাইবার চেষ্টা আছে—সেটুকু, আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ পড়িবে। কারণ সূর্য্যের রশ্মি দেখাইতে বাতি জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

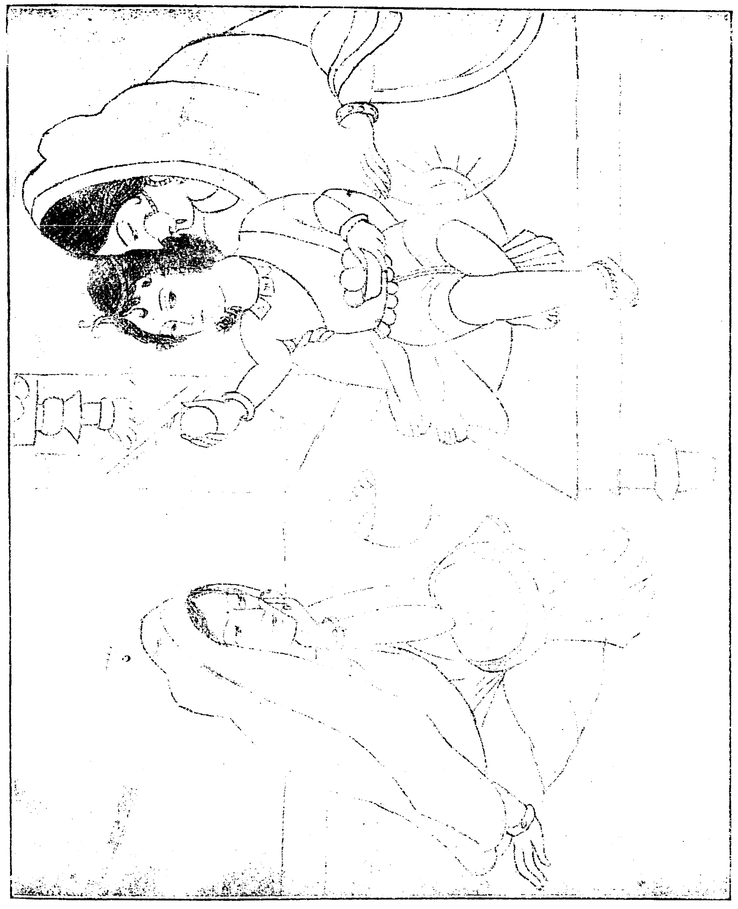

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত।

ভারতী

৪২শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৫ [১২শ সংখ্যা

বসন্ত সঙ্গীত

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

বসন্ত জেগেছে আজি প্রাণে ;
নিশা মোর সুখে ভোর, দুখের' গানে।
দখিণা বায়, বুলায়ে যায়—
সুবাস হাত গায়, মমতা দানে।
কভু শশি-অম্বরা, কভু তারকা ভরা,—
নিশীথিনী ;
নিদ্রা মায়াবিনী গো—
কি মন্ত্র ঢালে তার কানে কানে,—
জোছনা সে চুম্বনে ঢুলে পড়ে,—
তারকা হেসে ওঠে ঘুমের ঘোরে,—
ভবনে শান্তি নামে, বনে থামে পাখী,
শ্রান্তি-নিমীলিত অবনী-আঁখি ;
ব্যর্থ এ ফাগুন রাতি সবখানে,
গো সবখানে।
বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।
তন্দ্রাহীন দুনয়ন, ভাব বিহ্বল মন
ছুটে চলেছে কোন্ অজানা পানে
কে জানে !
(আমার) গানের সাথী, ধ্রুব তারকাটি
জোগায় আশার ভাষা সুরতানে।
বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

II	˙ সা	না	–পা	না।	১˙ সা	সা	গরা	–গা।	+ পক্ষা	–গা	–া	মা।
	ব	স	০	ন্ত	জে	গে	ছে০	০	আ০	০	০	জি
	৩˙ গা	–রা	সা	–া।	˙ সসা	–রগা	–মপা	–ক্ষা।	১ পা	–া	–া	–া
	প্রা	০	ণে	০	নিশা	০০	০০	০	মোর্	০	০	০

। সা না -পক্ষা -া। পা -া -মা -গা। -া -া -া -া।
সু খে •• • ভোর • • • • • • • •

। গা মা -া পা। মা -গা -রা -সা। সা -া -া -া II
দু খে • র গা • • • নে • • • •

II -া না না না। সা -া -া না। ধনর্সর্রা -র্সনা -ধপা ক্ষা।
• দ খি ণা বায়্ • • বু লা••• •• •• য়ে

। পা -া -া -া। ক্ষা ক্ষা -া ক্ষা। পা পা ক্ষপধ -পমগা।
যায়্ • • • সু বা • স হা ত গা•• য়••

। গা মা পা মা। -গা -া রসা -ন্সা II
ম ম তা দা • • নে• ••

II মা পা না না। না -া না না। -র্সা র্সা র্সা র্সা।
ক ভু শ শি অ • ন্ব রা • ক ভু তা

। র্সা র্সা র্রা র্সা। র্সা র্রা না র্সা।
র কা ভ রা নি শী থি নী

। সা -গা গা গা। র্রগর্মর্পা -র্মগর্গর্সা না না। র্সা -া -া -া।
নি • দ্রা মা য়া••• •••• বি নী গো • • •

। র্সা না -া পা। মা -গা গা -মা। পা মা গা -া।
কি ম • ন্ত্র ঢা লে তার্ • কা নে কা •

। রসা -া -ন্সা -া। সা সা সা -না। সা সা গা গা।
নে• • •• • জ্যো ছ না • সে চু ম্ব নে

। গমা রগা -মপা মা। গা -া -া -া। পা পা ক্ষা -পা।
চু• লে• •• প ড়ে • • • তা র কা •

। র্সা না পক্ষা পা। মগা মা পা মা। গা -া রসা -ন্সা।
হে সে উ• ঠে যু• মে র ঘো • • রে• ••

। মা পা পা না। -া না না না। র্সা র্সা র্সা র্রা।
ভ ব নে শা • ন্তি না মে ব নে থা মে

। র্সনা -া র্সা -া। র্সা -া না না। ধপা -া ক্ষা পা।
পা • খী • শ্রা • ন্তি নি মী• • লি ত

। পা না না -র্সা। ধনর্সর্রা -র্সনা -ধপা ক্ষপা।
অ ব নী • আঁ••• •• •• খি•

। পা -া পা -া। পা -া পা -া। মা গা রগা -মপা। -মা -া গা -া।
ব্য • র্থ • এ • ফা • গু ন রা• •• • • তি •

। গা মা পা -া। না না র্সা র্রা। ধনা -র্সর্রা -র্সনা -া।
স ব খা • নে গো স ব খা• •• •• •

। র্সা -া -া -া। র্সা র্গা র্গা র্রর্গা। -র্মর্পা র্মা গা র্সনা।
নে • • • ব স ন্ত জে• •• গে ছে শুধু

। পা ক্ষপা -মগা মা। গা -রা সন্না -সা II
আ মা• •• রি প্রা • ণে• •

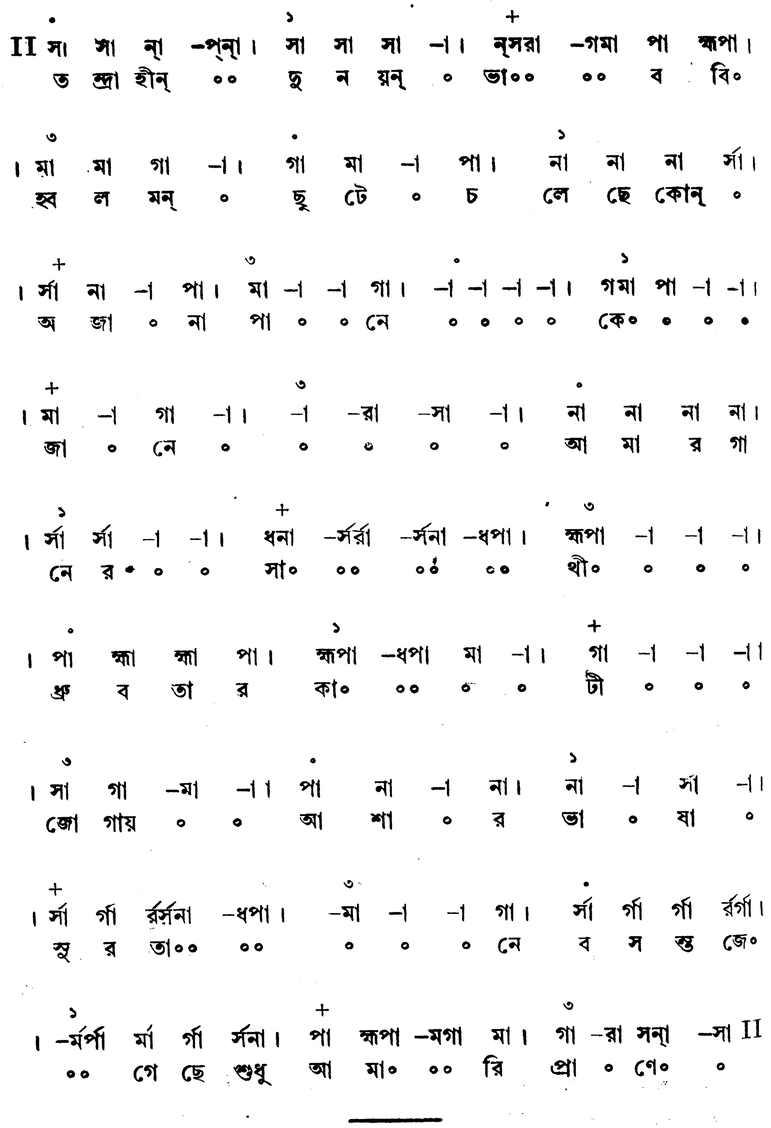

মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্প-কলা

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম

ভারতবর্ষ হইতে কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হইয়াছে; এবং এই সন্ধানের ফলে পরস্পর-বিরোধী নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে। ফেনপুঞ্জের ন্যায় এই বিবিধ মতরাশি এখন সঙ্কুচিত হইয়া ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে সম্রাট্ সিঙ্‌টির রাজ্যকাল (৬৫ খৃষ্টাব্দ) হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করে ও চীন-দেশ-বাসিগণের লৌকিক ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যখনই কোন দেশে কোন যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। গল্পগুলি হয়তো একেবারে নিছক কল্পনার বস্তু নয়—বাস্তবের পোড়েনে ও কল্পনার টানায় তাহা বোনা হইয়াছে।

স্বপ্নে আমরা অনেক ভবিষ্য ঘটনার সূচনা পাইয়া থাকি। সম্রাট সিঙ্‌টি এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিলেন;—একজন সুবর্ণময় পুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজভ্রাতা এই স্বপ্নের বিচার করিয়া বলিলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ পশ্চিম দেশের (১) সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যমুনি বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন; চীনে যে তাঁহার ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইবে, এই স্বপ্ন তাহারই দ্যোতক। বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্মের বিষয়ে চীনদেশ-বাসিগণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জ্ঞান না থাকিলেও তাঁহারা জানিতেন যে পশ্চিমে ভারতবর্ষ বলিয়া এক দেশ আছে ও সেখানে একজন মহাপুরুষ এক অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৭ সালে কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণ চীনদেশে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; দৈব-প্রভাবে তাঁহারা মুক্তিও লাভ করেন। গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কারাদ্বার সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল, বন্দী শ্রমণগণের দেহ হইতে লৌহ জিঞ্জির স্রস্ত হইয়া পড়িল এবং এক সুবর্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন! ইহা হইতে অনুমিত হয় যে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব এই সময়েই ঘটে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ভূগোল-সম্বন্ধে গ্রীকদের সে ধারণা ছিল তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। কেহ বা ভারতকে ত্রিভুজ, কেহবা ট্রাপিজ, কেহ বা চতুর্ভুজ মনে করিতেন। চীনাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা চীনের প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি, ইনি বংশের (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়

(১) অর্থাৎ ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া চীনসাহিত্যে ও চীনপরিব্রাজকদের লিপিতে ইহা "পশ্চিমদেশ" বলিয়াই অভিহিত হইয়া আসিয়াছে।

শতাব্দী) সম্রাট্ হোয়েটী (Hwei-Ti বা Wu-Ti) প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ১৯৪-১৭৯ খৃঃ পূঃ। তাঁহার শৌর্য্যে বহিঃশত্রুগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন-হেতু সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। এই সুখ-শান্তির একমাত্র কণ্টক ছিল—পার্ব্বত্য জাতি দুর্দ্ধর্ষ হিউঙ্গ্-নুগণ (Hiung-nu)। কিন্তু তাহাদের উৎপাত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। এই জাতি তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে চীনের পশ্চিম-সীমান্ত কানসু প্রদেশে অবস্থিত ইউয়েছি (Yueh-chi) নামক আর একটী জাতিকে স্রোতোমুখে নিক্ষিপ্ত তৃণপুঞ্জের মত আরও পশ্চিমে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সম্রাট হোয়েটি হিউঙ্গ-নুগণের অরাতি ইউয়েছি জাতির সহিত সখ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ চাঙ্-কীয়েনকে (Chuge-K'ien) ইউয়েছি সভায় দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। (২) ইনি ইউয়েছি জাতিদ্বারা সমধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সদ্যঅধিকৃত ব্যাক্ট্রিয়া দেশ (বহ্লীক) পর্য্যন্ত তিনি আগমন করেন এবং মধ্য ও পশ্চিম এসিয়া সম্বন্ধে নানা অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। এই ব্যাক্ট্রিয়াতেই থাকিবার সময় তিনি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার প্রথম কয়েকটি অভিযান মুখ্যতঃ নিষ্ফল হইলেও ভারত-আবিষ্কার ইহারই গৌণ ফল বলিয়া ধরিতে হয়। এই সময়ের পর হইতেই চীন ও ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সদ্ধর্ম্ম-প্রচার-প্রচেষ্টাই এই দৃঢ় সম্পর্কের মূল কারণ। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস্, উত্তরে মধ্য এসিয়া ও পূর্ব্বে সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশে) প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। মধ্য এসিয়ায় শত শত মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুঙ্কুমবর্ণ কাষায় বাস-পরিহিত সযত্ন-ক্ষৌরিতশীর্ষ ভিক্ষুগণের গাথা-গীতে উষর মরুও যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল! কুস্তনের (বর্ত্তমান খোটান) গোশৃঙ্গ মঠ ইহার সাক্ষী। শুধু খোটানই বা বলি কেন, সমগ্র প্রদেশেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। ক্রমে তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সম্রাট্ সিঙ টির সময় হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তরোত্তর প্রসার হইতে থাকে। এই সিঙ্টির প্রখ্যাত সেনাধ্যক্ষ প্যান চাও (Pan

(২) স্যর আরল্ ষ্টাইন মধ্য-এসিয়ায় মিরণ হইতে টুন-হুয়াঙ্ যাত্রা করিবার সময় প্রাচীনকালে এইখান দিয়া কোন্ কোন্ পথ ছিল, তাহা জানিবার জন্য পুরাতন পুস্তক দেখিতেছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—(Ruins of Desert Cathay. Vol, I. p. 512)—

"Ever since the remarkable mission of Chang-Ch'ien whom the Emperor Wu-ti had sent westwards to open communications with the Great Yueh-chi tribe (the later Indo-Scythians then settled on the Oxus) for an alliance against their common enemy the Hsiung-nu or Huns the Chinese knew of two main routes by which to reach the 'Western regions' *i, e.* the Tarom basin and the countries on the Yaxartes or Syr-Daria and Oxus."

Ch'ao) মধ্য-এসিয়ার শেন-শেন, খোটান, কুচা ও কাশ্বর নামক রাজ্যসমূহ জয় করিয়া চীন-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই প্রদেশের চীনাগণ যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন ও তৎপ্রচারে সহায়তা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এই ঘটনার পর ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ সংখ্যক চীনা লইয়া একটী দৌত্যসমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য খোটানে প্রেরিত হয়। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (৩) তাঁহারা কতকগুলি বৌদ্ধ পুঁথি ও মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে আনেন, ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু কশ্যপ মদঙ্গকে। ইঁহার গুরু গোভরণ পরে চীনে আসিলে তাঁহাদের জন্য তদানীন্তন চীন রাজধানী লো-সাঙে একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। এই দুইজন ভিক্ষু চীনা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং বহু বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ চীনাদের সুবিধার জন্য ভাষান্তরিত করেন। (৪) পরে সার্দ্ধ দুই শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই অনুবাদের কাজ করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সাধারণ লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অনেকেই আগার পরিত্যাগ করিয়া উপসম্পদা গ্রহণ পূর্ব্বক অনাগারী ভিক্ষু হইলেন।

ভারতে চীন পরিব্রাজকগণের আগমন ও চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার-লাভ

চীনদেশে প্রচলিত বিনয় অর্থাৎ সঙ্ঘের নিয়ামক শাসন সূত্রসমূহ খাঁটী আছে কিনা অথবা তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, এই সন্দেহ অনেক চীনা ভিক্ষুর মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। ভারতবর্ষে গেলে প্রকৃত বিনয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে, এইজন্য, আর শাস্তা পরিত্রাতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি সুতরাং গরীয়ান তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও বহু চীনা ভিক্ষু দুর্গম পথের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এখানে আসিতে লাগিলেন। সুদূর চীনে থাকিয়া উপাধ্যায় অথবা আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহারা তথাগত বুদ্ধের কত কাহিনী মুগ্ধ চিত্তে শুনিয়াছেন—কেমন করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, কেমন করিয়া দেবতারা চতুর্পূর্ব্ব-নিমিত্ত দেখাইয়া সংসারে তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদন করিলেন, কেমন করিয়া রাহুলবক্ষোলগ্না নিদ্রিতা যশোধরার মায়া কাটাইয়া গভীর নিশীথে তিনি নগর ত্যাগ

(৩) This is the date of the arrival of the first Indian Sramans Kasyapa Matanga and Bharana (or Dharmaraksha) who were invited by the Chinese Emperor Ming-ti (A. D. 58—75), and it is the historical beginning of Buddhism in China, though there are some traces of it in the earlier literature". TAKAKUSU,—*A Record of Buddhist Practices* p. XVII. Footnote.

(৪) These two were the first Indian Buddhists in China ; they came to China in A. D. 671 and translated several Sutras,—Ibid, p. 183, Footnote.

...First translators of Buddhist texts which are said to have been brought loaded on a white horse. The White Horse monastery was built at Lo-yang. One work of translation is ascribed to Kasyap Matanga and five to Dharmaraksha. Ibid p. 207 Footnote.

করিলেন, ছয় বৎসর কঠিন তপশ্চর্য্যায় শীর্ণ-কলেবর হইয়া কঠোর শরীর-পীড়নের অসারতা উপলব্ধি করিলেন, আর শেষে কেমন করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে নিষিণ্ণ-অবস্থায় ধ্যান-সমাধিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হইয়া তাঁহার দিব্য চক্ষুর বিকাশ হইল, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পঞ্চ স্কন্ধের বিনাশ হইল, কেমন করিয়া মার ও মার-কন্যাগণের প্রলোভন কাটাইয়া তিনি নির্ব্বাণপন্থার আবিষ্কার করিলেন—শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের পুলক সঞ্চার হইয়াছে, শরীর রোমাঞ্চিত অথবা কণ্টকিত হইয়াছে, আর ভগবানের সাধনক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্রের নানাবিধ দৃশ্য কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! কপিলাবস্তুর ন্যগ্রোধারাম, শ্রাবস্তীর জেত-বনারাম, রাজগৃহের বেণু-বনারাম, গৃধ্রকূট পর্ব্বত; গয়াশীর্ষ, যষ্টিবন, বোধিদ্রুম—এ সবের কথা কি তাঁহারা পিটকত্রয় পড়িয়াই জানিবেন? না। এই পীঠসমূহ একবার দেখিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরির উচ্চতা, মরুকান্তারের মরীচিকাময় বালুকারাশির তপ্ততা, মকর-কুম্ভীরাদিসমাকীর্ণ দুস্তর ক্ষিপ্রগতি নদী-সমূহের গভীরতা, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল বনানীর ভীষণতা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। ভারতে চীনা ভিক্ষুগণের প্রবাহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গয়াতে নাকি কতকগুলি চীনা মঠও স্থাপিত হইয়াছিল! ইহাদের মধ্যে ফা—হিসেন (অথবা ফা—হি্সয়েন)। হোয়েন সাঙ্ (হ্সুয়ান—সাঙ্, উয়াম—চোয়াঙ্ না কি ভুল!) ও ই-ৎপিঙের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত দুইজন ভিক্ষু স্থলপথে আসিয়াছিলেন—মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়া। ভারত হইতে তখনও ভিক্ষুগণ চীনে যাইতেছিলেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব ইয়া ও—হি্সঙ্ নামক সম্রাটের নিকট বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও বজ্র (ছেদিকা) সূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন; পরে তিনি রাজপুরোহিতও হইয়াছিলেন। ইনি অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুনের জীবন চরিত রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে বোধি-ধর্ম্ম কাণ্টন হইয়া নানকিঙে গিয়াছিলেন। সেখানে রাজা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে অসন্তুষ্ট হইলে তিনি স্বীয় অনুভাবের দ্বারা মাত্র একটা নলকে উড়ুপ করিয়া তরঙ্গ-স্ফীত ইয়াঙ্-টালি নদ অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলেন! চীনদেশীয় শিল্পীগণের নিকট এই ঘটনাটী চিত্রাঙ্কনের উপজীব্য হইয়া আছে। এইরূপে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাও ধর্ম্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর শত্রু ছিল ও মাঝে মাঝে বৌদ্ধগণ যেমন প্রতিকূল সম্রাটের আমলে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছেন, তেমনি আবার অনুকূল নৃপতিবর্গের সহানুভূতির ছায়ায় শীতল হইয়া নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সে কাহিনী এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

হান ও পরবর্ত্তী রাজবংশের সময় চীন-দেশের প্রভাব সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং তাহা মধ্য এসিয়ায় সম্যক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পর চীনদেশে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। তাহাতে চীনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তুর্কীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে। টাঙ্ (Tang) বংশের (৬১৮—৯১৮ খৃঃ

অঃ) প্রথমাংশে এইরূপই হইয়া থাকে। পরে এই বংশের সম্রাট্ তাইৎ সুঙ্ (Tai—tsung ৬২৭—৬৫০ খৃষ্টাব্দ) তুর্কীদিগকে পরাজিত করিয়া চীনের লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জ্বল করেন। হামি ও তুরফান চীন সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, ও কুচা, খোটান, খরস্থান ও কাশ্‌ঘর চীনা শাসনকর্ত্তার অধীনে আসে। কাশপিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। নেপাল ও মগধ হইতে দৌত্য আসিতে লাগিল, রুমের সুলতান ও পারস্যের বাদশাহ চীন সম্রাট্‌কে ভেট পাঠাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সাহিত্য ও সুকুমার কলারও উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই টাঙ্-বংশ এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠে যে ভারতবর্ষ তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—ইহার ফল অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুকূলই হইয়াছিল। বিজিত ভারত চীনকে বিজয় করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল চীনক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা বিপুল মহীরুহ হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফেলিল।

চীন শিল্পকলায় বৌদ্ধ ভাব ও আদর্শের বিকাশ

চীন কল্পনায় নূতন রঙ্ ধরিল, চীনা আদর্শ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। প্রসিদ্ধ চীন শিল্পী উ—তাওৎ সু (Wu. Tao-tzu) এই যুগের আদর্শ চিত্রকর। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-চিত্র-অঙ্কনে তিনি তাঁহার শিল্প-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মল্লদের শালবনে যুগল শালতরুর মধ্যস্থলে শান্ত নিদ্রায় মগ্ন, আর রাজা' প্রজা, অর্হৎ সন্ন্যাসী, পশু-পক্ষী সমগ্র সৃষ্ট জগৎ তাঁহার শোকে মুহ্যমান। (৫) তাঁহার কোন চিত্র এখনও বর্ত্তমান আছে কি না জানা যায় না। তবে মধ্য এসিয়ার যে শিল্পকলার কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা এই উন্নত টাঙ্ বংশের আমলেই আত্মপ্রকাশ করে।

স্যর অরেল ষ্টাইন সাহেব বিস্তর শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মধ্য এসিয়াতে সুগভীর বালুকা-স্তরনিহিত যে লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কতক পরিচয় Ruins of Desert Cathay নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কালে মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের

(৫ Cf. "We must return for a time to China, to consider the classic art of the T'ang epoch (A. D. 618—905), for this is the great creative age of the Far East, by which the whole future development both of Chinese and Japanese art is mainly determined: the part that Greece had played for Europe was played for Japan by China—Dr. Coomarswamy's *Budha and the Gospel of Buddhism*—p. 341.

"The Tang era stands in history for the period of China's greatest external power—the period of her greatest poetry and of her grandest and most vigorous, if not, perhaps, her most perfect art. Buddhism now took hold on the imagination of the time. China was never in such close contact with India, numbers of Indians including three hundred Buddhist monks, actively preaching the faith, were to be found in the T'ang capital of Loyang. And Buddhist ideas permeated Tang painting —*Binoyon Painting in the Far East* p. 105. et seq.

কিরূপ বিস্তার ঘটিয়াছিল, কিরূপে তুর্কী, সগ্‌দিয়ান, উইগুর প্রভৃতি শেমিটিক জাতিগণ সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, কিরূপে চীনের সীমান্তে জল-বুদ্‌বুদের সৃষ্টি ও বিলয়ের মত কত-শত ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান-পতন ও সমাধি হইয়াছিল, অধীন রাজ্য-সমূহে চীনের আধিপত্য কিরূপ ছিল, আজ তমিস্রাবৃত ভূগর্ভে প্রোথিত ভাস্বর রত্ন-রাজির পুনরুন্ময়নে তাহা দিবালোকের মত প্রতিভাত হইতেছে। এমন কত সামগ্রী-সম্ভার বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে অর্দ্ধবিলীনস্মৃতি সেই পুরাতন যুগের দৈনন্দিন চঞ্চল জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছি। কত কাজের অকাজের আসবাব, কাঠ-কাঠরার সরঞ্জাম, চেয়ার, টেবিল, ইঁদুর-ধরার কল, ঘর-কন্নার নানান খুঁটীনাটীর সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন এ-সব কল্যকার! আর তখনকার গৃহস্থালীর সুস্পষ্ট ছবিটা যেন নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠে! আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে পড়িয়াছি যে কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করা হইত। যে সমস্ত জাতি সভ্যতায় পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাকি অরণি-সাহায্যে অগ্নিমন্থন-প্রথা প্রচলিত আছে। তুথারা ও ইয়ামেনে মন্থনের জন্য দুইটী অরণি ও টুঙ্‌-হুয়ানে একটা মন্থনদণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। (৬) কিন্তু এই মরুকুক্ষি হইতে যে শিল্প-সম্পদ্ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

কয়েকখানি চিত্রের ব্যাখ্যা ও বিবরণ

খাদালিক, নিয়া, মিরণ ও টুন হুয়াঙে যে-সমস্ত বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সে গুলিতে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাৎ গন্ধার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রভাব বর্ত্তমান। কোন কোন স্থলে ইহার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। তাহা বলিতেছি। খাদালিকের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্তরভাগ অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তির দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে—কোথাও বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, কোথাও তিনি উপবাস-ক্লিন্ন আর কোথাও বা অর্হৎগণ কর্ত্তৃক পূজিত। নিয়াতে কাঠের জিনিষগুলির উপর খোদাইয়ের কাজ গান্ধার আদর্শে করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে ঐতিহাসিক মূল্য-বিশিষ্ট যে-সমস্ত কাগজ ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় "মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিরণের শিল্পকলায়—কি চিত্রে, কি ভাস্কর্য্যে সেই

(৬) " H. G. Evelyn while recognised them as regular fire-flocks meant for the production of fire by the churning of small wooden sticks which fitted the holds" —Ruins of Desert Cathay Vol. I. p. 313.

"...By the side of so much evidence of a highly organised civilization, it was strange to come upon a small block of wood which had undoubtedly served for producing fire in the manner current at all times among savage races"—Ibid Vol. I p. 393.

(গান্ধার) আদর্শের অনুবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। আসনোপবিষ্ট এবম্বিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির এরূপ ভাবে পরিচ্ছদ সন্নিবেশিত হইয়াছে যে সেই সুদূর লপ-নর মরুর ভাস্কর কি নিপুণ ভাবেই যে গ্রীক-বৌদ্ধ অঙ্কন-রীতির অনুকরণ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিহার-প্রাচীর-গাত্রে বিবিধ বিষয় অবলম্বনে চিত্রসমূহ লিখিত হইয়াছে—উড্ডীন গন্ধর্ব্ব, উপদেষ্টা বুদ্ধদেব, অবহিত রাজপুত্র। ধ্যান, অভয়, বর, বিতর্ক, নানাবিধ মুদ্রায় বুদ্ধদেব চিত্রিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের গায়ে সেমিটিক রীতির বেশ, ও মুখে গ্রীকরীতির ভাব লক্ষিত হয়। কোথাও বা আনন্দ-প্রমুখ শিষ্যগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আর কোথাও বা তিনি ধর্ম্মের অপবাদ করিতে-ছেন, বদ্ধকরপুট রাজপুত্র অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। গাথিত, ভারুত, অজন্তা, অনুরাধাপুর বিহারে যেমন জাতক চিত্রসমূহ অঙ্কিত আছে, এখানেও সেইরূপ। আচার্য্য কুমারস্বামী লিখিত Mediaeval Sinhalese Art নামক গ্রন্থে বেসসান্তের জাতকের ঘটনাবলম্বনে যে অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখানেও সেই বিষয় চিত্রিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুই শিল্পকলার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। মিরণের চিত্রে গ্রীক-বৌদ্ধ পদ্ধতিই বর্ত্তমান।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে জাতক-চিত্রের কণ্ঠদেশে (নিম্নভাগে) সুষমাময় পুষ্পরাশির দ্বারা গ্রথিত স্রগ্‌দাম তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ-যৌবনা গন্ধমাল্যপরিশোভিত কতকগুলি নর-নারীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলিতে গ্রীক ও রোমীয় চিত্রাঙ্কন-রীতির সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান; তাহাদের সহিত বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতি অথবা বৌদ্ধ দেবদেবীর কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। এক স্থলে একটী লীলাময়ী কামিনী চারি-তার-বিশিষ্ট মাণ্ডোলিন বাজাইতেছে, তাহার চক্ষু সলজ্জ ও ভ্রূমিনিবিষ্ট, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলের উপর দিয়া শুভ্রকুসুম-মাল্য ঘুরিয়া গিয়া সুচারু গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে লাল ফিতায় গ্রন্থিনিবদ্ধ হইয়াছে। লোহিত পুষ্পদ্বয় কর্ণভূষণের কায করিতেছে। পূর্ণায়ত সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য-বিধায়ক ওষ্ঠযুগল ললিতভাব-ব্যঞ্জক। ইহার পার্শ্বে একটি বালিকা মালা ধরিয়া আছে ও একজন সুপুরুষ যুবা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। রোমীয় আর্ট গল কিংবা গথীয়দিগের যেরূপ আলেখ্য রচিত হইত, এও সেইরূপ। পুরুষের দক্ষিণহস্তে বক্ষের সম্মুখভাগে ধৃত একটী স্ফটিক পাত্র। তাহার পরেই একটী সুন্দরী লোহিতাভ দ্রাক্ষাগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছে। তুর্কীস্তানে ও তৎসান্নিধ্যে অবস্থিত জনপদ-বাসীগণ জীবনের আস্বাদ পরিপূর্ণ ভাবেই লইতে শিখিয়াছিল। জীবনের আনন্দ-মদিরা পাত্র ভরিয়া পান করিয়া বিভোর হইয়া থাকার এই ছবি। ওমর খৈয়মের কথা মনে পড়ে না কি? পরে যে সব চিত্র আছে, তাহাতে গ্রীক অথবা লিভাণ্টের আর্ট প্রকট। ঐ ছবিগুলি দেখিয়া ষ্টাইন সাহেব ভুলিয়া গিয়াছিলেন

যে সিরিয়া অথবা রোমের কোন অধীনস্থ প্রদেশের ধ্বংস-বিশেষের মধ্যে না থাকিয়া তিনি চীন সীমান্তের কোন বৌদ্ধ মঠে আছেন!

উপরিভাগে জাতক-চিত্রে দেখিতে পাই—এক রাজপুত্র অশ্বারূঢ়, সম্মুখে চারিটী ধবলতুরঙ্গম-বাহিত রক্তবর্ণ রথ, একটী রূপসী ললনা সে রথ চালনা করিতেছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে দুইটা বালক গহন কাননের নিদর্শন-স্বরূপ একটী ঘন সবুজ রঙের বৃক্ষ, তৎপার্শ্বে ধনরত্নমণ্ডিত সুসজ্জিত শ্বেতকুঞ্জর চিত্রিত হইয়াছে—যেন জীবন্ত! অতিশয় দক্ষতার সহিত কুঞ্জরের চোখে ও মুখের ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—উহার পশ্চাদ্ভাগের দক্ষিণ পাশে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর খরোষ্টি অক্ষরে দুই পঙ্‌ক্তি লেখা আছে। হস্তীর সম্মুখে একজন রাজপুত্র রহিয়াছেন, তাঁহার শ্রুতি, গ্রীবা, বাহু, মণিবন্ধ বহুমূল্য রত্নাভরণে মণ্ডিত। বামহস্ত দ্বিরদের শুণ্ডে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু। হিন্দু তথা বৌদ্ধ শাস্ত্র-মতে দান-কর্ম্ম পূতবারি-সহযোগে সিদ্ধ হয়। ইহাকে "দক্ষিণোদকম্" বলে। ভারুতচিত্রে অনাথপিণ্ডিক সঙ্ঘকে জেত-বনারাম দান করিতেছেন, হস্তে তাঁহার দক্ষিণোদকম্, ইহার পরের চিত্রে চারিজন সামান্তবেশ-পরিহিত ঘনকেশ-শ্মশ্রুলাঞ্ছিত সুদীর্ঘ দণ্ডধারী সন্ন্যাসী।

উপরি ও নিম্নভাগের চিত্র যে একই চিত্রকরের, তাহা উভয় চিত্রে সন্নিবেশিত রাজপুত্রের অঙ্কন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। নীচের চিত্র যেমন শিল্পীর ছন্দানুগ হইয়াছে—রোমীয় আর্টের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও শিল্পী তাহারই ভিতর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি উপরের চিত্রে পারিপার্শ্বিক দুই-একটা ক্ষুদ্র বিষয়ে রোমীয় আর্টের অনুবর্ত্তন ভিন্ন মূল বিষয়-সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শ পারম্পর্য্য উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে ভরসা করেন নাই।

চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিলে জিনিষটা ভাল বুঝা যাইবে না। জাতক কথায় রাজপুত্র বেস্‌সান্তরের গল্প আছে—এস্থলে তাহাই চিত্রের উপজীব্য। শেষ বোধিলাভের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব বেস্‌সান্তর হইয়া জন্মিয়াছিলেন। জাতক গ্রন্থে ইহাই শেষ জাতক। যাঁহারা মূল পালি না পড়িয়া অনুবাদ পড়িতে জানেন, তাঁহারা Cowell এবং Rouse দ্বারা অনুবাদিত ৫৪৭ নং জাতক পড়িবেন। সংক্ষেপে কথাটা হইতেছে এই—জন্মিবার পর হইতেই রাজপুত্র খুব দানধ্যান করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অনুভাব-যুক্ত একটী শ্বেতকুঞ্জর ছিল; সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত। এক সময়ে কলিঙ্গ জনপদে অনাবৃষ্টিবশত অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়া বড় লোকক্ষয় হইতে লাগিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কলিঙ্গবাসীরা অবশেষে স্থির করিল যে তাহারা শিবিরাজ্যের রাজকুমার বেস্‌সান্তকের নিকট শ্বেতকুঞ্জর ভিক্ষা করিয়া নিজেদের দেশে বৃষ্টি করাইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য দ্বারা তাহাদের জীবন অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাই চিত্রের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—ঐ নারীমূর্ত্তি

তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী মাদ্রী ও বালকদুইটী তাঁহার পুত্র। কেশশ্মশ্রুপরি-শোভিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট অশ্ব ও রথ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি একপ্রকার নিঃস্ব হইয়া পুত্রপত্নী-সমভি-ব্যাহারে নির্ব্বাসনে চলিলেন। সেখানেও তিনি পুত্রদ্বয়কে (মূল জাতকে পুত্র ও কন্যা) পূজক নামে এক ব্রাহ্মণের হস্তে দান করিলেন। পাছে স্ত্রীকেও এইরূপে দান করিয়া ফেলেন, সেইজন্য স্বয়ং শক্র (ইন্দ্র) ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নকট উপস্থিত হইয়া মাদ্রীকে ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন; ও পরে তাঁহার দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রথ, পত্নী, পুত্র সব ফিরাইয়া দিলেন।

অন্যান্য চিত্র

টুন-হুয়াঙে আবিষ্কৃত চিত্রগুলির সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানে ষ্টাইন সাহেবের আবিষ্কৃত কতকগুলি (canvas) অতিসূক্ষ্ম রেশম অথবা লিনেনের তৈয়ারী। বেণু-পেশিকালগ্ন রজ্জু দেখিয়া বোধ হয় যে সেগুলি মন্দির-চূড়াবলম্বী ধ্বজা। উহাতে দুই পার্শ্বেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের চিত্র। বহুমূল্য রেশমের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা কখনই নিম্ন অঙ্গের নহে—এ কথা বলিলে কোন দোষ হয় না। বাস্তবিকই চিত্রগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর পরিকল্পনার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কালে চীনের টা-ঙ্ রাজাগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ের তাঁহাদের রাজ্যের শ্রী, সমৃদ্ধ, ও সাধারণ উন্নতির সঙ্গে শিল্প-কলাও চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আসল চিত্রকলার নিদর্শনস্বরূপ সেই শিল্প-সামগ্রী চীন ও জাপান হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যে চিত্রের কথা বলিতেছি, তাহা ঐ সময়ের। চিত্রাঙ্কনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম মধ্য এসিয়ায় আসিয়া সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মের গ্রন্থান্তর-নিবিষ্ট বিষয়গুলিকে মডেল ধরিয়া লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত হইলেও চিত্রকরগণ স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাজেই ঐ চিত্রগুলিতে স্থানীয় রঙের ছোপ লাগিয়া আছে। (৭)

কোথাও দেবগণ মিলিত হইয়াছেন, কোথাও বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ-বর্ণিত স্বর্গের দৃশ্য—এইগুলি বড় বড় ধ্বজায় অঙ্কিত। আর অন্যান্য পতাকাগুলির বিষয়,—কোথাও পৃথক পৃথক্ দেবতা রহিয়াছেন, আর কোথাও বা বুদ্ধদেবের

(৭) Cf.—The Buddhist art of China is on another footing, for notwithstanding it repeats the forms of Indian art, China had already an old, and from a technical standpoint, exceedingly accomplished art, and a profound philosophy of her own, before the Buddhist pilgrims and missionaries carried across the wastes of Central Asia the impulse to a new development of thought and of plastic art,... Chinese Buddhist art is not entirely Indian but essentially a new thing, almost as much Chinese as Indian.—Coomarswamy *Buddha and the Gospel etc.* p. 338.

জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যায়ক্রমে এক একটী করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত চিত্রগুলি সংখ্যায় কম হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব ও মনোহারিত্ব এবং শিল্পকলার চারুতার হিসাবে সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য!

বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে তাঁহার সম্বুদ্ধত্ব লাভ করা পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি অঙ্কন করিতে ভারতীয় চিত্রকরগণ ভাল জানিতেন। টুম হুয়াঙের শিল্পীগণও ঐ বিষয়গুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। লুম্বিনি উদ্যানে গৌতমের জন্ম, শৈশব ও যৌবনের অতিমানুষ অদ্ভুত ঘটনাবলী, অন্তঃপুর-প্রাসাদের রম্য জীবন, চতুর্পূর্ব্বনিমিত্ত-দর্শন ও সংসার-ত্যাগের কল্পনা, নিদ্রিতা যশোধরা ও শিশুপুত্র রাহুলের নিকট নিঃশব্দ বিদায়-গ্রহণ ও প্রাসাদ-পরিত্যাগ, মহাভিনিষ্ক্রমণের অনুবর্ত্তী বিবিধ অবস্থা, ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্য্যা, এবং নৈরঞ্জার নদীতীরে শেষ বোধিস-অবস্থার বিসর্জ্জন ও সম্বুদ্ধত্বের বিকাশ—এই বিষয়সমূহ অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ Foucher সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"In short we meet again with almost the whole catalogue of episodes which have remained classic since the Greeco-Buddhist School of Gandhara. The most important point to note is *the frankly Chinese fashion in which these traditional subjects have been treated.* Under the hands of local artists they have undergone the same disguising transformation which Christian legend has under those of Italian and Flemish painters."

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য হয় যে চিত্রান্তর্গত বিষয়গুলি পরস্পর ক্রমে চলিয়া আসিলেও চীনা ছাঁচে তাহাদিগকে ঢালা হইয়াছে, জীবনের পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়াই উক্ত বিষয়গুলিকে স্ফুরিত হইবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। চিত্রের প্রতিলিপি দিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেই ভাল হইত; তদভাবে সংক্ষেপে উহার বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বেণুপেশিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় একটী ধ্বজাকে যেমন-তেমন করিয়া জোড় দেওয়া হইয়াছে। এই পতাকার উপরিতন অংশে বুদ্ধদেবের জননী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন বুদ্ধদেব শ্বেতকুঞ্জর হইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন। মূল পালি গ্রন্থ "নিদান কথা" হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"অথ বোধিসত্ত্ব সেতবরবারণো হুত্বা—ততো অবিদূরে একো সুবন্নপব্বতো—তথ চরিত্বা ততো ওরুথ্হ রজত পব্বতম্ অভিরুহিত্বা উত্তরদিগতো আগম্ম রজত-দামবণ্ণায় গোণ্ডায় সেতপদুমম্ গাহত্বা কোঞ্চনাদম্ নদিত্বা কনকবিমানম্ পবিগিত্বা মাতু শয়নম্ তিক্খত্তুম্ পদক্কিম্ম কত্বা দক্কিণ সগ্গম তালেত্বা কুচ্ছিম্ পবিটঠসদিশো অহোসি।"

অনুবাদ।—"অতঃপর বোধিসত্ত্ব শ্বেত-কুঞ্জর হইয়া—তাঁহার অনতিদূরে একটা সুবর্ণ পর্ব্বত ছিল—সেখানে চরিয়া তথা হইতে অবরোহণ করিয়া রজতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উত্তরদিক হইতে আগমন পূর্ব্বক রজতবর্ণ শুণ্ড দ্বারা শ্বেতসরোরুহ গ্রহণ করিয়া ক্রৌঞ্চ নাদ করিয়া কনক-বিমানে প্রবেশ করিল; মাতার শয্যা বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিয়া যেন কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন।"

এই চিত্রের নীচেই মায়াদেবী চীনা-পরিচ্ছদ পরিহিত চারিজন লোকের স্কন্ধে স্থাপিত শিবিকারোহণে লুম্বিনি উদ্যান-অভিমুখে চলিয়াছেন। শিবিকা-বাহকগণের ত্বরিত গতি-ভঙ্গী চিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরের চিত্র হইতেছে, লুম্বিনি উদ্যানে মায়াদেবীর কুক্ষিচ্যুত হইয়া বুদ্ধ-দেবের জন্ম। "গালগাথং গহেত্বা তিট্ঠমানায় এব চ অস্যা গব্ভবুট্ঠানং অহোসি।" শালশাখা গ্রহণ করিয়াই তিনি বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন। এই চিত্রে ট্রাডিসনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই বটে, কিন্তু গান্ধার শিল্পের আদর্শ রক্ষিতও হয় নাই। চীনাবেশ-পরিহিতা মায়াদেবীর জামার প্রকাণ্ড হাতা হইতে শিশুবুদ্ধ স্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ইহাই চিত্রিত। এই প্রদেশে বুদ্ধদেবের জন্ম-গ্রহণ-প্রসঙ্গের একই পদ্ধতির অনুসরণ হওয়ায় নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায় যে স্থানীয় প্রভাবই বলবান্।

পরের দৃশ্যটী বড় মনোহর। শিশু বুদ্ধ 'চলি চলি পা পা' করিয়া বেড়াইতেছেন, ও যে যে স্থান তাঁহার চরণস্পৃষ্ট হইতেছে, সেই সেই স্থানে কমলদল ফুটিয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় পতাকায় দুইটী চিত্র আছে,—

সংসার-বন্ধনছেদনাভিলাষী ইন্দ্রিয়-সংগ্রাম-বিজয়ী বীর গৌতম গভীর নিশীথে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতেছেন, আর তাঁহার প্রমোদা-গারে চতুর হাব-ভাব-শালিনী বিলাসিনী কামিনীগণ নিদ্রায় চেতন-হারা—"একচ্ছা পগ্ঘরিতখেলা, লালাকিলিন্নগণ্ডা, একচ্চা দান্ত খাদন্তিয়ো, একচ্চা বিপ্পল গণ্ডিকা, একচ্চা বিকটমুখা, একচ্চা অপগতবথা।' ইহা দেখিয়াই কামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। দৈবপ্রভাবে রক্ষীবর্গ গভীর নিদ্রায় অভিভূত, চিত্রে উপরদিকে একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে, তাহারই উপর বুদ্ধদেব প্রিয় তুরঙ্গম কণ্টকের পৃষ্ঠে চলিয়া-ছেন, আর সারথি ছন্দক পাশে পাশে। পর্ব্বত ও বনানীর রঙ দেখিলে কোন্ সময়ে তিনি নগর ত্যাগ করিতে ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিম্নের চিত্রে গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদ-শ্রবণে রাজা শুদ্ধোধন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত যে চারিজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজা ও মন্ত্রীর সমক্ষে তাহাদের বিচার হইতেছে, তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছে, পশ্চাতে রক্তাম্বর-পরিহিত দুইজন ঘাতক দাঁড়াইয়া আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধ মহামান তন্ত্রের দেবদেবী, বোধিসত্ত্ব, লোকপাল, দ্বারপাল প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পরিচয় দিতে গেলে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধান্তরে সে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গান্ধার আর্ট, গান্ধার আর্ট করিয়া অনেক বকিয়াছি, কিন্তু বিষয়টি কি, তাহা বলা হয় নাই। সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেছি। আচার্য্য কুমারস্বামী শিল্প-সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক authority। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন, নিম্নলিখিত কারণে এই গান্ধার অথবা গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পের এইরূপ নাম-করণ হইয়াছে। নিষিণ্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি সম্পূর্ণ ভারতীয়; ইহা ব্যতিরেকে বৌদ্ধ দেবসমাজের যাবতীয় প্রধান আদর্শস্থানীয় মূর্ত্তিগুলি, যথা, দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি; অর্দ্ধশায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি বোধিসত্ত্ব ও অন্য বৌদ্ধদেবতার মূর্ত্তি, অথবা স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবন-দৃশ্যের আদর্শ রচনা-সমূহ তথা স্থাপত্য মণ্ডলের কতকগুলি ক্ষুদ্র বিষয়, হয় গ্রীক-রোমীয় মডেল-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা তদ্দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক প্রাদেশিক রোমীয় কলায় একাংশই হইতেছে গান্ধার শিল্প, তবে এই রোমীয় কলার সহিত ভারতীয় উপাদানের ঘনিষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং ইহা দ্বারা বৌদ্ধ পুরাণকথিত বিষয়গুলির প্রকৃষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের ধরণ যে উত্তর কালের ভারত-বৌদ্ধ ও চীন-বৌদ্ধ শিল্পে সংক্রমিত হইয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। (৮)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

(৮) This art is so called, because apart from the seated Buddha form, which must of course, be wholly Indian, the leading types of the Buddhist pantheon—viz. the standing Buddha figure, the reclining type, the figures of Buddhi-Swatta and other Buddhist divinities, as well as the types of composition of some of the scenes of the Buddha's life, and likewise certain details of architectural ornament, are either directly based upon or strongly influenced by Greeco-Roman proto types. Gandhara art is in fact a phase of provincial Roman art mixed with Indian elements and adapted to the illustration of Buddhist legends. The influence of the western forms on all later Indian and Chinese Buddhist art is clearly traceable..."

—Ibid. p. 329.

মনের কুয়াসা

(১৯)

জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইল।—কি দুশ্চিন্তা, কি ঔৎসুক্যের মধ্যে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে! এমন কি ব্যায়ামসমিতিকে পর্য্যন্ত এ কয়দিন তাহার মনে পড়ে নাই। এ কিরূপ তন্ময়তা! কই পিতার অসুখের সময় ত জ্যোতির্ম্ময়ী এতদূর কাতর হইয়া পড়ে নাই। তাহার লজ্জাসঙ্কুচিত মন উত্তর স্বরূপ কহিল, —"কোন কারণ ছিল না ত তাহার, পিতার ত জীবনসংশয় হয় নাই।—তবুও"—

ইহার অর্থ,—তবুও একজন অনাত্মীয় পরের জন্য এত কেন ভাবনা! প্রতিদিন ত রোগে তাপে পৃথিবীর কত লোক মৃত্যু গ্রাসে পড়িতেছে; কে কার জন্য এত ভাবে? এস্থলে মৃত্যুর কথাটা মনে আসিবামাত্র বালিকার মনের মধ্যে একটা কষ্টের শিহরণ উঠিল!

তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর সোফায় শুইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্রাম করিতেছিল। পাশেই হাতের কাছে একটি ছোট টেবিলে,ফুলভরা ফুলদানী একটির চারিদিকে নানারকম কাগজ পত্র, বহি সাজান। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মধ্য হইতে একখানি থিয়সফিষ্ট পত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটা প্রবন্ধ আগাগোড়া শেষ করিয়া তখন তাহার হুঁস্ হইল,—এক অক্ষরও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। পাঠিকার স্থূল অক্ষি বহির পাতায় নিবদ্ধ ছিল বটে—কিন্তু সূক্ষ্ম আঁখি ঘুরিতেছিল অন্য ঘরে। আজ ইচ্ছা করিয়াই প্রাতঃকালে শরৎকুমারকে সে দেখিতে যায় নাই,—ভাল আছেন ত তিনি! তিনি কি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিতে চাহিতেছিলেন?

এ কিরূপ প্রশ্ন?, সে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল বলিয়া তিনিও কি ব্যাকুল থাকিবেন? এ কি পিপাসা! এখন ত তিনি আরাম হইয়া উঠিয়াছেন—এখনো তাঁহার চিন্তাতেই সে মগ্ন কেন? তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য কেন সে এত তৃষাতুর? এ কি সর্ব্বগ্রাসী ভাব? ইহাই কি প্রেম?

ক্ষতি কি? প্রেমদেবতাকে মনে মনে পূজা করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ইহার পরিণাম? এই আকাঙ্ক্ষা—এই চিন্তা, এই পূজার পরিণাম; লোকে বলে বিবাহ।

হাতের বইখানা জ্যোতির্ম্ময়ী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।—"না তাহা হইতে পারে না—পারে না,—আমি জ্যোতির্ম্ময়ী,—চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—দেশের জন্য জীবনদান করিয়াছি—আমি ব্যক্তি বিশেষের পরিণীতা পত্নী!—অসম্ভব,—অসম্ভব!" একবার সে অতি চুপে চুপে—স্বগত উচ্চারণ করিল—"মিশেষ চৌধুরী—" তাহার চিন্তা-মলিন মুখে সহসা একটা কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত পোষা কোকিলটি এই সময় কুহু কুহু করিয়া উঠিল, বাহিরের আম-বাগানে দুই চারিটা কোকিল এক সঙ্গে ইহার উত্তর গাহিল; সহসা—কুহু কুহুতানে আকাশ ভরিয়া গেল!—জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বলিল,—"বনের পাখী তোমরা খাঁচার পাখীকে ধরা দিতে চাও ত দাও, আমি কিন্তু ধরা দিব না।" সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ সন্ধ্যাতেও শরৎকুমারকে দেখিতে যাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী ফুলদানীর একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ করিল। ঠিক দুইটার সময় কুন্দ গৃহে আসিয়া হাজির হইল। আজই সকালে সে বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। হাসির চিঠিখানা, রাজকুমারীর হাতে দিয়া কহিল—

"এই নিন্ রাজকুমারি। চিঠিখানি আপনার হাতে ধরে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আজ দায়মুক্ত হলুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন, কুন্দ থিয়সফিষ্টখানা কুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, আলমারি খুলিয়া রাজকন্যার বৈকালিক সাজসজ্জার আয়োজনে রত

হইল। আজ তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চা-পানের নিমন্ত্রণ।—

হাসির চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন—

"সুগুণা দেবী—কে কুন্দ? আমাকে তিনি এত প্রশংসা করে লিখেছেন—লজ্জা করে যে।"

কুন্দ বলিল—"ও আমাদের হাসি। সকলে ওকে হাসি ব'লেই ডাকে। এমন সুন্দর মেয়েটি, কি বলব! আপনি যদি দেখেন রাজকুমারি ত আপনিও নিশ্চয়ই ভালবাসবেন।"

শরৎকুমার প্রলাপের ঘোরে যে হাসির নাম উচ্চারণ করিতেন, সেই হাসি নয় ত এ? একটা কিরূপ অস্বস্তি চাঞ্চল্য রাজকন্যার মন দিয়া বহিয়া গেল? ইহা কি ঈর্ষার আন্দোলন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"বিয়ে হয়নি বোধ হয় তাঁর?"

"না। কোন বরকেই যে তার বাপমার মনে ধরে না। যা হ'ক এবার শুনছি—একটি মনের মত পেয়েছেন, সম্বন্ধ চলছে তার সঙ্গে।"

"কে সে ভাগ্যবান?" জ্যোতির্ম্ময়ীর বক্ষে শোণিতপ্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া গেল,—এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎকুমারের নাম শুনিবার জন্য সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কুন্দ বলিল—"তিনি আপনাদেরই আত্মীয়, বিজনকুমার রায়।"

বালিকার রুদ্ধ নিশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিল,—সে হাসিয়া কহিল—"তা বেশ, হ'লে মন্দ হয় না! আমি বরণ করে কনেকে ঘরে তুলে নেব। তোমাদের হাসি, কুন্দ, ডাক্তারদার কে হন?"

"জানিনে ঠিক, একটা কোন দূর সম্পর্ক থাকতে পারে। কই তার কথা ত হাসির কাছে কখনও শুনি নি। তবে আমার সঙ্গে হাসির দেখা শুনা খুব কমই হয়—বেশী কথা কবার অবসরই ঘটে না।"

"সম্বন্ধের কথা কার কাছে শুনলে?"

কে জানে কেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মন বলিতেছিল খবরটা ঠিক নয়।

কুন্দ কয়েকখানা কাপড় ও জ্যাকেটের সুট মিলাইতে মিলাইতে বলিল—

"ও কথা অবশ্য হাসির কাছে শুনিনি। বিদায় নিতে যাবার সময় দিদিমা বলেছিলেন।—বিকালে কোন্ কাপড়খানা পরবেন রাজকুমারি?"

"দেখ কুন্দ, কতবার তোমাকে বলেছি—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, তোমার যেখানা ইচ্ছে—"

"না না বলুন রাজকুমারি—কোন্খানা পরবেন?"

"আচ্ছা শাদা রঙের যা হয় একখানা রাখ।"

"রাজা বাহাদুর কিন্তু রঙিন কাপড় পসন্দ করেন।"

"তবে তাই রাখ।"

"ফিকে নীল বা গোলাপী কি দেব?"

"তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না! আচ্ছা—নীলই রাখ। চিঠিখানা পড়েছ কুন্দ?"

"না। মতিরমালা-ছড়াই পরবেন শুধু!"

"সে হবে এখন কুন্দ; চিঠিখানা আগে পড় না! কলকাতায় গিয়ে সর্ব্বাগ্রে এবার তোমার হাসির সঙ্গেই দেখা করব।"

"তখন সে আপনারও হাসি হয়ে যাবে।"

"মতির মালা ও ব্রেসলেট আপনার জন্যে বার করে রাখছি।—অন্য কিছু ত আপনি পরেন না।" এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হাসির চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"এই নেও।"

কুন্দ নিকটে আসিয়া পত্রখানা লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"চেঁচিয়েই পড়না—" কুন্দ পড়িতে লাগিল—

সম্মানীয়া রাজকুমারি—

আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই, কিন্তু আপনার গুণের কথা এত শুনিতে পাই—যে না দেখিয়াও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। আপনাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। যখন কলিকাতায় আসিবেন—একবার যদি দেখা দেন ত পরমানন্দ লাভ করিব। সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিবেন।

ইচ্ছা করে আপনার নিকট আমিও দেশব্রতমন্ত্র গ্রহণ করি,—আমার শক্তি অতি সামান্য কিন্তু আপনার মত গুরুর উপদেশে সেই ক্ষুদ্র শক্তিও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

আপনি বয়সে ছোট হইয়াও জ্ঞান বুদ্ধি ও শক্তিতে আমার অনেক বড়, তাই পরিপূর্ণ প্রীতিভক্তি ভরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ছোট বোন বলিয়াই মনে করিবেন।

আপনার গুণমুগ্ধা ভগিনী—
শ্রীসুগুণা দেবী

পুঃ

শর-দা যদি এখনো সেখানে থাকেন ত আমার নমস্কার দিবেন।

চিঠিখানি পড়া হইলে কুন্দ তাহা রাজকন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল—"সুন্দর লিখেছে; চিঠিখানি পড়ে হাসিকে যেন ঠিক চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।"

"ভাষার ঘনঘটা নেই এইটে আমার বড় ভাল লেগেছে।"

"কেবল কি তাই? চিঠিখানি আগাগোড়া আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ—আমার সেইটেই বেশী ভাল লাগছে।"

"এই শ্রদ্ধা দিয়ে তিনিই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন?"

"যেমন গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো সেইরকম আর কি!"

"এ উপমা এখানে ঠিক সঙ্গত হোল না কুন্দ, পণ্ডিত মশায় শুনলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন—"

এই সময় একজন দাসী "পণ্ডিত মশয় আইছেন গো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিল। বাঙ্গালী ঘরে, রাজা সম্রাটের আলয়েও দাসী চাকরের আদব কায়দার বড় একটা আড়ম্বর দেখা যায় না। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া কুন্দ বলিয়া উঠিল, "নাম করতেই হাজির তিনি, লোকটার আয়ু দেখছি অনেক—"

জ্যোতির্ম্ময়ী দাসীকে বলিল—"আচ্ছা লক্ষ্মীর মা, তোমাকে কতবার বলেছি অত চেঁচিয়ে কথা কবে না,—কিছুতে কি শিক্ষা হবে না তোমার?"

লক্ষ্মীর মা শিরে করাঘাত করিয়া কহিল—"হায়রে কপাল! মারে তোমার ঘরে আইনা শিখাইলাম আমি—আর আমারে শিখাইতে চাও এখন তুমি সেদিনকার

খুকী, পলতে দিয়া যারে কত দুধ খাওয়াইছি! কলিকালই হইছে।”.

“বেশ বেশ আর বকতে হবে না, নাকি-গান আমার ভাল লাগে না। যাও পণ্ডিতমশায়কে বল গিয়ে আমরা আসছি এখনি।”

লক্ষ্মীর মা তবুও বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সোনার তাগা পরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোনার কণ্ঠমালা ও কোমরের রূপার চাবি শিকলিও দুলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে কুন্দর সহিত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এই সময় অনাদির আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজ-কন্যার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—প্রথমেই মনে হইল—“ভাল আছেন ত তিনি?” কিন্তু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই অনাদি কহিল —“একটা কথা আছে দিদিমণি।” রাজ-কন্যা কুন্দকে বলিলেন “যাও কুন্দ তুমি পণ্ডিত-মহাশয়ের কাছে বসে একটু গল্প কর গে—আমি এখনি আসছি।” কুন্দ চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী কণ্ঠাগত ভাষা রসনামুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—“ডাক্তারদা ভাল আছেন ত অনাদি দা?”

“হ্যাঁ ভাল আছেন,—কিন্তু তুমি আজ সকালে তাঁকে দেখতে যাওনি—তাই তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন—তোমার বুঝি কোন অসুখ করেছে—তিনি তোমাকে দেখতে আসতে চান।” জ্যোতির্ম্ময়ীর পণ ভঙ্গ হইল—বলিল—“না না তাঁর আসতে হবেনা—চল আমি এখনি তাঁকে একবার দেখে আসি।”

পণ্ডিত-মহাশয় যে তাহার অপেক্ষায় আছেন সে-কথা জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই ভুলিয়া গিয়া অনাদির অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র—তাহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে শরৎকুমার শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসুস্থতার পর এই প্রথম তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস। তাঁহার পা কাঁপিয়া উঠিল; দেহ ঈষৎ টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু এই কম্পন কি কেবলই দুর্ব্বলতাজনিত, কিম্বা আনন্দের অধীরতাও ইহার মধ্যে অনেকখানি লুক্কায়িত ছিল? রাজকুমারী উদ্বিগ্নভাবে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন “কি করেন ডাক্তারদা,—বসুন বসুন—দাঁড়াবেন না?’

“আমি ভাল হয়ে উঠেছি রাজকুমারি।”

“তবুও বসুন; এখনো বিছানা থেকে ওঠবার অবস্থা আপনার ঠিক হয়নি,—পা কাঁপছে আপনার।”

“আপনি বসুন আগে।” প্রত্যুত্তরে এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকুমারী আর কথা বাড়াইলেন না; শরৎকুমারের শয্যার নিকটেই তাঁহার জন্য অনাদি একখানি চৌকি আগে হইতেই রাখিয়া দিয়াছিল সেইখানিতে বসিয়া পড়িলেন। শরৎকুমার তখন শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—“আপনি সকালে আসেননি—তাই মনে হচ্ছিল—”

শরৎ হঠাৎ থামিয়া গেলেন, রাজকুমারী বলিলেন—“না আমার কোন অসুখ করেনি,—ভালই আছি।—আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন—তাই আর—”

রাজকুমারীরও কথাটা এইখানে বাধিয়া গেল—কেননা—যাহা বলিতে যাইতে ছিলেন,—তাহা সত্য নহে। শরৎকুমার তাঁহার পালায় রাজকন্যার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া কহিলেন—

“তাই আর আসার দরকার মনে করেন নি?” বলিতে বলিতে তাঁহার রুগ্ন মুখ—একটা ব্যথার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়-তন্ত্রীতেও সে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাসির চিঠিখানা শরৎকুমারের হাতে দিয়া বলিলেন “দেখুন দেখি চিঠিখানা পড়ে ডাক্তারদা; আপনার ভাল লাগবে মনে করে এনেছি।”

শরৎকুমার চিঠিখানি গ্রহণ পূর্ব্বক পড়িয়া রাজকন্যার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—“যিনি লিখেছেন—তিনি দেখছি গুণগ্রাহী।”

“তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন—দেখেছেন ত, কি উত্তর দেব?”

“ফিরিয়ে দেবেন নমস্কারটা।” এমন ঔদাসীন্যের সহিত কথাটা শরৎকুমার বলিলেন—যে জ্যোতির্ম্ময়ীর পূর্ব্বগঠিত বিশ্বাস বেশ-একটু টলমল করিয়া উঠিল। বলিল—“চিঠি পড়ে ত মনে হয়—আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা আছে।”

“ভুল আপনার।—মোটেই না।” বিদায় দিনে হাসির প্রত্যাখ্যানের কথা মনে জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু আজ আর সে স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল না। শরৎকুমার নিজেই যেন তাহাতে একটু বিস্মিত হইলেন। —জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল “আপনার আত্মা কিন্তু চুপি চুপি অন্য কথাই প্রকাশ করেছে।”

“কি রকম?”

“অসুখের সময় অনেক বারই হাসির নাম আপনার মুখে শুনেছি।”

শরৎকুমারের রক্তহীন পাংশুমুখে সহসা লজ্জার আভা চমকিয়া গেল। “সত্যি না কি? প্রলাপের ঘোরে কি কথা না জানি শরৎকুমার বলিয়াছেন—আর রাজকুমারী তাহা শুনিয়া কি না জানি মনে করিয়াছেন, ছি ছিঃ!” সব কথা রাজকন্যাকে খুলিয়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চন্দ্রালোকে বা ম্লান দীপশিখার নিকট বসিয়া যে সব কাহিনী বলা যায়,—দিনের ফ্যাক্ ফ্যাকে উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে প্রতিকূল।—তাহা ছাড়া অনাদি ছোকরা ঘরের কোণে বসিয়া আছে, যদিও সে নভেল পাঠে মগ্ন—তবুও ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত।

শরৎকুমার মৌন হইয়া রহিলেন—তাঁহার ভাষা এই সঙ্কটের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—ঘড়িটাও কি ছাই এই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতিকূল হইবে—সশব্দে এই সময় ৪টা বাজিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “উঠি তবে আজ, ৪টে বেজে গেল, আমাদের আবার আজ চায়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন—এখনো দুর্ব্বল আছেন।”

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা চলিয়া গেল। শরৎ চোখ বুজিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন! একটা কষ্টের অবসাদে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একান্ত ক্লান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সত্য এতদিন তাঁহার নিকট লুক্কায়িত ছিল—আজ তাহাতে

তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন,—তিনি বুঝিলেন,—অসুখের পূর্ব্বে যে-তিনি ছিলেন —আজ সে-তিনি নাই। হাসির যে হাসিটুকু তিনি এতদিন হৃদয়নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আজ ত আর তাহার সন্ধান পাইতেছেন না! জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃসাগরে তাহার শেষ রশ্মিটুকুও যে সহসা মিলাইয়া পড়িয়াছে!—কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে এ ঘটনা ঘটিল তাহা তিনি বুঝিলেন না,—এইটুকু শুধু বুঝিলেন—যে জ্যোতির্ম্ময়ী এখন তাঁহার মনে একমাত্র জাগ্রত দেবতা!

অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর উপহাস! তিনি হাসিকে ভুলিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এমনি করিয়া তপ্ত হইতে তপ্ততর অনলদাহের মধ্যে ডুবিয়া কি? হাসিকে যখন তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন—তখন তাহাকে দুষ্প্রাপ্য মনে করেন নাই, সেইজন্য তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হয় নাই,—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাঁহার পক্ষে একান্তই দুর্ল্লভ বস্তু; তাঁহার কাছে আত্মবেদনা জানাইতেও যে সাহস নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গের তারকা—আর শরৎকুমার মর্ত্ত্যের মানব! চিরদিন এই অনলদাহ নীরবে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে বহন করিতে হইবে যে।

"ভগবান এমন নিষ্ঠুর তুমি! অথবা ইহাই তোমার করুণা? গৃহী হইবার জন্য আমাকে তুমি সৃষ্টি কর নাই। এ জীবন পরার্থে দান করিতেই তুমি ইঙ্গিত করিতেছ। তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,—বল দাও প্রভু বল দাও।"

(২০)

জ্যোতির্ম্ময়ীও বেশ স্বচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরিল না। অন্য দিন শরৎকুমারের অজ্ঞাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বিকিরণ হইতে সে যে কণিকারাশি কুড়াইয়া আনে সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে,—কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে একটা অন্ধকার বেদনা ভার লইয়াই সেখান হইতে সে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে এ কি কুয়াসার ব্যবধান আজ! তাহার অন্তরতম প্রাণ "হায় হায়" করিয়া উঠিল,—কিন্তু সে তাহাকে সবলে কশাঘাত করিয়া—শাসন বাক্যে বারবার করিয়া কহিতে লাগিল—"ভালই ত সে ভালই! রে অবোধ মন,—তুমি এতদিন যাহা চাহিয়াছিলে—ভগবান আজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন,—এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন? তাঁহার মঙ্গলদান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখ অনুভব কর। ব্যক্তি বিশেষের জন্য হা হুতাশ করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তুমি দেশের কাজে জীবনদান করিয়াছ ইহা ভুলিও না গো—ভুলিও না।"

গৃহে ফিরিয়া দেখিল—কুন্দ উপস্থিত নাই,—যে দাসী তাহার অপেক্ষায় ছিল—সে বলিল—"কুন্দ-দিদি এসে চলে গেছেন,—আপুনি এলে ডাকুতে বলেছেন—" জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল "না ডাকুতে হবে না—।" দাসী কাঁকুইখানা লইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে নিরস্ত করিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি কোনরূপে দীর্ঘ কেশ-দাম সংবৃত করিয়া ফিরাইয়া বাঁধিয়া লইল,

তাহার পর যথাসাধ্য বিনাড়ম্বরে—এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাজপর্ব্ব সমাধা করিয়া লইয়া পিতার নিকট ছুটিল। যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেল— "পণ্ডিত-মহাশয়কে গিয়ে বল আজ আর পড়ব না,—তিনি ঘরে যেতে পারেন।"

পিতৃকক্ষে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল, রাজা তখনো প্রস্তুত নহেন, তিনি বেশ মগ্ন ভাবেই খাতার উপর কলম চালাইতেছেন। তাহার জন্য পিতা অপেক্ষা করিয়া নাই দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল,—কোন কথা না কহিয়া ধীর পদে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। রাজা তখন মুখ তুলিয়া, ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"তাই ত! ৪টে বেজে গেছে যে? আচ্ছা তুই একটুখানি অপেক্ষা কর্ রাণি, আমি এখনি আসছি।" তিনি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল,—টেবিলের উপর খুব দামী ফ্রেমে আঁটা—কালীঘাটের দুই পয়সা মূল্যের একখানি কালীর পট। সেই ছবিখানি হাতে লইয়া বালিকা মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিল।—

এ কি ভীষণ মূর্ত্তি জগদম্বা প্রকৃতির! শিবকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন অশিবা! মধুর প্রেমমিলনকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি এখন ভয়ঙ্করা,—নিষ্ঠুরা! কিন্তু প্রকৃতির পক্ষে এই নিষ্ঠুর ভাবেরও যে প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই অন্যায় দমন-কারিণী প্রকৃতি এখন মুণ্ডমালিনী, ভীমা।

দেয়ালে আধুনিক কোন চিত্রকর-অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির একখানি পট টাঙ্গান ছিল। একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিল। বিশ্বমাতার এই স্নেহ করুণা-রূপিণী ভাব কি সুন্দর!—তাঁহার এই ভুবনমোহিনী মাধুরীই ত প্রয়োজনে করালী কালীরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছে! বালিকার জীবনের মধুর ভাবও প্রয়োজনের পদতলে এইরূপ বিসর্জ্জন দিতে হইবে,—মাতৃরূপা হইবার সৌভাগ্য লইয়া সে জন্ম গ্রহণ করে নাই!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল মধুর স্বভাবের অংশে একটা দারুণ শিহরণ উঠিল,—সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। রাজা সেই সময় প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"ঐ পটখানি মা আমাকে বাঁধাবার জন্যে দিয়েছিলেন, বেঁধে এসেছে, তাঁকে পাঠাতে ভুলে গেছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল,—"এখন এইখানেই থাক্। ফিরে এসে আমি ঠাকুরমার কাছে নিজেই এখানি নিয়ে যাব।"

মোটরে চড়িয়া রাজা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন—"ওঃ একটা খবর তোকে দেওয়া হয় নাই। একটু আগে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় পেয়েছি। মকদ্দমায় আমাদের জিৎ হয়েছে। অনাদি ও শরৎ বেকসুর খালাস।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমি ক্লাউডেন সাহেবকে প্রাণ ভ'রে ধন্যবাদ দেব। জানতুম যদিও যে জিৎ আমাদের হবেই, আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট যথার্থই ধর্ম্মাবতার—তাঁর কাছে অবিচার নেই।"

"না না—এ কথা আমাদের তরফ থেকে ওঠান ঠিক হবে না। দেখছ না এই

মকদ্দামা তাঁর হাতে গিয়ে অবধি আমি সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করেছি। তবে যদি তাঁরা একথা তোলেন—তখন ধন্যবাদ দিতে দোষ নেই।"

তাঁহারা যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে টেবিল চৌকি পাতা,—চায়ের আয়োজন,—বাহিরের লোকও আজ এখানে কেহ নাই, পিতা কন্যাকে দেখিয়া উভয়েই সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেম সাহেব নূতন বাংলা শিখিতে ছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন "তোমাকে বড় অধিক দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিলাম, আমার প্রিয়তম সন্তান। (My deerest child) ঠিক হইল কি ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল,—"খুব ঠিক হয়েছে মাদার।" জ্যোতির্ম্ময়ী ইঁহাকে মাদার বলিয়াই সম্ভাষণ করিত। মেম সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে বাহুপাশ হইতে মুক্তিদান-পূর্ব্বক সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পেয়ালাতে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইলেন। সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সমিতি কেমন চলছে my deer girl ?"

সে যে এ কয়দিন সমিতির খোঁজ লয় নাই —সে কথা প্রকাশ না করিয়া কহিল—"ভালই।"

"আর উৎসব দিনের সেই hero—ডাক্তার চৌধুরী তিনি কেমন আছেন ?"

এই প্রশ্নে রাজকন্যার মুখ ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"তিনি সেরে উঠেছেন।" কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার লজ্জারাগ লক্ষ্য করিলেন না,—তিনি চাপূর্ণ পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইয়া—রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এমন পচা মকদ্দামা আমার কাছে জীবনে আসে নাই! কি করে যে মুন্সেফ তাকে জিতিয়ে দিলেন!"

রাজা নীরবে হাতের পেয়ালা হইতে সন্তর্পণে—বেশ সুন্দর কায়দার সহিত একটুখানি চা মুখে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী দস্তুরে পেয়ালার চামচখানা এ সময় একরকম অনাবশ্যক শোভাস্বরূপ। চিনি ঘাঁটার কাজে লাগা ছাড়া ইহা চাপানের কাজে লাগে না। দুএকবার চা মুখে লইবার পর রাজা বলিলেন, "কিন্তু সুজন রায়ের দল—আপনার নামে নানা কথা রটনা করবে।"

"Indeed! কিন্তু সেই ভয়ে ত আমি ন্যায়-বিচারের অপমান করতে পারিনে।" জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখকান্তি একটি অপ্রাকৃত জ্যোতিঃসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে গম্ভীরভাবে কহিল—"আপনার এই ন্যায়পরতা জগতের অস্থি মজ্জায় স্থান পাক্ সর্ব্বান্তঃকরণে আমি এই প্রার্থনা করি।" জ্যোতির্ম্ময়ীর বালোচিত সরল উৎসাহে মুগ্ধ হইয়া—ক্লাউডেন সাহেব তাহার পিঠে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"Thank you, dear girl—"বলিয়া পত্নীর দিকে চাএর পেয়ালাটা বাড়াইয়া দিলেন। মেমসাহেব তাঁহার পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দিয়া রাজাকে কহিলেন, "আপনার পেয়ালাটি রাজা বাহাদুর ?" রাজার পেয়ালাও তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল তিনি মেম-সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন না।

তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার আধ পেয়ালা চা-ও ত এখনো শেষ হোল না,—আর কখনো যে শেষ হবে না তাও জানি।"—তিনি কতকগুলি চকোলেট মিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ীর 'পিরিচে' তুলিয়া দিলেন। সাহেব বলিলেন—"ঠিক হয়েছে—sweets to the sweet."

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল—"আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি—মিষ্টার ক্লাউডেন?"

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"By Jove, —তুমি কখনই ছেলেমানুষ ছিলে না—তুমি একজন born sage,—একটি ক্ষুদ্র লামা।"

রাজা বলিলেন—"ঠিক বলেছেন মিষ্টার ক্লাউডেন,—জানেন, ও যখন তিন বছরের মেয়েটি,—তখন আমাকে কি রকম জব্দ করেছিল ?"

শৈশবে নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কিরূপ অটল ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী রাজার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, রাজা সেই গল্পটি করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল—"জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, আমি আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করেছিলুম।"

"হ্যাঁ ঠিকই করেছিলে, বিজ্ঞব্যক্তির (sage) মতই কাজ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল—"হ্যাঁ, যেমন দেশের লোকের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করে গভর্ণমেণ্ট—বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে নিজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করতে যাচ্ছেন—।"

কথার গতি ফিরিল—ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "বঙ্গবিভাগে ত আমি ক্ষতি বুঝি না,—তবে দেশের লোক যখন এই বিভাগের বিরোধী —তখন গভর্ণমেণ্টের এ থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত!"

রাজা কহিলেন "আমাদেরও ত আপত্তির প্রধান কারণ আপাততঃ তাই। যদি গভর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদন গ্রাহ্য না করেন তাহলে আমরা বিদেশীপণ্য বয়কট করব—"

এই কথা লইয়া তাঁহারা যুক্তিতর্কে পরামর্শে মাতিলেন। মিশেষ ক্লাউডেন এই অবসরে জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন,—খানসামা চায়ের সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া গেল।

আশ্বিনের আরম্ভ। বাগানের কেয়ারিতে, রাস্তার পটিতে রকম বিরকম বিলাতি ফুলের বসন্ত বাহার জমিয়া নাই। জিনিয়া দোপাটি প্রভৃতি দুইচারি রকমের ফুল সবে মাত্র এখন অল্প অল্প ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোলাপফুলই এখন ফুলবাগানের প্রধান শোভা। কিন্তু জয় এ-সময় সবজি বাগানেরই। কপি, শালগম, বিট, গাজর, পেঁয়াজ মটর প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে মিশেষ ক্লাউডেনের সবজি-বাগান ভরপুর। ফুলবাগান ও সবজিবাগানের মধ্যস্থিত বাঁশের খিলান-দরজার উপরে 'মার্সেল নিল' গোলাপ লতা ফুলে ফুলে ভরা। এই লতা-গাছ জ্যোতির্ম্ময়ীর উপহার। রাজবাগানের দুইটি কলম আনিয়া একবৎসর পূর্ব্বে নিজের হাতে সে খিলানের দুই প্রান্তে পুঁতিয়া গিয়াছিল। মেমসাহেবের যত্নে এত শীঘ্র সেই কলম দুইটির এমন মধুর রূপ। এখনো প্রত্যহ তিনি এই গোলাপগাছে স্বহস্তে জল সিঞ্চন করেন। তাঁহাদের দেখিয়া মালী ছোট জল পাত্র

একটি আনিয়া ধরিল। এই জলপাত্র লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মালী বেগতিক দেখিয়া আর একটি বোমা আনিয়া দিল। উভয়ে বয়স্যার মতই হাসি গল্পে, বিবাদ কৌতুকে বাগানে ছুটা-ছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাগানের আশে পাশে ক্রমশ হাসনুহানা ও রজনী-গন্ধার দলও খুলিতে আরম্ভ করিল। মিশেষ ক্লাউডেনের স্নেহাদরপূর্ণ, মুক্ত বায়ুসুবাস—নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের অস্বচ্ছন্দ ভাব-প্রফুল্লতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। হৃদয় স্বভাব স্বচ্ছন্দ মুক্তির ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিছু পরে রাজাবাহাদুরের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বলিলেন—"রাণি, কলকাতা থেকে আজ ম্যানেজারের আসার কথা আছে, একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল, পশ্চিমে নদীর পরপারে সূর্য্যদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত তপস্বীমূর্ত্তি, তৎবিকীর্ণ আলোকে দিগ্‌দিগন্ত লালে লালে সমুজ্জ্বল; নদীর জল বিদ্যুৎকণায় প্রবাহিত। জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—কে জানে কেন? তাহার কি হঠাৎ শরৎকুমারকে মনে পড়িয়া গেল?

মেমসাহেব ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন,—"এখনি যাবেন রাজা-সাহেব?"

রাজা আবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"একটু দরকার আছে মিশেষ ক্লাউডেন,—নইলে এমন সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই এখনি!" ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। মেম-সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুনরায় সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

ফিরিবার বেলা রাজা নিজে মোটরের কল ধরিলেন। শরতের দিন, সূর্য্য এখন দিগন্তনিম্নে, তবুও সায়াহ্নগগন উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান! বিলাতের twilight কি এই রকমই?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কমপাউণ্ড ছাড়াইয়া রাজা আর একবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"মিনিট পাঁচেক আমরা আস্তে যেতে পারি।" নদীর ধার দিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিলেন। ওপারে কাশফুলের কি সুন্দর শোভা! মাঝে মাঝে বাতাস শেফালিফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল, একজন মালী কেতকীফুল মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল, তাহার সৌরভ পথে ছড়াইয়া দিয়া গেল। নদীর ধারে একটি বটগাছের তলায় একখানা সিন্দূরলেপিত প্রস্তর মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি কাহার স্থাপনা কেহ জানেনা। পথিকজন অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি বলিয়া ইহাকে প্রণাম করিয়া যায়।

এই প্রস্তর সন্নিধানে বসিয়া একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল—

মঙ্গল শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে—
এলেন আনন্দময়ী ভুবন আলো করে!
আজি আলোকে ঝলকে আনন্দ,
বহে কুসুমে মধুর গন্ধ
উথলে দিকে দিকে গীতিছন্দ,
বরষ দিবস পরে।

রাজা গাড়ী থামাইয়া চাপরাশিকে দিয়া তাহাকে পারিতোষিক পাঠাইলেন—।

গানটি রাজারই রচিত। প্রথম যে আশ্বিনে তাঁহার দুই কন্যা শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃ ভবনে আসিয়াছিল; সেই সময় তিনি এই গানটি রচনা করেন। পুরাতন কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত; তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পাশ হইতে তাহা দেখিতে পাইল না। গানটি শুনিতে শুনিতে সে বলিয়া উঠিল—"আশ্বিন মাস পড়েছে বুঝি?"

রাজা চক্ষের জল—চক্ষেই ধরিয়া লইয়া কহিলেন "রাণীর কাছে বুঝি সে খবর এখনো পৌঁছয় নি।" রাণী হাসিয়া পিতাকে আদরের বাহুপাশে জড়াইল,—রাজা পুরাতন দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।—চাপরাশী ফিরিয়া আসিলে তিনি এবার মোটার সতেজে চালাইয়া দিলেন।

ম্যানেজার যে কাজের জন্য আসিতে-ছিলেন,—তাহার কাগজ পত্র সব ঠিক আছে কি না—তাহা দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া রাজা প্রথমেই গেলেন দপ্তরখানায়, আর জ্যোতির্ম্ময়ী কালীর পট লইবার জন্য গেল রাজার ঘরে। কাছেই থাকেন শরৎকুমার, —হয় ত বা এখন তিনি বারান্দাতেই আসিয়া বসিয়াছেন,—একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাতের কালী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সেই বিষম পিপাসাও সে সবলে চাপিয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। সেখান হইতে আপনার ঘরে গিয়া বৈকালিক সাজ ত্যাগ করিয়া মন্দিরে যাইবার বেশ পরিয়া লইল,—তাহার পর দিদিমার মহলে প্রবেশ করিল। দিদিমা মন্দির গমন উদ্দেশ্যে তখন বারান্দায় পদার্পণ করিয়াছেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া চরণ সংযত করিয়া কহিলেন—"আজ যে আমার রাধারাণীর অসময়ে উদয়?—মন্দিরে যাবি বুঝি? সাজ সজ্জা যে সেই রকম?"

"হাঁ ঠাকুর-মা, অনেকদিন দেব দর্শনে যাইনি তাই আজ ইচ্ছে হোল। দেখ দেখি তোমার জন্যে কি এনেছি?"

ঠাকুর-মা ছবিখানি হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন—"ঠিক সময়েই এনেছিস—রাণি, —এখনি মন্দিরে গিয়ে টাঙ্গিয়ে দেব। কালী মূর্ত্তি সেখানে একখানিও নেই। তাই বুঝি দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখার পরই পটখানি কালীঘাট থেকে আনিয়েছি।"

"আচ্ছা দাও ঠাকুর-মা,—আমি নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করিল। ঠাকুরমা তখন তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন—"দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছিস নাতনি! বিরহজ্বালা পুষছিস যে বুকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবাই যা বোঝে তোর বাপ ত তা বোঝে না। বাপের তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে অর্জ্জুন জামাই করবে। আরে ঐ ত সেই। যুদ্ধ জিতলে, মালা নিলে,—ছদ্মবেশী অর্জ্জুনই ত সে,—তোর বাবাকে কে তা বোঝায় বল্ দেখি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের বেদনা মুখে রক্তরাগে ঝাঁপাইয়া উঠিল—পাছে ঠাকুরমা তাহা লক্ষ্য করেন—সে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না ঠাকুর-মা আমি বিয়ে করব না।"

"কেন লো ?"

"সবাই যে বিয়ে করে।"

দিদিমা খুব হাসিয়া উঠিলেন,—নাতনির পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"ওঃ সেইজন্যে ? যেমন বাপ ঠিক তেমনি মেয়ে! সবাই যা করে তা করতে নেই—কেমন ? সেইজন্যে তোর বাপও ত বিয়ে করলে না।"

মেয়ে বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর-মা, বাবা বিয়ে করেননি বলে তোমার এত দুঃখ আমি সে দুঃখ নিবারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমারও অনেক সময় মনে হয় —বাবার বিয়ে হলে ভাল হয়। তুমি একটি ভাল মেয়ে দেখ—তারপর এবার আমরা দুজনে মিলে বাবাকে ধরে পড়ব।"

ঈর্ষার পরিবর্ত্তে নিজেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে ইহাতে ঠাকুর-মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"হ্যাঁ অসাধারণ মেয়ে বটে!" মুখে বলিলেন—"বেশ কথা! আগে ত তোর হাতে বাঁধন পড়ুক—তখন বাপের চাদরেও গিরে দিস্।"

রসুন-চৌকীর পূরবীরাগ সহসা মন্দিরের আহ্বান ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে থামিয়া পড়িল। রাজমাতা বলিলেন "চল্ রাণি চল্ আরতির সময় হোল, ফিরে এসে এ পরামর্শ করা যাবে।"

মন্দির-অঙ্গনে পৌঁছিয়া প্রথমেই রাজমাতা কালী-মূর্ত্তিখানি একজন সেবকের হস্তে দিয়া, কোথায় ইহা টাঙ্গান হইবে বলিয়া দিলেন। পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজ-আত্মীয়গণ এতক্ষণ রাজমাতার আগমন-অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা মন্দিরে আসিবামাত্র স্তোত্রপাঠ এবং আরতি আরম্ভ হইল। রাজকুমারীর সহিত মহারাণী সপ্তবার দেব-প্রদক্ষিণ করিয়া দেব-সম্মুখে প্রণত হইলেন। প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী নতজানু থাকিয়াই করযোড়ে মূর্ত্তি যুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রকৃতি পুরুষের মিলন ভাব—এই যুগল মূর্ত্তিতে আজ সে সর্ব্ব-প্রথমে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। এই মিলনরূপ—কি সুমধুর,—কি মনোমোহন! জ্যোতির্ম্ময়ী মনে করিয়া আসিয়াছিল, শ্যামসুন্দরের চরণতলে সে তাহার উন্মেষিত প্রেমকে আজ অঞ্জলিদান করিয়া—চির কৌমার্য্য ব্রতে শপথ বদ্ধ হইবে। পারিল না—সে তাহা পারিল না। ভগবানের প্রেমমিলনরূপে তন্ময় হইয়া মোহাচ্ছন্ন ভাবে করযোড়েই সে বসিয়া রহিল। আরতি শেষ হইয়া গেল, স্তোত্র পাঠ বন্ধ হইল—ঠাকুর-মা তখনো রাজকন্যাকে সেই ভাবে বসিতে দেখিয়া একটু যেন ভীত ভাবে ডাকিলেন—"রাণি ?" রাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এতদিনে শেষ হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীর কি-যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উত্তেজনার বশে কেহ হিসাব করিবার অবসর পান নাই; যুদ্ধ-শেষে এখন সেগুলি খতাইয়া দেখিলে বোধ হয় সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন!

আমরা আজ ক্ষতির হিসাব করিতে বসি নাই। চারি-বৎসর-ব্যাপী এই অবিশ্রাম রক্তপাতের ফলে মানব-জাতির কোন লাভ হইয়াছে কি না, তাহারই আজ হিসাব করিতে চাই। কারণ, অমঙ্গলের মধ্যেই ভগবানের মঙ্গল-ইচ্ছা দেখা যায়, এটা দার্শনিক ভাবুকতা নহে; মানব-জীবনের ইহা পরীক্ষিত সত্য।

এতদিন ধরিয়া মানুষ যে সভ্যতা সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজেই আজ সেই সভ্যতা সে চূর্ণ করিয়া দিল। যে সকল বড় বড় সাম্রাজ্য, সুরক্ষিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই সভ্যতার আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝড়ের মুখে ধূলিরাশির মত কোথায় যে সে উড়িয়া গেল, কেহ তাহা জানিতেও পারিল না। নিত্য-নব যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, অতি সূক্ষ্ম রাজনীতি-তত্ত্ব কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বলদর্পিত যদুবংশীয়েরা যেমন হানাহানি করিয়া মরিয়াছিল,তেমনই এই সভ্যতা নিজের ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই আত্মহত্যা করিয়া বসিল।

যে ভ্রান্ত নীতি এই সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ ছিল—তাহার নাম প্রতিযোগিতা। বলবানের জয়, দুর্ব্বলের পতন ইহার মন্ত্র, ভোগবিলাস ইহার দেহ, বাণিজ্য ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভীষণ অক্টোপাসের মত এই প্রতিযোগিতা-মূলক সভ্যতা বিশ্ব-মানবকে তাহার সহস্র বাহুর জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল।

জাতিতে জাতিতে রেষারেষি এই প্রতি-যোগিতার এক প্রধান রূপ। যে জাতিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেইই অপর দুর্ব্বল জাতিকে চিরকাল পদানত করিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জাতি যে প্রবলের পেষণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন। অপরকে পদানত করিবার এই যে ক্ষমতা, ইহাই ছিল জাতির শক্তির মানদণ্ড। যাহারা যত-বেশী পর-রাজ্য জয় করিতে পারিত, যত-বেশী দুর্ব্বল জাতিকে আত্মসাৎ করিতে পারিত, তাহারাই তত-বেশী সভ্য বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিসর, রোম, গ্রীস, পারস্য, তাতার সকলেই এইরূপ উপায়ে সভ্য হইয়াছিল। আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতম জাতিদেরও যে এইটিই মূলমন্ত্র ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আধুনিক কালে আবার "নেসনালিজ্‌ম্" বলিয়া একটা জিনিষ ঢুকিয়া এই পরজাতি-জিগীষাকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। দেশ-ভক্তি বা স্বদেশবাৎসল্য অতি-পবিত্র স্বর্গীয় বস্তু,

সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার যে বিকৃতি "নেসনালিজ্‌ম্‌" বা স্বাদেশিকতা-রূপে বর্ত্তমান জগতে দেখা গিয়াছিল, তাহা ছদ্মবেশী নয়ন-মনোহর শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা প্রবল জাতির ঘোরতর স্বার্থপ্রিয়তা মাত্র। খাঁটি স্বদেশ-বাৎসল্যে পরজাতি-বিদ্বেষের গন্ধও নাই। কিন্তু এই যে আধুনিক "স্বাদেশিকতা," ইহার মূলে পরজাতির বুকের রক্ত পান করিয়া বর্দ্ধিত হইবার ইচ্ছা! এই ইচ্ছা বা শয়তানী আদর্শের কাছে কেহ ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকেও যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া লইতে কিছুমাত্র বাধে না। বর্ত্তমানে জর্ম্মনিই এই ভীষণ "নেসনালিজ্‌ম্‌"-এর আদর্শকে চরমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার উদ্ভাবিত "Kultur" নামক অপূর্ব্ব পদার্থ বিশ্বশুদ্ধ লোককে জোর করিয়া গিলাইয়া দিতে সে বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহার সে শুভ-ইচ্ছা (?) পূর্ণ হইল না। যে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-রূপে সে দাঁড়াইয়াছিল, নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তবে সে নিবৃত্ত হইল।

এই প্রতিযোগিতার আর এক মূর্ত্তি, বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাক্ষাৎ রক্তারক্তির মত ভয়ঙ্করূপে দেখা না দিলেও ইহার কার্য্যকারিতা আরও ভীষণ। নীরবে অন্য জাতির বুকের রক্ত পান করিয়া তাহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিয়া দেওয়াই ইহার কাজ। কঠোর হৃদয়হীন বড়-বড় কারখানা ইহার সহায়, আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞান ইহার বাহন। অর্থ-নীতি-তত্ত্বের শ্রুতি-মধুর মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে দুর্ব্বল জাতির দেশের মধ্যে ইহা সুচীর মত প্রবেশ করে এবং বর্শার ফলকের মত রক্তপান করিয়া আসে। ডাকিনী-যোগিনী যেমন শ্মশান-বাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, কামান-গোলা-গুলিও তেমনই ইহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। বিগত মহাযুদ্ধের একটী প্রধান কারণ যে এই বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন। স্বর্গীয় ঋষি টলষ্টয় তাহা দিব্য চক্ষে দেখিয়া ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতিযোগিতার সব-চেয়ে ব্যাপক মূর্ত্তি, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব—ধনী ও দরিদ্রে দ্বন্দ্ব—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দ্বন্দ্ব। আর বলিতে গেলে ইহাই প্রতিযোগিতার অন্তরতম রূপ; অন্য সকলরূপ ইহারই প্রতিরূপ মাত্র। সর্ব্বকালে সকল সমাজেই এই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। ধনী ও শিক্ষিতেরা দরিদ্র অশিক্ষিতদের বলে ও কৌশলে চাপিয়া রাখিয়া নিজেরা সকল সুখ ও সুবিধাগুলি ভোগ করিয়াছে। দেশের নামে এই যে যুদ্ধ চলিয়াছে, মূলতঃ ইহা কি? জনকয়েক ক্ষমতাশালী লোক নিজেদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য বলে ও কৌশলে অপর-সকলকে মৃত্যুর মুখে পাঠাইতেছে। যদি সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে হাত থাকিত, তবে হয়ত এরূপ রক্তপাত ঘটিতে পারিত না। কারণ এই রক্তপাতে সর্ব্বরকমের ক্ষতি এই সাধারণ লোকদেরই। বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেও সাধারণ লোকদের—যাহারা কুলী-মজুর, কারিগর, মিস্ত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিত

হয়, তাহাদের—বিশেষ কিছুই লাভ নাই। জনকয়েক ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেই উহার মধ্যে লাভবান্ হইয়া থাকে। অনেক দিন হইতেই সাধারণ লোকেরা এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং বুঝিয়া এই অন্যায় দাসত্ব হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকল দেশের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে আন্দোলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের ফলে "নেশনালিজ্‌ম্‌" বস্তুটা হয়ত ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং দরিদ্র অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের দাসত্বও যে আর বেশীদিন টিঁকিবে, এমন মনে হয় না। পৃথিবীর চারিদিকে শ্রমজীবি-দলের মুক্তি-লাভের প্রবল চেষ্টার লক্ষণ ইহার মধ্যেই দেখা যাইতেছে। নিন্দনীয় "বলসিভিজ্‌ম্‌" জিনিষটা ইহারই এক শোচনীয় বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রতিযোগিতা যে মানব-সমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে, ইহা প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম। জীব-রাজ্যে সর্ব্বত্রই ইহার বিস্তার। আচার্য্য ডারউইন সর্ব্বপ্রথমে পরিষ্কারভাবে এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীব-বিজ্ঞানের প্রধান সত্য প্রচার করিয়াছিলেন,—"জীবন-সংগ্রাম" (Struggle for existence) ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest)। এই দুই রূপে সংহার-রূপিণী প্রকৃতিকে তিনি সর্ব্বত্র দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিকাশের চির-গোপন রহস্যটুকু ঐ দুই সূত্রের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁহারই মূল তত্ত্বের টীকা-ভাষ্যের দ্বারা আধুনিক জীব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়মকে এরূপ সঙ্কীর্ণভাবে দেখা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ দেখা, এ কথা আমরা সাহস করিয়া আজ বলিতে পারি। নবযুগের জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে কেবল জীবন-সংগ্রামই জীব-বিকাশের একমাত্র নিয়ম নহে—উহা তাহার একটী ধারা মাত্র। উহারই পাশাপাশি আর একটী প্রবলতার নিয়ম প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে—তাহার নাম সহযোগিতা (mutual aid)। জীবরাজ্যের কি নিম্ন কি উচ্চ উভয় স্তরে সর্ব্বত্রই এই সহযোগিতার প্রভাব সমান বিস্তৃত। ইহার অভাবে সৃষ্টির সমস্ত বিকাশ, সমস্ত সৌন্দর্য্য একেবারে অন্ধকারে মগ্ন থাকিত। কি অর্দ্ধবিকশিত উদ্ভিদ্-নামধারী জীবগণের মধ্যে, কি অণুপরিমাণ কীট-পতঙ্গের মধ্যে, কি দলবদ্ধ পশুপক্ষীর মধ্যে অথবা সমাজবদ্ধ শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের মধ্যে—একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ব্যাপার চলিতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার তদপেক্ষা প্রবলতরভাবে সহ-যোগিতা ও প্রেমের লীলাও অহরহ দেখা যাইতেছে। তাই নবজীবতত্ত্বের মূলমন্ত্র আর জীবন-সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা নহে—তাহা সহযোগিতা বা প্রেম।

এই সহযোগিতার নিয়ম জীবরাজ্যের নিম্ন স্তরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও উর্দ্ধ স্তরে অর্থাৎ মানব-সমাজে ইহার প্রভাব খুবই বেশী। মানবের সমাজ এই সহযোগিতার ভিত্তির উপরই অধিষ্ঠিত।

তাহার গণ, জাতি, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ, পরিবার, সকলই এই নিয়মের ফল। অবশ্য মানব-সমাজেও প্রতিযোগিতার কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সহযোগিতা ও প্রেমই তাহার নিজস্ব বস্তু। তাহার মধ্যে ইহার যত বিকাশ হইতে থাকিবে, ততই সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে; আর যতই সে প্রতিযোগিতাকে আশ্রয় করিবে, ততই তাহার ধ্বংস বা অবনতি হইবে। এতদিন এই পশুনীতি অবলম্বন করিয়াই মানুষ ত যুদ্ধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ তাহারই চরমফল।

মহাযুদ্ধের যজ্ঞভস্ম হইতে যে নবীন সভ্যতা জাগিয়া উঠিবে—আশা করা যায়, সে সহযোগিতা ও প্রেমের অমৃতপূর্ণ কলস লইয়াই সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে। সেই অমৃত-পানে মানুষের সকল গ্লানি, সকল দুর্দ্দশার অবসান হইবে; সাম্য ও মৈত্রীর ফলে অচিরে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বেশে দেখা দিবে।

যে বিগর্হিত পররাজ্য-জিগীষা সকল ব্যাধির মূল, আশা করি, তাহার অবসান হইবে। "নেসনালিজ্‌ম্" নামক যে ছদ্মবেশী লোভী শয়তান আপনার পসার জম্‌কাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেও বোধ হয় দূরে সরিয়া যাইতে হইবে! পৃথিবীময় যে সকল দুর্ব্বল, দরিদ্র জাতি প্রবলের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে, "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়া আছে, তাহাদের শৃঙ্খল মোচন হইবে। সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য, ও আদর্শ-অনুসারে নিজেদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সুখভোগ করিতে পারিবে। Self-determination কেবল রাজনৈতিকদের কথার কথা নয়, পৃথিবীর ছোট-বড় সকল জাতিই তাহার সুবিধা লাভ করিবে।

নবযুগের বাণিজ্য-ব্যাপারেও আর সেরূপ ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের দ্বন্দ্ব চলিবে না। সেই ভীষণ অক্টোপাস-নীতির পরিবর্ত্তে ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে co-operation বা মেলা-মেশার কারবার প্রবর্ত্তিত হইবে। ছোট গরিব জাতিরা তাহাদের নিজেদের দেশের সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিবে; বড় ধনী জাতিদের জন্য কেবল "কাঠ ও জল" বহিয়াই মরিবে না।

সর্ব্বোপরি সকল দেশের সকল মানুষ ধনীদের ও বড়দের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। জনকয়েক ধনী, শিক্ষিত ও বলশালী মিলিয়া দেশের সাধারণকে আর তেমন গরু-ভেড়ার মত তাড়াইতে পারিবে না! কেবল দেশে ও রাষ্ট্রে নহে—সমাজে ও পরিবারে সর্ব্বত্রই যেন মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে! আচারে ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায় সকল বিষয়েই যেন তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়! ধন কেবল জন-কয়েকের বিলাস-ভোগের জন্য নহে—সর্ব্ব-সাধারণের সেবায় তাহা উৎসৃষ্ট হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দরিদ্রের কুটীরেও যেন পড়িতে পারে, তাহা হইলেই জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-শোক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে।

এই সকল বিষয়ই নবযুগের মানুষের সম্মুখে প্রধান সমস্যা; ইহাদের সম্যক সমাধানেই তাহার মঙ্গল এবং মুক্তি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

"মাতৃগুপ্ত"

কবি মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভায় অতি-দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন; রাজার সেবা তিনি প্রাণপণে করছেন, কিন্তু রাজার সুনজর একদিনও তাঁর উপর পড়েছে একথা কেউ বলবেনা—সেই মলিন-মুখ, ছেঁড়া-কাঁথা মাতৃগুপ্তকে দেখে। ঋতুরাজের মতো রাজা হর্ষ সবাইকে সুখের হিল্লোলে পূর্ণ করলেন; কিন্তু দুঃখ—সে শীতের মতো কবির চারিদিকে জড়িয়ে রইলো! রাজা মাতৃগুপ্তের কবিতা থেকে সেটার ইঙ্গিত পেয়েও উদাসীন রহিলেন। এইভাবে কবি কত শীত যে বিনা-পুরস্কারে হর্ষবর্দ্ধনের সেবায় কাটালেন তার ঠিক নেই। রাজা যখনি শোধান—"কবি কি সংবাদ?" কবি উত্তর দেন ছেঁড়া-কাঁথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—"বড় শীত মহারাজ! হুতাশের গরম নিশ্বাস বুকের মধ্যে না যদি থাকতো, আর যদি হর্ষের কথা দু-একটা মাঝে-মাঝে আগামী বসন্তের আশার মতো শুনতে না পেতেম, তবে নিশ্চয়ই মরেছিলেম।" রাজা মনে-মনে কবির কথায় দুঃখ পান; আর এতদিন কবিকে অনর্থক যে নানা ভোগ ইচ্ছে কোরে ভোগাচ্ছেন সেটা ভেবেও লজ্জা পান; কিন্তু মুখে বলেন—লক্ষ টাকার কাশ্মীরী শাল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—"শীততো মোটেই বোধ হচ্ছেনা কবি!" কবি একটু ম্লান হেসে উত্তর করেন—"লোকের হর্ষবর্দ্ধন বসন্ত কাল; শীতের খবর তো তার কাছে পৌছতেই পারেনা মহারাজ!"

একদিন বসন্তকালে রাজা উপবনে বিহার করছেন, মলিন-মুখে মাতৃগুপ্তকে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে আস্‌তে দেখে রাজা বল্লেন—"তুমি ও আমি দুজনে কি আজ সমান সুখী নয়? এই বসন্তকালে শীত তো পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, তবে এখনো তোমার মলিন-মুখ ছেঁড়া-কাঁথা কেন বলতো কবি?" কবি উত্তর দিলেন—"মহারাজ আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা? আপনি ওই সম্মুখের ক্রীড়া-পর্ব্বতটির মতো বসন্তের দিনে বিচিত্র বাসন্তী ফুলের সাজে সেজে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করছেন; আপনার যশের সৌরভ পেয়ে দিগ্‌দিগন্ত থেকে দেখুন কত মধুকর এসে গুণগান করছে—আজ আপনার চারিদিকে আনন্দে হর্ষের মধুবৃষ্টি কোরে! আর আমি ঐ হিমাচলটার মতো যে শীতে সেই শীতেই ঘেরা রয়েছি এখনো!"

রাজা বল্লেন—"তবে কে বড় হল কবি? হিমাচল? না এই ক্রীড়া-পর্ব্বতটা?"

কবি বল্লেন—"ক্রীড়া-পর্ব্বতটি বসন্তের হর্ষবর্দ্ধন ফুল-ফলের ঐশ্বর্য্যে, ছায়ার মহিমায় বড়; আর হিমাচলটা কায়ায় যেমন, তেমনি দুঃখেও বড় মহারাজ! শীত ওর আর যাবার নয় দেখছি।"

মহারাজ কিছুদিন যুবরাজের হাতে রাজ্য-ভার দিয়ে বিশ্রাম করছেন—গরমের দিনে; কাঁথাখানা চারপাট কোরে স্কন্ধে

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

রেখে কবি উপস্থিত—বিষম রৌদ্রে, খোলা মাথায়। হর্ষবর্দ্ধন বলে উঠলেন—"এতদিনে শীত দূর হল কবিবরের!"

মাতৃগুপ্ত উত্তর করলেন—"মহারাজ, শীত একটু অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকে এই হতভাগা কবিটিকে পুড়িয়ে মারবার জন্যই রেখে গেছেন! শীতের আমলে কেবল কেঁপেই মরতেম, কিন্তু এ-আমলে হৃৎকম্প আর স্বেদ দুইই হচ্ছে;—মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা পড়ছে মহারাজ!"

রাজা মৃদু হেসে বল্লেন—"কবিবর, ওই কাঁথাটা স্কন্ধে না রেখে ওটার মায়া ত্যাগ কোরে যদি আমার হাতে সঁপে দাও, তবে ওটা দিয়ে তোমার জন্যে এমন-একটা ছাতা বানিয়ে দিতে পারি—বেশ বড়-গোছের—যার ছায়ায় তুমি সুখে থাকতে পারবে!"

মহারাজের সামনে কবি সেই শতকুটি কাঁথা বিছিয়ে তার উপরে বোসে বল্লেন—"দুঃখের দিনের সম্বল এই কাঁথা দিনে-রাতে শীতে-গ্রীষ্মে কাজ দিচ্ছে এখনো। এমন কি প্রয়োজন হলে মহারাজেরও পদধূলি মুছে নেওয়া কিম্বা সিংহাসনের গদীর আর-এক-পুরু খোলোসও করা যায় একে দিয়ে একদিন! কিন্তু ছাতা হলে এই ফুটোফাটা কাঁথায় রোদ-বৃষ্টি মোটেই আট্‌কাবে না; উপরন্তু যে-কাজগুলো এখন করছে তাও করতে পারবে না!"

মহারাজ বল্লেন—"কবিতা আর কাঁথা আর তার উপর আমি ধরলেম ছাতা!" বোলে রাজা উঠে কবির মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আনন্দে সভাসদ সবাই ধন্য ধন্য বোলে উঠলো।

কবি ছল্‌ছল্-চোখে বল্লেন—"প্রভু এ দাসকে কোন্ দূরদেশের রাজছত্রের তলায় নির্ব্বাসন দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন?"

"বন্ধু এইখানে"—বোলে রাজা ছাতা রেখে কবিকে বুকে ধরলেন।

মাতৃগুপ্ত বল্লেন—"বন্ধু, ছাতার আড়াল সরে গিয়ে তোমার পা পড়েছে দীনের কাঁথায়, অম্‌নি খোলা আঙিনার শেষপর্য্যন্ত তোমার ছায়া বিস্তারিত হল দেখ।"

রাজা বল্লেন—"বন্ধু, এই ক্রীড়াপর্ব্বতের তপ্ত মাটি ওই দেখ তোমারও ছায়া পেয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত শীতল হচ্ছে!"

গ্রীষ্মকাল এই ভাবে কাটলো। বর্ষা এসে উপস্থিত হল। উজ্জয়িনী-রাজপ্রাসাদের চূড়ায় ময়ূর সব পাখা বিস্তার কোরে মেঘের দিকে চেয়ে কেকা রব করছে; আকাশে ইন্দ্রধনু মেঘের উপরে সাত রং নিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজা বল্লেন—"ছাতার দরকার এখনো কি অনুভব করছোনা কবি?" কবি বল্লেন—"এখনো নয় মহারাজ! কেননা এখনো শুনছি ময়ূরেরা বলাবলি করছে—হায় অসার ইন্দ্রধনুর রং দেখে মেঘ মোহিত হয়ে রইলো আর চিত্রবিচিত্র পাখা মেলে আমরা যে তার গুণগান কোরে কৃপাবারি ভিক্ষা করছি, তার জন্যে মেঘপুলক বিন্দু যা দিচ্ছে তাতে তৃষ্ণা মেটা দূরে থাক্, পালকগুলো যে ধুয়ে নেবো তাও হচ্ছেনা। ইন্দ্রদেব যতক্ষণ আকাশ ফুটো-কোরে জল না ঢালছেন ছাতার কথা মনেও আসছেনা। এখন কেবল মনে আসছে—'সন্তপ্তানাম্ ত্বমসি শরণং'।" রাজা বলে উঠলেন—"যদি তাই

হয় তবে—বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ। জলদ-সময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥"

এই বোলে রাজা মাতৃগুপ্তকে একখানি পত্র দিয়ে বল্লেন—"আমার এই পত্র নিয়ে আপনি কাশ্মীরে গমন করুন এই মুহূর্ত্তে!"

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বল্লেন—"কবিবরের যান-বাহন পাথেয়—"

রাজা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"কিছু প্রয়োজন নেই।"

মন্ত্রী অবাক হয়ে কবির দিকে চাইলেন। কবি ছেঁড়া-কাঁথায় রাজার শাসন-পত্র বেঁধে নিয়ে পথে বার হলেন—আর-কিছু প্রয়োজন নেই বোলে।

কবি চলেছেন মেঘে ছায়া-করা দিনগুলির মধ্যে দিয়ে নদী-তীরে-তীরে—গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম কোরে। বনের পথে পাখীদের গান শুনতে-শুনতে, মাঠে-ঘাটে নানা ছবি, নানা শোভা দেখতে-দেখতে সারা পথ তিনি আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছেন। শেষে একদিন দূরে হিমাচলের পায়ের কাছে কাশ্মীরে এসে কবি উপস্থিত। তখন সেখানে ফুলের সময়। কবি দেখলেন সমস্ত দেশ ফুলে ফলে-সবুজে যেন একখানি বিচিত্র রাজাসনের মতো বিছোনো রয়েছে। তার উপরে বরফের চূড়া শ্বেত-ছত্রটির মতো শোভা ধরেছে। কবির পথের ক্লেশ দূর কোরে পর্ব্বতের বাতাস ফোটা-ফুলের সুগন্ধে উপবন আমোদ করেছে; ছেঁড়া-কাঁথায় মাথা রেখে মাতৃগুপ্ত সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন; কখন্ দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা আসছে তা তাঁর খবরেও আসেনি। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলেন—যেন মনে হল একটা সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গায়ের কাঁথাখানা কারা কেড়ে নিতে চাচ্ছে আর তিনি প্রাণপণে হাঁকছেন—মহারাজ রক্ষে করুন! আমার কাঁথা আমি কিছুতে ছাড়বোনা! মহারাজ কিছু বলছেন না কেবলি হাসছেন। —কবি চেয়ে দেখলেন সত্যিই এক হরিণশিশু তাঁর কাঁথার উপরে আরামে মাথাটি রেখে নিদ্রা দিচ্ছে; কবিকে উঠতে দেখে বনের হরিণ পালিয়ে গেল। স্বপ্নের অর্থ ভাবতে-ভাবতে মাতৃগুপ্ত সে-রাত্রির মতো সুরপুরের চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। তার পর হর্ষবর্দ্ধনের দানপত্র যথাসময়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃগুপ্ত প্রত্যুত্তর চাইলেন; তখন মন্ত্রী কবিকে প্রণাম কোরে বল্লেন—"অনুমতি দেন তো অভিষেকের আয়োজন করি। সিংহাসন কেন আর শূন্য থাকে?" কবি আশ্চর্য্য হয়ে শুধালেন—"কার অভিষেকের অনুমতি চাচ্ছেন আপনি আমার কাছে?" মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"হে সুকবি—আপনারি?" কবি বুঝলেন হর্ষবর্দ্ধন তাঁর মাথায় রাজছত্র না দিয়ে ছাড়লেন না। তিনি মন্ত্রীকে ছেঁড়া-কাঁথা দেখিয়ে বল্লেন—"মন্ত্রী, এখানা সিংহাসনে বিছিয়ে দিতে বল, আর অভিষেকের আয়োজন কর।"

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার অল্পদিন পরে হর্ষবর্দ্ধন স্বর্গে গেলেন এ-খবর যেদিন কাশ্মীরে পৌঁছল সেই দিন কবি রাজছত্রের মায়া পরিত্যাগ কোরে ছেঁড়া-কাঁথা স্কন্ধে ফেলে যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে বারাণসীতে চলে গেলেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের দারিদ্র্যের কারণ

ভারত যে দরিদ্র তাহার ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক্ এই দারিদ্র্যের কারণ কি ?

যদি ভারতবাসী ও কতকগুলি উদার-নৈতিক ইংরাজের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় ইংলণ্ড ভারতের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, অন্তর্জাতীয় কোম্পানী যেরূপ বঙ্গের সার-শোষণ করিয়াছে সেইরূপ ইংলণ্ডও দেড়শত বৎসর যাবৎ ভারতকে দোহন করিয়াছে।

এই প্রশ্নের সমাধানার্থ, এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল প্রথমতঃ তাহার আলোচনা করা আবশ্যক ; তাহার পর উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে ভারত বাস্তবিকই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; পরিশেষে ইংলণ্ডের কি লাভ হইয়াছে এবং সেই লাভের অনুরূপ ভারতের কি উপকার হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

*
* *

ইংরেজ-সরকারের প্রতিপক্ষীয়েরা মোগলের সময়কার ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করিতে বিরত হন না। সেই সময় রাজস্বের পরিমাণ কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তাহার সংখ্যাঙ্ক তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, তখন অর্দ্ধেক রাজস্ব ভূমিকর হইতে উৎপন্ন হইত। কিন্তু এই ভূমি-উৎপন্ন রাজস্ব কর-হিসাবে ধর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ভূমি সরকারের নিজস্ব ছিল, এবং সরকারের স্বেচ্ছানুসারে ফসলের পরিমাণ ধরিয়া পূর্ব্ব হইতেই রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত।

মোগল-সম্রাটদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উদার সেই আকবর, ফসলের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতেন ; পক্ষান্তরে—ইংরেজ-সরকার যাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই দত্ত-মহাশয়ের কথা-অনুসারেও, বঙ্গদেশে ফসলের উপর শতকরা পাঁচ, ভারতের উত্তরাংশে শতকরা ৮, মাদ্রাজে শতকরা ১২ এইরূপ ভূমি-কর ছিল। বোম্বায়ের ভূমিকর তিনি শতকরা ৩৩ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন।

অতএব ইংরেজ-সরকারের একজন প্রতিকূল-বাদীর হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যায়, কেবল কতকগুলি এলাকা এবং এক প্রদেশমাত্র হইতে—সর্ব্বাপেক্ষা উদার মোগল-সম্রাটের আমলে সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভূমির যে রাজস্ব ছিল,—সেই রাজস্ব আদায় হইত। সরকারের নিজ-অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত-কার্য্যের জন্য সরকারের প্রাপ্য সুদও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরংজেবের আমলে, যে সকল বিদেশী পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই জন-সাধারণের দুঃখ-দৈন্যের কথা,

কৃপাধীন স্বেচ্ছাধীন দাস-কৃষকের কথা, মনসবদারদিগের 'বেগার-খাটানো' প্রহার-ভোগী কারিগরের কথা বলিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয়-অভিযান দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ইংরেজ-বিজয়ের যুগে কতকগুলি জেলা ছাড়া, সমস্ত দেশ দৈন্যগ্রস্ত ছিল।

*
* *

পক্ষান্তরে নিম্নে-প্রদত্ত সংখ্যাঙ্কের দ্বারা সপ্রমাণ হইবে, ১৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাব (আয়)

(এস্থলে বিশেষরূপে Lord Wellesly ও Lord Dalhousieর শাসনাধীনে রাজ্য-বৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে)

১৭৯৩ অব্দে...£ ৮, ২২৫, ৬:৮

১৮০৮-০৯...£ ১৫, ৫২৫, ০৫৫

১৮৪০...£ ২১, ০০০, ০০০

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব (আয়)

১৮৭৬-৭৭...টাকা ৫৮৬, ৫১৯, ০৭০

১৯০০-০১...£ ৭৫, ১৬৬, ০০০

১৮৪০ অব্দে...ভূমিকর হইতে পাওয়া যায় ১২, ৫০০, ০০০£,

১৯০০-০১,... ...১৯, ৫৫৩, ৭০০

৬০ বৎসর যাবৎ পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

টেলিগ্রাফ :—লাইন ৫২, ৯০৯ মাইল ; তার :—১৭১, ০৪৯ মাইল।

রেল-পথ :—২৫,০৩৫ ½ মাইল।

খাল :—৭,৪১২ মাইল বড় খাল ও ২৮, ৩৩৭ মাইল ছোট খাল।

বাহ্য বাণিজ্য।

১৮৩৪ ৩৫ অব্দে। আমদানী : টাকা ৬০, ৫৪১, ২৯০।

রপ্তানী...০১, ৮৮১, ৬১০।

১৮৬০-১৮৬১...আমদানী : টাকা ৩৪১, ৭০৭, ৯০০

রপ্তানী...৩৪০, ৯০১, ৫৪০

১৮৮০-৮১...আমদানী : টাকা ৬২১, ০৪৯, ৮৪৩

রপ্তানী :—টাকা ৭৬০, ২১০, ৪২৮

১৮৯৯-১৯০০...আমদানী : টাকা ৯৬২, ৭৪১ ৬৫৬

রপ্তানী : টাকা ১, ১৭০, ৩৯৭, ০৯২।

ব্যাঙ্ক।

১৮৭১ অব্দে মূলধন : টাকা ৩৪, ২০৭, ৬১০।

মোট ডেপজিট : টাকা ১১৯, ৬৬০, ৪২৭।

১৮৮০...মূলধন...৩৬, ৮০০, ০০০

ডেপজিট...১২০, ৩৮১, ৬৮০

১৮৯৯...মূলধন...৪৪, ০২৮, ৭১০

ডেপজিট...২১১, ১৪৭, ৫৪২

১৯০০...মূলধন...৪৪, ০৫২, ৪৮০

ডেপজিট...২৩৬, ৪৭৪, ৯৩০

শ্রমশিল্পে যে মূলধন খাটিয়াছে।

তুলার কল-কারখানা (এই শ্রমশিল্প ১৮৫১ হইতে সূত্রপাত হয়)

১৮৭৮-৭৯ মাকু : ১, ৪ ৩৬, ৪৬৪

মূলধন টাকা ৫৭, ০৬৭, ৫০০

১৯০০-১৯০১ মাকু—৪, ৯২২, ৬০২

মূলধন টাকা ১৬৭, ৩০৫, ০০০

শ্রমজীবীদের মজুরী।

কৃষকদিগের মজুরী, ১৮৭৩ হইতে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ও কামারের মজুরী ২১৭ হইতে ১০০ এই অনুপাতে (কলিকাতায়), ১৫০ হইতে ১০০ এই অনুপাতে দিল্লিতে (ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় শ্রমশিল্পের ব্যবসায়ে মজুরীর বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়ঃ ১৮৮৫ অব্দে যে হেড-মিস্ত্রী ১৭ টাকা পাইত, আজিকার দিনে সেই মিস্ত্রী প্রায় ৪০ টাকা পাইয়া থাকে।

অবশ্য ভারত এখনো দরিদ্র, অতিশয় দরিদ্র; কিন্তু ভারত ইংরেজের শাসনাধীনে দরিদ্র হয় নাই, বরং সমৃদ্ধ হইয়াছে।

* * *

ভারত উচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাক, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে বরং সাহায্য হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; আরও এই কথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত উদার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড ভারতের সমধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে, আমরা দুই যুগ নির্দ্ধারণ করিব।

ক্লাইভ ও ওয়ারেন-হেষ্টিংসের আমলে কোম্পানী হিন্দুরাজাদিগের নিকট হইতে বিস্তর টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়াছে। এই সমস্ত টাকা ভারত হইতে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহার বদলে ভারত কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি সাধারণের যেরূপ বিশ্বাস, তদনুরূপ কোম্পানীর যে খুব বেশী লাভ হইত তাহা মনে হয় না।

১৭৭২ অব্দে আয় £২, ৩৭৩, ৬৫০; ব্যয়—£ ১,৭০৫, ২৭৯। ১৭৮৫ অব্দে, আয়: £ ৫, ৩১৫, ১৯৭; ব্যয়—£ ৪, ৩১২, ৫১৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে;—আয়ের অঙ্কে এইরূপ ঘাট্‌তি হইয়াছিল, যথা ১৭৯৭-৯৮ অব্দে £ ১১৪, ৭৪৬; ১৮০৮-০৯ অব্দে £ ২৬,০৪২।

পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতি আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার কারণ হইয়াছিল, এবং আমেরিক-উপনিবেশদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছিল। ভারতের সহিত ব্যবহারেও সেই একইরূপ কঠোরতা: যে সকল ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের কারখানায় তৈয়ারী হইয়া ইংলণ্ডের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইংলণ্ডে সেই সকল জিনিসের প্রবেশ রহিত করা হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজী তৈয়ারী মাল শতকরা দশ হিসাবে মাসুল দিলেই ভারতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত।

কোম্পানীর আমলে ভারত, ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে সত্যসত্যই অভিযোগ করিতে পারেন; অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী যে টাকা জবরদস্তি আদায় করিত বলিয়া কথিত হয়—তার চেয়ে আসলে কম। লর্ড কর্ণোয়ালিসের আমলে উহা একেবারেই রহিত হয় এবং তখন অবাধ-বিনিময় ৬০ বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার খারাপ পরিণাম একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ—বাঙ্গলা,

এবং সেই বাঙ্গলাই কেবল এই শাসনাধীনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

* * *

প্রথমে আমরা সরকারী ঋণের বিষয় আলোচনা করিব; ইহাকে সচরাচর home charge বলা হয়।

এই টাকা প্রতিবৎসর ভারত-সরকার ভারতের ষ্টেট্-সেক্রেটারিকে পাঠাইয়া থাকেন—যেমন মনে কর ১৮৯-১৯০০ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৬, ৩৯২, ৮৪৬; ১৯০০-০১ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৯, ২০০, ৯৫৭।

ভারত-সরকার ইংলণ্ডে যে টাকা ঋণ করেন ও রেল-কোম্পানীকে প্রতিভূস্বরূপ যে টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, উক্ত ঋণের মধ্যে ৯০ লক্ষ পৌণ্ড তাহারই সুদ। ঐ ধার-করা টাকার অধিকাংশ উৎপাদক পূর্ত্তকর্ম্মে খরচ হইয়াছে। ধারের সুদ অপেক্ষা এই পূর্ত্তকর্ম্মের আয় বেশী। উহার মধ্যে আবার কতক টাকা বিজয়-কার্য্য ও বিদ্রোহের বাবৎ খরচ হইয়াছে। কিন্তু এই খর্চ্চার ভার সমস্ত ভারত-বাসীর স্কন্ধে পড়ে না কি? কিন্তু ভারতের ঐক্যসাধন বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে সকলেরই কি ত্যাগস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে? পরিশেষে, বজেটের বাৎসরিক ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্যও টাকা ধার করিতে হইয়াছে। কেবল এই বাবদেই কিছু টাকা হাতে রাখিলে সুবিধা হয়। ভারত-সরকার ও ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি বজেটের এই ঘাট্‌তি একটু বেশী সহজভাবে দেখেন: যে দেশ প্রতিনিধি-সভার দ্বারা পরিচালিত নহে, সে দেশের স্বার্থসম্বন্ধে একটু বেশী চিন্তা করা আবশ্যক।

রাজস্বের এই টাকা যাহা বিলাতে পাঠান হয় তাহা খুব বেশী নহে এবং অনেক স্থলেই (বিশেষত দুর্ভিক্ষের বৎসরে) এই টাকা পাঠান অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

আরও যে যে বাবদে ভারত-সরকার ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধর্ত্তব্য:—

সৈনিক-ব্যয়।

ভারতের ইংরেজ-সৈন্য পোষণের সমস্ত ভার ভারতের স্কন্ধে ফেলা উচিত নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজে যে সকল যুদ্ধ-অভিযান চালিত হইয়াছে—যেমন সৌদান ও চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ—সেই-সব অভিযানের খর্চ্চা ভারতকে দিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

রাজ্য-শাসনের ব্যয়।

ষ্টেট্-সেক্রেটারির বজেট্ ইংরেজ করদাতাদের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। ভারত-সরকারের ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কার্য্যকালে বেতনের কিয়দংশ এবং কর্ম্ম হইতে অবসরের পর সমস্ত পেন্‌সনের টাকা ইংলণ্ডেই খরচ করেন; কাজেই ইহা ভারতের একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি—এই সকল ইংরেজ-কর্ম্মচারীর জায়গায় যদি দেশীয় কর্ম্মচারী ক্রমশ অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের এই ক্ষতি হয় না। কেননা, তাহারা তাহাদের

বেতনের সমস্ত টাকাই ভারতে খরচ করিবে। তথাপি এখানে আমি এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই :—

ইংরেজেরা ভারতের প্রকৃত উপকার করিয়াছে এবং এখনো করিতেছে। সম্পূর্ণ-রূপে ভারতবাসীর দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব।

ইংলণ্ডের সাহায্য ব্যতীত, ভারত এত কম সুদে টাকা ধার করিতে পারিবে না। সরকারী পূর্ত্তকর্ম্মের খরচই ধরনা কেন; ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে এই টাকা £ ২০৮ মিলিয়ানে উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন ভারত-বাসীর দ্বারা শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে ভারত শতকরা ১০ টাকার নীচে কখনই টাকা ধার করিতে পারিত না। ৫০ কোটির বেশী টাকা এই হারে কি ভারত ধার পাইত? এখন দেখ, এই ২০৮ মিলিয়নের সুধ হইতেছে শতকরা ২½ হইতে ৩½ পর্য্যন্ত মাত্র।

পূর্ব্বে যে কথা বলিতেছিলাম, সেই কথায় আবার আসা যাক্ :—

ভারত-সরকারের খরচের কথা—বিশেষত যে টাকা ইংলণ্ডে খরচ করা হইয়া থাকে সেই খরচের কথা অতিরঞ্জিত;

যে দেশে মূলধনের খাঁকৃতি, সে দেশে খরচের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিপদজনক;

ভারতের দারিদ্র্য এই সকল খরচের উপর আরোপ করা অসম্ভব।

*
* *

সরকারী ঋণের সহিত ব্যক্তিগত ঋণও আছে; অর্থাৎ ইংরেজেরা ভারতীয় ব্যবসায়-উদ্যমে যে টাকা খাটাইয়া থাকেন তাহার সুধ :—যথা চায়ের চাষ, নীলের চাষ, কাফির চাষ; খনি, তূলার কল-কারখানা, পাটের কল-কারখানা; জাহাজ-চালনের কোম্পানী, বেঙ্ক ইত্যাদি। বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করা সকল দেশের পক্ষেই সুবিধা; যে দেশের মূলধন খুব কম, তাহার পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক।

"অনুপস্থিতির" (absentism) উপর যে দোষারোপ করা হয়, তাহা এই সব স্থলে খাটে না। 'অনুপস্থিত' ব্যবসাদার অধিবাসী-দিগের শ্রমোৎপন্ন জিনিস বিদেশে খরচ করেন, এবং তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে নূতন মূলধন দেন না। কিন্তু বিদেশী ঋণগ্রাহী নিজের দেশে সেই মূলধন আনয়ন করেন, যে মূলধনের অভাব দেশে ছিল—অর্থাৎ অন্য দেশের লোকের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করেন। অবশ্য ঐ মূলধন নিজস্ব হইলে ঋণগ্রাহী দেশের লোকের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। কিন্তু মূলধনের অনুরূপ যে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য তাহা ত উহারা যোগান দেয় নাই। অতএব এই বাবদে ইংলণ্ডকে যে টাকা দেওয়া হয়,—ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে উপকার পাইয়াছে ঐ টাকা, তাহারই মূল্য-স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাক্, ভারত যে উপকার পায়, তাহার তুলনায় ইংলণ্ডের লাভ বেশী হয় কিনা?

এইখানে একটু পৃথক্‌ভাবে দেখা আবশ্যক: ভারতে যে টাকা খাটে, তাহার সুধ সহজ ভাবের চির-প্রচলিত সুধ। এই সুদের হারে, ভারত বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

আবার আর এক-প্রকার সুদ আছে, যাহা লভ্যজনক। এই লভ্যজনক সুদের কিয়দংশ দেশের লোকেরই হাতে থাকিতে পারিত যদি তাহাদের মূলধন থাকিত, কিংবা ইংরেজেরা যে সকল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় সেই সকল ব্যবসায়ে যে বিজ্ঞানের আবশ্যক সেই বিজ্ঞান যদি তাহাদের জানা থাকিত। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে, ভারতভূমি এত বৃহৎ এবং এখনো উহার সারোদ্ধারকল্পে (exploitation) উহাকে এতকম খাটানো হইয়াছে যে, বাস্তবিক বলিতে গেলে, এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কথাই আসিতে পারে না। অতএব ইংরেজ কোম্পানীর লাভের দরুন, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি স্থগিদ হয় নাই।

ভারতের যাহা কিছু সমৃদ্ধি ও উদ্যম উদ্যোগ তাহার জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইয়াও সম্ভবত অপেক্ষাকৃত প্রবল, সমৃদ্ধ ও যন্ত্রপাতি-সমন্বিত ইংলণ্ডের শাসনাধীনে ভারত কতকটা ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া হইয়াছে এই সমস্যা "Drain of India" (ভারত শোষণ) এই বাক্যের উদ্ভাবকগণ যত সহজ বলিয়া মনে করেন তাহা তত সহজ নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় না থাকিলেও, এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আগে কাব্য তাহার পর কাব্যের লক্ষণ-নির্দ্দেশ, আগে সাহিত্য তাহার পর সাহিত্যের বিশ্লেষণ, আগে আদর্শ তাহার পর আদর্শের বিচার। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্য বহুশত বর্ষ ধরিয়া 'আদি কাব্য' হিসাবে এই আদর্শ-রচনার স্থান অধিকার করিয়াছিল; পরে বাল্মীকি ও তদনুবর্ত্তী কবিগণের রচনাসমূহের বহুকাল ব্যাপী অনুকৃতি ও আলোচনার ফল-স্বরূপ. বোধ হয়, ক্রমশঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। রামায়ণের সময় না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে কাব্যপদ্ধতির আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে কোনও না কোনও একটা ধারণা যে বর্ত্তমান ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আলঙ্কারিক গ্রন্থ; ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত এইরূপ সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডীর পূর্ব্বেও যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বেদাদি রচনার সময় অলঙ্কারশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল কি না সন্দেহ। দণ্ডী (১) হইতে সাহিত্যদর্পণকার (১) পর্য্যন্ত আলঙ্কারিকগণ

(১) কাব্যাদর্শ ১।৬, সাহিত্যদর্পণ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) পৃঃ ৪

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি" প্রভৃতি যে সকল প্রামাণিক বৈদিক-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। রসের ধারণা বহুকাল হইতে কোনও না কোনও আকারে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদের "বাক্‌ বৈ রসঃ" এই নির্দ্দেশ আলঙ্কারিক-সম্মত বাঙ্ময় রসের স্পষ্ট সূচনা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্ক 'উপমা'র যে লক্ষণ দিয়া গিয়াছেন (১) তাহা আলঙ্কারিক মস্মটের নির্দ্দেশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। পাণিনির সূত্রের (২) মধ্যেও 'উপমান' 'উপমেয়' ও 'সামান্যে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি অন্য দুইটি সূত্রে (৪) কৃশাশ্ব ও শিলালি এই দুইজন নটসূত্রকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কেশবমিশ্র তাঁহার 'অলঙ্কারশেখরে' শৌদ্ধোদনি (৪) নামক কাব্যসূত্রকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' অনেকের মতে (৫) প্রথমে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল; ইহার বর্ত্তমান ছন্দোবদ্ধ আকার পরবর্ত্তী কালের কৃতিত্ব। ভরত স্বয়ং, কোনও স্থলে দ্রুহিণাদির (৬) স্পষ্ট নামোচ্চারণ করিয়া, এবং কোনও স্থলে 'অন্যে' এই বেনামী নির্দ্দেশ দিয়া, (৭) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক আচার্য্যগণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে বৈদিক সময়ে না হইলেও অন্ততঃ সূত্ররচনার সময়ে, অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, অলঙ্কারশাস্ত্রও আলোচিত ও সূত্র-আকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যের যে বহুল চর্চ্চা ও বিকাশ দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বে অলঙ্কার-বিষয়ক মোটামুটি কোনও ধারণা যে একেবারেই ছিল না তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তসম্রাটদিগের আমলে তদনুগত কবিস্তাবকেরা শিলালিপিগাত্রে যে দীর্ঘচ্ছন্দ কাব্যবহুল প্রশস্তি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই সকল প্রশস্তি-রচয়িতাগণের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র অজ্ঞাত ছিল না। (৮) কালিদাসাদির কাব্য ছাড়িয়া দিলেও অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যরীতিতে লিখিত, সর্গবন্ধে গ্রথিত, এবং মহাকাব্য

(১) অথাত উপমা যদতৎ তৎসদৃশমিতি গার্গ্যস্তদাসাং কর্ম্ম জ্যায়সা বা গুণেন প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতম্‌ বা উপমিমীতে, অথাপি কনীয়সা জ্যায়াংসম্‌ (নিরুক্ত, ৩।১৩)।

(২) পাণিনিসূত্র, ২।১।৫৫; ২।১।৫৬

(৩) পাণিনিসূত্র, ৪।৩।১১০; ৪।৩।১১১

(৪) অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ), পৃঃ ২

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, p. 351 et seq.

(৬) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৬০ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। 'দ্রুহিণ' অর্থে ব্রহ্মাও হইতে পারে; কিন্তু রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসায়' (গায়কবাড় সংস্করণ) 'দ্রুহিণ' বা 'দ্রৌহিণি' নামক আলঙ্কারিকের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৪৮।

(৮) Buhler, Indian Inscriptions and the Kavya, in the *Indian Antiquary* 1913, p. 146, p. 243 etc.

সংজ্ঞায় অভিহিত। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র শ্লিষ্ট রচনা যে শুধু অলঙ্কার-বহুল তাহা নহে, উক্ত গ্রন্থে 'শৃঙ্খলাবন্ধ-রচনা' এবং 'শ্লেষ' 'উৎপ্রেক্ষা' 'আক্ষেপ' (১) প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারের স্পষ্ট উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে গ্রন্থকার, অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চ্চা না করিয়া, তাঁহার আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই। এমন কি তাঁহার গ্রন্থের শেষে সুবন্ধু সগর্ব্বে বলিয়াছেন যে তাঁহার রচনার প্রত্যেক অক্ষরে 'শ্লেষ'-প্রয়োগচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। (২) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিতে'র সময় অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার নাই; কারণ বাণভট্ট 'উপমা' 'দীপক' 'শ্লেষ' 'জাতি' (স্বভাবোক্তি) (৩) ভিন্ন 'অক্ষরচ্যুত' 'মাত্রাচ্যুত' 'বিন্দুমতী' ও 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি (৪) বিশিষ্ট অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আলঙ্কারিকনির্দ্দিষ্ট 'কথা' 'আখ্যানক' ও 'আখ্যায়িকার' ভেদ (৫) তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক হইতে ভামহ দণ্ডী প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার পর অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চ্চা ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে আর কোনও কথা থাকে না।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলা যায় না, তবে ইহার বর্ত্তমান ছন্দোবদ্ধ কারিকা-ন্যস্ত আকারও যে ষষ্ঠ শতাব্দের বহু পূর্ব্বের রচনা তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ভরতের গ্রন্থে প্রধানতঃ নাট্য, অভিনয়, নৃত্যকলা, ও সঙ্গীতশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা থাকিলেও, কতকগুলি অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ নাট্যে সঙ্গীতে এবং কাব্যে প্রযোজ্য অলঙ্কারাদির বিবৃতি আছে (৬)। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কাব্যের দৃশ্যত্ব এ শ্রব্যত্বভেদ (৭) না করিলেও পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ নাটককে কাব্যের ভেদবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভরতের মত সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত কাব্যের সাধারণ লক্ষণাদি সম্বন্ধে

(১) বাসবদত্তা (শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ) 'শৃঙ্খলাবন্ধো বর্ণগ্রথনাসু, উৎপ্রেক্ষাক্ষেপৌ কাব্যালঙ্কারেষু (পৃঃ ১৪৬)। 'ততো দীর্ঘোচ্ছ্বাসরচনাকুলং সুশ্লেষবজ্রঘটনাপটু সৎকাব্যবিরচনমিব' (পৃঃ ২৩৮)। সৎকবি-কাব্যরচনামিব অলঙ্কারপ্রসাধিতাম্‌ (পৃঃ ৩০৩)। 'সৎকবিকাব্যবন্ধ ইবানববন্ধ-তু-হি-নিপাতঃ (পৃঃ ১৫৮)।

(২) প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রপঞ্চবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধম্‌।
সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ॥ (পৃঃ ৩৫৭-৮)।

(৩) কাদম্বরী (Ed. Peterson, পৃঃ ২)—'হরন্তি কং নোজ্জ্বলদীপকোপমৈর্নবৈঃ পদার্থৈরুপমাদিতাঃ কথাঃ। নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ো মহাস্রজশ্চম্পককুট্মলৈরিব॥'

(৪) 'কদাচিদক্ষরচ্যুতকমাত্রাচ্যুতকবিন্দুমতীগূঢ়চতুর্থপাদপ্রহেলিকাপ্রদানাদিভিঃ' (পৃঃ ৭, পংক্তি ২২-৩)।

(৫) হর্ষচরিত (Introd. verses), 'উচ্ছ্বাসান্তেঽপ্যথিন্নান্তে যেষাং বক্ত্রে সরস্বতী। কথমাখ্যায়িকা-কারা নতেষন্দ্যাঃ কবীশ্বরাঃ।' কাদম্বরী (পৃঃ ৭), 'কাব্যনাটকাখ্যানকাখ্যায়িকা' ইত্যাদি।

(৬) ৬ষ্ঠ অধ্যায় (রসাধ্যায়); ৭ম অধ্যায় (ভাবব্যঞ্জনাধ্যায়); ১৬শ অধ্যায় (অলঙ্কারলক্ষণাধ্যায়) ইত্যাদি।

(৭) দণ্ডী নাটককে গদ্যপদ্যের মিশ্রকাব্য ধরিয়াছেন (১।৩১); কিন্তু 'তেষামন্যত্র বিস্তরঃ' বলিয়া এক কথায় শেষ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বামন নাটককে সর্ব্বপ্রধান রচনা বলিয়াছেন—'সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ' (৩।১।৩০)।

বিশেষ কিছু বলেন নাই, সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার মতাদির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে ভাব ও অলঙ্কারাদির কথাই বেশী বলিয়াছেন; তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাটকের উপজীব্য রস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পরে দেখিব যে আনন্দবর্দ্ধনাদি কাব্যগত রসের ধারণা মুখ্যতঃ ভরত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা পরে আলোচ্য। কিন্তু ভরতের কাব্যবিষয়ক ধারণা সম্পূর্ণ নাট্যাত্মক (dramatic)। এ কথা নাট্যশাস্ত্র ১৬।১১৮ ও অন্যান্য স্থল হইতে জানা যায়, এবং অভিনবগুপ্ত ইহা বেশ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপাত্মকমেব'; কিন্তু এই নাট্যের মূলবস্তু রস। গুণ দোষ অলঙ্কার সমস্তই এই রসাভিব্যক্তির অধীন (১।১০৪)। সেইজন্য ভরত প্রথমেই বলিয়াছেন (৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬২) 'তত্র রসানেব তাবদাদাবভিব্যাখ্যস্যামঃ। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে ইতি।' অভিনবগুপ্ত আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—'নাট্যাৎ সমুদায়রূপাদ্ রসাঃ। যদি বা নাট্যমেব রসাঃ রসসমুদায়ঃ। নাট্য এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ কাব্যার্থঃ'। ভরতের মতে, গুণ দোষ অলঙ্কারাদি 'বাচিক অভিনয়' বা 'অনুভাবের' অঙ্গস্বরূপ এবং এই অনুভাব বা বাচিক অভিনয়ের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। (ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬২; ৭।৫; ৮।৬; ৮।৯১)। বাচিক অভিনয়ের কথা ভরত চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন; অলঙ্কারাদি ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রসঙ্গতঃ অলঙ্কারাদিকে তিনি বাচিক অভিনয়ের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

ভরতের পরে এবং দণ্ডী বা ভামহের পূর্ব্বে আরও কয়েকটি আলঙ্কারিকের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। দণ্ডী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ব্বাচার্য্যগণকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রযোগানুপলভ্য চ। যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥" (১।২)। ইহার ব্যাখ্যায় কাব্যাদর্শের কোনও অজ্ঞাতনামা টীকাকার (১) দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্যপ ও বররুচির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভামহের গ্রন্থে (২) মেধাবীর নামও পাওয়া যায়। 'বাসবদত্তা'য় 'বুদ্ধসঙ্গতি'-রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক (৩) কোনও আলঙ্কারিকের নাম দৃষ্ট হয়; কিন্তু বৌদ্ধ

(১) রঙ্গাচার্য্যসম্পাদিত কাব্যাদর্শে হৃদয়ঙ্গমাখ্য টীকা, পৃঃ ৩—'পূর্ব্বেষাং কাশ্যপবররুচিপ্রভৃতীনামাচার্য্যাণাং লক্ষণশাস্ত্রাণি সংহৃত্য' ইত্যাদি।

(২) কমলাশঙ্কর ত্রিবেদীসম্পাদিত প্রতাপরুদ্রীয়ের পরিশিষ্টে মুদ্রিত ভামহের কাব্যালঙ্কার, পৃঃ ২১৭ ও ২২১। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারটীকায় নমিসাধুও (১।১; ১১২৪; ১২।১৪৫) এই মেধাবী বা মেধাবিরুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মেধাবী যে জন্মান্ধ ছিলেন তাহা রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' (পৃঃ ১২) হইতে জানা যায়।

(৩) কন্দর্পকেতুর মুখে বাসবদত্তার বর্ণনাবসরে 'বৌদ্ধসঙ্গতিমিব অলঙ্কারভূষিতাম্' এই পাঠ কলিকাতায় মুদ্রিত সংস্করণে দৃষ্ট হয়। এবং ইহার শিবরামকৃত টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়—'অলঙ্কারো নাম ধর্ম্মকীর্ত্তিকৃতো গ্রন্থবিশেষঃ'। কিন্তু শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণে এই পাঠ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'সৎকাব্যরচনামিব

ধর্ম্মকীর্ত্তি কোন সময়ের লোক তাহা ঠিক জানা যায় না। রাজশেখর (১০ম শতক) তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা'র প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক ও তদধিকৃত বিষয়ের তালিকা দিয়াছেন। 'তত্র কবিরহস্যং সহস্রাক্ষঃ সমাম্নাসীৎ, ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ, রীতিনির্ণয়ং সুবর্ণনাভঃ, আনুপ্রাসিকং প্রচেতায়নঃ, যমকানি চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ, শব্দশ্লেষং শেষঃ, বাস্তবং পুলস্ত্যঃ, ঔপম্যমৌপকায়নঃ, অতিশয়ং পারাশরঃ, অর্থশ্লেষমুতথ্যঃ, উভয়ালঙ্কারিকং কুবেরঃ, বৈনোদিকং কামদেবঃ, রূপকনিরূপণীয়ং ভরতঃ, রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ, দোষাধিকরণং ধিষণঃ, গুণোপাদানিকমুপমন্যুঃ, ঔপনিষদিকং কুচভারঃ ইতি'। (পৃঃ ১) ইহা ভিন্ন তিনি সুরানন্দ, শ্যামদেব, আপরাজিতি, কালিদাস, অবন্তীসুন্দরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবন্তীসুন্দরী রাজশেখরের পত্নী ছিলেন, তাহা 'কর্পূরমঞ্জরী'র প্রস্তাবনা হইতে জানা যায়। 'অগ্নিপুরাণে' কাব্যলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় আছে, কিন্তু তাহা পরবর্ত্তী কালের রচনা হইলেও, তাহাতে ধ্বনিকারের মতের কোনও উল্লেখ নাই এবং স্থানে স্থানে দণ্ডীর বাক্য যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার রচনাকাল বোধ হয় 'কাব্যাদর্শ' ও 'ধ্বন্যালোকের' (৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শতকের) মধ্যবর্ত্তী।

এ পর্য্যন্ত অলঙ্কার সম্বন্ধে যে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' (১) ছাড়িয়া দিলে, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। কাব্যের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দণ্ডীর গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়।

দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কুত্রাপি স্পষ্ট করিয়া কাব্যের (Poetry) লক্ষণনির্দ্দেশ করেন নাই, তবে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কাব্য-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। 'কাব্যাদর্শ' এই গর্ব্বিত নামে অভিহিত হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ প্রধানতঃ কাব্য-গত গুণ, দোষ, রীতি, ও অলঙ্কারের আলোচনাতেই পর্য্যবসিত। অলঙ্কার শব্দ কাব্যলক্ষণাদি-শাস্ত্রে (Poetics) সাধারণতঃ দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিস্তৃত অর্থে, কাব্যে যাহা কিছু সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক ও চিত্তাকর্ষক তাহাই অলঙ্কার। "সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ" বামনের এই সূত্রে (২) এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ করণব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন

অলঙ্কারপ্রসাধিতাম্' এইরূপ আছে। এই ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি কি না তাহা অনুসন্ধেয়। তাহা যদি হয় তবে ইহার আবির্ভাবকাল ৭ম শতকের মধ্যভাগ। ধ্বন্যালোকেও (পৃঃ ২১৬-৭) ইহার উল্লেখ আছে।

(১) ভামহ ও দণ্ডীর পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, কিন্তু ভামহ আগে কি দণ্ডী আগে সে বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সমূহ দ্রষ্টব্য—J, R. A. S. 1905, p 535 sq; K. P. Trivedi. Introd. to *Prataparudriya*, p xxviii, sq; J. R. A. S. Bomb. xxiii; Rangacharya, Introd. to *Kavyadarsa*; *Indian Antiquary* 1912, p 90 sq and p. 232 sq; *Indian Antiquary* 1913, p. 258 sq; Jacobi, ZDMG. vol. 64, p. 134.

(২) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ১।১।২

অর্থে, অলঙ্কার উপমারূপকাদিস্বরূপ শব্দার্থের শোভাতিশায়ি ধর্ম্ম বা প্রয়োগ বুঝায় (১); ইংরাজিতে যাহাকে figure of speech বলে। দণ্ডী ভামহ উদ্ভট রুদ্রট (২) প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ এই সঙ্কীর্ণঅর্থজ্ঞাপক, অলঙ্কারকেই যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও দণ্ডী অলঙ্কারকে "কাব্যশোভাকর ধর্ম্ম" (৩) মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কাব্যাদর্শের বেশীর ভাগ ইহারই আলোচনায় প্রযুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের 'আত্মা' কি সে বিষয়ে দণ্ডী কোনও বিচার করেন নাই, এবং পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যে তিনটি ভাগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল! অন্য এক স্থলে দণ্ডী অলঙ্কার অর্থে শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা-মাধুর্য্যাদি কাব্যের 'গুণ' (qualities of style) বুঝিয়াছেন (৪); এবং কাব্যরীতির যে দশটি গুণের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একস্থলে 'সমাধি' (harmony) গুণকে এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয় যে তিনি ইহাকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব (৫) মনে করেন। তাঁহার নিকট কাব্যের 'ব্যঙ্গ্য অর্থ' (suggested sense) যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ 'সমাসোক্তি', 'ব্যাজস্তুতি' 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' প্রভৃতি অলঙ্কারের লক্ষণে ব্যঙ্গ্যার্থের অল্পবিস্তর ধারণা অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি (suggestion) অর্থে যাহা বুঝেন তাহা দণ্ডী (৬) (এবং ভামহ ও উদ্ভটও) 'পর্য্যায়োক্তে'র মধ্যে অন্তর্ভূত করেন (৭)। তথাপি আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য অর্থ' কে যেরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা এই সকল গ্রন্থে দেখা যায় না। রস সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট না হইলেও, এ বিষয়ে দণ্ডী যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা বলা যায় না। মাধুর্য্য গুণের বিশ্লেষণে তিনি 'বাচি বস্তুন্যপি

(১) উক্ত সূত্রের বৃত্তিতে বামন বলিয়াছেন—'করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলঙ্কারশব্দোঽয়ং উপমাদিষু বর্ত্ততে।'

(২) ভরত অলঙ্কারকে ভূষণ হিসাবেই ধরিয়াছেন এবং রসব্যক্তিই কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য এ কথা বহুস্থলে বলিয়াছেন। অলঙ্কার ও গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অলঙ্কারৈ র্গুণৈশ্চৈব বহুভিঃ সমলঙ্কৃতম্। ভূষণৈরিব বিন্যস্তৈস্তদ্‌ভূষণমিতি স্মৃতম্॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৬।৪)। 'প্রয়োগমেষাং চ পুনর্বক্ষ্যামি রসসংশ্রয়ম্॥' (১৬।১০৪)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।১

(৪) কিন্তু দণ্ডী 'গুণ'কে মুখ্য অলঙ্কার এবং উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারকে 'গৌণ' অলঙ্কার হিসাবে ধরিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়।

(৫) 'তদেতৎ কাব্যসর্ব্বস্বং সমাধির্নাম যো গুণঃ। কবিসার্থঃ সমগ্রোঽপি তদেনমনুগচ্ছতি' (কাব্যাদর্শ, ১।১০০)

(৬) কাব্যাদর্শ ২।২৯৫

(৭) এ সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধন বলেন—'পর্য্যায়োক্তেঽপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বং তদ্ভবতু নাম ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। নতু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ। তস্য মহাবিষয়ত্বাঙ্গিত্বেন চ প্রতিপিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গ্যস্যৈব প্রাধান্যম্। বাচ্যস্য তত্রোপসর্জ্জনীভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ। (ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৩৯)।

রসস্থিতিঃ' (১) এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি আর এক স্থলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অলঙ্কার অর্থকে রসাভিষিক্ত করে (২)। প্রেয়স্ ও রসবদ্ এই দুই বিশিষ্ট অলঙ্কারের লক্ষণেও (৩) তিনি রসের স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। ভট্টলোল্লট প্রভৃতির ন্যায় দণ্ডীও রসসম্বন্ধে 'উৎপত্তিবাদী'। কিন্তু দণ্ডী ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ আনন্দবর্দ্ধনাদির ন্যায় রসকে প্রাধান্য দেন নাই এবং দর্পণকারের ন্যায় 'কাব্যের আত্মা' বলিয়া সর্ব্বাগ্রে অভিহিত করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন নাই।

ইহা হইতে বোঝা যাইবে কাব্য সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা অত্যন্ত আদিম, সঙ্কীর্ণ, এবং পরবর্ত্তী জটিলতার দ্বারা অনাক্রান্ত। দণ্ডী একস্থলে কাব্যের 'শরীর' এবং (এই শরীরের) 'অলঙ্কারে'র উল্লেখ করিয়াছেন; (৪) কিন্তু এই শরীরের অন্তর্ভূত শক্তি-স্বরূপ 'আত্মা'র (soul of poetry) কথা কোথাও বলেন নাই। বোধ হয় তাঁহার ধারণা এই কাব্যের 'শরীর' অতিক্রম করিয়া বেশী দূর যায় নাই। 'কাব্য-শরীর' কি তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"। কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সমগ্র ধারণা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গুণদোষ ও অলঙ্কার ভিন্ন তিনি রীতির (style) উপরেও অনেকখানি জোর দিয়াছেন। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্যে অর্থ ও ভাবাদি উপযুক্ত ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত হওয়া উচিত এ কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে বামনাচার্য্য 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (৫) বলিয়া রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন, দণ্ডী ততদূর যান নাই। তথাপি ভামহ যেরূপ রীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন (৬) দণ্ডী তাহা করেন নাই। বরং ইহাকে কাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বা উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন। দণ্ডী বৈদর্ভী

(১) কাব্যাদর্শ, ১।৫১।

(২) 'কামং সর্ব্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি' (কাব্যাদর্শ, ১।৬২)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।২৭৫। তথা ২।২৮১—৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) কাব্যাদর্শ, ১।১০। কাব্যাদর্শের পূর্ব্বোক্ত টীকাকার 'শরীর' অর্থে "কাব্যানাং স্বরূপম্" এইরূপ ধরিয়াছেন। কিন্তু তরুণবাচস্পতি [Rangacharya Edition পৃঃ ৮] এবং প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ [Bibliotheca Indica Ed. পৃঃ ১০] সাধারণ অর্থেই লইয়াছেন। প্রেমচন্দ্র টীকা করিয়াছেন "কাব্যানাং শরীরঞ্চ আত্মভূতস্য রসাদিব্যঙ্গ্যস্য দেহভূতাশ্রয়শ্চ।" অবশ্য এস্থলে 'আত্মভূতস্য রসাদিব্যঙ্গ্যস্য' কথাটা দণ্ডীর নহে, তাঁহার নিজের, ধ্বন্যালোকাদি হইতে দণ্ডীর উপর আরোপিত করা হইয়াছে। 'রসগঙ্গাধরে' জগন্নাথ বলিয়াছেন—'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'। (পৃঃ ৪)

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ১।২।৬

(৬) 'বৈদর্ভমন্যদস্তীতি মন্যন্তে সুধিয়োঽপরে। তদেব চ কিল জ্যায়ঃ সদর্থমপি নাপরম্॥ গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্। গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়মমেধসাম্॥ ইত্যাদি (ভামহ, কাব্যালঙ্কার ১।৩১-৩২)

ও গৌড়ী এই দুই রীতিভেদ করিয়াছেন এবং মোটামুটি ধরিলে ইহারা অনাড়ম্বর রীতি (plain style) এবং প্রাজ্ঞরীতি (learned style) বুঝায়। এই দুই রীতির সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া দণ্ডী দেখাইয়াছেন যে বৈদর্ভীই শ্রেষ্ঠ রীতি (১।৪১-১০০)। এই দুই প্রকার সীমান্তগত রীতির মধ্যস্থলে যে নানা প্রকার মিশ্র বা অন্তর্বর্ত্তী রীতি থাকিতে পারে তাহা দণ্ডীর অজ্ঞাত ছিল না (১।৪০ ; ১।১০১) কিন্তু কাব্যের রীতি যে সর্ব্বত্র ভাব বা অর্থের অনুযায়ী হওয়া উচিত এ কথার আলোচনা দণ্ডী কোথাও বিশেষভাবে করেন নাই। দণ্ডীর পূর্ব্বে ভরত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কাব্যের বা নাটকের রীতি যে কেবল উপযুক্ত শব্দের দ্বারা অর্থের অনুসরণ করিবে তাহা নহে, পরন্তু কবি যাহার মুখে ইহা বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহারও স্বভাব বা প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। রীতি যে ব্যক্তিগত (individual) হইতে পারে তাহার উল্লেখ দণ্ডীতে নাই। যাহা হউক, বামনের কথা ছাড়িয়া দিলে, কাব্যাদর্শ ভিন্ন অন্য কোথাও রীতি (বা style) কে এত প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। দণ্ডী মাধুর্য্য-প্রসাদাদি যে দশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন (১) তাহাও শুধু রীতির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। দণ্ডীর পরবর্ত্তী বামন এই দশগুণের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে ইহা কেবল রীতির গুণ নহে, কাব্যের সমগ্র অর্থের মধ্যেও উপলব্ধি হয়।

রীতির প্রসঙ্গে দণ্ডী বলিয়াছেন যে 'কান্তি' (heightened speech) বৈদর্ভী রীতির বিশিষ্ট গুণ ; গৌড়ী রীতির বিশিষ্ট গুণ 'অত্যুক্তি' (exaggeration) [১।৮৫-৯২]। দণ্ডী যে কান্তিগুণের কথা বলিয়াছেন তাহা ভামহের 'বক্রোক্তি' ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচন'টীকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় (পৃঃ ২০৭-৮)। সুতরাং দণ্ডী যাহাকে গুণমাত্র বলিয়া ধরেন ভামহ তাহাকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন।

অন্যত্র দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ (২) করিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অনেকটা পাওয়া যায়। অন্যান্য বিশিষ্টতার মধ্যে তাঁহার মতে মহাকাব্য 'সদলঙ্কারযুক্ত' এবং 'রসভাব নিরন্তর' হওয়া আবশ্যক।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে দণ্ডীর মতে তন্নামযোগ্য প্রত্যেক কাব্যে অন্ততঃ চারিটি জিনিস থাকা উচিত—কাব্যের সম্পত্তিস্বরূপ মাধুর্য্যাদিগুণযুক্ত রীতিতে রচনা, কাব্যের বিপত্তিস্বরূপ দোষের বিসর্জ্জন, কাব্য-শোভাকর অলঙ্কারের সদ্ভাব, এবং বোধ হয় আনন্দবর্দ্ধক রসের সমাবেশ। এই চারিটি কাব্য-ধর্ম্মের সমবায় তিনি 'সৌভাগ্য' (৩) নামে অভিহিত করিয়াছেন

(১) ভরতও এই দশগুণের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ১৬।৯২) কিন্তু রীতির প্রসঙ্গে নহে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই 'গুণ' গুলি কাব্যের গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন।

(২) কাব্যাদর্শ, ১।১৪-১৯

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।৫৪ ; (Bibl-Indica) ৩।১৫১ বা (Rangacharya Edithin) ৪।২৮

এবং এই সৌভাগ্যের ফলস্বরূপ সমগ্র কাব্যে 'মাধুর্য্য' (১) নামক আস্বাদের উৎপত্তি হয় ; অবশ্য এই মাধুর্য্য ও রীতির গুণস্বরূপ মাধুর্য্য (২) এক জিনিস নহে।

দণ্ডী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ভামহ ও উদ্ভটেও অল্প বিস্তর প্রযোজ্য। ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' শ্রীযুক্ত কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী তৎসম্পাদিত প্রতাপরুদ্রীয়ের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়াছেন। (৩) প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যলক্ষণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও, প্রধানতঃ গুণ, দোষ, ও অলঙ্কারের বিচারেই ভামহের সমগ্র গ্রন্থ নিয়োজিত হইয়াছে। শব্দার্থই কাব্য এবং রূপকাদি প্রসাধনস্বরূপ, (৪) কারণ "ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্"। (৫) কিন্তু ইহা শুধু কাব্যশরীরের কথা। তৎপরে ১৬০ সংখ্যক শ্লোকে অলঙ্কার বা figures of speech এর বিবৃতি। তদনন্তর দোষের বিচার। শেষ দুই অধ্যায়ে ন্যায়নির্ণয় (logic of poetry) এবং শব্দশুদ্ধি (grammatical purity) সম্বন্ধে আলোচনা। দণ্ডীর ন্যায় ভামহও অলঙ্কারকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন।

ভামহের মতে, কোনও প্রবন্ধের চিত্তাকর্ষক বিশিষ্ট গুণের নাম 'ভাবিক' বা 'ভাবিকত্ব' (৩।৫২) ; এই ভাবিকের কথা দণ্ডীও (২।৩৬৩) বলিয়াছেন। কিন্তু ভামহ বলেন যে রচনার এই ভাবিকত্ব 'বক্রোক্তি' ভিন্ন পরিস্ফুট হয় না ; কারণ বক্রোক্তিই সমস্ত গুণ বা অলঙ্কারের মূলস্বরূপ, এবং বক্রোক্তি ভিন্ন কোনও অর্থ প্রতীয়মান হয় না—

সৈষা সর্ব্বত্র বক্রোক্তিরনয়াঽর্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা ॥ (২।৮৫)

ভামহ কবিগণ 'বক্রবাক্' বলিয়াছেন (৬।২৩) এবং অন্যত্র (২।৮১) 'অতিশয়োক্তি' দ্বারা বাক্যের যে লোকাতিক্রান্তগোচরতা বুঝাইয়াছেন তাহা অলৌকিক 'বক্রতা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অভিনবগুপ্ত ('ধ্বন্যালোকলোচন', পৃঃ ২০৮) এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'। কবিপ্রতিভাহীন ব্যক্তি সাধারণতঃ যে বাক্য ব্যবহার করে তাহার মধ্যে হৃদ্যতা, বৈচিত্র্য, বা বক্রতা নাই, তাহা 'স্বভাবোক্তি' (natural speech) ; কিন্তু কবির উক্তি ইহা হইতে ভিন্ন। তাহাতে শব্দের ও অর্থের বৈচিত্র্য আছে, তাহা বক্রোক্তি (imaginative speech)। সেইজন্য ভামহ বলেন যে—

'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ'। (২।৩৬) এবং বক্রোক্তি-শূন্য বলিয়া তিনি হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারকে অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য করেন না। (২।৮৬)

(১) কাব্যাদর্শ, ১।১০২

(২) কাব্যাদর্শ, ১।৫১

(৩) প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ (Bombay Sans. series) App. viii pp. 209-231

(৪) ভামহালঙ্কার, ১।৯ হইতে ২৩ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১০-১১। ভামহ গুণ ও অলঙ্কারের পার্থক্য করেন নাই। ভাবিকত্বকে তিনি গুণও বলিয়াছেন, অলঙ্কারও বলিয়াছেন।

(৫) ঐ ১।১৩ ; এই শ্লোকাংশ কাব্যপ্রকাশে (৭।১) উদ্ধৃত হইয়াছে।

রসভাব প্রভৃতির ধারণা অজ্ঞাত না থাকিলেও, তাহাদিগকে ভামহ বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। তিনি উল্লিখিত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বক্রোক্তিদ্বারা সমস্ত অর্থ 'বিভাবিত' হয়। 'বিভাব্যতে' অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেন (ধ্বন্যালোকলোচন, পৃঃ ২০৮)—'বিভাবতাং নীয়তে বিশেষেণ চ ভাব্যতে রসময়ীক্রিয়ত ইতি'। এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে ভামহের 'বিভাব্যতে' শব্দটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক এবং ইহার দ্বারা ভামহ বুঝাইতে চান যে বক্রোক্তি হইতে অলঙ্কার (বা গুণ) ও রস এই দুয়ের উৎপত্তি। রসবদ্ অলঙ্কারের মধ্যেও ভামহ বলিয়াছেন —'রসবদ্দর্শিতস্পষ্ট-শৃঙ্গারাদি রসম্' (৩।৬)। কিন্তু তাঁহার মতে কাব্যে নিরন্তর রস-স্থিতির প্রয়োজন নাই; বক্রোক্তির প্রয়োজন আছে (১।৩০)।

বক্রোক্তির যে আধুনিক সংকীর্ণ অর্থ 'সাহিত্যদর্পণ'কার (১০।৯) দিয়াছেন তাহা রুদ্রটে প্রথম দেখা যায় (২।১৪-১৭)। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তক ভামহের বক্রোক্তিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিলেও, (১) পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তিকে ভামহের অর্থে ব্যবহার করেন নাই, সামান্য অলঙ্কারপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভামহের 'বক্রোক্তি' একেবারে লুপ্ত হয় নাই 'কাব্যপ্রকাশে' ও 'সাহিত্য দর্পণে' কবি 'প্রৌঢ়োক্তি' এই নূতন নামে আত্মগোপন করিয়া পুনরায় দেখা দিয়াছে।

উদ্ভটের 'অলঙ্কার-সংগ্রহে' (২) ছয়টি অধ্যায়ভুক্ত ১৭৫ শ্লোকে কেবলমাত্র ৪১টি অলঙ্কারের লক্ষণনির্দ্দেশ আছে। কাব্য-লক্ষণসম্বন্ধে কোনও কথা নাই। ভট্ট উদ্ভট বোধ হয় অলঙ্কারকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। প্রতিহারেন্দুরাজ তাঁহার বিস্তৃত টীকায় অনেক নূতন কথা আনিয়াছেন এবং উদ্ভটের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাহা কতটা তাঁহার নিজের এবং কতটা উদ্ভটের তাহা বলা কঠিন। (৩) প্রতিহারেন্দু-রাজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া

(১) রুয্যক, অলঙ্কারসর্ব্বস্ব পৃঃ ৮ (ও জয়রথটীকা)। মহিমভট্ট, ব্যক্তিবিবেক, পৃঃ ২৮, ৩৭, ৫৮, ৬৪, ও ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬, ৩৬, ৩৭, ৪৩-৪৪

(২) উদ্ভটের গ্রন্থ প্রথম J. R. A. S. vol. xxix. N. S. 1897, p. 829-853তে মুদ্রিত হইয়াছিল। নির্ণয়সাগর যন্ত্রে প্রতিহারেন্দুরাজের টীকার সহিত ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ শ্রীগোপেন্দ্র ত্রিপুরহর গোপাল রচিত বামনের টীকায় (Benares Sans. Series Ed. p, 5) এবং রুয্যকের অলঙ্কার সর্ব্বস্বে (Trivandrum Ed. p. 7) উদ্ভটের যে শ্লোকাংশ পাওয়া যায় মুদ্রিত পুস্তকে তাহা নাই। উদ্ভট ভামহের উপর ভামহবিবরণ নামক একটি অধুনালুপ্ত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা যে কেবল প্রতিহারেন্দু রাজ (পৃঃ ১৩) বলিয়াছেন তাহা নহে, অভিনবগুপ্তের ধ্বন্যালোক-লোচনেও (পৃঃ ১০) এ কথা আছে।

(৩) বুহলার (Buhler) (Kashmir Rep. J. R. A. S. Bomb. 1877) উদ্ভটকে কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়ের সমকালীন বলিয়াছেন (৭৭৯-৮১৩ খ্রীঃ অঃ)। প্রতিহারেন্দুরাজ অনেক পরবর্ত্তী। পিশেলের (Pischel) মতে ইহার আবির্ভাবকাল ১০ম শতাব্দের মধ্যভাগ।

য্যাকোবি (ধ্বন্যালোক-অনুবাদ, উপক্রমণিকা পৃঃ ৫ এবং পৃঃ ১৭) বলেন যে উদ্ভট রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন। অবশ্য উদ্ভট রসসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু য্যাকোবি যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা উদ্ভটের নহে, প্রতিহারেন্দুরাজ 'তদাহুঃ' বলিয়া কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ('কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ' পৃঃ ৭৭)

রুদ্রট তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারে' যে ভামহাদির উপর বেশী উন্নতি করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের প্রশংসা ও কাব্যের প্রয়োজনসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা খুব কমই আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যলক্ষণের বিচার করিবেন বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত কাব্য-লক্ষণ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আছে। প্রথম শ্লোকে "নমু শব্দার্থৌ কাব্যম্" এই পৃষ্ঠপ্রতিবচনে শব্দার্থই কাব্যের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া প্রধানতঃ শব্দ এবং অর্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পর বক্রোক্তি ও অনুপ্রাসের কথায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে যমক-লক্ষণ, চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লেষের ব্যাখ্যা, পঞ্চম অধ্যায়ে চিত্র নামক শব্দালঙ্কারের বিবৃতি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শব্দালঙ্কারের দোষ-নিরূপণ। সপ্তম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত অলঙ্কারাদির নির্ণয়, একাদশ অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের দোষবিচার, এবং পরিশেষে চারিটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে নায়কনায়িকাদির বিবরণে গ্রন্থের সমাপ্তি। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রধানতঃ শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের প্রতিপাদনই রুদ্রটের অলঙ্কারগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। "জলদুজ্জলবাক্প্রসরঃ সরসং কুর্ব্বন্ মহাকবিঃ কাব্যম্" (১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্বেতাম্বর নমি-সাধু 'সরস' অর্থে শৃঙ্গারাদি রসের সূচনা ধরিয়াছেন। (২) কিন্তু এক নায়কনায়িকা প্রকরণে (৩) ৪টি শ্লোক ভিন্ন রুদ্রট অন্য কোথাও রসের অবতারণা করেন নাই। রস সম্বন্ধে রুদ্রটের ধারণা নমিসাধু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'উচ্যতে, কাব্যস্য হি শব্দার্থৌ শরীরম্। তস্য চ বক্রোক্তিবাস্তবাদয়ঃ কটক-কুণ্ডলাদয় ইব কৃত্রিমা অলঙ্কারাঃ। রসাস্তু সৌন্দর্য্যাদয় ইব সহজাঃ গুণাঃ।' (৪) সুতরাং রস তাঁহার মতে কাব্যশরীরের সৌন্দর্য্যাদির মত সহজ গুণ এবং নায়কনায়িকা-প্রসঙ্গেই ইহার অভিব্যক্তি। রুদ্রট ভরতকে (৫) অনুসরণ করিয়া শৃঙ্গারাদি দশটি রসের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে (৬)—

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্য্যৈঃ।
নির্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামস্তীতি তেঽপি রসাঃ॥

(১) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ১।৪ (২) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৩
(৩) দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক ১-৪ ইত্যাদি (৪) ১২।১ শ্লোকের উপর টীকা, পৃঃ ১৫০
(৫) ভরত নাট্যশাস্ত্রে ৮টি রসের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫)। রুদ্রট শান্ত ও প্রেয়ান্ এই দুটি অধিক রসের কথা বলিয়াছেন।
(৬) ভরত, নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য। Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanyaloka p. 3 et seq.

রুদ্রট 'রীতি' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা দণ্ডীর মতানুযায়ী নহে। রুদ্রট বৈদর্ভী রীতির কোনও উল্লেখ করেন নাই; পাঞ্চালী লাটী (দাক্ষিণাত্য) ও গৌড়ী এই তিন রীতিভেদ করিয়াছেন। এই ভেদ সম্বন্ধেও দণ্ডীর সহিত মতপার্থক্য আছে। রুদ্রটের মতে বাক্যগত লঘু মধ্য আয়ত সমাসবিরচনা লইয়াই এই ত্রিবিধ ভেদ। (১)

রুদ্রট 'ভাব' এই অলঙ্কারের (২) যে লক্ষণ এবং উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের (suggested sense) সূচনা আছে কিন্তু ব্যঙ্গার্থের স্পষ্ট ধারণা কোথাও নাই। রুদ্রট যদি আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী হন তবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। (৩)

তাহার পর বামন। (৪) বামনের গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত এবং ইহার বৃত্তিও তাঁহার স্বকৃত। বামনের মতে "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" এবং "বিশিষ্টপদরচনা রীতিঃ"। (৫) এই বিশিষ্ট পদরচনা কি তাহার উত্তরে বামন বলিয়াছেন "বিশেষো গুণাত্মা" অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি-গুণাত্মকরচনাই বিশিষ্টরচনা। এবং এইরূপ গুণবিশিষ্ট-রচনা-মূলক রীতিই কাব্যের আত্মাস্বরূপ। বামনের মতে রীতি ত্রিবিধ—(৬) বৈদর্ভী, গৌড়ী, ও পাঞ্চালী। এ বিষয়ে বামন রুদ্রটের মত অনুসরণ করেন নাই; বরং বৈদর্ভী সম্বন্ধে দণ্ডী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বামনের সহিত বিশেষ মত ভেদ নাই। যে রীতিতে মাধুর্য্যাদি দশটি গুণই দেখা যায় তাহাকে দণ্ডী ও বামন উভয়ই গ্রাহ্য ও উপাদেয় বৈদর্ভী রীতি বলেন। কিন্তু শ্লিষ্ট শিথিল অল্প-প্রাণাক্ষরবহুল গৌড়ীরীতিকে দণ্ডী বৈদর্ভীর বিপরীত রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বামনের মতে কতকগুলি বিশিষ্টগুণের সদ্ভাব লইয়াই গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির ভেদ; অর্থাৎ শুধু ওজঃ ও কান্তিগুণ থাকিলেই গৌড়ী এবং মাধুর্য্যও সৌকুমার্য্যগুণ থাকিলেই পাঞ্চালী রীতি।

(১) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার, ২।৪-৬

(২) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ৭।৩৮-৪১

(৩) রুদ্রটের আবির্ভাবকাল ১০ম শতকের মধ্যভাগ এইরূপ Peterson নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Report J. R. A. S. Bomb 1883 Extra no. p. 17); কিন্তু Pischel প্রভৃতি রুদ্রট ও শৃঙ্গারতিলক-ভাণ রচয়িতা রুদ্রভট্ট একই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ৯ম শতাব্দের মধ্যভাগ এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন (Indrod. to Pischel's Sringartilaka)। তাহা যদি হয় তবে রুদ্রট আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

(৪) বামনের আবির্ভাবকাল কেহ ৮ম (Pathak in J. R. A. S. Bomb. 1892) কেহ ৯ম (Ganganath Jha, Preface to his Trans. of Vamana), কেহ বা ১০ম শতকের মধ্যভাগ (Buhler, Kashmir Report P. 65) ধরিয়াছেন। ধ্বন্যালোকে বামনের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে সুতরাং বামন আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ১।২।৬-৮

(৬) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র ১।২।৯-১৪

কিন্তু 'রীতি' কাব্যের আত্মা হইলেও, শব্দ ও অর্থের সমবায়ই কাব্য, (১) এবং সকল কাব্য গুণ ও অলঙ্কারের জন্য উপাদেয় হয়। (২) গুণ ও অলঙ্কার কি তৎসম্বন্ধে বামন বলিয়াছেন—'কাব্যশোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্ম্মাঃ গুণাঃ' এবং 'তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ' (৩) অর্থাৎ গুণ কাব্যশোভার উৎপাদক এবং অলঙ্কার তাহার বর্দ্ধক। এস্থলে অবশ্য অলঙ্কার শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে লওয়া হইয়াছে এবং কেবল figure of speech বুঝাইতেছে। কিন্তু 'সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ' (৪) এই প্রসিদ্ধসূত্রে অলঙ্কার অর্থে বামন কাব্যের সমগ্র সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছেন। কাব্যের এই 'অলঙ্কার' বা 'সৌন্দর্য্য' কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে তাহার উত্তরে এই কয়টি উপায়ের উল্লেখ আছে—(১) গুণবিশিষ্ট রীতিতে রচনা (২) দোষের বর্জ্জন এবং (৩) অলঙ্কারের (figure of speech) সমাবেশ। (৫)

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে বামনের সিদ্ধান্ত দণ্ডী হইতে বিভিন্ন না হইলেও অনেক বিষয়ে তদপেক্ষা পরিণত, সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত। তথাপি তখনও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সব কথা বলা হয় নাই। গুণ (qualities) ও অলঙ্কার (figure of speech) যে কাব্যে সহকারীমাত্র এবং আহার্য্য, তাহা বামন দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু গুণালঙ্কার যুক্ত শব্দার্থ যে কাব্যের একমাত্র উপজীব্য, এ ধারণা তিনি এখনও ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। দণ্ডী রসকে অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়াছেন (২।২৭৫ ; ২।২৮০-২৯২); কিন্তু বামন এ বিষয়ে দণ্ডীকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বামন বলিয়াছেন রচনার মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ (১।৩।৩০-৩৩) এবং বোধ হয় নাটকের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের জন্য ভরতাদিপ্রোক্ত নাটকের উপজীব্য রসকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। 'কান্তি' গুণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন 'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ' এবং এইরূপে তিনি রসকে গুণের অন্তর্ভূত করিয়া কাব্যের মুখ্য লক্ষণ-সমূহের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। 'বক্রোক্তি' (৬) অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় ব্যঙ্গ্য অর্থের (suggested sense) অস্পষ্ট সূচনা থাকিলেও, ইহাকে বামন লক্ষণা (indication) বলিয়াই ধরিয়াছেন। ব্যঞ্জনাবৃত্তির (suggestion) কোনও আভাস তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

'কাব্যপ্রকাশে' (৭) উল্লিখিত শ্রীশঙ্কু নামক অলঙ্কারিকও বোধ হয় এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। যদি ইনি 'রাজতরঙ্গিণী'

(১) 'কাব্যশব্দোঽয়ং গুণালঙ্কারসংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োর্বর্ত্ততে' (১।১।১ বৃত্তি)।

(২) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র ১।১।১, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'।

(৩) ঐ, ৩।১।১-২। বামন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে রীতি কাব্যের আত্মা এবং গুণবিশিষ্টপদরচনাই রীতি; তাহা হইলে গুণ কাব্যাত্মার অংশস্বরূপ। তাহারা উপস্কার্য্য (fit to be adorned); উপস্কারক (ornament) নহে। কিন্তু এখানে বামন গুণকে কাব্যোপস্কারক বা কাব্য-শোভাকর ধর্ম্ম বলিয়া অসঙ্গতি আনিয়াছেন।

(৪) ঐ, ১।১।২, ইহার বৃত্তিতে পুনঃ বলিয়াছেন—"করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলঙ্কারশব্দোঽয়ং উপমাদিষু বর্ত্ততে।"

(৫) ১।১।৩, 'স দোষগুণালঙ্কারহানাদানাভ্যাম্।'

(৬) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র ৪।৩।৮

(৭) কাব্যপ্রকাশ (Bomb. Sans. Series Ed.) পৃঃ ৯০

গ্রন্থে উল্লিখিত (১) রাজা অজিতাপীড়ের সমকালীন কবি হন তবে ইঁহার আবির্ভাব-কাল নবম শতকের পূর্ব্বার্দ্ধ। (২) ভরতের 'রসোৎপত্তি' বিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে, মম্মট শ্রীশঙ্কুর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীশঙ্কু রসসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ঝালকীকর তাঁহার কাব্য-প্রকাশের টীকায় (৩) বলিয়াছেন যে ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক,এবং অভিনব-গুপ্ত এই চারিজন পর্য্যায়ক্রমে মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য ও অলঙ্কার মতানুযায়ী ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কথা তিনি কোনও প্রাচীন টীকায় পাইয়াছেন (৪)।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধ্বনি (suggestion) বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রথম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃত বিচার 'ধ্বন্যালোকের' সময় হইতে। 'ধ্বন্যালোকে'র প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব্ব
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্॥"

সুতরাং ধ্বনির ধারণা যে আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদও প্রচলিত ছিল তাহা বেশ বোঝা যায়; কারণ এই শ্লোকে চারিটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে (১) কাব্যের আত্মা ধ্বনি (২) ধ্বনির অস্তিত্ব নাই (অভাববাদ) (৩) ধ্বনি লক্ষণার (indication) অন্তর্গত (৪) ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ (suggested sense)বাচ্যার্থ (expressed sense) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনাপূর্ব্বক ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্থাপনাই 'ধ্বন্যালোকের' প্রধান উদ্দেশ্য।

'ধ্বন্যালোক' দুইভাগে বিভক্ত; একভাগ কারিকা, তাহার নাম 'ধ্বনি'; অপরভাগ এই কারিকার বৃত্তি, তাহার নাম 'আলোক'। অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই ধ্বন্যালোকের এক অশেষপাণ্ডিত্যপূর্ণ 'ধ্বন্যালোক-লোচন' নামক টীকা করিয়াছেন। জহ্লণ-সঙ্কলিত 'সুক্তি-মুক্তাবলী' নামক সংগ্রহে উদ্ধৃত রাজশেখর রচিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে ধ্বনি ও আলোক, কারিকা ও বৃত্তি, উভয়েরই রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন। (৫) কিন্তু অভিনব-গুপ্তের 'লোচনে' কারিকাকার ও বৃত্তিকৃৎ এই দুইজন পৃথক ব্যক্তি, এইরূপ অনেকস্থলে সূচিত হইয়াছে। (৬) অভিনবগুপ্ত বোধ-হয় আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকাররূপে নির্দ্দেশ

(১) রাজতরঙ্গিনী (Bomb. Ed) ৪।৭০৫

(২) S. P. Pandit in his preface to *Gaudavaho* p. lxxxvii and Peterson in his preface to Subhasitavali p. 127

(৩) কাব্যপ্রকাশ (Bombay, Second Ed.) পৃঃ ৮৩

(৪) পৃঃ ১৮। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকায়ও এইরূপ আছে। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকা হইতে বোঝা যায় যে ইহারা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন।

(৫) ধ্বন্যালোক (কাব্যমালা সংস্করণ) সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ধ্বন্যালোকের অন্য নাম 'কাব্যালোক' 'সহৃদয়ালোক' ইত্যাদি।

(৬) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ৫১, ৬০, ১২৩

করিয়াছেন (১)। য্যাকোবি দেখাইয়াছেন যে কারিকাকার ও বৃত্তিকৃৎ এই দুজনের মতের অনেকস্থলে পার্থক্য দেখা যায়। আনন্দবর্দ্ধন বোধহয় কাশ্মীরদেশে ৯ম শতকের উত্তরার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। (২)

পূর্ব্বাচার্য্যগণ অলঙ্কারের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ স্থূলতঃ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'ধ্বন্যালোক' হইতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের সূত্রপাত। আনন্দবর্দ্ধনের সময় হইতে মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ও ব্যাকরণাদির বিভিন্ন মতবাদ আলঙ্কারিকদের বিচারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং সূক্ষ্মানুসন্ধানে নির্ণীত অলঙ্কার-শাস্ত্র কঠিন ও দুরবগাহ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকাকে ধ্বন্যালোকের 'লোচন' বলিয়া অভিহিত করিলেও, এই 'লোচন' আমাদিগকে দীব্য চক্ষুদান না করিয়া অনেক সময় আরও অন্ধ করিয়া দেয়; কারণ কারিকা ও বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার টীকা আরও কঠিন এবং তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মম্মট হইতে বিশ্বনাথ বিদ্যানাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বন্যালোকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং ধ্বন্যালোককে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা স্বস্ব মতবাদের স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধনই সর্ব্বপ্রথম একটা সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারণা গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ তাঁহার গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শব্দ অর্থ, গুণ দোষ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি কয়েকটি মূলতত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার কিরূপ স্থান তাহা আনন্দবর্দ্ধন প্রথম সুবিচারপূর্ব্বক নিরূপিত করিয়াছেন। রসের স্বরূপ-নির্ণয় এবং রসব্যঞ্জনাই যে কাব্যের উদ্দেশ্য এই কথা তিনি 'ধ্বন্যালোকে' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই রসাভিব্যক্তি আশ্রয় করিয়াই গুণদোষ অলঙ্কার রীত্যাদির কাব্যে যথাযোগ্য স্থিতি। গুণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি বলেন—

রসভাবাদিতাৎপর্য্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম্
অলঙ্কৃতীনাং সর্ব্বাসামলঙ্কারত্বসাধনম্।
তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥(৩)

(১) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ২৩৩। ক্ষেমেন্দ্রও তাঁহার 'ঔচিত্য-বিচার' গ্রন্থে (কাব্যমালা সংস্করণ পৃঃ ১৩৪) আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু মম্মট আনন্দবর্দ্ধনকে কারিকাকার হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন; কারিকাকারকে ধ্বনিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অলঙ্কার গ্রন্থে ধ্বনিকার এই নির্দ্দেশ করিয়া যুগপৎ কারিকা ও বৃত্তি হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। য্যাকোবির মতে কারিকাকার ও বৃত্তিকার দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি।

(২) Buhler, Kashmir Report (J. R. A. S. Bomb. 1877. Extra no) p. 65-66 Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanayaloka.

(৩) ধ্বন্যালোক পৃঃ ৭৪ ও ৭৮। শেষোক্ত শ্লোকের বৃত্তি এইরূপ—'যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সন্তমবলম্বন্তে তে গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ। বাচ্যবাচকলক্ষণাস্তঙ্গাণি যে পুনরাশ্রিতাস্তেঽলঙ্কারা মন্তব্যাঃ। কটকাদিবদিতি।' (পৃঃ ৭৮)। কাব্যপ্রকাশেও এইরূপ ধরা হইয়াছে।

শৌর্য্যাদি যেরূপ মানবাত্মার ধর্ম্ম, গুণও সেইরূপ কাব্যাত্মার ধর্ম্ম বিশেষ। অলঙ্কার শুধু কটককুণ্ডলাদির মত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক প্রসাধন স্বরূপ। মম্মটাদি পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধন কাব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) ধ্বনিকাব্য (১) (অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনির প্রাধান্য) (খ) গুণীভূতব্যঙ্গ্য (২) (অর্থাৎ যাহাতে ব্যঙ্গ্যঅর্থ থাকিলেও তাহা সুস্পষ্ট নহে) (গ) চিত্রকাব্য (৩) (অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনির লেশমাত্র নাই)। 'কাব্যপ্রকাশ', 'সাহিত্যদর্পণ', 'একাবলী', 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত প্রধান অলঙ্কার গ্রন্থে ধ্বন্যালোকনির্দ্দিষ্ট এই শ্রেণীবিভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চিত্রকাব্যকে সকলেই অধমকাব্যরূপে নিরূপিত করিয়াছেন, (৪) কারণ ইহাতে রসভাবাদির অভিব্যক্তি আদৌ নাই। গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য মধ্যম এবং ধ্বনি কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ধ্বনি কাব্য কাহাকে বলে তাহার বিচারে এবং ব্যঙ্গ্যার্থের নিরূপণে প্রায় সমগ্র ধ্বন্যালোক নিয়োজিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে, কারণ ধ্বন্যালোক হইতে আরম্ভ করিয়া এ বিষয়ে এত কথা লিখিত হইয়াছে এবং এত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে তাহার বিবরণ এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে দেওয়া যায় না। (৫) মোটামুটি বলা যায় যে সমস্ত উত্তম কাব্যে ধ্বনি (বা suggestion লক্ষিত হয়। শব্দের অভিধা (denotation) ও লক্ষণা (indication) ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামক একটি শক্তি আছে; কাব্যেও শব্দার্থসম্ভব ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাবৃত্তি আছে। রসাদির অনুভব এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি (function of suggestion) ভিন্ন হয় না। কারণ শুধু অভিধা দ্বারা রসাভিব্যক্তি হইতে পারে না; অথবা, "ইহা অদ্ভুত রস" এইরূপ শুধু নির্দ্দেশ করিয়া দিলে রসের কোনও প্রতীতি হয় না। লক্ষণার দ্বারাও রসের উদ্‌গম হয় না, কারণ অনুভূতির পূর্ব্বে রসের কোনও বিভিন্ন সত্তা নাই। লক্ষণা, শব্দের গৌণশক্তি মাত্র; এবং যেরূপ লক্ষিতার্থ না থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিতে পারে, সেইরূপ লক্ষিতার্থ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকিতে পারে। নৈয়ায়িকের অনুমানের দ্বারাও রস ব্যক্ত হয় না, কারণ স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ রসের আস্বাদ ও অনুমান দুই এক জিনিস নহে। সেইজন্য ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির অঙ্গীকার কাব্যাত্মক রসের অনুভবের জন্য আবশ্যক। ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই ইহার প্রকাশ সম্ভব হয়। রসই যে কাব্যের আত্মাস্বরূপ একথা আনন্দবর্দ্ধন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, অভিনবগুপ্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ৬৫ পৃষ্ঠায় রসাদিধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি।' 'যদ্যপি চ রসেনৈব সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্' ইত্যাদি। পুনশ্চ ২৭ পৃষ্ঠায় —'রস এব বস্তুত আত্মা বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্ব্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে'।

এইরূপ ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের স্থাপনা করিয়া ইহার 'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি,' 'রসধ্বনি' প্রভৃতি কিরূপ বিভিন্ন ভেদ হইতে পারে এবং কিরূপে ইহা সমাসাদিত হয়, আনন্দবর্দ্ধন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের মতবাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহার উপর বৈয়াকরণদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইবে; কারণ আলঙ্কারিক মত হইলেও মুখ্যতঃ শব্দব্যাপারের আলোচনার উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আনন্দবর্দ্ধনও 'শব্দতত্ত্ববিদ্'-দিগের কথা অনেকস্থলে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন (যথা পৃঃ ১৯৯) এবং একস্থলে বলিয়াছেন—'প্রথমে হি বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যানাম্' (পৃঃ ৪৭)।

অন্যান্য দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণ এই ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকার করেন না; কেহ বা ইহাকে অভিধা ও লক্ষণার মধ্যে কেহ বা অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে অভাববাদী, অন্তর্ভাববাদী, অনুমানবাদী, অভিহিতান্বয়বাদী ও অন্বিতাভিধানবাদী, দীর্ঘব্যাপারবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার আলোচনা, ন্যায় মীমাংসা ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থ প্রথমে যথেষ্ট তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। উদ্ভটের টীকাকার প্রতিহারেন্দুরাজ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আনন্দবর্দ্ধনাদি যাহাকে ধ্বনি বলেন তাহা উদ্ভটনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাব্যালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুত (১)। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তক বলেন যে 'বক্রোক্তি'ই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি 'উপচার-বক্রতা' (অর্থাৎ উপচার বা সাদৃশ্যমূলক বক্রোক্তি) নামক ভেদ-বিশেষের মধ্যে ধর্ত্তব্য। (২) ইহারা অন্তর্ভাববাদী অর্থাৎ ইহারা ধ্বনিকে গুণ ও অলঙ্কারের অন্তর্ভুত বলিয়া ধরেন। ভট্ট লোল্লট বলেন যে শব্দের অভিধাশক্তি,

(১) ধ্বন্যালোক ১।১৬

(২) ধ্বন্যালোক ৩।৩৫

(৩) ধ্বন্যালোক ৩.৪২-৪৩

(৪) ধ্বন্যালোক ৩।৪২-৪৩, পৃঃ ২২০-২২১। কাব্যপ্রকাশ, ষষ্ঠ উল্লাস। সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ) ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৩৬। সাহিত্যদর্পণকার ইহার কাব্যত্বই অঙ্গীকার করেন নাই। প্রতাপরুদ্রীয়, পৃঃ ৭১

(৫) এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য—কাব্যপ্রকাশ ১ম হইতে ষষ্ঠ উল্লাস। ব্যক্তিবিবেক (Trivandrum Sans. Series)। সাহিত্যদর্পণ, ২য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ এবং ৫ম পরিচ্ছেদ। একাবলী, উন্মেষ ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত। প্রতাপরুদ্রীয়, কাব্যপ্রকরণ পৃঃ ৪২-৯৫। রসগঙ্গাধর, শুঃ ৯-২০ ইত্যাদি।

(১) 'নন্থ যত্র কাব্যে সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিনঃ প্রধানভূতস্য স্বশব্দব্যাপারাস্পৃষ্টত্বেন প্রতীয়মানৈকরূপস্যার্থস্য সম্ভাবস্তত্র তথাবিধার্থাভিব্যক্তিহেতুঃ কাব্যজীবিতভূতঃ কৈশ্চিৎ সহৃদয়ৈ ধ্বনি নাম ব্যঞ্জকত্বভেদাত্মা কাব্যধর্ম্মোঽভিহিতঃ। স কস্মাদিহ নোপদিষ্টঃ। উচ্যতে। এষোঽলঙ্কারেষ্বন্তর্ভাবাৎ।' (উদ্ভট, কাব্যালঙ্কারসার লঘুবৃত্তি টীকা পৃঃ ৭১)।

(২) 'বক্রোক্তিজীবিতকারস্তু বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিস্বভাবাং বহুবিধাং বক্রোক্তিমেব প্রাধান্যাৎ কাব্যজীবমুক্তবান্.....উপচারবক্রতাদিভিঃ সমস্তো ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ স্বীকৃতঃ। (রুয্যক, অলঙ্কারসূত্র, Triv. Ed. পৃঃ ৭-৮)।

নিক্ষিপ্ত শরের মত, এরূপ 'দীর্ঘব্যাপার', যে তাহাতেই সমস্ত অর্থ ব্যক্ত হয় (১)। ইনি দীর্ঘব্যাপারবাদী। এই সমস্ত মতবাদভিন্ন 'ব্যক্তিবিবেকে'র টীকাকারের কথায় জানা যায় যে ভট্টনায়ক (২) একখানি "হৃদয়-দর্পণাখ্যো ধ্বনিধ্বংসগ্রন্থঃ" রচনা করিয়াছিলেন। (৩) 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থেও মহিমভট্ট আনন্দবর্দ্ধনকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। মহিমভট্ট ধ্বনিকে অনুমানের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই এইরূপ বলিয়াছেন—

অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্ব্বস্যৈব ধ্বনেঃ
প্রকাশয়িতুম্।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা
পরাং বাচম্ ॥

রুয্যক 'অলঙ্কারসর্ব্বস্বে', মম্মট 'কাব্যপ্রকাশে' বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে', বিদ্যাধর 'একাবলী'তে 'ব্যক্তি বিবেকে'র মত নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ তীব্র আক্রান্ত হইলেও, 'ধ্বন্যালোক' কালক্রমে সর্ব্ববাদী সম্মত প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং মম্মট রুয্যক জগন্নাথ হইতে বিশ্বনাথ বিদ্যাধর বিদ্যানাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছেন।

সুতরাং মম্মট প্রভৃতি পরবর্ত্তী অলঙ্কারিকগণের কাব্যের ধারণায় বিশেষ কোনও নূতন কথা পাওয়া যায় না, কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত মতাদির বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। মম্মটের পরবর্ত্তী অসংখ্য আলঙ্কারিকগণের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। শুধু 'কাব্যপ্রকাশে'রই এ পর্য্যন্ত ৫০টি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (৪) ইহাদের ছাড়িয়া দিলেও ভোজ তাঁহার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণে' (৫) কাব্যের যে লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মতাদির সহিত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

(১) 'যদি পুনঃ সোঽয়মিষোরিব দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপার ইতি মন্বানাঃ শব্দশ্রবণসমমন্তরং যাবতোঽর্থস্য প্রতিভানং তাবদভিধৈব ব্যাপারঃ প্রগল্‌ভত ইত্যভিদধতি' ইত্যাদি (বিদ্যাধর, একাবলী, Ed. K. P. Trivedi, p. 42)। একাবলীর প্রথম উন্মেষে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা ও খণ্ডন আছে।

(২) পিটারসন্ (সুভাষিতাবলী ভূমিকা) ইহাকে কাশ্মীরাধিপতি অবন্তীবর্ম্মার সমকালীন (৯ম শতকের শেষভাগ) বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার ধ্বন্যালোকলোচনে (পৃঃ ১৫, ১৯, ২২, ২৯, ৬৩, ৬৭) অনেকবার ইহার মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন। রুয্যক (অলঙ্কারসর্ব্বস্ব পৃঃ ৯) ইহার মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ভট্টনায়কেন তু ব্যঞ্জনব্যাপারস্য শ্রৌঢ়োক্ত্যাভ্যুপগতস্য কাব্যে সত্ত্বং ক্রবতা ন্যগ্‌ভাবিতশব্দার্থস্বরূপস্য ব্যাপারস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তত্রাপ্যভিধাভাবকত্বলক্ষণব্যাপারদ্বয়োত্তীর্ণো রসচর্ব্বণাত্মৈব ভোগাপরপর্য্যায়ো ব্যাপারঃ প্রধান্যেন বিশ্রান্তিস্থানতয়াঽঙ্গীকৃতঃ।' ইঁহার অধুনা লুপ্ত গ্রন্থের নাম 'হৃদয়-দর্পণ'।

(৩) ব্যক্তিবিবেক (Triv. Ed.) পৃঃ ১ এই 'হৃদয়দর্পণ' ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা, তাহা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন।

(৪) Ganganath Jha, Kavyaprakasa, Preface p. viii—ix.

(৫) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—১।২—'নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।'

'রসগঙ্গাধর'কার জগন্নাথ, দণ্ডী প্রভৃতির প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া—'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্' (১) এইরূপ বলিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহার বিশ্লেষণে তিনি গুণ দোষ অলঙ্কার ধ্বনি রস প্রভৃতি সকল কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতাম্বর জৈন হেমচন্দ্র, মম্মটকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' কাব্যের স্বরূপ "প্রদোষৌ সগুণৌ সাংলঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্" (২) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বনি, ব্যঙ্গ্যার্থ, ও রসের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। 'অলঙ্কার শেখরে' (৩) "উক্তঞ্চ ভগবতা শব্দার্থৌ কাব্যস্য শরীরং, আত্মা রসঃ, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ। দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ। অলঙ্কারাঃ কুণ্ডলাদিবৎ' প্রভৃতি যে সকল বাক্য অলঙ্কার-সূত্রকার ভগবান্ শৌদ্ধোদনির মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণকারের মত হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। 'একাবলী' ও 'প্রতাপরুদ্রীয়ে' 'ধ্বন্যালোকে'র ও মম্মটের মতই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি" (৪) বলিয়া মম্মট কাব্যলক্ষণের যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বনাথ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই (৫) তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই নির্দ্দেশ যুক্তিসম্মত নহে এবং ইহা যদি গৃহীত হয় তবে কোন কাব্যই তন্মাময়োগ্য হইতে পারে না, কারণ কোনও কাব্যই নির্দ্দোষ নহে। (৬) বিশ্বনাথ শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রসই কাব্যের আত্মা; গুণ অলঙ্কার ও রীতি রসের উৎকর্ষবিধায়ক এবং দোষ রসের অপকর্ষক। তর্কের কথা ছাড়িয়া দিলে মম্মট ও সাহিত্যদর্পণকারের মতে যে বিশেষ গুরুতর পার্থক্য আছে তাহা বোধ হয় না। কাব্যপ্রকাশকার গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন—'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্। নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।' এবং দ্বিতীয় শ্লোকের বৃত্তিতেও কাব্যের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিত-

(১) জগন্নাথ, রসগঙ্গাধর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৪। সাহিত্যদর্পণকারের রসবিষয়ক মত সম্বন্ধে জগন্নাথ এইরূপ বলিয়াছেন—যত্তু রসবদেব কাব্যমিতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্ তন্ন। বস্ত্বলঙ্কারপ্রধানানাং কাব্যানাম-কাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ—মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ (পৃঃ ৪)।

(২) হেমচন্দ্র, কাব্যানুশাসন (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ১৬

(৩) কেশব মিশ্র, অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ২০

(৪) কাব্যপ্রকাশ ১।১ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ১৩)।

(৫) সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ৬-২২), ১ম পরিচ্ছেদ। সাহিত্যদর্পণের নির্দ্দেশও যুক্তিযুক্ত নহে এবং অসম্পূর্ণ, একথা প্রভাটীকায় বিস্তৃত আলোচনা আছে (কাব্যপ্রদীপ, কাব্যমালা সংস্করণ, প্রভাটীকা ৮-১১)

(৬) কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপের উদ্যোত-টীকায় ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। (চন্দোরকর সম্পাদিত কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ১৫ উদ্যোতটীকা দ্রষ্টব্য)

বেদ্যান্তরমানন্দং প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধান-বেদাদি-শাস্ত্রেভ্যঃ সুহৃৎসম্মিতার্থতাৎপর্য্যবৎপুরাণাদীতিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থয়ো গুণভাবেন রসাঙ্গভূত ব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণং কবিকর্ম্ম...” ইত্যাদি (১)। তবে সাহিত্যদর্পণকার রসকেই কাব্যাত্মা বলিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রসের ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচনার যোগ্য।

রাজশেখর রসাধিকরণে নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করিলেও,রসের আলোচনা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২) সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। ভরতের মতে শৃঙ্গারাদি অষ্টরসের বিস্তারই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। কেশব মিশ্রের ‘অলঙ্কার-শেখরে’ (৩) সূত্রকার শৌদ্ধোদনির ‘বাক্যং রসাদিমৎ কাব্যম্’ ‘অলঙ্কারাস্ত শোভায়ৈ, রস আত্মা’ ইত্যাদি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান হয় যে রসের কাব্যাত্মতা সম্বন্ধে এইরূপ মত বহুপূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার রসবাদের বিস্তৃত আলোচনার সময় যে ভরত ও শৌদ্ধোদনির মতের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ধ্বন্যালোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—‘এতচ্চ রসাদিতাৎপর্য্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভারতাদৌ অপি সুপ্রসিদ্ধমেব···’ ইত্যাদি। (৪) কাব্যের ভেদস্বরূপ নাটকে যাহা ভরতাদি-কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা যে সমস্ত কাব্যের ধারণায় প্রযুক্ত হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রস কাহাকে বলে এবং তাহার উৎপত্তি কিরূপ তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ ‘রস্যন্তে ইতি রসাঃ’ (‘রস আস্বাদনে চুরাদিঃ’) এইরূপ বুৎপত্তি করিয়া, যাহা আস্বাদ বা উপভোগ করা যায় তাহার নাম রস এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কাব্যে যাহা আস্বাদনীয় তাহাই কাব্যরস। ইহা মনের একটী স্থায়ীভাব। এই আস্বাদ কিরূপে সম্ভব তাহার সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন—‘বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ (৫) বিভাব (Excitant), অনুভাব (Ensuant) এবং ব্যভিচারিভাব (Accessory) হইতে

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯-১০

(২) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়।

(৩) অলঙ্কারশেখর, পৃঃ ২, ৬, ২০ ইত্যাদি।

(৪) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ১৮১-১৮২

(৫) নাট্যশাস্ত্র পৃঃ ৬২। (কাব্যপ্রকাশে ধৃত পৃঃ ৮৩, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৯)! ইহা অনুসরণ করিয়া ধনঞ্জয় দশরূপকে (পৃঃ ১৩৬) বলিয়াছেন—‘বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ। আনীয়মানঃস্বাদ্যত্বং স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ। সোভানি (*Bhandarkar Comm. Volume* p. 388) ভরতের নাট্যশাস্ত্র (৭ম অধ্যায় পৃঃ ৭০) হইতে নিম্নোদ্ধৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের অস্পষ্ট সূচনা ভরতের মধ্যেই রহিয়াছে। “যদা অন্যোন্যার্থসম্ভূতৈ বিভাবানুভাবব্যক্তিভৈরেকোনপঞ্চাশতা ভাবৈঃ সামান্যগুণযোগেনাভিনিষ্পদ্যন্তে রসাস্তৎ কথং স্থায়িন এব ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। উচ্যতে.....। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাঃ স্থায়িনো ভাবাঃ।.....যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষস্তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিক্ষতঃ স্থায়িভাবো রসতাং লভতে।”

রসের নিষ্পত্তি। বিভাব অর্থে যাহা এই স্থায়ীভাবকে সংবেদনযোগ্য (capable of being sensed) করিতে পারে; যথা শৃঙ্গাররসে ললনাউদ্যানাদি। অনুভাব ইহাকে স্পষ্ট সংবেদিত (sensed) করে; যথা আলিঙ্গনকটাক্ষাদি। ব্যভিচারিভাব সহকারি হিসাবে ইহাকে বর্দ্ধিত করে; যথা হর্ষনির্বেদাদি। এই সমস্ত হইতে রসস্বরূপ স্থায়ী ভাবের (permanent mood) নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু ইহাদের সহিত আস্বাদ্যমান রসের কি সম্বন্ধ? উল্লিখিত ভরতোক্তি অবলম্বন করিয়া এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্ট লোল্লট প্রভৃতি মীমাংসামতবাদীগণ বলেন(১)—“স্থায়িনাং বিভাবৈঃ ললনাদিরূপৈরালম্বনকারণৈঃ উদ্যানাদিভিরুদ্দীপনকারণৈঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজোৎক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ, ব্যভিচারিভি র্নির্বেদাদিরূপৈঃ সহকারিভিশ্চ সংযোগাৎ ক্রমেণোৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাৎ, গম্যগমকভাবরূপাৎ পোষ্যপোষকভাবরূপাচ্চ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চ ভবতীতি সূত্রার্থঃ।” এই রসবাদকে উৎপত্তিবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের মতে বিভাবাদি কারণ (cause) হইতে রসরূপ কার্য্যের (effect) নিষ্পত্তি। রামসীতাদির মধ্যে স্থিত যে শৃঙ্গারাদি রস এবং যাহা অভিনয়াদির দ্বারা নটনটীর মধ্যে অবিদ্যমান থাকিলেও প্রতীয়মান, তাহা এইরূপে দর্শক বা শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহা এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—“যথা অসত্যপি সর্পে সর্পতয়া অবলোকিতাৎ দায়োঽপি ভীতিরুদেতি, তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাঽপি নর্ত্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়-হৃদয়ে চমৎকারমর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরোহতি।” কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে যাহা দর্শকের মধ্যে অবিদ্যমান, তাহা কিরূপে তাহাকে চমৎকৃত করিতে পারে তাহা বোঝা যায় না। সেইজন্য কাব্য-প্রকাশের ‘প্রদীপ’-টীকাকার বলিয়াছেন—‘সামাজিকে তদভাবে চমৎকারানুভববিরোধাৎ।’ (২) রস প্রতীয়মান (cognised) হইতে পারে না, কারণ রামসীতাদি দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত নহে; ইহার উৎপত্তি (produced) হইতে পারে না, কারণ বিভাবাদির বাস্তবিকত্বের (reality) অভাব; ইহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না, কারণ যাহা সিদ্ধ (estalished) তাহারই, প্রদীপের দ্বারা ঘটাদির ন্যায়, অভিব্যক্তির সম্ভব।

সেইজন্য নৈয়ায়িকমতানুসারী অনুমানবাদীগণ বলেন যে অনুমানের দ্বারা রসের নিষ্পত্তি হয়। শ্রীশঙ্কুপ্রভৃতি এইরূপ বলেন—“স্থায়িনো বিভাবাদিভিরুক্তরূপৈঃ সংযোগাদ্ অনুমাপ্যানুমাপকরূপাৎ সম্বন্ধাদ্ রসস্য নিষ্পত্তিরনুমিতিরিতি সূত্রার্থঃ।” (৩) ইহা এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বোঝান হইয়াছে: যেমন

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৮৭ (ঝালকীকর টীকা)

(২) প্রদীপ (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৬৩।

(৩) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৮৮

কুজ্ঝটিকাকুলিত দেশে ধূম না থাকিলেও ধূমসাদৃশ্যের অভিমান হইতে ধূমনিয়ত বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ নটনটীর মধ্যে রস-বিষয়ক বিভাবাদি না থাকিলেও, নিপুণ অভিনয় দ্বারা তাহাদের মধ্যে ইহার প্রতীয়মান অস্তিত্ব হইতে রামসীতাদির রতির অনুমান করা যায়। এই অনুমিত রত্যাদি স্বীয় চমৎকারিতার বলে দর্শনের প্রতীতিগম্য হইয়া তাহাদের মনে রসস্বরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে রসের প্রত্যক্ষ আস্বাদ ও অনুমিতির দ্বারা আস্বাদ একই প্রকার সুখকর নহে। সেই জন্য উল্লিখিত 'প্রদীপ'কার বলিয়াছেন —'এতদপ্যহৃদয়গ্রাহি। যতঃ প্রত্যক্ষমেব জ্ঞানং সচমৎকারং নানুমিত্যাদিরিতি লোক-প্রসিদ্ধিমবধূয়ান্যথাকল্পনে মানাভাবঃ।' (১)

ভট্টনায়কাদি সাংখ্যমতাবলম্বীগণ এই দুইটি কোনও মত স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতকে ভুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বলেন—"বিভাবাদিসংযোগাদ্ ভোজ্যভোজকসম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিঃ" (২) অর্থাৎ ভোজ্য (enjoyed) এবং ভোজক (enjoyer) সম্বন্ধ হইতেই বিভাবাদি দ্বারা রসের নিষ্পত্তি। একটু বিস্তৃতভাবে ইহা বুঝিতে হইবে। ইঁহাদের মতে শব্দের তিনটি শক্তি আছে—'অভিধা', 'ভাবকত্ব' এবং 'ভোজকত্ব'। ইহারা বলেন যে 'অভিধা' দ্বারা অভিধা (denotation) এবং লক্ষণা (indication) দুই বুঝায়। 'ভাবকত্বের' অর্থ "সাধারণীকরণম্" (generalisation) (৩)। এই শক্তির দ্বারা বিভাবাদি এবং স্থায়িভাব 'সাধারণীকৃত' হয় অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি (general character) বুঝায়, ইহাদের কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম (specific properties) বুঝায় না। যেমন 'সীতা' এই বিভাবের দ্বারা 'সীতা' নামক কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় না, 'কামিনী' এই সাধারণ বিষয় বুঝায়। এবং রামের সীতাবিষয়ক অনুরাগ এই স্থায়িভাব কেবল সাধারণ রতি বা অনুরাগ (love in general) বুঝায়। রতির কোনও বিশিষ্ট কারক (agent) বা বস্তু (object) বুঝায় না। 'ভোজকত্ব'শক্তির দ্বারা, এই সাধারণী-কৃত বিশিষ্টধর্ম্মবর্জ্জিত স্থায়ীভাব এবং বিভা-বাদির উপভোগ হয়। সুতরাং রসের আস্বাদ অলৌকিক, সাধারণ লৌকিক সুখের আস্বাদ হইতে বিভিন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন আনন্দময় জ্ঞানের ন্যায় ইহার উপভোগ। এই মত-বাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি যে এরূপ শব্দের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব' শক্তির কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। ('এতাদৃশ ব্যাপারদ্বয়কল্পনে প্রামাণাভাবাৎ।' প্রদীপ পৃঃ ৬৬)।

অভিনবগুপ্তাদি আলঙ্কারিকগণের মত এইরূপ ;—'স্থায়িনাং বিভাবাদিভিঃ সমং সংযোগাদ্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাদ্ বিভাবাদীনামেব বা পরস্পরং সংযোগাৎ

(১) প্রদীপ পৃঃ ৬৪-৬৫, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ২৪৮-২৫৫। রসের আলোচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন একাবলী পৃঃ ৮৬-৮৮, প্রতাপরুদ্রীয় পৃঃ ২১৯-২২৯, রসগঙ্গাধর পৃঃ ২২-৩১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(২) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯১

(৩) প্রদীপ পৃঃ ৬৬। সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য।

মিলনাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিরিতি সূত্রার্থঃ।' (১) ইহাকে অভিব্যক্তিবাদ বলা যাইতে পারে। রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, ললনা উদ্যান কটাক্ষ প্রভৃতি লৌকিক কারণ হইতে অনুমিত (২) হইয়া, সংস্কার বা বাসনা (impression) রূপে সহৃদয়-হৃদয়ে থাকিয়া যায়। যখন কোন কাব্য পঠিত বা নাটক অনুষ্ঠিত হয়, তখন সহৃদয়-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এই সকল সংস্কাররূপী রত্যাদি ভাব পূর্ব্বোক্ত ললনাদি কারণ দ্বারা অভিব্যক্ত (suggested) হয়; কিন্তু এই সকল কারণ এখন আর লৌকিক কারণ থাকে না, তাহারা বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব নাম গ্রহণ করে এবং পূর্ব্বোক্ত 'ভাবকত্বশক্তি'র দ্বারা ইহারা 'রামসীতা' এই রূপ নির্দ্দিষ্ট (specific) ব্যক্তি বা বস্তু না বুঝাইয়া সাধারণ 'কামিনী' প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। তখন বিভাবাদি 'ইহা আমার, ইহা পরের', এইরূপ কোনও বিশিষ্ট সম্বন্ধ (specific connexion) না বুঝাইয়া দর্শক বা শ্রোতার দ্বারা আস্বাদক্ষম হয়। (৩) স্থায়ীভাবও কোনও নির্দ্দিষ্ট দর্শক সম্বন্ধে প্রযোজ্য থাকে না, দর্শকমাত্রেই প্রযোজ্য হয়, সুতরাং সর্ব্বসম্বন্ধী হইয়া যায় ('পরিমিতাবনধীতী')। যদিও ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট দর্শক কর্ত্তৃক আস্বাদিত হয় বটে, তথাপি আস্বাদনের সময় সে 'আমারই এই বিভাবাদি আমিই রসের আস্বাদয়িতা' এই-রূপ ভাবে না, বরং বিভাবাদির সাধারণী-করণের জন্য ইহা সকল সহৃদয় লোকের আস্বাদ্য এইরূপ তাহার প্রতীতি হয়। এই আস্বাদই রস। সুতরাং যাহাদের কখনও রত্যাদি অনুভব হয় নাই এবং যাহাদের এ বিষয়ে কোনও বাসনা (impression) নাই, তাহারা কখনও রস আস্বাদন করিতে পারে না। এইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন যে ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে, কারণ ইহা 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' (৪); কেবল 'সহৃদয়হৃদয়-বেদ্য' (৫)। এই বাসনা (impression) স্বাভাবিকী, অথবা কাব্য-নাটকের চর্চ্চাদ্বারা উৎপন্ন হয়। সেইজন্য বৃদ্ধ মীমাংসক বা বৈয়াকরণগণ অথবা যাঁহারা সংসারবিরক্ত তাঁহারা রসাস্বাদে বঞ্চিত, একথা আলঙ্কারিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন (৬)।

সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত অলৌকিক রস, ব্যঞ্জনা (suggestion) দ্বারা, দর্শক বা শ্রোতার মনে অভিব্যক্ত হয়। ইহা অভিধা (denotation), তাৎপর্য্য (import), লক্ষণা (indication), প্রত্যক্ষ (cognition),

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯১। প্রদীপ পৃঃ ৬৭

(২) এই অনুমান কিরূপ তাহা কমলাকরী টীকা (Benares Ed.) এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'অয়মেত-দ্বিষয়-রতিমান্। তৎকার্য্যকটাক্ষাদিভাবাৎ। যো নৈবং স নৈবম্। যথা বিরক্তঃ॥'

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮১

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২

(৫) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৮

(৬) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭৯। প্রদীপ পৃঃ ৬৩। কমলাকরী টীকায় উক্ত হইয়াছে "রসিকা এব রসাস্বাদে যোগ্যা নতু বিরক্তাদয়ঃ।"

অনুমান (inference) বা স্মরণ (recollection) ইহাদের কাহারও বিষয়ীভূত নহে। (১) যদিও বিভাবাদি অপরিহার্য্য এবং তদ্ভিন্ন রসের অস্তিত্ব নাই, তথাপি ইহারা রসের কারণ (cause) নহে, রসও ইহাদের -কার্য্য (effect) নহে। যাহা কার্য্য তাহা কারণের তিরোভাবের পরও থাকিতে পারে; কিন্তু রস বিভাবাদি না থাকিলে থাকিতে পারে না। (২) সুতরাং ইহা 'বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ।' ইহা অলৌকিক বলিয়া সাধারণ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাপ্য নহে। যেমন খণ্ডমরীচি, শর্করা, কর্পূর প্রভৃতির সম্মেলনসম্ভূত পানীয়ে, ইহার প্রত্যেকের আস্বাদ হইতে বিভিন্ন, আস্বাদ পাওয়া যায়, রসেও সেইরূপ। (৩) বিভাবাদির দ্বারা সম্পন্ন হইলেও রস এক (single or indivisible); এবং ইহা হইতে বিভাবাদির বিভিন্ন প্রতীতি হয় না। সুতরাং স্থায়ীভাব, এইরূপ পানীয়ের মত আস্বাদিত হইলে, রস হয়।• তাহা হইলে রস 'চর্ব্বণা' বা 'আস্বাদ' (৪)। 'চর্ব্ব্যমানতাই (state of being relished)। ইহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম (৫)।

রসের আস্বাদ অলৌকিক; কারণ ইহা ব্রহ্মানন্দাস্বাদের মত অপূর্ব্ব। (৬) ইহার আস্বাদনে অন্য কোনও বস্তুপ্রতীতি থাকে না ('বিগলিতবেদ্যান্তরঃ')। কেবল ব্রহ্মাস্বাদ ও কাব্যরসাস্বাদের পার্থক্য এই যে কাব্যরসাস্বাদ বিভাবাদ্যনুসন্ধানসাধ্য কিন্তু ব্রহ্মস্বাদ যোগের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং এই রসপ্রতীতি 'সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদন সাক্ষিক' অথবা মম্মটের কথায় 'সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃতঃ' (৭)।

তাহা হইলে দেখা গেল যে কাব্যের আদর্শ অতি সঙ্কীর্ণ আদিম ধারণা হইতে কিরূপে ক্রমশঃ রসের চরম নিষ্পত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। অলঙ্কারের ভেদ (classification) এবং লক্ষণনির্ণয় (definition) বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। গুণ দোষের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে রীতি বা style যে কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা দণ্ডীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই রীতির সংস্থানে সমাধি (harmony) বা সৌন্দর্য্যের (beauty) উৎপত্তি, কারণ এই রীতি 'রসাদীনাং উপকর্ত্রী'মাত্র। অভিধা লক্ষণাদিরূপ শব্দের শক্তিনিরূপণ এবং তাহার পর ব্যঞ্জনার স্থাপনা দ্বারা শব্দব্যাপারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্যপদ্যের যে ভেদ নাই এবং ছন্দ

(১) সাহিত্যদর্পণ ৫ম পরিচ্ছেদ।

(২) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৬। কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৪

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৩ 'প্রপাণকরসন্যায়াচ্চর্ব্ব্যমানো রসো ভবেৎ'। কমলাকরী—'পানকে অম্লখণ্ড-মরীচকাদীনাং চিত্ররসবৎ সংবলিতানাং রসত্বং।' কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৩। প্রদীপ পৃঃ ৬৯।

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৯। কাব্যপ্রকাশ ৯৪। প্রদীপ ৬৮-৬৯।

(৫) 'চর্ব্বমানৈকপ্রাণঃ' কমলাকর।

(৬) 'ব্রহ্মানন্দসহোদরঃ' (সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২), 'ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্' (কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৩)।

(৭) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯২, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২

যে কাব্যের শুধু বহিরাবরণ বা accident মাত্র, তাহা দণ্ডী হইতে দর্পণকার পর্য্যন্ত সকলেই বলিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতে স্থির করিয়াছিলেন যে শব্দার্থ প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা কাব্যের শরীরমাত্র (body or material part)। কাব্যের আত্মা (soul of poetry) ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ, কারণ শরীর আত্মার আনুষঙ্গিক মাত্র। কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসায়' যে 'কাব্যপুরুষে'র কল্পনা করিয়াছেন তাহা কবিকল্পিত হইলেও এই রূপকের স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। এই দেহাত্মার রূপক আরও বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে —'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ, অলঙ্কারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ।' এই কাব্যের আত্মা এরূপ অজ্ঞেয় ও অগম্য এবং ইহার শক্তি এত বহুবিস্তীর্ণ যে ইহাকে মানবাত্মার সহিত তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে যে গভীর আনন্দের উদ্গম হয় তাহার দ্বারাই ইহা বোধগম্য।

সুতরাং ভাষার সহিত কাব্যের সম্পর্ক থাকিলেও, ভাষাই ইহার সর্ব্বস্ব নহে; গদ্য পদ্য বা ইহার অন্য কোনও আকারের পরস্পর পার্থক্য নাই, কারণ সহৃদয়-হৃদয়ের আনন্দই ইহার প্রমাণ। কাব্যে কেবলমাত্র ছন্দ বা মাত্রাদির সংস্থান অথবা শব্দবৈভব এই আনন্দের উৎপাদক নহে। সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রকে শুধু Rhetoric বলিয়া বর্ণনা করা যায় না; Poetics বা Theory of Poetic expression বলিলে আরও সঙ্গত হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিক কেবল অক্ষরপ্রাণ কাব্যের (syllabic poetry) বর্ণনা করেন নাই, ভাবনাসম্মত কাব্যের (ideal poetry) বর্ণনা করিয়াছেন। কবির ভারতী, তাঁহাদের মতে, নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী রসভাবরুচিরা অনন্যপরতন্ত্রা এবং লোকোত্তরচমৎকারিণী।

এইরূপ কাব্যের শরীর ও আত্মাকে পৃথক করিয়া এবং শব্দার্থের মধ্যে প্রতীয়মান রসকে কাব্যাত্মা কল্পনা করিয়া আলঙ্কারিকগণ Æsthetics বা সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রস যখন কোনও মানসিক স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া পরিস্ফুট হয়, তখন বিভিন্ন মানসিকবৃত্তির আলোচনাও (analysis of emotions) আলঙ্কারিকগণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কেবল রসের বিশ্লেষণ নহে, হাস শোক ক্রোধ ভয় জুগুপ্সা বিস্ময় নির্ব্বেদ এবং হাবভাব বিলাসাদির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা অলঙ্কারগ্রন্থের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। এই psychology of poetic emotions অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই রসের অনুভূতি ব্যঞ্জনা (suggestion) ভিন্ন হয় না, সেইজন্য ব্যঙ্গ্য কাব্যকেই (suggestive poetry) শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা হইয়াছে। কাব্যের এই ব্যঞ্জনাবৃত্তিই (function of suggestion) সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে রসকে অভিব্যক্ত করে। কিন্তু ভাবকত্ব (imagination)

কেবল কবির মধ্যে থাকিলে হইবে না, পাঠকের মধ্যে থাকাও একান্ত আবশ্যক। 'রসিক' বা 'সহৃদয়' (man of taste) কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহা হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'যস্ত তু কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনাযোগ্যতাসহৃদয়সংবাদভাক্ স সহৃদয়ঃ' (চূড়ামণি টীকা পৃঃ ৩)।

রসের ধারণাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই রসের ধারণা কিরূপ সূক্ষ্ম অথচ উন্নত তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কাব্যামৃতরসাস্বাদকে আলঙ্কারিকগণ স্বপ্রকাশানন্দ অজ্ঞাপ্য অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মরসাস্বাদের সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাব্য (Poetry) এবং ব্রহ্মজ্ঞান (Religion) প্রায় এক পইঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যরসাস্বাদে সকলেই অধিকারী নহেন এবং ইহার জন্য ভাবকত্ব (imagination) ও সাধারণী বৃত্তির (community of feeling) আবশ্যক।

এই রসের আনন্দ, চমৎকার (wonder) হইতে সমুদ্ভূত। অদ্ভুত (বা marvellous or sublime) কে রসভেদ বলিয়া নিরূপিত করিলেও, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ ॥

চমৎকার (spirit of wonder) যে কাব্যের মূল তাহা বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে এবং এই 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ' কাব্যরসের আস্বাদ কেবল সহৃদয় ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ যোগীদিগের ন্যায় অনুভব করিতে পারেন—

পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিম্।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যেমন সকলকেই কাব্যরসাস্বাদনের অধিকারী বিবেচনা করেন না, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে সকল কবিই এই কাব্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন না। দণ্ডী বলিয়াছেন—

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্

তাহা হইলে কাব্যরচনা নিষ্ফল; কারণ—'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্' (বামন ১।৩।১৬)। এই 'প্রতিভান'—'জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ। যস্মাদ্বিনা কাব্যং ন নিষ্পদ্যতে। নিষ্পন্নং বা হাস্যায়তনং স্যাৎ।' কিন্তু এই কবিত্বশক্তি থাকিলেও চেষ্টা, একাগ্রতা, লোকশাস্ত্রবৈচক্ষণ্য, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস অভিধান ছন্দ কলাবিদ্যা দণ্ডনীতি প্রভৃতির অনুশীলনও 'কাব্যাঙ্গ' বা কবিত্বের উন্মেষক। (বামন, ১।৩; কাব্যপ্রকাশ ১।৩)। সেইজন্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

তদস্ততন্দ্রৈরনিশং সরস্বতী
শ্রমাদুপাস্যা খলু কীর্ত্তিমীপ্সুভিঃ।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

স্মরণে

জনম-জনম যাহার পাণি পীড়ন করে' আস্‌ছ বন্ধু মোর,
আবার সে যে পড়্‌ল ছিঁড়ে তোমার তরুণ ফাগুন ফুলের ডোর।
গুঁড়িয়ে গেল পাঁজর-তলা বিদায়-বোঝার পাষাণ-ভাঙ্গা ভারে,
জীবন-নায়ে জল ভরিল, পৌঁছিল না সুখ-দরিয়ার পারে।
মৃত্যু-কালো শূন্য নিখিল, উদাস-করা সকল হাসির সুর—
উধায় এলে ভাসান্ দিয়ে, নতুন স্রোতে যায় সে কতদূর!

ছাইএর সনে ছাই মিশেছে, যে-টুকু তার অমর চিরন্তন,
সেই-টুকু-বাগ্‌দত্তা সে যে, নতুন যুগে কর্‌বে নিবেদন।
বক্ষতলের স্বপ্নাসবে রসিয়ে হিয়ার ব্যাকুল ওষ্ঠাধর,
চির-নারীর বরণ-মালা সেই তোমারে পরায় নিরন্তর।
আকাশ-গাঙের আব্‌ছা-বাঁকে মহানীলের মিলন-মোহানায়,
অনন্ত সেই অন্তরঙ্গ—বুকের তলায় হারাও নি তো তায়।
চোখের জলের মানস-হ্রদে, সেই তো অমল স্মৃতির শরৎ-ভরা,
গৌরবেরি নগ্ন কমল, সেই ফুটেছে শিশির-মোতি-ঝরা।

পরশ-মণির সোনার ছোঁয়া পেয়েছে আজ তোমার মনের মণি,
শুকিয়ে গেছে প্রাণের স্নায়ু, ধমনীতে জমাট্ শোণিত-ধ্বনি।
সাম্‌নে তোমার ঘুমন্ত পথ, ছায়াপুরীর দুয়ার-প্রান্তে শেষ,
নাইকো আলো, নাইকো ছবি, পেরিয়ে চল' দীর্ঘ-শ্বাসের দেশ।
কান্না-ধোয়া ভস্ম-রাশে দাও লুটায়ে সিক্ত যূথীর হার,
বাহির থেকে নেই গো কিছুই, ভিতরকার এই দরদ জুড়াবার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের জাগ্রত অবস্থায় স্মৃতি যে আমাদের মনের রাজ্যে আনাগোনা করে, তাহা প্রত্যক্ষই অনুভব করিতে পারি। এই সব স্মৃতি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান কার্য্য, বর্ত্তমান চিন্তা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইতর প্রাণীর উপরও স্মৃতির প্রভাব অল্প নহে। কোন্ সুদূর অতীতে অনুরূপ অবস্থায় ঠিক কি ফল ফলিয়াছিল—স্মৃতিই সে বিষয়ে তাহাদিগকেই সচেতন করিয়া তোলে; এবং সেই সুদূর স্মৃতির সাহায্যেই সমস্ত প্রাণী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করে।

কিন্তু বর্ত্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই স্মৃতিগুলির অন্তরালে আরো বহু সহস্র এমন স্মৃতি আছে, যাহারা চেতন-রাজ্যের পশ্চাতে অচেতনের তিমির-লোকে পুঞ্জিত থাকে। আমাদের সমস্ত অতীত জীবনের স্মৃতি যে এই আঁধার রাজ্যে সুরক্ষিত আছে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—নেহাৎ নগণ্য বিষয়ের স্মৃতিও অবহেলিত হয় না—কোনটিই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায় না। এই অজ্ঞানময় পাতাল-পুরীর স্মৃতিগুলি কতকটা অদৃশ্য ছায়া-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া আছে। হয়ত তাহাদের জ্ঞানের আলোক-রাজ্যে প্রবেশের সাধ খুবই হইতে পারে, কিন্তু এই সাধ মিটাইবার চেষ্টা মোটেই থাকে না। তাহারা জানে, সচেতন মানুষ আমি—তাহাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া আমার অন্য অনেক কাজ আছে। কিন্তু যদি কোন মুহূর্ত্তে আমি, বর্ত্তমান অবস্থা ও বর্ত্তমান কার্য্যের উপর—অর্থাৎ যাহা-কিছু এতাবৎকাল আমার স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাহার উপর বীতরাগ হই—কিম্বা যে-মুহূর্ত্তে আমি অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ি, সেই মুহূর্ত্তে উল্লিখিত অতীত স্মৃতিগুলি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের বাধা দূর হইল বুঝিয়া আমার মনের রাজ্যে সজাগ হইয়া উঠে। অতীতের এই অসংখ্য স্মৃতি একসঙ্গেই ছুটিয়া আসে—সকলেই ফুটিতে চায়—কিন্তু মনে এতগুলাকে ঠাঁই দিই কি করিয়া? কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে আসিতে দিব?—এ সমস্যার সমধান কঠিন নহে। ইতিপূর্ব্বে যখন আমি জাগ্রত ছিলাম—তখন যে স্মৃতিগুলি আমার মনের তদানীন্তন অবস্থার সঙ্গে একটা কোন রকম সম্পর্ক পাতাইতে পারিয়াছিল, সেই সব স্মৃতিই সর্ব্বাগ্রে প্রবেশাধিকার পাইবে। নিদ্রিত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট দৃশ্যগুলি আমার চোখে পড়িতেছে—অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট শব্দ কাণে আসিতেছে—দেহের উপর যে স্পর্শ লাভ করিতেছি, তাহাও তেমন স্পষ্ট বোধ হইতেছে না—তা ছাড়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে কত সব নানা প্রকারের মিশ্র অনুভূতি আছে! ছায়া-স্মৃতিগুলির মধ্যে যাহারা এই গন্ধ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির সহিত অর্থাৎ এক কথায় বাস্তবতার সহিত যুক্ত হইতে অভিলাষী, তাহাদের মধ্যে কেবল সেইগুলিই প্রবেশাধিকার পাইতে পারে, যেগুলি আমার দৃষ্টি মণ্ডলের বর্ণ-বিন্দু, আমার বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় অনুভূতির সহিত আপনাদের অস্তিত্ব জুড়িয়া দিতে সমর্থ হয়! ইহা ছাড়া আমাদের সাধারণ প্রকৃতির সহিত তাহাদের খাপ খাওয়াও চাই। যখন এইভাবে স্মৃতি ও অনুভূতির সম্মিলন ঘটে—তখনই আমরা 'স্বপ্ন দেখি'।

স্বপ্নের ভিতর দুর্ব্বোধ রহস্য কিছুই নাই। —স্বপ্ন দেখা ও আমাদের কোন বিষয়ে ধারণা করার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ-কিছু নাই। কোন একটি বাস্তব পদার্থের সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিবার সময় আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখি, শুনি, তাহা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্মৃতি-সমুদ্ভূত অনুমানের সহিত সংযুক্ত হয়। অনুমানের সহিত তুলনায় প্রত্যক্ষ অনুভূতির কার্য্য খুবই সামান্য। যখন আমরা কোন গ্রন্থ বা সংবাদ-পত্র পাঠ করি—তখন কি সমস্ত ছাপার অক্ষরগুলিই আমাদের জ্ঞানরাজ্যে পৃথক পৃথকভাবে সুপ্রকাশিত হয়? না। তাহা হইলে বোধ হয় সমস্তদিন ধরিয়া পড়িলেও একখানা কাগজ শেষ করা যাইত না। আসল ব্যাপার দাঁড়ায় এই, পড়িবার সময় একটা শব্দের এমন কি এক-একটা ছত্রের দুই-একটা অক্ষর, দুই-একটা বিশেষ বিশেষ চিহ্নই সেই-সেই শব্দ বা ছত্রের সম্বন্ধে আমাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয়। আমরা দুই-একটা অক্ষর ও শব্দমাত্র প্রত্যক্ষ করি, বাকীটা অনুমানেই বুঝিয়া লই। গোল্ড্‌সিডর এবং মলার যে-ভাবে এই ব্যাপারটি প্রমাণ করিয়াছেন—তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ইঁহারা কতকগুলি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত বাক্য, যেমন "Positively no admission," "Preface to the Fourth Edition" প্রভৃতি কথা একখণ্ড কাগজে লিপিবদ্ধ করেন; ইচ্ছা করিয়াই ইঁহারা শব্দগুলি ভুল করিয়া লেখেন—এমন কি মধ্যে মধ্যে দুই-একটী অক্ষর একেবারেই বাদ দেন। পরে এক অন্ধকার গৃহে এই লেখাগুলি, যাঁহাকে দিয়া পরীক্ষা করা হইবে—তাঁহার সম্মুখে ধরা হয়। এই ব্যক্তি কাগজে কি লেখা রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই জানিতেন না। বৈদ্যুতিক আলোকে এই বাক্যগুলিকে অতি অল্প সময়ের জন্য পরিদৃশ্যমান করা হয়—এত অল্প সময় যে পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষে সে সময়ের মধ্যে সমস্ত অক্ষরগুলি পড়িতে পারা অসম্ভব। একটী অক্ষর পড়িতে কত সময় লাগে, তাহা অবশ্য পূর্ব্বেই নির্ণয় করিয়া লওয়া হয়। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশটি অক্ষর-বিশিষ্ট এক একটী বচনের আট-দশটি মাত্র অক্ষর পড়িতে যত সময় লাগিবার কথা—ঠিক ততটুকু সময়মাত্র আলো জ্বালিয়া রাখা হয়। দর্শক কিন্তু তবুও বাক্যগুলি ঠিক-মতই পড়িয়াছিলেন। এই পরীক্ষার ব্যাপারে যে বিষয়টী লইয়া আমাদের প্রয়োজন, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

পর্য্যবেক্ষণকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন্ কোন্ অক্ষর তাঁহার চোখে পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস—

তবে তিনি সম্ভবতঃ যে অক্ষরগুলি প্রকৃতই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাদেরই দুই-চারিটী উল্লেখ করিবেন। কিন্তু ইহা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, যে-সমস্ত অক্ষর বাদ দেওয়া হইয়াছিল বা ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যেও কোন কোন অক্ষর দর্শক নিশ্চয় দেখিয়াছেন, বলিবেন, অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণকারী পূর্ণ আলোকে বাক্যের ভিতর এমন-সব অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন বলিবেন—যেগুলি সে বাক্যে থাকা উচিত ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই পূর্ব্বপরিচিত বাক্যের কয়েকটী মাত্র অক্ষর প্রত্যক্ষ করাতেই অবশিষ্ট অংশগুলি মনে পড়িয়া যাওয়ায় স্মৃতি কতকগুলি বাস্তবিক-অদৃষ্ট অক্ষরকেও মনের রাজ্যে আঁকিয়া তুলিয়াছে। স্মৃতির দ্বারাই দর্শক এ অক্ষরগুলি শুধু অনুভব করিয়াছেন—চোখ দিয়া প্রত্যক্ষ করেন নাই।

কাজেই জাগ্রত অবস্থায় এবং আমাদের বাস্তব বিষয়গুলির সম্বন্ধে লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যেও—স্বপ্ন দেখার সময় যাহা ঘটিয়া থাকে—সেইরূপ একটা ব্যাপার ভিতরে ভিতরে ক্রমাগতই ঘটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত জিনিষেরই আমরা একটা মোটামুটি খসড়া ছবি (sketch) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ করি। এই অসম্পূর্ণ ছবিটাই আমাদের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদের পূর্ণ স্মৃতি—যাহা এতকাল উন্মনা অবস্থায় চিন্তার রাজ্যে লুক্কায়িত ছিল—এই সুযোগে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয়। এই প্রকার অনুমান (hallucination) সত্যের সঙ্গে বিজড়িত হইয়াই আমাদের বোধ-শক্তিকে জাগাইয়া দেয়। নিমেষ-মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। কোন জিনিষকে প্রত্যক্ষ করিতে যত সময় লাগে—মনের ক্রিয়া তদপেক্ষা বহু দ্রুত সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত ব্যাপারে স্মৃতি-মূর্ত্তিগুলির আচরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

কোন বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করায় যখন এই স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়—তখন ইহারা ঠিক যেন সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ-অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, এরূপ মনে করা যায়। মলার এবং গোল্ডসিডরের পরীক্ষারও পূর্ব্বে মনস্টারবর্গের যে-সমস্ত পরীক্ষার কথা আমরা অবগত আছি, (যদিও এই সমস্ত পরীক্ষা ভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল) সেগুলি আমাদের উল্লিখিত অনুমানকে সমর্থন করে। মনস্টারবার্গের লিখিত শব্দগুলি তেমন সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল না। এস্থলেও শব্দের সমস্তটা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে যে সময় আবশ্যক—তদপেক্ষা অনেক কম সময়—চোখের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণকারী যখন শব্দগুলির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি তাহার কাণে কাণে সম্পূর্ণ ভিন্ন-অর্থের অনুরূপ শব্দ বলিয়া যাইতেছিল। ফলে ঘটনা হইল এই যে, দর্শক এমন একটা শব্দ পড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিল, যাহা লিপিবদ্ধ শব্দ হইতে বিভিন্ন; অথচ লিখিত শব্দের সহিত এই নূতন শব্দের মোটামুটি সাদৃশ্য ছিল—এবং ইহার অর্থের সহিত দ্রষ্টার কাণে কাণে উচ্চারিত শব্দের অর্থেরও বেশ মিল ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক—

লিখিত শব্দটী ছিল—"টিউমাল্ট"। দ্রষ্টার কাণে কাণে বলা হইল, "রেলরোড"—সে পড়িল—"টনেল"। টিউমাল্টে-টনেলে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু "টনেলের" অর্থগত সাদৃশ্য "রেলরোডের" সহিত। "রেলরোড" শব্দটী কাণের কাছে উচ্চারিত হওয়ায় আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের মনে রেলরোডের 'আইডিয়া' বা ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এক দল স্মৃতি (যেমন গাড়ী, রেলপথ, ভ্রমণ প্রভৃতি) সুপ্রকাশিত হইবার আশায় সজাগ হইয়া ওঠে।

অনুভূতির এবং স্বপ্নের ইহাই হইল ভিতরকার কথা; উভয়ক্ষেত্রেই—একদিকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ কতকগুলি বাস্তব ধারণা—এবং অপরদিকে কতকগুলি স্মৃতি—যাহারা এই সমস্ত ধারণার মধ্যে পুষ্ট হয়; পরে এই ধারণা ও স্মৃতি উভয়ে একত্র মিলিয়া স্বপ্নরূপে পুনর্জীবন লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অনুভূতি ও স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি? নিদ্রা ব্যাপারটাই বা কি?—অবশ্য নিদ্রার (physiological) কায়িক ব্যাখ্যার কথা তুলিতেছি না। সে একটা ভিন্ন প্রশ্ন এবং তাহার সমাধানও সুদূরপরাহত। আমি প্রশ্ন করিতেছি, (psychologically) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে নিদ্রার ব্যাখ্যা কি?—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মন, আমরা ঘুমাইয়া পড়িলেও আপনার কার্য্য করিয়া যায়। জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতে একই ভাবে আমাদের মন যে অনুভূতি ও স্মৃতির উপর কার্য্য করে—তাহা আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি এবং আরো দেখিয়াছি, এই স্মৃতি ও অনুভূতিকে ঐ একই ভাবে সংমিশ্রিতও করিয়া থাকে। যাহা হউক—আমাদের এক অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি অনুভূতি মাত্র—অপর অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি স্বপ্ন। তাই প্রশ্ন করিতেছি—পার্থক্যটা কোথায়? মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া নিদ্রিত অবস্থার বিশেষত্বই বা কি?

আমরা কোন থিওরি বিশ্বাস করিতে চাহি না। এ বিষয়ে থিওরি আছেও বিস্তর। কেহ বলেন, নিদ্রা হইতেছে বহির্জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা—বাহিরের জিনিসকে ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য করা। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্যকরী থাকে—ইহারাই আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নের বাহ্য আকৃতিটা জাগাইয়া তোলে। কেহ বলেন—"নিদ্রিত হওয়ার অর্থ মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির (superior faculties) কার্য্য স্থগিত করিয়া দেওয়া।" ইঁহারা এই সমস্ত বৃত্তির ক্ষণিক নিষ্ক্রিয়তার কথাও বলিয়া থাকেন; কিন্তু এটা তেমন কাজের কথা বলিয়া মনে করি না। স্বপ্নে আমরা যুক্তি-তর্কের ধার ধারি না বটে, কিন্তু এ-বিষয় যে আমাদের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়, এমন নহে। এমন সব স্বপ্ন আছে যেস্থলে আমরা বেশ সহজ ও শুদ্ধ ভাবেই যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলি, এমন কি এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে স্বপ্ন-দ্রষ্টার ভুল-ভ্রান্তির মূল একটু অতিরিক্ত মাত্রায় যুক্তি-তর্কের বশীভূত হওয়া। যদি স্বপ্ন-দ্রষ্টা, সহজ সরলভাবে স্বপ্নের ভিতর যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া যায়, শুধু তাহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে তাহার স্বপ্নের

মধ্যে অদ্ভুত বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া যে সে সমস্ত ব্যাপারের একটা অর্থ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়—অসম্বদ্ধ বিষয়াবলীকে যুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চায়—ইহাতেই তাহার অসঙ্গমস যুক্তি-তর্কের জালে আবদ্ধ হইয়া বাস্তব ঘটনাবলী এক অদ্ভুতরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, আমাদের উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতাই যথেষ্ট দুর্ব্বল, এমন কি সময় সময় স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি-বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এ থিওরিও ঠিক নহে।

আরো কিছু চাই। শুধু থিওরিতে চলিতেছে না। বাস্তব ব্যাপারের আরো একটু বেশী কাছ-ঘ্যাঁসা হইতে হইবে। নিজের উপর পরীক্ষা করিয়াই একটা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পর—যেহেতু স্বপ্ন দেখা অবস্থাতেই আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিতে পারি না, তাই স্বপ্ন হইতে যে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠি,—সেই ক্রমবিবর্ত্তনশীল অবস্থাটী অতি নিবিষ্টভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমা-দিগকে অনুসরণ করিতে হইবে—এইভাবে অনুসরণ-দ্বারা যাহা আমরা অনুভব করিতে পারিব, বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ—কিন্তু খুব একান্ত-ভাবে মনঃসংযোগ করিলে ইহা একেবারে অসম্ভবও নহে। লেখকের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। অনতিকালপূর্ব্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন, সে স্বপ্নটি কি এবং স্বপ্নভঙ্গের পর যাহা ঘটিয়াছিল—তাহাই বলিতেছি।

স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। যেন রাজনীতি বিষয়ে বলিতেছেন। তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেমন একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সেই গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে অস্পষ্টতর কলরবে পরিণত হইল—অতঃপর গভীর গর্জ্জন, ও ভয়ঙ্কর চীৎকার-শব্দ উঠিল। অনতিবিলম্বে চারিদিক হইতে সমস্বরে "বেরিয়ে যাও", "বেরিয়ে যাও" এই রব উঠিল। পাশের বাড়ীর বাগানে তখন একটা কুকুর ডাকিতেছিল এবং তাহার প্রত্যেক বারের "ভেউ ভেউ" ডাকের সহিত "আউট, আউট" (অর্থাৎ "বেরিয়ে যাও" "বেরিয়ে যাও") শব্দ স্বপ্ন-দ্রষ্টার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল। এই অতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটিতে অনেকখানি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

জাগ্রত-আমি মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া নিদ্রিত 'আমি'কে এখন বলিব—"এইবার আমি তোমায় ঠিক ধরিয়াছি! তুমি ভাবিতেছিলে: শ্রোতৃমণ্ডলী চীৎকার করিতেছে? না। বাস্তবিক পক্ষে ও একটা কুকুর ডাকিতেছিল। যতক্ষণ না তুমি আমায় বল—তুমি সত্য সত্য কি করিতে-ছিলে, ততক্ষণ তোমায় আমি ছাড়িব

না।" স্বপ্নের-আমি ইহার উত্তরে বলিব—"আমি কিছুই করিতেছিলাম না; এবং এইখানেই তোমায়-আমায় প্রভেদ। তুমি মনে কর যে একটা কুকুরকে ডাকিতে শুনা এবং ও ডাকটা যে কুকুরেরই তাহা বুঝিতে পারা—এই দুই ব্যাপারের জন্য তোমায় কিছুই করিতে হয় না? সেটা মস্ত ভুল। এইগুলাও বুঝিবার জন্য তোমায় যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হয়। তুমি বুঝিতে পার না, যে তোমার সমস্ত স্মৃতি, তোমার যাবতীয় সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কতখানি সাহায্য এই একটী বিষয়ের জন্য তুমি গ্রহণ কর। যে শব্দটী শুনিতে পাইলে—তাহার সহিত ঠিক তোমার কোন্ স্মৃতিটীর সাদৃশ্য আছে—সেটা তোমায় নির্দ্ধারণ করিতে হয়—কেবল তাই নয়—এই স্মৃতি ও তোমার শুনা শব্দ উভয়ে মিলিয়া যাওয়া চাই—একটু অমিল বা পার্থক্য থাকিলে চলিবে না—তাহা হইলে তোমার কেবল স্বপ্ন দেখাই সার হইবে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘটিবে না। এই সর্ব্বাঙ্গীন সমতা কেবল স্মৃতি ও অনুভূতির প্রয়োগ-দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ যেমন দর্জ্জী একটা নূতন কোট তৈয়ার করিতে হইলে—সেলাই করিবার পূর্ব্বে কাপড়টা টানিয়া ভাঙ্গিয়া ঠিক তোমার শরীরের কাঠামোর সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া লয়, তেমনই আর কি। কাজেই তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিতে তোমায় খাটিতে হইতেছে। জাগ্রত অবস্থায় তোমার জীবন পরিশ্রমের জীবন; এমন কি যখন তুমি কিছুই করিতেছ না ভাব—তখনও তুমি প্রকৃত পক্ষে কাজ হইতে নিষ্কৃতি পাওনা। কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে কিছু ত্যাগও করিতে হইতেছে। সজ্ঞান অবস্থায় শত সহস্র অনুভাবের বিষয় হইতে এই প্রকারেই অধিকাংশকে বাদ দিয়া কয়েকটী মাত্র বিষয় তুমি সত্যসত্য অনুভব কর। যে পরিত্যক্তবিষয়াবলী রাত্রে তোমার নিদ্রাবস্থায় পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা তোমার স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে অতি সন্তর্পণে ও অভ্রান্তরূপে তুমি নির্ব্বাচন করিয়া লও—কেননা তোমার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মিশ খাইবে না সেগুলি তোমায় বর্জ্জন করিতে হয়। এই যে নির্ব্বাচন যাহা তুমি ক্রমাগতই করিয়া চলিয়াছ—এই যে সামঞ্জস্য যাহা তুমি প্রতিনিয়তই বিচার করিয়া চলিয়াছ—ইহাই মানুষের সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) গোড়ার কথা। এবং এই-সব তোমাকে অহরহ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। জল-বায়ুর চাপ যেমন তুমি অনুভব করিতে পার না—তেমনি এই যে তুমি সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিয়াছ—এটুকুও অনুভব কর না—অথচ ইহা তোমায় ক্লান্ত করিয়া ফেলে। সাধারণ জ্ঞান বড় শ্রান্তিদায়ক।

"কাজেই আবার বলিতেছি, তোমার সহিত ঠিক এইখানেই আমার পার্থক্য যে, আমি কিছুই করি না। যে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম-প্রবণতা, নির্ব্বাচন-প্রচেষ্টা তুমি মানুষের ঘাড়ে চাপাও—আমি শুধু তাহা হইতে বিরত থাকি। প্রাণের সহিত নিজেকে সংযুক্ত না করিয়া—আমি প্রাণ হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া লই। কোন বিষয়ের উপরই আমার কোন স্পৃহা বা পক্ষপাতিতা নাই—সমস্ত

বিষয়েই আমি নির্ব্বিকার, নিঃস্পৃহ। ঘুমাইয়া পড়াই হইতেছে, নিঃস্পৃহ হইয়া পড়া। মানুষ যে পরিমাণে স্পৃহার অতীত হইয়া থাকে—ঠিক সেই পরিমাণে সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সন্তানের পার্শ্বে নিদ্রিতা যে মাতার বজ্র-পতনের শব্দেও নিদ্রা ভঙ্গ হয় না—সন্তানের একটী দীর্ঘশ্বাসেই তিনি আবার জাগিয়া উঠেন—তিনি কি তাঁহার সন্তানের সম্বন্ধে বাস্তবিক নিদ্রিত হন?—যে বিষয়ের উপর নিদ্রাতেও আমাদের সহানুভূতি থাকে, সে বিষয়ের সম্পর্কে আমরা নিদ্রিত হইতে পারি না।

"তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ—আমি যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমি কি করি? আমি তোমায় বলিব—তুমি যখন জাগিয়া থাক, তখন তুমি কি কর? তুমি আমাকে গ্রহণ কর—স্বপ্নের-আমাকে, তোমার অতীত জীবনের সমষ্টি আমাকে, এবং তুমি আমাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া জোর করিয়া আমার যে বৃত্ত তোমার বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর চারিদিকে আঁকিয়া ফেল, সেই ক্ষুদ্র বৃত্তের সহিত অবিকল খাপ খাওয়াতেই চাও। ইহাই হইতেছে জাগ্রত অবস্থার স্বরূপ। ইহার অর্থ, সংগ্রাম করা। ইহার অর্থ, ইচ্ছা করা। তারপর স্বপ্নের কথা—সত্যই কি আমার এবিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে, বোধ করি? ইহা হইতেছে সেই অবস্থা—যে অবস্থায় তুমি তোমাকে হারাইয়া ফেল—যখন তোমার কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি থাকে না—যখন তোমার ইচ্ছা-বৃত্তির কার্য্য বন্ধ থাকে।"

স্বপ্নের-আমি যাহা বলিবে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। যদি আমরা ইহাকে মন খুলিয়া কথা বলাইতে পারি, তবে ইহা ছাড়া আরো অনেক তত্ত্ব সে আমাদিগকে শুনাইতে পারে। থাক্—এখন আমরা যে বিশেষ পার্থক্য জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্নকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে—সংক্ষেপে তাহা প্রতিপাদন করিব। স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় একই প্রকার বৃত্তির পরিচালনা ঘটিয়া থাকে কিন্তু একক্ষেত্রে উহারা কর্ম্মবন্ধনে বিশেষভাবে আবদ্ধ, অপর ক্ষেত্রে বন্ধন-মুক্ত। স্বপ্ন হইল সম্পূর্ণ মানসিক জীবন হইতে কর্ম্ম, উদ্যম এবং দৈহিক পরিচালনার বিযুক্তি! এ অবস্থাতেও আমরা অনুভব করি, এ অবস্থাতেও আমরা স্মরণ রাখি - স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলি। এ সমস্তই স্বপ্নে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাদের অস্তিত্ব থাকিলেই যে কর্ম্মোদ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল, এমন নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন বিষয়কে অপর কোন বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিতেই উদ্যমের প্রয়োজনীয়তা। একটা কুকুরের চীৎকার শব্দের সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর গুঞ্জন ও হুঙ্কার-ধ্বনির স্মৃতির সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্যে কোন উদ্যমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ শব্দ যে কুকুরেরই ডাক, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মস্তিষ্ক চালাইবার প্রয়োজন হয়। স্বপ্ন-দ্রষ্টার এই উদ্যমেরই অভাব। কেবলমাত্র এই উদ্যমের অভাব হইতেই স্বপ্ন-দ্রষ্টা জাগ্রত মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

মূলের এই পার্থক্যটী অনুসরণ করিলে

আরো অনেক পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে। এই উপায়ে আমরা স্বপ্নের প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি জানিতে পারিব। বিশেষ-ভাবে তিনটী বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে। স্বপ্নের অসামঞ্জস্য, স্বপ্নের ভিতর সময়ের ব্যাপকতা অনুভবের অভাব এবং কোন্ অনুভূতির সহিত সংমিশ্রিত হইবে তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত স্মৃতিসমূহের স্বপ্ন-দ্রষ্টার মনে উদিত হইবার প্রণালী।

স্বপ্নে অসামঞ্জস্যের অর্থ সহজেই নির্ণয় করা যায়। স্বপ্নের বিশেষত্বই এই যে, ইহা স্মৃতি-চিত্র এবং অনুভূতির মধ্যে পরস্পরের পূর্ণ ভাবের ক্ষমতার দাবী করে না—বরং তাহাদের একটু লুকোচুরিরই সমর্থন করে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের স্মৃতিও একই অনুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—দৃষ্টিমণ্ডলে হয়ত একটী সবুজ স্থান অনুভূত হইল; তাহাতে যেন শাদা শাদা কতকগুলি চিহ্ন আছে। স্বপ্নে ইহা শুভ্রকুসুম-পরিপূর্ণ একটী উদ্যান হইয়া দেখা দিতে পারে—কিম্বা বল-সমেত বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিলও হইতে পারে, আরো কত-কি হইতে পারে। বিভিন্ন স্মৃতি-চিত্রগুলি—যাহাদের সকলেই উল্লিখিত দৃষ্টিমণ্ডলের অনুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে—ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে! কখনও কখনও এমনও হয় যে, একাধিক স্মৃতিও ক্রমান্বয়ে সেই অনুভূতিতে মিশিয়া যাইতে সমর্থ হয়। এবং তাই উদ্যান বিলিয়ার্ড টেবিলে রূপান্তরিত হয় এবং আমরা সবিস্ময়ে এই অসাধারণ রূপান্তর-ব্যাপার দর্শন করি; কখনও কখনও একই সময়ে একত্র এই স্মৃতিগুলি অনুভূতিতে লীন হয়—তখন উদ্যানই বিলিয়ার্ড টেবিল হইয়া দাঁড়ায়। এবং দুইটিকে তখন আর দুইটী ভিন্ন জিনিস বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থাতেই সেই সব আজগুবি স্বপ্ন আমরা দেখিয়া থাকি—যাহাতে কোন বিষয়, যেমন আছে তেমনি থাকিয়াও অন্য-কিছু বলিয়া মনে হয়।

আমাদের অনেক স্বপ্নে সময়ের ব্যাপকতা অনুভব করিবার ক্ষমতার যে অভাব দেখা যায়, তাহা এই একই কারণের জন্য। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর আমরা স্বপ্নে এত সব বিষয় দেখিয়া ফেলি—যাহা জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইতে কয়েকদিনও সময় লাগিতে পারে। যখন আমরা জাগিয়া থাকি, তখন আমরা আমাদের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চলি—বাহিরের এই সামাজিক জীবনের প্রতি আমাদের যে লক্ষ্য থাকে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বপ্নে ইহার অস্তিত্ব নাই। বাহিরের দ্বারা ভিতরের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যতটুকু মনোযোগ আবশ্যক—এবং অন্তরে অনুভূত সময়ের ব্যাপ্তির সহিত সাধারণ ঘটনার ব্যাপ্তির সমতা রক্ষার জন্য যতদূর মনঃসংযোগ প্রয়োজন, স্বপ্ন-দ্রষ্টার উহার বিশেষ অভাব থাকে।

এখন স্বপ্ন-দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার কিরূপ বিশেষত্বের দরুণ বাস্তব অনুভূতির সহিত সম্মিলিত হওয়ার তুল্য উপযোগী স্মৃতি-সমূহের মধ্যে কোন কোনটীর প্রতি অধিকতর পক্ষপাত প্রদর্শিত হয়, তাহা আলোচনা করিব। আমাদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে দিনের বেলায় যে-যে

বিষয় আমরা অধিক ভাবিয়া থাকি—রাত্রে সাধারণতঃ তাহাই স্বপ্ন দেখি। এ কথা কোন কোন স্থলে সত্য। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার মানসিক জীবন যে এইভাবে নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে—তাহা এই জন্য যে, সে নিদ্রা বাস্তবিক নিদ্রা নয়। এই প্রকার স্বপ্নময় নিদ্রা আমাদের ক্লান্তি অপনোদন না করিয়া ক্লান্তি বাড়ায়। যে-সব চিন্তা পূর্ব্বে আমাদের মনের ভিতর দিয়া অতি দ্রুত বহিয়া গিয়াছে; সাধারণ নিদ্রায় সেই সব চিন্তা লইয়াই আমরা স্বপ্ন দেখি অথবা এমন সব বিষয় লইয়া দেখি, যাহা আমরা অনুভব করিয়াছি মাত্র কিন্তু সে-দিকে তৎপ্রতি বড় একটা মনোযোগ দিই নাই। যদি আমরা একই দিনের ব্যাপার রাত্রে স্বপ্ন দেখি, তবে তাহা এমন সব বিষয় লইয়া, যাহাদের তেমন একটা কিছু গুরুত্ব নাই—তেমন কোন বিশেষত্ব নাই।

এবিষয়ে ডিলেজের W. Robert এর এবং Freud এর সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মতের মিল আছে। আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—একেবারে রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়াছিলাম—অথচ কোন গাড়ী চাপা বা এরূপ কোন দুর্ঘটনাই চোখের সম্মুখে ঘটে নাই। কিন্তু যদি রাস্তায় কোন গাড়ী আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আমার মনে বিপদের আশঙ্কামাত্রও স্থান পাইয়া থাকে অথবা আমি জ্ঞাতসারে কোন আশঙ্কা না করিয়া থাকিলেও—অলক্ষ্যে আমার দেহ যদি একটুও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—তবে আমি সে রাত্রে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারি যেন আমার শরীরের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গিয়াছে! একজন মরণোন্মুখ রোগীর শয্যাপার্শ্বে আমি দাঁড়াইয়া আছি। যদি কোন মুহূর্ত্তে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও আমি এরূপ ভাবিয়া থাকি যে হয়ত রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, তবে আমি হয়ত স্বপ্ন দেখিব, রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আরোগ্য-লাভের বিষয়ই স্বপ্ন দেখিব—খুব সম্ভব রোগের অবস্থা স্বপ্ন দেখিব না। স্থূল কথা এই যে যে-সব বিষয় আমরা অলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছি—সাধারণতঃ সেইগুলিই স্বপ্নে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? স্বপ্নের সত্তা—অস্পষ্ট সত্তা; যে সব স্মৃতি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে স্বপ্ন সংগ্রহ করে—সেগুলি সাধারণতঃ অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্মৃতি।

ইহা সত্য যে খুব গভীর নিদ্রায় যে নিয়মে স্বপ্নে স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আমরা এইরূপ গভীর নিদ্রার অবস্থার বিষয়ে কিছুই জানি না। এ অবস্থায় যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা সাধারণতঃ আমরা জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ভুলিয়া যাই। ক্বচিৎ একটু আধটু মনে থাকে।

যাহা হউক এই গভীর নিদ্রার অবস্থা মনস্তত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। ছায়া-দর্শন প্রভৃতি ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানা, মৃত আত্মার আবির্ভাব প্রভৃতি আত্মিক ব্যাপারও উক্ত বিজ্ঞানেরই অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এ-সব বিষয়ের উপর কোন মতামত প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু Psychical Research Society বলিয়া এইসব আত্মিক ব্যাপারের যে এক অনুসন্ধান সমিতি আছে, তাহার সভ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য্য উৎসাহের ফলে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যে সব সত্য নির্ণীত হইতেছে, তাহা অশ্রদ্ধা করা চলেনা। যদি আমাদের স্বপ্নের উপর টেলিপেথির কোন প্রভাব আসিয়া থাকে—তবে খুব সম্ভব এই গভীর নিদ্রাকালেই ইহা নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু এবিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত করা সহজ নয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

সুসময়

বসন্ত বায় বহে নাই হায়
কুসুম-বনে।
হাওয়াটুকু তার লাগিয়াছে শুধু
আমার মনে!
না-জানি কেমনে নিমেষের ভুলে
ছেয়েছে হৃদয় পল্লবে-ফুলে,
গুঞ্জন আর কূজন জেগেছে
মনের কোণে!
বসন্ত নাই হাওয়া তারি তবু
লেগেছে মনে।

আজিকে তোমরা দিয়োনা আমারে
দিয়োনা বাধা;
সারাদিন ধরি হবে আজি মোর
বীণাটি সাধা!
নিবিড় নিঠুর পীড়ন মধুর
জাগায়ে তুলিবে বিহ্বল সুর,
তারি সাথে সাথে দুখানি নূপুর
বাজিবে আধা!
গাহিবার দিনে আজিকে তোমরা
দিয়োনা বাধা!

নবীন আষাঢ় আসেনি এখনো
আকাশ জুড়ে।
সজল বাতাস গেয়ে গেছে তবু
হৃদয়-পুরে!
যে নদী লুকায়ে ছিল বালুমাঝ
কূলে কূলে ছেপে উঠেছে সে আজ,
বিপুল আবেগে কল্লোল তুলি
চলেছে ঘুরে!
শ্যামল আষাঢ় আসেনি যদিও
আকাশ জুড়ে।

আজি এই স্রোতে ভাসাবো আমার,
ক্ষুদ্র তরী।
শপথ তোমার, ডেকোনা আমায়,
রেখোনা ধরি!
ডোবে যদি তরী, ডুবে যাবে হায়
পারিবেনা কেহ ফিরাতে আমায়,
লব সযতনে শীতল মরণ
বরণ করি!
ডুবে যদি যায় তবু আজি হায়
ভাসাবো তরী!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বরণ

এস এস ঋতুরাজ! তোমারে বরিব আজ
পল্লব মুকুল ফুল ফলে,
প্রভাত-অরুণ-রাঙা কোকনদ-দলে!
তব পীত উত্তরীয় নূতন রঙায়ে নিয়ো
আমাদের পরাণের রঙে,—
বাসন্তী নহে ত তাহা, রক্তিম বরণে!

কণ্টকী শিমুল গায় যে লালে ছাইয়া যায়
তাই দিয়ে রচিব কেতন,—
ব্যথা পেয়ে যে অশোকে চেতনা নূতন!

কচি কিশলয়-দল সাজাবে আসন-তল,
বর্ষে বর্ষে আরক্ত নবীন,
জরার শাসন যারা ভাঙে চিরদিন।

অপরাজিতার পাঁতি কণ্ঠহারে দিব গাঁথি,
নীলকণ্ঠ নীলকান্তি যার,
বর্ষা শীতে মরেনাক চিরনির্ব্বিকার।
দ্রাক্ষাগুচ্ছ অর্ঘ্য করে' দেব করপুট ভরে'
পীড়নে যে রসধারা ঢালে,—
তন্দ্রাহত মর্ম্মমাঝে অগ্নিমন্ত্র জ্বালে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল, ১।২ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। গিরিশ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। গ্রন্থকার 'উপক্রমণিকায়' বলিয়াছেন, শিবচন্দ্র 'দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি, বাগ্মী, সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বা লোকহিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এ সকলের কেহই ছিলেন না। সচরাচর বড় লোক বলিলে যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সূচিত হয়, তাহাও তাঁহার ছিল না।' তবে তাঁহার জীবন-চরিত লেখা কেন? কারণ আছে। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। গ্রন্থকারের কথায়, "তিনি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড বিধানে যে সমস্ত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ন্যস্তধনের ন্যায় তাহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই এবং আজীবন সেই বৃত্তিগুলির সংরক্ষণে ও পরিস্ফুটনে যত্নশীল ছিলেন।" এই বিপুল জীবন-সংগ্রামের দিনে এ বড় সহজ কাজ নহে। হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন, সেকালের সামান্য চাকুরে, একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজে পড়িতেন,—সেখানে ডিরোজিও ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। তখনকার দিনে ছাত্রেরা পানাহার-সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন,—শিবচন্দ্র কোন দিন তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ না করিলেও পানাহারে রীতিমত সংযমী ছিলেন। তাঁহার কয়েকজন সতীর্থ একবার তাঁহাকে সবলে শয়ন করাইয়া সুরাপানের চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাপরায়ণ দৃঢ়চিত্ত শিবচন্দ্রকে সুরা পান করাইতে পারেন নাই। বাল্যকালের আর একটি ঘটনায় শিবচন্দ্রের ভিতরের মানুষটিকে সহজে বুঝা যায়। তাঁহার বয়স তখন দশ-বারো বৎসর; বাড়ীর পূজারী ঠাকুর তাঁহার হাত দেখিয়া বলেন, "তুমি হাকিম হইবে। যদি হাকিম হও, তাহা হইলে আমাকে কি দিবে?" বালক শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি যদি হাকিম হই, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।" ইহার বহু বৎসর পরে হাকিম হইয়া সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়াছিলেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে যে-মনুষ্যত্বের আভাষ পাই, তাহা অসামান্য।

পনেরো বৎসর বয়সে শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতেই শিবচন্দ্র পত্নীর শিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। তখনকার দিনে এ ব্যাপার রীতিমত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্রের অকুতোভয়তা ও তাঁহার স্ত্রীর নিষ্ঠায় কোন বিঘ্নই তাঁহাদের সত্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। স্ত্রীকে দুই-চারিটা গঞ্জনা এজন্য শুনিতে হইয়াছিল, কিন্তু আদর্শ সহধর্ম্মিণী স্বামীর আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সে সকল গঞ্জনা গ্রাহ্যও করেন নাই। ১৮৫২ খ্রীঃঅব্দে শিবচন্দ্র "কোন্নগর হিতৈষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সভা শিবচন্দ্রের সাহায্যে গ্রামের রাস্তা মেরামত, সাঁকো নির্ম্মাণ, দরিদ্রদের সাহায্য-দান দস্যুভয়-নিবারণের জন্য সরদার পাইক নিযুক্ত করা বাঙলা, পাঠশালার জীর্ণ সংস্কার, ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান-সাধনে" সক্ষম হইয়াছিল। শিবচন্দ্র ডেপুটিত্ব করিয়াও এ-সব সংস্কারের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন,—এইখানেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। পরে গ্রামে সুরাপান রহিত করাইবার জন্য মদের দোকানগুলি উঠাইবার উদ্দেশ্যে ছয়মাস অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় তাহা ঘটে নাই। কোন্নগরে যে রেলওয়ে ষ্টেশন ও ডাকঘর খোলা হয় তাহারও মূলে শিবচন্দ্রের চেষ্টা। এগুলা গেল বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের কথা। পারিবারিক জীবনে তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন; সকলের সহিত মিশিতেন, তুচ্ছ ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতেন না—আত্মীয়-পরিজনের সহিত আচারে-ব্যবহারে খাঁটী ছিলেন। তাঁহার সকল কাজ ঘড়ি-ধরা ছিল; নিয়মের কখনো এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিত না। ডিরোজিওর কাছে শিক্ষাকালে তিনি একেশ্বররাদী হন; পরে বাংলা ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার গ্রাহক হন্ এবং ঐ পত্রিকায় লিখিত উপাসনা-পদ্ধতি-অনুসারে গৃহে উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব অধিপতির সহিত নববিধান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ প্রকৃত পক্ষে হিন্দুমতে আচরিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে যখন হুলস্থুল বাধিয়া যায়, কেশবচন্দ্র তখন নীরব ছিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যের পদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তখন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবচন্দ্র প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" গ্রন্থে শিবচন্দ্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি বিনয়ী ও সদাশয়, দয়ালু ও সৌজন্য বিশিষ্ট ছিলেন; তিনি যথাসময়ে ও শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য করিতেন; এবং তিনি পারিবারিক ও সামাজিক সদ্‌গুণ-নিচয়ে আদর্শকল্প ছিলেন।" শিবচন্দ্রের জীবন সাধারণ বাঙালীর জীবন, তাহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য বা অমানুষিক বিশেষত্ব নাই সত্য, তবে এই Principle প্রভৃতির শিথিলতার যুগে তাঁহার চরিত্রে এমন অনেকখানি তেজ ও দার্ঢ্য দেখা গিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। এই দীর্ঘ গ্রন্থখানিতে শিবচন্দ্রের হৃদয়ের বহু গুণের কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনের এমন বহু কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য, অথচ মনুষ্যত্বের গৌরব-মহিমায় সেগুলি রীতিমত সমুজ্জ্বল। গ্রন্থের রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী, আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। তবে ত্রুটিও যে একেবারে নাই, এমন নয়। পারিবারিক

এমন অনেক কথা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, আত্মীয়-বন্ধুর পরিচয়ও মধ্যে মধ্যে এমন অনাবশ্যক বিশদ করা হইয়াছে যে সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। জীবনী-রচনায় একটা বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয় —যেন Boswellism না আসিয়া পড়ে। কারণ জীবন-কথা ঠিক ঘরের লোকগুলির জন্য ত নয়—ইহার কতটা সাধারণকে দিবার সামগ্রী এবং কতটাই বা শুধু ঘরে রাখিবার, তাহা খুব পাকা হাতে ওজন করা প্রয়োজন। সেই ওজনের মাত্রা মাঝে মাঝে এ গ্রন্থে শিথিল দেখিলাম। আর একটা কথা;—অবশ্য গ্রন্থকার যেন কথাটা অন্যভাবে গ্রহণ না করেন—আমাদের আপত্তি, ঐ গ্রন্থের নামে "নরদেব" কথাটায়। শিবচন্দ্র যে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,তবে ঐ "নরদেব"কথাটায় অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে—ধর্ম্মগত আপত্তি। আমাদের আপত্তি আছে, অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না। গ্রন্থকার এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ধর্ম্মবীরগণকেই এদেশের লোকে দেবতার আসন দিয়া থাকে—তাই কথাটা তুলিলাম।

মহাত্মা গান্ধী। (জীবনী ও অভিমত সংগ্রহ)। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা, রুদ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। হাওড়া পানিত্রাস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভারতের অদ্বিতীয় আদর্শ কর্ম্মবীর অসাধারণ স্বার্থত্যাগী জনবন্ধু দধীচি-কল্প মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনী অপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি এমনি উপভোগ্য হইয়াছে যে উপন্যাস ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। গ্রন্থের পাতায় পাতায় গান্ধীর অসাধারণ মহত্ত্বের মহিমাময় ছবি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান্ধীর বহুবাণীও সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলির মূল্য মণি-মাণিক্যের চেয়েও বেশী। বাণীগুলি স্বতন্ত্র কার্ডে লিখিয়া ঘরে-দুয়ারে ছবির মত ঝুলাইয়া রাখিবার যোগ্য! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক! বাঙালীর ছেলেরা এ গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠা মুখস্থ করিয়া মজ্জাগত করিয়া ফেলুক! গান্ধীর গুণের সুবাসে তাহাদের নবমুকুলিত চিত্ত আমোদিত হোক, পরিপূর্ণ হোক; গান্ধীর আদর্শ পথের তাহারা পথিক হোক—ইহার চেয়ে বড় কামনা এ-যুগে বাঙালীর আর থাকিতে পারে না। এই সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—নিঃস্বার্থ মনুষ্যত্বের ছবি আঁকিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

পাণিপথ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী বি, এ প্রণীত। চট্টগ্রাম, মিণ্টো প্রেস, কে, বি, বসু দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি ঐতিহাসিক কাব্য'। প্রথম সর্গে দেখি, 'স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম' ও সভাসদ্‌গণ—কাছে 'নর্ত্তকীনিচয় * * চপলা চমকে অঙ্গে বেষ্টিয়া নয়ন—' 'করিতেছে সুরামুগ্ধ সম্রাট-অন্তরে উদ্দাম লালসা-পূর্ণ কাম উদ্দীপিত'।" ক্ষণপরেই "শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত, মধুর পঞ্চমে গৃহ করি উচ্ছ্বসিত"—এই ব্যাপারটি এবং গানের ভাব ও ধরণ একেবারে হুবহু 'পলাশীর যুদ্ধ' স্মরণ করাইয়া দেয়! দ্বিতীয় সর্গে, দৌলত খাঁর প্রমোদ বন—সেখানেও গান আছে, নারী আছে, এবং থিয়েটারী ধরণে কথা-বার্ত্তাও প্রচুর আছে! একে পাণিপথ, তার উপর গোড়াতেই নর্ত্তকী আর প্রমোদ-বন—কাজেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। রচনা বিশেষত্ব-হীন, নকলের নকল, ছন্দ পঙ্গু, ভাব এবং কবিত্ব উভয়েরই অভাব! একটা কথা, যুদ্ধ নহিলে কি কাব্য হইবে না? এবার বোধ হয় বাঙলার কাব্য-জগতে "জর্ম্মান-ওয়ার" দেখা দিবে! সাধারণ নর-চিত্তে ভাবের যে বিচিত্র লীলা অহরহ ফুটিতেছে, তাহা কি বাঙলার কাব্য-কারগণের চোখে পড়ে না? থিয়েটারের সেই ভীম গর্জ্জন শেষে কাব্যের ক্ষেত্রেও রীতিমত দম্ভ-আস্ফালন সুরু করিয়া দিল!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।